তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ননীগোপাল সেনগুপ্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত—
১৮।২ সেলিমপুর লেন,
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১

১৩৬৭

মুদ্রাকর
রঞ্জিত মজুমদার,
যুগবার্ত্তা প্রেস,
৫।১, বৃন্দু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা—৯

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / মহামহোপাধ্যায়

সাধক পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মন্তব্য

Mahamahopadhaya   2 A Sigra
Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.   Banaras

Dated 22.10.59

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা গ্রন্থখানির প্রবন্ধগুলি সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা সমস্যাগুলির এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির সুসমাধান করিয়াছে। আমি গ্রন্থকারের নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গী যথোচিত ভাবে উপলব্ধি করি। তাঁহার উপস্থাপিত বিষয় সমূহ এবং পদ্ধতি স্বচ্ছ, সুযুক্তিপূর্ণ এবং গভীর তেজোব্যঞ্জক। এই গ্রন্থখানি আমাকে অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—কেবল মাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বিষয় বস্তু ও পাণ্ডিত্যের জন্য নহে—অন্তর্দৃষ্টির বিশাল প্রসারতার জন্য এবং অন্তর রাজ্যের জ্বলন্ত বিশ্বাসের জন্যই। গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থের আশু প্রকাশ করিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান কালই এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রকাশের উপযুক্ত সময়।

গোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত,
১৩২।৩এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / প্রকাশকের নিবেদন

ওঁং

যাঁহার সুমহীয়সী ইচ্ছা ব্যতীত একটী গাছের পাতাও নড়ে না, একমাত্রই তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছায়—আত্মবিলোপকারী ব্রহ্মদর্শী সত্য-ধর্ম্ম-প্রচারক পরমর্ষি মহিমচন্দ্রের অভেদাত্মন্— বেদাচার্য্য উঁমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "জ্ঞানরাজ্যের" বিস্ময়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—ব্রহ্মদর্শী, সত্যধর্ম্ম-প্রচারক পরমর্ষি গুরুনাথের অতুলস্নেহ-পুত্তলী পুত্র প্রতিম শিষ্য সত্য-সাধক গ্রন্থকার (পরমর্ষি গুরুনাথ অভিহিত "মহাত্মা") স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্তের "সত্যদর্শনের" নবতত্ত্ব এবং বিভিন্ন কঠিন উচ্চ দর্শনের সমন্বয় সম্বলিত (Comparative study of Religion and Philosophy-র) জ্ঞানগর্ভ রচনা "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা" তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু পৃথিবীবাসীর নিকট প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এই সাধক গ্রন্থকারের রচিত "A. B. C. of Satyadharma and its Philosophy" প্রকাশিত হইয়া জগতের মণিষীবৃন্দ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে Dr. S. Radhakrishnan, Sadhak Pundit Mahamahopadhaya Gopinath Kaviraj, Dr. A. C. Ewing, Dr. K. Leidecker, Dr. Joachim Wach, Sri Srish Goswami, Dr. Kalidas Bhattacharyya, Dr. Mrs Roma Chowdhury, Dr. Kalidas Nag, Prof Kalyan Chandra Gupta প্রভৃতি Manuscript পড়িয়াই বইখানির বহুল প্রচারার্থে তাঁহাদের সু-অভিমত লিখিয়া দিয়াছেন। যাহার সারাংশ সকল ঐ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর কতিপয় মণীষীদের এবং পত্র পত্রিকার অভিমতের "সারাংশ" এই খানে দেওয়া হইল। —"দৈনিক বসুমতী-গ্রন্থকার তাঁহার সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ধর্ম্ম, দর্শন, ঈশ্বর ও তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ, সৃষ্টিরহস্য, মায়াবাদ প্রভৃতি জটিল তত্ত্বগুলির উপর

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / প্রকাশকের নিবেদন

এমন ভাবে আলোকপাত করেছেন যা' আগ্রহী পাঠক মাত্রের নিকট উপলব্ধ হবে এবং তা' থেকে তাঁরা আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবেন। দুরূহ বিষয়গুলি যে সহজ-বোধ্য হইয়াছে, তা'বলাই বাহুল্য। ইহা তাঁহার কেবল মাত্র গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফল নয়, তাঁর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন-ভূয়িষ্ঠ। যুগান্তর—চতুর্ব্বর্গ সাধনার পথে পূর্ণতালাভের উপায় সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান নির্দ্দেশ এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে, তা' সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশের মানুষের পক্ষেই সত্য এবং সমভাবে অনুসরণ-যোগ্য; বইয়ের রচনাভঙ্গী প্রাঞ্জল। রাষ্ট্রশক্তি—ধর্ম্ম এবং দর্শন সম্পর্কে বইখানি নূতন দিগ্‌দর্শী, একথা নির্দ্ধিধায় বলা চলে। ব্রহ্ম এবং জীব-জগতের সম্পর্ক বিষয়ে গভীর এবং যুক্তিবাদী আলোচনা গ্রন্থখানিকে মহামূল্য মর্য্যাদা দিয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। চিন্তাশীল পাঠক এবং রিসার্চ্চ স্কলারদের কাছে বইখানি সমাদৃত হবে সন্দেহ নাই। উদ্বোধন—সুধীজনের সমাদৃত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববাণী—সহজ সরল ইংরেজীতে বিচক্ষণ গ্রন্থকার বহু দর্শন ও জীবন সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। রবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গ্রন্থকার একজন সাধক ব্যক্তি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণগুলি অনমণীয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই পুস্তকখানি রাখা বিধেয়। প্রবর্ত্তক—গ্রন্থখানির ভাষা সরল, সহজবোধ্য ও তেজোব্যঞ্জক। আলোচনায় যেমন মৌলিকতা, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞান, বিচার-নৈপুণ্য ও নির্ভীকতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের চিন্তাধারা কোথায়ও My-ticism-এর কুয়াসায় আবৃত হয় নাই। ডাঃ সুনীতি কুমার চাটার্জ্জী—বই খানির বহুল প্রচার কামনা করি। দর্শন—এই

পুস্তকের সর্ব্বত্রই লেখকের মননশীলতা, ধর্ম্মানুরাগ ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মায়াবাদ সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলিতে তাঁর প্রভূত বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকের প্রচার কামনা করি। Ex-Chief Justice শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র—আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে এই বই সকল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম্মানুরাগীদের আদরণীয় হইবে। Swami Ranganathanandaji—I am sure, the book will help some at least of modern humanity, who have been alienated from God, to find their way back to Him Who is the self of their-selves. Dr K. M. P. Mohamed Cassim, Ceylone—We are much impressed by the philosophical soul-elevating writings of the Rev. author. Oomoto, Japan—The fine book will be for the use of the ardent seekers of Truth. May God bless the holy work. The Call Divine—Here, indeed, is rich material. Books of this kind deserve better and wider notice from the public. Anviski, Benares Hindu University—Proofs for the existence of God are interesting in so far as they make an improvement upon the previous attempts made in both East and West. The writer seems to be at his best in showing some fresh insights into the problem of man's relation to God. The solutions offered by the author in

the light of Satyadharma are illuminating. Dr. D W. Fry, Editor, Understanding, USA—The book is a logic of spiritualism in which the author discloses the real nature and mystery of religion. Dr. B. C. Chowdury, President, World Jnana Sadhak Society—Hope, the book's light will lead the mad power-crazy world today and the encircling gloom of Kali Yuga to the peak of everlasting Truth and Bliss. Bhavan, Bombay—The discussions are illuminating and bear the stamp of deep insight and wide knowledge and contains very useful informations. The book contains the essence of Indian philosophy and gives a connected and convincing exposition of Eternal Dharma. শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রী অরবিন্দ পাঠাগার, কলিকাতা—The admirable elucidation and expression will help many to understand Indian philosophy in a perspective of the modern mind. বাসুদেব—বর্ত্তমানে সকলেই যুক্তির সাহায্যে জানিতে চায়। এই দিক দিয়া গ্রন্থখানি বর্ত্তমান কালের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। জড়বাদী, বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিকগণকে এই বই খানা পড়িতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার ঈশ্বর বিশ্বাসী মরমী সাধক। গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট হইল যে ইহা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যাহা সত্য-ধর্ম্ম রূপে বিরাজমান, তাহাই এখানে নিপুণ যুক্তি সহকারে প্রদর্শিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুক্তি ও জড়বিজ্ঞানের যুগে

এইরূপ একখানা গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। Rev. Claude A. Strak, Massachussetts.—The excellent book approaches the pinnacle of Advaita Vedanta. শ্রীমৎ স্বামী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী — (প্রকাশকের নিকট) ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই আদর্শ যেন নির্ব্বিঘ্নে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। Rev. S. J. Masson, Pontifica Universita Gregorina, Rome—The book is original and interesting and will be available to our students. শ্রীমৎ মদন মোহন ব্রহ্মচারী, সারস্বত আশ্রম, ওয়েষ্ট বেঙ্গল—There is no other shortest route than this. The Abheda Jnana Sadhana is an original contribution. The philosophy of Sankaracharyya, the philosophy of Vaishnavas—all the philosophies have been merged into the philosophy of Satya-Dharma. Mr. Sujib Punnyanubhav, World Fellowship of Buddhists, Bangkok—The book is of great value to those who adhere to theistic religions, because it deliberately tried to prove the existence and supernatural power of God, the Mighty One. Congratulations to the mission for its success in spreading the precious stones of philosophy and religion. Mr. Dickerman Hollister, Chairman, Temple of Understanding, USA—The book is most interesting. Dr. TMP. Mahadevan, Director, Centre of Advance Studies in Phillsophy, University of

Madras, says: "SATYA DHARMA" is a NEW-RELIGION in an age of doubt of despair. It seeks to bring together the best in all known religions. It is unique and unconventional. In this book the author has offered an earnest and masterly presentation of the philosophy of "Satya Dharma". গ্রন্থকারের সহিত সাধক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকার পাণ্ডুলিপি পড়িয়াছেন এবং গ্রন্থকারের কাশীবাস-কালীন তাহা তিনি গ্রন্থকারের সহিত গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের রচিত "সত্য-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ইতিহাস" গ্রন্থে (এখনও ছাপা হয় নাই) এবং গ্রন্থকারের পত্রাদিতে দেখা যায় যে সাধক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা" সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"সুন্দর হইয়াছে," "চমৎকার হইয়াছে," "গ্রন্থখানি সুচিন্তিত, সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে," "বইখানি সুযুক্তি-পূর্ণ ও ভাষা এবং ভাব তেজোব্যঞ্জক," "উদার, নির্ভীক, দূরদর্শিতা-পূর্ণ সত্যভাব সমূহে পরিপূর্ণ"। সাধক পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় গ্রন্থকারকে এই বইখানি ছাপাইতে বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে আরও বলিয়াছিলেন যে Delhi University হইতে Birla এবং Dalmia Prize এর জন্য তিনি যে সকল Thesis প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি শত গুণে ভাল। তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন যে Government যদি তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যের দরখাস্ত সম্বন্ধে তাঁহার (কবিরাজ মহাশয়ের) opinion চাহে, তবে তিনি ভাল grant recommend করিবেন। পরমর্ষি গুরুনাথ রচিত "তত্ত্বজ্ঞান" সাধক পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় পড়িয়াছেন। তিনি গ্রন্থকারকে

বলিয়াছেন "আপনার তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা তত্ত্বজ্ঞান-MADE EASY এবং "তত্ত্বজ্ঞানের" উদ্ধৃত তত্ত্ব সমূহ "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকায়" যথাযথ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" অর্থাভাব জন্যই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ ছাপাইয়া যাইতে পারেন নাই। সাধক পণ্ডিত নির্ম্মল চন্দ্র সেন মজুমদার সাংখ্যতীর্থ কবিরত্ন মহাশয় বলেন—Comparative study of Religion and Philosophy-এর এই বইয়ের মত বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় পুস্তক নাই। পণ্ডিত শ্রী শ্রীশ চন্দ্র গোস্বামী বলেন— মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমত চমৎকার। গ্রন্থকারের Speech হইতে (delivered at all India Faiths' conference held in connection with the Silver Jubilee Session of the All India Philosophical Congress held in Calcutta under the presidency of Dr. S. Radhakrishnan (last but one para, para No. 32) এখানে উদ্ধৃত করিলাম : "Here I must stop though the philosophy of Satya Dharma is inexhaustible. The learned President in the history of Indian philosophy regretted that no new system of philosophy arose in India within the last few hundred years. But from what has been briefly stated above, it will be seen that the philosophy of Satya-Dharma is a new one in this world and it has also been declared so

by no less a person than Mahamahopadhyay Pandit Gopinath Kaviraj, M.A., Retd. Principal, Queen's College, Benares, a great philosopher and Sadhaka of the present century.' Dr. S. Radhakrishnan'ও "ABC" বইখানির বহুল প্রচার recommend করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা গ্রন্থখানি আনুমানিক ১৯৫৮ সালের মধ্যভাগে সমাপ্ত হইয়াছিল। একমাত্র যাঁহার সুমহীয়সী অমোঘ ইচ্ছায় নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে এই অমূল্য সত্য-দর্শন গ্রন্থ (Philosophy of গুণ-সূত্র) "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা" প্রকাশিত হইল, সেই সংকর্ম্মনির্ব্বাহক অনন্ত মহিমাময়, অনন্ত করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় পরমপিতাকে সদা সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং যেন তাঁহার পরমা মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তির কাছে সর্ব্বদা মাথা অবনত করিয়া চলিতে পারি, এই প্রার্থনা করি। যিনি সর্ব্বদা আমাকে নিত্য অন্তরে বাহিরে ঘিরিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি এই দীনহীনকে দয়া করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের করণ করিলেন, সেই সত্য ধর্ম্মপ্রচারক ও সত্য-দর্শন মূল প্রবক্তা, এবং যাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই বলা যায়—"সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি মত প্রভেদান্ ধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্বান্ বিপরীত ভাবান্, একীচকর্থ স্বগুণ প্রভাবৈঃ," নিত্যাশীর্ব্বাদক পরমর্ষি গুরুনাথকে আমার এই অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বারংবার অর্পণ করি। আমার অতুল স্নেহময় উন্নত-সাধক পিতৃদেবের আপনা-ভোলা উদার আশীর্ব্বাদে এবং স্নেহময়ী উন্নত-সাধিকা মাতৃদেবীর-আশীর্ব্বাদে ও ইহ-পরলোক-

স্থিত দেবদেবীগণের অযাচিত ও অকরুণ আশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদিগকে বারংবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমার শেষ জীবনের সংকর্ম্মের উৎসাহ দাতা ও সতত অন্তঃপ্রেরণাদায়ক, স্নেহশীল, গ্রন্থকারের অতি প্রিয়—সাধকপ্রবর পণ্ডিত নির্ম্মল চন্দ্র সেন মজুমদার সাংখ্যতীর্থ কবিরত্ন মহাশয়ের কাছে আমি চিরঋণী, যিনি বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে নিজ নৈপুণ্যে সুবাতাসে "ABC of Satya Dharma" এবং "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা" গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে Pilot করিয়াছেন। আমি ভক্তিভরে নতশিরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বারংবার অর্পণ করি।

"ত্বদিচ্ছয়া বাতি সমীরণোঽনীশং
ত্বদিচ্ছয়া ভানুমতা করোঽর্পতে।
ত্বদিচ্ছয়া বারি দদাতি চাম্বুদ
স্ত্রায়স্ব দাসং স্বক মাশু তারক।"

ওঁ

ওঁ

প্রার্থনা

হে সত্য স্বরূপ, হে জ্ঞান-স্বরূপ, হে অনন্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ, হে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর, হে নিত্য ও পূর্ণ পবিত্রতা, হে দোষপাশলেশশূণ্যং শিবম্, হে শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্! তোমার অনন্ত জ্ঞানে সকল তত্ত্বই নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছে। পৃথিবীতে—বিশ্বে জীব সমূহের যে অসংখ্য সমস্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই সকল সমস্যারই সরল, প্রাঞ্জল ও সত্য সমাধান তোমার নিকট নিত্য বর্ত্তমান। তোমাতে অন্ধকারের লেশ মাত্রও নাই। হে অনন্ত দয়াময় পিতঃ! তোমার অপার দয়ায় তোমার জ্ঞান-ধনে যিনি ধনী হন, তাঁহার হৃদয়-দেশ তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃতে নিত্য উদ্ভাসিত থাকে, তিনি ধন্য হন। হে অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! তোমার নিজ দয়া গুণে এই দীনহীনকে সকল সমস্যার সত্য মীমাংসা দান কর, এই ঘোর অমানিশার অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয়কে তোমার অতুলনীয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল কর। পিতঃ! নিজ করুণাগুণে জ্ঞান-বিরোধী মোহ আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ কর। হে অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! তোমার নিজ অপার স্নেহগুণে আমার সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া দীনহীনের প্রার্থনা গ্রহণ কর।

তোমার দীনহীন সন্তান সুরেন্দ্র।

ওঁং

উৎসর্গ

পরমভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমৎ পরমর্ষি গুরুনাথ

মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে।

গুরুদেব!

তোমার শ্রীচরণ প্রান্তে উপবেশন করিয়া তোমার দয়ায় যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহার অবলম্বনে তোমার অমূল্য দান তত্ত্বজ্ঞান-গ্রন্থরূপ নন্দন কানন হইতে একটী পুষ্প চয়ন করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। জানি, মলিন হস্তের সংস্পর্শে সেই পুষ্পটী মলিন হইয়াছে, কিন্তু তোমার নিজ স্নেহগুণে তুমি উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে, ইহাই আমার ভরসা।

তোমার দীনহীন সন্তান সুরেন্দ্র।

ওঁ

নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে তাহা আমি অনুভব করি না। অতি কাঠিন্য জন্য ভূমিকার আবশ্যকতা হইতে পারে। গ্রন্থে লিখিত বিষয় সমূহের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে গেলে উহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে বই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না। তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। আমি পণ্ডিত নহি। তাই বিষয়টী কঠিন হইলেও আমি ইহাকে পাঠকের সমক্ষে কঠিন ভাবে ধরিতে সমর্থ হই নাই। আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পাঠক সহজেই এই গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বিষয়টী আলোচনা করিলে তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন অংশ কঠিন হইলেও উহা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। "তত্ত্বজ্ঞান" বিষয়ে কিছু লিখিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর্ত্তব্য। সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ ও তাঁহাদের সম্বন্ধ ও পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তাই এই বিষয়টী প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান বা ধারণা না জন্মিলে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভও সুকঠিন। পাশ্চাত্য দর্শনে কেহ কেহ সৃষ্টিতত্ত্বকে নিম্নস্তরে স্থান দান করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের মধ্যে উচ্চতম শাস্ত্র বেদান্ত দর্শনে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার" পরেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র রচিত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা উৎপন্ন না হইলে দর্শন শাস্ত্রের কঠিন সমস্যা সমূহ যথা—"আমি কে?"

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / গ্রন্থকারের নিবেদন

"আমি কোথায় হইতে আসিয়াছি?" "আমি কেন আসিয়াছি?" "আমি কোথায় যাইব?" প্রভৃতির সুসমাধান অসম্ভব। সৃষ্টিতত্ত্ব অংশ গ্রন্থের আকারের অনুপাতে একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইল, যদিও একথা সত্য যে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ বিরচিত হইলেও তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইল, একথা বলা চলে না। এই গ্রন্থে যথা সম্ভব যুক্তি দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। উহাতে—বিশেষতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি কিন্তু নানা কারণবশতঃ তাহা সম্ভব হইল না। যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বজন সন্তোষকর ভাবে আলোচনা করিতে হইলে অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু পরমগুরুর দিব্যজ্ঞান অথবা অন্ততঃ পৃথিবীতে প্রচলিত সর্ব্ববিষয়ের শাস্ত্ররাশির বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমি পরা ও অপরা উভয় বিদ্যাহীন, সুতরাং গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে পারিল না, ইহাতে দোষ ত্রুটী অনিবার্য্য ভাবেই বর্ত্তমান থাকিল। "প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ" বাক্য মহাকবি কালিদাসের পক্ষে বিনয়ের উক্তি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে যে এই ক্ষেত্রে উহা সত্য, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। পাঠক যদি এই গ্রন্থকে ইঙ্গিত মাত্র মনে করেন এবং নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধনা দ্বারা ইহার অভাব পূর্ণ করেন, তবে আমি সুখী হইব। এস্থলে সত্যানুরোধে বিনীত ভাবে একটী কথা বলিতে হইতেছে যে আমি যশঃপ্রার্থী হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করি নাই। ইহা প্রথমতঃ একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মাত্র ছিল। কিন্তু অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে গ্রন্থ বর্ত্তমান আকার প্রকার ধারণ করিয়াছে। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে আমার পরমভক্তিভাজন শ্রীশ্রীগুরুদেব

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীমৎ পরমর্ষি গুরুনাথের "সত্যধর্ম্ম," "তত্ত্বজ্ঞান" (উপাসনা ও সাধনা খণ্ডদ্বয়) এবং "সত্যামৃত" লিখিত তত্ত্বই আমার চিন্তার মূলে। এই গ্রন্থের বহু স্থলে, বিশেষতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব মূলক অংশে উক্ত গ্রন্থ সমূহের উক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার সকল চিন্তার মূলেই যখন গুরুদেবের শিক্ষা ও দীক্ষা, তখন তাঁহার লিখিত গ্রন্থ হইতে বহুল উদ্ধার করায় আমার কুণ্ঠার কোনই হেতু নাই। পরমপিতা নিত্য সত্য, অনন্ত, নির্ব্বিকার এবং উপমারহিত। জগতে তাঁহার তুল্য কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। এই গ্রন্থে যে সকল উপমার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সান্ত এবং বিকৃত পদার্থ সহযোগে অবশ্যম্ভাবী রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের তুলনা হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি সকলেই অনন্তোপায় হইয়া আংশিক সাদৃশ্যের জন্য সেইরূপ তুলনাই দিয়া থাকেন। কারণ, উক্তরূপ উপমা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ না হইলেও তাহাতে মূল বিষয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া যায় ও জ্ঞান লাভের বিশেষ সহায় হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে গ্রন্থোক্ত উপমা যতদূর সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি যোগে প্রমাণ করিয়া উপমা দ্বারা সরল করা হইয়াছে। একমাত্র উপমার উপরই নির্ভর করা হয় নাই। এস্থলে বিশেষ ভাবে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বহু সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। পাঠক যদি দয়া করিয়া সেই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা দেন, তবে বিশেষ ভাবে সুখী হইব। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন প্রবন্ধে প্রচলিত মতবিরোধী সমালোচনায় বিচারে একটু উদার ভাব প্রদর্শন করেন। আলোচনা যথা সম্ভব ধর্ম্ম সঙ্গত, বিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা, পাঠক তাহা দেখিলেই

আমি সুখী হইব। স্থূল, গ্রন্থোক্ত কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত গঠন করিবার পূর্ব্বে পাঠক যেন যথা সম্ভব চিন্তা দেন ইহাই তাঁহার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। অনেকেই স্বমত বিরোধী আলোচনা অশ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেন, বিশেষতঃ উহা যখন সাধারণ লেখকের লেখনী প্রসূত হয়। পাঠকদিগের বিরক্তি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে ও তাহা হইতেও পারে না। তবে আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি ও তাহা হইতে যে সকল চিন্তা আসিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তাহা এরূপভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে তাহাতে কাহারও কোন ত্রুটী (offence) গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা নাই। পরমত খণ্ডনার্থে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা কখনও বিশুদ্ধ সমালোচনার (honest criticism-এর) সীমা লঙ্ঘন করে নাই বলিয়া মনে করি। যদি আমার যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথায়ও পাঠক ঐরূপ কোনও ত্রুটী লক্ষ্য করেন, তবে তাহা আমার ভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণ দখলের অভাব বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে ও তাহার জন্য আমি পাঠকের নিকট এস্থলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পাঠকদিগের নিকট আমার আর একটী বিনীত ও বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। পাঠক বিশেষের হৃদয়ে গ্রন্থের প্রারম্ভে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, যাহাদের মীমাংসা উহার শেষ বা মধ্যভাগে তিনি প্রাপ্ত হইবেন। অবশ্য গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই তথায় উপস্থিত সকল প্রশ্নের

মীমাংসা লাভ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অনিবার্য্য কারণেই পূর্ব্বের বা পরের অংশ সমূহের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বিষয়টী বিশেষভাবে অনুরোধ করিবার প্রধান কারণ এই যে আমার এরূপ ক্লেশদায়িনী অভিজ্ঞতা আছে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দিয়াছি, কিন্তু তিনি সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অংশ পাঠ করিয়াই অযৌক্তিক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সর্ব্বাগ্রেই সেই সর্ব্বস্ব দাতা, নিত্য সত্য, অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়, অনন্ত গুণ নিধান ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদয়াল পরমপিতার নিকট হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনিই বুদ্ধির প্রেরয়িতা। (ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)। আমার কার্য্য অসম্পূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট হইলেও যে চিন্তারাশি আমি পরম-দয়াল পরমপিতার অপার দয়ায় লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। যে সর্ব্বশক্তি-মান প্রেমময় পিতা অন্ধকে দৃষ্টি দেন, যিনি বধিরকে শ্রুতি শক্তি দেন, যিনি পঙ্গুদ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান, যিনি মূককে বাচাল করেন, যাঁহার করুণায় অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসম বাধা বিঘ্ন অবিলম্বে বিদূরিত হয়, তাঁহারই কৃপায় আমি যাহা লাভ করিয়াছি, তাহারই জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা ভরে বারংবার প্রণত হই এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে নানাবিধ বহু বাধা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনন্ত দয়ার আধার

দীন-জন-বৎসল পরম পিতার অপার দয়ায় আমাকে এই কার্য্য হইতে একেবারে বিরত করিতে পারে নাই। কার্য্য মন্দ গতিতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু উহা একেবারে স্থগিত হয় নাই। ধন্য দয়াময়! ধন্য তোমার অপার দয়া! ধন্য অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! দীন সন্তানের প্রতি তোমার অসীম দয়ার জন্য তোমাকে বারংবার হৃদয়ের অগণ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। কৃপাময় পিতঃ! তুমি দীনের প্রতি নিত্য প্রসন্ন থাক, এই প্রার্থনা তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রী শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা ও দীক্ষা আমার চিন্তার মূলে। সেই চিন্তার কিছু অংশ এই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। সুতরাং এই গ্রন্থের যাহা কিছু ভাল, তাহা তাঁহারই। যেমন নির্ম্মল-সলিলা গঙ্গা গঙ্গোত্রী হইতে বহির্গত হইয়া যতই নিম্নভূমিতে আসিতেছে, ততই মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ আমি মোহ-মুগ্ধ বলিয়া তাঁহার শিক্ষা আমার মধ্য দিয়া চিন্তার আকারে বহির্গত হইবার নিমিত্ত দোষদুষ্ট হইয়াছে। নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের অগণ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি, মুনি, সাধু, মহাজন, জ্ঞানী, ভক্ত এবং নানা বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের কোন কোন ভাব সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। বংশ পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের দ্বারা কথিত তত্ত্বরাজি প্রচারিত হইয়া না আসিলে জগৎ ভগবৎ তত্ত্বে এত অধিক সমৃদ্ধ হইতে

পারিত না। তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর ভক্তিভাজন উপনিষদের ঋষিগণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রণেতার উদ্দেশ্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি বহুস্থলে তাঁহাদের অমূল্য গ্রন্থ সমূহ হইতে তাঁহাদের অমৃতময়ী বাণী উদ্ধার করিয়াছি। ভক্তিভাজন সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, গৌর গোবিন্দ রায় ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়দের উদ্দেশ্যেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত উপনিষদ্ ও গীতার বঙ্গানুবাদ—এই গ্রন্থে বহুস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

প্রণাম

সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্তমেক-
মনাদি মাদিং ভুবনস্য চান্তম
আনন্দরূপং পরমং মহিষ্ঠং
তমীশ্বরং সর্ব্বগুরুং নমামি।

———

প্রযত্ন পাশ স্থির চিত্ত দণ্ডে
নাশেষ শাস্ত্রাম্বুধি মন্থনেন।
জ্ঞানামৃতং যেন পরং প্রদত্তং
তস্মৈ নমস্তুভ্যমচিন্ত্যশক্তে॥

বর্ত্তমানস্য দেহস্য হেতুভূতৌ গুণান্বিতৌ।
পিতরৌ পরমারাধ্যৌ নমামি মঙ্গলার্থিনৌ॥

প্রণতস্য শ্রী সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্তস্য

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / সূচীপত্র

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / সূচীপত্র

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা / সূচীপত্র

ওঁ

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা

(প্রথম খণ্ড)

ওঁ

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

(শ্বেতাশ্বতরোপানিষদ্)

—(০)—

তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকা

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিতত্ত্ব

সৃষ্টির সূচনা

"আদাবেক এবাসীৎ পরমেশ্বরঃ।"

অর্থাৎ আদিতে একমাত্র পরমেশ্বর ছিলেন। (তত্ত্বজ্ঞান)

"পরমাত্মার বিবংহয়িষা বা পরীচিক্ষিষা হইল। অর্থাৎ প্রেমগুণ প্রভাবে তিনি আপনাকে বহু করিতে অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা করিলেন।"* (তত্ত্বজ্ঞান)

"সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২।৬)

বঙ্গানুবাদঃ—তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। (তত্ত্বভূষণ)

শ্রুতিতে আরও বহুস্থলে এরূপ বহু উক্তি আছে যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় ক্রমশঃ বিরাট বিশ্ব সম্ভব হইল। ব্রহ্ম যে জীব ও জগতের একমাত্র স্রষ্টা, সেই সম্বন্ধে 'মায়াবাদ' অংশে আরও বহু শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

* ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতঃপর লিখিত হইবে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তদর্শন ১।১।২-৪ সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও জগৎ যে ব্রহ্ম প্রসূত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ১।১।২ সূত্রকে যুক্তিমূলক প্রমাণ এবং ১।১ ৩-৪ সূত্রদ্বয়কে শব্দ প্রমাণ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বহু উচ্চ দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ব্রহ্ম যে জগতের স্রষ্টা, তাহা যুক্তি দ্বারা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

আর্য্যশাস্ত্রের পাঞ্চভৌতিক মত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ ও অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং মহাপ্রলয়ে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজঃ মরুতে এবং মরুৎ ব্যোমে লয় প্রাপ্ত হইবে। ব্যোম—যাহা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আবার সেই অব্যক্তেই লয় প্রাপ্ত হইবে।* সুতরাং প্রথমে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তিনিই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, ইহাতে সংশয়ের কোনই কারণ নাই।

এস্থলে পাঠক বলিতে পারেন যে প্রথমে ব্রহ্মের অস্তিত্বই প্রমাণিত হউক, তৎপর তাঁহার সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তিতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থে "ব্রহ্মের অস্তিত্ব" শীর্ষক কোনও পরিচ্ছেদ নাই বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহ যে তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণে বিশেষ ভাবে সহায় হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

(১) ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব।

(২) জড়ের বাধকত্বের কারণ।

* ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক গুণ বা তাঁহার একতম স্বরূপকে অব্যক্ত কহে। "অব্যক্ত কি" অংশে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অব্যক্ত সুতরাং ব্রহ্ম হইতে যে জড় জগতের উৎপত্তি, তাহা ইতঃপর প্রমাণিত হইবে। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্যোম হইতে ক্রমশঃ ক্ষিতির উৎপত্তি হইতে পারে।

(৩) গুণ বিধান।

(৪) ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী।

(৫) সৃষ্টিতত্ত্বের প্রমাণ।

(৬) প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন।

(৭) ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

(৮) স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন।

(৯) পরলোকতত্ত্ব।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থের নিম্নলিখিত অংশ সমূহ পাঠ করিলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভ করিবেন। উহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্তোষকর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(২) ঈশ্বর এক কি বহু?

(৩) ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?

(৪) ঈশ্বরের স্বরূপ।

(৫) ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ?

(৬) জীবাত্মার অস্তিত্ব নির্ণয়।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে A.B.C. of Satya Dharma and its Philosophy গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বর্ত্তমান। পাঠক সেই গ্রন্থ পাঠ করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবেন।

ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত গুণে গুণবান। সুতরাং তিনি অনন্ত প্রেমময় প্রেম একটি অতি সুমহান গুণ। ব্রহ্মে যে অনন্ত গুণ ও শক্তি নিত্য বর্ত্তমান, সেই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা মানবে বহু আত্মিক গুণ লক্ষ্য করি। অবশ্য বলিতে হইবে যে উক্ত গুণ সমূহ বীজ ভাবে, অঙ্কুর ভাবে বা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত আকারে মানবে দৃষ্ট হয়। অপূর্ণ মানব ব্রহ্মের অংশভাবেই ভাসমান।* সুতরাং পূর্ণে যে অনন্ত

* "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী—" অংশ দ্রষ্টব্য।

গুণ পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন ঃ—

অনন্ত ভুবন তব গুণ গান
করি অন্ত কান্ত না পায় কখন।
সে অনন্ত গুণ কণা করি দান
এ কাতর জনে তারক নিস্তার।

ব্রহ্মের বিবংহয়িষা অর্থাৎ প্রেমগুণ প্রভাবে আপনাকে বহু করিতে অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান হইতে ইচ্ছা হইল। পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মদ্বয় প্রত্যেক পদার্থে বর্ত্তমান। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। জড় পদার্থে আকর্ষণের ন্যায় বিকর্ষণ সর্ব্বদা বিদ্যমান, সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা ও রোগজননতা বর্ত্তমান ইত্যাদি। মানবেও জ্ঞান ও প্রেম, করুণা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণ বর্ত্তমান। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিতে পাইব। গুণকেও পদার্থ বলা হয়। সুতরাং অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমগুণের যে দুইটী বিপরীত শক্তি আছে, যথা বহুকে এক করা ও এককে বহু করা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। প্রেম যে বহুকে এক করে এ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক কথা বলিতে হইবে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে প্রেম যেরূপ মিলন করে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। প্রেমদ্বারা যে কেবল দম্পতি অতুলনীয় মিলনে মিলিত হন, তাহা নহে, কিন্তু অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়কেও প্রেমই এক করিতে পারে। বাধ্য করিবার বা মিলন করিবার চারিটী পন্থা শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। এই সামই প্রেম। অন্য তিনটীতে যে মিলন, তাহা সম্পূর্ণ নহে। শেষোক্ত দুইটী দ্বারা যে মিলন, তাহাকে মিলন না বলাই কর্ত্তব্য। উহা অতিশয় বাহ্যিক ও ক্ষণিক। দান দ্বারা মিলনও বহু ভাবে বাহ্যিক। একমাত্র প্রেমের মিলনই সত্য মিলন। কারণ, তাহা মর্ম্মস্থল হইতে উদ্ভূত হয় ও তাহা বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হয়। প্রেম সাধনায় অগ্রসর হইলে উভয় সাধক নিজেদের মধ্যে কোনও ভেদ

সহ্য করিতে পারেন না, ভেদ দেখিলেই ব্যথিত হন। প্রেমই উভয়কে অভেদ জ্ঞান দান করে এবং উহার অতি উচ্চ অবস্থা সোঽহং জ্ঞান ও তৎপরে ততোঽধিক উৎকৃষ্টতর বা উৎকৃষ্টতম অভিধান জ্ঞানরূপ প্রেম তাহাদের মধ্যে আনয়ন করে।* প্রেম দ্বারা যে কেবল শত্রু পরাজিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু অতিশয় দুর্দ্দান্ত মহাপাপীও আসিয়া প্রেম সাধকের সহিত মিলিত হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। বঙ্গদেশে জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তন মহাপুরুষ নিত্যানন্দের প্রেমেই সম্ভব হইয়াছিল।

প্রেম যে বহুকে এক করিতে পারে, তাহা লিখিত হইল এবং ইহা সকলেরই সহজে ধারণীয়। এখন আমরা দেখিব যে প্রেম কিরূপে এককে বহু করে। আমরা যদি ভাবরাজ্যে গমন করি, তবে দেখিতে পাইব যে বুদ্ধদেব, মহম্মদদেব, খ্রীষ্টদেব, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রেমে বাধ্য হইয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রচার প্রেম ভিন্ন সম্ভব হয় না। যখন মহাপ্রেমিক সাধক নিজে ধর্ম্মসুধা পান করিয়া নিজে বিভোর হন, তখন জগতে সেই সুধা বিতরণ করিবার জন্য তিনি স্বতঃই ব্যাকুল হন। কারণ, জগতের নরনারী তখন তাঁহার প্রেমের পাত্র। তাহাদের দুঃখে তিনি দুঃখিত। তাই তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি ব্যাকুল হন। কথিত আছে যে খ্রীষ্টদেব পৃথিবীর দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে Man of Sorrows (বহু দুঃখে দুঃখিত মানব) বলা হইত। তিনি পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"Thy kingdom come Thy will be done in this Earth as it is in heaven".

বঙ্গানুবাদ :—"স্বরগে তোমার রাজ্য যথা সুখময়,
তেমনি হউক নাথ, ভূমণ্ডলময়"

---

* এই সোঽহং জ্ঞান দুই সাধকের মধ্যে সম্ভব হয়। ব্রহ্মের সহিত যে সোঽহং অসম্ভব, তাহা "সোঽহং জ্ঞান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

স্বরগে যেমন সিদ্ধ তব অভিপ্রায়,
তেমতি ভূলোকে পূর্ণ হউক ত্বরায়।”
(পরমর্ষি গুরুনাথ)

উক্ত মহাপুরুষগণ দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের উপদিষ্ট পন্থায় সত্যভাবে যথোচিত সাধন ভজন করিয়াছেন, তাঁহারাও (উপযুক্ত শিষ্যগণও) তাঁহাদের (মহাপুরুষগণের) সাহায্যে তাঁহাদের সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে একত্ব লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদের আদর্শকে অল্পাধিক আয়ত্ত করিয়া ক্ষুদ্রাকারেই হউক অথবা বৃহদাকারেই হউক নিজদিগকে সেই আদর্শে পরিণমন করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মপ্রচারক মহাসাধক এক হইয়াও বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন।

এখন আমরা প্রকৃতির রাজ্যে আগমন করি। আমরা তথায় দেখিতে পাই যে পুরুষ ও স্ত্রী প্রেমে সম্মিলিত হইলে সন্তান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মিলনের ফলে তাহারা একীভূত হইয়া বহু হন। কেহ বলিতে পারেন যে উক্ত কার্য্যের কারণ কাম, প্রেম নহে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রেম দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃতভাবে প্রকাশ পায় এবং তাহাই কাম নামে পরিচিত হয়। কামের মূলে প্রেমই। কাম জাতগুণ অর্থাৎ ইহা দেহ সংসর্গে উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রেম আত্মারই পরমোৎকৃষ্ট সরল গুণ। এ বিষয়ে ইতঃপর লিখিত হইয়াছে। যখন কাম বিকৃত—অতি বিকৃত হইয়াও এককে বহু করিতে পারে, তখন নিত্য নির্ব্বিকার সার পদার্থ পরম পিতার অনন্ত ভাবে সুপবিত্র প্রেম যে এককে বহু করিতে পারিবে, ইহা সহজেই ধারণা করিতে পারা যায়। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কামের সৃষ্টিকারিণী শক্তি প্রেম হইতেই প্রাপ্ত। পৃথিবীতে দেখা যায় যে সর্ব্ব জীবে Reproduction-এর শক্তি বর্ত্তমান এবং তাহারা নিজেকে Reproduce করে। ইহার মূলেও যে প্রেম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত শব্দ জায়ার অর্থ যাহাতে নিজে জাত হয়।

সুতরাং প্রেম এককে বহু করিতে পারে। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন যে ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। হ্লাদিনী শক্তি যে প্রেমের, তাহা সহজবোধ্য। সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহার প্রেমোৎপন্না ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রোক্ত প্রশ্নোত্তরে এস্থলে সংক্ষেপে আরও বলা যাইতে পারে যে মানবের পক্ষে কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতাই একমাত্র কার্য্য নহে। এই কাম প্রবৃত্তির মূলেও যে প্রেম, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মানবের সেই অন্তর্নিহিত প্রেমই নিজেকে বহু ভাবে প্রকাশ করিতে চায়। ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে আমরা নিঃসন্তান একটী দম্পতির সম্বন্ধে চিন্তা করি। আমরা দেখিতে পাইব যে তাহারা কেবল কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই সুখী হন নাই। তাহাদের সন্তান না থাকায় তাহারা চির বিষণ্ণ, তাহারা সংসারকে অসারই জ্ঞান করেন। তাহাদের অর্থের সাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে. তাহারা বহুবিধ সম্পদে সম্পদ্‌বান হইতে পারেন. তাহাদের নানাবিধ যশঃ ও কীর্ত্তি থাকিতে পারে, তাহারা পদ গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারেন. কিন্তু ঐ সকল ধনবল জনবল, পদমান সেই অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ের এমন এক স্থল শূন্য রহিয়াছে, যাহা পূর্ণ করিতে না পারিয়া তাহারা চির বিষণ্ণ। এইরূপ কেন হয়? ইহার কারণই এই যে আত্মার প্রেম নিজেকে যেমন প্রেম করে,* সেইরূপ নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়া সেই বহুকেও প্রেমে হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে চায়। নিঃসন্তান দম্পতির এই প্রেমময়ী ইচ্ছা পূর্ণ হয় না বলিয়াই তাহাদের এত দুঃখ। "লীলাতত্ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাও নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়া সেই ভাসমান বহুকে অর্থাৎ নিজ সন্তানদিগকে নিত্য তাঁহারই অনন্ত প্রেমে পূর্ণভাবে তাঁহার অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মই স্বয়ং

* "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে উদ্ধৃত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত প্রেমতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

এক ও অখণ্ড থাকিয়াও জড় দেহ যোগে বহুভাবে ভাসমান হইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার অখণ্ডত্ব বাধিত হয় না। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার অনন্তশক্তিশালিনী প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহারই গুণ বিশেষ অবলম্বনে জড় জগৎ ও উহা হইতে জড় দেহ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধও হয় নাই এবং এই কার্য্য সম্পাদনে তিনি অসমর্থও নহেন।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে মাতাপিতা সন্তানের দেহ সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা সৃষ্টি করেন না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মাতাপিতা দেহধারী। তাহাদের দেহেরই উপরই যৎকিঞ্চিৎ অধিকার আছে। সুতরাং তাহারা দেহই সৃষ্টি করেন, আত্মা সৃষ্টি করিতে পারেন না। অশরীরী নিত্য নিরাকার, নির্ব্বিকার অনন্ত প্রেমময় ব্রহ্মের দেহ নাই। তিনি তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।* আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রণালীই জাগতিক প্রণালীতে Reflected হইয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে মূলে জড় ও আত্মার রাজ্যে একই বিধান কার্য্য করিতেছে। One God, One Law, ne Universe.

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সেইরূপ পরমোন্নত সাধকগণই সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অথবা তাঁহাদের বাণীতে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। আত্মিক বিষয় বিজ্ঞানের বহির্ভূত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা অসম্ভব। পার্থিব দৃষ্টান্তও এস্থলে দুর্ব্বল। ইহার কারণও একই। অর্থাৎ

* এস্থলে "আত্মার সৃষ্টি" পদে ব্রহ্ম স্বয়ং দেহ যোগে দোষপাশবদ্ধাবস্থায় ভাসমান হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। নতুবা আত্মার কোনই জন্ম-মৃত্যুজনিত বিকার হয় না। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম জীবভাবে ভাসমান হওয়ায় তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই।

পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আত্মিক তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। তবে যতদূর সম্ভব, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যুক্তিও প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম বহু হইয়াছেন বলিলে তিনি বহু খণ্ডে—অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে না। তিনি এক, অখণ্ড থাকিয়াও অসংখ্যভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, যেমন সমুদ্র বহু তরঙ্গভাবে ভাসমান হয়। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উহা এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিলে পাঠক নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড হইয়াও বহুভাবে ভাসমান হইতে পারিয়াছেন।

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেম বহুকে এক করিবার ন্যায় এককেও বহু করিতে পারেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধু পরম পিতা তাঁহারই অনন্ত প্রেম গুণে মহাপ্রলয়ে আবার বহুকে এক করিবেন।* এবং এতদর্থে অসংখ্য জীবকে তাঁহারই দিকে নিয়ত অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহারই অনন্ত প্রেমে আকর্ষণ করিতেছেন। জীবের অনন্ত উন্নতিও সেই অনন্ত অতুলনীয় প্রেমেই সম্ভব হইবে এবং এক অচিন্ত্য দূরবর্ত্তীকালে মহাপ্রলয়ান্তে, তিনি যেমন এক ছিলেন, তেমনি একই থাকিবেন। তখন তাঁহার অপূর্ব্বা লীলা পূর্ণ হইবে। তিনি এক ছিলেন এবং এক হইবেন, বাক্যদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে তিনি এখন একমেবাদ্বিতীয়ম্ নহেন। উহার অর্থ এই যে সৃষ্টিকালে তিনি নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি প্রকৃতভাবে বহু হন নাই। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং মহাপ্রলয়ের পরে তাঁহার বহুভাবে ভাসমানত্ব ছিল না ও থাকিবে না। আবার ইহাও চিন্তা করিতে হইবে যে সেই ভাসমান জীব সমূহ তাঁহারই একান্তভাবে নিত্য অন্তর্গত। সুতরাং তিনি নিত্যই এক। ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

---

* এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে মহাপ্রলয় সম্ভব হইতে অধার্য্যকাল ব্যয়িত হইবে।

আবারও আপত্তি হইতে পারে যে ইহা বুঝিতে পারা গেল যে প্রেম একেকে বহু করিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে ব্রহ্ম নিত্যই এক, অখণ্ড, অব্যয় ও নিষ্কল। উপনিষদ্ সমূহে পূজনীয় ঋষিগণ একবাক্যে তাঁহাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, অদ্বৈত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম এক, অখণ্ড হইয়াও বহু হইয়াছেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। এক এবং বহুর সমস্যা সুকঠিন। ইহা অনেককেই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। পরম দয়াল পরম পিতা এই মহাসমস্যার সমাধানে এই দীন হীনের সহায় হউন এই প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে ব্যাকুলভাবে জানাইতেছি।

আপত্তিকারী প্রথমেই বলিতেছেন যে উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সত্য। আবার ইহাও সত্য যে সেই ঋষিগণই "অহং বহুস্যাম্", "তৎ সৃষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ ইত্যাদি বাক্যও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়ভাবের উক্তিই করিয়াছেন। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিয়া উহাদের সামঞ্জস্য নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিব।

এই গ্রন্থের বহুস্থলে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড থাকিয়াও জড় দেহ যোগে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। পাঠক যদি সেই অংশ সমূহ পাঠ করেন, তবে তিনি এই সমস্যার প্রধান অংশের সমাধান নিঃসংশয়িতভাবে লাভ করিতে পারিবেন।

(১) গুণ বিধান (২) জড়ের বাধকত্বের কারণ, (৩) ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী।

এখন এক ও বহু কি ও উহাদের সম্পর্ক কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। দেখা যাউক, এই ভাবেও উক্ত সমস্যার সুমীমাংসা লাভ সম্ভব কিনা। আপত্তিকারী বলিতেছেন যে ব্রহ্ম নিত্যই এক, অখণ্ড, অব্যয় ও নিষ্কল। তিনি নিত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই

শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। আমারও তাহার সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত। ইহাতে কোনও মতদ্বৈধ যে থাকিতে পারে, ইহা আমাদের মনে হয় না। পাঠক যদি গ্রন্থলিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করেন তবেই দেখিতে পাইবেন যে ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ১০ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি সেই জড় পদার্থ দ্বারা জীবদেহ প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল দেহে অনুপ্রবেশ করিলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মই প্রত্যেক জীবদেহে জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া আছেন। সুতরাং জীবাত্মা মাত্রই স্বরূপতঃ পূর্ণব্রহ্ম। কারণ, ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব হেতু তাঁহার কোনই অংশ হইতে পারে না। এই দেহপ্রবিষ্ট যিনি, তিনি স্বরূপতঃ পূর্ণ হইলেও স্বেচ্ছায় দেহবদ্ধাবস্থায় দেহজাত দোষ পাশবদ্ধাবস্থায় ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। সুতরাং যতকাল তিনি দেহবদ্ধাবস্থায় থাকেন, সেই দেহ স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক অথবা কারণ দেহই হউক, ততকালই তিনি অপূর্ণ ও পৃথক্‌ভাবে ভাসমান থাকেন। অতএব, আমাদের বুঝিতে হইবে যে একই সত্য তত্ত্ব এবং বহু ব্রহ্মের ইচ্ছাজাত। অর্থাৎ একই একেরই ইচ্ছায় বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। এখন যদি কেহ এরূপ প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন যে তাহাতে বিশ্বের জীবকুল একই সময় ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হন, তবে তখন একমাত্র পরমাত্মাই বর্ত্তমান থাকিবেন। সুতরাং তখন দেখা যাইবে যে একের মধ্যেই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বহু বর্ত্তমান ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে জীবাত্মাসমূহ প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ পূর্ণ বটেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অর্থাৎ যতকাল তিনি জীব অর্থাৎ দেহে বদ্ধ, ততকালই তিনি অপূর্ণভাবে ভাসমান। এই যে পূর্ণত্বের কথা বলা হইল, উহা তাঁহার স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ তখন আর তাঁহাকে দেহজাত দোষপাশবদ্ধাবস্থায় চিন্তা করা হয় নাই। সুতরাং জীবাত্মা সমূহ পরমাত্মার অন্তর্গত। অতএব এস্থলে দেখা গেল যে বহু আর কিছুই নহে, কেবল একেরই ইচ্ছায়

একেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এক না থাকিলে বহু হইতে পারিত না। অতএব একের অন্তর্গত হইয়া বহু বর্তমান এবং একই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন।

এখন জড় জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক। জড় জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিতভাবে লিখিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জড় জগতের উৎপত্তি ব্রহ্মের ইচ্ছা সহযোগে তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং উহা ব্রহ্মের সহিত পরম্পরাভাবে অভেদ বলা যাইতে পারে। জড় জগতের ভিত্তি ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই এবং ইহা সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়াই বর্ত্তমান।*

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ (গীতা -৯।৪)

অতএব জড় জগৎও ব্রহ্মেরই, একেরই অন্তর্গত।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জড় জগৎও অখণ্ড। উহারও খণ্ড হইতে পারে না। কারণ, জড় জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণু একে অন্যের সহিত সংবদ্ধ। তবে যে জড় জগতে বহু দৃষ্ট হয়, ইহা সত্য, কিন্তু পূর্ণভাবে সত্য নহে। কারণ, একটী কাগজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিলেও উহার প্রত্যেক অংশই অন্য সকল অংশের সহিত, অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত এবং সমগ্র জড় জগতের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ব্যোম হইতে অবশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন এবং উহা ব্যোমেরই অন্তর্গতভাবে অবস্থিত। ব্যোম সর্ব্বব্যাপী। অর্থাৎ উহা সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপিয়া আছে। সুতরাং প্রত্যেক জড় পদার্থই অন্য জড় পদার্থের সহিত সংযুক্ত। Sir James Jeans বলিয়াছেন যে আমা-দের একটী অঙ্গুলী হেলনেও বিশ্বের সর্ব্বত্র Disturbance উপস্থিত হয়। ইহাই যখন সত্য, তখন খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতীয়মান জড়বস্তু সমূহ যে একে অন্যের সহিত গ্রথিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অতএব জড় জগৎও এক ও অখণ্ড হইয়াও বহুভাবে অবস্থিত।

* এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ "অব্যক্তের পরিণাম" ও "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাইব।

অর্থাৎ জড় জগতেও দেখা যায় যে এক হইতে বহুর উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে এবং বহু একেরই অন্তর্গতভাবে অবস্থিত। পাঠক মনে রাখিবেন যে ব্যোম এক ও অখণ্ড। তিনি আরও মনে রাখিবেন যে জড় জগতের কিছুই ধ্বংস হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

এখন আমরা অনন্ত স্বরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করি। "মায়াবাদ" অংশে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত। দুইটী বিপরীত গুণের অনন্ত মিশ্রণে একটী একত্ব সংসাধিত হয়। আবার সেইরূপ অনন্ত একত্বের অনন্ত মিশ্রণে যে একত্ব সংসাধিত হইয়াছে. তাহাই ব্রহ্মের একমাত্র নিত্য সত্য স্বরূপ—পরম রূপ বা অরূপ রূপ··

ওঁং

সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত স্বরূপও নিত্য বর্ত্তমান, আবার সেই অনন্ত স্বরূপই নিত্য অনন্তমিশ্রণে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া তিনি। সুতরাং তাঁহার একটী মাত্র নিত্য ও অনাদি স্বরূপ এবং সেই একমাত্র নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া বিরাজমান তাঁহারই অনন্ত স্বরূপ। অতএব এস্থলেও দেখিতে পাইলাম যে একই নিত্য সত্য, কিন্তু সেই একের মধ্যেই অন্তর্গতভাবে অনন্ত স্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, উহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতঃপর বহুস্থলে দেখিতে পাইব। আমরা আরও দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মই জীব ও জগৎভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং উহারা একমাত্র তাঁহারই অন্তর্গত। অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম এই পরম তত্ত্বই সত্য, সত্য, পরম সত্য।

অতএব যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক্ না কেন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে একই সত্য এবং বহু একেরই অভিব্যক্তি এবং একেরই অন্তর্গত। সুতরাং এক যে বহু হইতে পারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে একই উচ্চতমা সংখ্যা এবং

বহু একেরই অন্তর্গত। কিন্তু গণিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একই নিম্নতম সংখ্যা। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে একই একমাত্র সংখ্যা। অন্য যে সকল সংখ্যা দেখা যায়, তাহা একেরই বহুভাবে প্রকাশ। যথা ২=১+১, ৩=১+১+১ ইত্যাদি। এক ভিন্ন বহু দাঁড়াইতে পারে না। ইতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে ব্রহ্মই স্বয়ং পূর্ণভাবে প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান এবং তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং তিনিই পূর্ণভাবে প্রত্যেক জড় পদার্থের সারসত্তারূপে বর্ত্তমান। সুতরাং একই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে গণিত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যদিও উহা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান।

ব্রহ্ম যে এক ও অখণ্ড তাহা আপত্তিকারীও স্বীকার করেন। সুতরাং ব্রহ্ম যখন "অহং বহুস্যাম্" সঙ্কল্প করিলেন, তখন তিনি অবশ্যই বহুভাবে ভাসমান হইবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। দুই প্রকারে এক বহু হইতে পারে। যথা—একটী দ্রব্য বহু অংশভাবে প্রস্তুত করিয়া এবং এক বহুভাবে ভাসমান হইয়া। ব্রহ্ম যখন অখণ্ড স্বভাব, তখন তিনি দ্বিতীয় প্রকারেই বহু হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আমাদের দৃষ্ট বা অনুমিত বহু একেরই বহুভাবে ভাসমান পদার্থ সমূহ। আমাদের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আমরা এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা প্রত্যেকেই একেরই এক একটী ভাসমান পদার্থ মাত্র, অথবা চলিত ভাষায় বলা যায় যে একটি দ্রব্য, দুইটী দ্রব্য ইত্যাদি।

জীবাত্মা সমূহকে যদি কেহ অসংখ্য জীব বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারাও একই পরমাত্মার অন্তর্গত বলিতে হইবে। আর যদি তাঁহাদের স্বরূপ মাত্রকেই লক্ষ্য করা হয়, তবে ত তাহা একমাত্র আত্মাই, কখনই বহু নহেন।

অতএব আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, এস্থলেও সেই একই সিদ্ধান্ত লাভ করা গেল। অর্থাৎ বহু একেরই অন্তর্গত, বহু একেরই অভিব্যক্তি, এক হইতেই বহুর উৎপত্তি এবং একেই বহুর পরিণতি। একই নিত্য সত্য, একই উচ্চতম সংখ্যা।

এক হইতে উচ্চতর সংখ্যার অস্তিত্ব থাকা দূরের কথা, একের সমানও কোন সংখ্যা নাই।

যদধিকো ন কশ্চিৎ স্যাদনন্তে জগতিতলে
যৎ সমোঽপি ন কশ্চিৎ স্যান্নমামি জগদীশ্বরম্॥
(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

বঙ্গানুবাদঃ—অনন্ত জগতে যাঁহার অধিক কেহ নাই, যাঁহার সমানও কেহ নাই, (সেই) জগদীশ্বরকে আমি প্রণাম করি।

অতএব তিনি দ্বিতীয় রহিত বা নিত্য একমেবাদ্বিতীয়ম

ওঁং

বহু যখন চিরকাল একেরই অন্তর্গত ভাবে বর্ত্তমান, তখন একই সত্য এবং একের উল্লেখ করিলে বহুর উল্লেখ একান্ত অপ্রয়োজনীয়।

অন্যভাবেও এবিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারে। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মে বিপরীত গুণের একত্ব সংসাধিত হইয়াছে। একত্ব ও বহুত্ব বিপরীত গুণ আপত্তিকারীর আপত্তিতেও ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মেও উক্ত বিপরীত গুণদ্বয়ের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাতেই অনন্ত একত্বের এবং অনন্ত বহুত্বের অনন্ত সংমিশ্রণ হইয়া অনন্ত একত্ব হইয়াছে। তাই তিনি এক হইয়াও বহুর স্রষ্টা হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্রহ্মে যে অনন্ত বহুত্বের একত্ব হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রথমে আমাদের দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক্। দেহ একটি কিন্তু ইহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, অন্তরস্থিত যন্ত্র সমূহ, সহস্র সহস্র নাড়ী দৈহিক অণু সমূহ, রক্ত, মাংস, মজ্জা, মেদ, অস্থি প্রভৃতির একত্বে উহা (দেহ) গঠিত। দেহের কোন একটী অঙ্গকে দেহ বলা যায় না। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি লইয়াই দেহ। সুতরাং এস্থলে একের অন্তর্গত হইয়াই বহু বর্ত্তমান।

আমরা যদি অন্তঃকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে আমরা ঐ একই

অবস্থা দেখিতে পাই। অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, অহঙ্কার এক অন্তঃ-করণের অন্তর্গত।

এখন আমরা আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করি। আমাদের মধ্যে আত্মিক গুণ যথা—জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণরাশি বর্ত্তমান। এস্থলে দেখা গেল যে আত্মা একই, কিন্তু তাঁহাতে বিভিন্ন গুণ বর্ত্তমান। যদি আমরা সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে উহাতে সপ্তবর্ণ বর্ত্তমান এবং উহাদের সংমিশ্রণে একটী সূর্য্যরশ্মি গঠিত। অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি এক, কিন্তু উহার অন্তর্গত হইয়া বর্ত্তমান সাতটী বর্ণ। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বদাই শুভ্রবর্ণ। অর্থাৎ সপ্তবর্ণের অপূর্ব্ব মিশ্রণে একটী বর্ণ গঠিত হইয়াছে যাহাতে সেই সপ্তবর্ণই বর্ত্তমান। সেইরূপ ব্রহ্মে অনন্ত একত্বের একত্ব সম্পাদিত হওয়ায় তিনি একরূপ হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি নিত্যই শিবম বা শুভম্। সূর্য্যরশ্মি শুভ্রবর্ণ। শুভ্র শব্দ শুভ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। যথা শুভ্ + রক্। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মে অনন্ত একত্বের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি একরূপং, একরসং, শিবমদ্বৈতম্। কিন্তু সেই একরূপের অন্তর্গত হইয়াই তাঁহার অনন্ত অরূপ রূপ নিত্য বর্ত্তমান. সুতরাং তাঁহাতেই অনন্ত বহুত্বের একত্ব হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে One God, One Law, One Universe. এক ব্রহ্ম, এক বিধান, এক বিশ্ব। সর্ব্বত্রই একই বিধান কার্য্য করিতেছে। এই সম্বন্ধে আমরা আরও প্রমাণ ক্রমশঃ লাভ করিব।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেও বহুত্ব বোধ আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ। যদি তাঁহার বহুত্ববোধই না থাকিত, তবে তিনি "অহং বহুস্যাম্" এই সংকল্প করিতে পারিতেন না। অর্থাৎ তিনি বহুর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারিতেন না। একজন নিরক্ষর সর্ব্ববিষয়ে মূর্খ ব্যক্তি কখনই একটি বিরাট, জটিলতাপূর্ণ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না। কারণ, তাহার মধ্যে সেই ভাবের কোনই জ্ঞান নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে

তিনি যদি বহুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে বহুর স্রষ্টা হওয়া অসম্ভব হইত। অতএব বলিতে হইবে যে ব্রহ্মে বহুত্ব বোধ আছে। পরমর্ষি গুরুনাথ বহুত্ববোধকে ব্রহ্মের সরল কঠোর লয়শীল গুণ বলিয়াছেন।

অবশেষে দ্বন্দ্ব শব্দটীর অর্থ চিন্তা করা যাউক। উহা দ্বারা মিলন অর্থাৎ একত্ব বুঝায়, আবার কলহ সুতরাং পার্থক্য অর্থাৎ দ্বিত্ব, বহুত্বও বুঝায়, যেমন—মহাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখা যায় :—

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

এস্থলে ২য় পংক্তিতে মাতা দুর্গাদেবী তাঁহার প্রিয়তম প্রাণপতির সহিত অভেদের ঐকান্তিকতার বিষয়েই বলিয়াছিলেন; কিন্তু পাটুনী মনে করিয়াছিল যে তাঁহাদের মধ্যে দিবানিশি কলহই চলিত। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে অমিলন, পার্থক্য বা দ্বিত্ব মূর্ত্তিমান ভাবে বিরাজ করিত। তাই সে বলিয়াছিল :-

"যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী শব্দই একত্ব ও বহুত্ব উভয় ভাবই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মেও উভয় ভাবই নিত্য বর্ত্তমান, এ বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ নাই।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বহু একেরই অন্তর্গত। একই পূর্ণ, বহু একেরই অভিব্যক্তি মাত্র। একও বহু হইতে পারেন এবং বহুও এক হইতে পারেন। সুতরাং এক ও বহুর কোনও মারাত্মক প্রভেদ নাই, একেই উভয় মিলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। অথবা বলা যাইতে পারে যে পূর্ণ বহু ও পূর্ণ এক একই। এই উভয় কার্য্যই যে প্রেমদ্বারা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে পরমর্ষি গুরুনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

একং যো বহুধা কর্ত্তুং বহূনেকঞ্চ শক্তিমান্।
নিত্যং জননশীলশ্চ, স গুণঃ প্রেম কথ্যতে॥ (সত্যামৃত)

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে গুণ এককে বহু করিতে ও বহুকে এক করিতে শক্ত, যাহা নিত্য জননশীল, সেই গুণকে প্রেম কহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন পূর্ণ, তখন তাঁহার আপনাকে বহু করিতে ইচ্ছা হইল কেন? ইহার উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য এই যে এই প্রশ্নের মধ্যে যে "ইচ্ছা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে উহাতে কিছু পাইবার জন্য বাসনা প্রকাশ করে। অর্থাৎ ইচ্ছার অর্থ ঈপ্সা, কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার মধ্যে ঈপ্সার লেশ মাত্রও নাই। কারণ, তিনি পূর্ণ ও নিত্য আপ্তকাম। ইহাই সত্য যে তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি (Will Power) প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কিছু পাইতে বা লাভ করিতে তাঁহার কোনই ঈপ্সা বা কামনার (desire বা wish এর) উদয় হইয়াছিল না বা হইতেও পারে না। ইচ্ছার অর্থ কখনই ঈপ্সা নহে এবং Will এর অর্থ কখনই desire বা wish নহে। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই ইচ্ছাকে ঈপ্সা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। এইজন্য আমাদের সংস্কার এতদূর দৃঢ় হইয়াছে যে আমরা ইচ্ছা বলিলেই কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা বুঝি। আমাদের এই সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে এবং ইচ্ছাকে কখনই ঈপ্সা পর্য্যায়ভুক্ত না করি, কিন্তু ইচ্ছাকে will বা voliton অর্থে ব্যবহার করি।

যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার ইচ্ছা শক্তি থাকিবে না, ইহা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বরং সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছাশক্তি নাই বলিলেই তাঁহার পূর্ণত্বে দোষারোপ করা হয়। ইংরেজীতে যদি ভাবটী প্রকাশ করা যায়, তবে বলিতে হয় "God willed the creation but not wished for it". ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি আছে, কিন্তু তিনি পূর্ণ বলিয়া তাঁহার ঈপ্সা নাই বা থাকিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ সার্ব্বজনীন উদ্বোধনমূলক ব্রহ্মসঙ্গীতের ("ভুবনবাসী সবে গাও"এর) নিম্নলিখিত বাক্যে অর্থটি অনেকটা প্রস্ফুট হইয়াছে।

"এক তিনি দেবদেব নিখিল কারণ,
খুসী তাঁর এ ধরা সৃজন পালন।" (নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

মানবের ন্যায় ঈপ্সা দ্বারা বাধ্য হইয়া তিনি এই সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পরমপিতা অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত শক্তির আধার, আবার তিনি অনন্তভাবে অনন্ত স্বাধীন, সুতরাং তিনি অনন্ত গুণ ও শক্তির অতীত। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যেই বাধ্য-বাধকতার প্রশ্ন আসিতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি নাই, তবে তাহার ইহাও বলিতে হইবে যে পূর্ণ ব্রহ্ম ক্রিয়া-শক্তিবিহীন। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলেন ঃ—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (৬।৮)

বঙ্গানুবাদ ঃ—ইহার বিচিত্রা পরাশক্তি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া। (তত্ত্বভূষণ)

উপনিষদের অন্যান্য বহু মন্ত্রেও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি আছে এবং তিনি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইতঃপর বহুস্থলে প্রমাণিত হইবে যে ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম যে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় নহেন, তাহা "মায়াবাদ" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইচ্ছা ও কর্ম্ম এক পর্য্যায়ভুক্ত, একটী অন্তরের ভাব, অপরটী উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পরমপিতার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশরূপ কর্ম্ম আমরা অপামর সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বদাই দেখিতেছি।* কারণ, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও সম্ভব হয় না। মহাপুরুষ ঈশা শেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" (Thy

---

* "পরমপিতার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ" উক্তিতে কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে জগৎ ব্রহ্মের বাহিরে অবস্থিত। আমরা ব্রহ্মকে দেখিতে পাই না, কিন্তু তাঁহার জগৎরূপ কার্য্য দেখিতে পাই। তাই আমাদের বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার নিমিত্ত ঐরূপভাবে উক্ত হইয়াছে। নতুবা জীব ও জগৎ সর্ব্বকালে ব্রহ্মের অন্তর্গতভাবে অবস্থিত। এ বিষয়ের আলোচনা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

will be done)। প্রত্যুত নির্ভরতা নামক অত্যুৎকৃষ্ট গুণ সাধনের মূল পরমপিতার ইচ্ছাকে অম্লান বদনে অথবা সানন্দ চিত্তে পদে পদে শিরোধার্য্য করিয়া নেওয়া। সকল প্রকার সাধককেই শেষে পরমপিতার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তাঁহারই ইচ্ছার সহিত সাধকের ইচ্ছার পূর্ণ মিলনই লোভনীয় ও লভনীয় এবং সেইজন্য উন্নত সাধকগণ সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন। মানবের মধ্যে আমরা জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা দেখিতে পাই। উহারা কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই বলিতে হইবে যে জীব যে পরমাত্মার অংশভাবে ভাসমান, তাঁহাতে উহারা পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবেই বর্তমান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটির প্রতি পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি ॥ (৩।২২)

বঙ্গানুবাদঃ পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই, আমার পাইবার কিছু নাই অথচ আমিও কর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকি।* (গৌরগোবিন্দ রায়)

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত এই যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়।** আচার্য্য শঙ্কর এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষভাবে জোর (Emphasis) দিয়াছেন সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তকে সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মানবে যে ইচ্ছাশক্তি অপূর্ণ ও বিকৃতভাবে আছে, ব্রহ্মে তাহাই পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে নিত্য বর্ত্তমান। কারণ, ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে মানবে তাহা আসিতে পারিত না। মানবে যে ইচ্ছাশক্তি আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং মানবের উৎসেও উহা বর্ত্তমান। অতএব "ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তি নাই" এই উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণা। ব্রহ্ম কেবলই—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

---

* গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

** "মায়াবাদ" অংশে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

নহেন, কিন্তু তিনি অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তির নিত্য আধার ও ইচ্ছাশক্তি তাঁহারই শক্তি বিশেষ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বলিয়া তাঁহার গুণরাশি বিভক্ত হইতে পারে না। তাঁহার অনন্ত গুণই নিত্য। ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমানও বলিব, আবার বলিব যে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি নাই, ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়। অতএব ব্রহ্ম যখন সঙ্গত বিবেচনা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পরমপুরুষ যে কর্ম্মই করুন না কেন, তাহাতে তিনি কখনই লিপ্ত হন না, তিনি নিত্য নির্লিপ্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ (৪।১৪)

বঙ্গানুবাদ : কর্ম্ম সকল (সৃষ্ট্যাদি) আমাকে লিপ্ত করে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমার এইরূপ জানে, সে কখন বদ্ধ হয় না। (গৌরগোবিন্দ রায়)

পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

"অনন্ত গুণের ধাম পালিছ ভুবন,
আপনি নির্লিপ্ত রহি লিপ্ত করি জন।"

গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই যে তিনি যেন সর্ব্বদা ফল কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করেন। এই ভাবটি যে গীতাতে কত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সেই গ্রন্থ পাঠে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যখন সাধকের প্রতিই এই উপদেশ, তখন সর্ব্ব আদর্শের আদর্শ যিনি, সেই পরমেশ্বরে যে উক্ত আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে পরমপিতা ঈপ্সা বা কামনা বাসনার জন্য বাধ্য হইয়া এই সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই নির্লিপ্ত ভাবে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং এই কার্য্যে তাঁহার মধ্যে কোনই বিকার উপস্থিত হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা জানিয়াও কেহ কেহ বলেন যে মানবের পক্ষে ইচ্ছা যেমন তাঁহার অপূর্ণতা প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার ইচ্ছায় সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিলেও তাঁহার অপূর্ণতাই প্রকাশ পায়। তাঁহারা বলেন যে সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার স্বভাব বলিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। পাঠক এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি", "কল্পবাদ" প্রভৃতি অংশ সমূহে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাব বশতঃ আপনা আপনি হয় নাই, কিন্তু উহা তাঁহার ইচ্ছা সম্ভূতা সুতরাং সাদি। মানবের ইচ্ছার ন্যায় যে ব্রহ্মের ইচ্ছা দোষদুষ্টা নহে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে ঈপ্সা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আমরা সাধারণ মানবে দেখিতে পাই যে তাহার প্রায় সকল কার্য্যই স্বার্থপরতা দোষে দুষ্ট এবং তাহার কার্য্যসমূহ সর্ব্বদাই তাহার অপূর্ণতাই প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ সাধকের সম্বন্ধে যদি আমরা চিন্তা করি, তবে দেখিব যে তাঁহার কোন কোন কার্য্য স্বার্থগন্ধহীন বটে কিন্তু অনেক কার্য্যই স্বার্থ জন্য সম্পাদিত। সংসারে চলিবার মত যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা অবশ্যই তাঁহারা সম্পাদন করেন। আমরা যদি আরও উচ্চস্তরের সাধকের কথা চিন্তা করি, তবে দেখিব যে তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছাই যেন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। তাঁহাতে (সেই সাধকে) যেন নিজের ইচ্ছা বিলীন। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই কামনা প্রসূত নহে, বরং সমস্ত কার্য্যই যেন তিনি পরম পিতার আদেশে করিতেছেন। প্রশ্নকর্ত্তা বলিতে পারেন যে, যে তিন শ্রেণীর মানবের কথা উল্লেখ করা হইল তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে অথবা নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই সকল কার্য্য দ্বারাও তাঁহাদের অন্তরে উন্নতি লাভের আশা স্পষ্ট বা লুক্কায়িত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য দ্বারাও তাঁহাদের ঈপ্সা সূচিত হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অপূর্ণ জীব যতই পরমোন্নতি লাভ করুন, সকল কার্য্যই যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈপ্সা বিরহিত ভাবে সম্পাদন

করেন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ কার্য্যই যে তাঁহারা নির্লিপ্ত এবং আদিষ্ট ভাবে সম্পাদন করেন, তাহা সত্য। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অত্যুন্নতদিগের ঈপ্সা তখন একমাত্র বাঞ্ছনীয় পরম সুহৃদ্ ব্রহ্মের জন্যই, আমাদের ধারণীয় বিষয় সংক্রান্ত কোনও বাসনা কামনা পূরণের জন্য নহে।

অত্যুন্নত সাধকও আবার যতই উন্নত হইবেন * তাঁহার ঈপ্সাও ততই অল্প হইতে অল্পতর হইতে থাকিবে এবং "ব্রহ্মের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা" এই ভাবের আরও ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে, অথবা বলিতে হয় যে "ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার কোনও পৃথক ইচ্ছা থাকিবে না" এই ভাবের ক্রমোন্নতি তাঁহাতে সাধিত হইতে থাকিবে। অবশেষে তাঁহার পূর্ণামুক্তির সাথে সাথে তাঁহার ঈপ্সারও শেষ হইবে।

অনন্ত ও পূর্ণব্রহ্ম সকল আদর্শের আদর্শ। সুতরাং তাঁহাতে ঈপ্সা সম্পূর্ণরূপে নিত্য বিবর্জ্জিত। অর্থাৎ তাঁহাতে সকল আদর্শের নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈপ্সা বিরহিত ও নির্লিপ্তভাবে তাঁহার অসীম শক্তিসম্পন্না সুমহতী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা লীলার্থই (কিন্তু কিছু পাইবার জন্য নহে) এই সৃষ্টি ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার কোন ইচ্ছাই তাঁহার অপূর্ণতা প্রকাশ করে না অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার অর্থ ঈপ্সা নহে, আবার Will এর অর্থ desire হইতেই পারে না। কারণ, তাঁহার নূতন কিছুই প্রাপ্তব্য নাই, তিনি যে নিত্যই আপ্তকাম। অপূর্ণতা ও ঈপ্সা (উহারা যতই অল্প হউক না কেন) সর্ব্বদা সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ণে ঈপ্সার কোনই স্থান নাই।

আমরা জাগতিক ব্যাপারের তুলনা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করি বটে, কিন্তু পাঠক সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে সান্ত জীব বা জড় পদার্থ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মের সম্পূর্ণ উপমা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় জগতে কেহ বা কিছু নাই। পাঠকের আরও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি সর্ব্ব আদর্শের আদর্শ। সুতরাং তাঁহাতে যে বিশেষত্বেরও

---

* ব্রহ্মের অনন্তগুণ, প্রত্যেক গুণে ব্রহ্মের সহিত সাধকের একত্ব লাভকে মুক্তি বলা হয়। সুতরাং মুক্তিও অনন্ত এবং আত্মার উন্নতিও অনন্ত।

পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মানবের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ঈপ্সা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে পরমোন্নতদিগের মধ্যে অত্যুন্নত সাধকগণের জীবনে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম ও অত্যল্পভাবে বর্ত্তমান থাকে মাত্র। সুতরাং পরব্রহ্মে যে সর্ব্বপ্রকারে ঈপ্সা বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি পরমেশ্বরকে একটি সাধারণ মানব মাত্র মনে করা যায়, তবে সৃষ্টিকার্য্যের মূলেইচ্ছা বর্ত্তমান বলিলে তাঁহার পূর্ণত্বে সন্দেহ আসিলেও আসিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি ত মানব নহেন, এমন কি পৃথিবীর উচ্চতম সাধকও তাঁহার অনন্ত অনন্ত অনন্ত উন্নতির কণামাত্র লাভ করেন মাত্র। সুতরাং "সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল" বলায় তাঁহার অপূর্ণতার আশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে আরও একটি তত্ত্ব আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই যে আমরা দেখিয়াছি যে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সার হ্রাস হয়। যদি ইহাই সত্য হইল, তবে যাঁহাতে অনন্ত উন্নতি নিত্য বর্ত্তমান, তাঁহাতে ঈপ্সার লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তবে অনবস্থা দোষ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঈপ্সা হ্রাস পাইতেই থাকিবে, কিন্তু উহা কখনও নিঃশেষিত হইবে না। তাহা হইতে পারে না। কারণ, ক্রমান্বয়ে হ্রাস হইতে হইতে উহা এক স্থলে নিঃশেষিত হইবেই হইবে। ইহাই স্বাভাবিক বিধান।

অন্যভাবেও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরমপিতা কামনা দ্বারা বাধ্য হইয়া সৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টির মূলে তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা। প্রেম নিত্যই কামনাতীত। তিনি নিত্যই অনন্ত ও পূর্ণ প্রেমময়। সুতরাং প্রেমময়ী ইচ্ছার মধ্যে কোনও বাসনা কামনা থাকিতে পারে না। প্রেম যে কিরূপ কামনাতীত, তাহা বুঝাইতে বোধ হয় অধিক বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রেমের সাধক প্রেম সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হইলেই পরম প্রেমময় পরমপিতাতে আত্ম সমর্পণ করিতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন। তিনি তখন কোনও সুখের এমনকি স্বর্গসুখেরও প্রার্থী থাকেন না। কোনও

দুঃখকে তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করেন না। তিনি সর্ব্বদা প্রেমব্যাকুল প্রাণে একমাত্র প্রেমের পাত্র পরম প্রেমময়কেই প্রার্থনা করেন। সর্ব্বদাই তাঁহার ইহাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন তিনি সেই অতল প্রেম জলধিতে নিত্য সুবিনিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারই নিত্য প্রেম সুধা পানে নিত্য নিরত থাকেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার যেন পৃথক্ কোনও ইচ্ছা থাকে না, এক কথায় তিনি যেন সেই নিত্য সুহৃদ্ পরম প্রেমময়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। তখন তিনি প্রেমময়ের জন্যই নিজ জীবন, দেহ, মন, প্রাণ, বাসনা, কামনা, সকলই সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়াও সুখী হন না. তখন তাঁহার প্রেমের জন্যই প্রেম অথবা তিনি অহেতুকভাবেই প্রেমময়ের জন্য নিত্য প্রেম ব্যাকুল।

উক্তরূপ অত্যুন্নত প্রেমিক সাধক প্রেমময়ের প্রেমসুধারসে যখন আত্যন্তিকভাবে ভাবে ডুবিয়া থাকেন, তখন সেই সুগভীর প্রদেশ হইতে তিনি তাঁহার সহোদর প্রতিম জগদ্বাসিগণের নিকট সত্যভাবে বলিতে পারেন যে ঃ—

যিনি অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ প্রেমময়ের অপরূপ প্রেম-সুন্দর মধুর রূপ দর্শন করেন নাই, যিনি মরু পর্য্যটনকারী পথিকের ন্যায় অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া প্রেম জ্যোতির্ম্ময় নিত্য নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের অপূর্ব্ব সুশীতল রূপমাধুরী প্রেমপিয়াসু নয়নে নিরন্তর পান করিয়া করিয়া অরূপ-রূপ-তৃষ্ণার অপার পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াও নিত্যই অতৃপ্ত থাকেন নাই; যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত আধার, অনন্ত লাবণ্যে নিত্য পরিপূর্ণ অনন্ত প্রেমময় দেবতার অফুরন্ত অরূপ রূপরাশি অনিমেষ প্রেম নয়নে দর্শন করিয়া করিয়া প্রেমে তাঁহাতেই আত্মহারা হইয়া থাকেন নাই; যিনি পরম প্রেম সুন্দর অতুলন প্রেমমণির অদর্শন মাত্রেই সমস্ত দেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেখেন নাই, বিশ্বভুবন শূন্যময় হেরেন নাই ও বিরহানলে বিদগ্ধ হন নাই, আবার যিনি অনন্ত প্রেমাধার বিশ্বেশ্বরকে সমস্ত হৃদয়ের সুগভীর স্থল হইতে বিশ্বময় দর্শন করিয়া তাঁহারই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বারংবার "সত্যং, শিবং, সুন্দরং, মধুরম্" বলিতে থাকেন নাই, যিনি সেই নিত্য সুহৃদ্ প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের দর্শনে সকলই আনন্দ,

সকলই অমৃত, সকলই প্রেম এবং সকলই অপূর্ব্ব দিব্যজ্ঞান জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন নাই, যিনি হৃদয় মন্দিরে হৃদয় রাজ্যের একমাত্র রাজাধিরাজ অনন্ত প্রেমরসময় নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতির হৃদয় হরণ প্রকাশ নিত্য দর্শন করেন নাই, যিনি সেই অতুলনীয় প্রেম জ্যোতিঃতে সেই অরূপ রূপানলে পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি দান করেন নাই, তাহার কোন দর্শনই আজ পর্য্যন্ত সার্থক হয় নাই বুঝিতে হইবে, যিনি এই বিরাট্ বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে এবং প্রত্যেক জীবের আত্মারূপে অবস্থিত সেই অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং কে -সেই অনন্ত অরূপ-রূপ-সিন্ধু একমাত্র ব্রহ্মকে নিত্য দর্শন করেন না, আবার যিনি সেই একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মে সমুদায় জীব ও জগৎ অন্তর্গতভাবে নিত্য অবস্থিত নেহারেন নাই এবং যিনি গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া এইভাবে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপ ব্রহ্মের পরম রূপ নিত্য দরশন করেন না, তাহার এখনও অধিক বাকী আছে, জানিতে হইবে।

যিনি তৃষিত চাতক সম প্রেমসুধাপানের জন্য আকুলপ্রাণে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রতীক্ষার অসীম ক্লেশ ভোগ করেন নাই এবং পরিশেষে প্রেমামৃত প্লাবনে প্লাবিত হইয়া আকুল পিয়াসার পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই, যিনি অনন্ত রসাধার প্রেমরসময়ের সুমধুর মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারই প্রেমসুধাপানে বিভোর হইয়া জন্ম সার্থক করেন নাই, যিনি অনন্ত প্রেমময়ের একান্ত প্রেমে তাঁহাতেই আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে অনিমেষ লোচনে দর্শন করিয়া তাঁহারই সুধাপূর্ণ প্রেম গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে রসনাকে অপার তৃপ্তি দান করেন নাই, প্রেমামৃতসিন্ধুর অপূর্ব্ব প্রেমরস আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দাতিশয্যে তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণবধ্বনি উচ্চৈঃ-স্বরে উচ্চারিত হয় নাই, যাঁহার হৃদয় আকাশে সেই অতুলনীয় নিত্য নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ প্রেমচন্দ্র নিত্য প্রকাশিত থাকেন না এবং যিনি সেই পূর্ণ প্রেম সুধাকরের প্রেমসুধা চকোরবৎ নিত্য অবিচ্ছেদে পান করেন না, যিনি অতল প্রেম জলধিতে নিত্য সুবিনিমগ্ন থাকিয়া নিত্য প্রেম সুধা

পান করিতে করিতে গুরুগম্ভীর স্বরে "পূর্ণমমৃতম্", "পূর্ণমৃতম্" বলিতে থাকেন নাই, তাহার অন্য রসাস্বাদনে কি ফল ?

যিনি হৃদয়স্থিত অনন্ত প্রেমময়ের অপূর্ব্ব প্রেমসুধাগন্ধে অন্ধ হইয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায় সেই প্রেমের অফুরন্ত উৎসের অনুসন্ধানে ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়ান নাই, যিনি তাঁহার প্রেমগন্ধে আত্মহারা হইয়া "কই তুমি", "কই তুমি" বলিয়া বারংবার ভীমরব করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন নাই, যাঁহার সুস্ফুটিত হৃদয় পদ্মের অপূর্ব্ব সুধাগন্ধ প্রেম সমীরে বিকীর্ণ হইয়া নিজেকে এবং দশ দিক্ আমোদিত করিয়া তোলে নাই, যাঁহার সুমধুর প্রেমপূর্ণ জীবন গন্ধে আকুল হইয়া পরম ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত গভীর মিলনে মিলিত হইয়া মহাপ্রেমের হাট মিলান নাই, তাঁহার কোন আঘ্রাণই সফল হয় নাই।

অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমগুণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে যাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়সিন্ধু অফুরন্ত প্রেমরসময়ের প্রেমে উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে নাই, যিনি অনন্ত রসাধার প্রেমময়ের নামসুধা পানে চিরবিহ্বল হইয়া থাকেন নাই, যিনি অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন নাই, যিনি অনন্ত প্রীতির উৎস পরম কবির নিত্য প্রেম সঙ্গীত পীরিতির গাঁথা সাক্ষাৎভাবে শ্রবণ করিয়া করিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহাতেই নিত্য বাস করেন না, এবং যিনি তখন অবলীলাক্রমে হৃদয়, মন, প্রাণ, জীবন, জাতি, কুল, ধন, মান সমস্তই সেই একমাত্র প্রেমের পাত্রে চিরতরে সমর্পণ করেন নাই, কোন শ্রবণই তাঁহাকে পরিতৃপ্তি দান করিতে পারে নাই।

যিনি অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া ডুবিয়া প্রেমময়ের অপূর্ব্ব প্রেম ক্রোড়ে নিত্য আশ্রয় লাভ করেন নাই, যিনি অনন্ত স্নেহময় পরম-পিতার স্নেহালিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া আত্মহারা হইয়া থাকেন নাই এবং তাঁহারই অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্পর্শনে সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত ও প্রেমে বিগলিত হইয়া তাঁহাতে চির-মিলনে মিলিত হইয়া থাকেন নাই, তাঁহার স্পর্শসুখ নিশ্চয়ই সার্থক হয় নাই।

অতএব দেখা যায় যে সাধকেরও প্রেম সাধনার অত্যুচ্চাবস্থায় রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শরূপ সর্ব্ববিধ কামনা বাসনা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সাধকেরই যখন উক্তরূপ কামনাশূন্যা, ধারণাতীতা প্রেমময়ী অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে, তখন যিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমে নিত্য বিভূষিত, যিনি নিত্য প্রেমস্বরূপ অথবা অনন্ত প্রেমের একমাত্র উৎস, তাঁহাতে কামনার স্থান কোথায় ?

পরমর্ষি গুরুনাথ "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থে ধর্ম্মার্থীদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছেন ঃ—

"প্রেম কামনাতীত, সুতরাং একাসনে কোনও কাম্য বিষয়ের প্রার্থনার সহিত প্রেমের জন্য প্রার্থনা করিবে না।"

যখন সাধনার প্রারম্ভাবস্থায় উপাসনার বিধির মধ্যে এই মহান্ উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, তখন সাধক প্রথম হইতেই বুঝিতে থাকেন যে প্রেম কামনাতীত ও সেইভাবে হৃদয়কে গঠন করিতে থাকেন এবং অবশেষে প্রেম যে কিভাবে পরিণতি লাভ করে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, অথবা সেই অতুলনীয়া অবস্থার কণামাত্রও বর্ণিত হয় নাই।

পরমর্ষি গুরুনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন ঃ—

"কামই দোষাংশশূন্য হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। আকরে যে স্বর্ণপ্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে স্বর্ণেতর নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে, শীতল জলে ধৌত করিলে তৎসমুদায় দূরীভূত হয় না, কিন্তু প্রবল দহনে দগ্ধ করিলে এবং ঐ দাহ সময়ে উহাতে শ্যামিকানাশক পদার্থ বিশেষ সংযোগ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। যদি একবার দগ্ধ করিলে বিশুদ্ধ না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ ঐ রূপ দগ্ধ করা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ নিসর্গলব্ধ কামকেও শীতল জলবৎ আশু সুখকর ক্রিয়া বিশেষে প্রবর্ত্তিত করিলে উহা প্রেমাকারে পরিণত হয় না, প্রত্যুত উহাকে তত্ত্বজ্ঞান-দহনে দগ্ধ ও দাহ করিলে উহাতে পবিত্রতা, সরলতা প্রভৃতির

সংযোগ করিলেই উহা বিশুদ্ধ হইয়া প্রেম নামে ব্যাখ্যাত হয়। এই প্রেমই ঈশ্বর প্রেমের অঙ্কুর।"* (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)

যখন ঈশ্বর প্রেমের অঙ্কুরই সর্ব্ব প্রকার কাম বাসনা-বিবর্জ্জিত, তখন যিনি অনন্ত ও নিত্য প্রেমের একমাত্র আধার, যিনি অনন্ত জ্ঞান, পবিত্রতা, সরলতা প্রভৃতি অনন্তগুণে নিত্যই পরিপূর্ণ, যিনি নিত্য নিরাকার, নির্ব্বিকার ও অশরীরী, তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছা যে সম্পুর্ণ-রূপে কামনা শূন্যা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব এইভাবে আলোচনা করিয়াও দেখা গেল যে অনন্ত প্রেমময় ব্রহ্মে কোনও কামনা থাকিতে পারে না। তিনি তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন, কোনও কামনা দ্বারা বাধ্য হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন না।

একজন শ্রদ্ধেয় মায়াবাদী দার্শনিক পণ্ডিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া-ছেন যে জগতে দেখা যায় যে ইচ্ছার গতি আছে। যদি জীবাত্মার ইচ্ছাই থাকে, তবে বলিতে হইবে যে উহার গতি অন্তঃকরণে যায় এবং অন্তঃকরণ হইতে বহিরিন্দ্রিয়ে যায় ও শেষে দেহ হইতে বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মের ইচ্ছা থাকিলে উহারও অবশ্য গতি আছে বলিতে হইবে এবং তাঁহার হইতে উহা অবশ্যই বাহিরে যাইবে। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দেশ নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার গতি হইতে পারে না। যখন দেখা যায় যে ইচ্ছা হইলেই উহা ইচ্ছাকারী ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, তখন ব্রহ্মে কি প্রকারে ইচ্ছা থাকিতে পারে?

ইহার উত্তরে প্রথমেই আমাদের বলিতে হয় যে আমাদের অবস্থা দ্বারাই ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি সম্পুর্ণরূপে বুঝিতে গেলেই আমাদের ভ্রম অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত হইবে। অথচ জাগতিক দৃষ্টান্ত ভিন্ন সাধারণের পক্ষে বুঝিতে ও বুঝাইতে অন্য উপায় নাই। আবার সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের সম্পূর্ণ উপমাও সম্ভব হয় না। আমাদের আরও বুঝিতে হইবে যে আমাদের গুণ ও শক্তি তাঁহারই গুণ ও শক্তির আভাস মাত্র

---

* এই সম্পর্কে ইতঃপর লিখিত অংশ সমূহ বিশেষতঃ "মায়াবাদ" অংশ দ্রষ্টব্য। প্রেমই দেহসংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয় ও কাম রূপে পরিণত হয়। প্রেম আত্মার সরল গুণ, কিন্তু কাম জাতগুণ অর্থাৎ দেহ সংসর্গে জাত। উহা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। উহা হৃদয়েই জাত, বর্দ্ধিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। উদ্ধৃত অংশে যাহা লিখিত হইল, তাহা প্রেম সাধনার প্রণালী বিশেষ।

অথবা উহারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং বিকৃত। আমাদের গুণ ও শক্তি দেহ সংসর্গে আসিয়া কতকটা স্থুলভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি স্থুল ত নহেই, সূক্ষ্মও নহে। উহারা কারণাকারে তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান।* এই জন্যই তাঁহার গুণ ও শক্তির ধারণা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

ব্রহ্মে জীবভাবের কোনও ক্রিয়া নাই। তাঁহাতে তাঁহার ইচ্ছামাত্র বর্ত্তমান। তিনি নিত্য অশরীরী। তাঁহাতে ইচ্ছার উদয় হইলে তাঁহাতে কোনই আলোড়ন উপস্থিত হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ, তিনি নিত্যই অনন্ত ভাবে শান্ত ও চঞ্চলতা শূন্য। (শান্তং শিবমদ্বৈতম্)।

এই প্রশ্নের উৎপত্তির কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে ব্রহ্ম যেন একটি বৃত্তাকার পদার্থ, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার মধ্যবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার পরিধিতে গমন করে এবং সেই পরিধিও কেন অবশেষে অতিক্রান্ত হইবে না, ইহাই সমস্যা। ইহার মীমাংসার জন্য বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত। তাঁহার মধ্যবিন্দু, পরিধি বা বহির্ভাগ বলিয়া কিছু নাই। তাঁহাতে চতুর্দ্দিক বা দশদিক বলিয়াও কিছু নাই। তাঁহার ইচ্ছার উদয় হইলে সম্পূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মেই সেই ইচ্ছার উদয় হইবে এবং উহা বর্ত্তমান থাকিবে। তাঁহার কোন এক বিন্দুতে ইচ্ছার বর্ত্তমানতা থাকিবে, কিন্তু অন্যত্র থাকিবে না, ইহা হইতেই পারে না। কারণ, তিনি আমাদের ধারণীয় বিন্দুতেও পূর্ণ এবং অনন্তেও নিত্য পূর্ণ। অথবা তাঁহার সম্বন্ধে দেশ কালের প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার গতির প্রশ্নও উদয় হইতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহার অতীত বা বহির্ভূত কিছুই নাই।

দেখা যায় যে সাধকে যখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, তখন তিনি স্থির

* এই সম্বন্ধে "ইচ্ছা শক্তি" ও "মায়াবাদ" অংশদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান।

হন। এই স্থিরতার অবস্থায় তিনি প্রসন্ন, স্থির, স্বপ্রকাশ এবং চৈতন্যস্বভাব সম্পন্ন। শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। উক্ত অধ্যায়ের দ্বাবিংশ হইতে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠে* জানা যায় যে সাধক গুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতিক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদার জন্য অচঞ্চল অবস্থা লাভ করেন। সত্ত্বগুণের জন্যই বা উহার অতীত হইয়াই যদি সাধকই অচঞ্চল হইতে পারেন, তবে যিনি নিত্যই সেই সত্ত্বগুণের অতীত অথবা যাঁহাতে জড়ীয় সত্ত্বগুণ কখনও ছিল না বা নাই, সর্ব্বসাধকের নিত্য উপাস্য এবং সর্ব্বসাধকের গুণ ও শক্তিরাশির নিত্য উৎস, সেই পরব্রহ্মে যে অনন্ত শান্তি নিত্য বিরাজ করিতেছে এবং তাঁহাতে যে চঞ্চলতার লেশ মাত্রও নাই বা উদয় হইতেও পারে না, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পরে। পূর্ণে কখনই আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে না। যদি একটি পাত্র জল দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিয়া আবৃতভাবে রাখা যায়, তবে আর উহাতে কোনই আলোড়ন দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ অনন্ত ও পূর্ণ ব্রহ্মে কখনই আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে না।

যদি তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে ব্রহ্মে ইচ্ছার উদয় হইলে তাঁহাতে আলোড়ন হয়, তবুও ইহা চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে উহার গতি তাঁহাকেও অতিক্রম করিবে। তিনি অনন্ত এবং বিভু। তাঁহার অস্তিত্ব ভিন্ন কোন দেশ নাই। সুতরাং যে দেশে তাঁহার ইচ্ছার গতি যাউক্ না কেন, সেই দেশও তাঁহারই অন্তর্গত। সুতরাং উক্ত গতি কখনই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

অন্তঃকরণ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে এবং অন্যান্য স্থলে দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্তঃকরণের দুই অংশ। উহার এক অংশ আত্মিক ও অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। আমাদের ইচ্ছারও সকল সময় অন্তঃকরণ হইতে বহিঃপ্রকাশ হয় না। আমাদের এমন অনেক ইচ্ছার উদয় হয়, যাহার

---

* তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থের সৃষ্টি প্রকরণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আরও বিস্তারিত বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পাইবেন।

কোন কার্য্যই আমরা বাহিরে দেখিতে পাই না, হৃদয়েই উহারা উদয় হয় এবং হৃদয়েই বিলীন হয়। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছার উদয় হইলেও উহা তাঁহাতেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে। উহার গতিরও ব্রহ্মকে অতিক্রম করিবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আকাশ বা ব্যোমের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। ব্যোম সর্ব্বব্যাপী। ব্যোম নাই এমন দেশ নাই। ব্যোমের ক্রিয়া আছে।* যে সকল বৈজ্ঞানিকগণ Ether স্বীকার করেন, তাঁহারা উহার স্পন্দন বা ক্রিয়া আছে, ইহাও স্বীকার করেন। ব্যোমের ক্রিয়া উহাতেই উৎপন্ন হয় এবং উহাতেই নিবদ্ধ থাকে। কারণ ব্যোম ভিন্ন কোন জড় রাজ্য নাই। ব্যোমের ক্রিয়ার গতি বিশ্বের বাহিরে যায় না বা যাইতেও পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছাও তাঁহারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে, তাহাতে আপত্তির কোনই কারণ থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মে যদি তাঁহার ইচ্ছাজনিত আলোড়ন হয়, ইহা যদি একান্তই

*মহর্ষি কণাদ অভাব ভিন্ন যে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তম্মধ্যে দ্রব্য পদার্থই প্রথম। পরে তিনি দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া, ইহাও স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে কণাদের মতে আকাশের দ্রব্যত্ব জন্য ক্রিয়াও আছে। কিন্তু তদীয় দর্শনের (বৈশেষিক দর্শনের) ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে আকাশের কোন ক্রিয়া নাই। ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

টীকাকারেরা বা ব্যাখ্যাকারেরা আকাশে কোনও ক্রিয়া নাই মনে করিয়া দ্রব্যের লক্ষণও অন্যরূপ করিয়াছেন। যথা যে পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না অথবা যে পদার্থে দ্রব্যত্ব-জাতি থাকে, তাহাকে দ্রব্য পদার্থ কহে। কিন্তু অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ কিনা তাহা নির্ণয়ার্থে প্রবৃত্ত হইয়া, উহা কি জন্য দ্রব্য হইল, তাহার কারণ লিখিতে গিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তমস্তমালং বর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ কর্ম্মবত্ত্বাদ্ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ। অর্থাৎ অন্ধকার তমালবর্ণ বিশিষ্ট, উহা রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ গুণযুক্ত এবং উহা চলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বলিয়া ক্রিয়া-বিশিষ্ট। অতএব রূপবত্ত্ব (গুণবত্ত্ব) ও ক্রিয়াবত্ত্ব হেতু উহা দশম দ্রব্য। এখানে দেখা যায় যে গুণ বিশিষ্ট ও ক্রিয়া বিশিষ্টকে দ্রব্য কহে, এতদভিপ্রায়ে ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

স্বীকার করিতে হয়, তবুও বলিতে হইবে যে সেই আলোড়ন বা গতি ব্রহ্মকে অতিক্রম করে না বা করিতেও পারে না।

মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের জ্ঞানকে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহাকে তাঁহার গুণ বলিতে এবং জ্ঞানের ক্রিয়া আছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। "মায়াবাদ" অংশে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের জ্ঞান তাঁহার অনন্ত গুণের একটী গুণ। স্বরূপ ও গুণে কোনই পার্থক্য নাই। তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়াও আছে। ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্ত্রটী এই সম্পর্কে পাঠক দেখিতে পারেন। মায়াবাদিগণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রামাণ্যে বলিতে চাহেন যে মায়াবাদ উপনিষদ্ সম্মত। ইহা যে সত্য নহে, তাহাও উক্ত অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদেই আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মের জ্ঞানের ক্রিয়া আছে।* যদি তাহাই না হয়, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম অনন্তজ্ঞান বটেন, কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না। ইহা স্ববিরোধী উক্তি। অতএব ব্রহ্মে জ্ঞানও আছে এবং জ্ঞানের ক্রিয়াও আছে বলিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে সেই জ্ঞানের ক্রিয়াও যেমন তাঁহাতেই সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিতেছে না, সেইরূপ তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাও তাঁহাতেই উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহাতেই নিবদ্ধ থাকিতেছে। উহার গতি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বহির্গত হয় না

মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়। শক্তি থাকিলেই বাদীর মতে উহার গতি আছে। মায়াবাদ অনুযায়ী মায়ার শক্তির জন্যই জড়-জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। জড় জগৎ সত্য কি মিথ্যা, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। সত্য হইলে নিশ্চয়ই ইহা কোন এক বিশেষ শক্তির ফল বলিতে হইবে। মিথ্যা হইলেও মায়াই মিথ্যাকে সত্যভাবে প্রতীয়মান করাইতেছে। সুতরাং উহাও শক্তির কার্য্য, যেমন বাজীকর তাহার কৌশল দ্বারা এককে অন্য কিছু দেখান।

---

*বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।১০ মন্ত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন।

বাজীকরের ইচ্ছা ভিন্ন—শক্তি ভিন্ন উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে মায়াবাদ অনুযায়ী বিচার করিলেও ব্রহ্মে শক্তি আছে বটে, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাতে কোনই আলোড়ন নাই। অথবা যদি আলোড়ন কল্পনাও করা যায়, তবুও উহা তাঁহাতেই নিবদ্ধ থাকে। কারণ উক্তমতে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। মায়া যদি ব্রহ্মের শক্তি হইয়াও জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারে এবং সেইজন্য তাঁহাতে কোনও গতির সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি কেন সেই একই কার্য্য করিতে পারিবে না এবং সেই জন্য কেন তাঁহাতে গতির সৃষ্টি হইবে? উভয়ই যখন শক্তি, তখন একের পক্ষে গতির আবির্ভাব এবং অন্যের পক্ষে গতি শূন্যতা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে শক্তিমান ব্যতীত শক্তির বর্ত্তমানতা অসম্ভব। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারেনা যে মায়ার গতিশক্তি আছে, কিন্তু ব্রহ্মে সেই শক্তির কোনও গতি নাই।

বেদান্তদর্শনের (২।১।১০) "স্বপক্ষদোষাচ্চ" সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে দেখা যায় যে তিনি বলিয়াছেন যে প্রদর্শিত দোষ-নিচয় উভয় পক্ষে সমান জানিবে। যেহেতু সমান, সেই হেতু কোনও পক্ষ উক্ত দোষের অবতারণা করিতে পারেন না এবং পারেন না বলিয়াই তাহা অদোষ অর্থাৎ দোষ নহে। যে দোষ উভয় স্বীকার্য্য, সে দোষ দোষ নহে। (এতে দোষাঃ সাধারণত্বান্নান্যতরস্মিন্ পক্ষে চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্য দোষতামেবৈষাং দ্রঢ়য়তি অবশ্যা শ্রয়িতব্যত্বাৎ)।*

অতএব মায়াবাদীর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাজনিত সৃষ্টির জন্য তাঁহাতে কোনও গতি হইবে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমরা কিন্তু ইহা স্বীকার করিনা যে ব্রহ্মের ইচ্ছার উদয়ে তাঁহাতে কোনও প্রকারের আলোড়ন উপস্থিত হয়। আবার যদিই বা তর্কস্থলে ব্রহ্মে ইচ্ছা জনিত আলোড়ন স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তথাপিও সেই আলোড়ন ব্রহ্মেই অবশ্য নিবদ্ধ থাকিবে। অতএব যেভাবেই চিন্তা করা যাউক না কেন, ব্রহ্মে

*কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত বেদান্ত দর্শন। (৪৬ পৃঃ)

তাঁহার ইচ্ছার উদয়ে তাঁহার কোনও ত্রুটী লক্ষিত হয় না. সুতরাং তিনি তাঁহার অমেয় শক্তিসম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে।

ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আরও একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে উহা দ্বারা সৃষ্টি সংঘটিত বলিলে বলিতে হইবে যে তাঁহার বিকার হইয়াছে। বিকারের অর্থ পরিবর্ত্তন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সৃষ্টি ছিল না, সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল, সুতরাং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হইল। সুতরাং নূতন কিছু করিতে হইল। সুতরাং তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি (স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ—শ্বেত)। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানিতেন। (১।৪।১০)। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া ছিল ও আছে। আবার উক্ত উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে আছে যে আত্মা আত্মাকেই ভালবাসেন। সুতরাং তাঁহার প্রেম ক্রিয়াও ছিল ও আছে। ক্রিয়ার মূলে ইচ্ছা-শক্তি। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি স্বাভাবিকী। ইচ্ছাশক্তির স্বভাব কার্য্য করা। সুতরাং যাহার ইচ্ছা আছে, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই কার্য্য করেন। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্য করিলে তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সৃষ্টি বলিলে তাঁহার কোনও বিকার হইয়াছে বলা যায় না।

ব্রহ্ম অনন্ত Dynamic এবং অনন্ত Static এই দুইটী গুণের একত্বে তাঁহার একতম স্বরূপ বা গুণ। তিনি যদি একমাত্র Static হইতেন, তবে তাঁহাকে একমাত্র সত্য, ইহাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাঁহাতে যে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত গুণ বর্তমান, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা তাঁহাকে অনন্ত গুণনিধান, অনন্ত শক্তির আধার এবং অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তির অতীত বলিয়া মনে করি এবং ইহা যে সত্য, তাহা "মায়াবাদ" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার

শক্তি আছে, তাঁহার কার্য্যও আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তিনি কার্য্য করিলে তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ কিছুই হয় না।

আরও একটী বিষয় আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা এই যে বিশ্ব সর্ব্বদা অবিরাম কার্য্যে নিযুক্ত। এই সম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা নাই। সুতরাং আমরা বিশ্বে অসংখ্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এই পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাই এই পরিবর্ত্তনের মূলে। আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে জড় জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত গুণ এবং নিমিত্ত কারণ তাঁহার অপার শক্তিময়ী ইচ্ছা। আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ইচ্ছা শক্তি কার্য্য করিতেছে। এই সম্বন্ধে "কল্পবাদ" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ যে ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। আমরা জানি যে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটী শুষ্ক পত্রও ভূতলে পতিত হয় না। ইহা যখন সত্য, তখন এই বিশ্বব্যাপী অনন্ত প্রায় পরিবর্ত্তন যে তাঁহারই ইচ্ছা জনিত, ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথায় ? ইচ্ছা ও ক্রিয়া একই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং ক্রিয়া ব্রহ্মের স্বভাব। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

জীবে ও জগতে এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মে নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে জীবে এবং জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহাই হুবহু ব্রহ্মে বর্ত্তমান। উভয়দিগকে যাহা দেখিতেছি, তাহা বিকৃত, অতি বিকৃত ও চির বিকৃত। কিন্তু ব্রহ্মে যাহা কিছু, তাহা নিত্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত। যে কারণে জীবের জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশ পাতাল তফাৎ, সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির এবং জীব ও জগতের কার্য্যের মধ্যে অত্যধিক পার্থক্য। এই তত্ত্ব তাঁহার অন্যান্য গুণ ও শক্তি সম্বন্ধেও সত্য। যাহা আমরা বলিতে চাই, তাহা এই যে জীব ও জগতের গুণ, শক্তি ও কার্য্যের বিশ্লেষণ করিতে করিতে যখন আমরা অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় উপনীত

হইব, তখনই ব্রহ্মের গুণ, শক্তি ও কার্য্যের আভাস লাভ করিব। স্থূল, জীব ও জগতের বিকৃতি যদি সম্পূর্ণরূপে নিরসন করা যায়, তবে একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। যদি কেবলমাত্র তর্ক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি Realise করিতে চাহেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। তাঁহার গুণ ও শক্তি Realise করা সাধনা ও ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। সংযুক্তি ও ন্যায় বিচার দ্বারা তাঁহার গুণ ও শক্তির অস্তিত্ব আমরা সত্যভাবে অনুমান করিতে পারি। আভাস লাভ করিতে পারি। অতএব জীব ও জগতের গুণ, শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া আমরা ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য।

এই সম্পর্কে আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তাহা এই যে ব্রহ্মের যদি ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়, তবে আর তাঁহাকে কালাতীত বলা যায় না। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশেই সকল ঘটনা ঘটে এবং সেই সকল ঘটনার পারম্পর্য্য দ্বারা আমরা কালের নির্দ্দেশ করি। যথা—পৃথিবীর নিজ কক্ষে যে একবার ঘুর্ণন তাহাকে দিবস বলে। সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে একটী বৎসর হয়। এই জন্যই ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয়। ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা গেল যে দেশে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা আমরা কাল নির্ণয় করি। ইহা ভিন্ন কালের কোনও অস্তিত্ব নাই। উহা বুদ্ধি নির্ম্মাণ মাত্র।* কেহই অন্তঃকরণের ভাবের বা চিন্তার পরিবর্ত্তন দ্বারা কাল নির্ণয় করেন না। সুতরাং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ জন্য তাঁহাকে কালান্তর্গত করা যায় না। দেশ ও অন্তঃকরণের ভাব (space and thought) পরস্পর বিপরীত। দেখা গিয়াছে যে কালের মূলে দেশে সংঘটিত ঘটনা, কিন্তু হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তন নহে। সুতরাং ব্রহ্মে সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার উদয়ে কালের প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।

---

* Cultural Heritage of India (First edition) তে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আর কাল বলিয়া যখন কোন সত্য পদার্থ নাই, তখন ব্রহ্ম কিরূপে কালের অন্তর্গত হইবেন ? আমরা কাল ধারণা না করিয়া পারিনা, যদিও মূলতঃ দেশ ভিন্ন কালের কোনও অস্তিত্ব নাই। আমরা যখন কালকে ধারণা হইতে বাদ দিতে পারি না, তখন আমাদের নিকট কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা— ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। কিন্তু ব্রহ্মের নিকট সকল ঘটনাই নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার ভূত, ভবিষ্যৎ ভাবে কোনই কাল নাই। তাই তাঁহাকে কালাতীত বলা হয়। God's knowledge is Eternal Now

অতএব এইভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ জন্য তাঁহার কোনও ত্রুটী হয় না বা হইতেও পারে না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের সকল কার্য্যই বাধা-বাধকতা শূন্য। তিনি কখনও কিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া কোনও কার্য্য করেন না। তিনি তাঁহার অনন্ত গুণ ও শক্তির অতীত। কোন গুণ বা শক্তি তাঁহাকে বাধ্য করিয়া কিছু করাইতে পারে না। তাই তিনি জগৎ কার্য্যে চির নির্লিপ্ত।

পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই স্বীকার করিবেন। সেই আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে আবার বেদ সর্ব্বপ্রধান। আবার বেদান্ত বেদের সারভাগ বলিয়া কথিত হয়। সেই পূজনীয় বেদান্তশাস্ত্রই নানাস্থলে নানাভাবে বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে এক ব্রহ্মই সত্য এবং তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং শেষে তাঁহাতেই উহাকে লয় করিবেন। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশে উদ্ধৃত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রুতি মন্ত্র সমূহ দ্রষ্টব্য। বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন যে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যুগে যুগে মহাপুরুষগণও এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে পরমেশ্বরের ইচ্ছায়ই এই জগৎ সৃষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে তাঁহারই প্রেমলীলা মাত্র বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং শব্দ ও অনুমান (যুক্তি) প্রমাণ দ্বারা আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পরম ইচ্ছাময় পরমেশ্বরই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছায়ই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং সেই একই ইচ্ছায়ই উহা আবার লয়প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদত্ত হওয়া অসম্ভব। কারণ, সৃষ্টির প্রারম্ভিক ব্যাপার এক-মাত্র সৃষ্টি কর্ত্তারই প্রত্যক্ষীভূত। পরমোন্নত সাধকগণ অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতার দয়ায় উহারও সত্য এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান (অনুমান নহে) লাভ কবিতে পারেন। সুতরাং এক অর্থে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু আমাদের নিকট সেই সকল মহাপুরুষের উক্তি আপ্তবাক্য মধ্যে পরিগণিত।

আবার দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনই ঐ একই ভাবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, বেদান্ত আলোচনা করিলেও আমরা ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় লীলার্থ বিশ্ব সৃষ্ট, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

অতএব আমরা প্রমাণোপযোগী সমস্ত পন্থা অনুসরণ করিয়া এই সত্য সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্রহ্মের অপার শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পুষ্ট হইতেছে এবং পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

আমরা যদি পৃথিবী ও মানবের সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে বুঝিতে পারিব যে উহারা ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছে। ক্রম-বিকাশের অর্থই এই যে যাহার ক্রমবিকাশ হইতেছে, সে নিজেকে আবরণ মুক্ত করিয়া ক্রমশঃ উন্ননতর স্তরে যাইতেছে, যেন সে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে! উদ্দেশ্য ভিন্ন ক্রমবিকাশ কথার কথা মাত্র, উহার কোনও সত্য অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিজেদের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে যখনই আমরা ইচ্ছা করি এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, তখনই উহার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকে। জগতে কার্য্য আছে,

কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, এরূপ দেখা যায় না। আমাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা উহা কোথা হইতে লাভ করিলাম? উহাত সেই পরম ইচ্ছাময়ের অনন্ত ইচ্ছা-শক্তির কণামাত্র বই আর কিছুই নহে। মানব ব্রহ্মের অংশভাবে ভাসমান। সুতরাং সেই অনন্ত শক্তিমানের শক্তিও মানবের অংশভাবে বর্ত্তমান। মানবের প্রত্যেক কার্য্যের পশ্চাতে যখন উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, তখন ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে সৃষ্টিরূপ মহান্ কার্য্যের অন্তরালেও পরমপিতার অতি সুমহান্ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রেও দেখা যায় যে সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য ব্রহ্মে নিহিত রহিয়াছে। তাই তাঁহাকে "নিহিতার্থ" শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে।

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি (৪।১)

বঙ্গানুবাদ :—যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা শক্তি যোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন। (তত্ত্বভূষণ)

বেদান্তদর্শনের ২।১।৩৩ সূত্রে ("লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" এ) দেখা যায় যে ব্রহ্ম লীলার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামনা Plato এবং কোন কোন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন যে সৃষ্টির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ও তাহা মঙ্গলে পরিপূর্ণ। মনীষি Aristotle জগতের চারিটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—Material Cause (উপাদান কারণ) Formal cause (আকৃতি কারণ), Efficient cause (নিমিত্ত কারণ) and final cause (শেষ কারণ)। এই final cause এর অর্থই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিমিত্ত কারণ উপাদানের উপর কার্য্য করিয়া জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনই সৃষ্টির যে একটি উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেছেন। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে Plato এবং Aristotle উদ্দেশ্যের (Teleology-এর) উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

Darwin সাহেব Heredity, Struggle for existence and chance variation-এর উপর তাহার ক্রমবিকাশবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক Biologist গণ বলেন যে উক্ত তিনটী কারণেই এইরূপ জ্ঞান পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হইতে পারে না। কেহ কেহ Chance variation theory অস্বীকার করিয়াছেন। এই কার্য্যে অবশ্যই ব্রহ্মের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। নতুবা Evolution (ক্রমবিকাশ) উর্দ্ধগামী না হইয়া নিম্নগামী হইতে পারিত। অবশ্য তখন তার উহাকে ক্রমবিকাশ না বলিয়া ক্রম সংকোচন বলিতে পারা যাইত। "সপ্ত সমস্যা" অংশে ইহার আরও আলোচনা বর্ত্তমান। অতএব বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে।*

সৃষ্টি কার্য্যের যে একটী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। এখন সেই উদ্দেশ্যটী যে কি তাহা আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে তিনি বহু হইবেন অর্থাৎ তিনি প্রেমগুণ প্রভাবে বহুভাবে ভাসমান হইবেন। এই বিবংহয়িষা অর্থাৎ আপনাকে বহুভাবে ভাসমান করিবার ইচ্ছার অপর নাম স্বগুণ পরীচিক্ষিষা অর্থাৎ তাঁহার যে অনন্ত গুণ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কোনটীর কিরূপ শক্তি অর্থাৎ প্রেম প্রধান কি জ্ঞান প্রধান, কি অন্য কোনও গুণ প্রধান, ইহা পরীক্ষা করাই এই সৃষ্টি ব্যাপার। এ কারণ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই অনন্তগুণ অত্যল্প পরিমাণে এবং কেবল কোনও একটি গুণ অধিক পরিমাণে প্রদান করা হইয়াছে। যেমন কাহাকে প্রেম, কাহাকেও জ্ঞান ইত্যাদি অধিকরূপে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি অপক্ষপাতিতা নিবন্ধন গড়ে সকলকেই

* এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমরা Darwin প্রচারিত বা তদ্রূপ অন্য কোন ক্রমবিকাশবাদ স্বীকার করি না। তবে আমরাও স্বীকার করি যে ব্রহ্ম ক্রমোন্নত বহু প্রকারের বহু জাতীয় জীব (Species) ক্রমশঃ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সংমিশ্রনে বহু প্রকার শংকর জাতীয় জীবও উৎপন্ন হইয়াছে। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

তুল্য গুণ বিশিষ্ট করিয়াছেন। ঐরূপ গুণসম্পন্ন জীবাত্মার মধ্যে কে কিরূপে তাঁহাতে তন্ময় * হইতে পারেন, ইহাই পরীক্ষা এবং এই জন্যই সৃষ্টি।

বিবংহয়িষা ও স্বগুণ পরীচিক্ষিষা ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশক হইলেও প্রকৃতপক্ষে যে উভয়ের অভিধেয় এক, তাহা এখন লিখিত হইতেছে। অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ প্রেমময় পরমপিতা প্রেমলীলার্থ নিজ-গুণে নিজেকে দেহ যোগে বহুভাবে ভাসমান করিলেন। দেহের আবরণ ব্যতীত তাঁহার বহু হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি নিত্যই এক এবং অখণ্ড। তিনি কখনও খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু হইতে পারিতেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য অখণ্ডত্ব স্বরূপ রক্ষা পাইত না। তাই তাঁহার অখণ্ডত্ব রক্ষা করিয়া বহু হইতে হইয়াছে। এই বিপরীত কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের উপাদানত্বে তাঁহার অসীম শক্তি-শালিনী ইচ্ছা দ্বারা তিনি জড় জগৎ ও তাহা হইতে অসংখ্য দেহ রচনা করিয়াছেন। এই দেহই আত্মার আবরণ স্বরূপ হইয়াছে এবং ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই দেহ যোগে অখণ্ড থাকিয়াও বহুভাবে ভাসমান হইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিররণ আমরা ইতঃপর বহুস্থলে দেখিতে পাইব।

প্রেমের ধর্ম্ম প্রেমের পাত্রকে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান। সুতরাং অনন্ত প্রেমময় বহুর প্রত্যেককে আত্মদান করিবেন। পরমপিতার পক্ষে আত্মদানের অর্থ কি? উহার অর্থ ইহা হইতে পারে না যে তিনি আপনাকে অন্যকে দান করিয়া নিজে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন, অথবা তিনি সম্পূর্ণরূপে গুণ ও শক্তিশূন্য হইবেন, যেমন রাজা হরিশচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এবং দক্ষিণা দান করিয়া শেষ-কালে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী এবং অতুলনীয় স্নেহের ধন, নয়নের মণি একমাত্র পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হীন বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত একত্বের একত্বে বিভূষিত। তাঁহার অনন্ত গুণরাশির ক্ষয় নাই। সুতরাং তাঁহাতে উপরোক্ত

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ "গুণ বিধান" অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাবের কোনও অবস্থায়ই উপস্থিত হইবে না বা হইতেও পারে না। যাহা হইবে, তাহা এই যে তিনি প্রত্যেক জীবকেই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণত্বের দিকে ধাবমান করিবেন। তাহাতেই তাহারা তাঁহারই অনন্ত প্রেমের বিধানে আবরণরাশি হইতে ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইয়া পরমপিতার গুণ-রাশিতে একত্ব লাভ করিবেন। এই আবরণ উন্মোচন ও একত্বলাভ অনন্ত প্রায় কাল চলিবে। অবশেষে মহাপ্রলয়ে তিনি ক্রমশঃ প্রত্যেককে পূর্ণামুক্তি দান করিবেন অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেককে তিনি দান করিবেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা। তিনি (জীবাত্মা) ত্রিবিধ দেহের আবরণে আবদ্ধ বলিয়া পূর্ণত্ব বা স্ব স্বরূপ বিস্মৃত। এই আবরণরাশির ক্রমোন্মোচন করিয়া অনন্ত গুণের পূর্ণ বিকাশকেই অনন্ত প্রেমময় পিতার আত্মদান শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং জীবের পূর্ণামুক্তি বা সর্ব্বদেহ মুক্তিতেই আত্মদানও সম্পূর্ণ হইবে। কারণ, তখন আর আবরণের লেশমাত্রও থাকিবে না, পৃথক্ ভাবের ভাসমানত্বের শেষ হইবে এবং আত্মা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ লাভ করিবেন অর্থাৎ জীবত্বের সম্পূর্ণ শেষ হইবে। ইতঃপর লিখিত যন্ত্রের দৃষ্টান্ত এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। এই আবরণ উন্মোচনের শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে।

আবার যদি অন্যভাবে চিন্তা করা যায়, অর্থাৎ যদি স্বগুণ পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি, ইহা মনে করা যায়, তবে ব্রহ্মের অনন্তগুণ পরীক্ষার জন্যই তাঁহাকে অনন্তভাবে ভাসমান হইতে হইবে। নতুবা তিনি একমাত্র থাকিলে তাঁহার গুণরাশির কোনই পরীক্ষা সম্ভব নহে * কারণ, তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্তগুণে অনন্তভাবে নিত্যই পরিপূর্ণ। পূর্ণে কখনও কোনও পরীক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার গুণরাশির পরীক্ষা অসম্ভব। তাই তিনি প্রেমে আপনাকে বহু ভাবে সুতরাং অপূর্ণভাবে ভাসমান করিয়াছেন। এই অপূর্ণতার কারণ আমাদের জড়জাত

---

* ব্রহ্ম নিত্যই এক ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। সৃষ্টিকালে তিনি বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। "একমাত্র থাকিলে" বলায় বুঝিতে হইবে যে "তিনি যদি বহুভাবে ভাসমান না হইতেন।"

নানাবিধ অসংখ্য দেহ। এই সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। এই দেহ যোগেই তিনি বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই দেহ একটী, তুইটী বা তিনটী নহে, কিন্তু প্রত্যেক জীবের পক্ষেই উহা অসংখ্য। এই দেহই আমাদের আত্মার আবরণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। অনন্ত গুণনিধান ও অনন্ত গুণাতীত পরমপিতার উপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা এই আবরণরাশি ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে হইতে পূর্ণামুক্তি লাভ করাই জীব জীবনের উদ্দেশ্য—এই আবরণ উন্মোচনের শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা সম্পন্ন হইবে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে বিবংহয়িষা এবং স্বগুণ পরীচিক্ষিষা উভয়েরই উদ্দেশ্য একই, কখনই ভিন্ন নহে। অর্থাৎ প্রেমগুণে বহু হওয়ার উদ্দেশ্য সেই বহুকে আত্মদান অথবা সেই বহুর প্রত্যেকের পক্ষে ব্রহ্মের সেই অপূর্ব্বা, অতুলনীয়া ও অবর্ণনীয়া অবস্থা লাভ করা অসংখ্য পরীক্ষা সাপেক্ষ। আবার স্বগুণ পরীচিক্ষিষা ফলবতী করিতে তাঁহার নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিতে হইয়াছে। এককে—একমাত্র অখণ্ড নিরাকার পরব্রহ্মকে বহুভাবে ভাসমান করিতে হইলেই আবরণ অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি জড় জগৎ ও তাহা হইতে অসংখ্য দেহ সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ এবং পরম্পরাভাবে বহু হইলেন।* আবার এই আবরণ না হইলে পরীক্ষা অসম্ভব। সুতরাং বহু হইতে হইলেও পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী এবং স্বগুণ পরীক্ষারূপ কার্য্য সাধনার্থও নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করা অবশ্যম্ভাবী এবং উভয় প্রকার কার্য্যের অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান হওয়া ও স্বগুণ পরীক্ষারূপ উভয়বিধ কার্য্যের উদ্দেশ্যই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা। অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনে এক, একে তিন।

---

* জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ ভাবে ভাসমান অর্থাৎ পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় দেহজাত দোষ পাশ বন্ধাবস্থায় অপূর্ণ ভাবে ভাসমান। জড় জগৎ তাঁহার একতম স্বরূপ অব্যক্তের পরিণামে সৃষ্ট, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং Practically অব্যক্তই জড় জগৎ রূপে ভাসমান মাত্র। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। এই বিষয়টী কঠিন। এই তত্ত্ব জগতে কখনও প্রচারিত হয় নাই। পরমর্ষি গুরুনাথই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থে উহার উল্লেখ করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই ভাব বর্ত্তমান। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ সেই ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তাই এই তত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত উপনিষদে নিম্নলিখিত মন্ত্র বর্ত্তমান।

১) সোহকাময়ত। (২) অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। (৩) স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। (২।৬) প্রশ্নোপনিষদেও ঐরূপ উক্তি আছে।

বঙ্গানুবাদ :—(১) তিনি (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন। (২) আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। (৩) তিনি তপঃ করিলেন অর্থাৎ আত্মগুণ সমূহের কোনটীর ঐশ্বর্য্য অধিক, ইহা ইচ্ছা করিলেন। এই যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় তিনি পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছা করিয়াই সৃষ্টি করিলেন

তপ্ ধাতুর যে ঐশ্বর্য্যার্থ আছে, তাহার প্রমাণ পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তপ ঐশ্বর্য্যে বা। বৃতু বরণে ইতি পাণিনিঃ।
অয়ং ধাতুরৈশ্বর্য্যে বা তঙ্শ্যনৌ লভতে।
অন্যদা তু শব্বিকরণঃ পরস্মৈপদীত্যর্থঃ।
কেচিত্তু বা গ্রহণং বৃতুধাতোরাত্মবয়বামিচ্ছন্তি।

ইতি ভট্টোজি দীক্ষিতঃ।

অর্থাৎ পাণিনির গণপাঠে লিখিত আছে যে "তপ ঐশ্বর্য্যে বা বৃতু বরণে"। ইহার অর্থ পরবর্ত্তিগণ দুই প্রকারে করেন। দৃষ্ট হইবে যে উভয় প্রকারেই দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী তপ্ ধাতুর ঐশ্বর্য্যার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকার এই—এই ধাতু ঐশ্বর্য্যার্থে বিকল্পে তঙ্শ্যন্ লাভ করে।

তঙ্—আত্মনেপদ। অন্য সময়ে শপ্ বিকরণ ও পরস্মৈপদ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই—

কেহ কেহ কিন্তু বৃতু বা গ্রহণ বৃতু ধাতুর আদি অবয়র (অর্থাৎ বৃতু ধাতু) ইচ্ছা করেন।

তেষাং মতে ঐশ্বর্য্যে তপ্যতে ইতোব প্রয়োগো ন তু তপতীতি। ইতি তত্ত্ববোধিনী।

অর্থাৎ তাহাদিগের মতে ঐশ্বর্য্যে অর্থে "তপ্যতে" এই প্রকারই প্রয়োগ হয়, কিন্তু তপতি এ প্রকার হয় না। আর পূর্ব্বমতে "তপ্যতে" ও তপতি উভয় প্রকারই হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি মন্ত্রের তিনটী অংশ। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ নির্দ্দেশ করিতেছে যে পরব্রহ্ম নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রেমই সৃষ্টি করে। সুতরাং আম : এস্থলে তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দেখিতে পাই। তৃতীয় অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি উক্ত কার্য্য দ্বারাই তাঁহার গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। সুতরাং জ্ঞানের কার্য্যও এই উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে দেখিতে পাই। "সোহকাময়ত" বাক্য দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা যে সৃষ্টির মূলে তাহাও আমরা দেখিতে পাই। অতএব ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাহা শ্রুতি সম্মতও বটে। "ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা" সৃষ্টিলীলা গ্রন্থের মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সকল সমস্যার সুসমাধান সহজ লভ্য হয় অনন্ত দয়ার আধার পরম পিতঃ! তুমিইত একাধারে নিত্য সত্য. নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেম। তোমার দিব্যজ্ঞানে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া আছে। দয়াময় পিতঃ! তোমার নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদের হৃদয় তোমারই দিব্যজ্ঞানে উজ্জ্বল কর। আমরা সেই আলোকে সৃষ্টির সমস্যা সমূহের সত্য মীমাংসা লাভ করিয়া তোমারি কৃপায় ধন্য হই এবং তোমাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে প্রেমে ব্রহ্মের বহুভাবে ভাসমান

হওয়া, তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা এবং প্রেমময়ী লীলা একই। প্রথম তত্ত্ব পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। প্রশ্নোক্ত তত্ত্ব দ্বিতীয়। এই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি। অনন্ত প্রেমময়ের সুমহতী লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধেও ইতঃপর কিঞ্চিৎ লিখিত হইবে। সমগ্র গ্রন্থই এই তত্ত্বসমূহের আলোচনা মাত্র। সুতরাং সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে উহাদের আলোচনা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব। পাঠকগণের নিকট পূর্ব্বেও নিবেদন করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি যে আমি এই বিরাট ব্যাপার সংসাধন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ইচ্ছা হয় যে কৃপা কল্পতরু শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনন্ত নিত্য ও পূর্ণ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণানিধান পরব্রহ্মের প্রেমময়ী লীলার অপূর্ব্ব অনন্ত মহিমা জগতের নরনারীর হৃদয় দ্বারে সুকীর্ত্তন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। কিন্তু আমার সেই গুণ ও শক্তি কোথায়? আমি যে সর্ব্বভাবেই নিতান্ত দীনহীন। আমি কেমন করিয়া এই সুদুস্তর সাগর পার হইব? "সম্মুখেতে পথ, যেতে মনোরথ, কিন্তু বাঁধা যে রয়েছে চরণ"। ইহা যে আমার পক্ষে বামন হইয়া চন্দ্রে হস্তক্ষেপ করিবার ন্যায় নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। পাঠক আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, ইহাই তাহার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। নিশ্চিতই আমার ইহা অপরাধ যে আমার বর্ত্তমান নিতান্ত অনুপযুক্ত অবস্থায় এই সুদুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর অনন্ত ক্ষমাশীল, কল্যাণদাতা অনন্ত স্নেহময় পিতা আমার সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুণ, যাহাতে আমি তাঁহারই অমোঘ আশীর্ব্বাদে তাঁহারই দয়ায় যেন আমার হৃদয়ের সকল সদাকাঙ্ক্ষা এবার এ জীবনে পূর্ণ হয়, যেন এই গ্রন্থ সত্য তত্ত্ব সমূহে পরিপূর্ণ থাকে। যেন তাঁহারই সত্য তত্ত্ব সমূহ তাঁহারই দয়ায় আমার হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং তাঁহারই দয়ায় যেন সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে জগতের নর-নারী সমক্ষে তাঁহারই সেই অমূল্য তত্ত্ব-রত্নরাজি

উপস্থিত করিতে পারি, তাঁহারই অপার দয়ায় যেন এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বরাশি সকলের পক্ষে সহজ বোধ্য হয়। তাঁহার দয়ায়ই অসম্ভব সম্ভব হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, বধির শ্রবণ করে, মূক বক্তা হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে.

"তোমারি করুণায় নাথ সকলই হইতে পারে,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।"

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণ অংশ ভাবে সকলের মধ্যেই ভাসমান। কিন্তু কোনও একটী গুণ এক এক জনে অধিক পরিমানে প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি এইরূপ ভাবে গুণ বিধান দ্বারা জগতে বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ জগতে বিচিত্রতা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তাঁহার গুণরাশির পরীক্ষা হইতেছে। জগতে বিচিত্রতার মূলে যে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন গুণের, বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ. তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কারণ, আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে কেহ জ্ঞানের পক্ষপাতী, কেহ প্রেমের পক্ষপাতী, কেহ একাগ্রতার পক্ষপাতী, কেহ সরলতার পক্ষপাতী ইত্যাদি। আবার নানা জনে সজ্ঞানে অজ্ঞানে নানা গুণের সাধকভাবে নানা পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। একটু গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এক একজন যেন এক একটী গুণ দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত। যাহারা জ্ঞান-পন্থাবলম্বী সাধক অর্থাৎ জ্ঞানকেই যাহারা একমাত্র মুক্তির পথ মনে করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রেম পন্থাবলম্বীদিগকে বিদ্রূপ করেন এবং প্রেমের পথ অবলম্বনীয়ই নহে বলিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের ন্যায় প্রেম গুণও যে আছে অর্থাৎ তিনিই যে একাধারে জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ ইহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা প্রেমকে তটস্থ লক্ষণ মাত্রই বলিয়া থাকেন। আবার এমনও মহাপ্রেমিক সাধকও দেখা যায়, যিনি জ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না। জ্ঞানকে তাঁহারা শুষ্ক তর্কের বিচার মাত্র

বলিয়া থাকেন, এমন কি তাহারা জ্ঞানকে প্রেম সাধনার বিরোধী বলিয়া থাকেন। *

কেহ কেহ দয়ার পন্থা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তাহারা পরোপকারই একমাত্র মহাব্রত বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমানে যাহারা দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন, রোগীদিগের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন এবং আর্ত্ত ও দুস্থদিগকে নানাভাবে সাহায্য দান করেন, তাহারা দয়ামার্গাবলম্বী। কেহ কেহ একাগ্রতাকেই পরম ধন মনে করেন এবং তাহা লাভ করিবার জন্য নানাবিধ সাধন করেন। আবার কেহ কেহ পবিত্রতাকে পরমবস্তু মনে করিয়া সুনীতির একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাধন ভজন দ্বারা নিজেকে সর্ব্বদা সুপবিত্র রাখিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ সত্যই একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করেন। আবার অন্য জন সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া পরমপিতার উদ্দেশ্যে সাধন ভজন করেন। শ্রেয়ঃ সাধক বলেন "তূর্ণং গৃহাদ্ গম্যতাম্" অর্থাৎ শীঘ্রই গৃহ হইতে বাহির হও। আবার প্রেয়ঃ সাধক বলেন "গৃহ হইতে নির্গত হইয়া কি ফল লাভ হইবে? যখন যেখানে থাকিব, তখন তাহাই গৃহস্বরূপ হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইবে, অতএব ঘরে বসিয়াই কার্য্য করি।" আরও তিনি বলেন, "যখন গৃহের কর্ত্রীকে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবারও এক্ষণে সামর্থ্য নাই, তখন সেই কর্ত্রীর সন্তানদিগকে বাহিরে পাইয়া তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে যেমন যথা সময়ে তিনিও আমাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইবেন, তদ্রূপ জগদীশ্বরের পুত্র কন্যাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিলে সেই পরাৎপর প্রেমময় জগদীশ্বর অবশ্যই আমাকে দর্শন দিবেন।"** কেহ কেহ সরলতার পথ অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ

* এই সম্পর্কে "জ্ঞান ও ভক্তির" বিরোধ অংশ দ্রষ্টব্য।

** তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা—১৭

বা বুদ্ধির অপব্যবহার করিয়া কুটিল-বক্র পথই কাম্য মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী তাহার কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ শান্ত নিরাবিল জীবন যাত্রাই কামনা করেন, আবার কেহ কেহ নানারূপ ব্যস্ততা, গোলমালের ভিতর দিয়াই চলিতেছেন, যেন কিছু একটা বিপরীত ঘটনা না ঘটিলে তাহার দিন ভাল যায় না, তাহাতেই যেন তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অর্থাৎ কাহারও শান্তভাবে আনন্দ, আবার কাহারও ভীষণভাবে আনন্দ। কেহ কেহ Work is Worship অর্থাৎ কর্ম্মই শ্রীভগবানের পূজা বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্ম-যোগ অবলম্বন করেন, আবার কেহ বা ভক্তিযোগ, কেহ বা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে নিজ নিজ জীবনের গতি নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা তমো-মার্গাবলম্বী, কেহ বা রজোমার্গাবলম্বী, আবার কেহ বা সত্ত্বগুণই সর্ব্ব প্রধান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা অত্যন্ত দুর্ব্বল-হৃদয় এবং সর্ব্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, আবার কেহ কেহ সাহসের এবং সময় সময় দুঃসাহসের উপর নির্ভরশীল। কাহারও মধ্যে ইচ্ছাশক্তি যেন লয়প্রাপ্ত। তিনি যেন পাপ ও দোষকে মুষ্ট্যাঘাতে দূরে রাখিতে পারেন না, আবার কেহ যেন ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সকল জয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সংসারে বিচরণ করেন। বিদ্যালয়েও দেখা যায় যে কেহ সাহিত্য, কেহ গণিত, কেহ বিজ্ঞান, কেহ দর্শন শাস্ত্রের পক্ষপাতী। আবার ঐসকল বিদ্যারও কত বিভাগ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পছন্দ করেন। সংসারে দেখা যায় যে নানা ব্যক্তি নানা কর্ম্ম পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবনাতিপাত করিতেছেন। এইরূপ শত সহস্র ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে যে এক এক জন এক একটি গুণকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া পথ চলিতেছেন। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ", "No two men fully agree" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা এবং আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা বহুভাবে এক হইলেও আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকেই সকলের সঙ্গে মিল রাখিয়াও এক একটি বিশেষ পন্থা ধরিয়াই জীবন পথে অগ্রসর হইতেছেন। যমজ ভ্রাতা

বা ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যেও সম্পূর্ণ মিল থাকে না। একই গুরুদেবের দুইটি প্রিয়তম সাক্ষাৎ শিষ্যের সাধনার পন্থাই যে কেবল বিভিন্ন থাকে, তাহা নহে, কিন্তু সময় সময় মতেরও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জীবাত্মা মাত্রেরই সকল গুণ থাকিলেও তাহাদের প্রথম অবস্থায় এক একটী গুণের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার জন্যই জনে জনে এত পার্থক্য। সাধনায় অগ্রসর হইলে যাহা হয়, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে জন্মাবধি এক একটী বিশেষ গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। এইরূপে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বিকাশ যে দেহের গঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা গুণবিধান অংশে সবিস্তারে নিবেদিত হইবে। এই স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে কাহারও দেহ অন্য কাহারও দেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে না, এমনকি যমজ ভ্রাতা বা ভগ্নীদ্বয়ের শরীর অবিকল একরূপ নহে। "No two clocks can go together" বাক্যটিও এস্থলে উপমা-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী গুণের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। অন্যান্য গুণেরও বিকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পতর। এখন আমরা গুণের পরীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। সাধক মাত্রই জানেন যে এক একটীর গুণ সাধনার পথে কতই পরীক্ষা উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে কতই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয়। সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন এবং কাহারও কাহারও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে যে শত চেষ্টায়, শত আকুল প্রার্থনায়ও যেন গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। কত সাধকের কত হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি আকাশে বাতাসে উত্থিত হইতেছে, তথাপিও তিনি যেন কুল পাইতেছেন না, তথাপিও তিনি যেন সাধনীয় গুণ বা শক্তি লাভে সিদ্ধ হইতেছেন না।

এক অর্থে আমরা সকলেই সাধক। সকলেই আমরা অনন্ত

করুণাময়ের করুণায় তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছি, যদিও আমরা সকলে জানিতেছি না যে আমরা কোন প্রকার সাধনা করিতেছি। আমরা যদি নিজেদের জীবন বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে কত অধিক পরীক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং কখনও কখনও তাহা হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আবার কখনও কখনও অকৃতকার্য্যও হইয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমাদের জীবন সংগ্রামে পরিপূর্ণ। এস্থলে পরীক্ষার আগুনে বহুবার দগ্ধ হইতে হয়, এস্থলে পরীক্ষার কঠিন আঘাত সহ্য করিতে হয়, এস্থলে বারংবার পতনের নির্ম্মম যাতনা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়, এস্থলে লজ্জা, অপমান, দুঃখ, জ্বালা বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ধন্য অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধান যাহাতে এই সকল দুঃখ দৈন্য একমাত্র মহামঙ্গলেই পরিণত হয়।

সাধারণতঃ পার্থিব কার্য্য সমাধা করিতেও আমাদের পরীক্ষায় পতিত হইতে হয় এবং তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে অত্যধিক বেগ পাইতে হয়। এখন আধ্যাত্মিক গুণ সাধনায়ও যে পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যাঁহারা প্রেমগুণ সাধনা করেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের পথে বহু বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগকে সময় সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, লজ্জা, অপমান ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যদি তাঁহার প্রেমগুণ প্রবল হয়, তবে পরিশেষে তিনি জয় লাভ করেন। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

"প্রেমপুরে পশিবারে চাহিছ অবল মন,
সে পুরে গমন, আদি অন্ত-সুখের সদন।

মধ্যে তার বধ্য হয় জন, কিম্বা দগ্ধ অনুক্ষণ,
শুনি তার বিবরণ যে হয় কর বিধ্বন।
মুখ ভাগে সুখ তার, পরে পথ দুঃখাগার,
কণ্টকিত প্রায় তার, পরে বহু দূর—
পরে সংশয় শেখর, শিখর তার উচ্চতর,

অতিক্রম করা ভার, বলহীন যেই জন।
যার আছে একাগ্রতা, করুণরস, মমতা,
অভিমান বিহীনতা, নিঃস্বার্থতা আর—
পশিতে পারে যে তথা, ঘুচে তার মনোব্যথা
দেখে অপরূপ যেই বিবেকাঞ্জন লোচন।”

এস্থলে পরমর্ষি গুরুনাথের অন্য একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে যে সকল প্রকার সাধনায়ই পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। প্রেম সাধনায়ও যে সুকঠিন পরীক্ষা বর্ত্তমান, তাহাও তিনি এস্থলে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

“যদি সুখ চাহ মনঃ, বহ আগে দুঃখ ভার।
নতুবা সে সুখ-কণা মিলিবেনা জেনো সার।

যদি কমল তুলিতে বাসনা করহ চিতে,
প্রস্তুত হও কণ্টক জ্বালা, যাহে সহিবারে পার
রত্নাকর-রত্নচয় যদি পাইতে আশয়,
ত্যজ যাদোগণ ভয়, লবণ বারির আর।
প্রণয় পয়োধি জলে চাহ ডুবতে কুতূহলে
ভাবনা তরঙ্গ তালে, অতি দুরগম—
সদা বিরহ সমীরে, তনু তরী মগ্ন করে
ইহা সহিতে যে পারে প্রেম সুখ ঘটে তার।
শিরোমণি ফণিনীর চাহ যদি হও ধীর,
বিকট দংশন তার অতি জ্বালাময়—
যদি সে জ্বালা সহিতে পার তুমি কোন মতে,
তাহ'লে পার পাইতে, সে মণি কত সুন্দর।
ভুবনের সার ধন চাহ যদি ধর্ম্মধন,
যাহার প্রভাবে হয় মুকতি নিশ্চয়—
কামিনী কাঞ্চনে রতি ত্যজি শুদ্ধ কর মতি,
বালিকা ভাব যুবতি স্মর সে পরমেশ্বর।”

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

প্রেমগুণ প্রবল থাকিলে সাধনার পথে আগত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন সুদূরে সংস্থাপন করিতে পারা যায়। দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাইর উদ্ধার কাহিনী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেমের পথের ভীষণ পরীক্ষা হইতেও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রকৃত প্রেমিক প্রবর নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন —

"মেরেছিস্ কলসীর কানা
তাই ব'লে কি প্রেম দিব না ?"

অবশেষে নিত্যানন্দের প্রেমের জয়ই হইল। মহাপাপী জগাই মাধাইর শুভ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। জগাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিল ঃ—

"নিতাইরে আর মারিস না মাধা ভাই,
মার খেয়ে যে প্রেম যাচে, এমন প্রেমিক দেখি নাই।"

"ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে উদ্ধৃত সঙ্গীতদ্বয় পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ভগবৎ প্রেমের সর্ব্বত্র জয় হয় এবং পাষণ্ডও বহুকালের কুকার্য্য চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া পরমপিতার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সঙ্গীত ভাব সঙ্গীত নহে। উহার তত্ত্ব পৃথিবীতে বহুস্থলে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রেম সাধনার পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা, তাহা কে নির্ণয় করিবে ? তাই যাহার প্রেমগুণ প্রবল না থাকে, যাহার নিঃস্বার্থতা, অভিমান বিহীনতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ না থাকে, তাহার পক্ষে প্রেমগুণ সাধনা সুকঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তাহার প্রেম সাধনার পথের বিঘ্নরাশি দূরীকরণের জন্যে উক্ত গুণ সমূহের একান্ত প্রয়োজন।

জ্ঞান সাধনার সম্বন্ধে কি বলিব ? ইহার পথে পরীক্ষার বোধ হয় শেষ নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতাই জ্ঞান সাধনার শেষ, অনন্ত মুক্তি ও শেষ বা পূর্ণামুক্তি।

"প্রেমভক্তি রেকাগ্রত্বং সরলতা পবিত্রতা।
বিশ্বাসশ্চেতি ষড়্জ্ঞেয়া গুণাঃ পরম সংজ্ঞকাঃ ॥

"জ্ঞানান্মোক্ষো" বাচ্যমেতদ্ বহূক্তং সাধুসত্তমৈঃ।
তজজ্ঞানঞ্চ ফলং জ্ঞেয়ং ষন্নামেষাং মনোরমম্॥"

(সত্যামৃত)

বঙ্গানুবাদ ঃ—"প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা এবং বিশ্বাস" এই ছয়টী পরম গুণ। "জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়" ইহা উত্তম সাধুগণ বলেন। এই ছয়টি পরমগুণের মনোরম ফলই সেই জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ উক্ত ছয়টী পরম গুণ সাধিত হইলে উহার ফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং উহা যে কত উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরমর্ষি গুরুনাথ সুখ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ -

"আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যতেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বর্ত্তমান থাকিলেও জড়াত্মবোধ-নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখলাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

অপর, সূর্য্য নিরন্তর বিদ্যমান থাকিলেও, পৃথিবী স্বকীয় আবর্ত্তমান দ্বারা আপনার অংশকে সূর্য্যকিরণ লাভে বঞ্চিত করে, তথায় সূর্য্যো-কিরণোদ্ভাসিত সুবিমল চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া, যেমন ঐ অংশকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব সময়েও প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল গুণ নিচয় দ্বারা মানবগণ সুখী হইতে পারে।"

(তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)

এই উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধেও উপোরক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্থান অতি উচ্চে। সুতরাং উহার সাধনার পথে পরীক্ষাও অসংখ্য এবং সুকঠিন। "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না মহীতে।" যাহাতে অত্যন্ত সুখলাভ হয়, তাহার মূল্যও অধিক। তাহা লাভ

করিতে সেইরূপ অধিকতর ও কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয় সুতরাং অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

অপরদিকে অতি নিম্নস্তরের অপরা বিদ্যা লাভেও যে কত পরীক্ষা, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা-গুরুর, জ্ঞানী, ভক্ত, মহাজনদিগের এবং দীক্ষাগুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রকৃতির গ্রন্থ হইতে যে আমরা অসীম জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা ইতঃপর লিখিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যে আজ তাহাদের জ্ঞানের পরিচয় দিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাহার মূলেও প্রকৃতির শিক্ষাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সম্বল। পরমর্ষি গুরুনাথ প্রকৃতির জ্ঞানকে দীক্ষারূপ জন্মের মাতা বলিয়াছেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে প্রকৃতিগ্রন্থ হইতে আমরা পরা ও অপরা উভয় বিদ্যাই লাভ করিতে পারি। অনন্ত জ্ঞানের একমাত্র নিত্য আধার পরম পিতা তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষার জন্য প্রকৃতিতে নিজ হস্তে অভ্রান্ত লিপিতে সকল তত্ত্ব লিখিয়া রাখিয়াছেন, নিজেই নিজের পরিচয় দিয়া রাখিয়াছেন। তাহার অবলম্বনে কঠোর সাধনা দ্বারা তাঁহাকেই আমরা লাভ করিতে পারি, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কত জনে এই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করি। আমাদের কেন এরূপ দুর্দ্দশা? ইহার কারণই এই যে প্রকৃতি হইতে জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার জন্য বহু বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহার জন্য যথেষ্ঠ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। কিন্তু মানব সাধারণের সেই একান্ত বাঞ্ছনীয়া সহিষ্ণুতা কোথায়?

জ্ঞান লাভের প্রথম অবস্থায় শুষ্কতাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সংশয় রূপ মহাদোষও জ্ঞান লাভের পক্ষে যে কত বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা কে বর্ণনা করিবে?* এস্থলে ভক্তিভাজন

* আবার সংশয় উপস্থিত না হইলে জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। ধন্য অনন্ত মঙ্গলময়! ধন্য তোমার অনন্ত মঙ্গল বিধান! এই অপূর্ব্ব বিধানের বর্ণনা কে করিবে?

স্বর্গগত মহাপণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের নিকট হইতে শ্রুত তাঁহার সাধনার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর প্রথমে ভাব ও উচ্ছ্বাসের সহিত উপদেশ ও কীর্ত্তনাদি সম্পাদন করিতেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহার শুষ্কতা, সংশয় ও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছিল। তদানীন্তন একাধিক ব্রাহ্ম সাধকের নিকট তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের শুষ্কতা অপগত হইয়াছিল না, তাঁহার সংশয়ান্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল না। তৎপর প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভের জন্য তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষতঃ Neo Hegelian Philosophy পর্য্যালোচনা করিলেন এবং অবশেষে তিনি উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বহু আর্য্যশাস্ত্র পাঠ করিয়া সংশয়ের অতীত হন। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন যে কেহই তাঁহাকে আর অন্ধকারে টানিয়া নিতে পারিবেন না, তিনি ধ্রুব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞান সূত্র দ্বারাই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে প্রমাণ করিতে পারেন। 'তিনি যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের গভীর অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত বহু দার্শনিক গ্রন্থ বিশেষতঃ "ব্রহ্মপ্রেমসুধাসিন্ধু" নামক নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে পারে।

তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের জীবন গ্রন্থ পাঠে আমরা যাহা লাভ করি, তাহা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসের পর অনেকেরই শুষ্কতা উপস্থিত হয় এবং তাহাই তাহার জীবনের উন্নতি শেষ করিয়া দেয়। সেই শুষ্কতার দূরাপসরণে যে চেষ্টা, যে অধ্যবসায়, যে সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা হইতে অনেকেই নিরস্ত। সুতরাং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান উপার্জ্জনে আমাদের অত্যধিক সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণও একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাধারণে হাল্কা-ভাবেই থাকিতে চায়। এই পাতলা রসপ্রিয়তাও জ্ঞান লাভের একটী প্রধান অন্তরায়। ইহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য যে বহুকাল যাহারা উপন্যাস

জাতীয় হালকা পুস্তক পাঠ করেন, তাহারা অপরা বিদ্যার গভীর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিতে অসমর্থ হন। তাহাদের পক্ষে কঠিন তত্ত্ব-সমূহ সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা করা অসম্ভব হয়। জ্ঞানলাভের জন্য অত্যধিক একাগ্রতাও প্রয়োজনীয়। ইহা পরা ও অপরা উভয়বিধা বিদ্যা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জ্জনে স্থিরচিত্ত ও ধ্যানশীল না হইতে পারিলে উহার লাভ সুকঠিন ও বহুকাল সাপেক্ষ। কিন্তু মানবসুলভ বিক্ষিপ্তচিত্ততা যে জ্ঞান সাধনার পথে বিশেষ পরিপন্থী, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। বহু ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ইচ্ছুক এবং সেই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জ্ঞান লাভের পথে নানাপ্রকার কাঠিন্য দর্শন করিয়া আরম্ভেই পাঠ বন্ধ করেন।

যাঁহারা দয়া গুণের সাধনা করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের সম্মুখে স্বার্থত্যাগরূপ বাধা, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্টও উপস্থিত হয়, কিন্তু দয়াকে যাঁহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সকল বাধা অতিক্রম করেন। কাহারও কাহারও পক্ষে বাধা আসিয়া সাময়িক ভাবে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার দয়া বলবতী হইলে তিনি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অবশেষে দয়া গুণেরই জয় হয়। এস্থলে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। তিনি দয়াপরবশ হইয়া কত অর্থ যে অকাতরে দান করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? তিনি কেবল সঞ্চিত অর্থ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার দানের জের মিটাইতে শেষে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল। বহু বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকায় নারীদিগের এবং বালবিধবাদিগের মহাদুঃখে তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনার্থ জীবন পণ করিয়াছিলেন। এত যে দয়ার কার্য্য তাহাতে কি তাঁহার পথে বিঘ্ন আসিয়াছিল না? যাহারা তাঁহার জীবন চরিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে তাঁহার

পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহাকে হত্যা করিতেও লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। উপকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া তাঁহার নিন্দাই করিতেন। কিন্তু তিনি সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দয়ার জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত এবং আরও শত শত প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি যাহাদের না থাকে, তাহারা বহু কষ্টসাধ্য দয়াগুণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। উত্থান ও পতন মানব জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং সকলের পক্ষে প্রথম পতনই শেষ পতন নহে। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার সাধকেরই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহাদের এই দুইটী গুণ উন্নত নহে, তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। Failures are but the pillars of success মহাবাক্যও জীবনে যে পরীক্ষা বর্ত্তমান, তাহা প্রমাণ করে।

একাগ্রতা সম্বন্ধেও যদি আমরা চিন্তা করি, তবে সেই স্থলেও পরীক্ষার বর্ত্তমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। একাগ্রতা সাধনায় অতি চঞ্চল মনকে বারংবার লক্ষ্যস্থলে ফিরাইয়া আনিতে হয়। এই গুণ সাধনার আরও অনেক প্রণালী বর্ত্তমান। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদিগকে যেন সহস্র দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে। চিত্ত বিক্ষেপের শত শত কারণ বর্ত্তমান। তাই এই সাধনায়ও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং একাগ্রতার বল না থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু যাঁহার একাগ্রতা বলবতী, তিনি পরিশেষে লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে যোগ সাধনের ফলস্বরূপ যোগসাধকে আমরা একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য দেখিতে পাই। সেইরূপ একাগ্রতা সাধন যে কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা যোগিগণ সবিস্তারে বলিতে পারিবেন। সাধারণেরও যে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা নাই, তাহা নহে। এই একাগ্রতা সাধন পথে আরও বহু পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাই কেহ কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্যস্বরূপ। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে তাঁহার সত্য স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সত্যের অনন্ত মহিমা। তাহার আভাস দিবার শক্তিও যে আমার নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। জগতের সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থ সমূহ বিশেষভাবে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই সকল গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সত্যের সাধনা অতি কঠোর সাধনা। সত্য কথন দ্বারাই এই সাধনার আরম্ভ হয়। "সদা সত্য কথা বলিবে" এই বাক্য বর্ণ পরিচয়ে লিখিত আছে বটে, কিন্তু এই মহদুপদেশ জীবনে সম্পূর্ণ ভাবে পালন করা যে কত কঠিন, কত দুরূহ ব্যপার, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

পৃথিবী যে জটিল কুটিলতাময় সংসারে পরিণত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও চিন্তার প্রয়োজন হয় না। জগতে যে সংসার কত প্রকারে তাহার কুটিল জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা সহজবোধ্য। পৃথিবীতে এমন বিভাগ নাই যেস্থলে অসত্য রাজত্ব করিতেছে না। বর্ত্তমান জগতে রাজনীতির এত অধিক প্রাবল্য যে ধর্ম্মের সাধনা যেন উহা দ্বারা একান্তভাবে আবৃত। রাজনীতি কূটনীতি। ইহা যে অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। Language of Diplomacy কখনই সত্যে পূর্ণ হইতে পারে না। উক্ত নানা কারণে সাধারণ জনগণের ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা সত্য রক্ষা করিতে পারে না। আবার সত্যময়তা লাভ করিতে হইলে কেবল সত্য কথনই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে সত্য রক্ষা করিতে হইবে। এই পথে যে কত অসংখ্য বিঘ্ন, তাহা সেই পথের সাধক মাত্রেই জানেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিও সেই বিঘ্নের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। স্থূল, এই জটিলতা পূর্ণ—মিথ্যা পূর্ণ জগতে আমরা মিথ্যা দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হইতেছি এবং মিথ্যার অন্ধকারে এতদূর আচ্ছন্ন যে সর্ব্বাবস্থায়ই

মিথ্যা যে মহাপাপ, সেই জ্ঞানই আমাদের নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারি যে সত্যসাধন পথে অসংখ্য পরীক্ষা উপস্থিত হয়। যাহার সাধন বল আছে, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সাধারণ সাধকের পক্ষে বহু উত্থান ও পতনের জন্য বহু কঠিন আঘাত সহ্য করিতে হয়। বহুর পক্ষে বর্ত্তমানে অকৃত-কার্য্যতা লাভ হইয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উল্লেখ আছে। এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ণামুক্তিই জীবের পরিণতি। কিন্তু উহার আরম্ভ ধর্ম্মেই। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম বলিতে ধর্ম্ম এবং মোক্ষ উভয়কেই বোঝায়। ইহা বোধ হয় Religion শব্দের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং গুণ সাধনাও যাহা, ধর্ম্ম সাধনাও তাহা। উহাতে যে অসংখ্য বিঘ্ন বর্ত্তমান, তাহা নানা-ভাবে এস্থলে লিখিত হইতেছে। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নিয়মানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ গুরুদেব এবং মহাজনদিগের উপদেশ অনুযায়ী মোক্ষ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে জীবনকে নিয়মিত করা, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। শারীরিক ধর্ম্ম মানসিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি আছে। অর্থাৎ সেই সেই ক্ষেত্রে সাধু সজ্জন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত ও বিধিবদ্ধ যে বিধান সমূহ, তাহার অনুবর্ত্তনকে সেই সেই ক্ষেত্রের ধর্ম্মসাধন বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সাধনেও যে কত অধিক পরীক্ষা, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। নিয়মভঙ্গ করিতেই যেন আমাদের অত্যাগ্রহ, কিন্তু উহা রক্ষা করিতে উৎসাহ উদ্যম নাই। সুতরাং বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত হয়। অনেকেই অত্যল্পকালও নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ব্রত গ্রহণ করিয়া বিনা কারণে অথবা তুচ্ছ কারণে উহা ভঙ্গ করা হয়। আমাদের এমনিই দুর্দ্দশা! সুতরাং এপথে সামান্য পরীক্ষা আসিলেও আমাদের পতন হয়। ধর্ম্মই মোক্ষের মূল বা ভিত্তি। সুতরাং ভিত্তি পাকা করিতে গেলেই সেইপথে সাধকের বহু পরীক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অনিবার্য্য। ইহা সহজবোধ্যও বটে।

এইরূপ ভাবে অন্যান্য গুণরাশির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে গুণসাধনায়ই অবশ্যম্ভাবীরূপে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং সাধনীয় গুণের তৎকালীন শক্তি অনুযায়ী সাধকের কৃত ও অকৃতকার্য্যতা লাভ হয়। সকলেই যে সকল সময় তাহাদের সাধনীয় বিশেষ গুণের জয় দেখিতে পাইবেন, তাহা সম্ভব নহে। প্রারম্ভ ও মধ্যভাগে প্রায়শঃ জয় পরাজয়, উত্থান পতন অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু একাগ্র সাধনা করিতে থাকিলে আজ না হয় কাল, এ জন্মে না হয় অন্য জন্মে, এলোকে না হয় পরলোকে সেই সাধনার ফল যে অবশ্যই ফলিবে, তাহা সুনিশ্চিত।

এস্থলে ভক্ত সমাজে প্রচলিত নিম্নলিখিত উক্তিটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীভগবান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ,
তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসানুদাস।"

এই উক্তির শাব্দিক অর্থ যদিও আমাদের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত নহে, কিন্তু উহার ভাবার্থ যে আমাদের মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে, অর্থাৎ সাধনার পথে যে বহু পরীক্ষার উপস্থিত হয়, ইহা সুনিশ্চিত।

খৃষ্টদেব তাঁহার শিষ্যগণকে পরমপিতার নিকট যে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তি আছে ঃ—

"Lead us not unto temptation,
but deliver us from evil."

বঙ্গানুবাদ ঃ—ফেলিওনা আমাদিগে কভু প্রলোভনে,
অসৎ হইতে রক্ষ এই দীনগণে।

(তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)

এই প্রার্থনায়ও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসে। স্বয়ং খৃষ্টদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনন্ত কৃপাময় পরমপিতার অপার কৃপায় সেই পরীক্ষা হইতে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ রাত্রি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে বুঝিতে পারা

যায় যে তাঁহার নিকট ভীষণতম পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পরদিনের সকল অবস্থাই দিব্য চক্ষে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই নিজ জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি দৈহিক মৃত্যুকেই বরণ করিলেন এবং "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" এই মহামন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইলেন। মৃত্যুতে তাঁহার নির্ভরতা নামক পরম গুণের জয় সংসাধিত হইল এবং তাঁহারই ফলে জগতে তাঁহার একমাত্র প্রাণের ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিল। ধন্য মহাপুরুষের অপূর্ব্ব নির্ভরতা! ধন্য তাঁহার অতি মূল্যবান জীবন উৎসর্গ। তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর বিঘোষিত হইবে !!!! কঠোপনিষদ্ বলেন :—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ (৩।১৪)

অনুবাদ: (হে জীবগণ, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে) উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত হও। ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই (তত্ত্বজ্ঞান রূপ) পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন (তত্ত্বভূষণ)

ইহাতেও দেখা যায় যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কত সুকঠিন। এই পথকে ক্ষুরধারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং পথ যে কত বিঘ্ন সঙ্কুল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় সত্যামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তত্ত্বজ্ঞান ছয়টী পরমগুণের ফলস্বরূপ। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে জীবন সংগ্রামময় এবং ইহার সফলতা লাভ করিতে অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সকল প্রকার সাধকগণই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে সাধনার পথে বহু পরীক্ষা আসে এবং উপযুক্ত সাধনাবলে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ধর্ম্ম প্রচারই বলুন, সমাজ সংস্কারই বলুন অথবা পরোপকারই বলুন, উহাদের সকলের মূলেই প্রেম বর্ত্তমান।

যিনি যতদূর প্রেম সাধনায় উন্নত, তিনি উক্ত কার্য্য সমূহ সম্পাদনে ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় যে জগৎ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে খ্রীষ্টদেব ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহম্মদদেবের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ের জীবন নাশের জন্য চেষ্টাও হইয়াছিল, অপার স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে এবং একান্ত পতিগত প্রাণা সাধ্বী সতী ধর্ম্মপত্নীকে বাড়ীতে রাখিয়া শ্রীচৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, হরিনাম সেরূপ ভাবে প্রচারিত হইতেছিল না। কেবল যে জগৎ প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণই ঐরূপ ভীষণ পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। অখ্যাত কিন্তু সাধনায় উন্নত বহু ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারকগণও নানাবিধ কঠিন পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন। জগতের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সেইরূপ বহু তেজস্বী সাধক সেই সকল ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগতে বজ্রগম্ভীর স্বরে সত্য এবং প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সকল জীবনই সংগ্রামময়, সকল জীবনই পরীক্ষা সমূহে পরিপূর্ণ। এমন মহাপুরুষ নাই যাঁহার জীবনে পরীক্ষা আসে নাই এবং যাহাকে সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। মহাপুরুষের মহত্বই থাকে না, যদি তিনি কঠিন পরীক্ষায় পতিত না হইয়া থাকেন এবং সাধনার বলে এবং ভগবৎ কৃপালাভে সেই ভীষণ ভীষণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারেন। সাধক যতই উন্নত হন, তাঁহার নিকট ততই ভীষণতরা পরীক্ষা উপস্থিত হয়। সাধারণ মানব এবং মহাপুরুষদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে উদ্যমহীন সাধারণ মানব একবার পতনেই সর্ব্বপ্রকার যত্ন চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া পতিত অবস্থাকেই বরণ করিয়া লয়, গড্ডলীকা প্রবাহের ন্যায় চিরাচরিত পন্থায়ই বিচরণ করেন, তাহারা ভুলিয়া যান যে পরীক্ষা তাহাদের বল পরীক্ষার জন্যই আসিয়াছিল, বিপদ তাহাদিগকে জাগরণ করিবার জন্যই আসে। কিন্তু মহাপুরুষগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু

কখনও কখনও যদি দৈব দোষে তাহাদের পতন হয়, তবে তাহা একান্ত-ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া সেই পতনভূমির উপরই দণ্ডায়মান হইয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য পুনরায় কঠোর সাধনা করেন। তখনই ভগবৎ কৃপা তাঁহার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাঁহাকে গন্তব্যস্থলে লইয়া যান। অনন্ত কৃপাময় পরমেশ্বর যখনই তাঁহার প্রিয় সন্তানকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখেন, তখনই তিনি তাঁহাকে সহস্রপদ অগ্রসর করাইয়া দেন। ইহা তাঁহার কৃপার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ধন্য কৃপাময় পরম পিতঃ! তোমারই অপার অনন্ত কৃপা!! তোমার কৃপায় যুগে যুগে কত অধম, কত পতিত নরনারী যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? তোমাকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করি।

মহামনাঃস্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের জীবন সংগ্রামময়। আমাদিগের অবস্থা সমূহ সর্ব্বদাই আমাদিগকে অধঃপতনের দিকে নিবার জন্য ব্যস্ত। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের ক্রমবিকাশ সাধন করিয়া আমাদের অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

"Life is the tendency of unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down."

অর্থাৎ অধোগামী করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত আমাদের বিরুদ্ধ অবস্থা সমূহের মধ্যে জীবের ক্রমবিকাশ সম্পাদনই জীবন। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিবেন যে জীবন পরীক্ষাময়। ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি এবং ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে স্বর্ণকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে হইলে কত প্রকার প্রক্রিয়া করিতে হয়, কত প্রবল অগ্নি দহনে উহাকে দগ্ধ হইতে হয়। কেবল সুবর্ণই যে অগ্নি দহনে দগ্ধ হইলে বিশুদ্ধ হয় তাহা নহে। কিন্তু সকল খনিজ পদার্থেরই বহু প্রণালী দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে হয়। লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করিতে যে অগ্নিদহন ও বারংবার উহাকে আঘাত করিতে

হয়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। চন্দন কাষ্ঠখণ্ড বারংবার ঘর্ষিত হইলেই সুবাসযুক্ত চন্দন প্রলেপের অবস্থায় উপনীত হয়। তিল, সরিষা, বাদাম প্রভৃতি পদার্থ অত্যন্তভাবে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের ব্যবহার উপযোগী নানাবিধ তৈল প্রদান করে। কুসুমরাশি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা পুষ্পসারে পরিণত হয়। ধান্য নিষ্পেষণ ও অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই আমাদের দেহ রক্ষার সর্ব্বপ্রধান খাদ্যরূপে পরিণত হয়। গমেরও ঐ একই পরিণতি। দুগ্ধের ঘৃতে এবং নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যে পরিণতির বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ একই বিধান জগতে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

এইত গেল জাগতিক খণ্ড খণ্ড পদার্থের কথা। এখন যদি আমরা আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি জন্মভূমি—পৃথিবী মণ্ডল সম্বন্ধে একটু চিন্তা করি, তবে কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে কোন এক সুদূর অতীতে কতক উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ (some hot gaseous matter) সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমশঃ এই পৃথিবী মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে ইহার যে কত ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যাও কেহ নির্ণয় করিতে পারে না এবং সেই সকল দুর্ঘটনার ভীষণত্ব সম্বন্ধেও কেহ ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখন ইহা জীবকুলের বাসের উপযুক্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত উত্তপ্ত বাষ্প রাশিই নানা Vicissitudes এর মধ্য দিয়া বসুন্ধরায় পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা কেহই এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহি না। ঠিক একইরূপে গ্রহ উপগ্রহগুলিও সৃষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলেও যে একই অবস্থা ছিল, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। উহাতে যদি কোন দুর্ঘটনাই না থাকিত, তবে উহা হইতে সময় সময় গ্রহ পরিমান উহার (সূর্য্যের) অংশ সমূহ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সজোড়ে সুদূরে ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে পারিত না। সেই সকল ভীষণ ভীষণ দুর্ঘটনা আমাদিগের ধারণাতীত বলিলেও কিছু বলা হইল না। এইরূপেই অন্যান্য অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে

হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের আদি মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের আদি মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে অসংখ্য অসংখ্য অসংখ্য দুর্ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। এই সমস্তই সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই সম্পাদিত হইতেছে। উহাদের অন্য কোনও কারণ নাই। সুতরাং দেখা যায় যে জীবনের সফলতা লাভ করিতে জড় জগতেরও অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া আগমন করিতে হইয়াছে ও হইবে। এই পরীক্ষা সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় পদার্থের আবার পরীক্ষা কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জগতে জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলেই পরীক্ষার মধ্য দিয়া আসিতে হইবে। One God, One Law, One Universe. মানবেরও সেইরূপ ভীষণ পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে হয়! ইহা ভিন্ন বিশুদ্ধ হইবার, জীবনে সার্থকতা লাভ করিবার অন্য কোনও পন্থা নাই।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির একটী সুমহান্ উদ্দেশ্য আছে। আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থই জগতে আসিয়াছি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবেই। আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে জীবগণ জীব জগতের নিম্নতম স্তরে দেহাবদ্ধ হন এবং অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে ক্রমশঃ উচ্চতর দেহ ধারণ করিয়া মানব দেহ এবং তৎপরে দেবদেহ লাভ করিবেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব যে নিম্নতম স্তরে শরীরের গঠন জন্য গুণরাশির বিশেষ বিকাশ সম্পাদিত হয় না এবং জীব উত্তরোত্তর উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিবেন। এইরূপ উন্নত হইতে উন্নততর হইতে প্রত্যেক জীবের বহু বাধা বিঘ্ন ও পরীক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং সেই সকল বাধা উত্তীর্ণ হইতেই হইবে এবং সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে। যে উদ্দেশ্য জীবকে ক্রমশঃ উন্নত দেহ দান করিয়া মানব ও পরিশেষে দেবদেহ দান করিয়াছে অর্থাৎ হৃদয়কে নানা ঘাত প্রতি-

ঘাতের মধ্য দিয়া বলশালী করিয়া ব্রহ্মের গুণরাশি লাভের উপযুক্ত করে, অর্থাৎ প্রতি হৃদয়ে ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির বিকাশ সাধন করে, তাহা যে ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা, আত্মদানের অভিনয় বা প্রেমলীলা, তাহা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষাই সৃষ্টির মূলমন্ত্র। সুতরাং উহা যে জীবের জীবনে সংসাধিত হইবেই, ইহা সুনিশ্চিত। আবার এই সুমহান্ উদ্দেশ্য যখন প্রত্যেক জীবনেই পূর্ণ হইবে, তখন জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় সকল বিধানেই আমরা এই মহামন্ত্র লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইব। জীব ও জগতের প্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ঐ মন্ত্রের অর্থ পরিস্ফুটাকারে প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ যদি গভীরভাবে নিজ নিজ জীবনবেদ পাঠ করেন, তবেই যে তাহারা এই সত্য তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের কারণ নাই। স্থূল, কেবল মনুষ্য জীবন নহে, কিন্তু সকল জীবের জীবনই সংগ্রামে পরিপূর্ণ। সংগ্রাম ভিন্ন একটী জীবও সংসারে দেখা যায় না।

আবার পাঠক যদি "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে জীবনে জীবনে বহু পরীক্ষা, বহু সংগ্রাম বর্ত্তমান, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে সেই সকল সংগ্রামের ফলই সর্ব্বদা মঙ্গলে পরিণত হয়। সংগ্রাম, পরীক্ষা ভিন্ন জীবন নাই, আবার কোন কার্য্যই মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলে পরিণত হয় না। উক্ত অংশ পাঠে আমরা ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা সম্বন্ধে যে আরও সমর্থন পাইব, তাহাতে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যদি গভীর ভাবে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে বিশ্বের অন্তরালে, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেন কিছু লুক্কায়িত আছে, আমরা যেন সর্ব্বদাই উপরি উপরি দেখি, উপরি উপরি বিচার করি; আমরা স্থূল নিয়াই ব্যস্ত, কিন্তু সূক্ষ্ম বা ততোঽধিক কারণে উপনীত হইতে চাহি না, অর্থাৎ বাহির নিয়াই থাকি, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থলে—মর্ম্মস্থলে যে কি আছে, তাহার অনুসন্ধান করি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহার আভাস আমাদের অনুভূতিতে কখনও আসে

না, তাহা নহে। এই আভাসের মাত্রা তাহাদের নিকটই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, যাহাদের হৃদয় অধিকতর স্বচ্ছ। ইহার কারণ কি? এই কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব যে সূক্ষ্ম জগৎ অর্থাৎ আত্মিক জগৎ আমাদের নিকট অদৃশ্য। আমাদের এবং সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে একটী সুগভীর পর্দ্দা রচিত হইয়া আছে। এই পরদা ভেদ না করিতে পারিলে আত্মিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। অথচ এই পর্দ্দার অপর দিকে আসল বস্তু সার সম্পদ লুক্কায়িত আছে। সেই বস্তু সম্বন্ধে সত্য ও সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই পরদাটী কি? উহা অজ্ঞানতা। মায়াবাদী ইহাকে মায়া, অবিদ্যা বলেন। কিন্তু আমরা বলি যে ইহা অজ্ঞানতা মাত্র। এই অজ্ঞানতার আরম্ভ আত্মার দেহ সংসর্গে আগমনাবধি এবং ত্রিবিধ-দেহের পূর্ণ বিগমে বা পূর্ণামুক্তিতে এই অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে। আমাদের জীবনে কর্ত্তব্য কি? প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক কার্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সত্য ও সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা। আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা সত্য জ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান নহে, উহা বিকৃত জ্ঞান। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা সূর্য্যগ্রহণের উপমা আনয়ন করিতে পারি। পূর্ণ গ্রাসে সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে। কিন্তু রাহুর গ্রাস ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং সূর্য্যও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। আমাদের অবস্থাও তাহাই। আদিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে দেহের প্রভাবে আবৃত হই। কিন্তু সাধন ভজন দ্বারা দেহের প্রভাব যতই অল্প হইতে অল্পতর হইবে, আমাদের হৃদয়ের আবরণ ততই মুক্ত হইতে থাকিবে। এই আবরণ মোচন সাধন, ভজন ও ব্রহ্ম কৃপাসাপেক্ষ। এই সাধন ভজনের মধ্যেই আমাদের নানাবিধ -- সময় সময় অতি কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলেই গুণের এবং শক্তির প্রয়োজন। শক্তি গুণের। শক্তি স্বাধীন ভাবে থাকে না। উহা গুণের

সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যেমন তেজের দাহিকা শক্তি তেজঃ ভিন্ন দেখা যায় না। সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, না হওয়া সম্পূর্ণ-রূপে গুণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের পথ চলার সাথে সাথে গুণের পরীক্ষা হইতেছে।

প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর কেন আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে জীবনে এত কঠোর পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন? কেন তিনি আমাদিগের সম্মুখভাগ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে আমরা সাধন ভজন দ্বারা অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইব এবং অবশেষে পূর্ণতা লাভ করিব। এই ক্রমোন্নতির পথে আমরা সর্ব্বদাই বাধার সম্মুখীন হইব এবং এই বাধা সমূহ অতিক্রম করিবার শক্তির দ্বারাই গুণরাশির শক্তির Practical Demonstration হইবে। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। সুতরাং জীবাত্মায় অনন্ত গুণ ও শক্তি বর্ত্তমান। অর্থাৎ জীবাত্মাও স্বরূপতঃ পূর্ণই বটেন, কিন্তু পর-মাত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় দেহের প্রভাব অবলম্বনে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। এই দেহ প্রভাব ক্রমশঃ সাধন ভজন দ্বারা হ্রাস করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ আমরা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিব. আমাদের সম্মুখের অন্ধকার চলিয়া যাইবে এবং বস্তু, কার্য্য ও তত্ত্ব সমূহের সত্য জ্ঞান আমরা লাভ করিব। এই কার্য্যে, এই পথ চলার মধ্যে যে বহু বাধা বিঘ্ন থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। সেই বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই অগ্রসর হওয়াই গুণের শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং গুণরাশির পরীক্ষাও এইভাবে সংঘটিত হইতেছে ও হইবে.

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এই বিশ্বলীলা অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ প্রেমময়ের আত্মদানের অভিনয় মাত্র। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে এই বিশ্বকার্য্য একটী বিরাট ব্যাপার। ইহা একদিনে আসে নাই, একদিন স্থিতি করিয়াই শেষ হইতেছে না। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, যে জিনিষটী লাভ করিতে যত অধিক চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম প্রয়োজনীয় হয়, আমরা সেই জিনিষটীর মূল্য ততোঽধিক

নির্দ্দেশ করি। এই আত্মদান যদি এক মুহূর্ত্তেই আরম্ভ ও শেষ হইত, তবে ইহার মূল্যও আমাদিগের নিকট অত্যল্পই হইত। এই আত্মদানের কার্য্য সাধিতে জীবাত্মা প্রায় শূন্যাবস্থা হইতে পূর্ণত্বে উপস্থিত হইবে। সুতরাং ইহা অতি সুমহান্ কার্য্য এবং ইহা সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করিতে অবশ্যই অত্যধিক কাল, অচিন্ত্য সুদীর্ঘকাল ব্যয়িত হইবে এবং জীবাত্মাদিগের বহু বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে হইবে। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" আমরা যে দুঃখের ভারে ভারগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত, সেই দুঃখ চিরস্থায়ী নহে। আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে এই সকল দুঃখ পরার্দ্ধ শ্রেণী পারের অবস্থা লাভ করিলেই বিদূরিত হইবে। ইহাকেই ভবসিন্ধু পার হওয়া বলে। তৎপর সত্ত্বের রাজত্ব এবং ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতর সুখ। এই অবস্থায়ও পরীক্ষা আছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখের তীব্র দহন জ্বালা নাই। বরং সেই দুঃখের মধ্যে এক-রূপ অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে গুণের শক্তির পরীক্ষা চিরকাল চলিবে।

পাঠক যদি গুণ পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে মানস রথে আরোহন করুন, সর্ব্বক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে আপনার চতুর্দ্দিকে, দশদিকে, সর্ব্বদিকে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আকাশই বলুন, অনল অনিলই বলুন, ভূমি জলই বলুন, সকলই আমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কে না জানেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইতেছি? কে না জানেন যে উহারা আমাদিগকে মোহ মুগ্ধ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বদিকে সুগভীর ও সুবিস্তার অন্ধকার সৃজন করে এবং ভ্রান্তমার্গে আমাদিগকে পরিচালনা করে? কে না জানেন যে উহাদের হস্ত হইতে চিরমুক্ত হইবার জন্যই জীবনে জীবনে সজ্ঞানে অজ্ঞানে কতই সাধনার স্রোত প্রবাহিত হয়? কে না জানেন যে, কত সময় কত শত সহস্র মানবসন্তান যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে পরম পরিত্রা-তাকে ডাকিতে থাকেন? আবার কে না জানেন যে, কত সাধক

পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন "Get thee behind me, Satan" এবং পরম করুণাময় পিতাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ দান করেন?

প্রকৃতিতে পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে সে স্থলেও পরীক্ষা কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে। একটী বৃক্ষ বা লতার জন্ম ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন, দেখিতে পাইবেন যে বৃক্ষ লতার জীবনে কত বাধা, কত বিঘ্ন আসিয়াছিল। কত বৃক্ষ লতা অঙ্কুরেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কত বৃক্ষলতা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আবার কত বৃক্ষলতা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জগৎকে ফল, ফুল ও নানাবিধ রস প্রদান করিয়া উহাদের জীবন সার্থক করিয়াছে। আমরা দেখি যে খর্জ্জুর বৃক্ষ নিজের বক্ষ বিদারণ করিয়া আমাদিগকে সুমিষ্ট রস দান করে, ইক্ষুদণ্ড ভীষণ ভাবে নিষ্পেষিত হইয়া জগৎকে সুমধুর রস প্রদান করে, কুসুম রাশি মধু মক্ষিকা দ্বারা বারংবার দষ্ট হইয়া কি অপূর্ব্ব মধুর রসই না আমাদিগকে দান করিতেছে! ফলগুলি চর্ব্বিত হইয়া আমাদের রসনাকে সুরসে ভরপুর করিয়া তোলে। আর কত বস্তুর বর্ণনা করিব? পাঠক যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, যে বিষয় চিন্তা করিবেন, যে কার্য্যেরই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, সর্ব্বত্রই যে একই বিধান লক্ষ্য করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সর্ব্বত্রই পরীক্ষা এবং পরিণতিতে জীবনের সার্থকতা।

পাঠক, মানব জীবনে পরীক্ষা দেখিতে ইচ্ছা করেন? তবে দেখিতে পাইবেন যে :—

সুতিকাগৃহে পরীক্ষা, মৃত্যু শয্যায় পরীক্ষা, গর্ভবাসে পরীক্ষা, ভূমিষ্ঠ হওয়াতেও পরীক্ষা; ইহ জীবনে পরীক্ষা, পর জীবনে পরীক্ষা, ইহলোকে পরীক্ষা, পরলোকে পরীক্ষা, স্বর্গে পরীক্ষা, নরকে পরীক্ষা, বর্ত্তমান জন্মে পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ জন্মে পরীক্ষা, গত জন্মেও পরীক্ষাই বর্ত্তমান ছিল; পিতায় পরীক্ষা, পুত্রে পরীক্ষা, মাতায় পরীক্ষা, কন্যায় পরীক্ষা, ভ্রাতায় পরীক্ষা, ভগ্নীতে পরীক্ষা, পতিতে পরীক্ষা, পত্নীতে পরীক্ষা; বাল্যে পরীক্ষা, যৌবনে পরীক্ষা, আবার প্রৌঢ়াবস্থায়ও পরীক্ষা, বৃদ্ধ

কালেও পরীক্ষা, গৃহে পরীক্ষা, কর্ম্মস্থলে পরীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পরীক্ষা, গৃহস্থাশ্রমে পরীক্ষা, সন্ন্যাস আশ্রমে পরীক্ষা, স্বদেশে পরীক্ষা বিদেশে প্রবাসে পরীক্ষা, উপাসনা গৃহে পরীক্ষা, কুস্থানে পরীক্ষা, তীর্থক্ষেত্রে পরীক্ষা, সাধারণস্থলে পরীক্ষা, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় পরীক্ষা, আবার তাহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া জীবন যাপনেও পরীক্ষা; যশে পরীক্ষা, নিন্দায় পরীক্ষা লোকপ্রিয়তায় পরীক্ষা, লোকাপবাদে পরীক্ষা, সামাজিক উন্নতিতে পরীক্ষা, নগণ্য অবস্থায় পরীক্ষা; বিদ্যার্জ্জনে পরীক্ষা, বিদ্যাহীনতায় পরীক্ষা; অলসতায় পরীক্ষা, কার্য্যতৎপরতায় পরীক্ষা; রোগে পরীক্ষা, স্বাস্থ্যে পরীক্ষা, অল্পায়ুতে পরীক্ষা, দীর্ঘজীবনে পরীক্ষা; সধন অবস্থায় পরীক্ষা নির্ধন অবস্থায় পরীক্ষা, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণেও পরীক্ষা; পার্থিব উন্নতির অত্যুচ্চশিখরে আরোহণে পরীক্ষা; সর্ব্বজনের অবহেলার পাত্রভাবে জীবন যাপনে পরীক্ষা; রাজায় পরীক্ষা, প্রজাজীবনে পরীক্ষা, ঈশ্বর দৃষ্টিতে উন্নত হওয়ায় পরীক্ষা, মানব চক্ষে ঘৃণিত হওয়ায় পরীক্ষা; সম্পত্তি বিষয়ে নির্লিপ্ততায় পরীক্ষা, ধনলাভে পরীক্ষা, ধনার্জ্জনে পরীক্ষা, ধনত্যাগে পরীক্ষা, ধনদানেও পরীক্ষা; মিত্রতায় পরীক্ষা, শত্রুতায় পরীক্ষা, যুদ্ধে পরীক্ষা, সন্ধিতে পরীক্ষা, শান্তিতেও পরীক্ষা; তমঃতে পরীক্ষা, রজঃতে পরীক্ষা, সত্ত্বেও বিষম পরীক্ষা; মিলনে পরীক্ষা, বিরহে পরীক্ষা, বিচ্ছেদেও পরীক্ষা; আশায় পরীক্ষা, নিরাশায় পরীক্ষা; আনন্দে পরীক্ষা, নিরানন্দে পরীক্ষা; সুখে পরীক্ষা, দুঃখে পরীক্ষা; শান্তিতেও পরীক্ষা, অশান্তিতেও পরীক্ষা; সম্পদে পরীক্ষা, বিপদে পরীক্ষা; পুণ্যে পরীক্ষা, পাপে পরীক্ষা, উন্নতিতে পরীক্ষা, অধঃপতনে পরীক্ষা; প্রেমে পরীক্ষা, অপ্রেমে পরীক্ষা, জ্ঞানে পরীক্ষা, অজ্ঞানে পরীক্ষা, স্বল্প জ্ঞানেও পরীক্ষা, ভক্তিতে পরীক্ষা, অভক্তিতে পরীক্ষা, অন্ধ বিশ্বাসে পরীক্ষা, বিচারলব্ধ জ্ঞানানুসরণে পরীক্ষা; সরলতায় পরীক্ষা, জটিলতা কুটিলতায় পরীক্ষা; পবিত্রতায় পরীক্ষা, কলুষান্ধকারে পরীক্ষা; মধুরতায় পরীক্ষা, কটুতা তিক্ততায় পরীক্ষা; পরোপকারে পরীক্ষা, পরাপকারে পরীক্ষা, অন্যের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় পরীক্ষা, পরানিষ্ট চিন্তায় পরীক্ষা; আসক্তিপাশে বদ্ধাবস্থায়

পরীক্ষা, নির্লিপ্ততায় পরীক্ষা ; ক্রোধে পরীক্ষা, অক্রোধে পরীক্ষা, ক্ষমায়ও পরীক্ষা ; দূষণীয় কার্য্যে পরীক্ষা, অপরাধ স্বীকারে পরীক্ষা, ক্ষমা ভিক্ষায়ও পরীক্ষা; ন্যায়ে পরীক্ষা, অন্যায়ে পরীক্ষা, সত্যে পরীক্ষা, অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় পরীক্ষা ; ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে পরীক্ষা আবার নীরব ও উদাসীন ভাবে গতানুগতিক জীবন যাপনেও পরীক্ষা ; সন্তোষে পরীক্ষা, অসন্তোষে পরীক্ষা, হিংসায় পরীক্ষা, অহিংসায় পরীক্ষা ; অহংকারে পরীক্ষা, নিরহংকারে পরীক্ষা, নির্ভরতায় কঠিন পরীক্ষা; বৈরাগ্যে পরীক্ষা সংসারে যে বিষম পরীক্ষা, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে ?

পাঠক, পরীক্ষার কথা আর কত বলিব ? সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই পরীক্ষা। একবার নিরীক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে জগৎ পরীক্ষাময়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল পরীক্ষার পরিণতিতে মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। ধন্য মঙ্গলময় ! ধন্য তোমার মঙ্গলময় রাজ্যের সুমঙ্গলময় বিধান ! জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহাতেই তোমার একমাত্র সুমহান্ উদ্দেশ্য সুমঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া নিত্যই নির্ভুল ভাবে সুসিদ্ধ হইতেছে। এই ভাবেই তুমি স্বগুণ-পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছ, এই ভাবেই পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছ, আবার এই ভাবেই তোমার জ্ঞান-প্রেমময়ী লীলার উদ্দেশ্য সকলের জীবনে সম্পূর্ণ করিবে। ধন্য নিত্য জ্ঞান-প্রেমময় পিতঃ ! ধন্য তোমার অপূর্ব্বা জ্ঞান-প্রেমময়ী লীলা ! সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে সকল চিন্তায় তোমার সত্যজ্ঞান, তোমার দিব্য প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। হে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর ! তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার অনন্ত প্রেমে জীব সমূহে আত্মদান করিয়া তোমার অপূর্ব্বা সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছ। হে অনন্ত দয়ার আধার দীনবন্ধু পিতঃ ! হে অনন্ত জ্ঞানাধার নিত্য গুরো ! তোমার অপার দয়াগুণে এই দীনহীনের জ্ঞান-প্রেমনয়ন চিরতরে উন্মীলন করিয়া দেও। তোমারই দীনহীন সন্তান তোমারই অপার দয়াগুণে তোমারই জ্ঞান-প্রেমময়ী, অমৃতময়ী, মঙ্গলময়ী লীলা সত্য-ভাবে দর্শন করিয়া ধন্য হউক, কৃতার্থ হউক, তাহার জন্ম সার্থক হউক,

জীবন সফল হউক। হে অনন্ত কৃপাময় পিতঃ! তুমি নিজ অপার কৃপাগুণে আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত কর।

ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছার মূলে যে তাঁহার অনন্ত প্রেম ও অনন্ত জ্ঞান উভয়ই বর্ত্তমান, তাহা এখন প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম জ্ঞান-প্রেমময়। তাঁহার প্রেম জ্ঞান ছাড়িয়া নহে। উভয় মিলিত হইয়াই কার্য্য হয়। জ্ঞান-প্রেমময়ত্ব তাঁহার একতম স্বরূপ। দুইটী বিপরীত গুণের মিলনে তাঁহার এক একটী একত্ব গঠিত। জ্ঞান-প্রেমময়ত্ব সেইরূপ একটী একত্ব। তিনি সেইরূপ অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিতে যখন অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার ইচ্ছা হইল, তখন সেই কার্য্যে তাঁহার জ্ঞানও অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিবে। অর্থাৎ তিনি প্রেমগুণ দ্বারা নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক জীব তাঁহাতে তন্ময় হইবেন এবং এই ভাবে তাহার স্বগুণ-পরীক্ষা রূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।* এস্থলে ইহা অবশ্য

* অনেকে মনে করেন যে, যেস্থলে প্রেম, সেইস্থলে জ্ঞান থাকে না। এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। পরস্পর গভীর প্রেমে মিলিত দম্পতির সম্বন্ধে যদি আমরা চিন্তা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে, তাহারা যেমন পরস্পরকে জানেন, এমন আর কেহই তাহাদিগকে জানে না অথবা তাহারাও অন্য কাহাকেও সেইরূপ ভাবে জানেন না। কারণ, যে স্থলে প্রেমের পরিপক্কতা সম্পাদিত হইয়াছে, সেই স্থলেই সরলতা মূর্ত্তিমতী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কপটতা রূপ অন্ধকার স্থান লাভ করে না বা করিতেও পারে না। সুতরাং একের নিকট অন্যের হৃদয় সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। সুতরাং একে অন্যকে সহজেই জানিতে পারে ও জানে।

উপরোক্ত ধারণার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থায় প্রেমিক প্রেমের পাত্রের দোষ দেখিতে চাহেন না এবং সেই অবস্থায় তাহার দোষের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে প্রেম অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্যই প্রেম সাধক প্রেমের পাত্রের দোষ সম্বন্ধে জ্ঞানকে প্রেম বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম গভীরতা প্রাপ্ত হইলে পরস্পরের দোষের জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে প্রেমের বাধা সৃষ্টি করে না। এই সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অতল প্রেম-জলধি প্রেমময় পরম বন্ধু নিত্যই আমাদিগের

বক্তব্য যে জীবের পক্ষে কোন এক গুণে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে সত্য। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ উদ্দেশ্য অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমে সম্পূর্ণতা লাভ করা। এই প্রেমে সম্পূর্ণতা লাভের অর্থই এই যে পরম পিতার অনন্ত গুণে জীব অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিবে।**

এই বিষয়টী আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার প্রয়াস পাইতেছি। দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রথমে প্রকৃত প্রেম হয়। এই অবস্থায় উভয়ের মধ্যে গুণের কিছু কিছু মিলন হয় বটে, কিন্তু প্রেমের বর্দ্ধিতাবস্থা ভিন্ন দুইয়ের গুণরাশি এক হয় না। প্রকৃত প্রেম যখন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ও অভেদের প্রারম্ভিক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দুইয়ের মধ্যে একাধিক গুণের একীকরণ হয়। এই অভেদের মাত্রা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাঁহাদের মধ্যে গুণরাশিও ক্রমশঃ একীভূত হইতে থাকে। অভেদ যখন উভয়ের মধ্যে সোঽহং সীমায় উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের গুণরাশির মধ্যে অধিকাংশ গুণের একীকরণ হয়। সোঽহং জ্ঞানও যখন আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন

দোষ দুর্ব্বলতা জানিতেছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার অনন্ত প্রেম বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ন হইতেছে না। ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়। সুতরাং তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে আমাদের ধারণীয় কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। সাধকের উন্নতাবস্থায়ই সাধারণতঃ জ্ঞান ও প্রেমের বিরোধ লুপ্তাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহার অত্যুন্নত অবস্থায় যখন তিনি জ্ঞান ও প্রেমের একত্ব অর্থাৎ জ্ঞান-প্রেমময়ত্ব লাভ করেন, তখন ঐ বিরোধ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" এবং "জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য।

** এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। জীব পূর্ণমুক্তির পূর্ব্বে সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। কারণ, অনন্ত একত্বের একত্ব সম্পূর্ণরূপে লাভও যাহা, পূর্ণ ব্রহ্ম হওয়াও তাহা। সুতরাং জীবের পক্ষে সেই অবস্থা লাভ অসম্ভব।

পরস্পরের গুণরাশির একীকরণ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যখন 'অভিধান' নামক মহাপ্রেমে উভয়ে এক হন, তখন উভয়ের গুণরাশির মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকে না বলিলেই হয়। অর্থাৎ উভয় যেন নামে পৃথক, কিন্তু গুণরাশিতে এক। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে প্রেমকে 'অভিধান' প্রেমে পরিণত করিতে হইলে সাধকদ্বয়ের একে অন্যের সদ্গুণরাশিতে উন্নীত হইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত পরিমাণে গুণ সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হয়। সাধকদ্বয় সম্বন্ধে উপরোক্ত অবস্থা। পরম সাধক যখন কোন একগুণে পরম পিতার সহিত একত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার (সাধকের) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) তন্ময়তার আরম্ভ হয়। সাধক একটী একটী গুণে একত্ব লাভ করিতে থাকেন, তাঁহাতে তিনি ততোঽধিক ভাবে তন্ময় হইতে থাকেন। এইরূপে পরম সাধক যতই অনেক একত্বে ভূষিত হইতে থাকেন, পরম পিতাতে তন্ময়তাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধক যখন প্রেমগুণে ও অন্যান্য বহু বহু গুণে একত্ব লাভ করেন, তখন তিনি অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানের জন্য সাধনা করেন।* পরমপিতা অনন্ত এবং

* অভেদ জ্ঞান প্রধানতঃ তিন প্রকার। অন্তর্গত হইয়া অভেদকে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান অন্তর্গত করিয়া অভেদকে উত্তমর্ণ অভেদ জ্ঞান এবং সমানে সমানে অভেদকে সমর্ণ অভেদ জ্ঞান কহে। সমর্ণ অভেদ জ্ঞানের অন্য নাম সোঽহং জ্ঞান। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রেমেরই প্রকারভেদ। আবার প্রেমের উন্নত অবস্থায় অভেদ, সোঽহং জ্ঞান ও অভিধান প্রেম উৎপন্ন হয়। ইহা দুই বা ততোঽধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্ভব হয়। সাধকও পরমেশ্বরের মধ্যে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত সম্ভব হয়। অর্থাৎ সাধক তাঁহার অত্যুন্নত অবস্থায় পরম পিতার অপার দয়ায় তাঁহার সহিত অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান বা সমর্ণ অভেদ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে "সোঽহং জ্ঞান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানেও উচ্চ নীচ জ্ঞান থাকে। সুতরাং পরমপিতা অনন্তকালের ভক্তিভাজন। ব্রহ্ম সকল জীবকে উত্তমর্ণ অভেদ জ্ঞান করেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনন্ত সন্তানকে নিত্যই অনন্ত প্রেমে অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন জীবই তাঁহাকে উত্তমর্ণ অভেদ জ্ঞান করিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহাকে অন্তর্গত করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার সমান

তাঁহার গুণরাশিও অনন্ত এবং অনন্ত ভাবে উন্নত। সুতরাং জীবের পক্ষে চিরকাল এইভাবে একত্ব লাভ চলিতে থাকিবে। পাঠক মনে রাখিবেন যে পরম সাধক অনন্ত একত্ব লাভ করিলেও তাঁহার কার্য্য শেষ হয় না। অর্থাৎ পরমপিতার অনন্ত গুণরাশির প্রত্যেক গুণে একত্ব লাভ করিলেও তিনি সাধনার শেষ সীমায় উপনীত হন না। কারণ, সেই অনন্ত একত্বের একত্ব অর্থাৎ অনন্ত গুণের permutation and combination করিলে যাহা হয়, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং এই তন্ময়তার সাধনা চিরকাল চলিতে থাকিবে।* পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে "স্বপ্রযত্নে অনন্ত একত্ব লাভই অসম্ভব, তাহাতে আবার অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য।"** অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে প্রেম সাধনা চিরকাল চলিবে। পাঠক বলিতে পারেন যে তাহা হইলে অন্যান্য গুণে একত্ব লাভের আবশ্যকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে অন্যান্য গুণে একত্ব লাভ অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান লাভ ও উহার বৃদ্ধির জন্যই। প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহা প্রেমের পাত্রকে নিজের সহিত সর্ব্বতোভাবে এক করিতে চাহে. কোনওরূপ পার্থক্য সে সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং পরম পিতার অন্যান্য গুণরাশিতে একত্ব লাভের জন্য পরম সাধকের সাধনা একান্ত আবশ্যকীয়। সাধকদ্বয়ের মধ্যে অভিধান প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে. পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। প্রেমার্থী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের গুণরাশি অন্যের গুণরাশির সহিত যতই সমতা লাভ করিবে, প্রেম ততই গভীরতা প্রাপ্ত হইবে। পরব্রহ্মের প্রতি সাধকের প্রেমের গভীরতা অর্জ্জন করিতে হইলেও তাঁহার

উন্নতই কেহ নাই, তাঁহার হইতে অধিকতর উন্নত হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

* ইহার বিস্তারিত আলোচনা "গুণ বিধান" ও "সোহহং জ্ঞান" অংশদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

** তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

(সাধকের) একত্বের সংখ্যা সেইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কারণ, পরব্রহ্ম নিত্য অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ বা ওঁং। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সাধকের একত্বের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, তিনি ততই পরম পিতার প্রেমে নিমগ্ন হইতে থাকিবেন। ভক্ত অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছেন :—

"ডুবিব অতল সলিলে প্রেম সিন্ধু নীরে আজ"।

ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের বলিতে হয় যে পরমপিতার অপার কৃপায় প্রথমে তাঁহার নিকট উপবেশন, তৎপর তাঁহাতে ডুবিতে চেষ্টা ও তৎপর তাঁহাতে মগ্ন হওয়া পরম সাধকের শুভাদৃষ্টে সংঘটিত হয়। এই নিমগ্নতারও ক্রম বর্ত্তমান। কারণ তিনি অতল প্রেম জলধি। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমে ডুবিতে পারিলে, সেই অতল প্রেমজলধি জলে নিত্য নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিলে অন্যান্য গুণরত্নরাজি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য হয়। সাধকরত্ন পূর্ণত্বের দিকে প্রধাবিত. তিনি অনন্ত গুণ লাভ করিতেই ব্যাকুল। অন্যথা তাঁহার পূর্ণতা লাভ হয় না। আবার সম্পূর্ণ গুণ সামঞ্জস্য না হইলে প্রেমের সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না। ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত। সুতরাং পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সেই অপূর্ব্বা, অতুলনীয়া, অনির্ব্বাচ্যা অবস্থা লাভ করিতে সাধকেরও প্রত্যেক গুণে একত্ব এবং অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করাও একান্ত আবশ্যকীয়।

পরম পিতার স্বগুণ-পরীক্ষারূপ কার্য্যে তাঁহার প্রত্যেক গুণের শক্তি পরীক্ষিত হইবে। পরীক্ষা জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞানের কার্য্যও সেই উদ্দেশ্য সাধনে দেখিতে পাই। পরম পিতার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা যে সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান, তাহা আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা দ্বারা বুঝিতে পারি। সৃষ্টি যে জ্ঞান মণ্ডিতা ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সৃষ্টির যে অংশ ধরা যাউক্, তাহার পর্য্যালোচনে আমরা বুঝিতে পারি যে ইহার পশ্চাতে জ্ঞানময় স্রষ্টা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, নতুবা অজ্ঞান জড় এইরূপ বিশ্বগঠনে ও পরিচালনে সমর্থ হইতে পারিতেন না। যাহারা জ্যোতিষতত্ত্ব

(astronomy) অবগত আছেন, তাহারা জানেন যে একজন পরম গণিতজ্ঞ (Greatest Mathematician) সৃষ্টির গঠন ও পরিচালনা করিতেছেন, নতুবা এইরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে গণনা সম্ভব হইত না।* জ্ঞানময়ী শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে এই বিচিত্রা সৃষ্টি কিছুতেই সম্ভব হইত না। অথবা যদি বা ধরিয়া নেওয়া যায় যে উহা সম্ভব হইত, তবুও উহা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল সৃষ্টির গঠন ও পরিচালনায়ই যে আমরা অনন্ত জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিচয় পাই, তাহা নহে, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে প্রকৃতি গ্রন্থ পাঠে আমরা অসীম জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন:

অজ্ঞান সন্তানে জ্ঞান করিবারে বিতরণ,
পশুপাখী আদি সবে, শোভিছ জ্ঞান-নিদানে।
আকাশেতে করি দৃষ্টি, হেরিয়া অনন্ত সৃষ্টি
হৃদয়ে জ্ঞানের বৃষ্টি, হয় নাথ তব গুণে।

(তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত)

"গুণ-বিধান" অংশে এবং অন্যান্য স্থলে প্রকৃতির শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। পাঠক তাহা পাঠ করিবেন। স্থূল, সাধক যদি ইচ্ছা করেন, তবে প্রকৃতি হইতে এত অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন যে তাহা দ্বারা তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। প্রকৃতিই আমাদের আদি গুরু। আবিষ্কারের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলেও অনেক সময় প্রকৃতিতেই উপনীত হইতে হয়। মহাজ্ঞানী Newton দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার বৃক্ষ হইতে ফলের পতন দেখিয়াই সম্ভব হইয়াছিল। Steam Engine এর আবিষ্কারের মূলেও প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ। মানব সৃষ্টির পরেই জ্ঞানলাভের জন্য সৎগুরু

* Sir James Jeans বলিয়াছেন :—

ur efforts to interpret Nature in terms of concepts of pure mathematics have so far proved brilliantly successful. (The Mysterious Universe).

অথবা বর্ত্তমানে প্রচলিত নানা অমূল্য গ্রন্থরাশির কোন সাহায্যই মানুষ পায় নাই। তখন তাহার প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ ও প্রকৃতির শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াই জীবন যাপন ও যাহা কিছু ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইত। অনেক জ্ঞানী ব্যাক্তি প্রকৃতিকে মহাগ্রন্থ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে যে প্রকৃতি দেবীকে অপার শক্তি-ময়ী, স্নেহময়ী জননী এবং সর্ব্বকালে বন্ধুভাবে সহায় বলেন, তাহার মধ্যে সত্য নিহিত রহিয়াছে। জড়কে সর্ব্বশাস্ত্রেই চেতনা শূন্য পদার্থ বলা হয়। উহা চালাইলে চলে ও থামাইলে থামে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। সাংখ্যদর্শন বলেন যে জড় প্রকৃতিই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। তথাপিও জড়কে চালাইতে একজন চৈতন্যবান পুরুষের প্রয়োজনীয়তা উহা বোধ করিয়াছেন। যদি সেই দর্শন চৈতন্যবান পুরুষের উপস্থিতিও বর্জ্জন করিতে পারিতেন, তবে তাহাও করিতেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা সাংখ্যকার সম্ভব মনে করেন নাই।* সুতরাং এই সৃষ্টির পশ্চাতে যে একজন জ্ঞানময় স্রষ্টা নিত্য বর্ত্তমান, ইহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং ইহাও সহজবোধ্য যে এই বিশ্ব জ্ঞানমণ্ডিত। গভীর অনুসন্ধানে সেই সত্য তত্ত্ব আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে, সেই সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই অথবা তাহা ভিন্নও আমরা বুঝিতে পারি যে ইহা প্রেমময়ী। আমরা ঘরে ঘরে প্রেমের লীলা দেখিতে পাই। জগৎ মুহূর্ত্তের জন্যও প্রেম শূন্য নহে। যদি তাহাই হইত, তবে জীবন যাপন অসম্ভব হইত। কেহ কেহ বলিবেন যে জগতে অপ্রেম আছে। তাহা সত্য হইলেও প্রেম যে জগত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং অপ্রেমকে পরাজয় করিয়া আপন মহিমায় আপনি প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়াছেন :—

* সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা "সাংখ্যমত বিচার" অংশে দেখিতে পাইব।

"প্রেম বিনে তা মিলবে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হলে ?
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে ?"

আজ যে পৃথিবীর এক প্রান্তে দুঃখের ক্রন্দন উত্থিত হইলে অন্য প্রান্তে তাহার সকরুণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে প্রেম ; আজ যে এক জাতির উপর অন্য জাতি অত্যাচার করিলে জগৎ অত্যাচারিত জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহার মূলেও প্রেম ; আজ যে ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জল প্লাবন প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত হইলে সুদূর আমেরিকা সাহায্য দানে মুক্ত হস্ত হন, তাহার মূলেও প্রেম ; আজ যে নানা দেশে নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান চলিতেছে ও উহার জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহার মূলেও প্রেম ; আজ যে নিষ্পেষিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অধঃপতিত নর নারীর জন্য পৃথিবী-ব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূলেও প্রেম। গত ১৯৪০ সনের ২৭শে আগষ্ট তারিখে Dr H. C. Mukerjee, M. L. A. মহাশয় (তিনিই পরে পশ্চিমবঙ্গের Governor হইয়াছিলেন) Bengal Legislative Assembly-তে বলিয়াছিলেন যে Protestant খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ ১৭৫০০ প্রতিষ্ঠানের জন্য দুই কোটী নব্বই লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় করেন। Roman Catholics খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ বৎসর বৎসর ঐরূপ টাকা ব্যয় করেন। Protestant ধর্ম্মপ্রচারকগণের ব্যয়ের অর্থের মধ্যে প্রায় দেড় কোটী টাকা ভারতের বাহির হইতে আসে। যদি Roman Catholic ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাহির হইতে ঐরূপ অর্থ আনিয়া ভারতবর্ষে ব্যয় করেন, তবে অল্পাধিক তিন কোটী টাকা বাহির হইতে আসিয়া বৎসর বৎসর নানা সদ্ভাবে ব্যয়িত হইতেছে। ইহার মূলেও কি প্রেম নহে ?*

---

* কেহ কেহ বলেন যে ইহার মূলে রাজনৈতিক কারণ নিহিত আছে। আমাদের সেরূপ মনে হয় না। আমরা মনে করি যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিশ্বাস করেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মই জগতের একমাত্র ধর্ম্ম ও তাহা জগতের ঘরে ঘরে প্রচার করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাই ধর্ম্মপ্রচারকগণ উক্ত ধর্ম্ম

সাধারণে মনে করে যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রেমের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এস্থলেও প্রেম তাহার কার্য্য করে। নতুবা পৃথিবী ব্যাপী কাজ কারবার অচল হইত। সমস্ত বাণিজ্যের মূলে বিশ্বাস কার্য্য করিতেছে। ব্যবসায়ী মাত্রই জানেন যে বিশ্বাস ভিন্ন কারবার চলিতে পারে না। এই যে মানবের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ইহার মূলেও পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব। এই সদ্ভাব মূলতঃ প্রেমেরই ক্ষুদ্রাংশে প্রকাশ। এস্থলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে সকল ক্ষেত্রে প্রেমের পরিমাণ সমান নহে, অল্পাধিক আছে।

আরও শত সহস্র ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে প্রেম সকল কার্য্যের মূলে বর্ত্তমান এবং প্রেমই সর্ব্বত্র আপন প্রাধান্য স্থাপন করিয়া দেদীপ্যমান ভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সর্ব্বোপরি বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জীব সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। কেহ বলিতে পারেন, উহা প্রেমের জন্য নহে কিন্তু কামের জন্যই। তাহার মনে রাখিতে হইবে, কাম প্রেমেরই বিকার, প্রেম দেহ সংসর্গে আসিয়া কাম রূপে ব্যক্ত হয়। কামই যে দোষাংশ সম্পূর্ণরূপে বিবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বর-প্রেমের অঙ্কুররূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়াছেন ঃ—

"প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ওরে প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, সেই প্রেম পবিত্র হলে।"

প্রচারই একমাত্র জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহু ক্লেশ ও নানাবিধ বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা Hill Tribes প্রভৃতি জাতির মধ্যেও ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মপ্রচারের মূলে প্রেম। প্রেম ও জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার বাক্য ব্যয় মাত্র। যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের মূলে থাকিত, তবে British মিশনারী ভিন্ন অন্যান্য দেশের মিশনারীগণ ভারতবর্ষে আসিতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে এস্থানে আমেরিকা, জার্ম্মেনী, ইটালি প্রভৃতি নানা দেশীয় মিশনারীগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন ও করিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের দেশে ও অন্যান্য স্বাধীন দেশেও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারের মূলে যে প্রেম, তাহা সুনিশ্চিত।

পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, যে বস্তু যত ভাল, তাহার * বিকৃতিতে উহা ততই মন্দ হয়। অনেক দৃষ্টান্ত না দিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমই সর্ব্ব প্রেমের মূল এবং এই প্রেম প্রকৃতভাবে এবং গভীর ভাবে সাধন করিতে পারিলেই ঈশ্বর প্রেম লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু পতি পত্নী কামই একমাত্র লক্ষ্যের বস্তু মনে করিয়া যখন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী হন এবং প্রেম ভুলিয়া ব্যভিচারে রত থাকেন, তখন তাহাদের সম্বন্ধ যে কি বিষময় হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। অপর দিকে গভীর প্রকৃত প্রেমে সুমিলিত দম্পতির জীবন যে কত মধুময়, তাহা আমরা সকলেই জানি।

* এস্থলে "এই প্রেম পবিত্র হইলে" উক্তিতে কেহ কেহ এই বলিয়া ত্রুটী ধরেন যে প্রেম সর্ব্বদাই অনন্তভাবে পবিত্র, সুতরাং "যদি ইহা পবিত্র হয়", এই উক্তির সার্থকতা কোথায়? অবশ্য এই বাক্যের এইরূপ বাহ্যিক অর্থ ধরিলে উহাতে ত্রুটী আছে বলিতে হইবে। কিন্তু উহার বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়া প্রকৃত অর্থ চিন্তা করিলে পূর্ব্ব কথিত তত্ত্বের সঙ্গে সমন্বয় হয়। সাধারণে সাধারণের মধ্যে প্রেমও দেখে এবং কামনা বাসনাও তাহাতে সংশ্লিষ্ট দেখে। সুতরাং সাধারণকে উপদেশ দিতে হইলে সঙ্গীত রচয়িতার বলিতে হইবে যে প্রেম পবিত্র হইলে অর্থাৎ কাম গন্ধহীন হইলে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার হীন বাসনা, কামনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইলে এবং সেই পবিত্র, সরল প্রেমপূর্ণ হৃদয় যদি পরম পিতার জন্য প্রেম ব্যাকুল হয়, তবে সেই প্রেম সেই সাধককে অনন্ত প্রেমময়ের শ্রীচরণ প্রান্তে লইয়া যায়। ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ এই তত্ত্বই সমর্থন করে। সাধারণ মানবের জীবনে ও সাধকের প্রথমাবস্থায় কাম বিবর্জ্জিত প্রেম থাকে না। কিন্তু সাধক কঠোর সাধনা দ্বারা সেই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা লাভ করেন। সুতরাং প্রেম পবিত্র হইলে তাঁহার কাছে লইয়া যায় এই উক্তিতে ও পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বে কোনই প্রভেদ নাই। উপরোক্ত উক্তিতেও প্রেম যে কি এবং উহার কার্য্য যে কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে প্রেম নিত্যই অনন্ত ভাবে সুপবিত্র। উহার বিকার কামই চির অপবিত্র দোষ। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন "তুমি পাবন মোহন প্রেম রসে।" যে পদার্থ অন্যকে পবিত্র করে, তাহাতে যে পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী ভাবে বর্ত্তমান, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রেম দ্বারা যে স্থিতি হইতেছে অর্থাৎ পালন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে. তাহা জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মাতা পিতার সন্তান পালন কার্য্য, আত্মীয় স্বজন দ্বারা দুরবস্থাগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণ, রোগে চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষা, দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান. শিক্ষা দান ও বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠান সংঘটন, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থশালা নির্ম্মাণ ও পরিচালনা প্রভৃতি কোটী কোটী কার্য্য আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে উহারা প্রেম দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। এই সকল কার্য্যের মূলে প্রেম না থাকিলে উহারা কখনই সম্ভব হইত না এবং পালন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অচল হইত। কেবল মানব সমাজেই প্রেমের দ্বারা পালন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না, কিন্তু ইতর জীব জগতেও প্রেমের দ্বারা সেই কার্য্যই সংঘটিত হইতেছে। উহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস আমরা "ইতর জীবের কথা" অংশে লাভ করিব। প্রেম দ্বারা যে সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পাদিত হয়, তাহা লিখিত হইল।

প্রেম দ্বারা যে লয় কার্য্যও সম্পন্ন হয়, সেই সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পাঠককে এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" এবং "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লয়ের অর্থ কি? "গুণ বিধান" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং জীবাত্মার কোনই ক্ষয় বা লয় নাই। তবে লয় কাহার? জড়ের অর্থাৎ দেহেরই লয় হয়। পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন যে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকেরও অনন্ত সাধনা করিতে হয় এবং অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণ সাধনাই পরিশেষে সাধকের ব্রহ্মপ্রেমকে ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে প্রধাবিত করিতেছে। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে জীব যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তিনি স্থূলতম হইতে স্থূলতর, স্থূলতর হইতে স্থূল; সেইরূপ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম; কারণ, কারণতর, কারণতম দেহ ধারণ করিবেন। এই যে দেহের ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা লাভ, তাহাই দেহের লয় এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকিবে। এই

লয়কেই লয় বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সকল জীবই ক্রমশঃ আত্মিক উন্নতির পূর্ণতা দ্বারা ত্রিবিধ অসংখ্য দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবেন ও ব্রহ্মপ্রেমের পূর্ণতা লাভ করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন, যেমন ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক হইয়া যায়।*

পুরাণে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণুকে পালন কর্ত্তা এবং শিবকে লয় কর্ত্তা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে পুরাণকার ইহাই প্রকাশ করিতে চাহেন যে প্রলয় যিনি করেন, তিনি মঙ্গলময়। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মঙ্গলের মূলে ব্রহ্মপ্রেম প্রধানভাবে নিত্যকার্য্য করিতেছেন। আর মঙ্গলের মূলে যে প্রেম অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা আমরা সহজ জ্ঞানেই ধারণা করিতে পারি। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব যে মহাপ্রলয় ব্রহ্মের প্রেম দ্বারা সংঘঠিত হইবে।

মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে জীবের লয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই বুঝিতে পারি যে উহাদ্বারা জীবের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সম্পাদিত হইবে। জীবের প্রথম সৃষ্টিমূহূর্ত্তে বহুভাবে ভাসমানেচ্ছু অনন্ত প্রেমময় জন্মদাতা পরমপিতা স্বেচ্ছায় সেই আদি দেহের হৃদয় গুহায় যেন নিজেকে ধরা দেন বা আবদ্ধ হন।** উদ্দেশ্য এই যে সেইরূপে ভাসমান জীব তাহার অনন্তপ্রায় জীবনে অসংখ্য পরীক্ষার ভিতর দিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিবেন, সমস্ত জীবন ভরিয়া তিনি অনন্ত গুণের পরমোন্নতি

---

* এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থে যে স্থলে "মহাপ্রলয়ে জীবের ব্রহ্মে লয়" "পূর্ণামুক্তিতে জীবের ব্রহ্মে লয়" অথবা ঐরূপ সম অর্থসূচক বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে যে জীবের ত্রিবিধ দেহের সম্পূর্ণ বিগম বা লয় বলা হইয়াছে। আত্মা এক, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত বলিয়া বহুভাবে ভাসমান। জীবের লয় অর্থে বুঝিতে হইবে যে সেই আবরণেরই লয় হইয়াছে মাত্র, জীবাত্মার লয় বা ক্ষয় হয় না বা হইতেও পারে না। জড়েরই লয় হইয়া থাকে, আত্মার নহে। আত্মা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। মহাপ্রলয় এক মুহূর্ত্তে হইবে না। ইহাতে অধার্য্য সুদীর্ঘকাল ব্যয়িত হইবে।

** এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

সাধন করিবেন, কত অসীম সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া তিনি জীবনাতিপাত করিবেন। জীব সজ্ঞানে অজ্ঞানে অনন্ত প্রেমময়ের সুগভীর প্রেমাকর্ষণে পূর্ণত্বের দিকে প্রধাবিত। যখন সাধকরত্ন অত্যুন্নত অবস্থা লাভ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিণতি সাধন জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং ক্রমশঃ আরও উন্নতির সাথে সাথে ঐ আকাঙ্ক্ষা বলবতী, বলবত্তরা ও বলবত্তমা হয় এবং পূর্ণত্বের দিকে গতিও দ্রুতা, দ্রুততরা ও দ্রুততমা হয়।* কিন্তু সাধকের লাভ করিতেও হইবে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের অনন্ত একত্বের একত্ব। সুতরাং তাহাতে তাঁহার অনন্ত প্রায় কালের প্রয়োজন হইবে। অতএব যে পূর্ণত্ব লাভের জন্য জীব অনন্ত প্রায়কাল সজ্ঞানে অজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিত ও পূর্ণত্বের দিকে প্রধাবিত এবং অত্যুন্নতা অবস্থা লাভের পর যে আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ তীব্রা, তীব্রতরা ও তীব্রতমা হয়, যে অতুল্যা, অমূল্যা, অচিন্ত্যনীয়া, অনির্ব্বাচ্যা অবস্থা সেই প্রলয় কার্য্য আনয়ন করে, তাহা যে অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণা, ইহা যুক্তিযুক্ত এবং সহজবোধ্য। আবার সেই মঙ্গলের মূলে যে অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম বর্ত্তমান, তাহাও সহজবোধ্য। ইহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষিপ্তভাবে আমরা করিয়াছি এবং ইতঃপর অন্যান্যস্থলে ও বিশেষতঃ "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব অংশে" আমরা দেখিতে পাইব। ইহা বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মপ্রেম আমাদিগকে অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার দিকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন এবং সেই জন্যই সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে তাঁহার দিকেই সর্ব্বদা আমরা চলিতেছি। এই বিশ্বলীলা অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা। সৃষ্টি ও স্থিতি যে প্রেম দ্বারা সংসাধিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে

---

* জীবাত্মাকে ভগ্নাংশ বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে তিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা বটেন, কিন্তু দেহ বদ্ধতা জন্য অংশ ভাবেই—ক্ষুদ্র ভাবেই ভাসমান। এই ভাসমান অবস্থা বা বাস্তব অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে। নতুবা স্বরূপে উভয়েই এক। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য।

জীবের জীবনে প্রেমলীলার সমাপ্তি সংঘটিত হয়, সেই কার্য্যও অর্থাৎ পূর্ণামুক্তিও যে তাঁহার প্রেম, অতুলনীয় প্রেম, অধারণীয় প্রেম, অনন্ত প্রেম দ্বারা সুসম্পন্ন হয়, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এক অর্থে পূর্ণা মুক্তি বা লয় জীবের প্রতি পরম প্রেমময়ের প্রেমের কার্য্য। সুতরাং সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রেমলীলার প্রথম অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতি যখন প্রেম দ্বারা সংসাধিত হয়, তখন সেই একই প্রেমলীলার শেষ অঙ্গ এবং আমাদের ধারণানুযায়ী উৎকৃষ্টতম অঙ্গ যে সেই একই প্রেম দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই।*

ইহার পরেও প্রশ্ন হইতে পারে যে মহাপ্রলয়ে জীবের ব্রহ্মে লয় যে প্রেম দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে আমরা যে মৃত্যু দেখি, তাহা যে প্রেম দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ইহার উত্তরে প্রথমেই আমাদের বক্তব্য যে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ত্রিবিধ অসংখ্য দেহ সহ জীবের আদি জন্মই দেহের একমাত্র জন্ম এবং মহাপ্রলয়ে ত্রিবিধ দেহের বিগম হইলেই তাঁহার দেহের প্রকৃত মৃত্যু হয়। এতদ্ভিন্ন যে বহুবার বহুপ্রকার দেহের জন্ম ও মৃত্যু আমরা পৃথিবীতে দেখি ও অনুমান করি, তাহাও সেই জন্ম মৃত্যুর অন্তর্গত। উহাদিগকে জন্ম মৃত্যু না বলিয়া পট পরিবর্ত্তন মাত্র বলা যাইতে পারে। মৃত্যুসমূহকে গীতার ভাষায় জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ বা সাপের খোলস পরিবর্ত্তনও বলা যাইতে

* এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে একই ব্রহ্ম প্রেম সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার নিকট তাঁহার প্রেমলীলার অঙ্গ সমূহের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই। কিন্তু আমাদিগের ধারণানুযায়ী শেষ অঙ্গকে উৎকৃষ্টতম বলা যাইতে পারে। কারণ, উহাতে আমাদের ব্রহ্ম প্রাপ্তির পূর্ণতা লাভ হয়। ইহার পূর্ব্বে যে মুক্তি, তাহা আংশিক মুক্তি মাত্র। কিন্তু পূর্ণামুক্তিতে শেষ দেহের বিগম সংঘটিত হয়, অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য সূচক শেষ চিহ্ন লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই ব্রহ্মে লয় বলা হয়।

পারে। এই যে বহুমৃত্যু, ইহাও অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলার বহু প্রকার কার্য্যের এক প্রকার কার্য্য।**

সেই আদি জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে পূর্ণামুক্তির মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনন্তপ্রায় কালব্যাপী জীবনই জীবের জীবন। আমরা যে জন্ম মৃত্যুর সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করি, উহারা সেই অতি দীর্ঘ জীবনের অন্যান্য অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটী ঘটনা মাত্র। যাহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, মানবের একবার মাত্রই জন্ম হয়, ইহা যাহাদের বিশ্বাস, যাহারা ইতর জীবকুলকে জীব শ্রেণী হইতে বাদ দেন, তাহাদের পক্ষে একটী জন্ম ও একটী মৃত্যু অতি সুদীর্ঘ জীবনের তুলনায় একটী অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সুতরাং ইহা তাহাদের নিকট কোনও সমস্যার মধ্যেই পরিগণিত হওয়া উচিত নহে। আর যাহারা বিশ্বাস করেন যে জীবের প্রথম জন্ম ইতর জীব রাজ্যের এক অতি নিম্ন স্তরে সংঘটিত হয় এবং তিনি ক্রমশঃ প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে উন্নত হইতে উন্নততর ইতর জীব দেহ ধারণ করিতে করিতে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেন, বারংবার ইহলোক ও পরলোকে যাতায়ত করেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর অধীন হন, পৃথিবীতে অবশ্য সাধ্য সাধনায় সিদ্ধি হইলেই পরলোকে চিরকাল বাস করেন, তাহারাও অনন্ত প্রায় কাল ব্যাপী জীবের জীবনের অনন্তপ্রায় ঘটনার তুলনায় পৃথিবীতে তাহার যত সংখ্যক মৃত্যু ঘটে, তাহাও অতি নগণ্য। এই সমস্যার বিচার কালে আমাদের যতদূর সাধ্য একটী জীবের অসংখ্য ঘটনাবলী সহ পূর্ব্বোক্ত অতি দীর্ঘ জীবনের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলেই অর্থাৎ সমগ্রভাবে একটী জীবন পূর্ব্বোক্ত ভাবে চিন্তা করিতে পারিলেই সহজে আমরা বুঝিতে পারি যে পৃথিবীতে ইতর জীব ও মানব ভাবে যে আমাদের বহু মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ এবং অন্যান্য সাধারণ ঘটনার ন্যায় কয়েকটী ঘটনা মাত্র। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পরলোকে পারলৌকিকগণ উন্নততর

** "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" এবং "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য

লোকে গমন করিবার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিলেই তাহারা দেহ ত্যাগ করিয়া উন্নততর লোকে প্রস্থান করেন। এঁই অর্থে সেই দেহ-ত্যাগকেও মৃত্যু বলা যাইতে পারে।* পরলোকে মণ্ডল সংখ্যা অসংখ্য।** জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে হইবে। সুতরাং সেইরূপ মৃত্যুও অসংখ্য; যখন সেই মৃত্যু তাহাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত উন্নত লোকে যাইবার পন্থা সুগম করে, তখন পার্থিব মৃত্যুর ভীষণভাব তাহাতে থাকিতে পারে না।

পৃথিবীতে যদি জীবের মৃত্যু না থাকিত তবে স্থূল বিচারেও বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবী সেই জন্যই একটী ভীষণতম দেশে পরিণত হইত। পৃথিবীতে যে দুঃখ, দৈন্য, রোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান বর্ত্তমানে দেখিতেছি, মানবের মৃত্যু না হইলে তাহা কোটী কোটী গুণ বর্দ্ধিত হইত। উহাতে পৃথিবী কেবল নরকে পতিত হইত না, কিন্তু কল্পনা দ্বারা আমরা যে ভীষণতম নরকের চিত্র অঙ্কন করিতে পারি, তাহা হইতেও কোটী কোটী গুণে ভীষণতর নরকে আমাদের জন্মভূমি পরি-ণত হইত, এই পৃথিবী মানব বাসের সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত হইত। আবার ইতর জীব সমূহের যদি মৃত্যু না হইত, তবে যে পৃথিবী কোন পিশাচের আগারে পরিণত হইত, তাহা কেহ ধারণা করিতে পারে না।*** স্থূল, আমাদের কল্পনা শক্তির এতদূর শক্তি নাই যে জীবকুলের মৃত্যু বিরহিত পৃথিবীর দুরবস্থা বর্ণনা করিতে পারে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে কালে মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে বটে কিন্তু অকালে মৃত্যু ত শোচনীয় ব্যাপার, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কাহার মৃত্যুর

---

* পরলোকেও যে মৃত্যু অর্থাৎ দেহত্যাগ হয়, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনা আছে। (১২।৯।৩।১২, ১০।৪।৩।১০ ইত্যাদি)। ভক্ত গাহিয়াছেন "মৃত্যু সে অমৃত সোপান"

** "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

*** ইতর জীবও জীব। তাহার দেহেও একই জীবাত্মা বাস করেন। দেহের গঠন জন্য ইতর জীবে ও মানবে পার্থক্য। "ইতর জীবের কথা" অংশ দ্রষ্টব্য।

কাল কখন, ইহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এস্থলে সত্যধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"মনুষ্য মাত্রই পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পাপ দ্বারা ঐ আয়ুঃ ক্ষয় হয় অর্থাৎ উহার কিয়দংশ বা সমস্ত ভোগের অনুপযুক্ত হয়, কিন্তু পুণ্য দ্বারা বৃদ্ধি হয় না। পাপ ক্ষয় হইবার পরে নিষ্পাপ হইলে পুনরায় ঐ আয়ুঃ ভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পুণ্য দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়না বটে, কিন্তু আয়ুঃর প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। কারণ, বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন এক মহাত্মার একদিনের আয়ুঃ অপরের শত বৎসরের আয়ুঃর সমান হইতে পারে। অর্থাৎ উক্ত মহাত্মা তদীয় একদিনের আয়ুঃ প্রদান করিলে ঐ ব্যক্তি শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।"

ইহাতে দেখা যাইবে যে মনুষ্যমাত্রই নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃসহ জন্মগ্রহণ করে।* সুতরাং তাহার জীবনকাল পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং যদি কাহারও পক্ষে সেই কাল অল্প হয়, তবে তিনি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করিবেন। সেইজন্য তাহার অকালমৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন যুক্তি সঙ্গত হইবে না। আবার উক্ত হইয়াছে যে সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃও পাপ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই পাপ বহু প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার পাপ আমাদের বোধগম্য হইবে। এক প্রকারের পাপ জন্মগত। অর্থাৎ জন্মের সহিতই পিতৃপুরুষগণের পাপ গর্ভস্থের উপর বর্ত্তে। চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলেন যে, কোন কোন রোগ বহু পুরুষ পর্য্যন্ত বংশে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় প্রকার পাপ স্বকৃত বহুবিধ পাপ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত, বর্ত্তমান জন্মেকৃত অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেকৃত পাপ দ্বিতীয় প্রকার পাপের অন্তর্গত। অতএব পাপ জন্য যদি আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং উহা যদি আমাদের ভাবে ও ভাষায় অকালে সংঘটিত হয়, তবে সেইজন্য সেই মানবই দায়ী। এই ভাবের মৃত্যুও মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেই সংঘটিত হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে

* ইহার প্রধান কারণ তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল।

আমরা আমাদের কর্ম্মফলের জন্য দায়ী এবং সেই ফল আমরাই ভোগ করিব। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দীর্ঘ বা হ্রস্ব জীবন আমাদেরই কর্ম্মফল জনিত। যাহা হউক, এই সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আর এস্থলে দীর্ঘ করিব না। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মৃত্যু, রোগ, শোক, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি আমাদের ভাবে ও ভাষায় অমঙ্গল সমূহও সর্ব্বদা মঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থূল, বিশ্বে মঙ্গল ভিন্ন যে অমঙ্গল নাই, তাহা সবিস্তারে সেই অংশে লিখিত হইয়াছে। উহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে মঙ্গলের মূলেও প্রেম তাঁহার অনন্ত শক্তিসহ বর্ত্তমান বলিয়াই সকল ঘটনা মঙ্গলপ্রসূ হইতে সমর্থ হইয়াছে। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মের প্রেমের শক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। সুতরাং অমঙ্গল বলিয়া আমরা যে সকল কার্য্যের আখ্যা প্রদান করি; তাহাও যে ব্রহ্মের প্রেমের বিধানেই সুতরাং মঙ্গল বিধানেই জগতে আসিয়াছে এবং একমাত্র মঙ্গলই সংঘটন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে লয় কার্য্যও অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম দ্বারাই সংসাধিত হয়।

প্রেমের ধর্ম্ম কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে প্রেমের ধর্ম্ম আত্মদান। জগতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রেমিক তাঁহার প্রেমের পাত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন। তিনি আপনাকে দিয়াই সুখী! যদি তিনি প্রেমের পাত্রের জন্য কোনরূপ সেবা অথবা তাহার প্রীতিকর অন্যবিধ কোন কার্য্য না করিতে পারেন, তবে তিনি দুঃখিত হন। জগতে প্রকৃত প্রেমের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত একান্ত পতিগত প্রাণা সাধ্বী সতীর জীবন। তিনি তাঁহার প্রাণপতির জন্য দেহ, মন, প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াও যেন সুখী হন না। তিনি তাহার জন্য আরও কি কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে সুখী করিবেন, ইহার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সাধারণের চক্ষে এই পর্য্যন্তই দেখা যায় বটে, কিন্তু গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই পরমা সতী তাঁহার গুণরাশির প্রভাব দ্বারা স্বামীর গুণরাশির

বিকাশ সাধনে সাহায্য করিতেছেন। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে সতী স্ত্রী তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার বিপথগামী স্বামীকেও সংপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। অপর পক্ষে সৎ পতিও তাঁহার গুণরাশির প্রভাব দ্বারা সতী স্ত্রীর গুণরাশির বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই ভাবে পরস্পরের মধ্যে গুণ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। প্রেমের যে ধর্ম্ম জগতে আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে অনন্ত প্রেমময় পরম-পিতার প্রেমে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান. ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। জীব সমূহ পরম প্রেমময় পরম পিতার অনন্ত প্রেমের পাত্র। তিনিই স্বয়ং প্রেমগুণে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তিনিই জীব সমূহের প্রত্যেককে মাতা পিতার একমাত্র পুত্র অপেক্ষাও অনন্ত গুণে অধিকতর ভাবে নিত্য ভালবাসেন এবং সেই জন্যই প্রত্যেককে তাঁহারই অনন্ত উদার অনন্ত প্রেমে নিত্য পরিপূর্ণ ক্রোড়ে নিত্য অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে অর্থাৎ প্রত্যেক জীবকে অনন্ত প্রেমময় পিতা নিজেকে দান করিবেন। কারণ, প্রেমের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সমান ভাবে কার্য্য করে। তাঁহার নিজেকে দান করিবার অর্থ কি? ইহার অর্থই এই যে তিনি ক্রমশঃ তাঁহার অনন্ত গুণরাশিতে তাঁহার সন্তানদিগকে বিভূষিত করিবেন। এই প্রণালী অনন্ত প্রায় কাল চলিতে থাকিবে। কারণ ক্রমই সৃষ্টির প্রণালী। কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই আত্মদানের পরিণতি সম্ভব হইবে। তখন তিনি ক্রমশঃ প্রত্যেককে অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্ব দান করিবেন। অর্থাৎ তিনি ক্রমশঃ প্রত্যেককে সম্পূর্ণ ভাবে নিজ মধ্যে গ্রহণ করি-বেন।* অর্থাৎ যে অপূর্ব্বা প্রেমলীলা সৃষ্টিতে আরম্ভ, স্থিতিতে যে প্রেমের কার্য্য দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই. সেই প্রেমের জন্যই জীবগণে তিনি ক্রমশঃ আত্মদান করিয়া করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণত্বের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং অবশেষে সেই প্রেমের জন্যই তাহা-দিগকে মহাপ্রলয়ে ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন।

---

* সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থা অতীত হইতে যেরূপ বহুকাল বা ধারণাতীত কাল গত হইয়াছে, মহাপ্রলয়েও সেইরূপ ধারণাতীত কাল ব্যয়িত হইবে।

অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অনন্ত প্রেমসিন্ধুর প্রেমেই সৃষ্টি, প্রেমেই স্থিতি ও প্রেমেই লয়কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য প্রেমেরই কার্য্য প্রকারভেদ মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার প্রেমই আদি, অন্ত ও মধ্যে বর্ত্তমান। অর্থাৎ অনন্ত প্রেমাধার পরম পিতা প্রেমেই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন, প্রেমেই জীবদিগকে বা ভাসমান রূপে সন্তানদিগকে নিত্য প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন এবং নিত্য প্রেমে চিরকাল লালন পালন করিতেছেন। আবার সেই অসীম শক্তিশালী প্রেমেই বহুকে ক্রমশঃ উন্নতি দান করিতে করিতে অবশেষে এক করিবেন। সুতরাং স্বগুণ-পরীক্ষারূপ প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য তিনি এই ভাবেই প্রত্যেক জীবের জীবনে সংসাধন করিবেন। অতএব আমরা দেখিলাম যে নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র সর্ব্বাংশে প্রমাণিত হইয়াছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩.৬)

বঙ্গানুবাদঃ—যে হেতু আনন্দ হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে। জন্মিয়া আনন্দ দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে'* (তত্ত্বভূষণ)

* এস্থলে আনন্দের অর্থ প্রেম। বহু পণ্ডিতের মতে শ্রুতিতে বহু স্থলে উক্ত 'আনন্দ" শব্দের অর্থ প্রেম। বৈষ্ণবগণের মতে বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি হইতে সৃষ্টি। প্রেম, আনন্দ ও হলাদিনী শক্তি এক প্রেমকেই বুঝাইতেছে, ভাষার পার্থক্য মাত্র। প্রেম দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে বলায় বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির মধ্যে প্রেমই একক ভাবে এই সকল কার্য্য করিতেছেন। যাহা হয় তাহা "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রেমের শক্তি অন্যান্য গুণের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার প্রেমেরই জয় লাভ হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা হইতেই এই সৃষ্টি লীলার সূচনা। ব্রহ্ম অনন্ত গুণের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং তিনি অনন্ত মঙ্গলময় বা শিবম-

ব্রহ্মের প্রেমসম্ভূতা ইচ্ছা (সিসৃক্ষা) দ্বারা যেমন সৃষ্টি হইয়াছে, প্রেমসম্ভূতা ইচ্ছা (রিরক্ষিষা) দ্বারা যেমন ইহার স্থিতি হইয়াছে, তেমনি প্রেমসম্ভূতা ইচ্ছা (জিহীর্ষা) দ্বারা বিশ্বের লয় হইবে। এই ত্রিবিধ কার্য্যই তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। এই ত্রিবিধ ইচ্ছাই সেই একই সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার প্রকার ভেদ মাত্র। উহা যে প্রেমসম্ভূতা, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলেও আমরা দেখিতে পাইলাম যে ব্রহ্মের বিবংহয়িষা, স্বগুণ পরীক্ষা ও প্রেমলীলা একই।

ইচ্ছার ব্যাপার বুঝাইতে আর অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ, জীব ও জড় জগৎ যে কর্ম্মময়, এমনকি মণ্ডল-গুলিও যে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কর্ম্ম মাত্রেরই পশ্চাতে ইচ্ছা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। "কল্পবাদ" অংশে ইহাব বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইচ্ছা অন্তরের ভাব এবং কর্ম্ম তাহারই প্রকাশ মাত্র। সুতরাং কর্ম্মজগতের পশ্চাতেও যে এক সুমহতী ইচ্ছাশক্তি চির বর্ত্তমান, ইহা স্থির নিশ্চিত।

এই অনন্ত প্রায় বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় ক্রিয়াকে অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি কার্য্যকে একটী ব্রহ্মকৃত মহাযজ্ঞ রূপে চিন্তা করিতে পারা যায়। এই যজ্ঞে পরম পুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মই হোতা, তাঁহারই প্রেমময়ী সুমহীয়সী ইচ্ছা শক্তিই তাঁহার এই সুমহান যজ্ঞে সর্ব্বপ্রধানা সাহায্য-কারিণী প্রকৃতিস্বরূপা, সেই সত্যস্বরূপ নিত্য প্রেমময়ের প্রেমময়ী ইচ্ছা সম্ভূত সুমহতী প্রেমলীলারূপ সঙ্কল্পই ইহার বেদী; এই মহাযজ্ঞের সুমহান্ উদ্দেশ্য তাঁহার স্বগুণ-পরীক্ষা বা তাঁহার অনন্ত প্রেমে বহুভাবে

দ্বৈতম্। সুতরাং তাঁহার সকল কার্য্যই সেই এক স্বরূপের কার্য্য এবং উহা মঙ্গলে চিরকাল পরিপূর্ণ। আবার সেই এক স্বরূপ তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একত্ব।

ভাসমান হওয়া।* সেই নিত্য জ্ঞানের অনন্ত জ্ঞানই ইহার অগ্নি (ক), সেই নিত্য প্রেমের অনন্ত প্রেমই ইহার হবিঃ (খ), সেই অনন্ত ও নিত্য গুণাধারের অনন্ত গুণরাশিই ইহার সমিধ্ (গ), সেই নিত্য পরম শিবের অনন্ত মঙ্গলভাবই ইহার মাতরিশ্বা (ঘ)। এই মহাযজ্ঞের বিঘ্নও বর্ত্তমান এবং তাহাই ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা সহযোগে সৃষ্টির বীজ স্বরূপ তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন জড় জগৎ ও তদুৎপন্ন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য দেহ। অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময়ের অব্যর্থ এবং নিত্য মহাবলীয়ান প্রেমাকর্ষণই সেই বিঘ্ন লয়কারী। অনন্তসন্তান সুবৎসল অনন্ত স্নেহময় পরমপিতার প্রেমরাজ্যে তাঁহারই বহুভাবে প্রকাশরূপ জীবসমূহ এবং তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতি দানই এই মহাযজ্ঞের সুমহান্ ফল। অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমে তাঁহারই প্রিয়তম সন্তানদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দানই এই মহাযজ্ঞের সুমহতী দক্ষিণাস্বরূপ। অর্থাৎ এই সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ মহাযজ্ঞে তিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে ক্রমশঃ আত্মদান করিতে করিতে তাঁহাকেই সম্পূর্ণ-

---

* ব্রহ্মের বহুভাবে ভাসমান হওয়া, স্বগুণে পরীক্ষা এবং প্রেমলীলা যে এক, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) অগ্নি প্রকাশক ও পাবক। জ্ঞানও প্রকাশক ও সর্ব্ব পাপ নাশক। তাই জ্ঞান অগ্নির সহিত উপমিত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নি শব্দ বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে গীতার ৪।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(খ) হবিঃ অপ্ জাতীয় পদার্থ সুতরাং রসবান। প্রেম অনন্ত রস পূর্ণ। ঘৃত খাদ্য হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু। (ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ)। ঘৃত antiseptic food value হিসাবে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করে। (আয়ুর্বৈ ঘৃতং)। প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তাই ঘৃতের সহিত প্রেম উপমিত হইয়াছে।

(গ) ব্রহ্মের অনন্ত গুণই সৃষ্টিতে কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমের কার্য্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছি। তাই তাঁহার অনন্ত গুণ (জ্ঞান ও প্রেম ভিন্ন) কাষ্ঠখণ্ড সমূহের সহিত উপমিত হইয়াছে।

(ঘ) অগ্নি, ঘৃত এবং কাষ্ঠখণ্ড সমূহ একত্রে মরুৎ (gas) সৃষ্টি করে। ইহাই মাতরিশ্বা। উহা সেই স্থলের হাওয়া বিশুদ্ধ করে। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত গুণ সমষ্টির কার্য্য সর্ব্বদা মঙ্গল উৎপাদন করে।

রূপে দান করিবেন এবং এই ভাবেই এই সুমহান্ যজ্ঞ পূর্ণতা বা পরিণতি লাভ করিবে। অর্থাৎ অত্যন্ত অপূর্ণতা হইতে প্রত্যেক জীব পূর্ণতা লাভ করিবে, ইহাই প্রেমলীলাময় ব্রহ্মের প্রেমলীলা এবং এই ভাবেই তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তির পরীক্ষা হইবে।

অতএব দেখা যায় যে প্রেমই বিশ্বলীলায় প্রাণস্বরূপ। আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্মই সমুদায়, তাঁহা হইতেই সকল আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই সকল প্রতিগমন করিবে। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম, তিনিই একমাত্র অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম। তাঁহারই প্রেমলীলার জন্য তাঁহারই হইতে তিনিই এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। ধন্য নিত্য অনন্ত প্রেমময়! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা! কবে আমরা তোমার এই সুমহতী প্রেমলীলার মর্ম্মবোধে সমর্থ হইব? হে অনন্ত দয়ার আধার! তুমি নিজগুণে আমাদিগের হৃদয়ে তোমার অসীম জ্ঞান প্রেমালোকে প্রকাশ করিয়া সকল অন্ধকার হরণ কর।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে জগৎ এক প্রেম সূত্রেই গ্রথিত। সেই অনন্ত শক্তিশালী গুণমনির প্রভাবেই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য চলিতেছে। আবার জগতে একটীমাত্র চৈতন্যানন্দ স্রোত যে নিত্য প্রবাহিত, ইহাও পরমোন্নত সাধকগণ প্রত্যক্ষ করেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ যে ইহা একেবারেই বুঝিতে পারেন না, তাহা নহে। ইচ্ছাশক্তি যে অণু, পরমাণু এবং আধুনিক বিজ্ঞানে নির্দ্দিষ্ট Electron, Protone প্রভৃতি হইতে বিরাট বিশ্ব পর্য্যন্ত পরিচালনা করিতেছেন, ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে এই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা একমাত্র ব্রহ্মেরই। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রেম, জ্ঞান ও ইচ্ছা সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বের সকল সুবিধান করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন হইবে যে অনন্ত প্রেমময় পিতা এই বিশাল সৃষ্টিকার্য্য

কেন করিতেছেন। ইহার উত্তর ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে তিনি লীলার্থই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতে-ছেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে ইহার লয় সাধন করিবেন। এখন সেই লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে যাইতেছি।

ওঁং জ্ঞান-প্রেমময়ম্ ওঁং

ওঁং

"মূল কথা, এই পরীক্ষা বা সৃষ্টি ব্যাপার লীলাময়ের লীলা-মাত্র। যে স্থানে সাধক এই মহতী লীলার মর্ম্মবোধ করিয়া প্রযত্ন সহকারে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন, সেই মহিষ্ঠ মহাত্মাই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনন্ত প্রেমানন্দ পারাবারে ও অনন্ত জ্ঞানানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া চরিতার্থ হইতে পারেন।" (পরমর্ষি গুরুনাথ)

—(০)—

লীলাতত্ত্ব

আমরা পূর্ব্ব অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার অনন্ত-শক্তি-সম্পন্না প্রেমময়ী ইচ্ছা সহযোগে তাঁহার অব্যক্ত গুণ হইতে এই বিরাট্ বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং পরিশেষে সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সুদূর ভবিষ্যতে উহার লয় করিবেন। তিনি তাঁহার প্রেম প্রভাবে নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন এবং সৃষ্টি উদ্দেশ্য তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা বা বহুভাবে ভাসমান হওয়া বা আত্মদানের মহাপ্রেমলীলা। সুতরাং চিন্তা করিতে গেলে লীলাময়ের প্রেমলীলার যৎকিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার চির প্রেমলীলার সুমহান্ তত্ত্ব যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করা মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তবে যথাসাধ্য তাঁহার প্রেমলীলাতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রয়াস করিয়াছি মাত্র। অনন্ত জ্ঞানময় পিতা, অনন্ত স্নেহময় পিতা, অনন্ত দয়ার আধার পরমপিতা এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তাঁহার দীনহীন সন্তানের সহায় হউন, ইহা তাঁহার নিকট আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। "সৃষ্টি প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র" এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু আপত্তি সচরাচর উত্থিত হয়। সেই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং তাহাতেই লীলাতত্ত্ব সমূহ উদ্ঘাটিত হইবে।*

* এই সম্পর্কীয় কোন কোন আপত্তি পূর্ব্ব অংশে আলোচিত হইয়াছে। আবার "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" ও "কল্পবাদ" অংশদ্বয়েও কিছু কিছু আলোচিত হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম কেন প্রেমে নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিলেন ? তিনি এককই ছিলেন, এককই থাকিতে পারিতেন। তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টি যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টি ব্রহ্মের প্রেমলীলামাত্র। এতদর্থে তিনি বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে বহু ভাবে ভাসমান জীবসমূহকে তিনি অপূর্ণত্ব হইতে ক্রমশঃ পূর্ণত্ব দান করিবেন। অর্থাৎ এই প্রেমলীলা ব্রহ্মের আত্মদানের অভিনয় মাত্র। এই লীলা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ ইচ্ছা জনিত। কোনও বাধ্যবাধকতায় বাধ্য হইয়া তিনি এই কার্য্য করিতেছেন না। অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁহার সম্পূর্ণ খুসীর উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, সৃষ্টি হইয়াছে, ইচ্ছা না করিলে উহা হইত না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "মায়াবাদ" অংশে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি নিত্যই অনন্ত গুণাতীত। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণ বা স্বরূপ আছে সত্য, কিন্তু তিনি উহাদের উপরে অবস্থিত। অর্থাৎ He is above all His infinite attributes or He transcends them all তিনি মানুষের ন্যায় কোনও গুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন না, কিন্তু তিনি নিত্যই তাঁহার অনন্ত গুণ পরিচালনা করেন। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। তাঁহার সকল কার্য্যই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যকে তাঁহারই লীলা মাত্র বলা ছাড়া গতি নাই। সৃষ্টিকার্য্য যে তাঁহার কোনও প্রকার অভাব পূরণের জন্য নহে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টির জন্য তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম প্রভৃতি অনন্ত গুণের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। আবার সৃষ্টি না হইলেও উহাদের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। আরও বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অখণ্ড ও পূর্ণই ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও সেই

ভাবেই আছেন এবং মহাপ্রলয়ের পরও তিনি একই ভাবেই থাকিবেন। তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন নাই, তিনি নিত্য নির্ব্বিকার। তিনি নিজে নিজেকে প্রেমে বহুভাবে ভাসমান করিতেছেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাতে খণ্ডিত হন নাই, আমাদের ধারণীয় ভাবে বহু হন নাই। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম কি প্রকারে এক ও অখণ্ড থাকিয়াও বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সৃষ্টির জন্য তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। অন্য ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির প্রথম মহাশুভ মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়ের শেষ শুভ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মেরই অন্তর্গত ছিল আছে ও থাকিবে। সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে ইহা চিন্তা করিলে অযৌক্তিক হইবে না যে তিনিই সমুদায়। সুতরাং এক অর্থে এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ যে তিনি একই ছিলেন ও একই আছেন। জগৎ চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু নিত্য নহে। উহা সৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই লয় হইবে। সুতরাং এক অখণ্ড ব্রহ্মেরই নিত্য সত্তা নিত্য পূর্ণভাবে বর্ত্তমান।* পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা তাঁহারই ভাসমান অবস্থা। তিনি স্বয়ং বহু জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহারই ইচ্ছা সহযোগে জড় জগৎ রূপে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং একমাত্র নিত্য সত্য তত্ত্ব একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই। অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট বা অনুমিত হয়, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই বহুভাবে ভাসমানত্ব মাত্র।

এখন প্রেমে বহুভাবে ভাসমান হওয়ার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত প্রেমতত্ত্ব দেখিতে পাইব। উহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে

* এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক যতই অগ্রসর হইবেন, এই বিষয় ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জীব বলিতে আত্মা+দেহ। মহাপ্রলয়কালে আত্মা ত্রিবিধ দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় হইবেন এবং অব্যক্ত গুণে তাঁহার ইচ্ছা জনিত যে কারুকার্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা আর থাকিবে না।

আত্মপ্রেমই সর্ব্বপ্রেমের মূলে। অর্থাৎ আমরা নিজেকে ভালবাসি বলিয়াই সকলকে ভালবাসি। এই আত্মপ্রেমই মানব সাধারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ দেহকেই আত্মা মনে করি এবং দেহকে অত্যন্তরূপে ভালবাসিতে যাইয়াই স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু প্রেম একটী নিত্য সত্য গুণ। উহাকে দোষ যতই আবরণ করিয়া রাখুক না কেন, উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিবেই। তাই জগতে আমরা প্রেমলীলা দেখিতে পাই। আমরা বাল্যে মাতাপিতা, ভাই-বোনদিগকে ভালবাসি এবং যৌবনে বিবাহ সূত্রে স্ত্রী পুরুষ আবদ্ধ হয়। পুরুষ নিঃসম্পর্কিতা একটী স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রী নিঃসম্পর্কিত একটী পুরুষকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। এই ভালবাসা সময় সময় প্রকৃত প্রেম, অভেদজ্ঞান প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দম্পতি ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকেন না। তাহারা একীভূত হইয়া বহু হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। যে দম্পতির কোনও সন্তান হয় নাই, তাহারা চিরবিষণ্ণ থাকেন। সুতরাং দেখা যায় যে মানব নিজেকে নিজে ভালবাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি নিজে বহু হইয়া অথবা অন্যকে অবলম্বন করিয়াও প্রেম সার্থক করিতে প্রয়াসী হন।

অতএব আমরা প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা করিলে উহার দুইটী দিক্ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ আত্মপ্রেম বা নিজেকে নিজে ভালবাসা। দ্বিতীয়তঃ অন্যের প্রতি প্রেম। আমরা আরও দেখিতে পাই যে আত্মপ্রেমই সর্ব্ব প্রেমের মূলে। অন্যকে বা সন্তানকে যে ভালবাসা, সেই প্রেমও আত্মপ্রেম হইতে আগমন করে। এখন আমরা যদি পরম প্রেমময় পরম পিতার সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে তিনিই নিত্যই অনন্ত প্রেমে পরিপূর্ণ বা তিনি প্রেমস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে আত্মপ্রেমও নিত্য পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। প্রেমের স্বভাবের অন্য দিক্ অর্থাৎ আপনাকে বহুভাবে ভাসমান করিয়া তাহাদিগকে প্রেম করা। প্রেমলীলায় তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়া প্রত্যেককে অনন্ত প্রেমে ভালবাসিতেছেন এবং সেই

অনন্ত অপূর্ব্ব প্রেমের জন্যই তাঁহার প্রত্যেক সন্তান তাঁহারই অনন্ত গুণে গুণবান হইবেন। সৎ জনক জননী সন্তান সম্বন্ধে কি করেন? যাহাতে সন্তান নানাগুণে বিভূষিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের উদার আদর্শ সন্তানের আদর্শ হয়, যাহাতে সন্তান সেই আদর্শের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে, সেই জন্যই তাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ প্রেমে পরমপিতা বহুভাবে ভাসমান হইয়া সেই বহুর প্রত্যেককে তিনি আত্মদান করিবেন, অপূর্ণতা হইতে পূর্ণত্বে গ্রহণ করিবেন। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে এবং পরে আরও লিখিত হইবে। সুতরাং প্রেমের স্বভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এই বিশ্বকার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মের বহুভাবে ভাসমান হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে প্রেম করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ হয় নাই, বরং তাঁহার প্রেম স্বভাব সঙ্গতই হইয়াছে। এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মানব ত তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু ও স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি প্রেম করিয়াই অন্য প্রেম সাধন করিতে পারেন। অন্য প্রেম সাধনের জন্য সন্তানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, তাঁহার হইতে উচ্চ বা তাঁহার সমান কেহ নাই বা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার অন্য প্রেমের জন্য সন্তানতুল্য জীব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে সন্তান না থাকিলে মানব হৃদয়ে যে স্থান শূন্য থাকে, তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুগভীর এবং তাহা অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম সন্তানার্থ বহু হইয়াছেন। (বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি)। জীবকুল তাঁহারই সন্তান। জীব যতই পরমোন্নত হউন না কেন, তিনি পূর্ণা-মুক্তির পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মের নিকট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। পার্থিব ভক্তির অর্থাৎ মাতা, পিতা, গুরু, দেবদেবীগণের প্রতি ভক্তি প্রেমে লয় হয়, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির লয় নাই। উহা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম চির-কালের বা সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী কালের ভক্তিভাজন। এই সম্বন্ধে

"সোঽহংবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে আরও বক্তব্য এই যে সন্তান না হইলে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদি হইতে পারে না। পিতাই হউন্, মাতাই হউন্, তাঁহারাও একজনের সন্তানই বটেন। সুতরাং সন্তানই নানা উপাধি ধারণ করে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রেমের যখন দুইটী দিক্ যথা আত্ম-প্রেম এবং অন্য প্রেম * তখন কেন সৃষ্টি অনাদি হইবে না। অর্থাৎ ব্রহ্মের উভয় প্রকারের প্রেমের কার্য্যই কেন অনাদি কাল হইতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে না? অর্থাৎ তিনি কেন অনাদি কাল হইতেই নিজে নিজেকে বহু করিয়া প্রেমকে দ্বিতীয় প্রকারের সার্থকতা দান করিলেন না? ইহার উত্তরে প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে বহুভাবে ভাসমান হওয়ার অর্থই জড় জগতের এবং তাহা হইতে অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য দেহের সৃষ্টি। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। সৃষ্টি একটী ক্রিয়া। সুতরাং উহার পশ্চাতে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। ইচ্ছা ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে না। এই ক্রিয়াই প্রেমময়ের প্রেমলীলা। এই প্রেমলীলার জন্য জীব ও জগৎ আসিয়াছে। কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য কাহারও সর্ব্বদা ইচ্ছার উদয় হয় না। কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তেই উহার উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই ক্রিয়ার আদি আছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছা যখন বাধা-বাধকতাশূন্যা, তখন সেই ইচ্ছার নিশ্চয়ই আদি আছে। আর যে পদার্থের আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। এই জন্যই উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই সাদি ও সান্ত, কিন্তু কখনও অনাদি অনন্ত নহে। সৃষ্টি একটী বিরাট্ ব্যাপার, উহা এক মুহূর্ত্তে উৎপন্ন, স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয় না।

* "অন্য প্রেম" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের সন্তানগণ তাঁহার হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্ ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদাভেদ সম্পর্ক চির বর্ত্তমান। এই ভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই জীবকে অন্য বলা হইল, জীবাত্মার স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নহে। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। ইহা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে।

উহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ধারণা করা যায়। ইচ্ছাশক্তিশূন্য ও গুণশূন্য ব্রহ্ম হইতে এইরূপ ক্রিয়াশীল বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন জগতের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ যে অসম্ভব, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর দিকে আত্মপ্রেমের জন্য জাগতিক ক্রিয়ার ন্যায় কোনও ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি অনাদি কাল হইতেই আত্মপ্রেম করিতেছেন, কিন্তু অন্য প্রেমের আদি আছে, যেমন মাতা পিতার পক্ষে সন্তান উৎপাদন এবং তাহাকে স্নেহ করার আদি আছে।

যদি বলেন যে বিশ্ব স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে আপনা আপনি সঞ্জাত অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই উহা তাঁহার স্বভাবজাত, তবে বলিতে হয় যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতে আপনা আপনি একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মই উৎপন্ন হইতে পারেন, অন্য কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। অপূর্ণ জগৎ সমগ্র ব্রহ্ম হইতে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্যভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মেরও জন্ম হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে বহু ব্রহ্মের আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। পাঠক মনে রাখিবেন যে এই স্বভাবজাত উৎপত্তির মধ্যে ব্রহ্মের ইচ্ছার কোনই কার্য্য নাই, জগৎ আপনা আপনি হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মও যেমন অনাদি অনন্ত, জগৎও তেমনি অনাদি অনন্ত। আর জগৎ যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতে আপনা আপনি আসে নাই, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে জগৎ অত্যন্ত ভাবে অপূর্ণ ও উহাতে আত্মিক কোন গুণই যথা জ্ঞান, চৈতন্য, প্রেম প্রভৃতি দেখা যায় না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে জগৎ ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে আমরাও ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া থাকি, তবে কেন এই আপত্তি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমাদের মতে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের উপাদানত্বে (সমগ্র ব্রহ্মের উপাদানত্বে নহে) তাঁহারই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছা যোগে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।* সুতরাং তিনি

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপর লিখিত হইয়াছে।

এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। হিন্দু দর্শন সমূহও অব্যক্ত হইতে (কিন্তু সমগ্র ব্রহ্ম হইতে নহে) জগতের উৎপত্তি বলেন। বিশ্ব যে ব্রহ্মের এক পাদে অবস্থিত তাহাও হিন্দুশাস্ত্রই বলেন। গীতা "একাংশেন স্থিতং জগৎ", "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" বলিয়াছেন। যাহা হউক সৃষ্টি যে অনাদি নহে, এবং ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, ইহা পূর্ব্ব অংশে, "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি", "কল্পবাদ" অংশ সমূহে এবং অন্যান্য স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত স্বাধীন। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন আসে না। তিনি অনন্ত গুণাধার হইয়াও নিত্য অনন্ত গুণাতীত। তিনি কখনও কোনও গুণের দ্বারা বাধ্য হইয়া কোনও কার্য্য করেন না। সুতরাং তাঁহার কোনও একপ্রকার কার্য্য যদি তিনি না করেন, তবে তাহাতে তাঁহার কোনও ত্রুটী হয় না। কারণ, তিনি নিত্যই অনন্ত প্রেমময় সত্য, আবার তিনি নিত্যই নিজেকে নিজে ভালবাসিতেছেন, ইহাও সত্য। অর্থাৎ তাঁহার আত্মপ্রেমের কার্য্য নিত্যই তাঁহাতে হইতেছে। সুতরাং প্রেম কখনও তাঁহাতে লীন অবস্থায় পরিণত হয় নাই। তিনি অনন্ত ইচ্ছাময়, কার্য্য করা বা না করা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। সুতরাং তিনি যদি কোনও প্রকারের কার্য্য কোনও কালে না করেন বা কোনও কালে করেন, তবে তাহাতে ত্রুটী কোথায়? দ্বিতীয় প্রকার প্রেমের জন্য সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রয়োজন। সুতরাং সেই কার্য্য কখন করিবেন বা না করিবেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তিনি নিত্যই অনন্ত স্বাধীন। সুতরাং তিনি কখন কি করিবেন বা কখন কি না করিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। তিনি কোনও Routiue-এর দ্বারা বাধ্য নহেন। বা তাঁহার কার্য্যের জন্য কাহাকেও কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তিনি যদি জড় পদার্থ হইতেন, তবে তাঁহার গতিবিধি নিরূপিত হইতে পারিত। জড় জগৎ অলঙ্ঘ্য-নীয় বিধানের অধীন। কিন্তু অনন্ত স্বাধীন ব্রহ্মের প্রতি কি সেই উক্তি

প্রযোজ্য হইতে পারে? তাহাতে কি তাঁহার অনন্ত স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয় না? তিনি সকল কারণের কারণ, কিন্তু তাঁহার কোনই কারণ নাই। সুতরাং যখন তাঁহার ইচ্ছা হইল, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ বলিলে অযৌক্তিক কিছুই বলা হইল না। ব্রহ্মকে যদি কেবলমাত্র Empirical Logic-এর নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবেত তিনি জড় পদার্থে পরিণত হইলেন। Psychology মানব মনের সকল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে মীমাংসা করিতে পারে না এবং পারিবেও না। কারণ, মানবের অন্তঃকরণের একাংশ আত্মিক ও অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। আত্মিক যাহা কিছু, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বাহিরে। যখন মানবের গতিবিধির কারণই আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তখন ব্রহ্মের কার্য্যের কারণ সমূহ কেমনে নির্দ্দিষ্ট হইবে? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম অনন্ত স্বাধীন।

তৃতীয়তঃ—প্রেমের দুইটী দিক ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য প্রেমের মূলেও আত্মপ্রেম। অর্থাৎ অন্য প্রেম আত্মপ্রেমের অন্তর্গত। সুতরাং উভয় প্রকার প্রেমই এক। সম্পূর্ণরূপে অন্তর্গত পদার্থ অন্তর্গমনকারী পদার্থের সহিত একীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজের প্রতি নিজের প্রেম দ্বারা প্রেমের কার্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বেও সম্পাদন করিতেছিলেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মের গুণাতীতত্ত্ব সম্বন্ধে মায়াবাদ অংশে লিখিত বিষয় পাঠক বিশেষ ভাবে দেখিবেন। উহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্রহ্ম বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। জীবসমূহের সহিত তাঁহার অভেদও আছে এবং উহাই নিত্য স্থায়ী। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা।* ব্রহ্ম ও জীবে যে ভেদ, তাহা জড়দেহ যোগে তাঁহার বহুভাবে ভাসমানত্বের জন্যই, সুতরাং উহা চিরস্থায়ী, কিন্তু নিত্য স্থায়ী নহে। সুতরাং এক অর্থে জীবাত্মাকে প্রেম করাও

* "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" দ্রষ্টব্য।

যাহা, ব্রহ্মের পক্ষে নিজেকে প্রেম করাও তাহা। অন্য প্রেমের মূলেও আত্মপ্রেম, অর্থাৎ উহা আত্মপ্রেমের প্রকার ভেদ মাত্র। সুতরাং এক অর্থে তিনি জগতেও সেই আত্মপ্রেমের লীলাই করিতেছেন। স্বগুণ পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন অর্থাৎ এই বিশ্ব কার্য্য তাঁহার লীলা মাত্র। আমাদের ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ব্ব অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রেমের বহুকে এক করিবার ন্যায় এককে বহু করিবার শক্তিও আছে।

এই তত্ত্বটি আরও সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। ব্রহ্ম প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুল্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভেদ জ্ঞান করিতেছেন। আবার সেই একই মুহূর্ত্তে তিনি জীবদিগকে বহুভাবে ভাসমানত্বের জন্য যেটুকু ভেদ তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে, সেইটুকু মাত্র ভেদ বা সন্তান জ্ঞান করেন। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তিনি জীবকুলকে উত্তমর্ণ অভেদ জ্ঞানে চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাকে আপনি প্রেম করিতেছেন। নিম্নলিখিত অনুরূপ তত্ত্বসমূহ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্মের পক্ষে আত্মপ্রেম ও অন্যপ্রেম একই। সৃষ্টির জন্য তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ব্রহ্ম নিত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্। জীব ও জগৎ তাঁহারই একান্ত-ভাবে অন্তর্গত। এই জন্যই তিনি বহুভাবে ভাসমান হইয়াও সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন এক ও অখণ্ড ছিলেন, এখনও তিনি সেইরূপ এক ও অখণ্ডই আছেন এবং মহাপ্রলয়ের পরেও সেই একইরূপ থাকিবেন। সুতরাং সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ত্বের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।*

ব্রহ্মে অনন্ত ইচ্ছাশক্তি নিত্য বর্ত্তমান। সেই একমাত্র ইচ্ছাশক্তি হইতেই তাঁহার বিবংহয়িষার (আপনাকে বহু করিবার ইচ্ছায়) উদয় হইল। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সেই বিবংহয়িষা হইতে সিসৃক্ষা (সৃজন করিবার ইচ্ছা), রিরক্ষিষা (রক্ষা করিবার ইচ্ছা) এবং

* ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে বহু স্থলে আলোচিত হইয়াছে।

জিহীর্ষার (লয় করিবার ইচ্ছার) উদয় হইল। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি এক, অখণ্ড ও নিত্য এবং বিবংহয়িষা উঁহার একটী প্রকার মাত্র। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র নিত্য ও অনন্ত এবং মূলে বর্ত্তমান। বিবংহয়িষা প্রভৃতি উহার এক একটী প্রকার ভেদ মাত্র। কারণ, যদি ব্রহ্মের বিবংহয়িষা প্রভৃতির উদয় না হইত, তথাপিও তাঁহার নিত্যা ইচ্ছাশক্তি নিত্যই তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিত। অর্থাৎ ঐ সকল প্রকার ইচ্ছা তাঁহার অনন্ত ইচ্ছাশক্তির অন্তর্গত।

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের অনন্ত আত্মপ্রেম তাঁহাতেই নিত্য বর্ত্তমান। জীবকুলের প্রতি যে তাঁহার প্রেম, তাহা সেই আত্মপ্রেমেরই অন্তর্গত, অথবা তাহা (জীবের প্রতি তাঁহার প্রেম) সেই অনন্ত আত্মপ্রেমের প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং সত্যভাবে চিন্তা করিলে উভয়ই এক। যদি জীবের প্রতি তাঁহার প্রেম না হইত, অর্থাৎ যদি কখনও বিশ্বলীলা সংঘটিত না হইত, তবুও তাঁহার অনন্ত নিত্য ও পূর্ণ প্রেম তাঁহাতে স্বমহিমায় নিত্যই বর্ত্তমান থাকিত। অর্থাৎ এই সৃষ্টিতে জীবকুলের উৎপত্তির জন্য এবং তাহাদের প্রতি প্রেমের জন্য তাঁহার অনন্ত প্রেমের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। অর্থাৎ সৃষ্টি না হইলেও তাঁহার যেমন অনন্ত ও পূর্ণ প্রেম ছিল, সৃষ্টি হওয়াতেও সেই প্রেমের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

জীব মাত্রেরই আত্মপ্রেম আছে। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে আমরা আলোচনা দেখিতে পাইব। জীব সর্ব্বদা নিজেকে নিজে ভালবাসেন। এই অবস্থা সুষুপ্তিতেও বর্ত্তমান থাকে। কেবল জড় জাত তমঃ দ্বারা অন্তঃকরণ এতদূর আবৃত হয় যে আপাততঃ প্রতীয়মান হয় যে জীব সম্পূর্ণরূপে অচেতন এবং তাঁহার কোন গুণই নাই। "সুষুপ্তি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মার জ্ঞান সুষুপ্তিতেও বর্ত্তমান থাকে। আত্মার জ্ঞান যখন থাকে, তখন তাঁহার অনন্ত গুণই থাকে বুঝিতে হইবে। আত্মা কখনও কোন একগুণ সহ বর্ত্তমান থাকেন এবং অন্যান্য গুণ লুপ্ত থাকে, ইহা হয় না এবং হইতেও পারে না। আত্মা স্বমহিমায়ই নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু তমঃ আবরণের

অত্যাধিক্য বশতঃ তাঁহার গুণরাশি অন্তঃকরণে এরূপভাবে কার্য্য করিতে পারে না, যাহাতে আমরা জাগরণ কালীন বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান লাভ করিতে পারি। সুষুপ্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক "সুষুপ্তি" অংশে দেখিতে পাইবেন। সুষুপ্তিকালে জীবের পক্ষে অন্যের প্রতি প্রেম সম্বন্ধীয় কোনও কার্য্য বা চিন্তা অসম্ভব। জাগরণ কালেও এমন অনেক সময় হইতে পারে, যখন অন্যের প্রতি প্রেম সম্বন্ধীয় কোনও কার্য্য বা চিন্তা থাকে না। সুতরাং জীব সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তাহার নিজেকে নিজে ভালবাসিতেই হইবে, কিন্তু অন্য প্রেম তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ নিত্য প্রেমময় ব্রহ্মের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে তিনি নিজে নিজেকে নিত্যই ভালবাসেন, কিন্তু অন্য প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ তিনি প্রেমময়ী ইচ্ছার দ্বারা তাঁহার একটী স্বরূপ অবলম্বনে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া জীবকুলকে স্বীয় সন্তান জ্ঞানে ভালবাসিতেছেন। সৃষ্টি যেমন নিত্যা নহে, অন্য প্রেমও সেইরূপ নিত্য নহে। এস্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনন্ত ও নিত্য প্রেমময় ব্রহ্ম চিরকালই তাঁহার সন্তানদিগকেও আত্মতুল্য জ্ঞানে প্রেম করিতেছেন। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে আত্মপ্রেমই প্রেম এবং অন্য প্রেম উহার অবান্তর প্রকারভেদ মাত্র।

নিম্নোদ্ধৃত অংশদ্বয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে অন্য প্রেম আত্মপ্রেমের অবান্তর ভেদ মাত্র।

"Love implies a distinguishing between two and yet these two are, as a matter of fact, not distinguished from one another."

"This act of differentiation is merely a movement, a playing of love with itself in which it does not get to otherness or other being in any serious sense, nor actually reach a condition of separation

and division." (Hegel's Philosophy of Religion, English Translation, Vol. III).

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্রহ্ম তাঁহার নিজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কিন্তু কোনও প্রকারের বাধ্যবাধকতার জন্য নহে, নিজে নিজেকে প্রেমে বহুভাবে ভাসমান করিয়া তাঁহার প্রেম-লীলা সম্পাদন করিতেছেন এবং এই প্রেমলীলায় তাঁহার নিত্য স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং উহা প্রেমস্বভাব ব্রহ্মের স্বভাব সঙ্গতই হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রেমে বহুভাবে ভাসমানত্বের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই এই তত্ত্ব সহজবোধ্য হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের বিবংহম্লিষা, স্বগুণ পরীক্ষা ও প্রেমলীলা একই। উহাদের উদ্দেশ্য কখনই ভিন্ন নহে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় ইহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে সৃষ্টি একটী ক্রিয়া। সুতরাং ইহার আদি ও অন্ত আছে, এবং ইহা ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে। আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে অন্য প্রেম সম্পাদন করিতে হইলে সৃষ্টির প্রয়োজন, সুতরাং ক্রিয়ার প্রয়োজন। সুতরাং উহার আদি আছে। উহা কখনও অনাদি নহে, সুতরাং অনন্তও নহে। অর্থাৎ সৃষ্টি সাদি ও সান্ত ও ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত। উহা কখনই তাঁহার স্বভাবজাত (automatic) নহে। আমরা আরও দেখিলাম যে অন্যপ্রেম আত্মপ্রেমের প্রকারভেদ মাত্র এবং প্রথমটী দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে ব্রহ্ম যখন নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ জ্ঞানময়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যখন তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান, তখন তাঁহার প্রত্যেক গুণের শক্তি তিনি জানিতেন, তবে কেন তাঁহার স্বগুণ-পরীচিক্ষিষা ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার স্বগুণ শক্তি জানিতেন, ইহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। যদি তিনি শক্তি সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকিতেন, তবে তিনি এই সুবিশাল জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি ও পালন করিতে পারিতেন না। এই সৃষ্টির মূলে যে প্রেম ও জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহা পূর্ব্ব অংশে

প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে তিনি এই সৃষ্টিতে তাঁহারই অনন্ত স্বরূপের Practical demonstration বা Practical Realisation করিতেছেন মাত্র। অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁহার লীলামাত্র। এই লীলা শব্দের অর্থ অনেকে ইংরেজীতে Sporting Spirit (খেলার ভাব) বলিয়া মনে করেন। অন্যান্য বিদেশী ভাষায় লীলার প্রতিশব্দ না থাকায় এই শব্দ বড়ই হাল্কা ভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই সৃষ্টিলীলা পরমপিতার অনন্ত গাম্ভীর্য্য ও অনন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝেন যে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা তুচ্ছ খেলার বস্তু নহে। এই সৃষ্টি জ্ঞান ও শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণা। ইহা বিশৃঙ্খলায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে না। এক ব্রহ্ম, এক বিধান, এক বিশ্ব। বিশ্বের সমস্তই বিশ্বেশ্বরের বিধানের অন্তর্গত। এস্থলে কোনও বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। ভক্ত রজনীকান্ত গাহিয়াছেন :—

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন প্রভাময়।
তুমি অমৃত বারিধি হরি হে, তাই তোমার ভুবন ভরি হে
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে সুধার লহরী বয় ;
ঝড়ে সুধাজল, ধরে সুধা ফল, পিয়াসা, ক্ষুধা না রয়।
তুমি সর্ব্বশকতিমূল হে, তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি প্রেমের চির নিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে
তাই মধু মমতায় বিটপী লতায় মিলি প্রেম কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয় গাহে তব প্রেম জয়।

যে অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বরের রচিত বিশ্বের অনন্ত রচনা প্রণালীর একটী বা দুইটী মাত্র বিধি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন ও নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সাধকগণ যাঁহারই জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইয়া কৃতকৃতার্থ

হন, সেই অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির আধার পরম পুরুষের সৃষ্টিলীলা সামান্য খেলা নহে। খেলার সহিত মহালীলার তুলনা আনয়ন করা অপরাধ জনক বলিয়া মনে হয়।

আবার ব্রহ্মের গুণরাশির শক্তির Practical Demonstration সম্বন্ধেও আপত্তি হইতে পারে যে, তিনি যখন নিজ গুণরাশির শক্তি জানিতেনই, তখন আবার কার্য্য দ্বারা উহাদের পরীক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি। ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্যই অনন্ত এবং পূর্ণ। তাঁহার জ্ঞানে যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনই নিত্য বর্ত্তমান, তেমনি তাঁহার জ্ঞান অনন্তভাবে পূর্ণ হওয়ায় তিনি নিত্যই সম্পূর্ণরূপে জানেন যে তিনি কি করেন বা করিবেন। আমাদের জ্ঞান অত্যন্তভাবে অপূর্ণ। তাই আমরা বুদ্ধি দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, একটী কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করি, অথবা কোন বিষয়ের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করি। কিন্তু ব্রহ্মে জ্ঞানের পূর্ণত্ব থাকায় তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন বা করিবেন, তাহাও তাঁহাতে পূর্ণভাবেই নিত্য প্রকাশিত থাকে। আমাদের ন্যায় মাথা খাটাইয়া তাঁহার কোনও বিষয় জানিতে হয় না বা সৃষ্টি করিতে হয় না। সৃষ্টিলীলা হইতেছে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং ইহা তাঁহার নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞানে সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানে নূতন কিছু হয় নাই, তিনি Practical Shape দিতেছেন মাত্র। বিশ্বে ভবিষ্যতে কি হইবে, কিভাবে পরিণতি লাভ করিবে, তাহাও তাঁহার নিত্য জ্ঞানে নিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং এক অর্থে যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে। তাঁহার জ্ঞানে নূতন কিছুই হইতেছে না।

সৃষ্টিকে যখন আমরা লীলা বলিয়াছি, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইহা অপ্রয়োজনে সম্পাদিত হইতেছে। ব্রহ্মে কোন গুণেরই কোনই অভাব নাই। উঁহারা নিত্যই অনন্ত এবং পূর্ণ। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানেরও কোনও অভাব নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং যে Practical demonstration হইতেছে, সেই সম্বন্ধেও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানই ছিল। কারণ, তাহা না থাকিলে এই লীলা সম্পাদিত হইতে পারিত না। কিন্তু

তিনি নিজ ইচ্ছায় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে লীলার্থই এই জগদ্ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন। অর্থাৎ লীলার মর্ম্মবোধ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্ম তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে বাধ্য-বাধকতা শূন্য হইয়া এই অতি সুমহতী জ্ঞান-প্রেম-আনন্দময়ী লীলা সম্পাদন করিতেছেন। ইহাতে আবশ্যকতার প্রশ্ন আসে না। কারণ. "আবশ্যক" বলিলেই তাঁহার কোনও না কোনও প্রকার অভাব আছে, সুতরাং বাধ্যতাও আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণে কখনই কোনও অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সৃষ্টি ক্রিয়া তাঁহারই আনন্দময়ী লীলা মাত্র।

বেদান্তদর্শনের লীলা বিষয়ক সূত্রের সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাইব যে, আপ্তকাম মানবও তাহার খুসীমত অপ্রয়োজনীয় কার্য্য কখনও কখনও করিয়া থাকেন। তাহার সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন করি না যে তিনি কেন সেই কার্য্য অপ্রয়োজনে করেন। যদি কেহ সেইরূপ প্রশ্ন করেন, তবে বোধ হয় উহার নিম্নলিখিত ত্বরিৎ উত্তর (Curt Reply) প্রাপ্ত হন :— "আমরা খুসী"। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ, কিন্তু তাঁহার কোনই কারণ নাই।

স কারণং কারণাধিপাধিপো

ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ (শ্বেত ৬।৯)

বঙ্গানুবাদ ঃ—তিনি সমুদায়ের কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা-দিগের অধিপতি। তাঁহার কোন জনয়িতা বা অধিপতি নাই।

(তত্ত্বভূষণ)

পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন ঃ—

তুমি কারণের কারণ, তোমার নাহি কারণ,

অসীম অপার তুমি, তুমি অনির্ব্বচনীয়।

তাঁহার নিজের যেমন কোনই কারণ নাই, সেইরূপ তাঁহার কার্য্যেরও কোনই কারণ নাই। তিনি নিত্যই অনন্ত স্বাধীন। সুতরাং তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নহেন। তিনি জড় পদার্থ নহেন যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের মত তিনি নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীন হইবেন। তিনি

Routine-এর বাধ্য নহেন। তাঁহার খুসীমত তিনি কার্য্য করেন। অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে কেবল লীলার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না অথবা তিনি কোনও কারণ বশতঃ বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করেন নাই।

প্রশ্ন হইবে যে এই Practical Demonstration কাহার সম্বন্ধে সম্পন্ন হইতেছে। ইহা কি ব্রহ্মের নিজ সম্বন্ধে অথবা তাঁহার বহুভাবে ভাসমান সন্তানদিগের জন্য? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে Practical Demonstration তাঁহার লীলার্থ হইতেছে। জীবকুল তাঁহার অংশভাবে ভাসমান এবং এই বিশ্বের কার্য্যসমূহ তাঁহারই শ্রীহস্তের যন্ত্রস্বরূপ তাঁহারা (জীবকুল) সম্পাদন করিতেছেন। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

অনন্ত গুণের ধাম পালিছ ভুবন,
আপনি নির্লিপ্ত রহি লিপ্ত করি জন। (তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত)

সুতরাং ব্রহ্ম জীবকুল দ্বারাই Practical Demonstration করিতেছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই মহালীলায় প্রত্যেক জীবই অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। সুতরাং উহা জীবকুলের জন্যই। আবার ব্রহ্ম যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্, জীবকুল যখন তাঁহারই চির অন্তর্গত এবং পৃথক্ ভাবে (Distinct ভাবে) ভাসমান মাত্র, তখন তিনিই নিজে নিজের জন্যই এই লীলা সম্পাদন করিতেছেন, ইহাও বলিতে পারা যায়। প্রকৃতভাবে বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে এই লীলা তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তিরাশির অভিনয় মাত্র। সহজ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তিনি নিজেই তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তির Practical Realisation করিতেছেন।

আবারও প্রশ্ন হইবে যে এই বিশ্ব কার্য্য দ্বারা কি ব্রহ্মের জ্ঞানের কিছুই বৃদ্ধি হয় না। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ জ্ঞানের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না বা হইতেও পারে না। ইহাও বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি ব্যাপার ব্রহ্মের গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা বই আর কিছুই নহে। কোন দ্রব্যের কি শক্তি এবং

একাধিক পদার্থের সংমিশ্রণে কি নূতন পদার্থ ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, রসায়ন শাস্ত্রে জ্ঞানী অধ্যাপক তাহা জানেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন Practical Demonstration করেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই। কিন্তু সেই কার্য্যে তাঁহার জ্ঞানের কোনই বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ লীলা দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানময়ের জ্ঞানের কোনই বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং সৃষ্টি ব্যাপার যে তাঁহার লীলামাত্র, ইহা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম কেন কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন? তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যখন নিত্য, তখন তিনি কেন সেই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে উহা ইচ্ছা করেন নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা দেখা গিয়াছে যে পরমোন্নত ব্যক্তিগণ যদি ইচ্ছা করেন যে তিনি কিছুদিন অন্ন গ্রহণ করিবেন না, তবে সেই নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে তাঁহার অন্ন গ্রহণের প্রবৃত্তিই হয় না। অর্থাৎ তাঁহার সবিশেষ শক্তি সম্পন্না ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত সঙ্কল্প জন্য তাঁহার শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিত হয়। যদি কেহ এই তত্ত্ব বিশ্বাস না করেন, তবে তাহাকে তাহার নিজেরই কার্য্যের বিশ্লেষণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি দেখিতে পাইবেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে উহা নাও করিতে পারেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে আরব্ধ কর্ম্মও বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এস্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি যে সঙ্কল্প দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা মানব নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন, সক্রিয় হইতে পারেন, আবার আরব্ধ কার্য্য ভঙ্গও করিতে পারেন। অতএব দেখা যায় যে ইচ্ছা দ্বারা যেমন ক্রিয়া হয়, তেমনি ইচ্ছা দ্বারা ক্রিয়া নাও হইতে পারে, আবার ইচ্ছা দ্বারা কর্ম্মের বাধাও উৎপাদন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছার মধ্যে ক্রিয়া করা বা না করার শক্তি নিহিত আছে। অতএব পরব্রহ্ম যেমন ইচ্ছা হইলে কার্য্য করেন, সেইরূপ ইচ্ছা না হইলে কার্য্য না করিয়াও থাকিতে পারেন। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে সৃষ্টি করা বা না করা তাঁহার ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর

করে। তিনি যখন ইচ্ছা করেন নাই, তখন সৃষ্টি হয় নাই; আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই সৃষ্টি হইয়াছে, আবার তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন মহাপ্রলয় হইবে। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণেরও অতীত। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িনী ইচ্ছার উদয়ের কারণ নাই বলিলে অযৌক্তিক কিছু বলা হইল না। আবার আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম নিত্যই অনন্তভাবে অনন্ত এবং পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং নিষ্কারণ ব্রহ্মকে কার্য্য-কারণ-সমন্বিত জড় জগতের সহিত তুলনা করিলে আমাদের ভ্রম অবশ্যম্ভাবী রূপে উপস্থিত হইবে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে সৃষ্টি ব্রহ্মের খেয়াল মাত্র। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির একটি মহদুদ্দেশ্য বর্ত্তমান। সুতরাং উহাকে একটী খেয়ালের ফল বলা অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। তাঁহাতে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেম হইতে যে ইচ্ছা সঞ্জাত, তাহা খেয়াল হইতেই পারে না। সেইরূপ ইচ্ছা যে সর্ব্বদাই মঙ্গল প্রসব করিবে, সে বিষয়ের বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যিনি অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত, যিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, যাঁহার সমান গুরুগম্ভীর পরম পুরুষের বর্ত্তমানতা আপামর সর্ব্বসাধারণের ধারণাতীত, তাঁহার নিকট হইতে কি আমরা হাল্কাভাবের কার্য্য আশঙ্কা করিতে পারি? কখনই নহে। অতএব পরমপিতার ইচ্ছায় লীলার্থই এই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, ইহাই স্থির নিশ্চয়। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত নহে, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে উহা আপনা আপনি হয় নাই অথবা ইহা তাঁহার একটি খেয়ালের ফলও নহে, কিন্তু ইহা তাঁহার প্রেমময়ী লীলা মাত্র।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে সৃষ্টিতে অসীমপ্রায় বিপ্লব, দুঃখ, দৈন্য, আপদ, বিপদ, রোগ, শোক, অত্যাচার, অবিচার, অকালমৃত্যু প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, জীবকুল উহাদের জন্য বহু সময় আকুল প্রাণে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ব্রহ্ম কেন লীলার্থ মাত্র এইরূপ সৃষ্টি করিলেন, যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনার উৎপত্তি সম্ভব

হইয়াছে? সৃষ্টি না হইলে ত জগতে জীবকুল আগমন করিত না, সুতরাং তাহাদের এইরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম যেমন ছিলেন, তেমনি থাকিতেন। তাঁহার ত আর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিশ্বে মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্রও অমঙ্গল হইতেছে না। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গলে পরিপূর্ণ, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত মঙ্গলময় পরব্রহ্মের অনন্ত ও পূর্ণ জ্ঞানে তাহাও একমাত্র মঙ্গলেই পরিপূর্ণ। উক্ত প্রবন্ধ পাঠে পাঠক ধারণা করিতে পারিবেন যে বিশ্বে মঙ্গল বই অমঙ্গলের অস্তিত্ব নাই। আমাদের ভ্রান্ত ধারণার মূলে আমাদের অজ্ঞানতা। আমরা সর্ব্ব বিষয়েই ক্ষুদ্র, অত্যন্তভাবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং বিরাট্ বিশ্বের পরিচালনা সম্বন্ধে আমরা একান্তভাবে অজ্ঞ। এই জন্যই আমরা মঙ্গলে অমঙ্গল দেখি। যখন সর্ব্বদাই একমাত্র মঙ্গলই সম্পাদিত হইতেছে, অমঙ্গলমাত্রও নাই, তবে সেইরূপ সৃষ্টি যদি অনন্ত নিত্য, ও পূর্ণ জ্ঞান-প্রেমময় সুতরাং অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার ত্রুটী কোথায়? দুঃখ থাকিতে পারে, সুখও থাকিতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিতে যদি চিরকাল মঙ্গলই হইতে থাকে, তবে কেন আমরা সৃষ্টিতে দোষের—ত্রুটীর চিন্তা করিব? যাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, যিনি নিত্য মঙ্গলময়, তাঁহারই মঙ্গল রাজ্যে কি দোষলেশাশঙ্কা করা যাইতে পারে? কখনই নহে। ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের আত্মিক উন্নতির সাথে সাথে আমরা অতুলনায় সুখের অধিকারী হইব। "ক্রমশঃ সুখের বিধি"। মানবের অনন্ত জীবনের তুলনায় দুঃখের কাল অত্যল্প। প্রথমে দুঃখ, তৎপর সুখ, ইহাই বিধি। মানব অসহিষ্ণু। তাই সে আশা রাখিতে পারে না। আপাত তরঙ্গ দেখিয়া তীরেই নৌকা ডুবায়।

কেহ বলিতে পারেন যে ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, তখন তিনি সগুণ ভাবে কি প্রকারে লীলারূপ বিরাট্ বিশ্ব সৃজন ও পালন করিতেছেন। ইহার

উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম নির্গুণ অথবা সগুণ অথবা উভয়ই, ইহার সমালোচনা "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে গুণহীন বলা হয় না। তিনিই অনন্ত গুণাধার, আবার তিনিই অনন্ত গুণের অতীত। পাঠকের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলে গুণের অতীত হওয়া যায় না। সুতরাং তিনি সগুণ ভাবে কার্য্য করিলে তাঁহার পক্ষে কোনও ক্রটীর উৎপত্তি হয় না। বরং বলা যাইতে পারে যে সগুণ ভাবে কর্ম্ম করিবার পূর্ণা শক্তি তাঁহাতে আছে বলিয়াই, তিনি গুণের অতীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সৃষ্টির জন্য তাঁহার স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সম্বন্ধীয় তাঁহার কোনও ক্রিয়া ছিল না, সৃষ্টিকালে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে জগৎ সম্বন্ধে সক্রিয় হইয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি নিত্যই বর্ত্তমান এবং তাঁহার নিজ সম্বন্ধেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহাকে নিত্যই জানিতেন, তিনি তাঁহাকে নিত্য প্রেম করিতেন। তাঁহার অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি আছে, সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছাশক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। উঁহাদিগকে যদি নিজ ইচ্ছামত (বাধ্যবাধকতা শূন্য হইয়া) তিনি কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাহাতে তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে পরমপিতা একাধারে অনন্ত গুণাতীত ব্রহ্ম এবং অনন্তগুণসম্পন্ন পরম পুরুষ। অর্থাৎ তাঁহাতেই দার্শনিক ভাব সম্পন্ন ব্রহ্মত্ব ও ঈশ্বরত্বের (Absolutism and theism এর) মিলন হইয়াছে। নতুবা ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর দুই নহেন। তিনি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই। তাঁহাতে কোনও প্রকারের কোনই বিভাগ নাই।

বেদান্ত দর্শনের নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্ম কেবল লীলার্থই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন:— লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। (২।১।৩৩)

আচার্য্য রামানুজ ইহাকে লীলার ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর এই সুস্পষ্ট সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি উপমা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত মাত্র।

সুতরাং উহা অনাদি অনন্ত এবং সৃষ্টি কার্য্য তাঁহার ইচ্ছাজনিত নহে। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কৃত উক্ত সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যেমন লোক মধ্যে কোন এক প্রাপ্ত কাম রাজার বা রাজ-আমাত্যের (যাহার কিছু মাত্র অভাব নাই, সমস্তই আছে, তাহার) বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র লীলারূপ প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে বা বিনা উদ্দেশ্যে কেবল মাত্র স্বভাবের বশে লীলারূপে অর্থাৎ অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র স্বভাবের বশে সম্পন্ন হইতে পারে।"

প্রথম দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে রাজা আপ্তকাম হইয়াও কোন কোন কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহার যখন কার্য্য আছে, তখন উহার পূর্ব্বে ইচ্ছা আছে, উদ্দেশ্যেও বর্ত্তমান। কারণ, শেষোক্ত দুইটী ব্যাপার ভিন্ন কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইচ্ছা অন্তরের ভাব এবং কার্য্য উহার বহিঃ প্রকাশ মাত্র। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের একমাত্র সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই হয় যে পরমপিতা নিত্য আপ্তকাম হইয়াও তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা লীলার্থ জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে "কল্পবাদ" অংশে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিবার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আমাদের দেহের ক্রিয়াগুলি ইচ্ছা দ্বারাই সংসাধিত হয়। উহার মধ্যে কতক অংশ আমাদের এবং অধিকাংশই পরমেশ্বরের। অর্থাৎ ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না। স্বাভাবিক ক্রিয়া বা Automatic action বলিয়া আমরা আপততঃ যাহা মনে করি, তাহাও ইচ্ছাজনিতই বটে। শঙ্কর ভাষ্যে আমরা পাই শ্বাস প্রশ্বাসের কথা। সুতরাং সেই ক্রিয়াও ইচ্ছাজনিত।

লীলা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে কি লীলাকারী পুরুষের ইচ্ছা আমরা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে পারি? যদি কেহ সৃষ্টি ব্রহ্মের

লীলাও বলেন এবং একই সময় বলেন যে উহা ব্রহ্মের ইচ্ছাজনিত নহে, তবে উহারা কি স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না? লীলা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে লীলাকারী পুরুষ ইচ্ছা করিয়া লীলার্থে কার্য্যটী আরম্ভ করিয়াছেন। আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখন তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন। তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ বা ক্লেশ উপস্থিত হইবে না। অর্থাৎ লীলার্থ আরব্ধ কার্য্যের পূর্ব্বে ইচ্ছা থাকিবে এবং যখন তিনি সেই ইচ্ছা সংহরণ করিবেন, তখন উহা বন্ধ করিয়া দিবেন। অর্থাৎ লীলা ব্যাপারটী আদ্যন্ত কর্ত্তার সম্পূর্ণ খুসীর উপর নির্ভর করে—কোন স্থলেই কোনও রূপ বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, বরং আনন্দই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে। ইংরাজীতে কথাটী বোধ হয় নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়।

"Leela from beginning to end depends entirely upon the option and sweet pleasure of the actor himself unhampered by any the slightest obligation from any side."

ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হইল, স্থিতি হইতেছে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় প্রলয় হইবে। কিন্তু মানবের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কি তাহার কৃত লীলা? কেহ কি কখনও শ্বাস প্রশ্বাসকে নিজের লীলা বলিয়াছেন অথবা লীলাভাবে চিন্তা করিয়াছেন? বরং এই কথাই সত্য যে সাধক ঈশ্বরের মহিমা চিন্তাকালে ভাবিতে পারেন যে এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া তাঁহারই অনন্ত লীলার একটু অংশ মাত্র। তিনি এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে দেহ গঠন করিয়াছেন যে আমাদের বিনা আয়াসে জীবন রক্ষার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া অনবরত অবাধে চলিতেছে।

ভাষ্যকার বলেন যে আমরা স্বভাববশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করি। বাস্তবিকই উক্ত ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাজনিত নহে। এবং বহু সময় এবং বিশেষতঃ নিদ্রাকালে উহা অজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার জন্য আমি ইচ্ছা করিলাম না, অথবা যাহা আমার অজ্ঞাত ভাবেই সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কি কখনও আমার লীলাপদ বাচ্য

হইতে পারে ? কখনই নহে। যদি বলেন যে তাহা সম্ভব, তবে আচার্য্যোক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে লিখিত তত্ত্বের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার ব্রহ্ম যখন ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইবে। এই লয় ক্রিয়াও তাঁহার মহালীলার একটী বিশেষ অঙ্গ। ইহা একটি সামান্য অঙ্গ নহে কিন্তু সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যায় একই প্রকারের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সৃষ্টি ও স্থিতি কার্য্যে ব্রহ্মের যেরূপ আনন্দ বর্ত্তমান, লয় কার্য্যেও সেই একই রূপ আনন্দ তাঁহাতে আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব অংশে আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহার প্রেম দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ত্রিবিধ কার্য্যই সম্পন্ন হয়। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপিনী লীলা বন্ধ করিয়া দিলে তাহার কি অবস্থা হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। সেইরূপ লীলা যে আমরা আদবেই চাহি না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন সে মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে ইহাকেই অন্তিমকালের মুখশ্বাস বলে। চিকিৎসকগণ বলেন যে তখন আমরা বায়ু হইতে অধিক পরিমাণ oxygen গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করি। অর্থাৎ আমরা অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করি অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমরা এইরূপ লীলার কখনই পক্ষপাতী নহি। সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপারকে মানুষের লীলা বলা কিছুতেই সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে শঙ্কর ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইহা যে সত্য নহে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। কারণ, উক্ত ক্রিয়া আমাদের জীবন ধারণের জন্য সর্ব্বপ্রধান ভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্যই বলিতে হইবে যে প্রাণন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া ও মৃত্যু একই।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত সূত্র বলিলেন যে ব্রহ্ম লোকবৎ অর্থাৎ মানবের ন্যায় কেবল লীলার্থই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষ্যে যে দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমটীর আলোচনায় আমরা পাইলাম যে

সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছা জনিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা লীলা প্রমাণিতই হয় না, কিন্তু উহার আলোচনায়ও আমরা পাইলাম যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা automatic action বলি, তাহাও ব্রহ্মের ইচ্ছা জনিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটীর আলোচনা পাঠ করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে পরব্রহ্মের সম্বন্ধে উপমা কখনই সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং দ্বিতীয় উপমা সম্বন্ধে আলোচনা সঙ্গত হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপমা সম্পূর্ণ হয় না বা হইতেও পারে না। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত দ্বিতীয় উপমাটীর যে সর্ব্বাংশে অমিল তাহা নহে, উহার ভাবের সঙ্গেও উহার কোনই মিল নাই। আলোচনা পাঠ করিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্থূল সূত্রে আছে লীলার কথা অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ক্রিয়ার কথা, কিন্তু ভাষ্যে আছে আমাদের এমন একটী ক্রিয়ার কথা, যাহা আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদা সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে মোটেই অপেক্ষা করে না, যদিও সেই ক্রিয়াও ইচ্ছাজনিত—আমাদের নহে, কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তার। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াকে কোনও প্রকারেই মানবের লীলা আখ্যা প্রদত্ত হইতে পারে না অথবা উহা আমাদের লীলা বলিয়া লোক প্রসিদ্ধও নহে। আরও একটী বিষয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে প্রথম দৃষ্টান্তটীর সহিত দ্বিতীয়টীর ঐক্য নাই। প্রথমটীতে আছে আপ্তকাম ব্যক্তিরও লীলার্থ কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। এই দৃষ্টান্তটী সর্ব্বাংশে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হইলেও উহা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মানবীয় লীলার চিহ্নও পাওয়া যায় না। অতএব দেখা গেল যে সৃষ্টির ব্যাপার আপ্তস্ত ব্রহ্মের ইচ্ছা জনিত এবং সেই জন্যই ইহা লীলাপদ বাচ্য।

প্রোক্ত সূত্র উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ এই দৃষ্টান্তটীকে anthropomorphism বলেন। আমরা কিন্তু এই আপত্তিকে অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করি। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে ভূমিকায় কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জীব ও জগৎই সাধারণের পক্ষে

একমাত্র শিক্ষার স্থল। যদি এই দুইটীকে আমাদের বিচার ও চিন্তা হইতে বাদ দেই, তবে আর আমাদের থাকে কি? মনন ও বিচারের প্রধান সম্বল Criticism of experience. আবার জীব ও জগৎ সম্বন্ধেই আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি। সুতরাং উহাদিগকে বাদ দিলে আমরা যে কেবল মূক হইয়া থাকিব, তাহা নহে, কিন্তু আমরা কোনই চিন্তাও করিতে পারিব না। জীব ও জগৎ বাদ দিলে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতে পাইব, শূন্যই লাভ করিব। জীব ও জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, তখন উহাদের অবলম্বনে আমরা বহু তত্ত্ব লাভ করিতে পারি ও করি। আমাদের শরীরের অত্যল্প পরিমাণ রক্ত দ্বারা যেমন দেহের সমস্ত রক্তের স্বভাব নির্ণয় করা যায়, তেমনি জীব ও জগতের বিশ্লেষণে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায়। কেবল একটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে জীব ও জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপূর্ণ ও চির বিকৃত, কিন্তু ব্রহ্মে সকলই পূর্ণ ও নিত্য অবিকৃত। আরও বলা যাইতে পারে যে এই আপত্তি এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান বিরোধী।

এস্থলে অন্য একটী বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাব জাত বলা হইয়াছে। আমরা সৃষ্টিতে অসংখ্য ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখিতে পাই। আবার উক্তমতে কল্পের পর কল্প অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল সৃষ্টি চলিতে থাকিবে। সুতরাং জগৎ ব্যাপার চির-ক্রিয়াময়। অতএব যাঁহার স্বভাব হইতে ক্রিয়াময় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বভাবে ক্রিয়াশক্তির মূল ইচ্ছাশক্তি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বলিতে হইবে। উৎপাদক সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও নাই, সুতরাং ক্রিয়াশক্তিও নাই। এই অবস্থায় উৎপন্নে ক্রিয়াশক্তি কোথায় হইতে আসিল? মায়াবাদ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলেন। বিশ্ব যদি স্বভাবজাত বলা হয়, তবে ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব থাকে না। কারণ, ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই উৎপাদন করা যায় না। যদি বলেন যে মায়া শক্তিতেই বিশ্ব উৎপন্ন ও ক্রিয়াময়, মায়ার

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি আছে এবং মায়াকে ত্রিগুণসম্পন্নাও বলা হইয়াছে, তবে বলিতে হয় যে মায়াওত ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তি কখনও শক্তিমান হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না বা থাকিতেও পারে না। আবার শক্তি কাহার ? শক্তি গুণের এবং গুণের সহিত অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যদি মায়াকে তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবুও মায়ার কর্ম্মশক্তিও অনন্ত গুণ নিধান ব্রহ্মেরই শক্তি বলিতে হইবে। গুণ ভিন্ন শক্তি যেমন ছিন্নসত্তা কথার কথা মাত্র, সেইরূপ অনন্ত গুণাধার ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার শক্তির কোনই অর্থ নাই। অতএব মায়ার শক্তি স্বীকার করিলেও সেই শক্তি অনন্ত শক্তির উৎস ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত মাত্র বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

আমরা যাহাকে স্বভাবজাত কর্ম্ম বলি, উহার পশ্চাতেও ইচ্ছা বর্ত্তমান, ইহা অবশ্যই স্বীকার বরিতে হইবে।* ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা ও কর্ম্ম এক পর্য্যায় ভুক্ত। প্রথমটী অন্তর্নিহিতভাব এবং দ্বিতীয়টী উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমটীর উদয় না হইলে দ্বিতীয়টী কখনও সম্ভব হয় না। অতএব ব্রহ্মে সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, তাই তাঁহাতে জগৎরূপ কার্য্য আমরা দেখিতেছি।

মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন বটে, কিন্তু সৃষ্টিকে অনাদি বলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত। পূর্ব্বোদ্ধৃত শঙ্করভাষ্যে তাহাই বলা হইয়াছে। যদি সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাতই হয় অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন আপনা আপনি তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তবে ব্রহ্মকে উহার উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলা যাইতে পারে না। নিমিত্ত কারণ বলিলেই সেই কারণে কর্ম্ম সুতরাং কর্ম্ম সম্বন্ধে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান, ইহা বুঝিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত

* শ্বাস প্রশ্বাস ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া স্বভাবজাত কর্ম্ম বলিলেও উহাদের পশ্চাতে যে ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাহা "কল্পবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র হইতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি যেন কর্ম্ম দ্বারা লোকদৃষ্টিতে কৌরবদিগকে হত্যা করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা যেন কৌরবদিগের বধের নিমিত্ত কারণ মাত্র অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা হন।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

বঙ্গানুবাদ :—অতএব তুমি উত্থিত হও, যশঃ লাভ কর, শত্রুদিগকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই মারিয়াছি। হে সব্যসাচিন্! তুমি (এখন) নিমিত্ত মাত্র হও।

(গৌরগোবিন্দ রায়)

এস্থলে অর্জ্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। সুতরাং নিমিত্ত বলিলে কর্ম্ম বুঝায় এবং কর্ম্মের পশ্চাতে ইচ্ছা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে।

পরমর্ষি গুরুনাথ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বুঝাইতে লিখিয়াছেন :—

"যাহা বিনা যাহা হয় না, তাহা তাহার কারণ। একখানি বস্ত্র কতকগুলি সুত্র দ্বারা রচিত হইল। তন্তুবায় (তাঁতি) উহা সম্পাদন করিল। তুরী (তাঁতির মাকু) ও বেম প্রভৃতিও ঐ কার্য্যে লাগিল। এই পট কার্য্যের কারণের মধ্যে তন্তু সমবায়ী বা উপাদান কারণ, তন্তু সমূহের পরস্পর সংযোগ অসমবায়ী কারণ, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই নিমিত্ত কারণ।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)

ইহা হইতেও দেখা যায় যে কর্ম্মকর্ত্তা তন্তুবায়ই প্রধান নিমিত্ত কারণ। তাহার যন্ত্রাদিও নিমিত্ত কারণ বটে, কিন্তু উহারা কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাহার হাতের যন্ত্র মাত্র। উহারা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। মানুষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়াই নিমিত্ত কারণ। তাঁহার যে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা অন্য কোন যন্ত্রের আবশ্যকতা নাই, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই যে সমুদায় সম্ভব হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"ইচ্ছাশক্তি" ও "মায়াবাদ" অংশদ্বয়ে এ বিষয়ের আলোচনা আমরা দেখিতে পাইব। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে কাহাকেও নিমিত্ত কারণ বলিতে গেলে তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তাও বলিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার যে ইচ্ছাশক্তি আছে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

গ্রীক দার্শনিক মহামনাঃ Aristotle এর মতের Material and Efficient Cause এর ব্যাখ্যা করিতে Principal Stephen বলিয়াছেন ঃ—

The material cause of a thing is simply the material of which it is composed, and which is necessary to its production, as the marble for the statue, the wood for the boat. The efficient and working cause is the energy which imposes the form on the materials—the strength of the Sculptors or builder's arm, which makes the marble to assume the form of a hero, the wood that of a boat and so on."

বঙ্গানুবাদ ঃ—একটী পদার্থের উপাদান কারণ তাহাই, যাহা হইতে উহা প্রস্তুত হয় এবং যাহা উহার উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয়, যথা—প্রতিমূর্ত্তির জন্য মার্ব্বেল পাথর, নৌকার জন্য কাঠ ইত্যাদি। যে শক্তি বস্তুর উপর নামরূপ দান করে, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বা কার্য্য-কর কারণ বলে। যথা ভাস্কর বা নির্ম্মাতার বাহুর শক্তি যাহা মার্ব্বেল পাথর হইতে বীর পুরুষের মূর্ত্তি, কাঠ হইতে নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

এস্থলেও দেখা যায় যে Efficient Cause এর অর্থও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ভাবমাত্র, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ বলিলেই তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিতে হইবে।

Chamber's Dictionaryতে Efficient শব্দের অর্থ নিম্ন-

লিখিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—"Capable of producing the desired result." (অভিপ্রেত ফল উৎপাদনে সমর্থ) সুতরাং আভিধানিক অর্থ ধরিলেও নিমিত্ত কারণের ঐ একই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে নিমিত্ত কারণের অর্থই কর্ম্মকর্ত্তা। ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিব, আবার তাঁহাকে ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব না, ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়। অতএব তাঁহার ইচ্ছায় লীলার্থই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই সত্য। উহা তাঁহার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে তাঁহা হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই।

সৃষ্টি যে সম্ভব হইয়াছে, ইহা সত্য. উহা স্বভাবজাতই হউক অথবা ইচ্ছাকৃতই হউক্। যে প্রকারেই হউক না কেন, আমরা ইহা চিন্তা করিতে পারি না যে যিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, যিনি অনন্ত ন্যায়বান, যিনি অনন্ত অনন্ত গুণাধার, তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার হইতে এমন বিধান হইয়াছে যাহাতে কোনও প্রকারের কোনও ত্রুটী থাকিতে পারে। বিশ্বে আপাত দুঃখ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিণামে যে অনন্ত সুখ, সে বিষয়ে সন্দেহ কোথায়? সুতরাং সৃষ্টি ব্যাপার যে লীলাময়ের লীলামাত্র, সে বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। এস্থলে আবারও বলিতে হয় যে এই গ্রন্থের নানা স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে এবং ইহা তাঁহারই ইচ্ছাকৃত। সেই ইচ্ছার মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রেম প্রধান ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সেই ইচ্ছাজাত সৃষ্টিতে কোনও ত্রুটী আসিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি ব্যাপার যে ব্রহ্মের প্রেমলীলা মাত্র, এই তত্ত্ব স্বীকার করিলে আপাতদুঃখের আপত্তিও দাঁড়াইতে পারে না। আর যে সৃষ্টিতে প্রতিমূহূর্ত্তে মঙ্গল বই বিন্দুমাত্রও অমঙ্গল হইতেছে না, সেইরূপ বিশ্ব যদি লীলার্থ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া থাকে, তবে

তাহাতে ব্রহ্মের কোনই ত্রুটী হইতে পারে না।* অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে লীলাতত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে এবং সৃষ্টি ব্যাপার যে ব্রহ্মকৃত লীলামাত্র, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই এবং ইহাও সত্য যে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাধ্যবাধকতা-শূন্যভাবে আদ্যন্ত বিশ্বলীলা সমাধান করিতেছেন।

ওঁং জ্ঞান-প্রেমময়ম্ ওঁং

* "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জগতে মঙ্গল বই অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে না। আমরা যাহাকে অমঙ্গল বলি, তাহাও মঙ্গলেই পরিপূর্ণ

ওঁং

যেন স্থিতং প্রাগ্ জগতোঽস্য সৃষ্টে
র্যস্যাস্য নাশেঽপি সতীব সংস্থা।
যেনাব্যতে সর্ব্বজগৎ স্বশক্ত্যা
তমীশ্বরং সর্ব্বগুরুং নমামি॥ (পরমর্ষি গুরুনাথ)

—(o)—

সৃষ্টি সাদি কি অনাদি ?

'সৃষ্টির সূচনা' ও 'লীলাতত্ত্ব' অংশদ্বয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৃষ্টি সাদি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ভিন্ন সৃষ্টির সাদিত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ও 'কল্পবাদ' অংশদ্বয়ে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

সৃষ্টির যে আদি আছে, তাহা এই সৃষ্টি শব্দ অথবা creation অথবা সৃষ্টি অর্থ সূচক অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দ গুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সৃষ্টি একটী ক্রিয়া বা কর্ম্ম। ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা থাকা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ক্রিয়া কখনও স্বাধীন নহে, কর্ত্তাই স্বাধীন। ইচ্ছা ও ক্রিয়া এক পর্য্যায় ভূক্ত। ইচ্ছা অন্তরের ভাব ও ক্রিয়া উহার বহিঃ প্রকাশ মাত্র। সুতরাং উহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্পর্ক বর্ত্তমান। ক্রিয়া বলিলেই কর্ত্তার ইচ্ছা উহার পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, ইহা আমাদের স্বাভাবিক ধারণা। আবার 'ইচ্ছা' বলিলেই আমরা স্বতঃই বুঝি যে কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে কর্ত্তার হৃদয়ে তাহা উদয় হইয়াছে এবং উহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও উহা (ইচ্ছা) তথায় ছিল না। সুতরাং কর্ম্ম ত উহার পূর্ব্বে থাকিতে পারে না। অতএব এক কর্ত্তা (তিনি পরব্রহ্ম) আছেন ও কোনও এক বিশেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল ও সেই বিশেষ ইচ্ছার কর্ম্মরূপ বহিঃ প্রকাশ (অর্থাৎ সৃষ্টি) হইল। অথবা সেই বিশেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে উদয়

হইয়াছিল না। অতএব সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম সেই ইচ্ছার উদয়ের পূর্ব্বে ছিল না বা থাকিতেও পারে না। সুতরাং সৃষ্টি সাদি, কখনই অনাদি নহে।

নিম্নলিখিত ভাবেও দেখা যাইবে যে আত্মাই সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান, তাঁহারই ইচ্ছা এবং ক্রিয়া সেই ইচ্ছারই পরিণতি।

আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা, ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতি জন্যা ভবেচ্চেষ্টা, চেষ্টা জন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—আত্মজনিত ইচ্ছা, ইচ্ছার জন্য অন্তরে যত্নের উদয়, আন্তরিক যত্নের ভাব হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টার জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মানব যে সময় হইতে একটু চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় হইতেই সহজ জ্ঞানে সে বুঝিয়াছে যে একজন এই বিশাল সৃষ্টির কর্ত্তা আছেন। "বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে জনৈক ঋষি নভোমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্রাদি দর্শন করিয়া চিন্তা করিতেছেন যে "কিমিয়ং সৃষ্টির-কর্ত্তৃকা? নৈতৎ সম্ভবতি।" অর্থাৎ এই সৃষ্টি কি অকর্ত্তৃকা? কখনই ইহা সম্ভবপর নহে।* পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে যে এই ভাব প্রচলিত, তাহা সৃষ্টির সাদিত্ব সম্বন্ধে চরম সাক্ষ্য (conclusive evidence) না হইলেও একটী বলবতী যুক্তি বটে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রুতি মন্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যাইবে যে সৃষ্টি সাদি। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে criticism of experience আমাদের বিচারের প্রধান সহায়। জগতে দেখা যায় যে আমাদের দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। জগৎও সৃষ্ট বা উৎপন্ন পদার্থ। সুতরাং উহারও আদি অন্ত আছে। জাগতিক পদার্থ মাত্রই জন্ম বৃদ্ধি, হ্রাস ও নাশরূপ বিকারের অধীন। সুতরাং জগৎও অবশ্যই সেই নিয়মের অন্তর্গত। কারণ, জগৎও সেই অংশ সমূহের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং জগতেরও আদি আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যুক্তি যুক্ত ভাবে ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই।

আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় অব্যক্তের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। "লীলাতত্ত্ব" অংশে

---

* তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা—৬২ পৃঃ।

আমরা দেখিয়াছি যে এই সৃষ্টি কেবল লীলার্থই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট। জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইলেও ইহাতে তাঁহার ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইয়াও পৃথক্ (distinct) ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ অব্যক্তস্বরূপ + কারুকার্য্য বা নামরূপ = জড় জগৎ। কেহই সৃষ্টিকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে এক বলিতে পারেন না। সৃষ্টি যে ব্রহ্মের স্বভাবজাত (automatic), অনাদি অনন্ত নহে, তাহা প্রথম অংশ চতুষ্টয়ে নানাভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টি এক সময়ে ছিল না এবং সুদূর ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সুতরাং উহা ব্রহ্মের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়ও নহে। এই জন্যই সৃষ্টি ব্যাপারকে লীলা আখ্যা দেওয়া হয়। ব্রহ্ম Absolute. তিনি নিত্য অনন্ত ভাবে স্বাধীন। তিনি অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তিরও অতীত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই বা থাকিতে পারে না। সৃষ্টি যদি অবশ্য প্রয়োজনীয়ই হইত, অর্থাৎ সৃষ্টি না হইলে যদি তিনি অচল হইতেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব অসম্ভব হইত, তবে তিনি Absolute হইতে পারিতেন না। ইহাই যখন সত্য তত্ত্ব, তখন সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত ও সাদি, কখনই অনাদি নহে।

"কেহ কেহ বলেন যে "সংসার অনাদি, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সংসার অনাদি না হইলে কোন সময়ে তাহার আদি সর্গ বা প্রথম উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। আদি সর্গ স্বীকার করা কিন্তু দার্শনিকদিগের চক্ষে নিতান্তই অসমীচীন বলিয়া প্রতীত হইবে। কারণ, ভোগের জন্য শরীরের উৎপত্তি হয়। কেননা শরীর ভোগের অধিষ্ঠান। সুখ দুঃখ ভোগ পুণ্য-পাপ জন্য। পুণ্য ও পাপ শরীর নিষ্পাদ্য। আদি সৃষ্টি মানিলে বলিতে হয় যে তৎপূর্ব্বে শরীর ছিল না। সুতরাং শরীরসাধ্য কর্ম্মও ছিল না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে আদি সৃষ্টির ভোগ কর্ম্মজনিত নহে। উহা আকস্মিক। সংসার আকস্মিক বা নির্নিমিত্ত হইলে মুক্ত দিগেরও সংসার হইতে পারে। আদি সর্গে সুখ দুঃখাদির বৈষম্য নির্নিমিত্ত হইলে অকৃতাভ্যাগম দোষ উপস্থিত

হয়। কেননা ইতিপূর্ব্বে কর্ম্ম করা হয় নাই, অথচ কর্ম্মফল সুখ দুঃখ-ভোগ করিতে হইল। যাহা করা হয় নাই, তাহার ফল ভোগ করার নাম অকৃতাভ্যাগম। সুধীগণ বিবেচনা করিবেন যে আদি সর্গ মানিতে হইলে প্রাথমিক বৈষম্য সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাধীন বলিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার বৈষম্যাদি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সংসার অনাদি, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্র সিদ্ধ।"

"ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আদি সৃষ্টির ভোগ কর্ম্মজনিত নহে বটে, কিন্তু গুণজনিত; অর্থাৎ আদিতে যে সকল জীব সৃষ্ট হয়, তাহা-দিগের প্রত্যেকের এক একটী গুণ অধিকতর ভাবে উন্নত থাকে এবং তাহারা সকলেই গড়ে তুল্য গুণ-বিশিষ্ট থাকে (ক), সুতরাং তাহাতে সৃষ্টি কর্ত্তার কোনরূপ বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। যদি বল যে তবে জগতে এরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে প্রতি জীবই সেই অনন্ত স্বাধীনের অংশ (খ)। সুতরাং তাহাদিগের প্রত্যেকেরই কর্ম্ম সম্পাদন-বিষয়ে স্বাধীনতা যে আছে, তাহাতে সংশয় নাই। সেই স্বাধীনতায় পরিচালিত হইয়া তাহারা পরে যে যেরূপ কার্য্য করে, জন্মান্তরে ও ঐ জন্মেও তদনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে।"

"অপর, আদি সৃষ্টির ভোগ যে আকস্মিক নহে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত অংশেই প্রকাশিত হইয়াছে। আর আদিসর্গে সুখ ও দুঃখাদির বৈষম্য নির্নিমিত্ত হইলে অকৃতাভ্যাগম দোষ হয় বটে, কিন্তু উহা নির্নিমিত্ত নহে। গড়ে তুল্য গুণ বিশিষ্ট হইলেও কাহারও পক্ষে প্রথমে দুঃখ পরে সুখ; আবার দুঃখ আবার সুখ, ইত্যাকার অবস্থা হয়। আর অপরের পক্ষে কিছুদিন সুখ পরে দুঃখ ইত্যাদি রূপভেদ মাত্র থাকে। তবে যিনি স্বাধীন ভাব-নিবন্ধন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট কার্য্য করেন, তিনি ক্রমশঃই উন্নত ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি স্বাধীনতা বশতঃ উন্নতির দিকে না যান, তিনি অশেষ দুঃখে জীবন যাপন

(ক) এবং (খ) ইহার বিস্তারিত বিবরণ "গুণ বিধান" ও "ব্রহ্মের জীব-ভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ এক, কিন্তু অংশভাবে ভাসমান, তাহাও উহাদিগেতে বিবৃত হইবে।

করিতে বাধ্য হন। এ সমস্ত আদি সৃষ্টির পরে স্বকার্য্য জনিত হয়, সুতরাং উহাতে অকৃতাভ্যাগম দোষ হইতে পারে না।''

"অপিচ 'আদি সর্গ স্বীকার করা কিন্তু দার্শনিকদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া প্রতীত হইবে' এই অংশের উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল দর্শন প্রণীত হইয়াছে, সে গুলি যে অভ্রান্ত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে একদর্শনের বহু বিষয় অন্য দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। এ অবস্থায়ও যে ব্যক্তি উভয় দর্শনকে অভ্রান্ত বিবেচনা করে, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আকাশাদি যে সকল পদার্থকে বিকৃতি (অর্থাৎ সৃষ্ট বা উৎপন্ন) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি সর্ব্বদর্শী দার্শনিকের পক্ষে সঙ্গত হয়?''

"যেমন শ্রুতিতে সৃষ্টির সাদিত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ বাইবেল প্রভৃতিতেও উহা লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই সৃষ্টিকাল এত দূরবর্ত্তী যে তাহা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। এমন কি উহা চিত্তেও সম্যক ধারণা করা যায় না। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, উহা অনাদি নহে, প্রত্যুত সাদি। যেমন .৯· পৌনপৌনিক নব দশাংশ প্রকৃত পক্ষে একের তুল্য নহে, কিন্তু উহাকে এক ধরিয়া কার্য্য করায় স্থূল জগৎ সম্বন্ধে কোনও ভ্রম হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও জানিবে। পূর্ব্বোক্ত গণিতজ্ঞদিগের ন্যায় দার্শনিকেরাও সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন'' (ক)

এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে সৃষ্টিকে অনাদি বলিলেও অদৃষ্টাবাদের সুমীমাংসা লাভ হয় না। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কার অনুযায়ী আমাদের বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন ও বর্ত্তমান জন্মের বহু বহু কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এইরূপ পূর্ব্ব জন্ম ধরিতে ধরিতে যদি যাওয়া যায়, তবে অনাদি অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় বটে, কিন্তু কেহই আদি জন্মের ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা—৫৪-৫৮ পৃঃ।

প্রশ্নের সুমীমাংসা না করিয়া একটী অসীম অন্ধকার পূর্ণ কাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। ইহাতে অনবস্থা নামক বিচার দোষও উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে হয়।

আমরা আদি অন্ত মানব ভাবেই পৃথিবীতে বিচরণ করি, অথবা কীট কীটাণুভাবেই জগতে আদিতে আসিয়া থাকি, আমাদের আদি জন্ম আছে.ইহা সত্য। হিন্দুশাস্ত্র মতে মানবজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে ইতর জীবভাবে ৮৪ লক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ৮৪ লক্ষের মধ্যে যে প্রথম জন্ম. তাহাই মানবের জীবভাবে জন্ম। অতএব হিন্দু শাস্ত্র মতেও আমরা প্রথম জন্ম ধারণা করিতে পারি। "অহং বহুস্যাম্" প্রভৃতি সৃষ্টির সূচনামূলক শ্রুতি বাক্য সমূহ আলোচনা করিলেও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে সৃষ্টি অনাদি নহে এবং আমরা একদিন পরমাত্মা হইতে আসিয়া দেহ বদ্ধ হইয়াছি।

কেহ কেহ এই সকল সৃষ্টির সূচনা মূলক উক্তি সম্বন্ধে বলেন যে প্রত্যেক কল্পারম্ভে ঈশ্বর (ব্রহ্ম নহেন) এইরূপ ইচ্ছা করেন। এই মত আমাদের অনুমোদিত নহে। এ বিষয়ে 'কল্পবাদ' ও 'মায়াবাদ' অংশদ্বয়ে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জীবের জন্ম সম্বন্ধে ত সে কথা প্রযোজ্য নহে। কারণ, প্রত্যেক কল্পেই জীব নিম্নতম স্তরে জন্মগ্রহণ করে, ইহা হিন্দু শাস্ত্রেরও মত নহে। বরং ইহাই উহার মত যে কল্পান্তে যে সকল জীব যে অবস্থায় ছিল, পর কল্পে তাহারা সেই ভাবে ব্যক্ত হয়। সুতরাং জীবের জন্ম অনাদি বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে এক কল্পের মধ্যেই আমাদের প্রথম জন্ম হইয়াছে। কারণ ৮৪ লক্ষ জন্ম সংখ্যাতীত নহে। উহা গণনার মধ্যে গণ্য করা হয় এবং উহা অনায়াসেই ধারণা করা যায়। অতএব দেখা গেল যে আমাদের প্রথম জন্ম আছে এবং তাহা এক কল্পের মধ্যেই সম্ভব হয়।

এ বিষয়ে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই যে বীজাঙ্কুর ন্যায়ের ন্যায় এ বিষয়ের সুমীমাংসা অসম্ভব। অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা মানিয়া লও ; বৃক্ষ পূর্ব্বে না বীজ পূর্ব্বে, তাহা যেমন তাহাদের মতে

তর্ক করিয়া শেষ করা যায় না, সেইরূপ জন্ম পূর্ব্বে অথবা কর্ম্ম পূর্ব্বে তাহারও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যদি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে কর্ম্মবাদ ইহার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু দেখা গেল যে সেই কর্ম্মবাদ সম্বন্ধীয় শেষ মীমাংসা অসম্ভব। সুতরাং কর্ম্মবাদ জন্য যে সৃষ্টি অনাদি বলিয়া ধরিতে হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

সৃষ্টি যদি অনাদি হইত, তবে পরমেশ্বর উহার স্রষ্টা হইতে পারিতেন না। উভয়ই অনাদি হইলে একে অন্যের স্রষ্টা বা কারণ হইতে পারেন না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সাংখ্যদর্শন পুরুষ এবং প্রধান উভয়কেই অনাদি বলেন, কিন্তু পুরুষকে প্রকৃতির স্রষ্টা বলেন না।* সাংখ্যমতে বলা হয় যে প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে এবং মোক্ষ দান করে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র। উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকগণ সৃষ্টিকে কার্য্য এবং পরমেশ্বরকে উহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে স্বতঃই তাঁহাদের পূর্ব্বাপর সম্পর্ক সূচিত হয়। কারণ চিরকালই কার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সৃষ্টি সাদি। আবার যদি সৃষ্টিকে অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মের স্বভাবজাত অর্থাৎ তাঁহারই ইচ্ছা ভিন্ন আপনা আপনি তাঁহা হইতে সঞ্জাত বলিয়া অনুমান করা যায়, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম উহার উপাদান কারণ হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উহার নিমিত্ত কারণ নহেন। এই সম্বন্ধে "লীলাতত্ত্ব" অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে।

সৃষ্টি যদি অনাদি হইত, তবে উহা পরমেশ্বর হইতে স্বাধীন হইত ও বিশ্বের সংঘটন (composition), বিকাশ ও লয় এবং উহাদের বিধানের উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিত না। পরমেশ্বর অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বড় জোড় সৃষ্টির সহিত তাহার কেবলমাত্র প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকিত। কিন্তু জগৎ গঠনে আমরা তাঁহার অসীম

* সাংখ্য দর্শনে কথিত তত্ত্বসমূহ "সাংখ্যমত বিচার" অংশে লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞানের পরিচয়ই পাই। নানা বিভাগের বৈজ্ঞানিকগণ জগৎ কার্য্যে অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সেইরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। জ্ঞানশূন্য জড় কখনও স্বাধীনভাবে এইরূপ জ্ঞানময়ী সৃষ্টির বিকাশ সাধন করিতে পারিত না। জড় কখনও স্বাধীন নহে। সে নিজে অচেতন এবং সর্ব্বদাই চেতনের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। উহা চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। সুতরাং সেই জড় কখনও স্বাধীনভাবে নিজেকে বিকাশ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে পারিত না। একটু অনুধাবন করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে এই জড় জগতের পশ্চাতে জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় ও অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণনিধানের সুমহতী ইচ্ছা নিয়ত কার্য্য করিতেছে এবং সেই জন্যই উহা এইরূপ বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যে ইহার চমৎকারিত্ব ও বৈচিত্র্য আরও কতভাবে ধারণা করিবেন, তাহা কে জানে ?

মানব বলিতে আমাদের দেহ ও আত্মা মিলিত বস্তুকে বুঝি। এই দেহ মানব স্বয়ং সৃষ্টি করেন নাই। সেইজন্যই দেহের উপর তাহার সম্পূর্ণ হাত নাই। সর্ব্বদাই দেখি যে দেহ আমাদের অবাধ্য, অথবা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেহকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব করাই আমাদের জীবনের একটী বিশেষ সাধনা। অপর পক্ষে মানবের হাতের তৈয়ারী জিনিষের (artificial things-এর) উপর তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। এই বিষয়টী গভীরভাবে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৃষ্টি যদি অনাদি হইত, তবে তাহার উপরও পরমেশ্বরের একাধিপত্য থাকিত না। এক প্রকার লোক আছেন যাহারা পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া বলেন যে Elements এর (ভূতসমূহের) উপর পরমেশ্বরের কোনও হাত নাই। সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিলে উক্তমতের অধিক পরিমাণে সমর্থন করা হয় এবং ইহাতে অদূরদর্শিতার পরিচয়ই প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন যে "পরমেশ্বর যখন নিত্য জ্ঞানময়, তখন জ্ঞানের বিষয় অনাদি কাল হইতে না থাকিলে তাঁহার জ্ঞানময়ত্বের অর্থ কি ?" অর্থাৎ জ্ঞানী আছেন, অথচ জ্ঞানের বিষয় নাই, ইহা স্ববিরোধী উক্তি।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পরমপিতা অনন্ত গুণাতীত। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশে লিখিত গুণাতীত শব্দের ব্যাখ্যা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজেকেই নিজে জানিতেন, নিজেকেই নিজে প্রেম করিতেন এবং নিজে নিজেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং একই সময় তিনি তাঁহার অনন্ত গুণ-রাশির অতীত। ব্রহ্মের জ্ঞানের জন্য পৃথক পাত্রের (object এর) অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনিই তাঁহার জ্ঞানের ভাজন অথবা তিনি নিজে নিজেকে জানেন। কারণ, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলেন—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। ১।৪।১০ ।* সাধারণের ধারণা এই যে বিষয় ও বিষয়ী উভয় না থাকিলে জ্ঞানক্রিয়া অসম্ভব। এই বদ্ধমূল সংস্কার হইতেই এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। ইহা জড়ভাবে জড়িত জীবের অর্থাৎ দ্বৈতভাবাপন্ন জীবের জ্ঞান ও প্রেম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরমাত্মা জড়ের অতীত। তিনি নিত্যই এক অখণ্ড ব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি নিজেকে নিজে জানিতে জড়ের প্রয়োজন হইবে, ইহা যে একান্তই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্ম নিত্যই নিরালম্ব (সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং), পূর্ণ এবং অনন্ত স্বাধীন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম ক্রিয়ার জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।

এই সম্বন্ধে এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। "বিষয় ও বিষয়ী উভয়ের মিলন না হইলে যে কোন জ্ঞান সম্ভব নহে, এমন কি ব্রহ্মের পক্ষেও উক্ত অবস্থা ভিন্ন জ্ঞান লাভ অসম্ভব।" এই উক্তির সমর্থনার্থ কেহ কেহ কৌষীতকী উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উপস্থিত করেন। "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞা-মাত্রা অধিভূতম্। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রাঃ

* বঙ্গানুবাদ ঃ—অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকেই এইরূপ জানিয়াছিলেন "আমিই ব্রহ্ম"। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-রত্ন)।

ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা। তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।” বঙ্গানুবাদ ঃ–এই দশভূতমাত্রা (অর্থাৎ বিষয় জগতের উপাদান) প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এবং এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা (অর্থাৎ বিষয়ী জগতের উপাদান) ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত, তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত, তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুইয়ের কেবল একটিতে কোন রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা (অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু) নানা নহে (একমাত্র) যেমন রথের নেমি অর সমূহে স্থাপিত এবং অর সমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা সমূহে স্থাপিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অজর, অমর প্রজ্ঞাত্মা। (তত্ত্বভূষণ)

ঋষি এস্থলে প্রজ্ঞাত্মার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন নাই, ইহা সুস্পষ্ট। “প্রজ্ঞাত্মা” শব্দ দ্বারা যে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৫ম মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। সুষুপ্ত স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। বঙ্গানুবাদ ঃ—সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূতের ন্যায় হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভূক্ এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার, সেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই তৃতীয় পাদ। (তত্ত্বভূষণ)।

এই অবস্থা জীবের সুষুপ্তির অবস্থা। সুতরাং প্রজ্ঞাত্মা শব্দ দ্বারা জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে নহে। কঠোপনিষদ্ জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা বলিয়াছেন। এখন তুরীয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে

উক্ত উপনিষদ্ কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক্। উহার ৭ম মন্ত্রে দেখা যায় যে তিনি নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞা-নঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ইত্যাদি। বঙ্গানুবাদ ঃ- যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নের অন্তরালাবস্থা যুক্ত নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্বৈত ভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত নহেন অপ্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন নহেন, ইত্যাদি। (তত্ত্বভূষণ)।

অতএব কৌষীতকী উপনিষদে উক্ত "প্রজ্ঞাত্মা" শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় না। সুতরাং উহা হইতে উদ্ধৃত মন্ত্র আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করে। অর্থাৎ জড়ভাবে জড়িত জীবের অর্থাৎ দ্বৈতভাবাপন্ন জীবের পক্ষেই জ্ঞানলাভের জন্য বিষয় বিষয়ীর মিলন প্রয়োজনীয়, কিন্তু জড়াতীত, অখণ্ড, অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের পক্ষে জ্ঞান লাভের জন্য * উক্ত বিষয় বিষয়ীর মিলন একান্ত প্রয়োজনীয় নহে এবং হইতেও পারে না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে জীবের জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" তাহা আমরা তৈত্তিরীয়ো-পনিষদের ২।১ মন্ত্রে দেখিতে পাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞান তাঁহার অনন্ত গুণের একটী গুণ। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশ দ্রষ্টব্য তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের স্বরূপ, লক্ষণ ও গুণ একই। জীবের জ্ঞানকে জ্ঞান শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে আত্মার জ্ঞান অন্তঃকরণের সংসর্গে বিকৃত হইয়া যে ভাবে প্রকাশিত

* ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে নূতন করিয়া কোনও জ্ঞান লাভ হয় না তবে ব্রহ্মের পক্ষে "জ্ঞান লাভের জন্য" বলা হইল কেন? ইহার কারণ এই যে আপত্তিকারীর আপত্তিও ঐরূপ ভাবমূলক। সুতরাং তাহাকে বুঝাইতে ঐরূপ ভাবেই লিখিত হইল। স্থূল, দ্বৈতভাবাপন্ন অপূর্ণ জীবের পক্ষে যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ পূর্ণ ব্রহ্মের পক্ষে তাহা প্রয়ো-জনীয় নহে। যদি তাহা স্বীকার না করা যায়, তবে ব্রহ্ম পরমুখাপেক্ষী বলিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মত্ব থাকে না। ব্রহ্মের কোনই অভাব নাই, সুতরাং তাঁহার কিছুরই অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি নিত্যই অনন্তভাবে পূর্ণ ও অনন্ত স্বাধীন। He is Absolute. সুতরাং জগৎ তাঁহার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

হয়, তাহাই জীবের জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। ইহাকে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিকৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে।

যাহারা বিষয় বিষয়ীর মিলন ব্যতীত জ্ঞানলাভ যে কেবল আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলেন, তাহা নহে; কিন্তু সেই তুলনায় ব্রহ্মের পক্ষেও উহা অসম্ভব, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে একটী বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে। তাহা এই যে আমাদের পক্ষে বিষয় সর্ব্বদাই বাহিরের বস্তু। কিন্তু তাহারা কি বলিতে চাহেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মের বাহিরে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়রূপে অবস্থিত, যেমন এই পুস্তকখানি আমার বাহিরে আমার জ্ঞেয় পদার্থরূপে বর্ত্তমান? যদি বিশ্বকে ব্রহ্মের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া তাহারা স্বীকার করেন, তবে ত ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হন। সুতরাং ব্রহ্ম যাহারা স্বীকার করেন, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মের বাহিরে কোন পদার্থের অবস্থিতি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। আর যদি তাহারা বিশ্বকে ব্রহ্মের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ত তাঁহার জ্ঞেয় বিষয় তাঁহার বাহিরে আর থাকিল না। সুতরাং জগতে বিষয় বিষয়ীর সম্পর্কের তুলনা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইল না। কারণ, বিষয় সর্ব্বদাই বিষয়ীর বাহিরে অবস্থিত থাকে। যদি কেহ বলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মের বাহিরে নহে, তাঁহার অন্তর্গতই বটে, কিন্তু উহা তাঁহার স্বগতভেদ, তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যাহারা জীব ও জগৎকে স্বগতভেদ বলেন, তাহারা উহাদিগকে ব্রহ্মের সহিত অভেদও বলেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অমারা রামানুজ আচার্য্য কথিত স্বগতভেদ সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিনা। উহাতে এক, অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মকে বিভাগ করা হইয়াছে। তিনি নিত্য একরস। তাঁহাতে কোনও বিভাগ হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন জীব ও জগৎকে অভেদ ভাবে দেখেন, তখন সেই অর্থে তিনি নিজে নিজেকেই জানিতেছেন বলিতে হইবে। স্বগতভেদ বলিলেই বলিতে হইবে যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশভাবে

ভাসমান। যদি তাহাই হয়, তবে জীব ও জগৎকে জানার অর্থও তাঁহার নিজেকেই নিজে জানা। এই বিষয় যে ভাবেই আমরা চিন্তা করিনা কেন, এই আপত্তিতেও বিষয় বিষয়ীর তুলনা ব্রহ্ম পক্ষে খাটে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আপত্তিকারী উক্ত তুলনা ব্যতীত এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেন না যে ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানেন না। শ্রুতি প্রমাণ যে সেই সিদ্ধান্ত বিরোধী, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আমরা আরও বলিতে পারি যে পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমাত্মার সম্পূর্ণ ভাব আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব, আভাস মাত্র লাভই সম্ভব। মনের অণুত্বই আছে, মহত্ত্ব নাই। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেও মন একই সময় পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ পঞ্চ বিষয়ের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও যথায় মনের সম্বন্ধ থাকে, তথায়ই জ্ঞান জন্মে। মনের মহত্ত্ব স্বীকার করিলে একই কালে পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে পারিত। "অপর মন আশু সঞ্চারী বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় যেন এককালেই জ্ঞান পঞ্চক জন্মিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা নহে। উৎপল শত পত্র ভেদ ও অলাত চক্র দর্শনের ন্যায় উক্ত পঞ্চবিধ জ্ঞান যে ক্রমশঃ জন্মে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" (ক)

অতএব দেখা গেল যে মন অত্যন্ত সান্ত ও সীমাবদ্ধ বা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু পরব্রহ্মের সম্বন্ধে ত এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইতে পারে না। তিনি ত প্রতি মুহূর্ত্তেই সকল জানিতেছেন। তিনি যে কেবল সসীম বিশ্বকেই জানিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু বিশ্বাতীত তিনি তাঁহাকেও অনন্তভাবে—সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্ষণেই জানিতেছেন। তাঁহার নিকট ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। সকলই তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান। এইরূপ অনন্ত অপার এবং পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানী যিনি, সামান্য মানব তাহার অতি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনের সহিত তুলনা করিয়া

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

তাঁহার অনন্ত এবং নিত্য পূর্ণ জ্ঞানের ধারণা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে আমাদের অন্তঃকরণই অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং উহা অনন্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অতএব অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্মের জ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণের জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পরব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে তাঁহাকেই নিত্য অনন্তভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই জানিতেছেন এবং তাঁহারই একান্ত ভাবে অন্তর্গত ক্ষুদ্র বিশ্বকেও জানিতেছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য দর্শন বলিয়া থাকেন যে প্রথমতঃ আমরা পদার্থের জ্ঞানলাভ করি এবং তাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান পাই। অর্থাৎ প্রথমতঃ Consciousness এবং তদুৎপন্ন Self-Consciousness, ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আত্মা দেহে না থাকিলে কোনও রূপ Consciousness উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে সকল জ্ঞানক্রিয়ার সাক্ষী বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান আত্মার একটী নিত্য স্বরূপ সুতরাং তিনি জানিতেছেন যে তিনি জ্ঞানক্রিয়া করিতেছেন। সকল জ্ঞানক্রিয়ার মূলে যখন আত্মা বর্ত্তমান, তখন তাঁহার অজ্ঞাতে জ্ঞানক্রিয়া হইবে অথবা জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে যে তিনি জ্ঞানী, ইহা হইতেই পারে না। মায়াবাদ এবং সাংখ্যদর্শন কূটস্থ ব্রহ্ম এবং পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে জ্ঞানময় সাক্ষী বলেন। অতএব আত্মা নিজে অন্য অবলম্বন ব্যতীতও নিজেকে জানিতে পারেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রোক্ত দার্শনিকগণ বলেন যে Consciousness-ই আত্মা অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। যদি তিনি নিত্যই জ্ঞানস্বরূপই হন, তবে কেন তিনি নিত্যই নিজেকে নিজে জানিতে পারিবেন না? তাঁহার নিজেকে জানিতে অন্য বিষয়ের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী কেন হইবে? আলো কি নিজেকে প্রকাশ করিতে অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন বোধ করে? সূর্য্য যেমন নিজেকে আলোক দান করে, সেইরূপই গ্রহ উপগ্রহও সূর্য্যালোকেই উদ্ভাসিত হয়। যখন সূর্য্যমণ্ডলই সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু

তাহা হইতে গ্রহগণের উৎপত্তি হয় নাই, তখনও সূর্য্য নিজের আলোকে নিজেই আলোকিত হইত। যদি বলেন যে চক্ষু সকল বস্তু দেখে বটে, কিন্তু উহা নিজেকে নিজে দেখিতে পারেনা, তবে বলিতে হয় যে চক্ষু এক প্রকার (সর্ব্বপ্রকার নহে) জ্ঞান লাভের জন্য দেহের একটী জড়ীয় যন্ত্র মাত্র এবং উহা অত্যন্তভাবে সীমাবদ্ধ। উহা পার্থিব কার্য্য সাধনার্থ ঐরূপ ভাবে গঠিত। জ্ঞান ব্রহ্মের একটী নিত্য ও পূর্ণ গুণ। উহা জড় যন্ত্রের সহিত উপমিত হইতে পারে না। উহার অন্তর বহির্ভাগ নাই। উহা নিত্য, সীমাহীন এবং সর্ব্বদর্শী। এস্থলে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশ পাঠক পাঠ করিবেন। জীবের মনের যখন লয় হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন জীবাত্মায় লীন হয়, তখন তাহার কোন বিষয়-জ্ঞান থাকা অসম্ভব। তখনও কিন্তু তিনি আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী। সুতরাং তিনি তখন অবশ্যই নিজেকে নিজে জানেন। এই জ্ঞানই সত্য জ্ঞান। পাঠক মনে রাখিবেন যে আত্মার জ্ঞান নিত্য। কারণ, জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। যখন তাঁহার বিষয়-জ্ঞানও থাকিল না তখন অবশ্যই তাঁহার স্বভাববশতঃই নিজেকে নিজে জানিতে হইবে। প্রোক্ত দার্শনিকগণ এই দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করিয়াই স্থির করিয়াছেন যে আত্মার জ্ঞান বিষয় সাপেক্ষ। প্রোক্ত দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা আছে অথবা যাহারা উহাতে বিশ্বাসী, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন যে বিষয় নিরপেক্ষ হইয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। যাহারা অন্তঃকরণের জ্ঞানকেই একমাত্র জ্ঞান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অন্তঃকরণের পশ্চাতে যে মূল জ্ঞান বা সত্য জ্ঞান বর্ত্তমান, ইহা যাহারা বলেন না অর্থাৎ যাহারা অন্তঃকরণকেই (Mind কেই) আত্মা মনে করেন, তাহারা অবশ্যই বলিবেন যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিষয় জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়।* নিম্নোদ্ধৃত অংশও আমাদের মত সমর্থন করে।

"Some metaphysicians, however, e g. Plotinus

* "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে অন্তঃকরণের সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান।

and Schilling have maintained that even man may acquire the power of rising above the limitations which produce sense consciousness and of becoming directly conscious of himself as a self evolving creative power identical with—or a function of the Absolute ; and many mystical thinkers have claimed the same power. The idea has been a favourite one also with some poets, e. g. Wordsworth and Tennyson. (Problems of Metaphysics).

বঙ্গানুবাদ :—Plotinus এবং Schilling প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-উৎপত্তির জন্য যে সকল বাধা আছে, মানব তাহার উপর উঠিতে শক্তি লাভ করিতে পারেন। মানব যে ব্রহ্মের সহিত এক অথবা তাঁহার অংশ ভাবে স্বতঃ বিকাশকারী শক্তি, এই সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিও তিনি অর্জ্জন করিতে পারেন। অনেক চিন্তাশীল মরমিয়াগণ (Mystics) বলেন যে তাঁহাদের সেই শক্তি আছে। Wordsworth, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের এই ভাবটী প্রিয় ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, যদি অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন বলিতে হয়, তবুও তাহা আমাদের ধারণীয় নহে। কারণ, জগতে বিষয় বিষয়ীর মিলন ভিন্ন আমরা কোনও জ্ঞান ক্রিয়া লক্ষ্য করি না। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মানবের যতদিন দেহাত্মভেদ-জ্ঞানের উন্নতি লাভ না হইবে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল মনে এবং মন জীবাত্মায় লয় প্রাপ্ত না হইবে এবং যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা ব্রহ্মে তন্ময় না হইবেন (অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ), সেই পর্য্যন্তই এই জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না আত্মা স্ব স্বরূপে গমন করেন, সেই পর্য্যন্তই পরমাত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞানের ধারণা করা মানবের পক্ষে অসম্ভব। জীবের অর্থ দেহ + আত্মা।

সুতরাং আত্মা না হইলে পরমাত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান কিরূপে ধারণা করা যাইবে ?

আপত্তিকারী প্রোক্তরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদের ধারণীয় নহে বলেন। আমরা মানব সাধারণ ধারণা করিতে পারিব না বলিয়াই কি সেই তত্ত্ব মিথ্যা হইতে পারে ? ব্রহ্ম কালাতীত। তাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ নাই। সকলই নিত্য তাঁহার জ্ঞানে বর্ত্তমান। কিন্তু এই তত্ত্ব কি আমরা ধারণা করিতে পারি ? মানবের পক্ষে ভবিষ্যৎ জানা এক প্রকার অসম্ভব। গত ঘটনারও হুবহু স্মৃতি কাহারও থাকে না। যদি মানবের বিচারে ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে হয়, তবে ব্রহ্ম-জ্ঞান যে নিত্য, অনন্ত ও পূর্ণ এবং তিনি যে কালাতীত, ইহাও অস্বীকার করিতে হয়। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে (তথা কথিত জ্ঞানে) ধারণা করিতে পারিব না বলিয়া কোনও তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করা উচিত হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে বিশ্বে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন। সৃষ্টি যদি সাদি হয়, তবে এককালে বিশ্ব ছিল না বলিতে হইবে। সুতরাং সেই কালে ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা সর্ববাদিসম্মত যে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মকে ইংরেজীতে Absolute বলা হয়। Absolute এর অর্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং যাঁহার পক্ষে কোনও কিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না। ব্রহ্ম যদি জড় জগৎ ভিন্ন প্রকাশিত হইতে না পারিতেন, তবে সেই কারণেই তাঁহাকে Absolute বলিতে পারা যায় না। ব্রহ্মের প্রকাশের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহা কতদূর সঙ্গত উক্তি, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, নিজেকে জড় জগতে প্রকাশ করা নহে। এই স্বগুণ পরীক্ষার জন্যই প্রত্যেক জীবে তিনি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছেন, ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি অপ্রকাশিত ছিলেন এবং সৃষ্টির জন্যই তাঁহার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে লীলার্থই এই সৃষ্টি

ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মের Absoluteness বিশ্বকে লইয়াই, বাদ দিয়া নহে। সুতরাং পূর্ব্ব আপত্তির ত্রুটী কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জগতের পদার্থ সকল সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। যাহা আজ আছে, তাহা কাল নাই। আবার যাহা কাল থাকিবে, তাহা আজ নাই। সুতরাং সেইরূপ সর্ব্বদা চঞ্চল পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া কি প্রকারে তিনি প্রকাশিত থাকিবেন? এই সম্বন্ধে "আধ্যাত্মিক গুণ ও জড়ীয়গুণ" প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজেকে বিকাশ করিবার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই এবং সেই জন্যই বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে অনন্ত স্বাধীন। সুতরাং তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। ইহাও বিশেষভাবে বক্তব্য যে ব্রহ্ম ও জগৎ হুবহু এক (Identical) নহেন। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আরও বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত হইবে যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও প্রমাণিত হইবে যে অব্যক্ত স্বরূপই Practically জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পূর্ণরূপে এক নহে এবং জগৎ সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক (distinct)। সুতরাং ব্রহ্মের Absoluteness জগৎ লইয়াই হইতে পারে না। যদি তাঁহার প্রকাশের জন্য জগৎ সৃষ্টি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইত, তবে তাঁহার Absoluteness থাকিত না। এই জন্যই সৃষ্টিকে লীলা আখ্যা দেওয়া হয়, অর্থাৎ অপ্রয়োজনে নিজ খুসী মত তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রোক্ত মত বলেন যে সৃষ্টিতে ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নিজেকে বিকাশ করিয়াই চলিবেন। সুতরাং সৃষ্টি এখনও পূর্ণ নহে। সুতরাং তাঁহার প্রকাশও সম্পূর্ণ হইতেছে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন একজন অপূর্ণ সাধক, তিনি যেন নিজে নিজেকে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ বিকাশ করিতেছেন। ইহা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মের অনন্ত গুণই নিত্য সত্য। তাঁহার কোন গুণই সাদি ও সান্ত নহে। সুতরাং তাঁহার অনন্তত্ব ও পূর্ণত্বও নিত্য সত্য। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুরই বিকাশের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই বা ছিল না। আবার তাঁহার প্রত্যেক গুণই অনন্ত ও পূর্ণ। তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব গুণটীও নিত্য সত্য, পূর্ণ ও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার স্বপ্রকাশের কখনই বাধা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ তিনি নিত্য Absolutely স্বপ্রকাশ।

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

এই সম্বন্ধে আমরা অন্য ভাবেও আলোচনা করিতে পারি। প্রোক্ত মতানুযায়ী আমার সম্মুখস্থ Table-টীতে ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন। Table-টী এককালে ছিল না, কিন্তু স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিত্যই পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত ছিলেন। আবার উহা এককালে থাকিবে না, কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণ প্রকাশে নিত্য প্রকাশিত থাকিবেন। এই ভাবে চিন্তায় অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে এককালে পৃথিবী ছিল না, কিন্তু তাহাতে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশের কোনই বাধা হয় নাই। আমাদের চিন্তা যদি আরও প্রধাবিত করা হয়, তবেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই বিরাট বিশ্বের অবর্ত্তমানতায়ও অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও এবং মহা-প্রলয়ের পরেও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম প্রকাশিত থাকিতে পারিতেন ও পারিবেন। ব্রহ্মের প্রকাশের কোনও বাধা ছিল না, নাই বা থাকিবে না। কোন একটী বিশেষ বস্তুর সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মের প্রকাশের কোনই বাধা থাকে না, সেই বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার প্রকাশের কোনই বাধা থাকিতে পারে না। এস্থলে বিশ্ব এবং ক্ষুদ্র বস্তুটী সম্বন্ধে কোনই তারতম্য করা যায় না। উভয়ই সৃষ্ট বস্তু, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এইমাত্র পার্থক্য।

প্রেমের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অনন্ত নিত্য প্রেমময় পিতা সৃষ্টির পূর্ব্বেও নিজে নিজেকে প্রেম করিতে পারিতেন ও

করিতেন। ব্রহ্মই ত স্বয়ং তাঁহার নিজ ইচ্ছায় বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন।* কিন্তু তাহাতে তিনি খণ্ডিত হন নাই। অনন্ত, পূর্ণ ও অখণ্ড ব্রহ্ম ভিন্ন জীবাত্মার অস্তিত্ব কোথায়? বৃক্ষ যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ও ফলকে "আমিই" বলিতে পারে, সেইরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম "সকল জীবাত্মাই আমি" বলিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে জীবাত্মাকে ভালবাসার অর্থ প্রকারান্তরে নিজেকেই নিজে ভালবাসা। বৃহদারণ্যকোপনিষদ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে উক্ত ভাবের সমর্থন পাওয়া যাইবে। "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি; ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিধিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতং ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। বঙ্গানুবাদ:—তিনি বলিলেন—অয়ি! পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্ম-প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি!

---

* এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে লিখিত হইয়াছে।

জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। অয়ি! পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। অয়ি! পশুগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পশুগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পশুগণ প্রিয় হয়। অয়ি! ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণ জাতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ জাতি প্রিয় হয়। অয়ি! ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ক্ষত্রিয় জাতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় জাতি প্রিয় হয়। অয়ি! (স্বর্গাদি) লোক সমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ লোক সমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই লোক সমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! দেবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বেদসমূহের প্রতি প্রীতি-বশতঃ বেদসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বেদ সমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! ভূত সমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ ভূত সমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতসমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! সমুদায় বস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সমুদায় বস্তু প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই সমুদায় বস্তু প্রিয় হয়। সুতরাং অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে মনন করিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন করিলে ও অবগত হইলে এই সমুদায়ই বিদিত হয়।

ইহাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত ঔপনিষদিক প্রেমতত্ত্ব। উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখিতে পাই যে আত্মপ্রীতিই সর্ব্বপ্রেমের মূল। সাধকের যখন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে সমস্তই একাত্মা, তখন সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মপ্রীতি স্বভাবসিদ্ধ এবং আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। অর্থাং মানব যখন সকল জীবাত্মাকে এক আত্মা বলিয়া সত্য ভাবে জানেন, তখন আত্মার জন্যই আত্মার স্বাভাবিক গুণেই সকল প্রিয়

হয় ; কারণ, সাধক তখন সকলকেই আত্মতুল্য বোধ করেন। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। মানবের পক্ষে এই অবস্থা লাভ সাধনা ও ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ, কিন্তু অনন্ত নিত্য প্রেমময় পরমপিতা নিত্যই জানেন যে তিনিই সমুদায়, সুতরাং তিনি স্বতঃই সকলের প্রতি প্রেম-ময় হইয়া আছেন অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তিনি নিজে নিজেকেই নিত্য ভালবাসিতেছেন। সুতরাং সৃষ্টির জন্য তাঁহার নূতন ভাবে কাহাকেও ভালবাসিতে হইতেছে না। কারণ, সকল জীবাত্মাই একই পরমাত্মার অংশভাবে ভাসমান মাত্র। অর্থাৎ সকল জীবাত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা. কিন্তু দেহাবদ্ধ বলিয়া ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশমান। তিনি ভিন্ন জগতে কেহ নাই। কারণ, তিনি এক, অখণ্ড. সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সাধারণ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে আমি আমাকে ভাল না বাসিলে অন্যকে ভালবাসিতে পারি না। কারণ আমার কাছে আমার হইতে নিকটতর এবং প্রিয়তর কেহ নাই। আমরা অন্যের দুঃখ দেখিয়া সমবেদনা অনুভব করি। ইহার কারণ কি? আমার প্রতি আমার প্রেম আছে, সুতরাং অন্যের প্রতিও আমার প্রেম আছে। তাই অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পারি। যখন প্রেম এমন একটী গুণ, যাহা দ্বারা নিজেকে পরের সুখ দুঃখে পরিণত করা যায়, তখন সেই প্রেম যে নিজে নিজেকেও ভালবাসিতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য। জীবাত্মাই যখন নিজে নিজেকে ভালবাসিতে পারেন, তখন পরমাত্মা যে নিজে নিজেকে ভালবাসিতে পারেন. ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।* ঔপনিষদিক প্রেমতত্ত্ব এই যে সকল আত্মাই এক। কারণ, তাঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। আত্মা নিজেকে নিজে ভালবাসেন। সুতরাং পরমাত্মাও নিজে নিজেকে ভালবাসেন এবং জীবকুলকেও ভালবাসেন। জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা, তাহা আমরা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে দেখিতে পাইব।

---

* "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে দয়ার উৎপত্তির প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

অতএব যে ভাবেই চিন্তা করি, তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই যে সৃষ্টির সাদিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ব্রহ্মের নিত্য প্রেমময়ত্বের বা জ্ঞানময়ত্বের কোনই বাধা উৎপন্ন হয় না। উক্ত আলোচনায় আমরা আরও পাই যে যাহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" স্বীকার করেন, তাহারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, তাহাদের মতে সকলেই যখন ব্রহ্ম, তখম সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের নূতন করিয়া কাহাকেও জানিতে বা প্রেম করিতে হইতেছে না। আবার যাহারা ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সকলকেই আত্মা বলেন এবং জীব ও জগৎকে সীমাবদ্ধ আত্মা বলেন, তাহাদের পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সুসঙ্গত হয় না। কারণ, সকলেই যখন আত্মা, তখন আর নূতন ভাবে ব্রহ্মের কাহাকেও জানিতে বা ভালবাসিতে হয় না। ব্রহ্ম জীব ও জগতের জন্য যে সামানির্দ্দেশ করিয়াছেন. তাহার মূল্য আত্মার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, যে হেতু সীমা অনিত্য ও হীনবল।

এখন সৃষ্টির প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া সৃষ্টির সাদিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের জননী জন্মভূমি পৃথিবীর আদি অবস্থা চিন্তা করা যাউক্। উহা প্রথমতঃ বায়বীয় অবস্থায় ছিল, সেই পদার্থ কোথায় হইতে আসিয়াছিল? বিজ্ঞান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে উহা আমাদের দৃষ্ট সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই রূপ ভাবেই সূর্য্য হইতে গ্রহগণের এবং গ্রহগণ হইতে উপগ্রহগণের ক্রমশঃ উৎপত্তি হইয়াছে। এই আলোচনা দ্বারা আমরা পাই যে প্রথমতঃ সমস্ত সৌর জগৎ একমাত্র সূর্য্যেই অবস্থিত ছিল। কালক্রমে পরম ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সূর্য্যেরই কিছু কিছু অংশ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে গ্রহ উপগ্রহে পরিণত হইয়া সৌর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম বা আদি আছে। এই রূপে সূর্য্যেরও আদিত্ব প্রমাণ করা যায়। কারণ, সূর্য্যও এককালে বৃহত্তর অন্য সূর্য্য হইতে পৃথিবীর ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্যেরও জন্ম বা আদি আছে। আবার দৃষ্ট সূর্য্য যে সূর্য্যের অংশ, সেই সূর্য্যের এবং সেই সৌর জগতেরও আদি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রণালীতে যদি অগ্রসর হওয়া যায়, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে বিশ্বে স্থিত অসংখ্য মণ্ডলের প্রত্যেকটীরই জন্ম বা আদি আছে। এখন মণ্ডল সমূহের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে মিশ্রিত পঞ্চভূত বিরাট্ বিশ্বাকারে বর্ত্তমান ছিল। ইহাই ভূতগণের পঞ্চীকৃত পঞ্চ অবস্থা। এই অবস্থারও যে জন্ম বা আদি আছে, তাহা আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইব। এখন মিশ্রিত ভূতাবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাঁচটী ভূত পাই। যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্। আমরা ইতঃপর প্রোক্ত অংশে দেখিতে পাইব যে ক্ষিতি অপ্ হইতে, অপ্ তেজঃ হইতে, তেজঃ মরুৎ হইতে এবং মরুৎ ব্যোম হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতেরও আদি আছে বলিতে হইবে। ব্যোম জড় জগতের আদি বটে, কিন্তু এই প্রণালী অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্যোমেরও উৎপত্তি বা আদি আছে। কারণ, সকল মণ্ডল এবং ভূত চতুষ্টয়ের যখন আদি আছে, তখন ব্যোমেরও আদি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে ব্যোম ব্রহ্মের একটী স্বরূপ হইতে অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপ হইতে পরমপিতার ইচ্ছা সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্তের পরিণাম অংশ দ্রষ্টব্য। সুতরাং ব্যোমও সাদি। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেরই যখন আদি আছে, তখন সমষ্টি বিশ্বেরও আদি আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহারা পাঞ্চভৌতিক মত স্বীকার না করেন, তাহারা এই প্রণালী স্বীকার নাও করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পাঞ্চভৌতিক মত যে সত্য, তাহাও প্রোক্ত অংশে সংক্ষেপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "সৃষ্টিতত্ত্বের প্রমাণ" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে গ্রন্থ লিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থের "সৃষ্টি প্রকরণ" ও উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিলে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আবার আমাদের প্রোক্ত

প্রমাণ প্রত্যক্ষ বিষয় ও বিজ্ঞানের সুসিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক মত স্বীকার না করিলেও উক্ত প্রমাণের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সৃষ্টি প্রণালী পর্য্যালোচনা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টি সাদি, কখনও অনাদি নহে।

জড় মাত্রই জন্ম বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশরূপ বিকারের অধীন, সুতরাং জড়ের সমষ্টি জড় জগৎ যাহা জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহারও সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থা সমূহ অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং বিশ্বের আদি আছে এবং মহাপ্রলয়ে উহা ব্রহ্মের যে স্বরূপ হইতে আগমন করিয়াছে, এবং যে স্বরূপ অবলম্বনে স্থিত, তাঁহাতেই আবার লয় প্রাপ্ত হইবে। Sir James Jeans বলেন :—

"The immensity of the universe becomes a matter of satisfaction rather than awe; we are citizens of no mean city. Again we need not puzzle over the finiteness of space; we feel no curiosity as to what lies beyond the four walls which bound our vision in a dream.

It is the same with time, which like space, we must think of as finite extent. As we trace the stream of time backwards, we encounter many indications that, after a long enough journey, we must come to its source, a time before which the present universe did not exist. (The Mysterious Universe). অর্থাৎ বিশ্বের বিরাটত্ব আমাদের বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ই বটে। কারণ আমরা একটী ক্ষুদ্র নগরের অধিবাসী নহি। আবার বিশ্বের সসীমত্ব ধারণা করিতে যাইয়া আমাদের হতবুদ্ধি হইবার কোনও কারণ নাই, স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহার বাহিরে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হই না।

কালের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাও দেশের ন্যায় সীমাবদ্ধ।

আমরা যদি কাল প্রবাহের পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হই, তবে অনেক লক্ষণ পাই যে বহুপথ পর্যাটন করিলে কালের আদিতে উপনীত হওয়া যায়, যখন বর্ত্তমান বিশ্ব ছিল না।

Sir James Jeans অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

Now the odds against the present division of the total energy of the universe into atoms and radiation being fortuitous are, as it happens, precisely the same as the odds against the universe having reached its final stage ; indeed the mathematical specification of a fortuitous state is precisely the same as that of a final state, and this enables us to dismiss the fortuitous conception of the universe as being entirely out of the question. Everything points with overwhelming force to a definite event or series of events, of creation at some time or times, not infinitely remote. The universe cannot have originated by chance out of its present ingredients, and neither can it have been always the same as now. For in either of these events no atoms would be left save such as are incapable to dissolving into radiation ; there would be neither sun-light nor star-light but only a cool glow of radiation uniformly diffused through space. This is, indeed, so far as the present day science can see, the final end towards which all creation moves, and at which it must at long last, arrive. (PP. 55 & 56 of E. O. S. ; The Wider aspects of Cosmology). অর্থাৎ "বিশ্ব শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে, ইহাও যেরূপ অত্যধিক ভাবে অসম্ভব,

পরমাণু ও বিকীরণের (Radiation-এর) মধ্যে বিশ্বের সমস্ত ক্রিয়া-শক্তির আকস্মিক বিভাগও সেইরূপ অসম্ভব। বাস্তবিক গাণিতিক গণনা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট (বিশ্বের) আকস্মিক উৎপত্তির অবস্থা ও উহার শেষ অবস্থা একই প্রকারের এবং ইহা দ্বারা বিশ্বের আকস্মিক উৎপত্তির কথা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। সমস্তই এমন দৃঢ় ভাবে বলিয়া দিতেছে যে কোন এক বা বহু সময় সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাসমূহ ঘটিয়াছে এবং সেই সকল ঘটনা অনন্ত দূরবর্ত্তীকালে ঘটে নাই। বিশ্ব বর্ত্তমান উপাদান হইতে আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হইতে পারেনা এবং ইহা বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, সেই ভাবেই ছিল, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, যদি তাহাই হইত, তবে যে সকল পরমাণু বিযুক্ত হইতে অসমর্থ, তাহা ভিন্ন কোনও পরমাণু বিশ্বে থাকিত না। সূর্য্যালোক বা নক্ষত্রালোক থাকিত না। কেবলমাত্র সমস্ত বিশ্বে একটী শীতল আলো সমভাবে পরিব্যপ্ত থাকিত. আধুনিক বিজ্ঞান যতদূর দর্শন করিতে পারে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে উহা বিশ্বের শেষ অবস্থা এবং উহার দিকেই সমস্ত সৃষ্টি চলিতেছে এইং সেই স্থলে উহা অবশেষে সুদূর ভবিষ্যতে উপনীত হইবে।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তিনটী তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। প্রথমতঃ সৃষ্টির আদি আছে দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির অন্ত আছে মূলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা মহাপ্রলয়ের প্রারম্ভিক অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। আর যাহার আদি স্বীকৃত, তাহার অন্তও স্বীকার্য্য। তৃতীয়তঃ সৃষ্টি জড়ের মিলনে হঠাৎ সম্ভব হয় নাই। সৃষ্টির বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে বহু বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহাও বিজ্ঞান সম্মত মত। ঘটনা থাকিলেই সেই ঘটনা ঘটাইবার কর্ত্তা অবশ্যই বর্ত্তমান। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, বিজ্ঞানও বলেন যে সৃষ্টি হঠাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সত্য, ইহাও আমরা দেখিতে পাইলাম। এই সম্পর্কে

উল্লেখ যোগ্য যে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Eienstein'ও বলেন যে বিশ্ব অনন্ত অসীম নহে।

কেহ কেহ দেশ ও কালের অসীমত্ব মনে করিয়া সৃষ্টির অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। উক্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের উক্তিতে সেই আপত্তি খণ্ডিত হইল। উক্তরূপ দার্শনিকগণ জড়কে সসীম বলেন। জড়ই যদি সসীম হয়, তবে জড়ের সমষ্টিও সসীম হইবে। উহা যত বড় হউক না কেন, উহা কখনই অনন্ত অসীম হইতে পারে না। সসীমের সহিত যতই সসীম পদার্থ যোগ করা যায়, যোগফল কখনই অনন্তত্ব দান করিতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যাহা হয়, তাহা এই যে উহাতে আমাদের ধারণাতীত অসীমত্ব লাভ হয় বটে, কিন্তু অনন্ত অসীমত্ব লাভ হয় না। প্রকৃত অনন্তত্ব ব্রহ্মের একটী সরল ও নিত্য স্বরূপ, উহা কখনও সসীম পদার্থের যোগে সৃষ্ট হয় না বা হইতেও পারে না।

আমরা ঘটনা দ্বারা কালের সম্বন্ধে চিন্তা করি। যদি চিন্তা করিতে থাকি যে পৃথিবী কখন কিরূপ ভাবে সৃষ্ট হইল, তাহার পূর্ব্বে সূর্য্যের সৃষ্টি এবং তাহারও পূর্ব্বে অন্য সূর্য্যের সৃষ্টি ইত্যাদি, তাহার পূর্ব্বে পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ, তাহার পূর্ব্বে পঞ্চভূতের সৃষ্টি এবং তাহার পূর্ব্বে ব্রহ্মে সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার উদয়। এইরূপ চিন্তা করিতে গেলেই সৃষ্টির আদিকালে উপনীত হওয়া যায়। উহার পূর্ব্বে কোন ঘটনা থাকে না। সুতরাং আমরা যে ভাবে কাল নির্দ্দেশ করি, সেই ভাবে কালের অন্ত পাওয়া যায়। আপত্তিকারী অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং সেই কালকে কালই বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সেই কাল আমাদের চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কাল নহে। উহা ঘটনা দ্বারাও বিভক্ত নহে। সুতরাং উহাকে কাল বলা যায় না। উহাকে যদি একান্তই ঘটনা দ্বারাই প্রকাশ করিতে হয়, তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে উহা সৃষ্টির পূর্ব্বতন কাল বা মহাকাল।

দেশ সম্বন্ধেও ঐ একই ভাবে চিন্তা করিলেই উহার আদিতে উপ-

নীত হওয়া যায়। অতএব দেশ কালের আদি আছে এবং সৃষ্টি সাদি। "এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে কাল ও দিক্‌ও আকাশ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। কার্য্য ভেদে নামভেদ মাত্র। যেমন একই মনুষ্য কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও বন্ধু, কাহারও গুরু এবং কাহারও শিষ্য নামে অভিহিত হন, তদ্রূপ একই পদার্থ কার্য্য ভেদে আকাশ, কাল ও দিক্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। আবার একই কাল ক্রিয়া দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া অভিহিত হয়; এবং একই দিক্ উপাধি ভেদে পূর্ব্বাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে আকাশ, কাল ও দিক্ যে একই, এতদ্বিষয়ে বৈশেষিক দর্শনে ও সাংখ্য দর্শনে উল্লেখও আছে।" *

এস্থলে আকাশই দেশ। আকাশকে দেশ বলি কেন? ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের সৃষ্টির ক্রম আলোচনা করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথমে ব্যোম বা আকাশ সৃষ্ট হয়। তৎপর অন্যান্য ভূত সমূহ ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের কালে বিপরীত ক্রমে সেই সকল ভূত ব্যোমে লয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ব্যোমই একমাত্র আদি পদার্থ এবং সর্ব্বশেষে একমাত্র ব্যোমই থাকিবে। এই ব্যোম দ্বারাই দেশ গঠিত হইয়াছে এবং ব্যোমের লয়ে দেশ থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিলাম যে অন্যান্য ভূত ব্যতীতও একমাত্র ব্যোমের অস্তিত্বেই দেশের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ব্যোমের অস্তিত্ব ভিন্ন দেশের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্যোম এবং দেশকে এক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। অন্যান্য ভূতের দেশত্ব ব্যোম হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এস্থলে ১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে space (দেশ) এবং Ether (ব্যোম) একই।

দেশ ও দিক্ যে এক ইহা সহজেই ধারণা করা যায়। কিন্তু দেশ ও কাল যে এক, ইহা ধারণা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমাদের পরম্পরাগত ধারণা এত দৃঢ় মূল হইয়াছে যে আমরা কালকে একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই ধারণা করি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই

---

* তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা।

ভ্রান্তি অপনাত হইতে পারে। কাল ঘটনার পরিবর্ত্তন দ্বারা নির্ণীত হয়। ঘটনা দেশেই দেশ দ্বারাই সম্ভব হয়। যথা পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ, তৎপর পঞ্চ মহাভূত হইতে অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ক্রমশঃ উৎপত্তি হইতে হইতে বিশ্ব বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যই দেশেই দেশের পরিবর্ত্তন দ্বারা সম্ভব হইয়াছে এবং পরপর সংঘটিত হইয়াছে। আবার আমরা যাহাকে দিন ও রাত্রি বলি, তাহাও পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্ত্তনের ফল মাত্র। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া বৎসর এবং ষড় ঋতু সম্ভব হয়। সুতরাং উহাও দেশেই দেশ দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই যে পরপর হওয়া, ইহাকেই আমরা কাল সংজ্ঞা দিয়া থাকি। অর্থাৎ দেশেই দেশ দ্বারা ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয় এবং উহাদের পারম্পর্য্য চিন্তা করিতে গিয়াই আমরা কাল সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইহা আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মাণ মাত্র। মহাদার্শনিক Kantও কালকে মনের তৈয়ারী বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দার্শনিক পণ্ডিত Dr. সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের আলোচনায় কালকে বুদ্ধি নির্ম্মাণ বলিয়াছেন।*

"ব্রহ্মাণ্ড" শব্দ দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে বিশ্ব সীমাবদ্ধ। এই শব্দে বিশ্বকে ব্রহ্মের অণ্ডরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অণ্ড যেমন প্রসূতি অপেক্ষা বহু গুণে ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম হইতে প্রসূত বিশ্বও তেমনি ব্রহ্ম হইতে বহু গুণে —অনন্ত গুণে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বিশ্বকে অণ্ডাকার ভাবে অনুমান করা যায়। কারণ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমূহ অণ্ডাকার। সুতরাং উহাদের সমষ্টিও অবশ্য অণ্ডাকার হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক এইরূপ অনুমানের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ড শব্দ দ্বারা যেমন বিশ্বকে সীমাবদ্ধ মনে করা যায়, তেমনি যে উহা উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং সাদি, সুতরাং সান্ত, ইহাও যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে একটী শব্দের উপর নির্ভর করিয়াই

* Vide Cultural Heritage of India (first Edition)

এই রূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসা কি সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা কেবল এই একটী শব্দের উপর নির্ভর করিয়াই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছি না। অন্য বহু প্রমাণও ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আর্য্য শাস্ত্রের এক একটি শব্দও গভীর তত্ত্বের জ্ঞাপক। পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্ব যে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা জগৎ শব্দ দ্বারা বুঝিতে পারি। জগৎ = গম্ + ক্বিপ্ যাহা গমন করে। জগৎ শব্দে যদি পৃথিবী মনে করা যায়, তবে যেমন উহা ধাত্বর্থ সঙ্গত হয়, উহার অর্থ বিশ্ব বলিলেও তেমনি সঙ্গত হয়। এই তত্ত্ব কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞান অল্পকাল পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন। আবার "ব্যক্তি" শব্দের অর্থ "যাঁহাতে ব্রহ্মের অনন্ত গুণ ও শক্তির অভিব্যক্তি হইতেছে।" সুতরাং এই একটী শব্দের মধ্যে আমরা এক-রূপ সমস্ত দর্শন শাস্ত্র দেখিতে পাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে হিন্দু শাস্ত্রও বলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মের একপাদে অবস্থিত। সুতরাং বিশ্ব অনন্ত নহে। যাহা অনন্ত নহে, তাহা অনাদি হইতে পারে না।

জগৎ কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে বিশ্ব স্রষ্টার সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কারণ, ব্রহ্মই যখন সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তখন প্রকৃতি গ্রন্থ পাঠে, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি, ইহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। প্রকৃতির শিক্ষা সম্বন্ধে বহুস্থলে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে যে অনন্ত এবং নিত্য জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা প্রকৃতিতে নিজ হস্তে নিজ পরিচয় লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের সেই গ্রন্থ পাঠের শক্তি ও সাধনা থাকিলেই আমরা বহু তত্ত্ব লাভে লাভবান হইতে পারি। এই তত্ত্বই যখন সত্য, তখন আলোচ্য প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও আমরা ঐ একই পন্থা অনুসরণ করিতে পারি।

জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতিতে কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে মানব জন্মমাত্রই অন্য মানব সৃষ্টি করিতে পারে না। সৃষ্টি করিবার শক্তি তাহার যৌবনে আরম্ভ হয়। কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায় যে কোন স্ত্রীলোক যৌবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সন্তান প্রসব

করিয়াছেন। কাহারও কাহারও পক্ষে সাধারণের পক্ষে যে উপযুক্ত কাল, তাহার পূর্ব্বেই তাহার সন্তান হইবার কারণ এই যে তাহার সেই কালেই যৌবনোপযোগী শারীরীক উন্নতি (Development) সম্ভব হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহাই হউক্ না কেন, কোনও পুরুষ অথবা স্ত্রী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত্তেই অন্য অন্য মানবের জন্ম দান করেন না বা করিতেও পারেন না। সকলের পক্ষেই অল্পাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়। পশু পক্ষী এমন কি বৃক্ষলতা সম্বন্ধেও ঐ একই তত্ত্ব সত্য, অর্থাৎ তাহারা জন্ম মাত্রই অন্য পশু পক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি করে না। সুতরাং প্রকৃতিতে জীবসৃষ্টির কাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারি যে, পরমপিতা অনাদি কাল হইতে সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুদূর অতীতে কোন এক মুহূর্ত্তে সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইবে যে জীব সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, তাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, জীবের পক্ষে জন্ম মাত্রই অন্য জীব সৃজন করার অসমর্থতার কারণ তাহার দেহের অপরিপক্বতা। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে ত সেই যুক্তি প্রযোজ্য নহে। কারণ, তিনি নিত্যই (অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত) অনন্তভাবে পূর্ণ। তাঁহার কোন অভাব ছিল না বা থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি অনাদি কালই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। ইহার উত্তরে আমরাও বলি যে ব্রহ্ম নিত্যই পূর্ণ ও নিত্যই সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি যে লীলার্থই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে তিনি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা আপত্তিকারী স্মরণে রাখিবেন। এই সম্পর্কে লীলাতত্ত্ব অংশ দ্রষ্টব্য। আপত্তিকারী যদি উক্তভাবে চিন্তাকে প্রধাবিত না করিয়া নিম্নলিখিতভাবে উপরি উক্ত অংশের মর্ম্ম বোধের জন্য চেষ্টা করেন, তবে তিনিও আমাদের সহিত একমত হইবেন।

ব্রহ্ম স্বয়ং সুদূর অতীতে কোন এক মুহূর্ত্তে (অনাদি কাল হইতে নহে) সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারই উপাদানত্ব ও নিমিত্ত কারণত্বে সৃষ্ট জগতেও জীবগণ জন্ম মাত্রই অন্য জীব জন্ম দান করিতে

পারে না। অর্থাৎ তাঁহার নিজ প্রণালী অনুযায়ীই তিনি জীবগণ দ্বারা জীব সৃষ্টির কাল সম্বন্ধীয় বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারই কার্য্য প্রণালী জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার অনাদি অনন্ত জীবনেও যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই জীবের জীবনে ঘটিতেছে। জগতে জীব সৃষ্টির কাল দ্বারা তিনি আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তিনি অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু উহার আদি আছে এবং উহা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় সৃষ্টি কার্য্যেও তাহার স্বভাবের ছাপ পড়িয়াছে।

উক্ত সূত্রাবলম্বনে ইহাও প্রমাণিত হইল যে সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মের স্বভাব জাতও নহে। কারণ, কোন জীবই জন্মমুহূর্ত্তেই আপনা আপনি অন্য জীব জন্ম দান করে না। জীবের পক্ষে অনাদি কাল নাই, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র জীবনের জন্মমুহূর্ত্তকেই অনাদি বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাকে মৃন্ময় ঘটের সহিত তুলনা কালে পারমার্থিক বস্তু বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়, যদিও মৃত্তিকা কখনই পারমার্থিক বস্তু নহে।

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি অনাদি কাল হইতেই সৃষ্টি করিতেন, তবে বলিতে হয় যে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্তেই অনন্ত প্রায় জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, ব্রহ্ম হইতে যেমন অনাদি কালে প্রথম জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সৃষ্টির সেই প্রণালী অনুযায়ী প্রথম জীবেরও জন্ম মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় জীব, দ্বিতীয় জীবের জন্ম মুহূর্ত্তেই তৃতীয় জীব ইত্যাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে সেই অনাদি মুহূর্ত্তেই অনন্ত প্রায় জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহা অসম্ভব। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট প্রণালী বিরুদ্ধ এবং ক্রম প্রণালীরও একান্ত বিরোধী। সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালী যে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। আবার ব্যোম হইতে মরুতের, মরুৎ হইতে তেজের, তেজঃ হইতে অপের এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি, উহাদের পঞ্চীকরণ এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে অসংখ্য

পদার্থের সৃষ্টি কখনই একই মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হয় নাই। এই সৃষ্টি কার্য্য যে ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত, তাহা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রও স্বীকার করেন। সুতরাং বিশ্ব সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালী এবং জীব সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায় যে, জাগতিক সৃষ্টি প্রণালী সৃষ্টিকর্ত্তার নিজকৃত সৃষ্টি প্রণালী অনুযায়ী সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং সৃষ্টি সাদি, কখনই অনাদি নহে। এই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে One God, One Law, One Universe—এক ঈশ্বর, এক বিধান, ও এক বিশ্ব। অবশেষে অন্য একটি আপত্তির আলোচনা করিতেছি। প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ নাই। আমরা যাহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বলি, তাহা তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান। যদি তাহাই হইল, তবে সৃষ্টিকেও নিত্যা বলিতে হইবে। কারণ, উহা তাঁহার জ্ঞান হইতে কখনই অন্তর্হিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে প্রথমে আমাদের বলিতে হইবে যে প্রশ্নকর্ত্তা যে ভাবে সৃষ্টিকে নিত্যা বলিতে চাহেন, আমাদের যতদূর জানা আছে, সেই ভাবে কোন দর্শনেই সৃষ্টিকে নিত্যা বলা হয় নাই। সৃষ্টিকে সাদি ও সান্ত বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে ইহা এই ভাবে অর্থাৎ বাস্তব বিশ্বরূপে এক কালে ছিল না এবং এক কালে থাকিবে না। অর্থাৎ ইহার আরম্ভ ও শেষ আছে। সৃষ্টির আরম্ভ আমরা তখনই মনে করি, যখন ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন "অহং বহুস্যাম্" এবং সৃষ্টির তখনই অন্ত হইবে, যখন তিনি সেই সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার সংহরণ করিবেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে এবং পরেও লিখিত হইবে। যাহার আদি আছে, তাহারই শেষ আছে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ষড়বিধ বিকার আছে। বিশ্ব উৎপন্ন পদার্থ। সুতরাং উহার জন্ম ও নাশ রূপ বিকারও আছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বাস্তব সৃষ্টির আদি ও অন্ত আছে।

ব্রহ্মের অনন্ত অপার নিত্য জ্ঞানে সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য সকলই নিত্য বর্ত্তমান, ইহা সত্য। কিন্তু সেই জন্যই যে উহার (বাস্তব সৃষ্টির) প্রকৃত পক্ষে আদি অন্ত নাই, তাহা নহে। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত

বিবরণ” অংশে দেখিতে পাইব যে আত্মার জ্ঞান জড় সংসর্গে বিকৃত হইয়া যে চারিভাগে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদিগকেই আমরা বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার বলিয়া থাকি। আমরা চিত্ত দ্বারা গত বিষয়ের স্মরণরূপ জ্ঞান লাভ করি। বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নিত্যই অনন্ত ও পূর্ণ এবং অবিকৃত, আমাদের জ্ঞানের ন্যায় সীমাবদ্ধ ও বিকৃত নহে। তাঁহার জ্ঞানে স্মৃতি নাই, বুদ্ধিও নাই। যাহা তাঁহাতে আছে, তাহা তাঁহার নিত্য সত্য ও পূর্ণ জ্ঞান। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যতের জ্ঞানও নিত্য বর্ত্তমান। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদের ন্যায় তাঁহার বিগত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয় না। বুদ্ধির বিচার দ্বারাও ভবিষ্যতের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানও আমাদের ন্যায় অতি কষ্টে তাঁহার লাভ করিতে হয় না।

আবার ব্রহ্মের নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞানে সৃষ্টির আদি, অন্ত, মধ্য সকলই বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেছেন যে এই বাস্তব সৃষ্টি ক্রিয়ার আদি আছে, অন্ত আছে। উহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল ঘটনাই সুস্পষ্ট ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। আবার সেই একই সময় অর্থাৎ নিত্য তাঁহারই অনন্ত জ্ঞানে ইহাও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান যে সৃষ্টিবিষয়িনী সমস্ত বাস্তব ঘটনার কতকগুলি বিশ্বে ঘটিয়াছিল (গত হইয়াছে) কতকগুলি ঘটিতেছে (বর্ত্তমান) এবং কতকগুলি ঘটিবে (ভবিষ্যতে হইবে)। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, তাহা না হইলে তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারাই এই বিষয়টীকে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। গত মহাযুদ্ধের কথা ধরা যাউক্। উহার ঘটনা সমূহ ব্রহ্মের জ্ঞানে কিভাবে আছে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে উক্ত যুদ্ধের সকল ঘটনাই তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুদ্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই যুদ্ধের পূর্ব্বে জানিতেন, যুদ্ধের সময় জানিতেন, এখনও জানিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও

জানিবেন। আবার ইহাও সত্য যে তিনি ইহাও জানিতেছেন যে এখন আর পৃথিবীতে উক্ত যুদ্ধ বাস্তবভাবে ঘটিতেছে না, উহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি কোন ঘটনার চিন্তা করা যায়, তবে ঐ একই ভাবে বলিতে হইবে যে ঘটনাটী ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, তাহা তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ তিনি উহা এখন জানিতেছেন, ভবিষ্যতে ঘটনার সময় জানিবেন এবং তৎপরও জানি-বেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি এখন জানিতেছেন যে উহা পৃথিবীতে এখন বাস্তবভাবে ঘটিতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিবে।

জগতে অসংখ্য পরিবর্ত্তন আছে, ইহা সত্য। ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। মানুষের জন্ম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যু আছে। প্রত্যেক মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু ঘটনা ঘটে। উহাদের প্রত্যেকটীই ব্রহ্মের জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সেইজন্য কি আমরা মানবকে অনাদি অনন্ত বলি? কখনই নহে। কারণ, যেমন প্রত্যেক মানব জীবনের আদি অন্ত প্রত্যেক ঘটনা ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানে বিধৃত আছে, তেমনি ইহাও তাঁহার জ্ঞানে বিধৃত আছে যে উহাদের কতক অংশ বাস্তবভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, কতক ঘটিতেছে এবং কতক ঘটিবে। মানবের মৃত্যুর পর তিনি জানেন যে তাহার (মানবের) জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

সময় সময় কাহারও জীবনে এমন দুই একটী ঘটনা ঘটে যে, উহা দ্বারা তিনি একেবারে অভিভূত হন। ইহাকে Thrilling Incident বলা যাইতে পারে। সে ঘটনার চিত্র বহুকাল দ্রষ্টার চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাসমান থাকে। তিনি যেন সেই সকল দেখিতেছেন, সেই সকল শুনিতেছেন ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই সকল ঘটনা যেন তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে অভিনীত হইতেছে। সুতরাং সেই অতীত ঘটনাকে তিনি বর্ত্তমান ভাবে দেখিতেছেন সত্য। অপরদিকে তাহার জ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে সেই ঘটনা গত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও আমরা আভাসে বুঝিতে পারি যে অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্মের জ্ঞানে সমস্তই

বর্ত্তমান ভাবে বিধৃত আছে, ইহাও সত্য এবং তিনি যে উহাদিগকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বাস্তব ঘটনা বলিয়া নিত্য জানিতেছেন, ইহাও সত্য। অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানে অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্তের সমস্ত ঘটনাই নিত্য প্রকাশিত, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে উহারা বাস্তব জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ঘটনা বলিয়াই তাঁহার নিকট নিত্য বিদিত। পৃথিবীতে এরূপ বহু সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতেন এবং জানেন। আবার আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের স্মৃতি এবং বুদ্ধি ভূত ভবিষ্যতের কিছু কিছু জানিতে সাহায্য করে। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্তভাবে অনুমান করিতে পারি যে সাধারণ মানব স্মৃতি ও বুদ্ধি দ্বারা এবং সাধকগণ দিব্যজ্ঞান দ্বারা যাহা অপূর্ণ ভাবে জানিতে পারেন, ব্রহ্মের অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞানে, তাহা নিত্য প্রকাশিত। অতএব এই ভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা দেখিতে পাইলাম যে ব্রহ্মের নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য সৃষ্টির সাদিত্ব বাধিত হয় না।

"মায়াবাদ" অংশে উপনিষদ্ হইতে সৃষ্টির সাদিত্ব সূচক বহুমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সৃষ্টির সাদিত্ব ঘোষণা করিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের (বেদান্তের) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্য ইহাকে বেদান্ত দর্শন বলা হয়। উপনিষদে যখন সৃষ্টির সাদিত্ব সূচক মন্ত্র আছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে বেদান্তদর্শনও সেই তত্ত্ব স্বীকার করেন। "লীলাতত্ত্ব" অংশে উক্ত দর্শনের ২।১।৩৩ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের সমালোচনা আছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত সুতরাং সাদি।

মায়াবাদ অনুযায়ী পরব্রহ্ম তাঁহার মায়াশক্তি যোগে কোন এক অনাদি প্রায় মুহূর্ত্তে সীমাবদ্ধ মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম সৃজন করেন। এই স্বগুণ ব্রহ্মই মায়াযোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। আবার সেই স্বগুণ ব্রহ্মও এক একটি জীবের মোক্ষের সাথে সাথে ক্ষয় হইতেছেন এবং কোনও অনন্তপ্রায় কালে শেষ জীবের মুক্তির সহিত

স্বয়ং নিঃশেষিত হইবেন অর্থাৎ উক্তমতে সেই কালে সৃষ্টির লয় সম্পূর্ণ হইবে। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে মায়াবাদ অনুযায়ীও সৃষ্টি সাদি ও সান্ত। মায়াবাদী এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু আমরা উহার অস্বীকারের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি ও লয় প্রায় অনাদি ও অনন্ত প্রায় কালে সম্ভব হইয়াছিল ও হইবে। কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে সৃষ্টি সাদি ও সান্ত। এই সম্পর্কে ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও সকল পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র এক-বাক্যে বলিতেছেন যে সৃষ্টি সাদি এবং পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সম্পর্কে ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রও দ্রষ্টব্য। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের যখন এই বিষয়ে একমত, তবে আমরা যদি বলি যে সৃষ্টি সাদি, তবে সেই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক মনে করি না।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই এই সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টি সাদি। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি (১) স ইমান্ লোকান্সৃজত (ঐতরেয়োপনিষদ্)" বঙ্গানুবাদঃ - এই জগৎ পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিল। নিমেষ ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন "আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব"? এরূপ আলোচনা করিয়া তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন (তত্ত্বভূষণ)। এই সম্পর্কে ৪৫ এবং ৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র ও তদ্ সম্বন্ধীয় আলোচনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ওঁং অনাদিমাদিং ভুবনস্যান্তং ওঁং

ওঁং

অনাদিমাদিন্তমনন্তমন্তম্
অনন্তকানন্ত গুণং মহান্তম্
দূরীকৃতানন্ত কৃতান্তমন্তম্
নমামি কান্তং করুণৈকবন্তম্ (পরমর্ষি গুরুনাথ)

—(০)—

কল্পবাদ

কেহ কেহ সৃষ্টিকে একেবারেই অনাদি না বলিয়া উহাকে প্রবাহ-ক্রমে অনাদি ও কল্পক্রমে সাদি বলিয়া থাকেন। এই যে উভয় দিক্ রক্ষার ভাব কেন আসিতেছে, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহার মূলে দুইটী ভাব কার্য্য করিতেছে। উহাদের মধ্যে একটী অদৃষ্টবাদ বা কর্ম্মবাদ। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে হিন্দুশাস্ত্র কর্ম্মবাদের কোনও মীমাংসায় পৌছিতে পারেন নাই, তাই সৃষ্টির পর সৃষ্টি অর্থাৎ অসংখ্য কল্প কল্পনা করিতে উহা বাধ্য হইয়াছেন। পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবের প্রথম সুখ বা দুঃখ কর্ম্মজনিত (অদৃষ্টজনিত) নহে. কিন্তু গুণজনিত. তাহাতে সেই কঠিন সমস্যার যেরূপ সুমীমাংসা লাভ হইয়াছে. এমন আর কিছুতেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেই সূত্রানুসারে চিন্তা করিলে অদৃষ্ট-বাদ মীমাংসার জন্য কল্প কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

অপর ভাবটী এই যে উপনিষদে সৃষ্টির সাদিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অভ্রান্ত শাস্ত্র সুতরাং সেই সকল উক্তিকে ভ্রান্ত বলা সম্ভব নহে। সুতরাং সৃষ্টি কল্পক্রমে সাদি ; ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা এখন দেখিব যে কল্পবাদ বর্ত্তমানে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা যুক্তি সঙ্গত কিনা। সৃষ্টির পর সৃষ্টি এই কল্পনাতে যে বহু বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রুটী বর্ত্তমান, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার সময় "পৃথিবীই বিশ্ব" একথা যেন আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। বিশ্বে পৃথিবী গ্রহ অতি ক্ষুদ্র একটী মণ্ডল মাত্র। বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী একটী জ্যামিতিক বিন্দু বই আর কিছুই নহে। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে বিশ্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। পাঠক তাহা পাঠ করিলেই পূর্ব্বোক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা সাধারণতঃ হাল্কা ভাবে বিশ্বের ধারণা করি। "বিশ্ব বিদ্যালয়" একটী অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, এমনকি ইহাতে সমস্ত বিশ্বের পরা ও অপরা বিদ্যার শিক্ষা দান করা দূরের কথা, পৃথিবী মণ্ডলে প্রচলিত সমস্ত অপরা বিদ্যারও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। তথাপি ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। আবার যদি কোন উন্নত ব্যক্তি উদারভাবে নিজের গণ্ডির মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কয়েকজনকে একটু ভালবাসেন অথবা তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন, তবেই তাহাকে বিশ্বপ্রেমিক আখ্যা দেওয়া হয়। বিশ্বপ্রেম যে কি ও বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যে কি সুকঠিন, তাহা কতজনের ধারণা আছে, তাহা আমরা জানিনা। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে বিশ্বকে পৃথিবী অথবা পৃথিবীরই একটী সামান্য অংশ বিশেষ বলিয়া মনে করা হয়। আবার আমরা পৃথিবীর কথাই বা বলি কেন? আমরা যে সৌরজগতে বাস করি, তাহাও বিশ্বের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র।

উক্ত আছে যে এক সৃষ্টির শেষে যে যেমন অবস্থায় থাকিবে, পরকল্পে পূর্ব্ব সৃষ্টির কর্ম্মানুসারে সে সেইভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছেন, পর সৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিবেন। প্রথমতঃ সৃষ্টির বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ক্রমই ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রণালী এবং পরম পিতার প্রেমময়ী ইচ্ছার উদয়ের মুহূর্ত্ত হইতে সৃষ্টির বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে কত পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বৎসর গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা মানবের অসাধ্য। এই একটী অতি ক্ষুদ্র পৃথিবী মণ্ডলের রচনা প্রণালী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে ইহা প্রথমে বায়বীয়

অবস্থা হইতে জলীয় অবস্থায় ও তৎপর কঠিন অবস্থায় আসিয়াছে। এই প্রণালীতে যে কত কোটী কোটী বৎসর গত হইয়াছে, তাহা অনুমানের অসাধ্য। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে পৃথিবীতে ৩০ হইতে ৪০ কোটী বৎসর পূর্ব্ব হইতে জীবের বাস আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবী জীবের বাসের উপযোগী হইতে আরও কত ৪০ কোটী বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে জানে? স্থূল ভাবে বুঝিতে গেলে পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্তস্বরূপ হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি এবং বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে যে অনন্ত প্রায় কাল লাগিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। আবার প্রলয়কালে পরম পিতার মঙ্গল বিধানে বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ ক্ষিতি অপে, অপ তেজে, তেজঃ মরুতে এবং মরুৎ ব্যোমে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই লয় ক্রিয়ায়ও যে কত অসংখ্য বৎসব লাগিবে, তাহা কে অনুমান করিবে? কথিত আছে যে একদিন দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিবে। এক দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই ও একদিনে ইহা যাইবারও নহে। ইহা ভিন্ন পরমপিতা সৃষ্টি করিয়াছেন একটী অতি মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ। সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত না হইলে সৃষ্টির লয় হইবে, ইহা অযৌক্তিক কথা। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? সেই সুমহান্ উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক জীব (কেবল মানুষ নহে, কিন্তু অদৃশ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানুকীট পর্য্যন্ত)* ক্রমশঃ তাঁহারই অনন্ত গুণের অধিকারী হইবে, তাঁহারই প্রেমে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাঁহাতেই নিত্য সুবিনিমগ্ন হইয়া থাকিবে ও নিত্য অনন্ত জ্ঞানে তাঁহারই অনন্ত প্রেমসুধা পান করিবে এবং অবশেষে ত্রিবিধ দেহের বিগমে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত একটী মাত্র জীবও ঐরূপ চরমোন্নতা অবস্থা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত

* "ইতরজীবের কথা" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহাদের দেহেও আত্মা বর্ত্তমান। তাহারা ক্রমশঃ উচ্চতর দেহ ধারণা করিতে করিতে পরিশেষে মানব দেহ ধারণ করিবে।

মহাপ্রলয় সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ব্বে মহাপ্রলয় অসম্ভব। প্রত্যেক জীবের পক্ষে এই অত্যুন্নতা জ্ঞান-প্রেমানন্দাবস্থা লাভ করিতে হইলে সৃষ্টির শেষ কি কখনও আমাদের চিন্তায় আসে? সৃষ্টি যে কত বিরাট, তাহা মণ্ডল সৃষ্টির বর্ণনার সময় লিখিত হইবে।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে সৃষ্টি কি তবে কোন কালেও লয় হইবে না? লয়ের বীজ সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুস্থ শিশুর দেহেও তাহার মৃত্যুর বীজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সে শতাধিক বর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু একদিন সেই মৃত্যু বীজ প্রবল হইয়া তাহার দেহকে ধ্বংস করিবেই, ইহা সত্য। সৃষ্টি থাকিলেই লয় আছে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা। পরম পিতার সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছাকে আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা ও জিহীর্ষা। জিহীর্ষা যখন আছে, তখন উহার কার্য্য অর্থাৎ লয়ও আছে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে কোন এক কালে মহাপ্রলয় হইবে। কিন্তু সৃষ্টির আদি থাকা সত্ত্বেও যেমন অনেকে উহাকে অনাদি বলেন, সেইরূপ যুক্তিদ্বারা মহাপ্রলয় প্রমাণ করিলেও অনাদি প্রায় সৃষ্টির ন্যায় "প্রায় অশেষ" কথা দ্বারা সৃষ্টিকে বিশেষিত করিলে কোনও ত্রুটী হয় না।

ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রলয় মানবের ধারণাতীত কালে সম্পন্ন হইবে। সৃষ্টিকে অনন্ত বলিলেও বিশেষ কোনও দোষ নাই। কারণ, সাধারণ মানবের অচিন্ত্যকাল পর্য্যন্ত যে উহা থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত। যাহার অন্ত সাধারণ মানব লাভ করিতে পারে না, তাহাকেও অনন্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। কোন কোন শাস্ত্রে সৃষ্টিকে পরমেশ্বরের নিত্য লীলা বলা হইয়াছে। মানবের চিন্তনীয় কাল মাত্রে যাহার অনিত্যতায় অর্থাৎ বিনাশের হেতু লক্ষিত হয় না, তাহাই নিত্য বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চিন্তাতীত কাল পূর্ব্বে সৃষ্টি আরম্ভ

হইয়াছে ও চিন্তাতীত কাল পর্য্যন্ত উহা বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং উক্ত অর্থে যদি সৃষ্টিকে নিত্য বলা যায়, তবে তাহাও সেই অর্থে সত্য, নতুবা উহার আদিত্ব ও অন্তত্ব যুক্তি সিদ্ধ।

এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আদিম দেহ আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মণ্ডলে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্তি এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণ দেহের প্রাপ্তির অর্থই দেহের ক্রমান্বয় লয় এবং এইরূপ অসংখ্য লয়াবস্থাই জীবের জীবনের কার্য্য ও উন্নতির চরম ফল।*

বিরুদ্ধবাদী প্রশ্ন করিতে পারেন যে বারংবার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া দ্বারাই পরমেশ্বর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিবেন। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাধা কি ? এক কল্পে উহা সাধিত হইবে না বটে, কিন্তু বহু কল্পে—অনন্ত কল্পে উহা সাধিত হইবে মাত্র। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দুই বা বহু কল্পে যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে ত সেই কল্পান্তেই সৃষ্টির শেষ হইবে। বিনা উদ্দেশ্যে পুনরায় সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং সৃষ্টি সান্ত, কখনই অনন্ত নহে। যাহা অনন্ত নহে, তাহা অনাদি হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহার মৃত্যু আছে, তাহার জন্মও আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টি সাদি ও সান্ত। আবার যদি বলা যায় যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনন্ত কল্পে সাধিত হইবে, তবে বলিতে হয় যে উহার অর্থ এই হইবে যে উহা (সৃষ্টির উদ্দেশ্য) কখনই সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইবে না। কারণ, যে কল্পে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সেই কল্পান্তেই মহাপ্রলয়ও পূর্ণ হইবে। পুনরায় সৃষ্টি হইবে না। কারণ, উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির আর প্রয়োজন নাই। উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির একটী সুমহান উদ্দেশ্য আছে এবং তাহাই সৃষ্টিতে পূর্ণ হইতেছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না, অথচ অনন্ত কাল কল্পের পর কল্প সৃষ্টি চলিতে থাকিবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত

* ত্রিবিধ অসংখ্য দেহ সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে।

অনন্ত অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্ জ্ঞান-প্রেমময় পরম পুরুষের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং সৃষ্টি অনন্ত কল্প ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ – ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সত্য যে বিনা প্রয়োজনে কিছু হয় নাই বা হইবেও না এবং যখন যাহার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন তাহার লয় হইবে। পরমপিতা সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি বর্ত্তমান সৃষ্টি দ্বারাই উহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন, সুতরাং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ পরমপিতা সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের সৃষ্টি করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। কিন্তু তাহা জানিবার বা অনুমান করিবার আমাদের কাহারও সাধ্য নাই। যদি কেহ কিছু অনুমান করেন, তবে তাহা কল্পনা বই আর কিছুই নহে। কারণ, অনন্ত ভবিষ্যতে কি হইবে বা না হইবে, তাহা ধারণা করা মনুষ্য সাধ্য নহে। পরম পিতার সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকিতে প্রয়োজনাভাবে বর্ত্তমান সৃষ্টির একটীমাত্র উদ্দেশ্যই তিনি একই সৃষ্টিতে পূর্ণ করিতে পারিবেন না এবং তজ্জন্যই তিনি কল্পের পর কল্প ভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিবেন, ইহা যুক্তিযুক্ত অনুমান বলিয়া মনে হয় না। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সৃষ্টি প্রায় অনাদি ও প্রায় অনন্ত। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কল্পের কল্পনা অদৃষ্টবাদ মীমাংসার জন্যই। উহা পূর্ব্বেই অন্য-ভাবে সুমীমাংসিত হইয়াছে। যথা—আদি স্বর্গের ভোগ গুণজনিত, কর্ম্মজনিত নহে। ইহার পরে প্রমাণিত হইবে যে কল্পের কাল-পরি-মান বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নরূপ কল্পিত হইয়াছে ; এবং সেই কাল অতি অল্প। সুতরাং তাহা যে সত্য নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আধু-নিক বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণ করা যায় যে সেই কল্পিত কল্পকাল অতি সামান্য। কল্প কল্পনার এক অংশ যখন সত্য নহে, তখন অন্য অংশ যে সত্য তাহার প্রমাণ কি ?

সৃষ্টি ক্রমশঃই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতেছে। পৃথিবীর আদি সৃষ্টির কথা ও বর্ত্তমান মানবের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করিলে বুঝা

যায় যে সৃষ্টি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে মনুষ্য বর্ব্বর অবস্থা হইতে আজ কতদূর উন্নত। কেবল অপরা বিদ্যার উন্নতি লাভ করিয়া তাহারা প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নহে, কিন্তু মানবের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভাব স্বভাবতঃই বর্ত্তমান, তাহার বিকাশ দ্বারা তাহারা নীতির তত্ত্ব, ধর্ম্মের তত্ত্ব, এমনকি পরমাত্মার তত্ত্ব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। পাপী অনুতপ্ত হইতে শিখিয়াছেন, পরম করুণাময়ের করুণায় পাপমুক্ত হইতেছেন, পরমপিতার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতেছেন ও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেছেন। জগতে যে এত দুঃখ ও অশান্তি ইহার ভিতরেও কত সাধু আত্মা ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, কত প্রেমিক, কত ভক্ত প্রেমময়ের দর্শনলাভে জন্ম সার্থক করিতেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে এই সৃষ্টিতেই তাঁহার উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সাধিত হইতেছে। সকলের জীবনে এই একই সৃষ্টিতে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে সাধিত হইবে, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। আর তিনি এই একই সৃষ্টি দ্বারাই কেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না, এইরূপ যুক্তিযুক্ত কারণ কেহ দর্শাইতে পারেন না।

যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন এবং মনে করেন যে সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বহু কল্পের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান, তবে তাহাকে নিম্নলিলিখিত বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হিন্দুশাস্ত্রের কল্পিত কল্পকালসম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত আলোচনা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পারিব যে উহা সত্য নহে এবং ঐ কাল অত্যন্ত অল্প। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে বিশ্ব এত স্বল্প কালেই সৃষ্ট, স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে পৃথিবীই বিশ্ব নহে, বরং উহা বিশ্বের তুলনায় বিন্দুবৎ দেশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে মাত্র এবং ইহাও যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায় যে কল্পকাল পৃথিবী সম্বন্ধেই কল্পনা মাত্র, উহাতে সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই নাই।

যদি আমরা এই বিষয়টী অন্যভাবে আলোচনা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য একটী মাত্র সৃষ্টিতেই সাধিত হইতে পারে, কল্প কল্পনার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে বৈদিক যুগকে প্রথম সভ্যতার যুগ বলিয়া ধরা হয়। কেহ কেহ মিশর দেশের সভ্যতাকে আদি সভ্যতা বলিয়া থাকেন। আর্য্য সভ্যতাই যে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতা, তাহা ক্রমশঃ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। এই বৈদিক যুগ কেহ তিন হাজার, কেহ পাঁচ হাজার, আবার কেহ কেহ ততোঽধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমান আলোচনার জন্য উহাকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিলে বিশেষ কোনও ক্রুটী হইবে না। যদি ইহাতেও আপত্তি হয়, তবে আমরা ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। যথা—বৌদ্ধযুগ। উহা সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টদেব কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই কি আড়াই হাজার বৎসরে মানবের কি উন্নতি হইয়াছে, তাহাও আমরা চিন্তা করিতে পারি। কেহ কেহ বলিবেন যে এইকালে আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা পার্থিব উন্নতি অধিকতর হইয়াছে। এই উক্তি স্বীকৃতি হইলেও ইহা বলিতে হইবে যে উহা তুলনামূলক উক্তি মাত্র। এই সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিতভাবে কিছুই বলিতে পারেন না। দ্বিতীয় যুগেও মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। নর নারীর মধ্যে প্রকৃত সত্য অধিকতর ভাবে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনা প্রথম যুগে অতি অল্প লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উহাকে এখন আর গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যাইতেছে না। এখন সর্ব্বপ্রকারের নর নারী ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেছেন এবং ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত। অবশ্য এখনও পৃথিবী আদর্শের অত্যধিক নিম্নে অবস্থিত, কিন্তু আপামর সর্ব্বসাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবী এখনও আকাঙ্খিত ভাবে সত্য পথ প্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বহু বহু সত্য তত্ত্ব নির্ব্বিচারে জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাও সত্য। এইরূপে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে গত

আড়াই হাজার বৎসরের মানবীয় আত্মিক উন্নতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৈদিক যুগে যেরূপ আত্মিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, আলোচ্যকালে (ঐতিহাসিক যুগে) তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পৃথিবীর আত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কেহ কোন statistics রাখিতে পারেন না, তবে তত্তৎ কালীন মহাপুরুষদিগের উক্তি দ্বারা কিছু অনুমান করা হয়, এই মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেই বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সত্য। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে প্রকৃত ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহাও সত্য। প্রথম এবং দ্বিতীয় যুগের মহাপুরুষদিগের মধ্যে যদি তারতম্যই করিতে হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে প্রথম যুগের মহাপুরুষদিগের একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে তাঁহারা স্বয়ং এবং প্রকৃতি এই দুইটীকে অবলম্বন করিয়াই জীবনে সাধনা করিয়াছেন এবং মহান্ সত্যতত্ত্ব সমূহ জীবনে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই উপদেষ্টা ছিলেন না। পূর্ব্ব পুরুষগণের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও সাধনা দ্বারাও তাঁহারা সকল সময় সাহায্য লাভ করেন নাই। যাঁহারা তাহা পাইয়াছেন, তাঁহারাও তাহা অতি অল্প পরিমানেই লাভ করিয়াছিলেন বলিলে ক্রুটী হইবে বলিয়া মনে করি না। সুতরাং তাঁহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা নিজেদেরই সাধনালব্ধ সম্পত্তি, অন্য সাপেক্ষ নহে, অথবা তাহাতে অন্যদীয় সাহায্যের পরিমাণ অতি অল্পই। তাঁহারা পার্থিব জীবনে যেমন সমুদায় গড়িয়া লইয়াছেন, আধ্যাত্মিক জীবনও একরূপ তাঁহাদের নিজেদেরই হাতের গড়া। আমরা এখন অনুমান করিতে পারি না যে মানব কি প্রকারে পরকীয় সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতার উপাসনা ও সাধনা দ্বারা এত উন্নত জীবন ও মহান্ তত্ত্ব সমূহ লাভ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি যদি নানাবিধ শস্য রোপন, কর্ত্তন ও রন্ধনের উপযোগী করিয়া উহা নিজ সংগৃহীত কাষ্ঠরাশি যোগে স্বরচিত পাত্রে স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া যোড়শোপচারে সম্ভোগ করিতে পারেন, তবে তাহার পক্ষে যেরূপ উহা কষ্টসাধ্য হইবে, তাহা হইতেও বহু গুণে

অধিকতর ভাবে কঠিন হইয়াছিল প্রথম যুগের মহাপুরুষদিগের আত্মিক উন্নতি লাভ করিতে। কিন্তু অপর পক্ষে আলোচ্য যুগের মহাপুরুষগণও যে আধ্যাত্মিক সাধনায় অত্যধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তাঁহারাও পরমপিতার অপার দয়ায় বহু তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রথম যুগে যে আধ্যাত্মিক সাধনা অল্প সংখ্যক নরনারীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং বর্ত্তমানে যে উহা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রথম যুগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুগে অত্যধিক ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কোন সত্য সর্ব্ব সাধারণের গ্রহণীয় ও জীবনে সাধনীয় করিতে হইলে উহার বহুল প্রচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এবং এই কার্য্য যে কিছু পরিমাণে সম্পন্ন হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবী যতদূর অগ্রসর হইবে, ততই সত্য প্রচার অধিকতর এবং বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইবে। অর্থাৎ বেগ (Momentum) ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং পরে জনসাধারণ উহা নিজেদের জীবনে জীবনে সাধন আরম্ভ করিবেন। সাধক সাধিকার সংখ্যা ক্রমশঃ পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবী যতই অগ্রসর হইবে, মানবকুল পূর্ব্বতনদিগের সম্পত্তিতে অধিক হইতে অধিকতর রূপে সম্পদবান হইবেন। সুতরাং উন্নতির বেগ (Momentum) উহার জন্যও আরও দ্রুততর হইবে। ইহাতে বহু বাধা বিঘ্ন আসিবে, কিন্তু অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে সেই সকল বাধাও ক্রমশঃ অপসারিত হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে, জাতিতে এবং দেশে যেরূপ উত্থান ও পতন লক্ষ্য করা হয়, চিন্তা করিয়া দেখিলে সমগ্র পৃথিবীরও উক্ত উভয় অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। পার্থিব উন্নতির সীমা আছে। উহা জড়ের সম্পর্কাধীন বলিয়া কখনও অসীম হইতে পারে না এবং উহা কখনও আত্মাকে পরিতৃপ্তি দান করিতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই উহাতে অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হইবে। বর্ত্তমান যুগেই মানব একমাত্র পার্থিব উন্নতিতে বীতশ্রদ্ধ হইতেছে এবং ইহসর্ব্বস্বতারূপ বিষম রোগের

ঔষধ খুজিতেছে। সে যখন আত্মিক-উন্নতি-রূপ অপূর্ব্ব সুধার আস্বাদন লাভ করিবে, তখন সে স্বতঃই জড়ের আপাত-মধুর রস অতি তুচ্ছ মনে করিবে। মানব উচ্চ আদর্শের সম্মুখে নিজ সুখ সুবিধা, এমন কি ধন, প্রাণ, মান যে বিসর্জ্জন করিতে পারে, ইহা সর্ব্বযুগের প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং মানব যখন সত্য কি পরম বস্তু, তাহা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবে, তখন তাহার পক্ষে কোন স্বার্থই পরিত্যাগ করা কঠিন হইবে না। যখন অত্যুন্নত মহাপুরুষের সংখ্যা, যখন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মার সংখ্যা, যখন বহু গুণে একত্ব প্রাপ্ত সাধক সাধিকার সংখ্যা, যখন অনন্ত ও নিত্য জ্ঞান-প্রেমময়ের জ্ঞান-প্রেমানন্দ সাগরে নিত্য সুবিনিমগ্ন সাধক সাধিকার সংখ্যা অত্যধিক রূপে বৃদ্ধি পাইবে, তখন মানব সহজেই, এমনকি নির্ব্বিচারেই সত্য পথ গ্রহণ করিবে, সত্য পথে চলিতে থাকিবে, তখন মানব প্রকৃত ধার্ম্মিকের, মুক্ত মহাপুরুষগণের অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল জীবন সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া সহজেই তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে, তখন তাঁহাদের সত্যময়, জ্ঞানময় ও প্রেমময় জীবন দেখিয়াই সহস্র সহস্র জটিল কুটিল প্রশ্নের সদ্য মীমাংসা প্রাপ্ত হইবে এবং সহজেই অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিবে। ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের প্রধান অন্তরায় তিনটী—সংশয়, জন্মজন্মার্জ্জিত কুসংস্কার এবং বিষম বাসনা বা দোষপাশ বা জাত গুণরাশি। যখন মহাপুরুষদিগের জীবন প্রত্যক্ষ ও পর্য্যালোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের সংসর্গে নিরন্তর বাস করিয়া মানবের চিরতরে সংশয় নিরাকৃত হইবে, তখন স্বতঃই জীবনে সাধনা আরম্ভ হইবে এবং সংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকিবে। সংশয় ও সংস্কারের বাঁধ কাটিয়া গেলেই হৃদয় হইতে মুক্তির জন্য স্বতঃই আত্যন্তিকী ব্যাকুলতা-নদী উৎপন্ন হইবে। তখন পরম করুণাময় পরম পিতার নিকট তাহার মর্ম্মস্থল হইতে যে প্রার্থনা উত্থিত হইবে, তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার তমোবাঁধ কাটিয়া যাইবে ও পরমপিতার কৃপা অবতীর্ণ হইবে। জগৎ এই ভাবে উদ্ধারের পথে দ্রুতপদে, দৃঢ়পদে এবং সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর

হইবে। এই আড়াই হাজার বৎসরের উন্নতির পরিমাণ যদি আমাদের মাপকাঠি হয়, তবে কি কোটী কোটী বৎসরেও, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বৎসরেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না? পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই সকল নর নারী পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন, ইহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে অন্যান্য মণ্ডলের আবশ্যকতা ছিল না। উপনিষদও বলেন যে কেহ কেহ এই পৃথিবীতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং কেহ কেহ পরলোকে তাঁহার দর্শন লাভ করেন।*

মানব যে পৃথিবীতে কোটী কোটী বৎসর বাস করিবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ অত্যল্প। কে সুনিশ্চিত ভাবে বলিতে পারে যে পৃথিবী পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বৎসর মানব বাসের উপযোগী থাকিবে না? আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে পৃথিবী এমন কি আমাদের সৌর জগৎ কোটী কোটী বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে, তথাপিও আমাদের অনুমান মিথ্যা বলিবার কোনই হেতু নাই। কারণ, সৌর জগতের মণ্ডল সংখ্যা অল্পাধিক দুই শতের অধিক হইবে না। অর্থাৎ বিশ্বের মণ্ডল সংখ্যার তুলনায় উহারা নগণ্য। পৃথিবী অথবা সৌর-জগৎ যদি ধ্বংসই হয়, তবে উহা একদিনে সম্ভব হইবে না, নিশ্চয়ই উহা ক্রমশঃ সম্পন্ন হইবে। উহারা একদিনে সৃষ্ট হয় নাই, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। উহাদের ধ্বংসের জন্যই বিশ্ব ধ্বংস হইবে না, কারণ, উহাদের সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিশ্বে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান ছিল। যদি একান্তই উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে সেই সুদীর্ঘকালে অন্যান্য মণ্ডলগুলি নিজেদের স্থায়িত্বের উপযোগী adjustment করিয়া লইবে। সুতরাং সৌর জগৎ ধ্বংস হইলেও পৃথিবীর জীব সমূহের বাসের উপযুক্ত মণ্ডল জুটিবেনা, ইহা ধারণা করা যায় না। অর্থাৎ পৃথিবী শেষ হইলেও পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ মণ্ডল আমাদের জন্য বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং সম্পূর্ণা সৃষ্টি কোটি কোটী বৎসরে শেষ হইতে পারে না। এবং একটী

* এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমরা "সোঽহং জ্ঞান" অংশে দেখিতে পাইব।

সৃষ্টিতেই ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা বা প্রেমলীলা সম্পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, বহু সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাহা হইবেও না। এস্থলে ১৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠক দেখিবেন। উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টি প্রায় অনাদি অনন্ত। সুতরাং এক সৃষ্টিতেই যে তাঁহার মহালীলা সম্পূর্ণ হইতে পারিবে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহারা কল্পবাদ স্বীকার করেন, তাহারাও সৃষ্টিকে ব্রহ্মের লীলারূপে ব্যাখা করেন। প্রেমময়ের প্রেমলীলা যে সম্পর্ণ অপ্রয়োজনে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। বেদান্ত দর্শনের ২।১।৩৩ সূত্রের ভাষ্যেও আমরা দেখিয়াছি যে লীলা অপ্রয়োজনেই সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং সেই একান্ত প্রয়োজনে কিন্তু লীলার্থ রচিত বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত হইতে পারে না। কারণ, যদি তাহাই হয়, তবে আর লীলাকে অপ্রয়োজনীয় না বলিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়ই বলিতে আমরা বাধ্য হইব। কারণ, ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্ব ভিন্ন বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। যাহা তাঁহার নিত্য অবশম্ভাবী সাথী, তাহা অবশ্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে। ইংরেজীতে কথাটা প্রকাশ করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে The universe is a vital and indispensible part and parcel of God and His inseparable companion. In other words, God can not exist without the creation and it cannot, therefore, be dispensed with even at His pleasure. The entire world affairs, therefore, cannot be termed Leela as explained by us as well as by the most distinguished commentators of the Brahmo Sutra referred to above.*

---

* যদি সৃষ্টিকে অবশ্যম্ভাবী অনাদি অনন্ত বস্তু বলিয়া কল্পনা করা হয়, তবে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না। কারণ, তিনি নিত্যই অনন্ত স্বাধীন বা

এস্থলে যদি পাঠক সৃষ্টিকে ব্রহ্মের স্বভাবজাত বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, তবে তাহাকে উহার খণ্ডনার্থ এ পর্যন্ত যাহা এই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সৃষ্টি স্বভাবজাত বলিলে উহা লীলাপদ বাচ্য হইতে পারে না। অতএব আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সৃষ্টি একটা মাত্রই, যদিও উহার আদি অন্ত আমাদের ধারণার অতীত। সুতরাং একমাত্র সৃষ্টিতেই সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবেই ; ইহাতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কল্পবাদ সম্বন্ধে বিচারে ইহাই আমাদের প্রধান ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বের মানচিত্রে পৃথিবীত একটা বিন্দুই বটে, এমন কি সৌরজগৎও একটা বৃহত্তর বিন্দু বই আর কিছুই নহে এবং বিশ্বই আমাদের আলোচ্য বিষয় ক্ষুদ্রা পৃথিবী নহে।

হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহাও যে ঠিক নহে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে যে সেই যুগ চতুষ্টয় মিলিয়া যে কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অতি অল্প সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির আদি অসংখ্য বৎসর পূর্ব্বে। সৃষ্টির সত্যযুগ অতীত হয় নাই। তাহা সুদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান থাকিবে। আমাদের মনে হয় যে পুরাণকার যাহাকে সত্যযুগ বলিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র পৃথিবীমণ্ডলের কেবল মাত্র মানুষ সম্বন্ধে প্রাথমিক অর্থাৎ শৈশব অবস্থার একটী কল্পিত কাল। শিশু যেমন সাধারণতঃ সরল থাকে (সকল শিশুই সরল থাকে না), তেমনি হয়তঃ সেই সময়ের অধিকাংশ মানব সরল ছিলেন। বর্ত্তমানেও দেখা যায় যে অশিক্ষিত Tribes স্বভাবতঃই সরল প্রকৃতি। এই জন্য সেই যুগকে

Absolute. সুতরাং তাঁহার পক্ষে সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। সৃষ্টিকে অনাদি অনন্ত বলিলে ব্রহ্মের সৃষ্টি ভিন্ন অস্তিত্বের বাধা উৎপাদন করা হয়। লীলা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে সাময়িকভাবে সম্পাদিত হইবে। যাহা নিত্য, তাহাকে লীলা বলা যায় না। এই সম্পর্কে "লীলাতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

সত্য যুগ বলা হয়। আবার সকল মানবই প্রথমে শিশুই থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানারূপ জটিল কুটিল বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান হয়, সেইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত মানুষও নানারূপ বুদ্ধিতে নানাভাবের ভাবুক হইয়াছে। মোটামুটী ভাবে চিন্তা করিতে গেলে মনে হয় যে পৃথিবীতে সৃষ্টির বিকাশের সবে মাত্র যৌবন আরম্ভ। বোধ হয় সেই জন্যই চতুর্দ্দিকে এত নানাভাবের বিপ্লব। এখনও যে বিকাশের কত বাকী রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? শিশুর সারল্যের মূল্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিন্তু যে মানব বয়স্ক হইয়া সাধনা দ্বারা সরলতা, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণে উন্নত হইতে পারেন, তিনিই সত্যকে লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার জীবনে পরিণামে সত্যযুগ উপস্থিত হয় এবং তাহা কখনও শেষ হয় না। সেইরূপ জগৎ যখন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া (অবোধ অজ্ঞান থাকিয়া নহে), সকল বিষয় বুঝিয়া শুনিয়া জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া ও নানাবিধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া প্রেম, ভক্তি, সরলতা, একাগ্রতা, জ্ঞান প্রভৃতি গুণে পরমোন্নত হইবে, এক কথায় সত্যধর্ম্ম যখন জীবনে জীবনে সংসাধিত হইবে, তখনই সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। সেই সত্যযুগ চিরস্থায়ী। একটী মাত্র ক্ষুদ্র মণ্ডল সম্বন্ধে যদি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তবে সৃষ্টিতে যে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান আছে, তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে কি এই সৃষ্টির পরে আবার সৃষ্টি হইবে, ইহা ধারণায় আসে? কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে পৃথিবী আরও নয় কোটী নয় নিযুত বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। যদি তাহাই তর্কস্থলে সত্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়, তবে অনন্ত প্রায় মণ্ডল লয় হইতে প্রায় অনন্ত কালের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং সৃষ্টিকে সত্য ত্রেতাদি যুগ দ্বারা শেষ করিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

এস্থলে গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "পুরাণ প্রবেশ" নামক পুস্তক হইতে সৃষ্টির কাল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রমতে সৃষ্টি কাল। কাল বিভাগ সম্বন্ধে সকল পুরাণ একমত নহে। সাধারণতঃ

যে বিভাগ দেখা যায়, তাহাতে—

সত্যযুগ—১৭২৮০০০		
ত্রেতাযুগ—১২৯৬০০০	}	মানব বর্ষ
দ্বাপরযুগ— ৮৬৪০০০		
কলিযুগ— ৪৩২০০০		

সমষ্টি—৪৩২০০০০

বিষ্ণু পুরাণ মতে এক ব্রাহ্ম আয়ুষ্কাল—৩১১০৪০০০০০০০০০০ মানব বর্ষ।

মনুসংহিতা মতে এক ব্রাহ্ম আয়ুষ্কাল—১০৩৬৮০০০০০০০০০০০০ মানব বর্ষ।

গিরীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে "মহকল্লান্তে" যে প্রলয় হয়, তাহাতে বিশ্ব ধ্বংস হইলেও মহাভূত থাকিয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষ হইলে যে মহাপ্রলয় হয়, তাহাতে পঞ্চভূতও অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ইহাই পৌরাণিক কল্পনা। অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কালও যাহা, সৃষ্টিকালও তাহা।

আমরা দেখিলাম যে এক ব্রাহ্ম আয়ুষ্কাল বিষ্ণু পুরাণমতে যাহা, তাহা হইতে মনুসংহিতা মতে অধিকতর। কিন্তু সেই কালও এক পরার্দ্ধ বৎসর হইতে অল্পতর।

যথা – ১০০০০০০০০০০০০০০০০০—পরার্দ্ধ

১৩৬৮০০০০০০০০০০০০০—ব্রাহ্ম আয়ুস্কাল (মনুসংহিতা মতে)

৮৯৬৩২০০০০০০০০০০০০—বৎসর-কম-পরার্দ্ধ।

আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইব যে বিশ্বে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান। তাহা এত অধিক সংখ্যক যে তাহা পরার্দ্ধপরার্দ্ধ সংখ্যা দ্বারাও গণনা করা যায় না: ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মতও বটে। সুতরাং সেই অসংখ্য মণ্ডল সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এবং মহাভূত সকলের উৎপত্তি, পঞ্চীকরণ ও লয় কার্য্যে কেবল মাত্র এক পরার্দ্ধ বৎসরও লাগিবে না, ইহা পৌরাণিক কল্পনা অথবা সত্য, তাহা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ক্রমই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একটী প্রধান প্রণালী।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পুরাণে যে সৃষ্টিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই উহা উক্ত, নতুবা সৃষ্টিতে যে অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান, তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মাণ্ড এক, অখণ্ড ও অনন্ত প্রায়। ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নহে এবং তাহা হইতেও পারে না। কারণ, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও প্রলয় কর্ত্তা একমাত্র ব্রহ্মই। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও তাহাই দেখা যায়।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বঙ্গানুবাদঃ—যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর (বিশ্ব) ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপদ যিনি দর্শন করাইয়াছেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার।

Universe শব্দের অর্থ বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড এবং উহা যে একটীমাত্র, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

যদি কেহ অনন্ত প্রায় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করেন, তবে সেই বিভাগ কাল্পনিক মাত্র হইবে, যেমন পৃথিবীকে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দ্বারা ভাগ করা হয়। এই চরাচর পূর্ণ অখণ্ড বিশ্বই আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং একমাত্র ব্রহ্মই সেই সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও লয় কর্ত্তা। তিনি যখন জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা প্রভৃতি অনন্ত গুণে গুণবান এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে শক্ত, তখন একজন সৃষ্ট ও অপূর্ণ জীবকে এক একটী খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মারূপে কল্পনায় কোনও আবশ্যকতা নাই। যদি বলা যায় যে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য ব্রহ্মকে একজন মধ্যবর্ত্তী স্রষ্টারূপে ব্রহ্মাকে নিয়োগ করিতে হয়, তবে প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই অপূর্ণ শক্তি বলা হয়। আমাদের যতদূর জানা আছে, উপনিষদে একজন ব্রহ্মা ও একটী মাত্র বিশ্বের উল্লেখ আছে। উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে একমাত্র ব্রহ্মই (ব্রহ্মা নহেন) স্রষ্টা। পাঠক মনে রাখিবেন যে উপনিষদই দার্শনিক আলোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহাকে শ্রুতি-প্রস্থান

বলা হয়। উহা অবলম্বন করিয়াই ন্যায়-প্রস্থান (ব্রহ্ম সূত্র বা বেদান্ত দর্শন) এবং স্মৃতি-প্রস্থান (গীতা) এবং অন্যান্য স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থে প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদে যে বিষয়ের (অসংখ্য ব্রহ্মার কথার) উল্লেখ নাই, তাহা পুরাণে লিখিত হইলেও গ্রহণীয় নহে। শ্রুতিকেই অভ্রান্ত বলা হয়, পুরাণকে নহে। হিন্দু শাস্ত্রে পুরাণের স্থান নিম্নতম। আবার শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতির প্রামাণ্যই বলবৎ থাকে, স্মৃতি ও পুরাণের কথা অগ্রাহ্য হয়।

ব্রহ্মাণ্ড যে এক এবং অখণ্ড তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষ হইলেই মহাভূত সকল অব্যক্তে লীন হয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় সম্পূর্ণ হয়। যদি তাহাই হয়, তবে আপত্তিকারীর সকল ব্রহ্মাণ্ডই সেই একই কালে লয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড লয় হইবে, কিন্তু অন্য অসংখ্য ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড সকল লয় হইবে না, ইহা হইতে পারে না। কারণ, মহাভূত সমূহই যখন অব্যক্তে লীন হয়, তখন অন্য সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিও অসম্ভব এবং লয় অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র বিশ্বই একই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। সুতরাং কতকাংশের মহাভূত অব্যক্তে লীন হইবে এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের মহাভূত সেইরূপ লয় হইবে না ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং বিশ্বকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভাগ করিলেও তাহা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র হইবে এবং তাহা করিলেও সৃষ্টিকাল এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল হইতে অধিককাল হইবে না।

আমাদের ব্রহ্মার অধীন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কেহ নির্দ্দেশ করে নাই। সুতরাং এই কল্পনার মূলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহা আমাদের বিচারের বিষয় হইতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু বলিতেছেন যে অসংখ্য নক্ষত্র (দৃষ্ট ও অনুমিত) একই বিশ্বের অন্তর্গত এবং উহাদের সৃষ্টি ও স্থিতি একই নিয়মে সম্ভব হইয়াছে। যদি ধরা যায় যে আমাদের সৌর জগৎ একটী ব্রহ্মাণ্ড, তবুও বলিতে হয় যে আমাদের সূর্য্যই আদি সূর্য্য নহে। উহা অন্য সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার

সেই সূর্য্য অন্য সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি। ইহাও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইব যে আদিতে সুর ও অসুর নামক মণ্ডলদ্বয়ের সৃষ্টি হয়। আমাদের দৃষ্ট বা অনুমিত সূর্য্যমণ্ডল সমূহ সুরমণ্ডল হইতে এবং ধুমকেতু সমূহ অসুরমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ব এক ও অখণ্ড। ইহা বিভিন্ন ব্রহ্মার অধীন বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সমূহ নহে।

যে স্থলে একটীমাত্র কল্পনায় আমরা সুসিদ্ধান্তে আসিতে পারি, সেইস্থলে মধ্যবর্ত্তী স্রষ্টারূপে ব্রহ্মার কল্পনায়, ততোঽধিক অসংখ্য ব্রহ্মার কল্পনায় প্রয়োজন কি? দর্শন শাস্ত্র বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বহু কল্পনা না করিতে নিষেধ করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে সপ্তলোকের উল্লেখ আছে। যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্। এই সকল লোককে যদি কেহ এক একটী মণ্ডল মনে করেন, তবে তাহা ভুল হইবে। সেই সকল লোকে কত সংখ্যক মণ্ডল বর্ত্তমান আছে, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল লোকে কিরূপ দেহে জীব বাস করেন, তাহাও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। মানব ক্রমোন্নতি দ্বারা উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গমন করেন। মানবের উন্নতি পৃথিবী (বাদী কথিত) যে ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নহে। তাহার গতি অনন্ত প্রায় বিশ্বের সর্ব্বত্র। তবে তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহা ক্রমপ্রণালীর অন্তর্গত। ইহা হইতেও দেখা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড এক, অনেক নহে এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মারও আবশ্যকতা নাই। কারণ, সকল মণ্ডলের—সকল লোকের—স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা এক—তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। উহারা যে এক বিশ্বের বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রতীকরূপে কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা জাত রজোগুণে সৃষ্টি, রিরক্ষিষা জাত সত্ত্বগুণে

স্থিতি এবং জিহীর্ষা জাত তমোগুণে লয় সাধিত হইয়া থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রের উক্তরূপ কল্পনা সত্যানুকারী হইলেও বহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কল্পনা যে নিতান্তই অযৌক্তিক, তাহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদে পৌরানিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের কোনই উল্লেখ নাই। উক্ত গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত ব্রহ্মা প্রভৃতির সহিত পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কোনই সম্পর্ক নাই।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম বা দর্শন শাস্ত্র মধ্যবর্ত্তী ভাবে কোন স্রষ্টার কথা বলেন না। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা পাঠক মনে করিবেন না যে আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম বা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। আমরা তাঁহা-দিগকে মহাপুরুষ জ্ঞানে আমাদের ভক্তিভাজন বলিয়াই মনে করি। তাঁহারা পৃথিবীতে মানব ভাবে জন্মগ্রহন করিয়া সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অত্যধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাই এখন তাঁহারা বর্ত্তমান ভাবে পূজিত হইতেছেন। মায়াবাদিগণও প্রোক্ত-দেবগণকে জীব পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন।

Bible-এ (Genesis Chapter—II তে) নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টী বর্ত্তমান।

(15.) And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it. (16.) And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. (17.) But the tree of knowledge of Good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. বঙ্গানুবাদ :- (১৫) এবং প্রভু পরমেশ্বর মানুষটীকে (আদমকে) ইডেন উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তথায় রাখিয়া দিলেন। (১৬) এবং প্রভু পরমেশ্বর এই বলিয়া আদেশ দিলেন যে "তুমি ইচ্ছামত সকল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পার। (১৭) কিন্তু তুমি ভাল-মন্দ-জ্ঞানদায়ক

বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে না। কারণ, যে দিন তুমি তাহা ভক্ষণ করিবে, সেই দিন তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

ইহার পর আদম উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পতন হইয়াছিল। ইহা সকলেই অবগত আছেন।

এখন প্রশ্ন হইবে যে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণে দোষ কি? পরমেশ্বর জ্ঞানময়। বাইবেলে লিখিত আছে যে তিনি তাঁহার নিজের প্রতিকৃতিতে (Image-এ) মানুষ গড়িয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে পরমপিতার জ্ঞান আমাদেরও থাকা অবশ্যম্ভাবী। আত্মা দেহাবদ্ধ হওয়ায় সেই জ্ঞান নানা কারণে নিষ্প্রভ অবস্থায় থাকে। উহাকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া বা বিকাশ করিয়া অনন্ত জ্ঞানময় পিতার দিকে ধাবিত করাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং পরমপিতা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে করা নিষেধ দূরে থাকুক, তিনি তাহা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া খাইতেই আদেশ দিয়াছিলেন, ইহা বুঝাই ত স্বাভাবিক। ভালমন্দ বিচার করিবার জ্ঞান যদি মানবের না থাকিল, তবে তাহাকে জীব জগতের কোন স্তরে নামাইয়া দেওয়া হয়, তাহা পাঠক একবার চিন্তা করুন। মানব পশু পক্ষী নহে, সে কীট পতঙ্গ বা বৃক্ষলতাও নহে যে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার থাকিবে না। মানুষের এই অধিকারই তাহাকে পৃথিবীস্থ সকল জীবের ঊর্দ্ধে রাখিয়াছে এবং এই জ্ঞান আছে বলিয়াই অন্য জীব যাহা না পারে, মানুষ তাহা পারে। অর্থাৎ পরম পিতার উপাসনা করিবার অধিকার একমাত্র মানবেরই আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জীবের নাই। আমরা সকলেই জানি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে জ্ঞানময় পরমপিতাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভাল মন্দ বিচার করিবার জ্ঞান হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিব, ইহাই যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশা কোথায়?

ইতিপূর্ব্বে সত্যযুগ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা যাহা দেখিয়াছি, এস্থলেও তাহাই দেখিতেছি। অর্থাৎ শৈশবের সরলান্তঃকরণই যেন একমাত্র কাম্য বস্তু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই সরলান্তঃকরণ

অজ্ঞানতা ও অনভিজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। সাধকগণ সাধনা দ্বারা পুনরায় সরলতা অর্জ্জন করেন এবং তাহাই চিরস্থায়ী হয়।

যাহারা সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারা বলেন যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত। সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে আপনা আপনি (automatically) তাঁহার হইতে প্রস্ফুটিত হইতেছে। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের মূলে এই ভাব বর্ত্তমান যে ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিলেন বলিলেই তাঁহাকে অপূর্ণ বলা হইল। ইহা যে সত্য নহে তাহা আমরা "সৃষ্টির সূচনা" ও "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয়ে দেখিতে পাইয়াছি। সমস্ত প্রথম অধ্যায়েই এই বিষয় নানাস্থলে নানাভাবে লিখিত হইয়াছে। যদি তর্কস্থলে এই মত ও কল্পবাদ স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবে বলিতে হইবে যে সৃষ্টিতে যেমন পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি উহাদের পঞ্চীকরণ ও মণ্ডল সমূহের সৃষ্টি প্রভৃতি নানা স্তরে সম্ভব হইয়াছে, সেই-রূপ কল্পারম্ভ ও কল্পান্তও সৃষ্টির এক একটী স্তর বিশেষ। অর্থাৎ সৃষ্টিতে কল্পের পর কল্প আপনা আপনি আসিতেছে ও যাইতেছে, সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সৃষ্টির জন্য পরমপিতার কোন স্তরেই কোনই ইচ্ছার প্রয়োজন হয় নাই, হয়না বা হইবেও না। যথা—কোন ব্যক্তি অন্ন গ্রহণ করিলে তাহা পাকস্থলীতে যায় ও তথায় তাহাতে নানা রস স্বতঃই আসিয়া যুক্ত হয় ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া সার অংশ রক্তরূপে পরিণমন করে এবং অসার অংশ মল মুত্রাদি রূপে পরিণত হয়। ভোক্তার ইচ্ছার উপর এই পরিপাক ক্রিয়া অথবা উহার পরবর্ত্তী কার্য্যনিচয় নির্ভর করে না। আহারের পর সে কখনও ইচ্ছা করে না যে উক্ত অন্ন পরিপাক হউক্। হয়তঃ অনেক সময়, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে সে ভুলিয়াই থাকে যে সে অন্নগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহা পরিপাক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ভোক্তার ইচ্ছা না হইলেও অর্থাৎ সে যদি ইচ্ছা করে যে তাহার ভুক্ত অন্ন যেন পরিপাক না হয়, তথাপিও তাহা পরিপাক হইবে। আবার সে যদি অসুস্থ থাকে অথবা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া ইচ্ছাও করে যে তাহার ভুক্ত অন্ন পরিপাক হউক্, তথাপিও তাহা পরিপাক হইবে না। অর্থাৎ

পরিপাক ক্রিয়া ভোক্তার ইচ্ছার উপর ত নির্ভর করেই না, বরং তাহার অজ্ঞাতেই উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক্রিয়া তথা কল্পারম্ভ ও কল্পান্ত সৃষ্টির স্বভাববশতঃই হইবে অর্থাৎ সেই সকল স্তরই আপনা আপনি (antomatically) সম্পন্ন হইবে। তাহাতে পরম পিতার ইচ্ছার কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং তাঁহাতে সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা ও জিহীর্ষার উদয় হইবে না। পাঠক আরও সিদ্ধান্তে আসিবেন যে এই কার্য্যে কোন স্তরেরই ইতর বিশেষ নাই অর্থাৎ সকল স্তরই আপনা আপনি সম্পন্ন হইতেছে ও হইবে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে প্রত্যেক কল্পারম্ভে ব্রহ্ম কেন ইচ্ছা করিবেন যে তিনি বহু হইবেন? সৃষ্টিতে আপনা আপনি কল্পের পর কল্প চলিয়াই আসিতেছে ও চলিতেই থাকিবে (ক)। সুতরাং পরমপিতার ইচ্ছার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু উপনিষদে বহু মন্ত্র বর্ত্তমান যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন ও জগৎ সৃষ্ট হইল *। সেই সকল মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই না যে সৃষ্টি কল্পের পর কল্প ব্রহ্ম হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে। এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে সেই সকল মন্ত্র সুস্পষ্টভাবে বলিতেছে না যে সৃষ্টি কল্পের পর কল্প অনাদিকাল হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সেই সকল মন্ত্র পাঠ করিলেই এই ধারণাই সহজে মনে উদয় হয় যে একবার মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে এবং একবার মাত্র প্রলয় হইবে। যদি অসংখ্যবার সৃষ্টি ও লয় এই তত্ত্ব ভক্তিভাজন মহাজ্ঞানী ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হইত, তবে অবশ্যই তাঁহারা সেই তত্ত্বটীও উহাতে যোগ করিয়া দিতেন, কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন নাই। অপর দিকে প্রামাণ্য দ্বাদশখানি উপনিষদে কোথায়ও ইঙ্গিতে বা আভাসেও কল্পবাদ সমর্থক কোনও মন্ত্র নাই। যাহা হউক্,

(ক) সাংখ্যমতে কল্পারম্ভ পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ত্রিগুণের অসমতাই এই কল্পারম্ভের কারণ। এই বিষয়ে ইতঃপর আরও কিছু লিখিত হইবে।

* ইতিপূর্ব্বে "মায়াবাদ" অংশে সৃষ্টির সূচনা মূলক বহুমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

আপত্তিকারী যদি নিম্নোদ্ধৃত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন, তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন যে একবার মাত্রই সৃষ্টি হইয়াছে। কল্পবাদোক্ত অসংখ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে ইহাকে প্রতিবাদ সূচক মন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমি রজায়ত পৃশ্ন্যাঃ দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥ (ঋগ্বেদ—৬।৪৮।২২) বঙ্গানুবাদ ঃ—একবার মাত্র স্বর্গ বা আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। একবার-মাত্র ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। একবার মাত্র পৃথিবী হইতে পয়ঃ (অন্নরস = জীবের প্রাণ ধারণার্থ বিবিধ শস্যরাজি) আকৃষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরে আর কিছু সৃষ্টি হয় নাই। (নির্ম্মল চন্দ্র সেন মজুমদার সাংখ্যতীর্থ কবিরত্ন)। রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন কল্প ও ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নাই।*

কেহ কেহ ঋগ্বেদোক্ত নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে কল্পবাদ শ্রুতি-সম্মত। সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। ১০।১৯০।৩। এই মন্ত্রের অর্থ তাঁহারা এই ভাবে প্রকাশ করেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্পেও সেইরূপ ভাবেই সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত মন্ত্রটী যে সূক্তের অন্তর্গত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দশম মণ্ডল —১৯০ সূক্ত। (সৃষ্টি দেবতা। ঋতং চ সত্যং চাভী দ্ধাত্তপসোহধ্য জায়ত। ততোরাত্রা জায়ত ততঃ সমুদ্রোঃ অর্ণবঃ॥ ১॥ সমুদ্রাদর্ণ বা দধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বাস্য মিষতো-বশী॥ ২ সূর্য্যাচন্দ্রমসোধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ ॥ ৩॥ বঙ্গানুবাদ ঃ—১। প্রজ্জলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি

---

* রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

"একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। একবার মাত্র প্রশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই।"

জন্মিল, পরে সমুদ্র। ২। জল পূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোক দেখিতেছে। ৩। সৃষ্টিকর্ত্তা যথাসময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। (রমেশ চন্দ্র দত্ত)

বঙ্গানুবাদে দেখা যায় যে রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় "যথাপূর্ব্বং" শব্দের অর্থ "যথাসময়ে" করিয়াছেন। "পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়" বলেন নাই; সমস্তটী সূক্ত সৃষ্টি সম্বন্ধীয়। প্রথম দুইটী মন্ত্রে নানা পদার্থের সৃষ্টি বিষয় বর্ত্তমান। সুতরাং তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত রূপে করিলেই সহজ, সুসঙ্গত ও প্রকরণানুযায়ী হয়।

"সৃষ্টিকর্ত্তা পূর্ব্বকথিত অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টির ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য পদার্থ যেরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রকেও সেই রূপ ভাবে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।"

পূর্ব্বং অনতিক্রম্য যথাপূর্ব্বম্। সুতরাং "যথাপূর্ব্বম্" শব্দের প্রকৃত অর্থ "পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টির ন্যায়।" অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সৃষ্টির কথা বর্ত্তমান সূক্তে আছে, তাহা দ্বারা যখন আলোচ্য মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তখন "পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়" ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্ব শব্দ বস্তুতে প্রয়োগ না করিয়া যদি কালে প্রয়োগ করা হয়, তবুও উক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হইতে পারে। "যথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমনতিক্রম্য অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টির পূর্ব্বকালে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহ যেরূপ ভাবে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি চন্দ্র সূর্য্যও সেইভাবে সৃষ্টি করিলেন। আমাদের সকলের জানা আছে যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে (পূর্ব্বকালে) বহু বহু জড় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টির পূর্ব্বকালে সেই সকল পদার্থ তিনি যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চন্দ্র সূর্য্যও তিনি সেই ভাবেই সৃষ্টি করিলেন।

আমাদের দৃষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বকালের পরিমাণ যদি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে তাহা অসীম অর্থাৎ ধারণাতীত বলিলেই

যথেষ্ট হইবে। স্থূল, সৃষ্টিতে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বকাল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মনে হয় যে উহারা এই সেই দিন মাত্র হইয়াছে। আবার উক্ত মণ্ডলদ্বয় সৃজনের পূর্ব্বে যদি সৃষ্ট পদার্থের সংখ্যা অনুমান করিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে সেই সংখ্যা অনুমান যোগ্য নহে। অর্থাৎ উহাকে অসংখ্য বলিলেই যথেষ্ট হয়। অতএব যেভাবেই চিন্তা করা যাউক্ না কেন "যথাপূর্ব্বং" শব্দ ব্যাখ্যা করিতে বর্ত্তমান সৃষ্টি-কাল অথবা পদার্থ সমূহই যথেষ্ট। উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এই মন্ত্রের বলে পূর্ব্বকল্পের অনুমান নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

এই মন্ত্রে "অকল্পয়ৎ" শব্দই কল্প বিশ্বাসী পণ্ডিতদিগের কল্পব্যাখ্যার কারণ বলিয়া মনে হয়। হয়তঃ "অসৃজৎ" শব্দ লিখিত হইলে এই রূপ ভাবের ব্যাখ্যা হইত না। "অকল্পয়ৎ" শব্দের "সৃষ্টি করিয়াছিলেন" অর্থ। তথাপিও যদি ইহার বিশেষত্ব আছে বলিতে হয়, তবে ইহা চিন্তা করিলেই হয় যে "ব্রহ্ম সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন", ইহার অর্থ তিনি সৃষ্টি বিষয়িনী কল্পনা করিলেন। ইহঃ আমরা "মায়াবাদ" অংশে উদ্ধৃত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রুতি মন্ত্র সমূহে দেখিতে পাইব। তিনি সেই কল্পনানুযায়ী সৃষ্টি করিলেন বলিয়া "অকল্পয়ৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল প্রকার সৃষ্টির মূলে কল্পনা বর্ত্তমান থাকে। তাই কল্প ধাতুর অর্থ সৃজন করা ও কল্পনা করা একই, বিশেষতঃ ব্রহ্মের পক্ষে। এই সম্পর্কে ৪৫—৪৮ পৃষ্ঠায় একটী শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রে (সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত ইত্যাদিতে) আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই যে একবার মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং আলোচ্য মন্ত্রেরও সেই ভাবের অর্থই করিতে হইবে। কষ্ট কল্পনা প্রসূত অন্য অর্থ অসঙ্গত হইবে। কারণ কল্পবাদসূচক অন্য অর্থ অসামঞ্জস্য দোষে দুষ্ট হইবে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রটী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন।

"সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মুণ্ডকোপনিষদের ১।১।৮, ২।১।৩, ২।১।৬-৯ মন্ত্র সমূহে যে সকল সৃষ্টি বিষয়িনী বর্ণনা আছে, তাহা আলোচ্য সূক্তের কতকাংশে অনুরূপ।

উহাতে কিন্তু কল্প সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনই উল্লেখ নাই।

যাহারা শ্রুতি বিশ্বাসী, তাহারা উপরোক্ত সরল ও প্রাঞ্জল সৃষ্টির সাদিত্বসূচক বাক্যের বর্ত্তমানতায় অদৃষ্টবাদ মীমাংসার জন্য পৌরাণিক অনন্ত কল্প-কল্পনা বিশ্বাস করিতে পারেন না। মায়াবাদী বলিতে পারেন যে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কিন্তু উপরোক্ত বাক্যসমূহ সগুণব্রহ্মে প্রযোজ্য। ইহার উত্তরে পাঠককে "মায়াবাদ" অংশ বিশেষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে উহার বহুমত খণ্ডিত হইয়াছে। "মায়াবাদের সগুণব্রহ্মকে" যে উপনিষদে পাওয়া যায় না, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে এরূপ বহুলোক আছেন যাহারা শ্রুতিকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন না এবং এইরূপ লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে, এমনকি বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষেও অত্যধিক। বিশেষতঃ দর্শন শাস্ত্রের ত কোনও শাস্ত্রের অভ্রান্ততার উপর নির্ভর করা উচিত নহে। সে স্বাধীনভাবে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করে। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য আছে? ইহার উত্তর বুঝিতে পাঠক ইতি-পূর্ব্বেলিখিত অংশত্রয় ও বর্ত্তমান অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত সুতরাং সাদি, কিন্তু কল্পবাদ সত্য নহে। আমরা কেবল শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা করি নাই যথোপযুক্ত যুক্তিও প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে শ্রুতিকে অভ্রান্ত বলিয়া অস্বীকার করিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে জগতে শ্রুতির স্থান অত্যুচ্চে। সুতরাং বেদবেদান্তোক্ত মন্ত্র সমূহের মূল্য অত্যধিক। আবার যাহারা শ্রুতির অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী, তাহাদের নিকটও আমাদের কিছু বলিবার আছে। তাহাদিগকেও বলিতে হইবে যে কল্পবাদ শ্রুতি সম্মত নহে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে কল্পবাদে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা শ্রুতির অভ্রান্ততায়ও বিশ্বাসী। সুতরাং শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা উহা খণ্ডিত হইলে তাহাদের আর

* "মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম" উক্তির প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। সগুণব্রহ্ম বলিলে সাধারণের যে ধারণা হয়, মায়াবাদের সগুণব্রহ্ম তাহা নহেন।

কিছুই বলিবার থাকে না। এস্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে কল্প বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ শ্রুতির উক্ত মন্ত্রটী উদ্ধার করিয়া সর্ব্বদা বলেন যে কল্পবাদ শ্রুতিসম্মত। সুতরাং উহা খণ্ডন করাও প্রয়োজনীয়।

এমন বহুলোক আছেন, যাহারা পৃথিবীর কোন শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত মনে করেন না বটে, কিন্তু তাহারাই আবার প্রত্যেক শাস্ত্র কথিত বহু তত্ত্বের সত্যতা স্বীকার করেন। আপ্ত বাক্যও প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। শ্রুতির বহু বাক্যকেই যে আপ্তবাক্য মধ্যে গণনা করা যায়, তাহা তাহারাও স্বীকার করিবেন। অতএব কল্পবাদের খণ্ডনার্থ শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন অসঙ্গত হয় নাই। কল্পবাদ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কল্পনা। আমাদের মনে হয় যে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কর্ম্মবাদ মীমাংসার জন্য উহা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। দেখা গিয়াছে যে কর্ম্মবাদ মীমাংসা করিতে হিন্দু-শাস্ত্র অসমর্থ। অন্য সকল দেশীয় শাস্ত্রে এরূপ কল্পনা নাই। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের* মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বেদের উক্তি দ্বারাই যদি উহা খণ্ডিত হয়, তবে তাহা যুক্তিযুক্তভাবে অস্বীকার করা যায় না। আর্য্যেতর দর্শনে যাহারা বিশ্বাসী, তাহাদের কিছুই বলিবার নাই। কারণ, তাহারা কল্পবাদে বিশ্বাসী নহে।

এস্থলে পাঠক আবারও প্রশ্ন করিতে পারেন যে উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহ সৃষ্টির সাদিত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু উহাদিগকে কল্পারম্ভ সম্বন্ধীয় মন্ত্র মনে করিলেই হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত মন্ত্র সমূহে কল্পারম্ভ সূচক ভাব আভাষেও লক্ষ্য করা যায় না। বরং ইহার বিপরীতই দেখা যায়। উক্ত মন্ত্রসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। উহারা ইহাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে যে ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি সৃষ্টির পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্প থাকিত এবং সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি অব্যক্তে লীন থাকিত, তবে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই ছিল না, ইহার কোনও অর্থ হয় না। কারণ, সম্পূর্ণ সৃষ্টি তখনও সূক্ষ্মাকারে তাঁহাতেই বর্ত্তমান ছিল।

* এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

যদি তাহাই হইত, অর্থাৎ প্রলয়ান্তে সমস্ত জগৎ সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মেই বর্ত্তমান থাকিত, তবে ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয় বলিতে পারিতেন না যে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। (উভয় মন্ত্রেই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা স্বীকৃত হইয়াছে।) ১৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ঐতরেয়োপনিষদের ১।১ মন্ত্রেও ঐ একই ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ংতস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। (২) কুতস্তু খলুসোম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়তেতি সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকামেবাদ্বিতীয়ম্। বঙ্গানুবাদ ঃ—(১) হে সৌম্য অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্ত্তমান ছিল। এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। (২) তিনি (ইহার পর আরও) বলিলেন "কিন্তু হে সৌম্য কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে, এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল।

(মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।

আরও বলিতে পারা যায় যে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে ইহাও কথিত হইয়াছে যে সৎ হইতেই এই জগৎ আগমন করিয়াছে, অসৎ (শূন্য) হইতে নহে। যদি সূক্ষ্মাকারেই তখন জগৎ ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিত, তবে ঋষি অনায়াসেই বলিতে পারিতেন যে সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে কল্পের পর কল্প তাঁহার হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে। অসৎ হইতে সদুৎপত্তির প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারিত না। বরং ঋষি ইহার পর ৬।২।৩ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন যে তিনি বহু হইবেন। আপত্তিকারী এই উক্তিকে কল্পারম্ভে ব্রহ্মের উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। উপনিষদুক্ত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মন্ত্র সমূহে দেখা যায় যে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং উহা যে ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা যে কল্পারম্ভে উক্ত হয় নাই, তাহাও প্রদর্শিত হইল,

অথবা মন্ত্র পাঠেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ছিলেন বা আত্মা ছিলেন (উভয়ই একার্থ সূচক), অন্য কিছুই ছিল না. তিনি অর্থাৎ সৎ বা আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন। এ অবস্থায় সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত নহে, বরং অনাদি অনন্ত এবং কল্পারম্ভে এই ভাবে উক্ত হইয়াছে, এইরূপ ভাবের কল্পনা যে কিরূপে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী সুধীগণ করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা আরও একটী বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই ছিলেন. পূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টি তখন তাঁহাতে লীন অবস্থায়ও ছিল না। উক্ত আছে যে কল্পান্তে বিশ্ব সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মে লীন থাকে। লয় শব্দের অর্থ ধ্বংস নহে। সুতরাং সৃষ্টি তখনও তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, স্থূলাকারে না থাকিয়া সূক্ষ্মাকারে থাকে. এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং ঋষিগণ বলিতে পারেন না যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই ছিল না। সুতরাং কল্পারম্ভে মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনাও সত্য নহে। আরও বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি কোনও সৃষ্টি থাকিত, তবে সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ অবশ্যই ঐ মন্ত্রসমূহে "পূর্ব্বকল্পবৎ" উক্তি যোগ করিয়া দিতেন। যদি তাঁহাদের জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে কল্প বিষয়ক তত্ত্ব প্রকাশিত থাকিত, তবে তাঁহারা কেন এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন না? ইহা একটী সামান্য তত্ত্ব নহে। যাহা হউক ১৯১ এবং ১৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে আমরা পাই যে সৃষ্টি একবার মাত্র হইয়াছে। সুতরাং কল্পবাদ সত্য নহে। এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে ১৯১-১৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ যদি কল্পবাদ সমর্থকই হইত, তবে ঔপনিষদিক ঋষিগণও সেইভাবে সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধীয় উক্তি করিতেন। কিন্তু তাহাত দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত মন্ত্র কল্পবাদ সমর্থক নহে।

পাঠক এখন অন্য একটী প্রশ্ন করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মানবের উদরস্থ অন্ন ভোক্তার ইচ্ছা ব্যতীতও পরিপাক হয়

ও যে উদ্দেশ্যে মানুষ আহার করে, তাহা আপনা আপনি পূর্ণ করে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে সেই নিয়মের ব্যতিক্রমের কথা কেন বলা হয়? অর্থাৎ মানবের দেহে তাহার ইচ্ছা ভিন্নও ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইতে পারে, অর্থাৎ ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু পরমপিতার ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টিরূপ কার্য্য কেন সম্পন্ন হইতে পারিবে না? এই প্রশ্নর উত্তর বুঝিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে এই "দেহ-আমি" সৃষ্টি, ইহার একজন স্রষ্টা আছেন ও তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা আমার দেহরূপ সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ দেহের গঠনের উপর আমার কোন হাত নাই। দেহ মাত্রেরই বিশেষতঃ মানব দেহের গঠন এমন জটিল ও এমনি সুন্দর যে বিজ্ঞান যতই ইহার বিষয় অনুসন্ধান করিতেছে, ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। দেহের গঠন, উহাতে যন্ত্রাদির সংস্থাপন ইত্যাদি একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টির মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থই তাঁহারই ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা দ্বারা দেহের কোন কোন যন্ত্র চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু দেহের বহু যন্ত্রই আমাদের অজ্ঞাতে আপনা আপনি কার্য্য করিতেছে। দেহের সমস্ত অংশের ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। সুতরাং যাঁহার ইচ্ছায় দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, ও যিনি নানাবিধ যন্ত্রের নানাভাবের সংস্থান করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় উক্ত যন্ত্রসমূহ আমাদের ইচ্ছা ব্যতীতও পরিচালিত হয় ও পূর্ব্বোক্ত পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। সুতরাং ক্রিয়ার পূর্ব্বে ইচ্ছা বর্ত্তমান। আমরা অহংকারে মত্ত হইয়া মনে করি যে আমরাই দেহের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এমনকি পদে পদে সেই ভুল বুঝিবার সুযোগ পাইলেও অহংকারের প্রাবল্য বশতঃ সেই সকল অভিজ্ঞতা একেবারেই ভুলিয়া যাই। কিন্তু পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ত এমন কথা বলা চলে না যে তাঁহাকে অন্য একজন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বভাবই এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে তাঁহার বিনা ইচ্ছায় এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে মানুষের দেহে ভুক্ত অন্ন পরিপাকের ন্যায় তাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়া আপনা আপনি অনাদি কাল হইতে এবং কল্পের পর কল্প ভাবে অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। যদি তর্কস্থলে

বাদীর উক্তি গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকেই আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, তবে কেন কল্পারম্ভে ব্রহ্মের সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা ?

ব্রহ্ম একমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার উপরে কাহারও থাকা দূরে থাকুক, তাঁহার সমানও কেহ নাই। মানুষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহার দ্বারা যদি তাহার নিজ দেহ গঠিত হইত, তবেই সে ইহাকে তাহারই ইচ্ছানুযায়ী সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারিত। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন বা তাঁহার অজ্ঞাতে দেহে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারিত না।* কিন্তু সর্ব্বদাই সর্ব্ব কার্য্যে বুঝিতে হইবে যে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। তাহার ইচ্ছা সর্ব্বদাই অন্য একজন দ্বারা নিয়-মিত হইতেছে, তাহার জীবনের অধিকাংশই তাহার উপরস্থ মালিকের ইচ্ছায় পরিচালিত। মানবের এই অবস্থার জন্যই কথিত হয় যে Man proposes but God disposes. কাঙাল হরিনাথ বলিয়াছেন :—"ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার, তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার"। অতএব দেখা গেল যে মানবের সকল কার্য্যই ইচ্ছা দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সেই ইচ্ছার অতিঅল্প অংশই তাহার নিজের কিন্তু অধিকাংশই পরমপিতার। ব্রহ্মও যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইতেন এবং তাঁহার স্বভাব যদি অন্য দ্বারা গঠিত ও নিয়মিত হইত, তবে তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন ও তাঁহার অজ্ঞাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পের কল্প পার হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিত। আমাদের কোন কোন কার্য্য যেমন আপনা আপনি চলে ও কোন কোন কার্য্য আমা-দের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তেমনি কোন কোন কার্য্য তিনি ইচ্ছা দ্বারা সম্পাদন করিতেন এবং কোন কোন কার্য্য স্বতঃই ও সেই সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরে তাহা অসম্ভব। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় ও সজ্ঞানে সম্পন্ন হয়।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অচেতন স্বয়ং স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যই

---

* এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত বিষয় দ্রষ্টব্য।

করিতে পারে না। জড় চালাইলে চলে ও থামাইলে থামে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। জড় পদার্থের অর্থই চৈতন্যশূন্য পদার্থ, যাহা অন্যের বল প্রয়োগ ব্যতীত চলিতে বা থামিতে পারে না। অতএব যখন ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক আমাদের ইচ্ছা ভিন্ন ও অজ্ঞাতে সম্পন্ন হয়, তখন ঐ কার্য্যও দেহের অন্যান্য স্বাভাবিক কর্ম্ম (automatic action) সমূহ যে ব্রহ্মের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত সত্য। এই ইচ্ছা যে কিরূপ, তাহা ইতঃপর লিখিত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জড় পদার্থ স্বয়ং চলিতে বা থামিতে পারেনা সত্য, কিন্তু উহাদের কতকগুলি শক্তি আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি, বায়ুর সঞ্চালন শক্তি (Motion), চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি ইত্যাদি। এ সমস্তই উহাদের নিজস্ব শক্তি। ঐ সকল শক্তির কার্য্য চেতনের সহযোগ ব্যতীতও অচেতনে আমরা দেখিতে পাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পাঠক "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইবেন যে জড় জগৎ পরম পিতার অব্যক্ত-স্বরূপ ও ইচ্ছা দ্বারা গঠিত এবং উহার যে যে গুণ ও শক্তি থাকা আবশ্যক, তাহা তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহাতে দিয়া রাখিয়াছেন।* সুতরাং পরম চেতনের ইচ্ছা ব্যতীত নিজ নিজ শক্তিতে একটী তৃণকে গ্রহণ করিতে এবং দহন করিতে যে একান্ত অসমর্থ, তাহা কেনোপনিষদ্ বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদি উপাখ্যানোক্ত বায়ু এবং অগ্নিকে দেবতা বলা হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন জড়ের নিজস্ব কোন শক্তি নাই, ইহা প্রমাণিত হইল। কারণ, ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত একটী সামান্য তৃণকে স্থানচ্যুত বা দগ্ধ করিতে দেবতাদিগেরই যদি কোন শক্তি না থাকে, তবে সামান্য জড়ের যে সেই শক্তি থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার উহাদিগকে যদি জড় বায়ু ও অগ্নি মনে করা যায়, অর্থাৎ উপাখ্যানটি রূপক ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়

* "ইচ্ছাশক্তি" অংশ দ্রষ্টব্য।

স্বতঃই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থের নিজস্ব কোন শক্তি নাই, উহাদের মধ্যে যে শক্তির কার্য্য দেখিতেছি, তাহা সেই একমাত্র অনন্ত শক্তিমানের শক্তিই তাঁহার ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সর্ব্বোপরি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা (ক) সকলের উপর সকল সময় সর্ব্ববিষয়ে কার্য্য করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা জীবে ও জগতে যে শক্তির কার্য্য দেখিতেছি, তাহা একমাত্র তাঁহারই শক্তি, একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছে। অর্থাৎ তিনিই তাঁহার গুণ ও শক্তি যেখানে যেভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, উহারা সেখানে সেই ভাবেই কার্য্য করিতেছে। অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপার তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছার লীলামাত্র। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু লিখিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিষয়টী সহজবোধ্য হইবে বলিয়া মনে করি। আমরা ঘটিকাযন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতে পারি। কোন এক শিল্পী ঘড়িটী প্রস্তুত করেন। তিনি উহাতে যথোপযোগী যন্ত্রসমূহ যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই যে উহা সুনিয়মে পরিচালিত হইলে সঠিক ভাবে সময় বলিয়া দিবে ও নির্দ্দিষ্টকাল চলিতে থাকিবে। দেখা যায় যে কোন কোন ঘড়িতে একদিন অন্তর, কোন কোন ঘড়িতে সপ্তাহ অন্তর, আবার কোন কোন ঘড়িতে বৎসর অন্তর চাবি দিতে হয়। চাবি সময়মত না দিলে ঘড়ির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। উহাকে মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হয়, নতুবা উহা অধিকাল কার্য্যক্ষম থাকে না। যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হঠাৎ একটী ঘড়ি দেখেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে ঘড়িটী অচেতন পদার্থ হইয়াও আপনা আপনি চলিয়া ঠিক সময় বলিয়া দিতে পারে, তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ঘড়িটী নিজে নিজেই এইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ঐরূপ উক্তিই মানিয়া নিতে পারেন না। তিনি অবশ্যই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিবেন যে

(ক) চেতনের ইচ্ছা ব্যতীত যে জড় সর্ব্বকার্য্যে অসমর্থ, তাহা প্রমাণিত হইল।

ঘড়িটী একটী শিল্পীদ্বারা প্রস্তুত। তাঁহার ইচ্ছাদ্বারাই উহাতে নানাবিধ যন্ত্র নানাস্থানে সুসংস্থাপিত, উহাতে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর চাবি দিতে হয় এবং সময় সময় মেরামত করিতেও হয়। এই সকল কর্ম্ম উহার পশ্চাতে বর্ত্তমান বলিয়াই উহা এইরূপভাবে আপনা আপনি চলে ও ঠিক সময় বলিয়া দিতে পারে।

ঘড়ি সম্বন্ধে আমরা যেমন দেখিতে পাই আমাদের দেহ সম্বন্ধেও তাহাই। যদি কেহ পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রভৃতিকে automatic action বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারিবেন বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দেহ ও ঘড়ির ক্রিয়া প্রায় এক। ঘড়ি ও দেহ উভয়ই অচেতন পদার্থ। ঘড়ি মানব শিল্পীর হাতে তৈয়ারী আর দেহ পরম শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা প্রস্তুত। তিনি ইহাতে নানাবিধ যন্ত্র নানাস্থানে এমন সুশৃঙ্খলভাবে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন যে ইহা সুনিয়মে দেহী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তিনি নির্দ্দিষ্ট জীবনযাপন করিতে পারিবেন। দেহীর আহার, পানীয় গ্রহণ প্রভৃতি ঘড়ির চাবি দেওয়ার মত। ব্যারাম হইলে বা তাহা নিবারণ করিতে হইলে ঔষধ পথ্য সেবন, হাওয়া পরিবর্ত্তন, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি শরীরের মেরামত কার্য্য। ঘড়িতে আমরা যেমন automatic action দেখি, দেহেও সেইরূপ দেখা যায়। ঘড়ির automatic action-এর মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা প্রথমতঃ শিল্পীকে ও তৎপর ঘড়ির মালিককে দেখিতে পাই। শিল্পী যন্ত্রটী তৈয়ার করিয়াছেন, কিন্তু উহার সম্বন্ধে মালিকেরও কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে। শিল্পী যদি যন্ত্রটী সেইরূপভাবে তৈয়ার না করিতেন, তবে মালিক ঐরূপ অল্পায়াসে উহা নিয়ম মত চালাইতে পারিতেন না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণও উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। দেহের কার্য্যের অনুসন্ধান করিলেও আমরা পাই যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায় দেহের মধ্যে নানাবিধ যন্ত্র সুসংস্থাপিত হইয়াছে ও তাঁহার এমনই সুবন্দোবস্ত যে দেহী অল্পায়াসেই ইহা চালাইতে

পারেন এবং অদূরদর্শী ব্যক্তি দেহের কর্ত্তার অনুসন্ধান না করিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। ঘড়ি চলার মুলে যেমন শিল্পীর কার্য্যই অধিক পরিমাণে এবং মালিকের কার্য্য অল্প পরিমাণে কারণরূপে বর্ত্তমান, মানবদেহের কার্য্যেও সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা অধিক পরিমাণে ও মানবের ইচ্ছা অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পীকে বাদ দিয়া যেমন ঘড়ির চিন্তা অসম্ভব, তেমনি দেহের স্রষ্টাকে বাদ দিয়া দেহের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে পদে পদে ভুল হইবে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে দেহের তথাকথিত (automatic action-এর মূলে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা বর্ত্তমান। সুতরাং কার্য্যের মূলে যে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ইচ্ছা বর্ত্তমান, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ নাই। ইচ্ছাকে যখন আমরা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারিনা, তখন সৃষ্টি অবশ্যই সাদি এবং কল্পবাদ সত্য নহে।

যদি কল্পবাদ স্বীকার করা যায়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যেক কল্পারম্ভেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি, উহাদের পঞ্চীকরণ, মণ্ডল সমূহের সৃষ্টি এবং তৎপরে জীব সৃষ্টির আরম্ভ পর্য্যন্ত যে কত অসংখ্য বৎসর কাটিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা মানবের পক্ষে অসাধ্য।* আরও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যেক কল্পান্তে বিপরীত ক্রমে মণ্ডল সমূহের এবং পঞ্চমহাভূতের লয় হইতেও ধারণাতীত কাল ব্যয়িত হইবে। যখন প্রত্যেক কল্পের আরম্ভে এবং অন্তে অধার্য্য কাল ব্যয়িত হইবে, তখন অনন্ত কল্পে উক্ত কার্য্যে অনন্ত প্রায় কাল ক্ষয় হইবে। আবার একই প্রকারের সৃষ্টি, অর্থাৎ ভূত সৃষ্টি, মণ্ডল সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অনন্ত সংখ্যক বার করিতে হইবে। আবার সেই সেই পদার্থের একই প্রকারে লয়ও অসংখ্যবার সম্পন্ন হইবে। এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সৃষ্টি ও অসংখ্য লয়ের আবশ্যকতা দেখা যায়

* জীব সৃষ্টি পর্য্যন্ত বলার উদ্দেশ্য এই যে জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমপিতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ আরম্ভ হয় না। জীবসৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা জড়জগতের প্রারম্ভিক অবস্থা মাত্র। জড় জগৎ প্রত্যেক জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্যই। জীবের জন্যই জগৎ, নতুবা জড় জগতের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। সাংখ্যদর্শনও তাহাই বলেন।

না, যখন আমরা চিন্তা করি যে পরমপিতা অনন্ত অনন্ত অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান। অর্থাৎ অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত জ্ঞানময় ও অনন্ত ইচ্ছাময় পরমেশ্বর তাঁহার অসীম শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা জড় জগৎ এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না যাহাতে একই সৃষ্টিতে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিবে না।

কেহ বলিতে পারেন যে মানব এক দেহেই সম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। দেহ বাসের অযোগ্য হয়, তাই মানব নূতন দেহ ধারণ করেন। বিশ্বের পক্ষেও সেইরূপই হয় মনে করিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা লাভ হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে এই উপমা সমীচীন নহে। মানব যে অন্য দেহ ধারণ করে, উহা কেবল দেহ বাসের অনুপযুক্ততার জন্যই নহে। উহার আরও বহু কারণ অছে। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে মানব যে দেহে বাস করেন, সেই দেহ জাত দোষ পাশ এত বলবান থাকিতে পারে যে তিনি সেই দেহে থাকিয়া আত্মোন্নাতির জন্য কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, অথবা তাহার নিজ দোষেই এমন অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে যে ঐ দেহে থাকিয়া তাহার পক্ষে আত্মোন্নতি সম্ভব নহে। মানবকে যদি একই দেহে সুস্থ সবল ভাবেও চিরকাল রাখা হইত, তবে তাহার পক্ষে আত্মিক উন্নতি বহু স্থলেই অসম্ভব হইত। এরূপ বহু বৃদ্ধ পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, যাহারা বাল্যকালাবধি এরূপ দোষে অভ্যস্ত যে তাহারা আর কিছুতেই উহাদের হস্ত হইতে এড়াইতে পারেন না এবং সেইরূপ পাপ জীবনই যাপন করিতেছেন। কোনও রূপ আত্মিক উন্নতির চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় না। আবার এরূপ বহু লোক আছেন যাহারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক বহু বাধা হইতে উদ্ধার পাইতেছেন না। তাই অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা দেহকে চিরস্থায়ী না করিয়া পরলোকে গমনাগমন সুতরাং বহু জন্মের বিধান করিয়াছেন। মানব পরলোকে সাধন ভজন দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারেন ও করেন। আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াও উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সম্পর্কে

"পরলোকতত্ত্ব" অংশ দ্রষ্টব্য। পরলোকে পারলৌকিকগণ নিশ্চিন্ত থাকেন না। নিজেদের পাপক্ষয় ও গুণোন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। যখন পরলোকে সেই কার্য্যের দ্রুত উন্নতি লাভ না হয় এবং গুণোন্নতির জন্য পারলৌকিক আত্মা অধীর হন, তখন তিনি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করেন। কারণ পৃথিবীতে উক্ত কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ। দ্বিতীয়তঃ—এক একজন মানবের দেহ এক এক প্রকার। আবার এক এক প্রকার দেহ কোন কোন গুণ সাধনার পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক। উহাতে অন্য গুণ সাধনা অপেক্ষাকৃত কঠিন। যদি মানব সেই এক প্রকার দেহে চিরকাল বাস করিত, তবে তাহার পক্ষে পৃথিবীতে সাধ্য বহু প্রকার গুণ সাধনা অসম্ভব হইত। তাই নানা-প্রকার গুণ সাধনার জন্যও মানবের নানা প্রকার দেহ ধারণ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেহ যেমন আমাদিগকে উন্নতির পথে বাধা প্রদান করে, তেমনি উহার উপযুক্ত ব্যবহারে উন্নতির সাহায্যও করে। তৃতীয়তঃ—বিশ্বে যে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল মণ্ডলই আমাদের পক্ষে পরলোক। আমাদের আত্মিক উন্নতি অনুয়ায়ী আমরা প্রথমতঃ উপযোগী মণ্ডলে গমন করি এবং সাধন ভজন দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইব এবং ক্রমোন্নোত মণ্ডলে গমন করিব। আমাদের অনন্ত উন্নতি ঐ সকল মণ্ডলে সাধিত হইবে। পৃথিবীর দেহে বাস কালীন অত্যুন্নত মহাত্মগণও অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে মানব স্থূল দেহে বাসকালীন সেই দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন, কেহ কেহ সূক্ষ্ম দেহেরও সমস্ত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক কারণ দেহের কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। "সোঽহংবাদ" অংশে দেবযান পথ যাত্রীদিগের সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান। তাহাতেও দেখা যাইবে যে আমাদের অনন্ত উন্নতি। সুতরাং মহাত্মাগণেরও যদি পৃথিবীতে চিরকাল বাস করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনেও অনন্ত উন্নতি লাভ হইত না। অতএব

আমরা বুঝিতে পারি যে দেহের অনুপযুক্ততাই আমাদের পার্থিব দেহত্যাগের একমাত্র কারণ নহে।

অপর দিকে বিশ্ব ত জড় পদার্থ মাত্র। উহার সম্বন্ধে ত কোনই আত্মিক উন্নতির প্রশ্ন উদয় হয় না। পাঞ্চভৌতিক দেহ ত ধ্বংস হয় না। সমস্ত জড় পদার্থই থাকিয়া যায়, আকারটী মাত্র থাকে না। কিন্তু বিশ্বের লয়ে অব্যক্ত স্বরূপের সমস্ত কারুকার্য্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপই থাকে, কিন্তু উহাতে জড়ের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব। কথিত আছে যে বিশ্বস্থ জীবগণও প্রলয় কালে যেরূপ অবস্থায় থাকেন, পরকল্পেও তাহাদের সেই অবস্থায়ই পুনরাবির্ভূত হইতে হয়। সুতরাং সৃষ্টিকালে সাধন ভজন দ্বারা জীবের যে উন্নতি অর্জ্জিত হয়, প্রলয়ের পর পুনরাবির্ভাব পর্য্যন্ত উহার কিছুই হয় না। সুতরাং প্রলয় ও পুনঃ সৃষ্টি অপেক্ষা মানবের পক্ষে সৃষ্টিকালই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইহলোকে ও পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া এবং সাধন ভজন দ্বারা তিনি যে ঐ সুদীর্ঘকালে (কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত) মোক্ষলাভ করিতে পারেন সে বিষয়ে সংশয়ের স্থান অত্যল্প। কারণ, প্রলয় হইতে পুনরায় পরকল্পে পূর্ব্বাবস্থায় মানবের জন্ম লাভ করিতে যে ধারণাতীত কালের প্রয়োজন হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার পর যদি কাহারও জীবন বহু কল্প ব্যাপিয়া হয়, তবে আর কোন কথাই থাকে না। অন্য কোন বিষয় (point) চিন্তা না করিলেও কেবল মাত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবনে জীবনে সাধনে এই অযথা বিলম্বের জন্যই বলা যাইতে পারে যে কল্পবাদ সত্য নহে।

আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবের অনন্ত উন্নতি বিধান এবং পরিশেষে পূর্ণামুক্তি। জড় জগৎ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সৃষ্ট। উহার নিজের কোনই উদ্দেশ্য নাই। সাংখ্যও জড়কে পরার্থ বলিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে জড় জগৎ এমন সুদৃঢ় ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে জীব সমূহের সৃষ্টির উদ্দেশ্য একই সৃষ্টিতে সম্পন্ন হইতে

পারে। বারংবার সৃষ্টি হইলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে অযথা অধার্য্য কাল বিলম্ব হইবে। সুতরাং সেই মত গ্রহণীয় নহে। আপত্তিকারী কি বলিতে চাহেন যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে একই সৃষ্টিতে তাঁহার একটী মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া বিশ্বকে প্রস্তুত করা একেবারেই অসম্ভব ? তিনি এক, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক, সুতরাং সৃষ্টিও এক বই বহু নহে।

এখন আমাদিগের দিক্ থেকে চিন্তা করিতে পারা যায় যে সর্ব্ব-শক্তিমান জগদীশ্বর যখন ইচ্ছা করিলেই এই সৃষ্টিতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন, তখন তিনি কেন অনন্ত সংখ্যক সৃষ্টি ও অনন্ত সংখ্যক মহাপ্রলয় কার্য্যে অনন্ত প্রায় কাল অযথা ব্যয় করিবেন ? ব্রহ্ম সম্বন্ধে অবশ্যই কালের প্রশ্ন আসে না, কিন্তু আমরা যদি আমাদের ভাবে এই প্রশ্নের বিচার করিতে যাই, তবে বলিতে হইবে যে এরূপ কল্প কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ইহা দ্বারা জীবের উদ্ধারকার্য্যে অযথা ধারণাতীত কাল ব্যয়িত হয়, যাহা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর এড়াইতে পারিতেন।

কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবীতে যেমন ঋতু, পরিবর্ত্তন দ্বারা বৎসর ঘুরিয়া আসে, অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত যেমন পর পর আসিতেছে, কখনই উহার বিশ্রাম নাই, সেইরূপ বিশ্ব কল্পের পর কল্প অনাদি কাল হইতে আসিতেছে ও যাই-তেছে এবং এইরূপ ভাবে অনন্ত কাল চলিবে। উহাদেরও বিরাম নাই। সুতরাং কল্পবাদ সত্য। ইহার উত্তরে প্রথমেই আমাদের বক্তব্য এই যে উপমা যুক্তি নহে। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া উপমা প্রদর্শন করিলে সেই সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসুর হৃদয়ঙ্গম হয়, এই মাত্র। নতুবা একমাত্র উপমার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে যে এই উপমাটী সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই ইহার বহু ত্রুটী লক্ষিত হইবে। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া ঋতু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর এই আবর্ত্তনে ঋতু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। একথা সত্য নহে যে কোন এক ঋতুতে পৃথিবী মৃত অবস্থায় উপনীত হয়, আবার সেই ঋতুর অবসানে উহা পুনর্জীবন লাভ করে। পাঠক হয়তঃ বলিবেন যে শীত ঋতুই সেইরূপ একটী ঋতু। পাঠক যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে বাস্তবিক পক্ষে তাহা সত্য নহে। শীত-কালে যেমন কোন কোন স্থানে কোন কোন ফুল ফল হয় না, সেইরূপ সেই সেই স্থলে অন্য বহু প্রকারের ফুল ফল জন্মে। এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শীতকালেও বঙ্গদেশে খাদ্যসামগ্রী যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এমন আর কোন কালেই হয় না। রবি-শস্য সকলই শীতকালেই উৎপন্ন হয়। কোনও প্রকারের ধান্যও জন্মে। বঙ্গদেশে শীতকালে আম্র হয় না বটে, কিন্তু ঐ সময় মাদ্রাজে আম্র উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়। সুতরাং এক দেশেরই বিভিন্ন স্থানে একই সময় বিভিন্ন অবস্থা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর একস্থলে যে অবস্থা সংঘটিত হয়, অন্য স্থলে তাহা হয় না। আবার ঋতুও নানাস্থানে নানা মাসে আগমন করে। বঙ্গদেশে চৈত্রমাসকে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভ কাল বলা যাইতে পারে, কিন্তু এমন বহুস্থান আছে, যেখানে তখনও শীত রাজত্ব করিতেছে। সর্ব্বোপরি সমষ্টি ভাবে পৃথিবীকে দেখিতে গেলে উহাতে সর্ব্বকালেই সর্ব্ব ঋতু বিরাজ করিতেছে। আবার এই ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর কোনই ক্ষয় বা লয় হয় না। পৃথিবী এক রূপই আছে। সুতরাং আপত্তিকারীর উপমা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারিনা যে কল্পবাদ সত্য। বরং নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বয় দ্বারা উহার বিপরীতই যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীতে বহু জাতীয় জন্তু আসিয়াছে, আবার উহাদের মধ্যে কোন কোন জাতীয় জন্তু পৃথিবী হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পুনরায় উহাদের উৎপত্তি হয় নাই। জগতে যখন যাহার প্রয়োজন নাই, তখন তাহার বিলোপ হইবে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার

করেন। এই লয় কার্য্য মঙ্গলময় জগদীশ্বরের জিহীর্ষা দ্বারাই সম্পন্ন হয়। জিহীর্ষা তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা শক্তির একটী প্রকার ভেদ মাত্র। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই অনুমান করিতে পারি যে এমন এক সময় আসিবে, যখন মঙ্গলময় জগদীশ্বর সমুদায় জড় জগৎকে জিহীর্ষা দ্বারা লয় করিবেন উহার আর পুনরুত্থান হইবে না। অর্থাৎ যখন সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য বিশ্বস্থ সকল জীবদিগের জীবনে জীবনে সংসাধিত হইতে থাকিবে, তখনই মহাপ্রলয় কাল আরম্ভ হইবে। কারণ, তখন জড় জগতের কার্য্য সমাপ্ত হইতে চলিবে, উহার অস্তিত্বের আর কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। এ স্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সৃষ্টির প্রথম শুভ মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আসিতে যেমন অপরিমেয় কাল ব্যয়িত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপ্রলয়ের সূচনা হইতে শেষ শুভ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ধারণাতীত কালের প্রয়োজন হইবে। সৃষ্টিও যেমন এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হয় নাই, মহাপ্রলয়ও সেইরূপ এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইবে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য তিনই যে ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। মানবের যে দেহের মৃত্যু হয়, উহার আর পুনরুত্থান হয় না। সেইরূপ জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দেহ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে আর পৃথিবীতে উহাদিগকে পাওয়া যায় না। নদীর মৃত্যু হইলে অর্থাৎ শুকাইয়া গেলেও তাহাই ঘটে। পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, উহাদের জীবন অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী। সেইরূপ মণ্ডল সম্বন্ধেও কিছু বলা যাইতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে সূর্য্যমণ্ডল অল্প পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে এবং সুদূর ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্ব লোপ হইবে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে মণ্ডল সমূহও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কিন্তু বিশ্বে সেই সেই মণ্ডল ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে জাগতিক কোনও বস্তু একবার লয় হইলে পুনরায় সেইভাবে আসে না। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে বিশ্ব একবার লয় হইলে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না।

এখন আপত্তিকারী এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে ঋতুর যে আবর্ত্তন হইতেছে, ইহাত সত্য, উহা দ্বারা পৃথিবীর ক্ষয় বা লয় হউক্ বা না হউক্। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ইহা সত্য যে ঋতুর আবর্ত্তন আছে। ইহাও সত্য যে বহু পদার্থ ঘুরিতেছে। ঘড়ির কাটা ঘোরে, গাড়ীর চাকা ঘোরে, পৃথিবী ঘোরে. গ্রহ উপগ্রহ ঘোরে, সূর্য্য ঘোরে। বিশ্বও ঘোরে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন। ধরিয়া নেওয়া যাউক যে সমস্ত বিশ্বই ঘুরিতেছে। এই আবর্ত্তন জড়ীয় আকর্ষণ দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টির উত্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ। কোনও রূপ জড়ীয় আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা উহা সম্ভব হয় না। কারণ, জড় বলিয়া কোন পদার্থ কল্পান্তে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই একমাত্র উঁহার নিজ মহিমায় তখন বর্ত্তমান থাকেন। উঁহাতে জড়ের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সুতরাং একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছার জন্যই পুনঃ সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব আমরা পরমপিতার ইচ্ছাতেই অবশেষে উপস্থিত হইলাম। যদি তাহাই হয়, তবে কেন আমরা বলিতে পারিব না যে তিনি তাঁহার অসীম শক্তি সম্পন্না জ্ঞানপ্রেমময়ী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বিশ্বকে এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে এক সৃষ্টিতেই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। অনন্ত কল্পের বিধান যাঁহার ইচ্ছায় হইতে পারে, তাঁহারই ইচ্ছায়ই একই সৃষ্টিতেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহাকে কোন প্রকারেই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে. কিন্তু ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে অন্য মত এই যে পৃথিবীএবং গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সেইরূপ সূর্য্যও উহার গ্রহ উপগ্রহগণ সহ অন্য সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমরা অবশেষে এমন এক সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইব যে উহা আর ঘোরে না। কিন্তু সমস্ত বিশ্ব উহাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। এতএব

আমরা এমন একটী মণ্ডলে উপস্থিত হইলাম, যাহা আর ঘোরে না। হিন্দু শাস্ত্র বিশ্বকে সসীম বলেন। আমরাও তাহাই বলি। বিজ্ঞানও যে সেই বিষয়ে একমত, তাহা পূর্ব্ব অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই আবর্ত্তন এক স্থানে শেষ হইয়াছে এবং উহাই সেই মহা-সূর্য্য। সুতরাং সমগ্র বিশ্ব ঘুরিতেছে ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অতএব আবর্ত্তন যখন একস্থানে শেষ হইয়াছে, সৃষ্টিও যে মহাপ্রলয়ে শেষ হইবে, ইহাও অনুমান করা যায়। সমগ্র বিশ্ব ঘোরে এবং ঘোরে না এই উভয় ভাবেই চিন্তা করিয়া দেখা গেল যে কল্পবাদ অপেক্ষা এক-সৃষ্টি বাদের পক্ষ অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

অপর দিকে যদি আমরা চিন্তা করি যে ব্রহ্ম এক, যে গুণ জন্য সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রেমগুণ), তাহা এক, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এক, ব্রহ্মের যে স্বরূপ হইতে জগতের উৎপত্তি, সেই অব্যক্ত স্বরূপ এক, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক, বিশ্ব এক, তবে আমাদের যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে হইবে যে সৃষ্টিও একটী মাত্রই, কখনই বহু নহে।

আরও একটী বিষয় আমরা কল্পবাদ সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারি। কথিত আছে যে সৃষ্টিতে পূর্ব্বকল্পে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, পর কল্পেও তাহারা সেই সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইবার পূর্ব্বেই সৃষ্টি হঠাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই মতে সৃষ্টির অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল মন্ত্র যে ক্রম প্রণালী, তাহা বর্জ্জিত হইয়াছে। হঠাৎ সৃষ্টি হয় নাই এবং হঠাৎ ইহার লয়ও হইবে না। আবার জীবের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা ধ্বংস হইবে কেন? সাধক প্রথমতঃ পরম পিতার দয়ায় তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন, কিন্তু তাহাতেও পরে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি অনন্ত অতল প্রেমজলধিতে নিত্য সুবি-নিমগ্ন হইয়া থাকিতেই চাহেন। তাঁহার আরও আত্মোন্নতিতে অনন্ত কৃপাময়ের একান্ত অমোঘ আশীর্ব্বাদে তিনি পরম প্রেমময় পিতাকে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করেন। এই অবস্থার উন্নতিতে তিনি আরও গভীরতর প্রেমে ডুবিতে থাকেন। ইহা হইতেও আরও কত উন্নততর

অবস্থা যে জীব লাভ করিতে পারে, তাহা আমরা শুনি নাই। সুতরাং জীবের অন্ততঃ উপরোক্ত অবস্থা লাভের পূর্ব্বে লয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তাহার পূর্ব্বেত তাহার জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। যদি বলা যায় যে জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া বাস করে ও পরকল্পে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বিনা সাধনায় ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "নির্ব্বাণ", "লয়", "সোঽহংজ্ঞান" প্রভৃতি কোন কোন শাস্ত্রোক্ত উন্নতির শেষ সীমা জীবগণ সৃষ্টির ধ্বংসকালীন প্রাপ্তই হইলেন। তবে কি প্রকারে সেই সকল মুক্ত জীবগণ পূর্ব্বাবস্থায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন? অর্থাৎ একবার পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলে জীবগণ পুনরায় তাঁহা হইতে পূর্ব্ব সৃষ্টির দুরবস্থাসহ কি প্রকারে বহির্গত হইবেন? এক কল্পের লয়ে এবং পরকল্পের আরম্ভে যে ধারণাতীত কালের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই সমস্ত কালেইত জীবগণ পরম পিতাতে একান্তভাবে লয় প্রাপ্তই থাকেন, অর্থাৎ সেই সুদীর্ঘকালে তাহাদের এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোনই ভেদ থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাহাদের ত তখন মায়া মোহ প্রভৃতির বাধকতাও থাকে না বা থাকিতেও পারে না। কারণ, তখন তাঁহারা ত্রিবিধ গুণের আধার ত্রিবিধ জড়ীয় দেহ (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কারণ, পঞ্চভূতও তখন নাই। অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমে তাহারা পূর্ণামুক্তিই লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত জীবগণ যে সম্পূর্ণরূপে মুক্তই হইবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এস্থলে কল্পবাদ বিশ্বাসিগণ আপত্তি করিতে পারেন যে কল্পান্তে জীবগণের ব্রহ্মে লয় হয় না, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে এবং পৃথক ভাবে অবস্থান করেন মাত্র এবং কল্পারম্ভে তাঁহাদের পূর্ব্ব সৃষ্টির অবস্থায় পুনরাবির্ভূত হইতে হয়। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব যে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষ হইলে পঞ্চভূতও অব্যক্তে লীন হয়। সুতরাং ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষই কল্পান্ত।

জীবের অর্থ আত্মা + দেহ। আত্মা এবং দেহ ভিন্ন (আত্মা অধিবাসী এবং দেহ অধিবাস স্থান) জীব আর কিছুই নহে। এই জীবাত্মা এবং অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক, কিন্তু কখনই পৃথক নহেন। কিন্তু জীবাত্মা জড়দেহ যোগে পৃথক্ ভাবে ভাসমান মাত্র।* ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহারাও সেই তত্ত্বই প্রমাণ করে। দেহ তিন প্রকার। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিন প্রকার দেহই জড় নির্ম্মিত সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক। সুতরাং কল্পান্তে যখন পঞ্চভূতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিবে, তখন কোন প্রকার জীব দেহের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং জীব সমূহও সম্পূর্ণরূপে দেহ মুক্ত। সুতরাং কল্পান্তে জীবের বাকী থাকিল আত্মা মাত্র। সুতরাং কল্পান্তে ত্রিবিধ দেহের বিগমে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া এক হইতে বাধ্য। কোন প্রকারের পার্থক্য তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। কারণ, দেহই পার্থক্যের কারণ, কিন্তু উহা তখন নাই। অতএব জীবগণের সূক্ষ্মভাবে এবং পৃথক ভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতি এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব সৃষ্টির অবস্থায় পুনরাবির্ভাব একান্তই অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রুতি মন্ত্র সমূহ বিশেষতঃ ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়োপনিষদের মন্ত্র সমূহ পাঠ করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। সুতরাং কল্পান্তে ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে জীব ও জগৎ কিছুই থাকিতে পারে না। ইহা নিছক কল্পনা মাত্র।

প্রোক্ত আপত্তি সম্বন্ধে অন্যভাবে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ সর্ব্বপ্রকার দেহই জড় নির্ম্মিত সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক। কারণ দেহই সূক্ষ্মতম দেহ। আবার জীবাত্মা দেহবদ্ধতা ভিন্ন কখনও থাকিতে পারেন না। আত্মা যখন

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত অংশ চতুষ্টয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। (১) আত্মা ও জড়ের মিলন (২) জড়ের বাধকত্বের কারণ (৩) গঠন বিধান ও ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী।

ত্রিবিধ দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন আর তাঁহাতে জীব-ভাবের লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না। কারণ, আত্মার দেহবাসই জীবভাবের একমাত্র কারণ। সুতরাং ত্রিবিধ দেহের বিগমে আর তাঁহাকে জীব আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। দেহ মাত্রই যখন জড় নির্ম্মিত এবং কল্পান্তে যখন জড়ের অস্তিত্বই থাকে না, তখন জীবগণ যদি ব্রহ্মে কল্পান্তে পৃথক্ ভাবে বাস করেন বলা হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা (জীবগণ) জড় নির্ম্মিত কারণ দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর দেহে তখন বাস করেন। অর্থাৎ প্রোক্ত সুদীর্ঘকাল যাবত তাঁহারা সূক্ষ্মতম জড় হইতেও সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত দেহে বাস করেন। আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে দেখিতে পাইব যে কারণ দেহেই জীবের উন্নতির পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমে জীব পূর্ণামুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যান। কারণ, পার্থক্যের চিহ্ন সর্ব্বপ্রকার দেহ হইতেই আত্মা তখন মুক্ত। উক্ত অংশে ইহাও আমরা দেখিতে পাইব যে জীব দেহ যত সূক্ষ্ম হইতে থাকিবে, জীবের উন্নতির বাধাও ক্রমশঃ সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং কারণ দেহ উন্নতির বিরুদ্ধে অল্পতমই বাধা প্রদান করিবে। শেষ কারণ দেহের বিগমেই জীব পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। সুতরাং কারণ দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত দেহ জীবের উন্নতির বিরুদ্ধে কোন বাধাই প্রদান করিবে না। সুতরাং জীব সমূহ চরম উন্নতি লাভ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন বা পূর্ণমোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এস্থলে ইহাও বলিতে পারা যায় যে জীবের পক্ষে শেষ কারণ দেহ ত্যাগ ও পূর্ণমোক্ষ যখন একই কথা, তখন কারণ দেহের বিগমে অন্য সূক্ষ্মতর দেহ ধারণের প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক্ পূর্ব্ব কথিত সূক্ষ্মতম দেহের কি উপাদান কি হইতে পারে ? পঞ্চভূত যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই উপাদান জড়ের উৎপাদক বই আর কিছুই হইতে পারে না। অব্যক্ত কি ? উহা ব্রহ্মের একটী নিত্য স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব

ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপ। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "অব্যক্ত স্বরূপ কি" অংশে আমরা দেখিতে পাইব। অতএব ব্রহ্মের একটী নিত্য এবং অবিকৃত স্বরূপ দ্বারাই জীবগণের দেহ যদি কল্পান্তে নির্ম্মিত হয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব (ক), তবে ত তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত একীভূতই হইলেন। কারণ, ব্রহ্মের নিত্য অবিকৃত স্বরূপ দ্বারা আবৃত হওয়াও যাহা, ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লয় হওয়াও তাহা। সেই অবস্থায় জীবগণ অবশ্যম্ভাবিরূপে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তই হইবেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়াই যাইবেন। তাঁহাদের আর তখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে? এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে বেদান্ত বা সাংখ্যদর্শন কেহই অব্যক্ত দ্বারা কোন প্রকারের দেহ প্রস্তুত হয় বা হইতে পারে, ইহা বলেন নাই। ইহাও বক্তব্য যে অব্যক্ত ব্রহ্মের একতম স্বরূপ না হইয়াই পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই ছিল না বা থাকিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মই সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মাণ্ড শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। বিশ্বের মূলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই বা থাকিতে পারে না।

যে অব্যক্ত স্বরূপের যোগে জড় জগৎ গঠিত, সেই অব্যক্ত স্বরূপেই উহা (জড় জগৎ) মিলিত হইবে।* কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাজনিত অব্যক্তে খোদিত কারুকার্য্য সমূহ অর্থাৎ জাগতিক নামরূপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন মৃত্তিকা দ্বারা পুরুষ মূর্ত্তি গঠন করিয়া যদি পুনরায় উহাকে মৃত্তিকায় পরিণমন করা যায়, তবে মূর্ত্তির মৃত্তিকা মৃত্তিকায় লয় হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকায় খোদিত কারুকার্য্য সমূহ অর্থাৎ

(ক) যদি এই অনুমান সত্য ধরিয়া নেওয়া যায় তবে ব্রহ্মকেও শরীরী বলা যায়। কিন্তু তিনি যে নিত্য অশরীরী, তাহা সর্ব্ববাদ সম্মত।

* অনন্ত অখণ্ড অব্যক্ত গুণ কখনও খণ্ডিত হয় নাই, কিন্তু বিচ্যুতভাবে ভাসমান হইয়াছে মাত্র। অব্যক্ত সম্বন্ধীয় অংশ সমূহ এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। "মিলিত হইবে" বলায় বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রলয়ান্তে সেইরূপ ভাসমানত্বের অবসান হইবে অর্থাৎ অব্যক্তের উপর যে কারুকার্য্য সংঘটিত হইয়া জাগতিক নাম রূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ধ্বংস হইবে।

মূর্ত্তির নামরূপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়, মৃত্তিকা ভিন্ন উহাতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং ইহাও চিন্তা করা যায় না যে অব্যক্তে অতি সূক্ষ্মরূপে জীবের সংস্কার রাশি সঞ্চিত থাকে। কারণ, অব্যক্তে যাহা কিছু যুক্ত হইয়াছিল, তাহা ত বিশ্ব লয়ের সহিত ধ্বংস প্রাপ্তই হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত অব্যক্ত স্বরূপ মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থাই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সৃষ্টিকালীন অব্যক্তের উপর খোদিত কারুকার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইবে। ইহার পরেও যদি কেহ বলিতে চাহেন যে জীবগণ অব্যক্তে পূর্ব্ব সৃষ্টির বিকৃতি সহ বাস করিবেন, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে ব্রহ্মও অব্যক্ত দ্বারা বিকৃত (affected) হইবেন। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তাহা আমরা সকলেই জানি। এস্থলে আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে জড়দেহেরই বিকৃতি, আত্মার কখনও বিকৃতি হয় না বা হইতেও পারে না। সুতরাং জড়দেহ বিবর্জ্জিত আত্মায় কোনওরূপ বিকৃতি বা সংস্কার লগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

আবারও আপত্তি হইতে পারে যে ইহা বুঝিতে পারা গেল যে মহা-প্রলয়ান্তে কোন জীবেরই ব্রহ্ম হইতে পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সকল জীবাত্মাই ব্রহ্মে লয় হইবেন বটে (ক) এবং জড় জগতের মূল অব্যক্ত স্বরূপ কারুকার্য্য বিবর্জ্জিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাও ত হইতে পারে যে পূর্ব্ব কল্পের জীবাত্মগণ ব্রহ্মেই পৃথক্ ভাবে না থাকিয়া তাঁহাতেই একীভূত ও লীন অবস্থায় থাকিবেন এবং কল্পারম্ভে ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় তাঁহারা পূর্ব্বকল্পের অবস্থায়ই পুনরাবির্ভূত হইবেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আপত্তিকারী বলিতেছেন যে জীবাত্মাগণ ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লয় হইবেন। যদি তাহাই হয়, তবে আবার কল্পারম্ভে তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থায় পুনরাবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি এই আপত্তি স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সাধনা

(ক) জীবাত্মার লয় বা ক্ষয় নাই। দেহেরই লয় হয়। শেষ কারণ দেহ য়ল হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিয় মিশিয়া যায়, যেমন ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায়। ইহাকেই জীবাত্মার ব্রহ্মে লয় বলা হইয়াছে।

দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত সাধকগণও পুনরাবির্ভূত হইয়া সংসার করিতে পারেন। কিন্তু আপত্তিকারীও বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন না। আর জীবাত্মাগণ ব্রহ্মে লয় হইলে ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন এক অখণ্ড ব্রহ্মই ছিলেন, মহাপ্রলয়ান্তে তিনি এক অখণ্ডই থাকিবেন। এই উক্তি দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে সৃষ্টিকালে তিনি এক অখণ্ড থাকেন না, বহু খণ্ডে খণ্ডিত হন। কিন্তু মহাপ্রলয়ান্তে সেই খণ্ড সমূহ আসিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবে এবং সেই জন্যই তিনি এক অখণ্ড পূর্ণ ব্রহ্মই হইবেন। যাহা হয়, তাহা এই যে তিনি নিত্যই এক অখণ্ড পূর্ণ ব্রহ্মই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, কিন্তু সৃষ্টিকালে তিনি নিজেকে নিজে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে তাঁহার অখণ্ডত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। মহাপ্রলয়ান্তে তাঁহার বহুভাবে ভাসমানত্বের অবসান হইবে মাত্র। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্বের কারণ জীবাত্মার দেহবদ্ধতা অর্থাৎ দেহযোগেই তিনি যেন পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন অর্থাৎ দেহই নামরূপের কারণ। আত্মার নামরূপ নাই। সুতরাং তিনি যখন ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্বের সম্পূর্ণরূপে বিলোপ হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে আর পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেহেতু তাঁহার পৃথকত্বের একমাত্র কারণ দেহরূপ নামরূপ তখন আর তাঁহাতে নাই।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অবস্থা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জাগতিক সর্ব্বাধিক উপমাই সর্ব্বদা অসম্পূর্ণ। মহাসমুদ্রে কোন একটী ক্ষুদ্র পাত্র (শিশি) নিমগ্ন অবস্থায় রাখা হউক। উহা যে জল ধারণ করিবে, তাহাকে শিশিস্থ জল বলা যাইতে পারে। উহারও একটী আকার আছে, সুতরাং সেই জল টুকুর বিশেষত্ব বা নামরূপ আছে। এখন কৌশল ক্রমে শিশিটীকে যদি চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়, তবে শিশিস্থ সমুদায় জল মহাসমুদ্রের জলের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হইবে।

এখন আমরা কোন প্রকারেই মহাসমুদ্রের মধ্যে সেই বিশেষ জলটুকু খুজিয়া পৃথক্ করিতে পারিব না। কারণ, উহা উহার পৃথক্ অস্তিত্ব ত্যাগ করিয়া করিয়া বারিধিনীরে একান্তভাবে মিলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশিই জীবদেহ স্থানীয় এবং তন্মধ্যস্থ জলটুকু জীবাত্মা স্থানীয়। যখন জলটুকু শিশিতে অবস্থিত, তখন উহাকে বিশেষ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সেইরূপ আত্মা যখন দেহে বাস করেন, তখন তাঁহারও বিশেষত্ব (বাস্তবে) থাকে এবং সেই জন্যই তাঁহাকে জীবাত্মা বলা হয়। অর্থাৎ তিনি যেন পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ (ক)। পাত্রটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইলে যখন সেই জলটুকু সমুদ্র জলে মিলিয়া যায়, তখন উহাকে আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ আত্মা যখন ত্রিবিধ জড় দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তিনি ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যান এবং তখন আর তাঁহার কোনই বিশেষত্ব বা নামরূপ থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আর পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায় না, তিনি তখন পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে মিলিয়া মিশিয়া যান।

আবারও আপত্তি হইতে পারে যে মহাসমুদ্রে পাত্রস্থিত জলটুকুর অনুসরণ করিতে থাকিলে উহাকে পুনরায় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বকল্পের জীবাত্মাও সেইরূপ ভাবে ব্রহ্মের ইচ্ছায় পুনরাবির্ভূত হইতে পারেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ ভাবে শিশিস্থ জলটুকু পুনরায় সংগ্রহ করা কেবল মাত্র কল্পনা দ্বারা অসম্ভব না হইলেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু আত্মার পক্ষে ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, পরন্তু উহা একান্ত অসম্ভব। মহাসমুদ্রের জল পৃথক্ করা যায় বটে, কিন্তু আত্মা বিন্দু বিন্দু ভাবে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। কারণ, আত্মা নিত্যই এক ও অখণ্ড। আত্মা আমাদের ধারণীয় বিন্দুতেও অনন্ত এবং অনন্তেও নিত্য অনন্ত, অথবা আত্মা সম্বন্ধে বিন্দু শব্দ কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না। আমাদের মনে

(ক) ইহার বিস্তারিত বিবরণ "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে আমরা দেখিতে পাইব।

রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই অর্থাৎ ব্রহ্মই নিজেকে অখণ্ড রাখিয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন (ক)। আত্মার অংশ হইতে পারে না, দেহযোগে অংশ ভাবে ভাসমান হইতে পারেন মাত্র, যেমন সমুদ্র বহু তরঙ্গভাবে ভাসসান হয়। সুতরাং শেষ দেহ মুক্ত হইলে জীবাত্মার পার্থক্য সূচক কোন চিহ্নই থাকে না। তাঁহার সমস্ত বিশেষত্বই - নামরূপ—সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। আবার আমরা যদি ঘটাকাশ ও মহাকাশের সম্বন্ধে চিন্তা করি. তবে প্রোক্ত আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে না। আকাশ এক ও অখণ্ড। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ জীবাত্মা স্থানীয় এবং মহাকাশ পরমাত্মা স্থানীয়। ঘট ভাঙ্গিলে ঘটস্থ আকাশ মহাকাশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যায়। উহার কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না বা থাকিতেও পারে না। সেই-রূপ জীবের ঘটরূপ দেহ নিঃশেষে শেষ হইলে অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমে আত্মা আত্মার সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন. অর্থাৎ পৃথক্ ভাসমানত্ব আর থাকে না।

এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে ইহা যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় যে পূর্ব্বকল্পের জীবাত্মাগণ প্রলয়ান্তে ব্রহ্মে একীভূত হইয়াই থাকেন এবং পরকল্পে তাঁহারই ইচ্ছায় পুনরাবির্ভূত হন, তবে তাঁহাদের পূর্ব্বকল্পার্জ্জিত সংস্কার রাশি সহ. পাপ পুণ্য সহ কি প্রকারে তাঁহারা পূর্ব্বাবস্থায় পুনরাবির্ভূত হইবেন? তাঁহারাত সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে জন্মগ্রহণ করিবেন। কারণ তাঁহারা ত ব্রহ্মের সহিত একীভূত অবস্থায়ই ছিলেন, ব্রহ্ম ও তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য বা পার্থক্য সূচক চিহ্নও ছিল না। সুতরাং এইভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

আবারও যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় যে জীবগণ কল্পান্তে ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে এবং পৃথকভাবে অবস্থিত থাকেন, তবে কি

(ক) ইহার বিস্তৃত বিবরণ "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে আমরা দেখিতে পাইব।

বলিতে পারা যায় না যে একান্ত মুক্ত অবস্থায় * অতি সুদীর্ঘকাল একমাত্র ব্রহ্মেই বাস করিলেও কি তাঁহাদের পূর্ব্বকল্পের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না? তাঁহারা কি কাল মুখ নিয়া ব্রহ্মে লয় হইবেন এবং সেই একই কাল মুখ নিয়াই পুনরায় তাঁহার হইতে ফিরিয়া আসিবেন? অতি সুদীর্ঘকাল পূর্ণমুক্তভাবে ব্রহ্মে বাসও কি তাঁহাদের মলিনতা, দুঃখ দুর্দ্দশা নাশ করিতে সমর্থ হইবে না? পাঠক স্বতঃই বলিবেন যে ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব (ক)।

সাংখ্য দর্শনানুযায়ী প্রকৃতির অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। সৃষ্টির প্রারম্ভে একটী গুণ প্রবল হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে অসমতা উপস্থিত হয়, তাই সৃষ্টির সূচনা। সাংখ্য বলেন যে ঐরূপ হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। বৈদান্তিক বলেন যে তাহা যদি প্রকৃতির স্বভাবই হইত, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই স্বভাব কোথায় থাকে? বৈদান্তিক মতে কল্পবাদের বিরুদ্ধে কি সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না? সৃষ্টির যাবতীয় কার্য্য যদি ব্রহ্মের স্বভাববশতঃই হইত, তবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য নিত্যই হইতে থাকিত, কখনও ইহার বিরাম থাকিত না, কল্পান্ত ও কল্পারম্ভ বলিয়া কিছুই থাকিত না। সর্ব্বদাই অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত একই সময় (Simultaneously) সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনই সমানভাবে চলিতে থাকিত। কিন্তু তাহা যে হইতেছে না, তাহা আমরা শ্রুতি মন্ত্রসমূহ হইতেই বুঝিতে পারি। কল্পবাদের সমর্থনকারিগণও কল্পারম্ভ ও কল্পান্ত স্বীকার

* "একান্ত মুক্ত অবস্থায়" বলার তাৎপর্য্য এই যে বৈদান্তিক ও সাংখ্যবাদিগণ সর্ব্ব প্রকার জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্তিকেই পূর্ণামুক্তি বলেন, তখন জীবাত্মার রিপু, পাশ, সংস্কার প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ, উহারা সকলেই দেহজাত। দেহের সম্পূর্ণ লয়ের সহিত উহাদেরও লয় অবশ্যম্ভাবী।

(ক) ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস। সাধুর সঙ্গেই বাসই স্বর্গবাসের কারণ হয়, তবে সমস্ত সাধুত্বের আধারই ব্রহ্মের সহিত একত্রে ধারণাতীত কাল বাস করিলেও কি জীবের পাপ, দোষ, পাশ, সম্পূর্ণরূপে ক্ষালিত হইবেন না? সাধুগণের সহিত সহবাসে জীবনের পরিবর্ত্তন ও উর্দ্ধগতি হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

করেন। সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য যে অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিবে না, ইহা বুঝিতে পারা গেল। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, কিন্তু উহারা তাঁহারই ইচ্ছাজনিত। ইহার বিপরীত ভাবে চিন্তা করিতে গেলেই সাংখ্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সম্পর্কে "লীলাতত্ত্ব" অংশে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাকৃত। সৃষ্টিতে কল্পের পর কল্প আসিতেছে ও যাইতেছে, উহাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় যত কিছু কার্য্য, তাহাও ব্রহ্মের স্বভাবজাত বলাও যাহা, তাঁহাকে একটী অচেতন পদার্থ মাত্রও বলা তাহা। অনন্ত স্বাধীন এবং অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে ঐরূপ জড়বৎ কার্য্য করা কতদূর সম্ভব, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ইতিপূর্ব্বেও বহু যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাজনিত। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলেন ঃ "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্।" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব কেবলই ব্রহ্মই। যদি কল্পবাদ স্বীকার করা যায়, তবে জগৎকে কি প্রকারে সম্পূর্ণ-রূপে মিথ্যা বলা যায়? কল্পবাদে জড় জগৎ অনাদি ও অনন্ত সুতরাং নিত্য সত্য। কল্পান্তেও জগৎ সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে বলিয়া কথিত হয়। অদ্বৈতবাদী অবশ্যই বলিবেন যে জড় জগতের পরিবর্ত্তন আছে, সুতরাং উহা সত্য নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জড় পদার্থের পরিবর্ত্তন আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেইরূপ উক্তমতে জড় জগতেরও পরিবর্ত্তন আছে অর্থাৎ উহার লয় এবং পুনঃ সৃষ্টি আছে। দেখা যায় যে জড়ের নিরন্বয় ধ্বংস নাই, উহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, জড় জড়ই থাকে। সমগ্র জড় সম্বন্ধে মানব কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্র বলেন যে কল্পান্তে যে প্রলয় হয়, তাহাতে বিশ্ব ধ্বংস হইলেও মহাভূত সমূহ থাকিয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মার

আয়ুঃশেষ হইলে যে মহাপ্রলয় হয়, তাহাতে পঞ্চভূতও অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয় এবং ইহাও বলেন যে সৃষ্টি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও যেরূপ থাকে, পরপর কল্পেও সেইরূপ ভাবে পুনরায় ব্যক্ত হয়। সুতরাং উক্ত জগতের নিরন্বয় ধ্বংস-হয় না। লয় অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র। ব্যক্ত ছিল, অব্যক্তে লয় হইল অর্থাৎ অব্যক্তই হইল অর্থাৎ জড় পদার্থের ও জড় জগতের লয় একই প্রকারের। কেবল আকারের পরিবর্ত্তনের পরিমাণের অল্লাধিক মাত্র। সুতরাং যে পদার্থ অনাদি ও অনন্ত এবং যাহার ধ্বংস নাই, কেবল অবস্থা পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই উহাকে অসত্য বলা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। অতএব অদ্বৈতবাদীর পক্ষে কল্পবাদ স্বীকার করা কতদূর সঙ্গত, তাহাও চিন্তয়িতব্য। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য দর্শন অথবা অন্য কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র কল্পবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

উপরোক্ত বিষয় সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কল্পবাদ সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহা অদৃষ্টবাদ মীমাংসার জন্যই কল্পনা বিশেষ, যদিও উহার শেষ মীমাংসায় হিন্দুশাস্ত্র উপনীত হইতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় যে সাংখ্যবাদিগণ প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসার জন্য ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য দর্শন উহা সেই কর্ম্মবাদ মীমাংসার জন্য স্বীকার করিয়াছেন।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ইতিপূর্ব্বে লিখিত অংশ চতুষ্টয় অর্থাৎ "সৃষ্টির সূচনা", "লীলাতত্ত্ব", "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" এবং "কল্পবাদ" প্রায় একই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। যথা - ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত অথবা স্বভাবজাত, সাদি কি অনাদি, এক সৃষ্টি অথবা অনন্ত সৃষ্টি, উহা কি লীলার্থ সংঘটিত অথবা ব্রহ্মের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং উক্ত অংশ চতুষ্টয় অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। উক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে পাঠকের কোনও প্রশ্নের উদয় হইলে পূর্ব্ব লিখিত সমস্ত আলোচনায় তাহার উত্তর পাইবেন।

এখন আমরা অতি সংক্ষেপে সৃষ্টির বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ওঁং অনাদিমাদিমনন্তমন্তকং ওঁং

ওঁং

ত্বং সৃষ্টিহেতু স্ত্বমনন্ত-সদ্‌গুণ
স্ত্বং সৃষ্টিরূপশ্চ বিমুক্তি কারণম্।
ত্রাতা বিনাশী ত্বমনন্ত রূপক
স্ত্রায়স্ব দাসং স্বকমাশু তারক ॥ (পরমর্ষি গুরুনাথ)

—(০)—

সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ)।

আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা। তাঁহার সৃষ্টি বিষয়িনী বিশেষ ইচ্ছাই তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের সহায় স্বরূপা প্রকৃতি স্থানীয়া হইয়াছেন। * উক্তা ইচ্ছাশক্তি ক্ষণকালের জন্য উৎপন্ন হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু উহা চিরস্থায়িনী। এই বিশেষ ইচ্ছা ত্রিবিধা। যথা—সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা এবং জিহীর্ষা। অর্থাৎ সেই বিশেষ ইচ্ছাই, তিন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সিসৃক্ষা দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য, রিরক্ষিষা দ্বারা পালন কার্য্য এবং জিহীর্ষা দ্বারা লয় কার্য্য সাধিত হয়। জড়ের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা সঞ্জাত এবং প্রোক্ত ত্রিবিধ ইচ্ছার সহিত যুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িনী প্রেমময়ী ইচ্ছায় জড় এরূপভাবে

---

*ব্রহ্মের ইচ্ছাকে প্রকৃতি বলায় কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে উক্তা ইচ্ছা ব্রহ্ম হইতে পৃথক কৃতা প্রকৃতি রূপা (স্ত্রী রূপা) কোন কিছু। ইচ্ছা ইচ্ছাই এবং তাহা সমগ্র ভাবে একমাত্র ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র। উহা একমাত্র তাঁহারই সম্পূর্ণরূপে অধীন ও তাঁহাতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। সৃষ্টি কার্য্যে আমরা সর্ব্বদা দুই জনকে পাই। যথা পুরুষ ও প্রকৃতি। তাই আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্রহ্মের ইচ্ছাকে রূপক ভাবে প্রকৃতি বলা হইয়াছে মাত্র। হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রেও পুরুষ ও প্রকৃতিকে নানা ভাষায় প্র করা হইয়াছে।

গঠিত হইয়াছে যে তাহাতে উহা (জড়) ত্রিবিধ অবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ত্রিগুণ সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উহারা (ত্রিগুণ) সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করে। সাংখ্যদর্শনে ত্রিবিধ গুণ দ্বারা প্রকৃতি (প্রধান) গঠিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্না (ক)। মায়াবাদিগণ মায়াকে প্রকৃতির আসনে স্থাপন করিয়াছেন এবং উহাকে ত্রিগুণ সম্পন্না বলেন। সুতরাং এই তিনটী গুণ যে জড়ের গুণ বা ধর্ম্ম মাত্র; সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। উহারা কখনই ব্রহ্মের গুণ নহে। তাঁহার ইচ্ছা লীলার্থ ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদনার্থ জড়কে যে যেভাবে গঠন করিয়াছেন, জড়ের সেই সকল অবস্থাকে এক একটী গুণ নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের একমাত্র ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে তিন প্রকার কার্য্যের উপযোগীভাবে উহাকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা ও জিহীর্ষা ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়িনী ইচ্ছার প্রকার ভেদ মাত্র। উহারা সৃষ্টিবিষয়িনী ইচ্ছা বই আর কিছুই নহে। আবার আমরা যদি আরও বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা দেখিতে পাই যে উক্তা ত্রিবিধা ইচ্ছা ব্রহ্মের বিবংহয়িষা বা স্বগুণ-পরীচিক্ষিষার প্রকার ভেদ মাত্র। আবার বিবংহয়িষা বা স্বগুণ পরীচিক্ষিষা ব্রহ্মের নিত্যা অনন্ত ইচ্ছাশক্তির এক একটী প্রকার মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই নিত্য সত্য আর আমরা অন্য যাহা কিছু ভাষা দ্বারা প্রকাশ করি, তাহা

(ক) "ত্রিগুণ মবিবেকী বিষয়ঃ সামান্য মচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্ বিপরীতস্তথাচ পুমান্ ॥" (সাংখ্যকারিকা ১১)
বঙ্গানুবাদ ঃ—ত্রিগুণ অবিবেকী বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মি ব্যক্তের সদৃশ প্রধান; পুরুষ তাহার বিপরীত ও অসদৃশ। (দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী)। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। (গীতা—১৪।৫)। বঙ্গানুবাদ ঃ -সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ। (গৌর গোবিন্দ রায়)।

সেই ইচ্ছাশক্তিকে বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রিরক্ষিষা দ্বারা জড়ে সত্ত্বগুণ, সিসৃক্ষা দ্বারা জড়ে রজোগুণ এবং জিহীর্ষা দ্বারা জড়ে তমোগুণ সঞ্জাত। এই সকল গুণ পাঞ্চভৌতিক গুণের সহিত সর্ব্বদাই যুক্ত অথবা অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে যে উহারা জড়েরই গুণ। এই সম্পর্কে পাঠক "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত নির্ঘণ্ট পত্র Table) দেখিবেন। ঐ বিষয় চিন্তা করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তমোগুণ প্রধানতঃ ক্ষিতি ও অপের, রজোগুণ প্রধানতঃ তেজঃ ও মরুতের এবং সত্ত্বগুণ প্রধানতঃ ব্যোম পদার্থের ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন যে ব্রহ্মের ইচ্ছা ত্রিগুণ সম্পন্না। ইহার অর্থই এইযে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ভাব ত্রয় বর্ত্তমান, অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ব্রহ্মের প্রেমময়ী সৃষ্টি বিষয়িনী বিশেষ ইচ্ছার মধ্যেই সৃজনাত্মক, পালনাত্মক এবং লয়াত্মক ভাবত্রয় বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই প্রকৃতিকে অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছাকে ত্রিগুণ-সম্পন্না বলা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি এবং ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইব যে সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা ও তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ। ব্রহ্ম সৃষ্টির বীজ স্বরূপ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই ইচ্ছা-শক্তিই অব্যক্ত স্বরূপের গুণ এবং শক্তিকে সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্যের সাধনোপযোগী করিয়া জড় জগৎ গঠন ও পরিচালনা করিতেছেন। সেইজন্য জড় জগতে বহু গুণের ও শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদিগকেই জড়ীয় গুণ ও শক্তি বলা হয়। কিন্তু উহাদের মূলে অব্যক্ত স্বরূপের গুণ, শক্তি ও ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি। সেইরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই জড় জগৎকে এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে তাহা দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য হইতেছে। সুতরাং জড়ের ধর্ম্ম বা গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই সকল গুণ কি প্রকারে আসিল, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই সৃজনাত্মক, পালনাত্মক ও লয়াত্মক ভাব

বর্ত্তমান। কারণ, লীলাকার্য্য সম্পাদনার্থ এই তিনেরই প্রয়োজন, তাই ইচ্ছাশক্তি সেইরূপ ভাবেই জগৎ গঠন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে "ইচ্ছাশক্তি" ও "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়টীকে আরও সরল ও সুস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছি। মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি মৃত্তিকায় জন্মে। মৃত্তিকাজাত ফল মূলাদি দ্বারা আমাদের পালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক অর্থে উহারাও ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্ত। মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত গৃহও স্থিতির কার্য্য করিতে পারে। আবার মৃত্তিকা দ্বারা এমন পদার্থ সৃষ্টি করা যায়, যাহা দ্বারা জীব হত্যা করা যায়। মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত সমাধি দেহকে লয় করে। দেখা গেল যে মৃত্তিকা ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং উহাতে ত্রিবিধ গুণই আছে। চিন্তা করিলে জীবদেহও ত্রিবিধ কার্য্য করিতেছে। এইরূপ ভাবে ত্রিবিধ জড় পদার্থই ত্রিবিধ ভাবে গঠিত। এই ত্রিবিধ অবস্থা বা গুণ প্রত্যেক পদার্থে আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ এক একটী পদার্থে এক একটী গুণ প্রধান ভাবে বর্ত্তমান থাকে। আমাদের খাদ্যের মধ্যেও ত্রিবিধ অবস্থা আছে। আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ যে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা সত্ত্ব প্রধান খাদ্য। কোন কোন উদ্ভিদ খাদ্য, যথা মুসুরি ডাইল এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি রজঃ প্রধান খাদ্য এবং পর্য্যুষিত অন্ন প্রভৃতি তমঃ প্রধান খাদ্য। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ত্রিবিধ গুণই বর্ত্তমান, কিন্তু এক একটী খাদ্যে এক একটী গুণ প্রধান ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপভাবে জগন্ময় সর্ব্ব পদার্থেই ত্রিবিধ অবস্থা বা ধর্ম্ম বর্ত্তমান বটে, কিন্তু এক একটীর মধ্যে এক একটী প্রধান।

কেহ বলিতে পারেন যে ব্রহ্মের ইচ্ছা হইল, অমনি জড় ত্রিগুণ সম্পন্ন হইয়া সৃষ্টি হইল। এই উক্তি কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহা অত্যন্ত সত্য যে ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই জড়ে উক্ত গুণত্রয় সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জগতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা তাঁহারই একমাত্র ইচ্ছা-য়ই যুক্তিযুক্ত প্রণালী সহযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে ও হইবে। এস্থলে

সেই প্রণালীই এই যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত গুণ হইতে তাঁহার সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এমন সুকৌশলে জড় জগৎ রচনা করিয়াছেন যে উহার দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই ত্রিবিধ কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়) জড়ের যে গুণ সমূহ সম্পাদন করে, তাহাদিগকেই আমরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বলি। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জড়েরই গুণ বা ধর্ম্ম এবং উহারা জড়ের রচনার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। জড়ে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা ব্রহ্মের ইচ্ছাযোগে অব্যক্ত স্বরূপের নানাবিধ রচনার ফল মাত্র।

সাংখ্য বলেন যে উক্ত গুণত্রয় প্রকৃতির উপাদান। আমরা ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়িনী ইচ্ছাকে রূপকভাবে প্রকৃতি বলিয়াছি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সেই সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছার মধ্যে আমরা পাই ত্রিবিধ ভাব অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করণেচ্ছা। সুতরাং সেই সুমহতী ইচ্ছা দ্বারা জড় জগৎ রচিত হওয়ায় উহাতে (জড়েও) সর্ব্বত্র উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। যদি কেহ বলেন যে তিনটী গুণ তিনটী দ্রব্যভাবে প্রকৃতির উপাদান, তবে সেই মত আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। এই সম্বন্ধে সাংখ্যমত বিচার কালে আলোচিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম জগতের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। ইহা এই গ্রন্থের নানাস্থলে নানাভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্য ব্রহ্মই স্বীকার করেন না, বহু পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ মাত্র স্বীকার করেন। সাংখ্য প্রকৃতি যে কেবল ব্রহ্মের সহিত নিঃসম্পর্কিতা তাহা নহে ; কিন্তু উহা সাংখ্য পুরুষ হইতেও পৃথক, স্বাধীন ও বিপরীত স্বভাব। সুতরাং উহা কল্পিত পদার্থ মাত্র, উহার বাস্তব কোন সত্ত্বা নাই।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সাংখ্য বেদের সার পরম বস্তু ব্রহ্মকেই স্বীকার করেন না। উপনিষদ্ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম হইতেই বহুর প্রকাশ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "অহং বহু স্যাং প্রজায়ে-

য়েতি” প্রভৃতি মন্ত্র সমূহ দ্রষ্টব্য। আবার বহু যে ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হইবে, উহাও সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। “যতো বা ইমানি ভূতানি” মন্ত্র সমূহ দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু থাকিতে পারে না, তাহা সহজবোধ্য। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর কল্পনা করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না, তিনি সসীম হইয়া পড়েন। সুতরাং সাংখ্যের ব্রহ্ম-ভিন্না প্রকৃতি তত্ত্বটীর মূলেই ভ্রান্তি নিহিত কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। সাংখ্যের বহু পুরুষবাদও যে ভ্রান্ত, তাহা আমরা সাংখ্যমত বিচার কালে দেখিতে পাইব। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে এই তত্ত্বও উপনিষদের মূল তত্ত্ব-বিরোধী। যাহা হউক, এই বিষয়ের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যদি জগতের উপাদানই না হইত, তবে সর্ব্বত্রই কেন তিনটী গুণ দেখা যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা “সৃষ্টির সূচনা” অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাতে যে ত্রিবিধ ভাব অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে। অতএব সেই ত্রিভাব সমন্বিতা ইচ্ছা দ্বারা যে জড় জগৎ রচিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই তিনটী ভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উহাদিগকেই আমরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলিয়া থাকি। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে এবং “ইচ্ছাশক্তি” অংশে আরও লিখিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য যে একই পদার্থকে আমরা ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়োপযোগী ভাবে গঠন করিতে পারি। সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপকে এমনভাবে জগতে পরিণত করিয়াছেন যে উহাতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহা এই গ্রন্থেও নানাস্থলে প্রমাণিত হইয়াছে।

আবারও আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকেই

মহাবীজ ভাবে জড় জগৎ সৃষ্টির জন্য গৃহীত হইয়াছে। ইহা যে ত্রিগুণ সম্পন্না নহেন, তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিতে পারা যাইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই সরল (Simple), কখনই মিশ্র (Compound) নহেন।* অব্যক্ত স্বরূপে যে আমরা দুইটী গুণ দেখিতে পাই, অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকরেত্ব, উঁহারা প্রত্যেকেই সরল গুণ। উঁহাদের কাহারও মধ্যে অন্য কোন গুণ থাকিতে পারে না। কারণ, ঐরূপ প্রত্যেক গুণ অমিশ্র। অতএব অনন্ত নিরাকারত্ব নিরাকারত্বই মাত্র এবং অনন্ত সাকারত্ব সাকারত্বই মাত্র, উহাদিগেতে অন্য কিছুই নাই। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের মধ্যে প্রত্যেকটীই স্বাধীন। কোন গুণই অন্য গুণরাশির অধীন নহেন। অবশ্য উঁহারা মিলিত ভাবেই কার্য্য করেন। বিপরীত গুণ হইলেও উঁহাদের মধ্যে আমাদের ধারণীয় কোনই বিরোধ নাই। এ বিষয়ে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই বা থাকিতে পারে না। এস্থলে আরও বলিতে পারা যায় যে সাংখ্য ত্রিগুণকে ব্রহ্ম-ভিন্না-প্রকৃতিরই উপাদান বলিয়াছেন, কখনই পুরুষের গুণ বলেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পুরুষ প্রধানের বিপরীত ও অসদৃশ। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই স্বরূপ, সুতরাং উঁহাতে ত্রিগুণ নাই বা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ উহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা গঠিত নহে অথবা উঁহার উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ নহে। "মায়া ত্রিগুণ-সম্পন্না" এই সিদ্ধান্ত যে সাংখ্য প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মায়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহাকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য প্রকৃতিও যেমন পুরুষ সংসর্গে সকলই করিতেছে, এমনকি পুরুষের বন্ধন ও মোচন করিতেছেন। সেইরূপ মায়াও স্বাধীনভাবে সকলই করিতেছে, এমনকি

---

* এস্থলে জ্ঞান, প্রেম, করুণা, ন্যায় প্রভৃতি অনন্ত গুণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকেও বন্ধন করিয়া সগুণ ব্রহ্ম এবং জীব সৃষ্টি কারিয়াছে। আবার শক্তি শক্তিই এবং শক্তি গুণ বিশেষের বা গুণ সমষ্টিরই। উহার নিজস্ব কোনই উপাদান নাই। মায়াবাদে মায়া কোন গুণের শক্তি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উহা স্বয়ং ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে যদি উপাদানই বলিতে হয়, তবে উহারা ব্রহ্মেরই উপাদান বলিতে হইবে এবং গুণ বলিলে ব্রহ্মেরই গুণ বলিতে হইবে। তাহা একেবারেই অসম্ভব। মায়াবাদীও তাহা স্বীকার করিবেন না। তিনিও ত্রিগুণকে মায়ার উপাদান বলেন না।

উক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ জড়েরই ধর্ম্ম বা গুণ, উহারা কখনই ব্রহ্মের গুণ নহে এবং জড়ের উপাদান ঐ সকল গুণ হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মের প্রেমলীলার উপযোগীভাবে তাঁহার অব্যক্ত গুণ হইতে তাঁহারই ইচ্ছায় জড় জগৎ রচিত হওয়ায় উক্ত গুণত্রয় জড়ে অবশ্যম্ভাবিরূপে তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইয়াছে। উহারা জড়ের রচনা কৌশলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ার্থ জগতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। জড়ের বহু বহু গুণ আছে যাহাদিগকে কিছুতেই ব্রহ্মের গুণ বলা যায় না। উহারাও যেমন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ জড় জগতের রচনা কৌশলে উৎপন্ন হইয়াছে. সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণও সেইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ত্রিগুণের প্রথম ও প্রধান বক্তা সাংখ্যকার। তিনিই যখন উহাকে জড়ের গুণ বলিয়াছেন, তখন উহাকে কিছুতেই ব্রহ্মের গুণ বলা চলে না।

পাঠক একটী বিষয় মনে রাখিলেই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল মীমাংসা লাভ করিতে পারিবেন। সেইটী পরব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়িনী প্রেমময়ী ইচ্ছা। এই ইচ্ছা দ্বারাই সমুদায় হইয়াছে। এই ইচ্ছার জন্য তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ জগৎ গঠনে নিজেকে দান করিয়াছেন। এই ইচ্ছার শক্তি অনন্ত অসীম। পাঠক বর্ত্তমান ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশদ্বয় পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পাঠক যদি আরও গভীরতর প্রদেশে গমন করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে সেই মহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছার মূলে ব্রহ্মের নিত্য ও অনন্ত প্রেম বর্ত্তমান অর্থাৎ সৃষ্টি

তাঁহার প্রেমলীলা। ত্রিগুণ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শন, গীতা ও পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। "সাংখ্যমত বিচার" অংশেও এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

ভূত সৃষ্টি

অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণাধার জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোমের উৎপত্তি হইল। সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছায় এই পঞ্চভূত মিলিত হইয়া জড় জগতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সকল জীবের শরীর উৎপাদন করে। মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা আছে। ব্যোম যদিও নেত্র গোচর নহে, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

"প্রথমে ক্লোরেট অব্ পটাস (Potassium chlorate) উত্তপ্ত করিয়া একপ্রকার বায়ু সংগ্রহ কর। উহাকে ইডরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা অম্লজান বা অক্সিজেন (Oxygen) বলেন। পরে ক্ষুদ্র এক খণ্ড পটেসিয়াম্ জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে জল হইতে একটী বায়ু উৎপন্ন হয়। উহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকরা জলজান বা হাইড্রোজেন (Hydrogen) বলিয়া থাকেন। এই উভয় বায়ু যথাক্রমে এক ও দুই আয়তন পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একটী দৃঢ় শুষ্ক কাচ পাত্র মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। এই পাত্রটী যে অগ্রে বায়ু শূন্য করিয়া রাখিতে হয়, ইহা বলা বাহুল্য। অনন্তর, উক্ত কাঁচ পাত্রের মুখ সংলগ্ন দুইটী প্লাটিনাম তার দ্বারা পাত্র মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (Electric spark) প্রবিষ্ট করিয়া দিলে, উল্লিখিত বায়ুদ্বয় পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয়। এই সংযোগ সময়ে প্রথমে শব্দোৎপত্তি হয়। অনন্তর, দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বায়ুদ্বয় তেজোরূপে পরিণত হইয়াছে। তৎপরে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত তেজঃ জলকণারূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব দেখ, বায়ু

হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জলের উৎপত্তি হইল। অনন্তর, উল্লিখিত রূপে সঞ্চিতজল লইয়া শৈত্য-সংযোগ করিলেই উহা বরফ আকারে পরিণত অর্থাৎ কঠিন আকার প্রাপ্ত হইয়া ভূমি (ক্ষিতি) শব্দ বাচ্য হয়। অতএব পঞ্চভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যে পরম সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।"

"অপর, প্রথমে শব্দ, তৎপরে দুঃসহ স্পর্শ, তৎপরে তেজঃ, তৎপরে রস (জল নিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম) ও সর্ব্বশেষে গন্ধ (ক্ষিতি নিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম)—এই সমস্ত দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে শব্দাধার আকাশ, তদুৎপন্ন স্পর্শাধার বায়ু, তজ্জাত রূপাধার তেজঃ, তদুদ্ভূত রসাধার অপ্ এবং তদুৎপন্ন গন্ধাধার ক্ষিতি যখন দৃষ্ট ও অনুমিত হইতেছে, তখন পাঞ্চভৌতিক মত যে সত্য, সত্য, পরম সত্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। (ক)

পাঞ্চভৌতিক মতের বিরুদ্ধে একটী প্রধান আপত্তি এই যে আকর্ষণ জড় মাত্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু উহা তেজে দৃষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তেজেও আকর্ষণী শক্তি আছে। প্রথমতঃ—একটী চুম্বক যদি একটী সাধারণ লৌহ খণ্ডের সহিত ঘর্ষণ করা যায়, তবে সেই লৌহ খণ্ডও চুম্বকত্ব অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহা সেই লৌহখণ্ডে ঘর্ষণ জন্য তেজের অভিব্যক্তি জন্য সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ লাক্ষা খণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কাগজ সংলগ্ন করিলে ঐ কাগজ লাক্ষায় অভিব্যক্ত তেজঃ প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। ইহাও তেজের আকর্ষণী শক্তি সংক্রান্ত উদাহরণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহাও লাক্ষাদ্বয়ে তেজের অভিব্যক্তিরই ফল বলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—AC Electric current যদি মনুষ্য দেহের সহিত যুক্ত হয়, তবে তাহা দেহের সেই স্থানকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। ফলে সেই তড়িৎ আঘাতে (Electric shockএ) মানবের মৃত্যু হয়। কিন্তু DC current মানব দেহকে দূর (Repel) করিয়া দেয়। তাই সাধারণতঃ সেই আঘাতে মানুষের

---

* তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

মৃত্যু হয় না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ই প্রত্যেক পদার্থেই আছে। Electricity একটী পদার্থ। উহা তেজঃ পর্য্যায় ভুক্ত। সুতরাং উহারও উভয় গুণই থাকিবে। বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুতির জন্য একটি শক্তি এক প্রকারে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে মাত্র। পাঞ্চভৌতিক মত সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা (পরমর্ষিগুরুনাথ কৃত) গ্রন্থের 'সৃষ্টি প্রকরণ'' অংশে বহু আলোচনা বর্ত্তমান। হিন্দু শাস্ত্রেরও বহু গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিশেষ ভাবে উপনিষদ্, মনুসংহিতা, তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনী, পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য।

ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্ধিহান। এমন কি বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যেও বহু পণ্ডিত ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যোমের অস্তিত্ব অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছি। অপর দিকে উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ হিন্দু শাস্ত্র সমূহ ব্যোমের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিকগণ আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত বহু তত্ত্বাবলম্বনে নানাবিধ পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। পরমর্ষি গুরুনাথ পাঞ্চভৌতিক মত যে মহাসত্য তাহা সুস্পষ্টভাবে এবং সজোড়ে বলিয়া গিয়াছেন। এই মত সম্বন্ধে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিয়াছেন। ইহা সকলের পক্ষেই বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য।

"ভারতবর্ষীয় মনীষিগণ অধ্যাত্ম শক্তি প্রভাবে বা সূক্ষ্মদেহ ধারণ দ্বারা এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কারে সমর্থ ছিলেন ও আছেন। এক-মাত্র বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা তাহার অন্যথা করা পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তিরই সাধ্য নহে। যদি কখনও সূক্ষ্মদৃষ্টি স্থূল দৃষ্টির নিকট পরাজিত হয়, যদি কখনও যোগী ভোগীর সমীপে অধ্যাত্ম-তত্ত্বে হীনতর বলিয়া সপ্রমাণ হয়, এবং যদি কখনও ঈশ্বরজ্ঞান বাহ্য জ্ঞানের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়, তথাপি ভারতীয় অতীন্দ্রিয়দর্শী মনস্বিগণের উদ্ভাবিত বিষয় কখনও মিথ্যা বলিয়া প্রকৃতরূপে প্রতিপন্ন হইবে না। তবে জ্ঞান-হীনেরা চিরকালই জ্ঞানিগণের নিন্দা করিয়াছে ও করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)।

ব্যোমের অস্তিত্ব

এখন আমরা ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে যাইতেছি। পাঠক আলোচনান্তে বিবেচনা করিবেন যে ব্যোমের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা। আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছি যে ব্যোম প্রথম উৎপন্ন পদার্থ। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন :—

"দ্রব্য মাত্রেরই এক একটী বিশেষ গুণ আছে, উহা যাবৎ দ্রব্য-ভাবী অর্থাৎ যতক্ষণ দ্রব্য থাকে, ততক্ষণ ঐ বিশেষ গুণ থাকে এবং কালে উহাতেই লীন হয়। শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ মানিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম রক্ষা পায় না। দেখ, স্পর্শ বায়ুর একটী বিশেষ গুণ, একারণ যাবদ্ দ্রব্য-ভাবী অর্থাৎ যতক্ষণ বায়ু থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশেষ গুণ স্পর্শও থাকে। শব্দ সেরূপ নহে। বায়ু থাকিতেও শব্দ নষ্ট হয়। অতএব শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। এইরূপে প্রদর্শিত হইবে যে, শব্দ তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতিরও বিশেষ গুণ নহে। অতএব উহা যাহার বিশেষ গুণ, তাহাই আকাশ। বৈশেষিক দর্শনে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে।"

"অপর, প্রত্যেক বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণে যেরূপ গুণ থাকে, উৎপন্ন বস্তুতেও তদ্রূপ গুণ হইয়া থাকে। দেখ, যেরূপ গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্পের যোগে পুষ্প তৈল অর্থাৎ ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়, উহার গন্ধও তদ্রূপ হয়, যেরূপ রস সহযোগে কোনও তরল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার রসও তদ্রূপই হয়। তন্তুতে যেরূপ থাকে, পটেরও সেইরূপ হয়। দুই শীতল জিনিষ একত্র মিলিলে ঐ মিলিত দ্রব্য অবশ্যই শীতস্পর্শ হইবে, এবং উষ্ণ জল দ্বয় মিশ্রিত হইলে ঐ মিশ্রিত জল উষ্ণ স্পর্শ হয়। আর শীতল ও উষ্ণ জল মিশ্রিত করিলে নাতিশীতোষ্ণ জল হইয়া থাকে। শব্দ বেণু বীণাদির ধর্ম্ম হইলে তাহাও রূপাদির ন্যায় কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইত, অর্থাৎ বেণু প্রভৃতির অবয়বের যেরূপ শব্দ, উহাদেরও সেইরূপ শব্দ হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। এ কারণ বলা যায় যে বেণু বীণাদি শব্দের অধিকরণ নহে। বেণু বীণা মৃদঙ্গাদিতে আঘাত করিলে তৎ-

প্রদেশস্থ আকাশে শব্দের উৎপত্তি হয়। এ কারণ আকাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, শব্দ যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের গুণ নহে, তেমন আত্মারও গুণ নহে। কেননা, শব্দ সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে না এবং উহা মনেরও গুণ নহে, কেননা মনঃ অণু বলিয়া উহার গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব উহা অবশিষ্ট আকাশের গুণ।"*

আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু দ্বারা আমরা রূপ দর্শন করি, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, সুতরাং চক্ষু প্রধানতঃ তেজ দ্বারা গঠিত (ক)। নাসিকা দ্বারা আমরা গন্ধ গ্রহণ করি: ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ, সুতরাং নাসিকা প্রধানতঃ ক্ষিতি দ্বারা গঠিত। জিহ্বা দ্বারা আমরা রস আস্বাদন করি; অপের বিশেষ গুণ রস, সুতরাং জিহ্বা প্রধানতঃ রস দ্বারা গঠিত। ত্বক্ দ্বারা আমরা স্পর্শজ্ঞান লাভ করি; মরুতের বিশেষ গুণ স্পর্শ। সুতরাং ত্বক্ প্রধানতঃ বায়ু দ্বারা গঠিত। জ্ঞানেন্দ্রিয় দিগের মধ্যে বাকী রহিল কর্ণ, যাহার দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি। সুতরাং আমরা যুক্তি যুক্ত ভাবেই অনুমান করিতে পারি যে কর্ণ এমন একটী ভূত দ্বারা প্রধানতঃ গঠিত, যাহার বিশেষ গুণ শব্দ। সেই ভূতটীই ব্যোম। যদি কেহ বলেন যে শব্দ বায়ুরই বিশেষ গুণ, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। কারণ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ। আবার এক একটী ভূতের এক একটী বিশেষ গুণ আছে, একাধিক বিশেষ গুণ নাই। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ণাতিরিক্ত চারিটী সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। সুতরাং কর্ণ সম্বন্ধে অবশ্যই এমন একটী ভূত অনুমান করিতে হইবে, যাহার বিশেষ গুণ শব্দ। সেই ভূতটীই ব্যোম।

অন্যভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে চক্ষুর রূপ দর্শন শক্তি, কর্ণের শব্দ শ্রবণ শক্তি, নাসিকার

---

* তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

(ক Like alone can act upon like তত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠক চিন্তা করিবেন। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

আঘ্রাণ শক্তি, জিহ্বার রস গ্রহণ বা আস্বাদন শক্তি এবং ত্বকের স্পর্শ শক্তি আছে। প্রত্যেক ভূতেরই এক একটী বিশেষ গুণ আছে। যথা—বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, অপের রস এবং ক্ষিতির গন্ধ। বাকী রহিল শব্দ গুণ। তাহা নিশ্চয়ই অন্য আর একটী ভূতের বিশেষ গুণ হইবে এবং সেই ভূতটীই ব্যোম।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে জলের কেবল রসই একমাত্র গুণ নহে। তাহাতে স্থূল দৃষ্টিতেও গন্ধ, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণও পাই। এইরূপে ক্ষিতি, তেজঃ ও বায়ু সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান সকল ভূতই মিশ্র। প্রথমে ভূতোৎপত্তির পর পরম পিতার ইচ্ছায় ভূত সকল মিশ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে স্থূল বিশেষের ভূত পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যাহা হউক, সাধারণ ভাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান ক্ষিতি গন্ধ প্রধান, অপ্ জাতীয় পদার্থ রস প্রধান, তেজঃ পদার্থ রূপ প্রধান, বায়বীয় পদার্থ স্পর্শ প্রধান এবং ব্যোম শব্দ প্রধান।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে ভূতসমূহের গুণ সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ ও উৎপাদকের গুণ শব্দ উহা লাভ করিয়াছে। তেজের বিশেষ গুণ রূপ, এবং উৎপাদকের গুণদ্বয়, শব্দ ও স্পর্শ, উহা লাভ করিয়াছে। অপের বিশেষ গুণ রস এবং উৎপাদকের গুণত্রয়, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, উহা লাভ করিয়াছে। ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ এবং উৎপাদকের গুণ চতুষ্টয়, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, উহা লাভ করিয়াছে। অন্যেরা বলেন যে ব্যোমের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, অপের রস এবং ক্ষিতির গুণ গন্ধ। উহারা উৎপাদক হইতে কোন গুণই লাভ করে নাই। পঞ্চীকৃত পঞ্চ হওয়ার পর উক্ত গুণ সমূহ সংযুক্ত হয়। প্রথমোক্ত মতেও পঞ্চীকরণ স্বীকৃত। সুতরাং উভয় মত পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমান্বয় ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির বিশেষ গুণ। অতএব ভূত সমূহের বিশেষ গুণের উপর নির্ভর করিয়া ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ

প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিতে হইবে।

তেজঃ নামক জড় পদার্থ অন্যবিধ জড় পদার্থ অবলম্বন না করিয়া স্বয়ং স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে দাহ্য পদার্থ ভিন্ন অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। তড়িৎও (Electricityও) তদ্রূপ অন্য পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। বায়ুশূন্য পাত্রেও যখন তড়িৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই স্থলে এমন একটী পদার্থ বর্ত্তমান, যাহা বায়ু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাহার অবলম্বনে তড়িৎ নামক তেজঃ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। সেই পদার্থই ব্যোম। বৈজ্ঞানিক হয়তঃ বলিবেন যে পাত্র কখনও সম্পূর্ণরূপে বায়ু শূন্য করা যায় না। স্বল্প বায়ু পাত্রে থাকিবেই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পাত্রকে সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য করিতে শেষ চেষ্টা হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যতদূর পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট যে বায়ুর পরিমাণ প্রায় শূণ্যে পরিণত হয়। সুতরাং উহা গাণিতিক নিয়মানুযায়ী negligible quantity (নগণ্য পরিমাণ) বলিয়া উপেক্ষা করিলে কার্য্যতঃ কোনই ত্রুটি হয় না। বায়ুতেই শব্দ উত্থিত হয় এবং বায়ুই উহা বহন করে, এই মত সংস্থাপনের জন্য একটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আছে। উহা ইতঃপর লিখিত হইবে। উহাতেও দৃষ্ট হইবে যে কাঁচ পাত্রটিতে perfect vacuum হইয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন। তাহাতে কার্য্যতঃ সেই বিষয়ে (pointএ) কোনও ত্রুটি হয় না, যদিও সেই পরীক্ষার অন্য ত্রুটী সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

Sir Arthur Eddington যাহা বলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে জড় জগতের মূলে একটী Featureless অবস্থা বর্ত্তমান। দার্শনিক Locke-এর বিষয় চিন্তা করিলেও Featureless Substance এর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই Featureless Substance ব্যোম পদার্থ। আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া প্রথমে ব্যোমের উৎপত্তির কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ব্যোমের অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত পঞ্চীকৃত পঞ্চ হইবার পূর্ব্বে

যে ব্যোমের সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি, তাহাও সম্পূর্ণ Featureless. ব্যোমের ক্রিয়া আছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যোমই আদি সৃষ্টি এবং উহা হইতেও পরম পিতার ইচ্ছায় ক্রমশঃ এই জড় জগতের সম্ভব হইয়াছে।* আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিতে পাইব যে পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোমের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অব্যক্তের প্রথমজাত জড় পদার্থেরও ক্রিয়া শক্তি আছে। তাই এই বিরাট বিশ্ব ব্যোম হইতে সম্ভব হইয়াছে। ব্যোম যখন জড় জগতের আদি ও উপাদান স্বরূপ, তখন যে উহাতে অসীম প্রায় ক্রিয়া শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জননীর শক্তি অসীম, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মহর্ষি কণাদ যে আকাশকে দ্রব্য পদার্থ বলিয়াছেন এবং দ্রব্যত্ব জন্য উহার ক্রিয়াও আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্যোম সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ। সুতরাং উহার ক্রিয়াও অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং উহার ক্রিয়াশক্তিও অন্য ভূতচতুষ্টয়ের ক্রিয়া শক্তি হইতে অধিকতর।**

যদি বৈজ্ঞানিকগণ আর্য্যঋষিগণের উপলব্ধ সত্যতত্ত্ব বিশ্বাস করেন ও তদনুযায়ী পরীক্ষা করিতে থাকেন, তবে তাহারাও আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে

* নিষ্ক্রিয় পদার্থ কিছু উৎপাদন করিতে পারে না। যদি তাহাই সম্ভব হইত, তবে বন্ধ্যাও সন্তানের জননী হইতে পারিতেন।

** আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে শক্তি অধিকতরা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। স্থূলে যে অধিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে আমরা স্থূলের মধ্যেই বাস করি, তাই সূক্ষ্মের জ্ঞান আমাদের পক্ষে তত সহজলভ্য নহে। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম বহুবিধ শক্তি অধিকতরা। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম," ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য তত্ত্ব। ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষিতির প্রকৃতি অপ্, অপের প্রকৃতি তেজঃ, তেজের প্রকৃতি মরুৎ, এবং মরুতের প্রকৃতি ব্যোম। মাতার শক্তি অধিকতরা। সুতরাং ক্ষিতি হইতে অপের, অপ্ হইতে তেজের, তেজঃ হইতে মরুতের এবং মরুৎ হইতে ব্যোমের শক্তি অধিকতরা। সুতরাং দেখা যায় যে ব্যোমের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতমা। ব্যোম জগৎ প্রসব করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতমা শক্তি বর্ত্তমান, তাহা সহজবোধ্য। সুতরাং ব্যোমের ক্রিয়াও অধিকতমা।

জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। যাহা এতকাল আপ্তবাক্য মধ্যে পরিগণিত আছে, তাহা পরিশেষে সাধারণ সুলভ জ্ঞানে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ব্যোমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু পরে তাহারা ইথর নামক পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানোক্ত ইথর এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্যোমের মধ্যে অধিক সাদৃশ্য আছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইথরের স্পন্দন আছে, আমরাও ব্যোমের ক্রিয়া স্বীকার করি।* কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইথরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন. আবার কেহ কেহ তাহা করেন না। Sir James Jeans, Sir Arthur Eddington এবং Sir Oliver Lodge এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও প্রকৃত পক্ষে Ether এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যদিও কেহ কেহ তাহা ভিন্ন নামে প্রকাশ করেন।

---

* 'মহর্ষি' কণাদ অভাব ভিন্ন যে ছয়টী পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্রব্য পদার্থই প্রথম : যথা—ধর্ম্ম-বিশেষ-প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব-জ্ঞানা-ন্নিশ্রেয়সম্।" "পরে তিনি দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া ইহাও স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে কণাদের মতে আকাশের দ্রব্যত্ব-জন্য ক্রিয়াও আছে। কিন্তু তদীয় দর্শনের (বৈশেষিক দর্শনের) ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে আকাশে কোন ক্রিয়া নাই। উহা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।" "টীকাকারেরা বা ব্যাখ্যাকারেরা আকাশে কোনও ক্রিয়া নাই মনে করিয়া দ্রব্যের লক্ষণও অন্যরূপ করিয়াছেন। যথা—যে পদার্থে গুণের অত্যান্তাভাব থাকেনা অথবা যে পদার্থে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে, তাহাকে দ্রব্য পদার্থ কহে। কিন্তু অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ কিনা তাহা নির্ণয়ার্থে প্রবৃত্ত হইয়া উহা কি জন্য দ্রব্য হইল তাহার কারণ লিখিতে গিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—তমস্তমাল বর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্বাৎ কর্ম্মবত্তাদ্ দ্রব্যস্তু দশমং তমঃ।। অর্থাৎ অন্ধকার তমাল বর্ণ বিশিষ্ট, উহা রূপ বিশিষ্ট অর্থাৎ গুণযুক্ত এবং উহা চলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বলিয়া ক্রিয়া বিশিষ্ট। অতএব রূপবত্ত্ব (গুণবত্ত্ব) ও ক্রিয়াবত্ত্ব হেতু উহা দশম দ্রব্য। এখানে দেখা যায় যে, গুণ বিশিষ্ট ও ক্রিয়া বিশিষ্টকে দ্রব্য কহে; এতদভিপ্রায়েই ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

Sir Arthur Eddington truly says that half the leading physicists assert that the ether exists and the other half deny its existence but continues: both parties mean exactly the same thing and are divided only by words. Sir Oliver Lodge who has been the staunchest supporter of the objective existence of ether in recent years, writes :—

The ether in its various forms of energy dominates modern Physics, though many prefer to avoid the term because of its nineteenth century association and use the term space. The term used does not much matter. (The Mysterious Universe).

বঙ্গানুবাদ :—Sir Arthur Eddington সত্যই বলিয়াছেন যে প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যক প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ বৈজ্ঞানিক বলেন যে ইথর আছে এবং অপরার্দ্ধ বলেন যে উহা নাই। তিনি আরও বলেন যে উভয় পক্ষই একই ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকাশের ভাষার পার্থক্য মাত্র। (অর্থাৎ পদার্থ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের ধারণা সম্পূর্ণরূপে একই, কিন্তু যে ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করা হয়, তাহা পৃথক)। Sir Oliver Lodge গত কয়েক বৎসর যাবত ইথরের বাস্তব অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইথরের নানা শক্তি বিষয়ক জ্ঞান আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যদিও অনেকে ইথর নামটী এড়াইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, উহার সহিত উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যোগ আছে। তাহারা উহাকে space বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শব্দেতে (নামে) কিছুই আসিয়া যায় না।

এস্থলে ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটী ইঙ্গিত নিম্নে লিখিত হইল। অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে এই ভাবে ব্যোমের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কিনা। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে বায়ুই শব্দ

বাহক। সকল দিক আবদ্ধ করিয়া একটী কাঁচ পাত্রের মধ্যে একটী Electric Bell স্থাপন করা হয় এবং বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা ক্রমশঃ কাঁচ পাত্রের বায়ু বাহির করিয়া নেওয়া হয়। যতক্ষণ বায়ু কাঁচ পাত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত না করা হয়, ততক্ষন Bell এর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যখন পাত্রস্থ বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হইল, তখন Bell নড়িতে থাকে বটে, কিন্তু উহা বাজিবার শব্দ শুনা যায় না। শব্দ না শুনিবার কারণ অনুমিত হয় যে শব্দ যে স্থানে হইতেছে, সে স্থানে বায়ু নাই। বায়ুই শব্দের বাহক উৎপাদকও। সুতরাং বায়ু শূন্য স্থানে শব্দ হইতেই পারে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই অনুমান সত্য নহে। কেন সত্য নহে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এক ভূতে স্থিত ব্যক্তি অন্য ভূতে স্থিত শব্দ শুনিতে পায় না। ইহার প্রমাণ লিখিত হইতেছে। "ক" ও "খ" নামক দুই ব্যক্তি জল মগ্নাবস্থিত, "গ" নামক অন্য ব্যক্তি "ক"এর অতি নিকটে অথচ স্থল ভাগে অবস্থিত। "ক" ও "গ" এর দূরত্ব অপেক্ষা "ক" ও "খ" এর দূরত্ব অধিকতর। তথাপি যদি জলমগ্ন "ক" কোন রূপ শব্দ করে, তবে "খ" শুনিতে পাইবে, কিন্তু "গ" "ক" এর নিকটতর স্থানে থাকিয়াও সমভূতে স্থিত নহে বলিয়া সেই শব্দ শুনিতে পাইবে না। এস্থলে বিভিন্ন ভূতে অবস্থিতিই শব্দ না শুনিবার কারণ। পূর্ব্বোক্ত কাঁচ পাত্র বায়ু শূন্য, কিন্তু উহা ব্যোমপূর্ণ অপর দিকে পরীক্ষক কাঁচ পাত্রের বাহিরে বায়ু সাগরে নিমগ্ন। সুতরাং তিনি ব্যোমে উত্থিত শব্দ শুনিতে পারেন না। অর্থাৎ এস্থলেও অন্য ভূতে অবস্থিতিই পরীক্ষকের না শুনিবার প্রকৃত কারণ।

এখন আমাদের প্রস্তাবিত পরীক্ষার বিষয় লিখিত হইতেছে। কাঁচ পাত্রের স্থলে একটী নাতিবৃহৎ অথচ একজন পরীক্ষক বসিতে পারেন, এরূপ একটী কাঁচের ঘর (cabin) প্রস্তুত করুন্। তাহার ভিতরে Electric Bell স্থাপন ও বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা সেই ঘরের বায়ু নিকাশের বন্দোবস্ত করুন। একজন উক্ত ঘরে অবস্থান করুক্। বায়ুর গতি রোধ পূর্ব্বক ঘরের দ্বার hermetically বদ্ধ

করিয়া যন্ত্র দ্বারা বায়ু নিকাশ করা হউক্। যখন বায়ু সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করা হইল এবং বাহিরের দর্শকগণ Bell বাজিবার শব্দ শুনিতে পাইল না, তখন হইতে ভিতরের মানুষটী পরীক্ষা করিবেন যে Bell এর শব্দ হইতেছে কিনা। উপরোক্ত অবস্থায় মানুষটী ও Bell উভয়ই ব্যোমের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ সমভূতে স্থিত। সে যদি শব্দ শুনিতে পায়, তবে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা গেল ব্যোমেই শব্দ উত্থিত হয় অর্থাৎ ব্যোমই শব্দের উৎপাদক এবং ব্যোমই উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করে। প্রস্তাবিত পরীক্ষা সম্বন্ধে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই যে ঘরের ভিতরের মানুষটীর সেই স্থানে অবস্থানের সমস্ত সময় শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ রেচকান্তে কুম্ভক দিয়া থাকিতে হইবে, অর্থাৎ দেহে বায়ুর পরিমাণ Irreducible minimum অবস্থায় পরিণমন করিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করিয়া রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ যোগী দুর্ঘট নহে।

Bible হইতে একটী অংশ নিম্নে উদ্ধার করিলাম। "In the beginning was the word and the word was with God and the word is God. (Gospel according to St. John, Chap I, Verse 1.) বঙ্গানুবাদ :—প্রথমে শব্দ ছিল এবং শব্দ ব্রহ্মের সহিত ছিল এবং শব্দ ব্রহ্ম।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্যোমই সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ। সুতরাং In the beginning was the word বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে Bibleও প্রথমে ব্যোমের সৃষ্টি সমর্থন করেন।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে শব্দ জড় পদার্থের গুণ মাত্র। উহা ব্যোম হইতে উৎপন্ন। উহাকে ব্রহ্ম বলিবার তাৎপর্য্য কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ word এর সাধারণ অর্থ শব্দ মাত্র না বলিয়া Logos ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। Logos এর

অর্থ Chambers Dictionary মতে লিখিত হইয়াছে :—In the Stoic Philosophy the acting Principle living and determining the world.

এখন এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। আমাদের মত পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ শব্দ ব্যোমের বিশেষ গুণ এবং word এর অর্থ শব্দ মাত্র, অন্য কিছুই নহে। আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ব্যোম হইতেই অন্যান্য জড় পদার্থের উৎপত্তি। সুতরাং ব্যোমের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং শব্দের শক্তিও স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের শক্তি অপেক্ষা অধিকতরা। অর্থাৎ জড় জগতে ব্যোমের গুণ যেমন উচ্চতম, সেইরূপ শব্দ শক্তিও অন্যান্য সকল শক্তি হইতে বলবত্তমা। বিশেষ বিশেষ শব্দোচ্চারণে যে বিশেষ বিশেষ ভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। করুণ-রসাত্মক গ্রন্থ পাঠে করুণ রসের উদয় হয় এবং বীর-রসাত্মক গ্রন্থ পাঠে বীর রস আবির্ভূত হয়। যদি বলেন যে ঐ সকল শব্দের ভাব হৃদয়ে ধারণ করা হয় বলিয়া ঐ রূপ হইয়া থাকে, শব্দ শক্তি দ্বারা হয় না, তবে বক্তব্য এই যে যদি উক্তরূপ রস পূর্ণ গ্রন্থ প্রকৃত উচ্চারণের সহিত আমাদের অজ্ঞাত ভাষায় পঠিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের করুণ রস বা বীররসের উদয় হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। এ কারণবশতঃই কাহারও ব্যাকুল ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলে শ্রোতারও ক্রন্দন আসে। বজ্রনাদ শুনিলে হৃদয়ে এক প্রকার ভাবের উদয় হয় এবং কোকিলের কুহু ধ্বনি শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের উদয় হয়। কবিবর Wordsworthও কুহু ধ্বনিকে Divine Voice বলিয়াই মনে করিতেন। পাখীর গানে অনেকের হৃদয়ে নানাভাবের লহরী প্রবাহিত হয়। শুনিয়াছি যে অনেকে পাখীর গানই বহু রাগ রাগিনীর মূলে বর্ত্তমান বলিয়া মনে করেন। তানসেনের মেঘমল্লার রাগিনীতে মেঘ সঞ্চার ও দীপক রাগিণীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, সুতরাং ইহা বুঝিতে পারা যায় যে শব্দোচ্চারণ দ্বারা প্রকৃতিও প্রভাবিত হয়। এস্থলে ইহা

উল্লেখ যোগ্য যে হিংস্র বিষধর সর্পও নৃত্য করিতে থাকে। সাঁপুরিয়াদের সাঁপ ধরিবার প্রধান অস্ত্র তাঁহাদের বাঁশি। আবার আমরা দেখিতে পাইব যে বেদ বেদান্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চারিত হইয়া পঠিত হইলে উহাদের অর্থ বোধে অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়েও এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। ভারতীয় ঋষিগণ মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহা হইতেই মন্ত্রোচ্চারণের বিশুদ্ধতার জন্য সাধকগণ বিশেষ ভাবে যত্নবান থাকেন। অতএব দেখা যায় যে শব্দ শক্তি দ্বারা আমাদের গুণেরও বৃদ্ধি হইতে পারে। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে এইরূপ হইবার কারণ কি। ইহার উত্তরে আমরা নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

"গুণ বিধান" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মার সহিত এক হইলেও তাঁহার অনন্ত গুণরাশি দেহবদ্ধতা জন্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে প্রকাশিত। 'জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশেও আমরা দেখিতে পাইব যে জড় দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধক। ইহা জানিয়াই ভারতীয় যোগীগণ দেহের বিরোধিতা নাশ করিবার জন্য নানা প্রকার যোগ সাধন আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের দেহ এমনভাবে গঠিত যে উহা দ্বারা আত্মার অনন্ত গুণরাশি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ আবৃত অবস্থায় বর্ত্তমান। শব্দোচ্চারণে যে সেই আবরণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছি। বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ গুণ বিরোধী আবরণ উন্মুক্ত হয়। এইরূপ বারংবার বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিলে আবরণটী ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে এবং পরিশেষে অল্লায়াসেই উন্মুক্ত হয়। সুতরাং এই ভাবেও গুণ বৃদ্ধি করা যায়। ইহা দ্বারা পাঠক ইহা বুঝিবেন না যে শব্দ শক্তিই গুণবৃদ্ধির একমাত্র কারণ বলা হইল। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে শব্দ শক্তিও একটী কারণ। শব্দের অর্থ-বোধ ও চিন্তা অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান ধারণার দ্বারা যে গুণ বৃদ্ধি হয়, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। গুণ বৃদ্ধির জন্য বহু সাধনা আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রকাশিত সত্যধর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান,

সত্যামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে সাধনা সম্বন্ধে বহু উপদেশ লাভ করিতে পারেন। প্রধান প্রধান গুণ সমূহের সাধনা সংক্ষেপে A. B. C. of Satya Dharma and its Philosophy গ্রন্থেও দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব মণ্ডলের, সর্ব্ব জীবের বিভিন্ন ভাষার একটী মূল ভাষা বর্ত্তমান আছেন। এই সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজীবিক ভাষাকে বৈজিক ভাষা বলে। যেমন বীজ হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বীজ ভূত ভাষা হইতে লিখিত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই ঐ নাম হইয়াছে। বৈজিক ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে সকল জীবের সকল ভাষা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই মহীয়সী ভাষা পূর্ণ এবং অশেষ গুণ সম্পন্ন বলিয়া মহাত্মা ভোলানাথ এই ভাষায় দীক্ষা দান প্রণালী ভূমণ্ডলে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং বর্ত্তমান সময় সত্যধর্ম্মাবলম্বী গুরুগণ ঐ কারণে বৈজিক ভাষায় দীক্ষা মন্ত্র দান করিয়া থাকেন।* (সত্যধর্ম্ম)

---

* এই সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথের আরও কিছু উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈজিক ভাষাই মূল ভাষা। উহা হইতে বৈদিক ভাষার এবং তৎপর বৈদিক ভাষা হইতে বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার, বৈদিক ভাষা হইতে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবি, হিব্রু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অপর সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, তৎপর বাঙ্গলা প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে বহু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই সকল ভাষার মূল বা বীজভূত ভাষাই বৈজিক ভাষা। বৈজিক ভাষা যে কেবল মানবীয় ভাষারই মূল তাহা নহে, উহা নিখিল চেতন পদার্থের ভাষারই মূল। পশু পক্ষ্যাদির ভাষাও উহা হইতে উৎপন্ন। এমন কি বৈজিক ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভাষাই বুঝা যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান থাকিলে উড়িয়া, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষার অধিকাংশ বুঝা যায়, তদ্রূপ বৈজিক ভাষায় জ্ঞান থাকিলে কিঞ্চিদভিনিবেশ করিলেই অন্যান্য ভাষা বুঝা যাইতে পারে। এ কারণ জগদীশ্বরের গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে বৈজিক ভাষার অবলম্বনই সর্ব্বপ্রকার সুফলদায়ক ও সুবিধাজনক (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)। যেমন একটী ক্ষুদ্র আম্র ফল যে সে জীবে খাইতে পারিলেও উহার উৎপাদক বৃহৎ বৃক্ষটী ভক্ষণ করা দৃশ্যমান জগতের কোনও একটী জীবের পক্ষে সাধ্য নহে, তদ্রূপ উৎপন্ন ভাষা সমূহে জ্ঞান লাভ করা যেরূপ সামান্য আয়াস সাধ্য, উৎপাদিকা ভাষায়

অতএব যে ভাষা পূর্ণ, তাহার প্রকৃত উচ্চারণে আবরণ অধিক পরিমাণে উন্মুক্ত হইবে। যে পরিমাণে আবরণ উন্মুক্ত হইবে, আমাদের গুণ বৃদ্ধিও সেই পরিমাণেই হইবে। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে শব্দ শক্তি দ্বারা গুণের বৃদ্ধি হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে শব্দ নিজ শক্তি দ্বারা গুণদান বা বৃদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু দেহের উপর উহার ক্রিয়া দ্বারা আবরণ উন্মোচনে সাহায্য করে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে আত্মার গুণের উপর শব্দ শক্তির কোনই ক্রিয়া নাই বটে, কিন্তু দেহের উপর ক্রিয়া দ্বারা প্রকারান্তরে গুণের বিকাশ সাধন করে।

উপাসক ও সাধকগণ সর্ব্বপ্রথমেই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন না। প্রথমতঃ তাঁহাদের পরমপিতার গুণরাশির উল্লেখ বা সংকীর্ত্তন করিতেই হয়। এই কারণেই "গানাৎ পরতরং নহি" মহাবাক্যের সৃষ্টি। কারণ, গানে যেরূপ শব্দের উচ্চারণ হয়, সাধারণ বাক্যে সেইরূপ হয় না। গানে মনের একাগ্রতাও অধিকতর ভাবে আনয়ন করে। তাই ব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন আবরণ উন্মোচনের একটী কারণ। ব্রহ্ম নামের মহিমা আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহার নামোচ্চারণে আমাদের আবরণ উন্মোচনের সাহায্য হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্তগণ "নাম ও নামী অভেদ", "নামের মধ্যে নামী রাজে" এবং শব্দ-ব্রহ্ম প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকেন।

"ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ইন্দ্রিয়গণ যখম অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণ যখন জীবাত্মায় লয় হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সাধকের যে পর্য্যন্ত সেই অবস্থা নিত্য লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্তই সাধন ভজন জন্য তাঁহার জড়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। এস্থলে ইহা

তদ্রূপ নহে। ঐ উৎপাদিকা বৈজিক ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মাকে বহু গুণে উন্নত করিতে হয়, তাহা না হইলে কদাচ তাহাতে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না (সত্যধর্ম্ম)।

উল্লেখ যোগ্য যে অন্তঃকরণের এক অংশ আত্মিক ও অপর অংশ পাঞ্চ-ভৌতিক। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণ দ্বারা চিন্তাও বিশুদ্ধ আত্মিক ক্রিয়া নহে। অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা যেমন জীবকে দেহাবদ্ধ করিয়া পরীক্ষার মধ্যে রাখিয়াছেন, তেমনি জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে দেহের এমনি গঠন করিয়াছেন যে আমাদের দেহ মনের উপযুক্ত ব্যবহারে আমরা সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তিনি জানেন যে জীবগণ সর্ব্বারম্ভেই তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ ভাবে উপবেশন করিতে পারিবে না, তাই যাহাতে শব্দ অবলম্বনে জীবগণের আবরণ উন্মোচনের সাহায্য হয়, তিনি তাহাই করিয়া রাখিয়াছেন। উপনিষদুক্ত সাধনার উপদেশেও আমরা পাই -- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। ইহাতেও শ্রবণের স্থান প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক দিগের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে তাঁহারা উপাসনার জন্য স্থূল পদার্থ অবলম্বন করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও বাক্য অবলম্বন করেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শব্দ গুণ ব্যোমের এবং ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্যোমের শক্তিই সর্ব্বোত্তম। সুতরাং তাঁহারা যে উচ্চতম জড় পদার্থ অবলম্বন করেন, তাহা সুনিশ্চিত। যখন প্রারম্ভে আমাদের জড় পদার্থ অবলম্বন করিতেই হইবে, তখন ব্যোমকে অবলম্বন করিয়াই ভগবদুপাসনা করিতেই হইবে, তখন ব্যোমকে অবলম্বন করাই সুসঙ্গত। কারণ, উহা যেমন নিরাকার, তেমনি সর্ব্বোত্তম এবং সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ বলিয়া অধিকতর ফলদাতা। অন্য জড় পদার্থ অবলম্বনে সাকার বাদে সুতরাং ভ্রান্তিতে উপনীত হওয়ায় পূর্ণ সম্ভাবনা। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে দেখিতে পাইব যে ব্যোম অন্যান্য ভূত অপেক্ষা জীবের উন্নতির পথে অল্পতম বাধা প্রদান করে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে নিরাকারবাদী কেবল বাক্য দ্বারাই উপাসনা কার্য্য শেষ করেন না। তিনি ধ্যান ধারণা দ্বারাও উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। সাধক যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন, ধ্যানাবস্থায় উপাসনা তাঁহার ততই

অধিক হইতে অধিকতর হইবে।

অতএব আমরা দেখিলাম যে শব্দ শক্তি অন্যান্য জড় শক্তি অপেক্ষা আমাদিগকে ব্রহ্মোপসনায় সুতরাং আত্মোন্নতির অধিকতম সাহায্য করে। ব্যোম ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিণাম, সুতরাং উহা উচ্চতম জড় পদার্থ। ব্যোম নিরাকার, অনন্ত প্রায় এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যোমের অভাব কুত্রাপি হয় না বা হইতেও পারে না। ব্রহ্মের সহিত যদি কোন জড় পদার্থের একান্তই যৎকিঞ্চিৎ তুলনা আনিতেই হয়, তবে তাহা একমাত্র ব্যোম সম্বন্ধেই সম্ভব হয়। মহর্ষি দত্রাত্রেয় উক্ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতেও দৃষ্ট হইবে যে তিনি ব্রহ্মকে অন্য চারিভূত বিহীন বলিয়াছেন। কিন্তু আকাশের (ব্যোমের) সহিত তাঁহার তুলনা আনয়ন করিয়াছেন। (গগনমিব বিশালম্, "গগনোপম্")।

(১) দহন-পবন-হীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং
অবনী-জল-বিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং।
সম-গমন-বিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং
গগনমিব বিশালং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকম্॥

(২) ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ কথমত্র সন্তি
স্বর্গাদয়োবসতয়ঃ কথমত্র সন্তি?
যদ্যেকরূপমমলং পরমার্থ তত্ত্বং
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপম্ সোঽহম্॥

অর্থাৎ (১) অগ্নি-বায়ু-বিহীন একমাত্র বিজ্ঞানকে জান, ক্ষিতি-অপ্-বিহীন একমাত্র বিজ্ঞানকে জান, সম-গমন-বিহীন একমাত্র বিজ্ঞানকে জান, গগনের ন্যায় বিশাল একমাত্র বিজ্ঞানকে জান। (২) ব্রহ্মাদি দেবগণ কোথায় আছেন? স্বর্গাদি কোথায় আছে? যদি গগন সদৃশ একরূপ, অমল, পরমার্থতত্ত্ব, জ্ঞানামৃত, সমরস তিনি এবং আমি তাঁহার সহিত এক।

এইরূপ অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্যোমের মহত্ত্ব পূর্ণ গুণ বলিয়াই শব্দকে রূপকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু শব্দ শব্দই। উহা জড় পদার্থ বিশেষ. উহা কখনই ব্রহ্ম নহে। শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই যখন

আমরা উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারি, তখন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা উহার কোন অর্থ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১৪।১ মন্ত্রে দেখা যায় যে আকাশকে (ব্যোমকে) ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা বলা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের "আকাশস্তল্লিঙ্গবৎ" সূত্রের (১।১।২২) শঙ্কর ভাষ্যে দেখা যাইবে যে আকাশ শব্দ ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলেও শব্দ-ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। উপনিষদের কোন কোন স্থলে প্রাণকে (শারীরিক প্রাণ বায়ুকে) ব্রহ্ম বলা হইয়াছে এবং আকাশকে আত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে আকাশ-ব্রহ্ম, শব্দ-ব্রহ্ম, প্রাণ-ব্রহ্ম, আকাশাত্মা শব্দ সমূহ প্রাচীন কালে রূপক ভাবে ব্যবহার প্রচলন ছিল। Bible-এও ঐরূপ রূপকে word is God লেখা হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত উক্তি সমূহের সাহায্যেও আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে প্রথমে ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছিল। উপনিষদও তাহাই বলেন।

আবারও আপত্তি হইতে পারে যে ব্যোম সৃষ্ট পদার্থ, উহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের সহিত থাকিতে পারে না। কিন্তু Bible লিখিয়াছেন "the word was with God." সুতরাং word-এর অর্থ শব্দ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ইহা সুনিশ্চিত যে শব্দ জড়ীয় শব্দাকারে ব্রহ্মের সহিত ছিল না বা থাকিতেও পারে না। এখন প্রশ্ন হইবে যে শব্দ তবে কোথায় হইতে আসিল। ইহার উত্তরে পাঠককে "ইচ্ছাশক্তি" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপে নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব বর্ত্তমান এবং উহা অচেতন। উহারা ভিন্ন অব্যক্তের অন্য কোন গুণ নাই। তবে যে আমরা সৃষ্টিতে জড় পদার্থে নানাবিধ গুণ দেখিতেছি, তাহা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর সেই অংশদ্বয়ে বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহারা তাঁহারই অনন্ত গুণরাশির আভাস সমূহ মাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি জগতে বর্ত্তাইয়াছেন। অর্থাৎ

তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি অব্যক্ত স্বরূপকে এমনভাবে জগতে পরিণমন করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার অনন্ত গুণরাশির আভাস সমূহ জড় পদার্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মে জড় শক্তি নাই বটে, কিন্তু শব্দের মূল গুণ, তাঁহাতে অবশ্যই আছে। তাই সেই গুণের আভাস ব্যোমের গুণ শব্দ ভাবে জড় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে "The word was with God" রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দের মূল যে গুণ বা যে গুণের আভাসে ব্যোমের শব্দগুণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই গুণ ব্রহ্মের সহিত আছে। উহা যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল এবং এখন নাই, তাহা নহে ; উহা তাঁহার নিত্য গুণ। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সেই গুণটীই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নহে। তাহা যে ব্রহ্মের প্রেমই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে "সৃষ্টির সূচনা'' অংশে দেখিয়াছি এবং ইতঃপর বহুস্থলে দেখিতে পাইব।

কেহ কেহ বলেন যে শব্দের তিনটী স্তর—প্রথমটি ভৌতিক, দ্বিতীয়টী অনাহত ধ্বনি যাহা আমাদের অন্তঃকরণে চিন্তাকারে হইয়া থাকে। তৃতীয়টী উক্ত উভয়ের কারণরূপে ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই শব্দই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এবং উহা হইতেই প্রথমে ভৌতিক ব্যোমের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে এই মতানুযায়ীও ব্যোমের উৎপত্তি যে সর্ব্ব প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং word এর অর্থ Logos বলিলেও ব্যোমের যে সর্ব্ব প্রথমে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইল।

সৃষ্টির মূলে দুইটী বস্তু একটী ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ এবং অন্যটী তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছা। প্রথমটী উপাদান কারণ ও দ্বিতীয়টী নিমিত্ত কারণ। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রন্থ লিখিত সৃষ্টি তত্ত্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অব্যক্ত স্বরূপের অর্থ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। উক্ত স্বরূপ বিশ্বে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যোমও নিরাকার-সাকার এবং সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী। আবার ব্যোম অব্যক্তের সাক্ষাৎ পরিণাম। "ইচ্ছাশক্তি" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার

অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপের যেরূপ পরিণামে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেই রূপেই অব্যক্ত হইতে ব্যোমের গঠন করিয়াছেন।

ইহা উভয় পক্ষ সম্মত যে মরুতের দুইটী গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। প্রথমটী ব্যোম হইতে প্রাপ্ত ও দ্বিতীয়টী উহার বিশেষ গুণ; সেইরূপ তেজের শব্দ ও স্পর্শ উৎপাদক মরুৎ হইতে প্রাপ্ত এবং রূপ উহার বিশেষ গুণ; অপের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ উৎপাদক তেজঃ হইতে প্রাপ্ত এবং রস উহার বিশেষ গুণ, এবং ক্ষিতির শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস অপ্ হইতে প্রাপ্ত এবং গন্ধ উহার বিশেষ গুণ। পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুতের বিশেষ গুণ সমূহ গন্ধ, রস, রূপ এবং স্পর্শ ব্রহ্মের ইচ্ছায় উহাদের উৎপাদক যথাক্রমে অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের বিকারে উৎপন্ন। অতএব আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই বলিতে পারি যে ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ ও তাঁহারই ইচ্ছায় উহার উৎপাদক অব্যক্তের পরিণামে সম্ভব হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে উৎপাদক সূক্ষ্মের গুণ সম্পূর্ণভাবে স্থূলে পরিণত না হইয়া কিয়দংশ মাত্র স্থূলে দৃষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ বিকার জন্য অন্য গুণ রূপে পরিণত হইয়া থাকে। (ক)

ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে উৎপাদক অব্যক্তের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব ব্যোম লাভ করিয়াছে, তাই উহাও অনন্ত প্রায় নিরাকার ও সাকার। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "অব্যক্ত স্বরূপ কি ?" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে। আবার ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যক্তের পরিণামে সম্ভব হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অন্যান্য ভূতের এক একটী বিশেষ গুণ আছে এবং উহাদের অন্যান্য গুণ উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত। অতএব ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যক্তের পরিণামে উহাতে (ব্যোমে) উৎপন্ন হইয়াছে।

অন্যভাবে চিন্তা করিলেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। ক্ষিতির গুণ পাঁচটি যথা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ;

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

অপের গুণ চারিটী যথা—রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, তেজের গুণ তিনটী যথা—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; মরুতের গুণ দুইটী, যথা—স্পর্শ ও শব্দ; ব্যোমের গুণ একটি মাত্র, অর্থাৎ শব্দই উহার একমাত্র গুণ। উহার অন্য কোন গুণ নাই। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভূত যত সূক্ষ্ম হইতেছে, ততই উহার গুণ সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। অর্থাৎ বিকৃতির মাত্রা যতই অল্প হইতেছে, গুণ সংখ্যাও তেমনি অল্প হইতে অল্পতর হইতেছে। অবশেষে ব্যোমে অর্থাৎ অব্যক্তের সাক্ষাৎ বিকৃত পদার্থে একটী মাত্র গুণ অর্থাৎ শব্দকে পাই। ব্যোমের উৎপাদক ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ। সুতরাং উহা ব্যোম হইতেও অত্যন্ত সূক্ষ্মতর অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অব্যক্তের তুলনায় ব্যোমও স্থুল পদার্থ বই আর কিছুই নহে। অতএব আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে অব্যক্ত স্বরূপে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ কোনও গুণই নাই।

এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয় উত্থাপিত হইতে পারে ঃ—(১) জড় জগৎ উৎপাদক হইতে কোন্ কোন্ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে ? (২) জড় জগতে দৃষ্ট অন্যান্য গুণ কোথায় হইতে আগমন করিয়াছে ? ইহাদের উত্তর "অব্যক্তের পরিণাম" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশদ্বয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক তাহা পাঠ করিলেই উহাদের সরল ও প্রাঞ্জল মীমাংসা লাভে সমর্থ হইবেন। এস্থলে আর উহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

অতএব আমরা বহুভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহা অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত যে ব্যোম একটী ভূত পদার্থ এবং উহাই সর্ব্বারম্ভে সৃষ্ট হইয়াছে।

মণ্ডল সৃষ্টি

"ভূত সৃষ্টির পরে মণ্ডল সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সুর ও অসুর নামক মণ্ডল দ্বয়ের সৃষ্টি হয়। সুর আকর্ষণ প্রধান এবং অসুর বিকর্ষণ প্রধান। সুর হইতে সূর অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের উৎপত্তি। এক্ষণে যে সকল সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্ট ও অনুমিত হয়, তৎসমুদায় সুরমণ্ডল হইতে

আর এক্ষণে যে ধুমকেতু দৃষ্ট বা অনুমিত হয়, তৎসমুদায় অসুরমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (ক)

সুর ও অসুর মণ্ডল দ্বয় ব্যোম-প্রধান ভাবে গঠিত বলিয়াই মনে হয়। উহারাই আদি মণ্ডল দ্বয় এবং উহাদের হইতেই বিশ্বের সর্ব্ব প্রকার সকল মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে সর্ব্বমণ্ডলের জনক বলা যাইতে পারে। ব্যোম হইতেই অবশিষ্ট জড় জগতের উৎপত্তি। সেইরূপ উক্ত মণ্ডল দ্বয় হইতেই সর্ব্বমণ্ডলের উৎপত্তি। সুতরাং উহা যে ব্যোম-প্রধান, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সুর মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়াই সমগ্র বিশ্ব ঘুরিতেছে। সুতরাং উহা যে বিশ্বের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত, তাহা সহজ বোধ্য। ইতঃপর লিখিত বিভিন্ন লোকের মণ্ডল সংখ্যার বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে এক সত্যলোকে যত সংখ্যক মণ্ডল বর্ত্তমান, অন্য ছয়টী লোকে সমষ্টিতেও তত মণ্ডল নাই। সুতরাং সত্যলোকের মণ্ডল সমূহ সেই মহা সূর্য্যের বা আদি সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। সত্যলোক চরম ব্যোম-প্রধান দেশ। সুতরাং সুরমণ্ডলও ব্যোম প্রধান বুঝিতে হইবে। অসুর মণ্ডলও সুর মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী। কারণ, উহারা ক্রমান্বয় বিকর্ষণ ও আকর্ষণ প্রধান এবং পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে উহারা প্রথমাবধি ঘূর্ণায়মান। সুতরাং উহাও যে ব্যোম প্রধান, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভূবঃ লোক হইতেই ব্যোমপ্রধান মণ্ডলের আরম্ভ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে সূর্য্য হইতে সুদূরে অবস্থিত নক্ষত্ররাজি সূক্ষ্মতর পদার্থ (Finer materials) দ্বারা গঠিত। সুর এবং অসুর মণ্ডল যে কত দূর দূরান্তরে অবস্থিত, তাহা এখনও বিজ্ঞান জানেন না। বিজ্ঞান কয়েক কোটী নক্ষত্রের যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডল অসংখ্য। সুতরাং বিজ্ঞান এখনও ভূঃ লোকের অতি নিম্ন-স্তরের মণ্ডল গুলির কিঞ্চিৎ সংবাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অতএব উক্ত মণ্ডলদ্বয় (সুর এবং অসুর) যে finest

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

materials অর্থাৎ ব্যোম প্রধান ভাবে গঠিত, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পৃথিবী হইতে আমরা যতদূরে যাই, ততই মণ্ডল সমূহ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত নির্ঘণ্ট পত্র আমরা দেখিতে পাইব। উহাতেও দেখা যাইবে যে মণ্ডলগুলি যতই আমাদের হইতে দূরবর্ত্তী হইতেছে, ততই উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব দ্বারাই সেই সেই মণ্ডলের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব নির্ণীত হইতে পারে। কারণ, মণ্ডলের অবস্থা অনুযায়ী দেহের অবস্থা গঠিত হয়, অথবা মণ্ডলের পদার্থ দ্বারাই সেই মণ্ডলের জীবদেহ প্রস্তুত হয়।

বিশ্বে মণ্ডল অসংখ্য। তাহা সংখ্যা দ্বারা গনণা করা যায় না। তথাপিও তাহার যৎকিঞ্চিৎ ধারণার জন্য কিছু লিখিত হইল। পরার্দ্ধ সংখ্যাকে (১০০০০০০০০০০০০০০০০০—একের পৃষ্ঠে সতরটী শূন্যকে)* "ক" অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা গেল। সমগ্র বিশ্ব সাতভাগে বিভক্ত।

১—একক।
১০—দশক।
১০০—শতক।
১০০০—সহস্র।
১০০০০—অযুত।
১০০০০০—লক্ষ।
১০০০০০০—নিযুত।
১০০০০০০০—কোটী।
১০০০০০০০০—অর্ব্বুদ।
১০০০০০০০০০—পদ্ম।
১০০০০০০০০০০—খর্ব্ব।
১০০০০০০০০০০০—নিখর্ব্ব।
১০০০০০০০০০০০০—মহাপদ্ম।
১০০০০০০০০০০০০০—শংখ।
১০০০০০০০০০০০০০০—জলধি।
১০০০০০০০০০০০০০০০—অন্ত্য।
১০০০০০০০০০০০০০০০০—মধ্য।
১০০০০০০০০০০০০০০০০০—পরার্দ্ধ।

এস্থলে বক্তব্য যে পরার্দ্ধের পর সংখ্যা নির্দ্দেশক কোন শব্দ নাই।

যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যম্ ইহারাই সপ্তলোক। এক একটী লোক এক একটী মণ্ডল মাত্র নহে। এক একটী লোকে কত সংখ্যক মণ্ডল বর্ত্তমান, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ভূঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—পরার্দ্ধ অথবা ক
ভুবঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{২} অথবা ক^{২}
স্বঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{৪} অথবা ক^{৪}
জনঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{৮} অথবা ক^{৮}
মহঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{১৬} অথবা ক^{১৬}
তপঃ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{৩২} অথবা ক^{৩২}
সত্যম্ লোকের মণ্ডল সংখ্যা—(পরার্দ্ধ)^{৬৪} অথবা ক^{৬৪}

সুতরাং বিশ্বের মণ্ডল সংখ্যা দাড়ায়:—ক + ক^{২} + ক^{৪} + ক^{৮} + ক^{১৬} + ক^{৩২} + ক^{৬৪} = অসংখ্য।

Sir James Jeans গত পূর্ব্ব Calcutta Science Congress এ তাঁহার বক্তৃতায় মণ্ডল গুলি সম্বন্ধে কি বিরাট ধারণা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা এই সম্পর্কে স্মরণ করিবেন। তাঁহার মতে বহু বহু নক্ষত্র আমাদের ছায়া পথ হইতে অত্যধিক দূরে সুদূরে অবস্থিত। বর্ত্তমানের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রায় দুই নিযুত ঐরূপ নক্ষত্র দৃষ্টি গোচর হয়। উহাদের কতকগুলি এত দূরে যে সেই সকল নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ১৪ কোটী বৎসরের (light years) প্রয়োজন হয়। পাঠক মনে রাখিবেন যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে ইহা হইতেও অত্যাধিক দূরের নক্ষত্ররাজি যে দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বের সীমা আমাদের ধারণাতীত। বিশ্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি সমূহের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। (1) Indeed our Earth is so infinitesimal in comparison with the whole universe, we, the only thinking beings, so far as you know, in the whole of space, are to all appe-

arances so accidental, so far removed from the main scheme of the universe that it is *apriori* all too probable that any meaning that the universe as a whole may have, would entirely transcend our terrestrial experience and be totally unintelligible to us. (The Mysterious Universe). (2) A few stars are known which are hardly bigger than the Earth, but the majority are so large that huncreds and thousands of Earth could be packed inside each and leave the room to spare ; here and there we come upon a giant star large enough to contain millions of millions of Earth, and the total number of stars in the universe is probably something like the total numbers of grains of sand on all the sea shores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total of the substance of the universe. (Ibid). (3) The vast multitude of stars are wondering about in space. A few form of groups which journeyin company, but the majority are solitary travellers and they travel througha universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another star. For the most part each voyages in splendid isolation like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the averge ship will be well over a million miles from its nearest neighbour whence it is easy to understand why a ship seldom finds another

within hailing distance. (Ibid). বঙ্গানুবাদ ঃ—বাস্তবিক সমগ্র বিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের যতদূর জানা আছে এই সমুদায় বিশ্বে আমরাই একমাত্র চিন্তাশীল প্রাণী। বিশ্বের বিরাটত্ব চিন্তা করিলে মনে হয় যে আমরা যেন এস্থানে ঘটনা-চক্রে আছি। আমরা বিশ্বের প্রধান কল্পনা হইতে এত দূরে যে ইহা স্বতঃই সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে সমগ্রভাবে বিশ্বের যে উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতার অতীত সুতরাং বুদ্ধির অগম্য। (২) অল্প সংখ্যক নক্ষত্র পৃথিবী হইতে কিঞ্চিৎ পরিমানে বৃহৎ। কিন্তু অধিক সংখ্যক নক্ষত্রই এত বড় যে লক্ষ লক্ষ পৃথিবী উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভরিয়া রাখিলেও তাহাতে আরও স্থান থাকে। মাঝে মাঝে আমরা এত সুবৃহৎ নক্ষত্র দেখিতে পাই যে তাহাতে কোটী কোটী পৃথিবী ভরিয়া রাখা যায়, এবং বোধ হয় যে মোট নক্ষত্র সংখ্যা পৃথিবীস্থ সকল সমুদ্রতটের বালুকণা রাশির সমান। বিশ্বের সমস্ত স্থানের সহিত তুলনা করিলে আমাদের নিবাস স্থল (পৃথিবী) এতই ক্ষুদ্র। (৩) এই অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডল দেশে (spaceএ) ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া একত্র ঘুরিতেছে। কিন্তু অধিক সংখ্যক নক্ষত্রই একাকী চলে, এবং উহারা এত বিশাল বিশ্বে ঘুরিতেছে যে ইহা অচিন্ত্যনীয় যে উহাদের একটী নক্ষত্র অন্যটীর নিকট আসিবে। নৌ শূন্য সমুদ্রে জাহাজ যেমন একাকী চলে, সেইরূপ এই সকল নক্ষত্র শূন্যে ভ্রমণ করিতেছে। নক্ষত্রের গতিবিধির যদি একটী নমুনা তৈয়ার করা হয়, ও একটী নক্ষত্রকে এক একটী জাহাজ মনে করা যায়, তবে এক জাহাজ হইতে অন্য নিকটস্থ জাহাজ গড়ে এক নিযুত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত হইবে। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে একটী জাহাজ অন্যটীর দৃষ্টিপথে কদাচিৎ আসে।

জীব-সৃষ্টি

"ভূত সৃষ্টির পর মণ্ডল সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষ্কগণ বা মণ্ডলসমূহের প্রথমাবস্থায় উহাদিগের উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে

তাহা প্রাণীদিগের উৎপত্তি বা নিবাসের কথা দূরে যাউক্, উদ্ভিদগণও উৎপন্ন হইতে পারিত না। কালক্রমে উহাদের উপরিভাগ শীতল হইলে জীব ও উদ্ভিদের অবস্থিতির উপযুক্ত হইয়াছে। তেজের বিকারে যখন তোয় এবং তোয়ের বিকারে যখন ভূমির উৎপত্তি হয়, তখনই তত্তৎ পদার্থে পরমপুরুষের ইচ্ছা অনুসারে বিবিধ উদ্ভিদ ও জীবের নানা জাতীয় বীজ নিহিত হয়। এই উদ্ভিদ বীজ হইতেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। অধিকন্তু উৎপত্তির পরে উহাতে বীজাদি উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে উদ্ভিদ সঞ্জাত হইতেছে। ফলতঃ উদ্ভিদ ও জীব প্রায় এক নিয়মে উৎপন্ন। কেননা বহু সংখ্যক উদ্ভিদে পরাগ কেশরের রেণু গর্ভকেশরে অবস্থিত তরল পদার্থে পতিত হইয়া বীজ কোষের উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন করে। সাধারণতঃ জীবগণের উৎ-পত্তিও এই নিয়মে হয়। আর কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড প্রভৃতি কাটিয়া মৃত্তিকায় রোপন করিলে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাবের মধ্যেও পুরুভূজ নামক জীবকে কর্ত্তন পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করা যায়, তৎসমুদায়ের প্রতিখণ্ড হইতেই এক এক পুরুভূজ উৎপন্ন হয়। অপর কোনও কোনও উদ্ভিদের একই পুষ্পে গর্ভকেশর ও পরাগ কেশর থাকে। আর অবশিষ্টগুলির সেরূপ নহে। কতকগুলি পুষ্প আছে, যাহাতে কেবল গর্ভকেশর ও বীজ কোষ থাকে। আর কতকগুলি পুষ্পে কেবল পরাগ কেশর থাকে। অনন্তর বায়ু প্রবাহে বা মধুলুব্ধ ভৃঙ্গগণের গমনাগমনে এক পুষ্পের পরাগ কেশর অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজ কোষের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করে। জীবগণের পক্ষে শেষোক্ত উপায়ই সতত লক্ষিত হয়। অচিন্ত্য শক্তি পরাৎপর পরম পুরুষের যে কত প্রকারই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য ভক্ত হৃদয়ে ভক্তি প্রবাহ বর্দ্ধিত করে, তাহার ইয়ত্তা করা মানবের অসাধ্য।" (ক)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বিবিধ উদ্ভিদ ও জীবদেহের নানা জাতীয় বীজ কি প্রকারে ভূমি ও জলে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই কার্য্য কি কৃষকের দ্বারা ভূমিতে গৃহ হইতে আনীত নানাবিধ শস্যের

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

বীজ রোপণের ন্যায় সম্পন্ন হইয়াছিল ? অর্থাৎ প্রথমে যত প্রকারের যত সংখ্যক উদ্ভিদ বা জীব* উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়, ততপ্রকারের ততটী বীজ কি কৃষকের ন্যায় পৃথিবীর নানা স্থানে পরম পুরুষ নিজ হস্তে রোপন করিয়াছিলেন ? কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিবেন না। তবে কি প্রকারে ঐ বীজ সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে পরম পিতার ইচ্ছায় পৃথিবীস্থ পঞ্চভূতের বিশেষতঃ জল ও ভূমির গঠন এরূপ হইয়াছিল যে তাহা হইতে ক্রমশঃ নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও জীবদেহের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে মানবের উৎপত্তি যে নিয়মে হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে। শুক্র ও শোণিত উভয়ই জড় পদার্থ মাত্র। উহারা গর্ভধারণ সমর্থা ঋতুমতী স্ত্রীগর্ভে উপযুক্ত পরিমাণে মিলিত হইলেই মানব দেহের সম্ভাবনা হয়। এস্থলেও যেমন উপযুক্ত কালে উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত পদার্থ সমূহের যোগে মানবদেহের সম্ভাবনা হয়, আদিতেও সেইরূপ পঞ্চভূতের উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত কালে উপযুক্ত ভূমিতে মিলনের ফলে মানবদেহের সম্ভাবনা হইয়াছিল। ঐ একইরূপে ভূত পঞ্চকের নানাবিধ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রণের ফলে উপযুক্ত দেশ ও কালে আদিতে সৃষ্ট নানা জাতীয় জীব দেহের সম্ভাবনা হইয়াছিল।** ইহা একমাত্র পরমপিতার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনিই পঞ্চভূতাত্মক দেহ সমূহ পঞ্চভূতের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে তিনি পঞ্চভূতের (জড়ের) এমন অবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহাতে জীবদেহের

---

* "ইতর জীবের কথা" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে উদ্ভিদও জীব। তবে যে উহাকে উদ্ভিদ মাত্র বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জীবকে পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে পাঠকের নিকট সরল ও পৃথকভাবে বিষয়টীকে উপস্থিত করিবার জন্যই সাধারণতঃ আমরা জীব জন্তু বলিলে উদ্ভিদকে বুঝিনা।

** বর্ত্তমানে যে সকল জাতীয় জীব দৃষ্ট হয়, তাহারা সকলেই আদিতে উক্ত প্রকারে সৃষ্ট হয় নাই। জীবের মধ্যে বহু বর্ণ সঙ্কর আছে।

উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মূল প্রণালীর কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই।

এই বিষয়টীকে আরও সরল করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কারণ, আদি জীব সৃষ্টি একটী কঠিন সমস্যা। উহার মীমাংসা যতই সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হয়, ততই ভাল বলিয়া মনে হয়। জীবদেহ জড় মাত্র, উহা জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জড়ত্ব হিসাবে ogranic and inorganic matter এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। এখন আমরা মানব শিশুর উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করি। পুরুষ এবং স্ত্রী দেহ হইতে যে শুক্র ও শোণিত বিনির্গত হয়, উহারাও জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার উহারা জড়ের ক্রিয়া দ্বারাই উৎপন্ন হয়। উহাতে অলৌকিক কোন ক্রিয়া থাকে না। উভয় পদার্থের মিলনে যে পদার্থ হয়, উহাও জড়। উহাই মানব-দেহের ভিত্তিভূমি। তৎপর মাতৃগর্ভে মাতৃ দেহের উপাদান ও শক্তি দ্বারা উহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৎপর যাহা হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা যদি চিন্তা করি যে পঞ্চভূতের বিশেষতঃ ভূমি ও জলের এরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল যে ঐরূপ উভয়বিধ পদার্থ এবং উহাদের মিশ্রণ অথবা মিশ্র পদার্থই ভূমিতেই সম্ভব হইয়াছিল এবং ভূমিই গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় (ক) সেই আদি সন্তানদিগের পক্ষে কার্য্য করিয়াছিলেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে বলিয়া মনে হয়। স্থূল, পৃথিবীই আদি-মানব বা আদি জীব সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। প্রত্যেক কার্য্যেরই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আলো-চিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীও সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। জীবের সৃষ্টি, পুষ্টি ও লয়ের জন্যই জড় জগতের সৃষ্টি। জড় সৃষ্টির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সাংখ্য দর্শন বলেন যে জড় পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের জন্যই, উহার অন্য কোন সার্থকতা নাই। Plato এবং Aristotle প্রভৃতি দার্শনিকগণও বলেন যে বিশ্ব একটী

(ক) জলচর জন্তুদিগের পক্ষে জলই মাতৃস্থানীয় হইয়াছিল।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সৃষ্ট। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণও বলেন যে যে জীবগণ যে নিম্নতম স্তর হইতে মানব পর্য্যন্ত উন্নীত হয় ইহারও অবশ্য একটী উদ্দেশ্য আছে। যখন বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই এবং যখন জীব সৃষ্টি ব্যতীত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের পথে জড়কে যখন যেরূপ অবস্থায় আনয়ন করা আবশ্যক, পরম জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতার ইচ্ছায়ই সেইরূপ অবস্থায় পৃথিবী আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আসিবে। পৃথিবী যে আদি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত একই অবস্থায় অবস্থিত নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কত অসংখ্য প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রেমময়ী বিশ্বলীলার কর্ত্তা পরমপিতা তাঁহার সুমহতী ইচ্ছা দ্বারা পৃথিবীকে যথাকালে জীবদেহ উৎপত্তির উপযুক্ততা দান করিয়াছেন, ইহা অযৌক্তিক নহে। পাঠক ইহা মনে করিবেন না যে আমরা ইহা বলিতেছি যে পরম ইচ্ছাময় পরমপিতা ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি জীব উৎপন্ন হইল। তাঁহার বিশাল সৃষ্টির সকল কার্য্যই ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত এবং তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বদাই প্রণালী বিশেষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। সাধারণে মনে করেন যে পরমপিতা যাদুকরের মন্ত্রের ন্যায় ইচ্ছামাত্র সকল করিয়াছেন ও করেন। সৃষ্টি ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই মত সমর্থন করিবেন না। সুতরাং ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে পরম পিতা পৃথিবীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাঁহারই ইচ্ছায় উহা হইতে আপনা আপনি উপযুক্ত কালে উপযুক্ত দেশে জীবদেহ সমূহ ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। Prof Calvin says :—Spontaneous generation must have occurred long ago, when there was no living thing on the surface of the Earth. (Quoted from an article written by Mr Govinda Behari Lal in the Amrita Bazar Patrika of the 7th June 1959).

আমরা জড় জগতে কি দেখিতে পাই? ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বলেন যে বিবিধ পরমাণুর নানাপ্রকার সংযোগে এই বিচিত্র বিরাট বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানও বলেন যে Electron, Protone প্রভৃতির নানাপ্রকার সংযোগে নানা পদার্থের পরমাণু (Atom) প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ মিলনের ব্যতিক্রম করিতে পারিলেই এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হইতে পারে। বিজ্ঞান ইহাও বলেন যে কাষ্ঠখণ্ড প্রথমতঃ অঙ্গারে পরিণত হয় এবং উহা আবার হীরকে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে এমন বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে যথাকালে আদি ভূত সমূহের নানা প্রকার সংযোগ বিয়োগে নানা প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী আদিতে Hot gaseous matter মাত্র ছিল। পৃথিবীতে দৃষ্ট অসংখ্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, আমাদের সর্ব্বজন বিদিত ও সর্ব্বজন সুলভ জল ও মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আদিতে ছিল না। সেই পূর্ব্বোক্ত বায়বীয় পদার্থই ক্রমশঃ কিরূপ অবস্থা ধারণ করিয়াছে, তাহাত আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এইরূপ বিধানের কর্ত্তা যে একজন আছেন, ইহা যে জড়ের কেবল মাত্র automatic Physical and Chemical combination এর ফল মাত্র নহে এবং সৃষ্টি যে আকস্মিকও নহে, সেই সম্বন্ধে আমরা সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans এর মত ইতিপূর্ব্বে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে (১৫৪, ১৫৫, এবং ১৫৬ পৃষ্ঠায়) দেখিতে পাইয়াছি। সৃষ্টি হঠাৎ আপনা আপনি হয় নাই বা হইতেও পারে না। Chance বলিয়া কোন কিছু নাই। Darwin এর Chance Variation theory আধুনিক Biologistগণ স্বীকার করেন না। আবার এই বিরাট বিশাল জটিলতাপূর্ণ বিশ্ব অন্ধ অচেতন শক্তিমাত্রের স্বাধীন ক্রিয়ায় সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এই বিশ্ব জ্ঞানও সুশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা যায়। বৈজ্ঞানিকই বলেন যে জড়কে চালাইলে চলে, থামাইলে

থামে এবং জড় স্বাধীন নহে। উহা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। তথাপিও বৈজ্ঞানিক কেন স্বীকার করিবেন না যে এই জগতের স্রষ্টা এবং পালন কর্ত্তা অবশ্যই জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাময়। সর্ব্ব শাস্ত্রই বলেন যে অন্ধ জড়কে চালাইতে একজন স্বাধীন চৈতন্যময় পুরুষের আবশ্যকতা আছে। সেই চৈতন্যময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত প্রেমময় পরম পুরুষই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, God প্রভৃতি নানা নামে উক্ত হন। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই অনুমান করিতে পারি যে ব্রহ্মই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা পৃথিবীর এমন অবস্থা ক্রমশঃ আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহাতে ভূমি জল হইতে জীবদেহের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। অন্যান্য সকল প্রকার জড় পদার্থই যখন তাঁহারই ইচ্ছায় পঞ্চভূত হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতে সমর্থ হইয়াছে, তখন জীবদেহও যে সেই একই ইচ্ছা শক্তি দ্বারা একই প্রণালীতে পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে, তাহাতে অসম্ভাব্য কিছুই নাই। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে জীবদেহ জড় মাত্র, উহা অন্যান্য জড় অপেক্ষা বিভিন্ন নহে। স্বর্ণ, হীরক বা অন্যান্য Inorganic matterও যেরূপ, Organic জীবদেহ সেইরূপ। যে প্রভেদ উহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহা উহার রচনা কৌশল এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বপ্রকারের সর্ব্বজীব দেহে আত্মার বর্ত্তমানতা ও ক্রিয়া। দেহের মৃত্যু হইলে উহা কখনও সজীব দেহের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না, উহা সাধারণ জড়ে পরিণত হয়। আর এই সৃষ্টি ব্রহ্মের প্রেমলীলা মাত্র। ইহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই লীলার উদ্দেশ্য যখন জীব সৃষ্টি ভিন্ন সংসাধিত হওয়া একান্তই অসম্ভব, তখন তিনি যে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যান্য সকল পদার্থের ন্যায় জড় পদার্থ হইতে জড়ীয় জীবদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সহজেই ধারণা করা যায়। যিনি ব্যোম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ভূত সমূহ এবং তৎপর অসংখ্য অসংখ্য জটিলতা পূর্ণ জড় পদার্থ রচনা করিয়াছেন এবং সু-শৃঙ্খল ভাবে চালনা করিতেছেন, তিনি তাঁহার অপার শক্তিময়া ইচ্ছা দ্বারা কেন যে জড় পদার্থ হইতে জড়ীয় দেহ রচনা করিতে পারিবেন

না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দুইটী বিষয় স্মরণে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রত্যেক জীবদেহে আত্মা বর্ত্তমান এবং সেই জন্যই দেহের বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ ঃ—জীব ভিন্ন বিশ্ব সৃষ্টি একান্তভাবে ব্যর্থ। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে এই বিরাট বিশ্ব যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, পুষ্ট ও চালিত হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় জীবদেহও সৃষ্ট হইয়াছে। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হয় যে তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তিনি জীবদেহ সৃষ্টি করিতে পারেন না। আবারও বলি যে জীবদেহ জড় পদার্থের একটী প্রকার মাত্র এবং জড় হইতে তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ রচিত হইয়াছে। যদি বলেন যে বর্ত্তমান নিয়মে যে সৃষ্টি হইতেছে, তাহা আদি নিয়ম হইতে বিভিন্ন, তবে বলিতে হয় যে বর্ত্তমানেও ত সৃষ্টি-প্রণালীর প্রকার ভেদ দেখা যায় অর্থাৎ সকল প্রকার জীবই একই প্রণালীতে সৃষ্ট হয় না। সুতরাং আদিতে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।* সামান্য ব্যতিক্রম দেখিয়াই সেই নিয়ম অসম্ভব মনে করিতে হইবে না। কারণ, Exception only proves the rule. যাহা হউক্, এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে ইতঃপর লিখিত হইতেছে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও অণ্ডজ জীব সম্বন্ধে মনে করা যাইতে পারে যে আদি নিয়মে তাহাদের সৃষ্টি অসম্ভব নহে। কিন্তু জরায়ুজ জীব কি প্রকারে প্রথমতঃ আদি নিয়মে সৃষ্ট হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যিনি এই বিরাট বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি ইহার লালন, পালন, বর্দ্ধন ও রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই এমন বিধান অবশ্যই করিয়াছিলেন, যাহাতে জরায়ুজ জীব-সমূহের দেহবীজও লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হইয়া যথা-কালে তত্তৎ জীবাকারে পরিণত হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে

* ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে আদি প্রণালী এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে মূলতঃ কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই।

বর্ত্তমান জরায়ুজ জীব সমূহের আদি পুরুষগণ অণ্ডজই ছিলেন এবং অণ্ডই সেই বীজকে ভরণ পোষণ করিয়া যথাকালে পৃথিবীকে তত্তৎ জীবাকারের জন্তুগণ দান করিয়াছেন। এখনও স্থলচর, জলচর এবং উভচর বহু প্রকার জন্তুদিগের দেহবীজ অণ্ডাকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই সেই ডিম্ব হইতেই তত্তৎ প্রকারের জীবগণ বহির্গত হয়। কুম্ভীরের ন্যায় বৃহৎ জীবের দেহও প্রথমতঃ অণ্ডে রক্ষিত হয়। এখনও যাঁহার প্রেমের বিধানে ঐ রূপ সংঘটিত, আদিতেও সেইরূপ একমাত্র তাঁহারই প্রেমের বিধানে জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ জীবেরই আদি দেহ-বীজ সৃষ্ট, সংরক্ষিত ও জীবদেহাকারে পরিণত হইয়াছিল। আমরা জগতে অসংখ্য প্রকার জীব, অসংখ্য প্রকার দেহ, অসংখ্য কার্য্যের অসংখ্য প্রণালী দেখি। জগৎ অতীব বিচিত্র, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই অতি বিচিত্রতার মধ্যে মূল প্রণালী একই। Unity in diversity তত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষাই সৃষ্টির মূল কারণ এবং ইহার জন্যই সৃষ্টিতে এত অধিক বিচিত্রতা। আমরা আরও দেখিতেছি যে সৃষ্টিতে জীবদেহ সৃষ্টির একমাত্র প্রণালী বর্ত্তমান নহে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ চারি প্রকার জীবের দেহ সৃষ্টির মূল প্রণালী এক হইলেও কার্য্যতঃ কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বৃক্ষের উৎপত্তি বীজ হইতেও হয়, আবার উহাদের শাখা প্রশাখা ভূমিতে রোপন করিলেও উহারা বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সুতরাং জীবদেহ রচনায় বৈচিত্র্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত আদি সৃষ্টির প্রণালী যে সত্য এবং যুক্তিযুক্ত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এখন দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ—আদি নিয়মে এখনও সৃষ্টি হইতেছে না কেন? দ্বিতীয়তঃ—যদি দ্বিবিধ নিয়মই সমর্থিত হয়, তবে এরূপ বিভিন্ন নিয়মের কি আবশ্যকতা ছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইতঃপর লিখিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এই যে প্রকৃতিতেও

সৃষ্টির বহু বিভিন্ন বিধান দেখিতে পাই। বৃক্ষের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পাঠক স্মরণ করুন্। আমরা আরও দেখিয়াছি যে কোনও কোনও উদ্ভিদের একই পুষ্পে গর্ভকেশর ও পরাগকেশর থাকে, আর অবশিষ্ট গুলির সেরূপ নহে। জগতে চারিপ্রকার জীবের জন্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আবার ইহাও সত্য যে সকল বিধানই একই উদ্দেশ্যে গঠিত এবং উহারা বহু হইয়াও একই মহাবিধানের অন্তর্গত। সুতরাং জগতে বৈচিত্র্য দেখিয়া কোনই ভ্রমের আশঙ্কা করা যায় না। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে বৈচিত্র্যের মূলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা বর্ত্তমান।

প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত বিষয়টীকে আরও সরল করিবে। কোনও স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া তথায় জল রাখিয়া দিলে দেখিতে পাইবে যে কয়েক দিন বা কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতেই উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উৎপন্ন হইয়াছে। এ মৎস্য কোথায় হইতে আসিল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ মৎস্যের বীজ ঐ জলে বা ভূমিতে ছিল। আরও দেখ, কোনও পাত্রে জল রাখিয়া তাহা আবৃতপ্রায় অবস্থায় রাখিয়া দিলে কিছুকাল পরে ঐ জলে পোকা জন্মে এবং বহু সংখ্যক মশক ঐ জলের পাত্রে দৃষ্টি গোচর হয়। এ কীট ও মশক কোথায় হইতে আসিল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ জলে বা ঐ জলান্তর্গত ক্ষিতিভাগে উহাদিগের বীজ বা অণ্ড সন্নিবেশিত ছিল, পরে উহা যথোচিত আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যে কেবল ক্ষুদ্র জীবগণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। অতি বৃহৎ হস্তী গণ্ডার প্রভৃতির প্রথম উৎপত্তিও ঐ নিয়মেই হইয়াছে। এমন কি জীব শ্রেষ্ঠ মানব দম্পতি সমূহও প্রথমে ঐ নিয়মে স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। পরে উদ্ভিদাদির ন্যায় স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে উহাদিগের 'বংশবৃদ্ধি হইয়াছে। পৃথিবীস্থ প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থেই প্রথমতঃ একটী নর ও একটী নারীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পারলৌকিক মহাত্মারা বলেন যে পৃথিবীতে ষষ্টি সংখ্যক নর দম্পতির উৎপত্তি হয়। ইহারা যে পৃথিবীর কোন এক স্থানেই উৎপন্ন

হইয়াছিলেন, তাহা নহে। "এই ষষ্টি সংখ্যক দম্পতির মধ্যে বহু স্থানেই একটী নর ও একটী নারী জন্মিয়াছিলেন। কেবল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসিয়া ভাগে অর্থাৎ আস্য খণ্ডে বহু দম্পতির উদ্ভব হয়" (ক)। আমাদের মনে হয় যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দম্পতির উদ্ভব হওয়ায় বহু শত যোজন ব্যাপী স্থানে একটী মাত্র দম্পতির উদ্ভব হইয়াছিল বলিতে হইবে। তাই সেই দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিতে একটী নর ও একটী নারীর জন্ম হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই আদিকালে এক স্থানের নর নারীর পক্ষে অন্য স্থানের নর নারীর সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান থাকা সম্ভব ছিল না। ধরা যাউক্, ভারতবর্ষ, উত্তর মেরু প্রদেশ, চীনদেশ, পশ্চিম এশিয়া, মিসর, গ্রীস, জার্ম্মেনি, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এক একটী দম্পতির উদ্ভব হইয়াছিল। আদিকালের নরনারীর জ্ঞান, শক্তি ও সুবিধা (amenities of life) সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই সেই স্থলের নর নারী ও তাঁহাদের বংশধরগণ বহু পুরুষ পর্য্যন্ত নিজদিগকেই পৃথিবীর একমাত্র অধিবাসী বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে পৃথিবীতে আদিতে একটী নর ও একটী নারী মাত্র সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করে। ইহা প্রথমতঃ কিম্বদন্তি ভাবে বংশ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। যখন বহুকাল পরে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত হয় অথবা বিধিবদ্ধ ভাবে বাচনিক প্রচার হয়, তখন উহাই তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই কালের নর নারীর এক সময় ধারণা ছিল যে তাঁহাদের বাসস্থানই পৃথিবী. তাঁহাদের জ্ঞাত দেশ ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন স্থান নাই। সুতরাং তাঁহাদের ধারণা অনুযায়ী যাহা তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সেই সেই দেশের তত্তৎকালীন নানাভাবের অবস্থা চিন্তা করিলে এক অর্থে সত্যই মনে করিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে উৎপন্ন নর নারীর সংখ্যা সমষ্টিভাবে চিন্তা করিলে উহা যে সত্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রচারিত তথ্য অর্থাৎ ষষ্টি সংখ্যক দম্পতি বা সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর নানা স্থানে বহু দম্পতির উদ্ভব

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

যুক্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এখন প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে পূর্ব্ব বা আদি নিয়মে এখনও জীব সৃষ্টি হয় না কেন। ইহার কারণ প্রয়োজনাভাব। সৃষ্টিতে যাহার যখন আবশ্যকতা নাই, তাহা তখন থাকে না। "এক্ষণেও যে সকল মণ্ডলে (জ্যোতিষ্কে) জীবোৎপত্তি হয় নাই, তথায় ঐ নিয়মের সবিশেষ প্রয়োজন জন্য উক্ত প্রকারেই তথায় জীবের উৎপত্তি হইতেছে; কিন্তু পৃথিব্যাদি গ্রহে আর উহার প্রয়োজন নাই, কেননা এই সকল গ্রহাদিতে জীব দম্পতি হইতেই জীবের উৎপত্তি হইতেছে। যদি বল যে উভয় প্রকারেই কেন এখনও মানবাদির উৎপত্তি হউক না? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে মৎস্যের উৎপত্তির বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখ। যেখানে অন্য বহু মৎস্য থাকে, তথায় যেমন ঐ নিয়ম খাটে না, অন্য জীব সম্বন্ধেও তাহাই জানিবে। কেন না, যেখানে যে জীব বহু সংখ্যক উৎপন্ন হয়, তথায় খাদ্যাদির সহযোগে ঐ সকল মুল বীজ বা অণ্ড জীবগণের দেহস্থ হইয়া যায়। অথবা জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ও শারীরিক উত্তাপাদির জন্য ঐ সকল বীজ বা অণ্ড আর কার্য্যকরী হইতে অর্থাৎ আদিম উৎপত্তির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না" (ক)।

Dr. Calvin says :—There was pre-biotic time, a time when there was nothing living on the surface of our globe. Then it was possible for a large amount of organic material to be generated by a non-biological process, such as self-reproduction. But this cannot happen to-day. There exists everywhere organisms, minute and large, which would consume, would transform any such organic matter as soon as it is found, even small amounts". Mr. Govinda Behari Lal remarks :—Only then in a world without a living thing, could the most primitive forms

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

of life come out of non-living substance. (Quoted from an article witten by Mr. Govinda Behari Lal in the Amrita Bazar Patrika of the 7th June 1959).

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পরমপিতার বিবংহুস্নিষা অর্থাৎ আপনাকে বহুভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। সেই ইচ্ছার উদয়ের পরম শুভমুহূর্ত্ত হইতেই সৃষ্টির সূচনা। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে জীবাত্মা সমূহ স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু তাঁহারই নিজ ইচ্ছায় তাঁহারই গুণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন দেহে তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে যেন আবদ্ধ হইয়া অংশ ভাবে (জীবাত্মা ভাবে) ভাসমান হইতেছেন। সুতরাং দেহ যেমন তাঁহার ইচ্ছায় পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইতেছিল, তিনিও সেই সকল দেহে তেমনি জীবাত্মা ভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। স্থূল, পরমপিতার ইচ্ছাই সকল সৃষ্টির মূলে। তাঁহার ইচ্ছায় জীবদেহের উৎপত্তি এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই তিনি বিভিন্ন দেহে যুক্ত হইয়া বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছুই সম্ভব হয় নাই বা হইতেও পারে না। সুতরাং সেই সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছাকে বাদ দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব ধারণা করা অসম্ভব।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা সফল হয় না যদি তিনি নিজে বহুভাবে অর্থাৎ বহু জীবভাবে ভাসমান না হন। আবার যদি তিনি প্রত্যেক দেহে যুক্ত না হন, তবে বহুভাবে ভাসমান হওয়া সম্ভব হয় না। তাই দেহকে আত্মার আবরণ রূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে আত্মা নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থায় যাইতে পারিবেন, অর্থাৎ প্রায় গুণশূন্য অবস্থা হইতে সর্ব্বগুণ-সম্পন্না অবস্থা অর্থাৎ প্রায় পূর্ণাবস্থা লাভ করিবে। এই প্রণালীতেই তাঁহার গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে।* সুতরাং এইভাবে চিন্তা করিলেও বুঝা যায় যে ব্রহ্মের

* এই সম্বন্ধে "ইতর জীবের কথা", "জড়ের বাধকত্বের কারণ", "গুণ বিধান," 'চিদাভাস" (মায়াবাদ) এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ সমূহ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছায়ই দেহ সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি দেহে দেহে জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তিনি দেহে যুক্ত না হইলে জড় জড়ই থাকিত। কোন পদার্থের Physical and chemical combination-এ দেহে জ্ঞানের বিকাশই সম্ভব হইত না, আত্মোন্নতি প্রভৃতি দূরের কথা।

আদিতে নানা জাতীয় জীবগণের উৎপত্তি অল্পকাল ব্যাপী হয় নাই। বরং উহাতে যে অতি সুদীর্ঘকাল ব্যয়িত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। সৃষ্টির সকল ব্যাপারে আমরা ক্রম প্রণালী দেখিতে পাই। সুতরাং এখানেও সেই ক্রম প্রণালীর কোনই ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সুতরাং ইহাই সম্ভব যে দেশ ও কালের অবস্থানুসারে এক এক জাতীয় জীব পর পর উৎপন্ন হইয়াছে. অথবা অতি অল্প সংখ্যক জাতীয় জীবগণ সমকালে পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পর পর এইরূপ ভাবেই পৃথিবীতে বর্ত্তমানে দৃষ্ট এবং লয় প্রাপ্ত অসংখ্য প্রকার জাতীয় জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার নানা জাতীয় জীব হইতেও নানা প্রকারের উদ্ভিদ এবং জীব উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এস্থলে আদিতে উৎপন্ন নর দম্পতির সংখ্যার বিষয় আমরা স্মরণ করি। আদিতে উৎপন্ন ইতর জীবগণের সংখ্যাও সেইরূপ অল্পই ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ নিম্নস্তরে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক ইতর জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বতন জীবগণ জন্মান্তর প্রণালীর নিয়মানুযায়ী পরবর্ত্তীকালে নিজ নিজ স্তরে এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উৎপন্ন জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই ভাবেই "ইতর জীবের কথা" অংশে লিখিত জীবের ক্রম বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। অর্থাৎ জীবাত্মা প্রথমতঃ অতি নিম্ন স্তরের দেহে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর দেহে জন্মগ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আবার সেই একই মঙ্গল বিধানে মানব পরলোকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ ধারণ করিয়া অনন্ত প্রায় জীবনের অসংখ্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ধন্য অনন্ত প্রেমময়! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব

প্রেমের বিধান! যে বিধানে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে জগতে আসিয়াছি, যে বিধানেই আমরা তোমার অমৃতময় প্রেমক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া তোমারি জগতে থাকিয়া তোমারি অপার দয়ায় তোমারি অনন্ত গুণ লাভে সমর্থ হইব, যে বিধানে তোমারি দত্ত অনন্ত প্রায় জীবনে তোমারি জ্ঞান-প্রেমানন্দ সুধা চিরকাল পান করিব।

এস্থলে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "প্রথমে জলচর জীবের সৃষ্টি হয়। জলচর দিগের মধ্যেও প্রথমে মৎস্যের উৎপত্তি অনুমিত হয়। একারণ শাস্ত্রেও মৎস্যাবতার প্রথম অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক জলচর জীবের সৃষ্টির পরে উভচর জীবের উৎপত্তি হয়। উভচর জীবের মধ্যেও প্রথমে কূর্ম্মোৎপত্তি অনুমতি হয়। এ কারণ শাস্ত্রকারেরা মৎস্যাবতারের পরে কূর্ম্মাবতারই দ্বিতীয় অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনন্তর, স্থলচর জীবের উৎপত্তি হইতে থাকে। স্থলচরের মধ্যে প্রথমে বরাহজাতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। একারণেই বরাহবতার তৃতীয় অবতার বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্তর, বহু সংখ্যক স্থলচর জীবের উৎপত্তির পরে নরজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।" "ক্রম-সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে বনমানুষকে নরজাতির পূর্ব্বসৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়। অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন পরম-পুরুষের ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নর মিথুনের উৎপত্তি হইলে তাহাদের মৈথুন ধর্ম্মে বহু সংখ্যক নর নারী উৎপন্ন হইল। এক্ষণে বক্তব্য এই যে নরজাতিও প্রথমে অতি বৃহদাকার-বিশিষ্ট ছিল। এই জন্যই বোধ হয় মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ—এই তিন অবতারের পরেই নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। নৃসিংহ শব্দে অর্দ্ধনর, অর্দ্ধ-সিংহ—এতাদৃশ আকার বিশিষ্ট বলিয়া যে পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে, উহা অলঙ্কার-মায়াজালে আচ্ছাদিত, প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ "ভূরি-শক্তিসম্পন্ন বৃহদাকার মনুষ্য"। অন্যদিকে বিবেচনা করিলেও তৎকালীন মানবগণ উন্নত শরীর, দ্রঢ়িষ্ঠ দেহ, সবলকায় ও নির্ভীক ছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। কেননা, ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন না হইলে

বিবিধ হিংস্র জন্তুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করা, গৃহ-নির্ম্মাণে অসমর্থ, অস্ত্র নির্ম্মাণে অশক্ত এবং জ্ঞান-ধর্ম্মে অনুন্নত তৎকালীন নরনারীর পক্ষে অসাধ্য হইত। নৃসিংহ অবতারের পরেই বামন অবতার। এই সময় নরগণ গৃহ-নির্ম্মাণ ও খাদ্য-লাভের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অধ্যাত্মতত্ত্বে মনোযোগী হইলেন, সুতরাং পূর্ব্ববৎ একমাত্র শারীরিক পরিশ্রম আর তাঁহাদের অবলম্বনীয় ছিল না। এজন্য অর্থাৎ শারীরিক শ্রমের অল্পতায় শরীরও ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেমন মানবদেহের খর্ব্বতা সংঘটিত হইতেছিল, তেমনি অন্যান্য বৃহদাকার ও শক্তিশালী ইতর প্রাণিগণও ক্রমশঃ খর্ব্বকায় ও অল্পশক্তিক হইতে লাগিল।" "অতঃপর শাস্ত্রে যে পাঁচটী অবতারের অর্থাৎ পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কির উল্লেখ আছে, সে সকল মানবের সবিশেষ কার্য্য জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাতে প্রকৃত সৃষ্টি তত্ত্ব সংক্রান্ত কোনও রহস্য নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পরশুরাম অবতারও প্রথমোক্ত পাঁচটী অবতারের ন্যায় গূঢ়ভাব ব্যঞ্জক। কারণ, ঐ সময়েই মানবগণ অস্ত্রবিদ্যায় ভূয়সী উন্নতির সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরন্তু পরশুরাম যখন ইতিহাস-খ্যাত, তখন ঐরূপ কল্পনা না করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ বামন অবতারের পূর্ব্বেই মানবগণ শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিদ্যায় সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

First beginning of life অর্থাৎ প্রথম জীব সৃষ্টি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের একটী কঠিন সমস্যা। জড়বাদী (Materialist) বলেন যে প্রথমতঃ Protoplasm Cell কেবল মাত্র জড়ের নানাবিধ Physical and Chemical Combination-এ সম্ভব হইয়াছে। তাহারা আরও বলেন যে এই সকল ব্যাপার জড় পদার্থের আকর্ষণ, বিকর্ষণে হঠাৎ সম্ভব হইয়াছে অর্থাৎ জড়েরই শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নাই। ইহা যে সত্য নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৃষ্টিতে আকস্মিকতা (Chance) বলিয়া কোনও বস্তু বা অবস্থা নাই, সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। নতুবা সৃষ্টি এরূপ সুশোভনা, সুশৃঙ্খলাপূর্ণা

এবং জ্ঞানময়ী হইতে পারিত না। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে ক্রমবিকাশের (Evolution এর) পশ্চাতে অবশ্যই একটী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। উদ্দেশ্য স্বীকার করিলেই সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরেচ্ছা বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। এস্থলে ১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ স্মরণ করি। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans ও বলিয়াছেন যে সৃষ্টি হঠাৎ আপনা আপনি হয় নাই।

এ বিষয়ে আর একটী কল্পনা এই যে জীবদেহের বীজ পৃথিবীতে অন্য মণ্ডল হইতে আগমন করিয়াছে। এইরূপ কল্পনাকারী বলেন যে উল্কা জাতীয় পদার্থের সহিত উহা পৃথিবী মণ্ডলে আসিয়াছে যদি এই কল্পনা সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে প্রশ্ন হইবে যে, যে মণ্ডল হইতে জীবদেহ বীজ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই মণ্ডলে জীব কোথায় হইতে আসিল? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে সেই একই প্রকারে অন্যমণ্ডল হইতে সেই মণ্ডলে জীবদেহ বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যদি আমরা শেষ মণ্ডলে উপস্থিত হই, তবে বলিতে হইবে যে সেই শেষ মণ্ডলে একমাত্র পরমপিতার ইচ্ছায়ই জীবদেহের উৎপত্তির সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং যখন পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ জীবসৃষ্টির কল্পনা করিতেই হইবে, তখন পৃথিবীতেই তিনি ইচ্ছা করিয়া জীবদেহের সৃষ্টির বিধান করিলেন ও তিনি স্বয়ং তাহাতে যুক্ত হইলেন, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। এই মীমাংসা যে আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি ইহাও সত্য।

নানা জাতীয় জীব ক্রমান্বয় সৃষ্ট হইয়াছে। যাহার যখন প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্বে বা পরে কোন জাতীয় জীব সৃষ্ট হয় নাই, অথবা যখন যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সৃজন ও পোষণের জন্য পূর্ব্বে যাহা সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়, তাহাই তত্তৎ কালে উৎপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গাদি হইতে মনুষ্য দেহ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে উহাদের দেহের গঠন ক্রমশঃই উন্নত ধরণের এবং যতই

জীবের উন্নত স্তরে আসা যায়, ততই জ্ঞান বিকাশের উপযোগী পদার্থ সেই সকল দেহে অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে এবং রচনা কৌশলও ক্রমোন্নত। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পৃথিবীতে যত প্রকার জীব জন্তু বৃক্ষ লতা দেখা যায়, হুবহু ঐ সকল জাতিই যে আদিতে উক্ত প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবের মিলনেও নানা জাতীয় জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

নানাবিধ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে পৃথিবীতে যত প্রকার ইতর জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, উহাদের সকলের বংশ এখন বর্ত্তমান নাই। কোন কোন জাতীয় জীবের বংশ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কোন জীবজাতি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়াও যেরূপ চলিতেছে, লয় ক্রিয়াও সেইরূপই চলিতেছে। জগতে যাহার যখন প্রয়োজন, তখন তাহার সৃষ্টি হয়। যতকাল উহার প্রয়োজন থাকিবে, ততকাল উহা সৃষ্টিতে থাকিবে। আবার জগতে যখন যাহার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন সেই পদার্থের লয় হইবে। ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্ব। ইহার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ এক অচিন্ত্য দূরবর্ত্তী কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইবে, বিশ্বের লয়ও তখন সম্পন্ন হইবে।

"জীবের ভেদের কারণ দেহ। ইতর জীবগণ তমঃপ্রধান বা রজস্তমঃপ্রধান, কিন্তু মানব সত্ত্বপ্রধান বা রজঃ-সত্ত্বপ্রধান। ইহাই প্রভেদ। কিন্তু একাদৃশ দুর্ভাগ্য মানবেরও অভাব নাই যে তাহারা রজস্তমঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান (ক)"। "জীবদেহ ত্রিবিধ। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। প্রথম কারণ-শরীরের উৎপত্তি, তৎপরে তাহা হইতে সূক্ষ্মশরীরের এবং তদনন্তর সূক্ষ্মদেহ হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। আবার স্থূলের লয়ে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের লয়ে কারণ এবং কারণ শরীরের লয়ে পূর্ণভাবে মুক্তি। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহই আমরা ধারণ করিতেছি (খ)"। অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান দেহের ভিতর অনন্তপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডবাসের উপযুক্ত অসংখ্য স্থূল, সূক্ষ্ম ও

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা। (খ) তত্ত্বজ্ঞান—সাধনা।

কারণদেহ বর্ত্তমান। সাপ যেমন খোলস বদলায়, আমরাও ইহলোক হইতে বিদায় নেওয়ার পর আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুযায়ী পরলোকে উপযুক্ত মণ্ডলে যাই এবং সেই স্থানের উপযুক্ত দেহ ধারণ করি। এই দেহত্যাগ চিরকাল চলিবে। কারণ, আমাদের উন্নতি অনন্ত এবং মণ্ডল সংখ্যা অসংখ্য। স্থূল শরীরের সংখ্যা ৩৯৯, সূক্ষ্ম শরীরের সংখ্যা ৩৯৯ কম পরার্দ্ধ এবং কারণশরীরের সংখ্যা অনন্ত প্রায়। অথবা স্থূলদেহের সংখ্যা ৯৯, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহেব সংখ্যা ৩০০, সূক্ষ্মদেহের সংখ্যা ৩৯৯ কম কোটী, সূক্ষ্ম-কারণদেহের সংখ্যা কোটী কম পরার্দ্ধ। কারণদেহের সংখ্যা অনন্তপ্রায়।

কেহ কেহ বলেন যে কারণশরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের এবং সূক্ষ্ম শরীর হইতে স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয় না। স্থূলশরীরই মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয় এবং উহাই শেষে সূক্ষ্মশরীরে এবং তদনন্তর কারণশরীরে পরিণত হয়। আমাদের মনে হয় যে পরমর্ষি গুরুনাথের পূর্ব্বোক্তিই সত্য। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে অব্যক্ত গুণ হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার ক্ষিতি অপে, অপ তেজে, তেজঃ মরুতে এবং মরুৎ ব্যোমে লয় হয় এবং মহাপ্রলয়ে ব্যোম অব্যক্তে লীন হইবে। অর্থাৎ এই ভাবে উৎপত্তি ও লয়ে বৃত্ত (circuit) পূর্ণ (complete) হইবে। সেইরূপ অব্যক্তজাত ভূত পঞ্চক হইতে ব্যোম প্রধানভাবে কারণদেহ, তৎপর উহা হইতে মরুত্তেজঃ প্রধামভাবে সূক্ষ্মদেহ এবং সূক্ষ্মদেহ হইতে অপ্-ক্ষিতি-প্রধান ভাবে স্থূল দেহের উৎপত্তি হইয়াছে (গ)। আর স্থূল দেহের লয়ে সূক্ষ্মদেহ, সূক্ষ্মদেহের লয়ে কারণদেহ এবং মহাপ্রলয়ে সেই কারণ দেহের লয়েও দেহী পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। অতএব এস্থলেও বৃত্ত পূর্ণ হইল।

এখন প্রশ্ন হইবে যে কারণ ও সূক্ষ্মদেহ প্রথমতঃ কোথায় ও কিভাবে সৃষ্ট হয়। এই প্রশ্ন সুকঠিন। অনন্ত জ্ঞানাধার, অনন্ত দয়ায়

(গ) পাঠক মনে রাখিবেন যে পঞ্চীকরণের পর প্রথম সৃষ্ট পঞ্চভূতে ...স নাই।

পরমপিতা আমাকে সত্য জ্ঞান দানে এই সমস্যার সমাধান করিতে আমার সহায় হউন্, ইহা তাঁহার নিকট আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

আমরা "ইতর জীবের কথা" অংশে দেখিতে পাইব যে জীব মাত্রেরই প্রথম জন্ম জীবরাজ্যের নিম্নতম স্তর সমূহের কোনএকটী স্তরে। প্রত্যেক সৃষ্ট আত্মারই দেহের সংখ্যা অনন্ত প্রায়।* সুতরাং বিশ্বের সমগ্র জীবরাজ্যের অসংখ্য দেহ সহ জীবের প্রথম জন্ম সেই কোন একটী নিম্নতম স্তরে সংঘটিত হয়। সুতরাং সকল প্রকার সকল দেহের মূল ভিত্তি সেই দেহে পত্তন হয়। আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য মানবজন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গর্ভধারণসমর্থা স্ত্রীগর্ভে ঋতুকালে যখন পুরুষ বীজ উপ্ত হইল, তখন শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া অনন্ত প্রেমাধার পরমপিতার ইচ্ছায় মাতৃদেহের শক্তি-তেই উহা দেহাকারে পরিণত হইতে থাকে। যখন ঐ দেহে প্রারম্ভিক অবস্থা থাকিতে থাকিতেই হৃদয়গুহা প্রস্তুত হইল, তখনই লিঙ্গ দেহা-বস্থ জীবাত্মা উহাতে প্রবেশ লাভ করেন। এস্থলে "লিঙ্গ দেহাবস্থ জীবাত্মা" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে নারীগর্ভে জীবের প্রথম জন্ম হয় না। জীব নিম্নস্তরে ইতরজীব ভাবে বহুজন্ম ধারণ করিয়া পরমপিতার অপার দয়ায় দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে। সুতরাং মানবাত্মা কেবল স্বয়ংভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন না, কিন্তু তিনি লিঙ্গদেহ সহ প্রবিষ্ট হন। এই দেহকেই অঙ্গুষ্ঠস্থ জীবদেহও বলা হইয়া থাকে।

Darwin's "Descent of Man" হইতে নিম্নে এই সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—"Man is developed from an ovale about the 125th of an inch in diameter, which differs in no respect from the ovales of other animals. The embryo itself at a very early period can hardly be distinguished from that of other members of the vertibrate kingdom. At this period the arteries

* "সৃষ্ট আত্মা" অর্থে দেহাবন্ধাবস্থায় ভাসমান জীবাত্মাকে বুঝাইয়াছে।

run in arch-like branches as if to carry the blood to branchiae which are not present in the higher vertebrata though the slits on the side of the neck still remain marking their former position. At a somewhat later date when the extremities are developed, "the feet of lizards and mammals," as the illustrious Von Bayer remarks ' the wings and feet of birds, no less than the hands and feet of man all arise from the fundamental form." "It is" says Prof Huxley, "quite in the later stages of development that the young human being present marked differences from the young ape, while the latter departs as much from the dog in its developments as the man does. Startling as the last assertion may appear to be, it is demonstratively true" (Huxley's Man's place in Nature.).

"I will conclude with a quotation from Huxley who after asking, does man originate in a different way from a dog, bird, frog or fish ? Says "the reply is not doubtful for a moment ; without question, the mode of origin and early stages of the development of man, are identical with those of animals immediately below him in the scale. Without a doubt in those respects he is far nearer to apes than the apes are to the dogs" (Descent of Man.). অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১২৫ ভাগের এক ভাগ-ব্যাপী-ব্যাস-যুক্ত মাতৃগর্ভ স্থিত ডিম্ব হইতে মনুষ্য দেহ বিকশিত হয়। উহা কোন প্রকারেই অন্য জন্তুর গর্ভস্থ ডিম্ব হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন নহে। মানবভ্রূণকে আদি

অবস্থায় অন্য মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রূণ হইতে পৃথক্ মনে করা যায় না। এই অবস্থায় রক্তবহা নাড়ী সমূহ arch এর মত শরীরে গ্রথিত থাকে, যেন উহারা branchiae-তে রক্ত বহন করিতেছে। মেরুদণ্ডী জীবের branchiae নাই, যদিও গণ্ডদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বর্ত্তমান থাকে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ স্থানে পূর্ব্ব প্রকারের দেহে branchiae ছিল। সুপ্রসিদ্ধ Von Bayer বলেন যে কিছুকাল পরে যখন মানব দেহের অন্তর্ভাগ সমূহ বিকশিত হয়, তখন টিকটিকির পা-গুলি, পক্ষীর পা ও ডানাগুলির ন্যায় মানুষের হাত পা গুলি মূল দেহ হইতে বহির্গত হয় বা বিকশিত হয়। ভ্রূণের বিকাশের শেষ ভাগেই মানব ভ্রূণ বানর ভ্রূণ হইতে বিশেষ পার্থক্য সূচনা করে। বানর ভ্রূণ যেমন কুকুর ভ্রূণ হইতে বিকাশের শেষ ভাগে পৃথক্ হইয়া পড়ে, মানব ভ্রূণও সেইরূপ পৃথক্ ভাবাপন্ন হয়। এই উক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় বটে, কিন্তু উহা পরীক্ষিত সত্য।

আমি Huxley হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া উপসংহার করিব। তিনি প্রথমতঃ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে মানুষ কি কুকুর, পক্ষী, ভেক অথবা মৎস্য হইতে পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হয় এবং উত্তরে বলেন যে ইহার উত্তর মুহূর্ত্তরেও সন্দেহ জনক নহে। ইহা বলাই বাহুল্য যে উৎপত্তির প্রণালী এবং মানব ভ্রূণের বিকাশের প্রথম অবস্থা তাহার অব্যবহিত নিম্নস্তর সমূহের জন্তুর সেই অবস্থার সহিত একই। উপরোক্তি গ্রহণ করিয়াও বলা যাইতে পারে যে বানর এবং কুকুর ভ্রূণের পার্থক্য অপেক্ষা মানব এবং বানর ভ্রূণের পার্থক্য অল্পতর।

উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে দেখা যাইবে যে মানব মাতৃগর্ভে বহুস্তর পার হইলে তাহার শরীর গঠন পূর্ণ হয় ও ভূমিষ্ঠ হইবার উপযোগী হয়। উদ্ধৃত অংশে যে Fundamental Form-এর উল্লেখ আছে, উহার প্রথম অবস্থাই কারণদেহের অবস্থা। কারণলোকেও যে কারণদেহ বর্ত্তমান, তাহাতেও অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক মাত্র বর্ত্তমান থাকে। কারণ, সত্বপ্রধান দেহে কর্ম্মবাহুল্য থাকে না। যাহা সামান্য কিছু থাকে, তাহা মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সমুন্নতা ইচ্ছা-

শক্তি দ্বারাই সম্পাদন করেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না।* আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কারণদেহ ব্যোমপ্রধান। Fundamental Form-এ হস্তপদ থাকে না বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশে যে স্তরের উল্লেখ আছে, তাহার পূর্ব্বস্তরে অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ও থাকে না। সুতরাং মানবভ্রূণদেহের সেই অবস্থাকে কারণলোকের কারণদেহের সদৃশ অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। ভ্রূণদেহের উন্নতির বহুস্তর বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উহাদিগকে স্থূলভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটী কারণদেহের স্তর, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম শরীরের স্তর এবং তৃতীয়টী শেষ বা স্থূল শরীরের স্তর। ভ্রূণদেহের প্রারম্ভিক অবস্থাকেই কারণদেহের স্তর, দ্বিতীয় বা মধ্যম অবস্থাকে সূক্ষ্ম দেহের স্তর এবং তৃতীয় শেষ বা পূর্ণ অবস্থাকে স্থূলদেহের স্তর বলা যাইতে পারে। অথবা Manning and Fundamental stage কারণ দেহের; Skeleton stage-কে সূক্ষ্ম দেহের বা লিঙ্গ দেহের এবং Final and Complete stage-কে স্থূলদেহের স্তর বলা যাইতে পারে।

নরজন্ম সম্বন্ধে যাহা দেখিলাম, জীবরাজ্যের কোন একটী নিম্নতম স্তরে জীবের আদি জন্মেও ঐ একই প্রণালী অনুযায়ী হয়। পার্থক্য এই যে জীবের নিম্নতম স্তরে আদি জন্মকালে জীবের দেহে হৃদয় গুহা প্রস্তুত হইলেই বহুভাবে ভাসমানেচ্ছু প্রেমময় বিভু পরমাত্মা উহাতে যেন স্বেচ্ছায় ধরা দেন। এই ভাবে জীবের আদি সৃষ্টি হয়। উহাতেও জীবদেহের পূর্ণাঙ্গ হইতে তিনটী স্তর পার হইতে হয়. কালের অল্পাধিক্যের পার্থক্য মাত্র। ঐ স্তরেও প্রারম্ভিক অবস্থায় হৃদয় গুহা প্রস্তুত হয়। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতিকে যদি জীবরাজ্যের নিম্নতম স্তরের একটী মাত্র স্তর মনে করা যায় অর্থাৎ ঐ ভাবেই যদি জীবের আদি জন্ম হয়, তবে ভূমিকেই মাতৃস্থানীয়া মনে করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কারণলোকের কারণশরীর এবং সূক্ষ্ম

---

* যখন যাহার প্রয়োজন নাই, তখন তাহা থাকে না। এই তত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইবে।

লোকের সূক্ষ্মশরীর অদৃশ্য, কিন্তু ভ্রূণদেহ সর্ব্বাবস্থায়ই স্থূল এবং আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে গর্ভস্থ কারণশরীর ব্যোমপ্রধান ভাবে গঠিত সত্য। আমরা ইতঃপর দেখিব যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত এবং উক্ত সত্ত্বাংশ সমূহ দ্বারা সমষ্টিভাবে অন্তঃকরণের পাঞ্চভৌতিক অংশ অর্থাৎ মস্তিষ্ক গঠিত। হিন্দু শাস্ত্রও তাহাই বলেন। সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত বলিলেই ব্যোমপ্রধান ভাবে গঠিত বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইরূপ ভ্রূণের কারণদেহ ও সূক্ষ্মদেহ স্তরদ্বয়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা ইহা চিন্তা করিলেই এই সমস্যার মীমাংসা সুলভ হইবে। স্থূলতম জগতে সূক্ষ্ম ও কারণদেহের উপরও স্থূলের ছাপ বিশেষভাবে অঙ্কিত হয়। পারলৌকিক সূক্ষ্ম ও কারণদেহ এবং প্রোক্ত সূক্ষ্ম ও কারণদেহ স্বরূপতঃ এক হইলেও উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্যের কারণ স্থূলভূতের পরিমাণাধিক্য অর্থাৎ ভ্রূণের সূক্ষ্ম ও কারণ স্তরে দেহে স্থূল ভূতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর। ভূত সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই এই বিষয়টী আরও সরল হইবে বলিয়া মনে করি। জল যখন বাষ্পাকার ধারণ করে, তখন উহাকে বায়ু পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়াই মনে করা হয়। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে তখনও জলই। ইহার প্রমাণ এই যে সেই বাষ্পই জমিয়া মেঘ হয় এবং উহা হইতে বৃষ্টির আকারে ভূমিতে পতিত হয়। সুতরাং যখন যে ভূত অন্য ভূতের রাজ্যে অবস্থিত তখন সেই ভূতের অর্থাৎ শেষ প্রকার ভূতের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। অর্থাৎ উহা প্রায় অন্য ভূতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ভ্রূণের কারণ ও সূক্ষ্ম স্তর স্থূলতম রাজ্যের স্থূলতম দেহে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগের মধ্যে স্থূলত্বের বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে উহাদের মিশ্রণ বা পঞ্চীকরণ হইয়াছে। এই জন্য বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ পঞ্চভূত পাওয়া যায় না। এখন আমরা একখণ্ড লোহ সম্বন্ধে চিন্তা করি। উহাতেও ব্যোম আদি পঞ্চভূত বর্ত্তমান, কিন্তু উহাকে আমরা ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্ত পদার্থই মনে

করি। উহাকে উত্তাপ দ্বারা গলাইলে উহা অপ্ পর্য্যায়ভুক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপে উহাকে মরুৎ পর্য্যায়েও পরিণমন করা যায়। উহার প্রত্যেক অবস্থায়ই উহাতে পঞ্চভূত বর্ত্তমান. কিন্তু উহা যখন যে ভূতপ্রধান অবস্থায় থাকে, তখন সেই আকার ধারণ করে। লৌহখণ্ড অবস্থায় অপ্, তেজঃ প্রভৃতি ভূতও উহাতে আছে বটে, কিন্তু উহারা ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্ত পদার্থ আকারে উহাতে বর্ত্তমান। সেইরূপ ভ্রূণের সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থায়ও উহা কতকটা স্থূলাকারে দৃষ্ট হয়। এস্থলে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুগণের জন্মকালীন কারণ ও সূক্ষ্মদেহের স্তর অতি বলবান অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও লক্ষ্য করা যায় না। অথচ উহারাই হয়তঃ জীবদিগের আদিজন্মের এক একটী স্তর।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে কিরূপে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটদেহে জীব রাজ্যের অসংখ্য দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহার উত্তর বুঝিতে আমরা পৃথিবীতে দৃষ্ট বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম আকারের দুইটী ঘটিকা যন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করি। ক্ষুদ্রতম ঘড়িতেও সকল যন্ত্রই সুসংস্থাপিত আছে, কিন্তু উহারা অতি সূক্ষ্মাকারে (অতি ক্ষুদ্রাকারে) প্রস্তুত। সেইরূপ অনন্ত জ্ঞানাধার সুকৌশলী বিশ্বকর্ম্মা সেই ক্ষুদ্র কীটদেহে জীবরাজ্যের অসংখ্য দেহ কারণাকারে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন. ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। উহারা দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে উপযুক্ত দেহভাবে প্রস্ফুটিত হইবে। যথা—নারীগর্ভে যখন সেই জীব জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহা মানবাকার প্রাপ্ত হইবে, হস্তী গণ্ডার প্রভৃতির গর্ভে সেই সেই আকার প্রাপ্ত হয়। একটী কথা আছে "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। এই জীবদেহই সেই ভাণ্ড। ইহা যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ কত অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত. সেই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে হৃদয়ে অত্যাশ্চর্য্যরূপ ভক্তিনদী অবশ্যম্ভাবিরূপে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। অনন্ত সত্যস্বরূপ অনন্তজ্ঞানাধার, অনন্তপ্রেমাধার, অনন্ত দয়ার আধার ভগবান যাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া এই মহিমাময়ী সৃষ্টির তত্ত্ব দ্বার উদঘাটন করেন,

সেই সাধক পরম সৌভাগ্যবান। তিনি পরমদয়াল পরমপিতার অপার দয়ায় তাঁহারই অনন্ত জ্ঞানজ্যোতিতে অত্যুজ্জ্বল হইয়া, সর্ব্বান্ধকারশূন্য হইয়া, সর্ব্বসমস্যা-বিবর্জ্জিত হইয়া এবং সত্য জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। এস্থলে আরও বক্তব্য যে দেহী তাহার কর্ম্ম ও সাধনা দ্বারা পরম প্রেমময় পরমপিতার ইচ্ছায় ক্রমশঃ দেহ লয় করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে স্থূলের লয়ে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের লয়ে কারণদেহ এবং কারণদেহের লয়ে পূর্ণামুক্তি সম্ভব হয়। এই লয় কার্য্যে যে অনন্ত প্রায় কাল ব্যয়িত হইবে, তাহাও অন্যান্য স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :- পঞ্চতত্ত্বাত্মকং বিশ্বং শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্। সাধ্য-সাধক-ভেদেন শরীরং ত্রিবিধং শৃণু। সাধ্যঞ্চ কারণং সূক্ষ্মং সাধকং লিঙ্গ-সংজ্ঞকম্॥ অঙ্গুষ্ঠস্থং জীবদেহং স্থূল-দেহস্য কারণম্। কারণং সাধ্যরূপঞ্চ জ্ঞান-শক্তেঃ প্রজায়তে॥ লিঙ্গ শরীরং দেবেশি ক্রিয়া শক্তেশ্চ জায়তে। স্থূলঞ্চ শেষভূতঞ্চ তমঃ শক্তেঃ প্রজায়তে॥ অর্থাৎ এই বিশ্ব পঞ্চতত্ত্বাত্মক এবং শরীর ত্রিবিধ। হে দেবি! সাধ্য-সাধক-ভেদে শরীর যে তিন প্রকার, ইহা শ্রবণ কর। কারণ-দেহ সাধ্য ও সূক্ষ্ম দেহ সাধক। সূক্ষ্মদেহের অপর নাম লিঙ্গ শরীর এবং অঙ্গুষ্ঠস্থ জীবদেহ স্থূল দেহের কারণ। সাধ্য কারণ-শরীর জ্ঞান-শক্তি হইতে, সাধক লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর ক্রিয়া শক্তি হইতে এবং শেষ ভূতপ্রধান স্থূল-শরীর তমঃ শক্তি হইতে উৎপন্ন। (ক)

তন্ত্রোক্ত শ্লোক সমূহে দেখা যায় যে লিঙ্গ শরীরকে সাধক এবং কারণ শরীরকে সাধ্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে সূক্ষ্ম শরীরধারী তাঁহার সাধনা দ্বারা কারণ-দেহ লাভ করিতে পারেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে স্থূলদেহধারী কারণদেহের কোন অবস্থাই লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মদেহের কার্য্যও স্থূলদেহে থাকিতে থাকিতে করিতে পারেন এবং কারণ দেহের কার্য্যও

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা—৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।

আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে ২০৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।

তন্ত্র আরও বলিয়াছেন যে সাধ্য-কারণদেহ জ্ঞানশক্তি হইতে, সাধক লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর ক্রিয়া শক্তি হইতে এবং স্থূল শরীর তমঃশক্তি হইতে উৎপন্ন। এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে যিনি আত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন, অর্থাৎ সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া জ্ঞান-পন্থানুসরণ করেন, তিনি মৃত্যুর পর কারণদেহ প্রাপ্ত হন। যিনি ক্রিয়াশক্তি চালনা করেন, অর্থাৎ রজঃ গুণের উচ্চস্তরে বাস করেন, তিনি মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর প্রাপ্ত হন এবং পরে জ্ঞান সাধনা দ্বারা কারণ-দেহ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি তমোমার্গাবলম্বী তিনি যদি পরলোকে সাধনা দ্বারা নিজেকে সংশোধন না করেন, তবে স্থূলতম দেহ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহার পৃথিবীতে আগমন করিতে হইবে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পাপীও মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ পায় বটে, কিন্তু সেই দেহ সূক্ষ্মরাজ্যের নিম্নতম স্তরের দেহ মাত্র।

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ যে ক্রমান্বয় তমঃশক্তি, ক্রিয়াশক্তি (রজঃ শক্তি) এবং জ্ঞান-শক্তি (সত্ত্ব শক্তি) হইতে উৎপন্ন, ইহা উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম। আমাদের মনে হয় যে উহাই তন্ত্রোক্ত বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি একান্তই পূর্ব্ব বর্ণিত মাতৃগর্ভে সৃষ্ট কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ সম্বন্ধে ঐ উক্তি প্রয়োগ করিতে পাঠক ইচ্ছা করেন, তবে নিম্নলিখিত ভাবে চিন্তা করিলেই মীমাংসা সুলভ হইবে বলিয়া মনে করি।

জীবের আদি জন্ম ইতর জীবেরও নিম্নতম একটী স্তরে সম্ভব হয়। আদি জন্মেই জীব অসংখ্য দেহসহ জন্মগ্রহণ করে। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা যদি চিন্তা করি যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় বিধাতা তাঁহার অসীম জ্ঞানে অপূর্ব্ব কৌশলে সেই আদি মাতৃগর্ভে জীবের ত্রিবিধ অসংখ্য দেহ আদিম দেহে সুসংস্থাপন

করেন, তবে তাহা ভুল হইবে বলিয়া মনে করি না। Planning and Foundation stage-কেই কারণদেহ বলা হইয়াছে। জ্ঞান-শক্তি দ্বারা যে উহা সংসাধিত হয়, তাহা আমরা মনুষ্যকৃত সৃষ্টিতেও দেখিতে পাই। আমাদের এস্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম জন্মে যে জীবদেহ সৃষ্ট হয়, তাহাতে অসংখ্য দেহের সুসমা-বেশ থাকে। জীব সেই সকল দেহ দ্বারাই চিরকাল বিশ্বে বিচরণ করিবেন। সেই সকল দেহই চিরকাল যেমন পরীক্ষার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে, তেমনি উহারা তাঁহার সাধন ভজনেরও সহায় হইবে। সুতরাং উহার প্রস্তুতিতে যে জ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভ্রুণ দেহের প্রারম্ভিক অবস্থা পুর্ণ হইলেই Skeleton stage বা সূক্ষ্ম দেহের অবস্থা উপস্থিত হয়। জীবদেহের প্রথম অবস্থা শেষ হইতে না হইতেই ক্রিয়া শক্তির খেলা উহাতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ভ্রুণ গর্ভাধানের মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রিয়া করে এবং পরম পিতার ইচ্ছায় উহা দ্বারা মাতৃদেহ হইতে নিজোপযোগী সামগ্রী (materials) সংগ্রহ করিতে থাকে বটে, কিন্তু সেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এবং মাতৃদেহ হইতে অধিকতর সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া উহা Skeleton stage বা সূক্ষ্মদেহের স্তর উৎপাদন করে। এই লিঙ্গশরীরও ক্রমশঃ স্থূল শরীরে পরিণত হয়। এস্থলেও ভ্রুণ উহার দেহের স্থূলত্বের উপযোগী যে সকল সামগ্রী অর্থাৎ ক্ষিতি ও অপ্ ভাগ অধিকতর রূপে মাতৃদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ করে বটে, কিন্তু উহা স্থূল বা তমঃপ্রধান হয়। ত্রিবিধ অব-স্থায়ই ত্রিবিধ গুণের ক্রিয়া হয়, কিন্তু এক এক অবস্থায় এক একটী গুণের প্রধান ভাবে কার্য্য হয়। শিশুদেহ যে তমঃপ্রধান, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। শিশুর নিদ্রা অত্যন্ত অধিক। নিদ্রা তমঃ শক্তির কার্য্য। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তমঃ এর পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ ভ্রুণদেহ যে স্থূল তাহাত প্রত্যক্ষই করা যায়।

আমি বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে

সূক্ষ্মানুসন্ধান করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে গর্ভাধানের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচটী অবস্থা ভ্রূণ দেহে সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ ব্যোমপ্রধান বা সত্ত্বপ্রধান অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ বায়ুপ্রধান বা সত্ত্ব-রজো মিশ্র-প্রধান অবস্থা, তৃতীয়তঃ তেজঃপ্রধান বা রজঃপ্রধান অবস্থা, চতুর্থতঃ অপ্ প্রধান বা রজোস্তমোমিশ্র-প্রধান অবস্থা এবং পঞ্চমতঃ ক্ষিতিপ্রধান বা তমঃপ্রধান অবস্থা। উক্ত পাঁচটা অবস্থাকেই ক্রমান্বয় নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার দেহ বলা যাইতে পারে। যথা কারণদেহ, সূক্ষ্ম--কারণ-মিশ্র দেহ, সূক্ষ্মদেহ, স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্র দেহ এবং স্থূল দেহ। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে স্থূল রাজ্যের প্রোক্ত দেহ সমূহে স্থূলত্বের ভাব বিশেষ ভাবে অঙ্কিত থাকিবেই। জন্মকালীন সকল আদিম দেহেই এই পাঁচটী অবস্থা সংঘটিত হইবেই। এস্থলে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত নির্ঘণ্ট পত্র পাঠক দেখিবেন। সুধী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শরীরই বিস্তার করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত বলা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ইঙ্গিত প্রদত্ত হইতে পারে। যখন ভ্রূণদেহের এরূপ অবস্থা হয়, যে আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের সমুদায় যে পদার্থ দ্বারা প্রধান ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা উহাতে (ভ্রূণদেহে) অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে তখন উহার কারণদেহের অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। ভ্রূণদেহে যখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ স্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহাতে যখন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় যে সমুদায় পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তখন উহাকে সূক্ষ্মদেহের অবস্থা বলা যাইতে পারে। স্থূলদেহের পরীক্ষার জন্য ইঙ্গিতের কোনই প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। কারণ এবং সূক্ষ্মদেহের অবস্থাদ্বয়েয় মধ্যম অবস্থাকে (Intermediate Stageকে) সূক্ষ্ম-কারণ-মিশ্র-দেহ এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের মধ্যম অবস্থাকে স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্র-দেহ বলা যাইতে পারে। উক্ত দেহ দ্বয়ে ক্রমান্বয় কারণ ও সূক্ষ্মদেহের এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের সামগ্রী (materials) মিশ্রণ অবস্থায় থাকিবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রথমতঃ বলা হইল যে অসংখ্য সূক্ষ্ম ও কারণদেহ জীবের নিম্নতম স্তরে আদি-জন্মকালীন স্থূলদেহের পূর্ব্বস্তরে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তৎপর বলা হইল সে জীবের নরজন্মেও কারণ ও সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তির পর তাহার স্থূলদেহের উৎপত্তির সম্ভব হয়। এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি?

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক জীবদেহ গঠন কালীন উহার তিনটী অবস্থা অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা অবশ্যম্ভাবিরূপে থাকিবেই ইহাতে কোনই ব্যতিক্রম হইবে না। জীবদেহের প্রকার ভেদবশতঃ পরমপিতার ইচ্ছায় উহাদের গঠনের Details-এ পার্থক্য থাকিতে পারে ও থাকে, কিন্তু সর্ব্ব জীবদেহের Fundamental Procedure এ কোন পার্থক্য নাই। উহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, উহা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই একই। এই জন্যই Darwin বলিয়াছেন যে মানব দেহের প্রারম্ভিক অবস্থায় উহাতে নিম্নতর জন্তুর দেহ হইতে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। Darwin ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইতর জীবদেহই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মানব দেহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। প্রত্যেক জীবদেহের প্রস্তুতিতে পূর্ব্বোক্ত একই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সর্ব্ব জীবের দেহ মূলতঃ (কারণাকারে) এক বই দুই নহে। কেবল উহাদের details এ পার্থক্য এবং নিম্নতম স্তর হইতে দেহের গঠন ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে পৃথিবীতে মানব দেহে উন্নতির সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা পৃথিবীতে অসংখ্য জীবদেহ দেখিতেছি। ইহাদের গঠনের একটী অতি সুমহান্ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান বলিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। উহা প্রত্যেক দেহে আংশিক পরিমাণে সাধিত হইতে থাকিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ক্রমই সৃষ্টির প্রণালী। কোন জীবদেহই অকেজো নহে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে পরমপিতা এমনভাবে জীবদেহ সকল তাঁহার মহীয়সী শক্তিসম্পন্না

ইচ্ছা দ্বারা গঠন করিয়াছেন যে সেই সেই দেহে তত্তদুপযোগী কার্য্য সম্ভব এবং ক্রমশঃ উন্নত স্তরের দেহগুলি ক্রমান্বয় উন্নততর কার্য্যের উপযোগী ভাবে গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তর যখন তৎপূর্ব্ব স্তর সমুহ হইতে উন্নত ধরণের, তখন উন্নততর জীবদেহে নিম্নতর জীবদেহের কোন কোন অংশ অবশ্যম্ভাবিরূপে থাকিবেই, কিন্তু গঠন উন্নততর হয় বলিয়া নিম্নতর জীবদেহের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পাখীর দুইটী পা ও দুইখানি পাখা। পশুদেহ উন্নত হইয়া উহাতে চারি পা হইয়াছে। মানবদেহ পরমপিতার ইচ্ছায় উন্নততর ভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া উহাতে দুই হাত ও দুই পা সম্ভব হইয়াছে। এই জন্যই সন্নিহিত স্তরের (neighbouring stages এর)দুইটী দেহের মধ্যে ভ্রূণের আদি অবস্থায় কোন কোন অংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জীব ইতরজীব রাজ্যের নিম্নতম স্তরে সর্ব্বপ্রথমে অসংখ্য স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ সহ জন্ম গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক জীবদেহ গঠন কালীন উহাতে তিনটী স্তর থাকিবেই এবং উহাদিগকেই সেই সেই স্থূলদেহের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী সূক্ষ্ম ও কারণদেহ সমূহ জীবের আদি জন্মেই গঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেহ-সৃষ্টিরও কারণ, সূক্ষ্ম, ও স্থূল অবস্থা আছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানবকৃত (artificial) সৃষ্টিতেও Planning and Foundation stage, Skeleton stage and Final stage থাকে। মানব জন্মে দেহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্তও বটে। কারণ, নিম্নতম স্তরে জীবদেহের জন্ম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই সকল তত্ত্ব মানব বিজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই।

আবার আমাদের ইহাও চিন্তা করিতে হইবে যে আদি কারণ ও সূক্ষ্মদেহ জীবরাজ্যের একমাত্র নিম্নতম স্তরে জীবের আদি জন্মেই সৃষ্ট

হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে উহাদিগকেই একমাত্র কারণ ও সূক্ষ্মদেহ বলা কর্ত্তব্য। যতই জীব-দেহ উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকিবে, সেই কারণ ও সূক্ষ্মদেহে স্থূলত্বের ছাপ অধিক হইতে অধিক পড়িবে। মানব-দেহে স্থূলত্বের ছাপ অত্যধিক। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আত্মা লিঙ্গশরীর সহ নারীগর্ভে প্রবেশ করে। আদি স্তরের জীবদেহ ভিন্ন অন্য সকল স্তরেই আত্মা লিঙ্গদেহ সহ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। সুতরাং কারণ ও সূক্ষ্ম দেহসম্বন্ধে প্রকৃত বিচার করিতে হইলে নিম্নতম স্তরে আদি জন্ম সম্বন্ধে বিচার করাই কর্ত্তব্য। নতুবা নরজন্মের দেহের বিচার দ্বারা প্রকৃত সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের অনুসন্ধান লাভ সুকঠিন।

কেহ বলিতে পরেন যে ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় যে কারণ দেহের উৎপত্তি সর্ব্ব প্রথমে, তৎপর সূক্ষ্মদেহ এবং তদনন্তর স্থূল দেহ। আবার স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ এবং উহা হইতে কারণদেহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা অনুমান করিতেও কোন ত্রুটী নাই যে কারণদেহ কারণলোকে এবং সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম লোকে প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করে এবং স্থূলদেহ মাত্র পৃথিবী এবং অন্যান্য স্থূল মণ্ডলে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সেই কারণ ও সূক্ষ্মদেহই ক্রমশঃ স্থূলদেহে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ—আমদের চিন্তা করিতে হইবে যে ব্যোমপ্রধান কারণ লোকে জীবের আদি জন্ম যে অসম্ভব, তাহা সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইতেছে। ব্যোমপ্রধান দেহে কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, সুতরাং সেই সকল দেহ পৃথিবীর মাতা পিতৃ-দেহের ন্যায় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। সুতরাং তথায় আদিম দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মেন্দ্রিয় থাকে বটে, কিন্তু তাহা স্থূলদেহের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করিতে অক্ষম। "স্থূলে কার্য্য সম্পাদনী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সূক্ষ্মে তদপেক্ষা ন্যূনতর। এমনকি,

এরূপ অনেক কার্য্য আছে, যাহা কেবল স্থূলেই সম্পন্ন হইতে পারে, সূক্ষ্মে বা কারণে হইতে পারে না। আবার সূক্ষ্ম অপেক্ষা কারণে কার্য্য সম্পাদনী শক্তি ন্যূনতর (ক)।" উক্ত হইল যে সূক্ষ্মে এবং কারণ দেহে সকল কার্য্য হইতে পারে না। দেহ দ্বারা সৃষ্টিই সেইরূপ একটী কার্য্য মনে করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষ যোগে যে সৃষ্টি, তাহা যে ক্ষিতি প্রধান স্থূলতম যন্ত্র দ্বারা স্থূলভাবেরই কার্য্য, তাহা আমরা একটী তত্ত্ব স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিব। উহা অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়া উপস্থরূপ যন্ত্র দ্বারা সংসাধিত হয় এবং উপস্থ ক্ষিতির রজোহংশ দ্বারা গঠিত। সুতরাং যে স্থলে ক্ষিতির একান্ত অভাব না হইলেও বিশেষ বা অত্যধিক অভাব আছে, সেই স্থলে ঐরূপ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেনা। সূক্ষ্মদেহ তেজঃপ্রধান বা মরুৎপ্রধান সুতরাং উহাতে ক্ষিতির স্বল্পতা বর্ত্তমান। আবার কারণদেহ ব্যোমপ্রধান। সুতরাং উহাতে ক্ষিতির ভাগ অত্যল্প। উভয় দেহে বিশেষতঃ বোমপ্রধান দেহে ক্ষিতির বিশেষ কোন কার্য্যকরী শক্তি থাকিতে পারে না। আবার পৃথিবীতে তেজের বিকারে তোয় এবং তোয়ের বিকারে ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহারা প্রথমতঃ উত্তপ্ত ছিল। পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশ এখনও উত্তপ্ত আছে। যখন পৃথিবীর উপরিভাগ ও জল শীতল হইয়াছিল, তখনই উদ্ভিদ ও তৎপর জীবসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং তেজঃপ্রধান মণ্ডল সমূহে জীবের আদিম উৎপত্তি হইতে পারে না। মরুৎ প্রধান মণ্ডল উহা হইতেও সূক্ষ্ম। সুতরাং উহাতেও আদিম জীব সৃষ্টি অসম্ভব। আবার সেই মণ্ডল সমূহকে কারণ-সূক্ষ্ম লোক বলা হয়। সুতরাং উহাতে ব্যোম ও মরুতের আধিক্য বর্ত্তমান। তেজঃও উহাতে আছে, কিন্তু ক্ষিতির ভাগ উহাতে অত্যল্প। সুতরাং সেই সকল মণ্ডলে আদিম সৃষ্টি ক্রিয়া অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে হে পৃথিবীতে যেমন জীবসৃষ্টি পরমপিতার ইচ্ছায় স্ত্রী পুরুষ যোগ ব্যতীতও জল ও ভূমিতে সম্ভব হইয়াছিল, সেই-

---

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

রূপ কেন কারণ ও সূক্ষ্ম লোকে আদিম জীবসৃষ্টি হইতে পারিবে না ? ইহার এক প্রকার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এই যে সেই সকল মণ্ডল আদিম জীবসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত। কারণ, উহারা পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল মণ্ডলের তুলনায় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কারণ, কারণতর, বা কারণতম। আবার সূক্ষ্ম মণ্ডল সমূহে তেজের অত্যাধিক্য। দ্বিতীয়তঃ—পৃথিবীতে আদি জন্ম যেরূপে হইয়াছে, সেই রূপেই এখন আর হইতেছেনা। এখন স্ত্রী পুরুষ যোগেই সৃষ্টি কার্য্য হইতেছে। সুতরাং কারণ ও সূক্ষ্ম লোকেও ঐরূপে আদি সৃষ্টি অনুমান করিলেও পরে পৃথিবীর ন্যায় স্ত্রী পুরুষ যোগে কোনও সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কখনই কোনও প্রকারের সৃষ্টি সেই সকল মণ্ডলে হয় নাই বা হইতেছেনা। আবার এক প্রকারের সৃষ্টি যে স্থলে সম্ভব নহে, সে স্থলে অন্য প্রকারের সৃষ্টিও অসম্ভব। স্থূল, সেই সকল মণ্ডল আদিম দেহ সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ—তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল যে কারণ লোকে কারণ দেহের উৎপত্তি হয় এবং উহাই সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মদেহধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তদনন্তর সেই সূক্ষ্মদেহধারীই স্থূল জগতে স্থূল দেহ ধারণ করে। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত নির্ঘণ্ট পত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্যোমপ্রধান মণ্ডল এবং দেহ (কারণ দেহ) অংসখ্য। আপত্তিকারীও বলিতে পারিবেন না যে কোন কারণ মণ্ডলে (ব্যোমপ্রধান মণ্ডলে) প্রথমতঃ সৃষ্টি হয়। সুতরাং ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে শেষ কারণতম মণ্ডলে অর্থাৎ সত্যলোকের শেষ মণ্ডলে কারণ দেহের উৎপত্তি হয়। কারণ, উহাই কারণতম মণ্ডল এবং উহার পরে আর কোন মণ্ডল নাই। উহা যখন বিশ্বের শেষ মণ্ডল, তখন সেই দেশের কারণতম দেহে যে জীব বর্ত্তমান, তিনি যে উন্নততম অবস্থায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, জীব যখন উন্নত হইতে হইতে শেষ মণ্ডলে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি উন্নততম আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিবেন। কারণ, তিনি সেই স্থান হইতেই শেষ কারণদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন।

সুতরাং সেই স্থলে জীবের পক্ষে কোনও রূপ সৃষ্টি কার্য্য সম্ভব নহে এবং তথায় কোনও জীবের আদিম সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি সেই শেষ মণ্ডলে জীব সৃষ্টি স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি উন্নততম মহাত্মা ভাবেই জন্মগ্রহণ করিবেন। কারণ, তাঁহার দেহ কারণতম অবস্থায় অবশ্যম্ভাবিরূপে উৎপন্ন হইবে, যে হেতু সেই মণ্ডলই ব্যোম প্রধানত্বের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত। আর যদি স্ত্রী পুরুষ যোগে সেই স্থলে জীবের উৎপত্তি কল্পিত হয়, তবুও বলিতে হইবে যে তিনি তাঁহার উন্নততম মাতাপিতার ন্যায়ই উন্নততম হইবেন। কারণ, তাঁহার মাতাপিতৃ দেহ ত কারণতম দেহ, সুতরাং দোষ-পাশ-লেশ-শূন্য। সেইরূপ জীবের পক্ষে পূর্ণামুক্তির জন্যই স্বাভাবিক ভাবে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে, কারণ তাহাই তাঁহার বাকী আছে। তিনি কখনই ক্রমশঃ নিম্ন, নিম্নতর, নিম্নতম মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন না। সেই শেষ মণ্ডল হইতে নিম্নতর মণ্ডলে যাইবার জন্য অন্য কারণ হইতে পারে যে তাহার পাপ কার্য্যের জন্য অবশ্যম্ভাবী পতন। কিন্তু তাহাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, সেই মণ্ডলে স্থিত আত্মার পক্ষে এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না যাহাতে তিনি ক্রমশঃ নিম্ন, নিম্নতর, নিম্নতম মণ্ডলে পতিত হইতে হইতে অবশেষে তিনি স্থূল মণ্ডলে স্থূল দেহে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই ইতর জীবদেহ হইতে পুনরায় উন্নত হইতে হইতে তিনি শেষ মণ্ডলে পুনরাগমন করিবেন। পাঠক এই সম্পর্কে আরও একটী বিষয় চিন্তা করিবেন যে সেই শেষ মণ্ডলে সৃষ্ট প্রত্যেক আত্মারই সেইরূপ ভাবে পতন হইতে থাকিবে, নতুবা অসংখ্য জীব স্থূলদেহে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক স্থূলদেহেরই আদি সেই শেষ মণ্ডলের আদিম কারণ দেহ। অর্থাৎ সেই শেষ মণ্ডলে সৃষ্ট সকল আত্মার পতনই স্বভাব বলিতে হইবে। ইহা যে একান্ত অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। চতুর্থতঃ—উপরোক্ত রূপ শেষ মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে বা অন্যান্য স্থূল মণ্ডলে আসিতে হইলে অবশ্যই ক্রম প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিতে হইবে, অর্থাৎ সেই শেষ মণ্ডলে সৃষ্ট জীবাত্মাকে উচ্চতম

মণ্ডল হইতে প্রত্যেক মণ্ডল পার হইয়া নিম্নতম মণ্ডলে আসিতে হইবে। কারণ, ক্রম প্রণালীই সৃষ্টির একটী বিশেষ বিধান। ইহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হয়। এইরূপ ভাবে পতন হইতে হইতে শেষ মণ্ডল হইতে স্থূল মণ্ডলে স্থূলদেহে জন্মগ্রহণ করিতে অনন্ত প্রায় কালের প্রয়োজন হইবে। ক্রম পতনের জন্য আরও অধার্য্য কালের প্রয়োজন হয়, যদি আমরা চিন্তা করি যে কেহই অবিরাম পতন সহ্য করিতে পারে না। সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে উন্নত হইবেন। সুতরাং উচ্চতম মণ্ডল হইতে স্থূল মণ্ডলে প্রোক্ত কালের অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার স্থূলতম মণ্ডল হইতে শেষ মণ্ডলে যাইতে যে কত অসীম কালের প্রয়োজন, তাহাত আমরা সকলেই যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। কারণ, নিম্নতম অবস্থা হইতে উন্নততম অবস্থা লাভ করিতে বহু কঠোর সাধনার একান্ত প্রয়োজন। অতএব এইরূপে দুইবার—একবার পতন দ্বারা ও অন্যবার উন্নতিদ্বারা সকলমণ্ডল পার হওয়ায় যে অনন্ত অনন্তকালের প্রয়োজন, তাহা আবশ্যক হয় না যদি আমরা অনুমান করি যে জীবের নিম্নতম অবস্থা হইতে উন্নততম অবস্থায়ই যাইতে হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবে তাঁহার সেই পথ ভ্রমণ করিতে হইবে না। অবশ্যই ইহাতেও অসীম প্রায় কালের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি এবং ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইব। পঞ্চমতঃ—সেই শেষ কারণ মণ্ডলে যে জীব জন্মগ্রহণ করিবে, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ অনন্তপ্রায় পতন অসম্ভব। কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে উন্নতিই জীবের ধর্ম্ম এবং অবনতি (পতন) সাময়িক মাত্র।* সুতরাং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সকল জীবের কথা দূরে থাকুক, কোনও একটী জীবের পক্ষেও বিশ্বের শেষ মণ্ডল হইতে স্থূল মণ্ডলে ক্রম পতন অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। আর এই সুদীর্ঘ পতন যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের একান্ত বিরোধী, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ষষ্ঠতঃ—আমাদের মতে ইতর জীবের কোন এক নিম্নতম স্তরে জীব অসংখ্য

* "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ দ্রষ্টব্য।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ সহ স্থূলদেহে আদি জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই আদি দেহ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমতঃ কারণাকারে, তৎপর সূক্ষ্মাকারে থাকে এবং উহাই অবশেষে স্থূলাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপত্তিকারীর মত গ্রহণ করিলে অসংখ্য অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত একটী কল্পনার স্থলে অসংখ্য কল্পনা দার্শনিক বিচারে স্থান লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিলেও আপত্তিকারীর মত গ্রহণীয় নহে। আমাদের মতের সমর্থনে যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব, তাহা করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে কল্পনা না বলাই সঙ্গত। সপ্তমতঃ—যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মের ইচ্ছা দ্বারাই কারণ ও সূক্ষ্মদেহ সৃষ্ট হয় এবং উহারাই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে পরিণত হয়, উহাদের সৃষ্টির জন্য কোনও মণ্ডলের প্রয়োজন হয় না, তবে বলিতে হয় যে পরমপিতার ইচ্ছা সৃষ্টিতে সর্ব্বদাই প্রণালী বিশেষের মাধ্যমে সংসাধিত হয় এবং সেই প্রণালীও ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত। সৃষ্টির প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমিত কার্য্যের বিচার দ্বারাই আমাদের সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে। ইহা দ্বারা পরমপিতার অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছার শক্তিকে খর্ব্ব করা হইতেছে না। কিন্তু সৃষ্টি কার্য্য দর্শনে ইহাই আমরা বুঝিতে পারি যে ক্রমই তাঁহার সৃষ্টির একটী বিশেষ প্রণালী। সর্ব্বত্রই এই মহা বিধান কার্য্য করিতেছে। এই ক্রমপ্রণালীও একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছে। আর মণ্ডল ভিন্ন সুতরাং জড় ভিন্ন জড়দেহ সৃষ্টি যে অসম্ভব, তাহা আমরা সহজেই নিঃসংশয়িত ভাবে বলিতে পারি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কারণ ও সূক্ষ্ম দেহও সেই সেই মণ্ডলের জড় পদার্থ নির্ম্মিত বটে। উহাতে জড় ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। জগতে আত্মা ভিন্ন যাহার সম্বন্ধেই আমরা চিন্তা করি না কেন, তাহাই যে জড়, ইহা স্থির নিশ্চয়। ব্যোমও জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বে জড় রাজ্যে ব্যোমই সূক্ষ্মতম পদার্থ। সুতরাং ব্যোমই যখন জড় হইল, তবে দেহ মাত্রই যে জড় পদার্থ দ্বারাই নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে সন্দেহের স্থান কোথায়?

প্রশ্ন কর্ত্তা বলিতে পারেন যে কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করেন, ব্রহ্মাও সেইরূপ কারণদেহ ব্যোম-প্রধান ভাবে গঠন করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় উহাই সূক্ষ্মাকারে ও তৎপর স্থূলাকারে পরিণত হয়। উহাতে আত্মার কোনই প্রয়োজন হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবাত্মা কখনই দেহ ভিন্ন থাকিতে পারে না। তাঁহার কোনও একপ্রকার দেহ ধারণ করিয়াই থাকিতে হয়। সেইরূপ দেহও জীবাত্মা ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না। আমরা দেখি যে জীবদেহ হইতে যখন আত্মা বহির্গত হন, তখন সেই দেহ শবে পরিণত হয় ও তৎপর উহা পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঘটের ন্যায় জীবদেহ একাকী অর্থাৎ আত্মার আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ ভাবে কারণ দেহ সূক্ষ্মাকারে ও সূক্ষ্মদেহ স্থূলাকারে পরিণত হইতে পারে না।

অতএব উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রথমে কারণ শরীরের উৎপত্তি, তৎপর সূক্ষ্ম শরীরের এবং তদনন্তর স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয় এবং জীব উহাদিগকে আদি জন্মে প্রাপ্ত হন। আদি জন্মেই জীব বিশ্বে বাসপোযোগী অসংখ্য দেহ সহ জন্ম গ্রহণ করেন

ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সৃষ্টি

"পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের এবং রজো গুণাংশ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ আকাশের (ব্যোমের সত্ত্বাংশ দ্বারা কর্ণেন্দ্রিয় এবং রজোহংশ দ্বারা বাক্যের; বায়ুর (মরুতের)সত্ত্বাংশ দ্বারা ত্বকের এবং রজোগুণাংশ দ্বারা পাণির; তেজের সত্ত্বাংশ দ্বারা চক্ষুর এবং রজোহংশ দ্বারা পাদের; অপ, অর্থাৎ তরল দ্রব্যের সত্ত্বাংশ দ্বারা রসনার এবং রজোগুণাংশ দ্বারা পায়ুর, আর ক্ষিতির সত্ত্বাংশ দ্বারা নাসিকার এবং রজোহংশ দ্বারা উপস্থের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ ও রজোহংশ দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যষ্টি ভাবে দশটী বহিরিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বটে,

কিন্তু উক্ত সত্ত্বাংশ সমূহ দ্বারা সমষ্টি ভাবে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। আর উক্ত পঞ্চভূতের রজোহংশ দ্বারা যেমন ব্যষ্টি ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রূপ সমষ্টি ভাবে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাণ বৃত্তিভেদে পঞ্চধা। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণ হৃদয়ে, অপান মলদ্বারে, সমান নাভিদেশে, উদান কণ্ঠ-দেশে এবং ব্যান সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে।" (ক)

আমাদের মনে হয় যে দেহের অন্তরস্থিত যন্ত্র সমূহ পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়া বশতঃই নিজ নিজ কার্য্য স্বতঃই (automatically) সম্পাদনে সমর্থ হয়। আমরা নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করি। মুখ দ্বারাও এই কার্য্য সময় সময় করিয়া থাকি। নাসিকা দ্বারা কার্য্য হইলেও বায়ু মুখ গহ্বরে যাতায়াত করে। সুতরাং নাসিকা ও মুখ বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ রূপ কর্ম্ম করে। নাসিকা ভিন্নও উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে. কিন্তু মুখ ভিন্ন সম্ভব হয় না। সুতরাং বাক্ রূপ কর্ম্মে-ন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বায়ুকে দেহের মধ্যে প্রেরণ করি এবং তথা হইতে গ্রহণ করিয়া বহিষ্করণ করি। এই বায়ুই দেহের মধ্যে যাইয়া সকল অন্তর্নিহিত যন্ত্রগুলিকে যথাভাবে পরিচালনা করে। পূর্ব্বে যে প্রাণকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা স্থান ভেদে বায়ুর অবস্থিতির প্রকার ভেদ মাত্র। ঐ পাঁচটীই বায়ু। বায়ু বাহির হইতে প্রবেশের পূর্ব্বে অন্য ভূত সকল উহাতে সংযুক্ত থাকে এবং ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নানা পদার্থের সংস্রবে আরও অধিক পরিমাণে অন্যান্য ভূত উহাতে মিশ্রিত হয়। বায়ু পাঁচ ভাবে দেহের মধ্যে নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করে। সুতরাং পঞ্চভূতের রজোহংশ সমষ্টি দ্বারা যে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সত্য। অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে পঞ্চভূতেরই রজোহংশ আছে বটে, কিন্তু উহা মরুৎপ্রধান ভাবে গঠিত।

কেহ কেহ প্রাণকে বায়ু না বলিয়া শক্তি বিশেষ বলেন। প্রাণ যখন পঞ্চমহাভূতের পঞ্চ রজোহংশ দ্বারা সমষ্টি ভাবে গঠিত, তখন উহার যে বিশেষ শক্তি আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে আমাদের

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাণ বায়ুপ্রধান। প্রত্যেক ভূতেই শক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং বায়ুরও যে বিশেষ শক্তি আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আবার সূক্ষ্মতা হিসাবে ব্যোমের পরেই বায়ু, সুতরাং উহার শক্তিও অত্যধিক বলিতে হইবে। বায়ুর শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ। দেহের ভিতরে উহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বায়ুর মধ্যেও পঞ্চভূত বর্ত্তমান। বায়ুতেই প্রাণ শক্তি প্রধানতঃ বর্ত্তমান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা বায়ু গ্রহণ না করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রাণ ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়। আবার Oxygen gas প্রয়োগ করিলে রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থায়ও অধিক কাল বাঁচাইয়া রাখা যায়। এমনকি উহাতে সময় সময় রোগী আরোগ্য লাভও করে। আমাদের দেহের ভিতর বায়ু দূষিত হইয়া কত কি কাণ্ড করিতেছে, তাহা শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন। যে বায়ুর অভাবে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে বায়ু আমাদের জীবন রক্ষা করে, সেই বায়ুই দুষিত হইয়া হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের উপর এরূপ ক্রিয়া করে, যে তাহাতেই মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে। আমরা বায়ুর উভয় প্রকার শক্তিই দেখিতে পাইলাম। অর্থাৎ উহা জীবন রক্ষাও করে এবং দুষিত হইলে মৃত্যুকে আনয়নও করিতে পারে। বাহিরেও তাহাই দেখিতে পারি! যে বায়ু না হইলে আমরা অধিক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, তাহাই প্রবল আকার ধারণ করিলে কত কি ধ্বংস করে, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। প্রাণায়াম শব্দের অর্থ ও উহার ক্রিয়ার পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রাণ বায়ু প্রধান এবং বায়ু ভিন্ন উহার অস্তিত্ব সম্ভব নহে। পূরণ-ধারণ-রেচনাত্মক ব্যাপারকে প্রাণায়াম বলে। প্রকৃত পক্ষে এই ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘজীবী হইতে পারা যায় বলিয়া উক্ত হয়। প্রাণের (জীবনী শক্তির) আয়াম (দীর্ঘতা) হয় যাহা হইতে, এই অর্থে প্রাণায়াম শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

উপনিষদের নানা স্থলে প্রাণ শব্দের ব্যবহার বা ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাণ অর্থে প্রাণ বায়ু। দেহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বস্তু প্রাণবায়ু অর্থাৎ উহা না থাকিলে মানব

অধিক ক্ষণ বাঁচিতে পারে না। সুতরাং প্রাণবায়ু দেহের পক্ষে অপরিহার্য্য (indispensable). এই জন্য প্রাণকে গৌণ অর্থে আত্মা বলা হয়। কারণ আত্মা না থাকিলে দেহের মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, প্রাণ বায়ু না থাকিলেও সেইরূপ হয়। শেষে কেহ কেহ ব্রহ্মকেও প্রাণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—প্রাণব্রহ্ম। মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।৪ মন্ত্রে ব্রহ্মকে রূপক ভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া বায়ুকে তাঁহার প্রাণ বলিয়াছেন। শারীর প্রাণ যে বায়ু দ্বারা প্রস্তুত, তাহা বেদান্তদর্শনের "অতএব প্রাণঃ"। ১।১।২৩ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শক্তি কখনও নিরাশ্রয় ভাবে থাকে না। উহা কোন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। এস্থলে প্রাণশক্তি পঞ্চভূতের রজোহংশকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। সেই পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুই এস্থলে প্রধান ভাবে বর্ত্তমান।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে প্রাণ পঞ্চভূতের রজোহংশ দ্বারা গঠিত এবং সেই রজোহংশের মধ্যে বায়ুর রজোহংশই প্রধান। উহা না থাকিলে জীবন বাঁচেনা। তাই উহাকে প্রাণ, প্রাণ বায়ু, জীবনী শক্তি, শক্তি প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহ রক্ষার জন্য ইহা একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া গৌণ অর্থে বা রূপকে ইহাকে জীবাত্মা বা ব্রহ্মকেও বুঝাইতে কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন

কেহ কেহ প্রাণকে তামসিক বলেন। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রাণের বিশেষ শক্তির পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। শারীর বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি এ বিষয়ে আরও বহু তথ্য আমাদিগকে দান করিতে পারেন। প্রাণের কার্য্য আছে এবং সেই কার্য্য দ্বারাই দেহান্তর্গত যন্ত্র সমূহ মানবের ইচ্ছা ব্যতীতও পরিচালিত হয়। ইহাকে জীবনী শক্তিও বলা হয়। সুতরাং প্রাণক্রিয়া তুচ্ছ ক্রিয়া নহে। বরং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাণ ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান। উহা পঞ্চভূতের রজোহংশ দ্বারা গঠিত, সুতরাং উহাতে শক্তি অবশ্যম্ভাবিরূপে

বর্ত্তমান। জীবনী শক্তি না থাকিলে শরীর রক্ষা পায় না, মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। তমোগুণের স্থাপনা ধর্ম্ম। অলসতা, নিদ্রা প্রভৃতি তমোগুণাধিক্যের ফল। উহাতে ক্রিয়া নাই বলিলেই হয়। তমোগুণ শরীর লয় করে, কিন্তু রজোগুণ শরীর রক্ষা করে। সুতরাং প্রাণ তামসিক হইতে পারে না। প্রাণকে জীবনী শক্তিও বলিব, আবার উহাকে তামসিকও বলিব ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়।

অন্তঃকরণ

"অনাদি অনন্ত অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় পরমেশ্বরের যে অংশ * কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল নামক ত্রিবিধ-দেহ-সম্পন্ন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ, তাহাই জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত। জীবাত্মা বিবিধ পাশে বদ্ধ বলিয়া সে যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহা বিস্মৃত, অধিকন্তু দেহেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। পাশমুক্ত ও গুণাতীত হইয়া আত্মস্বরূপ লাভ করাই জীবাত্মার চরম কার্য্য।" "চৈতন্যাংশ * দেহে বদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্ঞানময়ত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন বোধ তাঁহার বুদ্ধিতে পরিণত হয়। বুদ্ধির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সংশয়াত্মক মনের উৎপত্তি হয়। তখন এইটী কর্ত্তব্য কি না ইত্যাদি ভাব আসিতে থাকে। অমনি অহংকার উৎপত্তি হইয়া চিত্তের সাহায্যে লুপ্ত স্মৃতির আভাস যোগে "ইহা আমি করিতে পারি" ইত্যাদি অভিমানের সঞ্চার করে। এই বুদ্ধি, মন, অহংকার ও চিত্ত ইহারাও ত্রিগুণময়, সুতরাং জড়বর্গের অন্তর্গত" (ক)। এই চারিটীর সমষ্টিকে অন্তঃকরণ বলা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় যে আত্মার নিজস্ব বিশুদ্ধ জ্ঞান জড়সংসর্গে আসিয়া অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের সত্ত্বাংশ সমষ্টির সহিত যোগে বিকৃত হইয়া যে চারিভাগে প্রকাশ পায়, তাহাকেই আমরা অন্তঃকরণ বলিয়া থাকি। কিন্তু আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে অন্তঃকরণ আত্মার সর্ব্ববিধ কার্য্যের

---

* ব্রহ্ম দেহযোগে অংশভাবে ভাসমান। এই ভাব গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

ক্ষেত্র। সুতরাং আত্মার কেবল জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রেম প্রভৃতি গুণ এবং ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি শক্তিও জড় সংসর্গে আসিয়া অর্থাৎ অন্তঃ-করণের যোগে বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। নিম্নে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বিকৃতির কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

যদি একটী লাঠির কতক অংশ জলে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহার জলস্থিত অংশ উপরিস্থিত অংশ হইতে বক্র হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই যে আলোক দুই প্রকার Medium-এর ভিতর দিয়া যাওয়ার জন্য জলস্থিত অংশের উক্তরূপ বক্রাবস্থা প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ জড় বলিয়া তাহা আত্মার Medium হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। সুতরাং আত্মার গুণ ও শক্তি ভিন্ন Medium-এর ভিতর দিয়া প্রকাশ পাওয়ায় বিকৃত হয়। কারণ, জড় চিরবিকৃত। (২) সূর্য্যালোক শুভ্রবর্ণ, কিন্তু যদি উহা নানা বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তবে সেই আলোকও নানাবর্ণে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আত্মার জ্ঞান প্রভৃতি গুণ ও ইচ্ছাশক্তি নিত্যই অতুলনীয় ভাবে শুভ্র ও অবিকৃত। কিন্তু তাহা জড়ের (মস্তিষ্কের) মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপে বিকৃত হয়। নানা মস্তিষ্কের নানা অবস্থানুযায়ী আত্মার গুণ ও শক্তির নানাভাবের বিকার লক্ষিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন অবিকৃতই থাকে, কিন্তু গৃহে প্রবিষ্ট আলো-কই নানা বর্ণের কাঁচ সংসর্গে নানা বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মার গুণ এবং শক্তি অবিকৃতই থাকে, কিন্তু নানা জনের নানাবিধ মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংসর্গে আসিয়া উহারা নানা বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রকাশই বিকৃত হয় মাত্র। এস্থলেও বিভিন্ন প্রকার Medium-এর তত্ত্বই প্রকাশিত হইল।

অন্তঃকরণের যন্ত্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্তঃকরণের কোন কার্য্যই হইতে পারে না। অন্তঃকরণ শব্দে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উহা একটী দেহাভ্যন্তরেস্থিত যন্ত্র। করণ অর্থে যন্ত্র। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বককে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। মুখ, হস্ত, পদ, উপস্থ ও পায়ুকে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়। এই দশটী ইন্দ্রিয়কে

বহিরিন্দ্রিয় বলা হয়। অপরপক্ষে মনকে অন্তরিন্দ্রিয়, ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হয়। উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতে পারে না। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্য। অন্তঃকরণের কার্য্যসমূহ কেবল মস্তিষ্ক দ্বারা সম্ভব হয় না, যদি দেহে জীবাত্মা বর্ত্তমান না থাকেন। কারণ, মৃতব্যক্তির মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিলেও উহা দ্বারা কোনও জ্ঞান লাভ বা ক্রিয়া সম্ভব হয় না সুতরাং আত্মার গুণ ও শক্তি মস্তিষ্কের সংসর্গে আসিয়া যে ভাবে প্রকাশিত হয় বা পরিণতি লাভ করে, তাহাকেই অন্তঃকরণ বলিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তঃকরণের এক অংশ পাঞ্চভৌতিক ও অপর অংশ আত্ম সংক্রান্ত। যে হেতু পরিণাম অংশকেই অন্তঃকরণ বলা হয় এবং জড়ের মধ্য দিয়াই উহার কার্য্য প্রকাশিত হয়, সেইজন্য উহাকে জড়বর্গের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। জড় মস্তিষ্কই আত্মার অবিকৃত গুণ ও শক্তি-সমূহকে বিকার গ্রস্ত করে। সুতরাং উহার প্রভাবাধিক্যের জন্য অন্তঃ-করণকে জড় বলা হয়। সাংখ্য ও বৈদান্তিকগণও অন্তঃকরণকে জড় বলেন। মায়াবাদ বলেন যে চিদাভাস দ্বারা অন্তঃকরণ চালিত হয় এবং সাংখ্য বলেন যে দেহে পুরুষের উপস্থিতিতেই অন্তঃ-করণ কার্য্য করে। এই উভয়মত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা মায়াবাদ অংশের "চিদাভাসে" দেখিতে পাইব। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহা অসম্ভব এবং অন্তঃকরণ আত্মা দ্বারাই চালিত হয়। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে অন্তঃকরণ পঞ্চভূতের অতি সূক্ষ্ম পঞ্চ সত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এস্থলে অন্তঃকরণ অর্থে মস্তিষ্ক। সত্ত্বের গুণ প্রকাশ করা, তাই অন্তঃকরণ (মস্তিষ্ক) সহজেই আত্মার গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। "আত্মা ও জড়ের মিলন", "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশত্রয়ে আমরা দেখিতে পাইব যে আত্মা ও জড় পরস্পর পরস্পরের উপর নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ক্রিয়া করিতে সমর্থ।

এখন আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে প্রথমে বলা হইল যে আত্মার জ্ঞান অন্তঃকরণের সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হইয়া যে চারিটী ভাগে

প্রকাশ পায়, তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। আবার পরে বলা হইল যে আত্মার গুণ ও শক্তি রাশি অন্তঃকরণের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার জন্য উহারা বিকৃত হয়। এই অসামঞ্জস্যের মীমাংসা কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্তঃকরণ যে আত্মার সকল গুণ ও শক্তির কার্য্যক্ষেত্র সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে অন্তঃকরণ জ্ঞান-প্রধান। জ্ঞান ভিন্ন প্রেমের কার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞান ভিন্ন ইচ্ছারও বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে অচেতন জড় পদার্থের যে কেবল জ্ঞান নাই, তাহা নহে কিন্তু প্রেমও নাই, ইচ্ছাও নাই। পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ এবং জীবাত্মা তাঁহারই অংশভাবে ভাসমান। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক চিন্তায় জ্ঞানের বিশেষ প্রভাব অবশ্যই থাকিবে। দেহে জ্ঞানময় আত্মা না থাকিলেত উহা মৃত শবে পরিণত হয়। তখন প্রেমই করে কে? ইচ্ছার খেলাই খেলে কে? অন্তঃকরণের প্রত্যেক কার্য্যের পরিণতির কথা চিন্তা করিলেই অহং জ্ঞানে উপনীত হইতে হয়। যথা—আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি ইত্যাদি। এই অহং জ্ঞান বাদ দিয়া অন্তঃকরণের কোন কার্য্যই হইতেছে না বা হইতেও পারে না। সুতরাং অন্তঃকরণে যে জ্ঞানের বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আত্মার প্রধান গুণ যে জ্ঞান তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অন্তঃকরণ জ্ঞান প্রধান কেন। জ্ঞানেব প্রাধান্য জন্যই পরমাত্মাকে চিন্ময় বলা হয়। এই জন্যই আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানকে ব্রহ্মের গুণ না বলিয়া স্বরূপ বলিয়াছেন। অন্তঃকরণ আর কিছুই নহে, কেবল আত্মার নানাবিধ গুণ ও শক্তির মস্তিষ্ক সংযোগে বিকৃত ভাবের প্রকাশ মাত্র। অন্তঃকরণের একাংশ পাঞ্চভৌতিক (অর্থাৎ পঞ্চভূতের পঞ্চসত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা গঠিত মস্তিষ্ক) ও অপর অংশ আত্ম সংক্রান্ত। আবার মস্তিষ্কের মাধ্যমে আত্মার গুণ ও শক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়া এবং উহাদিগকে বিকৃত করিতে সমর্থ বলিয়াই অন্তঃকরণকে জড় বলা হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বিশুদ্ধ জড় নহে।

"মেরুদণ্ডের দুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে। ঐ ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বাম ভাগে সুষুম্না নাড়ী আছে। ঐ সুষুম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তাহার মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিতি করে। দেহ মধ্যে সাতটী স্থানে ৭টী পদ্ম সুষুম্নায় গ্রথিত আছে। যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্র দল। মূলাধার বা আধারপদ্ম পায়ুঃ দেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ ভাগে, স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গমূলে, মণিপুর নাভিমূলে, অনাহত হৃদয়ে, বিশুদ্ধ পদ্ম কণ্ঠদেশে, আজ্ঞাপদ্ম ভ্রূমধ্যে এবং সর্ব্বোপরি মস্তকে সহস্রদল পদ্ম বিদ্যমান আছে। ঐগুলি বস্তুতঃ পদ্ম নহে, পদ্ম বলিয়া রূপক করা হইয়াছে মাত্র। শরীরাভ্যন্তরস্থ নাড়ী বিশেষের সংযোগে ঐগুলি উৎপন্ন। উল্লিখিত সাতটী পদ্মে যে সকল দলের সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্তও বৈজিক বর্ণমালার অনুসারেই হইয়াছে। নতুবা চিত্রে যেরূপ আকার থাকে, ঐরূপ উহাদের আকৃতি নহে" (ক)। এই সহস্র দল পদ্ম মস্তকে অবস্থিত অথবা মস্তিষ্কই সহস্রদল পদ্ম। যাহারা চক্রভেদ সাধনা করেন তাহারা বলেন যে সহস্রদল চক্র সাধনা হইলেই মানব মুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং মস্তিষ্কের মাহাত্ম্য কতদূর, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অন্তঃকরণের কার্য্য দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উহার মধ্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা (knowing, feeling and willing) বর্ত্তমান। পরম কৌশলী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ মস্তিষ্ককে এরূপ সুকৌশলে গঠন করিয়াছেন যে উহা এই তিন প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ। কেহ কেহ ভাব ও ইচ্ছার স্থান

(ক) সত্যধর্ম্ম ১১৬—১১৭। পরমর্ষি গুরুনাথ আরও লিখিয়াছেন যে 'নাড়ী সংযোগোৎপন্ন উল্লিখিত আকৃতির সংখ্যা ৬৮টীর অধিক হইলেও তন্মধ্যে ৫০টী প্রধান। এজন্য আর্য্যেরা বর্ণমালাও পঞ্চাশৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং এই জন্যই "ক্ষ" সংযুক্ত বর্ণ হইলেও উহাকে মূল বর্ণ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ঐ আকৃতিগুলিই বৈজিক ভাষার বর্ণের আকার।" অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত "ষট্‌চক্রভেদ সাধনা" গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

হৃদয়ে এবং জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে বলেন। আবার কেহ কেহ হৃদয় অর্থে বুদ্ধিও বলেন। ব্রহ্মে অনন্ত গুণ সংমিশ্রিত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান, অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত—

ওঁং

জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা, কিন্তু দেহবদ্ধাবস্থায় ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবাত্মার মধ্যেও তাঁহার অনন্ত গুণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মিলিত ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং উহাদের কার্য্যও অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া মিলিত ভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য উহাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভাগ করিয়া লই; অর্থাৎ যখন কার্য্যটী জ্ঞানপ্রধান, তখন উহাকে জ্ঞানের কার্য্য বলি এবং যখন কার্য্যটী প্রেমপ্রধান, তখন উহাকে প্রেমের কার্য্য বলি। সেইরূপ অন্তঃকরণ ও হৃদয় পৃথক্ নহে, কিন্তু উহারা অন্তঃকরণেরই কল্পিত দুই ভাগ মাত্র। অর্থাৎ যখন জ্ঞানপ্রধান কার্য্য হয়, তখন উহাকে অন্তঃ-করণের কার্য্য বলি এবং যখন ভাবপ্রধান কার্য্য হয়, তখন উহাকে হৃদয়ের কার্য্য বলি।

আবারও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে কেবল প্রেম নহে, কিন্তু কোমল গুণ সমূহ দ্বারা আমাদের হৃদয় দেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের অন্তর্ভাগ প্রভাবিত হয়। ইহা সকলেরই জানা আছে যে বহুকালের অদর্শনের পর দম্পতি বা গভীর প্রেমে যুক্ত বন্ধু যুগল পরস্পর পরস্পরকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়াই আনন্দে আপ্লুত হন। ঐরূপে মিলন কালে মনে হয় যে পরস্পর পরস্পরকে অন্তর্গত করিয়া রাখিতে পারিলেই যে সুখের অন্তিম সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশুকে আমরা স্নেহ করি, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিলেই আমরা শান্তি লাভ করি। কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশেও যে আনন্দ আমরা লাভ করি, তাহাও প্রোক্ত দেশে অনুভূত হয়। করুণ রস মাত্রেরই ক্রিয়া আমরা উক্ত স্থলেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। যদি হৃদয় অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন না হইত, তবে ভাব সমূহের ক্রিয়া কেন আমরা বক্ষঃস্থলে এবং জ্ঞানের ক্রিয়া কেন মস্তিষ্কে লক্ষ্য করি?

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

অন্তঃকরণের একাংশ যে আত্মিক এবং অপর অংশ যে পাঞ্চভৌতিক, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মস্তিষ্কই অন্তঃকরণের যন্ত্র। এই মস্তিষ্কের মাধ্যমেই আত্মার নানাবিধ গুণ ও শক্তি দেহের নানা স্থানে নানাভাবে প্রকাশিত হয়; যেমন জ্ঞানের স্থূল ক্রিয়া চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সংসাধিত হয়। জ্ঞানের সূক্ষ্ম ক্রিয়া, যথা—চিন্তা প্রভৃতি অন্তঃকরণের যন্ত্র মস্তিষ্কে সম্পাদিত হয়। ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেইরূপ প্রেম প্রভৃতি কোমল গুণ বা ভাব হৃদয় দেশে বা বক্ষঃস্থলের অন্তর্ভাগে প্রকাশিত হয়। আত্মার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রথমতঃ মস্তিষ্কেই গমন করে এবং সেই স্থল হইতে উহার বহিঃপ্রকাশ জন্য যথোপযুক্ত যন্ত্রসমূহে গমন করে। কিছু গ্রহণ করিতে হইলে হস্তই সেই কার্য্য করে, কিছু দেখিতে হইলে চক্ষুই সেই কার্য্য করে, ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে চিন্তা প্রভৃতি জ্ঞানের কার্য্য মস্তিষ্কেই হয়। সেইরূপ ভাব সমূহের (কোমল গুণ রাশির) প্রকাশ আমাদের বক্ষঃস্থলের অন্তর্ভাগে হইয়া থাকে। এই জন্য ভাব দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্র সহজেই affected হয়, অপরদিকে চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক সহজেই affected হয়। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অন্তঃকরণই আত্মার কার্য্যক্ষেত্র। আবার মস্তিষ্কই অন্তঃকরণের যন্ত্র এবং উহা দ্বারাই আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রয়োজনানুসারে যথাযোগ্য স্থানে প্রেরিত হয়।

অতএব মানব সাধারণের গুণ ও শক্তি সর্ব্বদাই বিকৃত ও অপূর্ণ। সেই গুণকে গুণ না বলিয়া গুণাভাস বলিলেও বিশেষ ত্রুটী হয় বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি বলিয়াছেন। উহাদিগকে কখনই আত্মার জ্ঞান বা অন্যান্য গুণের সমান বলেন নাই।

পরলোক

পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে ইতঃপর লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল। উক্ত গ্রন্থে এ বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্ত্তমান।

"মনুষ্য মাত্রেরই অসীম দেহ—স্থূলতম (আদিম), স্থূলতর ইত্যাদি এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি। মনুষ্য আদিম বা স্থূলতম দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করে। তথায় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হয়। পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি অনুসারেই আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। আদিম দেহ ত্যাগের পরে যে যে স্থানে যাইতে হয়, সে সমস্তও সাধারণতঃ পৃথিবীর ন্যায় এক একটী স্থান, কিন্তু ঐ সকল স্থান ক্রমশঃই সূক্ষ্ম। অপর যে সকল ব্যক্তি আদিম দেহেই বহু দেহের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান, তাঁহারা আদিম দেহ ত্যাগের পরে একেবারেই অত্যুন্নত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রূপে অসীম কাল গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ আত্মা অনন্ত গুণধাম পরমপিতার নিকটবর্ত্তী হয়, ও অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"* "উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইবে যে পরলোকে সকল আত্মা সমান স্থানে অবস্থিতি করেন না। বস্তুতঃও তাহাই। যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা উচ্চতর ও সুখময় স্থানে ও যাহারা অবনত, তাহারা

---

* এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্ম কোন এক সুদূরবর্ত্তী ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন এবং আত্মার উন্নতি হইলেই সেই জীব ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হন, অর্থাৎ দেশ হিসাবে তাঁহাদের নৈকট্য সম্পর্ক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। যাহা হয়, তাহা এই যে গুণবৃদ্ধির জন্য হৃদয়ে আবরণ সমূহ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয় এবং এই আবরণ উন্মোচনের বৃদ্ধির সহিতই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ফল স্বরূপ জীবাত্মা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন অর্থাৎ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে চির প্রেমান্তর্গত করিয়া হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন এবং তাঁহার দর্শন লাভ করিতে দূরে বা সুদূরে যাইতে হয় না। প্রথমে তাঁহাকে হৃদয়েই দর্শন করিতে হইবে এবং সাধনার উন্নতির সহিত তাঁহাকে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীতও দেখিতে হইবে। "প্রথমে তাঁহাকে হৃদয়েই দেখিতে হইবে" বলায় কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ ক্ষুদ্র কোন কিছু ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন এক গুণে একত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রথম দর্শন হয়। সুতরাং তখনও ব্রহ্মকে সাধক সেই গুণে অনন্তই দেখিয়া থাকেন। জীব যে কোন কালেই ব্রহ্মের অনন্ত এবং পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন না এবং ব্রহ্ম লোক সম্বন্ধে আলোচনা সোঽহংবাদ অংশে আমরা দেখিতে

নিম্নতম ও ক্লেশময় স্থানে বাস করেন। সূর্য্যমণ্ডলের ও পৃথিবীর কেন্দ্র সংযোজক রেখার মধ্য বিন্দু হইতে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশরূপে রেখাপাত করিয়া উচ্চতা ও নিম্নতা স্থির করিতে হইবে।" "একবিধ উন্নত আত্মারা পরলোকে যে যে স্থানে থাকেন, তাহাকে এক একটী শ্রেণী কহে। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রথম অবধি কতকগুলি শ্রেণীকে নরক বলা যায়। কিন্তু ঐ স্থান সমূহ একের পক্ষে নরক হইলেও অন্য কোন মণ্ডলবাসীর পক্ষে স্বর্গ হইলেও হইতে পারে। নরক ভিন্ন সমস্ত শ্রেণীগুলিই স্বর্গ।"

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মানুষ যতই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, ততই সে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করে। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

"If, as appears to be probable, Vegetation exists on Mars, life has developed on two out of the three planets in our system where it has any chance to do so. With this as a guide, it appears now to be probable that the whole number of inherited worlds within the galaxy is considerable. To think of thousands and even more, now appears far more reasonable than to suppose that our planet alone is the abode of life and reason. What the forms of life might be on those many worlds is a question before which the most speculative mind may quail. Imagination, in the absence of more knowledge of the nature of life than we now possess, is unequal

---

পাইব। এস্থলে পাঠক২০৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে সাধক পৃথিবীতে থাকিয়াই বহুগুণে উন্নত ও ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত নৈকট্য লাভ করিতে দেশ কালের অপেক্ষা করে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃপা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। তিনি বিভু।

to the task. There is no reason, however, against supposing that, under favourable conditions, organisms may have evolved which equal or surpass man in reason and knowledge of Nature—and let us hope in harmony among themselves. It may fairly be claimed, then, that this latest discovery completes the work which Copernicus began four centuries ago. Though the belief that our world was the material centre of the universe has long been dead, the supposition that it was (at least probably) unique in being the abode of creatures who could study the universe, has lingered long. Now this last stronghold of the old way of thinking has fallen and there is no longer a basis for supposing that either this world or its inhabitants are unique or any way the "first, last of things". The realisation of this should be good for us. (Dr Henry Norris Prussell Ph,) অর্থাৎ যদি মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিদের বর্ত্তমানতা স্বীকার করিতে হয় এবং ইহা সম্ভব যে তাহা সত্য, তবে আমাদের সৌর জগতে জীব-বাসের উপযোগী তিনটী গ্রহের মধ্যে দুইটী গ্রহে যে জীব উৎপন্ন হইতেছে, ইহাও বলিতে হইবে। ইহাকে সূত্র ধরিয়া ইহা অসম্ভব না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে আমাদের ছায়াপথের (galaxy) মধ্যে জীব নিবাস মণ্ডল অনেক। আমাদের গ্রহই অর্থাৎ পৃথিবীই একমাত্র জীব এবং জ্ঞানের নিবাসস্থল, ইহা অনুমান করা অপেক্ষা ইহা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় যে সহস্র সহস্র অথবা ততোঽধিক মণ্ডলে জীবের বাস আছে। সেই সকল মণ্ডলে কি আকারের জীব কি আকারে বাস করিতেছে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় মনও পরাজয় স্বীকার করে। সেই সকল মণ্ডলে জীব সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান অপেক্ষা

অধিকতর জ্ঞানের অভাবে কেবল কল্পনা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা একান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে অনুকুল অবস্থার মধ্যে সেই সকল মণ্ডলে এরূপ জীব সমূহ বিকশিত (Evolved) হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা বুদ্ধি এবং জ্ঞানে মানুষকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এবং আশা করা যাইতে পারা যায় যে মানুষ অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে মিলনের ভাব অধিকতর। সুতরাং ইহা একরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে যে Copernicus যাহা চারি শতাব্দী পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এই শেষ আবিষ্কার পূর্ণ করিল। আমাদের পৃথিবীই বিশ্বের মধ্য বিন্দু, এই বিশ্বাস যদিও বহুকাল পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছে, তথাপিও এই ধারণা যে পৃথিবী প্রকৃতির জ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানী জীবের সম্ভবতঃ বিশেষ বাসস্থল, তাহা বহুকাল বর্ত্তমান আছে। পুরাতন চিন্তার এই শেষ দুর্গ এখন পতিত হইয়াছে এবং বিশ্বের মধ্যে পৃথিবী ও উহার অধিবাসিবর্গের বিশেষত্ব আছে অথবা তাহারাই প্রথম, তাহারাই শেষ এবং তাহারাই সর্ব্ব-বিষয়ে উত্তম, এই ধারণার মূলে এখন আর কিছু নাই। এই তত্ত্বের সত্য ধারণা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

উদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে যে বিজ্ঞান এখন বহুকাল পরে বুঝিতে পারিয়াছেন যে অন্যান্য মণ্ডলেও জীবের বাস আছে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত পরলোক সম্বন্ধীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য মণ্ডল সমূহে পারলৌকিক আত্মাসমূহ বাস করেন। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন যে "এক্ষণে পৃথিবী যেমন নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও বিবিধ জীবের আবাস স্থান হইয়াছে, এইরূপ অন্যান্য বহু সংখ্যক গ্রহ ও উপগ্রহে এমনকি সূর্য্যমণ্ডলেও নানা শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ও জীবগণ বাস করিতেছে" (ক)। বিজ্ঞান বলেন যে সূর্য্যমণ্ডলে উদ্ভিদ ও জীবের বাস সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কারণ, উহার সর্ব্বত্রই অত্যন্ত উত্তাপ এবং উহাতে জল ও ভূমির একান্ত অভাব। পরমর্ষি গুরুনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন যে "গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বয়ং তেজোময় নহে। সূর্য্যের তেজঃ উহাদিগের উপর

(ক) তত্ত্বজ্ঞান - উপাসনা।

পড়ায় উহারা তেজঃবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। সূর্য্যমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বতে তেজোময় বাস্পরাশি বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে গ্রহ ও উপগ্রহে যেমন জ্যোতিঃ এবং তেজঃ পতিত হয়, তদ্রূপ উহা হইতেই সূর্য্য-মণ্ডলেও জ্যোতিঃ ও তেজঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে"(খ)। "জ্যোতিষ্ক-গণের বা মণ্ডল সমূহের প্রথমাবস্থায় উহাদের উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে তাহাতে প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও নিবাসের কথা দূরে যাউক, উদ্ভিদগণও উৎপন্ন হইতে পারিত না। কালক্রমে উহাদিগের উপরি-ভাগ শীতল হইলে জীব ও উদ্ভিদের অবস্থিতি উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের অভ্যন্তর ভাগ অদ্যাপি অতিশয় উত্তপ্ত আছে" (খ)। "তেজের বিকারে যখন তোয় এবং তোয়ের বিকারে যখন ভূমির উৎপত্তি হয়, তখনই তত্তৎ পদার্থে পরম পুরুষের ইচ্ছানুসারে বিবিধ উদ্ভিদ ও জীবের নানাজাতীয় বীজ নিহিত হয়" (খ)। এই সকল উক্তিই বিজ্ঞান সম্মত বলিতে হইবে। তথাপিও পরমর্ষি গুরুনাথ কেন সূর্য্যমণ্ডলে উদ্ভিদ ও জীবের বাস আছে, সেই সমস্যার সমাধান করা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্যই এই বিষয়ে বিশেষ রহস্য বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা ভেদ করা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল, সুতরাং তাঁহার উক্তি সকলেরই বিশেষ ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজনীয়। এখন আমরা পার্থিবভাবে একটু উক্তি সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিতে পারি, তাহার এই ইঙ্গিত সুধী ও বৈজ্ঞানিক বর্গের বিশেষ অনুধাবনের জন্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই পন্থা ধরিয়া বিচার ও পরীক্ষা করিলে এবং অন্যান্য পন্থা উদ্ভাবন করিলে মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক ভাবেই প্রমাণ করিতে পারা যায় যে সূর্য্যমণ্ডলে কোন কোন স্থানে জীব ও উদ্ভিদের বাস সম্ভবও আছে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ। উহাতে সময় সময় Black spots (সৌরকলঙ্ক) দৃষ্ট হয় এবং উহাদের এক একটী spot নাকি এক একটী পৃথিবীর সমান। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে সূর্য্যমণ্ডলের এই

(খ) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

সকল স্থলে উদ্ভিদ পাহার পর্ব্বত বহু পরিমাণে আছে। তাহাতেই উহারা অন্যান্য স্থল হইতে পৃথক্ বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী সূর্য্যেরই কন্যা স্বরূপা। উহার পরিমাণের তুলনায় অতি ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া উচ্চতম পর্ব্বত হিমালয় বর্ত্তমান। সূর্য্যমণ্ডলের ঐ সমস্ত স্থলে শত শত সহস্র সহস্র উচ্চতর এবং অধিকতর স্থানব্যাপী হিমালয় বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তাহাতেই সেই সকল স্থান আমাদের দৃষ্টিতে Black spots বলিয়া মনে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে চন্দ্রের কলঙ্ক কলঙ্ক নহে। কিন্তু উহাতে উহারা (কলঙ্ক চিহ্ন) পর্ব্বত সমূহের চিহ্নমাত্র। অতএব এই analogy ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কও (Black spots) বহুদূরব্যাপী পর্ব্বতমালার চিহ্ন মাত্র। সূর্য্যমণ্ডলের Black spot সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও ধ্রুব মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সূর্য্য সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব বিজ্ঞান এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে অত বড় মণ্ডলে এমন বহু স্থান থাকিতে পারে, যাহারা এমন ভাবে সৃষ্ট এবং সূর্য্যালোক সেই স্থানে এমনভাবে পতিত হয় যে তথায় উদ্ভিদ ও জীব বাস সম্ভব হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে পর্ব্বতমালার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহারা এমন-ভাবে রচিত হইতে পারে যে সেই স্থলে সূর্য্যতাপ এমন পরিমাণে পতিত হয় যে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবদেহ তথায় উৎপাদন বা বাসোপ-যোগী করিতে পারে। পৃথিবীতে হিমালয় প্রদেশেও জীবদেহ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ও বাস করে। এস্থলে পর্ব্বত গুহা সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিবীর প্রথম মানবগণ পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। এখনও সাধু সন্ন্যাসিগণ পর্ব্বতগুহায় বাস করেন। এই পর্ব্বত মালা যদি সহস্র সহস্র যোজন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে এবং গুহাগুলিও শত শত যোজন ব্যাপী হয়, তবে সেই সকল গুহাতে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উৎপন্ন হইতে ও বাস করিতে পারে। সূর্য্যমণ্ডলের আদিম মানবানুরূপ অধিবাসিগণের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ যেমন তাহার বিদ্যা,

বুদ্ধি ও কৌশলে ক্রমশঃ উন্নত প্রণালীতে শীতাতপ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে ও করিতেছে, মানুষ যেমন তাহার চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে প্রকৃতিকে বহুল পরিমাণে করায়ত্ত করিয়া ভূলোককে দ্যুলোক প্রায় করিয়া তুলিয়াছে, সূর্য্য মণ্ডলের অধিবাসিগণও সেইরূপ প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া নানা স্থানে জীব ও উদ্ভিদের উৎপাদন ও উপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ তাহার চেষ্টা ও বুদ্ধি দ্বারা মরুভূমিকেও "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ও মলয়জ শীতলা" করিতে পারে ও করে, মানব Air-conditioned house. Airconditioned coach ইত্যাদিও গঠন করিতে পারে এবং মানব ভূতল বিহারী হইয়াও গগন বিহারী হইতে পারে। "সাধনার বলে অসম্ভববৎ প্রতীয়মান কতশত ব্যাপার সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।" বিজ্ঞানই তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের অধিবাসিগণও বা কেন তাহা হইতে অধিকতর সুকৌশলে প্রকৃতিকে কয়ায়ত্ত করিতে পারিবে না, তাহার কোনই কারণ নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে স্থলে বাধার পরিমাণ যত অধিক, সেই স্থলে তাহা উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টাও ততোঽধিক। এই জন্যই পৃথিবীর আদি মানব অবস্থা হইতে বর্ত্তমান মানব জ্ঞানে ধর্ম্মে এত উন্নত। সূর্য্য মণ্ডলের মানবানুরূপ জীবগণ যে মানব অপেক্ষা বহু বহু গুণে পুরাতন সুতরাং অধিকতর অভিজ্ঞ, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। কারণ, পৃথিবী সৃষ্টির বহু বহু কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সে স্থলে জীব সৃষ্টিও যে পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির বহু কোটী বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সম্পর্কে আমাদের একটী বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে যে, যে সকল মণ্ডলে জীবের বাস আছে. তাহারা হুবহু পৃথিবীর জীবসমূহের ন্যায় নহে। মণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা (**Physical and Climatic condition**) অনুযায়ী তাহাদের দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে পৃথিবীর কোন কোন প্রকারের

জীব বা বৃক্ষলতার সদৃশ জীব বা বৃক্ষলতা অন্যান্য মণ্ডলে সৃষ্টই হয় না, যেমন পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার জীব এবং বৃক্ষলতা জন্মে, কিন্তু সকল প্রকার জীব এবং বৃক্ষলতা সকল স্থানেই জন্মে না। আবার সাহারা মরুভূমির নিকটবর্ত্তীস্থানের অধিবাসী ও Laplanders উভয়ই মানব বটে, কিন্তু তাহাদের Physique বিভিন্ন প্রকারের। বোধ হয় Laplander-গণ সাহারা মরুভূমিতে অধিককাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আবার বিপরীত কথাও সত্য যে মরুভূমির অধিবাসী উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে অধিককাল বাঁচেনা। দেখা গিয়াছে যে Up Country হইতে জলমাতৃক দেশ পূর্ব্ববঙ্গে আনীত গাভীগণ সুস্থ শরীরে অধিককাল বাঁচেনা। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সূর্য্যমণ্ডল বা অন্যমণ্ডলে আদিম দেহধারী জীব বাস করেন, তাহাদের দেহ সেই সেই মণ্ডলের আবহাওয়ার উপযোগী ভাবে গঠিত। ইহা বুঝিতে হইবে না যে, যে হেতু পৃথিবীর মানব সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিতে পারে না বলিয়াই কোন জীবই সেই স্থানে বাস করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে সূর্য্য মণ্ডলের জীবদেহ তেজঃ প্রধান।

চন্দ্রলোকেও যে জীবের বাস আছে, তাহাও বিজ্ঞান স্বীকার করেন না, যদিও চন্দ্রলোকের একপৃষ্ঠ মাত্র আমরা দেখিতে পাই এবং অন্য পৃষ্ঠ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও কতদূর সত্য, তাহা সুধী পাঠক বিবেচনা করিবেন। অন্য কোন মণ্ডল হইতে যদি কেহ পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু প্রদেশ মাত্র দেখিয়াই পৃথিবীতে জীবের বাস নাই, কিন্তু উহা বরফাচ্ছন্ন স্থান মাত্র মনে করেন, তবে তাহাদের যেমন ভূল হইবে, আমাদের মনে হয় যে চন্দ্রলোকে জীবের বাস নাই বলিলেও আমাদের সেইরূপ ভুলই হইবে।

অবশেষে আমাদের ইহাও চিন্তা করিতে হইবে যে পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত উপাদান সূর্য্যেরই সম্পত্তি। আবার চন্দ্রমণ্ডলের সমস্ত উপাদান পৃথিবীরই এবং পরম্পরা ভাবে সূর্য্যেরই। পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও জীবদেহ উৎপন্ন হইতেছে এবং উহাদের বাসোপযোগী সকল ব্যবস্থাই পার্থিব প্রকৃতিতে সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি যে সূর্য্য এবং চন্দ্র মণ্ডলদ্বয়ে উদ্ভিদ ও জীববাসের সম্ভাবনা আছে, তবে তাহা একান্ত অযৌক্তিক হইবে না। বৈজ্ঞানিক অবশ্যই বলিবেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের উপাদান পৃথিবীর সহিত এক হইলেও উহাদের রচনা বিভিন্ন হইতে পারে এবং Physical and Surrounding Conditions এমন হইতে পারে যে তাহাতে জীবের বাস অসম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বিনীতভাবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর অসংখ্য মণ্ডলগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল পৃথিবীকে যথাস্থানে রাখিবার জন্যই নহে। জীবের জন্যই জড় জগৎ, অন্যথা জগতের কোনই প্রয়োজন ছিল না। সাংখ্যও বলেন যে জড় পরার্থ মাত্র। সুতরাং অন্যান্য মণ্ডলেও জীবের বাস আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই অনুচ্ছেদে লিখিত বিষয় যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহের সহিত যোগে চিন্তা করা যায়, তবে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে যে জীবের বাস আছে, এই অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। অত বড় সূর্য্যমণ্ডলের কোন কোন স্থান যে পৃথিবীর অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে অর্থাৎ সেই মণ্ডলের উপযোগী জীব-বাসের সম্ভব হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল মণ্ডলেও আদিম দেহধারী জীবের বাস আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। মঙ্গল গ্রহে যে মনুষ্যরূপ Intelligent Beings আছে, ইহা বিজ্ঞানও অনুমান করেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বহুসংখ্যক মণ্ডলে আদিম দেহে (স্থূল দেহে) মানবানুরূপ জীব বাস করেন এবং পারলৌকিক আত্মাগণও সূক্ষ্মদেহে বাস করেন। আমাদের মনে হয় যে ৩৯৯ শ্রেণী পর্য্যন্ত আদিম স্থূলদেহে মানবানুরূপ জীব জন্মগ্রহণ ও বাস করেন। ৩৯৯ শ্রেণীই স্থূলদেহের শেষ। তৎপরে সূক্ষ্মদেহের আরম্ভ। আদিম দেহ স্থূলই হইতে পারে, সূক্ষ্ম বা কারণ হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। মাতৃ-

গর্ভ হইতে সূক্ষ্মদেহ ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না। আর সূক্ষ্মদেহ তেজঃ ও বায়ু প্রধান, কিন্তু আদিম দেহ ক্ষিতি ও অপ্ প্রধান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তেজঃ ও মরুৎ প্রধান মণ্ডলে যে আদিম দেহ সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা বিজ্ঞান সম্মত সত্য। ৪০০ শ্রেণী হইতে অনন্ত প্রায় শ্রেণীতে ক্রমান্বয় তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম প্রধান দেহে কেবল পারলৌকিক আত্মাগণ বাস করেন। আমাদের পরলোকে গমন করিয়া তথায় যেমন মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, সেইরূপ ঐ সকল মণ্ডলে গমন করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলের দেহত্যাগ করিতে হয়। ২৫৮-২৫৯ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় যে "তেজের বিকারে যখন তোয় এবং তোয়ের বিকারে যখন ভূমির উৎপত্তি হয়, তখনই তত্তৎ পদার্থে পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারে বিবিধ উদ্ভিদ ও জীবের নানা জাতীয় বীজ নিহিত হয়।" সুতরাং আদিম দেহের উৎপত্তির জন্য ভূমি ও জলের অত্যাবশ্যকতা। কিন্তু তেজোময়, বায়ুময় ও ব্যোমময় মণ্ডলে উহাদের বিশেষ অভাব। সুতরাং সেই সকল মণ্ডলে আদিম দেহের উৎপত্তি অসম্ভব।

সৃষ্টির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। ইহাতে যে কত শত বিষয়ের উল্লেখ হয় নাই, তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্যা সমূহের মীমাংসা সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান ভাবে লিখিত হইয়াছে। আরও প্রকৃত ভাবে বুঝিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্বই সকল বিষয় অন্তর্গত করিয়া বর্ত্তমান। সেই সকল সুকঠিন সমস্যার সমাধান হইলেই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা লাভ হইতে পারে।

ওঁং সৃজন-পালন-লয়-কারণং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহু-রসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তঃ। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।১-২ ।

জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব

জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর প্রসঙ্গক্রমে আরও লিখিত হইবে। সুতরাং এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিনা। আর মানুষের যে সহজ জ্ঞান আছে, তাহা দ্বারাই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে Meterialistic Theory of Creation সর্ব্বৈব মিথ্যা। যাহাদের সহজ জ্ঞান বিকৃত হইয়াছে, তাহারাই এইরূপ মত সমর্থন করেন।

জড়বাদী বলেন যে এই বিশ্ব জড় পরমাণুর Physical and Chemical Combination এ সম্ভব হইয়াছে। জড় পরমাণু কোথায় হইতে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে পরমাণু সমূহ হঠাৎ (By chance) উৎপন্ন হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক্। জড় পরমাণু হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই ও হইতেও পারে নাই। বিজ্ঞান জাগতিক ব্যাপারে Law of Cause and Effect স্বীকার করেন। এমনকি, বিজ্ঞান এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হয়। অদ্য পর্য্যন্ত যত কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়া সমূহ দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান হইতে যদি এই তত্ত্ব বহিষ্করণ করা যায়, তবে বিজ্ঞান দাঁড়াইতেই পারে না। বিজ্ঞান তখন বিজ্ঞানই থাকে না, শূন্য হইয়া যায়। আমরা এখন এমন কোন কার্য্য দেখি না, যাহা হঠাৎ হইয়াছে বা হইতেছে। আমরা আশাও করিতে পারি না যে ভবিষ্যতে হঠাৎ কিছু হইবে। প্রত্যেক কার্য্যেরই পশ্চাতে বহু বহু কারণ বর্ত্তমান

থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই অথবা উপরি উপরি মাত্র অনুসন্ধান করিয়াই কারণ খুঁজিয়া না পাইয়াই বলেন যে এই এই ঘটনা হঠাৎ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত যে একেবারেই ভ্রান্ত, তাহা সুধী পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। পরমর্ষিগুরুনাথ বলেন :—"জগদ্রূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল কারণ অনুমেয়। যেহেতু কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। তবে আপত্তি হইতে পারে যে, অভাবই ভাবের কারণ বলনা কেন? যেহেতু বীজ হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তথায়ও ভাব-বীজ অঙ্কুর-কার্য্যের কারণ নহে। প্রত্যুত, ভূমির উষ্ণতা ও জলাদির যোগ-নিবন্ধন বীজের ধ্বংস হইলে ঐ বীজাভাবই ভাব অঙ্কুরের উৎপত্তি-কারণ হয়। আর এতদ্বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যেরাও এবম্প্রকারই বলিয়া থাকেন।" "সাংখ্যাচার্য্যেরা বৌদ্ধাচার্য্যদিগের এই প্রকার সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, "বীজের প্রধ্বংসের পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাবভূত বীজাবয়ব হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। অতএব বীজাভাব অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ নহে।" "নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যেরা যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহি। আমাদিগের মতে বীজের ধ্বংস হয় না, বিকার মাত্র হয়। সেই ভাবভূত বিকারাবস্থা হইতেই ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। শ্রুতিতেও এইরূপই বর্ণিত আছে। অতএব অসদ্‌বাদী বৌদ্ধেরা যে বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্ত দর্শনে সর্ব্বত্রই অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার ভ্রমাত্মকতা প্রদর্শিত হইল।" "চার্ব্বাক বলেন যে কার্য্যের কোনও কারণ নাই। উহা আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, কার্য্য সকারণ হইলে যে সময়ে কারণ সমূহের উপযুক্ত মিলন হয়, তখনই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে। আর কার্য্য নিষ্কারণ হইলে উহাতে কাহারও অপেক্ষা থাকে না বলিয়া উহা সকল সময়েই হইতে পারে। অথবা কোন সময়েই হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্য সকল সময়ে হয় না,

কখনও কখনও হয়, একারণ উহার কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব চার্ব্বাকের আপত্তি সঙ্গত নহে।" "আরও দেখ, অভাবকে ভাবোৎপত্তির কারণ স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র অভাবের সুলভতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ আম্র বীজ হইতে কাঁটাল এবং কাঁটালের বীজ হইতে আম্র হইতে পারে। যখন আম্র-বীজ হইতে আম্র গাছ এবং কাঁটালের বীজ হইতে কাঁটাল গাছ হয়, তখন অভাবকে উৎপত্তির কারণ বলা যায় না। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না। প্রত্যুত ভাব-পদার্থ হইতেই ভাব-পদার্থের উৎপত্তি হয়। নাসতো জায়তে ভাবঃ। অতএব জগদ্রূপ কার্য্য দর্শনে ইহার যে কারণ অনুমান করা হয়, তাহা অভাব পদার্থ নহে, প্রত্যুত, ভাব পদার্থ।"(ক)

এই অংশের উর্দ্ধভাগে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে অসৎ হইতে জগৎ আসে নাই বা আসিতেও পারে নাই, কিন্তু সংস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ আগমন করিয়াছে। ইহা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ মন্ত্র।

এই সম্পর্কে Sir James Jeans-এর উক্তি (১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৬ পৃষ্ঠা) বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই। Chance বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক ক্রিয়ারই কর্ত্তা আছে। কার্য্য কখনও স্বাধীন নহে। কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য অসম্ভব। বিজ্ঞান জগতে উন্নতি দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে মানুষই সকল করিতে পারে এবং বিজ্ঞানের দুই চারিটী আবিষ্কারের দোহাই দিয়া কেহ কেহ বুঝাইতে চাহেন যে এই সৃষ্টি ক্রিয়ায় কেহই কর্ত্তা নাই, ইহা আপনা আপনি হইয়াছে। এই ধারণার পশ্চাতে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত অনুমান আছে, কিন্তু উহাদের মূলে কোনও যুক্তি নাই। এইরূপ উক্তির মূলে তথাকথিত জ্ঞানের অভিমান, সংস্কার-বিবর্জ্জিত ভাবে চিন্তাশীলতার অভাব এবং

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

কোন কোন ব্যক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস। অথচ বিজ্ঞান অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষপাতী নহেন ও হইতেও পারেন না। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে Sir Arthur Eddington, Sir James Jeans, Sir Oliver Lodge, Einstein প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁহার স্রস্টৃত্বে বিশ্বাসী। সুতরাং ঐরূপ অন্ধ বিশ্বাস একেবারেই মূল হীন। জাগতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে ক্রম প্রণালীর প্রাধান্য বর্ত্তমান। ক্রম প্রণালী ভিন্ন কিছুই হইতেছে না। যদি হঠাৎ পরমাণু সৃষ্টির কল্পনা করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে আদি সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালী ছিল না। তাহা অসম্ভব। আবার আদি সৃষ্টি যদি হঠাৎ সম্ভব হইয়াছে, মনে কর যায়, তবে পরের সৃষ্টি সমূহও হঠাৎ হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ, তাহাই Logical conclusion. এক প্রকার সৃষ্টি হঠাৎ হইবে, কিন্তু অন্য সকল প্রকার সৃষ্টি ক্রম প্রণালীর অধীন হইবে, ইহা হইতে পারে না। আবার বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে এবং ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে সৃষ্টি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। সুতরাং সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালীর প্রভাব ও প্রাধান্য দেখিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায় যে সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই।

A. B. C. of Satya Dharma and its Philosophy নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা আছে. তাহা যদি সংস্কার বর্জ্জিত ভাবে পাঠ ও চিন্তা করা যায়, তবে তাঁহার অস্তিত্ব ও সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকিবে না। বর্ত্তমান গ্রন্থেও "অব্যক্তের পরিণাম" অংশেও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তাঁহারই ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই তত্ত্ব নানাবিধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা এবং আপ্তবাক্য যোগে সেই স্থলে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণাভাবে একমাত্র Chance এর অনুমান ও উহার উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

সৃষ্টিতে নানাবিধ নৈসর্গিক দুর্ঘটনা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে এই জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট হইলে এরূপ হইতে

পারিত না। পাঠক যদি এই গ্রন্থের "ব্রহ্মের মঙ্গলসমন্বত্ব" অংশ পাঠ করেন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে জগতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহাই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এমনকি আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল অন্যায় করি তাহাও পরমমঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে মঙ্গলেই পরিণত হইবে। আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাই আমরা বিশ্বের মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু পরমেশ্বর যাহা করিতেছেন, তাহা সমষ্টিভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বে মঙ্গল বই কোনই অমঙ্গল হইতেছেনা। এস্থলে একটী মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ঠ হইবে যাহাতে আমরা বুঝিতে পারিব যে সকল কার্য্যই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। পৃথিবী আদি অবস্থায় উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ মাত্র ছিল। উহাই এখন সুন্দরী বসুন্ধরারূপে পরিণত হইয়াছে। উহা আদি অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে কোটী কোটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই, অপরন্তু উহা সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়াছে। আমরা কার্য্যকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই ভাগে ভাগ করি, কিন্তু ব্রহ্মের নিকট সকলই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থূল, একটী কথা স্মরণে রাখিলেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভ হয়। তাহা এই যে ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ. জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি নিত্য জ্ঞান প্রেমময়। সুতরাং তাঁহার হইতে কখনই কোন কারণেই অমঙ্গল প্রসূত হইতে পারে না। আমরা যাহা কিছু অমঙ্গল মনে করি, তাহা আমাদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের এবং মিথ্যা সংস্কারের জন্যই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে এই গ্রন্থে বহুস্থলে যুক্তি যোগে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

পরমানুর সংযোগ বিয়োগে জগৎ সৃষ্ট, ইহা স্বীকার করিলেও জিজ্ঞাস্য হইবে যে সেই পরমাণু কোথায় হইতে আসিল। ইহার উত্তর পূর্ব্বোক্ত "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। জগতের দুইটী কারণ অবশ্যই থাকিবে। তাহা উহার উপাদান ও নিমিত্ত। এই দুইটী কারণ ব্যতীত মনুষ্য কৃত কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। এই দুইটী কারণের মধ্যে প্রথমটী ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব এবং

দ্বিতীয়টী তাঁহারই ইচ্ছা। তিনিই তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে জগৎ এমন ভাবে রচনা করিয়াছেন যে তাহাতেই জগতে পরমাণু আসিয়াছে এবং উহাদের সংযোগ বিয়োগ সম্পন্ন হইতেছে। এ সকল তাঁহারই—একমাত্র তাঁহারই জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছা-সম্ভূত রচনা কৌশল। সৃষ্টির আদি প্রণালী যেরূপ ছিল, এখনও মনুষ্যকৃত সৃষ্টিতেও সেইরূপ প্রণালীই অবলম্বিত হয়। যদি সৃষ্টি By chance হইত, তবে এখনও জগতে সেইরূপই By chance সৃষ্টি হইতে থাকিত। উহার জন্য উপাদান ও নিমিত্ত কারণের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিত না, ক্রম প্রণালীও বর্জ্জিত হইত। কিন্তু এখন কোনওরূপ সৃষ্টি নৈসর্গিক বা কৃত্রিম (জীবকৃত) হঠাৎ হয় না।

বিজ্ঞান বলেন যে জড়কে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। সুতরাং জগতের কার্য্যের পশ্চাতেও একজন জ্ঞানময় শক্তিমান্ পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। নতুবা জড় জড়ই থাকিবে, উহা দ্বারা কোনই কার্য্য হইবে না। এই তত্ত্বের সারবত্তা ধারণা করিয়াই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন একজন পুরুষের বা জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই দর্শনের দৃষ্টান্ত এই যে অন্ধ জড়কে চক্ষুষ্মাণ কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষ চালায়। * পুরুষের সংসর্গ ভিন্ন জড় কিছুই করিতে পারে না।

জড়ের যে শক্তি, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি মাত্র এবং তাঁহারই ইচ্ছায় উহা জড়ীয় শক্তি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে কেনোপনিষদের উপাখ্যান বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে জড়ের শক্তি ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন শক্তিহীন। তিনি চালান বলিয়াই জড় জগৎ চলিতেছে এবং যখন তিনি ইহা থামাইবেন, তখন প্রলয় সম্ভব হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছার জন্য জগৎ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি যখন সেই ইচ্ছা সংহরণ করিবেন, তখন মহাপ্রলয় সম্পূর্ণ হইবে। জড় স্বাধীন নহে, উহা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন, তাই

* এই সম্পর্কে "সাংখ্যমত বিচার" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না।

বিজ্ঞান জড় জগতের বিধান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিধানের অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছেন, নতুবা চৈতন্য ও জ্ঞানহীন জড় কখনই এইরূপ প্রকৃতির কর্ত্তা হইতে পারিতেন না। সংস্কার বিহীন ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে এইরূপ জ্ঞানময়ী সৃষ্টির কর্ত্তা অবশ্যই অনন্ত জ্ঞানময়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Mahthematician. নতুবা বৈজ্ঞানিক নির্ভুলভাবে মণ্ডল সমূহের গতিবিধি গণনা করিতে পারিতেন না। তিনি অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহার দ্বারা রচিত ও পরিচালিত বিশ্বে বিধান সকল ত্রুটী শূন্য হইয়াছে (ক)। যদি ইহার কর্ত্তা অজ্ঞান জড় মাত্র হইত, তবে নক্ষত্র সমূহ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া এতকালে প্রলয় সংঘটন করিত। কিন্তু তাহাত হইতেছেনা। আমরা দেখিতেছি যে উহারা সুশৃঙ্খল ভাবে আপন আপন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিশ্বের রচনা ও পরিচালনায় কোথায়ও কোনই ত্রুটী নাই। যে সকল ত্রুটী আমরা মনে করি, তাহা আমাদের অজ্ঞান এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্যই। অতএব আমরা দেখিলাম যে জ্ঞান-প্রেমময় ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ ও তাঁহার ইচ্ছা শক্তি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টই হইতে পারিত না, পরিচালনাত দূরের কথা।

কেহ কেহ বলেন যে মানুষের চিন্তাশক্তিও (Thought) জড়ের Physical and Chemical combination এর ফল মাত্র. ইহার পশ্চাতে আত্মা নাই। তাহারা আরও বলেন যে বিজ্ঞানের আরও উন্নতিতে ইহা প্রামাণিত হইবে। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই দুইটী কল্পনাই নিছক মিথ্যা। আমরা দেখিয়াছি এবং ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত হইবে যে "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব সত্য। আমরা দেখিয়াছি যে চিন্তা অন্তঃকরণের কার্য্য।

(ক) প্রকৃতি যে জ্ঞানময়ী, প্রকৃত গ্রন্থ যে আমাদিগকে পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যাই দান করিতে পারে এবং অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা যে প্রকৃতি গ্রন্থে আত্ম পরিচয় সুস্পষ্টভাবে, কিন্তু কাঠিন্যপূর্ণ ভাষায় নিজ অভ্রান্ত লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের নানাস্থলে নানাভাবে লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অন্তঃকরণের মূলে আত্মার সুতরাং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি রাশি। উঁহারাই মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের (করণের) মাধ্যমে বাহিরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অন্তঃকরণের এক অংশ (এবং উহাই মূল অংশ) জড় পদার্থ নহে এবং অন্য অংশ সূক্ষ্মতম জড় দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ উহার এক অংশ কর্ত্তা ও অন্য অংশ উহার যন্ত্র মাত্র। সুতরাং অন্তঃকরণে যে আমরা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা দেখিতে পাই, তাহা সূক্ষ্ম। সুতরাং উহারা জড়ীয় ভূতের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না।

এখন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মস্তিষ্ক জড়ীয় ভূত দ্বারা গঠিত। সুতরাং অন্তঃকরণের একমাত্র যন্ত্রও ভূতোৎপন্ন। তবেত চিন্তা প্রভৃতি যাহা আমরা অন্তঃকরণে পাই, তাহাও ভূতোৎপন্ন বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্তঃকরণের মূলে যদি আত্মার সুতরাং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশি বর্ত্তমান না থাকিত, তবে মস্তিষ্ক স্বাধীন ভাবে বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহংকার, ভাব ও ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারিত না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিলেও উহাতে জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছার কোনই অভিব্যক্তি দেখা যায় না। পঞ্চেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ুঃ ও উপস্থ যেমন কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেইরূপ মস্তিষ্কও একটী শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র মাত্র। উহার মাধ্যমে আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি প্রকাশিত হয়। কারণ, উহা জড়ের পঞ্চ সত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা গঠিত, সুতরাং স্বচ্ছ। (সত্ত্ব গুণ স্বচ্ছ)। তাই উহাতে আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি প্রতিফলিত হইতে পারে এবং সেই অনুযায়ী শারীরিক যন্ত্র সমূহ চালিত হয়। দেহে আত্মা না থাকিলে যন্ত্র সমূহ সহ শরীর নিতান্ত অকেজো, উহা দ্বারা জীব ভাবের কোনই ক্রিয়া হয় না, উহা শবে পরিণত হয়। সুতরাং চিন্তার মূলে আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি, কিন্তু মস্তিষ্ক নহে। উহা যন্ত্র মাত্র—যেমন চক্ষু দর্শন করিবার যন্ত্র মাত্র, কর্ণ শ্রবণ করিবার যন্ত্র ইত্যাদি। মস্তিষ্ক এবং বহিরিন্দ্রিয়গণের মধ্যে পার্থক্য এই যে এক একটী ইন্দ্রিয় এক

একটী কার্য্য করে, কিন্তু মস্তিষ্ক সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের মূলে। অর্থাৎ আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি মস্তিষ্কের মাধ্যমে সকল ইন্দ্রিয় চালনা করেন। এই সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত ৮।১২।৪-৫ মন্ত্রদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "অথ যত্রৈ-তদাকাশমনুবিষন্নং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবাণীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্।" (৪) "অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।" বঙ্গানুবাদ :—তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের (অর্থাৎ কৃষ্ণতারকার) যে স্থলে অনু প্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ (বর্ত্তমান); চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। (দেহের মধ্যে থাকিয়া) যিনি বুঝিতেছেন যে "আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি," তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার যন্ত্র। যিনি বুঝিতেছেন "আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছি", তিনিই আত্মা; বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন "আমি ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি," তিনিই আত্মা, শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য (৪)। আর যিনি এই বুঝিতেছেন যে "আমিই ইহা মনন করিতেছি," তিনিই আত্মা, মনঃ ইহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষুদ্বারা সমুদায় কাম্য বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন (৫)।

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মাই সকল করেন, মস্তিষ্ক (অন্তরেন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ—করণ অর্থে যন্ত্র) ও বহিরিন্দ্রিয়গণ — পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যন্ত্র মাত্র। উহাদের নিজস্ব কোনই মূল্য নাই, যেমন বাদক ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সমূহ কোনও রূপ বাজনা বাজাইতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে উক্ত যন্ত্রসমূহ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাত উৎপাদন করিতে পারেই না, অপরন্তু

আত্মার গুণ ও শক্তিরাশিকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করিতে পারে ও করে। কি প্রকারে বিকৃতি সম্ভব হয়, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। অতএব "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে ব্রহ্ম হইতেই জড় জগতের উৎপত্তি, কিন্তু চিন্তা প্রভৃতি জড়ের কার্য্য নহে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে অন্তঃকরণের পাঞ্চভৌতিক অংশ আত্মার যন্ত্র মাত্র। Psychology বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন বটে, কিন্তু উহা সমগ্র অন্তঃকরণের সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই ও পারিবেও না। উহা কেবল জড়ীয় অংশের কিছু কিছু তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে মাত্র। এইজন্য উহাকে Most imperfect Science বলা হয়। এই জন্য সেই বিভাগের বৈজ্ঞানিকদিগের কোনই ক্রটী নাই। কারণ, তাহারা জড়ের বিধান লইয়াই চর্চ্চা করেন এবং তাহাই বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছু বলিতে পারেন না। It is beyond the jurisdiction of the material Science. জড়ের নিয়ম অলঙ্ঘ্য এবং উহা স্বাধীন নহে, কিন্তু আত্মা নিত্য স্বাধীন। সুতরাং তাঁহার কার্য্যের বিশ্লেষণ জড় বিজ্ঞানের পক্ষে অবোধ্য ও অসাধ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে জড় পদার্থের নানাবিধ সংস্থানে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং ইহা স্বীকার করা যায় না। জড় পদার্থের চৈতন্য নাই। ইহা বিজ্ঞানও স্বীকার করেন। সুতরাং এই অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন thought উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে চিন্তা জড় পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম। 'সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্"। সুতরাং thought যখন জড় পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম, তখন জড় পদাথ হইতে উহা উৎপন্ন হইতে পারে না।Thought যে জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা Dr John Caird তাঁহার "An Introduotion to the Philosophy of Religion" নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :— "We have seen that a theory which makes mind the

final result or last development of nature, is untenable, in as much as consciousness which this theory represents as last, is also first. It cannot be resolved into anything that does not already involve itself, it is the presupposition and all-embracing element of that material world from which it is supposed to be evolved".

চিন্তার মূলে যে আত্মার সুতরাং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশি তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী"-তে আরও দেখিতে পাইব। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, জড় জগৎ চিন্তা সুতরাং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই ও করে নাই।

অবশেষে আপত্তির দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানের বিশেষত্বই এই যে উহা সর্ব্ব সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বিরোধী। উহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করিতে পারে নাই যে চিন্তা জড় পদার্থ-জাত মাত্র। সুতরাং ইহা বলা উচিত নহে যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষময় ফল এই যে উহা অশিক্ষিত ও চিন্তাশীলতা বিহীন অন্ধ বিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে বিপথগামী করে।

সৃষ্টির যে একটী উদ্দেশ্য আছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য তত্ত্ব। সৃষ্টির যদি কোনই উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে ইহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইত না। পৃথিবীর আদি ও বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে পৃথিবী কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির কথা চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ নর সৃষ্টি হইয়াছে। আবার যদি আমরা আরও অগ্রসর হই, তবে দেখিতে পাইব যে এই নরগণ ভবি-

যতে দেবদেহ ধারণ করিয়া পরলোকের নানা মণ্ডলে বিচরণ করিবেন। এই সম্পর্কে "সপ্ত সমস্যা" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যাইবে যে প্রকৃতিতে এমন উপায়ে সৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি যে কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপায় সমূহ অবলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য না থাকিলে বিন্দুমাত্র মিশ্রিত শুক্রশোণিত মানবদেহে পরিণত হইত না। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বিশ্বে এমন কোন বস্তু সৃষ্ট হয় নাই বা হইবেও না, যাহার পশ্চাতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই এবং যাহা নিজ শক্তি অনুযায়ী সেই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধন না করে। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে চৈতন্য ও জ্ঞানশূন্য জড় পদার্থ আপনা আপনি জড় জগৎ সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতে পারে না। সৃজন ও পালন জন্য একজন চৈতন্য ও জ্ঞানপূর্ণ এবং শক্তিমান পুরুষের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন আমরা বলি যে চৈতন্য ও জ্ঞান শূন্য জড় পদার্থের মধ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে না। উহা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জ্ঞানময়ী প্রকৃতির কর্ত্তা হইতে পারে না। স্থূল, অচেতন ও জ্ঞানশূন্য সুতরাং উদ্দেশ্য বিহীন জড় দ্বারা এইরূপ সুশৃঙ্খলাপূর্ণা জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। যদি তর্কস্থলে ধরিয়াও নেওয়া যায় যে পরমাণু হঠাৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, তবুও বলিতে হইবে যে সৃষ্টি বিশৃঙ্খলায় ভাসিয়া বেড়াইত। Chaos and confusion মাত্র রাজত্ব করিত। কারণ, জড়ের কোন উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না সুতরাং উহা স্বয়ং কোনও বিধি নিয়ম সৃষ্টি করিতে পারে না। অপর দিকে আমরা দেখিতে পাই যে জড় জগৎ বিশেষ বিশেষ অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন। উহা Chaos and confusionএ পরিণত হয় নাই। একজন Idiot যে কেবল Newton, Einstein এর ন্যায় জ্ঞানী নহে এবং বড় বড় Engineer দিগের ন্যায় জাহাজ, উড়ো জাহাজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেনা, তাহা নহে, কিন্তু সে যাহা কিছু করে, তাহা বিশৃঙ্খল ভাবেই করে। একজন Idiot মানুষ হইয়াও যদি সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য না করিতে

পারে, তবে চৈতন্য ও জ্ঞান শূন্য জড় পদার্থ কি প্রকারে সুশৃঙ্খলভাবে জগৎ রচনা ও পালন করিবে? অতএব দেখা যায় যে অচেতন ও অজ্ঞান জড়ের কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, সুতরাং উহার কার্য্যও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ থাকিবে। জড়ের চৈতন্য ও জ্ঞান নাই, সুতরাং উহা স্বাধীনও হইতে পারে না। একমাত্র চৈতন্য ও জ্ঞানময় পদার্থই স্বাধীন হইতে পারে, অন্য সকল তাহারই অধীন।

জগৎ এক হইতে আসিয়াছে। উহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। বিজ্ঞান এখনও এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই বটে, কিন্তু উহা সেই তত্ত্বের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। কিন্তু পরমাণুকে যদি জগতের আদি স্বীকার করা যায়, তবে ইহা প্রমাণিত হয় না যে জগৎ এক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং সৃষ্টির জন্য পঞ্চবিধ পদার্থের উপর উহাকে নির্ভর করিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যে পরমাণুর কথা বলেন, তাহাও এক নহে। কারণ, Scientific atom Electron, Proton প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। Atom হইতে Electron proton প্রভৃতি বহিষ্করণ করা যায়। সুতরাং উহা এক থাকিল না। আবার কোন মতেই পরমাণু একটি নহে, কিন্তু উহারা বহু। সুতরাং এক হইতে সৃষ্টি হইল না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আমরাও বলি যে আকাশ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র জড় আকাশ হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে এক হইতেই জগৎ আসিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশ্ন হইবে যে আকাশ কোথায় হইতে আসিল। যদি বলা যায় যে উহা হঠাৎ আপনা আপনি হইয়াছে, তবে সেই পূর্ব্ব মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে যে হঠাৎ বলিয়া কিছু নাই এবং হঠাৎ সৃষ্টি হইতে পারে নাই ও হয় নাই। দ্বিতীয় উত্তর হইবে যে আকাশও জড় পদার্থ মাত্র সুতরাং অচেতন ও অজ্ঞান। উহা স্বাধীন নহে, সুতরাং উহার

কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে উহা স্বাধীন ভাবে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং আকাশ স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি করে নাই। জগৎ যে এক হইতে আসিয়াছে, সে বিষয়ের সংশয়ের কোনই কারণ নাই। One God, One Law, One Universe. আমরা জগতে সর্ব্বদাই unity in diversity দেখিতে পাই। সৃষ্টি ও স্থিতির fundamental law একমাত্র। ইহা নানা স্থলে এই গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ এক হইতে আসিয়াছে এবং সেই এক যে পরমাণু, আকাশ বা অন্য কোন জড় পদার্থ নহে, তাহা স্থির নিশ্চয়। সেই পরম পদার্থ একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নহে। উপনিষদ্ প্রভৃতি নানা দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ একবাক্যে বলেন যে ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। বেদান্তদর্শনও তাহাই বলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক-দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Platoও ঐ একই কথা বলেন। অতএব যুক্তি ও আপ্তবাক্য উভয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইল যে জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য নহে এবং ব্রহ্মই জগতের সৃজন ও পালন কর্ত্তা। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে জগৎ আসে নাই এবং তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জগৎ পালন করিতেছেন না।

ওঁং সৃজন-পালন-লয়-কারণং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁ

অচিন্ত্যং চিন্তনীয়ঞ্চ সদ্ভিরেকাগ্রমানসৈঃ।
সর্ব্বশক্তিময়ং পূর্ণং নমামি জগদশ্বীরম্ ॥
সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
সর্ব্বগুণং গুণাতীতং নমামি জগদীশ্বরম্।

পরমর্ষি গুরুনাথ

স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন

আমরা দেখিতে পাই যে সৃষ্টিতে পরস্পর বিপরীত শক্তি কার্য্য করিতেছে। পৃথিবীতে উষ্ণতা ও শীতলতা, দিবা ও নিশি, আলোক ও অন্ধকার, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সুখ ও দুঃখ, চৈতন্য ও অচৈতন্য ইত্যাদি আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি। সূর্য্য কিরণে আরোগ্য করিবার এবং রোগ জননের শক্তি বর্ত্তমান। সর্পবিষ জীবন নাশ করে, অবস্থা বিশেষে উহাই আবার অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। জড়পদার্থ মাত্র ত্রিগুণ সমন্বিত। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশক ও তমঃ আবরক, সত্ত্ব জ্ঞান ও আনন্দ দান করে, তমঃ অন্ধকার, মোহ এবং জড়ভাব উৎপাদন করে। সুতরাং বিরুদ্ধ। জড় পদার্থে বিরুদ্ধ গুণের অস্তিত্বের উপর Homeopathic চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্ভর করে। ঐ একই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই Auto Vaccine প্রস্তুত হয়। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আমাদের শরীরে Protective and Destructive germs বর্ত্তমান। উহারা বিরুদ্ধ কার্য্য করে। সুতরাং শরীরে বিরুদ্ধ অবস্থা বর্ত্তমান। আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে সে স্থলেও বিপরীত গুণ কার্য্য করিতেছে। প্রেম যেমন পরমানন্দের হেতু, তেমনি তাহাই আবার বহু দুঃখের কারণ। এই রূপ একই পদার্থে যে বিপরীত শক্তিদ্বয় কার্য্য করিতেছে, তাহার বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। এইজন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ এবং বিপরীত শক্তি এই জগতের মূলে নিয়ত কার্য্য

করিতেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই সন্দেহ মিথ্যা। যদি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ক্রিয়ায় সৃষ্টি সম্ভব হইত, তবে একই পদার্থে দুই প্রকার বিপরীত শক্তির এরূপ সুন্দর সমাবেশ হইত না, বরং বিভিন্ন শক্তির ফল-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ জগতে সৃষ্ট হইত। যখন আমরা একই পদার্থে দুই প্রকার বিপরীত শক্তির অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাই, তখন নিশ্চিন্ত ভাবেই অনুমান করিতে পারা যায় যে দুইটী বিপরীত শক্তি অভিন্ন ভাবে মিলিত হইয়া যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই যে এই বিপরীত শক্তিময়ী সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিকও পরম পিতাতে অনন্ত বিপরীত গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে *। এই জন্যই কেহ কেহ পরমেশ্বরকে Bundle of Contradictions বলেন।

এস্থলে মহাকবি ভবভূতির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক আমরা স্মরণ করিতে পারি। যদি পরমোন্নত সাধকগণে কোমল এবং কঠোর গুণের সমাবেশ হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের অপেক্ষা অনন্ত গুণে অনন্ত ভাবে অনন্ত উন্নত, তাঁহাদেরও একমাত্র উপাস্য ও অনন্ত কালের ভক্তি-ভাজন ব্রহ্মে যে সেইরূপ অপূর্ব্ব মিলন অনন্ত ভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরমোন্নত মহর্ষিদিগের জীবন পর্য্যালোচনা দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে অপেক্ষা-কৃত সহজ। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥ অর্থাৎ বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও মৃদু লোকোত্তর (ঈশ্বর প্রাপ্ত) দিগের চিত্ত কে জানিতে সমর্থ হয়? (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।

এখন পরমপিতাতে যে অনন্ত বিপরীত গুণের অত্যাশ্চর্য্য মিলন সম্পন্ন হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। বিষয়টী অতি সুকঠিন। অনন্ত করুণাময়, অনন্ত দয়াময় পিতা তাঁহার অপার দয়া গুণে আমার সহায় হউন, ইহা তাঁহার নিকট

* এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ দ্রষ্টব্য।

আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। অনন্ত স্নেহময় পিতা তাঁহার অপার স্নেহ গুণে আমার সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে সত্যজ্ঞান দান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করুন। পরমর্ষি গুরুনাথ পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—"পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ সত্ত্বাত্মক ধর্ম্ম দৃষ্টি-গোচর হয়, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পরমাত্মা উহাদের মধ্যে কোনটীর স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি কি সুখস্বরূপ, কি দুঃখ স্বরূপ? তিনি ধর্ম্ম-স্বরূপ, কি অধর্ম্ম-স্বরূপ? তিনি চৈতন্য-স্বরূপ কি অচেতন-স্বরূপ? এবং তিনি পুরুষ স্বরূপ, কি রমণী স্বরূপ? অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি কি পুরুষ?" "এই সমস্ত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই লক্ষিত হইবে যে, মানব-জীবনে সুখ ও দুঃখ, পর্য্যায়ক্রমে অনন্তকাল (ক) বিদ্যমান থাকিতে পারে। কেননা, যখন দুঃখের অভাব হয়, তখনও দুঃখাভাবে দুঃখ থাকে (খ)। এই অসীম অনন্তভাবে পর্য্যায়ক্রমে দুঃখ ও সুখের গতি চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, উহারা সরল রেখা-ক্রমে অনন্তা-ভিমুখে ধাবিত হইয়া কেন্দ্রাকর্ষিণী শক্তির বা পরমাত্মার আশ্রয়-প্রভাবে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবে (গ)। "এক্ষণে দেখুন, ঐ দুঃখ ও সুখ

(ক) "এখানে অনন্ত শব্দের অর্থ এই যে, যাহার অন্ত সাধারণ মানবে লাভ করিতে পারে না।"

(খ) "চিন্তাশীল পাঠক! আপনাকে এই বিষয়টী অর্থাৎ দুঃখাভাবে দুঃখ বুঝাইতে বোধ করি, অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। কারণ, আপনি অবগত আছেন যে কতকগুলি সুখ দুঃখের অবস্থা ভিন্ন উপলব্ধ হয় না। যেমন দারিদ্র্যাবস্থায় পরিবার-বর্গের প্রতি যাদৃশী সম্প্রীতি ও তজ্জন্য সুখ জন্মে, স-ধন অবস্থায় সে সুখ কখনই লভ্য হয় না। সুতরাং উক্তবিধ-সুখ উল্লিখিত দুঃখের সহচর। এজন্য ঐ দুঃখের অবসানেই ঐ সুখেরও অবসান হয়। একারণ ঐরূপ সুখের প্রার্থী মানবগণ জ্ঞাত আছেন যে, উল্লিখিত দুঃখের অভাবেই উক্ত সুখাভাবজনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, দুঃখাভাবেও দুঃখ উপস্থিত হয়। "সুখং হি দুঃখান্য-নুভূয় শোভতে, ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।" অর্থাৎ, গাঢ় অন্ধকারে যেমন দীপ দর্শনে সুখ হয়, তদ্রূপ দুঃখানুভবকারীর নিকটেই সুখ শোভা পায়।

(গ) বৃত্তাকারে পরিভ্রমণের কারণ গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিলেই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন।

অসীমভাবে মানবাত্মার ভোগ্য হইলেও কদাচ একদা ভোগ্য হইবে না। কারণ, সুখ ও দুঃখ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাব-পদার্থ, কেহই কাহারও অভাব-পদার্থ নহে(ঘ)। এবং উভয়েরই আধার এক, সুতরাং স্থানাবরোধকতা ধর্ম্মবশতঃ এক সময় সুখ ও দুঃখ উভয়ই একাধারে অবস্থিতি করিতে পারে না। এজন্য উহারা পর্য্যায়-ক্রম ভিন্ন কদাচ একদা উপস্থিত বা অনুভূত হইতে পারে না।" "কিন্তু যদি অনন্ত পরিভ্রমণে কদাচিৎ সুখ ও দুঃখের সংঘাত হয়, তবে ঐ সংঘাত-বলোৎপন্ন অবস্থায় অবস্থিত মিশ্র-পদার্থ কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবে. উহাই পরমাত্মার অনন্ত স্বরূপের একতম স্বরূপ। সে স্বরূপ যে কীদৃশ, তাহা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, সাধারণতঃ কেহই অনুভব করিতেও সমর্থ নহেন। কেননা, উহা না সুখ, না দুঃখ, অথবা সুখ দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত ভাবে একত্ব। পরন্তু যদি কেহ অনন্ত কালের মধ্যে কখনও উক্ত অবস্থায় পতিত হন, তবে তিনি অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু কদাচ ব্যক্ত করিতে পারেন না" (খ)। অতএব পরমাত্মা অব্যক্ত, ইহাই ব্যক্ত করা যায়। এতদ্ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না" (গ)। "এইরূপ প্রণালীক্রমে 'পরমাত্মা ধর্ম্মস্বরূপ, কি অধর্ম্ম স্বরূপ?' এই

(ঘ) "সুখ ও দুঃখ উভয়েই যে ভাব পদার্থ, এ বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে। যথা—বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকম্ ইতি ভাষা-পরিচ্ছেদঃ।

(খ) "অনন্ত সুখ দুঃখের মিশ্রণে কীদৃশী অবস্থা হয়, তাহা বুদ্ধি দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না, কিন্তু ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত সাধকের নিকট জানা যায় যে উহাতে পার্থিব সুখ বা পার্থিব দুঃখ এ উভয়ের কোনওটীর বিকাশ থাকে না। প্রত্যুত সৎ-চিৎ-আনন্দ-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই অনুভূত হয়।"

(গ) Hegelian Dialectic সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা যে পরমর্ষি গুরুনাথের মীমাংসার অস্ফুট আভাস, তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন। "Since all doctrines are faulty, they direct the attention of the mind which adequately analyses them to their contrary or refuting doctrines. Let us metaphorically conceive of the world of thought as a circle. Then at whatever point of its circumference the mind enters it, by mere process of adequately analysing its own conceptions it

প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলে, তিনি উহাদের কোনওটাই নহেন, অথবা তিনি ঐ উভয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। কিংবা, যদি কেহ জিজ্ঞাসু হন যে তিনি চৈতন্য স্বরূপ কি অচেতন স্বরূপ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে তোমরা যাহাকে চেতন বা অচেতন বিবেচনা কর, তিনি উহাদের কোনও রূপই নহেন, অথবা তিনি ঐ উভয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। কিংবা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি পুরুষ স্বরূপ না রমণী স্বরূপ অর্থাৎ তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তিনি প্রকৃতিও নহেন বা পুরুষও নহেন। অথবা তিনি অনন্ত প্রকৃতি-পুরুষাত্মক।" "এইরূপে অনন্তভাবে সুখ দুঃখের একত্ব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের একত্ব, চেতন ও অচেতনের একত্ব, দয়া ও ন্যায়পরতার একত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের একত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের একত্ব প্রভৃতি অনন্ত একত্বের একত্বই

will find itself driven in the direction of the Hegelian Absolute, the Embodiment of all truth which lies at the centre, (Mr. G. E. M Joad's Guide to Philosophy). বঙ্গানুবাদ :— যে হেতু সকল মতই অসম্পূর্ণ, তাই উহারা উহাদের যথোপযুক্তরূপে বিশ্লেষণকারী মনকে উহাদের বিরোধী বা খণ্ডনকারী মতের দিকে আকর্ষণ করে। চিন্তারাজ্যকে রূপক ভাবে একটী বৃত্ত বলিয়া মনে করা যাউক। তৎপর উহার পরিধির যে কোনও বিন্দুতে মন প্রবেশ করুক না কেন, উহার নিজের মতের যথোপযুক্ত রূপে বিশ্লেষণ করিলেই কেন্দ্রস্থিত মূর্ত্তিমান সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের (Hegelian Absolute-এর) দিকে আপনা আপনি প্রধাবিত হইবে। মন্তব্য :—এস্থলে চিন্তারাজ্যের কথাই মাত্র বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের চিন্তা কি প্রকারে Dialectic Method-এ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, কিন্তু মূলে উদ্ধৃত অংশে অত্যুন্নত সাধক জীবনে যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরমোন্নত সাধকগণ ব্রহ্মের দুইটী বিরুদ্ধ গুণে একত্ব লাভ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারেন এবং এই সূত্রে ব্রহ্ম যে বিরুদ্ধ গুণ সমূহের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মে অনন্ত বিপরীত গুণের মিলন হইয়াছে এবং তিনি আবার সকল গুণেরও অতীত তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আবার গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে স্রষ্টায় যেরূপ বিপরীত গুণের মিলন হইয়াছে, তাঁহার উপাদানত্বে এবং নিমিত্ত কারণত্বে তাঁহার সৃষ্টিতেও বিপরীত গুণের মিলন হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ" (ক) এবং (খ)। Plato তাঁহার দর্শনে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের একটী স্বয়ং মঙ্গলময় পরমেশ্বর এবং অন্যটী স্বাধীন-সত্ত্বা-বিশিষ্ট নিরাকার পদার্থ। উহা সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে, তাই বিশ্বে মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতেছে না। Bible-এও পরমেশ্বরের বিরোধী পুরুষ ভাবে সয়তানের কল্পনা করা হইয়াছে। Zorastrian ধর্ম্মেও আহুরা মজদা ও অঋমান নামক দুই বিরুদ্ধ পুরুষের উল্লেখ আছে। প্রথম পরমেশ্বর স্থানীয় ও দ্বিতীয় সয়তান স্থানীয়। সুতরাং দেখা যায় যে সৃষ্টিতে বিপরীত শক্তির সমাবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টির মূলে বিভিন্ন দুই বিরুদ্ধ শক্তির কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সৃষ্টির মূলে যে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির কল্পনার প্রয়োজন নাই, এক ব্রহ্মেই যে বিপরীত শক্তি বর্ত্তমান, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও অন্যান্য স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে (গ)।

Hegelian Philosophyতে বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। সুতরাং বিরুদ্ধগুণের একত্ব যে হইতে পারে এবং ব্রহ্ম (Absolute) যে সেই অনন্ত একত্বের একত্ব, তাহা বলিলে কোনই ত্রুটী হয় না। ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে। যথাঃ—সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, চৈতন্য ও অচৈতন্য, কঠোরতা

(ক) "ইতঃপূর্ব্বে "ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার" এই অংশে বিবিধ যুক্তি তর্কের সন্নিবেশ সময়ে এক একবার লক্ষিত হইয়াছে যে নিরাকারবাদই সত্য হইলেও সাকার না মানিয়া আর পারা যায় না। আবার দেখা গিয়াছে যে নিরাকারবাদই সত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকে যাহাকে সাকার বা নিরাকার বিবেচনা করে, ঈশ্বর তন্মধ্যে কোনটীই নহেন, অথবা অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এই উভয়ের অনন্ত ভাবে মিশ্রণ বা অনন্ত একত্বই তাঁহার প্রকৃতম স্বরূপ। উপরিলিখিত যুক্তির অনুসরণ ক্রমে এই মত নির্ণীত হইতে পারে।'

(খ) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

(গ) এস্থলে বক্তব্য যে কঠোপনিষদের ২/২১ মন্ত্রে ব্রহ্মকে "মদামদম: (হর্ষাহর্ষম বা সুখদুঃখময়ম:) .বলা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রে অন্যান্য বিরুদ্ধ গুণেরও উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪/৪/৫ মন্ত্রে আত্মাকে সুতরাং ব্রহ্মকে ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় প্রভৃতি বলা হইয়াছে। আবার কঠোপনিষদের ২/১৪ মন্ত্রে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত অবস্থারও উল্লেখ আছে।

ও কোমলতা, দয়া ও ন্যায়পরতা, জ্ঞান ও প্রেম, নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন যদি প্রোক্ত দর্শন অনুযায়ী চিন্তা করা যায়, তবে সুখকে Thesis, দুঃখকে antithesis এবং সুখ দুঃখের একত্বকে বা সুখ-দুঃখকে synthesis বলা যাইতে পারে। ঐ একই প্রণালীতে আমরা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, চৈতন্য-অচৈতন্য, কঠোরতা—কোমলতা, দয়া—ন্যায়পরতা, জ্ঞান-প্রেম, নিরাকারত্ব-সাকারত্ব; প্রভৃতির একত্ব বা synthesis লাভ করিতে পারি। এইরূপ অনন্ত একত্বের একত্বে যাহা হয়, তাহাই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ। উঁহার আভাস নিম্নলিখিত ভাবে প্রদত্ত হইতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখ-দুঃখ-ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-চৈতন্য-অচৈতন্য-কোমলতা-কঠোরতা-দয়া-ন্যায়পরতা-প্রেম-জ্ঞান-নিরাকারত্ব-সাকারত্ব-ইত্যাদি ইত্যাদি বা অনন্ত একত্বের একত্ব। অর্থাৎ তাঁহাতেই অনন্ত একত্বের একীভবন হইয়া যে একটি স্বরূপ হইয়াছে, তাঁহাই তিনি। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেনঃ —"সীমাবদ্ধ বা অন্ত বিশিষ্ট জীব সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, চেতন ও অচেতন, পুরুষ ও রমণী অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহাদের এক একটী বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা ও চর্চ্চা করিতে এবং বহুবিধ-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু উল্লিখিত যুগ্মের একতর না হইয়া যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারে না; এবং উক্ত যুগ্মসমূহের মধ্যে কোনওটার মিশ্রণে বা একত্বে যে কিদৃশী দশা হয়, তাহাই যখন ধারনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনন্ত মিশ্রণ এবং অনন্ত একত্বের একত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা বলা বাহুল্যমাত্র (ক)। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ যে নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলেও সাধারণ পাঠকগণ যাহা বুঝিতেন, নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিকতর ফল যে হইল, এরূপ প্রতীতি

(ক) হরগৌরী প্রভৃতির একত্ব নির্দ্দেশ দ্বারা শাস্ত্রকারগণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের বা অচেতন ও চৈতন্য স্বরূপের মিলন দ্বারা দার্শনিকগণ জগৎ-কার্য্য সম্পাদনের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ের আভাস প্রদান করিয়াছেন।

হয় না (ক)। এই সমস্ত কারণেই মহাত্মারা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে—"ঈশ্বর অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয়"। এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে উপনিষদে ব্রহ্মকে "আনন্দরূপমমৃতম্". "শান্তং শিবম-দ্বৈতম্" প্রভৃতি ভাবে বলা হইয়াছে, আবার তাঁহাকেই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ও বলা হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মস্তোত্রে যেমন তাঁহাকে "গতি প্রাণিনাম্", "পাবনং পাবনানাম্", "রক্ষণং রক্ষণা-নাম্", বলা হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহাকে "ভয়ানাং ভয়ম্", "ভীষণং ভীষণানাম্" ও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা ও লয় কর্ত্তা। সৃজন ও লয় বিরুদ্ধ অবস্থা। যিনি এই উভয় প্রকারের কার্য্য করেন, তাঁহাতেই অবশ্যই বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে যাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় হইয়াছে, তিনিই ভগবান। পশ্চিমবঙ্গস্থ Theosophical Societyর President পরলোকগত দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে Brahmo is the Supreme Unity of infinite contradictions. এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে বা অনন্ত একত্বে যদি ব্রহ্মের একতম স্বরূপ গঠিত হয়, তবে একটী গুণ অন্য বিরুদ্ধ গুণের সংহরণ করিবেনা কেন, অর্থাৎ উক্ত উভয় গুণের কোন গুণই থাকিবে না, অথবা ঐরূপ ভাবে দ্বিবিধ বিরুদ্ধ গুণরাশির অনন্ত সংমিশ্রণে বা অনন্ত একত্বে যে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ বা একস্বরূপ গঠিত হয়, তাহাতেও কোনও গুণেরই অস্তিত্ব থাকিবে না, অর্থাৎ তাঁহাতে Neutratized বা গুণ শূন্যাবস্থা বর্ত্তমান থাকিবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণই নিত্য সত্য, সুতরাং তাঁহাতে গুণ শূন্যাবস্থা উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁহার নিত্যগুণরাশির ধ্বংস হইতে পারে

(ক) যাঁহারা ভক্ত ও নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তায় রত, তাদৃশ চিন্তাশীল সাধুগণ মূলে লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া যে কোনও ফল লাভ করিতে পারিবেন না এমত নহে। ভরসা করি যে সেই শ্রেণীর লোক সমূহের পক্ষে মূলে নির্দ্দিষ্ট এই অংশ সবিশেষ উপকারক হইবে।

না। তাঁহার অনন্ত গুণ তাঁহাতে এমনিভাবে বর্ত্তমান যে উঁহারা মিলিত ভাবেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করে অথবা Hegelian Phílosophy-এর ভাবে বলা যাইতে পারে যে তাঁহাতে উভয় গুণের synthesis সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ "সুখকে" যদি thesis ধরা যায়, তবে "দুঃখকে" antithesis বলিতে হইবে এবং সুখ দুঃখের একত্বকে উহাদের synthesis বলা যাইতে পারে। ইহা যে সত্য, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে জড় জগতে প্রত্যেক পদার্থে বিপরীত শক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে জড়েও দুই দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির এমনভাবে মিলন হইয়াছে যে উহারা তাহাতে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। অর্থাৎ ঐরূপ দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতের ফলে জড় পদার্থে শক্তিরাশির Neutralized অবস্থা উৎপন্ন হয় নাই বা পদার্থ উভয় শক্তিশূন্য হয় নাই। অর্থাৎ উহাতে বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সমাবেশ হইয়াছে এবং উহারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সত্ত্ব ও তমঃ নামক জড়ের বিরুদ্ধ গুণদ্বয় প্রত্যেক জড় পদার্থে বর্ত্তমান। কিন্তু সেইজন্য জড় পদার্থ শূন্য হইয়া যায় নাই বা Neutralized অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। আবার আমরা যদি গভীর ভাবে আত্ম পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাইব যে আমাদের মধ্যেও দ্বিবিধ আধ্যাত্মিক গুণরাশির মিলন হইয়াছে, কিন্তু সেই জন্য উভয়বিধ গুণরাশি ধ্বংস হইয়া যায় নাই, অথবা আমরা গুণশূন্যাবস্থায় অবস্থিত নহি। বরং উভয় প্রকার গুণই আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতেছে। আমাদের মধ্যে কখনও জ্ঞানের কার্য্য, কখনও প্রেমের কার্য্য, কখনও একাগ্রতার কার্য্য দেখা যায়। সেই কালে মনে হয় যে সেই সেই গুণ ভিন্ন অন্য কোনও গুণ নাই। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহার প্রমান এই যে অন্য সময়ে অন্য গুণের কার্য্য দেখি।

যদি অন্য গুণ আমাদিগেতে না থাকিত, তবে সেই সেই গুণের কার্য্য মোটেই দেখিতাম না। যাহা হয় তাহা এই যে কোন কোন গুণ অবস্থানুসারে কোন কোন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। উহাতে অন্যান্য গুণ ধ্বংস হয় না। একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। মানুষ যখন অতি ক্রুদ্ধ হয়, তখন অন্যান্য রিপু, এমন কি আদি রিপুও যেন ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছু কিছু সময় পরেই সেই ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অন্যান্য গুণের পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং আমাদের কোন গুণই ধ্বংস হয় না। যদি ধ্বংসই পাইত তবে আর উহাদের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমরা দেহাবদ্ধ এবং অপূর্ণ ভাবে ভাসমান। সুতরাং একই কালে আমাদের অনন্ত গুণের বিকাশ দেখিতে পাইব না। Expression (প্রকাশ) না দেখিলেই বুঝিতে হইবে না যে সেই সকল গুণ নাই। Expression মস্তিষ্কের ও ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে হয়। উহারা জড় পদার্থ। সুতরাং উহা-দিগেতে স্থানাবরোধকতার বাধা আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। আমা-দিগেতে যে Neutralized অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, তাহাত আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটেন, কিন্তু দেহাবদ্ধতা জন্য দোষ-পাশাবদ্ধ বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রাদ্রপি ক্ষুদ্র অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবের কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মার অবস্থার আভাস আমরা লাভ করিতে পারি।

ব্রহ্মের অনন্তগুণের প্রত্যেক গুণেরই শক্তি বর্ত্তমান। আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাঁহার কোন গুণের কি শক্তি, তাহার Practical demonstrationই তাঁহার প্রেমময়ী সৃষ্টি-লীলা। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে সকল গুণের শক্তি একরূপ নহে। কোন গুণের শক্তি অন্য গুণের শক্তি অপেক্ষা বল-বত্তর। সুতরাং উভয় গুণের শক্তি কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু যে

গুণের শক্তি অধিকতরা, সেই গুণের শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিবে।

অচেতনত্ব হইতে চৈতন্যের শক্তি বলবত্তরা, ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। জীবে চেতন আত্মা ও অচেতন জড় দেহ বর্ত্তমান। উভয়ে উভয়ের কার্য্য করিতেছে বটে, * কিন্তু চৈতন্যের যে প্রাধান্য বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সেইরূপ ব্রহ্মে চৈতন্য ও অচৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান এবং উঁহারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তাঁহাতে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু চৈতন্যের শক্তি বলবত্তরা বলিয়া চৈতন্যই তাঁহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পরমচেতন বা একমাত্র চৈতন্য পরমেশ্বরের নিকট অচেতন জড় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্য স্বরূপই বলা হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাকে অচেতনময় বলা হয় না।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মে উভয়েরই স্থান আছে বটে, কিন্তু ধর্মের শক্তি অধর্ম্মের শক্তি হইতে বলবত্তরা বলিয়া ধর্ম্ম তাঁহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই জন্যই সকলে ব্রহ্মকে ধর্ম্মস্বরূপ বলেন। ধর্ম্মের শক্তি হইতে অধর্ম্মের শক্তি বলবত্তরা হইলে বিশ্ব একটী মূর্ত্তিমতী বিশৃঙ্খলায় (Chaos and Confusion এ) পরিণত হইত।

সুখ ও দুঃখের বিচারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উভয়েরই কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু সুখের শক্তি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা বলিয়া ব্রহ্মকে সুখস্বরূপই বলা হয়। তাঁহাতে যে দুঃখ আছে, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতেও চাহেন না। দুঃখের শক্তি যদি বলবত্তরা হইত, তবে সংসার শ্মশানে পরিণত হইত। আমরা যে শত দুঃখ সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত সুখেই জীবন যাপন করিতেছি, তাহার এক-মাত্র কারণই সুখের শক্তি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা।

জড় জগতেও আমরা দেখিতে পাই যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, উভয় গুণই কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু আকর্ষণের শক্তি বলবত্তরা বলিয়া

---

* "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বের সংঘটন ও সংস্থিতি সম্ভব হইয়াছে। বিকর্ষণের শক্তি আকর্ষণের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা হইলে বিশ্ব গঠিতই হইতে পারিত না, সংস্থিতি ত দূরের কথা।

ইতিপূর্ব্বে পরমপিতার করুণা এবং ন্যায় গুণের সমন্বয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। পরমপিতার করুণা গুণে তিনি পাপীর পাপ নাশ করেন। তাঁহাতে করুণাগুণ নিত্য অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে তিনি পাপী সন্তানের সর্ব্বপাপ তাহার অনুতপ্ত চিত্তের ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যতিরেকেই অর্থাৎ করুণাগুণের নিজ স্বভাববশতঃই, অর্থাৎ আপনা আপনি (automatically) পাপ নাশ করেন। কিন্তু তাহা যে হইতেছেনা, তাহাত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে তাঁহাতে তাঁহার করুণা স্বয়ং একক নাই, উহা তাঁহার ন্যায়পরতা-রূপ বিরুদ্ধ গুণের সহিত সংমিশ্রিত ভাবে একীভূত হইয়া তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ তিনি যেমন অনন্ত করুণাময়, তেমনি তিনি অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বর। ইহার ফলে আমরা কি দেখিতে পাই ? দেখি যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিলে অনন্ত করুণাময় পরমপিতা তাঁহার করুণাগুণে পাপীর পাপ নাশ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায়গুণ তাহার উপযুক্ত শাস্তির বিধান করেন।* উভয় গুণের একত্বের ফলে দাঁড়ায় এই যে পাপীর পাপের কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হয় এবং উহার ক্ষমাও হয়। পাপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। অন্ততঃ পাপের পরিমাণানুযায়ী অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবেই। অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে (ক)।

* পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন ঃ—"অনন্ত ন্যায়ের ধাম পাপীর শাসন।" "অনন্ত ন্যায়ের নিধি, তুমি আবার হও বিধি, পাপী জনে দণ্ড বিধি, সে হেতু বিহিত রয়।" "স্রষ্টা চ পাতা কৃপয়া কৃপালুর্ন্যায়াদনন্তাদথ পাপশাস্তা। অনন্ত প্রেমাদি গুনসুধাম, দত্ত্বা গুণান্ পাসি বিমুচ্য পাপাৎ।"
{ তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত }

(ক) মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন ঃ— খ্যাপনেনানুতাপেন তপস্যাঽধ্যয়নেন চ। পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি। অর্থাৎ খ্যাপন অর্থাৎ স্বীয় পাপোক্তি এবং তজ্জন্য অনুতাপ আর তপস্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং আপৎকালে দান—এই সকল কর্ম্মদ্বারা পাপকারী মানব পাপ হইতে মুক্ত

অপর দিকে পাপের উপযুক্ত শাস্তিও প্রদত্ত হয় না। অর্থাৎ Pound of flesh আদায় করা হয় না। যদি তাহাই করা হইত, তবে পৃথিবী একটী উৎকট নরকে পরিণত হইত, মানুষের পাপের দিকে মতিগতি এত অধিক। ভক্তিভাজন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছি যে আমাদের পাপের ক্ষমা হয় না, কিন্তু মার্জ্জনা হয়। অর্থাৎ পরম পিতার অনন্ত করুণা এবং অনন্ত ন্যায় গুণের মিশ্রণে আমাদের সর্ব্বদা মঙ্গলই উৎপন্ন হয়। পরমভক্ত সাধক ব্রহ্মানন্দের "জীবন বেদের" নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহা হইতেও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে উন্নত সাধকগণও বিপরীত গুণের সমন্বয় করিয়া জীবন চালনা করেন। "কাহারও উপর দয়া করিতে গিয়া একচুল ন্যায়ধর্ম্ম যদি অতিক্রম করি, দিবসে রজনীতে আর শান্তি পাই না। ন্যায়পরতার বোধ ষোলআনা জাগিয়া বসিয়া আছে।"

পরমর্ষিগুরুনাথ এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে "একজনের দয়াবৃত্তি (করুণা দয়ার অন্তর্গত) অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু ন্যায়পরতা তাদৃশী নহে। এস্থলে সে অনায়াসে দয়ার বশীভূত হইয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব জগতে নাই। কিন্তু যে অনন্ত মহাত্মার দয়াও অনন্ত, ন্যায়পরতাও অনন্ত, তাঁহা হইতে অনন্ত মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। সুতরাং অমঙ্গল-সাধনী বৃত্তির সন্নিবেশ তাঁহাতে কখনই হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে (খ)।

ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ তাঁহার দুইটী বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত মিশ্রণে সংঘটিত ও সেই জন্যই তাঁহাতে অনন্ত কোমলাত্মক ও অনন্ত কঠো-

---

হইয়া থাকে। (এস্থলে তপস্যা শব্দের মোটামুটী অর্থ এই যে, যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর সৎকার্য্য করিলেই তাহার তপস্যা করা হইল)। খৃষ্টীয় শাস্ত্রেও পাপোক্তি ও পাপের জন্য অনুতাপ ভোগের বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রে নানাবিধ পাপের নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

(খ) সত্যধর্ম্ম।

রাত্মক গুণের অনন্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত একত্বের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিরুদ্ধ গুণরাশির মিলনে যে নিত্য মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই মঙ্গলময়কেই ইংরেজীতে Good অথবা প্রচলিত ভাষায় God বলা হইয়াছে এবং আর্য্য শাস্ত্রে ব্রহ্মকে শিবম্ (শিবমদ্বৈতম্) বলা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৭ম মন্ত্র দ্রষ্টব্য। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশে লিখিত "নির্গুণ" শব্দের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য। উহাতে তুরীয় ব্রহ্মকে শিবমদ্বৈতম্ বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সূর্য্যরশ্মির দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইতে পারে। উহা সপ্তবর্ণের (Violet, indigo, black, green, yellow, orange and red) মিলনে শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ বর্ণ বর্ত্তমান। সেইরূপ ব্রহ্মে অনন্তগুণের মিলনের ফলে শুভ্রই, মঙ্গলই হয়। শুভ্র = শুভ্ + রক্। শুভ্রবর্ণ মিশ্রবর্ণ অর্থাৎ সপ্তবর্ণ মিলিত হইয়া যে বর্ণটী হইয়াছে, তাহাই শুভ্রবর্ণ। সেইরূপ ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের মিলনের ফলে যে একটী স্বরূপ হইয়াছে, তাহাও নিত্য মঙ্গলে পরিপূর্ণ। অথবা বলা যাইতে পারে যে যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ একীভূত হইয়া বর্ত্তমান নাই, তিনি শিব (পূর্ণমঙ্গল) হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে শিব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মায়াবাদের প্রামান্য উপনিষদ মাণ্ডুক্যের কথা বলা হইয়াছে। মহাদার্শনিক Platoও "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে কোন কোন দার্শনিক God শব্দকে ব্রহ্ম (Absolute) শব্দের নিম্নে স্থান দান করেন। কিন্তু যাহা লিখিত হইল, তাহা God বলিতেও যাহা বুঝায়, ব্রহ্ম বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ, অনন্ত একত্বের স্বরূপ যিনি অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম, তাঁহার হইতেই মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ তিনিই একমাত্র অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ বা শিবম্ বা All Good or God. ঔপনিষদিক মতে তুরীয় ব্রহ্ম ও শিব একই।

স্থূল ভাবে কাল দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপমা আনয়ন করিলে বলা যাইতে পারে যে তিনি নিত্য বসন্ত স্বরূপ। তাই কবি গাহিয়াছেন:—"সুন্দর

হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার, তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।" ব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ হওয়ায় তাঁহাতে নাতি-শীতোষ্ণ অবস্থা নিত্য বর্ত্তমান; অর্থাৎ তাঁহাতে নাতি কঠোর এবং নাতি কোমল ভাব নিত্য বর্ত্তমান, অর্থাৎ তাঁহাতেই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম, অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত করুণা, অনন্ত তেজঃ এবং অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত সুখ ইত্যাদিরূপে অনন্ত কঠোর ও অনন্ত কোমল গুণের অনন্ত সংমিশ্রণ বা একত্ব হওয়ায় তাঁহাতে এক অপূর্ব্বা অনির্ব্বাচ্যা অবস্থা নিত্য বর্ত্তমান, যাহা অতি কঠোরও নহে এবং অতি কোমলও নহে। সুতরাং তাঁহার কার্য্য মাত্রই অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মে যদি অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণের অর্থাৎ অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব অনন্ত মিশ্রণ না হইত, তবে তিনি মঙ্গলে পরিপূর্ণ শিব হইতে পারিতেন না। যদি ব্রহ্মে একমাত্র করুণাই থাকিত, তবে জগৎ বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ থাকিত। কারণ, পাপীর পাপের জন্য শাস্তি না হওয়ায় পাপের কার্য্য অসীম ভাবে বৃদ্ধি পাইত। আবার যদি তাঁহাতে একমাত্র ন্যায়ই থাকিত, তবে জগৎ পাপীর আর্ত্তনাদে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে বলিয়াই জগতে সর্ব্বদাই মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তিনিই—একমাত্র তিনিই শিব, কিন্তু যাঁহাতে একমাত্র কোমল অথবা একমাত্র কঠোর গুণ বর্ত্তমান বা যাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হয় নাই অথবা যাঁহাতে কোন গুণই নাই বা নির্গুণ (গুণ শূন্য), তিনি শিব হইতে পারেন না। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ মায়াবাদের একখানি বিশিষ্ট উপনিষদ্। সেই উপনিষদ যখন তুরীয় ব্রহ্মকে শিবমদ্বৈতম্ বলিয়াছেন, তখন যে তিনি গুণ শূন্য নহেন, কিন্তু তিনি যে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্বস্বরূপ ইহা স্বীকার করিতে হইবেই। ব্রহ্মকে শিবম্‌ও বলিব, আবার তাঁহাকে নির্গুণ (গুণ শূন্য) অথবা এক প্রকার মাত্র গুণের আধার বলিব,

ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে করুণারই সর্ব্বত্র জয় হয়। কারণ, করুণার শক্তি স্থায়ের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। যদি কেবল স্থায়েরই একাধিপত্য থাকিত, তবে বহু জীবের অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থাই সম্ভব হইত। কারণ, আমাদের বিপরীত পথে মতিগতি এতই বলবতী এবং তজ্জন্য আমরা অসংখ্য পাপে পাপী। কিন্তু করুণাময়ের রাজ্যে অনন্ত নরক সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তিনি তাঁহার করুণা গুণে পাপীদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দেন, চিরদিন কাহাকেও পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।

করুণার শক্তি যে স্থায়ের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা, তাহা আমরা পার্থিব স্থায় বিচারেও সর্ব্বদা দেখিতে পাই। বিচারকগণ আসামীর দণ্ডদানের সময় কখনও কখনও দয়াবশতঃ তাহার পক্ষে উপযুক্ত শাস্তি অপেক্ষা অল্পতর শাস্তির বিধান করেন। এমনকি, নর ঘাতকগণেরও মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য করুণা ভিক্ষার (Mercy petition-এর) বিধান আছে এবং সময় সময় উহার ফলে তাহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন।

করুণারই সর্ব্বত্র জয়, তাই মহাকবি Shakespeare এর অমর লেখনী হইতে করুণার মহিমা প্রকাশিকা অমৃতময়ী বাণী নিঃসৃত হইয়াছে। যথা ঃ—

The quality of Mercy is not strain'd,
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath : it is twice blessed ;
It blesseth him that gives and him that takes,
'Tis mightiest in the mightiest : it becomes
The throned monarch better than his crown ;
His sceptre shows the force of temporal power,
The attribute to awe and majesty,
Wherein doth sit the dread and fear of Kings,
But mercy is above this sceptered sway ;

It is enthroned in the heart of kings ;
It is an attribute to God Himself ;
And earthly power doth then show likest God's
When mercy seasons justice. (Merchant of Venice)

বঙ্গানুবাদঃ-করুণার গুণ দুর্ব্বল নহে। ইহা মৃদু বৃষ্টিধারার ন্যায় স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হয়। ইহা উভয় ভাবেই ধন্য। ইহা দাতা এবং গৃহীতা উভয়কেই ধন্য করে। ইহা অত্যন্ত শক্তিশালীর মধ্যেও অত্যন্ত শক্তিশালী। সিংহাসনাবস্থিত রাজার মুকুট অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর শোভমান। তাঁহার রাজদণ্ড তাহার পার্থিব ক্ষমতা মাত্র প্রদর্শন করে। উহা তাহার মহিমা এবং বিস্ময়-ভাব প্রদর্শন করে। রাজার সম্বন্ধে ভীতি ও আশঙ্কাই উহাতে অবস্থিতি করে। ইহা (করুণা) স্বয়ং পরমেশ্বরেরই একটী গুণ। এবং পার্থিব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যখন ন্যায়ের সহিত করুণা মিশ্রণ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরের গুণের ন্যায়ই কার্য্য করেন।

অনন্ত করুণাময়ের করুণার জয় সকল ভক্তগণই সমস্বরে গাহিয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখিতে পাইঃ—"যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে, যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, লয়ে যাব ভবসিন্ধু পারে।"

ভক্ত শিরোমণি পরমর্ষি গুরুনাথ অনন্ত করুণাময় পরমপিতার মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া গাহিয়াছেনঃ—

ভুলিতে কে তোমায় পারে, করুণাময় হে ?
ধরিছে চেতন কণা, যাহার হৃদয় হে।
অন্তরে তব করুণা, বাহিরে তব করুণা,
তবু ভুলি কোন জনা থাকিতে পারে হে।
হৃদয়ে করুণায়, দেহে করুণা উদয়,
তমোময়ী ভাবনায়, করুণা নিচয় হে।
করুণা বিকাশ সুখে, করুণা প্রকাশ দুঃখে,
মিলন করুণা পূর্ণ, করুণা বিরহে।

আকাশে প্রকাশ যাহা, অনল অনিলে তাহা,
সলিল ভূমিতে হেরি, করুণা উদয় হে।
ব্রহ্মাণ্ড করুণা পূর্ণ, করুণাময় তুমি ধন্য,
হবে কি হে পাপ পূর্ণ এ দীনের উপায় হে।

তাঁহার অনন্ত-করুণা-নির্ঝর-স্রোত জগতে নিত্য প্রবাহিত থাকিয়া কত অসংখ্য বিধানে যে পাপীদিগকে উদ্ধার করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সর্ব্বত্র করুণার জয় হয় বলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটী কণ্ঠ হইতে পরমকরুণাময় পরমপিতার করুণার জয় গান গীত হইতেছে, কিন্তু তিনি যে অনন্ত ন্যায়বান, তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানের বিচার কাণেই শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পরমোন্নত সাধকগণ ব্রহ্মকে অনন্ত ন্যায়বান রূপেও দর্শন করিতে যত্নবান থাকেন ও দর্শন করেন।

জ্ঞানের সঞ্চার অবধি মানব পরম পিতাকে কিভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মের কোমল এবং কঠোর উভয় প্রকার গুণরাশি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন বটে, কিন্তু আদিকাল হইতে মানব সাধারণ বুঝিতে চাহেন যে পরমপিতা অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত দয়াময়, অনন্ত করুণাময়, অনন্ত কৃপাময়, অনন্ত সরলতাময় ইত্যাদি, অর্থাৎ ভক্তগণ পরমপিতার কোমল গুণরাশির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার কঠোর গুণরাশির উল্লেখ করেন না অথবা কদাচিৎ করিয়া থাকেন। এই রূপই যখন অবস্থা, তখন ব্রহ্মে কঠোর গুণ-রাশিও যে বর্ত্তমান, তাহা ধারণা করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কঠিন। ভক্তগণ ব্রহ্মকে যেভাবে দেখিতে চাহেন, এক অর্থে তিনি তাহাই। কোমল গুণের মধ্যে প্রেম সর্ব্ব প্রধান। প্রেমের শক্তি যে কোমল এবং কঠোর উভয়বিধ সর্ব্ব গুণের শক্তি হইতে বলবত্তমা, তাহা আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাই। এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রেমের জয় হইতেছে, ইহা চিন্তা-শীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। প্রেমের যে অপরাজেয় শক্তি,

তাহা সর্ব্বসাধারণেও যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে না বুঝিতে পারেন, তাহা নহে।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে দুঃখ অপেক্ষা সুখের শক্তি বলবত্তরা, ন্যায় অপেক্ষা করুণার শক্তি বলবত্তরা ইত্যাদি। এখন পরমপিতার অনন্ত গুণরাশি সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক্। উঁহারা তাঁহাতে অনন্ত সংমিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং উঁহাদের মধ্যে কোন গুণই একক ভাবে কার্য্য করে না। যে গুণের কার্য্য হইবে, উঁহার বিরুদ্ধ গুণও একই সময়ে কার্য্য করিতে থাকিবে। কারণ, তাঁহার কার্য্য মাত্রই অনন্ত গুণের সংমিশ্রিত শক্তির ফল। প্রেমের শক্তি সর্ব্বপ্রধান। ধরা যাউক্, তিনি প্রেমের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখনই প্রেম বিরুদ্ধ ন্যায় ও জ্ঞান উঁহাদের সমগ্র শক্তিদ্বারা কার্য্য করিতে থাকিবেন। ফলে মঙ্গলই উৎপন্ন হইল। সুতরাং প্রেমেরই জয় হইল। স্নেহান্ধ পিতা উন্মার্গগামী সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ তাহার নানাবিধ অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করেন এবং সময় সময় তাহার অন্যায় কার্য্যে উৎসাহও দান করেন। ফলে পিতা সন্তানের অমঙ্গলেরই কারণ হন। পরমপিতা যদি আমাদিগকে কেবল প্রেমই করিতেন, এবং তিনি যদি স্নেহান্ধতাবশতঃ আমাদের ন্যায় অন্যায় বিচার না করিতেন, তিনি যদি আমাদের অন্যায়কার্য্যে উৎসাহ দান করিতেন, তবে বিশ্বে প্রত্যেক সন্তানের অমঙ্গলই সম্পাদিত হইত। উভয় গুণের মিশ্রিত শক্তিতে কার্য্য হয়। উঁহাদের মধ্যে যে গুণের শক্তি বলবত্তরা, সেই ভাবেই কার্য্যের পরিণতি লাভ করে। জগতে দেখা যায় বহু কোমল গুণেরই, যথা—প্রেম, দয়া প্রভৃতির জয় হইতেছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সেই সকল গুণের শক্তি অত্যধিক। সুতরাং জগতে মানব সাধারণ পরমপিতাকে সেই সকল গুণে গুণময় ভাবেই দেখিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ ব্রহ্মের কোমল গুণরাশির সমষ্টি এবং কঠোর গুণরাশির সমষ্টির সংমিশ্রিত শক্তির ফলে যে কার্য্য হয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে উহা সর্ব্বদাই মঙ্গলে পরিণত হয়। এস্থলেও

যাহাদের শক্তি অধিকতরা, তাহাদের প্রাধান্য আমরা পরিণতিতে দেখিতে পাইব। প্রেমের শক্তি সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং পরিণতিতে (Resultant effectএ) প্রেমের শক্তিই জয়লাভ করে। এই জন্যই পরমপিতাকে প্রেম-মঙ্গলময় বলা যায়। মঙ্গলের অর্থ ভাল—Good, সুতরাং মঙ্গলে আমাদিগকে ভালর দিকে, উন্নতির দিকে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের দিকে, আমাদের প্রত্যেকের Goal এর দিকে অগ্রসর করায়। সত্যবটে, মঙ্গল সাধনে পরমপিতা আমাদিগকে শাস্তি দেন, কিন্তি তিনি শাস্তিতেই কার্য্য শেষ করেন না, কিন্তু প্রেম প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে থাকায় সেই শাস্তিওমঙ্গলেই পরিণত হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই বিশ্বলীলা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা এবং সৃষ্টির সূচনা ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা হইতেই। সুতরাং বিশ্বের সকল কার্য্যের মূলে প্রেম বর্ত্তমান থাকায় ও প্রেমের শক্তি বলবত্তমা বলিয়া মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই জন্যই প্রেমময়ের মঙ্গল রাজ্যে Eternal perdition (অনন্ত নরক) নাই। এই সম্পর্কে ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সাধনা সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথের উক্তি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহা হইতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম প্রেমে জগতে মঙ্গলই সাধিত হইতেছে।

প্রেমের শক্তি যে সর্ব্বপ্রধান, ইহা আমরা পৃথিবীর কার্য্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিলেই নির্ভুল ভাবে বুঝিতে পারি। অন্য এক ভাবেও ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। আমাদের কাম রিপু যে সর্ব্বপ্রধান রিপু, ইহা স্বর্ব্ববাদিসম্মত। Freud ত কামকে সর্ব্বকার্য্যের Motive Power বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কাম যে প্রেমেরই বিকার অবস্থা, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুধীবর্গ ইহা জ্ঞাতও আছেন। প্রেমভাব দেহ সংসর্গে প্রকাশিত হইলেই বিকার প্রাপ্ত হইবেই, সেই বিকার অল্পই হউক্ অথবা অধিকই হউক্। কাম সর্ব্বোপরি উহার প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান বলিয়াই উহাকে আদি রিপু বলা হয়। এইজন্যই কামকে কুৎসিৎ, ঘৃণিত এবং পরি-

ত্যজ্য বলা হইয়াছে। কামের অত্যধিক প্রভাব সম্বন্ধে "জড়ের বাধ-কত্বের কারণ" অংশে উদ্ধৃত গীতার শ্লোকচতুষ্টয় (৩/৩৭,৩৮,৩৯,৪০) এবং উহাদের উপর আমাদের মন্তব্য পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে কাম হইতে বলবত্তর রিপু আর নাই। কামই তত্ত্বজ্ঞান আবরণ করিবার ভীষণতম দোষ। গীতা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে মানবের আর কি বাকী থাকে? অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে গুণের বিকৃতিই সকল মানবকে করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই গুণের সত্যভাবের প্রভাব যে সর্ব্বগুণের উপরে অবস্থিত থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিয়াছি যে উপস্থরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রধান ভাবে ক্ষিতির রজোভাগ দ্বারা গঠিত। উহা কাম-রিপুর যন্ত্র। কারণ, ক্ষিতিতে তমোভাগ অত্যধিক। কাম রিপুতেও মোহ অত্যধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উপস্থ যন্ত্র যেমন স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য করিতে পারে, শরীরের অন্য কোনও কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহা পারে না। এই বিশ্বলীলা কি? ইহা প্রেম প্রধান ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের লীলা মাত্র। ইহাতে প্রেমের শক্তিই অত্যধিক ভাবে কার্য্য করিতেছে। অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার প্রেমময়ী ইচ্ছাই সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। প্রেম দ্বারা যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য্য হইতে পারে, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে কামের যন্ত্র ক্ষুদ্রাকারে সেই ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। কামের মূলে যে প্রেম, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং প্রেমের বিকৃত ভাবই দেহের অঙ্গ বিশেষ অর্থাৎ উপস্থ দ্বারা ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। অর্থাৎ একমাত্র কামই ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। সুধী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে উহারা কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাই ইহার আর বিস্তার করিলাম না।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারাও বুঝিতে পারিলাম যে চির

বিকৃত কামের শক্তিই যখন এত অধিক, তখন নিত্য অবিকৃত ও পরম পবিত্র (ক) প্রেমের শক্তি যে অনন্ত ও অপার এবং সকল গুণের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তমা,, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্টগুণ, কাম উহার বিকৃত ভাব। উহা নিকৃষ্টতম অবস্থায় পরিণত হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যাহা যত উৎকৃষ্ট, উহার বিকৃতি অবস্থা তত অপকৃষ্ট হইবে। মিত্র যখন শত্রু হয়, তখন সে ভীষণতম ভাব ধারণ করে। এই জন্যই গৃহ শত্রু সকল শত্রু অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারী। এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর প্রেমের পাত্রী যখন অবিশ্বাসিনী হয়, তখন সে স্বামীর সর্ববিধ সুখ শান্তি হরণে সমর্থ হয়। এমন কি সময় সময় সেই স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। অন্য বহু দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং কাম যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম অনিষ্টকারী, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।*

আরও একভাবে চিন্তা করিলেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আমরা দেখিতে পাই যে সন্তানের জীবনের উপর পিতৃশক্তি অপেক্ষা মাতৃশক্তির প্রভাব অধিকতর। সুতরাং

(ক) পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন—"তুমি পাবন মোহন প্রেমরসে"। ঈশ্বরের প্রেমিক সাধক মাত্রই এই সাক্ষী দিবেন।

* ২৮ ২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কঠোর সাধনা অবলম্বন করিলে এই ভীষণতম রিপুও সুসংস্কৃত ও মিত্র ভাবাপন্ন হইয়া প্রেম নামে খ্যাত হয়। অর্থাৎ প্রেম দেহ সংসর্গে আগমন জন্য বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কাম নামে পরিচিত হয়। আবার সেই কাম সাধনা দ্বারা সুসংস্কৃত হইলে অর্থাৎ বিকৃতির অবস্থা পরিত্যক্ত হইলে অর্থাৎ দোষাংশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত হইলে উহা প্রেম নামে বিখ্যাত হয়। এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই Freud এর তত্ত্বের মূলে উপনীত হওয়া যায় এবং আমরা সত্য ভাবে সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে এই বিশ্বের কার্য্য সমূহের মূলে প্রেম বর্ত্তমান। অর্থাৎ বিশ্বলীলা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র। Freud এর মত স্থূলতম রাজ্য মাত্র স্পর্শ করিয়াছে। গভীরতর রাজ্যে গমন করিয়া কামের মূল কারণের অনুসন্ধান করেন নাই।

বলা যাইতে পারে যে সমস্ত মানব মণ্ডলীর উপর মাতৃশক্তি বলবত্তরা। ইতরজীব জগতে সন্তান পিতাকে কখনই জানে না। পিতাও উহাকে জানে না। উহারা মাতার স্নেহেই পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। এখন মাতা সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে মাতা কোমল গুণরাশি দ্বারাই যেন গঠিত এবং তাঁহাতে স্নেহ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। স্নেহ যে প্রেমের সঙ্কোচ ভাব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালী মায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। ইহার একমাত্র কারণই, এই যে তিনি বাঙ্গালী মাতার হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। ভক্ত সমাজে প্রচলিত সঙ্গীত আছে—"কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়।"

স্নেহের আকর্ষণ অত্যধিক এবং স্নেহে ক্ষমাও অতুলনীয়া তাই উপরোক্ত ভাবে ভগবানকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থন করিতেছেন। শাক্তগণ যে ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন, তাহার মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মাতাতে পিতা অপেক্ষা শক্তি অধিকতরা এবং এই শক্তির আধিক্যের কারণ মাতাতে কোমল গুণরাশির আধিক্য। আবার কোমল গুণরাশির মধ্যে প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তাঁহারা মুক্তির জন্য ভক্তি গুণকেই অবলম্বনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তি প্রেমেরই সঙ্কুচিত ভাব অর্থাৎ "ভয়ে ভয়ে ভালবাসা"।* সুতরাং ভক্তিরও শক্তি অধিক।

ইতঃপর লিখিত "সচ্চিদানন্দ" শব্দের ব্যাখ্যা পাঠক এই সম্পর্কে দেখিবেন। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মের অনন্ত কঠোর গুণরাশির মধ্যে জ্ঞান সর্ব্বপ্রধান এবং অনন্ত কোমল গুণরাশির মধ্যে প্রেম সর্ব্বপ্রধান। ইহা চিন্তাশীল ব্যাক্তিমাত্রই ধারণা করিতে

---

* প্রেমই প্রেম, ভক্তি, স্নেহ শ্রদ্ধা ও অভেদ ভাবে প্রকাশিত হয়। অভেদ নানা প্রকার। জগতের যাবতীয় চেতন পদার্থের প্রতি অভেদ ভাবকে শ্রদ্ধা কহে। সাধারণতঃ ভক্তির অল্পতাকে শ্রদ্ধা বলা হয়।

পারেন। আবার যদি আমরা প্রেম এবং জ্ঞানের শক্তিদ্বয়ের সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রেমের শক্তি জ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অধিকতরা। জগতে প্রেমের প্রভাব যে জ্ঞানের প্রভাব হইতে বলবত্তরা, তাহা আমরা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারি এবং পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই ভাবেও প্রমাণিত হইল যে প্রেমের শক্তি সর্ব্বপ্রধানা।

প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রন্থে পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন :—

"প্রেমের শক্তি অনন্ত, অনন্তকাল বর্ণন করিলেও ইহার শেষ করা যায় না। প্রেম পশুকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যকে দেবত্বে ও দেবতাকে অনাদি পুরুষের প্রেমে বিমোহিত করিয়া আত্মত্বে উপস্থিত করে। প্রেম প্রভাবে সমস্ত দোষ সহজ সাধনায় অনায়াসে দূরীভূত হয়। প্রেমের গুণে অন্য সমস্ত গুণ স্বল্প সাধনেই উপলব্ধ হয়। প্রেম সমস্ত গুণের রাজা, সকল গুণের গুরু এবং নিখিল গুণরাশির প্রসূতি ও পরিপালক। যাহার প্রেম আছে, তাহার সকলই আছে। যে এই ধনের ভিখারী, সেই-ই প্রকৃত ভিক্ষুক ; যে এই অনন্ত সাধ্য সাধনে তৎপর নহে, সে সাধনাহীন, তাহার কোন সাধনাই কার্য্যকরী নহে। যেমন সূর্য্য হইতে সমস্ত মণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে ও সূর্য্য কিরণ ব্যতীত তাহাদিগের উন্নতি ও অবস্থান অসম্ভব, তদ্রূপ প্রেম হইতে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হইয়াছে (ক) এবং প্রেম সাধনা ব্যতীত তাহাদিগের স্থিতি ও উন্নতিও একান্ত অসম্ভব, সন্দেহ নাই। প্রেম মৃতকে জীবিত করে ও জীবিতকে, অপরকে জীবিত করিবার শক্তি দেয়। ইহার শক্তি অনন্তকাল বর্ণনা করিলেও শেষ হইবার নহে, এজন্য এবিষয়ে নিবৃত্ত হইলাম।"

(ক) এস্থলে "উৎপন্ন" শব্দের অর্থ "বিকশিত হওয়া"। প্রত্যেক জীবাত্মায় অনন্ত গুণ নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু জীবাবস্থায় প্রেম সাধনা দ্বারা উঁহাদের বিকাশ অপেক্ষাকৃত সহজে সম্ভব হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "প্রেমের গুণে অন্য সমস্ত গুণ স্বল্প সাধনেই উপলব্ধ হয়।" "উপলব্ধ"ও যাহা, "উৎপন্ন"ও তাহা, অর্থাৎ গুণের বিকাশ হইলেই তাহা উপলব্ধ হয়। আবার যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই—একই অর্থে উৎপন্ন বলা যায়।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারি যে প্রেমের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তমা। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অংশদ্বয়ে দেখিতে পাইয়াছি যে এই বিশ্বলীলা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলামাত্র এবং তিনি তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। সুতরাং প্রেমের শক্তিই যে বলবত্তমা, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, যে গুণের জয় মানব দেখিতেছেন, তিনি ব্রহ্মকে সেই সেই গুণেই বিভূষিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের শক্তি, দুঃখ হইতে সুখের শক্তি, অচৈতন্য হইতে চৈতন্যের শক্তি বলবত্তরা বলিয়াই সর্ব্বসাধারণ ব্রহ্মকে ধর্ম্মস্বরূপ, সুখস্বরূপ এবং চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া থাকেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা, তাহার মূলেও সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সম্যক্ ভাবে চিন্তা করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহাতে অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণের অনন্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং তাঁহার কার্য্য মাত্রই সেই একত্ব প্রাপ্ত অনন্ত গুণের শক্তির ফল, সুতরাং উহা নিত্যই অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পরমেশ্বরে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহাতে গুণ শূন্যাবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে নাই এবং উহারা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী পরস্পর মিলিত ভাবেই কার্য্য করে এবং তাঁহাতে উঁহাদের একত্ব সম্পাদিত হওয়ায় যে গুণের শক্তি বলবত্তরা, তাহারই প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। আমাদের ধারণীয় কোনরূপ বিরোধ ব্রহ্মের গুণরাশিতে নাই বা থাকিতে পারে না। এই জন্যই তাঁহারা পরস্পর মিলিত ভাবেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক গুণই প্রত্যেক বিরুদ্ধ গুণের বিরোধিতা করিতে সমর্থ এবং অনন্ত মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া এক হইতেও সমর্থ। এইরূপ অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত তিনি। সুতরাং তিনি অনন্ত মঙ্গলে নিত্য পরিপূর্ণ

শিব। এই মঙ্গল ভাবই সর্ব্বোপরি জগতে কার্য্য করিতেছে। এই বিষয়টী অন্যভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার গুণরাশি কেন মিলিতভাবে কার্য্য করিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। আবার আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে প্রেম যেমন বহুকে এক করিতে পারেন, তেমনি তাঁহা এককে বহুও করিতে পারেন; ন্যায় যেমন দণ্ড দান করিতে পারেন, তেমনি উঁহা পুরস্কারও দান করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক গুণেও বিপরীত শক্তি বর্ত্তমান, অথচ উঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী গুণ। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে একের মধ্যেই বিরুদ্ধ শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া মিলিত ভাবেই কার্য্য করিতেছে। এই বিরুদ্ধ শক্তির বর্ত্তমানতায় এক একটী গুণ গুণশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। সেইরূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের বর্ত্তমানতা সত্বেও তাঁহাতে গুণ-শূন্যাবস্থা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উঁহারা নিজ নিজ বিরুদ্ধ শক্তি অনুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন সত্য, আবার উঁহারা যে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতেছেন, ইহাও সত্য। সেইরূপ ব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত [সগুণ ও নির্গুণ (গুণাতীত, গুণশূন্য নহেন) অথবা Immanent and Transcendent]। সুতরাং এস্থলেও অর্থাৎ ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে চিন্তা করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মে অনন্ত সগুণত্ব ও অনন্ত গুণাতীতত্বের অনন্ত একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবেই বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান এবং উঁহাদের একত্বও বর্ত্তমান। অতএব দেখা গেল যে এস্থলেও তাঁহাতেই বিরুদ্ধ ভাবদ্বয়ের যথা—মিলন ও বিরোধের অপূর্ব্ব সমাবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে। ফল যাহা হইতেছে, তাহাত সহজেই বোধগম্য হয়। অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নিত্যই মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

ধন্য অনন্ত মঙ্গলময়! ধন্য অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং, হে শিবম্! তুমিই ধন্য। তুমি যে অনির্ব্বাচ্য, ইহাত তোমার সুসন্তানগণ এক বাক্যেই বলিয়া গিয়াছেন। তোমার মঙ্গল চরণে বারংবার প্রণত হই। দীন হীনকে তোমার অভয় চরণে আশ্রয় দান

করিয়া কৃতার্থ কর।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মে অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণেরই শক্তি অনন্ত, কোন গুণেরই শক্তি সান্ত নহে। যদি তাহাই হয়, তবে এক গুণের শক্তি অন্য কোন এক গুণের শক্তি হইতে অধিকতর বলিবার অর্থ কি? যেহেতু প্রত্যেক গুণের শক্তিই অনন্ত, সেই হেতুই প্রত্যেক গুণই শক্তিতে সমতুল। সুতরাং তাঁহাতে গুণ-শূন্যাবস্থা অবশ্যম্ভাবিরূপে উপস্থিত হইবে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরাও ইহা স্বীকার করি যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণনিধান পরব্রহ্মের প্রত্যেক গুণেরই শক্তি অনন্ত বটে, কিন্তু সেই অনন্তত্ব কেবল পরিমাণ সূচক কিন্তু প্রকার সূচক নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক গুণে অনন্ত প্রকার শক্তি নাই। ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণেরই শক্তি অনন্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেক গুণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। চৈতন্যের শক্তি ও অচৈতন্যের শক্তি, জ্ঞানের শক্তি ও প্রেমের শক্তি; দয়ার শক্তি ও ন্যায়ের শক্তি, কখনই স্বরূপতঃ এক প্রকারের নহে, কিন্তু প্রকারতঃ উহারা বিভিন্ন। ঐ সকল শক্তির প্রত্যেক শক্তি পরিমাণে অনন্ত বটে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেক শক্তিরই স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্। ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, সুতরাং তাঁহাতে অর্থাৎ অনন্ত ও পূর্ণব্রহ্মে অনন্ত প্রকারের এবং অনন্ত পরিমাণের শক্তি বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও একটী গুণের শক্তি পরিমাণে অনন্ত হইলেও প্রকারতঃ অনন্ত নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণই অনন্ত প্রকার শক্তিসম্পন্ন নহে। অর্থাৎ "প্রেমময়" বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে তিনি "অনন্ত প্রকারের অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ ব্রহ্ম", কিন্তু ইহাই বুঝাইবে যে অনন্ত গুণনিধান ব্রহ্মের প্রেম তাঁহার অনন্তগুণের একটি গুণমাত্র এবং উহাতে (প্রেমে) অনন্ত প্রকারের অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান নাই। অর্থাৎ প্রেমের শক্তিও পরিমাণে অনন্তই বটে, কিন্তু উহা অনন্ত প্রকারের শক্তিতে অনন্তভাবে শক্তিমান নহেন। নানাপ্রকারের গুণের শক্তির মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহাত আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে অচৈতন্যের শক্তি হইতে চৈতন্যের শক্তি, অধর্ম্মের শক্তি হইতে ধর্ম্মের

শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ও বলবত্তরা। আমরা যদি জড় রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাইব যে বিকর্ষণের শক্তি হইতে আকর্ষণের শক্তি বিভিন্ন ও বলবত্তরা।

এস্থলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা গুণের শক্তির তারতম্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপমা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। (১) তুল্য পরিমাণ লৌহ ও স্বর্ণ খণ্ড দ্বয়ের শক্তি বিভিন্ন প্রকার। বিচার কালে দেখা যায় যে একের শক্তি অন্যের শক্তি অর্থাৎ অন্য প্রকারের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। (২) কোন বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে চারিটী ছাত্র প্রত্যেকে শতকরা ৮০ নম্বর পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চারিটি বিভিন্ন বিষয়ে যথা—দর্শন, সাহিত্য, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে M.A পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন যদি তাহাদের অধীত শাস্ত্রানুযায়ী পরিচালিত হয়, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে সংসারে তাহাদের প্রভাবের তারতম্য হইয়াছে এবং একের প্রভাব অন্যের প্রভাব হইতে অধিকতর। (৩) চারিজন সাধক প্রেম, জ্ঞান, একাগ্রতা ও সরলতা গুণ চতুষ্টয়ের এক একটীতে মহোন্নত। আমরা যদি সেই সকল সাধকের জীবনের প্রভাব পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাইব যে উহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান। আমাদের মনে হয় যে প্রেমের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপর জ্ঞান, তদনন্তর একাগ্রতা ও তৎপর সরলতা স্থান লাভ করিয়াছে।

অনন্ত প্রকারের শক্তি সমন্বিত অনন্ত গুণের একত্ব ব্রহ্মে সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত প্রকারের অনন্ত শক্তি নিত্যই বর্ত্তমান। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের বিরুদ্ধ গুণসমূহ মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। এই জন্যই উঁহাদের একত্ব বা synthesis সম্ভব হইয়াছে। Contradiction থাকিলেও unity তে পরিণত হইতে ব্রহ্মের গুণরাশির পক্ষে কোনই বাধা হয় নাই। অর্থাৎ এস্থলেও বিপরীতের মিলন অর্থাৎ বিরোধ এবং একত্ব সম্পাদিত

হইয়াছে। এস্থলেও আরও বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" অংশে লিখিত হইবে। সুতরাং তাঁহাতেই সগুণত্ব ও গুণাতীতত্ব রূপ বিরুদ্ধ স্বরূপ বর্ত্তমান।

অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের একত্ব সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে যে একত্বসম্পাদিত হয়, ব্রহ্মে সেইরূপ অনন্ত একত্ব বর্ত্তমান। আবার কেবল তাহাই নহে, কিন্তু সেই অনন্ত একত্বের অনন্ত সংমিশ্রণে যাঁহা, তাঁহাই তিনি, অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের অনন্ত একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। সুতরাং অনন্ত প্রকারের অনন্ত শক্তি ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণেই বিপরীত শক্তি বর্ত্তমান। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একটী গুণের বিপরীত শক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটী শক্তি অন্যটী অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবান্বিতা। কোনও গুণ বিশেষের শক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদের সেই গুণের উভয়বিধ শক্তি সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হইবে! অর্থাৎ উভয় প্রকার শক্তির যোগফলই সেই গুণের শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রেম ও ন্যায় দুইটী বিরুদ্ধ গুণ। আমরা বলি যে প্রেমের শক্তি ন্যায়ের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। প্রেমের মধ্যে আমরা মিলন করিবার অর্থাৎ বহুকে এক করিবার শক্তিকেই প্রশংসা করি। সর্ব্বশাস্ত্রই প্রেমের জয় অর্থাৎ মিলন করিবার শক্তিরই জয় কীর্ত্তন করিতেছেন।* ন্যায়ের মধ্যে দণ্ড দিবার শক্তি বর্ত্তমান। দণ্ড প্রেম-বিরোধী। দণ্ডদাতা ও দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রেম গুণের বিকাশ সাধিত হয় না। আবার গভীর প্রেমে মিলিত ব্যক্তিদ্বয় পরস্পরকে অন্যায় কার্য্যের জন্য দণ্ড দিতে পারে না। তাহারা পরস্পরের অন্যায় কার্য্যকে পরস্পর তুচ্ছই

* এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান অংশ, "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব", 'জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ" অংশ ত্রয় দ্রষ্টব্য। অন্যান্য স্থলেও এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

করে. ক্ষমাই করে। প্রেমিকের নিকট প্রেমের পাত্রের কোনও অপরাধই অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং প্রেম ও ন্যায়ের এই দুই স্থলেই বিরোধিতা। আবার ন্যায় গুণের পুরস্কার দিবার শক্তিও আছে। উঁহা প্রেমের মিলন করিবার শক্তির বিরোধিতা করে না, বরং সাহায্যই করে। সুতরাং সেই স্থলে, প্রেম ও ন্যায়ের বিরোধিতা নাই। সুতরাং দেখা গেল যে প্রত্যেক গুণেই বিরুদ্ধ শক্তি আছে এবং উঁহাদের যোগেই উঁহার পূর্ণাশক্তি। অর্থাৎ ন্যায়ের দণ্ড দিবার শক্তি ও পুরস্কার দিবার শক্তি একত্র যোগে ন্যায়ের শক্তি পূর্ণ হয়। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেমের বিরুদ্ধ শক্তি ন্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান আছে বটে, কিন্তু ন্যায়ের পূর্ণাশক্তিই প্রেমের শক্তির বিরোধিতা করে না। অতএব দেখা গেল যে কোনও গুণ উঁহার সমস্ত শক্তি দ্বারা অন্য গুণের সমস্ত শক্তির বিরোধিতা করে না। সুতরাং গুণদ্বয়ের বিরোধিতায় Neutralised অবস্থা উৎপন্ন হয় না। যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে গুণের একভাবের শক্তি অল্প হইলেও উঁহার অন্য ভাবের শক্তি অধিকতর হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক গুণের সমস্ত শক্তি তুল্য পরিমাণ অর্থাৎ অনন্ত বটে। যাহা লিখিত হইল, তাহাতে আরও বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রত্যেক গুণ অন্য গুণের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মিলিত হইতে সমর্থ। ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণরাশি নিত্য বর্ত্তমান। উঁহারা উঁহাদের নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করেন, উঁহাদের নিজ নিজ functionএর বাহিরে কোনই কার্য্য করেন না। আমাদের বিরোধিতার ধারণা এবং ব্রহ্মের বিরুদ্ধ গুণের বিরোধিতা এক নহে। আমরা দুইটী শত্রুভাবাপন্ন মানবের চিন্তা করি। তাহারা শত্রুতা বশতঃ পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিতে এবং অবশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু ব্রহ্মের গুণরাশি পরস্পরের প্রতি মারাত্মক ভাব পোষণ করেন না। (They are not always at daggers drawn at one another)। ব্রহ্ম নিত্য অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাঁহার অনন্তগুণের প্রত্যেকটী

গুণই নিত্য সেই ভাবেই কার্য্য করেন, যাহাতে নিত্য মঙ্গল উৎপন্ন হয়। যদি উঁহারা পরস্পর শত্রুভাবে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে ধ্বংস করেন সুতরাং গুণশূন্য অবস্থা উৎপাদন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অস্তিত্বই লোপ করা হয়, তবে আর মঙ্গল কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে বিরুদ্ধ গুণের অস্তিত্বে Neutra ised অবস্থা উৎপন্ন হয় না। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বে জনসাধারণ যাহা কিছু দেখিতেছে, তাহাই অল্পাধিক চির বিকৃত! আর ব্রহ্মে যাহা কিছু বর্ত্তমান, তাহাই নিত্য সত্য, নিত্য অবিকৃত ও নিত্য বিশুদ্ধ। তাঁহাতে অন্যায়, বিকৃতি বা অপবিত্র কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। অতএব এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল বিরুদ্ধ গুণের অস্তিত্বে Neutralised অবস্থা উপস্থিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণরাশি নিত্য বর্ত্তমান, ইহা প্রদর্শিত হইল। যদি তাহাই হয়, তবে সত্যের বিরুদ্ধ মিথ্যাও ব্রহ্মে আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মে মিথ্যা নাই। ব্রহ্মে যে বিরুদ্ধ গুণ আছে, উঁহারা সকলেই সত্ত্বাত্মক বা ভাবাত্মক। উঁহারা কখনই অভাবাত্মক নহে বা হইতেও পারে না। ব্রহ্মে অভাব নাই, সুতরাং অভাবাত্মক গুণও নাই। মিথ্যা অভাবাত্মক অর্থাৎ সত্যের অভাব। সুতরাং উহা ব্রহ্মে থাকিতে পারে না।

আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে ব্রহ্মে যদি অভাবাত্মক কিছুই না থাকে, তবে সৃষ্টিতে অভাব কি প্রকারে আসিল? ব্রহ্মে যদি অভাবের জ্ঞান থাকে, তবে উহা সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের কোন গুণই অভাবাত্মক নহে, তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণই ভাবাত্মক। আবার সেই প্রত্যেক গুণই স্বাধীন ও সরল (Simple), অর্থাৎ প্রেমে জ্ঞান নাই এবং জ্ঞানে প্রেম নাই। অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক গুণেই অন্য (অনন্ত-১) গুণারাশির অভাব আছে। সুতরাং ব্রহ্মে

"অভাব" নামক ভাবের বোধ (জ্ঞান) আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্মে তবে অভাব আছে। ব্রহ্ম ত অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে (স্থূল ভাবে বলিতে গেলে সমষ্টিতে) মাত্রও অভাব নাই। অর্থাৎ প্রেমে যাহা নাই, ব্রহ্মের অন্য (অনন্ত-১) গুণরাশিতে তাহা অবশ্যই বর্ত্তমান। ব্রহ্ম নিত্যই পূর্ণ। তাঁহাতে নিত্যই অনন্ত গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহাতে কোনই অভাব থাকে না বা থাকিতে পারে না। এই সম্পর্কে "জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি ?" অংশ দ্রষ্টব্য।

সত্যের বিরুদ্ধ কোন গুণই ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। সত্যের একটী অর্থ "নিত্য অস্তিত্ব"। সুতরাং সত্যের বিপরীত গুণ কখনই "অস্তি" অর্থাৎ বর্ত্তমান অর্থাৎ সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্য এবং মিথ্যা উভয়েই সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। আবার ব্রহ্মে নাস্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে তাঁহাতে অভাবের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তাঁহাতে অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ব্রহ্মে যে উহা নাই বা থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং সত্যের বিরুদ্ধ মিথ্যা ব্রহ্মে নাই।

এখন অন্য ভাবেও এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে পারি। ব্রহ্ম নিত্য সত্য বা সত্যস্বরূপ। ব্রহ্মের এই সত্যস্বরূপ দেহের মেরুদণ্ডের সহিত উপমিত হইতে পারেন। মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া যেমন সমস্ত দেহটী বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ আশ্রয় করিয়াই তাঁহার অনন্ত স্বরূপ বর্ত্তমান। মেরুদণ্ডের দুই দিকে যেমন বিপরীত দিক হইতে দুই দুইটী অস্থি আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, ব্রহ্মের সত্যস্বরূপেও তেমনি তাঁহার বিপরীত গুণরাশি সম্মিলিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিপরীতের মিলন স্থান একই, কখনই দুই বা বহু নহে।

অন্য একটী উপমাও প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রাণ বায়ুর অভাব হইলে সমস্ত দেহই অকর্ম্মণ্য হয় অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হয়। অপর

দিকে দেহের এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইলেও প্রাণবায়ু বর্ত্তমান থাকা পর্যান্ত দেহের মৃত্যু হয় না। সত্যস্বরূপও যেন ব্রহ্মের সেইরূপই একতম স্বরূপ, যাহা বাদ দিলে আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিতে পারি না। অতএব আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ যেন তাঁহার অনন্ত গুণের ভিত্তিভূমি, যাহা আশ্রয় করিয়াই উঁহারা বর্ত্তমান আছেন। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণই নিত্য সত্য। অন্য গুণরাশির চিন্তা না করিয়াও আমরা ব্রহ্মের এক একটী গুণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক গুণের পৃথক্ পৃথক্ চিন্তাকালে উহা যে সত্য, তাহা অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, যে গুণ সত্য নহে, তাহাত ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্ত গুণই নিত্য সত্য। সুতরাং সত্য বাদ দিয়া তাঁহার কোন গুণের চিন্তা করিতে গেলে চিন্তাকারী ব্যক্তির মনে করিতে হইবে যে তিনি একটী অস্তিত্বশূন্য গুণের চিন্তা করিতেছেন অর্থাৎ শূন্য চিন্তা করিতেছেন। সেইরূপ চিন্তা অসম্ভব। আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কালীন ভাবিতে পারি যে উহা প্রেম নহে, একাগ্রতা নহে, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ইহা কখনও ভাবিতে পারি-না যে জ্ঞান সত্য নহে। কারণ, ব্রহ্মের সকল গুণের মূলেই সত্য বর্ত্তমান। অসত্য বা মিথ্যা জ্ঞান যে কখনই জ্ঞানপদ বাচ্য হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জগতেও আমরা চৈতন্য শূন্য পদার্থ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু অস্তিত্ব শূন্য পদার্থের অস্তিত্ব কেহ প্রত্যক্ষত করেই না, কিন্তু অনুমানও করিতে পারেন না। এইরূপে ব্রহ্মের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে সকল গুণের মূলেই সত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপই তাঁহার সত্যস্বরূপে গ্রথিত ভাবে বর্ত্তমান।

অপর দিকে ব্রহ্মের একমাত্র সত্য স্বরূপের ধারণা করা সুকঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। উত্তম সাধকগণ প্রথমে ধ্যান নিমগ্ন অবস্থায় ব্রহ্মের সত্তা জ্ঞান অর্থাৎ তিনি যে তাঁহাদিগের সর্ব্বদিকে এবং অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান, এইরূপ জ্ঞান লাভ করেন। পরে

তাঁহাদের এরূপ উন্নতি হয় যে সাধারণে যাহাকে ধ্যান বলে, তাহা যে তিনি করিতেছেন, এমন বোধ হয়না, অথচ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-সত্তা বোধ তাঁহাদের সর্ব্বাবস্থায়ই হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন ঃ— উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো জ্ঞেয়ো বাহ্য পূজা ধমাধমা ।। ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের সত্য স্বরূপের ধারণা করা সম্ভব এবং উত্তম সাধকগণ তাহাই করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি "সত্যং" বলিবা মাত্র তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইত। ইহাও যে ব্রহ্ম সত্তার উপলব্ধির ফল মাত্র. তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্তা উপলব্ধ হইলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দাতিশয্য অবশ্যম্ভাবিরূপে উৎপন্ন হইত এবং আনন্দের ক্রিয়াও দেহে প্রকাশিত হইত।

শঙ্করমতে ব্রহ্মের তিনটী স্বরূপ। যথা—সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তম্। রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি মনস্বিগণ ব্রহ্মকে অনন্ত গুণাধার বলিয়াছেন। এই জটিল সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া একজন মায়াবাদী বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অনন্তকে "নেতি নেতি" দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ উঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ না বলিলেও চলে। কিন্তু জ্ঞানকে ত সেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞানের ক্রিয়া নাই, ইহা হইতেই পারে না। বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলেন যে ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ"।* অতএব তিনি বলিতে চাহেন যে ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং নির্ব্বিবাদে বুঝান যায়। বস্তুতঃও আচার্য্য শঙ্কর যে ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মের একমাত্র সত্য স্বরূপ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

আবার বহু অজ্ঞেয়তাবাদী ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ পর্য্যন্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার যে অন্যান্য গুণরাশি আছে, সেই সম্বন্ধে

---

* ৬/৮ মন্ত্র। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৪।১০, মুণ্ডকোপনিষদের ১।১।৯ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।১৯ এবং ৬।১৬ মন্ত্র সমূহেও দেখা যায় যে জ্ঞানময় ব্রহ্ম জানেন অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া আছে।

সন্দেহ পোষণ করেন। অর্থাৎ তিনি সত্য, ইহাই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার অধিক অজ্ঞেয়। অতএব যিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে অন্ততঃ সত্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিবেনই। সুতরাং সত্যস্বরূপ তাঁহার এমন একটী স্বরূপ যাঁহাতে বিশেষত্ব আছে। উহা এক এবং উহার বিরুদ্ধ কোনও স্বরূপ নাই।

সত্য সম্বন্ধে রামায়ণ এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। উহাদের হইতেও সত্য স্বরূপের বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। "সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ। সত্য-মূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্॥" (অযোধ্যাকাণ্ড)। "সত্য-রূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥" (মহানির্ব্বানতন্ত্র)। পাঠক এই সম্পর্কে "নির্ব্বিশেষবাদ" (মায়াবাদ অংশের) অংশে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের ২।৩।১২-১৩ মন্ত্রদ্বয় ও উহাদের উপর আমাদের মন্তব্য দেখিবেন। ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে বুঝাইতে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়। "সচ্চিদানন্দ" শব্দের অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। সৎ = নিত্য সত্য। চিৎ = জ্ঞান। আনন্দ = প্রেম। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও প্রেম স্বরূপ। ব্রহ্মে যে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান, তাহা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। তিনি কেবল সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ নহেন। সুতরাং যদি উক্ত শব্দে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝাইতে হয়, তবে জ্ঞানকে তাঁহার অনন্ত কঠোর গুণের এবং প্রেমকে তাঁহার অনন্ত কোমল গুণের প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।* তাহাতে দাঁড়ায় এই যে ব্রহ্ম নিত্য সত্য কঠোর- এবং কোমল-গুণরাশির আধার। অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, কঠোর-গুণরাশি-স্বরূপ এবং কোমল-গুণরাশি-স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার সত্য স্বরূপকে এই শব্দেও তাঁহার কঠোর ও কোমল গুণরাশি হইতে

---

* জ্ঞানকে কঠোর গুণরাশির এবং প্রেমকে কোমল গুণরাশির প্রতীক বলিবার কারণ এই যে জ্ঞান কঠোর গুণরাশির ও প্রেম কোমল গুণরাশির মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শক্তিসম্পন্ন। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ধারণা করিতে পারেন।

পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। অর্থাৎ এস্থলেও ব্রহ্মের সত্য স্বরূপের বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম। "সচ্চিদানন্দ" শব্দের ন্যায় নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহেও সত্যকে প্রথম স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। ওঁং সত্যং পূর্ণমমৃতং ওঁং (অদীক্ষিত সত্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা জপনীয়)। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। (এইমন্ত্র ও "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" একার্থ সূচক।) সত্যং শিবং সুন্দরং।

উপরোক্ত ভাবে আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মের সত্য স্বরূপের অবশ্যই বিশেষত্ব আছে এবং সত্যের বিপরীত মিথ্যা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে নাই বা থাকিতে পারি না। ৩৩১ হইতে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে চৈতন্য ও অচৈতন্যের, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, সুখ এবং দুঃখের, জ্ঞান এবং প্রেমের এবং পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব সংঘটিত হইয়াছে এবং উহাদের দ্বারাই তাঁহার এক একটী স্বরূপ। এখন :—প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। তাঁহাতে অচৈতন্যের স্থান কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মে অনন্ত চৈতন্য আছে, ইহাও যেমন সত্য, তাঁহাতে অনন্ত অচৈতন্য আছে ইহাও তেমনি সত্য। ব্রহ্মের স্বরূপ বা গুণরাশি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই আমাদের প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমাদের গুণদ্বারা ব্রহ্মের গুণের সম্যক ধারণা অসম্ভব। আমাদের যাহা কিছু গুণ বা শক্তি অনুভব করি, তাহা দেহ সংসর্গে প্রকাশিত হওয়ায় বিকৃত, অপূর্ণ ও অনেকটা স্থূল ভাবেই অনুভব করি। ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন। তিনি নিত্য কারণ বা কারণেরও অতীত, তাঁহার কোনই কারণ নাই। সুতরাং তাঁহাতে যে গুণরাশি বর্ত্তমান, তাহা অবশ্যই কারণাকারে অবস্থিত। তাহা কখনই স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে তাঁহাতে নাই. ইহা স্থির নিশ্চয়। সুতরাং তাঁহার গুণরাশির ধারণা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। স্থূল ভাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে সাধারণের গুণরাশি তাঁহার অনন্ত গুণের আভাস মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে দ্বিবিধ বিরুদ্ধ ও সত্ত্বাত্মক গুণরাশি বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত চৈতন্যের ন্যায় অনন্ত

অচৈতন্যও যে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? জগতে চৈতন্য ও অচৈতন্য উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মতভেদ নাই। ব্রহ্মই যখন সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এবং একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই চৈতন্যবান জীবাত্মা এবং অচেতন জড় জগৎ আসিয়াছে, অর্থাৎ তিনিই যখন একমাত্র কারণ বা Ultimate Reality, তখন ইহা সত্য ভাবেই অনুমান করা করা যায় যে ব্রহ্মে চৈতন্য এবং অচৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দার্শনিক আলোচনার সিদ্ধান্ত এই যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়। মহর্ষি আরুণি কেবল ক্ষুদ্র জড় পদার্থ দ্বারা সেই শ্রেণীর সমস্ত জড় পদার্থের জ্ঞান যে লাভ করা যায়, তাহা বলেন নাই, কিন্তু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যাও তিনি জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান তত্ত্বের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যখন এই তত্ত্ব সত্য, তখন ব্রহ্মে যে চৈতন্য এবং অচৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান ইহা যুক্তি সিদ্ধ। চৈতন্য এবং অচৈতন্য বিরুদ্ধ সত্ত্বাত্মক গুণ। কারণ, ব্রহ্মে অচৈতন্য না থাকিলে তাহা তাঁহার হইতে উৎপন্ন জগতে আসিতে পারিত না। সকল অদ্বৈতবাদীকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মে যাহা নাই, তাহা জগতে আসিতে পারে না। তবে ইহাও সত্য যে জগতে আমরা যাহাই দেখিতেছি, তাহা সমুদায়ই অল্পাধিক বিকৃত অবস্থায় পরিণত, আর ব্রহ্মে অনন্ত গুণ ও শক্তি নিত্য অবিকৃত ও কারণাকারে বর্ত্তমান, এই প্রভেদ। অদ্বৈতবাদই সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, ইহাই সত্য। ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সেই বেদান্ত দর্শনের মতেও ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। আর সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন পরমাণু বা জড় প্রকৃতি বর্ত্তমান ছিল, ইহা ধারণা করা অসম্ভব। ইহা যে যুক্তিযুক্তও নহে, তাহাও পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অচৈতন্য চৈতন্যের অভাবাত্মক গুণ নহে। উহা স্বয়ং ভাবে বর্ত্তমান। জড় জগৎ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অচৈতন্য শব্দটী form এ অভাবাত্মক হইলেও উহাকে সেইরূপ মনে করিতে হইবে না। শব্দের

form দেখিয়া ভাবাত্মকতা ও অভাবাত্মকতা নির্দ্দেশ করা যায় না। দুঃখকে যদি অসুখ (Unhappiness) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তবে উহা form এ অভাবাত্মক বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অসুখ বা দুঃখ ভাবাত্মক। অচৈতন্যও সেইরূপ। Form এ উহা অভাবাত্মক বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভাবাত্মক। অতএব অচৈতন্য অভাবাত্মক গুণ নহে। অচৈতন্য যদি অভাবাত্মক পদার্থই হইত, তবে চৈতন্যের উপস্থিতিতে জগতের অচৈতন্য বিদূরিত হইত। কিন্তু তাহা হইতে দেখা যায় না। অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ বিভু বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে চির বর্ত্তমান, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হন না। কিন্তু সেই জন্য বিশ্বের অচৈতন্য বিনষ্ট হইয়া উহা চেতনাবান হয় নাই। আলোকের অভাব অন্ধকার। তাই আলোকের উপস্থিতিতে অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। যদি অচৈতন্য অভাব পদার্থই হইত, তবে বিশ্বে চিন্ময় বিভুর উপস্থিতিতে উহার অচৈতন্য বিনষ্ট হইত। অথবা বিনাশের কথাই বা বলি কেন? চিন্ময় বিভুর নিত্য উপস্থিতিতে জগতে কোন কালেই অচৈতন্য থাকিত না, জগৎ নিত্যই চেতনাবান হইত। কিন্তু আমরা দেখি যে জগতে সর্ব্বত্র চিন্ময় বিভু থাকা সত্ত্বেও উহাতে অচৈতন্য বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ ব্রহ্মেও অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্য নিত্য বর্ত্তমান। উভয়ই নিত্য ভাব পদার্থ বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে। অতএব অচৈতন্য কখনই অভাব পদার্থ হইতে পারে না, উহা নিত্যই ভাব পদার্থ এবং চৈতন্যের ন্যায় ব্রহ্মেরই একটী স্বরূপ এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ই জগৎকে অচেতন বলিয়াছেন। নঞ এর ছয়টী অর্থ যথা:—তৎ সাদৃশ্য মভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। সাদৃশ্য, অভাব, অন্যতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা ও বিরোধ এই ছয়টী নঞ অব্যয়ের অর্থ। সুতরাং অচৈতন্যকে চৈতন্যের বিরুদ্ধ গুণ বলা যায় এবং আমরা তাহাই বলিয়াছি। অচৈতন্য অর্থে চৈতন্যের অভাব নহে। অচৈতন্য সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মে যদি অচৈতন্য না থাকিত, তবে তিনি অচেতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, তিনি সেই প্রকার সৃষ্টি

করিতে পারেন না। অচেতন জগৎই প্রমাণ করিতেছে যে ব্রহ্মে অচৈতন্য বর্ত্তমান। বেদান্ত দর্শনের "দৃশ্যতেতু" (২।১।৬) সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেন সেই যুক্তি সমূহ দ্বারা নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি শ্রুতির দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে অচেতন জগৎ চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। আমাদের যতদূর জানা আছে, প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদ্ কোথায়ও বলেন নাই যে ব্রহ্মে অচৈতন্য নাই। ইতঃপর যাহা লিখিত হইবে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মে অচৈতন্য বর্ত্তমান এবং ইহা শ্রুতি সম্মত। তিনি সেই ভাষ্যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চেতন পুরুষ হইতে কেশ রোমাদির এবং অচেতন গোময় হইতে বৃশ্চিকের উৎপত্তি। উহারা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, অচেতন দেহ হইতে কেশ রোমাদির উৎপত্তি হয়, আত্মা হইতে নহে। সেইরূপ গোময় হইতে বৃশ্চিকের দেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহার আত্মা গোময় হইতে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে অচেতন হইতে অচেতন পদার্থ সৃষ্ট হয়, কিন্তু চেতন পদার্থ হইতে অচেতন উৎপন্ন হয় না এবং অচেতন হইতেও চেতন পদার্থ হয় না। এই সম্পর্কে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ যোগ্য। উহাতে পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মের শরীর ভাবে কথিত হইয়াছে। উহাদিগকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। এই "পৃথকের" অর্থ বিভক্ত নহে, কিন্তু Distinct. তিনি জড় পদার্থে অবস্থিত হইয়াও যে কি প্রকারে উহা হইতে পৃথক্ (Distinct), তাহা 'অব্যক্তের পরিণাম" অংশে লিখিত হইবে। যদি উক্ত অচেতন পদার্থ সমূহ তাঁহার হইতে সম্পূর্ণ বিভক্ত ভাবে পৃথক্ বলা হয়, তবে ব্রহ্মই সসীম হন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব তাঁহারই অন্তর্গত। ব্রহ্মে অচেতন বিশ্বও বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহাতে অচৈতন্যও অবশ্য বর্ত্তমান। অচেতন জগৎ ব্রহ্মের উপাদানত্বে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইবে এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকিবে, কিন্তু ব্রহ্মে অচৈতন্য থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না। জগৎ ব্রহ্মে সোণার সিন্দুকে লৌহ খণ্ডের ন্যায়

বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত নহে। আমাদের মতে জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের একতম স্বরূপ, অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব সুতরাং ব্রহ্ম। নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব যে অচেতন, তাহা সহজ বোধ্য। সুতরাং উহাদের একত্ব ও মিশ্রণ ও অচেতন। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে চেতন হইতে অচেতন ও অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি অসম্ভব। জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। উৎপন্নে উৎপাদকের গুণ বর্ত্তে, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং জগৎ দৃষ্টে আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে ব্রহ্মের গুণরাশির মধ্যে এমন গুণও আছে, যাহা অচেতন। সুতরাং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বও অচেতন। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬ মন্ত্রে বলেন যে সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম চেতন ও অচেতন পদার্থ হইলেন। উহার অব্যবহিত পর মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে "তদাত্মানং স্বয়ম কুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃত মুচ্যতে"। সুতরাং তিনি নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ উৎপাদন করিলেন। সুতরাং অচেতন জগৎ যখন তাঁহার হইতে আসিয়াছে, তখন তাঁহাতে নিশ্চিতই অচৈতন্য আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম অন্যদীয় সাহায্য হইতে নিত্য বঞ্চিত। সুতরাং যাহা কিছু দেখিতে পাই, উহার বিশ্লেষণে তাঁহারই গুণ ও শক্তির পরিচয় পাইব। ব্রহ্ম জগতে হুবহু প্রকাশিত হন নাই। জগতে যাহা দেখি, তাহা চির বিকৃত ও অপূর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মে উহাদের মূল নিত্য অবিকৃত ও পূর্ণ উপরোক্ত ঔপনিষদিক উক্তির উপরই বেদান্ত দর্শনের ১।৪।২৬ "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" সূত্র গঠিত হইয়াছে। যদি ব্রহ্মই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন, তবে জগতের অচৈতন্য কোথায় হইতে আসিতে পারে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মে অচৈতন্য স্বরূপ বা গুণ আছে। ইহা অস্বীকার করিলে তাঁহার উপাদানত্বও অস্বীকার করিতে হয়। আবার তাহা করিলে শ্রুতির বহু মন্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হয়। তাহা অসম্ভব। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে সূত্রে পরিণামের কথাই আছে এবং উপনিষদের উক্তিতেও পরিণাম সুস্পষ্ট। আবার কেবল মাত্র শব্দ প্রমাণের উপরই

আমরা নির্ভর করিতে চাহি না। ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে প্রমাণিত হইবে।

রামানুজাচার্য্য ব্রহ্মকে চিদচিৎ বলেন। সুতরাং ব্রহ্মে অচৈতন্যও বর্ত্তমান। যদি চিৎ অর্থে কেবল মাত্র জীব ও অচিৎ অর্থে কেবল মাত্র অচেতন জগৎ বুঝায়, তবে ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম যখন এক ও অদ্বিতীয়, তখন ব্রহ্মকেই চিদচিৎ বলিতে হইবে। ব্রহ্মের অন্তর্গত ভাবে যখন অচেতন জগৎ চির বর্ত্তমান, তবে উহাকে ব্রহ্মের অংশ ভাবে বর্ণিত হইতে পারে। রামানুজাচার্য্যও জীব ও জগৎকে স্বগত ভেদ বলেন। অন্তর্গত অংশে যদি অচৈতন্য থাকে, তবে পূর্ণেও অচৈতন্য অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিবে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে যদি ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটী পদার্থ থাকে, তবে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না, তিনি সীমাবদ্ধ হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে একটী মহাসমুদ্রে দুই প্রকারের দুইটী দ্বীপ চির বর্ত্তমান। উহারা স্বভাবতঃই সমুদ্র হইতে বিভিন্ন। সুতরাং উহাদের দ্বারা সমুদ্র সীমাবদ্ধ হয়। ব্রহ্মও সেইরূপ উক্ত মতে জীব ও জগৎ দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও একরস। তাঁহাতে এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা তাঁহার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অচেতন জগৎ তাঁহার উপাদানত্বে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু তথাপিও তাঁহাতে অচৈতন্য থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। রামানুজাচার্য্যের স্বগত ভেদতত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। উহার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অচৈতন্য আছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদের আলোচনায় আমরা আরও সুস্পষ্ট ভাবে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি। সুতরাং ব্রহ্মই চিৎ ও অচিৎ উভয়ই বা চিদচিৎ ব্রহ্মেরই বিশেষণ অথবা চৈতন্য ও অচৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ এবং উঁহাদের যে একত্ব হইয়াছে, অর্থাৎ চৈতন্য-অচৈতন্য বা চিদচিৎ যে তাঁহার একতম স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে যে জ্ঞান ও প্রেমকে কি প্রকারে বিরুদ্ধ গুণ

বলা যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উঁহারা বিরুদ্ধ গুণ বটেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান কঠোর গুণ এবং প্রেম কোমল গুণ। জ্ঞান অগ্নির সহিত উপমিত হইতে পারে, কিন্তু প্রেম রসপূর্ণ। জ্ঞান তেজঃপূর্ণ, কিন্তু প্রেম আত্মদানে ব্যগ্র। জ্ঞান প্রকাশক, কিন্তু প্রেমকে অন্ধ বলা হয়। সুতরাং উহারা বিরুদ্ধ গুণী। জ্ঞান ও প্রেম যে বিরুদ্ধ গুণ, তাহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে। পৃথিবীতে দেখা যায় যে সাধকগণ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল জ্ঞানপন্থাবলম্বী ও অন্য দল প্রেমপথাবলম্বী। দুই দলের মধ্যে যে বিরোধ চির বর্ত্তমান, তাহাও সকলের জানা আছে। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানকেই মোক্ষের একমাত্র পন্থা বলিতেন। তিনি সেই মতে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে তিনি জ্ঞানকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেন বটে, কিন্তু প্রেমকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র বলিতেন। ব্রহ্মে যে জ্ঞানের ন্যায় প্রেমও অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। অপর দিকে মহাভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব মহাপণ্ডিত হইয়াও জ্ঞানকে ভক্তিপথের বিরোধী মনে করিতেন। সুতরাং জ্ঞান ও প্রেম যে বিরুদ্ধ গুণ, তাহা সুনিশ্চিত। আমাদের যাহা মত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে এবং অনন্ত জ্ঞান-প্রেম তাঁহার একতম স্বরূপ। সত্য দর্শনানুযায়ী উভয় গুণই ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান এবং উঁহাদের মিলনে যাহা হয়, তাহাই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী। সেই দর্শন জ্ঞানকেও অগ্রাহ্য করে না, প্রেমকেও অগ্রাহ্য করে না। বরং তাহা উভয় গুণ সাধনার জন্যই সকলকে অনুরোধ করেন, এমন কি সাধনার উচ্চাবস্থায় সাধক যে জ্ঞান-প্রেমের একত্ব সাধন করিবেন, ইহাও সেই দর্শন বলেন এবং ইহাও সত্য যে সেই সাধনের সিদ্ধির অবস্থায় সাধক ব্রহ্মকে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় রূপে দর্শন করিবেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রত্যেক নর নারীতে জ্ঞান ও প্রেম বর্ত্তমান। এমন লোক নাই যাহাতে এই দুই গুণ স্বল্প পরিমাণেও নাই। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে পরমাত্মায়ও জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই বর্ত্তমান।

তৃতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্রহ্মকে ধর্ম্ম স্বরূপই বলা হয়, কেহই তাঁহাকে অধর্ম্মস্বরূপ বলেন না। তাঁহাতে অধর্ম্ম বা পাপ থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ধর্ম্ম অর্থে বিধি, অর্থাৎ পরমপিতা বিধাতা। আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম অর্থে নিয়মানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী মতিগতি। এই বিশ্বে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি অসংখ্য বিধান, নিয়ম বা বিধি গঠন করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা সেই বিধি অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করেন এবং পথ চলেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম করেন। আর যাহারা বিধির বিধানের প্রতিকূল পথে গমন করেন, তাহারা অধর্ম্ম করে। এইরূপে বিধাতার বিধি লঙ্ঘন করিলেই জীবের পক্ষে পাপ হয়। কারণ, অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় বিধাতা যে বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিত্য মঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহার প্রতিকূলে গমন করিলে শাস্তি অনিবার্য্য। ভগবদ্বিধানের প্রতিকূলে গমন করিলেই যে আঘাত উৎপন্ন হইবে, তাহা সামান্যই হউক অথবা অতি বৃহৎই হউক, তাহা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহার প্রতিক্রিয়াও অবশ্য হইবে। বিধান লঙ্ঘনকারী যে উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবেই, তাহা নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ আঘাত করিলেই প্রত্যাঘাত অবশ্যম্ভাবিরূপে উপস্থিত হইবে। অতএব বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিলেই অধর্ম্ম বা পাপ হয় এবং উহারই প্রতিক্রিয়াকে শাস্তি বলা হয়। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে এই সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইব। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্ম কি প্রকারে তাঁহার নিজেরই বিধানের প্রতিকূলে যাইতে পারেন। অর্থাৎ তিনি কেমনে নিজকৃত বিধান ভঙ্গ করিতে পারেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সেই অনন্ত স্বাধীনের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান জীব যদি বিধির বিধানের বিরুদ্ধে গমন করিতে পারেন, তবে যাঁহাতে অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্বাধীনতা নিত্য বর্ত্তমান, তিনি কেন তাঁহার নিজকৃত বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না? এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে তাঁহার অনন্ত স্বাধীনতা আছে এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্রই বিধানের বৈপরিত্য ঘটাইতে

পারেন বটে, কিন্তু সেই জন্য যে তিনি তাঁহার বিধান ভঙ্গ করিবেনই, তাহা মনে করিতে হইবে না। আমাদের নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিলেই তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। আমাদের পক্ষে বিধানের বিরুদ্ধে যাইবার শক্তি আছে সত্য, কিন্তু সেই জন্যই কি আমরা সর্ব্বদা বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্য করি? অতএব আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম যখন পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহারই নিজকৃত বিধান রক্ষা করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে সেই বিধান ভঙ্গও করিতে পারেন। ইহা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে তিনি স্বয়ংও তাঁহার বিধানের ব্যতি-ক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি তাঁহার নিজকৃত বিধানের কাছে অবনত বা বিধানের কারাগারে আবদ্ধ, ব্রহ্ম হইতে তাঁহারই স্বেচ্ছাকৃত বিধান সমূহ অধিকতর শক্তিশালী। ইহা যে সম্পূর্ণ স্বাধীন পরমেশ্বরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ চিন্তার প্রধান ত্রুটী এই যে ব্রহ্মকে স্বাধীনতাশূন্য জড় পদার্থের আসনে বসান হয়। জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য তত্ত্ব। জড় জগৎ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। এই জন্যই চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, ঝড় প্রভৃতি ঘটনা বহু পূর্ব্বে জানা যায়। অতএব এইরূপ চিন্তা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্থূল, ব্রহ্ম নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ জ্ঞানময়। এই সৃষ্টির বিধান সমূহ সেই জ্ঞান দ্বারাই গঠিত। সেইরূপ ভাবে রচিত বিধানের কোনই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই জন্য এই কথা সত্য নহে যে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই বিধানও ভঙ্গ করিতে পারেন না। যদি বলেন যে ব্রহ্ম যদি নিজকৃত বিধান ভঙ্গ করেন, তবে যে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য কে দায়ী হইবেন, তবে বলিতে হয় যে একান্তই যদি তাঁহার বিধান ভঙ্গ করিতে হয়, তবে তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি দ্বারা এমন প্রণালীতে তাহা সংঘটন করিবেন যে তাহাতে জগতে মঙ্গল বই অমঙ্গল কখনই হইবে না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পরমপিতা অনন্ত মঙ্গলময় এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান। তাঁহার অনন্ত শক্তির নিকট জগৎ কার্য্য অতি

সহজ সাধ্য। সুতরাং সাধারণ সাধারণ সামঞ্জস্য (Adjustment) (যদি তাহার একান্তই প্রয়োজন হয়) যে তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ ব্যাপার, ইহা বলাই বাহুল্য। তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি যখন গড়িতে পারেন, তখন তিনি ভাঙ্গিতেও পারেন। তিনিই স্রষ্টা ও তিনি মহাপ্রলয়ের কর্ত্তা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এস্থলে আবারও বলিব যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্ঞান-প্রেমাধার পরমপিতা যে বিধান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহার পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি ইচ্ছা করিলে উহা ভঙ্গ করিতে পারেন। তিনি চঞ্চলমতি খেয়ালী মানব নহেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তাও অনন্ত। ধীর, স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির মানবেও আমরা দেখিতে পাই যে তিনি খেয়ালের বশে কোন কার্য্যই আরম্ভ করেন না। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তিনি বিশেষ চিন্তা দ্বারা কার্য্যের প্রণালী স্থির করেন। আবার খেয়ালের বশে বা অন্যের বিরোধিতায়ও তিনি হঠাৎ আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া দেন না। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের প্রণালী অনুযায়ী তাহা যথাকালে শেষ করিয়া থাকেন। এস্থলেও আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মে যাহা নাই, তাহার আভাসও জগতে আসিতে পারে না। অবশ্য একথা এস্থলেও প্রযোজ্য যে ব্রহ্মে যাহা কারণাকারে এবং বিশুদ্ধ ভাবে বর্ত্তমান, জগতে তাহাই স্থূল, বিকৃত ও আভাস আকারে পরিণত। ইহার কারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মে দ্বিবিধ সত্ত্বাত্মক গুণরাশি যে বর্ত্তমান, তাহাও এই সম্পর্কে চিন্তনীয়। অধর্ম্মকে অভাব পদার্থও বলা যায় না, কারণ অধর্ম্ম অর্থে নিয়মভঙ্গ, সুতরাং উহা ভাব পদার্থ। বিধির বিরুদ্ধে গমন, নিয়মভঙ্গ, নিয়ম লঙ্ঘন বা পাপ কখনও অভাব পদার্থ হইতেই পারে না। ইহারা যে ভাব পদার্থ, তাহা সর্ব্বসাধারণে ধারণাও করিতে পারেন। এস্থলেও বলিতে হইবে যে শব্দের আকার দেখিয়া উহা যে ভাব কি অভাব পদার্থ, তাহা নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মকে কেন কেবল ধর্ম্মস্বরূপ বলা হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মহাপুরুষদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মের এই ভাবের যৎকিঞ্চিৎ আভাস আমরা ধারণা করিতে পারি। সাধারণে যাহাকে

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলেন, মহাপুরুষগণ উহাদের উর্দ্ধে বাস করেন। তাঁহারা সত্যভাবে বলিতে পারেন :—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি ॥" বঙ্গানুবাদ :—আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি অধর্ম্মও জানি, কিন্তু তাহাতেও আমি নিবৃত্ত নহি। হে হৃশিকেশ! তুমি হৃদয়দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে যে ভাবে নিয়োগ কর, সেই ভাবেই আমি কর্ম্ম করি। মহাপুরুষদিগের অত্যুন্নত অবস্থায় তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মের শ্রীহস্তের যন্ত্রমাত্র। কারণ, তখন তাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন নিজের কোন পৃথক্ ইচ্ছার বর্ত্তমানতা অনুভব করেন না বা করিতে চাহেন না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা বিশ্বে সকলেই এক অখণ্ড, অপূর্ব্বা এবং অনির্ব্বাচ্যা সুমহতী শক্তির লীলা সন্দর্শন করেন। তাই পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

মানবে ক্ষমতা আছে, জনপদবাসী বলে।
আমিত হেরিনা কিছু শকতি মানব দলে।

শুন শুন নরগণ,	তোমরা হও করণ,
কেহ নহ ফলবান,	শকতির শুভ ফলে।
গুণদাতা গুণময়,	একমাত্র দয়াময়,
অনন্ত শকতিচয়,	কেবল তাঁহায়—
তিনিই শক্তির কারণ,	মানব তাঁর করণ,
অহঙ্কার অকারণ,	কর না এ হেন কালে।(তত্ত্বজ্ঞান

সঙ্গীত)। চতুর্থ প্রশ্ন হইবে যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে কি প্রকারে পুরুষ ও প্রকৃতি বলা যাইতে পারে? তিনি যে সর্ব্বোত্তম পরম পুরুষ, সেই সম্বন্ধে কাহারও কোনই সংশয় নাই। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহা অস্বীকার করেন না। পুরুষ ও প্রকৃতিকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। প্রথম অর্থে তিনি একধারে স্বামী ও স্ত্রী। দ্বিতীয় অর্থে তিনি একধারে পিতা ও মাতা। ভাবিয়া দেখিলে উভয় অর্থই এক। স্বামী ও স্ত্রীই পিতা ও মাতা রূপে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মই স্রষ্টা, তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ সৃষ্টির বীজ এবং তাঁহার ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতি

স্থানীয়া। আবার তাঁহাতেই অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষ জাতিতে কঠোর গুণের প্রাধান্য এবং স্ত্রী জাতিতে কোমল গুণের প্রাধান্য বর্ত্তমান। ব্রহ্মে যখন উক্ত উভয় প্রকারের অনন্ত গুণরাশির অনন্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে, তখন তিনিই যে একাধারে পরম-পিতা ও পরম জননী, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ নাই। যদি তাঁহাতেই পুরুষভাব এবং প্রকৃতিভাব অর্থাৎ কঠোর গুণরাশি ও কোমল গুণরাশি বর্ত্তমান না থাকিত, তবে জগতে কঠোর-গুণ-প্রধান পুরুষ এবং কোমল-গুণ-প্রধানা প্রকৃতি আসিতে পারিত না। নর নারীর পক্ষে ইহাই একটী বিশেষ সাধনা যে তাহারা ক্রমান্বয় কোমল ও কঠোর গুণরাশিতেও গুণবান ও গুণবতী হইবেন। নতুবা তাহারা যদি কেবলমাত্র নিজ নিজ জাতীয় গুণের অর্থাৎ কঠোর এবং কোমল গুণেরই সাধনা করেন, তবে তাহারা পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হইতে পারিবেন না। ইহা আমাদের পক্ষে সহজেই বোধগম্য যে ব্রহ্মে উভয় প্রকারের অনন্ত গুণ পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং তিনিই যে একাধারে পূর্ণভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি তাহাও সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। পৃথিবীতে ভক্তগণ ব্রহ্মকে পিতা এবং মাতা উভয় ভাবেই, অথবা পিতা বা মাতা ভাবে দেখিতে প্রয়াস পান। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিবেন যে যাহারা পিতাভাবে ভজনা করেন এবং যাহারা মাতা ভাবে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়ই একই পরব্রহ্মকেই ডাকিতেছেন, এক এক প্রকারের সাধক তাঁহার এক এক ভাবের সাধনা করিতেছেন, এই মাত্র প্রভেদ। আবার যাঁহারা ব্রহ্মের কোমল ও কঠোর গুণরাশির অর্থাৎ উভয় ভাবের সাধনা করেন, তাঁহারা পূর্ণত্বের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন। অতএব ব্রহ্মই যে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, তাহাতে বিন্দু-মাত্রও সংশয় নাই। পঞ্চম প্রশ্ন হইবে যে উদ্ধৃত অংশে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের অনন্ত সংমিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে। তাঁহাতে যে অনন্ত সুখ বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাঁহাতে দুঃখ—তাহাতে আবার অনন্ত দুঃখ কেন? আমরা জগতে

দেখিতে পাই যে আমাদের দুঃখ অভাবজনিত অথবা দোষপাশজনিত। ব্রহ্মের কোনই অভাব নাই বা দোষপাশ নাই বা থাকিতে পারে না। তিনি নিত্য অনন্ত গুণরাশিতে গুণবান এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি তাঁহাতে দুঃখ কেন? আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে বিপরীত গুণের মিলন হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে তাঁহাতে অনন্ত কোমল গুণ ও অনন্ত কঠোর গুণের একত্ব হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাতে সুখ রূপ কোমল গুণ থাকিলে উহার বিপরীত কঠোর গুণ দুঃখ অবশ্যই তাঁহাতে থাকিবে। উহারা উভয়ই যে ভাব পদার্থ, তাহা দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন। এস্থলেও ছান্দোগ্য উপনিষদের মীমাংসার অর্থাৎ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের মর্ম্মানুধাবন করিতে পারি। উহাতেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তাহা এই যে ব্রহ্মে দুঃখ না থাকিলে জীবে দুঃখ আসিতে পারিত না। কারণ, জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি ক্ষুদ্রভাবে, অংশভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবে যাহা আছে, পরমাত্মায় তাহা পূর্ণ—অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান। আবার ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীবে যাহা দেখি, তাহা স্থূল, বিকৃত এবং আভাস আকারে দেখি, আর ব্রহ্মে তাহা নিত্য বিশুদ্ধ, পূর্ণ, অবিকৃত এবং কারণাকারে বর্ত্তমান। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে কি প্রকারে সুখ দুঃখের একত্ব হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত অংশে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবারও প্রশ্ন হইবে যে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে কোমল গুণ থাকিলে উঁহার বিরুদ্ধ কঠোর গুণ ব্রহ্মে অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত সুখের ন্যায় অনন্ত দুঃখও আছে। কিন্তু সমস্যা হইতেছে "ব্রহ্মে দুঃখের কারণ কি?" এই সমস্যা অতীব কঠিন। অনন্ত জ্ঞানাধার, অনন্ত দয়ার আধার, অনন্ত স্নেহময় পিতা তাঁহার অপার স্নেহগুণে এই প্রশ্নের সত্য উত্তর প্রদানে সহায় হউন, ইহাই তাঁহার নিকট আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। এই বিষম সমস্যার মীমাংসা ধারণা করিতে আমাদের প্রথমতঃই বুঝিতে

হইবে যে জীব যে দুঃখ ভোগ করেন, উহাকে স্থূলতম দুঃখ বলা যাইতে পারে। জীবে আমরা যাহাই দেখিতে পাই, তাহাই বিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান। কারণ, জীবে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা দেহ সংসর্গেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরমাত্মায় সেইরূপ দুঃখ কখনই থাকিতে পারে না। তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম নহেন, তিনি কারণ বা কারণেরও অতীত। সুতরাং তাঁহার গুণরাশিকেও কারণই বলিতে হইবে। এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহার দুঃখের ধারণা মানবসাধারণ করিতে পারে না। আমাদের স্থূল বা স্থূলতম ভাবের দুঃখের তুলনা দ্বারা বুঝি যে তাঁহাতে দুঃখ থাকিতে পারে না। বাস্তবিকও তাঁহাতে সাধারণের ধারণীয় কোন দুঃখই নাই। তাঁহাতে যে দুঃখ আছে, তাহা কারণাকারে মাত্র বর্ত্তমান। আমাদের দৃষ্ট দুঃখ সেই অনন্ত দুঃখের আভাস মাত্র। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে পরমপিতার অনন্ত সুখের সত্য ধারণাও সাধারণ মানবের নাই। সাধারণে তাহাদের বিকৃত সুখের ধারণা দ্বারাই ব্রহ্মের সুখের ধারণা করিতে চায়। ব্রহ্মের অতুলনীয় জ্যোতিতে যেমন ছায়া নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের সুখ তাঁহাতে কোনই বিকার উৎপাদন করে না। দুঃখও তেমনি তাঁহাতে কোনই বিকার আনয়ন করিতে পারে না। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—"তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর, দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে!" ব্রহ্মের সকল কার্য্যেই তাঁহার অনন্ত গুণের ক্রিয়া হয়। তিনি নিত্যই অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ। অর্থাৎ তাঁহার একটী মাত্র স্বরূপ। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁহার সেই স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার বহুরূপের—তাঁহার অনন্ত অরূপ—রূপের সন্ধান আমরা পাই বটে, কিন্তু সেই বহুরূপ বা অনন্তরূপ একীভূত হইয়াই তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপের শক্তির কার্য্যের ফল। সুতরাং দাড়ায় এই যে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই মঙ্গলে পরিপূর্ণ।* পরমপিতা

* এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে এবং "মায়াবাদ" ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশদ্বয়ে আরও লিখিত হইবে।

একাধারে অনন্ত প্রেমময় ও অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বর। তাঁহার ন্যায়বত্বা জন্য যখন অন্যায়কারী সন্তানকে তিনি শাস্তি দেন, তখন অনন্ত প্রেমময় পিতা তাঁহার প্রেমের গুণেই অবশ্য দুঃখিত হন। জগতেও দেখা যায় যে সৎ পিতা অন্যায়কারী পুত্রকে শাস্তি দেন বটে, কিন্তু তাঁহাতে অত্যধিক স্নেহ বর্ত্তমান থাকায় তিনি আবার সেই জন্য দুঃখিতও হন। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে পরমপিতা পাপীকে এক হাতে চপেটাঘাত করেন এবং অন্য হস্তে নিজের দুঃখাশ্রু মুছেন। ন্যায়ানুরোধে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতেই হইবে, ইহা জানিয়া কোন এক ব্যক্তি District and Session Judge-এর পদ গ্রহণ করেন নাই। আর একজন Session Judge এর কথা শুনা গিয়াছে যে তিনি যেদিন হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ দান করিতেন, সেই দিন আর তিনি অন্য কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি ন্যায়ানুরোধে দণ্ড দিতেন বটে, কিন্তু প্রেমিক বলিয়া তাঁহারই ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যের জন্য তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। পরম পিতাও তাঁহার অনন্ত ন্যায় স্বভাব বশতঃ কঠোর কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তাঁহাতে প্রেমও অনন্ত ও নিত্য। সুতরাং তাঁহার প্রেমস্বভাব বশতঃ তিনি দুঃখিতও হন। কঠোর কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত হইলেও প্রেমিক পুরুষদিগকে দুঃখ দান করে, ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পরম পিতায় অনন্ত কঠোর গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং ভীষণ কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুমোদিত হইলেও অনন্ত কোমল গুণের আধার অনন্ত প্রেমময় পরমপিতাকে দুঃখ দান করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই যে সাধু মহাত্মাগণ সাধারণ জনগণের পাপের দিকে অবাধ গতি দেখিয়া অনেক সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করেন ও অনন্ত করুণাময় পরমপিতার নিকট পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করেন। পৃথিবীতে যুগে যুগে যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ এবং বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নরনারীর দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন।

তাঁহাদের হৃদয়ে যদি নরনারীর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি উত্থিত না হইত, তবে তাঁহারা সুদুষ্কর ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিতেন না। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষার মূলে নরনারীর প্রতি প্রেম। হৃদয়ে গভীর প্রেম বর্ত্তমান না থাকিলে ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্খাই জাগ্রত হয় না, কার্য্য ত দূরের কথা। এই কারণেই ক্ষমার অবতার পরমপ্রেমিক মহাপুরুষ খৃষ্টদেবকে Man of Sorrows বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই বঙ্গ গৌরব নবদ্বীপ চন্দ্র প্রেমিকপ্রবর গৌরচন্দ্র সাধারণে হরিনাম গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া অপার স্নেহময়ী জননী শচীদেবী এবং সতীসাধ্বী পতিগত-প্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া এবং নিজহস্তে নিজহৃদয়কে দ্বিধা করিয়া যে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ভক্তিধর্ম্ম প্রচারার্থ সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ নাই। আরবে মহাতেজস্বী পরমোন্নত পরম সাধক মহম্মদদেব নিজের জীবন বারংবার সঙ্কটাপন্ন করিয়াও মহান্ ধর্ম্ম প্রচারার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার মূলেও স্বদেশে জড়োপাসনার প্রাবল্য এবং আরবের তথা অন্যান্য দেশের তৎকালীন নানাবিধ দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে বিষম দুঃখের অনুভূতি। অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক পরম সাধক মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তিনি পর দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজত্ব, স্নেহময়ী মাতা স্নেহ-ময় জনক, প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী এবং স্নেহের পুতুল শিশু পুত্রের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও স্নেহের বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে দুঃখ নিরসনের উপায় তিনি নিজে জানিয়া উহা জগতে প্রচার করিবেন। সাধুগণ বলিয়া গিয়াছেন যে মহাপুরুষদিগের জীবন পর্য্যালোচনা দ্বারা তাঁহাদের প্রেমময় স্রষ্টার ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। সুতরাং সেই সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে অনন্ত প্রেমময় পরম-পিতা তাঁহার সন্তানগণের দুঃখে দুঃখিত। দয়ার অর্থ কি?

উহা পরদুঃখহরণেচ্ছা। দয়া কি ভাবে মানব হৃদয়ে উদয় হয়? এক ব্যক্তি অন্য দুঃস্থ ব্যক্তিকে দেখিলে তিনি দুঃখিতের দুঃখে দুঃখিত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম আছে বলিয়া তাহাতে দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য সমানানুভূতি বা সমবেদনার উদয় হয়। এই সমানানুভূতির জন্যই তাঁহার হৃদয়ে দুঃখ উপস্থিত হয়। সমানানুভূতির অর্থই উভয়ের মধ্যে একভাবের বর্ত্তমানতা। প্রথমোক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম আছে বলিয়া তিনি সেই দুঃখ মোচনের জন্য অগ্রসর হন। সংসারে কীর্ত্তি স্থাপন জন্য অথবা অন্যবিধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ জনসাধারণ এমন অনেক কার্য্য করেন, যাহাতে পরদুঃখ হরণ হয় বটে, কিন্তু সেই সকল কার্য্যকে প্রকৃতপক্ষে দয়ার কার্য্য বলা যাইতে পারে না। সুতরাং দয়ার উদয়ের পূর্ব্বে প্রেমিক ব্যক্তি সমানানুভূতি-জনিত দুঃখ ভোগ করেন এবং এই দুঃখ হইতেই তাঁহার পরদুঃখহরণেচ্ছা বা দয়ার উদয় হয়। পরমপিতা অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময়, সুতরাং তিনি অনন্ত দয়াময়, সুতরাং তিনি পাপীর দুঃখে দুঃখিত হন এবং দুঃখ মোচন করেন। "পাপীর দুখে নহ তুমি কখনও উদাসীন।" (ব্রহ্মসঙ্গীত)। তাঁহার যদি দুঃখই না থাকিত, তবে জগতে দয়া অবতীর্ণ হইতে পারিত না এবং অনন্ত প্রেমময় পিতাকে অনন্ত দয়াময় বলিবার কোনই অর্থ থাকিত না। প্রশ্ন হইতে পারে যে দয়া পরদুঃখহরণেচ্ছা মাত্র। দয়ার মধ্যে সমানানুভূতির উল্লেখের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দয়ার উদয়ের প্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য। যদিও অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে এবং দয়াকে প্রেম হইতে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করিলে অর্থাৎ দয়ার উৎপত্তির ইতিহাস চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিলে বুঝিতে পারা যায় যে দয়া পরদুঃখহরণেচ্ছা মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ। প্রেমে যে সমানানুভূতি আছে, ইহা সুনিশ্চিত। প্রেম আছে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সমানানুভূতি নাই, ইহা স্ববিরোধী উক্তি। যদু ও মধুর মধ্যে প্রকৃত প্রণয় আছে, কিন্তু পরস্পরের সুখে ও দুঃখে পরস্পর সুখী ও দুঃখী নহে, এরূপ হইতেই পারে না। আবার যদি এমন হয় যে

যদু মধুকে ভালবাসে, কিন্তু যদুকে মধু ভালবাসে না, তবুও যদু মধুর সুখ ও দুঃখে সমানানুভূতি সম্পন্ন হইবেন। সুতরাং যে স্থলে প্রেম আছে, সেই স্থলেই সমানানুভূতিও আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমপাত্রের দুঃখে দুঃখিত হইবেনই। তখন আর সেই দুঃখ পরের নহে, উহা তাহার নিজেরই। নিজের দুঃখ মোচন করিতে সকলেই ব্যগ্র। যে পরিমাণে অন্যের দুঃখে নিজেকে দুঃখী মনে করা যায়, সেই পরিমাণে অন্যের দুঃখ মোচন করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই প্রকৃত পক্ষে দয়ার ইতিহাস। সুতরাং পরের দুঃখ মোচন করাও যাহা, প্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে এক অর্থে নিজের দুঃখ মোচন করাও তাহা। ব্রহ্মে অনন্ত প্রেম বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার অনন্ত সন্তানদিগকে নিত্য প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে সমানানুভূতিও অনন্ত। সুতরাং তিনি জীবদিগের দুঃখে দুঃখিত। উপাসক ও সাধকদিগের মধ্যে দেখা যায় যে কাহারও পাপমুক্তি বা গুণোন্নতির জন্য প্রার্থনা পরমদয়াল পরমপিতা অবিলম্বে গ্রহণ করেন। আবার কাহারও কাহারও প্রার্থনা গৃহীত হইতেছেনা। ইহার প্রধান কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যাহাদের প্রার্থনা গৃহীত হইতেছে, তাহারা নিজদিগকে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ও কাতর প্রাণে তাঁহাদের প্রার্থনা পরমদয়াল পরমপিতার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহাদের প্রার্থনা হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত হয়, সুতরাং সেই করুণ ক্রন্দন ধ্বনি পরম প্রেমময় পরমপিতা শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হন। সুতরাং সেই দুঃখ তিনি তাঁহার অপার দয়াগুণে মোচন করেন। সেই জন্যই সরল প্রাণের ব্যাকুল ও কাতর প্রার্থনা প্রায়শঃ অগ্রাহ্য থাকে না। অত্যান্ত দুঃখিত চিত্তে কাতর প্রাণে সরল হৃদয়ে নারদ ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অনুপযুক্ত অবস্থায়ও তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে যাহাদের প্রার্থনা গৃহীত হয় না, তাহারা কেবল মুখেই প্রার্থনা করেন। মনে মনে প্রার্থনা করিলেও তাহাতে নিজের অভাব-

জনিত তীব্র দুঃখানুভূতি তাহার হৃদয়ে থাকে না। তাই তাহাদের প্রার্থনা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং উহা কখনই পরমপিতার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হয় না। প্রার্থনাকারী যদি নিজেই প্রকৃতভাবে দুঃখানুভব না করেন, তবে অনন্ত প্রেমময় পিতা তাহাদের দুঃখে কেমনে দুঃখিত হইবেন ? ফলে তাঁহাদের প্রার্থনা গৃহীত হয় না। হৃদয়ে দুঃখ না থাকিলে দুঃখ মোচনের প্রশ্নই আসিতে পারে না। অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতাকে ভাষা দ্বারা, স্তোক বাক্য দ্বারা, হাবভাব দ্বারা অথবা কপট ক্রন্দন দ্বারা যে ভুলাইতে পারা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব দেখা গেল যে প্রেমই দয়ার কারণ। করুণা ও কৃপা দয়ার অন্তর্গত। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। দার্শনিক পণ্ডিত স্বর্গগত ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে পরমপিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে He is Loving God and Suffering God. এই উক্তিতেও পূর্ব্বোক্ত ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে আমরা দেখিব যে উভয় সমভাবাপন্ন না হইলে একে অন্যকে ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মে যদি দুঃখই না থাকিত, তবে তাঁহাতেও জীবের দুঃখহরণেচ্ছার উদয় হইতে পারিত না এবং জীবের দুঃখ কখনই বিনষ্ট হইত না। এখন প্রশ্ন হইবে যে জীবাত্মারই বা দুঃখ কেন। জীবের দুঃখ ত দোষপাশ জনিত, কিন্তু তিনি ত (জীবাত্মা) দোষপাশ দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। উহারা হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, স্থিতি করে এবং হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান এবং ইহার কারণ এই যে তিনি দেহজাত দোষপাশ বদ্ধ। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মে জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যাইবে যে জীবাত্মার দুইটী অবস্থা, যথা স্বরূপ ও বাস্তব। স্বরূপে তিনি পরমাত্মাই বটেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। এই অবস্থাকেই কঠোপনিষদ্ ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা (কঠ ৩-৪) এবং ব্রহ্মকে অলিঙ্গ (অশরীরী) ও ব্যাপক বলিয়াছেন (কঠ ৬/৮)। জ্ঞান বিশিষ্ট জীবাত্মা

তাঁহার হৃদয়ের সমুদায় অবস্থা সর্ব্বদা জানেন। তাঁহাকে অন্ততঃ দ্রষ্টা বা সাক্ষী স্বীকার করিতেই হইবে। সাংখ্য এবং মায়াবাদও তাহা স্বীকার করেন। কোন এক ব্যক্তি যদি একটী জীর্ণ গৃহে বাস করেন, যে গৃহে বহু ছিদ্র বর্ত্তমান, যে গৃহে নানাবিধ বহু দস্যু, তস্কর, ও কুৎসিৎ প্রকৃতির লোক সর্ব্বদা বাস করিয়া নানারূপ পৈশাচিক, কুৎসিৎ ও ভীষণ ক্রিয়া সমূহ সংঘটন করিতেছে; অথচ যে গৃহ এমনভাবে নির্ম্মিত যে তাহা হইতে তিনি বহির্গতও হইতে পারেন না এবং উহা হইতে বহির্গমনের সকল চেষ্টা সেই দুর্ব্বৃত্তগণ সর্ব্বদা ব্যর্থ করিতেছে, কিন্তু যাহা হইতে বহির্গত হইয়া উন্মুক্ত আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করাই তাহার একান্ত প্রয়োজন, কারণ, তাহা হইলেই তাহার পূর্ণামুক্তি লাভ হয়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে তিনি সেই গৃহের দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষভাবে দুঃখিত হন। জীবাত্মাও সেইরূপ হৃদয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হইতে পারেন না কি? যদি বলেন যে আত্মা জড়ের দুঃখে দুঃখিত হইবেন কেন, তবে বলিতে হয় যে দেহ জড় হইলেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে। "জড় ও আত্মার মিলন," "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশত্রয়ে আমরা দেখিতে পাইব যে পরমাত্মার নির্ম্মাণ কৌশলে জড় দেহেরও যথেষ্ট শক্তি আছে এবং সেই শক্তির জন্যই উহা জীবাত্মার বাসস্থান হইতে এবং বাধকভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সেই জন্যই আত্মা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হইতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ আত্মা যেমন দেহের উপর শক্তি প্রয়োগে সমর্থ, জড় দেহও তেমনি উহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে জীবাত্মার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে কার্য্য করিতে সমর্থ। (Like alone can act upon like). কারণ, জড় ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় তাঁহারই কোন এক গুণের পরিণামে উৎপন্ন। সুতরাং উহারও বিশেষ শক্তি আছে, ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আবার প্রত্যেক জীবাত্মারই অসংখ্য দেহ বর্ত্তমান। জীবাত্মা কখনও দেহ ভিন্ন স্বাধীন ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। দেহ যতই রজঃ এবং তমোভাব হইতে মুক্ত হইতে থাকিবে ততই জীবাত্মা

বা ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা তাঁহার দেহ সম্বন্ধে অল্প হইতে অল্পতর দুঃখিত হইতে থাকিবেন। দেহ সত্ত্বপ্রধান হইলে তাঁহার দুঃখের অল্পতা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহার একান্ত অবসান হয় না।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ (গীতা—১৪।৫)

বঙ্গানুবাদ :—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিসম্ভব এই তিন গুণ, সেই গুণ-ত্রয় নির্ব্বিকার দেহীকে দেহবদ্ধ করে। (গৌরগোবিন্দ রায়)।

স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দেহে থাকিতে আত্মার পূর্ণা মুক্তি নাই। সুতরাং যে দেহে জীবাত্মা চিরকাল বাস করিবেন, সেই দেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে তিনি দুঃখিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

জীবাত্মা অপূর্ণ ভাবে ভাসমান। তিনি দেহ দ্বারা এমন সুকৌশলে আবদ্ধ যে তাঁহার গুণ ও শক্তিরাশি যেন নাই অথবা উহারা ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত। সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে জীবাত্মা স্বীয় সাধনা দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া পরমাত্মার গুণরাশিতে একত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন ও পরিণামে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ পূর্ণা মুক্তি লাভ করিবেন। সুতরাং জীবাত্মার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনার একান্ত প্রয়োজন এবং তাহা দ্বারা গুণ ও শক্তি লাভ অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং দেহ যতই সেই সাধনের বাধা উৎপাদন করিবে, ততই তাঁহার পক্ষে পূর্ণা মুক্তি লাভ করিতে বিলম্ব হইবে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেহের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। জীবাত্মা অপূর্ণ ভাবে ভাসমান। সুতরাং তিনি পূর্ণত্ব লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। বাধা দেহের দুর্দ্দশা। কারণ, দেহে যতই দোষ পাশ প্রবল থাকিবে, ততই তাঁহার উন্নতির বাধা উৎপন্ন হইবে। যে স্থানে বাধা, সেই স্থানেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব জীবাত্মাও যে এই দুঃখ ভোগ করেন, তাহাতে সংশয়ের কারণ কি? জীবাত্মাকে দেহা-বদ্ধ আত্মাও বলা হয়। অর্থাৎ আত্মা দেহে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তাহা জানেন। দেহের দোষ পাশই যখন বন্ধনের কারণ, তখন

যে দেহে তিনি বাস করেন, সেই দেহে যত অধিক পরিমাণে দোষপাশ থাকিবে, তিনি ততোঽধিক দুঃখে দুঃখিত হইবেন।

এত সময় আমরা দেহের দোষপাশের সম্বন্ধেই বলিয়াছি, কিন্তু জীবাত্মার পক্ষে দেহও ত কারাগার। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা বটেন, কিন্তু দেহাবদ্ধাবস্থায় থাকিতে থাকিতে তিনি অনন্তপ্রায় উন্নতি লাভ করিলেও পূর্ণা মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। জীবাত্মা তাঁহার স্বভাব অর্থাৎ অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিতে ব্যাকুল। তিনি যে পর্য্যন্ত না ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি বন্ধনদুঃখ ভোগ করিবেন, তাহা অত্যল্পই হউক্ বা অত্যধিকই হউক্। দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্তই উহার অল্পাধিক প্রভাব জীবাত্মার উপর বিস্তার করিবেই। যদি তাহাই না হইত, তবে দেহ কখনও জীবাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। দোষপাশই বলা হউক্ অথবা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের কথাই বলা হউক্, উহারা জড় জাত বা দেহ সংসর্গে জাত এবং দেহকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। দেহ ভিন্ন বা জড় ভিন্ন উহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বাস্তব অবস্থায় জীবাত্মার গুণ ও শক্তির অভাবের অন্ত নাই বলিলেই চলে। কারণ, তিনি অপূর্ণ ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। যাহার অভাব আছে, তাহারই দুঃখ আছে। জীবাত্মাও তাঁহার অভাব পূরণ করিতে ব্যাকুল, অর্থাৎ তিনিও গুণবান ও শক্তিমান হইতে ব্যগ্র। অর্থাৎ তাঁহার অনন্তগুণ ও শক্তি যে কারণে আবৃত, তাহা দূর করিতে ব্যগ্র। সুতরাং জীবাত্মারও দুঃখ আছে, ইহা বলিতে হইবে। জীবাত্মা যে দেহাবদ্ধাবস্থায় অপূর্ণতা জন্য শোকগ্রস্ত থাকেন, তাহা মুণ্ডকোপনিষদের ৩।১।১-২ মন্ত্রদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাই। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্য-মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" বঙ্গানুবাদঃ—দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের

মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অন্য অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে এবং (আত্মা ও জগৎ) তাঁহারই মহিমা ইহা দেখে, তখন বিগতশোক হয়। (তত্ত্বভূষণ)।

ইহাতে দেখা যাইবে যে পরমাত্মা সম্বন্ধে "ঈশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর জীবাত্মার দুঃখের কারণ বলা হইয়াছে তাঁহার অনীশ্বরত্ব (অনীশয়া অর্থাৎ শক্তিহীনতয়া বা দীনভাবেন অর্থাৎ অপূর্ণতা জনিত শক্তিহীনতা বা দীনতা বশতঃ)। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে জীবাত্মার দুঃখের কারণ তাঁহার অপূর্ণতা এবং তাঁহার অপূর্ণতার কারণ দেহে নিমগ্নতা বা দেহবদ্ধতা (সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ)। অতএব ইতিপূর্ব্বে যাহা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি মন্ত্র দ্বারাও সমর্থিত হইল। সুতরাং দেহাবদ্ধতাই যখন জীবাত্মার দুঃখের সর্ব্বপ্রধান কারণ বা মূল কারণ, তখন প্রোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে কঠোপনিষদও ২/২১ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্ত্তমান।

মানবের অভাবের জন্য যে তাহার বহু দোষের উৎপত্তি হয়, সে যে বহু পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দারিদ্র্য জন্য যে কত আশ্রাপ্রদ (Promising) যুবকের জীবন বিফল হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া কত লোক বিপথে গমন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং অভাবই, অপূর্ণতাই যে জীবের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান বাধা সুতরাং সর্ব্বপ্রধান দুঃখের কারণ, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের পূর্ণতা থাকিলে আমরা প্রেমজনিত দুঃখ ভিন্ন অন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতাম।

জীবাত্মা যে বাস্তবাবস্থায় বা দেহাবদ্ধাবস্থায় অপূর্ণ এবং তাঁহার

অত্যুন্নতির অবস্থায়ও যে তিনি অনন্তপ্রায় আনন্দময়ী অবস্থার সহিত সবিশেষ দুঃখ ভোগ করেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা জানিতে পারি। পরমর্ষি গুরুনাথ নিখিল জগতের প্রতি অভেদ জ্ঞান কারীর অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ঃ—

"এই সুপবিত্র মহত্তম অবস্থায় নিরন্তর পীযূষ রসাধিক অনুপম আনন্দ-রস-প্রবাহ তদীয় হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, সুতরাং শারীরিক ক্লেশ, মানসিক সন্তাপ ও অন্যান্য রূপ যাতনা উপস্থিত হইতে না হইতেই প্রজ্জ্বলিত অনলে তৃণকণার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। আহা! এতাদৃশী অবস্থা কি পরমানন্দসন্দোহসঙ্কুল ! কি মধুময়ী! সুধাময়ী !! ইহার স্মরণেও হৃদয় আনন্দরসে আপ্লাবিত এবং নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রু সলিলে পরিপূর্ণ হয়।"

"কিন্তু হায় ! মানব, তোমার অদৃষ্টে কি অমিশ্র-সুখ আছে ? দুঃখ শূন্য সুখ দার্শনিকগণ ও কবি সমূহ বর্ণনা করেন বটে, কিন্তু তাহা কি এই ক্ষুদ্র মানব জীবনে কখনও সংঘটিত হয় ? হায় ! এই অনন্তপ্রায় সুখময়ী অবস্থায়ও উল্লিখিত সাধকগণের হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দন ধ্বনির বিরাম থাকে না। তাঁহারা সেই অনন্তাতীত পরমপিতা পরমেশ্বরকে অভেদ-জ্ঞান করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন, পিতার নিকট নিরন্তর কঠোর রোদন করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি করুণ ভাবে পরিপূর্ণ করেন ; সেই অপূর্ণভাব-পরিপূরিত রোদন-নিনাদে কত কঠোর অবিশ্বাসীর হৃদয় অবিশ্বাস-মুক্ত হয়, পাষণ্ডের হৃদয় বিগলিত হয়, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, নদী, হ্রদ, সাগরাদিও পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। পাপী পাপ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে আনীত হয়, দাম্ভিকের প্রবল দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়, দৈত্যদানবাদি দেবভাব ধারণ করে এবং দেবগণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া জগতের গৃহে গৃহে নৃত্য করিতে থাকেন।"

"হে মঙ্গলময় ! তোমার মঙ্গল নিয়মের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া, মানবের কথা দূরে থাকুক, দেবগণেরও অসাধ্য। তুমি একজনের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া শত শত দুঃখ-বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ

কর, তুমি একের দ্বারা বহুকে এক কর, তুমি আত্মার অসীমত্ব প্রদান করিয়া একক বহু কর (ক)। নাথ! তুমি স্বয়ং যেমন অনির্ব্বচনীয়, তোমার কার্য্যকলাপ তদ্রূপ বাক্যাতীত। প্রভো! তোমাকে শত শত কোটী কোটী ধন্যবাদ প্রদান করি।"*

অতএব দেখা গেল যে দোষপাশ দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলেও জীবাত্মা নানা কারণে দুঃখ ভোগ করেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে আরও সরল করা যাউক্। প্রাতঃস্মরণীয়া পরমাসতী সীতাদেবী যখন রাবণগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, তখন রাবণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু নানা দোষে দুষ্ট সেই গৃহকে তিনি দুঃখ যাতনা পূর্ণ কারাগারই মনে করিতেন। অত্যন্ত-বিরহ-দুঃখ-ক্লিষ্টা সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে লাভ করিবার জন্যই অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এবং যে পর্য্যন্ত না তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। জীবাত্মার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। তিনি যে দেহে আবদ্ধ, সেই দেহের দোষ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা বটে, কিন্তু নানা দোষে দুষ্ট দেহ তাঁহার পক্ষে কারাগারই এবং সেই জন্যই পরমাত্মার সহিত তাঁহার মিলন সম্ভব হয় না, ইহা তিনি জানেন এবং তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত। অন্য প্রকার দুঃখের বিষয় চিন্তা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে তিনি যে পর্য্যন্ত না অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিবেন অর্থাৎ পূর্ণামুক্তি বা মোক্ষ লাভ করিবেন বা ব্রহ্মের সহিত পূর্ণ মিলনে মিলিত হইবেন, সেই পর্য্যন্তই তাঁহার অপূর্ণতাজনিত দুঃখ বর্ত্তমান থাকিবেই। উন্নত বা অবনত অবস্থার পার্থক্য এই যে তাঁহার

(ক) অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ রচিত "দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

* পরমর্ষি গুরুনাথ এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ—"বহু চেষ্টার পরে যদি ঈশ্বর প্রেমসম্পন্ন সাধকের প্রতি প্রেমময় পরমেশ্বর প্রসন্ন হন, তাহা হইলে সৌভাগ্যবান সাধক স্রষ্টায় প্রতি অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু সমর্ণ অভেদ জ্ঞান যে কখনও হইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্রষ্টার প্রতি কখনও "সোঽহং" জ্ঞান জন্মেনা, কারণ সমর্ণ বা পার্থিব অভেদ-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই সোঽহং জ্ঞানের নামান্তর।"

দুঃখের মাত্রা অল্প বা অধিক হয়। সীতাদেবীর জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই ইহারও উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। নানা দোষে দুষ্ট রাবণ-গৃহে বাসকালীন উহাকে তিনি বহুভাবে কারাগারই মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার বনবাসকালে মহাপুরুষ বাল্মীকির সুপবিত্র তপোবনকে সেইরূপ ভাবের কারাগার মনে করিতেন না। অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলনের জন্য অতি ব্যাকুলা সীতাদেবী শান্তিপূর্ণ তপোবনও ত্যাগ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। সুতরাং এক অর্থে সেই স্থানও তাঁহার পক্ষে কারাগারই ছিল। জীবাত্মার পক্ষেও রজস্তমঃ প্রধান দেহ রাবণ-গৃহ-রূপ কারাগারই বটে, কিন্তু সত্ত্বপ্রধান দেহও তাঁহার পক্ষে কারাগারবৎই, যদিও সেই দেহ পবিত্র বা অতি পবিত্র। তিনি সেই দেহেও নানা অভাবে ক্লিষ্ট হন এবং সর্ব্বোপরি তিনি তখনও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন না এবং পূর্ণত্ব লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত পূর্ণ মিলনের জন্য অতি ব্যাকুল থাকেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জীবাত্মা-রূপ পক্ষী দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ, পিঞ্জর লৌহ-নির্ম্মিত, রৌপ্য-নির্ম্মিত অথবা স্বর্ণ-নির্ম্মিতই হউক্, উহা যেমন উন্মুক্ত আকাশে ভ্রমণকারী পক্ষীর পক্ষে কারাগারই, সেইরূপ জীবাত্মা তমোময়, রজোময়, অথবা সত্ত্বময় যে দেহেই বাস করুন না কেন, তিনি উহাকে কারাগারই মনে করিবেন। পক্ষী যেমন সর্ব্বপ্রকার পিঞ্জর হইতেই মুক্ত হইয়া বন্ধনহীন অসীম আকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে, জীবাত্মাও তেমনিই ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত উদার ও সম্পূর্ণ স্বাধীন পূর্ব্ব-পরম-চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে পূর্ণভাবে মিলিত হইতেই সর্ব্বদা অতি ব্যাকুল। সুতরাং অপূর্ণের পক্ষে পূর্ণত্ব লাভের পূর্ব্বে দুঃখ অনিবার্য্য। সুতরাং জীবাত্মা চিরদুঃখী।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীবাত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হইলে তাঁহার কোনই দুঃখ থাকে না। যদি তাহাই হয়, তবে

পূর্ণ ব্রহ্মে কখনই দুঃখ থাকিতে পারে না। কারণ, তিনি নিত্যই পূর্ণ এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবাত্মা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেহজাত দোষ পাশ হইতে মুক্ত হইতে থাকেন এবং সেই জন্য সেইরূপ দুঃখের হস্ত হইতে ক্রম মুক্তি লাভ করেন; তাঁহার অপূর্ণতা যতই হ্রাস পাইতে থাকে, তাঁহার অপূর্ণতা জনিত দুঃখও ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমবৃত্তের পরিধিও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রথমতঃ স্বগৃহই তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্র থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া বিশ্বাকার ধারণ করে এবং পরিশেষে অনন্ত প্রায় ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রেমান্তর্গত করেন। প্রথমতঃ তিনি গৃহের আত্মীয় স্বজনের দুঃখেই দুঃখিত হন, ক্রমশঃ তাঁহার প্রেমের উন্নতির সহিত জগতের প্রত্যেক জীবের দুঃখে তিনি দুঃখী হইতে থাকেন। সুতরাং তাঁহার দুঃখের নাশ হয় না। একপ্রকার দুঃখ অর্থাৎ দোষ পাশ জনিত বা অপূর্ণতাজনিত দুঃখ হ্রাস হইতে থাকে বটে, কিন্তু প্রেম জনিত দুঃখ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মও প্রেমজনিত দুঃখে দুঃখী। তাঁহার দুঃখ অভাব জনিত নহে, দেহজাত দোষ পাশোৎপন্নও নহে অথবা অপূর্ণতা জনিতও নহে। কারণ, উহাদের কিছুই তাঁহাতে নাই বা থাকিতেও পারে না। তাঁহার দুঃখ প্রেমজনিত। তাঁহার প্রেম অনন্ত ও নিত্য। সুতরাং তাঁহার দুঃখও অনন্ত ও নিত্য।

এস্থলে আরও একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে ভারতীয় ষড় দর্শনই দুঃখ নিরসনের জন্য মুক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। অথচ এখন বলা হইল যে দুঃখের হস্ত হইতে জীবের সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে এই প্রেমজনিত দুঃখের জন্যই বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্যদেব, খ্রীষ্টদেব, মহম্মদেব দুঃখের জীবন বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে জগতের নরনারীর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি বিষমভাবে বাজিতেছিল, তাই তাঁহারা জীবদুঃখ হরণার্থ সুখের সংসার ত্যাগ করিয়া দুঃখসাগরে ঝম্প দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রেমজনিত দুঃখ নিরসন হইবার নহে। উহা

আত্মারই ধর্ম্ম এবং উহা আত্মাতেই নিত্য বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সাংখ্য দর্শনে যে ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশের উল্লেখ আছে, অধিকাংশ হিন্দুশাস্ত্র তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উহারা পার্থিব ও অতি স্থূল, উহারা দেহ সম্বন্ধীয় মাত্র। দুঃখকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দুঃখ যথা—বাত, পিত্ত ও কফের বিপর্য্যয়-জনিত রোগসমূহ। মানসিক দুঃখ যথা—প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ। আধিভৌতিক দুঃখ যথা—চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ) জীবসমূহ দ্বারা উৎপাদ্যমান ক্লেশচয়। আধিদৈবিক দুঃখ যথা—শীত, উষ্ণ, বর্ষা, বাতাদিজনিত দুঃখ সমূহ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে আধ্যাত্মিক দুঃখ অর্থে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ মাত্রই বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধীয় কোনওরূপ দুঃখের উল্লেখ নাই। সুতরাং দেহাবদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মার অপূর্ণতাজনিত দুঃখ, অভাবজনিত দুঃখ, দোষ পাশ জনিত দুঃখ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমজনিত দুঃখ সম্বন্ধে উহাতে কোনই উল্লেখ নাই। অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় মুক্তির জন্যই উহাতে সাধনার বিধান আছে। কিন্তু আমাদের যে সকল দুঃখ সূক্ষ্মাকারে বা কারণাকারে বর্ত্তমান, সেই সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করা হয় নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সাংখ্যমতে নির্দ্দিষ্ট দুঃখ হইতে মুক্তি কেবল স্থূল দুঃখের নিরসন মাত্র। সাধারণতঃ যে সকল দুঃখের আলোচনা হয়, তাহা সমস্তই উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখ। অপূর্ণতা জনিত দুঃখ, আত্মিক অভাবজনিত দুঃখ, দোষ পাশ জনিত দুঃখ অথবা প্রেমজনিত দুঃখ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে সৃষ্টির আদি এবং অন্ত যখন স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের কোনই দুঃখ ছিল না এবং মহাপ্রলয়ের পরেও উহা থাকিবে না। কারণ, উক্ত কালে কোন জীব ছিলনা বা থাকিবে না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রেমজনিত দুঃখও তখন ছিল না বা থাকিবে না। সুতরাং তাঁহার দুঃখও অনন্ত

এবং নিত্য হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণই নিত্য। সৃষ্টিকালে তাঁহার কোনই নূতন ক্ষণস্থায়ী গুণের উদ্ভব হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। কারণ, তিনি নিত্যই পূর্ণ। তাঁহাতে নূতন কিছু আসেনা বা আসিতেও পারে না—তাঁহার হইতে কিছু যায় না বা যাইতেও পারে না। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার দুঃখ নামক গুণ ছিল এবং মহাপ্রলয়ের পরেও তাহা তাঁহাতে থাকিবে। ব্রহ্মে কি প্রকারে তাঁহার অনন্ত গুণ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা "মায়াবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব। সেই আলোচনা দীর্ঘ ও জটিল বলিয়া এস্থলে আর উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম একাধারে অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত। তিনি কোনও গুণ দ্বারা চালিত হন না, কিন্তু তাঁহার দ্বারা তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণ চালিত হয়। তিনি অনন্ত স্বাধীন, তাই তিনি নিত্য নিজ অনন্ত গুণেরও অতীত। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি নিত্যই নিজেকে নিজে জানেন এবং তিনি নিত্যই নিজেকে নিজে ভালবাসেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি গুণ শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের ধারণীয় তাঁহার গুণের কোনও ক্রিয়া ছিল না মনে করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ বা গুণশূন্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে নিত্যই অনন্ত গুণ বর্ত্তমান এবং তিনি নিত্যই সেই অনন্ত গুণেরও অতীত। যুক্তিযুক্তরূপে যখন বুঝিতে পারি যে সৃষ্টিকালে তাঁহাতে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহাতে সেই গুণ ছিল। কারণ, তাঁহার প্রত্যেক গুণই নিত্য। আবার যদি দয়া, করুণা, কৃপা, মমতা, বন্ধুত্ববোধ প্রভৃতি গুণরাশি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে থাকিতে পারে, তবে দুঃখ নামক গুণ তাঁহাতে নিত্য থাকিতে বাধা কি? আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে।*

প্রেমে অনন্ত সুখের সহিত যে অনন্ত দুঃখ বিজড়িত, তাহাও

* এই জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, শুষ্ক তর্কজনিত জ্ঞান নহে।

আমরা বুঝিতে পারি। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রেম বহুকে এক করিতে পারে এবং এককেও বহু করিতে পারে। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রেম যেমন সৃষ্টি করিতে পারে, তেমনি উহা লয় করিতেও সমর্থ। অর্থাৎ এক একটী গুণেও বিপরীত ভাব বর্ত্তমান। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞান কঠোর গুণ পর্য্যায় ভূক্ত। জগতেও কথিত হয় যে জ্ঞানে শুষ্কতা বর্ত্তমান। জ্ঞান অর্জ্জনও অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু জ্ঞানে যে অপার আনন্দ দান করে * ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। ন্যায় যেমন দণ্ড দেয়, তেমনি পুরস্কারও দান করে।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে প্রেমিক মহাত্মাগণের প্রেমজনিত দুঃখ তাঁহাদিগকে বিষবৎ যন্ত্রনা দান করেনা। অর্থাৎ উহাতে তাঁহাদের কোনও বিকৃতি উপস্থিত হয় না বা দুঃখ কখনও জ্বালাদায়ক হয় না। যিনি অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার বিরহানলে দগ্ধ হইয়াছেন, তিনি দুঃখ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই দুঃখ ক্রমশঃ তাঁহাকে শোধন করিয়া প্রেমের পথে—মিলনের দিকে অগ্রসর করিয়াই দিয়াছে। স্থূল সেই দুঃখেও এক প্রকার আনন্দ বর্ত্তমান। কারণ, সেইরূপ উন্নত প্রেমিক সাধক বিরহজনিত দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কখনই প্রেম-সাধনা হইতে বিরত হন না, বরং তিনি সেইরূপ দুঃখকেই শিরোধার্য্য করেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সেই সাধকই মহা সৌভাগ্যবান। কারণ, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অমানিশা শীঘ্রই অবসান হইবে।** তাই নির্ব্বানোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় তাঁহার দুঃখ অধিকতর হইয়াছে মাত্র; সেই সাধকই ধন্য, যিনি অনন্ত প্রেমময়ের প্রেম বিরহানলে বিদগ্ধ হইতেছেন। কারণ, তিনি নিত্য প্রেমময়ের প্রেম আকর্ষণ গভীর ভাবে অনুভব করিতেছেন এবং এই বিরহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে পারিলে যে শীঘ্রই তাঁহার নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতির সহিত অপূর্ব্ব প্রেম-শুভ-মিলন সম্ভব হইবে, ইহাও ধ্রুব সত্য।

---

* এই জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, শুষ্ক তর্কজনিত জ্ঞান নহে।

** পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"তুমি মেলক দীনজনে বিরহে"।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মের অনন্ত দুঃখেও অনন্ত আনন্দ বর্ত্তমান। পাঠক বলিতে পারেন যে দুঃখে আনন্দ থাকিবে কি প্রকারে। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। চিন্তা করিলে আমরা এই তত্ত্ব আরও বুঝিতে সমর্থ হইব। যখন আমরা দুঃখীর দুঃখ সত্যভাবে অনুভব করিয়া বিশেষ ভাবে দুঃখিত হই, তখন সেই দুঃখের পশ্চাতে একটী অব্যক্ত আনন্দ বর্ত্তমান থাকে। যদি কোন ব্যক্তি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া নিজেও সমানানুভূতি সম্পন্ন হইয়া প্রকৃত শোকার্ত্তভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, তবে সেই ক্রন্দনের সহিত একটী অব্যক্ত আনন্দও যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা তিনি চিন্তাশীল হইলে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া দুঃখিত না হইলে নিজেরই মনে মনে লজ্জিত হইতে হয়। সেই স্থলে দুঃখিত হইতে পারিলেই সুখ লাভ হয়। আবার প্রেমিকের পক্ষে বিরহজনিত দুঃখ আনন্দ দান করে। প্রেমের সাধকমাত্রই ইহা স্বীকার করি-বেন। যদি বিরহে বিন্দুমাত্রও আনন্দ না থাকিত, তবে প্রেমিকের পক্ষে প্রেম সাধনা অসম্ভব হইত। ধর্ম্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যের জন্য সাধুগণ দুঃখবরণ করেন। তাহাতে তাঁহারা দুঃখের সহিত আনন্দও লাভ করেন। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি সাধু ভাবে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা শাকান্নভোজনে যে তৃপ্তিলাভ করেন, সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দ অসাধুভাবে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ষোড়শোপচারে অন্ন ব্যঞ্জনের ভোগে অলভ্য। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মে অনন্ত দুঃখের সহিত অনন্ত আনন্দ বর্ত্তমান।

একটী কথা আমাদের এস্থলে ধারণা করিতে হইবে। তাহা এই যে সাধারণ জনগণ যে সুখকে সুখ মনে করেন, ব্রহ্মের সুখ সেরূপ নহে। আমাদের স্থূল সুখ অনন্ত সুনির্ম্মল সুখের চির বিকৃত অবস্থা মাত্র। সুখ, শান্তি, আনন্দ, এক পর্য্যায়ভুক্ত এবং তাহাই ব্রহ্মে অনন্ত পরিমাণে এবং কারণাকারে বর্ত্তমান। তাঁহার অতুলনীয় সুখ ও দুঃখ আমাদের বিকৃত সুখ দুঃখের সহিত তুলনা করিতে যাইয়াই আমরা একান্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। এই বিশ্বলীলা ব্রহ্মের প্রেমলীলা।

আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ইহাতে অসংখ্য সুখের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, আবার রাশি রাশি ভীষণ দুঃখময় ব্যাপারও সংঘটিত হইতেছে। ইহার কোনটীই অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে কারণাকারে ব্রহ্মে অনন্ত সুখও যেমন বর্ত্তমান, অনন্ত দুঃখও তেমনি বর্ত্তমান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং জীবাত্মা সমূহ তাঁহারই ক্ষুদ্র ভাবের প্রকাশ। ব্রহ্ম একই সময়ে অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখ অনুভব করেন। তাঁহাতে স্থানাবরোধকতার প্রশ্ন আসিতে পারে না। সেই স্থল দেশাতীত, কালাতীত, ও জড়াতীত। সুতরাং তাঁহাতে স্থানাবরোধকতা থাকিতে পারে না। তাঁহাতে অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখ অনন্তভাবে মিশ্রিত হইয়া একীভূত হইয়া বর্ত্তমান। উহা যে আমাদের ধারণীয় সুখও নহে, দুঃখও নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সেই অবস্থা সম্বন্ধে ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে সুখ-দুঃখের একত্ব প্রাপ্ত সাধক তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভাবে অনুভব করেন। তাই প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর তাঁহার বিশ্বলীলাকার্য্যে নিত্যই আনন্দ লাভ করিতেছেন। বিশ্বে এরূপ সাধক আছেন, যিনি অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমজলধিতে নিত্য সুবিনিমগ্ন থাকিয়া সুখ-দুঃখময় বিশ্বে প্রেমলীলাময়ের প্রেমলীলাই দর্শন করিতেছেন। বিশ্বের অসংখ্য অসংখ্য দুর্ঘটনা দেখিয়া তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমদৃষ্টি কখনই সেই অমূর্ত্ত প্রেমমুর্ত্তি হইতে বিচলিত হয় না, কখনই, তিনি বিশ্বকার্য্যে ব্রহ্মের বিন্দুমাত্রও ক্রটী লক্ষ্য করেন না, তিনি জগতে নিত্যই মঙ্গলে হইতেছে দেখিয়া অনন্ত মঙ্গলময়কে জ্ঞান-প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সর্ব্বদা অন্তরতম স্থল হইতে ধন্যবাদ দেন। সুতরাং সেই পরমসাধকেরও পরমারাধ্য যিনি, যিনি নিত্যই অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত প্রেমে, অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাঁহার অনন্ত দুঃখ থাকিয়াও নিত্যই যে তিনি অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আরও একটী বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবাত্মায়

সুখ এবং দুঃখ বর্ত্তমান। তাহা এই যে আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে পারি যে প্রস্তরখণ্ড কাষ্ঠ খণ্ড বা মৃৎপিণ্ডের কোনও সুখও নাই, দুঃখও নাই। উহারা যদি জড়ের গুণ হইত, তবে অবশ্যই আমরা জড়ের বিশ্লেষণে উহাদের অনুসন্ধান পাইতাম। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত কেহই সেইরূপ সিদ্ধান্ত লাভ করিতেছেন না। সুখ এবং দুঃখ আত্মারই সরল গুণ এবং উহারা একমাত্র চৈতন্যেই বর্ত্তমান।* উহারা কখনও চৈতন্য শূন্য জড়পদার্থে নাই। সাংখ্য এবং মায়াবাদ অন্তঃকরণকে জড় মাত্র বলেন। উহা যদি একমাত্র জড়ই হয়, তবে উহাতে সুখ বা দুঃখ থাকিতে পারে না. যেমন প্রস্তর খণ্ডে সুখও নাই, দুঃখও নাই। এখন বাকী রহিল চৈতন্যময় আত্মা। সুতরাং সুখ এবং দু.খ আত্মারই গুণ। (জীব — আত্মা + দেহ)। এখন মায়াবাদ ও সাংখ্য দর্শনদ্বয় বলিবেন যে কূটস্থ ব্রহ্ম বা পুরুষের দেহে উপস্থিতির জন্যই অন্তঃকরণে সুখ এবং দুঃখ নামক বৃত্তিদ্বয় উদিত হয়। ইহা যে হইতে পারে না, তাহা "চিদাভাস (মায়াবাদী)" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আত্মায় যাহা নাই, তাহা তাঁহার আভাসে থাকা একান্ত অসম্ভব। মূলে যাহা নাই. ফলে তাহা থাকিতে পারে না. কায়ায় যাহা নাই, ছায়ায় তাহা থাকিতে পারে না। আমাদের মতে অন্তঃকরণ কেবলমাত্র জড় নহে। উহার এক অংশ আত্মিক ও অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা, তাহা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা জীবাত্মার সরল গুণ, তাহা যে পরমত্মায়ও অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান. ইহা সহজবোধ্য। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিয়াও প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মে সুখ এবং দু:খ বর্ত্তমান।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মে অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের

---

* চৈতন্য একমাত্র আত্মারই গুণ বা স্বরূপ। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই চৈতন্য নাই। দেহে আত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে দেহও শবে পরিণত হয়। উহাও জড়মাত্র। উহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই বর্ত্তমান থাকে না।

অনন্ত মিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে, তাঁহার দুঃখের কারণ একমাত্র জীব সমূহ। জীব সৃষ্টি না হইলে তাঁহার দুঃখের কোনই কারণ দেখা যায় না। পৃথিবীতে দেখা যায় যে কেহই এমন কার্য্য ইচ্ছা করেন না, যাহাতে তাহার নিজেরই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে ব্রহ্ম কেন লীলার্থে স্বেচ্ছায় এই জগদ্ব্যাপার সংঘটন করিলেন এবং সেইজন্য তিনি স্বয়ং দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার উত্তর একপ্রকার ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক্, এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক্। ইহা সত্য যে পৃথিবীতে দেখা যায় যে সাধারণে ইচ্ছা করিয়া দুঃখে পতিত হন না বটে, কিন্তু মহাপুরুষগণ দুঃখবরণ করিয়া থাকেন। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যথা বুদ্ধদেব, মহম্মদদেব, খ্রীষ্টদেব, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারের নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবনব্যাপী দুঃখ ভোগ করেন নাই। ইহাও বলা যাইতে পারে না যে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের ফল জানিতেন না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে প্রেমের জন্যই তাঁহারা সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখময় জীবন বরণ করিয়াছিলেন। সৃষ্টিও যে প্রেম-লীলমাত্র, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নানাস্থলে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্ত প্রেমময় পিতাও প্রেমের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে এইরূপ দুঃখের মধ্যেও অপূর্ব্ব আনন্দ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং তাঁহার অনন্ত দুঃখ আছে বলিয়া তাঁহার আনন্দের কোনই ব্যাঘাত হয় না। আমরা যদি আরও চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে কেবল মহাপুরুষগণই দুঃখ বরণ করেন, তাহা নহে, ধর্ম্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিগণও তাহা করিয়া থাকেন। সাধারণ সংসারী ব্যক্তিও সৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থ সময় সময় ঐরূপ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৎকার্য্যার্থ দুঃখ বরণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে সুখ ও দুঃখ কারণাকারে বর্ত্তমান। আমাদের স্থূল বা স্থূলতম সুখ দুঃখের সহিত তাঁহার অনন্ত অপার্থিব ও সুবিমল সুখ দুঃখের তুলনা

করিতে যাইয়াই আমরা ভ্রমে পতিত হই। আবার ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে সেইরূপ অনন্ত সুখের ও অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা অপূর্ব্ব একত্ব তাঁহাতে সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে সেইরূপ সুখ দুঃখের একত্ব ধারণা করা একান্ত অসম্ভব। কারণ, তাহা না সুখ, না দুঃখ বা উহাদের অপূর্ব্ব অনন্ত মিশ্রণ।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্মের দুঃখের একমাত্র কারণ জীবের দুঃখ। বরং ইহাই সত্য যে দুঃখ তাঁহার একটী স্বরূপ এবং সেই জন্যই জীবে দুঃখ আসিয়াছে। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণকে সৃষ্টি কালে ব্রহ্মের দুঃখ সম্বন্ধে ধারণা দিবার জন্যই। সৃষ্টির পূর্ব্বে ও মহাপ্রলয়ের পরে তাঁহাতে কি প্রকারের দুঃখ বর্ত্তমান থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য নহে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাতে অনন্ত দুঃখ নিত্যই বর্ত্তমান।* সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহাতে দুঃখ ছিল এবং মহাপ্রলয়ের পরেও উহা তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিবে। ব্রহ্মে অনন্ত দুঃখ আছে বলিয়াই তিনি জীব দুঃখে দুঃখিত। যদি তাঁহাতে নিত্যই দুঃখ না থাকিত, তবে প্রেম তাঁহাতে দুঃখের প্রকাশ সম্পাদন করিতে পারিত না। Like alone can act upon like. তাঁহাতে দুঃখ আছে বলিয়াই প্রেম তাঁহাতে দুঃখের প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। জীবে দোষপাশ প্রভৃতি জাত গুণ এবং, ভক্তি নির্ভরতা প্রভৃতি মিশ্র গুণ বর্ত্তমান, কিন্তু ব্রহ্মে উহাদের কিছুই নাই। সুতরাং প্রেম তাঁহাতে জাত বা মিশ্র গুণ উৎপাদন করিতে পারে না। ব্রহ্মে যাহা আছে, তাহাই তাঁহাতে প্রকাশিত হইতে পারে। যাহা নাই, তাহা তাঁহাতে আসিতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মে দুঃখ আছে বলিয়াই তাঁহাতে উহার প্রকাশ হয়, যদি উহা তাঁহাতে না থাকিত, তবে তাহা তাঁহাতে প্রকাশও হইত না। আমরা ইতিপূর্ব্বে নানারূপ যুক্তিযুক্ত ভাবে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে দুঃখ বর্ত্তমান।

* পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার অনন্ত গুণ বা স্বরূপের প্রত্যেকটীই নিত্য সত্য। তাঁহাতে কিছুই সাময়িক ভাবে আসে না বা তাঁহা হইতে কিছুই সাময়িকভাবে যায় না।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রেম ছিল ও উঁহাদের ক্রিয়াও ছিল—তিনি নিজে নিজেকে জানিতেন এবং নিজে নিজেকে প্রেম করিতেন। যখন তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রেম ছিল, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহাতে সুখও বর্ত্তমান ছিল। সুখ জ্ঞান ও প্রেমের নিত্য সহচর। আবার সুখ একক থাকিতে পারে না। উঁহা উঁহার বিরুদ্ধ গুণ দুঃখের সহিত অনন্ত মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান থাকিবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের একত্ব তাঁহাতে সম্পাদিত হইয়াছে এবং এইরূপ অনন্ত একত্বের একত্বই তাঁহার পূর্ণস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে যখন সুখ নিত্য বর্ত্তমান, তখন দুঃখও তাঁহাতে বর্ত্তমান, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত অনুমান এবং আপ্ত বাক্যই প্রমাণ মধ্যে গণ্য। সাধারণের পক্ষে তাঁহার স্বরূপের সত্য ধারণা (Realisation) অসম্ভব। একমাত্র ব্রহ্ম দ্রষ্টা ঋষিই তাহা লাভ করিতে পারেন। সাধারণে ব্রহ্মের প্রেম সম্বন্ধেও প্রকৃত ধারণা করিতে পারে না। আমরা বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে তাঁহারাও ব্রহ্মের প্রেমের বিরুদ্ধে নৈসর্গিক দুর্ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এইরূপ ভীষণ ভাবের অবস্থা আসিতে পারে না * এই জন্যই পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

"এত কাঁদাইছ মোরে, ওরে আমার প্রেমপোরা,
তোর প্রেম তবে কে বুঝ্‌বে, বুঝিল না এই ধরা।"

ব্রহ্মের জ্ঞানের বিরুদ্ধেও কেহ কেহ কথা বলেন। তাহারা বলেন যে জগৎরচনা ও পরিচালনায় ত্রুটী বর্ত্তমান। যাহা হউক্, ব্রহ্মের কোন কোন গুণেরই সত্যধারণা সাধারণ মানব লাভ করিতে পারে না। আমরা যাহা দেখি, তাহা বিকৃত ভাবেই দেখি। আমাদের প্রেম বিশুদ্ধ প্রেম নহে, আমাদের জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। সুতরাং

* জগতে যাহাই হইতেছে, তাহাই যে মঙ্গলের জন্যই ঘটিতেছে, সেই সম্বন্ধে ' ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের দুঃখ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা নাই বলিয়াই তাঁহাতে দুঃখ নাই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আবারও বলি যে আমাদের স্থূল, স্থূলতম এবং বিকৃত দুঃখের ধারণা দ্বারা আমরা ব্রহ্মের দুঃখ বুঝিতে যাই বলিয়াই তাঁহাতে যে দুঃখ আছে, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।

এত সময় আমরা পরমেশ্বরে দুঃখ আছে কিনা, এই আলোচনা করিলাম। এরূপ মতও আছে, যাহাতে ব্রহ্মকে একমাত্র সত্যস্বরূপ বলা হয়। শঙ্কর মতের উদ্দেশ্যও যে তাহাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সেই মতে জীবের দুঃখও নাই, সুখও নাই। উহারা মায়ার খেলা মাত্র। জীবে যদি সুখ ও দুঃখ কিছুই না থাকে, তবে ব্রহ্মেও তাহা থাকিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জীবে যে সকল গুণ আছে, তাহা ব্রহ্মেও বর্ত্তমান। তবে তাঁহাতে উঁহারা পূর্ণ, অনন্ত, অবিকৃত, বিশুদ্ধ ও কারণাকারে বর্ত্তমান। মায়াবাদে জ্ঞানকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়। যে স্থানে জ্ঞান, সেই স্থানেই আনন্দ অবশ্যম্ভাবী। সুখ, শান্তি, আনন্দ একই অর্থ প্রকাশক শব্দ। কেহ কেহ সুখ শব্দকে পার্থিব সুখ অর্থে মাত্র ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ তিনটী শব্দই একার্থসূচক। সুতরাং জ্ঞান ব্রহ্মে থাকিলে তাঁহাতে সুখও বর্ত্তমান। কথিত আছে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সর্ব্বপাপ, সর্ব্বশাপ, সর্ব্বদোষপাশ, এমনকি সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" (গীতা—৪।৩৮) (জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মে পরিণমন করে)। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক—২।২।৮)। বঙ্গানুবাদ ঃ—সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয় গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা জনিত বিষয় বাসনা ভেদ হয়, 'সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কর্ম্ম সমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রতিরোধক সকাম কর্ম্মসমূহ) ক্ষয় হয়। (তত্ত্বভূষণ)। তত্ত্বজ্ঞান যে সুখলাভের উৎকৃষ্ট উপায় তাহা

বলিতে যাইয়া পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—"আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য-নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যতেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বিদ্যমান থাকিলেও জড়াত্মবোধ নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখ লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।" (তত্ত্বজ্ঞান—সাধনা)।

যখন উপরোক্ত উক্তি সমূহ সত্য, তখন সেই সাধকের অসীম সুখলাভ অনিবার্য্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা, কিন্তু দেহযোগে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। যদি তাহাই হয়, তবে অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ যিনি, তাঁহাতে যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত সুখ নিত্য বর্ত্তমান, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে সাধারণে ইহা বুঝিতে পারেন যে আলোকে সুখ এবং অন্ধকারে দুঃখ।

উপনিষদ্ হইতে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে ব্রহ্মের কয়েকটী স্বরূপ কথিত হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিব-মদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। রসোবৈ সঃ।

উক্ত গুণ সমূহের সাধক যে কোন গুণের সাধনায় পরম পিতার সহিত একত্ব লাভ করিবেন, তাঁহার পক্ষে অসীম আনন্দ (সুখ) লাভ অনিবার্য্য। সুতরাং ঐরূপ অনন্ত গুণের আধার যিনি, তাঁহাতেও অনন্ত আনন্দ বা সুবিমল সুখ নিত্য বর্ত্তমান।

কেহ কেহ আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। উপনিষদেও "আনন্দরূপমমৃতম্" মন্ত্র বর্ত্তমান। ব্রহ্মকে সুখ স্বরূপও বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪।১০।৪ মন্ত্রে "কং ব্রহ্ম" (সুখ ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে। "যো বৈঃ ভূমা তৎসুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।" ইহাও সেই উপনিষদেরই উক্তি। স্বয়ং ব্রহ্মই ত ভূমা, সুতরাং তিনি সুখস্বরূপ। ব্রহ্মকে শান্তম্ বলা হইয়াছে। যিনি নিত্য

শান্ত বা নিত্য শান্তি নিকেতন, তাঁহাতে যে অনন্ত সুখ বর্ত্তমান, তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার মায়াবাদ প্রেমকে ব্রহ্মের স্বরূপ বা গুণ বলিয়াই স্বীকার করেন না, যদিও উপনিষদে ব্রহ্মকে "রসোবৈ সঃ" বলা হইয়াছে। আমরা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে প্রেম আছে। সুতরাং তিনি প্রেমস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে সুখ বর্ত্তমান। প্রেমে যে সুখ লাভ হয়. তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মসূত্রের "সুখ বিশিষ্টাভিধানাদেব চ" (১।২।১৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে দুইবার "সুখ বিশিষ্ট" ও একবার সুখাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য দৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি ব্রহ্মকে সুখ স্বরূপ বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে সুখ স্বরূপ এই সিদ্ধান্ত সত্য।

আমাদের মতে ব্রহ্মে অনন্ত সুখের এবং অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ হইয়াছে। আমাদের মুক্তি দুঃখ নিরসনের জন্য নহে, কিন্তু অপূর্ণের পক্ষে পূর্ণতালাভের জন্যই। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই তাহা। সৃষ্টি লীলা ব্রহ্মের স্বগুণপরীক্ষা। উহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহাই জীবাত্মা করিবেন। সুখ যেমন জীবাত্মার নিত্য সাথী. দুঃখও সেইরূপ তাঁহার নিত্য সাথী। একটী কথা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে প্রত্যেকেরই ব্রহ্মের সহিত সুখের এবং দুঃখের একত্ব লাভ করিতে হইবে। আবার সেই অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখেরও একত্ব লাভ করিতে হইবে। সেই স্বরূপ বাদ দিয়া কেহই অনন্ত একত্বের একত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ব্রহ্মের অনন্ত দুঃখ লাভ করিবার জন্যও সাধকের সাধনা করিতে হইবে এবং তৎপর তাঁহার অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের একত্ব লাভ করিতে হইবে।

অতএব আমরা উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় পাইলাম যে অনন্ত ও নিত্য গুণপূর্ণ প্রেমময় পিতার অনন্ত সুখের সহিত অনন্ত দুঃখ মিশ্রিত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে

যেমন অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তিনি তেমনি সুখ এবং দুঃখের অতীতও বটেন। কারণ, তিনি তাঁহার অনন্ত স্বাধীনতা জন্য অনন্ত গুণাতীত ওঁং। ব্রহ্মের অনন্ত গুণাতীতত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। উহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি যেমন অনন্ত-গুণ-বিভূষিত, তেমনি তিনি অনন্ত গুণাতীত। অর্থাৎ তিনিই একাধারে সগুণ ব্রহ্ম এবং গুণাতীত (প্রচলিত সাধারণ ভাষায় নির্গুণ) ব্রহ্ম। ইহাতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাতেই দ্বিবিধ সত্তাত্মক বিরুদ্ধ গুণরাশির একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অনন্ত ন্যায়বান পরমপিতা পাপীর শাস্তিদাতা, আবার অনন্ত করুণাময় পরমপি শা পাপীর পাপ-নাশন। অর্থাৎ তাঁহাতেই অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত করুণার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। অর্থাৎ অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত করুণার একত্বে যে স্বরূপ হয়, তাহাই তাঁহার একতম স্বরূপ। সেইরূপ ব্রহ্ম আমাদের কেবল পিতাও নহেন, আবার কেবল মাতাও নহেন। কিন্তু অনন্ত পিতৃত্ব এবং অনন্ত মাতৃত্বের একত্বই তাঁহার একতম স্বরূপ। বিপরীত গুণদ্বয়ের একত্বকে একটী স্বরূপ ধরিলে সেই রূপ অনন্ত একত্বের একত্বই তাঁহার প্রকৃত পূর্ণ স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি অনন্ত কোমল গুণের এবং অনন্ত কঠোর গুণের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বক্তব্য এই যে পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যে কোমল ও কঠোর গুণ বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মাতৃহৃদয়ে কোমল গুণের অত্যাধিক্য, তাই তাঁহাতে কঠোর গুণের অল্প পরিচয়ই পাওয়া যায়। অপর দিকে পিতৃহৃদয়ে কঠোর গুণের আধিক্য আছে বটে, কিন্তু তাঁহাতেও কোমল গুণ—স্নেহ মমতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সন্তান সম্বন্ধে পিতাতে কোমল ও কঠোর গুণের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পিতা একাধারে স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী, শিক্ষাদাতা গুরু, পরম হিতৈষি বন্ধু, শাসনকর্ত্তা প্রভু, নানাভাবে সাহায্যকারী সুহৃদ, অপ-

রাধের ন্যায়বান দণ্ডদাতা, আবার সন্তানের সর্ব্বাপরাধ ক্ষমাকারী ক্ষমাশীল পিতা এবং সন্তানের অক্লান্ত সেবক। কে এরূপ নিজের সুখ সুবিধা সমুদায় চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ সাদরে বরণ করিয়া দিবানিশি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া সন্তানের মঙ্গল তরে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন? কে নিজের মুখের গ্রাস সন্তানকে দান করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন? কে অর্থাভাব জন্য সন্তান-দিগের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজে অর্দ্ধ উপবাসী থাকিয়া অথবা পোষণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ না করিয়া মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করেন? কে এরূপ সন্তানের হিতের জন্য সংসারে বিচরণ করিয়া নানাবিধ লজ্জা, অপমান, জ্বালা, যন্ত্রনা ভোগ করিয়াও সন্তানের অহিত কামনা করেন না? কে সন্তানের কঠিন-রোগ-সংবাদ শ্রবণে বিদেশ হইতে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সন্তানের সেবা শুশ্রূ-ষায় নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করেন? এইরূপ দুঃখ কষ্টে লালিত পালিত সন্তানগণও যখন বয়স্ক অবস্থায় অবাধ্য হইয়া বিরক্তি উৎপাদন করে, তখন কে এই সন্তানদিগকে ক্ষমা করেন এবং কাহার হৃদয় হইতে তাহারা কখনই দূরে নিক্ষিপ্ত হয় না? তিনি জন্মদাতা পিতাই। আমাদের মনে হয় যে অনন্ত স্নেহময় পরমপিতা তাঁহারই অতুলনীয় উচ্চতম আদর্শের ক্ষুদ্রাকারে সংপিতাগণের স্নেহপূর্ণ হৃদয় গঠন করেন।

ধন্য অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! ধন্য তোমার অপার স্নেহের আদর্শ! ধন্য তোমার অপরিসীম স্নেহের অমূল্য দান! তোমার অপূর্ব্ব স্নেহময় পিতৃত্ব ও আমাদের একান্ত অন্তর্গত সন্তানত্ব চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ধন্য প্রেমময়! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা! তুমি কত অসংখ্য ভাবে যে নিজ সন্তানদিগকে ভালবাস, তাহা কে নির্ণয় করিবে? গৃহে গৃহে যে প্রেমলীলা আমরা সন্দর্শন করিতেছি, তাহা তোমারই অনন্ত প্রেমলীলার একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

ধন্য আমার অপার স্নেহময় পিতৃদেব! তোমার অপার স্নেহ গুণে তোমার সন্তানদিগকে নীরবে তুমি কতই ভালবাসিতে এবং এখন স্বর্গধামে থাকিয়া ভালবাসিতেছ! আমাদের জন্য কতই দুঃখ কষ্ট

না তুমি ভোগ করিয়া গিয়াছ! হায়! হায়! সেই অপরিসীম স্নেহের জন্যই অবশেষে তুমি পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে। হে সাধুতার আদর্শ! হে সত্যের একনিষ্ঠ সেবক! হে অক্লান্ত নীরব কর্ম্মী! হে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা! হে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ কৃতজ্ঞতা! হে তরু-পরাজয়কারিণী সহিষ্ণুতা! হে ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মহাপুরুষ! হে আমার পরমারাধ্য, পরম পূজনীয় পিতৃদেব! হে আমার পরমভক্তিভাজন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমি বারংবার ভক্তিভরে প্রণত হই। হে উদ্বেলতা-শূন্যা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীবৎ সুগভীর স্নেহে স্নেহময় পিতঃ! চির অপরাধী সন্তানের সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি চিরপ্রসন্ন হও। তোমার এই দীন সন্তানের এই কাতর প্রার্থনা তাহার এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি নিজ স্নেহগুণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ কর।

> পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়তে পরদেবতা॥

বহুসাধকগণ ব্রহ্মকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। যথা ঋগ্বেদে প্রার্থনা মন্ত্রে আছে:—"ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি" ইতি। খ্রীষ্টদেব পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত স্তোত্রে আছে:—"অগতির গতি পিতা অধম তারণ।" তাঁহার গ্রন্থসমূহে স্থানে স্থানে পরমেশ্বরকে পরমপিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রে মাতৃভাবের সাধনার উপদেশ আছে। তাহার বিশেষ কারণ এই যে তান্ত্রিকেরা শক্তি মন্ত্রের উপাসক। শক্তি পিতা হইতে মাতাতে অধিকতরা। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মের স্থলে স্থানে স্থানে "পুরুষ", "দেব" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের যত-দূর জানা আছে, প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদে ব্রহ্মের স্থলে "মাতা" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আসুন, আমরা সেই অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণে যিনি নিত্য বিভূষিত, সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতাকে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মকে, সেই একমাত্র ওঁ কে

হৃদয়ের ঐকান্তিকী ভক্তিভরে নমস্কার করি।

অবশেষে আমরা বলিতে পারি যে প্রোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁ। তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান বলিয়াই জীবে এবং জগতে আমরা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। অর্থাৎ স্রষ্টায় যাহা আছে, তাহাই বিকৃত ভাবে, অংশরূপ বা আভাসে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ওঁ অনির্ব্বাচ্যং অনির্দ্ধার্য্যং অচিন্ত্যং ওঁং

ওঁ

সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। সতপোঽতপ্যত। সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

ইচ্ছাশক্তি

সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আরও একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া পরমপিতার স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে লিখিত হইয়াছে যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা প্রেমলীলা ইচ্ছা করিলেন এবং সেই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাই তাঁহার একতম স্বরূপ অব্যক্ত যোগে জড় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্যতীত আমাদের দ্বারা প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোনও সৃষ্টি সম্পাদিত হয় না। সুতরাং বিশ্বেরও উপাদান ও নিমিত্ত কারণ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার সুমহতী ইচ্ছাশক্তিই এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই ইহার উপাদান কারণ। এই সেই কারণদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পরম প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোম উৎপাদন করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কিরূপে অব্যক্ত স্বরূপ ব্যোমের উৎপত্তি সম্ভব হইল। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পরমেশ্বরের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান সাধারণ মানব তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে যে সকল অনির্বর্চনীয় ও অজ্ঞাত-কারণ কার্য্য সমূহ সম্পাদন করে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন পরম পুরুষের ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে যে ব্যোমের উৎপত্তি হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। "ইচ্ছাশক্তির বলিষ্ঠাবস্থায় নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইচ্ছাশক্তির প্রশান্তাবস্থায় সে কার্য্য সাধন করা বহু সংখ্যক বলিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেও দুষ্কর হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যাবস্থায়

সামান্য একজনের উক্তি অনুসারে সুস্থকায় অপর মানবের দেহেও ইচ্ছানুগত ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে।" * বর্ত্তমানে Hypnotism প্রচলিত হইয়াছে। ইহাও ইচ্ছাশক্তিরই কার্য্য। যাহারা বাকসিদ্ধি বিষয়ে বিশ্বাসী, তাহারা জানেন যে ঐ সকল ক্রিয়ার মূলে ইচ্ছাশক্তি প্রবল ভাবে কার্য্য করে। যিনি ইচ্ছাশক্তির যত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে কার্য্যে সফলতা লাভ করেন। যোগীগণ তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তিকে উন্নত করিয়া যে বহু অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। সুতরাং অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তাঁহারই একতম স্বরূপ অব্যক্ত হইতে যে ব্যোমের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি কেহ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, সেই জন্য এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, তেমনি পরম পিতার মধ্যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জড় জগতের বীজ নিহিত ছিল। সৃষ্টিতে সেই বীজ বিকশিত হইয়া জগৎ আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। এই জগতের আকার, প্রকার, গুণরাশি প্রভৃতি সকলই উক্ত বীজের মধ্যেই ছিল—সূক্ষ্মাকারে ছিল, ব্যক্ত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। আবার কেহ কেহ বলেন যে উক্ত প্রকার সূক্ষ্ম জগদ্বীজ হইতে যে জগতের বিকাশ হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহার জন্য ব্রহ্মের ইচ্ছার কোনই প্রয়োজন হয় না। তাঁহার স্বভাববশতঃই উহা হইয়া থাকে। ইহা যে সম্ভব নহে, তাহা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি", "কল্পবাদ", "মায়াবাদ" প্রভৃতি অংশ সমূহ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে বীজই সৃষ্টির কারণ। তাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছার নামোল্লেখ মাত্র করেন। ইহারাও প্রায় প্রথমোক্ত পন্থার অনুবর্ত্তন করেন। এই সকল মত যে সত্য নহে, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

এবিষয়ের সমালোচনা করিতে প্রথমেই আমাদিগের বুঝিতে

---

* তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

হইবে যে যাহাকে সাধারণে চলিত ভাষায় বৃক্ষ বা লতার বীজ বলে, তাহা বিচি নামে অভিহিত করিলেই ভাল হয়। কারণ, উহা প্রকৃত পক্ষে বীজ নহে। বহু সংখ্যক উদ্ভিদের পরাগকেশর রেণু অন্য উদ্ভিদের গর্ভকেশরে অবস্থিত তরল পদার্থে পতিত হইয়া বীজ কোষের উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন করে ও উভয় যোগে পুষ্পে ফল হয় ও ফলের ভিতরে যে বিচি থাকে, তাহা রোপন করিলে বৃক্ষ হয়। এই বিচিকে সাধারণে বীজ বলে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরাগ কেশর রেণুই বীজ এবং গর্ভকেশরের তরল পদার্থই প্রকৃতি স্থানীয়। অর্থাৎ তথাকথিত বীজ উৎপাদনের জন্য দুইটি পদার্থের প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন যে ভূমিতে বীজ উপ্ত হয়, সেই ভূমির গুণ ও শক্তিরাশি, জল, বায়ু, ও উত্তাপ বৃক্ষের নানাভাব প্রদানের সাহায্য করে। বৃক্ষ ও লতার কথা বলা হইল। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবজগতেও ঐ একই নিয়মে কার্য্য চলিতেছে। যথা পিতার শুক্র ও মাতার শোণিত। এই উভয় মিলিত না হইলে সন্তান উৎপত্তি হয় না। জগতে স্বাভাবিক নিয়মে দেখা যায় এবং মানব প্রকৃতির নিয়মে চেষ্টা করিলেও দেখিতে পারেন যে মাতা পিতা বিভিন্ন জাতীয় হইলে তাহাদের সন্তান পিতা বা মাতার জাতীয় না হইয়া নূতন এক প্রকারের জীব হয়। যথা অশ্ব ও গর্দ্দভী মিলিত হইলে অশ্বতর (খচ্চর) নামক জন্তু উৎপন্ন হয়। অবশ্য তাহাতে মাতা পিতার জাতীয় গুণ কিছু কিছু থাকিবে, কিন্তু নূতন গুণরাশিও হইবে। সেইরূপ কোন কোন লেবু ফুলের পরাগ কেশর রেণু যদি অন্য কোন প্রকারের লেবু ফুলের গর্ভকেশরের তরল পদার্থে পতিত হয়, তবে তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা যে বৃক্ষের ফল, উহার অন্যান্য ফল অপেক্ষা পৃথক্ হইবে। নূতন ফলের বিচি দ্বারা নূতন প্রকারের লেবুর বৃক্ষ সৃষ্ট হইবে, যাহার ফল প্রথমোক্ত লেবু বৃক্ষদ্বয়ের ফল হইতে কোন কোন অংশে পৃথক হইবে। সার প্রভৃতির দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং বহু বহু প্রণালী অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদের যে কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। উহার বিস্তা-

রিত বিবরণ পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বীজই সন্তান উৎপাদনের এক-মাত্র কারণ নহে। পিতার শুক্রের সহিত মাতার শোণিত মিলিত না হইলে প্রথমোক্ত পদার্থ একান্তই বৃথা। উহা স্বয়ং স্বাধীনভাবে কখনই সন্তানোৎপাদনে ও তাহার দেহ প্রস্তুত করিতে সমর্থ নহে। এস্থলে Bible এর Parable of Sowers সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যে বীজ পাথরের উপর পড়িল, তাহা বৃথাই গেল। কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইল। পশু ও বৃক্ষ জগতে cross breeding এর কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, এই ব্যাপারটী মানুষের অজ্ঞাতে প্রকৃতিতে যে কত প্রকারের জন্তু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির উৎপাদনের কারণ হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

এখন মানব সম্বন্ধে বলি। চিন্তা করিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যই এক একটি নূতন প্রকারের জীব। একজনের সহিত অন্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। সুতরাং যতই পৃথিবীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, বৈচিত্র্যও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি? এই বৈচিত্র্যের একটি প্রধান কারণ Breeding. মানব জগতে অবশ্য Cross breeding নাই। কিন্তু প্রত্যেক নর নারীই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াও যখন দেহ মনের কোন কোন অংশে ভিন্ন ভিন্ন গুণ-সম্পন্ন, তখন তাহাদের মিলনে নূতন দেহ-সম্পন্ন সন্তান উৎপন্ন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স্থূল ভাবে দেখিলে সাধারণে বলিবে "মাতা পিতাও মানুষ, সন্তান ও মানুষ, এমন কি ভিন্নতা আছে?" কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেহের অনেক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতা আরও পরিস্ফুট হয়, যখন মাতাপিতা ভিন্ন দেশবাসী হন। যথা, পিতা যদি বাঙ্গালী ও মাতা যদি ইংরেজ হন, অথবা যদি ইহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ পিতা ইংরেজ ও মাতা বাঙ্গালী হন, তবে তাহাদের সন্তানের দেহ মনের মধ্যে সংমিশ্রণ জন্য কিছু কিছু নূতন দেখা যায়। মনুষ্যদেহেরও নানা জাতি আছে। যথা—আর্য্য, মঙ্গলীয়, ককেশিয় ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতীয় দেহ সম্পন্ন নর নারীর মিলনেও উক্তরূপ

কোন কোন অংশে ভিন্নরূপ-গুণ-সম্পন্ন দেহধারী মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। যে দেশেই বহু জাতীয় দেহ-সম্পন্ন নর নারীর বাস হইয়াছে, সেই স্থানেই এইরূপ বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে সন্তান পিতার রূপ গুণ অবিকল প্রাপ্ত হয় না। সন্তানের দেহ পিতার শুক্রের উপর যেমন নির্ভর করে, মাতার শোণিতের উপরও তেমনিই নির্ভর করে। তাহাদের মিলনে উৎপন্ন সন্তান তাহাদের প্রত্যেকের হইতে কোন কোন অংশে পৃথক রূপ ধারণ করে। আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে সন্তান দেহে মাতার অধিকার অধিকতর। কারণ তিনি সন্তানকে ৯ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ ও পোষণ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে শিশুরূপে প্রসব করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেও মাতৃ দুগ্ধই তাহার জীবন ধারণ করিবার প্রধান অবলম্বন হয়। সুতরাং মাতার দেহের প্রভাব সন্তান দেহের উপর অধিকতর কার্য্য করে। এইজন্য পিতা হইতে মাতা অধিকতরা ভক্তির পাত্রী। পিতার প্রতি ভক্তির মাত্রা হইতে মাতার প্রতি ভক্তির মাত্রা দশগুণ অধিকতর বলিয়া যে কোন কোন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। Smile's Essay on Influence of mothers পাঠ করিলে পাঠক এই ভাবটি অধিকভাবে হৃদঙ্গম করিতে পারিবেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে Heredity মানব স্বভাবের একমাত্র কারণ নহে, একটী প্রধান কারণ বটে। উহা ভিন্ন এবিষয়ে অন্যান্য অনেক প্রধান কারণ বর্ত্তমান। পাঠক এই সম্পর্কে "জন্মান্তরবাদ" অংশ পাঠ করিবেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, মূলে সৃষ্টিতেও ঠিক একইরূপে কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। পরমপিতার অন্যান্য অনন্ত স্বরূপের ন্যায় অব্যক্ত স্বরূপও নিত্য, সুতরাং তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু উহা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি সংঘটন করিতে সমর্থ হন নাই। যখন পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি সেই অব্যক্ত স্বরূপের সহিত মিলিত হইল, তখনই সৃষ্টির সূচনা হইল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পরমপিতার সৃষ্টিবিষয়িনী

প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তিই সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি স্বরূপা হইলেন। সৃষ্টিকার্য্যে দেখিয়াছি যে মাতার শক্তি পিতার শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। সুতরাং যদি বলা যায় যে পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টিবীজ স্বরূপ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের শক্তি অপেক্ষা সৃষ্টিকার্য্যে তেমনিই অধিক পরিমাণে বলবত্তরা, তাহা হইলে সেই উক্তি ভুল হইবে বলিয়া মনে করি না। পরমপিতার অব্যক্তস্বরূপ ও ইচ্ছাশক্তি উভয় মিলিত হইয়া যাহা হইল অর্থাৎ জড় জগৎ, তাহা ঠিক বীজের ন্যায়ই গুণান্বিত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা সেই বীজকে নিয়মিত করিয়া সৃষ্টির বর্ত্তমান আকার, প্রকার ও গুণরাশি দান করিলেন। অনেকে বীজের শক্তির উপরই অধিক জোড় দিয়া থাকেন, ইচ্ছার নামোল্লেখ মাত্র করেন। ইচ্ছার যে অসীম শক্তি, ইচ্ছার যে বিশেষত্ব, ইচ্ছা যে বীজকে বহুবিধ ভাবে নূতন আকার প্রকার দিতে পারে, তাহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। ইচ্ছাশক্তি যদি নামমাত্র ব্যাপারই হইত, তবে জীব জগতে মাতা নামে মাত্র আবশ্যক হইত। পিতার শুক্রই সন্তানোৎপাদন, গর্ভধারণ ও পোষণের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। কার্য্য জগতে মাতার কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। সন্তান সম্পূর্ণ রূপে, রূপে ও গুণে পিতার মতই হইত অর্থাৎ পিতা পুত্রের মধ্যে দেহের কোনও প্রকার ভেদ থাকিত না। কিন্তু জগতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতার কার্য্যকারিতা যে কত অধিক, তাহা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বসাধারণের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য।

পৃথিবীতে মানবের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কত কার্য্যই না হইতেছে? এই ইচ্ছা বলে মানুষ কত দুঃসাধ্য ব্যাপার সহজ করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের কর্ম্মফলে অর্থাৎ ইচ্ছায় পৃথিবী বর্ব্বর অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় আসিয়াছে। মানুষ আরও কত অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিবে তাহার আভাস এখনই আমরা পাইতেছি। অথচ বর্ব্বর অবস্থায়ও পৃথিবীতে যে ভূত সকল ছিল, এখনও তাহাই আছে। মানুষ কেবল ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা উহাদের (ভূতসমূহের) শক্তি করায়ত্ত

করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতেছে। পার্থিব উন্নতিতেই যে কেবল ইচ্ছাশক্তির খেলা দেখিতেছি, তাহা নহে, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলেও যে ইচ্ছাশক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহা সুনিশ্চিত। ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন সাধন, ভজন, ধ্যান, ধারণা অসম্ভব। অতএব ইচ্ছাশক্তি তুচ্ছ খেলার জিনিষ নহে। ইহা সামান্যকে অত্যাশ্চর্য্যরূপে পরিণত করিতে পারে, অচিন্ত্য ও স্বপ্নাতীত ব্যাপার সংঘটন করাইতে পারে। মানুষের ইচ্ছাই যখন এত বড় শক্তি ধারণ করে, তখন পরম পিতার ইচ্ছা যে অনন্ত গুণে শক্তিশালিনী, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তিনি যে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে বীজ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অসীম শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগৎকে বর্ত্তমান আকার প্রকার ও গুণরাশি সম্পন্না করিয়াছেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান এবং তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই সৃষ্টির মূলে।

এখন নিম্নলিখিত প্রশ্ন হইতে পারে। পরব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব বটে। জগতেও দেখা যায় যে সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক পদার্থেই সাকার এবং নিরাকার (ক)। কিন্তু জড় পদার্থে সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব ভিন্ন অন্য গুণরাশিও বিদ্যমান। সেই সকল গুণ কোথায় হইতে আসিল? এই সমস্ত গুণ অব্যক্তের মধ্যে থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা অনন্ত নিরাকার-সাকার মাত্র। ইহার উত্তর নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষের ইচ্ছায় না হইতে পারে এমন ব্যাপার নাই। পূর্ব্বে আরও উল্লেখ করা গিয়াছে যে মানুষ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিরোগীকে রোগযুক্ত ও রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারে। এস্থলে বাক্ সিদ্ধির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাক্সিদ্ধ ব্যক্তি অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছার সহিত যদি কাহাকেও অভিসম্পাত দেন, তবে অভিশপ্ত ব্যক্তি সেই বাক্যানুযায়ী

(ক) "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্রষ্টব্য

ফল ভোগ করেন। আরও একটু অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বাক্‌সিদ্ধ ব্যক্তি অভিসম্পাত দানকালে ক্রোধ বা হিংসা বা উভয় দ্বারা অভিভূত হন এবং তাহা তাঁহার বলবতী ইচ্ছার দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে সংক্রমণ করেন। ক্রোধ বা হিংসার স্বভাব অগ্নির ন্যায়।* সুতরাং ক্রোধ বা হিংসানল দ্বিতীয় ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া অভিশাপ দাতার ইচ্ছানুযায়ী দহন কার্য্য সম্পাদন করে। বিপরীত ভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পারি যে বাক্‌সিদ্ধ ব্যক্তি যদি তাঁহার আন্তরিক বলবতী ইচ্ছার সহিত কাহা-কেও বর প্রদান করেন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই বরানুসারে কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বরদাতার শুভ কামনা তাঁহার বলবতী ইচ্ছা দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় ও শুভভাবে উহার কার্য্য সম্পাদন করে। নিরাকার ভাব একে অন্যে কি প্রকারে প্রেরণ করিতে পারে, তাহা বুঝিতে হইলে Radio Transmission এর কথা চিন্তা করুন; তাহাতেও কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। Hypnotism এর ব্যাপার দেখিলেও ইচ্ছাশক্তির কার্য্য কিছু বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে বাক্‌সিদ্ধ ব্যক্তি অতি উন্নত। তিনি কেন ক্রোধ এবং হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অভিসম্পাত করিবেন? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে বাক্‌সিদ্ধি অত্যন্ত উন্নতির ফল নহে। নিরন্তর সত্য কথন ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই পার্থিব বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেই বাক্‌সিদ্ধ ব্যক্তির পতন হয় এবং বারংবার উহার অপব্যবহার করিলে আর তাহার বাক্‌সিদ্ধির অবস্থা থাকে না। যাহা হউক্, আমরা ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি যে কোনও ব্যক্তি বলবতী ইচ্ছা দ্বারা তাহার মনোভাব অন্যে প্রেরণ করিয়া সেই অনুসারে ফল ফলাইতে পারেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষ তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা

---

* ইহা একটু পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যখন অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হয়, তখন তাহার যে কেবল জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার অন্যান্য গুণ ও দোষও যেন সাময়িক ভাবে থাকে না বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত রূপ গুণ সহ ব্যোম উৎপাদন করিয়াছেন ও তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সৃষ্টির বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে। ব্যোম জড় জগতের আদি, সুতরাং প্রকৃতি স্থানীয়। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উহাকে এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে তাঁহারই সেই একই ইচ্ছায় তাহা (ব্যোম) হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য ভূতসকল এবং অবশেষে বিশাল সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

এই ভাবটী আরও পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ করা যাউক্। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে উপনিষদে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগৎ রচনার পূর্ব্বে আলোচনা করিলেন। এবিষয়ে "মায়াবাদ" অংশে আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাই জড় জগৎ। অব্যক্ত অনন্ত নিরাকারাত্ব এবং অনন্ত সাকারত্বের একত্ব এবং উহা অচেতন। জড় জগতে আকার এবং অচৈতন্য ভিন্ন যে সকল গুণ দেখা যায়, তাহার মূল অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য। সূর্য্যের জ্যোতিঃ, অপের রস, ক্ষিতির কাঠিন্য, ব্যোমের সর্ব্বব্যাপিত্ব, বায়ুর প্রাণবত্ত্বা ইত্যাদি কোথায় হইতে আসিল? তবে কি ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশি দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ গঠন করিয়াছেন? অর্থাৎ আমরা জড় জগতে যে সকল গুণ দেখিতেছি, উহারা তাঁহারই গুণরাশি মাত্র, অন্য কিছু নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণরাশিই বিকৃত হইয়া জড়ীয় গুণ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে? ইহার উত্তরে আমাদের "না" বলিতে হইবে। কারণ, যদি তাহাই হইত, তবেত তিনি সম্পূর্ণরূপে বিকৃতই হইলেন—সম্পূর্ণরূপে জগদাকারে পরিণতই হইলেন। তাহা যে হইতেই পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। জগৎ গঠনে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে যে আমরা জড় জগতে নানাগুণ দর্শন করি, তাহার কারণ এই যে বিশ্ব তিনি যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্পের সহিতই

স্থির করা হইয়াছিল। তাঁহার নিজ গুণরাশি সম্বন্ধীয় ভাব সমূহ (Ideas) তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপে তাঁহারই অনন্ত শক্তিসম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা তিনি বিকাশ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত জ্যোতিঃ আছে, তাঁহার অনন্ত সুন্দর রূপ আছে, সেইরূপ তিনি অনন্ত রসময় —অনন্ত প্রেমময় (রসোবৈসঃ), তিনি অনন্ত কঠোর, অনন্ত ন্যায়বান —জ্ঞানাদি অনন্ত কঠোর গুণের একমাত্র নিত্য ও অনন্ত আধার, তিনিই সর্ব্বব্যাপী বিভু এবং তিনিই প্রাণের প্রাণ—একমাত্র আত্মার আত্মা— তিনি ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী সরল করা যাউক্। শিল্পী যখন একটা পুরুষ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার মৃত্তিকাই সম্বল থাকে এবং তাহার হৃদয়ে থাকে ইচ্ছা এবং পুরুষের মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় ভাব সমূহ। তাই তিনি সেই মৃত্তিকায় তাহার কর্ম্ম (ইচ্ছা) দ্বারা পুরুষ মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হন। পুরুষ মূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান না থাকিলে তিনি সেইরূপ মূর্ত্তি কখনও গড়িতে পারিতেন না। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ এবং তিনি নিত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। সুতরাং তাঁহার অনন্ত গুণের সম্পূর্ণ জ্ঞানই তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহারই সুমহীয়সী ইচ্ছায় তাঁহারই গুণরাশি সম্বন্ধীয় ভাবসমূহের (deas-এর) সহযোগে তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জড় জগৎ সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিতে যাহা দেখা যায়, তাহার সকলই অব্যক্ত স্বরূপে তাঁহার ভাব সমূহের মূর্ত্ত প্রকাশ মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে Electrone, Protone প্রভৃতির সংখ্যা ও নানাবিধ সংস্থানের ফলে নানাবিধ পরমাণুর সৃষ্টি হয় এবং পরমাণুরও নানাবিধ সংস্থানে ক্রমশঃ এই জড় জগতের উৎপত্তি। সৃষ্টির মূলেও তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহারই সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে সেই জন্যই ক্রমশঃ এই জড় জগতের সম্ভব হইয়াছে। জগতের যেরূপ গুণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা সেইরূপ রচনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে এবং উহার মূলে বর্ত্তমান তাঁহার গুণ-

রাশির ভাব সমূহ, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এবং অব্যক্ত স্বরূপ।

বর্ত্তমানে দেখা যায় যে Electric Engineer তাহার কর্ম্ম দ্বারা একই Electricity দ্বারা Light energy, motion energy, heat energy প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ ও উঁহার শক্তিকে এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে উহাতে (অব্যক্তে) তাঁহার ভাব সমূহ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ ভাবে জগৎ গঠিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ উহাকে ব্রহ্মের আভাস বলেন। প্রকৃত পক্ষেও জড় জগতের রূপ গুণ যে তাঁহার গুণরাশির আভাস মাত্র, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে মহাদার্শনিক Plato এর world of ideas সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা একই তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। Professor Webber এর History of Philosophy হইতে Plato এর মত সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশেও দেখা যাইবে যে তিনি (Plato) উপরোক্ত মতই সমর্থন করেন। "The Ideas are the eternal patterns after which the things of sense are made ; the latter are the images, the imitations, the imperfect copies. The entire sensible world is nothing but a symbol, an allegory or a figure of speech. The meaning, the idea expressed by the thing alone concerns the philosopher. His interest in the sensible world is like our interest in the portrait of a friend of whose living presence we are deprived. The world of sense is the copy of the world of ideas ; and conversely the world of ideas resembles its image." অর্থাৎ ভাব সমূহ নিত্য আদর্শ, যাঁহার অনুকরণে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ সৃষ্ট। শেষোক্ত পদার্থ সমূহ

প্রথোমক্ত ভাব সমূহের প্রতিকৃতি, অনুকরণ বা অপূর্ণ নকল মাত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ একটী প্রতীক বা রূপক বর্ণনা মাত্র। পদার্থের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ উহা যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাই দার্শনিকের চিন্তার বিষয়। যাহার জীবন্ত বর্ত্তমানতা হইতে আমরা বঞ্চিত সেইরূপ বন্ধুর প্রতিকৃতির ন্যায় তাহার দার্শনিকের) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে অনুরাগ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ ভাবরাজ্যের নকল এবং বিপরীত ক্রমে ভাবরাজ্যের প্রতিকৃতি অর্থাৎ জড় জগৎ উহাতে (ভাবরাজ্যে) প্রতিফলিত হইয়াছে।

"অব্যক্তের পরিণাম" অংশে Plato-এর মত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আরও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে যে ব্রহ্ম তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে এই বিশ্ব গঠন করিয়াছেন।

এখন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে ব্রহ্মে সূর্য্যের জ্যোতিঃর ন্যায় জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, তিনি কি জলের ন্যায় রসবান, তিনি কি ক্ষিতির ন্যায় কঠিন ইত্যাদি। ইহার উত্তরে অবশ্যই আমাদের বলিতে হইবে যে ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে পরমপিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহারই ভাব সমূহের আভাস যোগে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার গুণরাশি হুবহু জগতে দেখিতে পাই না। যাহা দেখি, তাহা উহাদের আভাস মাত্র। আমরা অব্যক্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে যাইতেছি। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে সেই সম্বন্ধে আরও দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মের গুণরাশি তাঁহাতে নিত্য কারণাকারে বর্ত্তমান। তাঁহাতে কিছুই স্থূল বা সূক্ষ্মাকারে নাই। সৃষ্টি যতই অগ্রসর হইয়াছে, অর্থাৎ বিকারের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, পদার্থ সকল ততই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাকারে পরিণত হইয়াছে। (সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্)। বিকারই ইহার কারণ।

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতিঃ নহে। উপনিষদ্ বলেন :—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কঠ—৫/১৫)

বঙ্গানুবাদ ঃ—"সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা এবং বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না। এই অগ্নি কোথায়? অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্যোতিঃর নিকট সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নির জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হয়, যেমন দিবা দ্বিপ্রহরে খদ্যোতের জ্যোতিঃ থাকে না। সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনু-প্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। অর্থাৎ উহাদের জ্যোতিঃ তাঁহারই অতুলনীয় জ্যোতিঃর আভাস মাত্র।" ব্রহ্মেরই অনন্ত জ্ঞান জ্যোতিঃ, তাঁহাতেই অনন্ত আলোক, তাই সৃষ্টি সেই আভাসে রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে জ্ঞানালোক দান করিতে পারে। তিনিই অনন্ত প্রেমরসময় স্বামী, তাই জগতে রস প্রস্রবণ সর্ব্বদা প্রবাহিত। তাঁহাতে কঠোর গুণ ন্যায় প্রভৃতি আছে বলিয়াই জগতে কঠিন পদার্থ সমূহের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। ভক্ত কবি রজনীকান্ত গাহিয়াছেন ঃ—

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি, চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল,
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল, শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে তুমি চির শোভাময়, মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়, ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল।
নদী কহে তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ, বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন, প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল।
জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর, মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞান-তৃষাতুর,
সতী-প্রেমে জানি তুমি সুমধুর, বিভীষিকা কহে পাপী অসরল।
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান, ভক্ত কহে তুমি আনন্দ নিধান,
সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্য পান, প্রকাশে তোমারি করুণা অতল।

ইহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতের নানাবিধ পদার্থ ব্রহ্মের গুণাভাসে রচিত হইয়াছে। এস্থলে পরমর্ষি গুরুনাথ রচিত একটী কবিতার একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট, সুতরাং মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়।

"অনন্ত একত্ব হেন যে ধন স্বরূপে,

অপরূপ সেইরূপ অরূপ সরূপ।
যে রূপেরে রূপ তুমি ভাব মনে মনে,
সে রূপে অরূপ তিনি, বুঝিবে যতনে।
অরূপ যাহারে ভাব, সে রূপে সরূপ,
ইঁহার বর্ণনা তাই অতি অপরূপ।
তাই সাধু সদাশয় মহোদয়গণ
অনির্ব্বাচ্য বলি তাঁরে করে নিরুপণ।

এস্থলে আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ (৪/১)

বঙ্গানুবাদ :—যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভি প্রায়ঃ পরমাত্মা নানা-শক্তি যোগে অনেক বিষয়ের (রূপাদি বিষয়ের) সৃষ্টি করেন, যাহা হইতে সমুদায় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। (তত্ত্বভূষণ)।

এই স্থলে দেখা যায় যে এক অরূপ ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছা শক্তিযোগে বহু রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার হইতে আগমন করিয়াছে এবং তাঁহাতেই প্রতিগমন করিবে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে দেখা যায় যে ব্রহ্ম স্বয়ং অরূপ হইয়াও তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা বহু রূপবান পদার্থ সৃজন করিয়াছেন। এস্থলে ব্রহ্মকে যে অর্থে "অবর্ণ" বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম তাঁহার এক রূপকে বহু ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। - কঠ-৫/১২)।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাহা প্রয়োজনীয়, ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত শক্তিময়ী ইচ্ছাযোগে তাঁহারই গুণরাশির ভাব সমূহ (Ideas) তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপের উপর বর্ত্তাইয়াছেন এবং সেই জন্যই নানা রূপ গুণে বিভূষিত

জড় জগতের সম্ভব হইয়াছে। এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদের "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানও সেই তত্ত্ব স্বীকার করেন।

আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি ও ইতঃপর আরও দেখিব যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির মহিমা অনন্ত। সেই সুমহীয়সী শক্তিই নিমিত্ত কারণরূপে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকে জগতের বীজ ভাবে অবলম্বন করিয়া উহা এবং উহার শক্তিকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জগৎ এবং উহার গুণ ও শক্তিরাশি। এই মহীয়সী ইচ্ছাশক্তিই "মূলা প্রকৃতি. মহাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা ও জগজ্জননী প্রভৃতি নানা নামে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে অভিহিত হইয়া থাকেন। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের আদি কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে শিব ও শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন ; এবং প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মে লক্ষ্মী ও নারায়ণ, আর আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধা ও কৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষের আসনে অধ্যাসিত হইয়াছেন।" (ক)

অনন্ত গুণনিধি, অনন্ত প্রেমধাম পরমপিতা তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সুমহতী ইচ্ছাশক্তিই উঁহাকে (অব্যক্ত স্বরূপকে) এবং উঁহার শক্তিকে নানা নামরূপ, আকার প্রকার, নানাবিধ শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিয়া এই জড় জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই সুমহতী জ্ঞান-প্রেম-ময়ী ইচ্ছাই সেইরূপ ভাবে রচিত জড় পদার্থ দ্বারাই অসংখ্য প্রকার অসংখ্য জীবদেহ সুকৌশলে গঠন করিয়াছেন এবং তাহাতেই ব্রহ্ম আপনাকে বহু ভাবে ভাসমান করিয়াছেন। সুতরাং এক অর্থে জগৎ-রূপ কার্য্য পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেমলীলাই। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা" ও "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীব-দিগকে অসংখ্য প্রকারে লালন পালন করিতেছেন, সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীবকুলের ক্রমোন্নতির বিধান করিয়া সৃষ্টির সুমহান উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, আবার সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীব সমূহকে—ব্রহ্মের

(ক) তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা।

আত্মতুল্য সন্তানদিগকে ক্রমশঃ ব্রহ্মের অনন্ত গুণ দান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া সৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞের—মহোৎসবের—মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির মূল, তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই বিশ্ব স্থিতির মূল এবং সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই উহার লয়েরও মূল। সেই প্রেমময়ী সুতরাং মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ভিন্ন জগতে কিছুই হয় নাই, হইবেওনা এবং হইতেও পারে না। আমরা সেই অনন্ত শক্তিশালিনী প্রেমময়ী ইচ্ছার নিকট ঐকান্তিকী ভক্তিভরে বারংবার প্রণত হই, সেই মহামঙ্গলময়ী ইচ্ছাকে শিরোধার্য্য করি, সেই মহীয়সী ইচ্ছাকে পরম সমাদরে হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে—গভীরতম প্রদেশে সমুদায় প্রাণের সহিত বরণ করি। সেই পরম প্রেমময়ী ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউক, আমাদের জীবনে জীবনে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রতি-মুহূর্ত্তেই সেই একমাত্র প্রেমময়ী ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, আমরা ধন্য হই, কৃতকতার্থ হই। জনে জনের জীবনে, কীটানুকীট, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদি হইতে উন্নততম পরমর্ষি মহাপুরুষগণাবধি সর্ব্বজীবে, প্রতি অণু পরমাণুতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদিতে, বিরাট বিশ্বের সর্ব্বত্র অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেমময়ী ইচ্ছার একমাত্র মহাজয় দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞান-প্রেমানন্দ সাগরে নিত্য সুবিনিমগ্ন হই। ধন্য প্রেমময়! ধন্যা তোমার প্রেমময়ী ইচ্ছা! ধন্যা তোমার প্রেমময়ী লীলা! হে প্রেমময়! কবে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমরা ধন্য হইব, কৃতার্থ হইব, জন্ম সার্থক করিব, জীবন সফল করিব? হে অনন্ত প্রেমময় পিতঃ! হে অনন্ত দয়াময় পিতঃ! দীন সন্তানের প্রতি নিজ কৃপা গুণে চির প্রসন্ন হও।

এখন একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে আরও সরল করা যাউক্! আমরা দেখিতে পাই যে কোন বস্তু বিকৃত হইলে উহার রূপ গুণ কোন কোন অংশে (সময় সময় অধিকাংশে) পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা বুঝাইতে আমরা দুগ্ধের পরীক্ষা করিতে পারি। দুগ্ধ দধি হয়, দধি

ঘোল ও মাখম হয়, মাখম ঘৃত হয় এবং ঘৃতকে যত্নের সহিত বহুদিন রক্ষা করিলে উহা পুরাতন ঘৃত বলিয়া পরিচিত হয়। ইহার প্রত্যেক অবস্থা পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ প্রত্যেক বিকৃতিতে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রত্যেক অবস্থা উহার পূর্ব্বাবস্থা হইতে কোন কোন অংশে রূপে ও গুণে পৃথক্। আরও চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে দুগ্ধ সদ্যোজাত শিশু হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্তের পানীয় শ্রেণী ভুক্ত, কিন্তু পুরাতন ঘৃত খাদ্যই নহে, বরং উহা খাইলে শরীরে বিষ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে ভূত পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক বিকৃতিতে এক ভূত অন্য ভূত রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্যোম বায়ুতে, বায়ু তেজে, তেজঃ অপে এবং অপ্ ক্ষিতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গুণ ধারণ করে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক বিকৃতিতে পদার্থের রূপ ও গুণ পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে বিকৃতির স্তর যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই বিকৃত পদার্থের রূপ গুণ আদি পদার্থের রূপ গুণ হইতে ততোহধিক পার্থক্য ধারণ করিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম বিকৃতি ব্যোম। আর বর্ত্তমানে যে সকল পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে বিকৃতির কত অসংখ্য স্তরে উপনীত হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? সুতরাং সেই সকল পদার্থের আকার প্রকার ও গুণরাশি যে পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপের গুণ হইতে অধিক পরিমাণে পৃথক্ তাহা বোধ হয় আর অধিক যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রত্যেক বিকৃতিই পরম পিতার ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। কারণ, সৃষ্টিতে কোন কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে প্রত্যেক বিকৃতিই তাঁহার ইচ্ছায় নূতন নূতন রূপ ও গুণ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিকৃত পদার্থের যে রূপ ও গুণ হওয়া আবশ্যক, তাহাই তাঁহার ইচ্ছায় সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই ইচ্ছাময় পরমপিতা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছা সহযোগে এই বিচিত্র জগৎ সৃজন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ে সৃষ্টি ব্যাপারের মূলে যে পরম পিতার ইচ্ছা শক্তি অত্যধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছে, তাহা বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইবে মনে করিয়া উহাদের উল্লেখ করিলাম।

একটী দরিদ্র পরিবারে কয়েকটী বালক বালিকা ও তাহাদের মাতা পিতা বর্ত্তমান। দারিদ্র্য জন্য সকল সময় দুগ্ধ গৃহে আসেনা। একদিন তাহাদের মাতা অর্দ্ধসের মাত্র দুগ্ধ চুল্লীর উপরিস্থিত কটাহে রাখিয়া অগ্নি জ্বালিলেন। কিছুকাল মধ্যেই ঐ অত্যল্প পরিমাণ দুগ্ধ উত্তপ্ত হইয়া সমস্ত কটাহ পূর্ণ করিল। অজ্ঞ বালক বালিকাগণ এই মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল যে অদ্য তাহারা আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে পারিবে। মাতা কিন্তু দুগ্ধের উক্ত অবস্থা দেখিয়াই অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠ খণ্ড চুল্লী হইতে বাহির করিলেন। বালক বালিকারা দেখিয়া অবাক্ ও দুঃখিত হইল যে দুগ্ধ পূর্ব্বের স্বল্পাবস্থায় আসিয়াছে, তাহাদের আর অধিক দুগ্ধ পানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। সৃষ্টি ব্যাপারও এইরূপ। পরমপিতা ইচ্ছা করিলেন, তাই তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহারই ইচ্ছা সহযোগে নানাভাবে বিকশিত হইয়া জড় জগৎরূপে পরিণত হইল। আবার যখন তিনি ইচ্ছা সংহরণ করিবেন, তখন সৃষ্টিরও লয় হইবে। দুগ্ধ যেমন মাতার ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ রূপ কর্ম্ম দ্বারা নূতন আকার প্রকার ধারণ করে, পরম পিতার অব্যক্ত স্বরূপও সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় নানা রূপে গুণে বিকশিত হইয়াছে। কটাহের নিম্নে অগ্নি থাকা অবস্থায় অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তাল ভাব থাকা অবস্থায় দুগ্ধ যেমন বায়ু ও তেজঃ সহ কটাহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেইরূপ অব্যক্তও অতি সূক্ষ্মাকারে সমস্ত জড় জগতে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান এবং সৃষ্টির লয়ে অব্যক্ত যেমন ছিলেন, তেমন ভাবেই থাকিবেন, ব্রহ্মের ইচ্ছা জনিত বিকাশ জন্য আমরা জড় জগতে যাহা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা আর থাকিবে না।

শিল্পী মৃত্তিকাকে সম্বল করিয়া নানারূপ মূর্ত্তি গঠন করেন— কখনও দেবতার মূর্ত্তি, কখনও মানুষের মূর্ত্তি, আবার কখনও পশু পক্ষ্যাদির মূর্ত্তি। মৃত্তিকাই এই স্থলে বীজ স্থানীয়। শিল্পী তাহার

ইচ্ছা দ্বারা (কর্ম্মদ্বারা) পুতুল দিগকে নানারূপে প্রস্তুত করিয়া নানা নাম দেন, কিন্তু যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন সকল মূর্ত্তিই ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তখন মৃত্তিকা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, নামরূপ ভাবে যাহা তাহার ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আর থাকে না। কারণ, শিল্পী তাহার ইচ্ছা সংহরণ করিয়াছে। সৃষ্টিও সেইরূপে সংঘটিত হইয়াছে। পরমপিতা তাঁহার অব্যক্ত গুণকে বীজ রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারাই তাহাতে নানা নামরূপ দান করিলেন। আবার যখন জিহীর্ষা দ্বারা মহাপ্রলয় করিবেন, তখন তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই থাকিবে। জড় জগতে নানা ভাবে তাঁহার ইচ্ছা জনিত যে রূপ গুণ দেখিতেছি, তাহা আর থাকিবে না। ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে পরম পিতা তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপকে নানাভাবে বিকাশ করিয়াছেন এবং তাহাই এই জগৎ।

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টিতে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অত্যধিক দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ Energy এর উপরই বিশেষ জোড় দেন, কিন্তু ক্রিয়াশক্তিই (Energyই) যে সৃষ্টির একমাত্র কারণ নহে, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিশেষ ভাবে লিখিত হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও একটী মহাশক্তি যে সৃষ্টির মূলে কার্য্য করিতেছেন, সেই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সেই মহাশক্তিই পরমপিতার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ইচ্ছাশক্তি। উঁহা তাঁহার অনন্ত শক্তির একটী শক্তি মাত্র, কিন্তু কখনই পরমেশ্বর নহেন। ঐ একই কারণে Subjective Idealism নামক দার্শনিকগণ Mind অর্থাৎ একের ইচ্ছা ভিন্ন জগতে আর কিছুই দেখেন না। তাঁহারা ইচ্ছাকেই সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলেন। সৃষ্টির উপাদান কারণ বলিয়া তাহাদের মতে কিছুই নাই। তাহাদের এই ধারণা যে সত্য নহে, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে লিখিত হইবে।

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছার অপার মহিমা চিন্তা করিয়াই

কোন কোন শাস্ত্রে ইচ্ছাকে মূলা প্রকৃতি, মহাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা, জগজ্জননী প্রভৃতি নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থূল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে বীজ স্বরূপ অব্যক্ত এবং প্রেমময় পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি এই উভয়ের মিলনেই এই সৃষ্টি। উহাদের একের দ্বারা কখনই সৃষ্টি হয় নাই। জগতেও সৃষ্টির জন্য যে দুই এর আবশ্যকতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তবে এই দুই এর মধ্যে সৃষ্টির কার্য্যে ইচ্ছার শক্তি যে বলবত্তরা তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তির অনন্ত মহিমা বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। তাই এই স্থানেই উহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ব্রহ্মেরই ইচ্ছাশক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ। উহার উপাদান কারণ অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিতে যাইতেছি। পরম দয়াল পরম পিতা তাঁহার নিজ দয়া গুণে আমার সহায় হউন্।

ওঁং অনন্তশক্তিশালিনং ইচ্ছাময়ং ওঁং

ওঁং

অনাদিমাদিং তমনন্তমন্তকম্
অতীত-সাকার-নিরাকৃতিত্বকম্।
কর্ণস্য কর্ণং মনসোমনো বিভুং
স্মরামি দেবং করুণা কৃপানিধিম্॥

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

অব্যক্ত স্বরূপ কি ?

অব্যক্ত বা জগদ্বীজ নানা দর্শনে নানা প্রকার। মায়াবাদে মায়া, ন্যায়-বৈশেষিকে পরমাণু এবং সাংখ্য পাতঞ্জলে প্রধান। কিন্তু অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক ব্রহ্মের একতম স্বরূপকে সত্যদর্শনে অব্যক্ত বলা হয়। ব্রহ্মের সকলই অব্যক্ত। প্রোক্ত স্বরূপকে অব্যক্ত বলিবার কারণ এই যে উঁহাই তাঁহার ইচ্ছায় জগদ্রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ উঁহাই জগতের বীজ। এই স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "সাধারণ লোকে যাহাকে সাকার বা নিরাকার বিবেচনা করে, ঈশ্বর তন্মধ্যে কোনটীই নহেন, অথবা অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এই উভয়ের অনন্ত ভাবে মিশ্রণ বা অনন্ত একত্বই তাঁহার একতম স্বরূপ।"*

এই স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার ন্যায় হীনজনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। প্রথমতঃ এই দুইটী গুণের একত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সাধারণে মনে করিবে যে দৃষ্ট এবং অনুমিত সাকার পদার্থের সমষ্টি ব্রহ্মের সাকার রূপ এবং নিরাকার পদার্থের সমষ্টি তাঁহার নিরাকার রূপ। তাহাদের এই ধারণা তত্ত্বতঃ ভুল। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহাতে নিত্যই বর্ত্তমান ছিল। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোনও সাকার বা নিরাকার পদার্থ বর্ত্তমান ছিল না। তাঁহার সকল স্বরূপই নিত্য, সুতরাং তাঁহার অব্যক্ত নামক স্বরূপও নিত্য। মহাপ্রলয়ের পরেও তাঁহার অব্যক্ত নামক স্বরূপ বর্ত্তমান

---

* তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ দ্রষ্টব্য।

থাকিবে, কিন্তু কোনও রূপ সাকার বা নিরাকার জড় পদার্থ থাকিবে না। অতএব তিনি সাকার ও নিরাকার সৃষ্ট পদার্থের সমষ্টি এই সিদ্ধান্ত অসম্ভব হইয়া দাড়ায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে জড় জগতের সীমা আছে, কিন্তু ব্রহ্ম ত অনন্ত এবং তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপই অনন্ত। সুতরাং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপও অনন্ত। আবার উঁহা অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব, সুতরাং উঁহাও অনন্ত। কিন্তু জড় জগৎ চিরকাল সান্ত ও সসীম। সুতরাং জড় জগতের নিরাকার এবং সাকার পদার্থ সমূহের সমষ্টির নিরাকারত্ব ও সাকারত্বও সান্ত ও সসীম সুতরাং সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মের একটী অনন্ত স্বরূপ গঠিত হইতে পারে না।

পরমাত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত ভীত হন। কারণ, অনির্ব্বাচ্যকে বাক্যে প্রকাশ করিতে গেলেই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী, বিশেষতঃ তাঁহার যে স্বরূপের কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহাকেই অব্যক্ত বলা হয়। ইংরেজীতে একটী কথা আছে :—"Fools rush in where angels fear to tread," অর্থাৎ দেবদূতগণ যে স্থানে বিচরণ করিতে ভীত হন, নির্ব্বোধেরা সেই স্থানে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া যায়। আমিও তদবস্থ। কারণ, মন চিন্তা করিয়া অব্যক্তকেও বুঝিতে চায়, ইহাই উহার স্বভাব। অনন্ত ক্ষমাশীল পরমপিতা নিজগুণে অবোধ শিশুর বাচালতা ক্ষমা করিবেন ও যদি এই ব্যাখ্যার মধ্যে সত্য থাকে, তবে তাহা আমার এবং পাঠকদিগের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রণ করিয়া দিউন্, ইহাই তাঁহার নিকট আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

পরম পিতাকে নিরাকার ভাবে চিন্তা করাই সহজ। তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময়, সরলতাময়, করুণাময়, দয়াময় ইত্যাদি গুণময়। উপরোক্ত প্রত্যেক গুণই নিরাকার। আর গুণ মাত্রই abstract, concrete নহে। সুতরাং তিনি সাকার হইতে পারেন না। এক কথায় বলিতে গেলে যিনি চিন্ময়, তিনি নিরাকার, কখনই সাকার নহেন। পরম পিতার অনন্ত গুণের মধ্যে এমন কোন গুণ নাই, যাহা সাকার ভাব প্রকাশক। সকল গুণই নিরাকার ভাবাপন্ন। সুতরাং

সেই গুণ সমষ্টি পরমাত্মা নিরাকার। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, কিন্তু কারণ এবং কারণেরও অতীত। সুতরাং তিনি সাকার হইতে পারেন না। হৃদয়কে উদার ভাবে প্রসারিত করিয়া অনন্তের চিন্তা করিতে পারিলে তাঁহার নিরাকারত্ব বই সাকারত্ব ধারণায় আসিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল। ধর্ম্মসাধনে চিন্তার অধিকার অত্যধিক। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন :—

অচিন্ত্যং চিন্তনীয়ঞ্চ সদ্ভিরেকাগ্র মানসৈঃ।
সর্ব্বশক্তিময়ং পূর্ণং নমামি জগদীশ্বরম্॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

শ্রুতি অনুযায়ী সাধন রাজ্যে শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের স্থান অতি উচ্চে। "চিন্তাকে শান্ত কর, উন্নত কর, প্রসারিত কর" ইহাই সার ব্যবস্থা। এমন কি, ভক্ত পরমপিতার একটী নাম রাখিয়াছেন "চিন্তামণি"।

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতি র্জপোঽধমো জ্ঞেয়ো বাহ্যপূজাধমাধমা॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র —১৪/১২১)। উপরোক্ত শ্লোকটীতেও চিন্তার স্থান কত উচ্চে, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। এমন যে মহীয়সী শক্তি সম্পন্ন চিন্তা, তাহার উৎকর্ষ সাধনা না করিয়া চিন্তাবিহীন ভাবে জড় পদার্থকে পরব্রহ্মের আসনে স্থান দান করা যে কতদূর অপরাধ জনক, তাহা আর কত বলিব? চিন্তা করিবনা, অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব, ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়। পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রকাশিত সত্যধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থে নিরাকার বাদের অনেক আলোচনা বর্ত্তমান। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশদ রূপে এই তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। এস্থলে নিরাকারত্বের প্রমাণ স্বরূপ দুইটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূল পদার্থের সূক্ষ্মে লয় হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, ভূমি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজঃ বায়ুতে, এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। সুতরাং আকাশ যাঁহাতে লীন হয়, তিনি যে আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ুময় নহেন, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব ঈশ্বর নিরাকার। কারণ, আকাশ যখন নিরাকার, তখন তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম যিনি, তিনি অবশ্যই নিরাকার। সাকার বাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে আকাশ অপেক্ষা স্থূল বলিতে হয়। কিন্তু যিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনি যে সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা স্থূল, এইরূপ উক্তি যে, একান্ত উপহাসের বিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব সপ্রমাণ হইল যে ঈশ্বর নিরাকার।"

"ভূমি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, জল চতুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তেজঃ ইন্দ্রিয়ত্রয় গ্রাহ্য, বায়ু ইন্দ্রিয়দ্বয় গ্রাহ্য এবং আকাশ এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সুতরাং যিনি আকাশেরও অতীত, তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আর যাহা সাকার, তাহাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সুতরাং জগদীশ্বর যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, তখন তিনি সাকারও নহেন। প্রত্যুত ঈশ্বর নিরাকার।" (তত্ত্বজ্ঞান—উপাসনা)

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিরাকারই হন, তবে তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব কোথায় হইতে আসিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে তিনি অনন্ত নিরাকার সত্য। তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণা করা জীবের অসাধ্য ! কিন্তু তিনি অনন্ত হইলেও অনন্ত-অনন্ত-অনন্ত-স্বরূপ ও অনন্ত জ্ঞানাধার যিনি, তিনি নিজে নিজেকে একটী মাত্র এবং সমগ্র ব্রহ্ম বলিয়াই নিত্য জানেন। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র দ্রষ্টব্য। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ-তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—১।৪।১০)। বঙ্গানুবাদ :—অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্ম রূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকে এইরূপ জানিয়াছিলেন। "আমিই ব্রহ্ম"। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রও এই সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।

সুতরাং ব্রহ্ম যে নিজেকে নিজে নিত্য জানেন সেই সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা এবং তিনিই জ্ঞেয়। একটী অখণ্ড সমগ্র বস্তু বলিয়া যখন তিনি নিজেকে নিজে জানেন এবং ধারণা করেন, তখন তিনি অনন্ত সাকারও বটেন। তাঁহার সমগ্রত্বই তাঁহার

অনন্ত সাকারত্ব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের নিরাকারত্বও যেমন অনন্ত, তাঁহার সাকারত্বও তেমনি অনন্ত। সৃষ্ট সাকার পদার্থের সমষ্টি ভাবে তিনি সাকার নহেন। বিশ্ব সৃষ্ট, কিন্তু তিনি বিশ্বেরও অতীত – বিশ্বাতীত অনন্ত এবং স্বয়ং কোনও সৃষ্ট পদার্থ নহেন। বিশ্ব বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গত। বিশ্ব অনন্ত প্রায় হইলেও সাদি ও সান্ত, কখনও অনন্ত অসীম নহে। কিন্তু ব্রহ্ম ত অনাদি ও অনন্ত অসীম। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে তিনি সৃষ্ট পদার্থের সমষ্টি নহেন এবং সেই হেতুই সাকার বা নিরাকার নহেন।

বহুবৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভক্তিভাজন মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ অনন্ত ব্রহ্মকে সমগ্র ভাবে একটী মাত্র বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে সাকার ভাবে পূজা করিতে পারেন। এই উক্তিতেও ব্রহ্মের সাকারত্ব কি, তাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

এখন দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিষয়ের আরও পরিষ্কার আভাস দিতে চেষ্টা করা যাউক্। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অনন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উপমাই প্রদত্ত হউক্ না কেন, তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না। প্রথমতঃ—আমাদের জন্ম ও বাসভূমি পৃথিবীর কথা চিন্তা করা যাউক্। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে ইহা জল ও ক্ষিতিতে পূর্ণ এবং তেজও ইহাতে আছে। সর্ব্বোপরি ইহা বায়ু-মণ্ডলে নিমগ্ন। পৃথিবীর সর্ব্বদিকের বায়ুমণ্ডলের বিষয় চিন্তা করিতে আমরা যেন পৃথিবীর সীমা রেখা (Territorial jurisdiction পর্য্যন্তই যাই। তাহার পর কি আছে বা না আছে, তাহা চিন্তা করা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় অপ্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সীমা রেখা পর্য্যন্ত পৃথিবীকে অন্তর্গত করিয়া যেন মণ্ডলাকৃতি সম্পন্ন বায়ু-রাশি বর্ত্তমান। এখন আমরা জল ও ক্ষিতি পূর্ণা পৃথিবীকে চিন্তা হইতে অপসারণ করিয়া দেই এবং সেই স্থান শূন্য মনে করি। জল ও ক্ষিতি ভাব অপসৃত হইলেই বায়ুর স্বাভাবিক গুণে সেই স্থান বায়ু পূর্ণ হইবে। এখন যাহা দাড়াইল, তাহা একটী বায়ু মণ্ডল মাত্র।

উহার আকারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বায়ুমণ্ডলটীই পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে বায়ু (gaseous matter) পূর্ণ মণ্ডল ছিল, তাহাই। আমরা এই অবস্থায় উক্ত মণ্ডলটী সম্বন্ধে কিঞ্চিং ধারণা করিতে পারি।* এই মণ্ডলটীর উপাদান একমাত্র বায়ু। বায়ু নিরাকার, সুতরাং মণ্ডলটীও নিরাকার। কি উহাকে যদি সমগ্র ভাবে একটী মাত্র বলিয়া ধারণা করা যায়, তবে উহাকে সাকার বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্যোম হইতে ব্রহ্মের ইচ্ছায় মরুতের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই আদি মরুৎ মণ্ডলটী সম্বন্ধে যদি চিন্তা করি, তবে উহাকে ঐ একই ভাবে নিরাকার ও সাকার বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মরুৎ নিরাকার, সুতরাং উক্ত মণ্ডলটীও নিরাকার। আবার উহাকে সমগ্র ভাবে চিন্তা করিলে উহা সাকার ও বটে। দ্বিতীয়তঃ—আমরা এ বিষয়ে আরও একটু অগ্রসর হই। এখন আমাদের হৃদয় হইতে পৃথিবীর স্থানে কল্পিত বায়ু মণ্ডলটীর চিন্তাও অপসারণ করি। সেই স্থলে আমরা অনন্তপ্রায় মণ্ডলাকার বিশ্বের চিন্তা করি। বিশ্বকে মণ্ডলাকার বলিবার কারণ এই যে আমাদের দৃষ্ট সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহগুলি সকলই যখন মণ্ডলাকার, তখন বিশ্বকে মণ্ডলাকার বলিতে কোন দোষ নাই। বোধ হয় উচ্চ গণিতের দ্বারাও বিশ্বের মণ্ডলাকারত্ব প্রমাণিত হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকেও বিশ্বকে মণ্ডলাকার বলা হইয়াছে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ব্যোম যে বিশ্বকে ওতপ্রোত ভাবে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছে, ইহাও চিন্তা করি। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে এখন অসংখ্য মণ্ডল পূর্ণ বিশ্বকেও চিন্তা হইতে ছাড়িয়া দেই। এখন যাহা বাকী থাকিল, তাহা এক অখণ্ড ব্যোম মণ্ডল মাত্র। ইহাই সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থা।

* আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে কোনও সুদূর অতীতে dump of gaseous matter সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ বর্ত্তমান পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী প্রথমে ব্যোমই সৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা উক্ত প্রকার ব্যোম মণ্ডলটীর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। এ স্থলেও মণ্ডলটীর উপাদান একমাত্র ব্যোম পদার্থ। ব্যোম নিরাকার, সুতরাং মণ্ডলটীও নিরাকার। কিন্তু উহাকে যদি সমগ্র ভাবে একটী অখণ্ড বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে পারি, তবে উহাকে সাকার বলা যায়। অর্থাৎ আদি ব্যোম মণ্ডল অনন্ত প্রায় নিরাকার হইয়াও অনন্ত প্রায় সাকার।

ইহার পরেও অগ্রসর হইলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাঁহা অথবা তাঁহার আভাসও আমাদিগের ধারণার অতীত। অনন্ত অজড়ের ধারণা আমাদের জড় ভাবে জর্জ্জরিত হৃদয় দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং সেই দিকে আর অগ্রসর হইলাম না। কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্ত-দ্বয় অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে ব্রহ্ম অনন্ত ভাবে নিত্য নিরাকার এবং তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্বের একটী অখণ্ড ও সমগ্র ভাবই তাঁহার নিত্য ও অনন্ত সাকারত্ব। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে উক্তরূপ অনন্ত নিরাকারত্বের সমগ্রত্বের (গোটা বা whole-এর) এবং অখণ্ডত্বের ধারণা (প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে অনন্ত নিরাকারত্বের অনন্ত সাকারত্ব রূপ পূর্ণ ধারণা) একমাত্র অনন্তানন্তং পূর্ণ জ্ঞান ব্রহ্মেই নিত্য সম্ভব। কারণ, তিনি নিজে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিত্য জানিতেছেন। কোনও জীবের এইরূপ সাধ্য নাই যে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মের অনন্ত সাকারত্ব ধারণা করেন। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মের অনন্ত সাকা-রত্ব তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব দ্বারা গঠিত। সুতরাং এক অর্থে তিনি নিত্য অনন্ত নিরাকার সত্য, আবার ইহাও সত্য যে ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্ব বাদ দিয়া তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব নহে এবং তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব ভিন্নও অনন্ত নিরাকারত্ব বর্ত্তমান নহে, অর্থাৎ তাঁহাতেও অপূর্ব্ব রূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের অনন্ত একত্ব সম্পাদিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। ধন্য অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্ম! তোমাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বারংবার ধন্যবাদ দিতেছি। হে স্বপ্রকাশ অনন্ত

জ্ঞানময় ! তুমি প্রকাশিত হইয়া তোমার তত্ত্ব সকল পূর্ণ ভাবে, সত্য ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার দিব্য জ্ঞান দান কর। দয়াময় ! দয়া কর।

এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে পরম ব্রহ্ম অনন্ত অরূপ হইয়াও অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত রূপে রূপ ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে অনন্ত সুন্দর এবং ব্রহ্মদর্শী পরমোন্নত মহর্ষিগণ তাঁহার নানা অপরূপ রূপ দর্শন করেন ; তিনি অশব্দ, অথচ তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত সাধকগণ তাঁহার অনাহতা অমৃতময়ী বাণী সতত শ্রবণ করেন, তিনি অরস, অথচ তিনিই একমাত্র অনন্ত রসাধার—একমাত্র অতল প্রেম-জলধি ; তিনি অস্পর্শ, কিন্তু পরমোন্নত মহাত্মাগণ বলেন যে তাঁহার অনন্ত উদার প্রেমক্রোড়ে আরোহণ করা যায়, নিত্য বাস করা যায় !

"অব্যক্তের পরিণাম" অংশে মহামনা Plato দ্বারা কথিত সৃষ্টি-তত্ত্বের সমালোচনা বর্ত্তমান। উহাতে দৃষ্ট হইবে যে তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট অব্যক্ত ও পূর্ব্ব বর্ণিত অব্যক্ত স্বরূপের আকারে কোনও পার্থক্য নাই। তিনি ও সেই অব্যক্তকে আকারশূন্য (formless) বলিয়া-ছেন। বস্তুত: তাঁহার মতের অব্যক্ত এবং এই গ্রন্থ লিখিত অব্যক্ত স্বরূপে একটী বিষয়ে মাত্র পার্থক্য বর্ত্তমান। তাহা এই যে Plato বলিয়াছেন যে সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তা সম্পন্ন ও পরমে-শ্বরের বিরুদ্ধাচরণে সর্ব্বদা রত। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা উক্ত অংশে দেখিতে পাইব। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহাও আমরা দেখিতে পাইব যে অব্যক্ত-জাত জড় পদার্থ বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল উহার নিজ শক্তিতেই নহে, কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্রহ্মই স্বয়ং তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা জড়ের সেইরূপ গঠনই করিয়াছেন। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশও দ্রষ্টব্য।

ওঁং অধার্য্যং অনন্ত-সাকার-নিরাকৃতিং ওঁং

ত্বং সৃষ্টিহেতু স্ত্বমনন্ত-সদ্‌গুণ
ত্বং সৃষ্টিরূপশ্চ বিমুক্তিকারণম্।
ত্রাতা বিনাশী ত্বমনন্তরূপক
স্ত্রায়স্ব দাসং স্বকমাশুতারক ॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।

অব্যক্তের পরিণাম।

অব্যক্ত যে কি, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। আমরা আরও দেখিলাম যে সেই অব্যক্ত জগতের উপাদান এবং ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ। জাগতিক সকল পদার্থেরই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ আছে। এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা উক্ত কারণদ্বয় ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জগৎ-রূপ মহান্ কার্য্যেরও উপাদান ও নিমিত্ত কারণ আছে। অব্যক্ত যে জগতের উপাদান অর্থাৎ ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অব্যক্ত হইতে যে জগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহা এখন প্রমাণিত হইতেছে। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সম্পর্কে তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২/১ এবং ২/৬৭ মন্ত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বহু উক্তি উপনিষদ্ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূত সৃষ্টির এই ক্রম বৈজ্ঞানিক উপায়েও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। মিশ্রিত পঞ্চভূত (আদি ভূত-পঞ্চক) দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চভূতই জগতের মূলে। জগতে দেখা যায় যে উৎপন্নে উৎপাদকের গুণ বর্ত্তে। ইহা যখন সত্য, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে অব্যক্তের গুণ উঁহা হইতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন ভূতসমূহে বর্ত্তিয়াছে। ইহাই এখন প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থূল ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম ও মরুৎ নিরাকার, ক্ষিতি ও অপ্ সাকার এবং তেজঃ সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। সুতরাং বুঝা যায় যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অনন্ত

নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব হইতে জগদুৎপত্তির জন্য উহারা (ভূত-সমূহ) নিরাকার ও সাকার হইয়াছে।

যদি সূক্ষ্মভাবে পঞ্চভূতের বিষয় চিন্তা করা যায়, তবে বুঝা যায় যে প্রত্যেক ভূতই নিরাকার ও সাকার-উভয়ই। কিন্তু কোন কোন ভূতে নিরাকারত্বের ও কোন ভূতে সাকারত্বের প্রাধান্য বর্ত্তমান। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ব্যোম নিরাকার ও সাকার উভয়ই। ঐ একই প্রণালীতে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে আদি মরুৎ মণ্ডলও নিরাকার ও সাকার উভয়ই। তেজঃ যে সাকার ও নিরাকার উভয়ই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ক্ষিতি ও অপ্ যে সাকার, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য। উহাদিগেতেও যে নিরাকারত্ব বর্ত্তমান, তাহা এখন প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যোম ও মরুৎ নিরাকার। উহাদের বিশেষ গুণ ক্রমান্বয় শব্দ ও স্পর্শ। সুতরাং শব্দ ও স্পর্শ নিরাকার পদার্থের বিশেষ গুণ বলিতে হইবে। অপ্ ও ক্ষিতিতেও উক্ত গুণদ্বয় (শব্দ ও স্পর্শ) বর্ত্তমান। উহারা কোথায় হইতে আসিল? অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহারা ব্যোম ও মরুৎ হইতে পরম্পরা ভাবে আসিয়াছে। উৎপাদকের গুণ উৎপন্নে কখন কখন স্থূল ভাবে এবং কখনও সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকে। উহা প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং অপ্ ও ক্ষিতিতে ও নিরাকারত্ব বর্ত্তমান। উহা ব্যোম ও মরুৎ হইতে পরম্পরা ভাবে আগমন করিয়াছে।

যে ভূত যত নিরাকার, তাহা তত সত্ত্ব প্রধান। এই জন্য ব্যোমে সত্ত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। সেইরূপ যে ভূত যত সাকার, তাহা তত তমঃ প্রধান এবং ক্ষিতিতে তমোগুণের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায় যে সত্ত্ব নিরাকার পদার্থের সহিত এবং তমঃ সাকার পদার্থের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত। সকল পদার্থেই সত্ত্ব ও তমঃ বর্ত্তমান, পরিমাণের পার্থক্য মাত্র। সুতরাং ব্যোমেও তমঃ আছে এবং ক্ষিতিতেও সত্ত্ব আছে। সুতরাং ব্যোম ও মরুৎ নিরাকার বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেও সাকারত্ব বর্ত্তমান। সেইরূপ অপ্ ও ক্ষিতি সাকার বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেও নিরাকারত্ব বর্ত্তমান। উভয়

ক্ষেত্রেই ক্রমান্বয় সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব লুপ্ত প্রায়। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক পদার্থেই যেমন বিরুদ্ধ গুণ সত্ত্ব ও তমঃ বর্ত্তমান, সেইরূপ উহাদিগেতেও বিরুদ্ধ গুণ নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। উভয় স্থলে পরিমাণের পার্থক্য। সুতরাং অপ্‌ ও ক্ষিতিতেও নিবাকারত্ব স্বল্প পরিমাণে বর্ত্তমান বটে।

ব্যোমের গুণ শব্দ, মরুতের গুণ শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতেই এক বা একাধিক গুণ বর্ত্তমান। গুণ নিরাকার। সুতরাং ভূত মাত্রেই নিরাকারত্ব বর্ত্তমান। অপর দিকে ভূত মাত্রই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ মাত্রই দেশ ব্যাপিয়া থাকিতে বাধ্য। যাহা দেশ ব্যাপ্ত, তাহা অবশ্যই সাকার। সুতরাং ভূত মাত্রই অল্পাধিক সাকার। সুতরাং উহারা সাকার ও নিরাকার উভয়ই।

অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বে যাহা হয়, তাহা বিশুদ্ধ নিরাকারও নহে, বিশুদ্ধ সাকারও নহে, কিন্তু উঁহা উক্ত গুণ-দ্বয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্ব। সেইরূপ উঁহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চভূতের কোনওটীই বিশুদ্ধ নিরাকার বা বিশুদ্ধ সাকার নহে, কিন্তু প্রত্যেক ভূতই সাকার-নিরাকার পদার্থ। ইহা বুঝিবার সহজ উপায় এই যে সত্ত্ব ও তমঃ বিরুদ্ধ গুণ হইয়াও প্রত্যেক পদার্থেই বর্ত্তমান, পরিমাণের পার্থক্য মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক ভূতই সাকার ও নিরাকার উভয়ই বটে, কিন্তু সাকারত্ব ও নিরাকারত্বের পরিমাণের পার্থক্য বর্ত্তমান।

মহামতি Plato এর সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মত সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। এস্থলে Professor Weber লিখিত Plato এর অব্যক্ত সম্বন্ধে মত হইতে কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধার করিলাম। উহা হইতে দেখা যাইবে যে তাঁহার (Plato-র) মতের অব্যক্তকে দেশের সহিত এক বলা হইয়াছে। (It is identical with space and the space filled by bodies). সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত যে পরম পিতার সুমহতী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোম বা space বা দেশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্যোম হইতেই অন্যান্য ভূতের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উৎপত্তি, ইহা ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

দার্শনিক দ্বারা সমর্থিত, ইহা বলা যাইতে পারে।

"According to Plato and idealism matter is nothing corporeal, it is some thing that may become so, through the plastic action of the idea. The body is a determinate, limited, qualified and qualifiable thing; matter, considered as such and apart from the forms which the idea impresses upon it, is unlimited itself, it is devoid of all positive attributes, and cannot therefore be designated by any positive term, since every term determines; it is the undefinable, the formless, the imperceptible. But although in itself indeterminate, formless and imperceptible, it may, through the plastic action of the idea, receive all possible forms and determinations; it may become the matter of all sensible things, the universal recepient. It is identical with space and the place filled by bodies. (Weber's History of Philosophy, Pp. 92-93). অর্থাৎ Plato এবং অধ্যাত্মবাদ (Idealism) অনুযায়ী জড় শারীরিক কিছুই নহে। ইহা এমন কিছু যাহা ভাবের (Ideaর) নমনীয় ক্রিয়া দ্বারা ঐরূপ সম্ভব হইতে পারে। কায়া (body) নির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ, গুণযুক্ত এবং গুণযোগের উপযোগী পদার্থ। স্রষ্টার ভাব সমূহ যে আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাদ দিয়া যদি জড়কে জড় ভাবেই চিন্তা করা যায়, অর্থাৎ অব্যক্তকেই যদি চিন্তা করা যায় (জড় হইতে নামরূপ বাদ দিলে অব্যক্তই বাকী থাকে), তবে বলিতে হয় যে ইহা স্বয়ং অসীম। ইহা সকল সত্ত্বাত্মক গুণ শূন্য। সুতরাং ইহা কোন বাস্তব শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না অর্থাৎ ইহা অনির্ব্বাচ্য। কারণ, প্রত্যেক শব্দই সীমা নির্দ্দেশক। ইহা (অব্যক্ত) অনির্ব্বাচ্য,

নিরাকার এবং অননুভবনীয়। কিন্তু যদিও ইহা মূলতঃ (in itself) অবর্ণনীয়, নিরাকার এবং অননুভবনীয়, কিন্তু ইহা ভাবের (Idea-র) নমনীয় ক্রিয়া দ্বারা সকল প্রকার আকার ও সীমা গ্রহণ করিতে পারে, উহা সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের জননী হইতে পারে, ইহা সর্ব্বাকার গ্রহণকারী হইতে পারে। ইহা দেশ এবং কায়া দ্বারা পূর্ণ স্থানের সহিত এক (identical).

ক্ষিতি ও অপের নিরাকারত্ব বুঝিতে যে এত অধিক চিন্তার প্রয়োজন তাহার কারণ এই যে অব্যক্তের শেষ পরিণাম অপ্ ও ক্ষিতিতে বিকৃতির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। পদার্থ যত বিকৃত হইবে, উহা ততই আদি উৎপাদক হইতে অধিক পৃথক্ ভাবাপন্ন হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য এবং ভূত সমূহেও দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। তাই অব্যক্তের উভয় গুণই নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব স্থূল দৃষ্টিতে ক্ষিতি এবং অপে লক্ষ্য করা যায় না, কেবল সাকারত্বই দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদিগেতে উভয় গুণই বর্ত্তমান।

যদি ক্ষিত্যাদি ভূত চতুষ্টয়কে ব্যোমে লয় করা যায়, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের শেষ অবস্থা যদি সংঘটিত হয়, তবুও একমাত্র ব্যোম মণ্ডলই থাকিবে। উহা যে সাকার ও নিরাকার উভয়ই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশ্বের অন্যবিধ নামরূপ সমূহ তখন আর থাকিবে না। সুতরাং আদি অন্ত জগতের যে অবস্থার কথাই চিন্তা করা যায়, তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাকার ও নিরাকার উভয়ই। অর্থাৎ উৎপন্ন জগৎ কখনও উৎপাদক অব্যক্তের গুণ বিবর্জ্জিত হয় না। এ স্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় পঞ্চভূতের নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব উভয় ভাবই স্বীকার করেন এবং প্রোক্ত যুক্তি অনুমোদন করেন। অতএব পঞ্চভূতের আলোচনায় দেখা গেল যে উহারা এমন এক পদার্থ হইতে আসিয়াছে, যাহা সাকার ও নিরাকার উভয়ই। তাহাই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব।

এস্থলে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ব্রহ্মের নিরাকারত্ব কি ব্যোম, মরুৎ বা তেজের নিরাকারত্বের ন্যায় ? "অব্যক্ত কি ?" অংশে লিখিত হইয়াছে যে তিনি চিন্ময় এবং অনন্ত গুণময় সুতরাং তিনি নিরাকার। জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতির নিরাকারত্ব কি ব্যোম বা বায়ুর নিরাকারত্বের তুল্য ? উহারা নিরাকার হইলেও একটী দেশ ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম ত দেশ কালের অতীত। আবার তাঁহার সাকারত্ব সম্বন্ধে উক্ত অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত কি জড়ের সাকারত্বের তুলনা হইতে পারে ? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্বের সহিত জড়ের নিরাকারত্বের এবং তাঁহার অনন্ত সাকারত্বের সহিত জড়ের সাকারত্বের সম্পূর্ণ মিলন হইতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহার সেই গুণদ্বয়ই জড় জগতে হুবহু দেখিতে পাইনা। যাহা দেখিতে পাই, তাহা উঁহাদের পরিণাম মাত্র। "ইচ্ছাশক্তি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিকৃত পদার্থে আদি পদার্থ হুবহু পাওয়া যায় না। সুতরাং কারণ-অবস্থায় অবস্থিত অব্যক্ত গুণও হুবহু ভাবে যে স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে দেখিতে পাইবনা, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমরা আরও দেখিয়াছি যে বিকৃতির মাত্রা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বিকৃত পদার্থ আদি পদার্থ হইতে ততোঽধিক পৃথকরূপ ধারণ করিবে। ব্যোম অব্যক্ত গুণের সাক্ষাৎ পরিণাম। তাই ব্যোম সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলে অব্যক্ত গুণের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্রম বিকৃত অন্য ভূত চতুষ্টয় দর্শনে অব্যক্ত স্বরূপের ধারণা করা অতি সুকঠিন।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাঁহাতে অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের একত্ব হইয়াছে। নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব যে অচেতন, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও সহজ বোধ্য। সুতরাং উক্ত গুণদ্বয়ের একত্বে যে অব্যক্ত স্বরূপ গঠিত, তাহাও অবশ্য অচেতন। সুতরাং সেই অচেতন অব্যক্ত হইতে উৎপত্তির জন্যই জড় জগৎও অচেতন হইয়াছে। জগৎ ও জাগতিক

পদার্থ সমূহ আদি অন্ত অচেতন। এমন কোন কাল নাই বা এমন কোন অবস্থা নাই, যাহাতে উহারা চৈতন্য সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ অচৈতন্য জগতের একটী বিশেষ গুণ এবং উহা উঁহাতে আদি অন্ত বর্ত্তমান বা Constant. অতএব প্রমাণিত হইল যে অচেতন অব্যক্ত স্বরূপ হইতে অচেতন জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা অচেতন অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই জড় জগৎ অচেতন হইয়াছে।

প্রশ্ন হইবে যে জগতে শক্তির উৎস কোথায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি বর্ত্তমান। জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করা, প্রেমের শক্তি মিলন করা ইত্যাদি। সেইরূপ অনন্ত নিরাকারত্বে, অনন্ত সাকারত্বে ও উঁহাদের একত্বেও যে শক্তি বর্ত্তমান, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ। সেই সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি অব্যক্ত স্বরূপের শক্তিকে নানাবিধ জাগতিক শক্তি ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। কর্ম্ম দ্বারাই বৈদ্যুতিক শক্তিকে Light Energy, Heat Energy প্রভৃতিতে প্রকাশ করা যায়। কর্ম্মের মূলে যে ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাহা বুঝিতে হইবে। এক্ষেত্রেও অনন্ত অনন্ত অনন্ত শক্তিমান ইচ্ছাময় ভগবান তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ ও উঁহার শক্তি অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ রচনা করিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ "ইচ্ছাশক্তি" অংশে বিবৃত হইয়াছে।

নিরাকারত্ব, সাকারত্ব, অচৈতন্য ও শক্তি জগতের আদি অন্ত সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে। অন্যান্য নামরূপের লয় আছে, কিন্তু উঁহারা (নিরাকারত্ব প্রভৃতি) জগতের জীবনকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেই। অর্থাৎ উহারা Constant. সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায় যে জগৎ এমন একটী পদার্থ হইতে আসিয়াছে, যাহা নিরাকার, সাকার, অচেতন ও শক্তিমান। আমরা দেখিয়াছি যে সেই পদার্থই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। উঁহাকেই অব্যক্ত বা জগদ্বীজ বলা হয়।

বহু দার্শনিক জগতে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বহু বহু কথা বলেন।

জগন্মিথ্যাবাদের একটী প্রধান যুক্তি এই যে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং উহা নিত্য স্থায়ী নহে, সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু যদি আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করি. তবে দেখিতে পাইব যে জগতে পরিবর্ত্তন আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসকল পরিবর্ত্তন কেবল উপরি উপরি মাত্র। উহাতে জগতের মূল গুণ ও শক্তির কোনই বিকার হয় না। অর্থাৎ জাগতিক কোন পদার্থেরই সাকারত্বের. নিরাকারত্বের, অচেতনত্বের ও শক্তির পরিবর্ত্তন নাই। বরফকে জলে পরিবর্ত্তন করিলেও জল প্রোক্ত তিনটী গুণ ও শক্তি বিবর্জ্জিত হয় না। জলে কাঠিন্য থাকিবে না, কিন্তু তারল্য (কোমলতা) থাকিবে; কিন্তু প্রোক্ত তিনটী গুণ ও শক্তি Constantই থাকিবে। সুতরাং মূলতঃ কোনই পরিবর্ত্তন নাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে জগতে Matter and Energy এর পরিমাণ Constant. সুতরাং উহাদের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। উহারা চিরস্থায়ী। সুতরাং এক অর্থে বলা যাইতে পারে যে উহাদের কোনও প্রকৃত পরিবর্ত্তন হয় না। কারণ, উহাদের পরিমাণের পরিবর্ত্তন নাই, আবার উহাদের মূল গুণ ও শক্তিরও পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তন যাহা দেখা যায়, তাহা বাহিরের আকার প্রকারের উপরি উপরি পরিবর্ত্তন মাত্র অর্থাৎ উহারা একান্তই Superficial. সুতরাং ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জগৎ আসিয়াছে বলিয়াই উহাতে নিরাকারত্ব, সাকারত্ব, অচৈতন্য ও শক্তি আদি অন্ত বর্ত্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে, যেমন স্বর্ণখণ্ডকে হার, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে পরিণমন করিলেও উহাদিগেতেও স্বর্ণের সকল গুণ ও শক্তিই বর্ত্তমান থাকিবে. কখনই বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জাগতিক পদার্থে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহা উহাদের মূলগত গুণ ও শক্তির পরিবর্ত্তন নহে, কেবল বাহিরের নানারূপের উপরি উপরি পরিবর্ত্তন মাত্র।

আমরা এতক্ষণ যুক্তিযোগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিলাম। এখন আমরা শব্দ প্রমাণ দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা

করিতেছি। কঠোপনিষদ্ বলেন :—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ (৫।১২)

বঙ্গানুবাদ :—যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; যিনি স্বীয় এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে (আত্মাতে) দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে। (তত্ত্বভূষণ)

ব্রহ্ম তাঁহার একটী স্বরূপকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও বলিয়াছি যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত জগতের উপাদান কারণ ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি উহার নিমিত্ত কারণ। 'করোতি' শব্দ দ্বারা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কথা বলা হইয়াছে। অশরীরী ব্রহ্মের সকল কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" ও "কল্পবাদ" অংশদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কর্ম্ম মাত্রেরই মূলে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। প্রত্যুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ যে জগতের উপাদান, তাহা উহাতে (পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রে) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং উভয় উক্তিই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত তত্ত্ব এবং কঠোপনিষদুক্তি এক হইল। কঠোপনিষদ্ নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র সমূহে অব্যক্তকে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মের পরেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। কারণ, অব্যক্ত তাঁহারই একতম স্বরূপ। সুতরাং কঠোপনিষদ্ অনুযায়ী ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত একতম স্বরূপই অব্যক্ত বা জগদ্বীজ। আমরাও তাই বলিয়াছি।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। (৩।১০-১১)

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ (৬।৭-৮)

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ (মহান্ আত্মা) হইতে জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ. অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি শেষ, তিনি পরাগতি। ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব (বুদ্ধি) হইতে মহান আত্মা অধিক, মহৎ অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।* (তত্ত্বভূষণ)।

* উপরোক্ত মন্ত্র চতুষ্টয় হইতে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই যে জড় জগৎ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন। পরমপিতার অনন্ত স্বরূপের মধ্যে অব্যক্তও একটী স্বরূপ এবং ইহা যে কি, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অব্যক্ত শব্দ দ্বারা জগতের সৃষ্টির বীজকে সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা হয়। কারণ, সৃষ্টির বীজ প্রথমে অব্যক্ত কারণরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল এবং কার্য্যরূপে জগদাকারে পরিণত বা ব্যক্ত হইয়াছে। মায়াবাদে মায়াকে সৃষ্টির বীজ বলা হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শন মতে প্রধান (প্রকৃতি) সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অতি সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান থাকে; তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। এইরূপ এক এক দর্শন অব্যক্তের অর্থাৎ সৃষ্টি বীজের এক একরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অব্যক্ত যে কি তাহার কোনও সংজ্ঞা সেই সেই গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। তাহা যে কোন মতবিশেষের অব্যক্ত (সৃষ্টি বীজ) বলিয়া উহারা মনে করেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিবীজকেই অব্যক্ত বলা সঙ্গত। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে উহা অব্যক্ত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ ও সর্ব্ববাদী সম্মত। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব অবলম্বনেই পরম পিতার ইচ্ছায় এই জড় জগৎ রচিত হইয়াছে। উপনিষদ ও গীতার মন্ত্র চতুষ্টয় কঠ—৫/১২, শ্বেত—৬/১২, গীতা—৯/৪ এবং ১০/৪২) বিশেষতঃ গীতার শ্লোকদ্বয় আমাদের মতের সহিত হুবহু মিলিয়া

গিয়াছে। এ অবস্থায় আমরা যদি বলি যে কঠোপনিষদ ও গীতাকার অব্যক্ত শব্দে উক্ত ব্রহ্ম স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তবে তাহা যুক্তি-যুক্ত কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।

কঠোপনিষদের ৫/১১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে "যিনি (ব্রহ্ম) একরূপকে বহু করিয়াছেন"। 'রূপ' অর্থে গুণ এবং 'করোতি' শব্দ দ্বারা কর্ম্ম এবং উহার মূলে ব্রহ্মের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ যে কর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার একটী স্বরূপকে কার্য্যতঃ বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন। মায়াবাদ, সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং Plato কেহই ব্রহ্মের একটী রূপকে অর্থাৎ তাঁহার একটী স্বরূপকে অব্যক্ত বলেন নাই। সাংখ্য এবং Plato উভয়ই অব্যক্তকে যথাক্রমে পুরুষের এবং পরমেশ্বরের বিপরীত তত্ত্বই বলিয়াছেন। কিন্তু কঠোপ-নিষদ্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের একটীরূপ যাঁহাকে তিনি বহুপ্রকাব করিয়াছেন। (একং রূপং বহুধা যঃ করোতি)। আবার অব্যক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু হইতেই পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। ইহা সহজ জ্ঞান লভ্য। যদি বলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ ভাবেই বর্ত্তমান ছিল, তবে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না। কারণ, তিনি ভিন্ন আরও কিছু ছিল, যাহা জগদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি অনন্ত অসীম হইতে পারেন না। আবার অব্যক্ত যদি ব্রহ্মাতি-রিক্তই হয়, তবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান, ইহা বলিবার কোনই অর্থ থাকে না। মায়াবাদ অংশে মায়া সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যাইবে যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না। আর শক্তি উপাদান কারণ হইতে পারেনা। কারণ, উহাতে substance নাই। আবার মায়া ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। পঞ্চদশীও তাহাই বলেন। সুতরাং উহা জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেনা। আর মিথ্যা জগতের আবার উপাদান কি? উহাত শূন্য মাত্র, ভ্রম বশতঃ আমরা ব্রহ্মে জগৎ দেখি। "মায়াবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে রজ্জু-সর্পেরও কোনই উপাদান নাই এবং উহা সেইজন্য জাগতিক পদার্থ নহে।

শ্বেতাশ্বরোপনিষদের ৬/১২ মন্ত্রও লক্ষ্য করিবেন যে উহাও কঠো-পনিষদের মন্ত্রের অনুরূপ। উহাতে রূপ স্থলে বীজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। আমরা দেখিয়াছি যে পরমপিতা তাঁহার

অব্যক্ত স্বরূপকে জগৎ সৃষ্টির জন্য বীজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এইভাবেও দেখা গেল যে জগদ্বীজ ব্রহ্মের একতম স্বরূপ এবং তিনি উঁহাকে বহু প্রকার করিয়াছেন।**
অতএব দেখা গেল যে অব্যক্ত ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। গীতা হইতে শ্লোকদ্বয়ে তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। (একাংশেন স্থিতং জগৎ)। আমরাও বলি যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপই তাঁহার যেন এক একটী অংশ—নিরংশের অংশ। গ্রন্থ কথিত অব্যক্ত যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা যে অব্যক্ত সম্বন্ধে বলিয়াছি, কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ এবং গীতাও সেই অব্যক্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে কঠোপনিষদের উক্ত মন্ত্র চতুষ্টয় সম্বন্ধে (অব্যক্ত সম্বন্ধে) কাহারও কাহারও ধারণা এই যে অব্যক্ত শব্দে সাংখ্য প্রধান এবং পুরুষ শব্দে সাংখ্য পুরুষকে বুঝায়। এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা বেদান্তদর্শনের বহু সূত্র (১।৪।১-৭ এবং শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কঠোপনিষদ অদ্বৈতবাদিনী। সেই উপনিষদ পাঠ করিলেই ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। এই উপনিষদ্ নানাত্বের একান্ত বিরোধী। এই উপনিষদই বারংবার বলিয়াছেন :—

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি (৪।১০)
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি (৪।১১)

এই উপনিষদ্ পাঠে কেহই বলিতে পারিবেন না যে উহা সাংখ্য মত সমর্থন করেন। অব্যক্তের অর্থ সুস্পষ্ট, অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত বিশ্বের সূক্ষ্মতম বীজ, অর্থাৎ যাহা আদিতে অব্যক্ত ছিল এবং যাহা ব্যক্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের ৫।১২ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম তাহার একরূপকে বহু করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল স্থলে অব্যক্ত শব্দে সেই রূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সাংখ্য প্রধানকে নহে। সেইরূপ যে ব্রহ্মের গুণ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না, তাহাও ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর প্রধান ত ব্রহ্ম বা পুরুষের গুণ নহে। কঠোপনিষদের ৩।১১ মন্ত্রোক্ত মহৎ শব্দটীও সাংখ্যের পরিভাষা বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু কঠোপনিষদ্

** শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।১৪ ও ৫।১৫ মন্ত্রদ্বয়ে "অনেকরূপং" বলিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে বীজ অর্থে রূপ অর্থাৎ গুণ, তাহা সুনিশ্চিত।

একমাত্র ব্রহ্মই সমুদায়, ইহাই উপদেশ দেন। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ করেন এবং উহাদিগকে পরস্পর বিরোধী স্বাধীন তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, কিন্তু কঠোপনিষদ্ ব্রহ্ম হইতেই জড় জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। (একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।) এবং নানাত্বের অত্যন্ত বিরোধী সাংখ্য নিরীশ্বর, কিন্তু কঠোপনিষদ্ ব্রহ্মবাদিনী। এই উপনিষদ্ কখনই সাংখ্যোক্ত অব্যক্তকে এবং সাংখ্য পুরুষকে নিজ গ্রন্থ মধ্যে স্থান দান করিয়া নিজেকে বহুবাদিত্বে পরিণত করিতে পারেন না। সাংখ্য পুরুষ স্বীকার করিলেই বহু আত্মা সুতরাং নানাত্ব অবশ্যম্ভাবিরূপে স্বীকার্য্য হয় এবং সাংখ্যের অব্যক্ত স্বীকার করিলেও স্বাধীনা প্রকৃতি স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহা অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রোক্ত উপনিষদ্ উহার ৫।১২ মন্ত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই উপনিষদে বেদের পরমপূজনীয় ব্রহ্মের (শব্দের) উল্লেখ আছে। (২।১৫, ২।১৬, ৫।৬, ৫।৮, ৬।১, ৬।১৪ ৬।১৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। সাংখ্য ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা সাংখ্য-মতের বিরুদ্ধ মতই এই উপনিষদে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় মন্ত্রে (৩।১১) পুরুষকে "পরাগতি" শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুরুষ শব্দে কখনই সাংখ্য পুরুষকে বুঝায় নাই। 'পরাগতি' শব্দে ইহা বুঝায় যে একজন নিম্নস্তরেও অন্যজন উচ্চতম স্তরে অবস্থিত এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তির উচ্চস্থ ব্যক্তির দিকে যাইতেই হইবে এবং সেই স্থলে না যাইতে পারিলে তাহার আর উপায় নাই। উপনিষদ্ সমূহে ব্রহ্মকেই সেই ভাবে জীবাত্মার পরাগতি বলিয়া নানা শব্দে এবং নানা বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য পুরুষকে জীবাত্মার পরাগতি বলা যাইতে পারে না। কারণ, সাংখ্য পুরুষ ও জীবাত্মায় সাংখ্য দর্শনে কোন পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন নাই। বিশেষতঃ পুরুষ অসংখ্য ও বিভিন্ন। একজনই "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ও "সর্ব্বপ্রধান" হইতে পারে, কিন্তু বহু কখনও তাহা হইতে পারে না। আবার সাংখ্য পুরুষও প্রকৃতির স্রষ্টা বা উপাদান নহেন। সুতরাং মন্ত্রোক্ত ইন্দ্রিয়, বিষয়, মনঃ, বুদ্ধি, এবং অব্যক্তের গতি পুরুষের দিকে হইতে পারে না। পুরুষ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন এবং বিপরীত তত্ত্ব। একের সহিত অন্যের কোনই সম্পর্ক নাই, বরং বিপরীত সম্পর্কই আছে। একে অন্যের স্রষ্টা নহেন। পুরুষের মুক্তির পর প্রকৃতির সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিবেনা।

উভয়ই অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া কথিত হয়। কল্পান্তে পুরুষে প্রকৃতির লয় হয়, ইহাও বলা হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মে জড় জগতের লয়ের উক্তি স্পষ্টাক্ষরে উপনিষদে লিখিত আছে। সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক না কেন, সাংখ্য-পুরুষ সাংখ্য-প্রকৃতির পরাগতি বলা যাইতে পারে না।

এই উপনিষদের ৫।৬ মন্ত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৫।৮ মন্ত্রে পুরুষ ও ব্রহ্ম যে এক তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং কঠোপনিষদুক্ত পুরুষ ব্রহ্মই, তিনি কখনই সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ্ যে অতি পুরাতন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু সেই উপনিষদেও বহু স্থলে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদেও ঐরূপ ব্যবহার আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে কঠোপনিষদুক্ত পুরুষ ব্রহ্মই, সাংখ্য পুরুষ নহেন। ইতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রোক্ত ভাব আরও সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপনিষদের অন্যান্য বহু মন্ত্র আলোচনা করিলেও সাংখ্যমতের খণ্ডনই পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ধারণা যে অমূলক, তাহা সুনিশ্চিত। এখন আমরা আলোচ্য মন্ত্র চতুষ্টয়ের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মহৎ শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ মহৎ শব্দের অর্থ বুদ্ধি। এই অর্থ গ্রহণ করিলেই মনে করিতে হইবে না, যে উপনিষদ্‌কার ঋষি সাংখ্যমত সমর্থন করিয়াছেন। "মহৎ শব্দ সাংখ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে" এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক যে সাংখ্য দর্শন রচনা ও প্রচলনের পরে ঋষি দ্বারা কঠোপনিষদ্ উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ্ বহু। কিন্তু উহাদের মধ্যে অল্প কয়েকখানি মাত্র বৈদিক উপনিষদ্। শেষোক্ত উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদ্ একখানি পুরাতন বৈদিক উপনিষদ্। উহা আধুনিক উপনিষদ্ নহে। যজ্ঞাগ্নির নাম "নাচিকেতাগ্নি" বহু পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত আছে। কঠোপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ শাখার অন্তর্গত। এ অবস্থায় সাংখ্য দর্শন কঠোপনিষদ্ হইতে তত্ত্ব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কঠোপনিষদ্ সাংখ্য দর্শন হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে তাহাদের মত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কঠোপনিষদকেই প্রামাণ্য মনে করিয়া নিজমত সমর্থনার্থ উহা হইতে মন্ত্র উদ্ধার করেন। কিন্তু কঠোপনিষদের সমর্থকগণ সম্বন্ধে সেই ভাব দেখা যায়

না। অর্থাৎ তাহারা কঠোপনিষদের সমর্থনার্থ সাংখ্য হইতে কিছুই উদ্ধার করেন না।

সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলা হয়, তথাপিও যে উহা হিন্দু-দিগের ষড় দর্শনের মধ্যে ভুক্ত, তাহার কারণ এই যে সাংখ্যবাদিগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং বেদান্ত হইতে প্রকরণ-বিচ্ছিন্ন দুই একটী মন্ত্র, বাক্য বা শব্দ দ্বারা স্বমত সমর্থনার্থ উদ্ধার করেন। সাংখ্য মতাবলম্বিগণ সমস্ত গ্রন্থের ভাবধারা বা প্রকরণের উল্লেখ করেন না. কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রের কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা নিজেদের মত সমর্থন করেন মাত্র। এ অবস্থায় কঠোপনিষদ্ সাংখ্য হইতে তত্ত্ব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন না বলিয়া সাংখ্যই কঠোপনিষদ্ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া নিজ মতোপযোগী ভাবে উহার বিস্তার সাধন করিয়া একটী নূতন দার্শনিক মত গঠন ও প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলিলেই সুসঙ্গত হইবে। কারণ, সাংখ্যবাদিগণ নিজেরাই স্বীকার করেন যে সেই দর্শনের মূলে বেদ ও বেদান্ত। সাংখ্যদর্শন স্মৃতি মধ্যে গণ্য। বৈদিকী শ্রুতির উপর উহার স্থান কখনই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

ইহাও হইতে পারে যে মহৎ শব্দের বুদ্ধি অর্থই তৎকালে প্রচলিত ছিল। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে সাংখ্য দর্শন ও কঠোপনিষদের মধ্যে কোনটী প্রাচীনতর এবং মহৎ শব্দ কঠোপনিষদের সময় অন্যত্রও বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা অথবা মহৎ শব্দ কঠোপনিষদের ঋষি বা সাংখ্যকারের সৃষ্ট শব্দ (coined word বা পরিভাষা)।

মহৎ শব্দের বুদ্ধি অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দুই মন্ত্রের পূর্ব্বল্লিখিত অনুবাদ সঙ্গত হইতে পারে। কেবল ৩।১১ মন্ত্রে "মহৎ হইতে" স্থলে 'বুদ্ধি হইতে' বলিলেই হইল। এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে ৩।১০ মন্ত্রে বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। "বুদ্ধি হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ" ইহা পুনরায় দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিবার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ মহৎকে পুনরায় ২য় মন্ত্রে আনিবার প্রয়োজন কি? ৩।১১ মন্ত্রে পুরুষ শব্দে যে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্য জীবাত্মাকেই পুরুষ বলেন। ৩।১০ মন্ত্রে উক্ত মহান্ আত্মাই সাংখ্য পুরুষ বাচ্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং ৩।১১ মন্ত্রের পুরুষ শব্দে জীবাত্মাকে বুঝাইতে পারে না। উপনিষদ্কারই জীবাত্মাকে মহান্ আত্মা এবং পুরুষকে (ব্রহ্মকে) পৃথক্ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে মহান্ আত্মা শব্দে দেহাবদ্ধ সুতরাং দোষপাশাবদ্ধ জীবাত্মাকেই

লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবাত্মার স্বরূপকে নহে। এই উপনিষদই অন্য স্থলে জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত ভোক্তা আত্মা বলিয়াছেন। (৩।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ৩।১৩ মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও উক্ত ভাবই উপলব্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ ঃ—৩।১১ মন্ত্রের 'মহতঃ' শব্দের অর্থ 'মহান্ আত্মা হইতে' গ্রহণ করিলে পূর্ব্বলক্ষিত ক্রমভঙ্গ দোষ দূরীভূত হয়। উক্ত উপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬।৭-৮ মন্ত্রদ্বয়ে আমরা এইরূপ ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ সমর্থন পাই। এস্থলেও দেখা যায় যে ঋষি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এস্থলে "মহ-তোঽব্যক্তমুত্তমম্" বলা হইয়াছে অর্থ মহৎ হইতে অব্যক্ত উত্তম। সুতরাং এস্থলেও "মহতঃ" শব্দের পূর্ব্বোক্ত 'বুদ্ধি হইতে' অথবা 'মহান্ আত্মা হইতে' উভয় প্রকার অর্থই গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় ও এই মন্ত্রদ্বয়ের বিশেষ পার্থক্য এই যে একই মন্ত্রেই (৭ম মন্ত্রেই) একই পংক্তিতে বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, এবং মহৎ হইতে অব্যক্তকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ৩।১১ ও ৬।৭ মন্ত্রদ্বয়ে স্থিত মহতঃ শব্দের অর্থ 'মহান্ আত্মা হইতে, অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে। এস্থলে মহান্ আত্মা শব্দে দেহাবদ্ধ সুতরাং দোষপাশাবদ্ধ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবাত্মার স্বরূপকে লক্ষ্য করা হয় নাই। এস্থলেও জীবাত্মা ও পুরুষকে পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে 'মহতঃ' শব্দে ঋষি যদি 'মহান্ আত্মা হইতেই' মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি মহতঃ শব্দ ব্যবহার না করিয়া জীবাত্মা বোধক অন্য শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন। ইহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি। ধরা যাউক্ যে 'মহতঃ' শব্দ দ্বারা তিনি 'মহান্ আত্মা হইতে' লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার 'মহতঃ আত্মনঃ' শব্দদ্বয় প্রয়োগ করা উচিত ছিল। কিন্তু ছন্দের জন্য উভয় স্থলেই 'মহতঃ' শব্দ মাত্র প্রয়োগ করিয়াই 'মহান্ আত্মা হইতে' ভাব ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে। কঠোপনিষদ্ পদ্যে রচিত পদ্যে যে এরূপ সংক্ষেপ প্রয়োগ করা হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে উপনিষদের ভাষা উপন্যাসের ভাষা নহে। ইহাকে গুরুশাস্ত্রও বলা হয়। অর্থাৎ ইহাতে অধিক ভাব অল্প কথায় con-

centrated হইয়া বর্ত্তমান। ইহার ব্যাখ্যা যত সহজ মনে করা যায়, উহা তত সহজ নহে।

আবারও প্রশ্ন হইবে যে মহান্ আত্মা হইতে অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত কিরূপে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবাত্মা অর্থে দোষপাশাবদ্ধাবস্থ ভাসমান পরমাত্মা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 'মহান্ আত্মা' শব্দ দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপ লক্ষ্য করা হয় নাই। জীবাত্মা দোষ পাশে আবদ্ধ কেন? কারণ, তিনি দেহে আবদ্ধ। দোষ পাশ জাত গুণ এবং উহারা আত্মার দেহ সংসর্গে উৎপন্ন হয়। অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্মেরই একটী নিত্য স্বরূপ। এবং জীব-দেহ উঁহারই পরিণতি। দেহ উহার উৎপাদক অব্যক্ত স্বরূপের শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই জীবাত্মার আবাস স্থল হইতে এবং জীবাত্মার উপর শক্তি প্রচালনে সমর্থ হইয়াছে। এ সকলই পরমপিতার ইচ্ছায় তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সম্পন্ন হইয়াছে। জীবাত্মার শক্তি হইতে দেহের শক্তি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দেহেরও কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা দেহ ও আত্মার মিলন ও উভয়ের যোগে কার্য্য অসম্ভব হইত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "গুণ বিধান," "জড়ের বাধকত্বের কারণ," "আত্মা ও জড়ের মিলন" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ চতুষ্টয়ে দেখিত পাইব। যে দেহ জীবাত্মাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দেহের আদি উৎপাদক ব্রহ্মেরই অব্যক্ত স্বরূপকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি বন্ধন করিয়াছেন, তিনি বদ্ধ হইতে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বন্ধন করিবার শক্তির জন্যই অব্যক্তকে এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। নতুবা জীবাত্মার শক্তিও অসীম, কেবল বিকাশ সাপেক্ষ। দেহের শক্তি যে তুচ্ছ নহে, তাহা অন্য ভাবেও বুঝিতে পারা যায়। জীবের অনন্ত প্রায় জীবনের সাধনা কি? ইহার উত্তর বুঝিতে গেলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে দেহের অসংখ্য বন্ধন হইতে মুক্তিই জীবের সাধনা—দেহের অসংখ্য আবরণ উন্মোচনই তাহার সাধনা। জীবাত্মা ত স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। এই অসংখ্য আবরণ বা বন্ধন মোচন করিয়া আত্মস্বরূপ লাভ করাই তাঁহার সাধনা। আবার সকল বন্ধন বা আবরণ একমাত্র দেহজনিত, ইহার অন্য কারণ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই অব্যক্ত জীবদেহে পরিণত হইয়াছে। সেই দেহ তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা আত্মাকে বদ্ধভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনেকে

জড়কে তুচ্ছ পদার্থ মাত্র মনে করেন, কিন্তু জড় সামান্য বস্তু নহে, তাহা প্রোক্ত অংশ সমূহ পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বলা যাইতে পারে যে কঠ ৬৷৮ মন্ত্রে পুরুষকে অলিঙ্গ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি নিত্য অশরীরী। সুতরাং তিনি জীববৎ দেহবদ্ধ নহেন, কিন্তু ব্যাপক—অনন্ত ভাবে অনন্ত উদার—অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্বাধীন। অর্থাৎ দেহই জীবের সকল দোষ পাশের মূল উৎস, সকল বন্ধনের কারণ। "অলিঙ্গ" শব্দ দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। আবার কঠ ৩৷৪ মন্ত্র জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তা আত্মা বলা হইয়াছে। "সাংখ্যমত" অংশে আমরা দেখিতে পাই যে সাংখ্য বলেন যে প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে এবং প্রকৃতি পুরুষকে মোক্ষদান করে। মায়াবাদ বিশ্লেষণ করিলেও ঐ একই তত্ত্বে আমরা উপনীত হই। অর্থাৎ মায়াই জীবাত্মাকে বন্ধন ও মোক্ষ দান করে। সুতরাং অব্যক্তের যে অসীম শক্তি, তাহা সাংখ্য ও মায়াবাদেও স্বীকৃত হইয়াছে।

এই উপনিষদে বহু স্থলে "মহান্" শব্দ জীবাত্মার বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই উপনিষদে জীবাত্মাকে কখনও পরমাত্মার সহিত এক এবং কখনও পৃথক্ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা, কিন্তু দেহাবদ্ধ ভাবে ভাসমান অবস্থায় অপূর্ণ। এই সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদের ৩৷১৷১-৩ মন্ত্র সমূহ দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম ও জীবে ভেদাভেদ সম্পর্ক।

অতএব পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় এবং বহু ভাবের চিন্তার অবলম্বনে আমরা পাইলাম যে কঠোপনিষদ্ ব্রহ্মের একটী স্বরূপকেই অব্যক্ত বলিয়াছেন, সাংখ্য প্রধানকে কখনই অব্যক্ত ভাবে লক্ষ্য করেন নাই। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বেদান্ত দর্শন নানা উপনিষদের নানা মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বহু সূত্রদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সাংখ্য প্রধান জগৎ কারণ নহে। একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। পাদটীকা সমাপ্ত)।

শ্বেতাশ্বরতরোপনিষদ বলেনঃ—"একোবশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম একং বীজং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ৬৷১২" বঙ্গানুবাদঃ—"যিনি অনেক নিষ্ক্রিয় বস্তুর একমাত্র নিয়ন্তা, যিনি একমাত্র বীজকে বহু প্রকার

করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অন্যের তাহা হয় না।" ইহা ও কঠোপনিষদুক্ত তত্ত্ব একই। এস্থলে 'রূপ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বীজ' ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। আমরাও বলি যে ব্রহ্মই পরম পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাঁহার প্রকৃতিস্বরূপা এবং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই বীজস্বরূপ। তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির হস্তে সেই বীজ প্রদান করিয়াছেন। উঁহা (ইচ্ছাশক্তি) উঁহাকে (অব্যক্তকে) জগৎরূপে গড়িয়াছেন ও পোষণ করিতেছেন। প্রোক্ত 'একং রূপং' ও 'একং বীজং' ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের যে একটী স্বরূপ, তাহার আরও প্রমাণ এই যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪।১৪ এবং ৫।১৩ মন্ত্রদ্বয়ে ব্রহ্মকে 'অনেক রূপম্' বলিয়াছেন। আবার পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে কঠোপনিষদ্ অব্যক্তকে ব্রহ্মের পরেই স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম ও অব্যক্ত বা জগদ্বীজ সম্পূর্ণরূপে (Identical) নহেন, কিন্তু উঁহা তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপ সুতরাং তাঁহারই অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে দেখা যায় যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ জগদ্ব্যাপ্ত এবং তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত। আমরাও তাহাই বলি। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৯।৪" "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ (১০।৪২)।" "বঙ্গানুবাদ ঃ—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না। অথবা তোমার এ সকল বহু বিষয় জানিবার কি প্রয়োজন? আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য সমূহ যেমন স্বর্ণ দ্বারা গঠিত এবং স্বর্ণভিন্ন উহাতে অন্য কোন বস্তু নাই, সেইরূপ জাগতিক নাম রূপ অব্যক্ত দ্বারাই গঠিত এবং উহাই জগতের একমাত্র বস্তু। স্বর্ণ ভিন্ন যেমন স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্যের কোনই অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ অব্যক্ত স্বরূপ ভিন্ন জাগতিক নাম রূপেরও কোনই অস্তিত্ব নাই। তাই

অব্যক্ত স্বরূপ জগদ্ব্যাপ্ত না হইয়াই পারেন না। অব্যক্তকেই একাংশ বলা হইয়াছে। কারণ, অব্যক্ত ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত অংশের একাংশ। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ। এস্থলে (১০।৪২ শ্লোকে) ব্রহ্মের একতম স্বরূপকে একাংশ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে এই একাংশ শব্দে ব্রহ্মের একপাদ বুঝায়। তাহা হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ—হিন্দু শাস্ত্র কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন যে বিশ্ব ব্রহ্মের একপাদে অবস্থিত। কিন্তু চতুষ্পাদ ও একপাদ শব্দদ্বয় এত প্রচলিত যে সেই 'এক পাদের' স্থলে 'একাংশ' শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্মের একপাদে বিশ্ব স্থিত বলায় তাঁহার একটী স্বরূপকে কোথায়ও লক্ষ্য করা হয় নাই। উহার অর্থ এই যে বিশ্ব সসীম এবং ব্রহ্ম অনন্ত অসীম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বিশ্ব ব্রহ্মের অন্তর্গত ভাবে বর্তমান। পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে God is both Immanent and Transcendent (ব্রহ্ম বিশ্বগ ও বিশ্বাতিগ)। তৃতীয়তঃ—অনন্তকে চারি দ্বারা ভাগ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মের একপাদও নাই, চতুষ্পাদও নাই। আবার মায়াবাদোক্ত সগুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের মায়োপহিত এক চতুর্থাংশ। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবেনা যে অব্যক্ত স্বরূপই মাত্র মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি পূর্ণ ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ। আবার ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায় না। মায়াবাদ কখনও উহার সগুণ ব্রহ্মকে অব্যক্তস্বরূপ মাত্র স্বীকার করিবেন না। চতুর্থতঃ—ধরা যাউক্ যে কোনও একটী বস্তুর বিশটী গুণ আছে, সুতরাং সেই বস্তুটী সেই বিশটী গুণের সমষ্টি। সুতরাং সেই বস্তুটীর একটী মাত্র গুণকে উহার এক অংশ বলা যায়। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ আছে এবং তিনি সেই অনন্ত স্বরূপের একত্ব বা অনন্ত মিশ্রণ। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপকে তাঁহার এক একটী অংশ বলা যায় এবং এই স্থলে সেইরূপ অর্থেই একাংশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চমত :—প্রথম শ্লোকে (৯।৪) দেখা যায় যে ব্রহ্ম অব্যক্ত মূর্ত্তিতে

জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া আছেন অর্থাৎ অব্যক্তই জগতের উপাদান। উভয় শ্লোকই একার্থবাচক। প্রথমটীতে অব্যক্ত তত্ত্ব সুস্পষ্ট। সুতরাং দ্বিতীয়টীতেও অব্যক্ত সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। উভয় শ্লোকের লেখক এক ব্যক্তি। সুতরাং একাংশ শব্দ দ্বারা অব্যক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মের একপাদকে নহে।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দ্বয় এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক বাক্যে বলিতেছেন যে অব্যক্ত বা জগদ্বীজ ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ। এই সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দু মাত্র স্থান নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে অব্যক্ত বা জগদ্বীজ ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু হইতেই পারে না। যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম উহা দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করাও যাহা, ব্রহ্মকে সসীম বলাও তাহা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে উপনিষদ্দ্বয়ে ও গীতায় যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহা যে আলোচ্য অব্যক্ত, তাহার প্রমাণ কি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইতিপূর্ব্বে যুক্তি যোগে প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত অব্যক্ত হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই অব্যক্তই যে জগদ্বীজ, তাহাতে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। উপনিষদ্দ্বয় সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতেই জগৎ উৎপন্ন। সুতরাং আলোচ্য অব্যক্ত ও শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত একই। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনোক্ত অব্যক্তের সহিত শ্রুত্যুক্ত অব্যক্তের মোটেই ঐক্য নাই। পরমাণু ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেই পারে না। প্রধানকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা দূরের কথা, নিরীশ্বর সাংখ্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অপরন্তু প্রধানকে উহা কথিত পুরুষের ও বিপরীত ও অসদৃশ তত্ত্ব বলিয়াছেন। মায়াকে কেহ কেহ ব্রহ্মের শক্তি বলেন। শক্তি নিমিত্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহা উপাদান কারণ হইতে পারে না। কারণ, শক্তিতে বস্তু সত্ত্বা নাই, উহা ক্রিয়া করিতে সমর্থ মাত্র। মায়া যে ব্রহ্মের শক্তিও হইতে পারে না, তাহা 'মায়াবাদ' অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনিষদ্ এবং বেদান্ত দর্শন উভয়ই ব্রহ্মকে

জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মের এক-তম স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের উপাদান এবং তাঁহারই ইচ্ছা-শক্তিকে নিমিত্ত কারণ বলি। স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম যে সমগ্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হন নাই, কিন্তু তাঁহারই একতম স্বরূপ অব্যক্তই যে উহার উপাদান কারণ, তাহা ইতঃপর প্রমাণিত হইবে। অতএব মায়া জগতের উপাদান হইতে পারে না। মায়াবাদ ব্রহ্মের তিনটী মাত্র স্বরূপ স্বীকার করেন। যথা—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্ব। মায়া যে ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না, তাহা পঞ্চদশীও বলেন। পঞ্চদশী মায়াবাদের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের ২।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সুতরাং মায়া যে ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, তাহা সুস্পষ্ট এবং মায়াবাদও তাহা অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং মায়াকে কিছুতেই শ্রুত্যুক্ত ও গীতোক্ত অব্যক্ত বলা চলে না। আবার মায়া বৌদ্ধ অবিদ্যার অনু-করণ বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা Nothing. Nothingness এর মধ্যে কোনই বস্তু সত্তা নাই বা থাকিতেও পারে না। সুতরাং উহা কিছুরই উপাদান হইতে পারে না। ইহা সহজ-বোধ্যও বটে। যাহা স্বয়ং কিছু না, তাহা কি প্রকারে অন্য বস্তুর উপাদান হইতে পারে? Nothing can come out of nothing. (ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৬।২।১-৩)। মায়াবাদ যে মায়াকে ভাবরূপা বলেন, তাহা সত্য নহে। ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশ দ্রষ্টব্য। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে গীতা উপনিষদের প্রতি-ধ্বনি। "গীতামাহাত্ম্য"ও তাহাই বলেন। কঠোপনিষদের ভাষা পর্য্যন্ত উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং সেই উপনিষদ্ যখন ব্রহ্মের একতম স্বরূপকে সুস্পষ্ট ভাবে অব্যক্ত বলিয়াছেন, তখন গীতারও সেই একই মত বলিতে হইবে। গীতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এই যে অব্যক্ত ব্রহ্মের এক অংশ অর্থাৎ একরূপ এবং উঁহা দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট ও ব্যাপ্ত। উপনিষদ্দ্বয়ের অব্যক্ত ও গীতার অব্যক্তে কিছুই পার্থক্য নাই। আমাদের মতের সহিত উপনিষদ্ ও গীতার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কঠোপনিষদের ৫টী, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩টী ও

গীতার দুইটী মন্ত্র একত্রে পাঠ করিলে এবং পূর্ব্বালোচিত বিষয় সংস্কার বর্জ্জিত ভাবে অনুধাবন করিলে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে আলোচ্য অব্যক্ত এবং শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত অব্যক্ত একই। সত্যদর্শন অব্যক্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতি উঁহাকে ব্রহ্মের একতম স্বরূপমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, সেই স্বরূপ যে কি, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই, এই মাত্র পার্থক্য। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে একমাত্র সত্যদর্শনোক্ত অব্যক্তই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ, যাহা জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনোক্ত অব্যক্ত স্বয়ং ব্রহ্ম ত নহেনই, তাঁহার স্বরূপও নহেন। ইতি-পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে ও এখন যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা যুক্তিযুক্ত ভাবে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সত্যদর্শনোক্ত অব্যক্তই প্রকৃত অব্যক্ত বা জগদ্বীজ। যেহেতু অন্যান্য দর্শনোক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মের একতম স্বরূপ নহে, সেই হেতুই উহারা শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধী, সুতরাং উহারা গ্রহনীয় নহে। আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই জগদ্বীজ হইতে পারে না। কারণ, তাহা কল্পনা করিলে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম ভিন্ন উহা সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর কল্পনা করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না। তিনি উহা দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন যে কিছুই ছিল না, তাহা উপনিষদ্‌ বহু স্থলে বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে দার্শ-নিক প্রবর Plato কথিত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য Self-Existent Reality সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে উহা নিরাকার ও এরূপ নমনীয় যে উহা দ্বারাই তিনি জগৎ রচনা করিয়াছেন। Platoর মতে উহাই জগদ্বীজ বা অব্যক্ত। সেই অব্যক্ত সম্বন্ধে Principal Stephen যাহা বলিয়াছেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "The above hypotheses agree in affirming one Self Existent Reality. But certain aspects of the world as manifested in experience—its apparent imperfection and the prevalence of evil, have led many to think

that the world is best explained by supporting two Self-Existent Substances and powers of opposite nature, each resisting the other. One must be conceived as conscious, rational and good, striving to evolve a world which will also be perfectly good. This will be God. But nothing can be made out of nothing ; therefore there must be self-existent material outside of God for God to operate upon (as the potter can produce nothing without his clay)." "This self-Existent material must be conceived as separated by the whole diameter of being from the other Self-Existent Principle viz. God. It must be entirely without form or quality of its own. Plato spoke of it as the Non-Existent, because it is not anything in particular. Never theless though it is by itself nothing in particular, it is the antecedent condition of everything in the world of concrete nature and must be conceived as having some kind of plasticity in virtue of which it can be moulded into conerete form. Over against this formless substance then, there is the Divine Mind with its idea of perfect world and the Divine Will strives to impose this idea upon the formless material—gives to it form and quality, and thereby moulds it into things and will build up the things into an organised world of suns, planets and living cretures. But this Self-Exitent substance though described as without form and quality, must never-

theless have the power of resistance and must resist the transforming power of the Divine Idea. It is essentially what we call matter. The resistance of matter then, is what makes the world to be imperfect and incomplete. The Divine Idea can never be fully realised and therefore the process goes on eternally." "বঙ্গানুবাদ :— উপরোক্ত অনুমান সমূহ একটী মাত্র স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে একমত। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় পাই যে জগৎ স্পষ্টই অপূর্ণ ও ইহাতে দোষ ত্রুটী আছে। ইহাতে অনেকে মনে করেন যে পরস্পর বিপরীত ও বিরুদ্ধভাবের ও প্রতিরোধ পরায়ণ দুইটী স্বাধীন সত্তার কল্পনা করিলে জগৎকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। একজন সজ্ঞান, প্রজ্ঞাবান ও মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলে পরিপূর্ণ জগতের বিকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু শূন্য হইতে কিছু প্রস্তুত করা যায় না। কুম্ভকার যেমন মাটি ভিন্ন কিছু প্রস্তুত করিতে পারেন না, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন এমন কোন স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থ থাকা চাই, যাহার উপর তিনি কার্য্য করিতে পারেন। এই স্বাধীন-সত্ত্বা-বিশিষ্ট পদার্থ অন্য স্বাধীন-সত্ত্বা-বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। ইহার কোন আকার বা গুণ নাই। Plato বলেন যে ইহা অস্তিত্ব বিহীন (non-existent)। কারণ, ইহা বিশেষ কোন বস্তু নহে। যদিও ইহা বিশেষ কোন পদার্থ নহে, তথাপি ইহা জড় জগতের পূর্ব্বাবস্থা। এবং ইহা অবশ্যই এমন নমনীয় যে সেই নমনীয়তা গুণে উহাকে জড়াকারে পরিণত করা যায়। এই নিরাকার পদার্থের উপর ঈশ্বর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বের ভাব নিয়া বর্ত্তমান। পরমেশ্বর তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার নিজ ভাবকে উক্ত নিরাকার পদার্থের উপর বর্ত্তাইতে চাহিতেছেন—ইহাকে রূপ গুণ দিয়া পদার্থে পরিণমন করিতেছেন এবং সেই সকল পদার্থ দ্বারা সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও জীবজন্তুপূর্ণ জগৎ

সৃষ্টি করিবেন। উক্ত স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের রূপ গুণ নাই বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ আচরণের শক্তি অছে। ইহা পরমেশ্বরের ভাবের (Idea এর) বিকাশের বিরুদ্ধাচারণ অবশ্যই করে। ইহা জড় পদার্থের সার পদার্থ। জড়ের বিরুদ্ধাচরণই জগৎকে পূর্ণ হইতে দেয় না ও পরমেশ্বরের ভাব পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে দেয় না। সুতরাং এই প্রণালী অনন্তকাল চলিবে।”

এখন আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব যে উক্ত মত কিঞ্চিৎ সংশোধন করিলেই আমরা পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রচারিত সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে পারি। মহামনা Plato এবং Aristotle যে রূপ গুণ-হীন পদার্থের কথা বলিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন ও বিপরীত দিকে অবস্থিত কোন পদার্থ নহে। কিন্তু তাহাই পরমেশ্বরের পূর্ব্ববর্ণিত অব্যক্ত গুণ অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। এই গুণ যে কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন যে দর্শনোক্ত অব্যক্তের সহিত আলোচ্য অব্যক্তের ঐক্য অধিক। উক্ত পদার্থকেও Formless অর্থাৎ নিরাকার বলা হইয়াছে। অব্যক্ত স্বরূপও যে নিরাকার, তাহা “অব্যক্ত কি” অংশে লিখিত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন জগৎ ও তদুৎপন্ন দেহ জীবে ব্রহ্মের গুণরাশির বিকাশের বাধা প্রদান করে। Plato কথিত অব্যক্তকে গুণহীন বলা হইয়াছে। উহার অস্তিত্ব আছে, সুতরাং উহা গুণবান। উহার নমনীয়তা গুণও আছে। উহা যখন নিরাকার, তখন নিরাকারত্ব যে উহার একটী গুণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উহার বিরোধিতা করিবার শক্তিও আছে। শক্তি স্বাধীনা নহে। উহা গুণ অবলম্বনে স্থিত অর্থাৎ গুণেরই শক্তি সুতরাং সেই অব্যক্তের এমন কোন গুণ আছে, যাহার শক্তিতে উহা পরমেশ্বরের কার্য্যের বিরোধিতা করিতে সমর্থ ও বিরোধিতা করে। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত অব্যক্ত অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক গুণ যে অনন্ত গুণনিধান ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একতম স্বরূপ সুতরাং নিত্য সত্য, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত

হইয়াছে। উহা নিরাকার এবং উহার সাকারত্ব উহার নিরাকারত্ব দ্বারা গঠিত। উহা অচেতন। ইহা ভিন্ন জড়ের যে সমুদায় গুণরাশি দেখিতে পাই, তাহা অনন্ত ইচ্ছাময় পরমেশ্বর তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত গুণে বর্ত্তাইয়াছেন। ইহা আমরা 'ইচ্ছাশক্তি' অংশে দেখিয়াছি। অনন্ত মঙ্গলময়ের ইচ্ছা যে জগৎ সৃষ্টির মূলে কার্য্য করিতেছেন, ইহাও উদ্ধৃত অংশে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত দর্শন মতে আমরা দেখিতে পাই যে পরমেশ্বর তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার নিজ ভাবসমূহকে উক্ত নিরাকার পদার্থের উপর বর্ত্তাইতে চাহিতেছেন—উহাকে রূপ গুণ দ্বারা পদার্থে পরিণমন করিতেছেন এবং সেই সকল পদার্থ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও জীবজন্তু পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মতেও অব্যক্ত স্বরূপ নিরাকারই। পরমপিতা উহার অবলম্বনেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ রচনা করিয়াছেন। উহাতে নানারূপ গুণ বর্ত্তাইয়া ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় উহাদের সংমিশ্রণে বিচিত্র জগৎ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রোক্তমতে আমরা দেখিয়াছি যে স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট রূপ-গুণ-হীন পদার্থ পরমপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে, জগৎকে পূর্ণ হইতে দিতেছে না এবং পরমেশ্বরের ভাবও (Ideaও) বিকশিত হইতে বাধা প্রদান করিতেছে। ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মেরই একটী স্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি জড়ের সৃজন করিয়া জীবদিগের বাধা উৎপাদন করিয়াছেন। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাইব যে দেহ আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধক এবং দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী আমাদের বাধার আধিক্য, অল্পতা ও স্বল্পতা সূচিত হয়। আবার জড়ের তথা দেহের নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব অব্যক্ত স্বরূপ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারাই পরমপিতা নিজ ইচ্ছায় বাধা উৎপাদন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে জীবসমূহ জড়ের সেই সকল বাধা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া পরিণামে তাঁহাতে তন্ময় হইবে। সৃষ্টির যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বগুণ

পরীক্ষা তাহা এই ভাবে তিনি সম্পাদন করিতেছেন। সুতরাং জড়ের বিরুদ্ধাচরণ যে আছে, তাহা সত্য এবং জীব সমূহ যে সেই বিরুদ্ধাচরণ জন্যই তাঁহাতে জন্ম মাত্রই তন্ময় হইতে পারিতেছেন না, বরং প্রায় প্রতিপদেই বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাও সত্য। কিন্তু Plato বিরুদ্ধাচরণের যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিরোধী অন্য স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের বিরুদ্ধাচরণের শক্তি, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আমাদের এবং প্রোক্ত মতের একমাত্র পার্থক্য দাঁড়াইল এই যে উক্ত মতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের কল্পনা করে; আর আমরা বলি যে ব্রহ্মেরই একটী স্বরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ জড় রূপে পরিণত হইয়া জীবের বাধকরূপে কার্য্য করিতেছেন। এখন দেখা যাউক্ যে স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট ও বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন দুইটী সত্তার আবশ্যকতা আছে কিনা এবং ঐরূপ দুইটী তত্ত্বের অস্তিত্ব আদবেই সম্ভব কিনা। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে পরব্রহ্মেই পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি তাঁহারই গুণ দ্বারা তাঁহারই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই কার্য্যের বাধা যে উৎপাদন করিতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। প্রকৃত ভাবে বুঝিতে গেলে সেই বাধা জনিত কার্য্যও তাঁহারই কার্য্য। এইরূপ কার্য্যও তাঁহারই প্রেমলীলার অঙ্গ বই আর কিছুই নহে। কারণ, তাঁহার গুণোৎপন্ন পদার্থ দ্বারা যে বাধা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ভিন্ন তাঁহার প্রেমলীলা সম্পূর্ণ হইত না। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, তাহা তাঁহারই হইতে, তাঁহারই হইতে তাঁহারই নিজ ইচ্ছা প্রসূত। জগতের সকল শক্তিই সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাধীন। তাঁহার শক্তি ভিন্ন, তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন সকল শক্তিই শক্তিহীন। এই সম্পর্কে পাঠক কেনোপনিষদে বর্ণিত উপাখ্যান স্মরণ করিবেন। তাহাতেই বুঝা যায় যে অগ্নি ও বায়ু দেবতাগণও ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন একটী তৃণকে পোড়াইতে বা নড়াইতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং কোন শক্তি যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য

করিবে, ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। দর্শনোক্ত শক্তির ফলস্বরূপ আমরা পাই জড়। উহা চিরদিনই ব্রহ্মের অধীন। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে দেখিতে পাই যে আমরা জড়কে ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়া বহু কার্য্য করিতেছি। বিজ্ঞান সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দিতেছেন যে জড়কে বিশেষ ভাবে এবং বহুভাবে মানবের করায়ত্ত করা যায়। আমরা অপূর্ণ ও জড়ভাবে জড়িত বলিয়া সকল জড়কে সকল সময় ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি না, কিন্তু পরমোন্নত মহাত্মাগণ অন্তরের রিপুকুল কেবল যে দমন করেন, তাহা নহে, কিন্তু উহাদের লয় সাধনও করেন এবং সেই জন্য দেহকে সম্পূর্ণরূপে আত্মাধীন করিতে পারেন। তাঁহারা জড়কেও বহু প্রকারে নিয়মিত করিবার শক্তি লাভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যিনি যত জড়ের উর্দ্ধে বাস করেন, তিনি তত জড়কে নিয়মন করিতে পারেন। সুতরাং পরমেশ্বর যখন অশরীরী ও পূর্ণব্রহ্ম, তখন তিনি যে সমস্ত জড় জগৎকে ও উহার মূল বীজকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছেন, ইহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। ব্রহ্মেই যে বিপরীত গুণ ও শক্তি সমূহ বর্ত্তমান এবং উহারা জগতে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই যে সর্ব্বদা মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাঁহার নিজেরই দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে অর্থাৎ অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোরাত্মক গুণরাশির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে যে অনন্ত একত্বের একত্ব তাঁহাতে সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাতেই নিত্য মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের উপাসক মহাসাধক Plato এর অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল এই ভাবেই সংসাধিত হইতেছে। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে জগৎ কার্য্যে নিত্যই মঙ্গল হইতেছে, এবং তাহাতে অন্য কোন শক্তি বা পুরুষের তিল মাত্রও স্থান নাই। ইহাতে কোন দোষ ত্রুটী সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং কেহ কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। অনন্ত অনন্ত অনন্ত ও নিত্যজ্ঞান-প্রেমময়ের রাজ্যে, অনন্ত অনন্ত অনন্তগুণনিধান ব্রহ্মের রাজ্যে

দোষ ত্রুটী বা অন্য শক্তির বিরোধিতা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও জানা গিয়াছে যে সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পরম পিতাই অপূর্ণ জগৎ বাধারূপে সৃজন করিয়াছেন। অন্য কাহারও বিরুদ্ধাচরণের শক্তিই নাই, সুতরাং কাহারও বিরুদ্ধাচরণে সৃষ্টি অপূর্ণ থাকিতেছে, ইহা সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য যে জীবকুলকে অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বে গ্রহণ করিবার জন্যই অপূর্ণ জগৎ বাধারূপে সৃষ্ট হইয়াছে। এই বাধা অতি-ক্রমের শক্তি দ্বারাই আমাদের বল, আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হইবে। ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। এইসম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্ত গুণই এমন, যাহাতে জীবে ব্রহ্মের গুণ-রাশি বিকাশের বাধা উৎপাদন করে। ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানময়, তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্য বাধা প্রয়োজনীয়। তাই তিনি এমন একটী গুণ select করিয়াছেন, যাহা হইতে পরিণত দেহ অন্ধকার ও বাধা উৎপাদন করিতেছে। Dr. Hiralal Halder মহাশয় যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:— "The Reality is the universal, which goes out of itself, particularises itself, opposes itself, that it may reach the deepest and most comprehensive unity with itself." (Two Essays on General Philosophy and Ethics). বঙ্গানুবাদ:—"প্রকৃতিতত্ত্ব (Reality) বিরাট, মহান্ ও অনন্ত। উহা নিজ হইতে বহির্গত হইয়া নিজেকে সসীমত্ব দান করে, নিজে নিজের বিরোধিতা করে, যাহাতে নিজে নিজের সহিত গভীরতম এবং ব্যাপকতম মিলনে মিলিত হইয়া এক হইতে পারে।"

এত সময় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মের জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাই এই সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বাহিরের শক্তি জগতে নাই। তাঁহার কার্য্যে বাহিরের শক্তি-বাধা জন্মাইবে, ইহা ত দূরের কথা।

পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক কল্পনার একটী প্রধান ত্রুটী এই যে, উহাতে সর্ব্বশক্তিমান—অনন্ত শক্তিমান ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে। কারণ, দ্বিতীয় বিরুদ্ধ শক্তির বিরোধিতার জন্যই তিনি তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না বলা হয়। অর্থাৎ উক্ত শক্তির নিকট পরমেশ্বর আংশিক ভাবে পরাজিত। তাই তাঁহার কার্য্য অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাতে আরও ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি দুইটী স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের অনুমান করা যায়, তবে উক্তরূপে বহু স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের কল্পনায় দোষ কি? সৃষ্টিতে বহু প্রকারের বহু শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তবে আমরা বহুবাদে (Plurarismএ) আসিয়া উপনীত হইলাম। আবার যদি দুইটী সম্পূর্ণ স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থই বর্ত্তমান থাকে, তবে একটী অপরটীর উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, উক্তরূপ কার্য্য Like alone can act upon like নামক theory এর (মতবাদের) বিরুদ্ধ, সুতরাং অসম্ভব। অতএব পরমেশ্বরের বিরোধী কোনও স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট * পদার্থের কল্পনা ভিত্তিহীনা। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই থাকে না। তিনি সসীম হইয়া পড়েন। ব্রহ্মাতিরিক্ত অব্যক্তের কল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, পাঠক তাহা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছু ছিল না, নাই বা থাকিবেনা এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম তত্ত্বই একমাত্র সত্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের উপর Principal Stephen এর মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—"They (God and other Self-Existent Reality) may be separated from each other by the whole diameter

---

* "আত্মা ও জড়ের মিলন", "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ ত্রয় দ্রষ্টব্য। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের মত উক্ত Theory এর বিরোধী নহে, বরং ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা ও জড় সম্পর্কেও উক্ত মত সত্য।

of being merely in the sense of opposite poles of the same Ultimate Reality. But this is equivalent to saying that each is neccssary as the correlative of the other and that both are therefore co-ordinate factors of one Concrete Reality which is monism." অর্থাৎ "তাঁহারা (পরমেশ্বর এবং স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট অন্য পদার্থ) এই অর্থে সম্পূর্ণ বিপরীত যে তাঁহারা একই শেষ সত্তার (Ultimate Reality এর) বিপরীত দিকে অবস্থিত। উহার অর্থই কিন্তু এই যে উভয়ই পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং উহারা এক বাস্তব সত্তার সমশ্রেণীভুক্ত উৎপাদক এবং ইহাই একত্ব বা অদ্বৈত তত্ত্ব।"

পাঠক দেখিবেন যে ইহাতেও আমাদের মতই অন্য প্রকারে সমর্থিত হইয়াছে। তিনি আরও দেখিবেন যে Plato কথিত মতের কোনও ত্রুটী আমাদের দ্বারা বর্ণিত তত্ত্বে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক মতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে মহামনা Plato পরমপিতা পরমেশ্বরের বিরোধী একটী বাহিরের শক্তি কল্পনা করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের রাজ্যে তাঁহার বিরোধী কোন শক্তির বর্ত্তমানতা যে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার সেই নিত্য প্রণম্য একছত্রাধিপতি মহারাজাধিরাজের রাজ্য বহির্ভূত স্থান বা অন্য কোনও সত্তার অস্তিত্ব যে একান্তই অসম্ভব, ইহাও আমাদের সহজ জ্ঞান লভ্য। যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বেই এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বাইবেলেও উক্তরূপ বিরোধপরায়ণ একটী বিশেষ ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাকেই সয়তান বলা হয়। সে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সয়তানই জগতের সকল অনর্থের মূল। সেই আদমের পতনের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে পারস্য দেশেও ঐরূপ দুইটী বিরুদ্ধ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কল্পনা করা হইয়াছিল। সৃষ্টিতে সকলই তাঁহার ন্যায় ভাল হয়, একজন এইরূপ ভাবে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। তাঁহার নাম আহুরা মজদা। কিন্তু অন্য একজন যাহাতে আহুরা মজদার সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্য্যসমূহ পণ্ড

হয় ও মন্দ পরিণামে পরিণত হয়, তাহার জন্যই ব্যস্ত থাকে। তাহার নাম অশ্বমান। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে এই তিনটী মত প্রায় একরূপ। কেবল বিন্যাসের পার্থক্য। পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে ইহার কোন দুই মত অন্য তৃতীয় মত হইতে উদ্ভূত কিনা অথবা উহারা স্বাধীন ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। Plato গ্রীসদেশবাসী, Bible Asia Minor হইতে প্রচারিত, পারস্য দেশও উহাদের হইতে দূরবর্ত্তী নহে। পরস্পরের মধ্যে নানাভাবের আদান প্রদান যে হইত, তাহা ইতিহাসও সাক্ষ্য দিবেন। এ অবস্থায় একটী মত অন্যটির মূলে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কেহ বলিতে পারেন যে Plato এর মত অতি সূক্ষ্ম, আর অন্য দুই মত স্থূল। সুতরাং উহাদের মূল এক নহে। ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দার্শনিক Plato দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতগণ মাত্র পাঠ করিবেন ও উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, কিন্তু অন্য দুইটী ধর্ম্মশাস্ত্র, উহারা সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রচারিত। কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব রূপকে নানা আকার প্রকার দান করিলে তত্ত্বের মোটামুটি ভাব সর্ব্বসাধারণের সহজেই বোধগম্য হইবে বলিয়া প্রাচীনগণ মনে করিতেন। প্রাচীনকালে যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায়ও বুঝিতে পারা যায়। দার্শনিক Kant "Thing-in-itself"কে Noumenon এবং জাগতিক নামরূপকে Phenomenon বলেন। দ্বিতীয়টীর পশ্চাতে প্রথমটী চির বর্ত্তমান। আমরাও তাহাই বলি। অব্যক্তই বা ব্রহ্মের একতম স্বরূপই Noumenon, Phenomenaই জাগতিক নামরূপ। উহাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন, কিন্তু Noumenon নহেন। অতএব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবধারা দ্বারাই বুঝা যায় যে আলোচ্য অব্যক্তই জগতের উপাদান বা জগদ্বীজ। সুতরাং যুক্তি ও শব্দ প্রমাণযোগে প্রমাণিত হইল যে আলোচ্য অব্যক্তই অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক ব্রহ্মের একতম স্বরূপই যথার্থ অব্যক্ত বা জগদ্বীজ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জগৎ স্বয়ং সমগ্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিলে ত্রুটি কোথায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতেই যদি জগৎ উৎপন্ন হইত, তবে চৈতন্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা

প্রভৃতি ব্রহ্মের অনন্ত গুণই উহাতে বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু সেই সকল গুণ জগতে দেখা যায় না। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপের গুণই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য প্রভৃতি গুণ জগতে দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতে একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মই উৎপন্ন হইতে পারেন, অত্যধিক ভাবে অপূর্ণ-জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। আমরা দেখিতে পাই যে মাতাপিতার দেহের সামান্য অংশের মিশ্রণে সন্তান দেহের উৎপত্তি এবং সেই দেহে উভয় দেহের আকার প্রকার (Features) বর্ত্তমান থাকে। যদি একমাত্র মাতা বা পিতার সমগ্র দেহ দ্বারা সন্তানদেহ প্রস্তুত হইত, তবে উহাও (সন্তান দেহও) মাতা বা পিতার দেহের ন্যায় হুবহু হইত, কোনই বিভিন্নতা থাকিত না। সেইরূপ সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে উহাও হুবহু ব্রহ্মের মতই হইত। কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না। আবার সমগ্র ব্রহ্ম হইতে অন্য একটি পূর্ণ ব্রহ্মও হইতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে একই কালে দুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। অতএব সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। জগতে দেখা যায় যে মাতা পিতার সমগ্র দেহদ্বয়দ্বারা সন্তানদেহ গঠিত হয় না। উহার জন্য উভয় দেহের অত্যল্প অংশেরই প্রয়োজন হয়। আবার বৃক্ষের একটি মাত্র ফল বা অতি ক্ষুদ্র প্রশাখা হইতে একটি বৃক্ষ সৃষ্ট হইতে পারে। সেই কার্য্যে সমগ্র বৃক্ষের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অত্যন্তভাবে অপূর্ণ জগৎ রচনার পক্ষে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটিমাত্র স্বরূপই যথেষ্ট। এই জন্য সমগ্র ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রোক্ত দর্শন সমূহও বলেন যে উহাদের কথিত অব্যক্ত হইতেই জগৎ উৎপন্ন। সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হওয়া দূরের কথা, উহাদের মতে অব্যক্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ, উঁহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নহে। সুতরাং অব্যক্ত হইতে জগৎ উৎপন্ন বলায় এক অর্থে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন বলা যাইতে পারে, যেমন শাখা

প্রশাখা হইতে উৎপন্ন ফলকে বৃক্ষেরই ফল বলা হয়। এই অর্থেই কোন কোন উপনিষদ্ ব্রহ্ম হইতেই জগদুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। ইহা যে সত্য, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি ও গীতা কথিত মন্ত্র সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে। অর্থাৎ উহারা বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের একটি স্বরূপের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সমগ্র ব্রহ্ম হইতে নহে। আচার্য্য বা পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রুতির ব্যাখ্যা অবশ্যই অধিকতর আদরণীয় ও গ্রহণীয়। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যখন সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতেই জগৎ উৎপন্ন, তখন উহাদিগকেই এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য শ্রুতি উক্তি সমূহের ব্যাখ্যা ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু উহাদের অন্য ব্যাখ্যা নহে। এস্থলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে এই পন্থা অবলম্বন করিলে অর্থাৎ শ্রুতি-উক্তি-সমূহ অন্যান্য শ্রুতির উক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে আমরা সদ্ব্যাখ্যা লাভ করিতে পারি এবং সাম্প্রদায়িক ও কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যার জন্য যে সকল অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও নিবারিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে পূর্ব্বোদ্ধৃত কঠ—৩।১০-১১ ও ৬।৭-৮ মন্ত্র চতুষ্টয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাদিগেতে অব্যক্তের উল্লেখ আছে এবং উহাকে ব্রহ্মের পরেই স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদ্ই বলিয়াছেন "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" সুতরাং ব্রহ্মের একরূপ হইতেই জগৎ আসিয়াছে, কিন্তু সমগ্র ব্রহ্ম হইতে নহে। সুতরাং সেই স্বরূপই অব্যক্ত বা জগদ্বীজ। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি উঁহাদের মধ্যে অন্যতমা! সেই ইচ্ছাশক্তিই অব্যক্তস্বরূপ যোগে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্রহ্ম তাঁহার একতম স্বরূপ হইতে তাঁহার একতম শক্তি যোগে জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কার্য্যে সমগ্র ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ ও অনন্ত শক্তির প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার একটি মাত্র স্বরূপ ও একটি মাত্র শক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে মাত্র। হিন্দু দর্শন সমূহ কল্পবাদ স্বীকার করেন। সেই অনুসারে চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে প্রতি কল্পান্তে জগৎ অব্যক্তে লয় হয়, অব্যক্ত ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে এবং পুনঃ

কল্পারম্ভে সেই অব্যক্ত জগদাকারে ব্যক্ত হয়। জগৎ কল্পান্তে ব্রহ্ম হইয়া যায় না, কিন্তু বীজাকারে অব্যক্তে সুতরাং ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সেই অব্যক্ত ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে এক (Identical) হইতে পারে না, কিন্তু উহা (অব্যক্ত) ব্রহ্মের অন্তর্গত কিছু। সুতরাং কল্পবাদ অনুযায়ী চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উহা তাঁহারই অন্তর্গত একটি বীজ হইতে আসিয়াছে। আমরাও বলি যে সেই বীজই ব্রহ্মের অন্তর্গত অব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপ ব্রহ্ম ভূমা ও অনন্ত—তাঁহার আদি বা অন্ত নাই, ইহা সকল ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রই এক বাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু সৃষ্টির যে আদি ও অন্ত আছে, তাহা প্রথম অংশ চতুষ্টয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহারা কল্পবাদ স্বীকার করেন, তাহারাও সৃষ্টির বিকাশ ও লয় হয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং বিশ্ব যে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা জগতে দেখি যে, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যে বস্তু যাহাতে লীন হয়, সেই প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তু হইতে অর্থাৎ উৎপন্ন উৎপাদক হইতে সর্ব্বদাই ক্ষুদ্রতর। বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই লীন হইবে। সুতরাং বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রতর। এই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত (বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত) যে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। আবার "যতদূর গবেষণা মানবশক্তিসাধ্য, তাহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভূমি অপেক্ষা জলভাগ অধিক ; বায়ু-পরিমাণ ভূমি, জল ও তেজঃ-পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক ; এবং আকাশ উক্ত চতুষ্টয়ের সমষ্টি অপেক্ষাও অধিক। অতএব যখন ভূমি অপেক্ষা জল, তেজঃ অপেক্ষা বায়ু ও বায়ু অপেক্ষা আকাশ বহু ব্যাপী ও বহু পরিমাণ সম্পন্ন, তখন অবশ্যই জল অপেক্ষা তেজঃও অধিক। নতুবা, ক্রম পূর্ণ জগতে অক্রমতা দোষ হয়।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে আকাশ যাহাতে লয় হয়, তিনি আকাশ হইতে সূক্ষ্মতর বা আকাশেরও কারণ এবং তিনি আকাশ-পরিমাণ হইতেও

বৃহত্তর। তিনি ব্রহ্ম এবং তাঁহাতেই বৃহত্তমত্বের নিরতিশয়ত্ব বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি জগদাকারে পরিণত হন নাই বা হইতেও পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Einstein সাহেব বলেন যে Space is finite though unbounded অর্থাৎ বিশ্ব সান্ত। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত অসীম এবং বিশ্ব তাঁহার অনন্ত উদার নিত্য প্রেমক্রোড়ে শিশুবৎ চিরকাল অবস্থিত। হিন্দু শাস্ত্র বলেন যে ব্রহ্মের একপাদে বিশ্ব অবস্থিত এবং তাঁহার ত্রিপাদ বিশ্বের অতীত; আমাদের মত পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই যে অনন্ত অসীম ব্রহ্ম বিশ্বেও আছেন এবং বিশ্বের অতীত অনন্তেও সমভাবে বর্ত্তমান। "সোঽহং জ্ঞান" অংশে ব্রহ্মের অনন্তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা পাঠক এই সম্পর্কে দেখিতে পারেন। যদি তিনি জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে তাঁহার অনন্তত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সসীমত্বে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে জগদাকারে পরিণত হন নাই, হইতেছেনও না এবং হইবেনও না। তৃতীয় অধ্যায়ের "জড়ীয় গুণ ও আধ্যাত্মিক গুণ" অংশে এই মত সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে উক্ত মত (ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইতেছেন) অযৌক্তিক। আমরা ইতঃপর দেখিব যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণতিতে জড় জগতের উৎপত্তি হইত অর্থাৎ যদি জড় জগৎ স্বরূপতঃই সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মই হইতেন, তবে জীবাত্মায় এবং জড় জগতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য থাকিত না। অথচ আমরা তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য দেখিতেছি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণতিতে জড় জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। আর জড় জগৎ ব্রহ্মের একটী মাত্র স্বরূপের পরিণতিতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই নিজে সীমা বিশিষ্ট হইয়াছে এবং আত্মাকেও বাস্তবে সসীম অবস্থায় আনিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন নাই। কারণ,

ব্রহ্ম অনন্ত অপার, আর জগৎ তাঁহারই প্রেমক্রোড়ে ক্ষুদ্র শিশুবৎ অবস্থিত। সেই অনন্ত মানচিত্রে বিশ্ব একটী জ্যামিতিক বিন্দুবই আর কিছুই নহে। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে জগৎ রচনার জন্য সেই অনন্ত অপার পূর্ণ ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজন হয় নাই বা হইতেও পারে নাই, জগৎ এত ক্ষুদ্র. এত সসীম ও এত অপূর্ণ। উহার সৃষ্টির জন্য তাঁহার অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপই যথেষ্ট। উঁহাও তাঁহার সমগ্রত্বের তুলনায় বিন্দুবই আর কিছুই নহে। বিন্দু সৃষ্টির জন্য বিন্দুই যথেষ্ট, অনন্তের কোনই প্রয়োজন নাই।

অতএব নানাভাবের চিন্তা দ্বারা দেখা গেল যে জগৎ ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, সমগ্র ব্রহ্ম হইতে নহে। যে হেতু উহা তাঁহার একতম স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, সেই হেতুই উহাকে ব্রহ্মোৎপন্ন বলা যাইতে পারে। আবারও প্রশ্ন—ব্রহ্মের একমাত্র সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই বা কেন জগৎ উৎপন্ন হইতে পারেনা ? ইহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমরা জগতের বিশ্লেষণে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। ইহা ভিন্ন বিচারের অন্য পন্থা নাই। জগতে আমরা কি দেখি ? দেখি যে প্রত্যেক পদার্থের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ আছে। এই দুই কারণ ব্যতীত কোনও পদার্থ জগতে পাওয়া যায় না। বস্ত্রের উপাদান সূত্র, নৌকার উপাদান কাঠ। উপাদানে বস্তু সত্তা থাকা চাই। Substance ভিন্ন কিছুই কিছুর উপাদান হইতে পারে না। শক্তির অর্থ যাহার বলে কিছু করা যায়। শক্তির মধ্যে কোনই substance নাই। আমরা আমাদের একমাত্র শক্তি-দ্বারা Chair, table প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না। উহাদের প্রস্তুতির জন্য substance হিসাবে কাঠের প্রয়োজন। কাঠ ভিন্ন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কেহ কখনও উক্ত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। যদি একমাত্র শক্তি দ্বারাই সৃষ্টি সম্ভব হইত, তবে আমরাও ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সকল জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিতাম। জগতে একমাত্র বিধান (One God, One Law, One Universe)। আমরা যখন কিছুতেই তাহা করিতে

পারিনা, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে ভগবানও তাঁহার একমাত্র শক্তিদ্বারাই জগৎ গঠন করেন নাই। সেই কার্য্যে substance হিসাবে তাঁহার একতম স্বরূপকে—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বকে তিনি জগতের উপাদান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি গুণের। দ্রব্য গুণসমষ্টি মাত্র। এই সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইলঃ "এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি বা ইহার কোন অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, ইত্যাদি অর্থাৎ যে সমুদায় পদার্থকে আমরা দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করি, তৎসমুদায় আর কিছুই নহে কেবল কতকগুলি গুণসমষ্টি মাত্র। এই যে কাগজ নামক দ্রব্য পদার্থ দেখিতে পাইতেছ, ইহার বিষয়ে তুমি কি জানিতে পার ? বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার শুভ্রত্ব, আয়তন, আকৃতি কাঠিন্য প্রভৃতি কতকগুলি গুণই কেবল জানিতে পার এবং ঐ গুণগুলি ও অন্যান্য আরও কতিপয় গুণসমষ্টিই যে ঐ দ্রব্য পদার্থটী, তাহাতে আর সংশয় নাই। অন্য কথা দূরে থাকুক, যে অনন্ত শক্তি অনাদি অনন্ত পরমপিতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা তিনি কি পদার্থ ? বিবেচনা কর, জানিতে পারিবে যে অনন্ত অনন্ত গুণ সমষ্টি মাত্র।* "তুমি" কি পদার্থ বিবেচনা কর, "আমি" কি পদার্থ ভাবিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি, আমি, ইনি, উনি, তিনি প্রভৃতি এবং ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি সকলই কেবল অনন্ত সংখ্যক বা কতকগুলি গুণসমষ্টি মাত্র। কেননা, যাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায়, অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাহাই যখন পদার্থ, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজ প্রভৃতির যখন কেবল গুণই ধারণা করা যায়, তখন গুণ ব্যতীত দ্রব্য পদার্থের অস্তিত্ব হইতে পারে না, অর্থাৎ গুণাতিরিক্ত দ্রব্য নামক যে অন্য কোন পদার্থ আছে, তাহা অসম্ভব। এক্ষণে পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে যে, যদি গুণাতিরিক্ত দ্রব্য

---

* পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ।

নামক কোন পদার্থ জগতে না থাকে, তবে কাষ্ঠের গুণ, জলের গুণ, অগ্নির গুণ, বায়ুর গুণ, আত্মার গুণ ইত্যাদি কথা কি মহাত্মা, কি দুরাত্মা, কি অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতশিরোমণি, কি শাস্ত্রজ্ঞানলেশ বর্জ্জিত মন্দবুদ্ধি মূর্খ ইত্যাদি সকলেই কেন বলিয়া থাকেন? তাঁহাদিগের পক্ষে বরং কাষ্ঠ গুণ, জল গুণ, আত্মাগুণ ইত্যাদি কথা প্রচলিত করাই উচিত ছিল। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রব্য ও গুণ যে এক পদার্থ নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।" "ইহার উত্তর এই যে, দ্রব্য ও গুণ বাস্তবিক একই পদার্থ। প্রভেদ এই যে, গুণ ব্যষ্টিভাব জ্ঞাপক এবং দ্রব্য গুণের সমষ্টি প্রকাশক ; দ্রব্য বলিলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি গুণ সমষ্টি বুঝায়, আর গুণ বলিলে হয় 'ক', না হয় 'খ' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ানুসারে উচ্চারিত গুণ বা গুণগুলি বুঝায়। আবার দ্রব্য মাত্রই যে গুণের আধার, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কেননা ঐ গুণ সমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার। যেমন "দড়ির তাল", "ইটের স্তুপ" ইত্যাদি বলিলে আর অন্য কোন পদার্থকে বুঝায় না, কেবল কতকগুলি দড়ি বা কতকগুলি ইটের সমষ্টিকেই বুঝায়, তদ্রূপ দ্রব্য বলিলেও গুণ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না, কেবল কতকগুলি গুণের সমষ্টিকেই বুঝায়। আবার যেমন উল্লিখিত দড়ির তালই উহার প্রত্যেক অংশের আধার, তদ্রূপ দ্রব্য বা গুণ সমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার।" "এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে লিখিত হইল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, যখন গুণসমষ্টিই দ্রব্য এবং শক্তি দ্রব্যনিষ্ঠ, তখন শক্তি মাত্রেই যে গুণসমষ্টিতে বিদ্যমান আছে, তাহাতে আর সংশয় কি?" "অপিচ শক্তি যেমন গুণ সমষ্টিতে আছে, তদ্রূপ প্রত্যেক গুণেও আছে। কেননা গুণসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকিলেও যখন এক একটী গুণ দ্বারা গুণসমষ্টির ঐ এক একটী শক্তি প্রকাশিত হয়, তখন ঐ শক্তিটী ঐ গুণেরই বলিতে হইবে। মনে কর যেন আমাদিগের এই দেহের খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবার শক্তি আছে। ঐ চর্ব্বণশক্তি দন্ত দ্বারা প্রকাশিত বা সূচিত হয়, সুতরাং দন্তের যে চর্ব্বণশক্তি

আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর, যদি চোয়ালের অধঃ ও উদ্ধর্ভাগের স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তবে যেমন দন্ত সত্ত্বেও চর্ব্বণ হইতে পারে না, অথবা যেমন কতকগুলি দন্ত একটী মৃৎ পাত্রাদিতে রাখিলে উহাদের চর্ব্বণ ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ কোনও একটী গুণ, গুণসমষ্টির আশ্রয় ব্যতীত কার্য্যকারী হইতে পারে না। কিন্তু যেমন মুখের দন্তগুলি চর্ব্বণের মুখ্যভাবে ও নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া চর্ব্বণশক্তি দন্তনিষ্ঠ বলাই সঙ্গত এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলেই বলিয়া আসিতেছেন, তদ্রূপ গুণসমষ্টির সাহায্যে কার্য্যকারী হইলেও যে গুণ মুখ্যভাবে যে শক্তির প্রকাশক, সেই গুণেরই সেই শক্তি আছে, বলিতে হইবে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, গুণমাত্রেই শক্তি সম্পন্ন।" (সত্যধর্ম্ম)।

ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণেই পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বর্ত্তমান। যথা—জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করা, প্রেমের শক্তি মিলন করা, দয়ার শক্তি দুঃখ হরণ করা ইত্যাদি। সুতরাং অনন্ত নিরাকারত্বের, অনন্ত সাকারত্বের এবং উঁহাদের একত্বেরও শক্তি আছে বলিতে হইবে। গুণ ভিন্ন শক্তি দাড়াইতে পারে না। আমরা জগতে দেখি যে তেজঃ পদার্থ অন্য পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং গুণকে শক্তিমান্ বলা যাইতে পারে। শক্তি ও শক্তিমান্ আমাদের সহজ বোধ্য। শক্তিমানের শক্তি। সেই অর্থে শক্তিমান ও শক্তি এক (Identical) নহে। শক্তিমানের শক্তি ভিন্ন substance থাকে। অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানের অন্তর্গত বা অংশ, উহা কখনও স্বাধীন নহে। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে চাহেন যে Energy-ই সমুদায়। কিন্তু উহা এখনও Energy এর সংজ্ঞা দিতে পারে নাই। উহা হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাই solid, liquid and gas কেই matter বলেন। উহা তেজঃ পদার্থকেই Energy বলেন। কিন্তু হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী তেজঃও একটী জড় পদার্থ। Energy শব্দের অভিধানিক অর্থ—Power of doing work : (Physics) the term as applied in a material system,

used to denote the power of doing work possessed by that system (Chambers). Energy (ক্রিয়া করিবার শক্তি) সকল পদার্থেই আছে। উহা বরফেও আছে, ব্যোমেও আছে, কিন্তু তেজঃ পদার্থে ক্রিয়া শক্তির অত্যাধিক্য বর্ত্তমান। তাই উহাকে একমাত্র Energy বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা একমাত্র Energy নহে। অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে ক্রিয়া শক্তি (Energy) অত্যধিক বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়াশক্তি সেই সেই তেজঃ পদার্থের। সেই জন্যই হিন্দু মনীষিগণ উহাকে 'তেজঃ' আখ্যা দিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত Atomকে Electron, Proton প্রভৃতির মিশ্রণ বলা হয়। এই Electron প্রভৃতি বিদ্যুৎ কণা মাত্র সুতরাং তেজঃ পদার্থ। যাহা হউক, বিজ্ঞান এখনও এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই, speculation চলিতেছে মাত্র। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান মতে Matterকে Energyতে পরিবর্ত্তন করা যায় ও Energy কে Matter এ পরিবর্ত্তন করা যায়, এইরূপ মতের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষত্ব আছে। একমাত্র স্থূল বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা উহার অন্যথা করা যায় না। একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে বিজ্ঞানের উন্নতিতেও শেষে উহা হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করিবেন। উহা এখনও তেজস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, এখনও ব্যোমতত্ত্ব সুদূর পরাহত। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ীও তেজঃ পদার্থকে Matter এ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তেজঃ হইতে যে অপের উৎপত্তি, তাহা উক্ত তত্ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু Energy অর্থাৎ কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তি হইতে অপ্ বা অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার, অন্য পদার্থকে তেজঃ পদার্থে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন পদার্থকেই কেবল মাত্র Energyতে অর্থাৎ কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তিতে পরিবর্ত্তন করা যায় না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সৃষ্টিকার্য্যে অব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বলবত্তরা,

যেমন সন্তান সৃষ্টিতে পিতা অপেক্ষা মাতার শক্তি বলবত্তরা। এই জন্যই ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিশ্বাসে অনিচ্ছুক সুধী ব্যক্তিও স্বীকার করেন যে জগতে একটী মহাশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই সেই মহাশক্তি। "এই মহাশক্তিই মূলা প্রকৃতি, মহাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা, জগজ্জননী প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে অভিহিতা হইয়া থাকেন। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের আদি কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে শিব ও শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মে লক্ষ্মী ও নারায়ণ আর আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে রাধা ও কৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষের আসনে অধ্যাসিত হইয়াছেন"। (ক)। অনন্ত প্রেমময় ব্রহ্ম তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহারই ইচ্ছা শক্তির হস্তে যেন সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সুমহতী ইচ্ছাশক্তিই উঁহাকে (অব্যক্ত স্বরূপকে বা জগদ্বীজকে) নানা নামরূপ, আকার প্রকার ও নানাবিধ শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিয়া এই জড় জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সুমহতী জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাই সেইরূপ ভাবে রচিত জড় পদার্থ দ্বারাই অসংখ্য প্রকার অসংখ্য জীবদেহ সুকৌশলে গঠন করিয়াছেন এবং তাহাতেই ব্রহ্ম আপনাকে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন। সুতরাং এক অর্থে জগদ্রূপ কার্য্য পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেমলীলাই। সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীবদিগকে অসংখ্য প্রকারে লালন পালন করিতেছেন, সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীবকুলের ক্রমোন্নতির বিধান করিয়া সৃষ্টির অতি সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, আবার সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই জীব সমূহকে—ব্রহ্মের আত্মতুল্য সন্তানদিগকে ক্রমশঃ তাঁহার অনন্ত গুণ দান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া সৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞের—মহোৎসবের - মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির মূল, তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই বিশ্ব স্থিতির মূল এবং সেই প্রেমময়ী ইচ্ছাই বিশ্বলয়েরও মূল। সেই প্রেমময়ী সুতরাং মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ভিন্ন

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

জগতে কিছুই হয় নাই, হইবেওনা এবং হইতেও পারে না। আমরা সেই অনন্ত শক্তিশালিনী প্রেমময়ী ইচ্ছার নিকট ঐকান্তিকী ভক্তিভরে বারংবার প্রণত হই, সেই মহামঙ্গলময়ী ইচ্ছাকে শিরোধার্য্য করি, সেই সুমহীয়সী ইচ্ছাকে পরম সমাদরে হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে—গভীরতম প্রদেশে সমুদায় প্রাণের সহিত বরণ করি। সেই মহৎপ্রেমময়ী ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউক্। আমাদের জীবনে জীবনে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই একমাত্র প্রেমময়ী ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক্। আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই। জনে জনের জীবনে, কীটানুকীট, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, পর্ব্বতাদি হইতে উন্নততম পরমর্ষি মহাপুরুষগণাবধি সর্ব্বজীবে, প্রতি অণু পরমাণুতে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদিতে, বিরাট বিশ্বের সর্ব্বত্র অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেমময়ী ইচ্ছার একমাত্র মহাজয় প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞান-প্রেমানন্দ সাগরে নিত্য সুবিনিমগ্ন হই। ধন্য প্রেমময়! ধন্য তোমার প্রেমময়ী ইচ্ছা! ধন্য তোমার প্রেমময়ীলীলা! হে প্রেমময় প্রাণেশ্বর! কবে তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমরা ধন্য হইব, কৃতার্থ হইব, জন্ম সার্থক করিব, জীবন সফল করিব? হে অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! হে অপার দয়ার আধার পিতঃ! দীন সন্তানের প্রতি চির প্রসন্ন হও। সৃষ্টিকার্য্যে মাতার অংশ অধিকতর দেখিয়া পিতাকে ভুলিলে সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায় না। উভয় যুক্ত না হইলে কিছুই সৃষ্ট হয় না। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে স্বয়ং ব্রহ্মই পরম পুরুষ, তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ জগদ্বীজ এবং তাঁহার সুমহতী ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতি স্থানীয়া। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তিনি তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ নামক বীজকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী অব্যক্তকে ও উঁহার শক্তিকে নিয়মিত (Regulate) করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিতেছেন। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির শক্তি অসীম অপার, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অব্যক্তস্বরূপ বাদ দিয়া কিছু করিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য দেখিয়া

শাক্তগণ শক্তিকেই একমাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কখনও ক্রিয়া শক্তিকে substance ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রুতি বহুস্থলে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণের কথা বলিয়াছেন, একমাত্র নিমিত্ত কারণের কথা বলেন নাই। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ অনুবাদ এবং বেদান্ত দর্শনের আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (১।৪।২৬) সূত্র বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "(সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্ব-মসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।।" তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞা-নঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ইতি। (Bracket এর অন্তর্গত অংশের বঙ্গানুবাদ ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল)। "তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যাহা কিছু আছে,—সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম তৎ-সমুদায় হইলেন। সেই জন্যই ব্রহ্মকে সত্য বলে। বিশেষ বিশেষ নাম রূপবৎ প্রকাশিত এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নামরূপবৎ প্রকাশের বিপরীত অবিকৃত ব্রহ্মরূপ ছিল। তাঁহা (অর্থাৎ অসৎ শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম) হইতে সৎ অর্থাৎ প্রকাশিত নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং কর্ত্তা বলে। ইতি। * (তত্ত্বভূষণ)।" ইহাতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত

---

* ষষ্ঠ অনুবাক্যের প্রথমে আছে "অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।" (যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ মনে করে, তবে সে অসৎই হয়। যদি কেহ মনে করে যে ব্রহ্ম আছেন, তবে জ্ঞানিগণ তাঁহাকে সৎ বলিয়া মনে করেন।) সুতরাং দ্বিতীয় মন্ত্রে যে বলা হইয়াছে যে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ", উহার প্রকৃত অর্থই বঙ্গানুবাদে লিখিত হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে জগৎ অসৎ (শূন্য) হইতে আসিয়াছে।

হইয়াছে যে তিনি নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি একমাত্র শক্তি নহেন, পরম পদার্থ (substance)ও বটেন। Platoও সৃষ্টি কার্য্যে উপাদানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। এবং সেই জন্য একটী Separate Self-Fxistent Reality এর কল্পনা করিয়াছেন। Aristotleও সেই মতাবলম্বী। Kantও Phenomena এর পশ্চাতে Noumenon (Thing-in-itself) আছেন, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টিতে উপাদান ও নিমিত্ত কারণের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। যদি একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইত, তবে উহা একটী স্বপ্ন রাজ্য মাত্র হইত। উহাতে কোনই substance থাকিত না। আমরাও সারশূন্য পদার্থ (Illusion) মাত্র সৃষ্টি করিতে পারিতাম। কিন্তু জগতে উপাদান শূন্য দ্রব্য নাই এবং আমরাও কেবল মাত্র ক্রিয়া শক্তি দ্বারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারি না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। শাক্ত শাস্ত্রে যদি শক্তিকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া থাকেন, তবে তাহা সাম্প্রদায়িক উক্তি বলা যাইতে পারে। শক্তিই একমাত্র পদার্থ, ইহা তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র। শাক্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যায় যে শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এমনকি শিবেরও উপাস্য। এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে শাক্ত ভাবের প্রধান ভিত্তি সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, শিবও প্রায় শব। প্রকৃতিই সকল করিতেছেন। অপর দিকে শক্তিই সকল করিতেছেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতি ও শক্তির ঐক্য নাই। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ সম্পন্না। উহাদিগকে গুণ বা দ্রব্য বলে। উহাদিগেতে substance আছে এবং সেই substance এর পরিণামে জগৎ। সেই গুণত্রয়ের শক্তি দ্বারা (শক্তি হইতে নহে) কিন্তু উহাদের substance হইতে জগৎ সৃষ্ট। সাংখ্য কোথায়ও বলেন নাই যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তি মাত্র। সুতরাং দেখা গেল যে সাংখ্য দর্শন গুণ বা দ্রব্যকে জগতের উপাদান স্বীকার করেন। মায়াবাদে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়।

উহা তাঁহার স্বরূপ নহে। এই সম্পর্কে পঞ্চদশীর ২।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উক্ত মতে ব্রহ্মের তিনটী মাত্র স্বরূপ। যথা—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্ব। সুতরাং স্বরূপ বা গুণ ও শক্তি এক নহে। যদি শক্তিতেই substance ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই থাকিত, তবে স্বরূপ বা গুণের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। গুণের মধ্যে substance এবং ক্রিয়াশক্তি উভয়ই আছে। জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রত্যেক পদার্থেই substance এবং শক্তি আছে, কোথায়ও কেবলমাত্র শক্তি বা কেবল মাত্র substance নাই। পদার্থকেই শক্তিমান ও উহার শক্তিকেই শক্তি চিরকাল বলিয়া আসা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায় যে উহা (শক্তি) এমন পদার্থ হইতে আসিয়াছে যাহাতে substance ও শক্তি উভয়ই বর্ত্তমান। সেই পদার্থই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। Substance ভিন্ন অর্থাৎ উপাদান ভিন্ন জগতে কোনও পদার্থ নাই। মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে স্বপ্নে বা জাগরণে যাহা দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোনই substance নাই। এই জন্য মায়াবাদ ও শূন্যবাদ জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। Subjective creation এ শূন্য ভিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। এই সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।২।১-২ মন্ত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। উহাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে Nothing can come out of nothing. উহাদিগকে মায়াবাদ ও শূন্যবাদের খণ্ডনও বলা যায়। সৎস্বরূপ ব্রহ্ম একমাত্র শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা প্রামাণ্য কোনও উপনিষদে কোথায়ও বলা হয় নাই। তাঁহার অনন্ত স্বরূপ। ব্রহ্মের যে তিনটী স্বরূপ এবং শক্তি যে ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, তাহা মায়াবাদও বলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বেদান্ত দর্শনের ১।৪।২৬ সূত্র এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ এবং কঠ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ক্রমান্বয় ৫।১২ এবং ৬।১২ মন্ত্র সমূহে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হইয়াছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শক্তিকে জগতের উপাদান বলা যাইতে পারে না। কেনোপনিষদের ৩।৫ ও ৩।৯ মন্ত্রদ্বয়ে দেখা যায় যে ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তস্মিংস্ত্বয়ি কিং

বীর্য্যম্''। অর্থাৎ তোমাতে কি শক্তি আছে? যদি অগ্নি ও বায়ু একমাত্র শক্তিই হইত, তবে স্বয়ং ব্রহ্ম এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন না। অবশ্যই বলিতে হইবে যে অগ্নি ও বায়ু শক্তিমান এবং শক্তি তাঁহাদের অন্তর্গত। সুতরাং ব্রহ্মের নিজ উক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারা গেল যে শক্তি শক্তিমানের অন্তর্গত। কেনোপনিষদের এই অংশ পাঠে দেখা যাইবে যে অগ্নি ও বায়ুর শক্তিও ব্রহ্মেরই শক্তি। সুতরাং ব্রহ্মই শক্তিমান এবং শক্তি তাঁহারই অন্তর্গত। দার্শনিকগণ মানবের মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করেন। উহারা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা (Knowing, feeling and willing). এস্থলেও দেখা যায় যে শক্তিই একমাত্র পদার্থ নহে, জ্ঞান ও প্রেম আছে। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে যে আমাদের কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা জানিতে চাহিলে জ্ঞান ক্রিয়া হয়, ভাল বাসিতে চাহিলে প্রেম ক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার মূলে যে ইচ্ছা, তাহার জনক জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি। এই সৃষ্টিলীলার মূলেও ব্রহ্মের প্রেমোৎপন্ন ইচ্ছা। তাই "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" হইতেই সৃষ্টির সূচনা। সুতরাং শক্তিই একমাত্র পদার্থ ত নহেই, কিন্তু শক্তি গুণের। এস্থলে বিশেষ ভাবে বক্তব্য এই যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের উল্লেখ আছে। কর্ম্মের পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তি, সুতরাং শক্তিই একমাত্র নহে। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে শক্তি শক্তিমানে বর্ত্তমান। সেই শক্তিমান গুণ বা গুণসমষ্টি বা বহুগুণের বা অনন্ত গুণের মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। সুতরাং গুণকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দুইটী ভাব পাই। উহার একটী substance বা সার পদার্থ এবং অন্যটী উহার ক্রিয়া করিবার শক্তি। ইহাকেই শক্তি, Energy প্রভৃতি নামে কথিত হয়। আমরা আরও দেখিলাম যে শক্তি জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেনা। উহা নিমিত্ত কারণ মাত্র। গুণ ও ইচ্ছাশক্তি যে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, তাহা সকল উচ্চ দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি মাত্র হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়

নাই। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহারই একতম স্বরূপ—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞান, যুক্তি ও আপ্তবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি হইতে অথবা সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে পরিণাম ষড়বিধ বিকারেব একতম। সুতরাং অব্যক্ত গুণ সহ অনন্ত গুণাধার ব্রহ্মেরও বিকার হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। কারণ, তিনি নিত্য নির্ব্বিকার, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। একথা বলিলেও চলিবেনা যে অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপ এবং অনন্ত সমুদ্রের সুনির্ম্মল বারিরাশির তুলনায় বিন্দুমাত্র জলকণাসম অব্যক্তের বিকারে সেই অনন্ত মহাসাগরের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্রহ্ম নিত্যই পূর্ণ, অনন্ত এবং সম্পুর্ণ ভাবে নির্বিকার। তাঁহার অনন্তত্বের তুলনায় বিন্দুসম অব্যক্ত স্বরূপের বিকারেও অবশ্যই ব্রহ্মেরও বিকার হইবে। সেই বিকারের পরিমাণ অবশ্যই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইবে বটে, কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে উঁহার বিকারে ব্রহ্মেরও যৎকিঞ্চিৎ বিকার হইয়াছে। অব্যক্ত যখন ব্রহ্মের একতম স্বরূপ, তখন উঁহা নিত্য সত্য ও অনন্ত, উঁহার বিকার হইলে ব্রহ্মেরও বিকার অবশ্যম্ভাবী। উঁহা তুচ্ছ পদার্থ নহে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মে কখনও কোনও কারণে বিকারের লেশ মাত্রও সঞ্চার হইতে পারে না। এই বিকার সমস্যা অতীব সুকঠিন। এই বিকার সমস্যা এড়াইবার জন্যই মায়াবাদের সৃষ্টি। এই জন্যই সাংখ্যদর্শনে পুরুষের নির্ব্বিকারত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া পুরুষাতিরিক্ত প্রধানের অনাদিত্ব, ক্রিয়াশীলতা এবং জড় জগতের উপাদানত্ব কথিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন এতদূর গিয়াছেন যে উঁহা প্রকৃতিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেন এবং পুরুষ সাক্ষীমাত্র। আবার এই জন্যই ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুর অনাদিত্ব, আকাশের নিত্যত্ব এবং পরমাণুকে জড়

জগতের উপাদান ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হইতেও সুকঠিন। তবে এই সম্বন্ধে অনন্ত স্নেহময়, অনন্ত দয়াময় পিতার অপার দয়ায় যে সকল চিন্তা লাভ করিয়াছি, তাহা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তিনি বিবেচনা করিবেন যে সেই সকল যুক্তিদ্বারা এই কঠিন সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিতে পারা গেল কিনা। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই অতি সংক্ষেপে বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম যে সম্পূর্ণরূপে নিত্য নির্ব্বিকার, ইহা অতি সত্য তত্ত্ব বলিয়া আমরাও স্বীকার করি। দার্শনিক বিকারের অর্থ কোনও এক প্রকারের পরিবর্ত্তন। আমরা জগতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে পরিণাম হইলেই সেই পদার্থের কিছু বিকার হইবেই, অন্ততঃ উহার আকারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবেই। এই জন্যই যে স্থলেই পরিণাম, সেই স্থলেই বিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই জন্যই পরিণাম একমাত্র বিকার মধ্যে গণ্য। কিন্তু ইতঃপর ইহা প্রমাণিত হইবে যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই পরিণামে অব্যক্তের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন বা বিকার হয় নাই। সুতরাং নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। জগতে দুই প্রকার বিকার দৃষ্ট হয়। এক প্রকার বিকার উপাদানের আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারা, যেমন দুগ্ধের পরিণামে দধির উৎপত্তি। দধিতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। দুগ্ধ ভিন্ন ভাব ধারণ করে। চলিত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া দধি হইয়াছে। Hydrogen ও Oxygen হইতে জলের উৎপত্তিও সেইরূপ বিকার। দ্বিতীয় প্রকারের বিকারে উপাদান যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু উহার অবলম্বনে উহারই উপর কারুকার্য্য সম্পাদিত হইয়া উহা নূতন নামরূপ ধারণ করে, যেমন মৃত্তিকা দ্বারা পুরুষ মূর্ত্তি গঠিত হয়। মৃত্তিকাই উহার উপাদান কারণ। মৃত্তিকাই উহাতে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মৃত্তিকার উপর মৃত্তিকা দ্বারাই কারুকার্য্য সংঘটিত হয় বলিয়া পিণ্ডাকার মৃত্তিকা নানা নামরূপ ধারণ করে, অর্থাৎ উহার আকারের মাত্র পরিবর্ত্তন হয়।

স্বর্ণালঙ্কার এবং সমুদ্রতরঙ্গও ঐ একই প্রকারের বিকার মধ্যে পরিগণিত। অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জগদুৎপত্তি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত বটে, কিন্তু বিশেষ পার্থক্য এই যে সেই পরিণামে অব্যক্তের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয় নাই, আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। উঁহা জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও যেরূপ ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন, অথচ উঁহা হইতেই উঁহা দ্বারাই ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি জড় জগৎ রচনা করিয়াছেন। এখন হিন্দু দর্শনোক্ত অব্যক্ত সমূহের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনান্তে পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্বের প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। কথিত আছে যে অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়া জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল। সৃষ্টিকালে উহা ব্যক্ত হয় এবং প্রলয়ান্তে উহা অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মেই থাকে। এইরূপে প্রতি কল্পে অব্যক্ত ব্যক্ত হয় এবং প্রলয়ান্তে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে। সুতরাং এই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই অংশ বলিতে হইবে। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছু থাকিতে পারে না। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তখন যাহা কিছু থাকে, তাহা ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র এবং তাঁহারই অন্তর্গত বলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভবদ্গীতার ১০।৪২ শ্লোকে দেখা গিয়াছে যে অব্যক্তকে তথায় ব্রহ্মের অংশই বলা হইয়াছে। "একাংশেনস্থিতোজগৎ"। মায়াবাদে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে এবং মায়া দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলা হয়। মায়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "মায়াবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মায়াবাদে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হয় বটে, কিন্তু ঐ মত বিশ্লেষণ করিলে উহার সমর্থন পাওয়া যায় না। মায়াবাদ মায়াকেই অব্যক্ত বলেন। অব্যক্ত বলিলেই উহাকে জগতের উপাদান কারণ বলিতে হইবে। কারণ, অব্যক্তই ব্যক্ত হইয়া জগদাকার ধারণ করে। কিন্তু মায়া যে উপাদান কারণ হইতে পারে না, তাহাও প্রোক্ত অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শক্তি কখনও উপাদান কারণ হইতে পারে

না। তর্কস্থলে মায়াকে অব্যক্ত বলিয়া স্বীকার করা যাউক। মায়াবাদিগণ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি স্বীকার করেন। সাংখ্য প্রধানের অনুকরণে রচিত মায়াকে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্না বলা হয়। সুতরাং প্রধানের পরিণাম রূপ বিকারের ন্যায় মায়ার বিকারও অবশ্য স্বীকার্য্য। জগৎ ও মায়া এক নহে। কিন্তু মায়াবাদ অনুযায়ী মায়ার শক্তিতে জগৎ ভ্রম হইতেছে। এই জন্য জগৎকে মায়ারই পরিণাম বলা হয়। মায়া ব্রহ্মের একটী শক্তি। মায়াবাদ অনুযায়ী যখন পরিণাম হইলেই বিকার অবশ্যম্ভাবী, তখন মায়াশক্তির পরিণামে অবশ্যই ব্রহ্মেরও আংশিক বিকার হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মের বিকার অসম্ভব। সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমতাকে অর্থাৎ প্রধানকে অব্যক্ত বলা হয়। সেই দর্শন যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, তখন এস্থলে উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়। সাংখ্য অব্যক্তের পরিণামরূপ বিকার স্বীকার করেন। কিন্তু উহা পুরুষকে ভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং পুরুষের বিকৃতির প্রশ্নের উদয় হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও জ্ঞ স্বরূপ। পাতঞ্জল দর্শনের অব্যক্তও ঐ প্রধান। ঈশ্বর রচয়িতা, উপাদান কারণ নহেন। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন ব্রহ্মাতিরিক্ত পরমাণুকে অব্যক্ত বলেন। ঐ অব্যক্তের পরিণামে জগৎ। সুতরাং এস্থলে ঐরূপ অব্যক্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং পরমাণু অব্যক্ত হইতে পারে না। প্রোক্ত দর্শন পঞ্চক হইতে সর্ব্ববাদি সম্মত রূপে উচ্চতর বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিতে হইবে। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" সূত্রে ব্রহ্মের পরিণামে জগদুৎপত্তি, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষের পরিণামে জগদুৎপত্তি, ব্রহ্ম হইতে নহে। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে অথবা তাঁহার একতম স্বরূপ হইতে জগতের উৎপত্তির জন্য ব্রহ্মের কোনও বিকার হইয়াছে, ইহা বেদান্তদর্শন

বলেন নাই। প্রামাণ্য দ্বাদশখানি উপনিষদ্ এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মকে নির্ব্বিকারই বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি বলি যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উঁহার কোনই প্রকৃত বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই, তবে তাহা অযৌক্তিক হইবে না। অব্যক্তের পরিণামে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ উহাতে অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঠককে আমাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ এই যে, তিনি যেন এই সম্বন্ধে আবাল্য উপার্জ্জিত সংস্কার হইতে যথাসাধ্য নিজেকে মুক্ত রাখেন। আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে জড় পদার্থের পরিণামে উহার বিকার হয়। সুতরাং সেই অনুযায়ী আমরা মনে করি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং কারণ পর্য্যায় ভুক্ত অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামেও উঁহার বিকার হইয়াছে। আমরা ভুলিয়া যাই যে অখণ্ড ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের কোনই বিকার হয় না বা হইতেও পারে না। যুক্তিযুক্ত অনুমানই দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রমাণ ভাবে অবলম্বনীয়। এই স্থলে যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল কিনা, ইহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্যোম হইতে জড় জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে, উহাদের পঞ্চীকরণ ও পরিশেষে তাঁহারই ইচ্ছায় উহাদের নানাবিধ সংমিশ্রণে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ জড় জগতের আদি জড়ীয় উৎপাদক এবং উপাদান ব্যোম। ব্যোম সকল পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছে বা উহা সর্ব্বব্যাপী। উহার কোথায়ও অভাব নাই। উহা ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বদেশ ব্যাপ্ত ছিল, আছে ও ও থাকিবে সুতরাং ব্যোম সম্বন্ধে স্থানাবরোধকতার (Impenetribility র) প্রশ্নের উদয় হয় না। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্যোম এক ও অখণ্ড। যদি উহা তাহাই না হইত, তবে উহা বিশ্বে সর্ব্বব্যাপীভাবে থাকিতে পারিত না উহা মরুতাদি চতুর্ব্বিধ পদার্থ

দ্বারা অবশ্যই খণ্ডিত হইত। সুতরাং স্থানাবরোধকতা শূন্যতা ব্যোমের অখণ্ডত্ব ও অবিভাজ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পদার্থ বিভাজ্য হইলেই উহার বিকার বা পরিবর্ত্তন সম্ভব। যাহার বিভাগ অসম্ভব, তাহার বিকারও অসম্ভব। এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য পদার্থ যে নির্ব্বিকার, তাহা সহজবোধ্যও বটে। সুতরাং অবিভাজ্যতা ও অখণ্ডত্বই নির্ব্বিকারত্বের সর্ব্বপ্রধান কারণ। সুতরাং ব্যোম নির্ব্বিকার। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মরুতাদি চতুর্ভূতের পরমাণুর উল্লেখ আছে, কিন্তু উহাদিগেতে ব্যোমের পরমাণু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ সেই দর্শন-দ্বয়ের মতেও ব্যোম অখণ্ড ও অবিভাজ্য। উহারা ব্যোমকে নিত্য পদার্থ বলেন। অর্থাৎ যাহা সৃষ্টির আদি অন্ত সমভাবে (বিকার বিহীন ভাবে) বর্ত্তমান, তাহাকেই নিত্য বলা হইয়াছে। নতুবা জড় পদার্থ প্রকৃত পক্ষে নিত্য হইতে পারে না। মরুতাদি চতুর্ব্বিধ পদার্থ যে বিভাজ্য, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। ব্যোম যদি বিভাজ্য হইত, তবে উহারও পরমাণু থাকিত। কিন্তু ব্যোম যে অখণ্ড ও অবিভাজ্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং উহার পরমাণু নাই। সুতরাং অখণ্ডত্ব হেতু ব্যোম নির্ব্বিকার। ব্যোম সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ। উহার উৎপাদক (অব্যক্ত স্বরূপ) অবশ্যই উহা হইতেও সূক্ষ্মতর। (সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্)। অব্যক্ত ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। সুতরাং স্বভাবতঃই এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য ও অনন্ত ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এই সম্পর্কে পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতার শ্লোকদ্বয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অব্যক্ত অখণ্ড ও ওতপ্রোত ভাবে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। চতুর্ভূতোৎপত্তি সত্ত্বেও অবিভাজ্য ব্যোম যেমন নির্ব্বিকার আছে, সেইরূপ নিত্য অখণ্ড অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ভাবে সমগ্র জগতের উৎপত্তি সত্ত্বেও উহার কোনই বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। সুতরাং ব্রহ্মেরও বিন্দুমাত্র বিকার হয় নাই। অব্যক্ত স্বরূপের অখণ্ডত্ব নির্ব্বিকারত্বের কারণ। আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলাম যে ব্যোমের উপাদানত্বে জড় জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু শেষে দেখা গেল যে উহা (ব্যোম) উহার নিজ স্বভাবেই অবিকৃতভাবে

বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে চিরকাল বর্ত্তমান। সুতরাং ব্যোমের পরিণাম হইয়াছে, ইহাও যেমন সত্য, উহা অবিকৃত ভাবে চিরকাল বর্ত্তমান, ইহাও তেমনি সত্য। সেইরূপ অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন, ইহাও যেমন সত্য, উঁহার বিন্দুমাত্রও বিকার হয় নাই, ইহাও তেমনি সত্য। অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপ নিত্য নির্ব্বিকার, ব্রহ্মও নিত্য নির্ব্বিকার আছেন। জগতে দেখা যায় যে, যে বস্তু যত স্থূল উহার বিকারও ততোঽধিক। ক্ষিতির বিকার অপেক্ষা অপের বিকার অল্পতর। পরিবর্ত্তন জন্য আমরা ক্ষিতিতে অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখিতে পাই, কিন্তু অপে বৈচিত্র্যের পরিমাণ অল্পতর। সেইরূপ তেজের বিকার আরও অল্পতর এবং মরুতের বিকার ততোঽধিক অল্পতর। ব্যোমের একটী গুণ শব্দ, কিন্তু মরুতের দুইটী গুণ। যথা—শব্দ ও স্পর্শ। তেজের তিনটী গুণ। যথা—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ অপের চারিটী গুণ, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ক্ষিতির পাঁচটী গুণ। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিকৃতির মাত্রানুসারে বৈচিত্র্যের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা পদার্থ যত স্থূল, উহার বিকৃতিও ততোঽধিক, এবং পদার্থ যত সূক্ষ্ম, উহার বিকৃতিও তত অল্প। সুতরাং অতি সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য ব্যোম পদার্থে বিকৃতির বিরতি হইয়াছে। দেখা গেল যে, যে পদার্থ যত সূক্ষ্ম, উহা ততদূর নির্ব্বিকার। সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ ব্যোমের উৎপাদক অব্যক্ত অনন্ত ভাবে সূক্ষ্ম বা কারণতম ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। সুতরাং উঁহাতেও সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। সুতরাং উঁহাতে নির্ব্বিকারত্বেরও পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। সুতরাং জগদুৎপত্তি সত্ত্বেও অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। কেহ বলিতে পারেন যে জগৎ প্রসবের জন্য ব্যোমের যৎকিঞ্চিৎ বিকার অবশ্যই সম্ভব হইয়াছে। তর্ক স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ক্রম সূক্ষ্ম পদার্থে ক্রমাল্প বিকার দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্যোমের বিকার নামমাত্র। অব্যক্ত স্বরূপে জগদুৎপত্তির জন্য সেই বিকারটুকুও আসিবে

না। কারণ, উহা ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ, সুতরাং উহা নিত্য অনন্তভাবে সূক্ষ্ম ও অখণ্ড সুতরাং অবিভাজ্য। বিকৃতির ক্রমাল্পতার এক স্থলে অবশ্যই সম্পূর্ণ রূপে বিরতি হইবে। সেই স্থলই ব্রহ্মের নিত্য নির্বিকার অব্যক্ত স্বরূপ। যদি ইহা স্বীকার না করা যায়, তবে অনবস্থা নামক মহান্ দোষের উৎপত্তি হয়। আমরা কিন্তু বলি যে ব্যোমেরও কোনই বিকার হয় নাই. অব্যক্তের বিকার ত অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। "কোন পদার্থকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মতর ইত্যাদি রূপে বিভাগ করিলে শেষে যে সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ থাকে, তাহাই পরমাণু। যদি বল, বিভাগের শেষ হয় না, তাহা হইলে, প্রধান দোষ এই যে সকলই যদি অনন্ত রূপে সূক্ষ্ম হইতে পারিল, তবে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ আর থাকে না: তাহা হইলে পর্ব্বতের ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণের আপত্তি হইতে পারে।" "আর যদি বল, ভাগ করিতে করিতে শেষে আর কিছুই থাকে না, তবে গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে অবশ্যই সপ্রমাণ হইবে যে, প্রথমে যদি থাকে, তবে শেষেও অবশ্য থাকিবে। আর শেষে যদি না থাকে, তবে প্রথমেও কিছুই ছিল না বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রথমে যে ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব পরমাণু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে" (ক)। অতএব দেখা গেল যে বিভাগেরও শেষ আছে। সেইরূপ বিকৃতিরও শেষ আছে এবং ব্যোমেই বিকারের শেষ হইয়াছে। পরমাণু অবিভাজ্য, ব্যোমও অবিভাজ্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিভাগ ও বিকার ঘন সম্বন্ধে সম্বন্ধ। বিকৃতির প্রধান প্রণালীই বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ব্যোমের বিভাগ নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং ব্যোমের বিকারও হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। যদি তাহাই হইত, তবে উহা স্ব স্বরূপে বিশ্বে ওতপ্রোত

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা। "গণিত শাস্ত্রের প্রক্রিয়া এই—ভাজক × ভাগফল = ভাজ্য। যদি ভাগফল = ০ হয়, তবে ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল = ভাজক × ০ = ০ হইবে।" এস্থলে ইহা বক্তব্য যে এই পরমাণু এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরমাণু এক নহে।

ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। উহা অন্য ভূত চতুষ্টয় দ্বারা বিভক্ত হইত। কিন্তু তাহা যে হয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্যোমেরই যখন বিকার হয় নাই, তখন অব্যক্তেরও কোনই বিকার হয় নাই। উহাও নিত্য অখণ্ড ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জগদুৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার অবিভাজ্যতা হেতু সেই পরিণাম কার্য্যে উহার কোনই বিকার হয় নাই। এখন দেখা গেল যে উঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব বশতঃ পরিণাম সত্ত্বেও উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। ব্যোম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে অতি সূক্ষ্ম পদার্থের পরিণামে অন্য পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহার কোনই বিকার হয় না। ইহার কারণ, উহার অতি সূক্ষ্মতা সুতরাং অতি নমনীয়তা। Plato কথিত পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তের কথা চিন্তা করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। উহাও নিরাকার ও প্রায় কিছু না। কিন্তু এমন নমনীয় যে উহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে উহার বিকার হইতে পারে নাই। কারণ, উহা Self-Existent Reality সুতরাং উহা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। অখণ্ড ও অবিভাজ্য পদার্থের যে বিকার হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। উহা যখন Self-Existent Reality, তখন উহাকে Absoluteও বলা যাইতে পারে। Absolute এর বিকার অসম্ভব। সুতরাং উহারও বিকার হয় নাই। এই সম্পর্কে ৪৩৯-৪৪০ পৃষ্ঠায় Plato সম্বন্ধীয় উক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়তঃ—সেই অব্যক্ত এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে উহাকে প্রায় কিছু না বলা হইয়াছে। ব্যোমের যেমন অখণ্ডত্ব ও অতি সূক্ষ্ম স্বভাববশতঃ বিকার হয় নাই, সেইরূপ পরিণামসত্ত্বেও Plato কথিত অব্যক্তেরও অখণ্ডত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব বশতঃ বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। এই বিষয়ে সত্যদর্শনোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ আলোচ্য অব্যক্ত ও Plato কথিত অব্যক্তের কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং উহা (Plato কথিত অব্যক্ত) যদি জগদুৎপত্তির জন্য নিরাকারত্ব, অখণ্ডত্ব, একত্ব,

সূক্ষ্মত্ব ও নমনীয়তাহেতু নির্ব্বিকার থাকিতে পারে, তবে আলোচ্য অব্যক্ত যে নির্ব্বিকার থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, বিশেষতঃ উহা যখন ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। মহাদার্শনিক Kant এর "Thing-in-itself" Noumenon এবং জাগতিক নামরূপ Phenomena উহারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু Noumenon উহাদের পশ্চাতে এক ও অখণ্ড রূপে বর্ত্তমান। জগদুৎপত্তির জন্য Noumenon এর কোনই বিকার হয় নাই। উহা Thing-in-itself, সুতরাং স্বস্বরূপে আছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অধার্য্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহার কোনই বিকার হয় না। ইহার কারণ অখণ্ডত্ব, অবিভাজ্যতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা ও অতি নমনীয়তা। অব্যক্ত স্বরূপও অখণ্ড, অবিভাজ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতি নমনীয়। সুতরাং উঁহা হইতে জগদুৎপত্তির জন্য উঁহা বিকৃত হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। সুতরাং ব্রহ্মও নির্ব্বিকার আছেন। জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে বিকারের মাত্রা ক্রমশঃ অল্প হইতে হইতে নির্ব্বিকারত্ব এক স্থলে অবশ্যই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই স্থলই ব্যোম। যদি কেহ ব্যোমকে কিছুতেই নির্ব্বিকার মনে করিতে না চাহেন, তবে অব্যক্ত স্বরূপে সুতরাং ব্রহ্মে যে নির্ব্বিকারত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের কোনই কারণ নাই। ব্যোমের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌছিয়াছিলাম, তাহা একটী স্থূলতম দৃষ্টান্ত দ্বারাও যৎকিঞ্চিৎ সমর্থিত হইতে পারে। পৃথিবীতে দেখা যায় যে একাধিক সন্তানের স্বাস্থ্যবতী জননী তাহার স্বাস্থ্য অটুটভাবে রক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার সমবয়স্কা স্বাস্থ্যবতী অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের ন্যায়ই স্বাস্থ্যবতী রহিয়াছেন। গর্ভধারণ জন্য তাহার কোনও প্রকারের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই। এস্থলেও বলা যাইতে পারে যে উক্তরূপ জননীগণ সন্তানগণের দেহ নিজেদের দেহ দ্বারা গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দেহের বিকার হয় নাই। কথিত আছে যে কুন্তীদেবী স্থির

যৌবনা ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তিনজন জগৎ প্রসিদ্ধ মহাবীরের এবং এবং একজন পরম ধার্ম্মিকের জননী হইয়াও চিরকুমারীবৎই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার দেহের পরিণামে সন্তানের দেহের উৎপত্তি হইয়াছিলও সত্য, আবার উহা অবিকৃত ছিল, ইহাও সত্য। এই স্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ স্থূলতম পদার্থ দ্বারা। সুতরাং ইহা প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্বের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে আভাস ভাবে প্রদত্ত হইল মাত্র। আমাদের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থূল ব্যোম। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যোম হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে না। আমরা সেইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারাই নানাভাবে অব্যক্ত স্বরূপের জগদুৎপত্তি সত্ত্বেও নির্ব্বিকারত্বের প্রমাণ দিয়াছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পদার্থ যতই বিকৃত হইবে, উহা আদি পদার্থ হইতে ততই পৃথক্ ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং আদি উপাদান বুঝিতে আমাদের অধিক হইতে অধিকতর বেগ পাইতে হইবে। সুতরাং অব্যক্ত স্বরূপ বুঝিতে উঁহার সাক্ষাৎ পরিণাম ব্যোমের আলোচনাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমরা কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ব্রহ্মে উপস্থিত হই। তাঁহার কোনই কারণ নাই। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"তুমি কারণের কারণ, তোমার নাহি কারণ, অসীম অপার তুমি, তুমি অনির্ব্বচনীয়।" শ্রুতিও বলেন ঃ—ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন বেশিতা নৈবচ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬।৯)। বঙ্গানুবাদ ঃ—"জগতে তাঁহার কোন পতি বা নিয়ন্তা নাই। তাঁহার প্রতিমা বা অনুমান-সাধন চিহ্নও নাই। তিনি সমুদায়ের কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের অধিপতি ; তাঁহার কোন জনয়িতা বা অধিপতি নাই। (তত্ত্বভূষণ)।" যেমন কারণের একস্থলে শেষ হইয়াছে, সেইরূপ বিকৃতিরও একস্থলে শেষ হইয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্থলই অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম জগতের আদি কারণ (First Cause)

ও নিত্য সত্য। জগৎ কার্য্য। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। সুতরাং জগদ্রূপ কার্য্যেরও কারণ আছে। সৃষ্ট পদার্থের কারণ দ্বিবিধ—উপাদান ও নিমিত্ত। যদি উপাদানের পরিণামে জগদুৎপত্তির জন্য উহা নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া জগদাকার ধারণ করিত, তবে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের লোপ হইত। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, উহা নিত্য সত্য, অনাদি অনন্ত। আদি উপাদান হইতেই ক্রমশঃ সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে আদি কারণের বিকার হয় না বা হইতেও পারে না। যদি বলেন যে তাহা সম্ভব, তবে বলিতে হয় যে তাহা হইলে আদি কারণের লোপ হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, উহা (আদি কারণ) যে নিত্য সত্য, তাহা সহজবোধ্য ও তাহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। জলে Hydrogen এবং Oxygen এর Chemical Combination হইয়াছে। জলে উহাদিগকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মিশ্রণে উহারা অতি বিকৃত হইয়া নূতন একটী পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছে। জলের মধ্যে যে উক্ত gas দ্বয় আছে, তাহার প্রমাণ এই যে জলকে যদি gasএ লয় (Dissolve) করা যায়, তবে আবার উহাদিগকে পাওয়া যায়। কিন্তু জলাবস্থায় উক্ত gas দ্বয় gas ভাবে থাকে না। যদি আদি কারণ ব্রহ্মের বিকারে জগৎ উৎপন্ন বা ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইতেন, তবে জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম থাকিবেন না, তিনি জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বের সাময়িক লোপ হইত। ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। আবার জলকে gasএ লয় করিতে কোন এক জ্ঞানী ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন পুরুষের প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্ম যখন জগতে পরিণত হইয়াছেন, তখন আর কে জগৎকে লয় করিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বস্বরূপ দান করিবেন? জগৎ চৈতন্যশূন্য। ব্রহ্ম যখন জগদাকারে পরিণত, তখন তিনিও অচেতন মাত্র। সুতরাং তিনি জগৎকে লয় করিয়া পুনরায় স্বস্বরূপ লাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে First Cause হইতে পরিণামও স্বীকার করিতে হইবে এবং এই কার্য্যে যে তাঁহার বিকার হয় নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যদি

কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন যে First Cause স্বীকারের প্রয়োজন কোথায়, তবে বলিতে হয় যে আমরা উহা স্বীকার না করিয়া পারি না। আমরা দেখিতে পাই যে কারণেরও কারণ আছে। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেরই Series of Causes আছে। এইরূপ ভাবে পশ্চাৎ ধাবিত হইলেই আমরা First Cause এ উপনীত হইতে পারি। যদি কারণের কারণ, উহার কারণ. এই ভাবে অনন্তকাল চলিতে থাকি, তবে অনবস্থা নামক মহান্ দোষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং শেষ কারণই First Cause. ব্রহ্মই সেই First Cause. আদি কারণের কারণ কল্পনা করিলে উহাকে আর আদি কারণ বলা যায় না। সুতরাং আদি কারণের বিকার অসম্ভব। ইহাও সহজ-বোধ্য যে আদি কারণ এক, অখণ্ড ও নির্বিকার বলিয়াই সকল কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। আদি কারণে বিকৃতি আসিলে কার্য্য সম্ভব হইতনা, অথবা যদি একান্তই সম্ভব হইত, তবে উহাদের অবস্থিতি অসম্ভব হইত। প্রকৃত পক্ষে আদি কারণের উপরই পরবর্ত্তী কারণ ও কার্য্য সমূহ নির্ভর করে। সেই আদি কারণই যদি বিকৃত হইত, সুতরাং অন্য পদার্থে পরিণত হইত, তাহা হইলে আদি কারণের বিলোপ সাধন হইত। সুতরাং পরবর্ত্তী কারণ ও কার্য্য সমূহের অবস্থিতি অসম্ভব হইত। কারণ, সকল কার্য্যই আদি কারণ আশ্রয় করিয়া আছে। উহা যে নিত্য সত্য, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা সত্য যে ব্রহ্ম বা তাঁহার অব্যক্তস্বরূপে কোনই বিকার হইতে পারে না। সুতরাং ইহাও সেই একই কালে বলিতে হইবে যে উঁহার পরিণামে জগৎ উৎপন্নও হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা পূর্ব্বেই সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে ব্রহ্মের ইচ্ছায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহু যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও প্রদর্শিত হইবে যে সেই কার্য্যে অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, ইহা কেবল যে আমরা স্বীকার করি, তাহা নহে, কিন্তু উপনিষদ্ সমূহ এবং বেদান্ত দর্শনও তাহা

স্বীকার করেন। আচার্য্য শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পূর্ব্বালোচিত বেদান্তদর্শনের ১।৪।২৬ এবং ২।১।৬ সূত্র দ্বয়ের উপর শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। সুতরাং অব্যক্ত যে আদি কারণ এবং উপাদান কারণ সেই সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অব্যক্তের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট। স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণের বিকার এবং মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি মৃত্তিকার বিকার। আসল পদার্থ স্বর্ণ ও মৃত্তিকার কোনই বিকার হয় না, আকারের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। অব্যক্ত স্বরূপ অনন্ত নিরাকার। সুতরাং জগদুৎপত্তির জন্য উঁহার আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং উহার কোনই বিকারও হয় নাই। আকার থাকিলেত আকারের বিকার হইবে। আপত্তি হইবে যে অব্যক্ত কেবল অনন্ত নিরাকার নহে, উহা অনন্ত সাকারও বটে। সুতরাং আকারের বিকার অবশ্যম্ভাবী। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের অনন্ত সাকারত্ব তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্বের সমগ্রত্ব মাত্র। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সাকারত্ব আমাদের ধারণীয় সাকার পদার্থের সাকারত্ব নহে। চারিভূতের উৎপত্তির জন্য যেমন অনন্ত প্রায় নিরাকার-সাকার ব্যোমের আকারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেইরূপ জগদুৎপত্তির জন্য অনন্ত নিরাকার-সাকার অব্যক্তেরও আকারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্যোম অনন্ত প্রায় নিরাকার এবং সেই নিরাকারত্বের সমগ্রত্বই উহার অনন্ত প্রায় সাকারত্ব। অতএব আমরা এই ভাবে চিন্তা করিয়াও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জগদুৎপত্তির জন্য অব্যক্ত স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বর্ণালঙ্কারের বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির কারুকার্য্যের প্রতি আমাদের প্রথমতঃ দৃষ্টিপাত হয় বটে, কিন্তু আমরা স্বর্ণ ও মৃত্তিকাও দেখি। অপর পক্ষে জগৎ সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য যাঁহার উপর খোদিত হইয়াছে, সেই অব্যক্ত স্বরূপকে আমরা দেখি না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অব্যক্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

স্বভাববশতঃই আমরা উঁহাকে দেখিতে পাই না। "অব্যক্ত স্বরূপ কি ?" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে উঁহা নিরাকারই, উঁহার অনন্ত সাকারত্ব উঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব দ্বারা গঠিত। সুতরাং উঁহা আমাদের স্থূল জড় দৃষ্টির গোচর হইতে পারে না। আর আমরা যখন জড় মরুৎ এবং ব্যোমকেই দেখিতে পারি না, তখন ব্যোমের উৎপাদক দেখিতে আমাদের আশা করা একান্ত দুরাশা মাত্র। Kant এর Thing-in-itself কেও দেখা যায় না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণ বা ঋষিগণ নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন লাভ করেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কি উক্ত কারুকার্য্য ফাঁকি, মায়ামাত্র। কখনই নহে। স্বর্ণালঙ্কারের বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তির কারুকার্য্য যেমন স্বর্ণ বা মৃত্তিকা অবলম্বনে সত্যভাবেই বর্ত্তমান, জগৎ সম্বন্ধীয় কারুকার্য্যও তেমনি ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম অবলম্বনে বর্ত্তমান, সুতরাং সত্য। যেমন শিল্পীর ইচ্ছায় স্বর্ণে বা মৃত্তিকায় কারু-কার্য্য আরোপিত হইয়াছে, আবার শিল্পীর ইচ্ছায়ই উহারা কারুকার্য্য বিরহিত অবস্থায় আসিতে পারে, সেইরূপ পরমপিতার সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা যতকাল বর্ত্তমান থাকিবে, ততকালই উহারা (জগৎ সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য সমূহ) বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং উহারা সত্য। "মায়াবাদ" অংশে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। আরও একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে আরও সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। মহাসমুদ্রে যখন প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়, তখনই উহাতে উর্ম্মির উদ্ভব হয়। কিন্তু উর্ম্মিরাশির সর্ব্বত্রই ঐ মহাসমুদ্রের জল ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ একমাত্র সমুদ্র জলই অবলম্বন করিয়া বাত্যাযোগে উর্ম্মি সৃষ্ট হয়। জগৎও সেইরূপেই রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের এক-মাত্র অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনেই তাঁহারই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাদ্বারা জড় জগৎ রচিত হইয়াছে। উপমা স্থলে জল অব্যক্তস্বরূপ স্থানীয় এবং বাত্যা ইচ্ছাশক্তি স্থানীয়া। এখন যদি আমরা উদ্বেলিত মহাসিন্ধুর কিঞ্চিৎ জল এবং ঐ সমুদ্রের শান্ত অংশের কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিতে পাইব যে উভয় প্রকার জলের

কোনওটীর কোনই বিকার হয় নাই। উহাদের প্রত্যেক প্রকার জলেই দুই ভাগ Hydrogen and একভাগ Oxygen আছে। আবারও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে জলের স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই বটে, কিন্তু উহার আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য। উত্তাল তরঙ্গের উদ্বেলিত সিন্ধু এবং ধীর স্থির জলধি দৃশ্যতঃ এক নহে। সুতরাং আকারের কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সমুদ্রজলের আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা সত্য, উহা যতই অল্প বা অধিক হউক না কেন; কিন্তু নিরাকার অব্যক্ত স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অখণ্ড স্বভাব বশতঃ প্রকৃত পক্ষে উঁহার আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উহার আর পুনরুক্তি করিব না। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে তরঙ্গ মায়া নহে। যদি সেই ঝড়ের সময় কোনও জাহাজ ডুবিত, তবে উহার আরোহিগণ কখনই তরঙ্গকে মায়া বলিত না, কিন্তু তাহারা উহাতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে দিতে উহার সত্যতা অতি সত্যভাবে উপলব্ধি করিত। যাহা হউক্, এ বিষয়ের আলোচনা "মায়াবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব। উপরোক্ত স্থূল দৃষ্টান্তত্রয়েই দেখিতে পাইলাম যে বস্তুর (substance-এর) কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু উহাদের কেবল মাত্র আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং এই অনুমান যুক্তিযুক্তই হইবে যে নিরাকার-কারণতম পদার্থের সেই আকারজনিত বিকারও হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। নিরাকার, অখণ্ড ও অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থের যে আকারের কোনই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন পাত্রে নিরাকার ব্যোম পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে ব্যোম সেই সেই পাত্রের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যোম অখণ্ডই আছে এবং চিরকাল অখণ্ডই থাকিবে। উহাকে স্থূল পদার্থ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায় না। যাহা হয়, তাহা এই যে ব্যোম সকল পাত্রের সর্ব্বত্র ও বাহিরে এবং উহাদের সর্ব্বদিকের আবরণেরও অন্তর বাহির ওত-

প্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে। সুতরাং পাত্রমধ্যস্থ ব্যোম, পাত্রের বহিঃস্থ ব্যোম এবং পাত্রের আবরণ মধ্যস্থ ব্যোম যুক্তভাবেই—এক অখণ্ডভাবেই বর্ত্তমান। উহা খণ্ডিত হয় নাই বা প্রকৃত পক্ষে পাত্রের আকারে আকারিতও হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা এই যে ব্যোম বিভিন্ন পাত্রাকারে ভাসমান হইয়াছে মাত্র—মহাকাশ ঘটাকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। এই সম্পর্কে "গুণ-বিধান" অংশে কঠোপনিষদের মন্ত্রত্রয় এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকদ্বয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।* ব্যোমও সেইরূপ পাত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক এবং অখণ্ড ভাবেই চির বর্ত্তমান থাকে। আবার ব্যোমের জনক অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক অব্যক্ত স্বরূপও সেইরূপ আমাদের দৃষ্টিতে নানা নামরূপে ভাসমান হইলেও আমাদের ইহা বুঝিতে হইবে যে উঁহা এক, অখণ্ড, নির্ব্বিকারই রহিয়াছেন। উহার স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথবা অনন্ত ভাবে নিরাকার পদার্থের আকারের পরিবর্ত্তনের কোনই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার গুণবিশেষ অবলম্বনে বর্ত্তমান বিশ্বের ন্যায় পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বিশ্ব সৃষ্ট, পুষ্ট ও লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের কোন কারণেই বিন্দুমাত্রও বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। এই সহজবোধ্য তত্ত্ব ধারণা করিতে পারিলেও এই বিষম সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আবার একটী সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্ব "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সূক্ষ্মতম বা কারণতম পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহা প্রমাণ করা যায় যে ব্যোম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে (ক)। ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে জগৎ

---

* কঠোপনিষদের ৫।৯-১১ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৩।২ ও ১৩।১৬ শ্লোক সমূহ দ্রষ্টব্য।

(ক) "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির জন্য ব্যোমের কোনই বিকার হয় নাই। অব্যক্ত স্বরূপ ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং অনন্ত নিরাকার। সুতরাং জাগতিক কারুকার্য্য রচনার জন্য অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। আবার দেখা গিয়াছে যে স্থূল পদার্থের পরিণতিতেও কেবল মাত্র উহার আকারেরই পরিবর্ত্তন হয়, অন্য কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় না। নিরাকার পদার্থের আকারের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অনন্ত নিরাকার অব্যক্তস্বরূপ হইতে কারুকার্য্য সমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে উহার কোনই বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। Catalytic Agents এর উপস্থিতিতে অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু উহাতে উহাদের নিজেদের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। এই বিষয় অনুধাবন করিলেও আমরা অনুমান করিতে পারি যে এক বস্তু নিজে নির্ব্বিকার থাকিয়াও অন্য কিছু সৃষ্টি করিতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে Catalytic Agent অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়া দ্বারা কিছু সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু উহা নিজের উপর নিজ ক্রিয়া দ্বারা নিজ হইতে কিছু সৃষ্টি করিয়া নিজে নির্ব্বিকার থাকে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জগতে বহু বস্তু আছে, কিন্তু ব্রহ্ম ত একমাত্র। সুতরাং তিনি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য বস্তু কোথায় পাইবেন? সুতরাং তিনি নিজ ক্রিয়া দ্বারা (ইচ্ছাশক্তি দ্বারা) নিজ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সেই স্বরূপ অথবা তিনি স্বয়ং বিকৃত হন নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর একান্ত অভাব, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" সূত্র সম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত আলোচনা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্ম নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই কার্য্যে অন্য কাহারও বা অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় নাই, অথচ উহাতে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম অন্যদীয় সাহায্য হইতে নিত্য বঞ্চিত। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপমা কখনই সম্পূর্ণ হয় না। আমরা এতক্ষণ ব্যোমের

দৃষ্টান্ত দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ব্যোম যে কি পদার্থ, তাহা আর একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিতেছি। ব্যোম অব্যক্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিণাম মাত্র। বিশ্বের অন্যান্য যাহা কিছু, তাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে ব্যোমের পরিণামে উৎপন্ন। অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্মেরই অনন্ত স্বরূপের মধ্যে একটী স্বরূপ। সুতরাং উহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আমরা উঁহাকে দেখিতে পাই না, অনুমান করিতে পারি মাত্র। ব্যোমও অতি সূক্ষ্ম। এই জন্যই ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও অনেকে সন্দিহান। ব্যোম আমাদের অননুভবনীয় না হইলেও অদৃশ্য। পরীক্ষা দ্বারা উহারও অনুমান হইতে পারে। এই সম্পর্কে ভূত সম্বন্ধীয় পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত অংশ (২৩২-২৩৩ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। অব্যক্ত স্বরূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। উঁহার অনন্ত সাকারত্ব উঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব দ্বারা গঠিত। ব্যোমও সেইরূপ অনন্তপ্রায় নিরাকার-সাকার। এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। অব্যক্ত স্বরূপ অচেতন, জড় পদার্থ ব্যোমও অচেতন। অব্যক্তের শক্তি আছে, ব্যোমেরও শক্তি আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঐরূপ প্রায় সমভাবাপন্ন ব্যোমের উৎপত্তির জন্য অব্যক্ত স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে জড় পদার্থ মাত্রেরই দুইটী কারণ আছে। উহার একটী উপাদান কারণ, অন্যটী নিমিত্ত কারণ। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে জড় জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ এবং নিমিত্ত কারণ তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা। তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপে ও ব্যোমে যে পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা উহার উক্ত কারণদ্বয়ের মিলনের জন্যই। এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্ব প্রমাণ করিতে ব্যোম হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না এবং এই জন্যই আমরা নানা ভাবে ব্যোমের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে অব্যক্ত স্বরূপ জগদুৎপত্তির জন্য বিকৃত হন নাই। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে স্রষ্টায় ও সৃষ্টিতে বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। ব্রহ্ম

এক অখণ্ড থাকিয়াও অসংখ্য জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মে অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। কিন্তু জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। আরও দেখুন, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিত্য সর্ব্বত্র সুপ্রকাশিত। কিন্তু আমরা যে কেবল চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখি না, তাহা নহে, কিন্তু অন্তঃকরণ দ্বারাও তিনি অধার্য্য। সুতরাং তিনি নিত্য প্রকাশিত থাকিয়াও চিরগুপ্ত। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা যায় যে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপেও পরিণতি ও নির্ব্বিকারত্ব রূপ বিরুদ্ধ গুণদ্বয় বর্ত্তমান। এই জন্যই ব্রহ্ম উঁহাকে জগতের বীজভাবে গ্রহণ করিয়া উঁহার পরিণামে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সেই কার্য্যে অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়া জগদাকার ধারণ করিয়াছেন মাত্র। ইহার অর্থই এই যে উঁহা স্বয়ং ভাবেও থাকিতে পারে এবং জগদাকারেও পরিণত হইতে পারে এবং এই উভয় অবস্থায়ই উঁহা নির্ব্বিকার থাকে। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্রই নিত্য নির্ব্বিকার ও নিত্য সত্য। ব্রহ্ম তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপে বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং নিত্য নির্ব্বিকার। সুতরাং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপই নিত্য নির্ব্বিকার। পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপে নির্ব্বিকারত্বের বিরুদ্ধ গুণ পরিণতি অবশ্যই বর্ত্তমান। ইহা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায়। জগতে অবিরল পরিণতি দেখা যায়। যদি এই অনুমান মিথ্যা হয়, তবে জাগতিক পদার্থে পরিণতি কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই বলিতে হইবে যে জগৎ, উহা (পরিণতি) উহার আদি উপাদান কারণ অব্যক্ত হইতে লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের কোনও স্বরূপে যদি পরিণতি গুণ না থাকিত, তবে আমরা জগতে পরিণাম রূপ কার্য্য দেখিতে পাইতাম না। আর ব্রহ্মে যদি পরিণামের জ্ঞানই না থাকিত, তবে তিনি এক জাগতিক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপাদন করিতে পারিতেন না। যাহার

যে ভাবের কোনই জ্ঞান নাই, তিনি সেই ভাবের কোন কার্য্য করিতে পারেন না। অথচ আমরা দেখিতেছি যে জগৎ কার্য্যে পরিণতির শ্রেষ্ঠ স্থান। অনবরত পরিণমন ক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের অন্ততঃ একটী স্বরূপে পরিণতি গুণ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা তাঁহার পরিণতির জ্ঞান থাকিতে পারে না। সেই গুণটীই অব্যক্ত। জাগতিক পদার্থ ব্যোম পরিণাম সত্ত্বেও যে নির্ব্বিকার, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপ উহার উৎপাদক অব্যক্তেও বিপরীত গুণদ্বয় বর্ত্তমান। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অব্যক্ত স্বরূপ নিত্য নির্ব্বিকার, ইহাও নিত্য সত্য, আবার উঁহার পরিণামে যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও সমভাবে সত্য। অর্থাৎ অব্যক্ত বাস্তবে নাম-রূপ সম্বলিত জগৎরূপে পরিণত হইয়াও স্বরূপে নির্ব্বিকারই আছেন। সুতরাং practically অব্যক্তস্বরূপ জগৎরূপে ভাসমান হইয়াছেন। আমরা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে দেখিতে পাইব যে ব্রহ্ম ক্ষুদ্র জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি স্বরূপে অনন্ত একত্বের একত্ব থাকিয়াও বাস্তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবভাবে ভাস-মান। জড় এবং আত্মার উভয় রাজ্যেই একই বিধান বর্ত্তমান। One God, One Law, One Universe। ইহা (অব্যক্ত সুতরাং ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব) যখন প্রমাণিত হইল, তখন যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে পারা যায় যে জগৎ সৃষ্টির জন্য মায়াবাদ অন্তর্গত বিবর্ত্তবাদের কোনই প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে নির্ব্বিকার রাখিয়াই তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা উঁহা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করার জন্যই মায়াবাদ তথা বিবর্ত্তবাদের সৃষ্টি। এখন শব্দ প্রমাণ যোগে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্মের নির্লি-প্ততা দ্বারাও অব্যক্তের নির্ব্বিকারত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। এই সম্বন্ধে মায়াবাদ অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন :—"পরমপিতা এই সৃষ্টি হইতে নির্লিপ্তভাবে বিভিন্ন

আছেন" (সত্যধর্ম্ম)। "অনন্ত গুণের ধাম পালিছ ভুবন, আপনি নির্লিপ্ত থাকি লিপ্ত করি জন।" (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)। আবার কঠোপনিষদের ও গীতার নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র সমূহেও দেখা যায় যে ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। জাগতিক বিকার নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মকে কঠ-৫/১১ মন্ত্রে বাহ্য অর্থাৎ অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত বলা হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মকে অসঙ্গ বা স্বতন্ত্র স্বভাব বলিয়া থাকেন। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ (কঠ-৫।১১)।" "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ (গীতা-৯।৪-৬")। "বঙ্গানুবাদ :— সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎ সম্বন্ধ দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না। কারণ, তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব। (তত্ত্বভূষণ)। অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত অবস্থিতি করিতেছে, আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না। ভূতগণও আমাতে স্থিতি করিতেছে না, এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, আমি ভূতস্থ নহি, আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক। মহান্ সর্ব্বস্থানগামী বায়ু যেমন নিত্য আকাশস্থিত, সেই সমুদায় ভূত সেইরূপ আমাতে অবস্থিত জানিও। (গৌরগোবিন্দ রায়)।"

অতএব আমরা আপ্তবাক্য দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে ব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপের পরিণতিতে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি সেই জন্য বিকৃত হন নাই। ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" এবং "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশেও লিখিত হইয়াছে। নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত পদ্মপত্রে জল। পদ্মপত্রে জল আছে সত্য, কিন্তু উহা দ্বারা পত্রটী প্রভাবিত (affected) হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মের অব্যক্ত

স্বরূপ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উঁহাতেই স্থিতি করিতেছে সত্য, কিন্তু উহাতে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। It has remained as unaffected as ever. ইহার কারণ ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা। আবার 'ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা" বলিলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণেরই নির্লিপ্ততা। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দ্বয় এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম তাঁহার একটী স্বরূপের পরিণাম সংঘটন করিয়া জগৎ সৃজন করিয়াছেন। "একং রূপং (একং বীজং) বহুধা যঃ করোতি।" করোতি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি যে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উহা যে আপনা আপনি ব্রহ্ম হইতে আসে নাই, অর্থাৎ উহা যে ব্রহ্মের স্বভাবজাত নহে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সেই স্বরূপের পরিণাম হইয়াছে, ইহা শ্রুতি সম্মত। আবার ব্রহ্ম যে নিত্য নির্ব্বিকার, তাহাও শ্রুতি সম্মত। ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার। সুতরাং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপই নিত্য নির্ব্বিকার। অতএব দেখা গেল যে অব্যক্তের পরিণাম হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু সেই পরিণামে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই, এই তত্ত্বও শ্রুতিসম্মত ও সমভাবে সত্য। 'মায়াবাদ' অংশে সৃষ্টিসূচক বহু শ্রুতি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন। অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিণামে জগদুৎপন্ন। কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকারই বলেন। সুতরাং পরিণাম হইয়াছে, ইহাও সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই ইহাও সত্য। এই সম্পর্কে পাঠক ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বালোচনা পাঠ করিবেন। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৬ (দৃশ্যতে তু) সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে দেখা যায় যে ব্রহ্মসত্তাই জগতের সত্তা। উহাতে প্রকৃতি বিকৃতির কথাও আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতি ও জগৎ বিকৃতি। সুতরাং ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন। ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার। ইহাও শ্রুতি সম্মত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সেই পরিণামে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন

হয় নাই, কিন্তু তাঁহার একতম স্বরূপ হইতে জগৎ আসিয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে পারা যায় যে সেই স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৬ (আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ) সূত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সূত্র তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ মন্ত্রদ্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই স্থলেও ব্রহ্মের পরিণামে জগতুৎপত্তির কথা পাওয়া যায়। সূত্রে 'পরিণাম' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রুতি বাক্যেও পরিণাম সুস্পষ্ট। এস্থলেও ব্রহ্ম হইতে জগতুৎপত্তির কথা আছে। কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মকে নিত্য নির্ব্বিকার বলেন। সুতরাং জগতুৎপত্তির জন্য তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই. ইহাও শ্রুতি সম্মত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্র এই উপনিষদেরই উক্তি। সুতরাং ঐ উক্তি ব্রহ্ম প্রকরণে স্থিত। এস্থলেও বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতে জগৎ উৎপন্ন বলিয়াই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই যুক্তি সহ উক্ত হইয়াছে। যদি ইহা স্বীকার না করা যায়, তবে শ্রুতিতে শ্রুতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, কঠ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম তাঁহার একতম স্বরূপ অবলম্বনেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি ও যুক্তির বলে আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। বেদান্ত দর্শনের ১।১।২ (জন্মাদ্যস্য যতঃ) সূত্রেও ঐ একই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন. তাঁহাতেই স্থিত ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই সূত্র ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩।১৪।১ (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত) এবং অন্যান্য তদ্রূপ বহু মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার বলেন। বেদান্তদর্শন শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহাও তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শনানুযায়ীও বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বটে. কিন্তু

তাহাতে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্যে দেখা গেল যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপের পরিণামে জগদুৎপন্ন। কিন্তু তাঁহাতে উঁহার সুতরাং ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই। যাহাদের সংস্কার আছে যে পরিণাম হইলেই বিকার অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে পূর্ব্বকথিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। তাহারা দেখিবেন যে শ্রুতি ও আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের পরিণামে জগদুৎপন্ন। আবার ব্রহ্ম যে নিত্য নির্ব্বিকার, ইহাও সত্য। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে সমগ্র ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু তাঁহার একটী মাত্র স্বরূপ হইতেই জগৎ আসিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অব্যক্তের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন, ইহা সত্য এবং সেই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই, ইহাও সমভাবে সত্য। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিকদ্বয়ও বলিতেছেন যে অব্যক্তের বিকার হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারাও আমরা অনুমান করিতে পারি যে জগৎ উৎপত্তির জন্য অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং যুক্তি, শব্দ প্রমাণ এবং দর্শন সমূহের উক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জগদুৎপত্তির জন্য অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। যদি কেহ উক্ত বিস্তারিত আলোচনার পরেও ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্বসম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তিনি যেন "ইচ্ছাশক্তি" অংশে পরম পিতার ইচ্ছার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে লিখিত বিষয় স্মরণ করেন অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতার জ্ঞানও অনন্ত। সুতরাং সুকৌশলী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপের নিত্য নির্ব্বিকারত্ব প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করিয়া উঁহারই অবলম্বনে যে জগৎ রচনা করিতে পারেন, ইহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। যে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর স্বীয় সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজে সম্পূর্ণরূপে অখণ্ড ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও বহু জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইতে পারিয়াছেন, * তিনি যে অব্যক্ত স্বরূপকেও অখণ্ড ও নির্ব্বিকার

---

* "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রাখিয়া সেই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই উঁহার (অব্যক্ত স্বরূপের) অবলম্বনেই জড় জগৎ ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। স্থূল ভাবে বুঝিতে গেলে, বুঝিতে হয় যে সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান, প্রেম, অব্যক্ত স্বরূপ ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রধান ভাবে কার্য্য করিতেছেন। উঁহারা প্রত্যেকেই অনন্ত ভাবে সূক্ষ্ম এবং অনন্ত শক্তি সম্পন্ন। সুতরাং উঁহারা যে অনন্তের তুলনায় পরমাণুবৎ অব্যক্ত স্বরূপের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করিয়াও উঁহাকে বহু জড় পদার্থ ভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? (ক) তিনি স্বয়ং নিজে জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে জড় জগৎ ভাবে ভাসমান করিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যেই পরমপিতার একই বিধান জয়যুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনিও স্বয়ং যেমন খণ্ডিত বা বিকৃত হন নাই, তেমনি তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপও খণ্ডিত বা বিকৃত হন নাই। One God, One Law, One Universe. অতএব আমরা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারি যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে উঁহার বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। পরিণাম বাদের প্রধান বিরোধী মায়াবাদ। সুতরাং মায়াবাদ সম্বন্ধীয় এই তত্ত্বের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিস্তারিত আলোচনা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। মায়াবাদে কূটস্থ ব্রহ্মই জীবাত্মা। তিনি অবিদ্যা উপহিত এবং এই জন্যই তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবভাবে ভাসমান। অর্থাৎ এই অবিদ্যা বা মায়ার জন্যই তিনি অতি সামান্য বাস্তব অবস্থায় ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং স্বরূপ এবং বাস্তব অবস্থা উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলেন যে কূটস্থ ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ অবস্থাই সত্য, তাঁহার বাস্তব অবস্থা নাই, তবে বলিতে হয় যে, যদি তাহাই হইত, তবে সেই কূটস্থ ব্রহ্মের বন্ধন ও মুক্তির কথা উঠিত না। পরব্রহ্ম

(ক) ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্ত practically জগদ্রূপে ভাসমান হইয়াছেন।

কখনই মায়োপহিত হন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন বন্ধন ও মোক্ষের কোনই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। যদি মায়া দ্বারা কূটস্থ ব্রহ্ম ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান না হইতেন, তবে তিনি এরূপ শক্তিহীন অবস্থায় থাকিতে পারিতেন না। কঠোপনিষদের অশরীরী ব্রহ্মের অবস্থাই স্বরূপ অবস্থা এবং ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত অবস্থাই বাস্তব অবস্থা। শিকারী গৃহে বাসের অবস্থাই বাস্তব অবস্থা এবং তৎপর রাজপুত্রত্ব জ্ঞানই স্বরূপ অবস্থা। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে তিনি অবিদ্যাযোগে ক্ষুদ্র-ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। নতুবা সৃষ্টি ব্যাপার একান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি এবং ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে যাহা দেখিব, তাহাতে ইহা সুপ্রমাণিত হইবে যে সৃষ্টি ব্যাপার মিথ্যা নহে, কিন্তু উহা প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জীবাত্মার স্বরূপ অবস্থাই ক্ষুদ্রভাবে ভাস-মান। স্বরূপ অবস্থাই আবরণ রাশি দ্বারা আবৃত হইয়া বাস্তব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বরূপ অবস্থা বহ্নি, আর বাস্তব অবস্থা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। প্রকৃত পক্ষে এই ভাসমানত্ব জন্য স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই। স্বরূপ অবস্থা এবং বাস্তব অবস্থা বা ভাসমান অবস্থা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব দেখা গেল যে জীবাত্মার দুইটী অবস্থা আছে—একটী স্বরূপ ও অন্যটী বাস্তব। অব্যক্ত স্বরূপও ব্রহ্মের ইচ্ছায় বাস্তব অবস্থায় অর্থাৎ জগদ্রূপে ভাসমান হইয়াছেন। পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে যে জগতে সর্ব্বত্র মূলে একই বিধান কার্য্য করিতেছেন। উহাতে প্রকার ভেদ আছে, বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু মূলতঃ উহারা একমাত্র। এখন এই সম্বন্ধে আরও একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সেই আপত্তি উত্থাপন ও খণ্ডন করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি। অব্যক্ত পরমপিতার একতম স্বরূপ। পরমপিতা অনন্ত স্বরূপে স্বরূপবান। আবার তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মে যখন অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহার অন্যান্য অনন্ত স্বরূপের সহিত অনন্ত ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান, তখন কেবলমাত্র তাঁহাই অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপই কি প্রকারে পরিণত হইয়া জগদাকার

ধারণ করিতে পারেন, উহা কি প্রকারে পৃথক্ ভাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে প্রথমেই আমাদের বক্তব্য এই যে আপত্তিকারী জড়ীয় দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াই এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার আপত্তিকে আরও সরল করিতেছি। একটী সন্দেশের মধ্যে আমরা তুইটী পদার্থ দেখিতে পাই। উহারা চিনি ও ছানা। উহারা উহাতে (সন্দেশে) সংমিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান যে উহারা প্রত্যেক অণুতে পরস্পর পরস্পরের সহিত যেন ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সন্দেশ মধ্যস্থ কেবলমাত্র চিনির অবলম্বনে একটী খেলনা প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিনা, যাহাতে কেবল মাত্র চিনিই থাকিবে, অথচ সন্দেশের উপাদান ছানা ও চিনি পূর্ব্ববৎ সন্দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিবে এবং সন্দেশও পূর্ব্বাবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকিবে। আপত্তিকারীর মতে ইহা যেমন অসম্ভব, ব্রহ্মের কেবল মাত্র অব্যক্ত গুণের অবলম্বনে জড় জগৎ সৃষ্ট হওয়া এবং তজ্জন্য ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব। ইহার উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য এই যে ইহা একটী জড়ীয় দৃষ্টান্ত মাত্র। উহা দ্বারা ব্রহ্মের বা তাঁহার কোনও একটী গুণের সম্পূর্ণ তুলনা হয় না। কারণ, ব্রহ্ম অনন্ত ভাবে নিরাকার। ক্ষিতি পদার্থ দ্বারা নিরাকার ব্যোমেরই ধারণা করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মের গুণ সম্বন্ধে উহা দ্বারা সত্য ধারণা লাভ করা অসম্ভব। ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণই যে ব্যোম অপেক্ষা অনন্ত গুণে সূক্ষ্মতর, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। ক্ষিতির স্থানাবরোধকতা গুণ আছে। একই স্থানে একই কালে তুইটী লৌহ খণ্ড থাকিতে পারে না, কিন্তু ব্যোম সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং উহার পক্ষে স্থানাবরোধকতার প্রশ্নই উদয় হয় না। সেইরূপ সন্দেশে যাহা অসম্ভব, তাহা অপূর্ব্ব স্বভাব ব্রহ্মে সম্ভব হইতে পারে। এখন আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি। এই সমস্যা কঠিন বটে। আমরা ইহার সুমীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত দয়াময় পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি যেন নিজ অপার দয়াগুণে আমাকে এই সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান

দান করিয়া কৃতার্থ করেন। ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ বটেন। ইহা সত্য যে তাঁহাতেই তাঁহার অনন্ত গুণ অনন্ত মিশ্রণে নিত্য সংমিশ্রিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি যে তাঁহার প্রত্যেক গুণই আবার বিপরীত ভাবাপন্ন। প্রেমে যেমন বহুকে এক করা যায়, আবার সেই প্রেমই এককে বহু করা যায়। সুতরাং তাঁহাতে যেমন অনন্ত গুণের অনন্ত একত্ব বা অনন্ত সংমিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে, তেমনি তাঁহাতেই অনন্ত গুণ সংমিশ্রিত থাকিয়াও পৃথক্ ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণরাশি নিজ নিজ পৃথকত্ব রক্ষা করিয়াই অনন্ত মিশ্রণে নিত্য সংমিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান। আবার চিন্তা করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে মূলে অনন্ত গুণরাশির পৃথকত্ব না থাকিলে মিশ্রণ বা একত্ব সম্ভব হইত না। অর্থাৎ গুণরাশির পৃথকত্ব আছে বলিয়াই একত্ব বা অনন্ত মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে। যদি গুণরাশির পৃথকত্বই না থাকিত, তবেত অনন্ত গুণধাম পরমপিতার একটী মাত্র গুণই নিত্য বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত গুণই নিত্য বিদ্যমান এবং সেই অনন্ত গুণের একত্বও হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের মধ্যে প্রত্যেকটীই সরল ও স্বাধীন। সুতরাং সেই গুণরাশির যে মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা উঁহাদের অনন্ত সরলতা ও স্বাধীনতা বা পৃথকত্ব রক্ষা করিয়াই বটে, অন্য ভাবে নহে। বহুত্ব বোধ এবং একত্বজ্ঞান উভয়ই সরল গুণ। সুতরাং উহারা ব্রহ্মে নিত্যই বর্ত্তমান। ইহা দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে অনন্ত গুণ পৃথক্ ভাবে থাকিয়াও অনন্ত মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে কোন গুণই জড় পদার্থের ন্যায় বিভক্ত বা মিশ্রিত নহে। পার্থক্যের অর্থ Distinction. স্বর্ণালঙ্কারে কারুকার্য্য যেমন স্বর্ণের সহিত একীভূত হইয়াও পার্থক্য (Distinction) রক্ষা করে, সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত গুণই পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়াও– একীভূত হইয়াও নিজ নিজ পার্থক্য (Distinc-

tion) রক্ষা করেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য ইহা পাঠক মনে রাখিবেন এবং ইহাও মনে রাখিবেন যে ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণই অনন্ত ভাবে নিরাকার। পরমাত্মায় যে বিপরীত গুণের অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য এবং অনির্ব্বাচ্য রূপে মিলন সম্ভব হইয়াছে, তাহা ধারণা করিতে পারিলেই উপরোক্ত তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই। উপ-রোক্ত তত্ত্ব যখন যুক্তিযুক্ত এবং সত্য, তখন আমরা সহজেই চিন্তা করিতে পারি যে ব্রহ্ম তাঁহার অপার শক্তিশালিনী ইচ্ছাদ্বারা বাধ্য বাধকতা শূন্য হইয়া তাঁহার স্বেচ্ছায় লীলার্থই তাঁহার একটী মাত্র গুণ অর্থাৎ অব্যক্ত গুণ অবলম্বনে জড় জগৎ সৃজন করিয়াছেন। আমরা জগতে দেখি যে কর্ম্ম দ্বারা এক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে পরিণমন করা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কর্ম্ম ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। ক্রিয়া বিশেষ এবং প্রণালী বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ মানুষ তাহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জলকে Hydrogen এবং Oxygen এ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। আবার তাহার সেইরূপ ইচ্ছাদ্বারাই দুই ভাগ Hydrogen এবং একভাগ Oxygen মিশ্রণ করিয়া তিনি জলে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এখন বিজ্ঞান জগতে Energy (ক্রিয়াশক্তি) অসীম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। Energy এর উপযুক্ত ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক পরমাণুও বিভক্ত হইতেছে। জড়ীয় Energy পরম পিতার অনন্ত গুণের একটী গুণের অর্থাৎ অব্যক্ত গুণের অপার শক্তির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মানব যখন জড়ীয় Energy এর সীমাই লাভ করিতে পারে নাই, তখন অনন্ত ইচ্ছাময়ের অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তির অপার শক্তি সম্বন্ধে আমরা যে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিব না, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে জড় জগৎ সৃজন অথবা অথবা অব্যক্ত স্বরূপকে পৃথক্ ভাবে ব্যবহার করা যেমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়, তেমনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও অনন্ত শক্তিতে শক্তিমতী এবং তিনি যে অনন্ত জ্ঞানে নিত্য জ্ঞানী, সুতরাং অনন্ত সুকৌশলী, তাহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এই তত্ত্বটীকে দৃষ্টান্ত-

দ্বারা আরও সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জীব ও জড় সংক্রান্ত সকল দৃষ্টান্তই অসম্পূর্ণ। উহারা তত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যের আভাস মাত্র প্রদান করিতে সমর্থ। আমাদের মধ্যে যখন ক্রোধ রিপু (উহাও একটী জাত গুণ) অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন উহার তেজে অন্যান্য গুণ সাময়িক ভাবে যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এমন কি, ক্রোধান্ধ হইলে জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। ক্রোধান্ধ অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞানও থাকে না, সময় সময় শারীরিক চৈতন্য লুপ্ত হয়। অর্থাৎ ক্রোধান্ধ হইলে জ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ ক্রোধান্ধ ব্যক্তি সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যু মুখেও পতিত হয় এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (২।৬২-৬৩)। বঙ্গানুবাদ :—"বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে, বুদ্ধি নাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।" (গৌরগোবিন্দ রায়)।

গীতোক্ত তত্ত্ব আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। অন্যান্য প্রবল রিপুজাত মোহ দ্বারাও অত্যন্ত আক্রান্ত হইলে মনুষ্যের দুর্দ্দশা অল্পাধিক পরিমাণে এই রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল যে মনুষ্য অন্য গুণ বিবর্জ্জিত হইয়াও কোনও একটী বিশেষ গুণের ব্যবহার করিতে পারে। দোষ মাত্রই জাতগুণ। সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে তাঁহার প্রেমলীলারূপ মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি কোনও একটী গুণের অবলম্বনে জগৎ সৃজন করিতে পারেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এখন আমরা সরল গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। যখন মানব অতি গভীর ভাবে কোনও তত্ত্ব বা সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন তিনি অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া যান, কেবল চিন্তার বিষয়ই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে। অর্জ্জুন যেমন

পরীক্ষাকালে পক্ষীর চক্ষুটী মাত্র দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ তখন তাহার অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। আধ্যাত্মিক সাধনায় ধ্যানের স্থান অতি উচ্চে। সুগভীর ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় পদার্থ মাত্র ধ্যানকারী সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, অন্য চিন্তা তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়। এই ধ্যানের পরমোৎকর্ষ লাভ হইলে অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন সাধক বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারেন। আমাদের দেশে যোগিগণ সমাধিস্থ হইতে পারেন। সেই অবস্থার নানা বিভাগ আছে। তাহাতেও বহির্দেশ সম্বন্ধে চিন্তা পরিবর্জ্জিতে হয়। আবার আমরা যদি গভীর প্রেমে মিলিত দম্পতির সম্বন্ধে চিন্তা করি যে তাহারা কোন কারণ-বশতঃ বহু কাল বিরহক্লেশ ভোগ করিতেছেন। সেই অবস্থায় যদি তাহারা অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলিত হন, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা সাময়িক ভাবে পৃথিবীর দুঃখ, দৈন্য, জ্বালা, যন্ত্রনা, লজ্জা, অপমান সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া মিলনানন্দ—প্রেমানন্দ সম্ভোগ করেন। আধ্যাত্মিক জগতে মহাপ্রেমিক, মহাভক্তগণ যে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার প্রতি প্রেমোপহার দান করিতে যাইয়া আত্মহারা হন, তাহা মহাপ্রেমিক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এবং মহাভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দয়াদ্র চিত্ত ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াও যে দয়ার কার্য্য করেন, তাহা বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা ও দয়ার প্রভাব এমন হইতে পারে যে সেই সময় সাধক সাময়িক ভাবে অন্যগুণবর্জিত হইয়াই কার্য্য করিতে পারেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সাধক কোন এক সময় কোনও একটী গুণের কার্য্যই পৃথক্ ভাবে করিতেছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অবশ্যই একথা বলা চলে না যে তিনি অন্য গুণরাশি বর্জ্জিত হইয়া সৃষ্টিকালে একমাত্র

অব্যক্ত স্বরূপ লইয়াই কার্য্য করিতেছেন। তিনি নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ। সুতরাং অপূর্ণ মানবে যাহা দেখিতে পাই, তাঁহাতে সেই অবস্থা ঠিক ঠিক সংঘটিত হয় না। দৃষ্টান্তগুলি দিবার উদ্দেশ্য এই যে কোন একটী গুণ দ্বারা পৃথক্ ভাবে কার্য্য করা সম্ভব। পূর্ণ শক্তি ভগবানে সকলই পূর্ণ। সুতরাং তিনি তাঁহার অনন্ত গুণই নিত্য জাগ্রত রাখিয়া কোনও একটী গুণের কার্য্য পৃথক্ ভাবে করিতে পারেন এবং তাহাই করিতেছেন। এখন আমরা একটী জড়ীয় দৃষ্টান্ত অবলম্বনে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছি। চিন্তা করা যাউক যে প্রশান্ত মহাসাগরের পঁচিশ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থানে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে। সেইজন্য সেই স্থান ব্যাপী মহাসমুদ্রের উপরিভাগের জলরাশি উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সমুদ্র ঐরূপ ভাবে তরঙ্গাকুল হইলে জলের কোনও রূপ পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল আকারের একটু পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। এখন আমরা যদি আরও চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে তরঙ্গায়িত জলভাগের নিম্নে সুগভীর প্রদেশে এবং মহাসমুদ্রের অন্যান্য নির্ব্বাত দেশে জলে কোনও তরঙ্গ নাই। অর্থাৎ মহাসমুদ্রের অত্যল্প স্থানটুকু মাত্র আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু উহার অন্যান্য অংশের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মহাসমুদ্রের অন্যান্য অংশের তুলনায় তরঙ্গায়িত অংশ বা পরিবর্ত্তিত অংশ বিন্দু মাত্র। এই স্থলে আমরা যদি বাত্যাকে পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপে এবং মহাসমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলভাগকে পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপ ভাবে চিন্তা করি, তবেই বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার অন্যান্য গুণ হইতে অব্যক্ত স্বরূপকে বিচ্ছিন্ন না করিয়াও উঁহারই অবলম্বনে জড় জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে তরঙ্গ জন্য মহাসমুদ্রের উপরিভাগের জলের আকার মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু জলের স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ, তরঙ্গসমূহ জলকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের

স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অব্যক্ত স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা ও অখণ্ডত্ব স্বভাব বশতঃ উঁহার আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আবার আমরা দেখিলাম যে মহাসমুদ্রের কোনও একটী ক্ষুদ্র অংশ বাত্যা সহযোগে তরঙ্গায়িত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহার অন্যান্য স্থল ধীর স্থির থাকিতে পারে। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে পরম প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তিদ্বারা অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে জড় জগৎ ভাসমান করিয়াছেন। সুতরাং সেই কার্য্যের জন্য অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহার অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্বরূপ হইতে আমাদের ধারণীয় ভাবে বিভাগ করিতে হয় নাই। আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে ব্রহ্ম জড় দেহ যোগে বহু ভাবে সুতরাং অংশ ভাবে অর্থাৎ অসংখ্য জীবাত্মাভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উঁহাকেই (অব্যক্ত স্বরূপকেই) অসংখ্য জড় পদার্থরূপে ভাসমান করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং যেমন এক, অখণ্ড, নির্ব্বিকার ও পূর্ণ থাকিয়াও নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন, এস্থলেও তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছার বলে তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহারই অন্যান্য গুণরাশি হইতে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও যেন বিচ্ছিন্ন ভাবে—অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। অতএব এইভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে শ্রুতির মহাবাক্য "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" জীব ও জড় জগতে উভয় স্থলেই সত্য, সত্য, মহাসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। একটু পার্থক্য এই যে জীবাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ভাবে অভেদ এবং জড় জগৎ পরম্পরা ভাবে অভেদ। 'গুণ বিধান'' এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখিতে পাইব। এই কার্য্য দ্বারা যে ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্ব্ব-কথিত মহাবাক্য আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। One God, One Law, One Universe. এক পরমপিতার একই বিধান জীবে

এবং জড়ে উভয় ক্ষেত্রেই কার্য্য করিতেছে। এস্থলে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয় যে প্রতি কল্পান্তে অব্যক্ত ব্রহ্মেই বর্ত্তমান থাকেন এবং কল্পারম্ভে পুনরায় ব্যক্ত হন। যদি তাহাই হয়, তবে অব্যক্ত ব্রহ্মেরই স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই থাকিতে পারে না। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হয় যে তিনি সেই অব্যক্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, তিনি নিত্যই অনন্ত অসীম। তাঁহার সীমা সৃষ্টি করা কাহারও বা কিছুরই সাধ্য নাই। ইহাই যখন সত্য, তখন হিন্দু শাস্ত্র অনুধাবন করিয়াও বলা যাইতে পারে যে অব্যক্ত ব্রহ্মের একতম স্বরূপ এবং উহা তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যদি ইহাই সম্ভব হয়, তবে সত্যদর্শনোক্ত অব্যক্তও যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় জগৎ গঠনে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনই ভুল নাই। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে অব্যক্তের বিকার হয় নাই, ইহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ইহা বলা হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার বিকার হইয়াছে, ইহাও বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের ইচ্ছা অনন্ত-শক্তি-সম্পন্না। শক্তির স্বভাবই কার্য্য করা। নানা কার্য্য করিতে গেলেই ইচ্ছাশক্তিকে নানাভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং যাহা যাহার স্বভাব, সেই অনুযায়ী কার্য্য হইলে তাহা কখনও বিকৃত হয় না। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি জগৎ সৃজন, পালন ও লয় করেন বলিয়া উঁহার কোনই বিকার হয় না এবং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় না।

হে নিত্য নিরাকার, পরব্রহ্ম! তুমি স্থূল নহ, সূক্ষ্মও নহ, চরম কারণ রূপে তুমি নিত্য বর্ত্তমান। আবার তুমিই কারণেরও অতীত। তোমার বিকার কি প্রকারে সম্ভব হয়? হে অশরীরী ব্রহ্ম! আমরা স্থূলতম শরীরে বাস করিয়া, স্থূলতম বস্তুর দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ

ও আস্বাদন করিয়া এবং স্থূল পদার্থের সতত চিন্তা করিয়া এতদূর মোহগ্রস্থ হইয়াছি যে তোমাতেও বিকারের কল্পনা করিতে প্রয়াসী হই। ইহা ধারণা করিতে ভুলিয়া যাই যে চরম কারণে কোনই বিকার কখনই উপস্থিত হইতে পারে না। তোমার এমনই অনির্ব্বচনীয় স্বভাব যে তুমি সৃষ্টি করিতে পার, তোমার নিজেরই একটী স্বরূপের উপাদানত্বে এই জড় জগৎ উৎপাদন করিয়াছ, নিজে স্বয়ং বহু জীবাত্মাভাবে ভাসমান হইয়াছ, তোমারই অপার শক্তিশালিনী ইচ্ছা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। হে প্রেমলীলাময় পরমদেবতা! তোমার প্রেমলীলার্থ অনন্ত কর্ম্ম তুমি সম্পাদন করিতেছ, কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়ার জন্য তোমার বিন্দুমাত্রও বিকার হয় নাই, হইবেও না বা হইতেও পারে না। হে অনন্ত ইচ্ছাময়! তুমি নিত্য ক্রিয়াশীল। কে বলে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার কোনই ক্রিয়া ছিল না? তোমারই পরম জ্ঞানী সুসন্তান ঔপনিষদিক ঋষগণ সেই উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে বাধা করেন নাই। হে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ! তোমার সত্বা তুমিই নিত্য উপলব্ধি কর, তুমিই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিত্য প্রেম করিতেছ। আবার তোমারই উপাদানত্বে তুমিই স্বয়ং তোমারই অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, পালন করিতেছ, আবার কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে ইহা একেবারে লয় করিবে। কিন্তু তুমি এই অসংখ্য প্রকারের অগণিত কর্ম্ম দ্বারাও বিকৃত হইতেছ না, কোনও রূপ বিকৃতি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সত্যই তোমাতে বিপরীত ভাবের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইয়াছে। যে পিতঃ! হে অনির্ব্বাচ্য! তোমাকে বারংবার ধন্যবাদ দিতেছি। তোমার গুণ অনন্ত, তোমার মহিমা অনন্ত, আবার তোমার দয়াও অনন্ত। তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়া কেমনে নির্ব্বাক থাকিব? তোমাকে চিরকাল হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে ধন্যবাদ দান করিয়া আমিও ধন্য হইব। হে নিত্য শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্! হে নিত্য নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন পরম দেবতা! হে অনন্ত তেজঃ পূর্ণা, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা! তুমিত নিত্যই

অশরীরী, তোমাকে শরীরজাত-জড়-জাত দোষপাশ কিরূপে স্পর্শ করিবে? তুমি যে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব-বিকার-শূন্যম্, সর্ব্ব-দোষ-পাশ-লেশ-শূন্যং শিবম্! তোমাতে বিকারের স্থান কোথায়? "তুমি প্রভু নিরাকার, অথচ হে সর্ব্বাকার, তবু তুমি নির্ব্বিকার, ধন্য ধন্য গুণময়"। তুমি একান্তই অনির্ব্বচনীয়। তোমার অনন্ত অংশের একাংশেরও উপমা জগতে মিলে না। কি প্রকারে আমরা তোমার সম্বন্ধে চিন্তা করিব, তোমাকে বাক্যে আনয়ন করাত দূরের কথা? তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার অনন্ত স্বরূপ কে বর্ণনা করিবে? মহর্ষিগণই যখন তোমার গুণরাশির অপার শক্তি বর্ণনা করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র নর, মহর্ষিগণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার অনুপযুক্ত থাকিয়াও কি প্রকারে তোমার সেই অপূর্ব্ব-অরূপ-রূপ-মাধুরী বর্ণনা করিব? হে শরণাগত বৎসল পিতঃ! আমি তোমার শরণাগত সন্তান। তোমার নিজ অপার দয়াগুণে এই অধম সন্তানের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে সত্যজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান দান কর, যেন তোমার অপার দয়ায় তোমারি নিত্য সত্য তত্ত্বের সত্য জ্ঞান নিজে লাভ করিয়া জগতের নরনারীর হৃদয়ে উহা তোমারই অনুপম প্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। দয়াময়! নিজগুণে চিরদুঃখী সন্তানকে দয়া কর।

ওঁং

অতএব উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনান্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পরমপিতা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই জড় জগৎ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কার্য্যে প্রকৃত পক্ষে সেই স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং স্বয়ং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই।

আমরা জড় উৎপত্তির বিবরণ জানিতে পারিলাম। পাঠক এখন স্বতঃই জীবাত্মা সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিবেন। জীবাত্মার জন্যই জড়ের সৃষ্টি। তাই এখন জীবাত্মা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে যাইতেছি।

ওঁং ব্রহ্মাণ্ডকারণং নিত্য নির্ব্বিকারং ওঁং
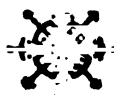
ওঁং

অনন্ত সন্তান সুবৎসল প্রভো
রণন্তু সন্তানক সদ্গুণস্তু তে।
অনাদ্যনন্তস্য সতশ্চ পালিনো
নমো নমস্তে চরণে সুমঙ্গলে॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

জীবাত্মা

আমরা আত্মা বলিতে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে বুঝি। পরমাত্মা বলিতে পরমেশ্বর বা ব্রহ্মকে বুঝি এবং জীবাত্মা বলিতে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, মনুষ্য, পরলোকবাসী প্রভৃতিকে বুঝি। আত্মার অর্থ কি? আত্মা শব্দটী অত ধাতু হইতে মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অত ধাতুর অর্থ সতত গমন বা সর্ব্বব্যাপীত্ব। সুতরাং আত্মা শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, তিনিই আত্মা (ক)। অতএব আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও তাঁহার খণ্ড হইতে পারে না। আমরা আত্মাকে দুইভাগে বিভাগ করিয়া থাকি। যথা—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। যে আত্মা জীবত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ দেহাবরণে আবৃত অর্থাৎ দেহ সংসর্গে আসিয়া নানাবিধ দোষ পাশে আবদ্ধ, তাহাকেই আমরা জীবাত্মা বলি। আর যিনি জড় দেহ দ্বারা আবৃত নহেন, যিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, মহান্, তাঁহাকেই আমরা পরমাত্মা বলি। অর্থাৎ জীবাত্মা সমূহ হইতে নিত্য উৎকৃষ্টতর অবস্থাপন্ন বলিয়া তাঁহাকে "পরম" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব জীবাত্মা আর কিছুই নহে, কেবল দেহাবরণে আবৃত পরমাত্মা। অর্থাৎ আত্মা এক ও অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বব্যাপক অবস্থায় তিনি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া এবং দেহাবদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাও অর্থাৎ জীবাত্মাও সাধনা দ্বারা অন্ত বিশিষ্ট অসীমত্ব (অনন্ত অসীমত্ব

(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ দ্বারা সম্পাদিত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—২৬১ পৃঃ—টীকা।

নহে) লাভ করিতে পারেন। এই তত্ত্ব বুঝিতে পাঠক পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত "সত্যামৃত" গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। আত্মা সম্বন্ধে গ্রন্থের নানাস্থলে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। (১) "সৃষ্টির সুচনা", (২) "আত্মা ও জড়ের মিলন," (৩) "জড়ের বাধকত্বের কারণ," (৪) "গুণবিধান" এবং (৫) "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী"। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময় পরমাত্মা নিজ ইচ্ছায় এক ও অখণ্ড থাকিয়াও বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাহা এই যে প্রেমময় পরমপিতা বহুভাবে ভাসমান জীবাত্মাদিগকে ক্রমশঃ অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত করিতেছেন এবং অবশেষে প্রত্যেক জীবকে তাঁহারই অনন্ত স্বরূপে স্বরূপবান করিবেন। জীবের সমস্ত জীবনই পরীক্ষাময়। কারণ, জীব অপূর্ণ, কিন্তু তাঁহার লাভ করিতে হইবে পূর্ণত্ব। অতএব দেহাবদ্ধ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই কিন্তু দেহবদ্ধতা জন্য ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে দেখিতে পাইব। জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে যাইয়া পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেনঃ—
"ইন্দ্রিয়ার্থে সন্দেহ হইতেও পারে, কিন্তু তৎ সন্দেহকারী অস্মদ্-বাচ্য পদার্থের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কেননা, অস্মদ্-বাচ্য পদার্থাভাবে সন্দেহ কে করিবে ?* এই জীব-সংজ্ঞক আত্মা ইন্দ্রিয়ার্থ-গ্রাহক ও চৈতন্য বিশিষ্ট। এই আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। ইহার চৈতন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক বা প্রাণ অর্থাৎ জীবনী-শক্তি নহে। ইহাই অতঃপর সপ্রমাণ করা যাইতেছে। এই আত্মা শরীর বা ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, শরীর আঘাত প্রাপ্ত ও বিষয় ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হইলেও যদি অন্যমনস্ক থাকা যায়, তবে ঐ উভয়ের

---

* দার্শনিক Descartes এর সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা "I think, therefore I am" (Cogito ergo Sum আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।) পাঠক স্মরণ করিবেন।

অনুভব হয় না। (২) প্রাচীনদিগের মতে চৌদ্দ বৎসর এবং নব্য-দিগের মতে সাত বৎসর গত হইলে, শরীর ও মস্তিষ্কের সমস্ত উপা-দানের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু স্মৃতি প্রভৃতি ভাব পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব স্মৃত্যাদি ভাব যাহাতে বিদ্যমান আছে, সেই আত্মা শরীর বা মস্তিষ্ক নহে। কিন্তু উহা চৈতন্য-বিশিষ্ট। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ করণ, আত্মা কর্ত্তা। অতএব আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন ও চৈতন্য বিশিষ্ট। (৩) জীবনীশক্তি প্রাণ নামে খ্যাত, উহা আত্মা হইতে পৃথক্। কেননা, আত্মার ধর্ম্ম চৈতন্য, তাহা প্রাণের ধর্ম্ম নহে। কারণ, চৈতন্য প্রাণ-ধর্ম্ম হইলে, শ্বাস প্রভৃতি প্রাণকার্য্য-সমূহ চৈতন্যা ভাবে হইতে পারে না। অতএব, স্থির হইল যে, আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মস্তিষ্ক নহে, এবং প্রাণও নহে। আত্মা ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্ পদার্থ। একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে, অন্য কাহারও চৈতন্য নাই।” হিন্দু ষড় দর্শনই জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উহাতে জীবাত্মার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে জ্ঞানকেই প্রধান লক্ষণ বলা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলা হয় বটে, কিন্তু উহাও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং সাংখ্য-প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন বলা হয়। এই পুরুষই জীবাত্মা। তিনি সচেতন। তাঁহার চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হন। বহু সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শন জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু দার্শনিক Hume বলেন যে Self (আত্মা) বলিয়া কিছু নাই। আমাদের মনের যে সকল অভিজ্ঞতা (Experience) তাহা ভিন্ন অন্য কিছু তিনি খুঁজিয়া পান না। তিনি মনকে (অন্তঃকরণকে) অভিজ্ঞতার সমষ্টি (Bundle of experiences) মাত্র বলেন। এখন প্রশ্ন হইবে যে, যদি ইহা একটী Bundleই হয়, তবে আমাদের অভি-জ্ঞতা সমূহের বন্ধন রজ্জু কি ? Hume এর মতে Law of Asso-ciationই সেই বন্ধন রজ্জু। Law of Assoc ation স্বীকার করিলেই স্মৃতির প্রশ্নের উদয় হইবে। অবশ্যই বলিতে হইবে যে স্মৃতি কোন এক বস্তু আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। সেই বস্তুই

জীবাত্মা। নতুবা বলিতে হয় যে, যে মুহূর্ত্তে অভিজ্ঞতা জন্মে, উহার পর মুহূর্ত্তেই উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কোনও একটী ঘটনা বারংবার ঘটিতে দেখিলে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের হৃদয়ে ধারণা হয়, তাহাই Association যথা—বিদ্যুৎ চমকিল, ইহার পরেই মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হইবে, ইহা আমরা জানি। কারণ, ইহা বারংবার দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি। এই যে বলা হইল যে আমরা জানি যে বিদ্যুৎ চমকিলে মেঘ গর্জ্জন হয়, এই জানাও সম্ভব হয় না, যদি আমাদের স্মৃতি না থাকে। কারণ, যত অধিক বারই আমরা একটীর পর একটী ঘটনা ঘটিতে দেখি না কেন, সেই সকল অভিজ্ঞতাই পর মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া যায়, যদি আমাদের স্মৃতি না থাকে। সুতরাং পর পর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের অন্তঃকরণে স্থান লাভ করিতে পারে না। এইত গেল পর পর একই প্রকারের ঘটনা সম্বন্ধে। কিন্তু ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব্বে যে একটী মাত্র ঘটনা একবার মাত্র আমার চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছিল, তাহা যে আমার হুবহু মনে আছে, স্মৃতি ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। উহাকেও Law of Association এর অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। সুতরাং আত্মা ভিন্ন অন্তঃকরণের সকল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। বাহিরের বস্তুর সহিত সম্পর্কে আসিলে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহাতেই আমাদের বিজ্ঞান লাভ হয় না। আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ কারণ কার্য্য পরম্পরা হিসাবে এবং আমাদের স্মৃতিতে যাহা আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া ঘটনাটী পর্য্যালোচনা করি ও একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই যে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত (Reasoning and Judgment) ইহা সম্ভব হয় না যদি আমাদের অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী হয় অর্থাৎ উহার সহিত পূর্ব্বাপর সম্পর্ক না থাকে, অর্থাৎ এমন একটী বস্তু না থাকে, যাহাতে সমস্ত বিধৃত না থাকে। আত্মাই সেই বস্তু যাহাতে সমস্ত বিধৃত থাকে। মহামতি Kantও এই ভাবে Hume এর মত খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদও উপরোক্ত ভাবে খণ্ডিত হইতে পারে।

সকলই যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের কিছুই পরমুহূর্ত্তে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের স্মৃতিতে বহু অতীত ঘটনার বিষয় বিধৃত হইয়া বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ক্ষণিকবাদও সত্য নহে। এস্থলে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। আত্মার গুণরাশি জড় সংসর্গে আসিয়া বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণের যন্ত্র মস্তিষ্ক। সুতরাং অন্তঃকরণ বলিলে আত্মার গুণরাশিকে উহাদের প্রকাশক যন্ত্রের সাহায্যে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ আত্মার গুণরাশির বিকৃত অবস্থা এবং সেই বিকৃতির কারণ উহাদের জড় সংসর্গে প্রকাশ। সুতরাং অন্তঃকরণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। 'ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে অন্তঃকরণের উৎপত্তির বিষয় লিখিত হইয়াছে। উহাতেও ঐ একই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। জড়বাদিগণ অন্তঃকরণকে দেহের Physical and Chemical action এর ফল বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং দর্শন জগৎও তাহা স্বীকার করেন নাই। কোন মতে চৌদ্দ বৎসর ও কোন মতে সাত বৎসরে দেহের সুতরাং মস্তিষ্কের সমস্ত উপাদান পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু স্মৃতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং স্মৃতি প্রভৃতি যাহাতে বর্ত্তমান থাকে, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ নাই। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মার গুণরাশিই অন্তঃকরণের মূলে অর্থাৎ আত্মার গুণরাশি কারণ এবং অন্তঃকরণ কার্য্য। দ্বিতীয়টী প্রথমটীর বিকৃত অবস্থা অর্থাৎ আত্মার গুণরাশি দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধগণ কারণ ও কার্য্য স্বীকার করেন। চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কারণই পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে কারণ ধ্বংস হইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কারণের বিকৃতিতে কার্য্যের

উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কারণই কার্য্যাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার গুণই জড় সংসর্গে বিকৃত হইয়া অন্তঃকরণ রূপ কার্য্যে প্রকাশিত হয়। আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে অন্তঃকরণের প্রধান লক্ষণ জ্ঞান। আত্মা ভিন্ন জড়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সুতরাং অন্তঃকরণ দ্বারাও জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। জীবাত্মার সংজ্ঞা যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দেহ (সুতরাং জড়) ও আত্মা যে পৃথক (distinct) সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেহাত্মভেদ জ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব। জড়ের চৈতন্য নাই, সুতরাং সে স্বয়ং স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই চৈতন্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। সাংখ্য দর্শন ও বিজ্ঞানও সুস্পষ্টভাবে এই মতই সমর্থন করেন। আত্মাই জড়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু জড় কখনও আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দর্শন শাস্ত্রে "আমাকেই" subject এবং জড় পদার্থকে object বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাবে অর্থাৎ জড় subject ও "আমাকে" অর্থাৎ আত্মাকে কখনও object বলা হয় নাই। অতএব জড়ের জ্ঞান নাই এবং উহা আত্মা হইতে পৃথক, ইহা প্রমাণিত হইল। এই "পৃথকের" অর্থ Distinct. জড়ও ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কারুকার্য্য সম্পন্ন অব্যক্ত স্বরূপ বা বিশ্ব এবং তদুৎপন্ন দেহ আত্মা হইতে বিভক্ত নহে, কিন্তু পৃথক্‌ভাবাপন্ন (Distinct). এস্থলে ভৌতিক গুণ আধ্যাত্মিক গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। "যে সকল পদার্থে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকে ভূত পদার্থ বলে। যে সকল গুণ মূলভূত পদার্থ বা ভৌতিক পদার্থনিষ্ঠ, তাহাদিগকে ভৌতিকগুণ কহে। আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—সরল, মিশ্র ও জাত গুণ। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, তাহাকে অর্থাৎ পরমাত্মার গুণরাশিকে সরল গুণ কহে। যথা—প্রেম, সরলতা ইত্যাদি। যে

গুণের অঙ্কুর আত্মাতে থাকুক বা না থাকুক, অন্য কোন গুণ বা গুণ সমূহের যোগে স্বীয় নামে প্রকৃত ভাবে পরিচিত হয়, তাহাকে মিশ্র গুণ কহে। যেমন ঈশ্বর ভক্তি। ইহা আধ্যাত্মিক প্রেম ও পার্থিব ভক্তি যোগে উৎপন্ন, এজন্য ইহা মিশ্র গুণ। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হয় ও তিরোহিত হয়, তাহাকে জাতগুণ কহে, যথা—কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি" (ক)। সাধারণে ইহাদিগকে গুণ না বলিয়া দোষ বলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আত্মা ও জড় পৃথক্। সুতরাং এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং শরীর জড়, সুতরাং অচেতন। এতদুভয়ের কিরূপে মিলন হইতে পারে? জীব অর্থে দেহ+আত্মাকে বুঝায়। উহাদের মিলন একটী কঠিন সমস্যা বটে। যাহা হউক, আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ওঁং অনন্ত-সন্তান-সৃজন-পালন-কারণং প্রেমময়ং পরমাত্মানং ওঁং

(ক) সত্যধর্ম্ম।

ওঁ

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

আত্মা ও জড়ের মিলন

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মা ও জড় পৃথক্ ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখিতে পাইব। যদি তাঁহারা হুবহু একই (Identical) পদার্থ হইত, তবে পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ (জীবাত্মা) * দেহে সংযুক্ত হওয়ায় তাঁহার অর্থাৎ জীবাত্মার কতকগুলি জাত গুণের উৎপত্তি হইত না। এমন কি মিশ্র গুণেরও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, উভয়ই যখন আত্মা, তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ একই উপকরণে গঠিত ও এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে হইবে। তাঁহাদের মিলনে পরমাত্মার সকল গুণরাশিই পূর্ব্বাবস্থায় থাকিত। ভিন্ন দ্রব্য নহে বলিয়া নূতন কোন গুণ আসিতে পারিত না। জলের সহিত জল মিশাইয়া পরীক্ষা করিলে মিশ্রিত পদার্থে জলের সমস্ত গুণই পাওয়া যায়। জল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের গুণ মিশ্রিত পদার্থে পাওয়া যায় না। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। (কঠ-৪/১৫) (যেমন নির্ম্মল জলে নির্ম্মল জল বৃষ্ট হইলে সেইরূপই থাকে (তত্ত্বভূষণ)।" সেইরূপ আত্মা ও জড়ের মিলনে মিশ্রগুণ—নির্ভরতা, ভক্তি প্রভৃতি এবং জাতগুণ রাশি—কাম ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারিত না। একথা সুস্পষ্ট যে নির্ভরতা, ভক্তি, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পরমাত্মার গুণ হইতেই পারে না। অতএব দেখা গেল যে দেহ যদি আত্মা হইত, তবে জীবাত্মা দেহে সংযুক্ত হইলেও সমভাবাপন্ন দ্রব্যের

---

* পরমাত্মাই স্বয়ং দেহযোগে ক্ষুদ্রভাবে সুতরাং অংশভাবে ভাসমান এবং তাহাই জীবাত্মা। নতুবা পরমাত্মা ও জীবাত্মা স্বরূপতঃ একই। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

সহিত মিলনে আত্মার যাহা স্বাভাবিক সরল গুণরাশি, তাহা পূর্ণ ভাবেই থাকিয়া যাইত। মিশ্র বা জাত গুণের উৎপত্তি হইতে পারিত না। সৃষ্টিতে পরীক্ষার স্থান, অবনতি বা উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত না। পাঠক এই সম্পর্কে 'সৃষ্টির সূচনা" অংশ পাঠ করিবেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, ইহা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। পারদ ও গন্ধকের রাসায়নিক সংযোগে নূতন মিশ্র পদার্থ সৃষ্ট হয়। উহাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র কোন গুণ মিশ্র পদার্থে (Chemical Compound-এ) থাকে না। কিন্তু মিশ্র পদার্থ নূতন গুণরাশি ধারণ করে। আত্মা ও জড় যদি Chemical Compound-এর মত নূতন এক পদার্থ হইয়া জীব হইত, তবে তাহার মধ্যে আত্মার গুণরাশি, জড়ের গুণরাশি ও জীবের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র ও জাত গুণরাশি কোনটাই দেখিতে পাওয়া যাইত না। জীবের মধ্যে আমরা উক্ত গুণরাশি হইতে পৃথক ন্‌তন কতকগুলি গুণ দেখিতে পাইতাম মাত্র। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে জীবের মধ্যে আত্মা ও জড়ের গুণরাশি ও মিশ্র এবং জাতগুণরাশি বর্ত্তমান। সুতরাং জীব Chemical Compound নহেন। Heterogenous mixture বলিতে আমরা বুঝি যে, যে মিশ্র পদার্থে উপাদানগুলির (Components-এর) আদি (Original) গুণরাশিই বর্ত্তমান থাকে, মিশ্রণ জন্য ন্‌তন কোন গুণের সৃষ্টি হয় না। জীব Heterogenous mixture হইতে পারে না। কারণ, উহাতে (Mixture-এ) মিশ্রগুণরাশি দেখিতে পাই না। কেবল আদি গুণরাশিই তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু জীবে আত্মা ও জড়ের আদি গুণরাশি ভিন্ন মিশ্র ও জাত গুণরাশিও দেখিতে পাই। Homogeneous Mixture বলিতে আমরা বুঝি যে, যে মিশ্র পদার্থে উপাদানের (Components-এর) আদি গুণরাশি বর্ত্তমান থাকে এবং ন্‌তন মিশ্র গুণরাশিও উৎপন্ন হয়, যেমন জল ও লবণ মিশ্র করিলে মিশ্রিত পদার্থে জল ও লবণ উভয়েরই আদি গুণরাশি বর্ত্তমান থাকে, অধিকন্তু মিশ্রণ জন্য ন্‌তন গুণের আবির্ভাব হয়। যথা জল ও লবণ প্রত্যেকেই

সাধারণ ভাবে Non-conductor of electricity, কিন্তু জল ও লবণ মিশ্রিত পদার্থ Conductor of electricity. যদি জড় বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হয়, তবে আত্মা ও জড়ের (দেহের) Homogeneous Mixture-এ জীব হইয়াছে বলিতে হইবে। তাই জীবের মধ্যে আত্মার গুণ, জড়ের গুণ এবং উভয়ের মিশ্রিত গুণ বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার মিশ্রিত পদার্থের * মধ্যে জীব প্রথম তিন প্রকারের হইতেই পারে না। পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিবেন না যে আত্মা ও দেহ মিশ্রিত জড় পদার্থের ন্যায় একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। জীব অর্থ আত্মা+দেহ। আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় যেন দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দেহ ও আত্মা কখনও জড় পদার্থের ন্যায় মিশ্রিত হইতে পারে না। দেহ এবং আত্মার মিলনের অর্থই তাহাদের যোগ। এই যোগের জন্যই অর্থাৎ দেহে আত্মার অধিবাসের জন্যই জীবে আমরা সরল, মিশ্র ও জাত গুণরাশির প্রকাশ দেখিতে পাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে ত্রিবিধ দেহের লয়ে জীব পূর্ণামুক্তি লাভ করেন। এই সম্পর্কে পাঠক ইতঃপর লিখিত অংশত্রয় পাঠ করিবেন। "দেহ জড়, উহার সহিত আত্মায় কিরূপে মিলন হইল?" এই কঠিন প্রশ্নের সরলও প্রাঞ্জল মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত কোনও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জড়ের সহিত জড়ের মিলন পৃথিবীর বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতে পারে। বিজ্ঞান জড় লইয়াই আলোচনা করে, আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলে না। জড় বিকৃত পদার্থ হইলেও পরমাত্মার কোন একটী স্বরূপের পরিণামে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থ তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপন্ন। আমাদের মনে হয় যে সেই জন্যই অর্থাৎ পরমাত্মার কোনও একটী স্বরূপ হইতে জন্মলাভের জন্যই জড় নির্ম্মিত দেহ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশের (ক) অর্থাৎ জীবাত্মার অধিবাসের উপযোগী হইয়াছে।

---

* প্রকৃতপক্ষে মিশ্র পদার্থ তিন প্রকার। কারণ, প্রথম প্রকার পদার্থকে (জলের সহিত জলের মিশ্রণকে) পদার্থ বলা সঙ্গত হইবে না।

(ক) সাক্ষাৎ অংশের অর্থ পরমাত্মাই স্বয়ং ক্ষুদ্রভাবে সুতরাং অংশ ভাবে ভাসমান।

জল ও লবণ মিশ্রিত পদার্থে জল ও লবণ মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রণালী বিশেষদ্বারা উহাদিগকেও বিভিন্ন করা যায়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জীবের মধ্যে জীবাত্মা ও জীবদেহের (জড়ের) যেন Homogeneous mixture হইয়াছে। Homogeneous শব্দের অর্থ Having the constituent elements all similar (Chambers). ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে উভয়বস্তু (জীবাত্মা ও জড়—প্রথমটী ব্রহ্মের সাক্ষাৎঅংশ অর্থাৎতিনিই বহুভাবে, ক্ষুদ্রভাবে, অংশভাবে ভাসমান মাত্র এবং অপরটী তাঁহার অনন্ত অংশের এক অংশ একমাত্র ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়াছে বলিয়া জীবরূপী Homogeneous mixture-এর সম্ভব হইয়াছে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জড়ের জন্মও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে বলিয়া উহা তাঁহারই সাক্ষাৎ অংশের অর্থাৎ জীবাত্মার আবাসস্থানরূপে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ জড় ব্রহ্মের অনন্ত অংশের একাংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সবিশেষ শক্তি লাভ উহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বলিতে গেলে বলিতে হয় যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় সুকৌশলী বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছাই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারই অপূর্ব্বকৌশলে জড় ও আত্মার যোগ স্থাপিত হইয়া জীবজগতের সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ স্রষ্টার অপূর্ব্ব কর্ম্মকৌশলে ও জড়ের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে শক্তিলাভের জন্যই জড় ও আত্মার মিলন হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে দেখিতে পাইব। উর্ণনাভ যেমন অন্য কোন পদার্থের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং ইচ্ছামাত্র নিজ হইতে তন্তুরাশি সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা সে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার পরব্রহ্ম নিজ অব্যক্ত নামক স্বরূপকে তাঁহার ইচ্ছা সহযোগে ভাসমান করিয়া এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদুৎপন্ন দেহ-যোগে স্বয়ং অখণ্ড ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও বহুভাবে অর্থাৎ নিজেকে অসংখ্য জীবাত্মা ভাবে ভাসমান করিয়াছেন। এই তত্ত্বটী দৃষ্টান্ত দ্বারা

আরও একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। ব্যোম সর্ব্বব্যাপী ইহা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও যে Ether স্বীকার করেন, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং ব্যোম যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি একস্থানে একটি ঘট রাখি, তবে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে ব্যোম অখণ্ডই আছে। কারণ, উহার অভাব কোথায়ও নাই। ঘটের ক্ষিতি ভাব দ্বারাও ব্যোম খণ্ডিত হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। কিন্তু ঘটমধ্যস্থ ব্যোমকে অর্থাৎ ঘটাকাশকে আমরা একটী পৃথক্ বস্তু বলিয়াই মনে করি। ঘট বস্তু কি? উহা মৃত্তিকা। আবার মৃত্তিকা কি? উহা যে ব্যোমের বিকার, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং আমরা পাইলাম যে ব্যোম এক অখণ্ডই বর্ত্তমান, কিন্তু উহা হইতে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন ক্ষিতিদ্বারা গঠিত ঘটদ্বারা উহা অখণ্ড থাকিয়াও যেন খণ্ডিত হইয়াছে। "যেন" শব্দ প্রয়োগের অর্থ এই যে আমরা বিশেষ চিন্তাদ্বারা ব্যোমকে অখণ্ডই দেখিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ (For all practical purposes) ঘট উহার অন্তরস্থ ব্যোমসহ একটী পৃথক্ বস্তু। অর্থাৎ ঘটান্তরস্থ ব্যোম যেন মৃত্তিকা দ্বারা অংশীকৃত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাব্যোমের সহিত অর্থাৎ মহাকাশের সহিত সর্ব্বদিকেই সংযুক্ত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্কও তাহাই। পরমাত্মা তাঁহার একটী স্বরূপ হইতে উৎপন্ন জড় দ্বারা নির্ম্মিত দেহযোগে নিজে অখণ্ড থাকিয়াও যেন অংশীকৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা ও একমাত্র তাঁহাতেই অবিচ্যুতভাবে থাকিয়াও যেন বিচ্যুত-ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং অখণ্ড থাকিয়াও স্বীয় বিবং-হুয়িষা দ্বারা নিজেই নিজেকে অংশভাবে অসংখ্য দেহে ভাসমান করিয়াছেন। 'অব্যক্তের পরিণাম" ও "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন' অংশদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ব্রহ্মের সহিত তাহা নিত্যই অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। আবার

জড় জগতের ভিত্তি ব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম সমগ্র জড় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াই আছেন। এই সম্পর্কে পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতার ৯।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অতএব ব্রহ্ম দেহদ্বারা বিচ্ছিন্ন হন নাই বা হইতেও পারেন নাই, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ভাসমান হইয়াছে মাত্র। আমরা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ দেশ সমূহের সম্বন্ধে চিন্তা করি। নর সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশ বলিয়া কিছু ছিল না নর সৃষ্টির পর পৃথিবী ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেরই এক একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু ঐ সীমার পরিবর্ত্তন হয় ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। এই সীমার পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। আবার যখন মহাপ্রলয়কালে পৃথিবীতে নরনারী বাস করিবেন না, তখনও পৃথিবীই থাকিবে, কিন্তু তখন পৃথিবীর নানাস্থান যে নানাদেশ নামে পরিচিত, সেই সকল বিভিন্ন নাম আর থাকিবে না। সুতরাং দেখা যায় যে পৃথিবীই সত্য, কিন্তু দেশগুলির নিত্য স্থায়িত্ব নাই। দেশসমূহের সীমাগুলির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু পৃথিবী এক অখণ্ড ছিল, আছে ও থাকিবে। সেইরূপ ব্রহ্মও এক ও অখণ্ডই আছেন, কিন্তু তিনি সীমা নির্দ্দেশক দেহ দ্বারা যেন বহু হইয়াছেন প্রত্যেক জীবেরই দেহের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু সেই সীমা দ্বারা ব্রহ্মের কিছুই আসিয়া যায় না। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। আবার মহাপ্রলয়ে যখন বিশ্বলয় হইবে অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমানত্বের যখন শেষ হইবে, তখন ব্রহ্ম একাই থাকিবেন, জীব ও জগৎ তখন থাকিবে না। সেই অবস্থায়ও তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্যই এক ও সমভাবে ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। পৃথিবী এক অখণ্ড থাকিয়াও অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড না হইয়াও তজ্জাত পদার্থ (হ্রদ, নদী, পর্ব্বত, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি) দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু বহু দেশ নামে পরিচিত হইয়াছেন অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, তেমনি ব্রহ্ম ও স্বয়ং এক অখণ্ড থাকিয়াও নিজ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পরম্পরাভাবে জাত দেহ দ্বারা বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন

মাত্র। এই কার্য্যে তাঁহার অখণ্ডত্বের কোনই হানি হয় নাই, সুতরাং বিকারও হয় নাই। এখন উপরোক্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঘট ভাঙ্গিলেই যেমন ঘটস্থ ব্যোম ও মহাব্যোম এক হয়, তেমনি কি এই দেহের মৃত্যুতেই জীব ব্রহ্মে লয় হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের অসংখ্য ত্রিবিধ দেহ বর্ত্তমান। উহাদের লয়ে পূর্ণামুক্তি হইবে বটে, কিন্তু তাহা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সম্ভব নহে বলিয়া মনে হয়। কেন সম্ভব নহে তাহা "সোঽহংবাদ" অংশে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত ঘট বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই আমরা ঘটান্তরস্থ ব্যোমকে পৃথক্ বা মহাব্যোমের অংশ বলিয়া মনে করিব। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আমাদের দেহরূপ ঘট চিরকালস্থায়ী, কিন্তু নিত্য স্থায়ী নহে। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ও সীমাবদ্ধতা চিরকাল বর্ত্তমান। পূর্ণামুক্তিতে অর্থাৎ শেষ কারণ দেহের বিগমে উহাদেরও শেষ হইবে। অতএব জড় ও আত্মার মিলন যে সম্ভব এবং সেই রূপ মিলনই জীবে সম্ভব হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গেল। আমরা জড়ের উৎপত্তি এবং উহার সহিত আত্মার মিলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এই যে জড় ও আত্মার মিলন, ইহার প্রকার-ভেদেই অসংখ্য জীব জগতে আসিয়াছে। এই মিলনের প্রকারভেদ দ্বারাই নানা জীবে নানা গুণের নানা ভাবের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে এবং এই জন্যই সৃষ্টিতে ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির পরীক্ষা সম্ভব হইবে। আত্মা নিত্য নির্বিবকার। তাঁহার মধ্যে গুণরাশির কোনই বিভাগ হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। কিন্তু জড় দেহেরই নানা প্রকার গঠনে নানা জীবে নানা গুণের নানাভাবের সম্ভব হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করিতে যাইতেছি। দেহ দ্বারাই নানা গুণের নানা ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় বলিয়া অব্যবহিত পর অংশকে "গুণ বিধান" বলিয়া অভিহিত করা হইল।

ওঁং প্রেমলীলাময়ং সর্ব্বশক্তিময়ং ওঁং

জ্ঞানস্বরূপঃ কৃতিভক্তি রূপো
জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ বিধায়কস্ত্বং
কার্য্যস্য সিদ্ধৌত্বমসীহমূলং
সৎকর্ম্ম নির্ব্বাহক ঈশ্বরস্ত্বম্॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

গুণ বিধান

যাহার আবশ্যকতা নাই, তাহা সৃষ্ট হয় নাই এবং সৃষ্টের মধ্যে যখন যাহার আবশ্যকতা থাকিবে না, তখন তাহার বিলয় হইবে, ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তথা সাধারণ জনগণও বলিয়া থাকেন। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? অনন্ত নিত্য প্রেমময় পরমপিতা নিজেকে বহু করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ইচ্ছার অপর নাম স্বগুণ-পরীচিক্ষিষা। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রেমময়ী লীলার উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি স্বয়ং বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং নিত্য প্রেমময় পিতা সকলকে আত্মতুল্য বোধ করিতেছেন। জীবাত্মা সকলও তাঁহার অনন্ত গুণ-রাশিতে বিভূষিত হইয়া ক্রমশ: তাঁহাতে লয় হইবেন অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি দেহের সৃষ্টি করিলেন। এই দেহ আত্মা হইতে পৃথক্ * পদার্থ বলিয়া আত্মা কতকগুলি অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। অর্থাৎ দেহাবরণ দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিতির বাধা সৃষ্টি করা হইল। অথবা অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে যে পরমাত্মার জীবত্ব সৃষ্টি হইল। এই বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই বাধা অতিক্রম করাই জীবের পক্ষে সাধনা বা পরীক্ষা। এই পরীক্ষা

* পৃথক্ শব্দের অর্থ Distinct, বিভক্ত নহে। আত্মা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্ বা বিভক্ত কোন বস্তু নাই। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য।

অনন্তকাল চলিবে। যদি আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণরূপে এক পদার্থই হইত, তাহা হইলে দেহ কখনও আত্মার বাধা জন্মাইত না, জীবাত্মা নিজেই পূর্ব্ব-পরম-চৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া নিত্য পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারিতেন। অথবা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে দেহের কোনই আবশ্যকতা থাকিত না, সুতরাং দেহের সৃষ্টিও হইত না, সুতরাং জড় জগতেরও সৃষ্টির কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কারণ, জড় জগৎ একমাত্র জীবের জন্যই; আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে উহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ব্রহ্মের বিবংহয়িষা হইল। অর্থাৎ প্রেম গুণ প্রভাবে তিনি আপনাকে বহু করিতে অর্থাৎ বহু ভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই বিবংহয়িষা অর্থাৎ আপনাকে বহু করিবার ইচ্ছার অপর নাম স্বগুণ-পরীচিক্ষিষা। অর্থাৎ তাঁহার যে অনন্ত গুণ আছে, ইঁহাদের মধ্যে কোনটীর কিরূপ শক্তি অর্থাৎ প্রেম প্রধান, কি জ্ঞান প্রধান, কি অন্য কোনও গুণ প্রধান, ইহা পরীক্ষা করাই সৃষ্টি ব্যাপার। একারণ, প্রত্যেক জীবাত্মাকেই অনন্ত গুণ অত্যল্প পরিমাণে এবং প্রত্যেককেই কোন একটী গুণ অধিক পরিমাণে প্রদান করা হইয়াছে. যেমন কাহাকেও প্রেম, কাহাকেও জ্ঞান ইত্যাদি অধিকরূপে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি অপক্ষপাতিতা নিবন্ধন গড়ে সকলকেই তুল্য গুণ বিশিষ্ট করিয়াছেন। ঐরূপ গুণ সম্পন্ন ঐ সকল জীবাত্মার মধ্যে কে কিরূপে তাঁহাতে (ব্রহ্মে) তন্ময় হইতে পারে, ইহাই পরীক্ষা এবং এই জন্যই সৃষ্টি। আমরা দেখিয়াছি যে সকল জীবেরই গুণ সমষ্টি এক, কিন্তু কোন কোন গুণ কোন কোন জীবে অধিক পরিমাণে থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পরমেশ্বর এইরূপ গুণ বিধান কিরূপে করিলেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে কিছু লিখিত হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে দেহ দ্বারাই পরমপিতা ঐরূপ গুণের বিধান করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমপিতা জীবদেহ এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে তাহাতে প্রথমতঃ একটী গুণের বিশেষ ভাবে স্ফূর্ত্তি হয় এবং অন্যান্য গুণরাশি অল্প পরিমাণে

বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষের সহিষ্ণুতা। সেই গুণটী যাহাতে অধিক পরিমাণে উহাতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য বৃক্ষের দেহ সেইরূপভাবে গঠিত হইয়াছে। মানবের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। যে মানুষের প্রেম অধিক, তাহার শরীরও সেইরূপ ভাবে গঠিত। আবার যাহার জ্ঞান অধিক, তাহার শরীর অন্য ভাবে গঠিত। যদি একটী নীরেট মূর্খকে শত শিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহা হইলেও দশ বৎসরেও সে ক, খ, শিখিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে যাহারা বিদ্যাহীন হইয়াছি, তাহারা যে সকলেই আর্থিক দুরবস্থার জন্য বাধ্য হইয়া বিদ্যাহীন হইয়াছি, তাহা নহে, অনেকের মস্তিষ্কের শক্তিরই অল্পাধিক অভাব আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। জীবাত্মার জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞান প্রকাশ করিবার যন্ত্র যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অপটু হয় তবে সেই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের দেহ যেন রথ, পরমপিতা সেই রথ সাজাইবার ভিতরেই কোন একগুণের বিশেষ বিকাশের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। এই তত্ত্ব বুঝিতে আমাদের সবিশেষ চিন্তার প্রয়োজন নাই। কোন এক ব্যক্তি জন্মান্ধ। তাঁহার চক্ষুরূপ যন্ত্র দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ কোন এক ব্যক্তি জন্ম বধির। তাহারও কর্ণরূপ যন্ত্র দ্বারা কোনই জ্ঞান লাভের আশা নাই। এইরূপ যাহার যে জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকে, তিনি সেই সেই জ্ঞান লাভ করেন না। আবার যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় আংশিক ভাবে অপটু হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান-বিকাশের আংশিক বাধা জন্মে। সকল দেহেই আত্মা এক, আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। তবে কেন আমাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়? ইহার একমাত্র মীমাংসাই এই যে আমাদের দেহের গঠনই পার্থক্যের কারণ। আত্মা যখন যেরূপ দেহে বাস করিবেন, সেইরূপ দেহের গঠন অনুসারে তাঁহার গুণরাশির বিকাশ সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নীরেট মূর্খ বলিয়া যাহাকে আখ্যা দেওয়া গেল, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহারও এমন একটী

গুণ আছে, যাহার কাছে মহাবিদ্বানেরও মস্তক অবনত হয়। একথা দৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে যে তাহার ঐ বিশেষ গুণ বিকাশের জন্য অঙ্গের যেরূপ গঠন হওয়া আবশ্যক, পরমপিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য সেইরূপ বিধানই করিয়াছেন। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা প্রকৃতিকে এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে আমর তাহা হইতে অত্যধিক পরিমাণে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারি। যিনি প্রকৃতি হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তিনি মহা সৌভাগ্যবান। দেশ বিদেশে প্রকৃতির শিক্ষার কতই প্রশংসা নানা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বাল্যকালে Shepherd and the Philosopher নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে একজন মেষপালক প্রকৃতি হইতে যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া দার্শনিক পণ্ডিত মুগ্ধ হইয়াছেন। উপনিষদুক্ত সত্যকাম জাবালের জীবনে প্রকৃতির শিক্ষা তাঁহার ঋষিত্ব লাভের বিশেষ সহায় হইয়াছিল। আমরা বহু বহু কবিকে প্রকৃতির কবি (Natnre's Poet) আখ্যা দান করি। Wordsworth তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। উপন্যাস ও নাটক লেখকগণ প্রকৃতি দ্বারা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত ব্যক্তিগণের জীবন সুমধুর ভাবে বর্ণনা করিয়া কত ভাবেই না পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। Shakespeare, Miranda এবং বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা নাম্নী প্রকৃতির কন্যাগণের জীবন বর্ণনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। শুনিয়াছি যে আমেরিকায় একটী আলোক স্তম্ভ বারংবার প্রস্তুত করিয়াও রক্ষা করিতে পারে নাই। পুনঃ পুনঃ উহা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যখন তাহা মানবাকারে গঠিত হইয়াছে, তখন তাহা স্থায়ী হইয়াছে। প্রকৃতির জ্ঞান যে আমাদের জীবনে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা দীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নদ্ধৃত শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। "দীক্ষা স্যাৎ পরমং জন্ম সর্ব্বেষাং দেহধারিণাম্। বাহ্য জগজ্জ্ঞতা মাতা জন্মন্যস্মিন্ পিতা গুরু:॥ তয়োশ্চ প্রকৃতং প্রেম শ্রদ্ধা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। শুক্রং সপ্রণবং বীজং শোনিতং বিশ্বচারুতা॥ পরেশস্যাহৃদেশশ্চ জন্ম-

ভূমি র্গরীয়সী। দীক্ষা-জন্ম বিহীনস্থ নর-জন্ম-বৃথা ভবেৎ॥" "বঙ্গানুবাদ-দীক্ষা একটী পরম জন্ম, এই জন্মের পিতা গুরু, মাতা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা (বিশিষ্ট জ্ঞান), শ্রদ্ধা তাহাদিগের প্রকৃত প্রেম, শুক্র প্রণব যুক্ত বীজ, শোণিত বিশ্বের মনোহর ভাব এবং জন্মভূমি পরমেশ্বরের পরম প্রেমময় অঙ্ক দেশ। দীক্ষারূপ জন্ম যাহার হয় নাই, তাহার পক্ষে নরজন্ম বিফল। (সতধর্ম্ম)।" প্রকৃতি লব্ধ জ্ঞানের স্থান যে কত উর্দ্ধে তাহা পাঠক উক্ত শ্লোক সমূহ হইতে বুঝিতেছেন। সেইরূপ জ্ঞান আমাদের দীক্ষারূপ জন্মের মাতৃস্থানীয়। গুরুদত্ত জ্ঞান ও প্রকৃতি লব্ধ জ্ঞানের মিলন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। 'অতএব দীক্ষার্থী মাত্রেরই বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক ও বিশ্বের মনোহর ভাবে বিমোহিত হওয়াও বিধেয়"। প্রকৃতির জ্ঞানের এত উচ্চ প্রসংশা কেন? ইহার কারণ খুঁজিতে গেলেই আমরা পাই যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা তাঁহারই রচিত জগৎ তাঁহার অতুলনীয় নিত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এমন অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঠন করিয়াছেন যে ইহার প্রতি অণু পরমাণু হইতে বিশাল মণ্ডল পর্য্যন্ত সকলেই নির্ভুল রূপে স্রষ্টার জ্ঞান, প্রেম, দয়া, করুণা মহিমার পরিচয় দিতেছে। তিনি জগৎ রচনা করিতে যাইয়া যেন নিজ হস্তে নিজের পরিচয় লিখিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞানী গুণিগণ সেই অভ্রান্ত লিপি পাঠ করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া ধন্য হইতেছেন। সাধারণ ব্যক্তিও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই স্রষ্টার জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ভক্ত গাহিয়াছেন:—

"এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তদুপরি তব নামটী লিখেছ!
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার "দয়াল" নামটী লেখা;
"সুন্দর" নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
"প্রেমানন্দ" নাম নয়নে লিখেছ!

চন্দ্রাতপতুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
"সুধাসিন্ধু" নাম তায় অঙ্কিত করেছ !
জীবনে লিখেছ "জগত জীবন,"
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
"জ্যোতির্ম্ময়" নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ-চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ?" (বিষ্ণুরাম চট্টোঃ)

মায়াবাদ অংশে উদ্ধৃত ভক্তকবি রজনীকান্ত বিরচিত গানটীও এই সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে আমরা যদি প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অবলম্বনে আত্মিক রাজ্যের সমস্যার মীমাংসা করি, তবে তাহা সঙ্গতই হইবে বলিয়া মনে করি। আমাদের দেহ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক্। দেহ সৃষ্ট জড় পদার্থ সুতরাং প্রকৃতির অন্তর্গত। যিনি অন্ধ, তাহার স্পর্শ শক্তি অধিকতর, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তবে বুঝিতে পারিব যে মানব দেহের যদি কোন অঙ্গ হানি হয়, অথবা কোন অঙ্গ যদি বিশেষভাবে অপটু হয়, তবে ইহার ফলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি যেন বৃদ্ধি পায়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। জগদ্বিখ্যাত কবি Milton অন্ধ অবস্থায় Paradise Lost লিখিয়াছিলেন। তিনি নাকি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্ধতা সেই পুস্তক রচনায় তাঁহার সহায় হইয়াছিল। মহাভারত প্রসিদ্ধ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি কুটীল রাজনীতিতে অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের কুমতি অধিক পরিমাণে তাঁহারই নিকট হইতে সাক্ষাৎ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়। পাঠকগণ যদি নিজে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন, তবে অনতি-

বিলম্বে পূর্ব্বোক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয় যে আমাদের মস্তিষ্কের যে শক্তিহীন বা অপটু অঙ্গের পরিপোষণ ও কর্ম্মে ক্ষয় করিবার জন্য ব্যয়িত হইবার কথা, তাহা সেইভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। তাহা যেন মস্তিষ্কে জমা থাকিয়া যায়, উহার কিয়দংশ অন্যান্য অঙ্গের জন্য ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধির পরিপুষ্টি সম্পাদন করে। একটী প্রবাদ আছে যে লম্বা মানুষ অপেক্ষাকৃত বোকা (সরলান্তঃকরণকেই সাধারণতঃ বোকা বলে) এবং খাট মানুষ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। হাতীর বিরাট দেহ বটে কিন্তু ব্যাঘ্র, সিংহ অপেক্ষা উহার বুদ্ধি অল্পতর। * ইহাও পূর্ব্ব কারণে হয় বলিয়া মনে হয়। একটী বৃহৎ দেহপোষণ ও চালনা করিতে মস্তিষ্কের যত শক্তির প্রয়োজন, তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর দেহের জন্য অল্পতর শক্তির আবশ্যকতা। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মস্তিষ্কের পরিমাণ অনেক সময়ই দেহের পরিমাণ মত হয় না। অর্থাৎ বৃহৎ দেহের অধিক মস্তিষ্ক ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর দেহের অল্প মস্তিষ্ক থাকে না। আবার মস্তিষ্কের কেবল মাত্র আকার ও পরিমাণের উপরই উহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না, কিন্তু যে মস্তিষ্কে যত গ্রন্থি বা পাক (convolutions) থাকিবে, সেই মস্তিষ্ক ততোহধিক পরিমাণে বুদ্ধি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। এই সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। সুতরাং দেহ পোষণ ও চালাইবার জন্য মস্তিষ্কের যত অল্পশক্তির প্রয়োজন হইবে, ততই উহা উহার নিজস্ব ধন বুদ্ধির জন্য অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে "Nature works in a spirit of compensation" নামক তত্ত্ব সত্য। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেহ সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যাহা পাইলাম, যাবতীয় সৃষ্টিতেও তাহাই সম্পাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরম পিতা বিভিন্ন

* ইহা যেন কেহ মনে করেন না যে হাতীর মোটেই বুদ্ধি নাই। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে ব্যাঘ্র, সিংহ অপেক্ষা উহার বুদ্ধি অল্পতর।

দেহ এমনিভাবে গঠন করিয়াছেন যে কোনও একটী গুণ তাহাতে বিশেষভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ বর্ত্তমান ও অন্যান্য গুণরাশি প্রথমতঃ তাদৃশভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। অবশ্য উপাসনা ও সাধনা দ্বারা সকল গুণেরই উন্নতি করা যায় ও করা হয়, কিন্তু সাধনার আরম্ভে গুরু সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন যে শিষ্যের কোন গুণটীর উন্নতি সহজেই সম্ভব। অর্থাৎ পরমপিতা তাহার দেহে কোন গুণটীর বিশেষ বিকাশের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ কোন গুণে সাধক অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পরম পিতাতে তন্ময়তা লাভ করিতে পারিবেন। তৎপর তিনি সেই অনুযায়ী শিষ্যকে প্রথমতঃ সেই গুণের সাধনা করিতে শিক্ষা দিবেন। * আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেহ জগতে যে এত বিচিত্রতা দেখিতেছি, তাহাও নানা দেহে উক্তরূপ নানাগুণের নানাভাবের বিকাশের সুবিধার জন্যই। যদি সকলের পক্ষেই একই ভাবের সাধনার প্রয়োজন হইত, তবে সকলেরই দেহ এক প্রকারেরই হইত। আত্মায় আত্মায় যেমন কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ দেহে দেহেও কোনই পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু দেখা যায় যায় যে কোনও দুইটী দেহ সম্পূর্ণরূপে এক নহে, এমন কি, দুইটী যমজ ভ্রাতার দেহও সম্পূর্ণরূপে এক নহে। দুই যমজ ভ্রাতার স্বভাব, মতিগতির পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে যে তাহাদের দেহের গঠন অনুযায়ী তাহাদের গুণের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। আমরা যদি মানবের বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে বাল্যাবস্থায় মানবের গুণরাশি বীজাকারে (undeveloped state এ) বর্ত্তমান থাকে। যৌবনাবস্থায় ক্রমশঃ উহারা বিকশিত হয়। উভয় অবস্থায়ই মানহ দেহে

* শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রটীর যদি অংক ও তজ্জাতীয় শাস্ত্রে মস্তিষ্ক না খেলে, কিন্তু তথাপিও যদি তাহাকে I. Sc. পড়িতে বাধ্য করা হয়, তবে সেই ছাত্রের Career নষ্ট করা হয়। আবার ইহার বিপরীতও সত্য। যাহারা চিন্তাশীল, জ্ঞানচর্চ্চায় আনন্দ পায়, তাহাদিগকে জ্ঞানের সাধনা দেওয়াই উচিত। আবার যাহারা ভাবপ্রবণ, সৌন্দর্য্য পিপাসু তাহাদিগকে প্রেমের সাধনা দেওয়াই উচিত ইত্যাদি। বিপরীত পথ ধরিলে সাধনা কষ্টকর হয়।

একই আত্মা বাস করেন। তবে কেন বিভিন্নকালে এই বিকাশের তারতম্য? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বাল্যকালে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং ঐ অবস্থায় তমোগুণের প্রাবল্য থাকে। অপরদিকে যৌবনকালে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং রজোগুণের আধিক্য বর্ত্তমান থাকে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রজোগুণ চঞ্চল ও চালক। সুতরাং উহা বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলে। এই রজোগুণের কার্য্য হইতে হইতে সত্ত্বগুণের সবিশেষ উদ্রেক হয়। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অঙ্গগঠনের তারতম্য জন্য বাধার তারতম্য হয় এবং সেই জন্যই বিভিন্ন দেহের গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকার বিকাশ সংঘটিত হয়। আমরা "আত্মা ও জড়ের মিলন" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্যোম ঘটের পার্শ্বদেশ ও অধোদেশ দ্বারা খণ্ডিত হয় না। ঘটস্থ ব্যোম, ঘটের পার্শ্বদেশ ও অধোদেশস্থ ব্যোম এবং বহিঃস্থ ব্যোম সকলই এক অর্থাৎ ব্যোম সর্ব্বদাই অখণ্ডিত অবস্থায় আছে। কিন্তু আমরা ঘটস্থ ব্যোমকে পৃথক্ই বলিয়া থাকি। ইতঃপর লিখিত শ্রুতিমন্ত্রগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বায়ু এবং অগ্নি পাত্রের আকারে আকারিত হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে ঘটস্থব্যোমের আকার অন্য পাত্রস্থব্যোমের আকার হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যোমও যে পাত্রে অবস্থিত, তাহারই আকার ধারণ করে এবং সেই ভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু ব্যোম কখনও খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ আত্মা যেরূপ দেহে বাস করেন, সেইরূপ দেহের শক্তি অনুসারে তাঁহার বিকাশ সম্ভব হয়। অর্থাৎ ইতর জীবদেহে আত্মার যে ভাবে বিকাশ সম্ভব হয়, মানবদেহে তাহা হইতে তাঁহার বিকাশ অধিকতর সম্ভব। আবার পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে যদি কেহ শুভাদৃষ্ট বশত অতি উত্তম দেহ প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার বহুগুণের বিকাশ সহজেই সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যোমের ন্যায় আত্মা দেহরূপ ঘটদ্বারা কখনই অবচ্ছিন্ন হন না। এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আত্মার শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি করিবার দেহের ক্ষমতা থাকিবে কেন। ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের 'জড়ের

বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয় পাঠ করিতে হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এবং ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্ধ ব্যক্তি রূপ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, জন্মবধির ব্যক্তিও শব্দ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাহাদের উভয়ের দেহেই কিন্তু একই আত্মা বর্ত্তমান। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে একজন পরমোন্নত সাধক তাঁহার জন্মান্ধতা সত্ত্বেও রূপবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহার উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে উক্তরূপ জ্ঞানের কথা আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নহে। কারণ, উহা আত্মার নিজস্ব অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা লভ্য। আর উক্ত প্রকারের উন্নত অবস্থা লাভ করিতে হইলে সেই পরমোন্নত ব্যক্তিরও বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু সাধনা করিতে হইয়াছিল। এবিষয়ে "জন্মান্তরবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তিনিও পূর্ব্বজন্মে চক্ষুষ্মান্ ছিলেন এবং তাহার চক্ষু দ্বারা রূপ-বিষয়ক জ্ঞান প্রথমতঃ লাভ করিতে হইয়াছিল। অতএব আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে আত্মার বিকাশ দেহের গঠনের উপর নির্ভর করে। ঘটস্থ ব্যোম, বায়ু, অগ্নি ও জলে যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে একটী প্রকাণ্ড গৃহব্যাপী ব্যোম, বায়ু প্রভৃতিতে যে অধিকতর শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আত্মা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হয় না। এই বিষয়টী অর্থাৎ দেহের গঠনের উপর আত্মার বিকাশ নির্ভর করে, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী দ্বারা আরও পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করি। আমরা কল্পনা করি যে একই শক্তির (Power এর) বহুসংখ্যক বিজলি বাতি (Electric Bulb) একই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। উহাতে একই উৎস হইতে একই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ (Electric Corrent) আসিতেছে। ঐ সকল বাতিগুলি বহু বর্ণের কাচ দ্বারা নির্ম্মিত। কাচের বর্ণ যে কেবল বিভিন্ন, তাহা নহে, কিন্তু এক এক বর্ণের ভিতরেও বর্ণের গাঢ়তার পরিমাণেরও বিভিন্নতা বর্ত্তমান। এখন উক্ত প্রদীপগুলি যদি

একই সময় জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, তবে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক বাতির ভিতরে একই শক্তির আলোক থাকা সত্ত্বেও এবং সকল বাতির বিজলির উৎস একই হওয়া সত্ত্বেও নানা বাতি নানা প্রকার আলোক দান করিতেছে। যে সকল বাতি গাঢ়তম কৃষ্ণবর্ণ কাচের মধ্যস্থিত, তাহাদের আলোক যেন মোটেই প্রকাশিত হইতেছে না। অন্যান্য বাতিগুলি বর্ণ অনুযায়ী ও বর্ণের গাঢ়তা অনুসারে অল্পাধিক আলোক প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ কাচের স্বচ্ছতা অনুযায়ী আলোক প্রকাশের ন্যূনাধিক্য সংঘটিত হইতেছে। এস্থলে যাহা দেখা গেল, জীব জগতেও তাহাই সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক জীবের আত্মাই এক এবং সকল জীবাত্মাই এক অখণ্ড পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত এবং তাঁহা হইতে কোন প্রকারেই বিচ্যুত নহেন। অর্থাৎ এক অখণ্ড পরমাত্মাই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং খণ্ডীকৃত অংশের প্রশ্ন আত্মা সম্বন্ধে উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইতেছে। তাঁহারা পরমপিতার ইচ্ছানুযায়ী যে যেরূপ দেহে আবদ্ধ হন, সেই সেই দেহ অনুসারে তাহাদের গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। বাতিগুলিতে যেমন যেমন বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিকাশের সম্ভব হয়, জীবেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার দেহ অনুযায়ী বিভিন্ন গুণের বিকাশ হয়। আবার বর্ণের গাঢ়তা অনুসারে যেমন আলোক উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম হয়, সেইরূপ জীবের দেহ অনুযায়ী গুণরাশির বিকাশ অল্পাধিক হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জীব নিজ সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ দেহের আবরণ শক্তি হ্রাস করিতে থাকেন। তাহার সাধন ভজন দ্বারা তিনি যতই বাধা দূর করিতে থাকেন, ততই তাহার গুণরাশির বিকাশ সম্পাদিত হইতে থাকে। স্বগুণ পরীক্ষার আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে এই আবরণ উন্মোচনের শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা সম্পাদিত হইবে।

পাঠক এই সম্পর্কে কঠোপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রগুলির মর্ম্ম অনুধাবন করিবেন।ঃ—"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং

প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ"॥ "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি-রূপো বহিশ্চ॥" "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ-র্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ"॥ (কঠ—২।২।৯—১১)। বঙ্গানুবাদ: "যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ঠ হইয়া দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে তত্তদ্বস্তু রূপ হইয়াছেন এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরেও আছেন।" "যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন তেমনি সর্ব্বভূতের একই অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে তত্ত্বদ্বস্তু রূপ হইয়াছেন এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরেও আছেন" "সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎ সম্বন্ধে দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কারণ, তিনি স্বতন্ত্র-স্বভাব। (তত্ত্বভূষণ)" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। (গীতা – ১৩।২)" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ (গীতা—১৩।১৬)" "বঙ্গানুবাদ:—হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। সেই (জ্ঞেয়) ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণেতে বিভক্তের মত অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের পোষক, সংহারক ও উৎপত্তির কারণ। (গৌরগোবিন্দ রায়)।"

এই সম্পর্কে পরমর্ষি গুরুনাথকৃত তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আমাদের বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। "উল্লিখিত শরীর সমূহে চৈতন্যাংশের পূর্ব্ববৎ গুণান্বিতভাবে * স্ফূর্ত্তি হইলেই বর্ত্তমান সৃষ্টির বিকাশ সংঘটিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার বা পরম পুরুষের অংশ। এই অংশ তাঁহা হইতে বিচ্যুত

* অংশ শব্দ এস্থলে অংশভাবে ভাসমান বুঝায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতার শ্লোক দ্রষ্টব্য। "পূর্ব্ববৎ গুণান্বিত ভাবের" অর্থ ৫৩৭-৫৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধানুযায়ী যখন জীব সৃষ্ট হয়।

নহে, অথচ স্বয়ং তদ্রূপে (বিচ্যুতভাবে) প্রকাশমান থাকে। যেমন, দেহের অঙ্গ হস্তপদাদি দেহ হইতে পৃথক্ নহে, অথচ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যার্থেই যেন সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পরন্তু ইহারা সকলেই একই জীবেচ্ছা-সম্পাদক, তদ্রূপ এই সকল জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বা অপর জীবাত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথকত্ব রূপে আভাসমান মাত্র। যেমন ভারতবর্ষ, চীন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ একই পৃথিবীর অংশ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দৃঢ়তর সীমায় এরূপ বদ্ধ যে প্রভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান, তদ্রূপই পরমাত্মার অংশ সমূহের বা জীববর্গের প্রভেদ জানিবে" (ক)। কেহ কেহ বলেন যে পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভাবী জীবাত্মাতে গুণ সমষ্টি এক রাখিয়া তাঁহাতে (ভাবী জীবাত্মাতে) কোনও একটী গুণ অধিক পরিমাণে ও অন্যান্য গুণরাশি অল্প পরিমাণে দিয়াছেন। দেহ সেই জীবাত্মার সেই গুণানুযায়ী সম্ভব হইয়াছে। এই মত বিশ্লেষণ করিলে দাড়ায় এই যে, পরমাত্মা দেহে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইবার পূর্ব্বেই নিজের মধ্যেই নিজেকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাতে নানাবিধ পরিমাণে গুণবিধান করিয়া এক একটী জীবাত্মা প্রস্তুত করেন এবং সেই সেই জীবাত্মার দেহ সেইরূপ গুণানুযায়ী সম্ভব হয়। নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে উক্ত মতানুসারে আত্মাগণ দেহাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কিভাবে পরমাত্মাতেই অথবা স্বয়ং বিচ্যুত হইয়া নানা ভাবের গুণ সম্পন্ন অবস্থায় থাকেন।

(ক) পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের সম্পূর্ণ উপমা হইতে পারে না।

	জ্ঞান	প্রেম	সরলতা	পবিত্রতা	একাগ্রতা	অবশিষ্ট গুণরাশি
পরমাত্মা	অনন্ত	অনন্ত	অনন্ত	অনন্ত	অনন্ত	অনন্ত
'ক' নামক	১	১	১	১	১	১
একটী জীবাত্মা	কোটী	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	অনন্ত
'খ' নামক	১	১	১	১	১	১
একটী জীবাত্মা	পরার্দ্ধ	কোটী	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	অনন্ত
'গ' নামক	১	১	১	১	১	১
একটী জীবাত্মা	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	কোটী	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	অনন্ত
'ঘ' নামক	১	১	১	১	১	১
একটী জীবাত্মা	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	কোটী	পরার্দ্ধ	অনন্ত
'ঙ' নামক	১	১	১	১	১	১
একটী জীবাত্মা	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	পরার্দ্ধ	কোটী	অনন্ত
ইত্যাদি			ইত্যাদি		ইত্যাদি (খ)।	

পরমপিতা উক্ত ভাবে জীবাত্মা গঠন করেন না। আত্মার অর্থ "জীবাত্মা" অংশে লিখিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বব্যাপী এবং অখণ্ড। সুতরাং পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার দেহাবদ্ধ ভাবে ভাসমান হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাতে তাঁহার কোন ভাগ বাটোয়ারা সম্ভব নহে। অখণ্ড পরমাত্মার কোন অবস্থায়ই বিভক্ত হওয়া অসম্ভব। তিনি দেহ দ্বারাও খণ্ডিত হন নাই। যাহা হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অবিচ্যুত থাকিয়াও বিচ্যুত ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তিনি এক, অব্যয়, অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয়, নিষ্কল, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি নিত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সুতরাং অবিভাজ্য। তাঁহার বিভাগ কল্পনারও অসাধ্য। "আত্মা ও জড়ের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে এক ব্রহ্মই অখণ্ড থাকিয়াও বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ইহার প্রণালী আমরা ইতঃপর "ব্রহ্মের জীবভাবে

(খ) নির্ঘণ্টে যে বিভাগ দেখান হইয়াছে, উহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য অত্যন্ত কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা উহাদিগকে সত্য বিভাগ বলিয়া মনে করি। অখণ্ড অনন্তকে কখনও ভাগ করা যায় না। সুতরাং উক্ত বিভাগ ভ্রান্ত। অনন্তকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না।

ভাসমানত্বের প্রণালী” অংশে আরও বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইব। ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত গুণ সমষ্টি অর্থাৎ তিনি জ্ঞান, প্রেম, সরলতা, একাগ্রতা, দয়া, করুণা, কৃপা প্রভৃতি অনন্ত গুণের সমষ্টি। আবার তাঁহাতে সেই অনন্ত গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত গুণ একীভূত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। গুণের কখনও বিভাগ হইতে পারে না। শিক্ষক ছাত্রকে বিদ্যাদান করেন। ইহার অর্থ এই নহে যে শিক্ষকের বিদ্যা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছাত্রদিগকে দান করেন, কিন্তু তিনি নিজের বিদ্যা দ্বারা ছাত্রদিগের বিদ্যা বিরোধী অন্ধকার দূর করেন মাত্র এবং উহার ফলে ছাত্রদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। গুরু শব্দের ধাত্বর্থ যিনি অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করেন। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :—“(বিদ্যা) যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।” প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেও ঐ একই ভাব আমরা দেখিতে পাইব। “ক” নামক ব্যক্তি “খ” নামক ব্যক্তিকে ভালবাসে। এই প্রেম বিতরণ দ্বারা ‘ক” এর প্রেমের বিভাগ বা ব্যয় হইতেছে না, বরং অনুশীলন জন্য তাহার প্রেম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং “খ” এর প্রেমও অল্পাধিক পরিমাণে বিকশিত হইতেছে। দয়া সম্বন্ধেও সেই একই কথা। দয়া বিতরণে দয়ালু ব্যক্তির শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার দয়াগুণের ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হয়। স্থূল, একটী কথা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে গুণের কখনও বিভাগ হয় না বা হইতেও পারে না। গুণের অনুশীলনে গুণ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অবশ্য “বৃদ্ধি” শব্দে বিকাশ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গুণের প্রকাশ-বিরোধী আবরণের উন্মোচন বুঝিতে হইবে। এস্থলে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে কেহ কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই যে কেহ কখনও তাহার জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণ বিভাগ করিয়া অন্যকে দান করিয়াছেন। কোন কোন জড় পদার্থেরই বিভাগ সম্ভব, গুণের বিভাগ কখনও সম্ভব নহে। ব্রহ্মে অনন্ত গুণের একত্ব হইয়াছে সুতরাং তিনি Abstract, কখনই Concrete নহেন। তিনি দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ বিশিষ্ট জড় পদার্থ নহেন।

সুতরাং তাঁহার বিভাগ অসম্ভব, অথবা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। এখন জড় পদার্থের বিভাগ সম্বন্ধেই পরীক্ষা করা যাউক্। আমরা দেখিতে পাই যে কঠিন পদার্থকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায়। কিন্তু জল, তেজঃ, বায়ু ও ব্যোমকে উক্ত পদার্থের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করা যায় না। শেষোক্ত পদার্থগুলিকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড করা যায় না বটে, কিন্তু জল, তেজঃ এবং বায়ুকে পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। অর্থাৎ উহারা বিভক্ত হইতে পারে। কিন্তু ব্যোমকে কেহই অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে অথবা পাত্র বিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। ব্যোম সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত, অর্থাৎ ব্যোম বিশ্বব্যাপী এক ও অখণ্ড। উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব বশতঃ কখনই খণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি। ব্যোম যাঁহা হইতে উৎপন্ন, তিনি অবশ্যই ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর বা ব্যোমেরও কারণ। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্"। ব্রহ্ম যে সূক্ষ্মতম বা কারণতম তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব জড় ব্যোমই যখন উহার সূক্ষ্মতাবশতঃ খণ্ডিত হইতে পারে নাই, তখন সেই ব্যোমেরও কারণ এবং অনন্তভাবে সূক্ষ্মতম বা কারণতম ব্রহ্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাবশতঃ যে তিনি কোন প্রকারেই কখনই খণ্ডিত হইতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব ব্রহ্মের কোনওরূপ বিভাগ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। বিরুদ্ধবাদীর পূর্ব্বোক্ত মত সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা কখনও দেহাবৃত অবস্থায় ভিন্ন স্বয়ং থাকিতে পারেন না। স্থূল, সূক্ষ্ম, বা কারণ দেহের মধ্যে এক প্রকার দেহে, না হয় অন্য প্রকার দেহে তাঁহার অবশ্যই অবস্থান করিতে হইবে। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেহাবদ্ধ আত্মাকেই মাত্র জীবাত্মা বলা হয় অথবা দেহই জীবত্বের জনক। যে আত্মা দেহাবদ্ধ নহেন, তিনি ত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত মহান্, তিনি ত পরমাত্মা নামেই অভিহিত হন। সুতরাং দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অংশ সমূহ ভাবী জীবাত্মা ভাবে স্বয়ং স্বাধীন ভাবে অথবা পরমাত্মাতে থাকিতে পারেন না। যদি তর্কস্থলে ধরিয়া নেওয়া যায় যে পরমপিতা তাঁহার মহীয়সী শক্তি

সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারিতেন, অর্থাৎ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এমন ভাবে জীবাত্মা সমূহ সৃষ্টি করিতেন, যাহাতে দেহাবরণ ব্যতীতও কোনও জীবাত্মার কোনও একটী গুণ অধিক হইত এবং অপর জীবাত্মা সমূহের প্রত্যেকের এক একটী গুণ অধিক হইত, তবে তিনি তাঁহার সেই একই সবিশেষ শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার অংশ সমূহেও (ভাবী জীবাত্মা ভাবে প্রস্তুত তাঁহার অংশ সমূহে) উক্ত ভাবেই গুণ বিধান করিয়া দেহ ব্যতীতও গুণরাশির ক্রমোন্নতির বিধান করিতে পারিতেন। যদি ঐরূপই সম্ভব হইত তবে দেহের সুতরাং জড় জগতের সৃষ্টির কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু উভয় কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। অর্থাৎ অখণ্ড, নিত্য নির্বিকার, নিরাকার, নিষ্কল ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করাও যায় না, আবার দেহাবরণে আবদ্ধ না হইলে জীবাত্মার পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণ বিধানও হয় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন ছিলেন, তেমনি থাকিতেন।* আত্মা দেহাবরণে আবৃত হওয়ার পূর্ব্বমূহূর্ত্ত পর্য্যন্তই অর্থাৎ ব্রহ্ম দেহ যোগে পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই তিনি এক অখণ্ড, অর্থাৎ সৃষ্টিও তখন ছিল না। তখন তাঁহাতে বিভাগ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তখন নানা জীবাত্মা সৃজন ও গুণরাশির পূর্ব্বোক্তরূপে বণ্টন অসম্ভব। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম দেহযোগে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি কখনও বহু খণ্ডে খণ্ডিত হন নাই। জড় জগৎ সুতরাং জড় জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে

* "ব্রহ্ম যেমন ছিলেন তেমনি থাকিতেন" বাক্যে বুঝিতে হইবে না যে সৃষ্টিতে ব্রহ্মের কোনই বিকার হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা এই যে সৃষ্টি তাঁহাতেই ভাসমান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ এই সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা গিয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জগৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহার (অব্যক্তের) কোনই বিকার হয় নাই। "অব্যক্ত" practically জগৎরূপে ভাসমান হইয়াছে। "ব্রহ্মে জীবভাবের ভাসমানত্ব প্রণালী" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্ম স্বয়ং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। এই ভাসমানত্ব সম্ভব হইত না যদি জড় জগৎ সৃষ্ট না হইত।

যে উহা আত্মার গুণরাশিকে নানা ভাবে আবরণ করা, নানা প্রকার দোষ পাশ রাশি সৃজন দ্বারা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখা এবং নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উৎপাদন করা, অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করা। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জগৎ জীবের জন্যই, উহার নিজস্ব কোনই প্রয়োজন নাই। ইহার কোন কার্য্যই দেহ ভিন্ন সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমতী বটে, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা প্রণালী বিশেষের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। যাহা হউক, যদি পরম পিতার একমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই তিনি নিত্য অখণ্ড হইয়াও অসংখ্য খণ্ডনে খণ্ডিত হইতে পারিতেন, তবে সেই একই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই জড় জগৎ ও জড় দেহ ব্যতীতও তাঁহার এই প্রেমলীলার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ গুণ বিধান, বাধা সৃজন দ্বারা স্বগুণ পরীক্ষা প্রভৃতি, তাহাও সম্পাদন করিতে পারিতেন। অর্থাৎ যদি একটী একান্ত অসম্ভবকে যদি তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সম্ভব করিতে পারিতেন, তবে অন্য ক্ষুদ্রতর অসম্ভব-কেও তিনি সেই একই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সম্ভব করিতে পারিতেন। অর্থাৎ জড় জগৎ সৃষ্টি না করিয়াও তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে যাহার প্রয়োজন নাই, তাহা জগতে আসে নাই। এমন কি ক্ষুদ্রতম বালুকণাটীও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং তিনি যদি প্রোক্ত ভাবেই সৃষ্টি লীলা সম্পাদন করিতে পারিতেন, তবে এই অনন্ত প্রায় বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় রূপ বিরাট ব্যাপার সংঘটনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমরা জগৎ আমাদের সমক্ষে সর্ব্বদা দেখিতেছি। এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে বিরুদ্ধবাদীর মত যুক্তিসঙ্গত নহে। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় আমাদের গুণোন্নতি সাধনে সাহায্য করে। কারণ, দেহ ও বাহিরের জড় ভিন্ন আমাদের কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। সুতরাং গুণোন্নতির জন্য দেহ সুতরাং জড়ের একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্যই দেহের সুতরাং জড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উত্তরে

প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এমন বিধান করিতে পারিতেন যাহাতে জড় জগৎ সৃষ্টি ব্যতীতও গুণোন্নতি করা যাইতে পারিত। সুতরাং গুণোন্নতির জন্য জড়ের প্রয়োজন হইত না। জড় থাকিলে ত উহার প্রয়োজনীয়তা। এখন বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা যাউক্। গুণোন্নতির জন্য পরমেশ্বরের উপাসনাই প্রয়োজনীয়। উপাসনা করে কে? পরমাত্মার উপাসনা জীবাত্মাই করেন, তাঁহার দেহ উপাসনা করে না। আবার "সর্ব্বচেতনের চেতন সেই পরম কারণ গুণময় পরমেশ্বরের উপাসনা গুণ দ্বারাই হইতে পারে, অচেতন বস্তু বা গুণাতিরিক্ত পদার্থ দ্বারা কখনই হইতে পারে না" (ক)। দেহ সর্ব্বদা বাধক ভাবেই বর্ত্তমান। উহা কখনই আত্মোন্নতির সাহায্য করিতে পারে না। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে অনন্ত অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে জড় এবং দেহ এরূপ ভাবে গঠিত যে উহা বাধকরূপে সৃষ্ট হইলেও উহাতেই আবার জড়ের বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি ও সুযোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে (খ)। সুতরাং আমাদের গুণোন্নতি সাধনের জন্য জড়ের যে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জড়ের বাধা দূর করিবার জন্যই। অর্থাৎ আমরা জড়ের বাধা অতিক্রম করিবার জন্য জড়ের কিছু সাহায্য লাভ করি, যেমন কণ্টক দ্বারা দেহবিদ্ধ কণ্টক উৎপাটন করিতে হয়। (কণ্টকেনা বিদ্ধ কণ্টকম্). যেমন বিষে বিষ ক্ষয়। নতুবা জড়ের গুণোন্নতি দান করিবার কোনই শক্তি নাই। আর চৈতন্য শূন্য জড়ও চেতন ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক্ না কেন, আমাদের চেতনেই আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন যে ঐরূপ জড়ের সাহায্যে কিছু কিছু গুণোন্নতি হয় বটে, অর্থাৎ জড়ের বাধা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অতিক্রান্ত হয় বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ অত্যল্প। কারণ, যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা অভাবাত্মক দিক্ (Negative side) ভিন্ন আর কিছুই নহে। গুণোন্নতি উপাসনার

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

(খ) "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

উপরই অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মোটামুটী বুঝিতে গেলে দেহ এবং জড় আছে বলিয়াই উহার সাহায্য গ্রহণ, নতুবা উপরোক্ত মতের ভাবী জীবাত্মার গুণোন্নতির জন্য জড় জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। কারণ, দেহ থাকিলে ত জড়ের বাধা, নতুবা বাধা অতিক্রম করিবার জন্য দেহের অর্থাৎ জড়ের প্রয়োজন কোথায়? (খ)। যদি জীবাত্মা সকল পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইল, অর্থাৎ জীবাত্মা সকল বিভাগ জন্য অণু হইতেও অণু ভাবে পরিণত হইল, সুতরাং তাঁহাদের গুণরাশিও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল, তবে আবার দেহরূপ আবরণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমরা দেখিয়াছি এবং আরও দেখিব যে আত্মা এবং দেহ পৃথক্ (Distinct) পদার্থ এবং আত্মা সম্বন্ধে দেহ আবরণ বই আর কিছুই নহে। প্রত্যেক সাধকেরই উন্নত অবস্থায় দেহাত্মভেদ সাধনা করিতে হয়। ইহাও বলা যাইতে পারেনা যে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য দেহের প্রয়োজন। আত্মারই মৃত্যু নাই, কিন্তু আত্মা দেহত্যাগ করিলে সেই দেহেরই মৃত্যু হয়। আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে দেখিতে পাইব যে দেহ আবরণরূপে-বাধকরূপে সৃষ্ট। এই আবরণ দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অবিচ্যুত হইয়াও বিচ্যুতভাবে ভাসমান। অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমোময় দেহের আবরণ দ্বারাই জীবের অনন্ত গুণ ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশমান। এই দেহের বিরোধিতা লয় করিয়াই অর্থাৎ আবরণ রাশি উন্মোচন করিয়াই আত্মার গুণরাশির বিকাশ সাধন করিতে হয়। দেহ অসংখ্য সুতরাং সাধনাও প্রায় অনন্তকাল ব্যাপিনী। অর্থাৎ অসংখ্য দেহ লয় করাই আত্মার বিকাশ সাধনা। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আত্মার উন্নতির অর্থ আত্মার গুণরাশির বিকাশ বা আবরণ উন্মোচন। যদি বিভাগ জন্য (খণ্ডীকরণ জন্য) জীবাত্মার গুণরাশি ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে, তবে অসংখ্য দেহ দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় আবরণ করিবার কোনই আবশ্যকতা থাকিতে পারেনা। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীর মত অনুসরণ করিলে জড়-জগতের কোনই

(খ) "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে পরমপিতা যদি তাঁহার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা নিজেকে নিজে খণ্ড খণ্ড করিতে পারিতেন, তবে তিনি দেহ সুতরাং জড় জগৎ সৃষ্টি না করিয়াও খণ্ডীকৃত অংশের বাধাও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আত্মাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া অথবা ব্রহ্মেই পূর্ব্বোক্তরূপ গুণান্বিতভাবে অংশ প্রস্তুত করিয়া জীবাত্মার গঠন অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রকারের জীবাত্মার গঠনের বিরুদ্ধে আরও যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম নিত্যই একরস। তাঁহারই মধ্যে তাঁহারই দ্বারা তাঁহারই বিভাগ একান্ত অসম্ভব। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে ব্রহ্মে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় প্রভৃতি কোনও ভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না। এই সম্বন্ধে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের জীবাত্মা গঠন সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের মধ্যে কোনই সীমা নাই এবং সীমা গঠনোপযোগী কিছুই নাই। তিনি নিত্য অনন্ত উদার এবং একরস। তাঁহার সমস্তই নিত্য অনন্ত অসীমত্বে পরিপূর্ণ। তাঁহার মধ্যে সসীম কিছুই নাই। তাঁহার মধ্যে অসম্ভব সীমা সৃষ্টি করা যে অসম্ভব, তাহা আমাদের সহজ জ্ঞানলভ্য। জড়-জগতের মধ্যে ব্যোমই সূক্ষ্মতম পদার্থ। উহা হইতে সূক্ষ্মতর জড় পদার্থ জগতে নাই। সুতরাং ব্যোম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্যোমের মধ্যেই ব্যোম দ্বারা ব্যোমের সীমাবদ্ধ অংশ সৃষ্টি করা অসম্ভব। কেহ কি কখনও ব্যোমের অংশ কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি ব্যোমেই ঐরূপ অংশ সৃষ্টি হইতে না পারে, তবে ব্যোম হইতেও অনন্তগুণে সূক্ষ্ম, অনন্তগুণে উদার, অনন্তগুণে সীমাহীন, অনন্ত গুণে অখণ্ড ব্রহ্মে যে ঐরূপ ভাবের অংশ গঠন একান্তই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ব্যোম সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একমাত্র স্থূলতম ক্ষিতি পদার্থই ক্ষিতি পদার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অপ্ দ্বারা অপ্, তেজঃ দ্বারা তেজঃ, এবং মরুৎ দ্বারা মরুৎ

সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। যখন ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কি প্রকারে অনন্ত গুণে সূক্ষ্ম ব্রহ্মে তাঁহার নিজ দ্বারাই তাঁহাতেই সীমাবদ্ধ অনন্ত অংশ গঠন করিবেন? পাঠক ইহাও অবশ্য লক্ষ্য করিবেন যে স্থূল পদার্থ অপের মধ্যেই অপ্ দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।৩২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। উহাতে ব্রহ্মকে সলিল অর্থাৎ সলিলের ন্যায় ভেদ রহিত বলা হইয়াছে। তেজঃ ও মরুৎ সূক্ষ্ম ভূত পদার্থদ্বয়ও ঐ কার্য্যে অসমর্থ। সুতরাং সূক্ষ্মতম ভূত ব্যোমে উহা একান্তভাবে অসম্ভব। ব্যোমের কোনও প্রকারের অংশ হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু উহা হইতে পরম্পরা-ভাবে উৎপন্ন বিকৃত ক্ষিতি পদার্থ দ্বারা উহা অংশভাবে ভাসমান হইতে পারে, যেমন ঘটাকাশ। জীবাত্মাও তাহাই। ব্রহ্ম তাঁহার হইতে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন দেহযোগে পৃথক্ ভাবে ভাসমান মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অর্থাৎ স্বরূপে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রকৃত অংশ করা হয় নাই। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ অসম্ভব। অখণ্ড, নিষ্কল, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম যে সর্ব্বপ্রকারেই অবিভাজ্য, তাহা সহজ বোধ্যও বটে। আবার যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে ব্রহ্মেই উক্তরূপ গুণান্বিতভাবে সীমাবদ্ধ জীবাত্মা গঠন করা সম্ভব, তবুও বলিতে হইবে যে সেইরূপ সীমাবদ্ধ আত্মা খণ্ডীকৃত অংশই বটে। কারণ তিনিও সীমাবদ্ধ। সীমারেখার বাহিরে তাঁহার কোনই অধিকার নাই। সুতরাং খণ্ডীকৃত অংশের এবং তথাকথিত অবিচ্যুত অংশের কোনই পার্থক্য থাকিল না এবং উভয়ই এক পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন। সুতরাং খণ্ডীকৃত অংশ সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহা তথাকথিত অবিচ্যুত অংশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিতে হইবে। পরমপিতা আত্মাতে গুণের তারতম্য করিরা রাখিয়াছেন অর্থাৎ জড় পদার্থের ন্যায় আত্মার গুণরাশি ছোট বড় খণ্ড খণ্ড করিয়া জীবাত্মাতে সংস্থান করিয়াছেন, এই উক্তি যে আদবেই অযৌক্তিক, তাহা বলাই বাহুল্য। তত্ত্বতঃ বুঝিতে গেলে

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমরা সান্ত, সসীম ও অপূর্ণ, পাপে মলিন, নানা দোষে দুষ্ট ও বিবিধ পাশে আবদ্ধ। সুতরাং ভেদ স্বীকার করাও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দেহাবরণ দ্বারাই ভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। দেহই আমাদের সসীমত্বের একমাত্র কারণ, দেহদ্বারাই আমরা পরমাত্মা হইতে অপৃথক্ হইয়াও পৃথকভাবে প্রকাশমান। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে গুণের বিভাগ হইতে পারে না। আর জড় পদার্থের ন্যায় আধ্যাত্মিক গুণের বিভাগ যে হইতে পারে, একরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্ত আধ্যাত্মিক সরল গুণের প্রত্যেকটী ব্রহ্মে অনন্ত পরিমাণে নিত্য বর্ত্তমান। জীবাত্মাতে অর্থাৎ তাঁহারই অংশ-ভাবে ভাসমান জীব সমূহে যদি সেই অনন্তগুণের অনন্তভাগ হইয়া যায়, তবে তাঁহার গুণরাশিও আর অনন্ত থাকিল না, ব্রহ্ম সসীম হইলেন এবং তাঁহার অনন্তত্ব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। তাঁহাতে নিত্যই অনন্ত গুণ অনন্ত পরিমাণে ছিল, আছে ও থাকিবে—সৃষ্টির জন্য তাঁহাতে গুণের অল্পতা সংঘটিত হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। আবার বিপরীত ভাবে চিন্তা করা যাউক্। প্রত্যেক অংশে যতটুকু গুণ অংশীকৃত হইয়া বর্ত্তমান, জীবা-ত্মার গুণের ততটুকু উন্নতি হইতে পারে, ইহার অতিরিক্ত উন্নতি তাঁহাতে (জীবাত্মাতে) সম্ভব নহে। কারণ, ভাণ্ডে যাহা নাই, তাহা কি প্রকারে লাভ করা যায়? কিন্তু আমরা জানি যে জীবের প্রত্যেক গুণের অনন্ত উন্নতি সম্ভব। গুণের ঐরূপ অনন্ত উন্নতি সম্ভব হয় না, যদি জীবাত্মাকে জড় পদার্থের অংশের ন্যায় পরমাত্মার অংশ বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে জীবাত্মা দেহাবরণে আবৃত পরমাত্মাই, অন্য কিছু নহে, তাঁহাতে গুণরাশি পূর্ণ পরিমাণে—অনন্ত পরিমাণেই নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত বলিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে চিরভাসমান, তাহা হইলে অনন্ত গুণের অনন্ত উন্নতির জন্য

জীবের আবরণ সমূহ উন্মোচন করিতে হইবে মাত্র, ইহা চিন্তা করিলেই সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়। শেষোক্ত মতে আধ্যাত্মিক গুণরাশির বিভাগরূপ অস্বাভাবিক কল্পনার প্রয়োজন হয় না, অথবা জীবাত্মার গুণরাশির অনন্ত উন্নতির বাধাও সৃষ্টি করা হয় না। "একজন সাধক প্রেমে উন্নতি লাভ করিলেন" বলিলে এই বুঝায় না যে পূর্ব্বে যত পরিমাণ প্রেম ছিল, উক্ত উন্নতিতে তাহা হইতে প্রেমের বৃদ্ধি হইল। অথবা এক ব্যক্তি প্রেমে উন্নত ছিলেন. কোন কারণ বশতঃ তাহার পতন হইয়া প্রেমের অবনত অবস্থায় উপনীত হইলেন, সুতরাং পূর্ব্বে যে পরিমাণ প্রেম ছিল, তাহা হইতে প্রেমের হ্রাস হইল। কিন্তু উহার অর্থ এই যে কাহারও জীবনে প্রেম বিরোধী আবরণ উন্মুক্ত হইল, কাহারও জীবনে বা প্রেম পুনরাবৃত হইল। আবরণ উন্মোচনের পরিমাণ অনুযায়ী প্রেমের বৃদ্ধি বা বিকাশ এবং কর্ম্মদোষে পুনরাবৃত হইলে প্রেমের হ্রাস হইয়াছে মাত্র। প্রেম আত্মার গুণ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই গুণ ও তাঁহাতেই নিত্য অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। সুতরাং উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই—তাহা জন্মে না, বৃদ্ধি হয় না বা ক্ষয় হয় না— ইহাকে খণ্ডিত করা যায় না। জীবাত্মাগণের কর্ত্তব্য এই যে আবরণ উন্মোচন করিয়া পরমাত্মার অনন্ত প্রেমে একত্ব লাভ করেন। একত্ব প্রাপ্ত মুক্ত সাধকগণের যে অনন্ত প্রেম, তাহা পরমাত্মারই প্রেম— তাঁহার প্রেম ও পরমাত্মার প্রেম ভিন্ন নহে। তাঁহার (সাধকের) প্রেম বাহির হইতে আসে না। তিনি প্রেম বিরোধী আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন মাত্র। পরমপিতাই একমাত্র অনন্ত সরল গুণের অনন্ত ও নিত্য আধার। তাঁহার গুণরাশিই জীবে আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুযায়ী অংশ, আভাস, বিকৃতি প্রভৃতি নানভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জীবে যে সরল গুণ দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মেরই সরল গুণের অল্লাধিক বিকাশ মাত্র—ব্রহ্মে ভিন্ন অন্য কুত্রাপি বিন্দু মাত্রও সরল গুণ নাই। যাহাতে যতটুকু গুণ আছে, তাহাতে ততটুকু মাত্র বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। পাঠক মনে রাখিবেন যে দেহ আত্মার যন্ত্র মাত্র। আমরা সকলেই জানি যে মানব জাতির মধ্যে অনেকেই বিদ্যা উপার্জ্জন করেন

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে তাহাদের শরীরের গঠনই এমন যে তাহাতে আত্মার জ্ঞান অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু পশু পক্ষ্যাদির শরীরের গঠন সেইরূপ নহে, সুতরাং সেই সকল দেহ দ্বারা সেইরূপ ভাবে জ্ঞান প্রকাশের সুবিধা ও সুযোগ নাই। মানব অত্যধিক বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু পশুরাজ সিংহকে সহস্র শিক্ষা দিলেও সে অতি সাধারণ বিদ্বানের ন্যায় বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। এমন কি শিম্পাঞ্জিও সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে না। অন্যান্য জীবের কথা চিন্তা না করিয়া যদি কেবল মানব সম্বন্ধেই চিন্তা করি, তবে বুঝিতে পারি যে সকল মানবই সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও শঙ্কর, কালিদাস, Shakespeare প্রভৃতি হইতে পারেন না। সাধারণ ব্যক্তিবর্গ যতটুকু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, বিশেষ চেষ্টা করিলে তাহাদের অধ্যবসায় ও যত্নের ফলে তাহা হইতে কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বিদ্যা বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু কখনই তাহা সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের (Genius দিগের) দেহের গঠনই এমন যে তাহা দ্বারা তাহারা সহজেই বিদ্যা লাভ করিতে পারেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের দেহের গঠনই অন্যরূপ, অথবা তাহারা শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেহকে এমন দুরবস্থায় আনিয়াছেন যে তাহা দ্বারা অত্যধিক বিদ্যা উপার্জ্জন অসম্ভব। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "Intelligence is found to vary with the relative size and weight of the brain. The more the size and weight of the the brain as compared with the bulk of the body, the greater the intelligence The average brain of civilized men weighs about 49 oz, that of savage races about 4 or 6 oz less. Men of genius have risen as high as 64 oz. Idiots may not rise above 30 oz and may sink as low as 10 oz. Indeed 30 oz

appears to be the minimum of rational mind." (Stephen)

"Intelligence varies with the complexity of the brain even in a greater degree than with its bare size and weight. The brain contains a number of convolutions. The more numerous are these convolutions, the greater is the intelligence" (Text Book of Psychology by S. C. Sen). "বঙ্গানুবাদ : - মস্তিষ্কের আপেক্ষিক আকার এবং পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী বুদ্ধির অল্পাধিক্য হয়। শরীরের আকারের অনুপাতে মস্তিষ্কের আকার ও পরিমাণ যত অধিক হইবে, বুদ্ধিও ততোঽধিক হইবে। সভ্য মানবের মস্তিষ্কের পরিমাণ গড়ে ৪৯ আউন্স। অসভ্য জাতীয় মানবের মস্তিষ্কের পরিমাণ ৪ অথবা ৬ আউন্স কম। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মস্তিষ্কের পরিমাণ ৬৭ আউন্স পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। অবোধগণের মস্তিষ্কের পরিমাণ ৩০ আউন্সের উপরে সাধারণতঃ উঠে না এবং উহা দশ আউন্স পর্য্যন্ত নিম্নে নামিতে পারে। বস্তুতঃ বুদ্ধিযুক্ত মানবের মস্তিষ্কের নিম্নতম পরিমাণ ৩০ আউন্স বলিয়া মনে হয়।

মস্তিষ্কের কেবল মাত্র আকার ও পরিমাণ অপেক্ষাও উহার জটিলতার জন্য বুদ্ধির তারতম্য হয়। মস্তিষ্কে বহু পাক বর্ত্তমান আছে। এই পাক যে মস্তিষ্কে যত অধিক, সেই ব্যক্তির বুদ্ধি ততোঽধিক।"* উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা পাইলাম যে, যে দেহে যতটুকু বিকাশ করিবার শক্তি আছে, সেই দেহ ততটুকু মাত্র প্রকাশ করিতে পারে, উহার অধিক প্রকাশ করিবার তাহার শক্তি নাই। জীবাত্মা

* এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিভাশালী, সুবোধ, নির্ব্বোধ সকল মানবের মধ্যেই একই আত্মা বিরাজমান। আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। দেহের পার্থক্যই বুদ্ধির তারতম্যের কারণ। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্ধ রূপ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, জন্মবধির শব্দ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, যদিও উভয় দেহেই একই আত্মা বর্ত্তমান।

সমূহ যদি পরমাত্মার খণ্ডিত অংশই হইত, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের গুণ রাশির অনন্ত উন্নতি বা বিকাশ সম্ভব হইত না। খণ্ডিত ক্ষুদ্রাংশে ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত গুণরাশির যতটুকু মাত্র সম্ভাবনা, ততটুকু মাত্র উন্নতি লাভ করিয়াই থামিয়া যাইত। অর্থাৎ ভাণ্ডে যতটুকু থাকিবে, তাহাই সে প্রকাশে সমর্থ। ভাণ্ডে যদি অনন্ত বস্তু থাকে, তবে অনন্ত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, নতুবা নহে। কিন্তু প্রকৃত (বাস্তব ভাবে সত্য) অংশের অনন্ত সম্ভাবনা থাকা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কারণ, উহা যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যদি বিরুদ্ধবাদীর মতানুযায়ী কল্পনা করা যায় যে খণ্ডীকৃত জীবাত্মার খণ্ডীকৃত গুণরাশির অনন্ত উন্নতি হইতে পারে, তবে উহা অবশ্যই ক্রমশঃ হইবে। কারণ, ক্রমই সৃষ্টির বিশেষ প্রণালী। এখন চিন্তা করা যাউক যে একটী গুণের খণ্ডিত অংশের সহিত সেই গুণের অপর অংশ সমূহের (ক) ক্রমশঃ যোগ হইতে থাকিল এবং এইরূপ যোগ দ্বারা সেই গুণ অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইল। কিন্তু সীমাবদ্ধ গুণের সহিত উহার অপর সসীম অংশ যোগ করিতে থাকিলে সেই গুণ বৃহৎ, বৃহত্তর হইবে বটে, কিন্তু কখনও অনন্ত হইবে না। যাহা হইবে, তাহা এই যে, সেই গুণএ উন্নত হইবে যে উহার সীমা আমাদের অধার্য্য হইবে বটে, কিন্তু উহা কখনও অনন্ত ভাবে অসীম হইবে না। ইহার কারণ এই যে সসীমের সহিত সসীম বস্তু যোগ করিলে যোগ ফলও সসীম হয়, উহা কখনও অনন্ত অসীম হয় না বা হইতেও পারে না। এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, যদি আমরা মনে করি যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত। আবরণ উন্মুক্ত হইলেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যোগ বা বিভাগের প্রশ্নই উদয় হইতে পারে না। আবারও যদি তর্কস্থলে কল্পনা করা যায় যে খণ্ডীকৃত অংশের অর্থাৎ জীবাত্মার গুণরাশির অনন্ত উন্নতি হইতে থাকিল, তবে বিভিন্ন জীবাত্মায় বিভিন্ন উন্নতি হইতে থাকিবে

(ক) বাদীই বলেন যে গুণের অংশ হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা এত সময় বলিয়া আসিয়াছি যে গুণ অখণ্ডনীয়।

এবং তাঁহাদিগের বহুগুণ উন্নত হইতে হইতে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ পরমপিতার সেই সকল গুণরাশির সহিত সমান উন্নত হইল। উহাতে জীবাত্মাদিগের বহুগুণ স্বাধীন ভাবে উন্নত হইয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে এক একটী গুণ বহুতে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ এক একটী গুণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরমাত্মায় ও বহু জীবাত্মায় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান রহিল, অর্থাৎ এক একটী গুণ শত সহস্র বিভিন্ন ভাবে অথচ অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিল। ইহা যে অসম্ভব, তাহা যে কেহ বুঝিতে পারেন। যদি কেহ বলেন যে জীবাত্মাদিগের বহুগুণ অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরমাত্মার গুণ হইতে পৃথক্ থাকিবে না, কিন্তু একই হইবে। এই কল্পনাও অসম্ভব। কারণ, জীবাত্মা যখন পরমাত্মা হইতে খণ্ডিতই হইয়াছে, তখন তাঁহার গুণরাশি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক্ ভাবেই অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ খণ্ডিত জীবাত্মার অনন্ত গুণ যদি স্বাধীন ভাবে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সকল জীবাত্মা এক এক জন ব্রহ্মাই হইলেন এবং এইরূপে বহু বহু ব্রহ্ম হইতে থাকিলেন। ইহা যে অসম্ভব হইতেও অসম্ভব, তাহা যে কেহ বুঝিতে পারেন। মানব সন্তান মাতা পিতার নিকট হইতে দেহলাভ করিয়া বিভিন্ন দেহবাসী হন। স্বাধীন ভাবে সাধনা দ্বারা সন্তান সেই দেহের এতদূর উন্নতি করিতে পারে যে মাতা পিতার দেহ সেই দেহের সহিত উপমিতই হইতে পারে না। আমাদের এক ব্যক্তির সম্বন্ধে জানা আছে। বাল্যকালে অন্য সাধারণের ন্যায় তাহার শরীর ছিল। কিন্তু যৌবনে সাধনা দ্বারা তিনি দেহের এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার সাহস এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে তিনি ব্যাঘ্র ধরিতে গিয়াছিলেন এবং উহার সহিত সংগ্রামে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তির দেহ তাহার মাতা পিতার দেহ হইতে বহুগুণে বলিষ্ঠ, দ্রঢিষ্ঠ এবং সুস্থ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ পালোয়ানদিগের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে উক্তরূপ অবস্থাই আমরা জানিতে পারিব। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা তাহারা মাতা পিতার শরীর

হইতেও বহু গুণে বলশালী হইয়াছিলেন। সন্তান দেহ যেমন মাতা পিতার দেহ হইতে পৃথক্, জীবাত্মা যদি সেইরূপ পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌কৃত অংশই হন এবং যদি তিনি স্বাধীন ভাবে সাধনা দ্বারা অনন্ত গুণের অনন্তত্ব লাভ করেন, তবে তিনি ব্রহ্ম হইতে উন্নততর না হউন্, সমভাবে অবশ্যই অবস্থিতি করিতে পারিবেন। যদি বহু জীবাত্মা এইরূপে ব্রহ্মের সমতুল্য হন, তবে বহু ব্রহ্ম হইলেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে "পরম পিতার ইচ্ছায় যখন সকলই হইতে পারে তখন জীবাত্মা খণ্ডীকৃত অংশ হইলেও তাঁহার ইচ্ছায় জীবাত্মার খণ্ডীকৃত গুণরাশির অন্তর্গত থাকিয়া অনন্ত উন্নতিও হইতে পারে"। ইহার উত্তরে প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে। এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ—দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পরমপিতার ইচ্ছায় সকল হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণমন করিবার একটী যুক্তিযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। দর্শন এবং বিজ্ঞানের কার্য্যই এই যে, সেই সত্য প্রণালী আবিষ্কার (Discovery but not invention) করিয়া জগতে প্রচার করা। পরম পিতার কার্য্য কখনও খেয়ালের বশে সম্পাদিত হয় না। অর্থাৎ তিনি কখনও নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া যখন যাহা খুসী, তখন তাহা করেন না—পূর্ব্বাপর কার্য্যের কোনও মিল থাকে না। যখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মীমাংসায় পৌছিতে যুক্তিযুক্ত বাধা জন্মে, তখনই যদি পরমপিতার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বলিয়া সকল সমস্যার সমাধান করা হইত, তবে দর্শন ও বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইত না। যে সকল সমস্যার প্রথমতঃ সমাধান হয় নাই এবং উক্ত ভাবে কোনও রূপ অর্দ্ধ মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু পরে যখন উহার সত্য মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তখন দেখা গিয়াছে যে পরমপিতার ইচ্ছা প্রণালী বহির্ভূত ভাবে সে সকল কার্য্য করেন নাই। যুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া স্বকপোল-

কল্পিত মীমাংসার সমর্থনে যদি কেহ বলেন যে পরমপিতার ইচ্ছায় ইহা হইতে পারে, তবে যে সেইরূপ যুক্তি বিচার গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় সুধী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদের মতে আধ্যাত্মিক গুণ রাশির বিভাগরূপ অস্বাভাবিক কল্পনার প্রয়োজন হয় না অথবা জীবাত্মার গুণরাশির অনন্ত উন্নতির বাধা সৃষ্ট হয় না। দার্শনিক আলোচনায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বহু কল্পনা দূষণীয়। অল্পতম কল্পনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে তাহাই গ্রহণীয়। এখন এই সূত্র ধরিয়া প্রোক্ত বিরুদ্ধ মত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাতে নিম্নলিখিত কল্পনা অনিবার্য্য। (১) পরমাত্মা দেহাবচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা নিজের মধ্যেই অথবা পৃথক্‌ভাবে ভাবী জীবাত্মাকে অংশ ভাবে প্রস্তুত করেন। (২) উক্ত ভাব সম্পন্ন ভাবী জীবাত্মাতে অর্থাৎ উক্ত প্রকার অংশ সমূহে তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা একটী গুণ অধিক পরিমাণে ও অন্যান্য গুণরাশি অল্প পরিমাণে সংস্থাপন করিতে হয়, কিন্তু গুণ সমষ্টিতে সকলকে সমান রাখেন। অর্থাৎ তাঁহারই গুণরাশির নানারূপ বিভাগ করা হয়—খণ্ড খণ্ড করা হয়। অর্থাৎ নিজেই অনন্ত খণ্ডে খণ্ডিত হন। (৩) পরম পিতা ভাবী জীবাত্মার দেহ উক্ত গুণানুযায়ী সৃষ্টি করেন। (৪) পরমপিতার ইচ্ছায় উক্তরূপ ভাবী জীবাত্মা ও দেহের সংযোগ হয়। (৫) যদি আত্মাতে গুণরাশি অল্প পরিমাণে প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ কাহাকেও কোন গুণই পূর্ণ পরিমাণে না দেওয়া হয়, তবে সাধকগণ কিরূপে সাধনা দ্বারা গুণের অনন্ত উন্নতি লাভ করিবেন? যাহা মূলতঃ নাই, তাহা জীবাত্মা কিরূপে লাভ করিবে? সুতরাং প্রোক্ত মতবাদিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলিবেন যে পরমপিতা প্রত্যেক গুণই অল্প পরিমাণে দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এমন বিধান করিয়াছেন যে সেই সকল গুণের অনন্ত উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

এখন প্রোক্ত সূত্রানুসারে আমাদের মত সমালোচনা করিলে কি দাড়ায়, তাহা দেখা যাউক্। আমাদের মত নিম্নলিখিত ভাবত্রয় মাত্র

দ্বারা গঠিত। (১) পরমপিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বয়ং অখণ্ড থাকিয়াও তাঁহারই নিজ ইচ্ছায় তাঁহারই অব্যক্ত গুণ হইতে উৎপন্ন দেহ দ্বারা যেন অবচ্ছিন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অখণ্ড থাকিয়াও দেহযোগে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। (২) দেহগুলি তাঁহার ইচ্ছায় এমন ভাবে সৃষ্ট হয় যে কোন কোন দেহে কোন কোন গুণ অধিক পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ থাকিবে, কিন্তু অন্যান্য গুণ প্রথমতঃ তাদৃশভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ থাকিবে না, গুণ সমষ্টিতে সকলেই সমান থাকিবে! অর্থাৎ আত্মা যেমন তেমনি থাকিবেন, কেবল দেহাবরণের তারতম্যের জন্য গুণরাশির বিকাশের তারতম্য হইবে। (৩) দেহজাত আবরণ উন্মোচন দ্বারাই গুণের অনন্ত উন্নতি লাভ হইবে, অর্থাৎ আত্মার অনন্ত গুণরাশির অনন্ত ভাবের বিকাশ সাধিত হইবে।

উপরোক্ত সূত্রাবলম্বনে যে আলোচনা করা গেল, তাহাতে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত মত সত্য নহে, বিশেষতঃ বিরুদ্ধবাদীর কল্পনার ফলে নিম্নলিখিত অসম্ভব অবস্থা উৎপন্ন হয়। যথা:—"(১) অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ডীকরণ, (২) আধ্যাত্মিক গুণের খণ্ডীকরণ, (৩) অনন্ত ব্রহ্মের সীমাবদ্ধতা, (৪) জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির অসম্ভাবনা।" এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের মত ইতি পূর্ব্বে ও ইতঃপর প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে। সুতরাং উহাদিগকে কল্পনা বলা অসঙ্গত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে পরমাত্মা যখন দেহ দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারেন না বলা হইল, তথাপি আমরা কেন জীবাত্মা সম্বন্ধে "দেহাবচ্ছিন্ন পরমাত্মা" অথবা "পরমেশ্বরের অংশ" বা ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেছি। ইহার উত্তর বুঝিতে ৫৪৭-৫৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠক দেখিবেন। তাহাতে লিখিত আছে যে জীবাত্মা সকল এক অন্য হইতে অথবা পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত নহেন, কিন্তু বিচ্যুত ভাবে ভাসমান মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা এক ও অখণ্ড কিন্তু যেন পৃথক্। এই ভাব কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে, তাহা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে লিখিত হইবে। অর্থাৎ দেহ (জড়) পরম পিতার

অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে উৎপন্ন বলিয়া উৎপাদকের শক্তি লাভ করিয়াছে ও সেই জন্যই জীবাত্মার অধিবাসের উপযোগী হইয়াছে। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ পাঠক দেখিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে দেহ পরমাত্মার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জীবাত্মার আবরণ হইতে এবং বাধক ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পরমপিতার ইচ্ছাই উক্তরূপ সংযোগ ও আবরণের কারণ। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি জড় জগৎ তথা দেহ এমন ভাবে রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে জীবাত্মা আবৃত অবস্থায় থাকিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র অংশ ভাবে প্রকাশিত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ আবরণ উন্মোচন করিতে থাকিবেন। ইহাতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা সম্ভব হইবে। জীবাত্মাকে যে পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে পরমাত্মা দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ভাবে ভাসমান। নানাবিধ দেহে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার গুণরাশির পরিমাণ অত্যল্প প্রকাশিত থাকে, কিন্তু কোনও একটী গুণ অধিকতর ভাবে বিকশিত থাকে। ইহা যে দেহের নানাবিধ রচনার ফল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছি। অর্থাৎ দেহবদ্ধতা জন্য পরমাত্মাই অংশ ভাবে ভাসমান অর্থাৎ দেহরূপ আবরণ দ্বারাই পরমপিতা তাঁহার গুণরাশিকে যেন সীমাবদ্ধ করিয়া নিজেকেই অংশ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। দেহ না থাকিলে আমাদের কোনই বাধা থাকে না, অংশত্বও থাকে না। কারণ, ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি। জীবাত্মা যেন অসংখ্য পরদা দ্বারা বেষ্টিত। পরম পিতার এক একটী গুণে সাধক একত্ব লাভ করেন ও তাঁহার এক একটী পরদা খসিয়া পড়ে। জীবাত্মা ক্রমশঃ পরম পিতার কৃপা লাভ করিয়া আবরণ রাশি হইতে মুক্ত হইতে থাকেন। এই সাধনা চিরকাল চলে বলিয়াই জীবাত্মা অনন্তপ্রায় কালেও স্বপ্রযত্নে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি স্ব স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে গমন করিতে পারেন না। কিন্তু ক্রমশঃই পরদাগুলি খসিয়া যাওয়ায়

সাধক পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হন। অবশেষে মহাপ্রলয়কালে অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় তিনি ত্রিবিধ দেহের বিগমে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। অতএব দেখা গেল যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা বটেন, কিন্তু কার্য্যতঃ (for all practical purposes) তাঁহার অংশ ভাবে ভাসমান। স্থূল, জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে স্বরূপে পরমাত্মাই কিন্তু বাস্তবে তিনি ব্রহ্মের ক্ষুদ্র অংশ ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ অসংখ্য আবরণে আবৃত বলিয়া পরমাত্মাই যেন সসীমত্ব, ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত। এই জন্যই জীবাত্মা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং তিনি পরমাত্মার অংশ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা। অর্থাৎ স্বরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভেদ, কিন্তু বাস্তবে ভেদ। ইহাই সত্যদর্শনের ভেদাভেদ তত্ত্ব। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। পরব্রহ্ম দেশ কালের অতীত, সুতরাং তাঁহাকে জড় পদার্থের ন্যায় চিন্তা করিয়া "তাঁহার অংশ" বলা উচিত হয় না বটে, কিন্তু পৃথিবীর ভাষার অসম্পূর্ণতাবশতঃ ও জীবাত্মাদিগের বাস্তব অবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে বিশেষ ত্রুটী হয় না। অর্থাৎ তিনি নিজেই বহুভাবে সুতরাং অংশভাবে ভাসমান মাত্র. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বহু হন নাই, সুতরাং তাঁহার অংশও হয় নাই। জীবাত্মার বাস্তব অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে "পরমাত্মার অংশ" ভিন্ন প্রকৃত ভাবে প্রকাশক অন্য কোন উৎকৃষ্টতর শব্দ নাই। দার্শনিক বিচার বাদ দিলে ও আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদবান্ ব্যক্তি-দিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, এবং আমাদের বাস্তব অবস্থা চিন্তা করিলে আমরা কতজন নিজদিগকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াও পরিচয় দিতে পারি, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। স্থূল, আমরা যদি জীবাত্মাকে অংশীভূত পরমাত্মা (অংশীভূত অর্থাৎ অভূত তদ্ভাবার্থে চ্চি অর্থাৎ যাঁহা অংশ ছিল না, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি নিজে দেহাবদ্ধ হইয়া অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন।) বলিয়া মনে করি, তবে সকল জটিল সমস্যার সুমীমাংসা হয়। তিনি এক, অদ্বিতীয়

ও অখণ্ড। তিনি সংকল্প করিলেন যে তিনি প্রেম গুণ প্রভাবে বহু হইবেন অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান হইবেন এবং তাহাই হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই নয় যে তিনি নিজেকে বহু প্রকার বহু খণ্ড খণ্ড করিয়া বহু হইয়াছেন। কারণ, অখণ্ডের খণ্ড হইতে পারে না—তাঁহার নিত্য স্বভাব তিনি পরিবর্ত্তন করিবেন কিরূপে? অতএব যে স্থানেই "পরমাত্মার অংশ" "ব্রহ্মের অংশ", "পরমেশ্বরের অংশ" বলা হইয়াছে, সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে যে পরমাত্মাই নিজ ইচ্ছায় দেহবদ্ধ হইয়া অংশভাবে ভাসমান মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই। আত্মা কখনও এক বই বহু নহেন এবং হইতেও পারেন না। পরমাত্মা অণুতেও পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার অংশ ভাবে ভাসমান জীবাত্মা মাত্রই পূর্ণ। পরমর্ষি গুরুনাথ একাগ্রতার শক্তি বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—'একাগ্রতার শক্তি বশতঃ অণুর মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে অণু উপলব্ধি করা যাইতে পারে।" (সত্যধর্ম্ম)। শ্রুতি আত্মাকে "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়াছেন। আত্মা সম্বন্ধে এক অর্থে অণু শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আত্মা এক এবং নিত্যই অনন্তময়ত্বে পরিপূর্ণ। পরমাত্মাকে স্থান বিশেষে বর্ত্তমান বলিয়া চিন্তা করিতে যাইয়াই অণুত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই জন্যই তাঁহাকে "এই স্থানে তুমি," "ঐ স্থানে তুমি," "নিকটে তুমি," "দূরদূরান্তরে তুমি" বলা হয়। কিন্তু তিনি ত দেশকালে আবদ্ধ নহেন। তিনি দেশে কালে থাকিয়াও উহাদের অতীত ও অখণ্ড সুতরাং তিনি সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালেই অনন্ত ও পূর্ণ হইয়া আছেন। জীবাত্মাকে যে অর্থে স্বরূপতঃ পূর্ণ বলিয়াও অণু পরিমাণ বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করি। কোন মানব যদি নিজ গৃহে বসিয়া পরম পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—"হে করুণাময় পিতঃ! হে অনন্ত দয়াময় বিভো! তুমি এই গৃহে আছ, তুমি আমার সকল কথাই শুনিতেছ ও আমার নিকটে থাকিয়া আমার সকল দুর্দ্দশা দেখিতেছ। তুমি নিজ করুণাগুণে এখন আমাকে পরিত্রাণ কর," তবে পরব্রহ্ম

কেবল গৃহেই অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার নিজ সন্তানের এই ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিবেন, তাহা নহে; কিন্তু এই কথাই সত্য যে, যিনি পরব্রহ্ম, যিনি নিত্যই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে পরিপূর্ণ এবং যাঁহাকে দেশ কাল দ্বারা ব্যবচ্ছেদ করা যায় না, যিনি নিত্যই দেশ কালের অতীত, তিনি প্রার্থী সন্তানের ব্যাকুল প্রার্থনা গৃহে থাকিয়াও শুনিতেছেন ও একই কালে তাঁহার (সন্তানের) হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া, অনন্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র থাকিয়া এবং বিশ্বের অতীত অনন্তে বর্ত্তমান থাকিয়াও শুনিতেছেন। গৃহের প্রাচীর তাঁহাকে খণ্ড করিতে পারে নাই। জীবাত্মা সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। দেহ দ্বারা পরমাত্মা খণ্ডিত হন নাই। সুতরাং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণ, কিন্তু পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার নিজের একটী স্বরূপ হইতে উৎপন্ন জড়যোগে নির্ম্মিত দেহ দ্বারা তিনি জীবাত্মাকে এমনিভাবে আবরণ করিয়াছেন যে তিনি (জীবাত্মা) তাঁহার সত্য-স্বরূপ ভুলিয়া আছেন এবং প্রথমতঃ তিনি এমনি অবস্থাপন্ন হন যে তাঁহার অনন্ত গুণ আবরণের আধিক্যবশতঃ বীজাকার প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও তিনি (জীবাত্মা) পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান মাত্র। এই জন্যই বিশিষ্ট দার্শনিকগণ ও পরমোন্নত সাধকগণ জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ অথবা অণু পরিমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সকল শব্দ সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ব্যবহারের জন্যই। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মা অখণ্ড, সুতরাং তাঁহার অংশ হইতে পারে না, কিন্তু এখন বলা হইল যে তাঁহারই নিজ ইচ্ছায় তিনিই দেহাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যিনি অনন্ত ও অখণ্ড, তিনি কেন এবং কি প্রকারে আবার সীমাবদ্ধ হইবেন? প্রশ্ন কর্ত্তার দ্বিতীয় প্রশ্নের (অর্থাৎ তিনি কি প্রকারে সীমাবদ্ধ হইলেন, ইহার) উত্তর "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশদ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ও ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান অংশে এবং "সৃষ্টির সূচনা" এবং "লীলাতত্ত্ব" অংশত্রয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপিও বিষয়টী

জটিল বলিয়া উহাকে যতদূর সরল করা যায়, ততই ভাল মনে করি। তাই আরও বিস্তারিতরূপে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর নিকট বিষয়টীকে সরল ও সহজ করিবার চেষ্টা করিতেছি। পাঠক বিবেচনা করিবেন যে তাহাতে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা। যদি কোন মানব তাহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য অন্য ব্যক্তি বা বাহিরের কোনও পদার্থের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজ দেহের কোন অঙ্গের কার্য্য সাময়িক ভাবে কিন্তু অত্যন্তভাবে সংযত করিয়া রাখেন এবং তিনি যখন উপযুক্ত মনে করেন, তখন সেই অঙ্গকে যথোপযুক্ত ভাবে ক্রমশঃ কার্য্য করিতে দেন, তবে তাহার পক্ষে তাহা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারের মধ্যে পরিণত হইল, একথা বলা চলে না, অথবা সেই জন্য তাহাকে দোষীও সাব্যস্ত করা যায় না। বরং এইরূপ কার্য্য বিরল নহে। পরম পিতাও প্রেমলীলারূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিজের একতম স্বরূপ হইতে নিজ ইচ্ছা দ্বারা উৎপন্ন জড় দেহ সংযোগে যদি তিনি নিজে নিজেকে বহু ভাবে সুতরাং সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান করিয়া থাকেন, তবে সেই কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হয় নাই ও তাহাতে তাঁহার অখণ্ডত্বও বাধিত হয় নাই। আবার ব্রহ্ম যদি সেই একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিজেকে বহুভাবে ও সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান করিয়া থাকেন ও ক্রমশ: আমাদিগকে অধিক হইতে অধিকতর স্বাধীনতা দিবার বিধান করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে সৃষ্টি ব্যাপার পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা। পরীক্ষার অর্থই বাধা অতিক্রম করা। পূর্ণের পক্ষে পরীক্ষা অসম্ভব। তাই তিনি জড় জগৎ ও তদুৎপন্ন দেহ দ্বারা বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি স্বয়ং সেই দেহ যোগে সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, কিন্তু সীমাবদ্ধ হন নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে জগদুৎপত্তির জন্য সেই স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই সুতরাং ব্রহ্মেরও বিকার হয় নাই। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে

আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মের দেহাবদ্ধতার জন্য তাঁহার সীমাবদ্ধতা হয় নাই। অর্থা' সৃষ্টির কোন ব্যাপারই তাঁহার বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং সৃষ্টিসংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই তাঁহার কোনই ত্রুটী হয় নাই। Hurdles' Race এ দেখা যায় যে একটী বাধা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই অন্য একটী বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমাদের সমগ্র জীবন যেন একটী অফুরন্ত Hurdles' Race. অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে হইলে সেই অসংখ্য বাধা সকলেরই অতিক্রম করিতে হইবে। অতএব তিনি যদি তাঁহার স্বস্বরূপোৎপন্ন দেহ দ্বারা সেই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুযায়ীই হইয়াছে সন্দেহ নাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে ব্রহ্ম স্বীয় প্রেমময়ী ইচ্ছায় বাধ্যবাধকতা শূন্য হইয়া অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে স্বকীয় স্বরূপ বিশেষের অবলম্বনে জড় জগৎ ও তথা জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তিনিই একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সুতরাং এই কার্য্য তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে, অসম্ভবও নহে। ৫৩৪-৫৩৫পৃঃ উদ্ধৃত অংশে লিখিত দ্বিতীয় উপমাটীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইহাতে দেখা যাইবে যে পৃথিবীই সত্য, কিন্তু দেশগুলির সীমা নানা-ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে। সুতরাং তাহা সাময়িক কিন্তু নিত্য স্থায়ী নহে। সেইরূপ পরমপিতা পরমব্রহ্ম একমাত্র নিত্য সত্য পুরুষ. কিন্তু জীবাত্মার সীমা-নির্দ্দেশ-কারক দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে ও উহার নিত্য অস্তিত্ব নাই। পরমপিতা তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করিয়াছেন ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিজের একটী মাত্র স্বরূপ হইতে উৎপন্ন জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত দেহের অর্থাৎ সীমা নির্দ্দেশক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার যখন তাঁহার জীইর্ষা হইবে, তখন তিনি দেহের অর্থাৎ সীমা-রেখার লয় সাধন করিবেন, এবং মহাপ্রলয়ান্তে তিনি একাই থাকিবেন অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমানত্বের শেষ হইবে। ইতি মধ্যে স্থূলদেহের

লয়ে সূক্ষ্মদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের লয়ে কারণ দেহ ইত্যাদি নানাপ্রকারে তিনি সীমার বন্ধন কাটিতেছেন। অর্থাৎ জীবাত্মা ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতররূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন ও পরব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, অথবা অত্যুন্নত জীবাত্মাগণ তাঁহাতে গাঢ় হইতে গাঢ়তর মিলনে মিলিত হইতেছেন। অতএব দেখা গেল যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মার সহিত এক হইলেও তিনি দেহাবস্থিত থাকাকালীন অংশ মাত্র ভাবে ভাসমান এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তাঁহার স্বস্বরূপে সম্পূর্ণরূপে গমন অসম্ভব। সুতরাং ভেদাভেদ তত্ত্বই সত্য। ভেদাভেদ তত্ত্ব সত্য বলায় বুঝিতে হইবে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান। দেহই সেই ভেদের কারণ। কোন দর্শন বিশেষের মত এই উক্তি দ্বারা লক্ষ্য করা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল, তাহাতে ইহা বিশদ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে আত্মাতে গুণের বিভাগ হইতে পারে না। আত্মা যাহা, তাহাই আছেন ও নিত্য থাকিবেন। দেহের তারতম্য অনুসারে গুণ বিকাশের তারতম্য হয় মাত্র। দেহই আমাদের ভেদের কারণ। দেহের জন্যই আমাদের পূর্ব্ব পরম চৈতন্যাবস্থা লাভ করিতে পারি না। দেহই আবরণ এবং ত্রিবিধ দেহের সম্পূর্ণ বিগমে আমাদের পূর্ণামুক্তি। "Spirit is willing but flesh is weak".

"করুণ মধুর আহ্বান তোমার ভাঙ্গিয়া দিতেছে স্বপন,
সম্মুখেতে পথ যেতে মনোরথ, বাঁধা যে রয়েছে চরণ।
কবে বন্ধন করিবে মোচন,
ওহে মুক্ত মহান্ ভয় খণ্ডন !
বদ্ধ হৃদয় করগো মুক্ত, কাটিয়া মোহের বন্ধন,
আমি গিয়া অবাধে, তোমারি পদে.
সঁপে দি আমার জীবন।" (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী)
"মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণ ভরে একবার দেখিহে তোমায়" (ব্রহ্মসঙ্গীত)।

উপরোক্ত উক্তি সমূহ ও তদনুরূপ শত সহস্র উক্তিতে আমাদিগকে

সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে দেহই আমাদের বন্ধনের কারণ। উদ্ধার, পরিত্রাণ, মুক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি শব্দও পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে যে আমাদের স্বভাবই জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি, কিন্তু আমরা অসংখ্য আবরণে আবৃত বলিয়া পূর্ব্ব পরম চৈতন্য অবস্থা হইতে বঞ্চিত, সেই আবরণ রাশি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা সেই চির বাঞ্ছনীয়া অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হই। অসংখ্য দেহই সেই আবরণ। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং পরেও বলা হইবে যে সর্ব্বপ্রকার সকল দেহ হইতে মুক্তিই পূর্ণামুক্তি। নিম্নোদ্ধৃত অংশেও দেখা যায় যে আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। মোহাচ্ছন্ন বলিয়া আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। সুতরাং আত্মা যেমন, তেমনি থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার গুণের অল্পাধিক্য হয় না। দেহই এবং দেহজাত দোষ পাশ রাশিই আমাদের স্বরূপ অবস্থা লাভের পরিপন্থী। মোহ জাত গুণ। আত্মার মোহ নাই। দেহের সহিত আত্মার সংযোগের পর মোহ জন্মে। ("ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দেহজাত আবরণ সমূহ উন্মোচন করিতে পারিলেই আমরা স্ব-স্বরূপে গমন করিতে পারি। আবরণ যতদূর উন্মুক্ত হইবে, আমাদের স্বরূপ ততদূর বিকশিত হইবে। আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্ব-স্বরূপে গমন করিতে পারিব। "আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বিদ্যমান আছে। যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যতেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বিদ্যমান থাকিলেও জড়াত্ম-বোধ-নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখলাভের উৎকৃষ্ট উপায়" তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)। এস্থলে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের যে মত, তাহা Mr. Hiriyana M. A মহাশয়ের Outlines of Indian Philosophy গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "Since Moksa, according to Sankara, is not a state to be newly

attained, but is the very nature of the Self, we can hardly speak of a means in its ordinary sense for achieving it. It is realising what has always been own's own innate character, but happens for the time being to be forgotten. The Upanishadic statement is "that thou art, not, that thou becomest". The common illustration given here is that a prince, brought up as a hunter from infancy, discovering afterwards that he is of royal blood. It involves no becoming, for he has always been a prince and all that he has to do is to feel or realise that he is one We might illustrate the point equally well by referring to the distinction between a solar and a lunar eclipse. In the latter the light of the sun is actually cut off from the moon by the Earth coming between it and the sun, so that the passing off of the eclipse signifies a real change in the condition of the moon, viz, the part that was enveloped in darkness becomes lit. In the solar eclipse on the other hand, the luminary continues to be during the eclipse exactly as it was before or will be afterwards. It only appears to be eclipsed because the intervening moon prevents it from being seen as it really is. The reemergence of the bright sun accordingly means no change whatsocver in it, but only a moving futher away of the moon or the removal of the obstacle preventing the sun from showing itself as it is. Similarly

in the case of Addaitic Moksa, all that is needed is the removal of the obstacle that keep the truth concealed from us and the discipline that is prescribed is solely with a view to bringing about this result. It is therefore in a negative and indirect sense that we can talk of attaining moksa here. Empirical life being entirely the consequence of an Adyasa, the obstacle is Ajnana and it is removed through its contrary Jnana. The Jnana that is capable of effecting it should be for the reasons mentioned more than once before, direct or intuitive (Sakshatkara); and it should refer to one's own identity with Brahma, for it is the forgetting of this identity that constitutes Sansara. Such knowledge is the sole means of liberation"

বঙ্গানুবাদ ঃ—"শঙ্করের মতে যখন মোক্ষ আত্মারই স্বভাব ও তাহা অর্জ্জন করিতে হয় না, তখন তাহা লাভ করিবার জন্য সাধারণভাবে যাহাকে উপায় বলে, তাহার কথা আমরা বলিতে পারি না। যাহা আমাদের সত্য স্বভাব, কিন্তু সাময়িকভাবে বিস্মৃত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের মোক্ষ। উপনিষদের উক্তি তত্ত্বমসি, কিন্তু "তুমি তিনি হইবে" নহে। প্রচলিত দৃষ্টান্ত এই যে একজন রাজপুত্র শিশুকালাবধি শিকারী ভাবে পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি রাজবংশের। ইহাতে কিছু হইবার দরকার হইল না। কারণ, তিনি সর্ব্বদাই রাজপুত্র ছিলেন ও তাহার এই মাত্র বুঝিতে হইল যে তিনি রাজপুত্রই। সূর্য্যগ্রহণে ও চন্দ্রগ্রহণের পার্থক্য দ্বারাও এই ভাবটী প্রকাশ করা যায়। চন্দ্রগ্রহণে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া সূর্য্যের আলোক বন্ধ করিয়া দেয়।

সুতরাং গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই চন্দ্রের মধ্যে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। যথা -- চন্দ্রের যে অংশ অন্ধকারাবৃত ছিল, তাহা আবার আলোকিত হইল। অপর পক্ষে সূর্য্য যেমন সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে আলোকিত থাকে, গ্রহণের সময়েও সেইরূপ আলোকিত থাকে, চন্দ্র মাঝখানে আসে বলিয়া আমরা সূর্য্যকে অন্ধকারাবৃত দেখি ও উহার স্বরূপ অবস্থা দেখিতে পাই না। সূর্য্য গ্রহণের শেষে যখন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে কোনই পরিবর্ত্তন দেখি না, কিন্তু চন্দ্র দূরে সরিয়া যায়, অথবা সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার প্রকৃতপক্ষে যাহা বাধা, তাহা দূরীভূত হইল। সেইরূপ অদ্বৈতবাদিদের মতে মোক্ষলাভ করিতে হইলে সত্য যাহা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই সকল বাধা দূরীকরণই কেবল আবশ্যক, এবং যাহাতে সেই ফল লাভ করা যায়, সেই সাধনারই বিধান আছে। সুতরাং এখানে মোক্ষ লাভের কথা গৌণ ভাবেই বলিতে পারা যায়। ব্যবহারিক জীবন অধ্যাসের ফল বলিয়া অজ্ঞানই আমাদের বাধা এবং উহার বিপরীত জ্ঞান দ্বারাই সেই বাধা দূর করিতে হইবে। যে জ্ঞান সেই বাধা দূর করিতে সমর্থ, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান হওয়া উচিত এবং সে নিজেকে ব্রহ্মের সহিত একজ্ঞান করিবে। কারণ, সেই তত্ত্ব ভুল করাই সংসার। সেই জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।”

উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অদ্বৈত বৈদান্তিকের যে মত, তাহাতেও ইহা বলিতেছে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ জ্ঞানময়, সত্যময়, প্রেমময় ইত্যাদি, কিন্তু অজ্ঞান তাহা বুঝিতে দেয় না। অজ্ঞান অপসৃত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এ অজ্ঞান যে আত্মার দেহ সংসর্গে বাস, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এবং ‘ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী’ অংশে আরও বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত হইবে। এই অংশে “মায়াবাদ” অংশও দ্রষ্টব্য। মহামনা স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত উক্তিদ্বয় হইতেও আমরা পাই যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা এবং সাধনা এবং উপাসনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইবে। “Religion

is the manifestation of the Infinite already in man." (মানুষের মধ্যস্থিত অনন্তের বিকাশই ধর্ম্ম)। "Education is the manifestation of the perfection already in man." (মানুষে পূর্ণতা বর্ত্তমান। উহার বিকাশই শিক্ষা)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্ঞানময়ত্ব হারাইয়া ফেলে। সুতরাং দেহই অজ্ঞানের কারণ। মায়াবাদ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে যে অজ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা দেহ-সংসর্গ-জাত। কারণ, পরমাত্মার জীবত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে কোনরূপ অজ্ঞান ছিল না। দেহ ধারণ করিলেই যখন অজ্ঞান আসিল, তখন দেহ ভিন্ন অন্য কিছু উহার (অজ্ঞানের) কারণ হইতেই পারে না। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভাব যাহা লিখিত হইল, তাহাতে এবং নির্ব্বিশেষে অদ্বৈতবাদের "সোঽহং জ্ঞানের" বিশেষ কি পার্থক্য রহিল? ইহার উত্তর সোঽহং জ্ঞান অংশে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে সেই বিষয়ের আলোচনা করিলে পুনরুক্তি দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। পাঠক উক্ত অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও তিনি কখনই সোঽহং জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনন্ত উন্নতি হইতে থাকিবে বটে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মে লয়ের অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে চিরকালই ভেদ ও অভেদ বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভেদের কারণ দেহ, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমরা দেহধারী থাকিব, সেই দেহ স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক অথবা কারণ-দেহই হউক, ততকালই আমরা অল্পাধিক অপূর্ণ থাকিব। উক্ত অংশে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন এবং মহাভারত আমাদের মতই সমর্থন করেন। অতএব উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ব্রহ্ম তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা যোগে

বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই স্বরূপ বিশেষের পরিণামে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন জড় দেহ দ্বারা তিনি বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি নিত্যই এক, অখণ্ড, নির্ব্বিকার ও অনন্ত আছেন। সুতরাং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা, কিন্তু দেহাবদ্ধাবস্থায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান মাত্র। যে পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই ক্ষুদ্রতা বর্ত্তমান থাকিবে। তিনি ত্রিবিধ দেহের বিগমে মাত্র পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন, ইহার পূর্ব্বে নহে। এই ত্রিবিধ দেহ হইতে সম্পূর্ণা মুক্তি লাভ করিতে জীবের অনন্ত প্রায় কাল আবশ্যক হইবে। আমরা আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহ আত্মার অনন্ত গুণকে আবরণ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। পরম পিতার ইচ্ছায় সেই দেহেরই নানাবিধ রচনায় উঁহাদের (আত্মার গুণরাশির) অল্পাধিক বিকাশ সম্ভব হইতে পারে, ও হইয়াছে। গুণ বিকাশের তারতম্য জন্য আত্মায় কোনই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহই আমাদের বাধা ও ত্রিবিধ দেহের বিগমে আমাদের পূর্ণামুক্তি। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে দেহ দ্বারা আমাদের বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই বাধার বাধকত্ব দূরীকরণের উপায় কি। কেবল অভাবাত্মক (Negative) সাধনা দ্বারা অর্থাৎ কামে লিপ্ত হইব না, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইব না, লোভ পরবশ হইব না, অহংকারে উন্মত্ত হইব না, মোহে অন্ধ হইব না ইত্যাদিরূপে চেষ্টা দ্বারাই কি আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারিব? ইহার উত্তরে অতি সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে কেবল ঐরূপ সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভের আশা নাই। ধর্ম্মপথে চলিতে ও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য পরমপিতার উপাসনা, ধ্যান ধারণা এবং গুণ সাধন সর্ব্বপ্রধান ভাবে অবলম্বনীয়। রিপুকুল অবশ্যই দমনে রাখিতে হইবে, কিন্তু গুণরাশির সবিশেষ উন্নতি ব্যতীত উহাদের (দোষপাশগুলির অর্থাৎ জাত গুণরাশির) লয় সাধন সম্ভব হয় না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে রিপু দমন ও লয়ে অত্যধিক প্রভেদ রিপু

দমনে আধ্যাত্মিক জগতে অত্যল্প পথই অগ্রসর হওয়া যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের উন্নতি অনন্ত, সুতরাং সাধনাও অনন্ত এবং চলিবার পথও অনন্তপ্রায়। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে বিশ্বে অসংখ্য মণ্ডল আমাদের অধিবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের রজস্তমঃ গুণের অতীত হইলেই হইবে না, সত্ত্ব গুণেরও অতীত হইতে হইবে। সুতরাং দুই চারি দশ দিনে পুটপাট করিয়া আমাদের সাধনা শেষ করিতে পারিব না। পথ সুদীর্ঘ এবং সাধনাও সুকঠিন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক গুণ সরল, মিশ্র ও জাত ভেদে তিন প্রকার। ইহাও বলা হইয়াছে যে জাত গুণ রাশিকে দোষই বলা হয়। গুণ বলিলে উহাদিগকে সাধারণতঃ বুঝায় না। সরল ও মিশ্র গুণরাশি উৎকৃষ্ট এবং জাত গুণরাশি নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট গুণের উন্নতি হইলেই নিকৃষ্ট আপনা আপনি লয় প্রাপ্ত হয়। আমরা জাত গুণরাশির আপাত মধুর রসে মুগ্ধ হইয়া তাহা হইতে মধুরতর যে কিছু আছে, তাহার অনুসন্ধান করি না। কিন্তু যখন উৎকৃষ্ট গুণ সাধিত হয় ও উহার অপূর্ব্ব মধুর ও চিরস্থায়ী ঘনরস আমরা আস্বাদন করিতে থাকি এবং সেই জন্য ঘনীভূত আনন্দ লাভ করি, তখন পূর্ব্বোক্ত রস আমাদের অবহেলার বস্তু হয়। উৎকৃষ্ট লাভ হইলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই অপকৃষ্ট ত্যাগ করি। অতএব উপাসনা ও সাধনা দ্বারা প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, সরলতা, একাগ্রতা, নির্ভরতা প্রভৃতি গুণের সবিশেষ উন্নতি করিতে যত্নবান হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে আমরা সহজেই ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে এবং প্রেমময় প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব ও পরিশেষে মুক্তিলাভে সমর্থ হইব। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর তাঁহার অনন্ত প্রেমের আকর্ষণে তাঁহাদিগকে নিরন্তরই অব্যর্থ সন্ধানে আকর্ষণ করিতেছেন, চুম্বক যেমন অন্য চুম্বককে আকার্ষণ করে, সেইরূপ অনন্তপ্রেমাধার পরমেশ্বর নিত্যই তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আকর্ষণ যেমন চুম্বকের ধর্ম্ম, প্রেমেরও সেইরূপ উহা একটী প্রধান ধর্ম্ম।

উহা অনন্ত প্রেমাধার পরমেশ্বরে অনন্ত পরিমাণেইনিত্য বর্ত্তমান। একটী চুম্বক যদি বিশেষ ভাবে কর্দ্দমে প্রোথিত থাকে, তবে যেমন উহাকে অন্য প্রবল চুম্বকও আকর্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপে আমরা যতকাল দোষ পাশে গভীরভাবে আবৃত থাকি, এবং জড়ের এবং জড় দেহের স্বাভাবিক বাধা আমাদের সাধন ভজন দ্বারা দূর করিতে না পারি, ততকালই আমরা অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হইব না। দেহই সেই কর্দ্দম, উহা যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকিবে, অর্থাৎ উহাতে স্থূলভাব যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, ততই আমাদের বাধা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। এই বিষয়ে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রকাশিত সত্যধর্ম্ম, সত্যামৃত, তত্ত্বজ্ঞান (উপাসনা ও সাধনা খণ্ডদ্বয়) গ্রন্থ সমূহে সত্যধর্ম্মের বিবরণ, ব্রহ্মোপাসনার বিধান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপ, উপাসনা তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পাশ, মুক্তি প্রভৃতি বহু তত্ত্ব, এবং প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, নির্ভরতা, অভেদ জ্ঞান প্রভৃতি গুণ সাধনার ও ষট্‌চক্রভেদ সাধনার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঠক উক্ত গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলেই উপরোক্ত প্রশ্নের সরল ও প্রাঞ্জল মীমাংসা লাভ করিবেন। এস্থলে সাধনার বিষয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তাই সংক্ষেপেও উহার উল্লেখও করিলাম না। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে রিপুগণ দমনে রাখিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তির তাৎপর্য্য এই যে বিশেষ ভাবে গুণোন্নতি না হইলে উহারা লয় প্রাপ্ত হয় না এবং রিপু সকল লয় না হইলে বাঞ্ছিতা উন্নতিও অসম্ভব। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেমাকর্ষণে সকল বাধা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। কারণ, সেই আকর্ষণ অসীম শক্তিশালী, উহা সামান্য চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় নহে। সেই অব্যর্থ আকর্ষণের ফলে প্রত্যেক জীবের জীবনে এমন শুভদিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যেদিন তিনি নিত্য প্রেমময়ের নিত্য প্রেমক্রোড়ে নিত্য বাস করিতে সমর্থ হইবেন। অনন্ত প্রেমময়

পরমপিতার এমনই প্রেমের এমনই অত্যাশর্ষ্য বিধান !!! ধন্য তাঁহার অপরাজেয় প্রেম, যাহা ঘোরতর বিদ্রোহী সন্তানদিগকেও নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন !!! যে প্রেমাকর্ষণের বলবতী শক্তিতে প্রত্যেক জীবকে তাঁহারই অমৃতপূর্ণ প্রেমক্রোড়ে চিরকাল বাসের উপযোগী করিবে !!! ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে আমাদের সাধন ভজনের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণই নিরন্তরই কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের সাধন ভজন দ্বারা বাধা অতিক্রম সহজ ও সুখ দায়ক হয়। "তুমি উন্নত হইতে চেষ্টা কর বা না কর, ঐ যে অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত স্নেহময়, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত ন্যায়পর, অনন্ত অনন্ত অনন্ত-গুণ বিশিষ্ট তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহার অনন্ত গুণে তোমার উন্নতি নিয়তই হইবে, সন্দেহ নাই, যদি তুমি চেষ্টা কর, তাহা হইলে উহা পরম সুধাময়ী হইবে, আর তাহা না করিলে অননুভূত ও দুঃখময়ী হইবে। কারণ, চেষ্টা না করিলে তোমার অনুকূল ক্রমানুসারিণী না হওয়াতেই ঐরূপ হয়। চেষ্টা করা ও না করাতে ইহাই প্রভেদ।"* আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিতে পাইয়াছি যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধাই আমাদের দেহ। দেহ জড় গঠিত, উহা আত্মার বাধাদানে সমর্থ হইবে কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই হৃদয়ে উদয় হয়। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিতও হইয়াছে। এই সমস্যার মীমাংসার জন্যই "জড়ের বাধকত্বের কারণ" নামক প্রবন্ধের অবতারণা। অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত দয়াময় পরমপিতা তাঁহার নিজ গুণে এই কার্য্যে আমার সহায় হউন্ ইহা তাঁহার নিকট আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

ওঁং অনন্ত গুণ নিধানং অনন্ত গুণ বিধানং প্রেমলীলাময়ং ওঁং

* তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

ওঁ

দুষ্পার সংসার পয়োনিধেঃ প্রভো
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি যৎ।
অতীত্য তানি প্রতিকূল ভাবিনা
ময়া প্রয়াতুং কথমদ্য শক্যতে॥
স্রোতোঽনুকূলে গমনে কৃতে পিত
র্যন্নারকাবর্ত্ত গতো জগৎ পতে।
নূনং ভবিষ্যামি জগচ্ছরণ্য, তৎ
ময়া প্রয়াতুং কথমদ্য শক্যতে॥
বলং ত্বমীশাবল মানসস্য মে
প্রযচ্ছ মহ্যং বিজয়ি প্রভো বলম্।
সংসারবার্দ্ধেঃ পরপারদায়কং
ত্রায়স্ব দাসং স্বক মাশু তারক॥ (তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত)

জড়ের বাধকত্বের কারণ

আমরা সকলেই জানি যে আমরা ষড় রিপু যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত এবং অষ্ট পাশ যথা—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি দ্বারা অষ্ট প্রহর আবদ্ধ। এই শত্রুগণ যে সর্ব্বদাই আমাদের অনিষ্ট সাধন করে এবং আত্মোন্নতি লাভে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, ইহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে দেহ যখন জড় পদার্থ মাত্র, তখন তাহা জীবাত্মার, যিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা তাঁহার বাধকরূপে বর্ত্তমান থাকে কেন অথবা দেহ কেন আত্মার আবরণ ও বাধকরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ এই রিপু পাশ কোথায় হইতে আগমন করিল এবং উহাদের বাধকত্বের কারণ কি? ইহা একটী বিষম সমস্যা। এই কঠিন সমস্যার জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে মায়া, বাইবেলে সয়তান এবং

পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্তই মোহের উৎপত্তি ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা প্রধান। Theory of evil সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত বহু আলোচনা করিয়াছেন। সমস্যা জটিলতা পূর্ণ। কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহার সমাধান কতদূর সম্ভব জানিনা, অথচ যুক্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমাদের যুক্তি অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর উহা থামিয়া যায়। "যুক্তি থামিয়া যায়" বলায় ইহা বুঝিতে হইবে না যে অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতার বিধান unscientific বা অযৌক্তিক। পরম-পিতার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান সমূহ সর্ব্বত্রই অত্যন্ত সুযুক্তি-পূর্ণ। পৃথিবীর বিজ্ঞানে বা অন্য কোনও প্রকার অপরা বিদ্যায় পারদর্শিতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যেমন বাল্যকালাবধি যাবৎজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় একান্ত আবশ্যকীয়, নতুবা সুখকোমল দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল নিদ্রা ও অলসতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহ ইচ্ছা মাত্রেই কোন প্রকার বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ পরম পিতার মঙ্গল বিধান ধারণা করিতে জীবন ব্যাপী কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল পুথিগত বিদ্যা সম্বল করিয়া তর্কের অবতারণা দ্বারা সত্য তত্ত্বে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত দয়াময় পরম পিতার দয়ায় দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সকল কঠিন সমস্যার সরল ও প্রাঞ্জল মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন আর অন্ধকার থাকে না, সাধারণে সৃষ্টিতে যে অসামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সাধকের হৃদয়ে তাহা স্থান পায় না। যিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্ঞানময়, তাঁহারই অতুলনীয় জ্ঞান-জ্যোতিঃতে সাধক তখন নিজেকে আলোকিত করিয়া সকল কাঠিন্য ও সংশয়ের অতীত হন। এখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমরা "জীবাত্মা" অংশে দেখিয়াছি যে রিপু, পাশ জাত গুণ এবং উহারা আত্মার দেহ সংসর্গে আগমন জন্য সম্ভব হয়। আত্মাতে কোনরূপ জাত গুণ নাই বা থাকিতেও পারে না। কারণ, আত্মা স্বরূপতঃ

পরমাত্মাই। দেহ যে সম্পূর্ণরূপে জড় দ্বারা গঠিত, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য। ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জড় পরম পিতার কোনও একটী স্বরূপ হইতে অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছা সহযোগে উৎপন্ন। সুতরাং জড়ের কতকগুলি শক্তি সেইরূপ উৎপত্তির জন্যই স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত। জড়ের উৎপত্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্যই তাঁহাব ইচ্ছায় সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং জড় কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও তাঁহার ইচ্ছামাত্রই স্থির হইয়াছিল। কারণ সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার সংকল্প দ্বারা স্থিরীকৃত এবং অবশ্যই তাহা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই বটে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? উহা ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। যে স্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধা। বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তি পরীক্ষিত হইবে।* তাই আমাদের দেহ বাধা রূপে সৃষ্ট হইয়াছে। দেহে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এর পরিমাণের বিভিন্নতার উপর আমাদের দোষ পাশ রাশির বাধকতায় শক্তির অল্পাধিক্য হয়। আবার দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী সত্ত্বাদি গুণের ন্যূনাধিক্য হয়। অর্থাৎ যে দেহ যত সাকার ভাবাপন্ন ভূত দ্বারা গঠিত, সেই দেহে তমোগুণ ততোঽধিক এবং যে দেহ যত সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন ভূত দ্বারা গঠিত, সেই দেহে তত রজঃ বা সত্ত্ব গুণ অধিক। পাঠক মনে রাখিবেন যে দোষ-পাশ-রাশি জাতগুণ মাত্র অর্থাৎ দেহ সংসর্গে জাত। উহারা স্থূল দেহে বলবৎ ভাবে কার্য্য করে এবং দেহ যতই সূক্ষ্ম হয়, ততই উহারা দুর্ব্বল হয় এবং পরিশেষে ক্রমশঃ লয় হয়। এই সংক্ষেপে উক্ত তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। পরমপিতার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্পন্ন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বই তাঁহার একতম স্বরূপ এবং উঁহাকেই অব্যক্তস্বরূপ বলা হয়। সেই অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনেই পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি

* এ বিষয়ে "সৃষ্টির সূচনা' ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশদ্বয়ে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

যোগে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং জড় অব্যক্ত স্বরূপ হইতে বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেহ যতই সূক্ষ্ম হয়, আমাদের অন্ধকার ততই হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ-দেহ প্রাপ্ত হইলে অথবা পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে কারণ-দেহ লাভের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রাপ্ত হইলে আত্মস্বরূপ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। ব্যোম স্বচ্ছ। কারণ-দেহ ব্যোম প্রধান। সুতরাং সেই দেহে পরমাত্মার দর্শনের উপযুক্ততা লাভ হয়। পরে পরম কৃপাময় পরমপিতা কৃপা করিয়া সাধককে দর্শন দান করেন। এই ভাবে চিন্তা করিলে বলা যায় যে কারণ-দেহও যখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়, সাধকের ব্রহ্ম দর্শনও ততোঽধিক সহজ হয় ও পরে তিনি নিত্য ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন। ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে অব্যক্ত স্বরূপের সাকারত্ব যে পঞ্চভূতাত্মক দেহে যত অধিক, সেই দেহবাসী জীব তত অন্ধকারে ডুবিয়া থাকেন। "গুণবিধান" অংশে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে পারলৌকিক সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং সেই সকল দেহের অবস্থা কি অথবা তাহাতে বাধার অল্পতা হয় কিনা, তাহা সর্ব্বসাধারণের ধারণা করিবার উপায় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রে বহু তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আপ্তপ্রমাণ সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। যাহা হউক্, আমরা পৃথিবীস্থ জীবদেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইব যে, যে দেহ যত সাকার-ভাবাপন্ন-ভূত-প্রধান ভাবে গঠিত, সেই দেহ তত তমোভাবাপন্ন ও যে দেহ যত নিরাকার-ভাবাপন্ন-ভূত-প্রধান ভাবে গঠিত, সেই দেহ তত রজঃ বা সত্ত্ব-ভাবাপন্ন। পঞ্চম ভূত ক্ষিতির রজোভাগ দ্বারা জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থের উৎপত্তি হইয়াছে। উপস্থের শক্তি দ্বারাই কামের উৎপত্তি। দেখা যায় যে, যে নরনারীর অন্যান্য দোষ অপেক্ষা কাম অধিক, সে তত মোহাচ্ছন্ন। কামের মোহ অন্যান্য প্রত্যেক দোষের মোহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এজন্য কামকে আদি

রিপু বলা হয়। মানব কাম-মোহে অন্ধ হইয়া যত অকার্য্য কুকার্য্য করে, অন্যান্য দোষের মোহ দ্বারা এত অধিক দুষ্কার্য্য সংঘটিত হয় না। পাঠক গীতা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত (৫১৪ পৃঃ) শ্লোক পাঠ করিবেন। উক্ত গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের শেষ ভাগে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও নর নারী কাহা কর্ত্তৃক যেন বল পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে তিনি কাম শক্তির প্রাবল্যের বিষয়ে বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে ৩৭শ হইতে ৪০শ শ্লোক উদ্ধৃত হইল। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। ৩৭" 'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।। ৩৮" "আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনোনিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।। ৩৯' "ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্।। ৪০" (তৃতীয় অধ্যায়)! "বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রজোগুণ সম্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ দুষ্পূর, মহাপাপ, ইহাকে শত্রু বলিয়া জান(৩৭)। ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি, মালিন্য দ্বারা যেমন দর্পণ, গর্ভবেষ্টন চর্ম্মে যেরূপ গর্ভ আবৃত হয়, সেইরূপ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) তদ্দ্বারা (কাম দ্বারা) আবৃত ৩৮। এই কামরূপ দুষ্পূর অনল নিত্য শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয় (৩৯)। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান স্থান। এই সকল দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। (৪০)"। উপরোক্ত শ্লোক সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন যে কাম আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের আবরক এবং ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। অর্থাৎ ইহাদিগকে কাম সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া তাহারই (কামেরই) কার্য্য সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিয়োগ করে। সুতরাং আমাদের তত্ত্বজ্ঞান ঘোরতর মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদাই তমসাচ্ছন্ন থাকে। প্রথমে যে বলা হইয়াছে যে কাম আমাদের সর্ব্বপ্রধান রিপু ও আমাদের মোহের সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহা গীতোক্ত শ্লোক সমূহ দ্বারাও প্রমাণিত হইল। এই সম্পর্কে

কামের সবিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত সমালোচনা পাঠক দেখিতে পারেন। আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই জানেন যে উক্ত প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাঁহাদের মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। অটুট ব্রহ্মচর্য্য হৃদয়ে সত্য তত্ত্ব সমূহের প্রকাশের বিশেষ সাহায্য করে। কারণ, উক্ত অবস্থায় সাধকের হৃদয়ে একাগ্রতা আনয়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু উহার বিপরীত অবস্থায় চঞ্চলতা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। স্থির সমুদ্রে সূর্য্য এবং পূর্ণচন্দ্র যেমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়, তরঙ্গাকুল সমুদ্রে তাহা একেবারেই অসম্ভব। সেইরূপ ধীর, স্থির এবং অপ্রমত্ত চিত্তে জ্ঞান-সূর্য্য এবং প্রেম-চন্দ্র সহজেই প্রতিভাত হন। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালনে বহু প্রকার মালিন্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য পালনে দৈহিক বাধা যেরূপ ভাবে তাহার শক্তি প্রয়োগে অসমর্থ হয়, সেইরূপ আর কোনও দৈহিক সাধনে হয় বলিয়া মনে হয় না। এই ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহা ত ঊর্দ্ধরেতা হওয়া অর্থাৎ কাম প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত দমনে রাখা, সুতরাং মৈথুন ক্রিয়া ও মৈথুন চিন্তা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। এই অবস্থার ফল এত ব্যাপক ও উত্তম এবং এই অবস্থা সাধনার এত অধিক অনুকূল যে উহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই অবস্থায় সাধকের ব্রহ্মে অবস্থিতি (চরণ) অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কথিত আছে:—"ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু সদেবো নতু মানুষঃ।" সুতরাং ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা গেল যে কাম রিপু আমাদের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান বাধক। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে কাম দোষের প্রধান যন্ত্র উপস্থ ক্ষিতি প্রধান ভাবে গঠিত বলিয়া তাহা অত্যন্ত মোহের উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। পাঠক মনে রাখিবেন যে ক্ষিতি সাকার এবং স্থূলতম পঞ্চমভূত। আমাদের দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ। যাহাদের শরীর পিত্ত প্রধান, তাহারা ক্রোধন স্বভাব। পিত্ত অগ্নি স্বরূপ। ইহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন। ক্রোধের উৎপাদক পিত্ত,

অপ্ ও তেজঃ দ্বারা গঠিত। অপ্ সাকার, তেজঃ সাকার ও নিরাকার উভয়ই। ক্রোধ যে কাম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুর্ব্বল রিপু, তাহা আমরা জানি এবং পূর্ব্বোক্ত গীতোক্ত শ্লোকেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। লোভের যন্ত্র জিহ্বা অপের সত্ত্বাংশ প্রধান ভাবে গঠিত। তাই উহা ক্ষিতি প্রধান ভাবে গঠিত কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থের ন্যায় এবং অপ ও তেজঃ প্রধান গঠিত পিত্তের ন্যায় বলবান রিপুর জনক হইতে পারে নাই। জিহ্বা যদি অপের রজোহংশ প্রধান ভাবে গঠিত হইত, তবে লোভ ক্রোধ হইতে বলবত্তর রিপু হইত। জিহ্বা আমাদের একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, সুতরাং উহার স্থান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উচ্চে। উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। পিত্তকোষকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয় না সত্য। কারণ, শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্রকেই কর্ম্মেন্দ্রিয় পর্য্যায় ভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু পিত্ত যে পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান সহায়, ইহা চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মত। সুতরাং পিত্তকোষকেও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই তিন রিপু আমাদের দেহের অন্য কোন অঙ্গ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উহারা মস্তিষ্ক (অন্তঃকরণের যন্ত্র) সম্পর্কিত। উহা পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ প্রধান ভাবে গঠিত। মোহ অর্থে অজ্ঞান এবং মদ অর্থে অহঙ্কার। সুতরাং উহারা কাম, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় বলবান নহে, যদিও মোহ এবং মদের ব্যাপকতা অধিক। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, যে দোষ সাকারতম ভূত অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন, তাহা সর্ব্বপ্রধান এবং যে দোষ অপ্ অথবা অপ্ ও তেজঃ হইতে উৎপন্ন, উহার স্থান প্রথমোক্ত দোষের নিম্নে অর্থাৎ দেহ যত নিরাকার ভাবের দিকে অগ্রসর হয়, ততই দোষের মাত্রা হ্রাস পাইতে থাকে। Dr, J, S, Haldane এর "Mechanism, Life and Personality" নামক পুস্তক হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটার প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। "Cut off the oxygen supply to the brain and consciousness ceases within a few seconds." অর্থাৎ মস্তিষ্কে oxygen যাইতে না পারিলে অল্প কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর চৈতন্য

তিরোহিত হয়। ইহার কারণ কি? বায়ু হইতে যদি আমরা oxygen গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আমাদের শরীরে জাত carbon dioxide মস্তিষ্কে যাইয়া আমাদের জ্ঞান রোধ করে। বহু দুর্ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে যে কোন একটী বদ্ধ ঘরে কয়লা বা কেরোচিন তৈলের ধুম এত অধিক হইয়াছিল যে সেই ঘরে অবস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অচেতন করিয়া ফেলিয়াছে। সময় মত উক্ত অবস্থা ধরা না পড়ায় ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, এরূপও জানা গিয়াছে। সুতরাং উক্ত রূপ অচৈতন্য বা মৃত্যুর কারণ oxygen এর অভাব এবং Carbon monoxide and carbon dioxide এর ক্রিয়া। Oxygen, Carbon Monoxide এবং Carbon Dioxide উহারা সকলেই বায়ু পর্য্যায় ভুক্ত। কিন্তু তথাপি একটী জ্ঞান রক্ষা করে ও অন্য দুইটী জ্ঞান হরণ করে কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেও আমরা দেখিব যে Carbon monoxide এবং Carbon dioxide এর মধ্যে বায়ু ভিন্ন অন্য পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতির (Carbon) অংশ অধিক। কিন্তু Oxygen এর ভিতর ক্ষিতির ভাগ অত্যল্প। এই জন্যই প্রথম দুইটী চৈতন্য হরণ করে, কিন্তু তৃতীয়টী তাহা করে না। ইহার জন্যই বদ্ধ ঘর হইতে খোলা জায়গায় গেলে মাথা পরিষ্কার বোধ হয় ও আমাদের ভাল লাগে এবং এই জন্যই বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়। চিন্তা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে Carbon dioxide হইতে Carbon monoxide এর বিষক্রিয়া অধিক। তাহার কারণও ঐ একই। Carbon monoxideএ Oxygen এর পরিমাণ হইতে Carbon dioxide এ oxygen এর পরিমাণ দ্বিগুণ। এই জন্যই Carbon gas এর বিষ ক্রিয়া প্রথমটীতে (Carbon dioxideএ) যত নাশ করিতে পারে, দ্বিতীয়টীতে (Carbon monoxide এ) তাহা হইতে অর্দ্ধ পরিমাণে নাশ করিতে পারে। অনেকে হয়তঃ শুনিয়াছেন যে আমাদের দেশে মুনি ঋষিগণ আমাশয় রোগে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কারণ, ঐ রোগে অনেক ক্ষেত্রে

মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে। উদ্দেশ্য এই যে সজ্ঞানে পরমেশ্বরের নাম করিতে করিতে তাঁহারা দেহ ত্যাগ করিতে পারিবেন। রোগীদের বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে যাহাদের উক্ত আমাশয় রোগে মৃত্যু হয়, তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে। এমনও দেখা গিয়াছে যে মল মুত্র বন্ধ হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া বহু সময় যাপন করিয়াছে। ঔষধ দ্বারা বা যন্ত্র দ্বারা মল মুত্র নিঃসরণ করাইলে আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। এই অজ্ঞানের কারণ কি? চিকিৎসকগণ বলেন যে মলমুত্র বন্ধ হইলে উহাদের হইতে এক প্রকার Toxin উৎপন্ন হয়, যাহার বিষক্রিয়ায় রোগীর অজ্ঞান আনয়ন করে। আবার দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, সে সর্ব্বদাই মস্তিষ্কের অসুখে ভুগে, তাহার মস্তিষ্ক গরম থাকে, সময় সময় তাহার তাহার মাথাধরে ইত্যাদি। ইহার কারণও একই, কেবল বিষক্রিয়ার তারতম্য মাত্র। অপর পক্ষে যাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তাহার মস্তিষ্কের অসুখ অল্প। Toxin এর উৎপত্তির কথা চিন্তা করিতে গেলেও দেখা যাইবে যে উহা ক্ষিতি ও অপ্‌ জাতীয় পদার্থ হইতে উৎপন্ন এবং সেই জন্যই উহা রোগীর জ্ঞান হরণের কারণ হয়। অনেকে জানেন যে হীরক চুষিলে দেহে বিষক্রিয়া হয়। হীরক বস্তুটী কি? ইহা যে Carbon, তাহা অনেকে জানেন। অর্থাৎ Carbon এর একটী বিশেষ Concetrated preparation এর শক্তি আমাদের জ্ঞান হরণ করিয়া মৃত্যুর দ্বারে মানুষকে লইয়া যায়। Anaesthesia জাতীয় ঔষধগুলিতে Carbon অথবা তজ্জাতীয় পদার্থের শক্তি অধিক বলিয়াই উহারা জ্ঞান হরণে সমর্থ হয়। সর্পের বিষের ভিতরেও Carbon অথবা তজ্জাতীয় পদার্থের ভাগ ও শক্তি অধিক বলিয়াই উহা অতি সহজেই জীব জন্তুর জ্ঞান হরণ করিতে সমর্থ হয়। একজন বিশিষ্ট Chemist এর উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "Substances (gas, liquid, or solid) that act as poison are generally rich in carbon or some such element which is of the nature of a solid. The

introduction of Carbon or solid in general in a substance increases its matter and thereby decreases its activity. If activity is akin to consciousness that the theory that স্থূলত্ব decreases one's concious-ness stands." "বঙ্গানুবাদ :—যে সকল পদার্থ (মরুৎ, অপ্ বা ক্ষিতি যে জাতীয়ই হউক না কেন) বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাদের মধ্যে Carbon অথবা তজ্জাতীয় যে সকল পদার্থ ক্ষিতি পর্য্যায়ভুক্ত পদার্থ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ পদার্থের ভাগ অত্যধিক। Carbon অথবা কঠিন পদার্থ কোন পদার্থে যোগ করিলে উহাতে Matter (পদার্থের স্থূল ভাগ) বৃদ্ধি পায় এবং সেই জন্য উহার কার্য্যকরী শক্তি হ্রাস করে। যদি কার্য্য করার শক্তি জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত বল, তবে পদার্থের স্থূলত্ব যে জ্ঞান হ্রাস করে, এই মত সত্য।"

"The atoms of hydrogen and oxygen combine to form molecules of hydrogen (H_2 or H_3), of oxygen or ozone (O_2 or O_3), of water (H_2O) or of hydrogen peroxide (H_2-O_2), but none of these compounds contains more than four atoms. The addition of nitrogen does not greatly change the situtaion, the compounds of hydrogen, oxygen and nitrogen all contain comparatively few atoms. But the further addition of carbon completely transforms the picture; the atoms of hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon combine to form moleules containing hundreds of thousands and even tens of thousands of atoms. It is of such molecules that living bodies are mainly formed." (Sir James Jeans) "বঙ্গানুবাদ :—Hydrogen এবং Oxygen এর

পরমাণু সমূহ মিলিত হইয়াই Hydrogen এর (H_2, H_3), Oxygen এর (O_2 O_3), জল (H_2O), Hydrogen Peroxide (H_2 O_2) এর অণু প্রস্তুত করে। কিন্তু এই মিশ্রিত পদার্থের কোনটীই চারিটী পরমাণুর অধিক ধারণ করে না। Nitrogen এর যোগে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। Hydrogen, Oxygen এবং Nitrogen এর মিশ্রিত পদার্থ সমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প পরমাণু ধারণ করে। কিন্তু ইহাদের সহিত Carbon এর যোগ হইলে চিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon এর পরমাণু সমূহ মিলিত হইয়া শত শত, সহস্র সহস্র সংখ্যক অণু প্রস্তুত করে। জীব দেহ সমূহ সেই সকল অণু সমূহ দ্বারা প্রধানতঃ প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত উক্তি দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা গেল যে পৃথিবীস্থ জীবদেহে Carbon এর অংশ অত্যন্ত অধিক, অর্থাৎ আমাদের দেহ ক্ষিতি প্রধান, সুতরাং তমঃ প্রধান। আয়ুর্ব্বেদ মতে মানবদেহ বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা গঠিত। যে দেহ কফ প্রধান, তাহা সাধারণতঃ তমোভাবাপন্ন, যাহা পিত্ত প্রধান, তাহা প্রধানতঃ রজঃ ভাবাপন্ন ও যাহা বায়ু প্রধান, তাহা প্রধানতঃ রজঃ-সত্বভাবাপন্ন। অথবা মোটামুটি এই বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে যে যাহারা কফ প্রধান দেহ ধারণ করে, তাহারা সাধারণতঃ অলস ও নিম্ন শ্রেণীর ভাবের ভাবুক। পিত্ত প্রধান দেহ ধারী ব্যক্তি প্রায়শঃ কর্ম্মশীল ও মধ্যম ভাবাপন্ন এবং বায়ু প্রধান জনগণ প্রায়শঃ উচ্চাঙ্গের কর্ম্মশীল এবং উচ্চ ভাবাপন্ন। এস্থলে যদি কফকে ক্ষিতি ও অপের প্রতিরূপ, পিত্তকে তেজের প্রতিরূপ, এবং বায়ুকে মরুৎ ও ব্যোমের প্রতিরূপ মনে করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে দেহ যত সাকার-ভাবাপন্ন ভূতপ্রধান, সেই দেহবাসী তত নিম্নস্তরের ও নিরাকার-ভাবাপন্ন ভূতপ্রধান দেহবাসী তত উচ্চস্তরের। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে শরীর গঠনের উপর আমাদের গুণের বিকাশের তারতম্য হয়। Homeopathic বিজ্ঞান

বলেন যে Homeopathic ঔষধ গন্ধ দ্বারা affected হয়। অর্থাৎ গন্ধ ঔষধের শক্তিনাশ করে। গন্ধ বস্তুটী কি? আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে দেখিয়াছি যে গন্ধ ক্ষিতির বিশেষ গুণ। গন্ধবান বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আমাদের olfactory nerves এর সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের আঘ্রাণরূপ জ্ঞান জন্মাইবার কারণ হয়। অর্থাৎ গন্ধবান পদার্থের ক্ষিতি অংশ নানা কারণে বায়ুতে গমন করে এবং বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া যদি ঔষধে উপস্থিত হয়, তবে উহাতে ক্ষিতির অংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সকলেরই জানা আছে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যতশক্তি (Potency) বৃদ্ধি পাইবে, ততই আদি ঔষধ (Mother tincture) সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত হইবে। যথা—Nux Vomica Q হইতে Nux Vomica 12 এ Nux Vomica সূক্ষ্মতর ভাবে বর্ত্তমান। Nux Vomica 200 এ তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ যতই Potency বৃদ্ধি পায়, ততই ঔষধ সূক্ষ্মভাবে সুতরাং delicate ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ঔষধ যতই delicate হইবে, ততই উহা স্থূল পদার্থ দ্বারা অধিকতর ভাবে affected হইবে। এখন প্রশ্ন হইবে যে স্থূল বস্তু দ্বারা যদি ঔষধ affected হয়, তবে Nux Vomica 6 ঔষধের সহিত যদি উহার Mother tincture অধিক পরিমানে যোগ করা হয়, তবে কি সেই ঔষধ নষ্ট হইবে। Mother Tinctureও ত স্থূল বস্তু। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাহাতে ঔষধ নষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু Nux Vomica 6 যে কার্য্য করিত, উক্ত নূতন ঔষধে তাহা করিবে না। উহাকে স্থূলত্বে পরিণত করায় ঔষধে স্থূলের গুণ প্রকাশ করিবে। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে স্থূলেরও শক্তি আছে, সূক্ষ্মেরও শক্তি আছে। উহাদের পরিমাণ ও ফল বিভিন্ন প্রকার, এই মাত্র প্রভেদ। তাই নূতন Mixture নষ্ট হইবে না। উহারা যে একজাতীয়, ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ঔষধ গন্ধ দ্বারা affected হওয়ার দুইটী কারণ বর্ত্তমান বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ উহাতে বিজাতীয় (Foreign) স্থূল বস্তু যুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ

ঔষধ সূক্ষ্ম হওয়ায় সুতরাং delicate হওয়ায় উহা ক্ষিতির অংশ দ্বারা সহজেই affected হয়। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে গন্ধ কেন উহার উপর সহজেই নিজ শক্তি প্রয়োগে সমর্থ হয়। আবারও প্রশ্ন হইবে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুরাসার (Spirit) সহ রক্ষিত হয়। যদি ক্ষিতির গন্ধে ঔষধ নষ্ট হয়, তবে Spirit এর গন্ধে কেন উহা নষ্ট হইবে না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে Spirit এর গন্ধই একমাত্র গুণ নহে। উহা Disinfectant অর্থাৎ বিষক্রিয়াও নাশ করে এবং উহা বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে (preserve করিতে) ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঔষধ Spirit এর গন্ধ দ্বারা affected হয় না। বরং উহা যাহাতে সংরক্ষিত হয়, তাহাই করিতে সাহায্য করে। Spirit অপ্ জাতীয় পদার্থ হইলেও উহা পদার্থের সারভাগ এবং সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম, উহাকে বিশেষ ভাবে শোধিত করা হইয়াছে। আবারও প্রশ্ন হইবে যে গন্ধ দ্বারাই যদি ঔষধ affected হয়, তবে জলের গন্ধ এবং দুগ্ধসারের (Sugar of milk এর গন্ধ দ্বারা কেন উহা affected হইবে না। Homeopathic ঔষধ জলের সহিত এবং Sugar of milkএর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতেও রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহার উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঔষধ অন্য যে কোন স্থূল বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলেই অল্পাধিক পরিমাণে উহা affected হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে উহা ক্রমান্বয় অল্প পরিমাণে affected হয় বলিয়া মনে হয়:—সাধারণজল, Distilled water, Sugar of milk, Rectified Spirit and Pure Alcohol. সাধারণ জলে সর্ব্বদাই ক্ষিতি পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। Distilled Waterএ ক্ষিতি পদার্থের পরিমাণ উহা হইতে অল্পতর। Sugar of milk ক্ষিতি পদার্থ বটে, কিন্তু দুগ্ধ হইতে বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য পবিত্রতর ও সূক্ষ্মতর। Spirit এর বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং Pure Alcohol যে Rectified Spirit হইতেও সূক্ষ্মতর, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ক্ষিতি ও অপ্

জাতীয় পদার্থ অসংস্কৃত অবস্থায় যে অনিষ্ট করিতে পারে, সুসংস্কৃত হইলে উহা ততদূর অনিষ্ট করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ক্ষিতির গুণ আবরণ, কিন্তু কাচ পদার্থ ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াও স্বচ্ছ। ইহার কারণ কাচের ক্ষিতি সংস্কৃত হইয়াছে। তথাপি কিন্তু উহা বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছ হইতে পারে নাই। সেইরূপ Distilled Water, Sugar of milk, Rectified Spirit এবং Pure alcohol ক্ষিতি বা অপ্ পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াও উহাদের অসংস্কৃত অবস্থা হইতে অল্পতর অনিষ্ট করে। আমি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু বিশ্বাস আছে যে রাসায়ণিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ঐরূপ ধরণের পরীক্ষা করিলে এ বিষয়ে আরও সমর্থন পাইবেন। উক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে আমাদের দেহ যত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা গঠিত হইবে, আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ততোঽধিক হইবে। আবার আমাদের দেহ যত অধিক পরিমাণে স্থূল ভূত দ্বারা গঠিত হইবে, আমাদের জ্ঞান প্রকাশের বাধা ততোঽধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ইতর জীব জন্তু প্রভৃতি ও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের তারতম্য অনুসারে রজস্তমঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান দেহ ধারণ করে। অতএব ইতর জীবদেহের বিষয় চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে দেহে যত সাকার ভাবাপন্ন ভূতের অংশ অধিক, তাহার মধ্যে ততোঽধিক মোহ বা অন্ধকার এবং যাহার দেহে যতটুকু নিরাকার ভাবাপন্ন ভূতের অংশ অধিক, তিনি ততটুকু মোহমুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৃক্ষ carbon gas গ্রহণ করিয়া প্রায় ক্ষিতিত্ব বা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সিংহ উহার শরীরের গঠনের জন্য উহার জ্ঞান প্রকাশের অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছে। বৃক্ষ একেবারেই তমোভাবাপন্ন। উহার রজোভাবের মাত্রা অত্যল্প। অপর দিকে সিংহের তমোভাব যথেষ্ট থাকিলেও রজোভাবও যথেষ্ট আছে। উহার রজস্তমোভাবাপন্ন দেহ। অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহার রজোভাব প্রধান। অতি নিম্নস্তরের মানব দেহেও দেখা যায় যে উহা বাল্যকালে তমোভাবাপন্ন থাকে, যৌবনে রজোভাবাপন্ন এবং বৃদ্ধকালে

সাধারণ ভাবে সত্ত্বভাবাপন্ন হয়। ইহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাল্যে কফাধিক্য, যৌবনে তেজের আধিক্য এবং বৃদ্ধকালে বায়ুর আধিক্য দেহে বর্ত্তমান থাকে। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় আমাদের কোনও ভুল হইবে না যে পরমপিতার একতম স্বরূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব হইতে উৎপন্ন জড় উৎপাদকের শক্তি লাভ করিয়াছে এবং জীবের আবরণ স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান আছে। দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী আবরণের আধিক্য, অল্পত্ব ও স্বল্পত্ব সূচিত হয়। অর্থাৎ দেহ যতই সাকার ভাবাপন্ন ভূত প্রধান ভাবে গঠিত হইবে, উহাতে তমোভাব ততোঽধিক থাকিবে। আবার দেহ যতই নিরাকার ভাবাপন্ন ভূত প্রধান ভাবে গঠিত হইবে, উহাতে ক্রমশঃ রজঃ ও পরে সত্ত্বভাব প্রধানতঃ থাকিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে স্থূল-দেহ ক্ষিতি ও অপ্ প্রধান, সূক্ষ্মদেহ তেজঃ ও বায়ু প্রধান এবং কারণ-দেহ ব্যোম প্রধান। আরও মনে রাখিতে হইবে যে স্থূলতম দেহেও উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সাধনা করিলে সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন প্রভৃতি হয়। এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে অব্যক্ত স্বরূপের এমন কি শক্তি আছে, যাহা জড় ভাব লাভ করিয়া বাধার কার্য্য করিতেছে—আবরণ সৃষ্টি করিতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীই সেইরূপ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাকার এবং নিরাকার উভয় গুণ বিশিষ্ট হইয়াছে। এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই অব্যক্তের পরিণাম অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রত্যেক ভূতেই বর্ত্তমান। অনিসন্ধিৎসু পাঠক সাংখ্য দর্শনও পাঠ করিতে পারেন। ক্ষিতি অর্থাৎ সাকারতম ভূত তমঃ প্রধান এবং ব্যোম অর্থাৎ নিরাকারতম ভূত সত্ত্ব-প্রধান। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্যোম নিরাকার প্রধান বা প্রধানতম, মরুৎ নিরাকার প্রধান, তেজঃ সাকার এবং নিরাকার উভয়ই, অপ্ সাকার প্রধান এবং ক্ষিতি সাকার প্রধান বা

প্রধানতম। আমরা প্রকৃতিতে দেখিতে পাই যে সাকার প্রধান ভূতদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বাধা প্রদান বা আবরণ সৃষ্টি করে এবং ক্ষিতি অপ্ অপেক্ষাও এই সম্বন্ধে অধিকতর শক্তি ধারণ করে। সেইরূপ নিরাকার প্রধান ভূতদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতম বাধা প্রদান বা আবরণ সৃষ্টি করে। মরুৎ অপেক্ষা ব্যোম এই সম্বন্ধে অল্পতর শক্তি ধারণ করে বা ব্যোমের বাধা প্রদান বা আবরণ সৃষ্টি করিবার শক্তি অল্পতম। তেজঃ ভূতগণের মধ্যে মধ্যম স্থানীয়। বাধা প্রদান সম্বন্ধেও তেজঃ মধ্যম স্থানীয়। অব্যক্ত স্বরূপের সাকার অংশের আধিক্য অপ্ ও ক্ষিতিতে বর্ত্তমান। সেইরূপ উঁহার নিরাকার অংশের আধিক্য মরুৎ ও ব্যোমে বর্ত্তমান। তেজে অব্যক্ত স্বরূপের উভয় ভাবই সমভাবে বর্ত্তমান। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অব্যক্ত স্বরূপের সাকার অংশ পঞ্চভূতে বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের বাধা সৃজন করিতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ক্রমশঃ নিরাকার ভাবাপন্ন, সুতরাং উহারা ক্রমশঃ অল্পতর বাধা প্রদান করে। ব্যোমে নিরাকারত্বের জাগতিক পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপিও উহা সুবিশুদ্ধ নিরাকার পদার্থ নহে। আবার আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিয়াছি যে ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্যম্—এই ছয়টী লোকই ব্যোম প্রধান বটে, কিন্তু উহাতে ব্যোম-প্রধানত্বের ক্রম বর্ত্তমান। উক্ত অংশে দেখিয়াছি যে উক্ত ছয়টী লোকে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ভুবঃ লোকের প্রথম মণ্ডল ও সত্যলোকের শেষ মণ্ডলে ব্যোম-প্রধানত্বের পার্থক্য আমাদের পক্ষে অধার্য্য। সুতরাং ব্যোম প্রধান ষট্‌লোকে বাধার পরিমাণ অল্প এবং এই বাধাও ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইতে হইতে সত্যলোকের শেষ মণ্ডলে উহা অল্পতম হইয়া দাড়ায় এবং অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত করুণাময়ের অপার করুণায় যখন সেই বাধাও অতিক্রান্ত হয়, অর্থাৎ শেষ দেহও যখন শেষ হয়, তখন জীবাত্মা আর কোথায় থাকিবেন? যে স্থানে আর কোনই বাধা নাই, কোনই বিঘ্ন নাই, যে স্থান দোষ-পাশ-লেশ শূন্য, যাঁহাতে ত্রিগুণেরও লেশ মাত্র নাই, সেই নিত্য নিরাপদ স্থান,

নিত্য ও পূর্ণ শান্তিনিকেতন, নিত্য প্রেমধাম, নিত্য মঙ্গল আলয়, নিত্য চিন্ময় ধামে, নিত্য অনন্ত দিব্য জ্ঞানোজ্জ্বল দেশে নিত্য কালের তরে সম্পূর্ণরূপে তিনি মিলিয়া যান, সকল প্রকারের সকল ভেদ বিবর্জ্জিত হইয়া, সকল পৃথক্ অস্তিত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মেই সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া মিশিয়া যান। তাঁহার আর জীবত্বের লেশ মাত্রও থাকেনা, তিনি পূর্ব্ব পরম চৈতন্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যান। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মের অনন্ত সাকারত্ব কি তাঁহাতে কোনও বাধা উৎপাদন করে যে সেই গুণ হইতে উৎপন্ন জড়ের বিকৃত সাকারভাব জড়ে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের পক্ষে বাধকের কার্য্য করিবে? ইহার উত্তরে পাঠককে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত বিষয় স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। উহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্রহ্মে দ্বিবিধ সত্বাত্মক বিরুদ্ধ (Positive and contradictory) গুণের অত্যন্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে একটী গুণ উহার বিরুদ্ধ গুণের বিরোধিতা করে। এস্থলে আমাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে পরম পিতার বিরুদ্ধ গুণরাশি আমাদের ধারণীয় ভাবে বিরোধ পরায়ণ নহে। পরমপিতার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বও পরস্পর বিরুদ্ধ সত্বাত্মক গুণ। উঁহারা অনন্ত মিশ্রণে মিলিত হইয়া একটী স্বরূপ হইয়াছেন বা উঁহাদের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাহাই অব্যক্ত স্বরূপ। সুতরাং সেই অব্যক্ত স্বরূপে বাধা দিবার শক্তি আছে এবং উঁহা হইতে উৎপন্ন জড় জগতে পঞ্চভূত সাকার ও নিরাকার উভয়ই হইয়াছে এবং উহা বাধা প্রদান শক্তিও উৎপাদক হইতে লাভ করিয়াছে। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে পরমপিতার অনন্ত সাকারত্বেরই বাধকত্বের শক্তি জড় লাভ করিয়াছে এবং উহা সেই জন্যই আত্মার বাধকতা করিতেছে। কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপের অনন্ত নিরাকারত্ব কি কোনই বাধা দেয় না? সেই গুণেরও ত বাধকতা শক্তি আছে বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জড় অব্যক্ত স্বরূপের অনন্ত নিরাকারত্ব গুণের বিরোধিতা শক্তিও লাভ করিয়াছে

বটে এবং তাহা তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব গুণের শক্তি যাহা বিকৃত হইয়া জড়ে বর্ত্তমান, তাহারই বিরোধিতা উৎপাদন করিতেছে। আমরা "গুণ-বিধান" অংশে দেখিয়াছি যে জড়ে বিপরীত শক্তি আছে। অর্থাৎ জড় দ্বারা আবদ্ধ হওয়া যায় এবং উহার সাহায্যে বন্ধন মুক্তও হওয়াও যায়। অর্থাৎ পরম পিতার অনন্ত সাকারত্বের বিকৃতভাব যাহা জড়ে বর্ত্তমান, তাহা আমাদিগকে বন্ধন করে এবং পরম পিতার অনন্ত নিরাকারত্বের বিকৃতভাব, যাহা জড়ে বর্ত্তমান, তাহা সেই বন্ধন মোচনের সাহায্যও করে। কণ্টক দ্বারা আমরা বিদ্ধ হই এবং কণ্টক দ্বারাই সেই বিদ্ধ কণ্টককে উৎপাটন করা যায়। আমাদের মনে হয় যে সাংখ্য দর্শন এই জন্যই বলিয়াছেন যে প্রকৃতিই বন্ধন করে এবং প্রকৃতিই বন্ধন মোচন করেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব ও জড়ের নিরাকারত্ব এক নহে। তাঁহার নিরাকারত্ব হইতেই জড়ের নিরাকারত্ব আসিয়াছে বটে, কিন্তু জড় চির বিকৃত, সুতরাং জড়ের নিরাকারত্বও বিকৃত বই আর কিছুই নহে। আমরা যদি জ্ঞানের নিরাকারত্ব, প্রেমের নিরাকারত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবেই বুঝিতে পারিব যে উহা জড়ের নিরাকারত্ব হইতে পৃথক অর্থাৎ শেষোক্ত নিরাকারত্ব বিকৃত। বিকৃত পদার্থ মাত্রই স্থূল। অব্যক্ত স্বরূপের নিরাকারত্বের তুলনায় ব্যোমের নিরাকারত্বও স্থূল। সুতরাং উহাও আবরণের কার্য্য করে। কিন্তু উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত স্বভাব-বশতঃ নিরাকার জড় পদার্থে বাধার অল্পতা বর্ত্তমান থাকে এবং উহা বাধা নিরসনও করিতে পারে। অতএব আমরা দেখিলাম যে সাকার ও নিরাকার উভয় পদার্থই বাধা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু সাকার পদার্থ অধিকতর বাধা প্রদান করে কিন্তু নিরাকার পদার্থ অল্পতর বাধা প্রদান করে এবং নিরাকার পদার্থ বাধা নিরসনের সাহায্যও করে। এস্থলে আরও বক্তব্য যে নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব উভয়ই অচেতন। সুতরাং তজ্জাত নিরাকার ও সাকার পদার্থ মাত্রই অচেতন। যাহা অচেতন, তাহা দ্বারা অন্ধকার উৎপন্ন হইবেই। সুতরাং উভয় প্রকার পদার্থই অন্ধকার উৎপাদন করে। এই সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। অতএব দেখা গেল যে

জড় দেহ মাত্রই, তাহা স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক, অথবা কারণই হউক, আমাদের বাধা উৎপাদন করে। কিন্তু দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী বাধার আধিক্য, অল্পত্ব ও স্বল্পত্ব সূচিত হয়। অতএব আমাদের বুঝিতে হইবে যে জীব সর্ব্বপ্রথমে সাকার-ভূত-প্রধানতম দেহে আবদ্ধ হন এবং তিনি যতই নিরাকার ভাবাপন্ন ভূতপ্রধান দেহে গমন করিবেন, তাহার বাধার পরিমানও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে। অতএব দেখা গেল যে পরম পিতার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব যেমন তাঁহাতে পরস্পব বিরুদ্ধ ভাবে বর্ত্তমান, সেইরূপ জড় জগতেও উঁহাদের বিকৃত ভাবদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধিতা করিতেছে এবং তাহাতেই জীবের ক্রম বিকাশ সম্পন্ন হইতেছে। ধন্য প্রেমলীলাময় ভগবান! ধন্য তোমার সুন্দর ও মঙ্গল বিধান! আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে উভয় গুণই যখন পরস্পর পরস্পরকে বাধা প্রদান করিতেছে, তখন উহার ফলে বিকাশ সম্ভব হইবে কেন, Neutral অবস্থা উৎপন্ন হইবে না কেন? ইহার উত্তব বুঝিতে আমাদের "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের শক্তি, দুঃখ হইতে সুখের শক্তি, বিকর্ষণের হইতে আকর্ষণের শক্তি অধিকতরা। সেইরূপ সাকারত্ব হইতে নিরাকারত্বের শক্তি অধিকতরা। সাধারণতঃ আমরা জানি যে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের শক্তি অধিকতরা। আবার স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ সাকারত্ব ও নিরাকারত্বের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং নিরাকারত্বের শক্তি যে অধিকতরা তাহা প্রমাণিত হইল। সুতরাং উভয় গুণের কার্য্যের ফল স্বরূপ আমরা লাভ করি ক্রম বিকাশ। সর্ব্বোপরি বুঝিতে হইবে যে প্রেমলীলাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সকল সুবিধান গড়িয়া রাখিয়াছেন। জড় অচেতন, উহার শক্তির যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহাও সেই অনন্ত চেতনের ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হইতেছে। অচেতনের কোনই স্বাধীনতা নাই। আধুনিক বিজ্ঞানও বলেন যে জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। জড়ের উৎপাদক হইতে লব্ধ শক্তি এবং অনন্ত

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এই উভয় মিলিয়া বিশ্বের সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে। এই সম্পর্কে আরও একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে জড় জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা। সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ জড়কে যে ভাবে সৃষ্টি করিলে জীবের বাধা উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা হইতে যে মুক্তিরও সাহায্য পাইতে পারে, সেই ভাবেই তিনি তাঁহার অসীম শক্তিশালিনী প্রেম-মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তি ও তাঁহার অপার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা জড় জগৎ রচনা করিয়াছেন। এই বিষয়টীর অন্য ভাবে একটু সমালোচনা করা যাউক্। জড় বলিতে আমরা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ সমূহকে বুঝি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সৃষ্টির প্রথম ভাগে ভূত সমূহ ভূতাবস্থায় থাকিতে থাকিতেই পঞ্চীকৃত হইয়াছিল। অতএব দেখা যায় যে সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান উপকরণ স্বরূপ পঞ্চভূত নিজ নিজ স্বভাবে নাই। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি নাই। ক্ষিতির কথা ধরা যাউক্। ইস্পাত (Steel) ও একটী শসাফল উভয়ই ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্ত। কারণ, উভয় পদার্থই কাঠিন্য গুণ যুক্ত। কিন্তু ইস্পাতে কাঠিন্য অত্যধিক। সুতরাং ক্ষিতির ভাগও উহাতে অত্যধিক। উহাকে অপে অর্থাৎ তারল্যে পরিণত করিতে অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উক্ত ফলটীকে তরল পদার্থে পরিণমন করা অল্পায়াস সাধ্য। জল সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। Hydrogen এবং Oxygen এর মিলনে যদি কেহ জল প্রস্তুত করেন, তাহা যেরূপ বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন, Filtered water যাহা আমরা সহরে ব্যবহার করিয়া থাকি) সেইরূপ বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে। আবার শীতকালে বঙ্গদেশে গ্রামের অসংস্কৃত পুকুরগুলিতে, বিল বা ডোবাগুলিতে যে জল পাওয়া যায়, উহাকে ইংরেজীতে apology for water বলা যাইতে পারে। অর্থাৎউহাতে ক্ষিতির অংশ এত অধিক যে উহা নামে মাত্র জল বলিলেই হয়।

দ্বীতে কয়লা অগ্নি সংযুক্ত হওয়া মাত্র যে অগ্নি আমরা দেখিতে পাই,

তাহার মধ্যে তেজঃ ভিন্ন অন্য (foreign) পদার্থ থাকে, কিন্তু সমস্ত কয়লা পূর্ণভাবে প্রজ্বলিত হইলে যে অগ্নি দেখি, তাহাতে অন্য পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্পতর। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকারের তেজঃ শুদ্ধতর। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ভূতান্তর সম্পর্ক রহিত কোনও তেজঃ পদার্থ দেখা যায় না। Carbolic acid gas এবং Oxygen gas সম্বন্ধেও চিন্তা করিলেও দেখিতে পাইব যে যদিও উহারা উভয়ই মরুৎ পর্য্যায়ভুক্ত, তথাপি প্রথমোক্ত পদার্থ হইতে শেষোক্ত পদার্থ অধিকাংশে বিশুদ্ধ। কালিকাতা নগরীর অল্প উপরের বায়ু যেরূপ অবস্থাপন্ন, তাহা হইতে দার্জ্জিলিং এর উপরিভাগ বায়ু বিশুদ্ধ। আবার ২৫ কি ত্রিশ হাজার ফুট উপরের বায়ু আরও বিশুদ্ধ। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা আরও দেখিয়াছি যে জড় পদার্থ মাত্রই ত্রিগুণ সম্পন্ন, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থেই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ বর্ত্তমান। ইহাও বলা হইয়াছে যে ঐ সকল গুণ যথাক্রমে প্রকাশক, চালক ও আবরক। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বিশেষ গুণও উহাদের আছে। ক্ষিতি ও অপ্‌ তমোগুণ প্রধান, তেজঃ ও বায়ু রজোগুণ প্রধান এবং ব্যোম সত্ত্বগুণ প্রধান। ক্ষিতি ও অপের আবরকত্ব, তেজঃ ও মরুতের চালকত্ব এবং ব্যোমের প্রকাশকত্ব আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি। এস্থলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। এই তিন গুণই দেহীর পক্ষে "গুণ" অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু। সত্ত্বগুণ যখন রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত হয়, তখন দেহী নিজে "আমি সুখী", "আমি জ্ঞানী" এইরূপ বোধ করেন। উহা সুখ সঙ্গে ও জ্ঞান সঙ্গে দেহীকে দেহে বদ্ধ করে। সেই অবস্থায় দেহী শব্দাদি বিষয়ের যথার্থরূপে প্রকাশ ও সুখাদি অনুভব করে। এই অবস্থায়ও দেহী আত্মস্বরূপ জ্ঞানানন্দ লাভ করে না বটে, কিন্তু সেই অবস্থা লাভের বাধা সত্ত্বের পরিমাণানুযায়ী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে উক্ত গুণগুলিও জড়ের। সুতরাং সত্ত্বগুণ উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। রজোগুণ দুঃখাত্মক ও চালক। ইহাতে চাঞ্চল্য ও

অতৃপ্তি আনয়ন করে। সুতরাং ইহা দেহীকে কার্য্যতৎপরতা ও বাসনা দ্বারা দেহে বদ্ধ করে। এই অবস্থায় দেহী দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি যে সময়ে দেহে বৃদ্ধি পায়, তখন রজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। তমোগুণ আবরক ও ভ্রান্তির কারণ। উহা জড়তা, আলস্য ও নিদ্রা দেহে আনয়ন করে। অতএব সর্ব্ববিধ অজ্ঞানের জন্য যে ইহা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে দেহ যদি ক্ষিতি ও অপ্ প্রধান হয়, তবে জীব তমঃ প্রধান হইবেন যদি দেহ তেজঃ ও বায়ু প্রধান হয়, তবে তিনি রজঃ প্রধান বা রজঃ-সত্ত্ব প্রধান হইবেন, যদি দেহ ব্যোম প্রধান হয়, তবে তিনি সত্ত্বগুণ প্রধান হইবেন। দেহ তিন প্রকার। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন প্রকার দেহ ক্রমান্বয় উক্ত তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের প্রধান আধার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ভূত সকলের বিভিন্ন স্তর আছে। ত্রিবিধ গুণ অবশ্যই দেহের অনুসরণ করিবে। সুতরাং উহাদের বিভিন্ন স্তর আছে। পরমর্ষি গুরুনাথ উহাদের পাঁচটী প্রধান বিভাগ করিয়াছেন। যথা—তমঃ, রজস্তমোমিশ্র, রজঃ, সত্ত্বরজোমিশ্র ও সত্ত্ব। ত্রিবিধ ভূত প্রধানত্ব হিসাবে দেহকে পাঁচ ভাগ করা যায়। যথা—স্থূল, স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্র, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম-কারণ-মিশ্র ও কারণ। এই পঞ্চবিধ দেহ প্রোক্ত পঞ্চবিধ গুণের যথাক্রমে প্রধান আধার। স্থূল দেহ ক্ষিতি প্রধান, স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্রদেহ অপ্ প্রধান, সূক্ষ্ম দেহ তেজঃ প্রধান, সূক্ষ্ম-কারণ-মিশ্র দেহ বায়ু প্রধান ও কারণ-দেহ ব্যোম প্রধান বা একমাত্র ব্যোম। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্থূল দেহের সংখ্যা ৩৯৯, সূক্ষ্মদেহের সংখ্যা ৩৯৯ কম পরার্দ্ধ এবং কারণ দেহের সংখ্যা অনন্ত প্রায়। দেহের শ্রেণী উক্ত প্রকারে পাঁচ ভাগে বিভাগ করায় দেহের সংখ্যাও নিম্নলিখিত ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

দেহের প্রকার সমূহ	প্রকার ভেদে দেহের সংখ্যা	ভূত প্রধানত্বের প্রকার সমূহ	গুণ প্রধানত্বের প্রকার সমূহ
স্থূল	৯৯	ক্ষিতি প্রধান	তমঃ প্রধান।
স্থূল সূক্ষ্ম মিশ্র	৩০০	অপ্ প্রধান	রজস্তমোমিশ্র।
সূক্ষ্ম	৩৯৯ কম এক কোটী	তেজঃ প্রধান	রজঃ প্রধান।
সূক্ষ্ম-কারণ-মিশ্র	কোটী কম পরার্দ্ধ	মরুৎ প্রধান	সত্ত্ব-রজোমিশ্র-প্রধান।
কারণ	অনন্ত প্রায়	ব্যোম প্রধান বা একমাত্র ব্যোম *	সত্ত্ব প্রধান বা একমাত্র সত্ত্ব *

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতিকে আমরা অষ্ট পাশ বলিয়া থাকি। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাদের দেহাত্মবোধ আছে, তাহাদেরই উক্ত অবস্থাগুলি বর্ত্তমান। যাহারা দেহাত্মভেদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহারা পাশের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব আমরা দেহকেই মহাপাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। কারণ, দেহই পাশ সমূহের উৎপত্তির

---

* একমাত্র ব্যোম বলায় কেবল মাত্র পঞ্চীকৃত পঞ্চ ব্যোম বুঝিতে হইবে। ভূত সমূহ পঞ্চীকৃত পঞ্চ হওয়ার পরে কোনটীই বিশুদ্ধভাবে জগতে নাই। সত্ত্বও তদনুরূপ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কারণলোকের উচ্চতম স্তরে যে ব্যোম বিদ্যমান, তাহাতে অন্যভূতের পরিমাণ এত অল্প যে উহারা নাই বলিলেই হয়। আবার ইহাও অনুমান করা যায় যে সেই সকল ভূতপ্রায় ব্যোমাকার প্রাপ্ত।

ইতিপূর্ব্বে তিন প্রকার দেহের ও তিন প্রকার গুণের কথা বলা হইয়াছে। গুণ ও ভূতের নানারূপ মিশ্রণ জন্য দেহের শ্রেণীর সংখ্যা ও গুণের প্রকার এস্থলে আরও সূক্ষ্মতর ভাবে পাঁচ ভাগ করা হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ সূক্ষ্ম বিচার ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা শেষোক্ত বিভাগ সমূহ স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় উক্তিতে কোনই অসামঞ্জস্য নাই। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কারণ, কারণতর, কারণতম দেহ আছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সকল দেহ জড় সমূহের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে গঠিত। সুতরাং বর্ত্তমান নির্দ্দেশ ও পূর্ব্ব নির্দ্দেশের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভাগের ভেদ মাত্র।

কারণ। এই মহাপাশ আমাদের আদি জন্ম মুহূর্ত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার আশা নাই। তবে সাধনা দ্বারা ও ভগবৎ কৃপালাভে মহাপাশের মহাপাশত্ব যে ক্রমশঃই খসিয়া পড়িবে, তাহা সুনিশ্চিত। এখন দেখা যাউক যে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এর বাধকত্বের তারতম্যের মূলে কি কারণ নিহিত আছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সত্ত্বগুণ প্রকাশক, তমোগুণ আবরক এবং রজোগুণ চালক। রজোগুণ মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রকাশক বা আবরক গুণের মধ্যে কোনটাই উহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু রজোগুণে উভয় ভাবই মধ্যম ভাবে বর্ত্তমান, অর্থাৎ রজোগুণ সম্পূর্ণরূপে আবরকও নহে, সম্পূর্ণভাবে প্রকাশকও নহে। এখন একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে জড় পদার্থের প্রকাশকতার কারণ উহার স্বচ্ছতা। এই জন্যই সত্ত্ব গুণকে স্বচ্ছ বলা হয়। কারণ, উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ। সুতরাং যে পদার্থে স্বচ্ছতাবিরোধী ভাব যত অধিক, সেই পদার্থে ততোঽধিক তমঃ বর্ত্তমান। আবার যে পদার্থ প্রকাশের স্বল্প বাধা প্রদান করে, সেই পদার্থ তত সত্ত্ব প্রধান। এখন পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্ স্বচ্ছ সেইরূপ অপ্ অপেক্ষা তেজঃ, তেজঃ অপেক্ষা মরুৎ, মরুৎ অপেক্ষা ব্যোম স্বচ্ছ। সুতরাং ক্ষিতি প্রধান দেহ প্রকাশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা উৎপাদন করে। সেইরূপ অপ্ প্রধান দেহ ক্ষিতি প্রধান দেহ অপেক্ষা, তেজঃ প্রধান দেহ অপ্ প্রধান দেহ অপেক্ষা, মরুৎ প্রধান দেহ তেজঃ প্রধান দেহ অপেক্ষা এবং ব্যোম প্রধান দেহ মরুৎ প্রধান দেহ অপেক্ষা অল্পতর বাধা উৎপাদন করে। অর্থাৎ ব্যোম প্রধান দেহই অল্প বাধা উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণের বিশেষত্বই উহার স্বচ্ছতা এবং এই জন্যই উহাতে প্রকাশকত্বের আধিক্য। দেখা যায় যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ক্রমশঃ স্বচ্ছ এবং ব্যোমে স্বচ্ছতা চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক ত্রিগুণ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারাও আমরা পাই যে দেহ যতই সাকার-ভূত-প্রধান হয়, জীব

ততোঽধিক আবরণে আবৃত থাকে ও দেহ যত নিরাকার-ভূত-প্রধান হয়, ততই উহা অধিক হইতে অধিকতর প্রকাশবান অবস্থা লাভ করে। অর্থাৎ জড়ের আবরণ শক্তি ভূতের নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব অনুপাতে অল্লাধিক হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, তমোগুণ ক্ষিতি ও অপ্ প্রধান দেহে অধিক, রজোগুণ তেজঃ এবং মরুৎ প্রধান দেহে অধিক এবং সত্ত্বগুণ ব্যোম প্রধান দেহে অধিক। অর্থাৎ দেহ যতই নিরাকার ভূত প্রধান হয়, তমঃ ও রজঃ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে সত্ত্ব প্রধানতা বা একমাত্র সত্ত্বই থাকিবে। এখন আমরা এই বিষয়টী সম্বন্ধে অন্য ভাবে চিন্তা করিতে পারি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অব্যক্ত পরমপিতার একটী স্বরূপ। আমরা "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। আবার "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে অব্যক্ত স্বরূপ অচেতন এবং উহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জড় জগৎও অচেতন হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপন্ন জড় উৎপাদক অচেতন অব্যক্ত স্বরূপের অচৈতন্য লাভ করিয়াছে। যে স্থানেই অচৈতন্য, সেই স্থানেই অজ্ঞান। দেহ আত্মার আবরণ স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরেও প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং জড়পদার্থ দ্বারা আবৃত আত্মাও অজ্ঞানান্ধকারে অবস্থিত মনে করিতে হইবে। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহরূপ আবরণ হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইব, ততদিনই জড়াবরণ জনিত অজ্ঞান আমাদের সাথের সাথী থাকিবে, পরিমাণের পার্থক্য হইবে মাত্র। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় পদার্থ মাত্রই যদি অজ্ঞান উৎপাদক, তবে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের আবরণের পার্থক্য জনিত অজ্ঞানের তারতম্যের কথা বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জড় মাত্রই অজ্ঞান উৎপাদক বটে, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের জ্ঞান আবরণ করিবার শক্তির তারতম্য আছে, ইহাও বুঝিতে হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অব্যক্তের প্রথম পরিণাম ব্যোম। ব্যোমকে জাগতিক ভাষায় কারণ-পদার্থ পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু অব্যক্তের তুলনায় যে উহাও স্থূল পদার্থ, সে বিষয়ে

কোনই সন্দেহ নাই। তৎপর ব্যোমোৎপন্ন মরুৎ অব্যক্তের দ্বিতীয় পরিণাম। উহা ব্যোম হইতে স্থূলতর এবং অব্যক্ত হইতে আরও স্থূলতর। সেইরূপ মরুদুৎপন্ন তেজঃ অব্যক্তের তৃতীয় পরিণাম, তেজোৎ-পন্ন অপ্ অব্যক্তের চতুর্থ পরিণাম এবং তদুৎপন্ন ক্ষিতি অব্যক্তের পঞ্চম পরিণাম এবং উহারা ক্রমশঃ স্থূল। উক্ত পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া আরও বিকার প্রাপ্ত হইল। এখন বিকৃতির কত অসংখ্য স্তরে যে জাগতিক পদার্থ সমূহ বর্ত্তমান, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। অব্যক্তের তুলনায় উহাদের স্থূলত্ব বর্ণনাতীত। স্থূল পদার্থ মাত্রই আবরণের কার্য্য অধিকতর রূপে সম্পাদন করে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য এবং ইহা ইতি-পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং জড় পদার্থ যতই স্থূল হইবে, ততই উহা অধিকতর আবরক এবং যত উহা সূক্ষ্ম হইবে, ততই আবরণ অল্প হইতে অল্পতর, অল্পতম হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিলাম যে জড়দেহ কোন স্তরে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। আবার বিকৃত পদার্থ মাত্রই উৎপাদক হইতে স্থূল। স্থূল পদার্থ মাত্রই তদপেক্ষা অল্পতর স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে অধিকতর আবরণের কার্য্য করে। সুতরাং ক্ষিতি-প্রধান-দেহ অপ্-প্রধান-দেহ হইতে অধিকতর আবরক ভাবে কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ অপ্-প্রধান-দেহ তেজঃ-প্রধান-দেহ, মরুৎ-প্রধান দেহ ও ব্যোম-প্রধান-দেহ ক্রমশঃ অল্প আবরক। আররণের আধিক্য ও অল্পতা অনুযায়ী অজ্ঞানের আধিক্য ও অল্পতা অবশ্যম্ভাবী এবং অজ্ঞানের আধিক্য ও অল্পতা অনুযায়ী দোষ পাশের আধিক্য বা অল্পতা অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য নিশ্চিত হয়। আমরা দেখিলাম যে অজ্ঞান আবরণ জনিত। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, যে স্থলে আবরণের আধিক্য, সেই স্থলেই অজ্ঞানেরও আধিক্য। আবার যে স্থলে আবরণের অল্পতা, সেই স্থানেই অজ্ঞানেরও অল্পতা অবশ্যম্ভাবী রূপে উৎপন্ন হইবে।*

---

* এই আবরণত্ব স্থূলতম পদার্থে অধিকতম এবং কারণতম পদার্থে অল্পতম বটে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে আবরণের কার্য্য আমরা যেরূপ স্থূল ভাবে ধারণা করি, আত্মা জড় পদার্থ দ্বারা সেইরূপ ভাবে আবৃত নহেন। আত্মা জড় পদার্থের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণোৎপন্ন জাত গুণরাশি দ্বারা—দোশ-পাশ-সমূহ দ্বারা অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা আবৃত। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে এই অজ্ঞানই জড় দেহের নানাস্তরে নানাভাবে উৎপন্ন এবং সেই নানাবিধ অজ্ঞানকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সত্ত্বাবস্থাও ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা নহে, তবে উহা ব্রহ্মদর্শন লাভের অধিকতম সহায় অথবা সেই অবস্থায় জ্ঞান প্রকাশের বাধা অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য। সূক্ষ্মদেহ অপেক্ষা স্থূলদেহে যে অজ্ঞানাধিক্য বর্ত্তমান এবং কারণদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম দেহে অজ্ঞান অধিকতর, ইহা হিন্দু শাস্ত্রও বলেন! ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও অনুমিত হইতে পারে। বৃক্ষে আত্মা বর্ত্তমান, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। কারণ, স্বয়ং ব্রহ্মই লীলার্থ বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। জীবাত্মা সমূহ যখন স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, তখন আত্মায় আত্মায় কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। বৃক্ষাত্মা তাঁহার সুকঠিন দেহ দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রধান দেহ দ্বারা এতদূর আবদ্ধ যে তিনি একেবারে তমোগুণাক্রান্ত—তমসাচ্ছন্ন। তাঁহার স্বল্প জ্ঞানই দেহ দ্বারা প্রকাশিত হয়। সাধারণে উহার চৈতন্য লক্ষ্য করিতে পারে না। আমরা যদি নানা স্তরের জীবদেহ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে দেহ সমূহ এমন ভাবে গঠিত যে উহাতে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর জ্ঞান প্রকাশিত হয়। পৃথিবী মণ্ডলে মনুষ্য দেহেই জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ইহার মূলেও পঞ্চভূতের সংমিশ্রণের প্রণালী বর্ত্তমান। বৃক্ষ-দেহে ক্ষিতি ভাগ অত্যধিক, কিন্তু ক্রমশঃ উচ্চতর দেহে ক্ষিতির অংশ অল্প হইতে অল্পতর হয় এবং অন্যান্য ভূত অধিক হইতে অধিকতর হয়। মনুষ্যদেহে ক্ষিতি ও অপ্ যথেষ্ট পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু ইতর জীবদেহের তুলনায় অল্পতর এবং ইহাতে তেজঃ, বায়ু ও ব্যোমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর। মনুষ্য-দেহ দ্বারা যে পৃথিবীস্থ অন্যান্য সকল জীবদেহ হইতে অধিকতর জ্ঞান প্রকাশিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বৈজ্ঞানিকগণও বলিয়া থাকেন যে মনুষ্য দেহের গঠন প্রণালী উন্নততমা, সুতরাং ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে যে মনুষ্য হইতেও ক্রমশঃ উন্নত আত্মাদিগের দেহ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সুতরাং উহাদের জ্ঞান প্রকাশের

বাধা প্রদান শক্তিও ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর। ক্ষিতি-প্রধান হইতে অপ্-প্রধান দেহে, অপ্-প্রধান হইতে তেজঃ-প্রধান দেহে, তেজঃ-প্রধান হইতে মরুৎ-প্রধান দেহে এবং মরুৎ-প্রধান দেহ হইতে ব্যোম প্রধান দেহে ক্রমশঃ জ্ঞানের অধিকতর প্রকাশ কেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাকার-ভূত প্রধান-দেহ সেইরূপ ভাবেই কার্য্য করে, যাহাতে উহা অত্যধিক পরিমাণে জ্ঞান আবরণ করিতে পারে। এইরূপ অন্যান্য-ভূত-প্রধান-দেহ সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে উহাদের ক্রিয়াও এই-রূপ যে তাহা দ্বারা উহারা জ্ঞান প্রকাশের অল্প হইতে অল্পতর বাধা উৎপাদন করে। অজ্ঞানকে অন্ধকার ভাবে গ্রহন করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর ধারণা করা সহজ। স্থূল ভাবে বলিতে গেলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জড় উহার উৎপাদক অব্যক্ত স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় অর্থাৎ আকার এবং অজ্ঞান উভয়ই লাভ করিয়াছে এবং ব্যোম হইতে ক্ষিতি-ভূত সমূহ এবং উহাদের দ্বারা গঠিত জড় পদার্থ মাত্রই অজ্ঞান এবং আকার দ্বারা জ্ঞান প্রকাশের বাধা উৎপাদন করিবেই। জড় পদার্থ এই দুইটী গুণ বিবর্জ্জিত অবস্থায় কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত দেহ মাত্রই এই দুইটী গুণের ফল প্রদান করিবে। যে স্থলে আকারের তারতম্য আছে, সেই স্থলেই উক্ত গুণ-দ্বয়ের কার্য্যেরও তারতম্য অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং সাকার-ভূত-প্রধান অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রধান দেহে তমঃ এর প্রাধান্য এবং নিরাকার-ভূত-প্রধান অর্থাৎ ব্যোম-প্রধান দেহে সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকাশের প্রাধান্য থাকিবেই। অন্যান্য-ভূত-প্রধান দেহ সমূহ ভূতের নিরাকারত্বের বা সাকারত্বের প্রাধান্যের তারতম্য অনুযায়ী ক্রমশঃ প্রকাশবান বা তমঃ প্রধান হইবে। ইতঃপর লিখিত মেঘের দৃষ্টান্তে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিব যে দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী আমাদের জ্ঞানের কেন ও কিরূপ তারতম্য হয়। অতএব আমরা বিভিন্ন প্রকার বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা পাইলাম যে দেহই আমাদের বন্ধনের বা আবরণের মূল। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। সুতরাং উহার

আবরণের শক্তি জড় হইতে লাভ করিয়াছে। আবার জড়ের আবরণের শক্তি উহার উৎপাদক অব্যক্ত স্বরূপ হইতে লাভ করিয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে জড় যতই স্থূল, ততই উহাতে আবরণের আধিক্য বর্ত্তমান এবং উহা যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকিবে, ততই উহাতে আবরণের অল্পতা বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি অর্থাৎ দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী আবরণের আধিক্য, অল্পত্ব ও স্বল্পত্ব সূচিত হয়, তাহার সত্যতা নানা ভাবেই প্রমাণিত হইল। আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে জড় উহার উৎপাদক অব্যক্ত স্বরূপ হইতে দুইটী ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, যথা—আকার এবং অচৈতন্য এবং জড়ের এই দুইটী গুণই বিশেষ ভাবে জীবাত্মার বাধকত্বের কারণরূপে বর্ত্তমান। ৪৫৮-৪৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মহামনা Plato ও তাঁহার কল্পিত স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থটীর বাধা দিবার শক্তি আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেই জড়ের উৎপত্তি। সুতরাং জড়ের বাধা দিবার শক্তি আছে এবং উহা উহার উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সেই নিরাকার পদার্থটীই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ। উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছায় উহা জগৎ গঠনে নিযুক্ত। সুতরাং Plato এর মত অনুধাবন করিয়া আমরা পাইলাম যে জড় পদার্থই আমাদের উন্নতি বা বিকাশের বাধক। এখন প্রকৃতিতেও আমরা উৎপন্ন দ্বারা উৎপাদকের অংশের আবরণ সৃষ্টি যে দেখিতে পাই, তাহার সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়—তেজঃপুঞ্জ কলেবর সহ আমাদের নিকট বর্ত্তমান। তেজঃ হইতে অপের (জলের) সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ইতিপূর্ব্বে কথিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। সূর্য্য নিজ তেজ দ্বারা সেই জলকে বাষ্পাকারে পরিণমন করে। বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ সৃষ্ট হয়। এই মেঘই দ্রষ্টা মানবের পক্ষে এমন আবরণের কার্য্য করিতে পারে যে উহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকেও মোটেই দেখিতে দেয় না। তাহার দৃষ্টি পথের অন্তর্গত সমস্ত দেশই তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়।

মেঘের ঘনত্বের পরিমাণানুযায়ী সূর্য্য কখনও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়, কখনও উহার জ্যোতির কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের নয়ন গোচর হয়, আবার কখনও সূর্য্যালোক অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয় ও সূর্য্যকেও কখনও কখনও দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তে আমরা পাইলাম যে উৎপাদক তেজঃ হইতে উৎপন্ন জলকে আবার তেজঃ নিজেই বাষ্পাকারে পরিণমন করিয়া তিনটী অবস্থা দান করে। প্রথম অবস্থায় দ্রষ্টা মানব সম্পূর্ণরূপে আবৃত হন। তিনি তখন সূর্য্য বা সূর্য্যালোক মোটেই দেখিতে পান না। এই অবস্থাকেই সাধারণ স্থূল দেহ ধারীর অবস্থার সহিত উপমিত হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে মানবের পক্ষেই মেঘ আবরণ স্বরূপ হইল, কিন্তু সূর্য্য ত কখনও আবৃত হইলেন না। মেঘ এত বিরাট হইতে পারে না যে উহা পৃথিবীর চৌদ্দ লক্ষ গুণ বৃহত্তর সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ করিবে। আবার মানব কখনই সূর্য্যের অংশ হইতে পারে না। সুতরাং উৎপন্ন দ্বারা উৎপাদকের বা উহার অংশের আবরণ সৃষ্ট হইল না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহা সত্য যে সূর্য্য কখনও মেঘ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হন না। পূর্ব্বোক্ত অবস্থায়ও সূর্য্য নিজ তেজে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত থাকেন। সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর জন্ম। আবার পৃথিবী হইতেই মানব দেহের জন্ম। সুতরাং সূর্য্য হইতেই পরম্পরা ভাবে মানব দেহের জন্ম।* আবার মানব দেহের একটী মাত্র অঙ্গ চক্ষুই সূর্য্য দর্শন করে। উহার অন্যান্য অঙ্গ সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। এই চক্ষু যে তেজঃ প্রধান ভাবে গঠিত, তাহা আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং তেজঃ হইতে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন এবং ঘনীভূত বাষ্পরাশি বা মেঘ সেই তেজেরই অংশ স্বরূপ মানব চক্ষুকে আবরণ করিয়া রাখে তাহা প্রমাণিত হইল। অর্থাৎ উৎপাদক হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন পদার্থ উৎপাদকের অংশ

---

* পৃথিবীর সমুদায়ই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং পৃথিবীজাত যাহা কিছু, তাহাই পরম্পরা ভাবে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত জগৎ অরম্পরা ভাবে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

আবরণ করিতে সমর্থ অর্থাৎ উৎপাদক ও তাহার অংশের মধ্যে পরদা বেষ্টন করিনে সমর্থ। আবার আমরা ইহা চিন্তা করিতে পারি এবং আপত্তিকারীও অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন যে মেঘ সূর্য্যের একটু অতি ক্ষুদ্র অংশ আবরণ করিয়া রাখিতে পারে বলিয়া আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না। ব্রহ্মের পরম্পরা ভাবে অংশ স্বরূপ মানব দেহও সেইরূপ অনন্ত ও পূর্ণ ব্রহ্মকে আবরণ করে নাই, কিন্তু উহা তাঁহার অংশ মাত্র আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এইস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে উক্ত অংশ শব্দ ব্রহ্মকে একটী অনন্ত বিরাট দেশ মনে করিয়া ব্যবহৃত হইল। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেন অনন্ত বিস্তৃত একটী দেশ এবং জীবাত্মাগণ যেন তাঁহাতে বিন্দু বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্ম ত প্রকৃত পক্ষে একটী দেশ নহেন, তিনি দেশে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেশাতীত। তাঁহাকে বৃহৎই বলা হউক্ অথবা অনুই বলা হউক্, অথবা অনন্তই বলা হউক্, তিনি নিত্যই এক, অখণ্ড এবং আমাদের ধারণীয় অণুতেও তিনি অনন্ত ও পূর্ণ। সুতরাং দেহে যিনি, তিনি স্বরূপে পূর্ণ, কিন্তু দেহ দ্বারা আবৃত হওয়ায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ দেহ পূর্ণকে আবরণ করিয়া ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সূর্য্য একটী দেশ, সুতরাং উহার অংশ সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, কিন্তু অখণ্ড, অব্যয়, নিষ্কল, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মের ত কোনও প্রকারের অংশ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার কোনও প্রকারের অংশের ধারণা করা যাইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণে আমরা বুঝিতে পারি যে দেহ পূর্ণকে আবরণ করিয়া ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান করিয়াছে, যেমন মেঘ সূর্য্যকে আবরণ করিয়া উহাকে একেবারে অদৃশ্য করে এবং অন্যান্য অবস্থা দান করে। দেহ কেন ইহা করিতে সমর্থ তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জাগতিক দৃষ্টান্ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উহা প্রকৃত তত্ত্বের আভাস প্রদানে মাত্র সমর্থ। আর দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সম্পূর্ণ-রূপে এক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় বলা যায়, তবে আর উহা দৃষ্টান্ত পদবাচ্য থাকে না। আমরা পার্থিব বহু জ্ঞান দৃষ্টান্ত বা

উপমা দ্বারা লাভ করি, কিন্তু পরমপিতা যে উপমা রহিত। যদি জাগতিক দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইত, তবে আর তিনি অনির্ব্বাচ্য থাকিতেন না। কিন্তু সকল মহাপুরুষ এক বাক্যে ব্রহ্মকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়াছেন। আমরা এই বিষয়টী অন্য ভাবে চিন্তা করিলেও দেখিতে পাইব যে দেহ কি প্রকারে পূর্ণ ব্রহ্মকে ক্ষুদ্র ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মেঘ সূর্য্যকে সম্পুর্ণরূপে আবরণ করিতে পারে না। যাহা হয়, তাহা এই যে মেঘ দেশ বিশেষে সূর্য্য কিরণ প্রকাশের বাধা উৎপাদন করিতে পারে। অর্থাৎ মেঘের জন্য দেশ বিশেষ সূর্য্য কিরণ লাভে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ মেঘের জন্য দেশ বিশেষে সূর্য্য হীনশক্তি হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যদিও সূর্য্য পৃথিবীর অন্যত্র এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে নিজ উত্তাপ এবং আলোক প্রদান করে। অর্থাৎ সূর্য্য তাহার নিজ স্বভাবে থাকিয়াও দেশ বিশেষে মেঘের জন্য তাহার হীন শক্তি হইতে হয়। সেইরূপ দেহজাত দোষপাশরাশি অন্ধকার বা আবরণ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মকে তথায় অর্থাৎ সেই দেহে ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ করে। অতএব দেখা গেল যে উৎপন্ন দ্বারা উৎপাদক হীন শক্তি ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। মেঘের দ্বিতীয় অবস্থাকে দেহের সূক্ষ্মাবস্থার সহিত উপমিত হইতে পারে। এই অবস্থায় উহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও ঘনত্ব অল্পতর। সুতরাং সেই মেঘে সূর্য্যালোক সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কারণ, সেই মেঘে জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের অল্পতার জন্য অত্যল্প স্বচ্ছতা আনয়ন করে। কাজে কাজেই আমরা যৎকিঞ্চিৎ সূর্য্যালোক দেখিতে পাই, কিন্তু সূর্য্য দেখিতে পাই না। এই অবস্থাকে সূক্ষ্মদেহ ধারী আত্মাগণের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম দেহধারী পারলৌকিক মহাত্মাগণের জড়ের বাধা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থূল দেহধারীর বাধা হইতে অল্পতর। তাই তাঁহারা পরমাত্মার আভাস অনুভব করেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন না। সেইরূপ মেঘের তৃতীয় অবস্থায় উহাতে জলীয় বাষ্প অত্যল্প পরিমাণে থাকে বলিয়া উহার ঘনত্ব অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পায় এবং অধিকতর স্বচ্ছ হয়। তাই আমরা যে সূর্য্যালোক স্ফুটতর ভাবে দেখিতে পাই,

তাহা নহে, কিন্তু সূর্য্যকেও কখনও কখনও দেখিতে পাই। কারণ, উক্ত অবস্থায় মেঘ আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে অপসৃত হয়। এই অবস্থাকে কারণ দেহধারী মহাত্মাগণের অবস্থা বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের পক্ষে জড়ের বাধা অত্যল্প বিধায় তাঁহারা ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন এবং কখনও কখনও তাঁহারই অপার কৃপায়—তাঁহারই দর্শন লাভ করেন। এই অতি সূক্ষ্ম বাধাও যতই হ্রাস পাইতে থাকে, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মদর্শন লাভও পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। পরিশেষে তাঁহারা সেই নিত্য প্রাণরমন প্রাণপতির জ্ঞান-প্রেমময় সূর্য্যের নিত্য দর্শন লাভ করেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে স্থূল দেহধারী পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারও তাঁহাদের ন্যায় ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি হইতে পারে। মেঘের তিনটী অবস্থার কথাই মাত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেও ক্রম বর্ত্তমান। সুতরাং মেঘের ঘনতম অবস্থা হইতে উহা নিঃশেষ হওয়া পর্য্যন্ত বহুস্তর থাকে। সেই জন্যই স্থূলত্ব হ্রাস পাইতে পাইতে যখন সূক্ষ্মত্বের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন স্থূল-দেহধারী সূক্ষ্মদেহের পূর্ব্বাভাস লাভ করেন। সেই জন্যই সূক্ষ্মত্ব হ্রাস পাইতে পাইতে যখন কারণত্বের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সূক্ষ্ম দেহধারী প্রায় কারণ-দেহের অবস্থা লাভ করেন ইত্যাদি। স্থূল মেঘ সঞ্চার হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে উহার নিঃশেষ হওয়ার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহু বহু স্তর থাকে। জীব দেহেরও সেইরূপ অসংখ্য স্তর আছে। মেঘ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু দেহ চিরকাল স্থায়ী। সুতরাং তাহাতে স্তরও অসংখ্য থাকিবে। পাঠক মনে রাখিবেন যে উক্ত অবস্থা সমূহেই সূর্য্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত থাকে। কোন অবস্থায়ই তাহার প্রকাশের অভাব বা তারতম্য হয় না। বাধার তারতম্য অনুসারে আমাদের নিকট উহার প্রকাশের নানা অবস্থা সংঘটিত হয়। সৃষ্টিতেও উক্তরূপভাব সংঘটিত হইয়াছে। অনন্ত ও নিত্য জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছা সহযোগে তাঁহারই গুণ বিশেষ অবলম্বনে জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজে স্বয়ং নিত্য প্রকাশবান থাকিয়াও জড়ভাবে জড়িত জীবের নিকট তিনি যেন

অ বরণ দ্বারা আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মাই যেন দেহজাত নানাবিধ দোষ-পাশের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। যে দেহে যে পরিমাণে সাকার ভাবাপন্ন ভূতাধিক্য বর্ত্তমান, সেই দেহে সেই পরিমাণে আবরণের আধিক্য বুঝিতে হইবে। আবার যে দেহ যত নিরাকার ভাবাপন্ন ভূতদ্বারা গঠিত, সেই দেহে সেই পরিমাণ স্বচ্ছতা বা আবরণের অল্পতা বা স্বল্পতা। আরও একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্তভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সূর্য্যগ্রহণ কালে সূর্য্য চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হইয়া থাকে। তাই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না। চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং চন্দ্র পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্র পরম্পরাভাবে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। অতএব দেখা যায় যে উৎপাদক উৎপন্ন দ্বারা আবৃত হইতে পারে। আমাদেরও সেই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। জড় দেহ ব্রহ্ম হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন। সেই দেহই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশ ভাবে ভাসমান জীবাত্মার আবরণের কার্য্য করে এবং ব্রহ্মদর্শনে আমাদিগকে বাধা প্রদান করে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে মেঘের যেরূপ নানা অবস্থার কথা লিখিত হইয়াছে, সূর্য্য গ্রহণেও সেইরূপ নানা অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। পূর্ণ গ্রাসে অন্ধকারও পূর্ণ এবং ক্রম-মোক্ষে অন্ধকারের ক্রমাপসরণ। পরিশেষে গ্রহণান্তে মোক্ষাবস্থায় সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ। সেইরূপ সাধারণ স্থূল দেহধারীর পক্ষে সকলই অন্ধকার এবং ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয় না। কিন্তু যতই আমাদের স্থূলত্ব হ্রাস পাইয়া আমরা সূক্ষ্মত্বে যাই, আবার সূক্ষ্মত্ব হইতে কারণত্ব লাভ করি, ততই আমরা ব্রহ্মদর্শনের দিকে অগ্রসর হই এবং পূর্ণামুক্তিতে বা পূর্ণমোক্ষে পূর্ব্বপরম চৈতন্যাবস্থা লাভ করি। আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে সূর্য্য সর্ব্বকালেই প্রকাশিত ছিল ও আছে। গ্রহণ-কালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বাধা উপস্থিত হয়, তাই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না। সেইরূপ নিত্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার অনন্ত জ্যোতিঃতে নিত্যই প্রকাশিত। তাঁহার নিত্য প্রকাশের কখনও কোনও বাধা নাই বা থাকিতে পারে না। আমাদের সম্মুখের

বাধা যতই নিরসন করিতে পারিব, তাঁহার প্রকাশ ততই আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইবে। উৎপাদক যে উৎপন্ন দ্বারা আবৃত হইতে পারে, তাহার আরও বহু দৃষ্টান্ত প্রকৃতি হইতে আমরা লাভ করিতে পারি। এখন এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে জড়ের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব অনুসারে যদি আবরণের আধিক্য ও অল্পতা হয়, তবে কি পরমাত্মা জড় পদার্থ যে তাঁহাকে স্থূল জড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম জড়ের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখা যায়? ইহার উত্তরে প্রথমতই বক্তব্য এই যে একথা কখনও বলা হয় নাই যে পরমাত্মা কখনও জড় দ্বারা আবৃত হন। জীবাত্মাই অর্থাৎ দেহাবদ্ধ ভাবে ভাসমান আত্মাই দেহজাত অন্ধকার দ্বারা যেন আবৃত হন। আবরণের প্রশ্ন তাঁহারই সম্বন্ধে, পরমাত্মা সম্বন্ধে নহে। এত সময় যে আলোচনা করা গিয়াছে, তাহার অর্থ এই নহে যে ব্রহ্মকে জড় পদার্থের ন্যায় সাধারণ জড়ীয় আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায়, আবার সেই জড়ীয় আবরণ উন্মোচন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হইত, তবে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে আমরা আকাশে বাতাসে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। কারণ, আকাশ ও বাতাস উভয়ই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ জড় পদার্থ এবং উহাদের মধ্য দিয়া দূরস্থিত বা নিকটস্থিত জড় পদার্থ অনায়াসেই দৃষ্ট হয়। এত সময় আমরা যাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই যে আত্মার আবাস ভূমি জীবদেহ এমনি সুকৌশলে গঠিত যে উহা যতই স্থূল হইবে, ততই উহা জীবাত্মার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের এবং ব্রহ্মদর্শনের অধিকতররূপে বাধা জন্মাইবে। ইহার কারণ এই যে দেহ যতই স্থূল হইবে, উহাতে ততই সাকার ভাবাপন্ন ভূতাধিক্য বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং উহা ততোহধিক তমোভাবাপন্ন হইবে। আবার দেহ যতই সূক্ষ্ম হইবে, উহাতে ততই নিরাকার ভাবাপন্ন ভূতাধিক্য বর্ত্তমান থাকিবে এবং উহা রজঃ, রজঃ-সত্ত্ব এবং সত্ত্ব ভাবাপন্ন হইবে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাকার-ভূত-প্রধান দেহ উহার ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ তমঃ উৎপাদন করে, নিরাকার-ভূত-

প্রধান দেহ সেই পরিমাণে তমঃ উৎপাদন করে না ও করিতেও পারে না। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জড় উহার উৎপাদক অব্যক্ত স্বরূপের শক্তি লাভ করিয়াছে এবং উহার (জড়ের) স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী অর্থাৎ সাকারত্ব, সাকার-নিরাকারত্ব ও নিরাকারত্ব অনুযায়ী আবরণের আধিক্য, অল্পতা ও অত্যল্পতা সম্ভব। কারণ, জড়ের ইহা স্বাবাভিক ধর্ম্ম। আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে জড় উহার সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব অব্যক্ত স্বরূপ হইতে লাভ করিয়াছে। এই আবরণের তারতম্য জন্যই আমাদের দেহ তমঃ, রজঃ ও স্বত্ত্বগুণ সম্পন্ন হয়। এই তমঃই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা জন্মায় এবং সত্ত্ব অল্পতম বাধক। অজ্ঞানও জড়ের সুতরাং দেহের একটী প্রধান ধর্ম্ম এবং উহাও যে দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী অল্পাধিক হয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। স্থূল, সর্ব্বপ্রকার দেহই বাধা উৎপাদন করে, উহার পরিমাণের অল্পাধিক্য মাত্র। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জড়ের গুণ মাত্র। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জড়কে ত্রিবিধ কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়) সম্পাদনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জড়ের যে এই তিনটী কার্য্য সম্পাদনের উপযোগিতা বা গুণ আছে, তাহাকেই যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ পঞ্চভূত সৃষ্ট হইল। এই সকল ভূত দ্বারা যে কত অধিক মিশ্রণে মিশ্রিত জড় পদার্থ জগতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জড় যতই মিশ্রিত হউক না কেন, উহাতে উহাদের ধর্ম্ম থাকিবেই। এই ধর্ম্মকেই প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উহাদিগকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলা হয়। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে এই তিন ভাগকেই আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রণালী ক্রমপূর্ণ। সুতরাং একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এক মণ্ডলের দেহ উহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী মণ্ডলের দেহ হইতে বিভিন্ন। আবার বিভিন্ন মণ্ডলের দেহের কথাই বা বলি কেন? পৃথিবীতেই সকল

মানবের দেহ ঠিক একই প্রকারের নহে। উহাদের মধ্যেও পার্থক্য বর্তমান, বিশেষতঃ বিভিন্ন দূর দেশবাসী দেহ সমূহের মধ্যে। কাহারও দেহ তমঃ প্রধান, কাহারও দেহ রজঃ প্রধান এবং কাহারও দেহ সত্ত্ব-প্রধান ইত্যাদি, যদিও মানব সাধারণ রজঃ-সত্ত্ব-প্রধান দেহ ধারণ করে। সুতরাং অসংখ্য দেহে পঞ্চভূতের অসংখ্য মিশ্রণ জন্য সেই সকল দেহে ত্রিগুণের অসংখ্য মিশ্রণ সম্পাদিত হইয়াছে। সত্ত্ব শব্দের অর্থ সৎ এর ভাব (সৎ+ত্ব) অর্থাৎ যাহাতে প্রকাশকত্বের শক্তি বর্ত্তমান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সত্ত্ব যদি প্রকাশই করে, তবে উহাকেও আবরণ বা বন্ধন বলা হইল কেন। ইহার উত্তরে প্রথমতঃই বক্তব্য যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব জগতে নাই। কারণ বিশুদ্ধ ব্যোমও জগতে নাই। পঞ্চীকৃত পঞ্চ হইবার পর ব্যোমেও অন্যভূত বর্ত্তমান। সুতরাং যে সত্ত্ব জগতে বর্ত্তমান, তাহাও বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে। তাহাতেও সূক্ষ্মভাবে রজঃ ও তমঃ বর্ত্তমান। আবার উক্তরূপ মিশ্রিত ব্যোমের ভিতরেও অন্য ভূতের অল্পাধিক বর্ত্তমানতা আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে সাধক যতই কারণ, কারণতর ও কারণতম দেহ ধারণ করিবেন, তাহার দেহে সত্ত্বাধিক্যের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ দেহের গঠনে ব্যোমের যত আধিক্য বর্ত্তমান থাকিবে দেহে ব্যোম যতই শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর, শুদ্ধতর হইতে শুদ্ধতম হইবে, সত্ত্বগুণ দেহে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। সত্ত্ব শব্দের অর্থ সতের ভাব বা আভাস মাত্র, কিন্তু উহা প্রকৃত সৎ নহে। উহা জড়ের ধর্ম্ম মাত্র, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। উহা ব্রহ্মের গুণ নহে, কিন্তু বিকৃত পদার্থের গুণ। কারণ জড় চির বিকৃত। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবার ব্যোম যতই সূক্ষ্ম হউক্ না কেন, উহা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের তুলনায় স্থূল বই আর কিছুই নহে। সুতরাং উহাও যে সত্যস্বরূপ প্রাপ্তির বাধা জন্মাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে এই বাধা অপেক্ষাকৃত অত্যল্প এই মাত্র। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ব্যোমের অর্থ শূন্যতা নহে। উহাও একটী জড় পদার্থ। উহা যতই বিশুদ্ধ হইবে, ইহার স্বচ্ছতা

ততই বৃদ্ধি পাইবে। স্বচ্ছা বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। বুদ্ধি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না। ব্রহ্ম দর্শন করিতে হইলে অন্তঃকরণের লয় করিতে হয়। এ বিষয়ে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। "সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণে অনভিভূত হইয়া দেহীকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে দেহে বন্ধন করে। অবিদ্যা দ্বারা যখন দেহীর স্বীয় স্বরূপ জ্ঞানানন্দ তিরোহিত হয়, এবং যখন 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি অভিমানে লিপ্ত হয়, তখন সত্ত্ব গুণ আত্মাতে অন্তঃকরণ-বৃত্তি-ধর্ম্ম সুখ ও জ্ঞানের আরোপ দ্বারা দেহীকে দেহে বদ্ধ করে" *। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে সত্ত্বগুণের সাহায্যে যে সুখ ও জ্ঞান লাভ করি, তাহা বিশুদ্ধ সুখ ও জ্ঞান নহে। অর্থাৎ উহারা আত্মার স্বীয় স্বরূপ সুখ ও জ্ঞান নহে। উহারা বিকৃত, তাই উহাদিগকে অন্তঃকরণ বৃত্তি বলা হইয়াছে এবং এই জন্যই উহারা আমাদিগকে মোক্ষ দান না করিয়া দেহে বন্ধন করে। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে লিখিত বিষয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। রন্‌জ্ + অস্ = রজস্ = রজঃ = যাহা রঞ্জিত করে। রাগ শব্দও রন্‌জ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা— রন্‌জ্ + ঘঞ = রাগ = অনুরাগ বা আসক্তি। অতএব রজঃ এর মূলে যে কামনা বর্ত্তমান, তাহা সুনিশ্চিত। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন যে "কামের ধর্ম্ম এই যে, যে বস্তুর যে গুণ আছে, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক গুণ দর্শন করায়।" (ক) ইহাতে সুস্পষ্ট যে রজোগুণের মূলে কামনা বাসনা অর্থাৎ কামনা জন্য আমাদের কাম্য বস্তুকে নানাভাবে রঞ্জিত দেখি এবং লভনীয় ও লোভনীয় বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত (৫৮৭ পৃঃ) গীতোক্ত শ্লোকগুলি পাঠে এইভাব আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে কাম অর্থাৎ রজোগুণোৎপন্ন মোহ বশতঃ আমরা দেহকেই আত্মা মনে করি এবং আমরা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিতে বাধা প্রাপ্ত হই। তমঃ এর অর্থ

---

* তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

(ক) অদ্ভুত উপন্যাস।

অতি সুস্পষ্ট অর্থাৎ উহা অন্ধকার এবং অন্ধকারের সকল শক্তি অর্থাৎ আবরণ, অজ্ঞান প্রভৃতি উহাতে বর্ত্তমান। সুতরাং তমঃ যে সর্ব্বপ্রধান বাধক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্য দর্শন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে গুণ বা বন্ধন রজ্জু বলেন। কারণ, উহারা তিনই বিশেষভাবে দেহীকে দেহে বন্ধন করে। অতএব আমরা দেখিলাম যে জড়ের গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনই দেহীকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের দর্শনে বাধা জন্মায়। সেই বাধকতার তারতম্য আছে, এই মাত্র প্রভেদ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জড়দেহোৎপন্ন। ইহা বুঝিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী বাধার আধিক্য, অল্পত্ব ও স্বল্পত্ব উৎপন্ন হয়। আরও একটী বিষয় এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। তাহা এই যে ব্রহ্ম ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান। তিনি ত জড়েও সর্ব্বদাই ওতপ্রোতভাবে প্রকাশিত। তাঁহার নিত্য অত্যুজ্জ্বল প্রকাশের কোথায়ও কখনও কোন রূপই বাধা নাই। কিন্তু সেই প্রকাশ দেখিবে কে? যিনি দেখিবেন, তিনি যদি তমোভাবাপন্ন দেহে বাস করেন ও তাহার সাধনা দ্বারা দেহের স্বাভাবিক তমোভাব সুদূরে সংস্থাপন করিতে না পারেন, তবে ত তিনি অন্ধভাবেই থাকিলেন। সুতরাং তিনি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন না। রজঃ ও সত্ত্ব-প্রধান দেহে ঐ বাধার পরিমাণ অল্পতর বা অল্পতম হইবে বটে, কিন্তু বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে না। সেই দেহবাসীরও ব্রহ্মদর্শনের জন্য সাধনা করিতে হইবে এবং ব্যাকুল প্রাণে ব্রহ্ম কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে যে একমাত্র আত্মাই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। জড় জাত ইন্দ্রিয়গণ আত্মার যন্ত্রস্বরূপ বাহিরের জড় পদার্থ সম্বন্ধে মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারে। উহাদের ব্রহ্মদর্শনের কোনই শক্তি নাই। কারণ, উহারা জড় মাত্র এবং সেই জন্যই পরমাত্মার দর্শনে শক্তিহীন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে দেখিতে পাইব। জীবাত্মা জড়দেহোৎপন্ন রজস্তমঃ এর আবরণে

সর্ব্বদা আবৃত। (খ) সুতরাং তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারেন না। সত্ত্বেরও আবরণ আছে, কিন্তু উহার স্বচ্ছতা ধর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মের প্রকাশ উহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কখনও দেখা যায় না। জীব যখন বহিরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণ আত্মায় লয় করিতে পারেন, অর্থাৎ যখন তিনি বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ লাভ করেন, তখন তিনি পরমাত্মারই কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হন। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে জড় দেহই উহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা (কিন্তু স্থূল ভাবে নহে) আত্মার পক্ষে পরমাত্মার দর্শনে বাধা উৎপাদন করে। স্থূল দেহধারী মানবও যখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পরমাত্মার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে জড় দেহের স্থূল ভাব নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবই আত্মার পরমাত্মা দর্শনের বাধক। আবার সেই সূক্ষ্মভাগও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ভাগত্রয় আবার যথাক্রমে ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ এবং অপ্-ক্ষিতি গঠিত দেহে প্রধান ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী বাধার আধিক্য, অল্পত্ব ও স্বল্পত্ব সংঘটিত হয়। আমরা "গুণবিধান" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে মস্তিষ্কের আকার এবং পরিমাণানুযায়ী মানবের বুদ্ধি (Intelligence) অল্পাধিক হয়। আবার প্রত্যেক মস্তিষ্কে কতকগুলি গ্রন্থি বা পাক (Convolutions) বর্ত্তমান এবং মস্তিষ্কে এই পাকগুলি যত অধিক সংখ্যক হইবে বুদ্ধিও ততোঽধিক হইবে। এই পাকগুলির সংখ্যাধিক্য মস্তিষ্কের আকার ও পরিমাণ হইতেও অধিকতর পরিমাণে বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে জীবদেহের ক্রমশ: উচ্চস্তরে উহাদের গঠন ক্রমশঃ জটিলতর (more complex) এবং ক্রমশঃ জ্ঞান-প্রকাশ অধিকতর। আমরা দেখিয়াছি যে জীবদেহের মূলে জড় পদার্থ এবং জড় পদার্থের সাকারত্বও নিরাকারত্ব অনুযায়ী তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য। আবার উহারা যথাক্রমে আবরক, চালক ও প্রকাশক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে দেহ সত্ত্ব প্রধান পদার্থ

(খ) পৃথিবীস্থ সর্ব্বসাধারণ সকল জীবকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইল।

দ্বারাই সবিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত, তাহা রজঃ প্রধান এবং ততোঽধিক তমঃ প্রধান পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত দেহ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান প্রকাশ করিবে এবং ব্রহ্মদর্শনের সহায় হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের বুঝিতে হইবে যে জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা ঐরূপ অপূর্ব্ব বিধানে জীবদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে জড় জগৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছা সহযোগে উৎপন্ন। দেহও সেইরূপ পরম্পরা ভাবে অব্যক্ত স্বরূপোৎপন্ন। জড়ও তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মকৌশল দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ দেহকে জড় দ্বারা তিনি এমন সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে উহা দ্বারা রাশিকৃত বাধা উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার দেহে বিভিন্ন প্রকার ভূতের বিভিন্ন প্রকার কৌশলে বিভিন্ন প্রকার সংস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রকার বাধা উৎপাদন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে জীব সমূহের তাঁহাতে তন্ময় হইতে ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। এই ভাবেই জীবে জীবে নানা ভাবে গুণ বিধান করা হইয়াছে। কোন গুণ-প্রধান জীব কিভাবে বাধা অতিক্রম করিতে পারে, ইহাই পরীক্ষা। অতএব দেখা গেল যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপ ও তাঁহার জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছা জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্ব ভাবে কার্য্য করিতেছে। দেহের বাধকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেও অব্যক্ত স্বরূপ হইতে প্রাপ্ত শক্তিতে শক্তিমান জড় পদার্থ এবং ব্রহ্মের ইচ্ছা অথবা জীবদেহ নির্ম্মাণে তাঁহার কর্ম্মকৌশল এই উভয়ই আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। অতএব আমরা দেখিলাম যে দেহই ব্রহ্মদর্শনের বাধক এবং দেহের মূলে জড়ের স্বাভাবিক বাধকতা শক্তি এবং উহার নির্ম্মাণ কৌশল। সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে দেহ ও আত্মার যোগ হইলে দেহ জাত বহু দোষ পাশ হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। এই দোষ পাশ রাশিই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে এবং জীবাত্মার আবরণ ভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহার অপূর্ণতা আনয়ন করে, যেমন Toxin নাম বিষ দেহে উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কে গমন করিয়া জ্ঞান

হরণ করে। ইহার আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে দেখিতে পাইব। অতএব আমরা দেখিলাম যে দোষ পাশ রাশি ব্রহ্ম দর্শনের বাধক এবং সেই দোষ পাশ রাশি দেহজাত, তাই উহাদিগকে জাতগুণ বলা হয়। আবার দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও কারণত্ব অনুযায়ী দোষপাশের অত্যাধিক্য অল্পতা ও স্বল্পতা সংঘটিত হয়। সুতরাং দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আবরণ এবং সেই দেহ যত সাকার-ভূত-প্রধান ভাবে গঠিত হইবে, ততই উহাতে আবরণাধিক্য বর্ত্তমান থাকিবে। আবার উহা যত নিরাকার-ভূত-প্রধান ভাবে গঠিত হইবে, উহাতে আবরণের ক্রমশঃ অল্পতা বা স্বল্পতা থাকিবে। স্থূলভাবে যদি বলা হয়, যেমন আলোচ্য প্রশ্নে বলা হইয়াছে, যে ক্ষিতি আমাদের সর্ব্বপ্রধান আবরণ অর্থাৎ ক্ষিতি নির্ম্মিত পদার্থ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বাধকভাবে কার্য্য করে, সুতরাং ক্ষিতি—প্রধান-দেহধারী সেই জন্যই ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না, তবে সেই ভাবের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হইবে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অনন্ত প্রেমময় পরম-পিতা তাঁহার অনন্ত প্রেমে জীবদিগকে অব্যর্থ সন্ধানে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক জীব দ্বারা বাধা অতিক্রম করাইয়া তাহাদিগকে নিজ অনন্ত প্রসারিত প্রেম ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিবেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাবটী সুস্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হইবে বলিয়া মনে করি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানও তাহাই বলেন। আমরা দেখিতে পাই যে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। সেই বাষ্প আবার মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। বৃষ্টির জল দ্বারাই নদ-নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদী সমূহই মহাসাগরের-আকর্ষণে পর্ব্বতের বক্ষ বিদারণ, স্থলভাগের নানাভাবে পরিবর্ত্তন সাধন এবং জহ্নুমুনির উরুভেদ রূপ শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে মহাসাগরে মিলিত হয়। মহাসাগরের এমনি আকর্ষণ যে নদীসমূহ তাহাতে মিলিত

হইবেই এবং সেই কার্য্য দ্বারা নদী জন্মের সার্থকতা লাভ করিবেই। উহাদের পথে যতই বাধা আসুক না কেন, সাগরের সেই অব্যর্থ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নদনদী ক্রমশঃ যে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাগরের দিকে ধাবিত হইবেই এবং পরিণামে মিলিতও হইবে ইহা সুনিশ্চিত।* পাঠক এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে উৎপাদক উৎপন্নে নিজজাত (উৎপাদক জাত) বাধা সমূহ লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই যে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ, ইহাই সৃষ্টি। ইহাই একের বহুভাবে ভাসমান হওয়া এবং ইহাই বাধা সৃজন দ্বারা বহুর শক্তি পরীক্ষা অথবা একের অনন্ত গুণের শক্তির পরীক্ষা। এস্থলে আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে ক্ষিতিই আমাদের প্রধান বাধক, অর্থাৎ দেহ যত স্থূল ভূতদ্বারা গঠিত হইবে, বাধার পরিমাণ ততোঽধিক থাকিবে, কিন্তু দেহ সূক্ষ্ম হইতে থাকিলে বাধার পরিমাণও অল্প হইতে অল্পতর হইবে। আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আমরা স্থূলতম দেহধারী অর্থাৎ ক্ষিতিপ্রধান দেহে বাস করি। এ অবস্থায় ব্যোম-দেহধারীর প্রকাশকত্ব আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ক্ষিতির স্বাভাবিক গুণ তমঃ সর্ব্বদাই বাধা দিতেছে ও দিবে। কিন্তু নিয়ত কঠোর সাধনা, ব্রহ্মোপাসনা এবং অনন্ত করুণাময়, দয়াময় পিতার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিলে ও সর্ব্বোপরি ভগবৎকৃপা লাভে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিলে সাধক পরিশেষে দেহের বিরোধিতা হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তখন দেহ তাঁহারই অধীনস্থ হয় ও পরাজয় স্বীকার করিয়া সাধকের ইচ্ছানুযায়ী সৎকার্য্যে নিযুক্ত হয়-ও অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হয়। ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব অংশে উদ্ধৃত অংশ সমূহ পাঠক দেখিবেন। সাত্ত্বিক আহার বিহার দেহের বিরোধিতা দমনে কিছু সাহায্য করে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী বিষয়কে আরও স্ফুটতর করিবে বলিয়া মনে করি। ক্ষিতিকেই নানাভাবে সংস্কার করিয়া কাচ প্রস্তুত

* "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে অনন্ত প্রেমময় পিতার অব্যর্থ প্রেমাকর্ষণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

হয়। ক্ষিতি স্বচ্ছ নহে। কিন্তু কাচ স্বচ্ছ। কাচ অবস্থায়ও উহা ক্ষিতি পর্য্যায় ভুক্তই বটে। কিন্তু উহার সাহায্যে যে কেবল নিকটস্থ বস্তু দেখা যায়, তাহা নহে, কিন্তু অতিদূরস্থিত বস্তুও দেখা যায়। বর্ত্তমানে যে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Powerful Telescope) প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ১৪০ নিযুত আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত নক্ষত্রও দেখা যাইতে পারে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। যে নক্ষত্রের আলোক সেইরূপ দ্রুত গতিতে পৃথিবীতে পৌছিতে ১৪০ নিযুত আলোক বৎসর লাগে, তাহা যে কত অসীম দূরে অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞানের আরও উন্নতিতে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরও শক্তিশালী হইয়া আরও দূর দূরান্তরের নক্ষত্ররাজি মানবের নয়ন পথে পতিত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আবার সুসংস্কৃত কাচ দ্বারা প্রস্তুত Microscope বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া মানব চক্ষুর অগোচর অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ ও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। ইহার কারণ কি? সাধকের ইচ্ছানুরূপ ক্ষিতির সংস্কারই ঐরূপ বিশেষত্বের কারণ। সুতরাং দেখা যায় যে ক্ষিতি সংস্কৃত হইলে ক্ষিতি অবস্থায়ই উহার বাধকতা শক্তি অপরিসীম ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সাধক ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা যদি নিজ হৃদয়ের সংস্কার সম্পাদন করেন, তবে দেহেরও সংস্কার হইয়া উহার স্বাভাবিক বাধকতা শক্তি ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হয় এবং সাধক সেই দেহে থাকিয়াও ভগবৎ কৃপায় দিব্য জ্ঞানালোকে সাধারণ মানবের অবোধ্য বহু সত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। হৃদয়ের সংস্কারের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহের বাধকতা শক্তিরই ক্রমশঃ লয় হইতে থাকে এবং উহা অবশেষে সাধনার অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয় তখন যে জ্ঞান-সূর্য্য অনন্ত অসীম দূর দূরান্তরে নিত্য অবস্থিত এবং যিনি নিকট হইতেও নিকটতর, নিকটতম নিত্য সাথী, আবার যিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান," সেই অনন্ত গুণাধার অনন্ত জ্ঞানাধার এবং অনন্ত প্রেমাধার ব্রহ্মও পরিশেষে সেই সুসংস্কৃত সাধক হৃদয়ে প্রতিভাত হন। এই

সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর সকল জীবের দেহই ক্ষিতি প্রধান বটে, কিন্তু বিভিন্ন জীবের দেহে ক্ষিতি প্রধানত্বের প্রভেদ আছে। সেইরূপ মনুষ্য দেহেরও বিভিন্নতা আছে, যদিও তাহা আপাত দৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারি না। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম যে Satan, Evil, মায়া, মোহ, রিপু, পাশ বা অসুর অন্য কোনও স্থল হইতে আগমন করে নাই। পরম পিতাই স্বগুণ পরীক্ষারূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছা যোগে জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জড় অব্যক্তের শক্তি লাভ করিয়া আমাদের বাধকতা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সেই জড় দ্বারা তাঁহার ইচ্ছায় বিবিধ জীবদেহ অসংখ্য প্রকারে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। জীবদেহ পঞ্চভূতাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক। জীবদেহের গঠনের তারতম্য অনুযায়ী নানাদেহে নানা প্রকার ভূতের সুতরাং ত্রিগুণের তারতম্য হইয়াছে। দোষ-পাশ-রাশি যে জাত গুণ অর্থাৎ দেহ সংসর্গে জাত, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এখন দেখিতে পাইলাম যে দেহ যত সাকার ভূত-প্রধান বা তমোভাবাপন্ন, সেই দেহে দোষ রাশি তত প্রবল। মধ্যম-ভূত-প্রধান দেহেও দোষ রাশি যথেষ্ঠ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ব্যোম প্রধান বা সত্ত্বপ্রধান শরীরে দোষরাশি দুর্ব্বল বা লয় প্রাপ্ত। স্থূল জগতেও দেখা যায় যে সাকার পদার্থ নিরাকার পদার্থ হইতে অধিকতর বাধা প্রদান করে। উৎপন্ন উৎপাদকের গুণ ও শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করে। জড় ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন। আবার অব্যক্ত স্বরূপ পরমপিতার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। সুতরাং আমরা যদি বলি যে নিরাকার জড়ের গুণ ও শক্তি তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব নামক গুণ হইতে এবং সাকার জড়ের শক্তি তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব নামক গুণ হইতে প্রধান ভাবে লাভ করিয়াছে, তবে তাহা ভুল হইবে বলিয়া মনে করি না। উভয় গুণই অচেতন অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব গুণদ্বয় অচেতন এবং উঁহাদের একত্ব অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপও অচেতন। সুতরাং

সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকারের জড় পদার্থই অচেতন। অতএব দেহই আমাদের সর্ব্ব-প্রধান বাধক এবং দেহ হইতেই দোষ-পাশ-রাশি জাত। ইহা যে সমস্তই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান, তাহা বর্ত্তমান অধ্যায়ে নানা স্থলে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মা যখন যে দেহে বাস করিবেন, তিনি সেই দেহজাত দোষ-পাশ-রাশি দ্বারা প্রভাবিত হইবেনই। উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় পরমপিতার উপাসনা ও গুণ সাধনা। যিনি যে পরিমাণে উক্ত কার্য্যদ্বয় হইতে বিরত থাকিবেন, তিনি তত পরিমাণে সেই দেহ-জাত দোষ-পাশ-রাশির হস্তের ক্রীড়ার পুতুলের ন্যায় কার্য্য করিবেন। আবার সাধক সাধনায় যতদূর অগ্রসর হইবেন, উৎকৃষ্ট গুণরাশির যতই বিকাশ হইতে থাকিবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় জাত-গুণ-রাশি ততই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। পরমপিতার সন্তান দেহে আসিয়া জাত-গুণরাশি দ্বারা আক্রান্ত হয় অর্থাৎ দোষ-পাশ রাশি দ্বারা দেহে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ হৃদয় দোষ-পাশ-রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং উহারা সয়তানের ন্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত করে। আবার অনন্ত প্রেম-ময়ের প্রেমের বিধানে তাহার সন্তানত্ব ফুটিতে ফুটিতে সে সয়তানের অর্থাৎ দোষ পাশ-রাশির বিদ্রোহ দমন করিবেই। এই যে সাধক সন্তানের সন্তানত্ব প্রাপ্তির জন্য বা সন্তানত্ব বিনাশ করিবার জন্য নিরন্তর যুদ্ধ, ইহাই দেবাসুরের যুদ্ধ। শ্রীশ্রী চণ্ডী যে অসুরদিগকে রক্তবীজ আখ্যা দিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। দোষ-পাশ-রাশিই সেই অসুরগণ। উহারা অসংখ্য। উহারা যে রক্তজাত, অর্থাৎ দেহজাত অর্থাৎ দেহ সংসর্গে উৎপন্ন, ইহা ইতি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে ইহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সয়তান বা অসুর এবং তাহার অনুবর্ত্তিগণ অথবা রক্তবীজবৎ অসংখ্য জাতগুণ পরাজিত হইবেই। পরমপিতার যে সরলগুণ যে ভাবে যুদ্ধে জয়ী হইবে, সেই গুণের সেই ভাবে শক্তি পরীক্ষিত হইবে। অর্থাৎ যদি প্রেমগুণ আমাদের বাধা সমূহ দূর করিয়া সর্ব্বাগ্রে ও অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে আমাদিগকে

পরম প্রেমময়ে তন্ময় করিতে পারেন, তবে প্রেমের শক্তিকেই প্রধান শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। এইরূপ যে গুণ পরম পিতাতে তন্ময় করিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, উঁহার শক্তিকে প্রেমের শক্তি হইতে নিম্নে কিন্তু অন্যান্য গুণের শক্তি হইতে উচ্চে স্থান দিতে হইবে ইত্যাদি। মায়া জীবের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়ার অর্থ মোহ বা অজ্ঞান। ইহা মায়াবাদের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইব। মোহ একটী জাত গুণ, সুতরাং উপরোক্ত মন্তব্য মায়া সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পূর্ব্ব পরম চৈতন্য হইতে জীবাত্মার দেহাবদ্ধতাই প্রকৃত ভাবে Paradise Lost (স্বর্গচ্যুতি)। জীবের রিপুগণ দমন হইলেই হৃদয়ে স্বর্গের আভাস লাভ করা যায়, কিন্তু রিপু সমূহ লয় না হইলে প্রকৃত স্থায়ী স্বর্গসুখ-ভোগ সম্ভব নহে। উহা পরার্দ্ধ মণ্ডলের অবস্থা পার হইলেই সম্ভব হয়। সেই অবস্থায় দোষ-পাশ-রাশির রজস্তমোহংশ লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অসুরের সহিত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ দোষ-পাশ-রাশির aggressive অবস্থা আর থাকে না। কিন্তু উহাদের সাত্ত্বিক অংশ সম্পূর্ণরূপে লয় করিতে, ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে এবং মিশ্রগুণ সমূহের লয় করিতে এবং পরমাত্মার অনন্ত সরল গুণের বিকাশ সাধন করিতে আমাদের মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই সময় অসংখ্য দোষ পাশ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইবে এবং অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। সর্ব্বশেষে মহাপ্রলয় কালে* ব্রহ্মকৃপায় ত্রিবিধ দেহের বিগমে তাঁহাতেই জীবাত্মার লয় হইবে অর্থাৎ পূর্ণামুক্তি লাভ হইবে। ইহাই জীবাত্মার পক্ষে লয়, স্ব স্বরূপে গমন, আত্মস্বরূপ লাভ, পূর্ব্ব পরম চৈতন্য অবস্থা লাভ, মোক্ষ বা প্রকৃত পক্ষে Paradise

---

* মহাপ্রলয় এক মুহূর্ত্তে হইবে না। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে যে অধার্য্য কাল ব্যয়িত হইয়াছে, মহাপ্রলয় সম্পূর্ণ হইতেও সেইরূপ অধার্য্য কাল লাগিবে। স্থূলে, সৃষ্টির পরিপক্কতা লাভ করিতে যে অধার্য্য কাল লাগিবে, বিপরীতক্রমে লয় হইতেও সেই রূপই অধার্য্য কাল লাগিবে।

regained বা পুনঃ স্বর্গ প্রাপ্তি। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে প্রচলিত ভাবে যাহাকে স্বর্গ বলা হয়, তাহা লাভ করিতে সবিশেষ আত্মিক উন্নতির প্রয়োজন হয় না। দেব পদবীতে উত্থিত হইতেও অত্যধিক আত্মিক উন্নতির প্রয়োজন হয় না। পরার্দ্ধ শ্রেণীর অবস্থা পার হইলেই পাপের সংগ্রামে জয় লাভ করা যায়। অর্থাৎ দোষ-পাশ-রাশির রজস্তমোহংশ লয় হইয়া শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব লাভ হয়। ইহার পরে যে সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার আভাসের ধারণাও আমাদের নাই। এই অত্যুন্নত অবস্থায়ই সাধক একত্ব লাভ করিতে থাকেন এবং আরও অত্যুন্নত অবস্থায় অনন্ত প্রেমময় পরম-পিতার সহিত অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ পরমপিতার অন্তর্গত হইয়া বাস করেন। ইহার পরেও যে সকল আরও অত্যুন্নত অবস্থা সাধক লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ জ্ঞানই নাই। এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে আমাদের অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের অনন্ত একত্বের একত্ব সাধনে সিদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা পূর্ণামুক্তি বা ব্রহ্মে লয়ের আশা নাই। অতএব বলা যাইতে পারে যে জীব অল্প উন্নতিতেই স্বর্গলাভ করেন বটে, কিন্তু স্বর্গেরও ক্রম বিদ্যমান। আবার আত্মোন্নতি লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ, তৎপর আরও আত্মোন্নতিতে পরমপিতার দর্শন, তৎপর তাঁহার সহিত মিলনে অর্থাৎ অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান লাভে অপূর্ব্ব অতুল্য স্বর্গসুখ লাভ এবং তৎপর আরও অত্যুন্নতিতে যে অনন্ত অমৃতময়ী, জ্ঞান-প্রেমময়ী, অতুল্যা, অমূল্যা, ধারণাতীতা অবস্থা সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহা স্থানের হিসাবে যে স্বর্গের কল্পনা করা হয়, তাহা হইতে অশেষগুণে শ্রেষ্ঠতর। স্থূল, অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে আমাদের জন্য "ক্রমশঃ সুখের বিধি" নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যদিও পূর্ণামুক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতুল্যা অবস্থা সমূহ আমাদের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত এবং ধারণারও অতীত, তথাপিও বিচারতঃ বলিতে হইবে যে পূর্ণামুক্তিই Paradise Regained. কারণ, জীব যতই উন্নত হইতে থাকিবেন, তিনি ততই আরও অধিক উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইবেন। অনন্তের

সন্তান অনন্তকেই চাহেন এবং অনন্তকে পূর্ণভাবে না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণাতৃপ্তি লাভ হয় না, শেষ সূক্ষ্ম বাধা সমূহ নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণাশান্তি লাভ করিবেন না, অংশভাবে ভাসমান জীবাত্মা অখণ্ডত্ব, পূর্ণত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার পূর্ণত্বের দিকে অবিরাম গতি চলিতেই থাকিবে, এমনিই অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার অনন্ত শক্তিশালী এবং অব্যর্থ প্রেম আকর্ষণ যে শেষ স্থান—পূর্ণ ব্রহ্মকে লাভ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণামুক্তি লাভ হইবে না। পরব্রহ্মই শেষ স্বর্গ। এমন পূর্ণ ও নিত্য সত্যস্বরূপ, দোষ-পাশ লেশ-শূন্য পরম শিব, এমন অনন্ত জ্ঞান-প্রেমে নিত্য পরিপূর্ণ, এমন অনন্ত অমৃতের অনন্ত পাথার, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত আধার, এমন অতল প্রেম-জলধি, এমন অনন্ত করুণামৃত বারিধি, এমন অনন্ত দয়ার একমাত্র আলয়, এমন অনন্ত গুণ নিধান, অনন্ত মহিমার নিত্য পরিপূর্ণ স্বর্গ কোথায়ও নাই বা থাকিতে পারে না। স্থান বিশেষকে স্বর্গ বলুন অথবা অপূর্ব্বা, অত্যুন্নতা এবং ধারণাতীতা আত্মিক অবস্থা সমূহকেই স্বর্গ বলুন, উহারা যে সকলেই পূর্ণব্রহ্মের অতি নিম্নে অবস্থিত, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং পূর্ণামুক্তিতে যে পূর্ণ ব্রহ্ম লাভ, তাহাই Paradise Regained. অন্যান্য ভাবে স্বর্গলাভ পূর্ণভাবে প্রকৃত স্বর্গ নহে। অতএব আমরা পাইলাম যে জীবের প্রথম জন্মাবধি পূর্ণামুক্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিতে হয়। সকল প্রকার বাধার মূলে দেহই কারণ। দেহের মূলে জড় পদার্থ, আবার জড় পদার্থের কারণরূপে পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপ এবং তাঁহার অনন্ত শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা বর্ত্তমান। জড় অব্যক্ত স্বরূপের শক্তিতে শক্তিমান এবং তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনোপযোগি ভাবে গঠিত। আবার দেহ সেই জড় দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে পরম পিতার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নির্ম্মিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। যে স্থলে পরীক্ষা সেই স্থলেই বাধার উপস্থিতি অনিবার্য্য। দেহকেই সেই বাধারূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং দেহ সংসর্গজাত বাধা অতিক্রম করিয়াই জীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং

পরিশেষে মহাপ্রলয় কালে তিনি পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন।* দর্শন শাস্ত্রের একটী বিষম সমস্যা এই যে জড় ও জীবাত্মার মিলন এবং উহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া কি প্রকারে সম্ভব হয়। তাঁহারা পৃথক্ পদার্থ। কিন্তু আমাদের মত যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পরম পিতার একটী স্বরূপের পরিণামে তাঁহারই ইচ্ছায় জড় জগতের সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ পরমপিতার স্বরূপ বিশেষোৎপন্ন বলিয়াই তাঁহার সেই অব্যক্ত স্বরূপের শক্তিতে শক্তিমান জড় সুতরাং দেহ জীবাত্মার অধিবাসের এবং আবরণের উপযোগী হইয়াছে। কারণ, উভয়ই পরম মূল পদার্থ স্বয়ং ব্রহ্ম হইতেই আগমন করিয়াছেন। সুতরাং একে অন্যের উপর নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ। অর্থাৎ Like alone can act upon like নামক তত্ত্ব আত্মা ও দেহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইল। জড়ই আত্মার আবরণ ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়ায় পরমাত্মাই অপূর্ণ ভাবে ভাসমান হন এবং তাঁহার গুণরাশি ও কার্য্য-সমূহ বিকৃত ভাবেই প্রকাশিত হয়। এই জন্যই আমরা সাধারণ জনগণ আত্মার স্বরূপ দেখিতে পাই না, এমন কি আমরা উহা অনুমান করিতেও সমর্থ নহি। এস্থলে সর্ব্বোপরি বলিতেই হইবে যে অনন্ত প্রেমময় তাঁহার প্রেমলীলার্থ নিজ স্ব ইচ্ছায় বাধ্য বাধকতা শূন্য হইয়া নিজ স্বরূপ বিশেষ অবলম্বনে জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং উহা হইতে উৎপন্ন দেহযোগে স্বয়ং একমেবাদ্বিতীয়ম্ থাকিয়াও বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং স্বগুণ পরীক্ষার্থ অংশভাবে ভাসমান জীবাত্মার দেহ দ্বারা বাধা উৎপাদন করিয়াছেন। আবার বাধা সকল উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি নানাবিধ মঙ্গল বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" এবং "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। এস্থলে ভক্তের একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। পরম-পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"সাঁপ হয়ে কাট তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়।" সকলই প্রেমলীলাময়ের প্রেমলীলামাত্র। ধন্য অনন্ত

* "সোঽহংজ্ঞান" অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ও নিত্য প্রেমময়! তুমিই ধন্য! তোমার চির প্রেমলীলা সম্পাদনার্থ তুমি যে সকল বিধান করিয়া রাখিয়াছ, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার আদ্যোপান্ত কোথায়ও কোনও ক্রটী নাই বা থাকিতেও পারে না। তোমার প্রেমলীলাময়ী ইচ্ছাতেও কোনই ক্রটী নাই। ইহাতে আছে কেবল তোমারই সত্য, জ্ঞান ও প্রেমের অনন্ত অমোঘ শক্তির ক্রিয়া, ইহাতে আছে তোমার অনন্ত গুণের শক্তিরাশির ক্রিয়া। হে অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং! তোমাতেই ত অনন্ত বিপরীত গুণের সুন্দর, মধুর ও পূর্ণ মিলন সম্ভব হইয়াছে। তাই তুমি এই বিপরীত ভাবের কার্য্য করিয়াও কোনও অমঙ্গল উৎপাদন কর না। হে সর্ব্ব-দোষ-পাশ-লেশ শূন্যম্ শিবম্! তোমাতে কোনওরূপ ক্রটী আশঙ্কা করা আমাদের অজ্ঞ নতা বই আর কিছুই নহে। হে অনন্ত দয়াময়! তোমার নিজ অপার দয়া-গুণে জগতের নর নারীকে ইহা ধারণা করিবার শক্তি প্রদান কর। ইহা তোমার নিকট ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করি। অতএব পরমর্ষি-গুরুনাথ দ্বারা প্রচারিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া আমরা যাহা পাইলাম, তাহাতে প্রোক্ত বিষম সমস্যার অর্থাৎ জড় ও আত্মার পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারূপ কঠিন সমস্যার সুমীমাংসা হইল বলিয়া মনে হয়। আত্মা ও জড়ের মিলন যে সম্ভব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দোষের তত্ত্ব (Theory of evil) রূপ কঠিন সমস্যাও এই অংশে সুমীমাংসিত হইল কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে দেহ সৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা বর্ত্তমান, সুতরাং জড় জগৎ সৃষ্টি ভিন্ন ব্রহ্মের প্রেমলীলা সংসাধিত হইতে পারে না। দেহ বাধক ভাবে যেমন কার্য্য করে, তেমনই বাধা অতিক্রম করিবার সাহায্যও করে। জাত গুণ রাশিকে দোষ বলা হয় এবং ইংরেজীতে উহাদিগকে Evil বলা হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতঃপর "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব"

অংশে দেখিতে পাইব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত মঙ্গলময়, অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা তাঁহার অমোঘ মঙ্গল বিধানে তাঁহার প্রেমলীলা সম্পাদনার্থ সৃষ্ট জগতে কদাচ এমন কিছু আনয়ন করেন নাই, যাহা দ্বারা আমাদের বিন্দুমাত্রও অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তবে যে আমরা জগতে অমঙ্গল দেখি, তাহার প্রধান কারণ আমাদের অসম্যক্ দৃষ্টি। ভগবৎ কৃপায় যাঁহার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, তিনি আমাদের ধারণীয় অমঙ্গলেও সুমঙ্গলই দেখিতে পান। আর যিনি নিত্য সত্যস্বরূপ, যিনি অনন্ত দিব্য জ্ঞানের নিত্য আধার, যিনি অনন্ত প্রেমের একমাত্র অনন্ত নিলয়, যিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ সুতরাং অনন্ত মঙ্গল, যিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার দ্বারা কখনই অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোনই অমঙ্গল থাকিতে পারে না।

ওঁং অনন্ত-পরীক্ষকং সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশনং প্রেমলীলাময়ং ওঁং

ওঁং

আদিস্ত্বং মধ্যস্ত্বং মুপর্য্যধস্ত্বম্
অনাদ্যনন্ত স্ত্বমপীশ্বরেশঃ।
ত্বং দেহধারী ননু দেহহীন
স্ত্বমেব সাকার-নিরাকৃতিশ্চ ॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী

এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে নানা স্থলে অনেক কিছু লিখিত হইয়াছে। বিষয়টী অতি গুরুতর। যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাবে এক স্থলে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজনীয়। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এই বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্মও সংক্ষেপে ইহাতে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে কিছু কিছু পুনরুক্তি অনিবার্য্য হইয়াছে। এই সমস্যার সাধনার্থ দেহ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে প্রেমলীলার্থ ব্রহ্মের এইরূপ ইচ্ছা হইল যে তিনি বহু হইবেন। তিনি নিত্য এক ও অখণ্ড। এক বহু হইতে হইলে দুই ভাবে তাহা সম্ভব হয়। প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া, যেমন একটী বৃক্ষকে টুকরা টুকরা করিয়া বহু খণ্ড করা যায়। ব্রহ্ম অখণ্ড। সুতরাং তাঁহাকে কিছুতেই খণ্ড খণ্ড করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ—এক বহু ভাবে ভাসমান হইয়া, যেমন মহাসমুদ্র বায়ুযোগে এক, অখণ্ড থাকিয়াও বহু তরঙ্গ ভাবে ভাসমান হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও এক ও অখণ্ড থাকিয়াও তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি যোগে বহু জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এতদর্থে তিনি তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপকে তাঁহার সেই একই ইচ্ছা শক্তি যোগে জড় জগৎ ভাবে পরিণমন করিয়াছেন। আবার সেই ইচ্ছাশক্তি যোগেই সেই জগৎ হইতে নানাবিধ প্রণালীতে অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া উহাদের হৃদয় গুহায় তিনি যেন নিজে ধরা দিয়াছেন। তিনি দেহ এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাহা ব্রহ্মের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা অংশে ও অন্যান্য স্থলে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। জড় দেহ জগৎ হইতে আসিয়াছে এবং জগৎ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং দেহ অব্যক্তের কিছু শক্তি লাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই উহা ব্রহ্মের অধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে।* প্রস্তর খণ্ডও জড় পদার্থ। ব্রহ্ম উহাতেও পূর্ণ-ভাবেই বর্ত্তমান বটেন। কিন্তু উহা জীবত্ব প্রাপ্ত হয় না এবং জীবভাবের কার্য্যও করিতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেহ জড় পদার্থ হইলেও উহা ব্রহ্মের ইচ্ছায় এমন সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম যেন উহাতে ধরা দিতে পারেন এবং উহার মাধ্যমে নিজেকে ক্রমশঃ বিকাশ করিতে পারেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ দেহ তাঁহার ইচ্ছায় সবিশেষ প্রণালীতে রচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে অনন্ত বিপরীত গুণের অনন্ত একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারই মধ্যে অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণের একত্ব সম্ভব হইয়াছে। He is the Supreme unity of infinite contradictory attributes. 'জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধক। জীব দেহ অসংখ্য। উহাদের বিভাগ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি উহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়:—স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কারণ, কারণতর ও কারণতম। ইহারা পঞ্চভূতের নানাবিধ মিশ্রণে রচিত। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্থূল পর্য্যায়ভুক্ত দেহ ক্ষিতি ও অপ্‌ প্রধান, সূক্ষ্ম পর্য্যায় ভুক্ত দেহ তেজঃ ও মরুৎ প্রধান এবং কারণ পর্য্যায় ভুক্ত দেহ ব্যোম প্রধান। দেহ যত সূক্ষ্ম হইতে

* "অধিবাস" শব্দ আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হইল। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও বাস করেন না। তাঁহার কোনই আধার নাই। তিনি নিজেই আধার ও নিজেই আধেয়। (সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং)। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে।

থাকিবে, আমাদের বাধার পরিমাণও ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। অব্যক্ত স্বরূপ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব। প্রধান ভাবে অনন্ত সাকারত্ব হইতে জগতের সাকারত্ব অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সাকার পদার্থ যে অধিকতর বাধা উৎপাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে দেহের সাকারত্ব যত হ্রাস পাইতে থাকে, উহার বাধার পরিমাণও ততই অল্প হইতে থাকে। প্রধান ভাবে অনন্ত নিরাকারত্ব হইতে জগতের যে অংশ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাধা উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণও পরমোন্নত সাধকদিগের বাধা স্বরূপ। তাঁহারা সত্ত্ব গুণেরও অতীত হইতে সাধনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাও ত্রিগুণাতীত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা। যে স্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধার উপস্থিতি অনিবার্য্য। নতুবা পরীক্ষার কোনই অর্থ থাকে না। আমাদের অতি সুদীর্ঘ জীবন (আদি জন্ম হইতে ব্রহ্মে লয় বা পূর্ণামুক্তি পর্য্যন্ত) যেন একটী Hurdles' race. একটী বাধা অতিক্রম করিতে না করিতে অন্য একটী বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্বগুণ-পরীক্ষা বা প্রেমলীলারূপ বিরাট ব্যাপার সাধনার্থ ব্রহ্ম এক হইয়াও এবং এক থাকিয়াও বহু ভাবে সুতরাং অপূর্ণ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। উদ্দেশ্য সেই অপূর্ণতা হইতে প্রত্যেক জীবই পূর্ণতা লাভ করিবেন। সেই একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেকের পথে বাধা উৎপাদন করা প্রয়োজনীয়। দেহই আমাদের প্রধান-বাধা। তাই তিনি প্রত্যেক জীবকে আদিতে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান করিয়াছেন এবং জীব যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই ক্রমশঃ বাধা হইতে মুক্ত হইতে থাকিবেন বটে, কিন্তু পূর্ণামুক্তির পূর্ব্বে তিনি কিছুতেই দেহ মুক্ত হইবেন না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বাধা মুক্তও হইবেন না। ব্রহ্ম যদি বহু ভাবে সুতরাং অপূর্ণভাবে, সুতরাং অংশ ভাবে ভাসমান না হইতেন, তবে তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা-রূপ কার্য্য তিনি সম্পাদন করিতে পারিতেন

না। কারণ, তিনি নিত্য অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ণের পক্ষে কার্য্যকরী পরীক্ষা অসম্ভব। তাই তিনি জীবদিগকে অপূর্ণ করিয়াছেন এবং সেই কার্য্যে তাঁহার একতম স্বরূপ অব্যক্তকে পরিণমন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জগৎ হইতে দেহ গঠন করিয়াছেন। জীবকুল দেহের জন্যই যে ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি সম্মত। মায়াবাদ আবরণের কারণ অবিদ্যা বলেন। কিন্তু এই অবিদ্যা কোথায় হইতে আসিল? অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞানতা। উহা যে দেহ হইতে উৎপন্ন, তাহা সুস্পষ্ট এবং ইহা প্রমাণিতও হইয়াছে। ব্রহ্মে অনন্ত চৈতন্য এবং অনন্ত অচৈতন্যের অপূর্ব্ব মিলন বা একত্ব হইয়াছে। উহারা বিরুদ্ধ গুণ। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ দ্রষ্টব্য। আচার্য্য রামানুজ স্বামীও ব্রহ্মকে চিদচিৎ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত স্বরূপ অচেতন। অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব যে অচেতন, ইহা সহজ বোধ্য। জড় জগতের অচৈতন্যও অব্যক্তের অচৈতন্য হইতেই প্রাপ্ত। দেহ জগৎ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অচেতন অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পরম্পরা ভাবে যে দেহ আসিয়াছে, তাহাও অবশ্যই অচেতন হইবে এবং উহা যে অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা উৎপাদন করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। দেহের আকারত্ব, নিরাকারত্ব ও অচেতনত্ব হইতেই যত কিছু দোষ, পাশ, অন্ধকার, আবরণ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। অতএব আমরা দেখিলাম যে অব্যক্ত ব্রহ্মের এমন একটী স্বরূপ, যাহা তাঁহার অন্যান্য গুণের বিরোধিতা করে এবং উহা হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন সুতরাং বিকৃত পদার্থ অর্থাৎ দেহ আমাদের বাধা উৎপাদন করিতেছে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে দেহ আমাদের পদে পদে বাধা উৎপাদন করে, ঘনতম অন্ধকার সৃষ্টি করে। ষড় রিপু অষ্ট পাশ প্রভৃতি যে দেহ সংসর্গে উৎপন্ন, ইহাও সর্ব্ববাদি সম্মত। দেহই আমাদের সকল অনিষ্টের মূলীভূত কারণ। জীবের অর্থ কি? উহা আত্মা+দেহ। সুতরাং জীব−দেহ=আত্মা।

দেহাত্মভেদ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়। সুতরাং দেহ না থাকিলে আত্মা স্ব স্বরূপে স্বমহিমায় বর্ত্তমান থাকিতে পারেন, তাঁহার দোষ, পাশ, অন্ধকার প্রভৃতি কিছুই থাকে না। অশরীরী আত্মা পরমাত্মাই। তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। কঠোপনিষদ্ জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মা বলিয়াছেন। দেহ রথ, আত্মা রথী ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে দেহ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে আসিয়াছে এবং অব্যক্তের কিছু শক্তি লাভ করিয়াছে। আবার দেহ যখন অব্যক্তের পরিণামে উৎপন্ন, তখন উহা চির বিকৃত। পৃথিবীর দেহ যে বিকৃতির কোন স্তরে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে ইতর জীবের দেহ বাদ দিলেও বহু বহু মানবের দেহ যে তমঃ প্রধান, সেই সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। বহু মানবের রজঃ শক্তিও নিম্নস্তরের কার্য্যের জন্যই প্রায়শঃ নিযুক্ত থাকে। এই দুই কারণেই অর্থাৎ দেহ অব্যক্তের শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এবং চির বিকৃত বলিয়াই উহা আত্মার আবরণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আত্মা এবং দেহ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়াছে বলিয়া উভয় উভয়ের উপর কার্য্য করিতে সমর্থ। Like alone can act upon like. আমরা দেখি যে দেহ মনের প্রতি এবং মন দেহের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। 'সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে অন্তঃকরণ কেবল জড় পদার্থ নহে। উহার এক অংশ আত্মিক ও অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। সুতরাং আত্মার উপর দেহের প্রভাব আমরা না দেখিতে পাইলেও উহা অনুমান করিতে পারি। পূর্ব্ব প্রবন্ধে সূর্য্য ও মেঘের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক্। উহাতে দেখা গিয়াছে যে প্রকৃতিতে কোনও বস্তু উহা হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন বস্তু দ্বারা আবৃত হইতে পারে. উৎপাদক পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন পদার্থ দ্বারা হীনবল হয়। জীব সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে। ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জগৎ ও জগৎ হইতে জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারাই যেন আবৃত হইয়াছেন। প্রচলিত উক্তি আছে :—"পাঁচভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে।" এই সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত

মন্ত্রত্রয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত শোকঃ।" "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (৩।১।১-৩)" বঙ্গানুবাদঃ—"দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অন্য অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে এবং (আত্মা ও জগৎ) তাঁহারই মহিমা ইহা দেখে, তখন বিগত শোক হয়। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণ বর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান পরম পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন তখন তিনি পাপ-পুণ্য অর্থাৎ বন্ধন ভূত সকাম উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে অভেদ-সখা বলা হইয়াছে। (সমপ্রাণাঃ সখামতঃ) আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে জীবাত্মা দেহ-বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মার দেহযোগে সঞ্জাত দোষ-পাশ-রাশি দ্বারা আবৃত হইয়া সুতরাং শক্তিহীনতা বশতঃ শোকগ্রস্থ। আবার শেষ মন্ত্রে ব্রহ্মের সহিত একত্ব (পরম সমতা) লাভের কথাও আছে। অতএব এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মই দেহ যোগে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইল। অর্থাৎ ভেদাভেদ তত্ত্বই সত্য এবং ভেদ দেহ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ প্রোক্ত প্রথম মন্ত্র দ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন। কঠোপনিষদ্ ৩।৩-১১ মন্ত্র সমূহ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। Plato কথিত Self-Existent Reality জড় পদার্থের আদি, তাই বলা

হইয়াছে যে জড় ব্রহ্মের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে দিতেছে না। সুতরাং Plato এর মতেও দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধক। অতএব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে আত্মা ও দেহের যোগ স্থাপন হইলেই দোষ পাশের উৎপত্তি হয় এবং তাহাই আমাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং অপূর্ণ ও শক্তিহীন ভাবে ভাসমানত্বের কারণ হইয়াছে। প্রস্তর খণ্ডের দোষ পাশ নাই। আবার অশরীরী পরমাত্মারও কোনই বালাই নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অনন্ত জ্ঞানময় পরম পিতার ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ অতি সুকৌশলে রচিত দেহই সকল আবরণ উৎপাদন করে, অসংখ্য প্রকারে ব্রহ্মের গুণরাশির বিকাশের বাধা প্রদান করে এবং এই ভাবেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই সম্পর্কে কঠোপনিষদের ৩।৩-১১ ও ৬।৭-৮ মন্ত্র সমূহ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মকে অশরীরী বলা হইয়াছে এবং জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং দাড়াইল এই যে ব্রহ্মই স্বয়ং দেহ দ্বারা আবৃত হইয়া বহু জীবভাবে সুতরাং ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ব্রহ্ম ও জীবাত্মা যে দুই নহেন, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪ ৪।১৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন এবং কঠোপনিষদ্ তাহা ৪।১০-১১ মন্ত্রদ্বয়ে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মই যে বহু জীবভাবে ভাসমান, তাহা কঠোপনিষদেরও মত। সেই উপনিষদে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। অধিকন্তু আত্মাকে ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত অর্থাৎ শরীরী বলা হইয়াছে। তাঁহাকে অবিদ্যা উপহিত বলা হয় নাই। সুতরাং দেহজাত দোষ-পাশ-রাশি দ্বারা উৎপন্ন অজ্ঞানতাই আত্মার বন্ধনের মূলে, মায়াবাদের মায়া বা অবিদ্যা নহে। কঠোপনিষদের ৩।৩-৯ মন্ত্র সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে দেহ ও অন্তঃকরণই যত গোলমালের মূলে। উহাতে মায়ার কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মুণ্ডকোপনিষদ্ও বলেন যে দেহের প্রভাবেই পরমাত্মা ক্ষুদ্র জীবাত্মা ভাবে ভাসমান। পূর্ব্বে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে দেহ অব্যক্তের সাকারত্ব ও অচৈতন্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাই জীবের অজ্ঞানতার প্রধান ভাবে কারণ

হইয়াছে। মায়াবাদও বলেন যে অজ্ঞানাবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইলেই মোক্ষ সুতরাং স্ব স্বরূপ লাভ করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে আত্মা আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া আছেন, সেই অজ্ঞান আবরণ অবিদ্যা জনিতই হউক্ অথবা দেহ-জাতই হউক্। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া, অন্ধকার, প্রভৃতি যাহা আবরণের কার্য্য করে, তাহা দেহ জনিত বটে, সুতরাং মায়ার আবরণের প্রশ্নই আসে না। এই সম্পর্কে কঠোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত (৪৪৪-৪৪৫পৃঃ) ৩।১০-১১ এবং ৬।৭-৮ মন্ত্র সমূহ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে উহাতে নিম্নলিখিত উৎকর্ষের ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) ইন্দ্রিয়, (২) মনঃ, (৩) বুদ্ধি, (৪) মহান্ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা, (৫ অব্যক্ত, (৬) পুরুষ বা ব্রহ্ম। ৬।৭ মন্ত্রে "মহতোহব্যক্তমুত্তমম্" উক্তির "মহতো" অর্থে "মহান্ আত্মা হইতে" বুঝিতে হইবে, বুদ্ধি হইতে নহে। কারণ, বুদ্ধির উল্লেখ উহার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান। "মহতো" শব্দের অর্থ বুদ্ধি হইতে করিলে ক্রম ভঙ্গও হয়। "মহতঃ আত্মনঃ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "মহতঃ" শব্দ ব্যবহার কারণ ছন্দ রক্ষা করা। পদ্যে অনেক শব্দ উহ্য থাকে। অতএব এস্থলে দেখা গেল যে অব্যক্তকে জীবাত্মা হইতে উত্তম বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন দেহ আত্মাকে বদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা ব্রহ্ম দেহের প্রভাবে ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাসমান হইতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাসমান অবস্থার কারণ অব্যক্ত। অর্থাৎ যাহা দ্বারা আত্মার ভাসমান অবস্থা বা বদ্ধাবস্থা বা বাস্তব দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা (অব্যক্ত) সেই অবস্থার উপরে। জীবাত্মার বাস্তব অবস্থা যে শোচনীয়, তাহা পূর্ব্বে মুণ্ডক উপনিষদের মন্ত্র সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে বাস্তব অবস্থার বা ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মার বা জীবাত্মার উপর অব্যক্তের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আত্মা স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরে নহে। অব্যক্তকে পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের নিম্নে

স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মার দুই অবস্থা—একটী স্বরূপ অবস্থা ও অন্যটী ভাসমান অবস্থা বা practical বা বাস্তব অবস্থা। এই ভাসমান ক্ষুদ্র অবস্থাকেই জীবাত্মা বলা হয়। অতএব এস্থলেও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইল যে আমাদের অজ্ঞানতার কারণ একমাত্র দেহ, মায়া নহে। জীবাত্মার অর্থ দেহ-মনোযুক্ত আত্মা বা দোষ-পাশ জন্য দেহাবদ্ধ আত্মা। ৬।৮ মন্ত্রে আরও লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে পুরুষকে ব্যাপক ও অশরীরী বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা একই। শরীরে যিনি বদ্ধ তাঁহাকে জীবাত্মা এবং যিনি অশরীরী এবং সর্ব্ব-ব্যাপী, তাঁহাকে পরমাত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দে কথিত হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কঠোপনিষদ্ বহুত্বের একান্ত বিরোধী। এই সম্পর্কে কঠ-৪।১১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ব্রহ্মকে জালবান বলিয়াছেন। যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই জাল স্বরূপ, কিন্তু মায়া নহে। যেমন উর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে এবং সেই জালে নিজেই নিজেকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মও নিজ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সুতরাং তাঁহার হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং সেই জাগতিক পদার্থ দ্বারা দেহ রচনা করিয়া তাহাতেই যেন নিজেকে নিজে আবদ্ধ করিয়াছেন। মায়াবাদ মায়াকেই ব্রহ্মের শক্তি বলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মায়াকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বলা হয়। এই সকল কার্য্যে মায়া ব্রহ্মের কোনই অপেক্ষা রাখে না। মায়াবাদের মায়া সাংখ্যদর্শনের প্রধানের অনেকটা অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এইমাত্র বলা যায় যে মায়াবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সুতরাং তাঁহাতে শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। উহাতে কি নির্গুণ (গুণ-শূন্য) ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না? তাহাতে কি ব্রহ্মে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অস্তিত্ব আরোপ করা হয় না? ইহা কি

বন্ধ্যাপুত্রবৎ স্ববিরোধী বা মিথ্যা উক্তি নহে? অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যোগে জগৎ উৎপাদন করিয়া তজ্জাত দেহে নিজেকে নিজে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ করিয়াছেন। Plato কথিত অব্যক্ত এবং সত্যদর্শনের অব্যক্ত উভয়ই বিরুদ্ধাচরণ করে। উক্ত অব্যক্তদ্বয়ে যে পার্থক্য, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সত্যদর্শনোক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন এবং তজ্জাত দেহই অব্যক্তের বিরোধিতা লাভ করিয়া আত্মার গুণরাশির বিকাশের বাধা দিতেছে। এ সকলই তাঁহারই ইচ্ছায় হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও কোনই শক্তি নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা অব্যক্তের স্বভাব পরিণত বস্তুতে আগমন করিয়াছে। এখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পরমর্ষি গুরুনাথের কয়েকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "(১) অনাদি অনন্ত অসীম-শক্তি-সম্পন্ন অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় পরমেশ্বরের যে অংশ, কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল নামক ত্রিবিধ-দেহ সম্পন্ন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ, তাহাই "জীবাত্মা" বলিয়া অভিহিত। জীবাত্মা বিবিধ পাশে বদ্ধ বলিয়া সে যে সচ্চিদানন্দস্ব-রূপ, তাহা বিস্মৃত, অধিকন্তু দেহেই আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন। পাশমুক্ত ও গুণাতীত হইয়া আত্ম-স্বরূপ লাভ করাই জীবাত্মার চরম কার্য্য।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। (২) "উল্লিখিত শরীর সমূহে চৈতন্যাংশের পূর্ব্ববৎ গুণান্বিত ভাবে স্ফূর্ত্তি হইলেই বর্ত্তমান সৃষ্টির বিকাশ সংঘটিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা পরমাত্মার বা পরম পুরুষের অংশ। এই অংশ তাঁহা হইতে বিচ্যুত নহে, অথচ স্বয়ং তদ্রূপে (বিচ্যুত ভাবে) প্রকাশমান থাকে। যেমন, দেহের অঙ্গ হস্তপদাদি দেহ হইতে পৃথক্ নহে, অথচ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যার্থেই যেন সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পরন্তু ইহারা সকলেইএকই জীবেচ্ছা-সম্পাদক, তদ্রূপ এই সকল জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বা অপর জীবাত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথকত্বরূপে আভাসমান মাত্র। যেমন ভারতবর্ষ, চীন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ একই পৃথিবীর অংশ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দৃঢ়তর সীমায় এরূপ বদ্ধ যে প্রভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান, তদ্রূপই পরমাত্মার

অংশ সমূহের বা জীববর্গের প্রভেদ জানিবে।"(ক) (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।
(৩) "ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিকে সত্ত্বময়ী কর, মনকে স্থির ও একাগ্র কর এবং অহংকারের অসারতা ধারণা কর, তবেই দেখিতে পাইবে যে, সত্ত্বময়ী সুতরাং স্বচ্ছা বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে, তখনই স্বরূপাবস্থা লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন উপস্থিত হইবে এবং তখনই অসার পদার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ সারাৎসারের প্রতি প্রযত্ন হইবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইতে পার, তবেই অচিরে মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবে।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)।
(৪) "আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যতেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বিদ্যমান থাকিলেও জড়াত্মবোধ নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখ লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।" (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।

(৫) "আমি জড়ভাবে, ত্যজিবারে ভবে,
বিভো কি এভাবে পারিব কখন ?
দেহে আত্মজ্ঞান যত করি হান,
ততই অজ্ঞান করে আক্রমণ।
'আমি জড় নই, সচেতন হই',
কত ভাবি তবু চেতনা ত নাই।
দেহে আত্মবোধ তবু যায় কই ?
কৃপা কর দাসে প্রকাশি এখন।
তুমি জ্ঞানানন্দ, আমি জ্ঞান-অন্ধ,
শক্তি গুণে মন্দ, আছি নিরানন্দ,
মায়া* ঘোরে ধন্দ, কাটা'য়ে সচ্ছন্দ,
কর মুক্ত বন্ধ বন্দ্য নিরঞ্জন।" (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।

(৬) "পরমপিতা স্বীয় অংশ জড় জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, এই সংযুক্ত তদীয় অংশকে জীবাত্মা কহে" (সত্যধর্ম্ম)। (৭) "আত্মা

(ক) সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের সম্পূর্ণ উপমা হইতে পারে না।
* মায়ার অর্থ অজ্ঞানতা, মোহ কিন্তু মায়াবাদের মায়া নহে।

নিত্য ও অবিনাশী। একই আত্মা সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বব্যাপক অবস্থায় পরমাত্মা বলিয়া ও বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হন।" তত্ত্ববোধ)। (৮) "এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ও ইহার অতীত যাহা কিছু সমস্তই এক, প্রকৃত পক্ষে ইহাতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, পঞ্চত্বাদি নাই। ইহা অনন্ত কাল পূর্ণ একত্বে বিভূষিত, কিন্তু সাধক সদ্‌গুরুগণ স্ব স্ব শিষ্যাদির শিক্ষার জন্য ইহাকে বিভক্ত ভাবে ব্যষ্টি ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন (ক)। আর্য্যশাস্ত্র তিনে এক, একে তিন বলেন। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, পালন কর্ত্তা একই। তিনি একই সৃষ্টি কর্ত্তা, একই পালন কর্ত্তা এবং একই লয় কর্ত্তা। পক্ষান্তরে সৃষ্টি বল, স্থিতি বল, লয় বল, এ তিনও একই। কিন্তু এই সকল বিষয় জ্ঞান সাপেক্ষ।" প্রোক্ত (১), (২) ও (৬) চিহ্নিত অংশত্রয়ে যে জীবাত্মাকে অংশ বলা হইয়াছে, তাহাতে "অংশ ভাবে ভাসমান" বুঝিতে হইবে, বিভক্ত অংশ নহে। জীবাত্মা পরমাত্মার কিরূপ অংশ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন ঃ—"পরমাত্মার বিবংহয়িষা বা পরীচিক্ষিষা হইল। অর্থাৎ প্রেমগুণ প্রভাবে তিনি আপনাকে বহু করিতে অর্থাৎ <u>বহুভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা করিলেন।</u>" (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।

জীবাত্মা বাস্তব ভাবে (<u>practically</u>) পরমাত্মার অংশ ভাবে ভাসমান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই এক বই দুই নহেন। সুতরাং জীবের বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভাষায় সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহাকে ব্রহ্মের অংশই বলিতে হয়। কারণ জীব চির অপূর্ণ, গুণহীন ও শক্তিহীন। উহাতে কখনই ব্রহ্মের ন্যায় অনন্ত গুণ ও শক্তির নিত্য প্রকাশাবস্থা থাকে না। দেহ এবং আত্মার যোগ সম্বন্ধে ইতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে, সেই ভাবে (৬) চিহ্নিত অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড। তিনি নিত্য অনন্ত ভাবে পূর্ণ। সূর্য্য মেঘ দ্বারা পূর্ণভাবে আবৃত হয় না। মেঘ ক্ষুদ্র, উহা অল্প দেশকেই আবরণ করিতে পারে। সেইরূপ দেহ ক্ষুদ্র

(ক) অর্থাৎ অধিকারী ভেদে উপদেশের তারতম্য।

ও সীমাবদ্ধ। উহা পূর্ণ ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারে না। সুতরাং দেহ দ্বারা ব্রহ্ম আবৃত হন, ইহা সত্য হইতে পারে না। সমস্যা কঠিন। অনন্ত দয়াময় পরম পিতা তাঁহার অপার দয়াগুণে আমার হৃদয়ে সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন, ইহা তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃই পাঠককে "গুণ-বিধান," "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "আত্মা ও জড়ের মিলন" অংশত্রয়ে লিখিত বিষয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সূর্য্য ও মেঘের সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত ভাবে পূর্ণ। তিনি কখনই দেশকালে অবস্থিত নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছেন। আমরা জড় ভাবে জর্জ্জরিত, তাই আমরা ব্রহ্মকে জড়ের বিচারে বিচার করিতে চাই। তিনি দেশে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেশের অতীত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেনঃ—মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ (৯।৪)। ব্রহ্ম আমাদের ধারণীয় বিন্দুতেও পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, আবার অনন্তেও তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। অথবা ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণীয় দেশ কাল সম্পর্কীয় প্রশ্নই উদয় হইতে পারে না। তিনি কখনই দেশ কাল দ্বারা বিভক্ত হন না। যদি একান্তই আমাদের ধারণীয় দেশ সংযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে ভাবিতে বা বলিতে হয়, তবে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ এবং অনন্তেও পূর্ণভাবে নিত্য বর্ত্তমান। অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্।

তিনি নিত্যই এক, অখণ্ড, ও দেশ কালাতীত ব্রহ্ম। তাঁহার কোনও মধ্যবিন্দু নাই, অথবা সর্ব্বত্রই তাঁহার মধ্য বিন্দু। তিনি নিত্য পরিধি শূন্য অনন্ত ব্রহ্ম। সুতরাং হৃদয় দেশে যিনি, তিনিও পূর্ণ, কিন্তু লীলার্থ বিকৃত-দেহ জাত দোষ-পাশের আবরণের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অতএব আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার ও পূর্ণ থাকিয়াও দেহযোগে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। তিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা। আত্মা+দেহ=জীব।

এই ভাবেই জীবসৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মেঘাবরণে সূর্য্যদেশ বিশেষ হীনবল হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনি থাকে। অন্যত্র উহার তেজঃ যথারূপে বিকীর্ণও হয়। অর্থাৎ স্বভাবে থাকিয়াও দেশ বিশেষে সূর্য্যের হীনশক্তি হইতে হয়। সেইরূপ দেহজাত দোষ-পাশ-রাশি অর্থাৎ জাতগুণ রাশি অন্ধকার বা আবরণ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মকে সেই দেহে ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ করে। এই যে দেহে ক্ষুদ্রভাবের প্রকাশ, তাহা সেই দেহের সম্বন্ধেই, অন্যত্র নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন পূর্ণ, তেমনি তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণ থাকেন, কেবল সেই দেহে পূর্ণ থাকিয়াও ক্ষুদ্রভাবে প্রতীয়মান হন। দেহে এইরূপ ক্ষুদ্রভাবে প্রতীয়মান পরমাত্মাই জীবাত্মা বলিয়া কথিত হন। ইনিই কঠোপনিষদুক্ত "ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মা।" সুতরাং ব্রহ্ম বা পরমাত্মা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও দেহযোগে ক্ষুদ্রভাবে এবং বহুভাবে ভাসমান হইতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম লীলার্থ নিজেকে বহুভাবে এবং ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিয়াছেন এবং সেই কার্য্যে তিনি তাঁহার এমন একটী স্বরূপ জগতের উপাদান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে উঁহা তাঁহার অন্যান্য গুণরাশির প্রকাশের বাধা জন্মাইতে সমর্থ। এই সকল কর্ম্মই তাঁহার নিজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় বাধ্যবাধকতা শূন্য ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার নিজ নিত্য স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহার এবং তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপেরও কোনই বিকার হয় নাই। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি। তাঁহাতে অনন্ত জ্ঞান নিত্যই বর্ত্তমান। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে তিনি তাঁহারই এমন একটি স্বরূপ লীলার্থ Select করিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত সুগভীর জ্ঞান-প্রেম যোগে সুপরিচালিত তাঁহারই সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুপ্রণালীতে ও সুকৌশলে সমস্ত জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রেমলীলাও সম্পাদিত হয়, অথচ তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অব্যক্ত স্বরূপে দুইটী বিরুদ্ধ গুণ, যথা—অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব

বর্ত্তমান। আমারা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে দেহের সাকারত্ব ও অচেতনত্ব প্রধান ভাবে বাধা সৃষ্টি করে। নিরাকারত্বও বিকৃত হইয়া বাধা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু সেই বাধার পরিমাণ অল্পতর। আবার আমরা দেখিয়াছি যে দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধকরূপে সৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান এবং কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান— এই উভয়ই ন্যায় শাস্ত্র সঙ্গত। যখন দেখা গিয়াছে যে দেহ গুণ রাশির সর্ব্বপ্রধান আবরক এবং উহা উহাদের বিকাশের বাধা প্রদান করে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে অব্যক্ত স্বরূপও ব্রহ্মের গুণরাশির বিরোধিতা সম্পাদনা করে। জড় পদার্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে আগমন করিয়াছে। অব্যক্ত ও জড়ে পার্থক্য এই যে জড়ে অব্যক্তের গুণ বিকৃত ভাবে কোন কোন স্থলে অতি বিকৃত ভাবে ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে জড় সুতরাং দেহ পৈত্রিক গুণ ও শক্তি লাভ করিয়া আমাদের গুণ বিকাশের বাধা প্রদান করিতেছে। বিকৃতি জন্য যে বাধার পরিমাণ আরও অধিকতর হইয়াছে, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জল তেজঃ হইতে উৎপন্ন। আবার সেই জলই উহার উৎপাদক অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে। তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি। কাষ্ঠ খণ্ড ক্ষিতি পর্য্যায়ভুক্ত। অগ্নিদ্বারা উহা ভস্মীভূত হইলেও উহা (ভস্ম উহাকে (অগ্নিকে) আবরণ করিয়া রাখিতে পারে। ভস্মাচ্ছাদ্দিত বহ্নি ভাষায় বলা হয়। সুতরাং বিকৃতি জন্য উৎপন্ন উৎপাদকের বাধা উৎপাদনে সমর্থ। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তবে কেন বলা হয় যে "দেহের সহিত আত্মার যোগ হইলেই তিনি যেন নিজে নিজেকে ধরা দেন?" ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সেই সম্বন্ধে কাহারও কোনই সংশয় নাই। আমরাও তাঁহাকে বিভু বলিয়া থাকি। যাহা হয়, তাহা এই বলিয়া মনে হয় যে দেহ এমন সুকৌশলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ রচিত হইয়াছে যে উহাতে হৃদয়-গুহা প্রস্তুত

হইলেই বহুভাবে ভাসমানেচ্ছু অনন্ত গুণ ও শক্তিধাম প্রেমময় ব্রহ্মের হৃদয়াকাশে বর্ত্তমানতা হেতু সেই দেহে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। সেই জন্য ব্রহ্ম তাঁহার গুণ ও শক্তিরাশি হৃদয়ে বিকাশ করিতে ইচ্ছুক। সেই জন্যই দেহের সৃষ্টি। নতুবা দেহের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। সুতরাং যখন তাঁহার গুণ ও শক্তি রাশির ক্রমশঃ প্রকাশে সমর্থ দেহ সৃষ্ট হইল, তখনই সেই দেহে ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা হেতু তাঁহার গুণ ও শক্তিরাশি দেহে (মস্তিষ্কে) প্রতিফলিত হয়। এই উভয়ের যোগে অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকাশোন্মুখ গুণ ও শক্তিরাশি এবং মস্তিষ্কের যোগে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণের এক অংশ আত্মিক ও অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে অন্তঃকরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। দেহ অপূর্ণ ও চির বিকৃত। উহার গঠন এমনি যে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশি পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিতে উহা সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। সুতরাং দেহ বিশেষের গঠন অনুযায়ী ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশির অপূর্ণ এবং বিকৃত প্রকাশের অল্লাধিক্য সংঘটিত হয়। তমোভাবাপন্ন দেহে প্রকাশের বিকৃতির পরিমাণ অত্যধিক এবং সত্ত্ব ভাবাপন্ন দেহে প্রকাশের বিকৃতির পরিমাণ অল্প। এই সম্পর্কে "গুণ-বিধান" অংশে লিখিত Electric bulb এর দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। দোষ-পাশের মূল খুঁজিলে অবশেষে আমরা আত্মার সুতরাং ব্রহ্মের গুণের সন্ধানই পাইতে পারি। আকরে প্রাপ্ত স্বর্ণে স্বর্ণেতর বহু পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। উহা অগ্নিতে দগ্ধ হইলে এবং শ্যামিকা নাশক পদার্থ দ্বারা শোধিত হইলে যেমন উহা বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমন দোষ পাশ-রাশির দেহ সংসর্গ জাত সমস্ত বিকৃতি (all impuritives নাশ করিলে অবশেষে আমরা ব্রহ্মের গুণেই উপনীত হই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে স্বর্ণ যেমন প্রকৃত-পক্ষে বিকৃত হয় না, ব্রহ্মের গুণ রাশিও কখনই বিকৃত হয় না। কিন্তু উঁহারা দেহ সংসর্গে আসিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া উহাদের বিকৃত ভাবের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। এই দোষ-পাশই অন্ধকার বা

আবরণ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মকে ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ করে। এই আবরণের জন্যই তিনি দেহে বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হন। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—"যেমন স্ত্রীলোকেরা প্রসবান্তে দুর্ব্বল ও বিকৃত দেহ হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে পাঞ্চভৌতিক পদার্থ যোগে মনের উৎপত্তি হইলে আত্মা বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার জ্ঞান ও গুণ স-ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির (ক) ন্যায় পূর্ব্বৎ কার্য্য সাধনে সমর্থ থাকে না। এই বিকৃত ভাবকেই মায়া ও মোহ বলে।" এই সকলই দেহের রচনা কৌশলের ফল মাত্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রস্তর খণ্ডেও তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু উহাতে জীবভাবের কোনই ক্রিয়া নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন:-"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্। (২।৫।১৮)।" "বঙ্গানুবাদ:—তিনি দ্বিপদ শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি চতুষ্পদ শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হইয়া পুরুষরূপে নানা দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই পুরুষ সর্ব্বদেহে পুরিশয় (অর্থাৎ দেহপুরে শয়ান)। এমন কিছুই নাই, যাহা ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত নহে। এমন কিছুই নাই, যাহা ইহা দ্বারা অনু প্রবিষ্ট নহে। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।"

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপযুক্ত ভাবে শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যেন ধরা দেন। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের ভাষা অসম্পূর্ণ। তাই সর্ব্বসাধারণের ধারণীয় ভাবেই ভাষা প্রযুক্ত হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও বলা হইয়াছে যে "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।" উভয় স্থলেই দেখা গেল যে প্রথমে দেহের সৃষ্টি এবং তৎপরে সেই দেহে ব্রহ্মের প্রবেশ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী বিভুর পক্ষে কোথায়ও প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান। সুতরাং বুঝিতে

(ক) এস্থলেও দেখা যায় যে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন ক্ষিতি পদার্থের—ভস্মের আবরণ দ্বারা অগ্নি শক্তিহীন ভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়।

হইবে যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই ঐরূপ ভাবেই লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে অনির্ব্বাচ্য বলা হয়। প্রকৃত পক্ষেও তাঁহার স্বরূপ ও কার্য্য বচনাতীত। আমরা সেই সকল বিষয় ভাষা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি এবং তাহাই করা হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শত চেষ্টায়ও অনেক কিছু অপূর্ণ থাকিয়া যায়, বিশেষতঃ যখন সেই বিষয় সংক্ষেপে দুই একটী শব্দ বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে যাহা হইতেছে, তাহা ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায়, কোনও বাধ্য বাধকতা জন্য নহে। সৃষ্টি ছিল না এবং অতি সুদূর ভবিষ্যতে থাকিবে না। সুতরাং সৃষ্টি ব্রহ্মের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। এই জন্যই সৃষ্টি ব্যাপারকে লীলা আখ্যা দেওয়া হয়। ব্রহ্ম Absolute. তিনি নিত্য অনন্ত ভাবে স্বাধীন। তিনি গুণ ও অনন্ত শক্তির অতীত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাধ্য বাধকতার প্রশ্নের উদয় হয় না এবং সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই বা থাকিতে পারে না। সৃষ্টি যদি অবশ্য প্রয়োজনীয়ই হইত, তবে তিনি Absolute হইতে পারিতেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম হৃদয় গুহায় ধরা দেন, ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে হৃদয় প্রস্তুত হইলেই জীবভাবের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। হৃদয়ই দেহের সর্ব্ব-প্রধান অঙ্গ। ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইলেই দেহের মৃত্যু। সুতরাং হৃদয়েই তিনি ধরা দেন, ইহা বুঝিতে হইবে। হৃদয় হইতেই যেমন দেহের সর্ব্বত্র রক্ত পরিচালিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াই দেহের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন। জীবাত্মা যে হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা উপনিষদ্‌ও বলেন। যথাঃ—হৃদয়ের নিরুক্ত—'স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি। (ছান্দোগ্য—৮।৩।৩)।" "বঙ্গানুবাদঃ—এই আত্মা হৃদয়ে। তাহার নিরুক্ত এইঃ—অয়ম্ (অর্থাৎ ইহা) হৃদি (অর্থাৎ হৃদয়ে) এই জন্য ইহার নাম হৃদয়ম্ (=হৃদি + অয়ম্)।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেনঃ—"হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং

প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠানি ভবন্তি।” “বঙ্গানুবাদ :—হে সম্রাট্। হৃদয়ই সর্ব্বভূতের আয়তন, হৃদয়ই সর্ব্ব ভূতের প্রতিষ্ঠা। হে সম্রাট্ হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।” (বৃহ—৪।১।৭)। “কতম আত্মেতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ। (বৃহ—৪।৩।৭)।” “বঙ্গানুবাদ :—ইহাদের মধ্যে আত্মা কে? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) এই প্রাণ সমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ পুরুষ (তিনিই আত্মা)।” “তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে। (বৃহ-৪।৪।২)।” “অনুবাদ :—তখন তাহার হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তি যুক্ত হয়। (মৃত্যু সময়ে যাত্রার কথা বলা হইল)”। ইহাও যাজ্ঞবল্ক্যেরই উক্তি। উপনিষদে আরও বহুস্থলে এরূপ উক্তি আছে, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে জীবাত্মা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এই সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনের ১।২।১১ এবং ২।৩।১৪ সূত্রদ্বয়ও দ্রষ্টব্য। অতএব ব্রহ্ম হৃদয়েই যে ধরা দেন, সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। যখন শ্রুতি ও বেদান্ত দর্শন উভয়ই এক বাক্যে বলেন যে হৃদয়ে জীবাত্মা বর্ত্তমান, তখন আমাদের উক্তিও (ব্রহ্ম নিজে নিজেকে হৃদয় গুহায় ধরা দেন) সত্য। এই সকল অতীন্দ্রিয় ও অতি গুহ্য বিষয়ে শ্রুতির উক্তি অভ্রান্ত বলিলে কোনই দোষ হইবে না।

চিকিৎসা শাস্ত্রও ঐ একই কথা বলেন। Ancient Indian Science of Health and Hygiene বিষয়ে ১৩।১২।৫৬ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে দেখা যাইবে যে জীবাত্মা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। “Ayurveda stands out prominently as the premier Science of life to consider the importance of both 'Brain and Heart'' in the same strain as the two main organs of the human body controlling all its mental and physical activities. The one cannot

work independetly of the other. And if the one is sick, the other is bound to be sick then and there or after the lapse of some time. But the Ayurvedic sages have laid greater emphasis on the importance of heart as the most important organ of the body where mind, the agent of Brahmo resides in the shape of Jivatma". আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্ক ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ারাহিত্য হইলেও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকা যায় তাহা যতই অল্প হউকনা কেন। কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে তৎক্ষণাৎই জীবের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহ—৪ ৪।২ মন্ত্রেও পাই যে মৃত্যুকালে জীবাত্মা হৃদয় হইতেই দেহত্যাগের কার্য্য আরম্ভ করে। সুতরাং যে স্থান হইতে মৃত্যু যাত্রার আরম্ভ, সেই স্থানেই জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নিম্নলিখিত কারণবশতঃ জীবদেহ ব্রহ্মকে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। (১) অব্যক্ত স্বরূপ অচেতন। সুতরাং সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন জড় জগৎ ও তজ্জাত জীবদেহও অবশ্যই অচেতন হইবে। তাই উহা অজ্ঞান অন্ধকার সৃষ্টি করিতে সমর্থ। দেহ সাকারও বটে। সাকারত্ব যে বাধা প্রদান করে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। (২) "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব মিলন বা একত্ব হইয়াছে। অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন জড় জগৎ ও জড় দেহের কার্য্য দেখিয়া যুক্তিযুক্তভাবে অনুমান করা যায় যে উহা ব্রহ্মের অন্যান্য বহুগুণের বিরোধী। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশেও আমরা দেখিয়াছি যে দেহই আত্মার সুতরাং ব্রহ্মের গুণরাশির বিকাশের সর্ব্বপ্রধান বাধক। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে জীবদেহ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন বলিয়াই এইরূপ বাধা প্রদানে সমর্থ। কারণ, উৎপন্নে উৎপাদকের গুণ ও শক্তি বর্ত্তমান থাকিবেই। (৩ জড় পদার্থকে আমরা দুই ভাবে বুঝিয়া থাকি।

একটী জীবকুলের জড় দেহ এবং অন্যটী জীবদেহাতিরিক্ত জড় পদার্থ সমূহ। উহাদিগকেই ক্রমান্বয় organic and inorgamic matter বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জড় পদার্থ এক প্রকারেরই, কখনই দুই প্রকার নহে। দেহই পূর্ব্বোক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। দেহাতিরিক্ত জড় পদার্থ সেই পরিমাণ বাধা প্রদান করে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত গুণময় এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান এবং অনন্ত সুকৌশলী ব্রহ্ম তাঁহার প্রেমলীলার উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিরোধিতা শক্তি সম্পন্ন অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন দেহ এমন সুকৌশলে রচনা করিয়াছেন যে দেহের সহিত আত্মার যোগ হইলেই অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমানেচ্ছু প্রেমময় বিভু যখন হৃদয়গুহায় প্রেমলীলার্থ স্বেচ্ছায় ধরা দেন, তৎক্ষণাৎ আত্মা এবং পাঞ্চভৌতিক পদার্থ যোগে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতেই দোষ-পাশ-রাশি সৃষ্ট হয় এবং অন্ধকার উৎপাদন করে। (৪) দেহমাত্রই বিকৃত পদার্থ, কিন্তু পার্থিব দেহ অতি বিকৃত ভাবাপন্ন। দেখা গিয়াছে যে উৎপন্ন পদার্থ উৎপাদকের বাধা উৎপাদনে সমর্থ। (৫) ব্রহ্ম তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা সুকৌশলে দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেহ-সৃষ্টির বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়াই উহা সৃষ্ট হইয়াছে। উহা একটী অকেজো বস্তু নহে। উহারও কার্য্য আছে এবং তাহাই অন্ধকার উৎপাদন করিয়া আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করা। (৬) সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। যে স্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই জন্য দেহই সর্ব্বপ্রধান বাধা ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মের কোন গুণ কি প্রকারে দেহজাত বাধা সমূহ অতিক্রম করিতে পারে, ইহাই পরীক্ষা এবং এই ব্যাপারই সৃষ্টিলীলা। দেহ সৃষ্ট না হইলে জীব সৃষ্ট হইত না। আবার জীব সৃষ্ট না হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারিত না। অপর পক্ষে দেহ উহার নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেহ অব্যক্তের গুণ লাভ করিয়াছে। আবার বিকৃতি জন্য উহাতে বিরোধিতা শক্তি আরও

বলবত্তরা হইয়াছে। (৭) ' Like alone can act upon like.'' নামক তত্ত্ব আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। ব্রহ্ম হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন দেহ তাঁহার উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, বিশেষতঃ দেহ যখন তিনি নিজ হইতে নিজ দ্বারা স্বেচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ বাধারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর দেহের প্রভাবের কথাই বা বলি কেন? ব্রহ্মই ত স্বয়ং নিজ দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করিতেছেন। দেহের সারবস্তুও তিনি, আত্মা ত স্বয়ং তিনিই এবং লীলাও তিনিই করিতেছেন। তিনি ত নিত্যই অন্যদীয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত। সুতরাং কে কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে? ব্রহ্ম ভিন্ন ত ত্রিজগতে কোনই বস্তু নাই। এ সকলই তাঁহার নিজ হইতে নিজকৃত লীলাভিনয়। (৮) ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শ্রুতি ও মহা-দার্শনিক Plato বলেন যে দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধক।

এই সম্পর্কে "গুণ-বিধান" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ' অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। তাহাতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে দেহই আমাদের বাধাস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিলাম যে দেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে এবং উহা ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকেই ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাধক মাত্রই জানেন যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অর্থাৎ দেহাত্মভেদ-জ্ঞান লাভ কতই সুকঠিন ব্যাপার। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত পরমর্ষি গুরুনাথের উক্তি সমূহ হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে আমরা আত্মা-স্বরূপ বিস্মৃত ও দেহেই আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন। এই অন্ধকার, এই অজ্ঞানতা যে আত্মার দেহ সংসর্গে উৎপন্ন, তাহা ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং দেহই যে সকল গোলমালের মূলে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা গেল। আবারও বলি যে জড়দেহ চৈতন্যশূন্য। সুতরাং উহা যে অন্ধকার উৎপাদন করিবে, ইহা ত স্থির নিশ্চয়। অব্যক্ত হইতে প্রাপ্ত দেহের সাকারত্বও অন্ধকার সৃষ্টি করে, তাহা ত পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি দেহ অব্যক্তের বিরোধিতা শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহাতে যুক্ত হইয়াছে বিকৃতিজন্য আরও উগ্রতর বিরোধিতা।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মই দেহযোগে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মার উপর দেহের প্রভাব বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। দেখা যাইতেছে যে আমরা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আবার আমাদের মধ্যে যাহারা আত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দেহাবরণের প্রভাব সেই উন্নতির পরিমাণানুযায়ী ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তথাপিও তাঁহারা দেহের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে পারেন নাই। স্থূল, যতকাল দেহ, ততকালই আত্মার উপর উহার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু দেহ যতই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কারণ, কারণতর ও কারণতম হইবে, উহার প্রভাবও সেই অনুপাতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে। আমাদের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। আমরা সুষুপ্তিকালে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হই যে তখন আমাদের জ্ঞান অতীব সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান থাকে। এমন অবস্থা হয় যে কেহ কেহ সুষুপ্তিতে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহার কারণ এই যে দেহ তখন ঘোরতর তমঃদ্বারা আক্রান্ত থাকে, আমাদের জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়। এই অবস্থাকেই জীবাত্মার বাস্তব অবস্থার সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় দেহসমূহ নিজ একতম স্বরূপ হইতে পরম্পরাভাবে উৎপাদন করিয়াছেন এবং নিজ প্রেমলীলার উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই অপূর্ব্ব জ্ঞান দ্বারা এমন সুকৌশলে উহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে উহার প্রভাব আত্মার উপর বর্ত্তিবেই। দেহ যত তমোভাবাপন্ন হইবে, উহার প্রভাব ততোঽধিক হইবে। আবার দেহ যত সত্ত্ব ভাবাপন্ন হইবে, উহার প্রভাব তত অল্প হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভূত যত স্থূল, উহা তত তমোভাবাপন্ন। সুষুপ্ত অবস্থায় দেহে আত্মা থাকিয়াও যেন প্রায় নাই অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ জীবাত্মার বাস্তব অবস্থায়ও তাঁহার ব্রহ্মত্ব থাকিয়াও যেন প্রায় নাই। তিনি দেহের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়েন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।

অতএব দেখা গেল যে জীবাত্মা স্বরূপে পরমাত্মা হইয়াও বাস্তবে তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব মাত্র। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মই দেহ যোগে ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আবার দোষ-পাশের আবরণে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই, যেমন মেঘের আবরণের জন্য সূর্য্য স্বভাবে থাকিতে পারে। দেহজাত দোষ-পাশ-রাশি ব্রহ্মের স্বরূপে কোনই বিকার উৎপাদন করিতে পারে না, কেবল উপরি উপরি অন্ধকার আবরণ সৃষ্টি করিয়া উহারা তাঁহাকে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে মাত্র। গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে দোষ-পাশ-রাশি আত্মার উপরি উপরি আবরণ সৃষ্টি করে মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মেঘের আবরণ যেমন সূর্য্য হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, দোষ-পাশের আবরণও তেমনি ব্রহ্ম হইতে অসীম দূর দূরান্তরে বর্ত্তমান থাকে। মেঘের আবরণ আমাদের দৃষ্টিতে অত্যধিক, কিন্তু সূর্য্যের নিকট উহা অত্যন্ত সামান্য, অতি তুচ্ছ। সেইরূপ দোষ-পাশের আবরণ বহির্দৃষ্টিতে আমাদের নিকট এতই অধিক, কিন্তু ব্রহ্মের নিকট উহা কিছুই না। এই ভাব বুঝাইতে যাইয়াই সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—তিনি যেন বদ্ধ। অতএব ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মার বা জীবাত্মার বাস্তব অবস্থা যে ব্রহ্মের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ সে সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপে পরমাত্মা বটেন, কিন্তু বাস্তবে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রভাবে প্রতীয়মান। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে ব্রহ্মই স্বয়ং স্বেচ্ছায় অবিকৃত থাকিয়াও দেহ-যোগে অংশভাবে প্রকাশমান। স্থূল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জীবদেহ সমূহ এমন সুকৌশলে রচনা করিয়াছেন যে উহা হইতে উৎপন্ন দোষ-পাশ জাত অন্ধকার দ্বারা তিনি এমন আবৃত হইয়াছেন যে তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার এক ও অখণ্ড থাকিয়াও for all practical purposes জীবাত্মাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং পৃথক্ (Distinct) অস্তিত্ব সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা

ব্রহ্মের অংশভাবে ভাসমান মাত্র (অবিচ্যুত হইয়াও বিচ্যুত ভাবে ভাসমান মাত্র)। অর্থাৎ স্বরূপে উভয়ই এক ভিন্ন দুই বা বহু নহেন। ব্রহ্ম কখনও খণ্ডিত হন নাই বা হইতেও পারেন নাই। কিরূপে স্বরূপে এক থাকিয়াও বাস্তবে তিনি ক্ষুদ্র ও অংশভাবে ভাসমান হইতে পারিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বই সত্য-দর্শনের ভেদাভেদ তত্ত্ব। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং স্বরূপে এক থাকিয়াও দেহ যোগে বহু ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন। "সর্ব্ব ঘটে তুমি বিরাজ," "যত্র জীব, তত্র শিব", "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো সদা শিবঃ" প্রভৃতি বাক্য সমূহ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্পর্ক সূচনা করে। "Unity in Diversity and Diversity in unity" তত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। একই বিধান সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। ইহাই যখন সত্য, তখন ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম এক অখণ্ড থাকিয়াও বহু জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর এই তত্ত্বকে আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার সাহায্য করিবে।

প্রশ্ন :—জীবাত্মা কি ব্রহ্মের সহিত অভেদ ?

উত্তর :—না।

প্রশ্ন :—জীবাত্মা কি ব্রহ্মের সহিত ভেদ ?

উত্তর :—না।

প্রশ্ন :—ভেদও নহে, অভেদও নহে, তবে কি ? ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ শব্দ, উভয় ভাব একে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

উত্তর :—ব্রহ্ম ও জীবাত্মার সম্পর্ক বিশুদ্ধ ভেদেরও নহে, বিশুদ্ধ অভেদেরও নহে। কিন্তু উহা ভেদাভেদ সম্পর্ক। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে এক থাকিয়াও বাস্তবে তাঁহারই অংশ ভাবে ভাসমান। ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণের মিলন বা একত্ব হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সৃষ্টিতেও বিরুদ্ধ ভাবের মিলন হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার যে এই দুই বিরুদ্ধ ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য-

ম্বিত হইবার কিছুই নাই। আমরা যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। আবার ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড। সুতরাং তাঁহার কোনই অংশ হইতে পারে না, ইহাও অতি সত্য। আবার ব্রহ্ম তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা সৃষ্টি করিতে পারেন না। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছু কল্পনা করিলে তাঁহার ব্রহ্মত্বই থাকে না, তিনি সীমাবদ্ধ সুতরাং ক্ষুদ্র হন। ইহা অসম্ভব। সুতরাং আমরা ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি, ইহা ধ্রুব সত্য, আবার আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইহাতেও বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী অবস্থা—একটী স্বরূপ অবস্থা। ইহাতে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মই। অন্যটী বাস্তব অবস্থা, ইহাতে তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। যদি ইহাই স্থির হইল, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মই লীলার্থ দেহযোগে ক্ষুদ্র ভাবে সুতরাং অংশভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ব্রহ্মের এই ক্ষুদ্রভাবে ভাসমানত্বকেই তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে, নতুবা ব্রহ্মের কোনই অংশ নাই বা হইতেও পারে না। ইহাও সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে এই ভাসমানত্বের জন্য ব্রহ্ম বিকৃত হন নাই। আবার ভাসমান বলিয়া জীবাত্মা মিথ্যা নহে। মহাসমুদ্র ও তরঙ্গ উভয়ই সত্য। মহাসমুদ্রই বাত্যাযোগে তরঙ্গ ভাবে ভাসমান হয়। সুতরাং তরঙ্গ স্বরূপে মহাসমুদ্রের সহিত এক হইয়াও বাস্তবে উহার ক্ষুদ্র অংশ ভাবে ভাসমান এবং পৃথক্ (Distinct) ভাবে প্রতীয়মান হয়। অতএব ব্রহ্মই দেহযোগে স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্রভাবে, অংশ ভাবে, পৃথক্ (Distinct) ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই পৃথক্ ভাবে ভাসমান যাহা, তাহা জীবাত্মা। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীব = আত্মা + দেহ। সুতরাং জীবাত্মার অর্থ ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত বা শরীরী আত্মা। যে পর্য্যন্ত দেহ, সেই পর্য্যন্তই জীবত্ব এবং সেই পর্য্যন্তই তাঁহার দুই অবস্থা—স্বরূপ ও বাস্তব। সুতরাং ভেদাভেদ তত্ত্বই সত্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা শব্দে কেবল আত্মাকেই বুঝিতে হইবে না, কিন্তু শরীরী আত্মা বা দেহাবদ্ধ আত্মাকে বুঝিতে হইবে। মায়াবাদও জীবাত্মার বাস্তব অবস্থা স্বীকার করেন বলিতে হইবে। উহা বলেন যে সর্ব্বদেহে নির্ব্বিকার কূটস্থ ব্রহ্ম

বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি অবিদ্যা উপহিত। এই অবিদ্যা উপহিত কূটস্থ ব্রহ্মই জীব। জীব ও আত্মা এক নহে। জীব=আত্মা+দেহ। সুতরাং জীবের অবস্থাই বাস্তব অবস্থা। সুতরাং দাড়াইল এই যে উভয় পক্ষই স্বরূপ ও বাস্তব অবস্থা স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদ মায়াকে বাস্তব অবস্থার কারণ বলেন এবং আমরা দেহকেই উহার কারণ বলি। দেহই যে বন্ধনের কারণ, তাহা ইতিপূর্ব্বে নানাস্থলে প্রমাণিত হইয়াছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "মায়াবাদ" অংশে লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম ও জীবাত্মা সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত নানাস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে তাই আর উহার পুনরালোচনা করিলামনা :—(১) ঘটাকাশ ও মহাকাশ, (২) সূর্য্যগ্রহণকালে রাহুগ্রস্থ সূর্য্য এবং স্বরূপে সূর্য্য, (৩) মেঘাবৃত সূর্য্য ও স্বরূপে সূর্য্য, (৪) পৃথিবী এবং সীমাবদ্ধ দেশগুলি, (৫) বিদ্যুতের উৎস এবং নানা বর্ণের কাচের bulb, (৬) উর্ণণাভ এবং উহার নিজোৎপন্ন জালে আবদ্ধতা, (৭) বৃক্ষ ও উহার শাখা প্রশাখা প্রভৃতি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন নিত্য নির্ব্বিকার এবং তিনি যখন সীমাবদ্ধ ও শক্তিহীন জীবাত্মা ভাবে ভাসমান মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কখনই ক্ষুদ্র হন নাই, (১) তখন জীবাত্মা বা স্বরূপত: পরমাত্মার মুক্তির অর্থ কি? (২) আবার জীবাত্মার বা স্বরূপতঃ পরমাত্মার মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা থাকিবে কেন? তিনি ত নিত্যই মুক্ত।

সমস্যা অতীব কঠিন। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতার অপার দয়ায় এই সম্বন্ধে আমাদের যে চিন্তা আসিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতেছি। পাঠক বিবেচনা করিবেন যে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ সমস্যার সুমীমাংসা আনয়ন করিয়াছে কিনা। বিষয়টী কঠিন বলিয়া বিস্তারিত ভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। আলোচনার দীর্ঘতার জন্য পাঠক ধৈর্য্যচ্যুত না হইলে আমরা সুখী হইব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে জীবের মুক্তি অনন্ত প্রকার।

অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত গুণ। তাঁহার দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের একত্বে অনন্ত একত্ব হইয়াছে। আবার সেই অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ তিনি। জীবের পক্ষেও সেইরূপ তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণে একত্ব লাভ করিতে হইবে এবং সেই অনন্ত একত্বের একত্বেও বিভূষিত হইতে হইবে। এই যে এক একটী একত্ব লাভ, তাহাই এক একটী মুক্তি। সুতরাং জীবের পক্ষে মুক্তিও অনন্ত। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা। সুতরাং জীবাত্মায় পরমাত্মার অনন্ত গুণই নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু উঁহারা অসংখ্য আবরণে আবৃত। এই আবরণ উন্মোচন করিয়া হৃদয়ে পরমাত্মার গুণরাশির বিকাশ সাধনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা প্রেমলীলাময় প্রাণেশ্বরের প্রেমলীলা। এই গুণরাশির পূর্ণ বিকাশ বা একত্ব লাভ বা পূর্ণামুক্তি ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা সাপেক্ষ। অতএব বলা যাইতে পারে যে মুক্তির অর্থ ব্রহ্মকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভাবে জীবনে বিকাশ করা বা ব্রহ্মে লয় বা পূর্ণামুক্তি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে এই প্রশ্ন মায়াবাদ বা সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। কারণ, উভয় দর্শনই ব্রহ্ম বা পুরুষকে নির্গুণ (গুণ শূন্য) এবং নিষ্ক্রিয় বলেন। সত্যদর্শন তাহা বলেন না। সেই মতে ব্রহ্ম অনন্ত গুণধাম ও অনন্ত শক্তির আধার এবং অনন্ত গুণ ও শক্তির অতীত। তাঁহাতেই অনন্ত শক্তিমতী ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্রহ্মের প্রেমলীলা মাত্র। তিনিই স্বয়ং বাধ্যবাধকতা শূন্য হইয়া কেবল লীলার্থই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে এবং সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ ভাবে দেহে নিজেকে নিজে ধরা দিয়াছেন, দেহজাত দোষ-পাশ-রাশি দ্বারা আবরণ সমূহ সৃষ্টি করিয়া নিজেই উহাদের দ্বারা আবৃত হইয়াছেন অথবা নিজেই নিজেকে ক্ষুদ্রভাবে, অংশ ভাবে ভাসমান করিয়াছেন। আবার তিনিই ক্রমশঃ ঐ সকল আবরণ উন্মোচন করিবেন এবং অবশেষে তিনিই, একমাত্র তিনিই থাকিবেন, দেহও থাকিবে না, সুতরাং কোনও রূপ জীব ভাবও থাকিবে না। অর্থাৎ তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে নিজের বন্ধন নিজে মোচন করিবেন। যিনি যাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন, তিনিই

তাঁহার সেই বন্ধন মোচন করিবেন। অর্থাৎ প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর নিজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় দেহে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং সেই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই নিজকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। এই কার্য্যে অন্য কাহারও কোনই হস্ত নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি ব্যাপার লীলামাত্র এবং তিনি উহা স্বয়ংস্বাধীন ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। তিনি অন্যদীয় সাহায্য হইতে নিত্য বঞ্চিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। যে স্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধা। এই বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে। সুতরাং প্রত্যেক জীবের অনন্ত প্রায় জীবনই সাধনার জন্যই, জীবন বা সাধনাই লীলা। সাধনা সম্বন্ধে পরমর্ষি-গুরুনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "সাধনা নৈসর্গিক গুণ। তুমি ইচ্ছা কর বা নাই কর, তোমাকে কোন না কোন সাধনা করিতেই হইবে, তুমি বোঝ বা নাই বোঝ, তোমাকে সাধনার পথে যাইতেই হইবে। কেন না, অন্বয়ী সাধনা না করিলেও ব্যতিরেকী সাধনা করিতে হয়। অনন্ত মঙ্গলময় পূর্ণ-পুরুষ তাঁহার অংশ সমূহকে (অংশ ভাবে ভাসমান জীবাত্মাদিগকে) ক্রমশঃ অনন্ত শক্তি প্রদান করিবার জন্যই এইরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখ, একটী অবিকার্য্য বীজ কোন স্থানে পড়িয়া থাকিলে যেমন উহা হইতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সাধনা ইচ্ছাপূর্ব্বক না করিলেও মঙ্গলময়ের নিয়মে সাধনা হইয়া থাকে। আরও দেখ, এক শিশি বায়ু একটা বৃহৎ বোতলের মধ্যে উত্তাপাদি বিস্তার্য্যতা-সাধনী ক্রিয়ার অভাবেও উহা আপনা হইতেই বোতলের সর্ব্বাংশে যেমন ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ উন্নতি লাভ আত্ম-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তুমি উন্নত হইতে চেষ্টা কর বা না কর, ঐ যে একজন অনন্তশক্তিমান অনন্তস্নেহময় অনন্তপ্রেমময়, অনন্তন্যায়পর, অনন্ত অনন্ত অনন্তগুণবিশিষ্ট, তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহার অনন্ত গুণে তোমার উন্নতি নিয়তই হইবে, সন্দেহ নাই, যদি তুমি চেষ্টা কর, তাহা হইলে উহা পরম সুধাময়ী হইবে,

আর তাহা না করিলে অননুভূত ও দুঃখময়ী হইবে। কারণ, চেষ্টা না করিলে তোমার অনুকূল-ক্রমানুসারিণী না হওয়াতেই ঐরূপ হয়। চেষ্টা করা ও না করা করাতে ইহাই প্রভেদ।” ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে জড় যেমন বাধা দিতে পারে, তেমনি উহা বাধা অতিক্রম করিবার সাহায্যও করিতে পারে। কণ্টকেনাবিদ্ধ কণ্টকম্। সুতরাং যাহা আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আবার সেই আবরণ মোচন করিতে সমর্থ। সর্পবিষ যেমন মৃত্যু আনয়ন করে, তেমনি উহাই আবার অবস্থা বিশেষে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে দেহের জন্য আমাদের বন্ধন, সেই দেহেরই উপযুক্ত ব্যবহারে আবার সেই বন্ধন হইতে মুক্তি। ব্রহ্ম তাঁহার খুশীমত নিজেকে বাঁধেন নাই, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল আর অমনি তিনি বদ্ধ হইলেন, তাহা নহে। নিজেকে বন্ধন করিতে তিনি এই বিরাট জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি করিয়াছেন, এই জগৎ হইতেই জীবদেহ সমূহ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার নিজ আবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রণালীর মধ্যে আবার ক্রমও বর্ত্তমান। জগতে ক্রম ভিন্ন কিছু হয়নাই ও হইবেও না। আবার তিনি ইচ্ছার মুহূর্ত্তেই নিজেকে বন্ধনমুক্ত করিবেন না। সেই কার্য্যটীও প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়াই ক্রমশঃ হইবে বা হইতেছে। দেহ রচনার মধ্যেই সেই প্রণালী নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ দেহই উহার কার্য্যদ্বারা আমাদিগকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে এবং ক্রমশঃ আবরণ উন্মোচন করিতে সহায়তা করিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেহের চালক অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের চালক জীবাত্মা যিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা ব্রহ্ম বা আত্মা স্বয়ং জীব হৃদয়ে বাস করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অনন্ত গুণই হৃদয়ে চির বর্তমান। কিন্তু দোষ-পাশ-রাশির আবরণের বর্ত্তমানতা হেতু উহারা কার্য্যকর হয়না। ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা যে পরিমাণে গুণরাশির বিকাশ সাধিত হইবে, দোষ-পাশরাশিও সেই পরিমাণে বশীকৃত বা লয়প্রাপ্ত হইবে। আবার গুণের বিকাশ

সাধন হইলেই সেই গুণের তেজে অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। এইরূপে ক্রমশঃই Momentum বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, গুণরাশি ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ভাবে বিকশিত হইতে থাকিবে এবং আবরণ সমূহও সেই পরিমাণে অপসৃত হইবে। আরও একভাবে প্রমাণিত হইতে পারে যে আবরণ সমূহ অনন্তকাল থাকিবেনা বা থাকিতেও পারেনা। আবরণ সমূহ দেহজাত, উহারা অনাদি অনন্ত নহে। উৎপন্ন পদার্থ বলিয়া উহারা নানাবিধ বিকারের অধীন। সুতরাং উহাদের বৃদ্ধি, হ্রাস ও নাশও আছে। উহারা নৈসর্গিক নিয়মেই ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। একেবারেই লয়প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উহারা অনন্তকাল আমাদের বাধা উৎপাদন করিতে পারিবে না। অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্ম নিজে তাঁহার নিজ আবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই উহা দ্বারাই সেই বন্ধন মোচনের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই এই বিধান করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যোগে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা তিনি তাঁহার প্রেমলীলার সকল সুবিধান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে Irreducible minimum অবস্থায় দেহাবদ্ধভাবে জগতে পাঠাইয়াছেন এবং সেই অত্যন্ত অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতায়ও তিনিই আমাদিগকে নিতেছেন। সৃষ্টিতে উভয়ভাবের বিধানই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় ও অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতাই করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই সেই মঙ্গল বিধান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব এবং সেই পথেই চলিতে চেষ্টা করিব। এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ ইতঃপর লিখিত হইতেছে। যাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইল, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট যে সাধনা আমাদের স্বভাব, আমরা সাধনা না করিয়া থাকিতে পারিনা। প্রত্যেক সাধকই জানেন যে তিনি কখনও কখনও অন্যায় কার্য্য করেন, কিন্তু কে যেন তাহাকে অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। আমাদিগের মধ্যে সদসৎ বিচারের শক্তি স্বাভাবিক ভাবে বর্ত্তমান। বিবেক এই বিচারকার্য্য করে বলিয়া উক্ত হয়। যাহা হউক, ইহা সত্য যে আমরা অন্যায় কার্য্য করিয়া রেহাই পাইতে

পারি না। পাপ কার্য্যে বিশেষভাবে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের জন্য অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী। পাপ কার্য্য করিতে করিতে শেষে আর অনুতাপ আসে না। কারণ, বিবেকের বাণী আমাদের কর্ণে আর পৌঁছিতে পারে না। দৃঢ় মূল অভ্যস্ত পাপের গভীরতাই বাধা উৎপাদন করে। কিন্তু এককালে, তাহা শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, ইহলোকেই হউক অথবা পরলোকেই হউক, বর্তমান জন্মেই হউক অথবা পরজন্মেই হউক, পাপের জন্য উপযুক্ত অনুশোচনা ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে দোষ-পাশরাশি হৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া আমাদের দ্বারা নানাবিধ পাপকার্য্য করাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে আমরা সুখী থাকি না। গভীর পাপে পাপী ভিন্ন সকলেই চাহেন যে তাহারা দোষ-পাশমুক্ত হইয়া সুপবিত্র হন ও পাপকার্য্য হইতে চিরতরে বিরত হন। এই ভাবেই আত্মিক উন্নতি সাধনা আরম্ভ হয়। কিন্তু গুণরাশির বিশেষ বিকাশ ভিন্ন পাপের মূল দোষপাশ-রাশির লয় হয়না। এই জন্যই সাধনার বিধানে দেখা যায় যে প্রকৃতিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নহে, কিন্তু প্রকৃতির উপযুক্ত ব্যবহারে গুণরাশির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল যে পরমপিতা জড় জগৎ ও তজ্জাত দেহ সমূহ দ্বারা আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা আবার উহাদের সাহায্যেই সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মুক্তিরও ক্রম বিদ্যমান। এক মুহূর্ত্তেই আমরা আবদ্ধ হই নাই এবং এক মুহূর্ত্তেই আমরা মুক্তও হইব না। ক্রমপ্রণালী জড় জগতে যেমন কার্য্য করিতেছে, আত্মিক জগতেও সেইরূপই কার্য্য করিতেছে। মুক্তির ক্রম বুঝিতে আমরা সূর্য্য-গ্রহণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে চন্দ্রের ছায়ায় ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। আবার যখন মোক্ষ আরম্ভ হয়, তখন ক্রমশঃ চন্দ্রের ছায়া অপসারিত হইতে হইতে অবশেষে সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয়। আত্মার বন্ধন ও মোচনও সেইরূপ। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম জীব-ভাবে আবদ্ধ হইতে অনন্ত প্রায় বিরাট বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং সেই

জগৎ হইতে দেহ সমূহ রচিত হইয়াছে। ইহাতে যে অসংখ্য বৎসর লাগিয়াছে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ আছে, সুতরাং জীবাত্মারও অনন্তগুণ আছে, কিন্তু জীবে উহা অসংখ্য আবরণে আবৃত। সুবর্ণ গঠিত একটী সুবৃবৎ বৃত্তের কল্পনা করা যাউক এবং উহা একটী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের পট দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত মনে করা যাউক। সেই পটে অসংখ্য বিন্দু বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক বিন্দুটী স্বর্ণবৃত্তের যেন এক একটী আবরণ। একটী আবরণ উন্মোচন করিলে স্বর্ণবৃত্তের বিন্দু পরিমাণ স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। সেইরূপ জীবাত্মার অনন্ত গুণরাশি অনন্ত আবরণে আবৃত। উহাদের একটী আবরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই পরমাত্মার একটুখানি স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ হয়। এইরূপে আবরণ উন্মুক্ত হইতে থাকিবে, আর পরমাত্মার স্বরূপ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। তাঁহার অনন্ত গুণ ও উহাদের আবরণও অনন্ত। তাই সেই সকল আবরণ মুক্ত হইতে অনন্ত প্রায় কালের প্রয়োজন হইবে। এই জন্যই বলা হয় যে আমাদের অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে অনন্ত সাধনার প্রয়োজন। এস্থলে আরও একটী বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা আমাদের অন্তঃকরণ। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে প্রস্তর খণ্ডেও ব্রহ্ম পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, কিন্তু উহার মধ্যে জ্ঞান বা জীবভাবের কোনই ক্রিয়া নাই। কিন্তু রচনাকৌশল দ্বারা লীলাময় স্রষ্টা এমনভাবে জীবদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন যে উহার রচনার স্তর বিশেষে, তিনি যেন নিজেকে নিজে ধরা দেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত। তাঁহার ইচ্ছায় জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই জড় জগৎ হইতে জীবকুলের দেহও সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে ব্রহ্মও দেহের যোগে অন্তঃকরণ নামক তৃতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইল। উহার এক অংশ আত্মিক এবং অন্য অংশ পাঞ্চভৌতিক। সুতরাং ব্রহ্ম, জড়দেহ ও অন্তঃকরণের যোগে জীব সৃষ্টি। প্রস্তরখণ্ডে অন্তঃকরণ নাই। সুতরাং তাহাতে ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও জীবভাবের কোনই

কার্য্য নাই। অতএব দেখা গেল যে অন্তঃকরণের জন্যই দোষ-পাশের সৃষ্টি এবং তজ্জন্যইআমাদের আবরণ। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। অন্তঃকরণই সদসৎ বিচার কবিতে সমর্থ। আবার অন্তঃকরণ পাপ কার্য্যে রত থাকিতে প্রস্তুত নহে। সে প্রকৃত শান্তি চাহে, প্রকৃত আনন্দ চাহে। ইহাই উহার স্বভাব। সে প্রকৃত আনন্দ পায় না বলিয়াই তামসিক ও রাজসিক আনন্দ লইয়া ব্যস্ত থাকে। সে দুধের সাধ ঘোলে মিটায়। সুতরাং অন্তঃকরণের নিজ স্বভাব-বশতঃই সে প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করে। কারণ, তামসিক ও রাজসিক আনন্দ তাহাকে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না। এই অনু-সন্ধানের ফলেই ধর্ম্ম জীবনের সূচনা হয় এবং ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইলেই ক্রমশঃ অন্তঃকরণের সাধু এবং পারমার্থিক দৃষ্টি খুলিতে থাকে। তৎপর ক্রমশঃ সাধনা, চেষ্টা ও অধ্যবসায় আসিয়া যুক্ত হয়। তৎপর যাহা হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুক্তির অর্থ বলা হইয়াছে। এখন যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে সেই সকল মুক্তিলাভের জন্যও চেষ্টা অন্তঃকরণ আনয়ন করিবে এবং ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা রূপ পরমো-পায় অবলম্বন করিবে। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মের ইচ্ছা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদের সকল কার্য্যের পশ্চাতে বর্ত্তমান। আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অন্তঃকরণ কেবল জড় পদার্থ নহে, উহার এক অংশ আত্মিকও বটে। সুতরাং ultimate analysis এ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে প্রেমলীলাময় পরব্রহ্ম তাঁহার লীলা সাধনার্থই জড় জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তাহা হইতে দেহ এবং দেহ ও আত্মার যোগে অন্তঃকরণের সৃষ্টি। এই ভাবেই তিনি স্বয়ং দেহে আবদ্ধ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আবার এই সকল দ্বারাই নিজ বন্ধন মোচনের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল বিধানেই আমাদের দৃষ্টি সত্যের উপর নিপতিত হয় এবং সেই একই মঙ্গল বিধানেই আমাদের হৃদয়ে স্থিত তাঁহার গুণ রাশির সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া তাঁহাকেই লাভ করিতে যত্ন ও চেষ্টা আসে। সুতরাং মুক্তির জন্য চেষ্টা স্বাভাবিক।

আমরা স্বভাবতই নিত্য মুক্ত, বন্ধন আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। দেহে যদি foreign substance কিছু প্রবেশ করে, তবে যে পর্য্যন্ত না উহা সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয়, ততক্ষণই দেহ উহার সম্পূর্ণ শক্তি দ্বারা উহাকে দেহ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করে। ইহাই দেহের স্বভাব। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বন্ধন আমাদের স্বভাব নহে, উহা বিদেশাগত, উহা বিকৃত পদার্থ জাত। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইব, সেই পর্য্যন্তই আমাদের বন্ধন মোচনের চেষ্টা চলিবে। ইহা আমাদের স্বভাব সঙ্গতই, কিন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য নহে। সকল বিধানই তাঁহার করুণার বিধান, এই সহজ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হয়। এই প্রসঙ্গে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ এস্থলে বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অন্তঃকরণ আত্মার কার্য্য ক্ষেত্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যের যেমন ক্রম-মোক্ষ হয়, আত্মার আবরণ রাশি ক্রমোন্মুক্ত হইতে থাকিলে আমাদেরও সেইরূপ ক্রমমোক্ষ হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে এই ক্রম মোক্ষ কাহার? পরমাত্মা ত নিত্যই মুক্ত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অন্তঃকরণই ক্রমশঃ অন্ধকার বিনির্মুক্ত হইতে থাকিবে এবং অন্তঃকরণের অন্ধকার নিরসনের সহিত পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত আবরণও বিদূরিত হইতে থাকিবে। সুতরাং এক অর্থে জীবাত্মাই (যিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা) আবরণ মুক্ত হন। তিনিই আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তিনিই মুক্ত হইতেছেন। সাধনার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, হৃদয় সুনির্ম্মল হয় অর্থাৎ আবরণ রাশি ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয় এবং আত্মার গুণরাশিও ক্রমশঃ হৃদয়ে বিকশিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তের দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে এক একটী গুণ বিরোধী আবরণ উন্মুক্ত হইবে এবং পরমাত্মার স্বরূপ একটু একটু করিয়া হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে। এই বিকাশ হৃদয়েই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হৃদয় সত্ত্বময় হইলে পরমাত্মার গুণরাশি হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এবং উহারা আমাদিগের ধারণীয় হয়। এই সম্পর্কে ৬৪৫ পৃঃ উদ্ধৃত (৩) চিহ্নিত অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। অতএব দেখা

গেল যে অন্তঃকরণই আমাদিগকে মুক্তির দ্বারে পৌছাইয়া দেয়। উহা যদি নিজেই আবরণ-রাশি-বিবর্জ্জিত হয় তাহা হইলে অচিরে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে মুক্তির অবস্থায় বা ব্রহ্মদর্শনের অবস্থায় অন্তঃকরণেরও আত্মায় লয় হয়। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবারও প্রশ্ন হইবে যে অন্তঃকরণের লয় হইলে একমাত্র পরমপিতাই বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং তখন কে কাহাকে দেখিবে? এই প্রশ্নও অতি সুকঠিন। এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। আমাদের নিবেদন নিম্নে লিখিত হইতেছে। দেহাবদ্ধ জীবাত্মা কখনই পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা "সোঽহং জ্ঞান" অংশে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্ব যখন নিশ্চিত সত্য, তখন জীবাত্মা কখনই পূর্ণভাবে একত্ব লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া মিশিয়া যাইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন না। ব্রহ্মদর্শন মনুষ্য দর্শনের ন্যায় নহে। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন :—"কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি প্রেমিক, ইহারা স্বাবলম্ব্য গুণের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই ঐ সকল গুণের চরমোৎকর্ষ স্থান অর্থাৎ ঈশ্বর নিরীক্ষিত হন।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহার আংশিক দর্শন, কখনই পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ দর্শন নহে। ব্রহ্মের অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ। উঁহাদের কোন একটী গুণের পরমোৎকর্ষ লাভ হইলেই সাধকের অনন্ত গুণের পরমোৎকর্ষ লাভ হয় না। পরমর্ষি গুরুনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন :— "যখন পরমাত্মার গুণ অনন্ত; তখন তাঁহার সেই অ-রূপ রূপও অনন্ত। সুতরাং সেই অনন্ত অনন্ত অ-রূপ-রূপ-দর্শন একজনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। একারণ তাঁহাকে পূর্ণভাবে দর্শন করাও অসম্ভব ও অসাধ্য।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। এই সম্বন্ধে কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে দর্শন করাও যায় না। ব্রহ্মদর্শন বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহার

আংশিক দর্শন মাত্র। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ। আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য সেই অনন্ত গুণ লাভ বা অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্ব লাভ। সুতরাং আমাদের সাধনা অনন্ত প্রায় কাল ব্যাপী। যদি প্রথম দর্শনেই সাধক ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করেন, তবে ত তখনই তাঁহার অনন্ত গুণের পরমোন্নতি লাভ হইল। তবে আর তাঁহার অনন্ত উন্নতি লাভের বাকী কি থাকিল? তিনি ত অনন্ত ব্রহ্মকে ফুরাইয়া ফেলিলেন। তিনি কেন সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিবেন? তিনি কেন অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য সৃষ্ট রাজ্যে অনন্তপ্রায় কাল বিচরণ করিবেন? এস্থলে আরও একটী কঠিন সমস্যাও উদয় হইবে যে ব্রহ্মদর্শনকালে সাধক যদি ব্রহ্মে মিলিয়া মিশিয়া যাইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন, তবে আবার তিনি কি প্রকারে জীবভাবে ফিরিয়া আসিবেন? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মদর্শন কালেও জীবাত্মা দেহে আবদ্ধ। সেই সময় ইন্দ্রিয়গণ মনে এবং মন জীবাত্মায় লয় হয় বটে, কিন্তু উহাদের নিরন্বয় ধ্বংস হয় না। তখন অনন্ত কৃপাময় পিতার অপার কৃপায় সাধক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। "এই সাক্ষাৎকার সময়ে লীনেন্দ্রিয়-মনের জীবাত্মায় লীনতা-নিবন্ধন দর্শন, শ্রবণ, মননাদি সর্ব্বশক্তিই জীবে থাকে। একারণ সে দর্শন এক অনির্ব্বচনীয় দর্শন। সে অরূপ-রূপ দর্শন যাঁহার অদৃষ্টে ঘটে, সে ব্যক্তিই তাহা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু বলিতে পারে না (ক)।" ভক্ত মনমোহন গাহিয়াছেন :—'যোগী ডুবিয়া তব রূপধ্যানে, কী যে অমৃত পাইল প্রাণে, যে জন পাইল সেই শুধু জানে, জয় জয় সুন্দর হে।" দেহ থাকিলেই উহার কিছু প্রভাব আত্মার উপর বর্ত্তিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পরমাত্মাই দেহ-যোগে জীবাত্মাভাবে ভাসমান সুতরাং পরমাত্মাকে ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান করিবার শক্তি দেহের আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য সকলই পরমপিতার বিধান। পরমর্ষি গুরুনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন— প্রত্যক্ষ ষড়বিধ, যথা—চাক্ষুষ, ঘ্রাণ, রাসন, শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানস। কিন্তু

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

জীবাত্মা যখন পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, তখন ঐ ষড়বিধ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অন্য এক প্রকার প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান হয়। শেষোক্ত প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান ব্যাপক এবং প্রথমোক্ত ষড়বিধ প্রত্যক্ষ ব্যাপ্য। উল্লিখিত প্রত্যক্ষের পরে যখন জীবাত্মার ঐ ভাব মনে সঞ্চারিত হয়, তখন বোধ হয় যে পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারের-কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার অমৃতাতীত মধুময় বচন শ্রবণ করিয়াছি। ইত্যাদি। ইহার কারণ ব্যাপক প্রত্যক্ষে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্য ষড়বিধ প্রত্যক্ষই অন্তর্গত থাকে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, উহা মানস প্রত্যক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ তৎকালে মনে ইন্দ্রিয়ের ও জীবাত্মায় মনের লয় হয়। শ্রুতিতেও আছে যে, মনঃ পরমাত্মাকে পাইতে পারে না।" (ক) বিপরীত ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শেষোক্ত জ্ঞানই আত্মার জ্ঞান। সেই জ্ঞান দেহ যোগে নববিধ ভাবে প্রকাশিত হয়। যথা—বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, অহঙ্কার, দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটীকে মানস জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাই মূলে ষড়বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলা হইয়াছে। আত্মার জ্ঞানই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। কিন্তু নববিধ জ্ঞান বিকৃত। বিকৃতির কারণ দেহ সংসর্গ। সুতরাং এই নববিধ জ্ঞান আত্মার জ্ঞানের অন্তর্গত থাকে। অর্থাৎ অবিকৃত আত্মার জ্ঞানই দেহ সংসর্গে বিকৃত হইয়া নববিধ ভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম দর্শন কালে সাধক সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া মিশিয়া যাইয়া আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পুর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন না। জীবাত্মা ভেদ রক্ষা করিয়াও ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন। আমাদের মনে হয় যে ব্রহ্মদর্শন কালে সাধকের অত্যুত্তম সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয়, যেমন সুষুপ্তিতে অত্যন্ত তামসিক অবস্থার উৎপত্তি হয়। দেহ জড় হইলেও সামান্য বস্তু নহে, দেহের জন্যই আত্মা ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। সত্ত্বগুণের অত্যাধিক্যে জ্ঞানের অধিক প্রকাশ এবং তমোগুণের আধিক্যে অধিক অন্ধকার। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম দর্শন কালে সত্ত্ব-

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি অধিকতম (highest maximum) আত্মোন্নতি পরম পিতার অপার কৃপায় যেন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে তখনও তাঁহার কারণতম দেহ বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি তখনও অপূর্ণ, সেই অপূর্ণতা যতই অল্প হউক না কেন। পরিশেষে অনন্ত অনন্ত অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় সেই শেষ কারণদেহ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পূর্ণমুক্তি লাভ করিবেন। অতএব দেখা গেল যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা ও ক্রম প্রণালীর বিরুদ্ধে আমরা গমন করি নাই। অর্থাৎ পরম পিতা তাঁহারই অনন্ত প্রেমে প্রত্যেক জীবকে নিম্নতম অবস্থায় জগতে ... নিয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে গ্রহণ করিবেন এবং মহাযাত্রার পথে জীবকে অসংখ্য বাধা বিঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং উহাদিগকে তাহার অতিক্রম করিতে হইবে। এই অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই পরমাত্মার বিভিন্ন গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে। যদি কেহ এই অতি সুদীর্ঘ পরীক্ষাময় জীবনের বিধান জন্য পরমপিতার কোনও ত্রুটী আছে বলিয়া মনে করেন, তবে তাহাকে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" এবং "মায়াবাদ" অন্তর্গত 'চিদাভাস' অংশদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে সৃষ্টি কার্য্যে কোথায়ও বিন্দু মাত্রও ত্রুটী হয় নাই। এই জগৎ তাঁহারই প্রেমরাজ্য। ইহার এক ছত্রাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্বয়ং নিত্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতা। সুতরাং ইহা নিত্যই অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় যে রাজ্যের বিধাতা, সেই রাজ্যে কোনও অমঙ্গল বা ত্রুটী যে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি বলেন যে সুদীর্ঘ ইতর জীব-জীবনে এবং মানব জীবনেরও নিম্নস্তরে দুঃখের তীব্রতা এবং গুণ-রাশির আবরণের পরিমাণ এত অধিক যে ইহার জন্যই পরম পিতার মঙ্গলময়ত্বে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ইহার উত্তরে আমাদের প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ পাঠে এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে বলিয়া মনে করি। এস্থলে অতি সংক্ষেপে বলিতে হইবে যে মানব অত্যুন্নত স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অনন্তকাল-ব্যাপী

দের জীবনে যে কত অসীম সুখ, শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিবে, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। উন্নত পারলৌকিক জীবনের অসীম কালের সহিত ইতর-জীব-জীবন এবং মানব জীবনের সমষ্টি কালের তুলনাই সম্ভব হয় না, শেষোক্ত কাল এতই অল্প। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত মণ্ডল সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপরোক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং পরীক্ষার জন্য যদি তিনি প্রথমে আমাদের বিশেষ দুঃখের বিধান করিয়াও থাকেন, তবে তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতে হইবে। আর সেই স্বল্প দুঃখ-দানও অনন্ত সুখ শান্তি দানের জন্যই বুঝিতে হইবে। যদি কেহ কাহাকেও শতকোটী স্বর্ণ মুদ্রা দান করিবার জন্যই এবং তাহাকে ভবিষ্যতে সেই মহাদানের উপযোগী করিবার জন্যই প্রথম জীবনে অভাব জনিত দুঃখ ভোগ করান, তবে তাহাতে সেই মহান্ দাতার উদ্দেশ্যের প্রতি কোনও দোষারোপ করা যায় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মাতার সন্তান লাভের পূর্ব্বে তাঁহার অল্লাধিক প্রসব বেদনা ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু স্নেহময়ী মাতা সন্তান মুখ দর্শন করিবা মাত্র সকল দুঃখই ভুলিয়া যান এবং মহানন্দে নিমগ্ন হন। এমন কি কোনও বন্ধ্যা নারী আছেন, যিনি ভীষণ প্রসব বেদনা ভোগ করিয়াও পুত্রের জননী হইতে অনিচ্ছুক? আবার যাহারা বাল্যে ও যৌবনে দুঃখের মধ্যেই জীবন যাপন করিয়াও নিজদিগকে উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সাক্ষ্য দিবেন যে তাহারা পরে আর সেই দুঃখের জন্য দুঃখিত নহেন, বরং উহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়ই হয়। তাহারা আরও বলিবেন যে সেই দুঃখ না থাকিলে তাহাদের এতদূর উন্নতি সম্ভব হইত না। সেই দুঃখ গুণরাশি বিকাশের জন্যই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে তাহাদের জীবনে আগমন করিয়াছে। আমরা যদি পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রথমে দুঃখ, তৎপরে সুখ। যদি কেহ বাল্যে ও যৌবনে কষ্ট করিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী হন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাল কাটান, তবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ লাভ অবশ্যম্ভাবী হইবেই। "নহি

সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে” উক্তি দ্বারাও আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রথমে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইতর জীবের জীবন যদি দুঃখময় মনে করা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে তাহাতে সাধারণ নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জীবনে প্রথমে দুঃখ এবং পরে সুখ। আমরা আরও একটী তত্ত্ব এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারি। তাহা এই যে পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে ছোটই বড় হয়, ক্ষুদ্রই বৃহৎ হয়। মাতৃগর্ভে উপ্ত এক এক বিন্দু শুক্র মাতৃদেহের শোণিত বিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শিশু আকারে ভূমিষ্ঠ হয়। আবার শিশুও ক্রমশঃ উন্নত দেহ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর সকল বীর, সকল যোদ্ধা, সকল পণ্ডিত, সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সকল ধার্ম্মিক, সকল ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষ ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে একই প্রণালীর সাহায্যে বড় হইয়াছেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুগণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। বটবৃক্ষের বীজটী সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও ঐ একই তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, এমন কি সমুদ্র, মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হইয়াছে।* এই ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্ত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে ছোটই বড় হয়, কেহই কখনই বড় হইয়া প্রথম জন্ম লাভ করেন নাই। বড় হইবার জন্য সকলেরই সাধনা করিতে হয়। “জন্মান্তরবাদ” অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে জগৎ প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণও জন্ম জন্মান্তরের সাধনা দ্বারা উন্নত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে অনন্তমঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র ক্রম সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ বৃহৎ হইবে। অতএব ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টিতে ক্রমোন্নতির বিধানানুযায়ী প্রথমতঃ জীবাত্মা অত্যন্ত তমঃ-প্রধান দেহে জন্ম গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যে দেহের গঠনই এরূপ যে তাহাকে (আত্মাকে) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

* উক্তি আছে “Drop by drop ocean is made”. ইহা বিজ্ঞান সম্মত উক্তিও বটে।

অবস্থায় উপনীত করে। অর্থাৎ সেই দেহে তমঃ এর প্রাধান্য জন্য তাঁহার গুণ রাশির বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। তিনি ক্রমশঃ উন্নততর দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া করিয়া শেষে মানব জন্ম লাভ করিবেন ও পরে দেব দেহ প্রাপ্ত হইবেন। এই জন্যই মানব জন্মকে দুর্লভ বলা হয়। আমরা একটী পদার্থ বা অবস্থাকে দুর্লভ বলি তখন, যখন উহা লাভ করিতে বহুকাল ও বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যাহা সহজেই পাওয়া যায়, তাহাকে কখনই দুর্লভ বলা যায় না। ইহাই যখন সত্য, তখন মানব জন্মের দুর্লভত্বের কোনই অর্থ হয় না, যদি ইহা কল্পনা করা যায় যে পরমাত্মা মানব দেহে আবদ্ধ ভাবে (জীবাত্মা ভাবে) সর্ব্বপ্রথমে ভাসমান হন। কারণ, পরমাত্মার পক্ষে মানব দেহে সর্ব্বপ্রথমে জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হওয়া কখনই দুঃসাধ্য সাধনার ফল হইতে পারে না। আবার যাহা সাধনা ব্যতীত আপনা আপনি হয়, তাহাকে কেহ কখনও দুর্লভ আখ্যা দান করেন না। অপর পক্ষে যদি ইহা কল্পনা করা যায় যে পরমাত্মা সর্ব্ব প্রথমে ইতর জীবের কোন এক নিম্নতম স্তরে দেহাবদ্ধ ভাবে (জীবাত্মা ভাবে) [illegible]ন হইয়াছেন এবং সেই জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর ইতর [illegible]জ্যের বহু দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব দেহ লাভ করিয়া- [illegible] অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই জীবের পক্ষে মানব জন্মলাভ দুল[illegible]। কারণ, ইতর জীবের নিম্নতম স্তর হইতে মানব দেহ লাভ ক[illegible] লক্ষ লক্ষ দেহে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন যে জীবের মানব জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। ইহাতে বহু কাল কাটিয়া যায়। ইহা ভিন্ন সেই সকল জন্মে সেই সকল জীবের সাধনাও করিতে হয়, তাহা যতই নিম্ন স্তরের এবং অজ্ঞানকৃত হউক্ না কেন। এই সকল জন্মের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে এবং "চিদাভাস" অংশে বিবৃত হইয়াছে। স্থূল, মানব জীবনের এবং ইতর-জীব-জীবনের অত্যন্ত পার্থক্যই ইতর জীবের পক্ষে মানব জন্মের দুর্লভত্বের কারণ বটে। আমরা এই বিষয়টী অন্য

ভাবেও চিন্তা করিতে পারি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা এবং পরীক্ষা যখন আমাদের পদে পদে দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে পরম পিতার অনন্ত গুণ বাস্তব ভাবে আবরণ দ্বারা প্রায় শূন্যাবস্থায় পরিণমন করা হইয়াছে। পূর্ণের পরীক্ষা হইতে পারে না। কারণ, পূর্ণের সকলই পূর্ণ, তাঁহার কোনই অভাব নাই। আবার তাঁহার অনন্ত গুণ যদি আবরণ দ্বারা পরিমাণে প্রায় শূন্যাবস্থায় আনয়ন করা না হয়, তবে পরীক্ষাও পূর্ণভাবে পূর্ণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবাত্মারই অসংখ্য বাধা অতিক্রমের পরীক্ষা দান করিতে হইবেই। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যদি জীব সর্ব্বপ্রথমে মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করে, তবে সুদীর্ঘ ইতর-জীব-জীবনে যে অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার আসিতে হয়, তাহা আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আমাদের যত কিছু আপদ বিপদ, দুঃখ দৈন্য, সঙ্কট বিপাক, লজ্জা অপমান, তাহা সমুদায়ই গুণ ও শক্তির বিকাশের জন্যই। উহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে, অনন্ত প্রেমময়ের রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন কিছুই নাই, সমস্ত অবস্থাই মঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সকলেরই গতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য সাধন করিতে। সুতরাং ইতর-জীব-জীবনে অসংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এবং তজ্জনিত অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে কার্য্য অপূর্ণ থাকিবে এবং মঙ্গল-প্রসূ হইতে পারে না। যদি বলেন যে মানব জীবনেই সেই সকল পরীক্ষা হইতে পারে, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। ইতর জীব দেহে যে পরীক্ষা সম্ভব, তাহা মানব দেহে সম্ভব নহে। ইহা সহজ বোধ্য। একটী কথা আমাদের এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ যত অধমই হউক না কেন, তাহাতে ইতর জীব হইতে গুণের অধিকতর ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং পরীক্ষা অপূর্ণ থাকে ও জন্য অভিজ্ঞতাও অপূর্ণ থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রথমতঃ নিরক্ষর ক ও ক্রমশঃ নিম্ন শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। কেহই নিম্ন শিক্ষার অবস্থায় মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষা

দেয় না। আবার উচ্চ শিক্ষার অবস্থায়ও কেহ মাধ্যমিক বা নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরীক্ষা দেয় না। কাহারও জীবনে নিম্নতম শিক্ষার অবস্থা পার না হইয়াই মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা লাভ হয় না। সর্ব্বত্রই ক্রম বর্ত্তমান। জীব জীবন পরম পরীক্ষার স্থল। সুতরাং সেই স্থলেও ক্রম অবশ্যই কার্য্য করিবে। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে জীব প্রথমতঃ মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার ইতর জীবেরও নিম্নতম স্তরে প্রথম জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি বলেন যে ইতর জীবের আবার পরীক্ষা কি, তবে বলিতে হয় যে ইতর-জীব-জীবনেও পরীক্ষা আছে। উহা মানব জীবনের পরীক্ষার ন্যায় কঠিন নহে। মানবের মধ্যেও সকলের জন্যই একই পরীক্ষা নহে। শিক্ষাস্থলেও যেমন পরীক্ষার প্রকার ভেদ, কাঠিন্য ভেদ আছে, বিভিন্ন জীবের সম্বন্ধেও তাহাই বর্ত্তমান। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখা যায় যে মানব জীবনে পদে পদে পরীক্ষা, সেইরূপ সর্ব্বত্রই। এই নিয়ম যে প্রকারান্তরে জড় রাজ্যেও কার্য্য করিতেছে, তাহাও সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ জড় ও জীবের জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলেই নানাবিধ পরীক্ষার ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। ইহাই যখন সর্ব্ব প্রধান তত্ত্ব, তখন ইতর জীব সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যখন ব্রহ্মের সগুণ পরীক্ষা, তখন তাহা যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদের জীবনেও সাধিত হইবেই, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব পরীক্ষাময় সুদীর্ঘ জীব জীবন অসম্পূর্ণ থাকে যদি দীর্ঘ ইতর-জীব-জীবনের পরীক্ষা তাহা হইতে বাদ পড়ে। কেহ কি মানব জীবন বাদ দিয়া দেব জীবন বা দেবোত্তম জীবনের কথা চিন্তা করিতে পারেন? ইহা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ ইতর-জীব-জীবন না থাকিলে মানব জীবন ও তৎপর দেবজীবনও সম্ভব হয় না। এস্থলে ইহাও আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে ইতর জীব নিম্নতর স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে উচ্চতর স্তরের ইতর-জীব-ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে ইতর-জীব-জীবনে পরীক্ষাও সহজ, মানব জীবনের ন্যায়

কঠিন নহে। ক্রমই সৃষ্টি প্রণালী। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জীবের পক্ষে তাই ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম হওয়াই বিধি। তাই জীবকুল অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে প্রায় শূন্যাবস্থা হইতে প্রায় পূর্ণাবস্থায় নীত হন এবং পরিশেষে অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় পূর্ণা-মুক্তি লাভ করেন। অতএব এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা যায় যে ব্রহ্মের প্রেমলীলায় জীব ইতর জীব ভাবে প্রথম জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নততর দেহ ধারণ করে। তাহাতে ক্রম প্রণালী, স্বগুণ পরীক্ষা বা জগতে দৃষ্ট সৃষ্টি প্রণালীর কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। গ্রীক দার্শনিক মহামনাঃ Plato আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বহু যোনি ভ্রমণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক জগতের প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জীবের ক্রম বিকাশ বাদের পক্ষপাতী। তাহারা বলেন যে Protoplasm হইতে জীবদেহ আরম্ভ হইয়া দেহের পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকও ক্রম বিকাশ বাদের পক্ষপাতী অর্থাৎ বিজ্ঞানও বলেন যে ছোটই ক্রমশঃ বড় হয়। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান অংশে এবং "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমাদের মত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে যে উক্ত মত আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন না করিলেও জীবরাজ্যে যে জীবাত্মা নিম্নতম স্তরের দেহ ধারণ করিয়া প্রথমতঃ জগতে আসিয়াছেন এবং ক্রমশঃ উচ্চস্তরে জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে মানব জন্ম লাভ করেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। সুতরাং উভয় মতই জীব সৃষ্টিতে ক্রম বিকাশের পক্ষপাতী। ইতর-জীব-দেহে যে আত্মা বর্ত্তমান এবং উহাদের আত্মা ও মানবের আত্মায় যে কোনই পার্থক্য নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" অংশে ৫৪৭-৫৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠক দেখিবেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। আবার আমরা জ্ঞানের মূল সূত্র পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা এবং সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালীর অনুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ইতর জীবগণ ক্রমোন্নতির নিয়মানুযায়ী বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া কালে কালে মানব দেহ

ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন বহু ভাবের প্রশ্নের অবতারণা করিয়া এবং উহাদের আলোচনা দ্বারা সেই একই মীমাংসায় আমরা উপনীত হইয়াছি। অতএব এই অংশের প্রারম্ভে যে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, উহাদের সুমীমাংসা আমরা পাইলাম কিনা, তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এখন মানব সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য নিবেদন করিতে যাইতেছি। মানব জন্মে আমরা আধ্যাত্মিক সাধনার উন্মেষ ও উন্নতি দেখিতে পাই, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মানব যে জন্ম জন্মান্তরে পৃথিবীতে বাস করিয়া সেই সাধনা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন, সেই সম্বন্ধে এখন পাঠকের সম্মুখে আলোচনা উপস্থিত করিতেছি।

ওঁং সর্ব্ব-জীব-সৃজন-পালন-কারণং সমপ্রেমময়ং পরমেশ্বরং ওঁং

ওঁ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

জন্মান্তরবাদ।

ইতর জীবের কথা পূর্ব্ব অংশে লিখিত হইয়াছে। এখন আমরা মানব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। মানব পৃথিবীতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন ও সেই সেই স্থলে স্থিতি দ্বারা জীবনে সাধনা করেন। এই সাধনাই তাহাকে ক্রমোন্নতি দান করে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে এরূপ উত্তম সাধকও পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের কার্য্য সম্পাদন করিয়া কারণ-দেহের কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ মহাত্মা দুর্লভ হইলেও ইহা হইতে আমরা এই তত্ত্ব লাভ করিতে পারি যে মানবে অত্যধিক সম্ভাবনা (Potentiality) বর্ত্তমান। আমাদের ঐকান্তিকী সাধনা দ্বারা যাহা আপাততঃ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, অনন্ত করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা আমাদিগকে তাঁহার গুণরাশি দান করিবার জন্যই এই প্রেমলীলা করিতেছেন। আমাদের পক্ষে উহা গুণ সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা সাপেক্ষ। তাঁহার গুণরাশি অনন্ত। সুতরাং কোন মানবই একটী মাত্র জন্মের কঠোর সাধনা দ্বারাও সেই সুদুর্লভ গুণরাশি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারও বারংবার পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বহু চেষ্টা, বহু যত্ন ও অধ্যবসায় সহযোগে বহু সাধনা করিতে হইবে। উহা ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই, তাহা আমরা মানব জীবন অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারিব। এখন আমরা মানবের পক্ষে জন্মান্তর গ্রহণ যে অবশ্যম্ভাবী সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও ইহুদি ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মতের মধ্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সুতরাং

পুনর্জন্ম বিষয়ে উহা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রারম্ভিক অবস্থায় পুনর্জন্ম অস্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বহুবৎসর যাবত ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ এখনও তাহা বিশ্বাস করেন না। হিন্দু ধর্ম্মের সকল বিভাগেই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্ম্মও উহা স্বীকার করেন। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবও বহু জন্ম পরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধগণ বলেন। জৈন ধর্ম্মেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত। শুনিয়াছি Spiritualism ধর্ম্মে প্রথমতঃ পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছিল না, কিন্তু এখন Spiritualist-গণ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হইয়াছেন। Theosophists দিগের মতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিক মহাসাধু Socrates ও Plato উভয়ই মানবের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে পুনর্জন্ম বিষয়ক অতি সংক্ষিপ্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "পরলোকগত আত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকেই পুনর্জন্ম কহে। পুনর্জন্ম যে সকল আত্মারই হইবে, এরূপ নহে, উহা আত্মাদিগের স্ব স্ব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে সকল ব্যক্তি আয়ুঃ সত্ত্বে আদিম দেহ ত্যাগ করেন, অথবা যে সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া গমন করিয়াও উপায় বিশেষ দ্বারা পরলোকে আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, তাহাদিগেরই পুনর্জন্ম হইতে পারে। অন্য কাহারও হইতে পারে না। আর আয়ুর্বিশিষ্ট বা আয়ুঃ প্রাপ্ত মাত্রেরই যে পুনর্জন্ম হইবে, তাহাও নহে। যে সকল আত্মা পরলোকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম (পাপক্ষয় ও গুণসাধন) করিয়া উঠিতে পারেন না, অথবা যাঁহারা পরলোকে গুণের অভাব প্রভৃতি নিবন্ধন অধীর হন, সাধারণতঃ তাঁহারাই পুনর্জন্ম লইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন উন্নত আত্মারাও কখনও কখনও সবিশেষ কারণবশতঃ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুনর্জন্মের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে উহা আত্মাদিগের ইচ্ছাধীন।" ভারতের বহু স্থানে নরনারী

তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদী বলিবেন যে সেই সকল উক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। একথা সত্য বটে, কিন্তু সকল উক্তিই সেই জন্য মিথ্যা বলা যায় না। পরলোকগত কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছায়াদর্শন গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে সামান্য একটী ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রসার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু উহাকে ভুতুরে কাণ্ড বা ভুতুরে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের উপযুক্তরূপ অনুসন্ধানের অভাবে জন্মান্তর সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ঐ সকল ঘটনাগুলির যেরূপ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন হইলে নিশ্চিতরূপে অপর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে জন্মান্তরবাদ সত্য। এখন আমরা শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জন্মান্তরবাদ সমর্থক নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহ উদ্ধার করিলাম :—"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে (কঠ ১-২।৬)।" "বঙ্গানুবাদ :—চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না ; কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া যে পুনঃ পুনঃ আমার অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন হয়। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য :—এস্থলে যম পরলোকতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া জন্মান্তরবাদের কথাও প্রকারান্তরে বলিলেন। মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম না হইলে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে পারে না)। "স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।। (মুণ্ডক- ৩।২।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—তিনি অর্থাৎ আত্মজ্ঞ এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহাতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে এবং যিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে অকাম জ্ঞানীগণ সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম

না।" (তত্ত্বভূষণ)।" "বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং গতং বিভুত্বাৎ। জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি ।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৩।২১)।" "বঙ্গানুবাদ :—আমি ই অজর, পুরাণ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত ঈশ্বরকে তাঁহার আকাশবৎ পকত্ব বশতঃ জানি, ব্রহ্মবাদিগণ যদীয় জ্ঞানকে জন্ম নিবৃত্তির কারণ ন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা সর্ব্বদা অভিবাদন করেন। (তত্ত্বভূষণ)।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ড ও বৃহদারণ্য-াপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র পাঠ রিবেন। তাহা হইতেও জন্মান্তরবাদের সত্যতা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে যায়। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ (গীতা—২৭)।" "বঙ্গানুবাদ :—যাহার জন্ম আছে, তাহারই নিশ্চয় মৃত্যু , যাহার মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয়ই জন্ম আছে। (গৌর গোবিন্দ)।" (মন্তব্য :—"যাহার মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয়ই জন্ম " এই বাক্য আলোচনা করিলে এই মনে হয় যে জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি মৃত্যুর পর জন্মও অনিবার্য্য। ইতিপূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে ও ইতঃপর যাহা হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে সকলের পক্ষেই পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী নহে। শ্রুতি এবং অন্যান্য স্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল আত্মা মুক্ত হইয়াছেন, াহারা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। সুতরাং সকলকেই পুর্নজন্ম করিতেই হইবে অর্থাৎ চক্রের ন্যায় প্রত্যেকের পক্ষেই জন্ম মৃত্যু বরত চলিতেছে, ইহা সত্য নহে। তবে অনুন্নত এবং অবনত পক্ষে যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ প্রয়োজনীয়, তাহা ইতঃপর হইতেছে)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরও বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ব্বে বহু জন্ম হইয়াছিল। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। (৪।৫)" :—অর্জ্জুন, তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সকল জন্মের কথা আমি জানি, তুমি জান না। (গৌর গোবিন্দ)।" যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও বিনষ্ট হয় না ও সাধনার জন্য তিনি

পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাও গীতা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। "প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ (৬-৪১।৪২)।"

"বঙ্গানুবাদ :—পুণ্যানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহু বর্ষ বাস করতঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে লোকে ঈদৃশ জন্ম সুদুর্ল্লভতর। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" এত সময় আমরা দেখিলাম যে তিনটী ধর্ম্মমত ব্যতীত সকল ধর্ম্মানুসারে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। শ্রুতি, স্মৃতি এক বাক্যে বলিতেছেন যে জীবের পুনর্জ্জন্ম আছে। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর যে ইহুদি ধর্ম্মের প্রভাব আছে, তাহা বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং বলিতে গেলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমতই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, কেবল একটী মাত্র ধর্ম্মই এই মতের বিরোধী। এখন আমরা যুক্তিমার্গা-বলম্বন করিয়া দেখিব যে জন্মান্তরবাদ সত্য কিনা। এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে পুনর্জ্জন্মের আবশ্যকতা কি? ইতিপূর্ব্বে "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশে ইহার উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি তাহা একটু বিস্তারিত ভাবে নিম্নে লিখিত হইতেছে। পাঠকের প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে ক্রমই সৃষ্টির প্রণালী। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আমাদের জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টির উদ্দেশ্যও যাহা, আমাদের জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যও তাহা, অর্থাৎ পরম পিতাতে তন্ময় হওয়া।* কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন এক জন্মে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হয়? একথা সর্ব্ব-

---

* সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। উহার মধ্যেই এই ভাব নিহিত যে প্রত্যেক জীব ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মের গুণরাশির বিকাশ সাধন করিয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেকের জীবনই সাধনাময় মনে করিতে হইবে।

বাদিসম্মত যে সেইরূপ অবস্থা লাভ সর্ব্বদা সকল জীবনে ঘটিতে দেখা যায় না। সুতরাং পুনর্জ্জন্মের একান্ত আবশ্যকতা। যদি কেহ গভীর ভাবে অনুসন্ধান করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে এক জন্মে কেহই সেইরূপ তন্ময়তা লাভ করেন না। যে সকল মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই সেইরূপ পরমোন্নতি লাভ করেন, তাহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে তাহারা বহু জন্মের সাধনা দ্বারাই উক্ত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, এক জন্মে বা প্রথম জন্মে সেই উন্নতির ক্ষুদ্রাংশও লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার বহু জন্ম পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে পরলোকেই সেই উন্নতি সাধিত হইতে পারে, পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন কি? পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের পক্ষে পৃথিবীতে বহু প্রকার সাধনার সুযোগ বর্ত্তমান। কারণ, পৃথিবীতে প্রাপ্ত দেহ আমাদের পক্ষে আদিম এবং স্থূলতম দেহ এবং আদিম দেহে বহু প্রকার সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা এস্থলে বাধাও যেমন অধিক, সেইরূপ বাধা উত্তীর্ণ হইবার সুযোগও অধিক। প্রত্যেক মণ্ডলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু পরলোকস্থ এক একটী মণ্ডল এক একটী বিশেষ সাধনার জন্য। অন্যান্য সাধনাও সেই সকল মণ্ডলে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে এক একটী গুণ সাধনার প্রধান স্থান। পৃথিবীতে আমরা বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও গুণের বিকাশ সাধন না করিয়া যাইতে হইলে পরলোকে যাইয়া সেই সকল গুণাভ্যাস কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, এমন কি কোন কোন গুণ সাধনার জন্য পারলৌকিক আত্মা বাধ্য হইয়া পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করেন। কারণ, আদিম দেহে সেই সকল গুণ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এস্থলে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রে যে কথিত আছে যে পুণ্যবান ব্যক্তি বহু বৎসর স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তাহা পাঠক স্মরণ করিবেন। ইহার অর্থ এই যে কোন এক ব্যক্তি সৎকর্ম্ম বা কোন কোন গুণের অল্পাভ্যাস দ্বারা

পরলোকে কিছু উন্নতি করিতে পারেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল গুণাভ্যাস করিলে পরলোকে ক্রমোন্নতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, যদি তাহার সেই সাধনা পৃথিবীতে না হইয়া থাকে, তবে তিনি পরলোকে কিছুকাল বাস করিয়া সেই সকল গুণ সাধনার জন্য পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অনন্ত উন্নতি সম্মুখে বর্ত্তমান। এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল করিতেছি। এক ব্যক্তি আবাল্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিতেছেন। তাহার নিষ্পাপ শরীর। যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুকুল অনেকটা দমনে রাখিয়াছেন। জ্ঞানও কিছু কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি যদি পরলোক গমন করেন, তবে পরলোকে তাহার কিছু দুর উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি প্রেম সাধনা ও সংসারে অবস্থিতির জন্য যে অভিজ্ঞতা লাভ ও অন্যান্য গুণ সাধনা হয়, (যথা প্রেম, সহিষ্ণুতা, নির্ভরতা প্রভৃতি) তাহা তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যদি সাধিত না হইয়া থাকে, এবং সেই সকল গুণের অভাবে তিনি যদি পরলোকে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে না পারেন, তবে সেই সকল গুণ সাধনা করিতে তাঁহার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আদিম দেহে অনেক প্রকারের গুণ সাধন অপেক্ষাকৃত অল্লায়াস সাধ্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে কিছু কাল তিনি পরলোকে উন্নত স্থানে থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কেন? আমাদের মনে হয় যে সকলেই পরলোকে যাইয়া ফিরিয়া আসেন না। পরলোকে থাকিয়াই পাপক্ষয় ও গুণোন্নতি সাধনের জন্য অনেকেই প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। যখন তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করেন, তখনই তিনি পাপক্ষয় ও গুণ সাধনার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। এস্থলে এই কথাটী আমাদের বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টা পৃথিবী এবং আমাদের আদিম দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া। ইহাতে যেমন বাধার আধিক্য, তেমনি উহাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার পন্থাও অধিকতর। "যত মুস্কিল, তত আছান" বাক্যটী পাঠক স্মরণ করিবেন। আমাদের আরও

মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীতে সকলেই শতায়ু প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হইবার সাথে সাথেই পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কেহ বা বাল্যে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ়াবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন। তাহাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে কিছুই সাধনা হয় না। আর যদি কেহ শতবর্ষ ব্যাপী জীবনও যাপন করেন, তবুও তিনিই বা কতটুকু সাধনা করেন বা করিতে পারেন? আমরা বহু বৃদ্ধকে দেখিতে পাই যে তাহারা আত্মিক সাধনায় মোটেই অগ্রসর নহেন। সুতরাং একটী মাত্র জন্মে পৃথিবীতে সাধনীয়া ও বাঞ্ছনীয়া উন্নতি আমরা লাভ করিতে পারি না, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অত্যল্প কালের অত্যল্প সাধনার জন্যই পরম পিতা পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই। এই সামান্য তুচ্ছ সাধনার বিধান তিনি পরলোকেও করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে তাহার পৃথিবী সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে মানব বহু জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, নানা গুণে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইবেন, নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া নানা উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া নানা ঘাত প্রতিঘাতের আঘাত সহ্য করিয়া নানা গুণের বিকাশ সাধন করিবেন এবং পরিশেষে পরলোকে পরম পিতাতে একান্ত ভাবে নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিবেন, ইহাই ত পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য। পৃথিবীকে সাধারণে যেমন জ্বালা যন্ত্রণার, দুঃখ কষ্টের, লজ্জা অপমানের স্থান বলিয়া মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে উহা কেবল তাহাই নহে। যে স্থানে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধনা দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপালাভে বহু মহাপুরুষ অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার প্রেম ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, সেই পুণ্যভূমি, সেই সিদ্ধ পীঠ, আমাদের সকলের মাতৃভূমি পৃথিবী মানবের পক্ষে তুচ্ছ কা[illegible] (Negligible time-এর) অবস্থিতির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অনন্ত প্রেমময় প[illegible]র সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যেমন সুমহান্, পৃথিবীর সৃষ্টির উদ্দেশ্যও [illegible] সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুকূলেই। সুতরাং ইহাও অতি মহা[illegible]ীর, অতি গম্ভীর। সুতরাং হাল্কা ভাবে পৃথিবী

জীবের মধ্যে একতাও দৃষ্ট হয়। পশুগণ মিলিত হইয়া অন্য পশুর আক্রমণ হইতে নিজ দিগকে রক্ষা করে। কেহ কেহ বলেন যে ইতর জীবের কার্য্যকর্ম্ম উহাদের Instinct (সহজ জ্ঞান) দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ উহা উহাদের স্বভাব সিদ্ধ। Instinct একটী অস্পষ্ট (vague) শব্দ মাত্র এবং ইহাই উক্ত মতে একটী মাত্র যুক্তি। এই Instinct পদার্থটী কি ? ইহা কোথায় হইতে আসিল ? ইহা কেন ইতর জীবে মানবের বুদ্ধির ন্যায় কার্য্য করে ? এইরূপ বহু প্রশ্নের উত্তরে তাহারা এই বলিয়া থাকেন মাত্র যে উহা উহাদের স্বভাব সিদ্ধ। কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ বলিলেই কি সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হয় ? যাঁহারা ইতর জীবের স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে ইতর জীবও নানা ভাবে মানবের বুদ্ধির ন্যায় পরিচয় দিয়া থাকে, তবে মানবে এবং ইতর জীবে জ্ঞান প্রকাশের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক এবং তাহা উহাদের দেহের গঠনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। উহাদের মধ্যেও আমরা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার কার্য্য আমরা দেখিতে পাই। মানবে উহারা যে ভাবে আগমন করিয়াছে, ইতর জীবেও সেই একই ভাবে উহারা আসিয়াছে। তারতম্যের কারণ যে দেহ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। Instinct আর কিছুই নহে, কেবল জীবের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার। উহারা অস্পষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে একই আত্মা সর্ব্ব জীব দেহে বর্ত্তমান। দেহের আবরণের তারতম্যের জন্যই বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন গুণ রাশির বিভিন্ন ভাবের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে ? যদি সকল দেহে একই আত্মা না থাকিতেন, তবে আমরা সকলের মধ্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার এইরূপ আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য (Striking Similarity) দেখিতে পাইতাম না। এস্থলে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মানবে মানবেও ঐ সকল ভাবের অত্যধিক পার্থক্য বর্ত্তমান। পশু-ভাবাপন্ন নিতান্ত নিম্নস্তরের মানব এবং সুশিক্ষিত ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে উন্নত মানবের মধ্যে উহাদের পার্থক্য দেখিয়া কি বলিতে

হইবে যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানবের আত্মা নাই? অতএব এই সিদ্ধান্ত সত্য যে ইতর জীবগণের দেহে জীবাত্মা বর্ত্তমান এবং দেহের গঠনের বিভিন্নতা অনুযায়ী জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার বিকাশের তারতম্য হয় মাত্র। দেহ যে আত্মার আবরণরূপে সৃষ্ট এবং সেই দেহের গঠনের তারতম্য অনুযায়ী যে আত্মার নানা ভাবের গুণ বিকাশ সম্ভব হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে নানাস্থলে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি যে পরম পিতা প্রত্যেক জীবকে কোন একটী গুণ অধিক পরিমাণে দিয়াছেন ও অন্যান্য গুণরাশি অল্প পরিমাণে দিয়া গুণ সমষ্টিতে সকলকে সমান করিয়াছেন। সৃষ্টিতে পরমপিতার স্বগুণ পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাও পাঠক স্মরণ করিবেন।* জীবাত্মা মাত্রেরই পরম পিতাতে প্রথমতঃ কোন এক গুণে ও তৎপর অন্যান্য গুণে তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। ইহা স্থির নিশ্চয়। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই তাহা। সুতরাং তাহাই প্রত্যেক জীবের জীবনে সুসম্পাদিত হইবে। অতএব কীট পতঙ্গাদি জীবাত্মা সমূহ ক্রমশঃ উন্নততর দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব দেহ লাভ করিবে ও তৎপর সাধন ভজন দ্বারা সেই তন্ময়তা লাভ করিবেন, এইরূপ প্রণালীই ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ইতর জীবের চৈতন্য অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে তাহা দেহের মৃত্যুর সহিত পূর্ব্ব পরম চৈতন্যে মিলিয়া যায় বা লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার তন্ময়তা হইতেও অধিক কিছু হয়। সুতরাং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা কোথায় রহিল? আমাদের মনে হয় যে তাহা সম্ভব নহে। যদি তাহাই হইত, তবে প্রেমময় বিধাতা মানবের সম্বন্ধেও কেন সেই একই বিধান করিলেন না? মানুষ জন্ম জন্মান্তরে, লোক লোকান্তরে কঠোর সাধনা করিবে, সুখ, দুঃখ, উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া চলিবে ও পরিশেষে বহুকাল পরে পরম পিতার কৃপা লাভ

---

* এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা" ও "গুণ বিধান" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

হইলে তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিবেন, কিন্তু কীট, কীটাণু একদিন ব্যাপী জীবন যাপন করিয়াই পূর্ব্ব পরম চৈতন্যে কেবল তন্ময়তা লাভ করিবে, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ বিনা সাধনায় ও বিনা উপাসনায়, অথবা তাহা যে কি বস্তু, তাহা জানিবার পূর্ব্বেই কীট কীটাণু, কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে যাহা জীবনের শেষ পরিণতি অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়, নির্ব্বাণ প্রভৃতি তাহা একদিনের মধ্যেই লাভ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুদিগের ষড়্‌দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিরসন করার উদ্দেশ্য লইয়াই লিখিত। আমরা দেখিলাম যে সেই অবস্থা ইতর জীবের পক্ষে উক্ত মতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিনা আয়াসে ও তাহাদের অজ্ঞাতেই সম্ভব হয়। সকল শাস্ত্রই বলে মানব জনম দুর্লভ। কিন্তু উক্ত মতানুযায়ী চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানব জন্মই অভিশপ্ত জন্ম। কারণ, সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য কীট পতঙ্গাদি এক দিনের জীবনেই সাধন করে, আর মানব যে কতকালে সেই অবস্থা লাভ করিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সৃষ্টি পরম পিতার স্বগুণ-পরীক্ষা। উক্ত উদ্দেশ্যের মধ্যেই ইহা সুস্পষ্ট যে প্রত্যেক জীব সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে করিতে তাঁহাতে তন্ময় হইবে। সাধনার মধ্যে আমরা পাই ইচ্ছা ও তজ্জাত কর্ম্ম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও দীর্ঘকাল। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কোন প্রকার উচ্চ সাধনা একদিনে সিদ্ধির অবস্থায় উপনীত হয় না। প্রত্যেকেই জানেন যে সাধনা কাল সাপেক্ষ, ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত এবং বিশেষ সহিষ্ণুতা ভিন্ন ইহা শেষ সীমা বা সিদ্ধির অবস্থা লাভ করে না। সকল জীবই উক্ত প্রণালীর অধীন। একদিনের মধ্যে পরম চৈতন্য হইতে কীটাণু জগতে আসিল, একদিনের মধ্যেই পরমপিতাতে তন্ময়তা লাভ বা তাহা হইতেও অত্যধিক অর্থাৎ পূর্ণামুক্তি লাভে ব্রহ্মে লয় হইল, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একদিনে তন্ময়তা লাভের জন্য কতটুকু সাধনা সম্ভব, তাহা আমরা সকলেই জানি। পরম পিতা কীটাণুকীটদিগের একদিন ব্যাপী জীবনের মধ্যে এক একটী অনন্ত উদার মহাগুণের শক্তির কি

পরীক্ষা করিলেন ? তাহাদের সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ত কোন শক্তির কোন ক্রিয়াই হইল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একদিন অজ্ঞাত ভাবে যাহা হইল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নহে। ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে তিনি ঐরূপ তুচ্ছ পরীক্ষার জন্য জীব সৃষ্টি করেন নাই। মানবের অনন্ত জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাঠক মনে রাখিবেন যে সৃষ্টির সকল কার্য্যই ক্রম প্রণালীর অধীন। ক্রম বাদ দিয়া জগতে কিছু হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইতর জীবগণ জীবাত্মা বটে, কিন্তু উহারা যে যেমন ভাবে আছে, সেইরূপ ভাবেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ একটী গো বারংবার গো ভাবেই জন্ম গ্রহণ করিবে, একটী ব্যাঘ্র বারংবার ব্যাঘ্র ভাবেই জন্মগ্রহণ করিতে থাকিবে। ইত্যাদি প্রকারে তাহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। আমরা মানবের কথা ভাবিতে গেলেই ইহাই চিন্তা করি যে তাহার অনন্ত উন্নতি আছে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু লিখিত হইয়াছে এবং পরে আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে।* মানবের অনন্ত উন্নতি হইতে থাকিবে, কিন্তু ইতর জীবগণ জীবাত্মা হইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এইরূপ বিষম ব্যবস্থা ত সকলেরই—অনন্ত প্রেমময় পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রেম বিধানে সম্ভব হইতে পারে না। যে হেতু ইতর জীবগণও জীবাত্মা, সেই হেতুই তাহারা মানবের সহিত সমভাবে অনন্ত প্রেম ও সমদর্শিতা পূর্ণ অনন্ত স্নেহময় পিতার স্নেহভাগী। পরমপিতার নিকট জীবাত্মাদিগের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই বা থাকিতেও পারে না। কারণ, সকলেই তাঁহারই সম অংশ অর্থাৎ সকলের মধ্যেই তিনিই স্বয়ং ক্ষুদ্রভাবে সুতরাং অংশভাবে ভাসমান। সেইরূপ জীবাত্মাদিগের মধ্যে যে কোনই তারতম্য নাই বা থাকিতে পারে না এবং দেহই যে জীবে জীবে পার্থক্যের কারণ, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কীট কীটাণু হইতে পরমোন্নত পরমর্ষিগণ পর্য্যন্ত

---

* মানবের অনন্ত উন্নতি সম্বন্ধে "গুণ-বিধান", "সোহহং জ্ঞান" ও "মায়াবাদ" অংশত্রয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

সকলেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার অনন্ত স্নেহক্রোড়ে শিশুবৎ সমভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার কাছে পুত্র কন্যার ভেদ নাই, কেহ কোলের, কেহ পিঠের নহে, তাঁহার নিকট উচ্চ নীচের বিভাগও নাই। সকলেই তাঁহার দ্বারা সমভাবে দৃষ্ট, লালিত, পালিত ও বৰ্দ্ধিত। আবার সেই অনন্ত প্রেমরসময় নিত্য প্রাণ-রমণ প্রাণপতি সকলকেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমে আত্মতুল্য বোধ করিতেছেন এবং নিত্য তাঁহাতেই প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বের অনন্ত প্রায় জীবের প্রত্যেক জীব সম্বন্ধেই এই সুমধুর বিধান, কেহই ইহা হইতে বাদ পড়েন না। যদি কেহ সেইরূপ অন্যায় তারতম্য তাঁহাতে আছে, ইহা বলেন. তবে সম্পূর্ণ সমদর্শী ব্রহ্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষ মিথ্যা ভাবে আরোপ করা হইবে মনে করি। যে হেতু ইতর জীবগণও জীবাত্মা, সেই হেতুই তাঁহাদের জন্মগত অধিকার (Birth right) অন্যরূপ দেহধারী জীবাত্মাগণের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সমান। ইহা অস্বীকার করিবার যুক্তি কোথায়? একই ক্রম প্রণালীর নিয়মানুযায়ী জীবাত্মার সর্ব্ববিধ অধিকার ও সুযোগ (Right and privileges) তাহাদিগেরও আছে, এই কথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। তাহারাও একই উন্নতি ও পরিণতির নিয়মে যে চালিত, তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, তাহারাও জীবাত্মা—একমাত্র অনন্ত স্নেহময় পরমপিতার সন্তান। মানবের আত্মা আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে ক্রমান্বয় নানাবিধ দেব-দেহ ধারণ করিবে, (যে সকল দেহের ধারণা আমাদের মধ্যে অনেকেরই নাই), কিন্তু ইতর জীবের আত্মা জীবাত্মা হইয়াও জন্মদোষে ক্রমশঃ উন্নত ধরণের দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব-দেহও ধারণ করিতে পারিবে না, ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। মানব ভুলিয়া যান যে তাহার বৰ্ত্তমান দেহই শেষ দেহ নহে। পারলৌকিক আত্মাদিগেরও দেহ আছে। তাঁহারা যতই উন্নত হইতে থাকিবেন, তাঁহাদের দেহও ততই উন্নত হইতে উন্নততর, উন্নততম হইবে। সুতরাং পৃথিবীর জীব রাজ্যে সেই নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জীব সমূহও ক্রমশঃ

উন্নত হইতে হইতে মানব দেহ ধারণ করিবে। বিরুদ্ধবাদিদের মত যদি স্বীকার করিয়া নিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা দুই শ্রেণীর জীবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। এক শ্রেণী আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা ক্রমোন্নতির প্রণালী অনুযায়ী উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গে যাইবেন, অনন্ত প্রেমময়ের অতল প্রেমজলধিতে নিত্য সুবিনিমগ্ন হইয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া থাকিবেন এবং সেই জন্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমানন্দ লাভ করিয়া জীব জন্মের সার্থকতা লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন, আর অন্য শ্রেণী নিজ জন্ম দোষে পশু পক্ষ্যাদির হীন জীবনই যাপন করিয়া যাইবে, যদিও সেই জন্ম তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, কিন্তু প্রেমময় বিধাতার ইচ্ছায়ই সম্ভব হইয়াছে। হিন্দু সমাজে বংশগত জাতিভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন:—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। মানুষের তৈয়ারী সামাজিক বিধানে শূদ্র বংশে জাত ব্যক্তি শূদ্র ভাবেই তাহার সেই জন্ম যাপন করিবে। কিন্তু অনন্ত প্রেমময় অত্যন্ত সমদর্শী ও পক্ষপাত শূন্য পরমপিতা কি এমন বিধান করিতে পারেন যে তাহার দ্বারা এক শ্রেণীর জীবাত্মা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত চিরকাল হীন জীবনই যাপন করিবে, আর অন্য শ্রেণীর জীবাত্মা আত্মোন্নতি দ্বারা নানাবিধ সুখ সুবিধার অধিকারী হইবে? হিন্দু শাস্ত্রের বিধানেও আছে যে শূদ্র চিরকালই শূদ্র থাকিবে না, কিন্তু তাহার সৎকর্ম্ম দ্বারা সে ক্রমশঃ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ভাবে জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীর মতে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা এমনি কঠোর বিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে ইতর জীবগণ চিরদিনই হীন ভাবেই কাল যাপন করিবে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর জীবাত্মা পরিশেষে পরম প্রেমময় পিতার প্রেমক্রোড় অধিকার করিবে, আর অন্য শ্রেণীর জীবাত্মা অনন্ত প্রায় কাল হীন জীবনই যাপন করিয়া যাইবে, অনন্ত প্রেমময় পিতার প্রেমাস্বাদন কখনই লাভ করিতে পারিবে না। ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে অনন্ত স্নেহময় পরমপিতা প্রত্যেক জীবকে তাঁহার

একমাত্র সন্তানবৎ অথবা তাহা হইতেও অনন্ত গুণে অধিকতর স্নেহে স্নেহ করেন। যদি ইতর জীব একই শ্রেণীতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জন্ম-গ্রহণ করিতে থাকে, তবে তাহার জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না বা হইতেও পারে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, তখন উহা প্রত্যেক জীবের জীবনেই সংসাধিত হইবেই। কাহারও জীবনে হইবে এবং কাহারও জীবনে হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীর মত গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে মহাপ্রলয়কালে অসংখ্য জীব সেইরূপ হীন অবস্থায় থাকিবে এবং তাহাদের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা যায় যে ইহা একটী অসম্ভব কল্পনা। কারণ, অনন্ত ইচ্ছাময় পর-মেশ্বরের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রত্যেক জীবনে পূর্ণ হইবেই হইবে। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক ইতর জীব জীবনে উহার উপযোগী সাধনা হইবেই।

প্রেম জগতে নানাভাবে পরিচিত। যথা—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ ও শ্রদ্ধা। জীবজন্তু প্রভৃতি মানবের শ্রদ্ধার ভাজন। "জগতের সমস্ত নরনারীকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়, এই অভেদ জ্ঞান সমস্ত চেতন পদার্থে পরিণত হয়।" এই যে সমস্ত চেতন পদার্থে অভেদ জ্ঞান, ইহাকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। সাধারণতঃ শ্রদ্ধা অর্থে ভক্তির অল্পতা বুঝায়। যাহা হউক, শ্রদ্ধা সাধন করিতে প্রথমতঃ একটী পশু বা পক্ষীকে অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ উহাকে খুব ভাল বাসিতে হয়। পরমোন্নতদিগের যাঁহারা অত্যুন্নত, তাঁহারা ইতর জীবের প্রতি কিভাব পোষণ করেন, তাহা বলিতে যাইয়া পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন ঃ—"নিখিল জগতের প্রতি 'সোঽহং" জ্ঞানকারী সাধক * দেবগণাবধি দৈত্য, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত চেতন পদার্থকেই ঔরস পুত্রবৎ পরম স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি কাহারও শত্রু নহেন এবং কেহই তাঁহার শত্রু নাই, তিনি তখন

---

* এই সোঽহং জ্ঞান জীবের প্রতি, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি নহে। ব্রহ্মের সহিত যে সোঽহং জ্ঞান হইতে পারে না, তাহা "সোঽহং জ্ঞান" অংশে দেখা যাইবে।

অজাতশত্রু। তখন সর্ব্বজীবের মঙ্গল-বিধানই তদীয় কার্য্য, সর্ব্ব জীবের উন্নতি-সম্পাদনই তদীয় চেষ্টা এবং তখন পাপী ও পুণ্যবান, সাধু ও অসাধু বলিয়া কোন ভেদ ভাব তদীয় হৃদয়ে থাকে না, ভদ্রাভদ্র, সভ্যাসভ্য, উন্নতাবনত সকলের সমভাবে উন্নতি-সম্পাদনই তাঁহার মহাব্রত হয়।" (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)। এই উক্তি দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে ইতর জীবগণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে। কারণ, অত্যুন্নত মহাত্মাগণই যখন তাহাদিগকে ঔরস পুত্রবৎ দর্শন করেন, তখন যাঁহার হইতে অধিকতর উন্নত হওয়া দূরের কথা, যাঁহার সমান উন্নতও কেহ নাই বা থাকিতে পারে না, অথবা কেহ ধারণাও করিতে পারে না, সেই অনন্ত গুণনিধান প্রেমময় পরম পিতা যে তাহাদিগকে আরও অনন্ত ভাবে নিত্য স্নেহ করেন ও তজ্জন্যই তাহাদিগকে সেইরূপ অনুন্নত অবস্থায়ই চিরদিন রাখিবেন না, তাহা সন্দেহ করিবার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। আর যদি আমরা দুইটী বিষয় অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ক্রম প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করি, তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে ইতর জীবও ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব দেহ ও তৎপর নানাবিধ দেব দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রত্যেক জীবনে সাধন করিবে। সাধারণ মানব নিজেকেই বিশ্বের রাজা বলিয়া মনে করেন। সাধারণের নিকট এই বিশাল বিরাট বিশ্বও অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ আমরা যে গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ আছি, বিশ্ব তাহাই মাত্র। উহার অধিক সে গভীর ভাবে জানিতে চাহে না। সুতরাং যখনই সে শুনিতে পায় যে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উন্নত ধরণের দেহ ধারণ করিয়া শেষে মানব দেহ ধারণ করে, তখনই সেই উক্তিকে সে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সহিত বিচার করে। অবশ্য আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের কথা বলিতেছি না। তবে একমাত্র আমরাই সৃষ্টির রাজা এই অহংকার হইতে সাধারণে নিমুক্ত নহেন। এই জন্যই যখন Darwin সাহেবের মত প্রচারিত হইয়াছিল, তখন অনেকে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার উপর গালি বর্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং এই বিষয়ের বিচারের মূলেই

গোলমাল রহিয়াছে, তাহাতেই কেহ কেহ আমাদের সুসিদ্ধান্তে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই সকল সংশয় অপনীত হইবে। এস্থলে আমাদের বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আমরা Darwin সাহেবের Theory বিশ্বাস করি না। সেই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে নিম্নতম স্তরের ইতর জীবের জীবন হইতে মানব জীবন লাভ করিতে এক একটী জীবাত্মার বহুকাল কাটিয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত জন্ম সংখ্যা যদি সত্য হয়, তবে মানব জন্মের পূর্ব্বে জীবাত্মার ৮৪ লক্ষ ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এত দীর্ঘকাল জীবাত্মা কোনই সাধনা করিল না, অথচ সাধনার জন্যই জীবন। সুতরাং এতকাল তাহার বৃথাই গেল। অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা কেন এরূপ অপ্রয়োজনীয় বিধান করিবেন? ইহার উত্তর নিম্নে লিখিত হইতেছে। সংখ্যা হিসাবে পুরাণোক্ত ৮৪ লক্ষ জন্মের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক মানবেরই ইতর জীব ভাবে বহু জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং উহাতে বহুকাল ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি ও তাহাই বিস্তারিত ভাবে এই অংশে লিখিত হইল। নিম্নলিখিত জীবন ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঙ্গত, সুতরাং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরমপিতার স্বগুণ পরীক্ষা। পরমপিতা প্রত্যেক জীবে কোনও একটী গুণ বিশেষ ভাবে বিকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন এবং গুণ সমষ্টিতে সকল জীবদিগকেই সমান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে সেই সেই জীব সেই সেই গুণে প্রথমতঃ তাঁহাতে তন্ময় হইবে। সুতরাং জীব সমূহের যে ধারা (Line) দিয়া চলিয়া আসিলে সেই জীবের সেই গুণ বিশেষ ভাবে প্রকাশের সুবিধা হয়, পরম পিতার মঙ্গল বিধানে জীবাত্মা সেই ধারা ধরিয়াই আসিবেন। ধরা যাউক্ যে ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি নামক ইতর জীবগণের শ্রেণীর দেহের গঠন এমন যে তাহাতে সেই সকল দেহে জীবাত্মা জ্ঞান গুণ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, অর্থাৎ সেই সকল দেহে বাসকারী জীবাত্মার

ক্রমশঃ জ্ঞানের বিকাশ প্রধান ভাবে হইতে থাকিবে। সেইরূপ চ, ছ, জ, ঝ প্রভৃতি জাতীয় জীবগণের দেহ গঠনের জন্য জীবাত্মার প্রেম গুণ বিকাশের সম্ভাবনা অধিক। যে জীবাত্মাকে পরমপিতা জ্ঞান গুণে তাঁহাতে তন্ময় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁহাকে (সেই জীবাত্মাকে) প্রথম শ্রেণীর দেহের (অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি নামক জীবগণের দেহের) মধ্য দিয়া ক্রমশঃ মানব জন্ম দান করেন। আবার যাহাকে প্রেমগুণে তাঁহাতে তন্ময় করিবেন, তাঁহাকে (সেই জীবাত্মাকে) ২য় শ্রেণীর দেহের (অর্থাৎ চ, ছ, জ, ঝ প্রভৃতি নামক জীবগণের দেহের) মধ্য দিয়া ক্রমশঃ মানব জন্ম দান করেন। এইরূপ অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। মানবের দেহও যে নানা প্রকার, সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে বিনা প্রয়োজনে জগতে কিছু হয় নাই এবং যাহার যখন প্রয়োজন থাকিবে না, তখন তাহার লয় হইবে। এমন অনেক বস্তু আছে, যাহার প্রয়োজনীয়তা আমরা মোটেই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু উহাদেরও যে আবশ্যকতা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলেই আমরা জানিতে পারি। শুনিয়াছি Allopathic Medical Science প্রথমে মনে করিতেন যে প্লীহা আমাদের শরীরে কোনই প্রয়োজনে আসে না। কিন্তু শেষে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে উহারও আবশ্যকতা আছে। উহাতে নাকি কতক পরিমাণে রক্ত জমা (Reserve) থাকে। এইরূপ আমরা যাহাকে অদ্য অত্যন্ত অকেজো মনে করি, কল্য জানিতে পারি যে তাহাও আবশ্যকীয়। আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য সকলকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি। কিন্তু চিকিৎসকগণ ও রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে উহারাও কত উপকারী ও কতই প্রয়োজনে আসে। উহারা যে কত রোগ আরোগ্যকারী ঔষধের কার্য্য করে, তাহা কে বর্ণনা করিবে? ইতিপূর্ব্ব যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইতর জীবজন্তুও জীবাত্মা। সুতরাং পরমপিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ জীবাত্মার জন্য যে ক্রমপ্রণালীর বিধান

করিয়াছেন, তাহাও একান্ত প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলের জন্যই। আমরা হয়ত আমাদের অপূর্ণা ও দুষ্টা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না, আংশিক ভাবে মাত্র বুঝিব, কিন্তু সেই বিধান সেই জন্য অসম্ভব, ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে। ইহা স্থির নিশ্চয় যে আমাদের জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য অধিক হইতে অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে আমরা বুঝিতে পারিব। পশু পক্ষ্যাদি হইতে নিম্নতর নিম্নতম ইতর জীবগণের জ্ঞান-বিকাশের শক্তি মানবের ন্যায় নাই। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবে জ্ঞানের বিকাশ অধিক হইতে অধিকতর দেখা যায়। ইহার কারণ যে নানা প্রকার দেহের গঠন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহাদের বুঝিবার শক্তি ক্রমশঃই অধিকতর হয়। জীবাত্মা মাত্রেরই স্বাধীনতা আছে। কারণ তিনি অনন্ত স্বাধীনের অংশ ভাবে ভাসমান। দেহের গঠনের জন্য অন্যান্য গুণের ন্যায় এই গুণও উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবে অধিক হইতে অধিকতর ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পাঠক মনে রাখিবেন যে ইতর জীবগণ তমঃ-প্রধান বা রজস্তমঃ-প্রধান। সুতরাং দেহে তমঃ এর পরিমাণের ক্রমাল্পতানুযায়ী উক্ত গুণ ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে অধিক ভাবে বিকশিত হয়। ইতর জীবদেহে সত্ত্বগুণও আছে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ নিম্নতর জীবে উহা অল্প হইতে অল্পতর। আবার কোন কোন জীবদেহে যে উহা বর্ত্তমান, তাহা বহির্দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না। সাধারণতঃ উক্ত গুণদ্বয় (জ্ঞান ও স্বাধীনতা) ইতর জীবে অত্যধিক ভাবে সীমাবদ্ধ। উহার কারণ যে তমোগুণাক্রান্ত দেহ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই জন্যই মনে হয় যে উহারা সাধনা করিতে পারে না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহারাও সাধনা করিতেছে, তাহা যতই অল্প হউক না কেন। এই স্থলে ৬৬৩-৬৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য। তাহাতে এই বিষয়টী সরল করিবে। ইতর জীবের জ্ঞান ও স্বাধীনতা যতই অল্প হউক না কেন, তাহা সর্ব্ব জীবেই যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে ও উচ্চতর ইতর জীব জগতে (পশু পক্ষ্যাদিতে) অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। সুতরাং উহারা উক্ত গুণদ্বয় দ্বারা পরিচালিত

হইয়া কোন কোন কার্য্য করে ইহা নিঃসন্দেহ। সকল কুকুর সমান ভাবে প্রভুভক্ত নহে, যদিও প্রভুভক্তি উহাদের সাধারণ স্বভাব। সকল বিড়াল একই স্বভাবের নহে। কোনটী শান্ত, কোনটী দুষ্ট। যাহারা পশুপক্ষীর আহার বিহার, ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। সুতরাং ইতর জীবের সজ্ঞান সাধনা যে মোটেই হয় না, তাহা মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সকল জীবই কর্ম্ম করে ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই অভিজ্ঞতা জীবের পক্ষে বিশেষ সম্পত্তি। সাধারণে মনে করে যে অভিজ্ঞতা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। অভিজ্ঞতা হইতেই সংস্কার জন্মে ও তাহা চিরস্থায়ী। কুসংস্কারকে সদ্‌গুণ সাধনা দ্বারা পরে লয় করিতে হয়। সুসংস্কার ত সহায় হইয়াই বহুকাল সাহায্য করে। সুতরাং ইতর জীব জীবনের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। উহাতে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মানব জীবনে জীবের যে পরীক্ষা সমূহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার প্রধান কারণই ইতর জীব জীবনের সংস্কার-রাশি, বিশেষতঃ কুসংস্কার রাশি। ইতর জীব জীবনে যে সংস্কার গঠিত হয়, তাহা লইয়াই মানব জীবন আরম্ভ হয়। এই বিধানও পরম মঙ্গলময় পরম পিতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই বিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবকে পূর্ণত্ব দান করিবার জন্যই এই সৃষ্টি লীলা। সুতরাং সেই অনন্ত ভাবে সুমহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, যদি মানব জীবন ভীষণ পরীক্ষার স্থলরূপে প্রস্তুত করা না হয়, অর্থাৎ যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পথে বিশেষরূপ বহু সংখ্যক বাধা সৃষ্টি করা না হয়। ইতর জীব জীবনের সংস্কার রাশিই প্রধানতঃ সেইরূপ কঠিন পরীক্ষার অবস্থা আনয়ন করে। অর্থাৎ ফলও যেমন অত্যুৎকৃষ্ট হইবে, পরীক্ষাও তেমনি কঠিন হওয়াই প্রয়োজনীয়। তাই মানব জীবনের পূর্ব্বে ইতর-জীব-জীবন সংস্থাপিত হইয়াছে। কাজে কাজেই ইতর-জীব-জীবনের সংস্কার রাশি জীব মানব জীবন পর্য্যন্ত বহন করিয়া আনিতে বাধ্য হয়।

এই সমস্যা জটিল ও কঠিন। তাই পাঠকের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তিনি যেন মায়াবাদের প্রোক্ত অংশ পাঠ করেন। তাহা হইলেই এই বিষয়ের সরল মীমাংসা লাভ করিবেন। এস্থলে উহার পুনরুক্তি অসম্ভব। যদি কেহ ইতর-জীব-জীবনে অনুকূল সাধনা বা অন্বয়ী সাধনা নাই বলেন, তবুও তাহার স্বীকার করিতে হইবে যে সেই জীবনে বিপরীত সাধনা বা ব্যতিরেকী সাধনা যথেষ্ট পরিমাণে সংসাধিত হয়। সমস্ত জীবনই যখন সাধনাময়, তখন ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। স্থূল, ইতর-জীব-জীবনে বিপরীত সাধনাই অত্যধিক, অনুকূল সাধনা অল্প। সজ্ঞান সাধনাও আছে, কিন্তু তাহাও অল্প। পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ইতর জীবগণও সাধনা করে, যদিও সেই সাধনা সাধারণে বুঝে না, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাহা ধরা পড়ে। স্থূল, পরমপিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রত্যেক জীবাত্মা দ্বারা সাধন করাইবেন, ইহা যখন সুনিশ্চিত, তখন জীবাত্মা মাত্রই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সাধনা করিবেনই। ইতর জীব জন্তুও যখন জীবাত্মা, তখন তাহারাও সাধনা করিতেছে বলিতে হইবে। ইহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। আমরা সাধারণ মানবের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাইব যে তাহার সজ্ঞান সাধনা অত্যল্প। কেবল ধর্ম্মার্থী এবং মোক্ষার্থিদিগের জীবনে সজ্ঞান সাধনা পরিলক্ষিত হয়। ইতর জীবের সজ্ঞান সাধনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় না বলিয়াই যদি তাহা-দিগকে জীবাত্মার শ্রেণী হইতে বাদ দিতে হয়, তবে বহু মানবও সেই একই কারণে জীবাত্মার শ্রেণী হইতে বাদ পড়েন। পরম করুণাময় পরমপিতা দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ জীবদিগের জীবনে তাঁহারই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথোপযুক্ত সাধনা করাইতেছেন। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সেই সাধনার প্রকার ভেদ আছে, এই মাত্র। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অন্য ভাবে এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ক্রম প্রণালী যে ইহার মূলে, তাহা সর্ব্ব প্রথমেই বুঝিতে হইবে। ক্রম বাদ দিয়া উহা বুঝিতে

গেলেই বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। হঠাৎ এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টির সাদিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে পরম পিতার ইচ্ছায় একমাত্র ব্যোম হইতে সৃষ্টি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে গণনাতীত কাল লাগিয়াছে এবং মহাপ্রলয়ের জন্য অনন্ত প্রায়কাল আবশ্যক হইবে। ইংরেজীতে একটী কথা আছে যে God's machine grinds very slowly. অর্থাৎ পরমেশ্বরের কল বড়ই আস্তে চলে। যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারাই বুঝেন যে এক একটী ব্যাপারের পশ্চাতে শত শত ঘটনা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে বহুদূর পশ্চাতে যাইতে হয়, এবং একথাও সত্য যে সেই জন্য আমরা বহু সময় পরমপিতার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ, তাহাতেই যখন ভুল হয়, তখন যাহার মর্ম্ম ধারণা করিতে বিশেষ চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনার একান্ত প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে যে সাধারণের ভুল হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ক্রম ভিন্ন সৃষ্টিতে কিছুই হয় না, ইহা যখন সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, তখন পরম পিতা জীবাত্মাকে যে নানা স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমান্বয় আকর্ষণ করিয়া শেষে তাঁহারই একমাত্র সুবিশাল ও অমৃতময় নিত্য প্রেমক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন, ইহাই ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই সকল স্তরই ইতর জীব জন্তুর, মানব ও পরলোকবাসিগণের জীবন। ইতর জীবগণের মধ্যে যেমন প্রকার ভেদ আছে, মানবের মধ্যেও সেইরূপ আছে, যদিও তাহা ততদূর সুস্পষ্ট নহে। পরলোকবাসিগণের মধ্যে আবার অসংখ্য প্রকার দেহ আছে। একটী জীবাত্মা মানব জন্মের পরেও তাহার স্ব স্থানে গমন করিতে কত পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ প্রকার দেহ ধারণ করেন, তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। মানবের পরলোকে অসংখ্য প্রকার দেহ ধারণ করিতে হয়, ইহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। সেই সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে পুরাণ কথিত ৮৪ লক্ষ ইতর জীবদেহ মহাসাগরে শিশির বিন্দুবৎ বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব কথিত মত ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত, কখনই বিরোধী নহে। জীবাত্মার ইতর জীব জন্তুর

দেহ ধারণ করিতে হইলে অধিক কাল বৃথাই ব্যয় হইবে, ইহা চিন্তা করিবারও কোনই প্রয়োজন নাই। জীবের জীবন কাল অনন্ত প্রায়, সুতরাং সমগ্র জীবনের তুলনায় ইতর-জীব-জীবন-কালও সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ। আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে ওষধি তরু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বীজ হইতে বৃক্ষে পরিণত হইয়া জগৎকে উহার ফল বিতরণ করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয়। কিন্তু বট বৃক্ষটী অতি অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায় ও তাহার প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতে বহু বৎসর গত হয় ও সে বহু বৎসর জীবিত থাকে। আকরে যে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহাকে অনেকবার দহন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া করিলে তবে বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যায়। লৌহকেও ইস্পাতে পরিণত করিতে হইলে উহাকে বারংবার দহন করিতে হয় ও অন্যান্য প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত ও ঐরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতিরই এই নিয়ম যে, যে বস্তুটী যত উত্তম, উহার সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে ততোঽধিক কাল আবশ্যক হয়। জীবের চরম উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে আত্মস্বরূপ লাভ, সুতরাং কার্য্যটী সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় অর্থাৎ যাহার উপরে আর কোন কার্য্য নাই বা থাকিতে পারে না। অতএব সেই স্থলে উপনীভ হইতে যে অনন্ত প্রায় কাল আবশ্যক ও পথটী ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা, তখন সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি নিজেকে অতিশয় জড় ভাবাপন্ন দেহে অর্থাৎ যে দেহে তমোভাবই পৌণে ষোল আনা, সেইরূপ দেহে অংশ ভাবে ভাসমান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে সকল জীবাত্মা তাঁহারই সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে অর্থাৎ প্রায় জড়াবস্থা হইতে আত্মোন্নতি সাধনা দ্বারা প্রায় শূন্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হইবে ও পরিশেষে তাঁহাতেই তন্ময় হইবে। সুতরাং যদি আমরা বলি যে জীবাত্মা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর জীব হইতে মনুষ্য দেহ লাভ করে, তাহা হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বগুণ পরীক্ষার অনুকূলের কার্য্যের কথাই বলা হইল, উহার বিপরীত ভাবের কিছুই বলা হয় নাই। উক্ত বিষয়টী আরও একটু

পরিষ্কাররূপে আলোচনা করিতেছি। আমরা পর্ব্বতকেও জীব বলি। উহার দেহ এত অধিক পরিমাণে ক্ষিতি প্রধান বা তমঃ প্রধান যে উহার চৈতন্য আছে বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করে না। উহা দেহের আবরণে যেন একেবারেই আবৃত। আবরণ যেন কোথায় ও কোন-রূপে একটু মুক্ত, তাই তাহাতে চৈতন্যের কার্য্য দেখা যায়। আমাদের দেশে পূজা প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্যে একটী প্রদীপ আদ্যন্ত জ্বালান থাকে। ঐ প্রদীপকে রক্ষা-প্রদীপ বলা হয়। উহা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে কোনও প্রকারে নির্ব্বাপিত হইলে অমঙ্গল হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকায় উহাকে একটী সরার উপর রাখিয়া অন্য একটী সরা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়, পাছে বাতাসে বা কীট পতঙ্গ পতিত হইয়া প্রদীপটী নির্ব্বাপিত না হয়। কেবল উপরের সরাটী এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যে কোন রকমে একটু বায়ু যাইয়া আলোকটীকে রক্ষা করে। পর্ব্বতের অবস্থাও যেন সেইরূপ। প্রদীপের আলো চৈতন্য স্বরূপ জীবাত্মার এবং সরাদ্বয় দেহের প্রতিরূপ। আলো সরাদ্বয় দ্বারা এমনি ভাবে আবৃত যে উহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে না। পর্ব্বতের দেহও সেইরূপ তমোভাবাপন্ন, ক্ষিতি দ্বারা এমনি ভাবে আবৃত যে সাধারণে উহাতে চৈতন্যের বিকাশ দেখিতে পায় না। আবার সত্যলোকের শেষ মণ্ডলে যে জীবাত্মা (পরমোন্নত পরমর্ষিগণের মধ্যে যিনি উন্নততম) বাস করিবেন, তাঁহার দেহ ব্যোম প্রধান বা একমাত্র ব্যোম বলিলেও হয়। তাঁহার দেহ যেন তাঁহাকে একটুকুও আবৃত করিয়া রাখে নাই অর্থাৎ তাঁহার যেন দেহরূপ আবরণ নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পরমপিতা প্রথমতঃ এমন ভাবের দেহ দ্বারা আবৃত হইয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার চৈতন্যের বহিঃ প্রকাশ অল্পতম (Irreduoible minimum) হয়। উদ্দেশ্য এই যে জীব সাধনা ও ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে করিতে ক্রমশঃ আবরণ উন্মুক্ত হইতে হইতে শেষে যেন তাঁহার আবরণ আর থাকে না বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ তাঁহার অসীম উদার হৃদয়ে পরমপিতার অনন্ত গুণ প্রায় পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত একত্বের একত্ব লাভের অবস্থা প্রায়

উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি অধিকতম (highest maximum) আত্মোন্নতি পরম পিতার অপার কৃপায় যেন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে তখনও তাঁহার কারণতম দেহ বর্তমান। সুতরাং তিনি তখনও অপূর্ণ, সেই অপূর্ণতা যতই অল্প হউক না কেন। পরিশেষে অনন্ত অনন্ত অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় সেই শেষ কারণদেহ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। অতএব দেখা গেল যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা ও ক্রম প্রণালীর বিরুদ্ধে আমরা গমন করি নাই। অর্থাৎ পরম পিতা তাঁহারই অনন্ত প্রেমে প্রত্যেক জীবকে নিম্নতম অবস্থায় জগতে আনিয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে গ্রহণ করিবেন এবং মহাযাত্রার পথে জীবকে অসংখ্য বাধা বিঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং উহাদিগকে তাহার অতিক্রম করিতে হইবে। এই অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই পরমাত্মার বিভিন্ন গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে। যদি কেহ এতদ্ভিত সুদীর্ঘ পরীক্ষাময় জীবনের বিধান জন্য পরমপিতার কোনও ক্রটী আছে বলিয়া মনে করেন, তবে তাহাকে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" এবং "মায়াবাদ" অন্তর্গত 'চিদাভাস' অংশদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে সৃষ্টি কার্য্যে কোথায়ও বিন্দু মাত্রও ক্রটী হয় নাই। এই জগৎ তাঁহারই প্রেমরাজ্য। ইহার এক ছত্রাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্বয়ং নিত্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতা। সুতরাং ইহা নিত্যই অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় যে রাজ্যের বিধাতা, সেই রাজ্যে কোনও অমঙ্গল বা ক্রটী যে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি বলেন যে সুদীর্ঘ ইতর-জীব-জীবনে এবং মানব জীবনেরও নিম্নস্তরে দুঃখের তীব্রতা এবং গুণ-রাশির আবরণের পরিমাণ এত অধিক যে ইহার জন্যই পরম পিতার মঙ্গলময়ত্বে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ইহার উত্তরে আমাদের প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ পাঠে এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে বলিয়া মনে করি। এস্থলে অতি সংক্ষেপে বলিতে হইবে যে মানব অত্যুন্নত স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অনন্তকাল-ব্যাপী

দেব জীবনে যে কত অসীম সুখ, শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিবে, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। উন্নত পারলৌকিক জীবনের অসীম কালের সহিত ইতর-জীব-জীবন এবং মানব জীবনের সমষ্টি কালের তুলনাই সম্ভব হয় না, শেষোক্ত কাল এতই অল্প। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত মণ্ডল সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপরোক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং পরীক্ষার জন্য যদি তিনি প্রথমে আমাদের বিশেষ দুঃখের বিধান করিয়াও থাকেন, তবে তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতে হইবে। আর সেই স্বল্প দুঃখ-দানও অনন্ত সুখ শান্তি দানের জন্যই বুঝিতে হইবে। যদি কেহ কাহাকেও শতকোটী স্বর্ণ মুদ্রা দান করিবার জন্যই এবং তাহাকে ভবিষ্যতে সেই মহাদানের উপযোগী করিবার জন্যই প্রথম জীবনে অভাব জনিত দুঃখ ভোগ করান, তবে তাহাতে সেই মহান্ দাতার উদ্দেশ্যের প্রতি কোনও দোষারোপ করা যায় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মাতার সন্তান লাভের পূর্ব্বে তাঁহার অল্পাধিক প্রসব বেদনা ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু স্নেহময়ী মাতা সন্তান মুখ দর্শন করিবা মাত্র সকল দুঃখই ভুলিয়া যান এবং মহানন্দে নিমগ্ন হন। এমন কি কোনও বন্ধ্যা নারী আছেন, যিনি ভীষণ প্রসব বেদনা ভোগ করিয়াও পুত্রের জননী হইতে অনিচ্ছুক? আবার যাহারা বাল্যে ও যৌবনে দুঃখের মধ্যেই জীবন যাপন করিয়াও নিজদিগকে উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সাক্ষ্য দিবেন যে তাহারা পরে আর সেই দুঃখের জন্য দুঃখিত নহেন, বরং উহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়ই হয়। তাহারা আরও বলিবেন যে সেই দুঃখ না থাকিলে তাহাদের এতদূর উন্নতি সম্ভব হইত না। সেই দুঃখ গুণরাশি বিকাশের জন্যই মঙ্গল-ময়ের মঙ্গল বিধানে তাহাদের জীবনে আগমন করিয়াছে। আমরা যদি পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রথমে দুঃখ, তৎপরে সুখ। যদি কেহ বাল্যে ও যৌবনে কষ্ট করিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী হন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাল কাটান, তবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ লাভ অবশ্যম্ভাবী হইবেই। "নহি

সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে" উক্তি দ্বারাও আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রথমে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইতর জীবের জীবন যদি দুঃখময় মনে করা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে তাহাতে সাধারণ নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জীবনে প্রথমে দুঃখ এবং পরে সুখ। আমরা আরও একটী তত্ত্ব এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারি। তাহা এই যে পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে ছোটই বড় হয়, ক্ষুদ্রই বৃহৎ হয়। মাতৃগর্ভে উপ্ত এক এক বিন্দু শুক্র মাতৃদেহের শোণিত বিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শিশু আকারে ভূমিষ্ঠ হয়। আবার শিশুও ক্রমশঃ উন্নত দেহ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর সকল বীর, সকল যোদ্ধা, সকল পণ্ডিত, সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সকল ধার্ম্মিক, সকল ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষ ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে একই প্রণালীর সাহায্যে বড় হইয়াছেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুগণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। বটবৃক্ষের বীজটী সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও ঐ একই তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, এমন কি সমুদ্র, মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হইয়াছে।* এই ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্ত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে ছোটই বড় হয়, কেহই কখনই বড় হইয়া প্রথম জন্ম লাভ করেন নাই। বড় হইবার জন্য সকলেরই সাধনা করিতে হয়। "জন্মান্তরবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে জগৎ প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণও জন্ম জন্মান্তরের সাধনা দ্বারা উন্নত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে অনন্তমঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র ক্রম সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ বৃহৎ হইবে। অতএব ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টিতে ক্রমোন্নতির বিধানানুযায়ী প্রথমতঃ জীবাত্মা অত্যন্ত তমঃ-প্রধান দেহে জন্ম গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যে দেহের গঠনই এরূপ যে তাহাকে (আত্মাকে) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

---

* উক্তি আছে **"Drop by drop ocean is made".** ইহা বিজ্ঞান সম্মত উক্তিও বটে।

অবস্থায় উপনীত করে। অর্থাৎ সেই দেহে তমঃ এর প্রধান্য জন্য তাঁহার গুণ রাশির বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। তিনি ক্রমশঃ উন্নততর দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া করিয়া শেষে মানব জন্ম লাভ করিবেন ও পরে দেব দেহ প্রাপ্ত হইবেন। এই জন্যই মানব জন্মকে দুর্ল্ভ বলা হয়। আমরা একটী পদার্থ বা অবস্থাকে দুর্ল্ভ বলি তখন, যখন উহা লাভ করিতে বহুকাল ও বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যাহা সহজেই পাওয়া যায়, তাহাকে কখনই দুর্ল্ভ বলা যায় না। ইহাই যখন সত্য, তখন মানব জন্মের দুর্ল্ভত্বের কোনই অর্থ হয় না, যদি ইহা কল্পনা করা যায় যে পরমাত্মা মানব দেহে আবদ্ধ ভাবে (জীবাত্মা ভাবে) সর্ব্বপ্রথমে ভাসমান হন। কারণ, পরমাত্মার পক্ষে মানব দেহে সর্ব্বপ্রথমে জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হওয়া কখনই দুঃসাধ্য সাধনার ফল হইতে পারে না। আবার যাহা সাধনা ব্যতীত আপনা আপনি হয়, তাহাকে কেহ কখনও দুর্ল্ভ আখ্যা দান করেন না। অপর পক্ষে যদি ইহা কল্পনা করা যায় যে পরমাত্মা সর্ব্ব প্রথমে ইতর জীবের কোন এক নিম্নতম স্তরে দেহাবদ্ধ ভাবে (জীবাত্মা ভাবে) ভাসমান হইয়াছেন এবং সেই জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর ইতর জীব রাজ্যের বহু দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব দেহ লাভ করিয়াছেন, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই জীবের পক্ষে মানব জন্মলাভ দুর্ল্ভই বটে। কারণ, ইতর জীবের নিম্নতম স্তর হইতে মানব দেহ লাভ করিতে লক্ষ লক্ষ দেহে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন যে জীবের মানব জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। ইহাতে বহু কাল কাটিয়া যায়। ইহা ভিন্ন সেই সকল জন্মে সেই সকল জীবের সাধনাও করিতে হয়, তাহা যতই নিম্ন স্তরের এবং অজ্ঞানকৃত হউক্ না কেন। এই সকল জন্মের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে এবং “চিদাভাস” অংশে বিবৃত হইয়াছে। স্থূল, মানব জীবনের এবং ইতর-জীব-জীবনের অত্যন্ত পার্থক্যই ইতর জীবের পক্ষে মানব জন্মের দুর্ল্ভত্বের কারণ বটে। আমরা এই বিষয়টী অন্য-

ভাবেও চিন্তা করিতে পারি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা এবং পরীক্ষা যখন আমাদের পদে পদে দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে পরম পিতার অনন্ত গুণ বাস্তব ভাবে আবরণ দ্বারা প্রায় শূন্যাবস্থায় পরিণমন করা হইয়াছে। পূর্ণের পরীক্ষা হইতে পারে না। কারণ, পূর্ণের সকলই পূর্ণ, তাঁহার কোনই অভাব নাই! আবার তাঁহার অনন্ত গুণ যদি আবরণ দ্বারা পরিমাণে প্রায় শূন্যাবস্থায় আনয়ন করা না হয়, তবে পরীক্ষাও পূর্ণভাবে পূর্ণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবাত্মারই অসংখ্য বাধা অতিক্রমের পরীক্ষা দান করিতে হইবেই। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যদি জীব সর্ব্বপ্রথমে মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করে, তবে সুদীর্ঘ ইতর-জীব-জীবনে যে অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার আসিতে হয়, তাহা আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আমাদের যত কিছু আপদ বিপদ, দুঃখ দৈন্য, সঙ্কট বিপাক, লজ্জা অপমান, তাহা সমুদায়ই গুণ ও শক্তির বিকাশের জন্যই। উহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে, অনন্ত প্রেমময়ের রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন কিছুই নাই, সমস্ত অবস্থাই মঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সকলেরই গতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য সাধন করিতে। সুতরাং ইতর-জীব-জীবনে অসংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এবং তজ্জনিত অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে কার্য্য অপূর্ণ থাকিবে এবং মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না। যদি বলেন যে মানব জীবনেই সেই সকল পরীক্ষা হইতে পারে, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। ইতর জীব দেহে যে পরীক্ষা সম্ভব, তাহা মানব দেহে সম্ভব নহে। ইহা সহজ বোধ্য। একটী কথা আমাদের এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ যত অধমই হউক না কেন, তাহাতে ইতর জীব হইতে গুণের বিকাশ অধিকতর ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং পরীক্ষা অপূর্ণ থাকে ও তজ্জন্য অভিজ্ঞতাও অপূর্ণ থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রথমতঃ নিরক্ষর থাকে ও ক্রমশঃ নিম্ন শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। কেহই নিম্ন শিক্ষার অবস্থায় মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষা

দেয় না। আবার উচ্চ শিক্ষার অবস্থায়ও কেহ মাধ্যমিক বা নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরীক্ষা দেয় না। কাহারও জীবনে নিম্নতম শিক্ষার অবস্থা পার না হইয়াই মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা লাভ হয় না। সর্ব্বত্রই ক্রম বর্ত্তমান। জীব জীবন পরম পরীক্ষার স্থল। সুতরাং সেই স্থলেও ক্রম অবশ্যই কার্য্য করিবে। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে জীব প্রথমতঃ মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার ইতর জীবেরও নিম্নতম স্তরে প্রথম জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি বলেন যে ইতর জীবের আবার পরীক্ষা কি, তবে বলিতে হয় যে ইতর-জীব-জীবনেও পরীক্ষা আছে। উহা মানব জীবনের পরীক্ষার ন্যায় কঠিন নহে। মানবের মধ্যেও সকলের জন্যই একই পরীক্ষা নহে। শিক্ষাস্থলেও যেমন পরীক্ষার প্রকার ভেদ, কাঠিন্য ভেদ আছে, বিভিন্ন জীবের সম্বন্ধেও তাহাই বর্ত্তমান। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখা যায় যে মানব জীবনে পদে পদে পরীক্ষা, সেইরূপ সর্ব্বত্রই। এই নিয়ম যে প্রকারান্তরে জড় রাজ্যেও কার্য্য করিতেছে, তাহাও সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ জড় ও জীবের জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলেই নানাবিধ পরীক্ষার ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। ইহাই যখন সর্ব্ব প্রধান তত্ত্ব, তখন ইতর জীব সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যখন ব্রহ্মের সগুণ পরীক্ষা, তখন তাহা যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদের জীবনেও সাধিত হইবেই, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব পরীক্ষাময় সুদীর্ঘ জীব জীবন অসম্পূর্ণ থাকে যদি দীর্ঘ ইতর-জীব-জীবনের পরীক্ষা তাহা হইতে বাদ পড়ে। কেহ কি মানব জীবন বাদ দিয়া দেব জীবন বা দেবোত্তম জীবনের কথা চিন্তা করিতে পারেন? ইহা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ ইতর-জীব-জীবন না থাকিলে মানব জীবন ও তৎপর দেবজীবনও সম্ভব হয় না। এস্থলে ইহাও আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে ইতর জীব নিম্নতর স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে উচ্চতর স্তরের ইতর-জীব-ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে ইতর-জীব-জীবনে পরীক্ষাও সহজ, মানব জীবনের ন্যায়

কঠিন নহে। ক্রমই সৃষ্টি প্রণালী। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জীবের পক্ষে তাই ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম হওয়াই বিধি। তাই জীব-কুল অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে প্রায় শূন্যাবস্থা হইতে প্রায় পূর্ণাবস্থায় নীত হন এবং পরিশেষে অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় পূর্ণা-মুক্তি লাভ করেন। অতএব এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা যায় যে ব্রহ্মের প্রেমলীলায় জীব ইতর জীব ভাবে প্রথম জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নততর দেহ ধারণ করে। তাহাতে ক্রম প্রণালী, স্বগুণ পরীক্ষা বা জগতে দৃষ্ট সৃষ্টি প্রণালীর কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। গ্রীক দার্শনিক মহামনাঃ Plato আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বহু যোনি ভ্রমণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক জগতের প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জীবের ক্রম বিকাশ বাদের পক্ষপাতী। তাহারা বলেন যে Proto-plasm হইতে জীবদেহ আরম্ভ হইয়া দেহের পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকও ক্রম বিকাশ বাদের পক্ষপাতী অর্থাৎ বিজ্ঞানও বলেন যে ছোটই ক্রমশঃ বড় হয়। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান অংশে এবং "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমাদের মত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে যে উক্ত মত আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন না করিলেও জীবরাজ্যে যে জীবাত্মা নিম্নতম স্তরের দেহ ধারণ করিয়া প্রথমতঃ জগতে আসিয়াছেন এবং ক্রমশঃ উচ্চস্তরে জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে মানব জন্ম লাভ করেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। সুতরাং উভয় মতই জীব সৃষ্টিতে ক্রম বিকাশের পক্ষপাতী। ইতর-জীব-দেহে যে আত্মা বর্ত্তমান এবং উহাদের আত্মা ও মানবের আত্মায় যে কোনই পার্থক্য নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" অংশে ৫৪৭-৫৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠক দেখিবেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই। আবার আমরা জ্ঞানের মূল সূত্র পরম পিতার স্বগুণ পরীক্ষা এবং সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালীর অনুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ইতর জীবগণ ক্রমো-ন্নতির নিয়মানুযায়ী বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া কালে কালে মানব দেহ

ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন বহু ভাবের প্রশ্নের অবতারণা করিয়া এবং উহাদের আলোচনা দ্বারা সেই একই মীমাংসায় আমরা উপনীত হইয়াছি। অতএব এই অংশের প্রারম্ভে যে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, উহাদের সুমীমাংসা আমরা পাইলাম কিনা, তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এখন মানব সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য নিবেদন করিতে যাইতেছি। মানব জন্মে আমরা আধ্যাত্মিক সাধনার উন্মেষ ও উন্নতি দেখিতে পাই, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মানব যে জন্ম জন্মান্তরে পৃথিবীতে বাস করিয়া সেই সাধনা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন, সেই সম্বন্ধে এখন পাঠকের সম্মুখে আলোচনা উপস্থিত করিতেছি।

ওঁং সর্ব্ব-জীব-সৃজন-পালন-কারণং সমপ্রেমময়ং পরমেশ্বরং ওঁং

ওঁ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

জন্মান্তরবাদ।

ইতর জীবের কথা পূর্ব্ব অংশে লিখিত হইয়াছে। এখন আমরা মানব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। মানব পৃথিবীতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন ও সেই সেই স্থলে স্থিতি দ্বারা জীবনে সাধনা করেন। এই সাধনাই তাহাকে ক্রমোন্নতি দান করে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে এরূপ উত্তম সাধকও পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের কার্য্য সম্পাদন করিয়া কারণ-দেহের কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ মহাত্মা দুর্লভ হইলেও ইহা হইতে আমরা এই তত্ত্ব লাভ করিতে পারি যে মানবে অত্যধিক সম্ভাবনা (Potentiality) বর্ত্তমান। আমাদের ঐকান্তিকী সাধনা দ্বারা যাহা আপাততঃ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, অনন্ত করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা আমাদিগকে তাঁহার গুণরাশি দান করিবার জন্যই এই প্রেমলীলা করিতেছেন। আমাদের পক্ষে উহা গুণ সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা সাপেক্ষ। তাঁহার গুণরাশি অনন্ত। সুতরাং কোন মানবই একটী মাত্র জন্মের কঠোর সাধনা দ্বারাও সেই সুদুর্লভ গুণ-রাশি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারও বারংবার পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বহু চেষ্টা, বহু যত্ন ও অধ্যবসায় সহযোগে বহু সাধনা করিতে হইবে। উহা ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই, তাহা আমরা মানব জীবন অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারিব। এখন আমরা মানবের পক্ষে জন্মান্তর গ্রহণ যে অবশ্যম্ভাবী সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও ইহুদি ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মতের মধ্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সুতরাং

পুনর্জন্ম বিষয়ে উঁহা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রারম্ভিক অবস্থায় পুনর্জন্ম অস্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বহুবৎসর যাবত ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ এখনও তাহা বিশ্বাস করেন না। হিন্দু ধর্ম্মের সকল বিভাগেই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্ম্মও উহা স্বীকার করেন। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবও বহু জন্ম পরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধগণ বলেন। জৈন ধর্ম্মেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত। শুনিয়াছি Spiritualism ধর্ম্মে প্রথমতঃ পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছিল না, কিন্তু এখন Spiritualist-গণ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হইয়াছেন। Theosophists দিগের মতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিক মহাসাধু Socrates ও Plato উভয়ই মানবের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে পুনর্জন্ম বিষয়ক অতি সংক্ষিপ্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "পরলোকগত আত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকেই পুনর্জন্ম কহে। পুনর্জন্ম যে সকল আত্মারই হইবে, এরূপ নহে, উহা আত্মাদিগের স্ব স্ব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে সকল ব্যক্তি আয়ুঃ সত্ত্বে আদিম দেহ ত্যাগ করেন, অথবা যে সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া গমন করিয়াও উপায় বিশেষ দ্বারা পরলোকে আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, তাহাদিগেরই পুনর্জন্ম হইতে পারে। অন্য কাহারও হইতে পারে না। আর আয়ুর্বিশিষ্ট বা আয়ুঃ প্রাপ্ত মাত্রেরই যে পুনর্জন্ম হইবে, তাহাও নহে। যে সকল আত্মা পরলোকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম (পাপক্ষয় ও গুণসাধন) করিয়া উঠিতে পারেন না, অথবা যাঁহারা পরলোকে গুণের অভাব প্রভৃতি নিবন্ধন অধীর হন, সাধারণতঃ তাঁহারাই পুনর্জন্ম লইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন উন্নত আত্মারাও কখনও কখনও সবিশেষ কারণবশতঃ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুনর্জন্মের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে উহা আত্মাদিগের ইচ্ছাধীন।" ভারতের বহু স্থানে নরনারী

তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদী বলিবেন যে সেই সকল উক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। একথা সত্য বটে, কিন্তু সকল উক্তিই সেই জন্য মিথ্যা বলা যায় না। পরলোকগত কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছায়াদর্শন গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে সামান্য একটী ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রসার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু উহাকে ভুতুরে কাণ্ড বা ভুতুরে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের উপযুক্তরূপ অনুসন্ধানের অভাবে জন্মান্তর সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ঐ সকল ঘটনাগুলির যেরূপ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন হইলে নিশ্চিতরূপে অপর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে জন্মান্তরবাদ সত্য। এখন আমরা শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতে জন্মান্তরবাদ সমর্থক নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহ উদ্ধার করিলাম :—"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে (কঠ ১-২।৬)।" "বঙ্গানুবাদ :—চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না; কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া যে পুনঃ পুনঃ আমার অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন হয়। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য :—এস্থলে যম পরলোকতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া জন্মান্তরবাদের কথাও প্রকারান্তরে বলিলেন। মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম না হইলে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে পারে না)। "স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।। (মুণ্ডক-৩।২।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—তিনি অর্থাৎ আত্মজ্ঞ এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহাতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে এবং যিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে অকাম জ্ঞানীগণ সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম

হয় না। (তত্ত্বভূষণ)।" "বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ। জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৩।২১)।" "বঙ্গানুবাদ :—আমি এই অজর, পুরাণ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত ঈশ্বরকে তাঁহার আকাশবৎ ব্যাপকত্ব বশতঃ জানি, ব্রহ্মবাদিগণ যদীয় জ্ঞানকে জন্ম নিবৃত্তির কারণ বলেন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা সর্ব্বদা অভিবাদন করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" পাঠক ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ড ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহা হইতেও জন্মান্তরবাদের সত্যতা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ (গীতা—২।২৭)।" "বঙ্গানুবাদ :—যাহার জন্ম আছে, তাহারই নিশ্চয় মৃত্যু আছে, যাহার মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয়ই জন্ম আছে। (গৌর গোবিন্দ রায়)।" (মন্তব্য :—"যাহার মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয়ই জন্ম আছে" এই বাক্য আলোচনা করিলে এই মনে হয় যে জন্মের পর মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি মৃত্যুর পর জন্মও অনিবার্য্য। ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা হইয়াছে ও ইতঃপর যাহা হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে যে সকলের পক্ষেই পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী নহে। শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল আত্মা মুক্ত হইয়াছেন, তাহারা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। সুতরাং সকলকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে অর্থাৎ চক্রের ন্যায় প্রত্যেকের পক্ষেই জন্ম মৃত্যু অনবরত চলিতেছে, ইহা সত্য নহে। তবে অনুন্নত এবং অবনত আত্মার পক্ষে যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ প্রয়োজনীয়, তাহা ইতঃপর লিখিত হইতেছে)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরও বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পূর্ব্বে বহু জন্ম হইয়াছিল। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। (৪।৫)" "বঙ্গানুবাদ :- অর্জ্জুন, তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সে সকল জন্মের কথা আমি জানি, তুমি জান না। (গৌর গোবিন্দ রায়)।" যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও বিনষ্ট হয় না ও সাধনার জন্য তিনি

পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাও গীতা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। "প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ (৬-৪১।৪২)।"

"বঙ্গানুবাদ :—পুণ্যানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহু বর্ষ বাস করতঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে। লোকে ঈদৃশ জন্ম সুদুর্ল্লভতর। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" এত সময় আমরা দেখিলাম যে তিনটী ধর্ম্মমত ব্যতীত সকল ধর্ম্মানুসারে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। শ্রুতি, স্মৃতি এক বাক্যে বলিতেছেন যে জীবের পুনর্জন্ম আছে। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর যে ইহুদি ধর্ম্মের প্রভাব আছে, তাহা বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং বলিতে গেলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমতই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, কেবল একটী মাত্র ধর্ম্মই এই মতের বিরোধী। এখন আমরা যুক্তিমার্গাবলম্বন করিয়া দেখিব যে জন্মান্তরবাদ সত্য কিনা। এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে পুনর্জ্জন্মের আবশ্যকতা কি? ইতিপূর্ব্বে "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশে ইহার উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি তাহা একটু বিস্তারিত ভাবে নিম্নে লিখিত হইতেছে। পাঠকের প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে ক্রমই সৃষ্টির প্রণালী। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আমাদের জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টির উদ্দেশ্যও যাহা, আমাদের জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যও তাহা, অর্থাৎ পরম পিতাতে তন্ময় হওয়া * কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন এক জন্মে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হয়? একথা সর্ব্ব-

* সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। উহার মধ্যেই এই ভাব নিহিত যে প্রত্যেক জীব ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মের গুণরাশির বিকাশ সাধন করিয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেকের জীবনই সাধনাময় মনে করিতে হইবে।

বাদিসম্মত যে সেইরূপ অবস্থা লাভ সর্ব্বদা সকল জীবনে ঘটিতে দেখা যায় না। সুতরাং পুনর্জ্জন্মের একান্ত আবশ্যকতা। যদি কেহ গভীর ভাবে অনুসন্ধান করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে এক জন্মে কেহই সেইরূপ তন্ময়তা লাভ করেন না। যে সকল মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই সেইরূপ পরমোন্নতি লাভ করেন, তাহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে তাহারা বহু জন্মের সাধনা দ্বারাই উক্ত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, এক জন্মে বা প্রথম জন্মে সেই উন্নতির ক্ষুদ্রাংশও লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার বহু জন্ম পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে পরলোকেই সেই উন্নতি সাধিত হইতে পারে, পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন কি? পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের পক্ষে পৃথিবীতে বহু প্রকার সাধনার সুযোগ বর্ত্তমান। কারণ, পৃথিবীতে প্রাপ্ত দেহ আমাদের পক্ষে আদিম এবং স্থূলতম দেহ এবং আদিম দেহে বহু প্রকার সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা, এস্থলে বাধাও যেমন অধিক, সেইরূপ বাধা উত্তীর্ণ হইবার সুযোগও অধিক। প্রত্যেক মণ্ডলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু পরলোকস্থ এক একটী মণ্ডল এক একটী বিশেষ সাধনার জন্য। অন্যান্য সাধনাও সেই সকল মণ্ডলে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে এক একটী গুণ সাধনার প্রধান স্থান। পৃথিবীতে আমরা বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও গুণের বিকাশ সাধন না করিয়া যাইতে হইলে পরলোকে যাইয়া সেই সকল গুণাভ্যাস কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, এমন কি কোন কোন গুণ সাধনার জন্য পারলৌকিক আত্মা বাধ্য হইয়া পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করেন। কারণ, আদিম দেহে সেই সকল গুণ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এস্থলে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রে যে কথিত আছে যে পুণ্যবান ব্যক্তি বহু বৎসর স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তাহা পাঠক স্মরণ করিবেন। ইহার অর্থ এই যে কোন এক ব্যক্তি সৎকর্ম্ম বা কোন কোন গুণের অল্পাভ্যাস দ্বারা

পরলোকে কিছু উন্নতি করিতে পারেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল গুণাভ্যাস করিলে পরলোকে ক্রমোন্নতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, যদি তাহার সেই সাধনা পৃথিবীতে না হইয়া থাকে, তবে তিনি পরলোকে কিছুকাল বাস করিয়া সেই সকল গুণ সাধনার জন্য পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অনন্ত উন্নতি সম্মুখে বর্ত্তমান। এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল করিতেছি। এক ব্যক্তি আবাল্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিতেছেন। তাহার নিষ্পাপ শরীর। যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুকুল অনেকটা দমনে রাখিয়াছেন। জ্ঞানও কিছু কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি যদি পরলোক গমন করেন, তবে পরলোকে তাহার কিছু দূর উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি প্রেম সাধনা ও সংসারে অবস্থিতির জন্য যে অভিজ্ঞতা লাভ ও অন্যান্য গুণ সাধনা হয়, (যথা প্রেম, সহিষ্ণুতা, নির্ভরতা প্রভৃতি) তাহা তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যদি সাধিত না হইয়া থাকে, এবং সেই সকল গুণের অভাবে তিনি যদি পরলোকে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে না পারেন, তবে সেই সকল গুণ সাধনা করিতে তাঁহার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আদিম দেহে অনেক প্রকারের গুণ সাধন অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে কিছু কাল তিনি পরলোকে উন্নত স্থানে থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কেন? আমাদের মনে হয় যে সকলেই পরলোকে যাইয়া ফিরিয়া আসেন না। পরলোকে থাকিয়াই পাপক্ষয় ও গুণোন্নতি সাধনের জন্য অনেকেই প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। যখন তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করেন, তখনই তিনি পাপক্ষয় ও গুণ সাধনার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। এস্থলে এই কথাটী আমাদের বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টা পৃথিবী এবং আমাদের আদিম দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া। ইহাতে যেমন বাধার আধিক্য, তেমনি উহাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার পন্থাও অধিকতর। "যত মুস্কিল, তত আছান" বাক্যটী পাঠক স্মরণ করিবেন। আমাদের আরও

মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীতে সকলেই শতায়ুঃ প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হইবার সাথে সাথেই পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কেহ বা বাল্যে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ়াবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন। তাহাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে কিছুই সাধনা হয় না। আর যদি কেহ শতবর্ষ ব্যাপী জীবনও যাপন করেন, তবুও তিনিই বা কতটুকু সাধনা করেন বা করিতে পারেন? আমরা বহু বৃদ্ধকে দেখিতে পাই যে তাহারা আত্মিক সাধনায় মোটেই অগ্রসর নহেন। সুতরাং একটী মাত্র জন্মে পৃথিবীতে সাধনীয়া ও বাঞ্ছনীয়া উন্নতি আমরা লাভ করিতে পারি না, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অত্যল্প কালের অত্যল্প সাধনার জন্যই পরম পিতা পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই। এই সামান্য তুচ্ছ সাধনার বিধান তিনি পরলোকেও করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে তাহার পৃথিবী সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে মানব বহু জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, নানা গুণে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইবেন, নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া নানা উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া নানা ঘাত প্রতিঘাতের আঘাত সহ্য করিয়া নানা গুণের বিকাশ সাধন করিবেন এবং পরিশেষে পরলোকে পরম পিতাতে একান্ত ভাবে নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিবেন, ইহাই তপৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য। পৃথিবীকে সাধারণে যেমন জ্বালা যন্ত্রণার, দুঃখ কষ্টের, লজ্জা অপমানের স্থান বলিয়া মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে উহা কেবল তাহাই নহে। যে স্থানে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধনা দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপালাভে বহু মহাপুরুষ অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার প্রেম ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, সেই পুণ্যভূমি, সেই সিদ্ধ পীঠ, আমাদের সকলের মাতৃভূমি পৃথিবী মানবের পক্ষে তুচ্ছ কালের (Negligible time-এর) অবস্থিতির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যেমন সুমহান্, পৃথিবীর সৃষ্টির উদ্দেশ্যও সেই একই সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুকূলেই। সুতরাং ইহাও অতি মহান্, অতি গভীর, অতি গম্ভীর। সুতরাং হাল্কা ভাবে পৃথিবী

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমাদের বিশেষ অপরাধ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা আদিম দেহ ধারণ করি। পরলোকে আমাদের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম দেহ ধারণ কবিতে হয়। এই আদিম-দেহ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে ইহাও সেই একই সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুকূলে। বিশ্বে এমন কিছুই সৃষ্ট হয় নাই. যাহা সেই উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে। আমাদের দেহ শত সহস্র বাধা দিতেছে সত্য, দেহের জন্য আমাদের নানাবিধ ভোগস্পৃহা বর্ত্তমান, আমাদের দেহ মন নানা ভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল বাধাও আমাদের নানাবিধ গুণের নানাবিধ বিকাশের জন্যই। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আমাদের আবার পরলোক হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় কেন এবং মৃত্যুর পর পরলোকেই বা কেন আত্মোন্নতি সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে পারি না, এই বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে এই সকল প্রশ্নের মূলে আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার ঐকান্তিকী অনিচ্ছা। অর্থাৎ wish is the father to the thought অনেকেই নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুতরাং এস্থানে ফিরিয়া আসিয়া জীবনযুদ্ধে পুনরায় নিযুক্ত হইতে তাহারা একান্তই নারাজ। এই অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কারণ, কেহই দুঃখ, সংগ্রাম প্রার্থনা করে না। সকলেই সুখ শান্তি চায়। তাহারা পরলোকের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে সম্পুর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলে যে দুঃখ অনিবার্য্য, তাহা তাহারা জানেন। তাই তাহারা এস্থানে ফিরিয়া আসিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু আমরা যদি একটুকুও চিন্তা করি, তবেই আমরা বুঝিতে পারিব যে আমাদের জীবনের গতি আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না। তাই কথা উঠিয়াছে Man proposes but God disposes. (মানুষ ভাবে এক, কিন্তু কার্য্যে হয় আর এক)। যাহারা জন্মান্তরবাদ

অস্বীকার করেন, তাহারা হয়তঃ মনে করেন যে মানবের একবার মাত্র জন্মই পরমপিতার অভিপ্রেত এবং তাঁহার মঙ্গল বিধানের অন্তর্গত, কিন্তু বিশ্বকে সমগ্র রূপে অথবা অধিকাংশরূপে ধারণা করিয়া যাহারা চিন্তা করিতে পারেন, তাহারা জানেন যে মানবের বারংবার জন্মগ্রহণই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। মানব পৃথিবীতে বারংবার আসা যাওয়া দ্বারাই তাহার জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিতে অধিক দূর অগ্রসর হয়। পরম পিতার মঙ্গল বিধান বুঝিতে আমাদের সর্ব্বদাই সমগ্র-ভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। নতুবা আমাদের সফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সর্ব্বোপরি পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষাই তাঁহার প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির একমাত্র কারণ এবং তাহা জীবনে জীবনে সংসাধিত হইবেই। ইতঃপর লিখিত "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব অংশে" আমরা এই সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে পারিব। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে জীবনের নানাবিধ অবস্থা ও অভিজ্ঞতা আমাদের গুণ সাধনার বিশেষ সহায়। আমাদের জীবনে যে গুণ লাভ করিতে হইবে, ইহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। একটী সদ্যজাত শিশু অথবা গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হইলে অথবা যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে পৃথিবীতে কি অভিজ্ঞতা বা গুণ অর্জ্জন করিলেন? আমাদের গুণ সাধনার জন্য নানা সুখ ও দুঃখের অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, নতুবা সেই সকল গুণ সাধনা সিদ্ধির অবস্থায় উপনীত হয় না। পৃথিবীতে যত প্রকার অবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা আমাদের উপকারার্থই। বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবীতে দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি দুঃখের ভিতর দিয়াই চলিয়া গেলেন, তাহার মুখে আর হাসি ফুটিল না। আবার কেহ বা নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াই জীবন যাপন করিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক মুর্খই রহিয়া গেল, আবার শতশতজন নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। কত শত শত ব্যক্তি ধন, জন ও নানাবিধ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিলেন, কেহ কেহ বা উক্ত

প্রকারের সুখ হইতে বঞ্চিতই রহিলেন। কেহ কেহ এক প্রকার সুস্থ শরীরে কাল কাটাইলেন কেহ কেহ বা চিররুগ্ন অবস্থায় জীবনাতিপাত করিলেন। কেহ কেহ পাপময় জীবন যাপন করিলেন, কেহ বা পুণ্য কর্ম্মদ্বারা নিজের জীবন ধন্য করিলেন। কেহ বা উপাসনা ও সাধনা বিমুখ হইয়া পতনের পর পতনের আঘাত সহ্য করিয়াই ম্লানমুখে পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন, আবার কেহ বা সাধন ভজন দ্বারা আত্মোন্নতিলাভে মহানন্দে জীবন যাপন করিলেন ও দেহান্তে পরমানন্দে পরম প্রেমময় পিতার নিত্য প্রেমক্রোড়ে নিত্য স্থান লাভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে মানবের পুনর্জন্ম আছে এবং তিনি জন্ম জন্মান্তরের নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করেন? নতুবা মানবে মানবে গুণ ও অবস্থা সম্বন্ধে এত বড় পার্থক্য কেন? কেহ সুখ, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, ধর্ম্ম লাভ করিলেন অন্যজন কেন তাহা হইতে বঞ্চিত রহিলেন? এইরূপ বৈষম্য ত অনন্ত ন্যায়বান, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত সমতাপূর্ণ পরমপিতার রাজ্যে সম্ভব নহে। ইহার একমাত্র মীমাংসাই এই যে মানব নানা জন্মে নানাবিধ অসংখ্য কার্য্য করে এবং উহাদের ফল ভোগ করে। উহাতে তাহার নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় ও ঐ অভিজ্ঞতা গুণ সাধনের পক্ষে তাহার বিশেষ সহায় হয়। আমাদের জন্মই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্যই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে সেই ভাবে অন্ততঃ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আমাদের এতখানি উন্নতি লাভ হইবে যে পৃথিবীর কর্ম্ম ও অভিজ্ঞতা আমাদের আর উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন হইবে না, পরলোকে অবস্থিতি করিয়াই জন্মের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব, সেই পর্য্যন্তই গুণোন্নতির জন্য আমাদের এস্থানে বারংবার ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু শিশুকালে বা যৌবনের প্রারম্ভে, এমন কি প্রৌঢ়াবস্থায়ও মৃত্যু হইলে একজন্মে সেই অভিজ্ঞতা ও গুণের উন্নতি কি প্রকারে লাভ করা যায়? ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে একটীমাত্র শতবর্ষব্যাপী জীবনেই বা মানব কতটুকু

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও গুণ সাধনা করিতে পারেন? অনেকেই যে উপযুক্ত সাধন ভজন করিতে পারেন না এবং পরম পিতাতে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন না, সে সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দিতে পারি। কেহ বলিতে পারেন যে খ্রীষ্টদেব ও শঙ্করাচার্য্য যৌবনে, শ্রীচৈতন্যদেব ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরাও বলি যে তাহা সত্য, কিন্তু সেই উন্নতি তাঁহারা একটিমাত্র জন্মে অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহাদেরও সেই উন্নতি তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনারই ফল। প্রথম জন্মেই অতি অল্প বয়সে কেহই তাঁহাদের মত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। আর তাঁহাদের মত মহাপুরুষ আমরা ঘরে ঘরে দেখিতেও পাইনা। প্রত্যেক মানবকেই বহু জন্মে উপযুক্ত রূপ উন্নতি লাভ করিতে হয়। অবশ্য এরূপ মানবও আছেন, যাহারা স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ভাবে পরিচালনা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জন্মে কৃতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু সেইরূপ সাধকের সংখ্যা অত্যল্প। তাঁহাদের পক্ষেও দুই একটী জন্মেই পৃথিবীতে থাকিয়া অত্যাবশ্যকীয় সাধনা শেষ করা অসম্ভব। আমরা সকলেই জানি যে একজন অসভ্য জাতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ মানব জাতির অধস্তন স্তরের একটী লোকের এবং উচ্চতম স্তরের এক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য অত্যধিক। প্রথম ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, কৃষ্টি প্রভৃতিতে অত্যন্ত নিম্নস্থান অধিকার করে। তাহাদের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাই তাহাদিগকে Criminal tribes পর্য্যন্তও বলা হয়। তাহাদের সাধন ভজনও অত্যন্ত নিম্নতম স্তরের। অপর দিকে উচ্চ স্তরের মানবের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৃষ্টি এবং সাধন ভজনে অগ্রসর হইবার যথেষ্ট সুবিধা লাভ করে। জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্মই পরম পিতার উপাসনা ও গুণ সাধনা। এই সকল কার্য্যে উচ্চস্তরের ব্যক্তির পক্ষে সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান থাকে। অন্য ব্যক্তি সাধন ভজনের প্রকৃত মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারে না, উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাধন ভজন করা ত দূরের কথা। মানবের একটিমাত্র জন্ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার

করিতে হইবে যে সেই জন্মের উপর মানবের কোনই হাত নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।* এখন প্রশ্ন হইবে যে একজন কেন সেই নিম্নতম স্তরে জন্মগ্রহণ করিল এবং প্রকৃত সাধন ভজন না করিয়াই দেহত্যাগ করিল। আবার অন্য ব্যক্তি কেন সুবিধা সুযোগ পূর্ণ স্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন। উভয়ই মানব বটে। তবে তাহাদের জীবনে এই পার্থক্য কেন? ইহার একমাত্র সুমীমাংসা এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রথমে জীবের নিম্নতম স্তরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং বারংবার ইতর জীব ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবের নিম্নতম স্তরে আগমন করিতে হইবে এবং মানব ভাবেও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া যথোপযুক্ত সাধন ভজন দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত স্তরে উত্থিত হইবে। যদি সকলের পক্ষেই এই একই বিধি হয়, তবে স্রষ্টার প্রতি কোন অসাম্য দোষ বা পক্ষপাতিতা অর্পিত হইতে পারে না। পরম পিতা সকলকেই সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে দান করিয়াছেন। মানব তাহার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার যতদূর করিবেন, তিনি জীবন পথে ততদূর অগ্রসর হইবেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পরম পিতা অনন্ত প্রেমময় এবং অনন্ত ন্যায়বান। সুতরাং তাঁহার সমতা গুণও অনন্ত। সুতরাং তাঁহাতে কোনই পক্ষপাতিত্ব দোষ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। একটী মাত্র জন্মেই কেহ মানব জন্মের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ যে পরমোন্নত মহাপুরুষ ছিলেন, সেই সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অতি অল্প লোকেই সন্দেহ করেন, যদিও একথা সত্য যে তাঁহার প্রতি আরোপিত পরমেশ্বরত্ব অনেকেই মানিয়া নিতে পারেন না। এই রূপ শক্তিশালী মহাপুরুষও যে জন্মজন্মান্তরে অত্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তাঁহার বহু জন্মের উল্লেখ আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। নিম্নলিখিত শ্লোক

* যাহারা মানবের পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করেন, তাহারা ইহাও স্বীকার করেন না যে ইতর জীবই ক্রমোন্নতির প্রণালীতে মানবভাবে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং একটী মাত্র জন্ম মানবের পক্ষে জীবভাবের জন্মের প্রথম ও শেষ অধ্যায়।

সমূহে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম ও সাধনার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। "বাসুদেবার্জ্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ। নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্ব্বদেবাবিতি শ্রুতঃ॥ অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ। এষঃ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ॥ নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্। এতৌ হি কর্ম্মণা লোকানশ্নুবাতেঽক্ষয়ান্ ধ্রুবান্। (মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব)।" "অর্থাৎ বাসুদেব এবং অর্জ্জুন মহারথ বীরদ্বয় সমাগত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে দ্যোতনাত্মক নরনারায়ণ পূর্ব্বদেব। এই মর্ত্ত্যলোকে ইঁহাদিগকে সুরাসুরগণসহকৃত দেবেন্দ্রও পরাজয় করিতে পারেন না। এই কৃষ্ণই সেই নারায়ণ, এবং এই অর্জ্জুনই সেই নর বলিয়া জানিবে। নারায়ণ ও নর একই সত্ত্ব কেবল দ্বিধাকৃত। ইঁহারা উভয়ে কর্ম্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।" "নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্। বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপোবর্ষাযুতান্ বহূন্॥ (মহাভারত-বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাত পর্ব্ব)।" "অর্থাৎ (মহাদেব বলিলেন) তুমি পূর্ব্বদেহে নর ছিলে, তখন নারায়ণ তোমার সহায় ছিলেন। তুমি নারায়ণের সহিত বদরিকা আশ্রমে বহু অযুতবর্ষ উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।" উপরোক্ত শ্লোক সমূহ দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে মহাপুরুষগণেরও বহু জন্মের কঠোর সাধনা দ্বারা পরমোন্নতি লাভ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও যে এই কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেন তাহা এই অংশের শিরোভাগে উদ্ধৃত শ্লোক হইতেও আমরা বুঝিতে পারি। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল। "জ্ঞানবান ব্যক্তি বহু জন্মের পর আমায় লাভ করিয়া থাকে। 'সমুদায় বাসুদেব' এইরূপ (জ্ঞানযুক্ত) মহাত্মা সুদুর্লভ।" অন্য একটী শ্লোকও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ (গীতা-৬।৪৫)।" "বঙ্গানুবাদ :—যে ব্যক্তি যত্ন সহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপ-বিমুক্ত হইয়াছে, সে ত অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়ই। (গৌর গোবিন্দ রায়)।" পার্থিব জীবনে আমরা

দেখিতে পাই যে আমরা যদি অর্জ্জন করি ও উপযুক্ত ভাবে তাহা সংরক্ষণ করি, তবে শেষ জীবন অপেক্ষাকৃত সুখে শান্তিতে কাটাইতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অর্জ্জন না করি অথবা অর্জ্জন করিয়াও তাহা অপব্যয় বা অমিতব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত হই, তবে শেষ জীবনে দুঃখ ত অনেক সময় অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তৎপর? সুতরাং পরলোকে তাহাদের উন্নতির আশা কোথায়? পাপ ও দোষে লিপ্ত পারলৌকিক আত্মা ক্লেশময় স্থানে থাকে, উন্নত অবস্থা ভিন্ন পরলোকে সুখময় স্থানে যাওয়া যায় না এবং গুণ সাধনায় অগ্রসর না হইলে কেহ ক্রমশঃ উন্নততর লোকে উত্থিত হন না। সুতরাং উন্নতি লাভার্থ আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। মানববর্গের মধ্যে অনেকেই মোহমুগ্ধ (যাহারা মোহ হইতে মুক্ত, তাহাদের কথা আমরা বলিতেছি না।) সুতরাং বাসনা কামনার অধীন। পার্থিব জীবনে এই বাসনা কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা অনবরত শত শত কার্য্য করিতেছি। এক বাসনা পূর্ণ না হইতে অন্য বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া আবার কত কার্য্য করিতেছি, কিন্তু তবুও কি আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হয়? অথচ আধ্যাত্মিক সাধনার অভাবে সেই বাসনা কামনার হস্ত হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাসনা কামনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায় উহাদের সম্ভোগ এবং উপাসনা ও সাধনার দ্বারা দোষ পাশের লয়। সাধারণ মানব কোন কোন কামনার বিষয় অতিরিক্ত সম্ভোগ করে, আবার বহু কামনার বিষয় সম্ভোগের সুযোগই লাভ করে না। কেহ কেহ বা কোন কোন কামনার বিষয় অল্পই সম্ভোগ করে। সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে সেই সেই কামনা থাকিয়া যায়। সময় সময় এই সকল অতৃপ্তা বাসনা কামনা অত্যন্ত বলবতী অবস্থায়ই থাকিয়াই যায় অথবা উক্ত অবস্থাতেই মানব দেহ ত্যাগ করে এবং কামনা ভারগ্রস্থ মন লইয়াই পরলোকে গমন করে। কামনা হইতে মুক্ত হইবার উপযুক্ত সাধনা তাহার না থাকায় সে পরলোকে যাইয়াও সেই সকল

বাসনা দ্বারা জর্জ্জরিত থাকে। সে স্থানে তাহার অতৃপ্তা বাসনার পরিতৃপ্তি লাভের কোনই উপায় নাই, সুতরাং তাহার অপূর্ণা আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কামনার মূলে যাহা অর্থাৎ রজোগুণ, তাহা তাহাকে পুনরায় যে স্থানে সে কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে, সেই স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে লইয়া আসে। কারণ, পরলোকে ক্রমোন্নতির সম্বল রূপ ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা তাহার নাই, সে উপরেও উঠিতে পারিতেছে না, যে স্থানে গিয়াছে, তাহাও তাহার পক্ষে নিজ অবনতি, পাপ ও দোষের জন্য ক্লেশকর, অধিকন্তু তাহার হৃদয়ে বাসনা কামনার আগুণ প্রজ্জ্বলিত, তখন তাহার অনন্যোপায় হইয়া পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ, এই স্থানে বাসনা কামনা পূর্ণ করিবার ও তজ্জন্য তথাকথিত সুখভোগ করিবার আশা সে হৃদয়ে পোষণ করে।* এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠক দেখিবেন। উহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব অধিক পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (গীতা ৮।৬)।" "বঙ্গানুবাদ :—যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া সে সেই ভাবই লাভ করিয়া থাকে। (গৌর গোবিন্দ রায়)।" "সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈ-র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম। কর্ম্মানুগানানুক্রমেন দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-৫।১১)।" "বঙ্গানুবাদ :—দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা সঙ্কল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহের বশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরে পরে নানাস্থানে আপন কর্ম্মানুযায়ী রূপ এবং অন্ন ও জল সেচন দ্বারা নিজের বৃদ্ধি ও জন্ম পরিগ্রহণ করে। (তত্ত্বভূষণ)।" "স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা, পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈতেষু স্থানেষু

* পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে নানা মানব নানাবিধ গতিতে জীবন পরিচালনা করে। সুতরাং পরলোকেও যদি তাহারা বিভিন্নভাবে জীবন যাপন করে বলা হয়, তবে কিছু অযৌক্তিক বলা হইল না। সুতরাং তাহারা নানা কারণে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা যাইতে পারে।

প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্। (কৌষীতকী উপনিষদ ১ম অধ্যায়)।" বঙ্গানুবাদ :—সে নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীট. পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, সর্প বা মনুষ্য এই সকল দেহে এই লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য :—মানুষ যে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, সর্প প্রভৃতি রূপে সর্ব্বদা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুনর্জন্ম গ্রহণের একটী প্রধান কারণ পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি সাধন। পশুপক্ষী ভাবে জন্মিলে তাহার সেই উদ্দেশ্য কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? পশু জীবনে যাহা লাভ করিবার আছে, তাহা লাভ করিয়াই ত জীব মানব জন্ম লাভ করিয়াছে। যদি ধরা যায় যে সে বাসনা কামনা দ্বারা বাধ্য হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, তবুও বলিতে হইবে যে বাসনা কামনার পূর্ণ করিতেও তাহার মনুষ্য দেহই যথেষ্ট। কারণ, সেই দেহেই তাহার কামনার উৎপত্তি ও সেইরূপ দেহ দ্বারাই তাহা পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। এস্থলে একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। তাহা এই যে কোন হতভাগ্য ব্যক্তি অভিশপ্ত হইয়া ইতর জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, অথবা অত্যন্ত দুরদৃষ্ট বশতঃ যদি কাহারও এরূপ কুবাসনা অথবা ভীষণা হিংসা বলবতী হয় যে তাহা পশু প্রভৃতির দেহেই চরিতার্থতা সম্ভব, এবং মনুষ্য দেহে অসম্ভব, তবে তাহার সেই ভাবে জন্ম হইতে পারে। কিন্তু উক্ত দুই অবস্থা বিশেষতঃ দ্বিতীয়া অবস্থা এতই কদাচিৎ ঘটে যে উহা সাধারণ বিধির অন্তর্গত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে বলিতে হয় যে That will be an exception but not the rule and exception only proves the rule.

"তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিংচেহ করোত্যয়ম্ তস্মা-ল্লোকাৎপুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি নু কাময়মানঃ (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—৪।৪।৬)।" "বঙ্গানুবাদ :—সেই বিষয়ে এই শ্লোক আছে। পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই

বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মসহ সেই দিকে গমন করে।
এই লোকে পুরুষ যে কর্ম্ম করে, সে (স্বর্গাদিলোকে) তাহার ফল লাভ করিয়া সেই (স্বর্গাদি) লোক হইতে এই কর্ম্ম-লোকে পুনরায় আগমন করে। কামনাবান্ পুরুষের বিষয়ে (এই প্রকার)। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" আমরা যদি একটু বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব যে এক একজন যেন স্বাভাবিক ভাবেই কোন কোন বিষয়ে উন্নতি করিতেছে, তাহার যেন কোনরূপ বেগ পাইতে হইতেছে না, অনায়াসেই যেন সেই সেই বিষয়ে তিনি সিদ্ধির দিকে ছুটিতেছেন। আবার কেহ কেহ যেন শত চেষ্টা করিয়াও সেইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ বলেন যে যাহাদের সহজেই উন্নতি হয়, তাহারা পূর্ব্ব জন্মের সাধনার জন্য ঐ ঐ কার্য্যে অধিকতর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নলিখিত উক্তি সকল হইতে এই ভাব সমর্থিত হইবে। "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্। (পতঞ্জলিঃ)।" "অর্থাৎ পতঞ্জলি বলেন যে, চিত্তস্থ সংস্কারগুলির জ্ঞানে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়।" "জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দান মধ্যয়নংতপঃ। তেনৈবাভ্যাস-যোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ।। ইতি পূর্ব্বাচার্য্যাঃ।" "অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যে অভ্যাস করা হইয়াছে, সেই অভ্যাস যোগেই মানব তাহাই অভ্যাস করে।" পূজনীয় বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে "মনুষ্যত্বেন তুল্যত্বেঽপি প্রজ্ঞা-মেধা-প্রকর্ষ-নিকর্ষভেদ-দর্শনাৎ প্রাগ্ ভবীয়াভ্যাস কল্পনা।" "অর্থাৎ মনুষ্যত্ব রূপে সমান হইলেও প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ-অপকর্ষ জন্য ভেদদর্শনে প্রাক্তন অভ্যাস অনুমিত হইতে পারে। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)।" কেহ কেহ বলেন যে ঐরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ মানবের পিতৃপুরুষগণের গুণ ও দোষ জন্য মাত্র। Law of heredity অনুসারে সংস্কারের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ ও দোষ সন্তানে কিছু পরিমাণে বর্ত্তে বটে; কিন্তু তাহাই সন্তানের উন্নতির বা অবনতির একমাত্র কারণ নহে। Law of heredity যদি মানবের একমাত্র কারণই হইত, তবে একই মাতা পিতার

সন্তানদিগের মধ্যে এতদূর পার্থক্য কেন? নেপোলিয়ান জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু অনেকে তাহার সহোদর ভ্রাতাদের নাম পর্য্যন্তও জানেন না। আমরা প্রত্যেক্ষ করিয়াছি যে দুইটি যমজ ভ্রাতার মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য থাকে। Siamese twin দের মধ্যেও ব্যবহার ও মনের ভাব যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে উহাদের মধ্যেও পার্থক্য বর্ত্তমান। যদি heredityই মানব স্বভাবের একমাত্র কারণ হইত, তবে যমজ ভ্রাতাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য থাকিতে পারিত না। কারণ তাহাদের উভয়েরই দেহ একই কালে একই শুক্র শোণিতের উপাদানে গঠিত এবং গর্ভবাস কালীন একই রসে পরিপুষ্ট। সহোদর সহোদরা দিগের সম্বন্ধে বরং বলা যাইতে পারে যে তাহারা মাতাপিতার বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন, যদিও সেই যুক্তি দুর্ব্বল, কারণ সেই সামান্য কারণেই তাহাদিগের মধ্যে এতদূর পার্থক্য, এমন কি সময় সময় ঘোরতর শত্রুতা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু যমজ ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ যুক্তিও প্রদর্শিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম জগতে পরমোন্নত ব্যক্তিগণের সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। আবার বিপরীত ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সেই সকল সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মাতাপিতাও অখ্যাত। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধ্রুবের মাতাপিতা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কখনই তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারেন না। আবার রাণা প্রতাপের পুত্র রাণা অমর সিংহ এবং আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের কথা পাঠক চিন্তা করুন। এইরূপ ইতিহাস খ্যাত শত শত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত বর্তমান, যাহাতে দেখা যায় যে মাতাপিতা উন্নত, কিন্তু সন্তান হীন ভাবাপন্ন। আবার বিপরীত ভাবেরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। অর্থাৎ মাতাপিতা হীনভাবাপন্ন, কিন্তু সন্তান উন্নত। সহোদর সহোদরাদিগের মধ্যে আত্যান্তিক প্রভেদের দৃষ্টান্তের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। সুতরাং একমাত্র Law of Heredity দ্বারা মানবের উন্নতি বা অবনতির মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে

করিতে পারা যায় না। ইহার পশ্চাতে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত সংস্কার অধিক পরিমাণে কার্য্য করে, তাহা সুনিশ্চিত। যদি একমাত্র মাতাপিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের দেহের গুণ ও দোষের জন্য আমরা যাহা তাহাই হইতাম, তবে আত্মার স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব বলিয়া কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে মানব যেন পূর্ব্বজনদিগের মিশ্রিত প্রতিকৃতি বিশেষ হইত। সে পূর্ব্বলব্ধ দোষ গুণ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকিত। কিন্তু আমরা জগতে কি দেখিতে পাই? দেখিতেছি যে মানব মাতাপিতা প্রভৃতি হইতে কখন কখন উন্নত, আবার কখন কখন অবনত। দেখিতেছি যে সন্তান সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উহাকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে। আবার অখ্যাত ও দোষদুষ্ট মাতাপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ সেই বংশকে উজ্জ্বল করিতেছেন। মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে মানবের উন্নতি ও অবনতির কারণ আত্মার স্বাধীনতা, পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম এবং তজ্জনিত সংস্কার, পিতৃপুরুষগণের দোষ গুণ, পারিপার্শ্বিক নানারূপ অবস্থা, সংসর্গ ও জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি। Law of heredity ই যদি মানবের ভাল-মন্দের একমাত্র পরিমাপক যন্ত্র হইত, তবে তাহাকে জড় পদার্থ বলিলেও আপত্তির বিশেষ কোন কারণ থাকে না। আমাদের মনে হয় যে জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে উক্তরূপ যুক্তি জড়বাদেরই নামান্তর মাত্র। ইহার পরেও প্রশ্ন হইতে পারে যে মানব পূর্ব্বপুরুগগণের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা তিনি উন্নত বা অবনত হন। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের কথা উত্থাপনের আবশ্যকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক সেই সমস্ত আলোচনা স্মরণ করিবেন। যদি পূর্ব্বজন্ম স্বীকৃত না হয়, তবে প্রত্যেক মানব যে গৃহে জন্মে, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। পরম পিতার ইচ্ছায় তাহাকে সেই ভাবেই জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, জন্মের উপর তাহার কোনই হাত নাই। আবার দেখা যায় যে একজন উন্নত মাতাপিতার

গৃহে জন্মিল, অপর জন অবনত মাতাপিতার গৃহে আগমন করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কেন পাপ ও দোষরাশির বোঝা মস্তকে বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিল এবং প্রথম জন কেন নিষ্কলঙ্ক ভাবে ভূমিষ্ঠ হইল? এই প্রভেদের জন্য এক একজনের জীবন কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা সকলেই জানেন। কেবল তাহাই নহে, এক এক গৃহের পারিপার্শ্বিক হাওয়ারও কত পার্থক্য? সুতরাং জীবন বিভিন্ন গতিতে পরিচালিত হয়। যদি এক জন্মেই পার্থিব জীবন শেষ হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির অধঃপতিত জীবনই থাকিয়া যায়, যে অধঃ-পতিত জীবনের জন্য সে মোটেই দায়ী নহে। কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে বলিতে পারা যায় যেসে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী নূতন জীবন ধারণ করিয়াছে। আবার তাহার অধঃপতনই শেষ পরিণতি, ইহা ভাবিবারও কোনই প্রয়োজন নাই। তাহারও আশা আছে যে সে পুনর্জন্মে কিংবা দুই তিন জন্মে তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে, আবার সে উন্নত শিরে জগতে দাড়াইতে পারিবে। পৃথিবীতে যে সকল সাধনা একান্ত আবশ্যক, তাহা যে পরলোকে সম্ভব হয়না এবং অধঃপতিত ব্যক্তির পক্ষে পরলোকে থাকিয়াই আত্মোন্নতি সাধন যে সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অধঃপতিতের সকল অভাব পরলোকে পূর্ণ হয়না এবং ইহার জন্যই তাহার পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। স্থূল, মানুষের উন্নতি বা অবনতির যে কারণগুলি ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন একটী বাদ দিলে সত্য মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। পাঠক মনে রাখিবেন যে আমরা ইহা বলিতেছিনা যে পুনর্জন্মই অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই মানবের উন্নতি বা অবনতির একমাত্র কারণ। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা একটী প্রধান কারণ। ৭১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গীতার ৬।৪১-৪২ শ্লোকদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ "শুচি শ্রীসম্পন্ন" লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে উন্নত ব্যক্তি সাধারণতঃ সেইরূপ অথবা ততোঽধিক উন্নত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাই

ত স্বাভাবিক। কারণ, তিনি তাহাতে তাঁহার সাধনার অনুকূল অবস্থা লাভ করিবেন ও সাধনার বিরোধী অবস্থা সকল সেইজন্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে পারলৌকিক আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন একটী উদ্দেশ্য লইয়া। সুতরাং তিনি যে গৃহে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সাহায্য পাইবেন, সেই স্থানে তিনি আসিবেন। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সাধারণতঃ আত্মার উন্নতি অনুসারে উন্নত বা অবনত মাতাপিতার গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মানবের জন্ম একটী দৈব ঘটনা বা আকস্মিক ব্যাপার (Chance or accidental) নহে। ইহার পশ্চাতে এত অধিক কারণ বর্তমান যে তাহাদের অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত। তাই আমরা উহার সামান্য আভাস মাত্র দিয়াছি। কেহ কেহ বলেন যে (১) "মানবের পূর্ব্বজন্ম যদি থাকে, তবে উহার কোন কোন বিষয় ত আমাদের স্মৃতিতে থাকে না কেন?" (২) "পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয় যখন আমাদের স্মৃতিতে থাকেনা, তখন সেই জন্মের কর্ম্মের জন্য আমাদের শাস্তিভোগ কেন?" ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আমরা এক জীবনের কথা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে আমরা যৌবনে বাল্যের অনেক বিষয়, প্রৌঢ়াবস্থায় বাল্য ও যৌবনের বহু বিষয়, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পূর্ব্ব তিন অবস্থার নানা বিষয় একেবারেই ভুলিয়া যাই। কোন কোন বৃদ্ধের এমন অবস্থা হয় যে মনে হয় যেন তাহার স্মৃতিশক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা স্মরণ করিতে পারি না। আবার কাহাকেও দুই চারি দিন পূর্ব্বের কোন ঘটনা সবিস্তারে (with full details) বর্ণনা করিতে বলিলে সে তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে বলিতে পারিবেনা। কেহ কেহ আছেন, যাহারা অল্প কালের মধ্যেই সকলই ভুলিয়া যান, আবার কেহ কেহ গত ঘটনাগুলি অথবা পঠিত পুস্তকের উক্তি সকল অধিককাল মনে রাখিতে পারেন। মানবের মধ্যে আবার এরূপ লোকও আছেন, যাহারা অত্যধিক

ভাবে স্মৃতিশক্তিহীন, আবার শোনা যায় যে শ্রুতিধর পণ্ডিতও আছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে স্মৃতিরূপ জ্ঞানের অংশ যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ মস্তিষ্ক (যাহা অন্তঃকরণের যন্ত্র মাত্র) সকলের পক্ষে সমান নহে। সেই জন্যই সকলের সমান স্মৃতি থাকে না। এবং কেহই এতবড় মস্তিষ্কশালী নহেন যে তাহার বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্তের সমুদায় ঘটনা হুবহু স্মৃতিতে থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেহেরই এমন গঠন যে বিস্মৃতি অনিবার্য্য। এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় যদি আলোচনা করা যায়, একটী জীবন যতই দীর্ঘ হউক না কেন, তাহা কাল হিসাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাগুলির কাল হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী। কারণ, পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে পরলোক বাসের কালও গণনা করিতে হইবে। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে কতকাল আবশ্যক হয়, তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আত্মাদিগের ইচ্ছানুযায়ী যখন জন্ম, তখন এক একজনের এক এক রূপ কাল। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলির অধিকাংশ বোধ হয় আত্মা পরলোকে থাকিতে থাকিতেই ভুলিয়া যান। তৎপর তিনি জন্মগ্রহণ করেন সম্পূর্ণ নূতন দেহে অর্থাৎ যে দেহের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই সে নূতন দেহে আসিয়া পূর্ব্ব জন্মের সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, নূতন দেহ তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরণের সাহায্য করে না। বরং নূতন দেহের গঠনই এমনি হয় যে তাহাতে পূর্ব্বস্মৃতি আসিবার বাধা উৎপাদন করে। নূতন দেহ তাহার পক্ষে একটী নূতন পাশভাবে কার্য্য করে। জীব যতদিন দোষপাশের রজস্তমঃ অংশ লয় করিয়া শিবত্ব লাভ না করিবেন, ততদিন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ করা সুকঠিন। তবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ যে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে পারেন বলিয়া শুনা যায়, তাহার কারণ সেই সকল ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ সাধনা ও তাহাদের বর্ত্তমান দেহের বিশেষ প্রকার গঠন। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কোন জন্মের কোন ঘটনা আমাদের জ্ঞান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তাহা নানা

কারণে আবৃত থাকে মাত্র। সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই আমাদের গত জীবন আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আত্মা যতদিন জড় ভাবে জর্জ্জরিত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞান প্রকাশের জন্য তাহার জড়ীয় দেহের শক্তির সীমার উপরই নির্ভর করিতে হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ যে আত্মার যন্ত্র মাত্র, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। যন্ত্র যদি অপটু হয়, তবে সেই যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন ফলও অসম্পূর্ণ হইবে, ইহা সহজবোধ্য। এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" অংশ দ্রষ্টব্য। দেহে আত্মা আছেন, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায়না। এই যে নূতন দেহের সহিত আমাদের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে বিস্মৃতি বিজড়িত, ইহাতেও অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কারণ, পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি যদি আমরা হুবহু এ জন্মে শিবত্ব লাভের পূর্ব্বেই জানিতে পারিতাম, অথবা সেই সকল স্মৃতিই আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিত, তবে উহারা আমাদিগকে সৎপথে পরিচালনা না করিয়া অসৎ পথেই লইয়া যাইত। মানবের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের মন্দ বিষয়ের স্মৃতি তাহাদিগের মন কলুষিত করে এবং উহার বারংবার চিন্তায় তাহাদের কুপথে গতি হয়। আবার আমরা যে সকল সৎকার্য্য করি, উহার স্মৃতিতেও বারংবার আলোচনায় আমাদের হৃদয়ে অহংকারই আনয়ন করে, এবং সেইজন্য বহু দোষের উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানে ভারতে কেহ কেহ আছেন যাহারা ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা বলিয়াই নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন এবং অহংকারজনিত মনের তৃপ্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত কিন্তু সেই পূর্ব্ব গৌরবের উদ্ধার সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি দ্বারাই আমরা সর্ব্বদা লাভবান হইতে পারি না। এক একজনের কর্ম্মদোষে এমন এক এক কুসংস্কার জন্মে, যে সে কিছুতেই উহার হাত হইতে এড়াইতে পারে না এবং সেই জন্য সে উন্নতির পথে বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরজন্মেও যদি সেই স্মৃতি আমাদিগের সেই সকল কুকার্য্য ও উহার ফল স্বরূপ কুভাব সুস্পষ্টভাবে স্মৃতিপথে

জাগরিত থাকিত, তবে আমরা উহাদের হাত হইতে জন্ম জন্মান্তরেও রক্ষা পাইতাম না। তাহাতে আমাদের দুর্দ্দশার মাত্রা কতদূর বৃদ্ধি পাইত, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। প্রত্যেক উন্নত সাধকই জানেন যে তিনি সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন যে তাহার জীবনের যাহা কিছু খারাপ, তাহা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাউক্। আমাদেব পূর্ব্বোক্তি দ্বারা কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে আমরা বলিতেছি যে পূর্ব্বস্মৃতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালেই সকলের পক্ষে অনিষ্টকারী। তবে এই মাত্র মোটামুটীভাবে বলা যায় যে পূর্ব্বজন্মের কু এবং সু কার্য্যের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিলে আমাদের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিকতর হইত। তাই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন। নূতন জন্মে যেন আমরা অতীতের স্মৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া যতদূর সম্ভব নূতন জীবন আরম্ভ করি। ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সাথের সাথী হইয়াই থাকিবে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার দ্বারা কুসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া এবং সুসংস্কারকে আরও দৃঢ় করিয়া জীবন পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এস্থলে অমর কবি Longfellow এর Psam of Life হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি পাঠক দৃষ্টিপাত করিবেন।

"Trust no future however pleasant,
Let the dead past bury its dead,
Act, act in the living present,
Heart within and God o'er head."

"বঙ্গানুবাদ :—ভবিষ্যৎ যতই আনন্দজনক হউক না কেন, উহাকে বিশ্বাস করিও না। মৃত অতীত অতীতকে কবরস্থ করুক। (অর্থাৎ অতীত সম্বন্ধে কোন ভাবনা ভাবিও না।) হৃদয়ে, অন্তরে এবং মস্তকোপরি পরমেশ্বর, ইহা চিন্তা করিয়া জীবন্ত বর্ত্তমানে কার্য্য করিতে থাক।" ইহা যদি বর্ত্তমানে জীবনের অতীত অংশ সম্বন্ধে সত্য হয়, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে যে উহা আরও সত্য, তাহা সুনিশ্চিতভাবে

বলা যাইতে পারে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটী সম-অর্থ-সূচক গানের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। "যে দিন গেছে তোমা বিনা, তারে আর ফিরে চাহি না, যাক্ সে ধুলাতে। এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে, যেন জাগি অহরহ।" ভক্ত মনোমোহন গাহিয়াছেন:—"অতীতে ভাবিয়া রহিলে পড়িয়া শক্তি কি জাগিবে প্রাণে? সম্মুখে চাহিয়ে ব্রহ্মনাম নিয়ে ছুটে চল তাঁর পানে।" সংস্কৃত উক্তি আছে:—"গতস্য শোচনা নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।" উপরোক্তি সমূহ হইতে আমরা বুঝিলাম যে জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে বর্ত্তমান জীবনের অতীত বিষয় নিয়া অধিক চিন্তা অকর্ত্তব্য। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক নহে। তাই অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা তাহা বিস্মৃতির আবরণে ঢাকিয়া রাখিবার বিধান করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রথমতঃই বলা যাইতে পারে যে ইহা অত্যন্ত খেলো প্রশ্ন। কর্ম্ম করিব, অথচ উহা ভুলিব বলিয়াই আমাতে উহার ফল ফলিবে না, ইহা যে নিতান্তই অযৌক্তিক, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, আমরা এই সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ইহা আমাদের জীবনেও প্রত্যক্ষ করিতে পারি যে কর্ম্ম আমাদের স্মৃতিতে থাকুক্ আর নাই থাকুক, কর্ম্মফল লাভ আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য। একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝিতে পারা যায়। এরূপ সময় সময় হয় যে আমাদের দেহের কোনও স্থানে একটী আঘাত পাই, কিন্তু সেই আঘাত জন্য তখন কোন বেদনা অনুভব করি না, অথবা অন্য ভাবে মন নিবিষ্ট থাকায় উহার সম্বন্ধে একেবারেই ভুলিয়া যাই। কিন্তু কিছু সময় পরে (কখন কখন অধিককাল পরে) সেই স্থানে বেদনা অনুভব করি। অনেকে যৌবনে কুসংসর্গে মিশিয়া আহার বিহার দ্বারা শরীরের উপর অত্যাচার করে। যদি সেইরূপ কুক্রিয়াসক্ত কোন ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃই খুব বলিষ্ঠ থাকে, তবে তখন সে সেই অত্যাচারের ফল বুঝিতে পারেনা। কিন্তু প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ বয়সে সে ইহার ফল

ভোগ করে। তখন কি তাহার সকল কুকর্ম্মই স্মৃতিতে জাগরিত থাকে? কখনই নহে। কিন্তু ইহার জন্য তাহার দুর্ভোগের ইতর বিশেষ হয়না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম্ম করিয়া ভুলিয়া গেলেও আমাদের ফল ভোগ করিতে হয়। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা Privy Council এ শেষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ভাওয়ালের রাজকুমার প্রায় দ্বাদশবর্ষ নিজের পূর্ব্ব জীবন ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু সেইজন্য কি তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল সেই সময় তাহার ভোগ করিতে হয় নাই? এইরূপ নিজের পূর্ব্ব জীবন একেবারে ভুলিয়া যাওয়া কদাচিৎ হইলেও অসম্ভব নহে। চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলেন যে ঐরূপ বিস্মৃতি ঘটিতে পারে. আবার কোন কারণবশতঃ স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে আমাদের উন্নত অবস্থায় অর্থাৎ যখন তমঃ এবং রজঃ লয় প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও ফিরিয়া আসিতে পারে। আবার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি না থাকার সর্ব্ব প্রধান কারণ দেহ। পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম দ্বারা যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, তাহা হইতে সংস্কার জন্মে ও তাহা আমাদের সাথের সাথী হয় এবং পরজন্মে আমাদের জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে একটী বিশেষ কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং পরজন্মে সেই সংস্কার প্রসূত সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফল যে আমরা ভোগ করিবই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অবশ্য স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা দ্বারা কুপথের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া সুপথে চালনা করা যাইতে পারে এবং উন্নত জীবনে তাহাই করা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নকর্ত্তা ইহাও বলিয়া থাকেন যে ভগবদ্দত্ত শাস্তির উদ্দেশ্য অবশ্যই সংশোধন। পরমপিতা অবশ্যই আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্যই শাস্তি দেন না। অর্থাৎ তদ্দত্ত শাস্তি Reformative but not punitive যদি তাহাই হয়, তবে অপরাধ সম্বন্ধে অপরাধীর অজ্ঞানতা থাকিলে সেই শাস্তির সার্থকতা কোথায়? ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলেই ইহার উত্তর আমরা পাইতে পারি। এই বিষয়টী সম্বন্ধে

আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাউক্। তর্কস্থলে ধরা যাউক্ যে আমাদের পুনর্জন্ম নাই। মানবজন্ম একবার মাত্র হয়। আমাদের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বর কর্ম্মফলদাতা। যদি প্রশ্নকর্ত্তার আপত্তি গ্রহণ করা যায়, তবে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যেক শাস্তির কারণ আমরা জানিতে পারিতাম। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে কারণ সমূহ প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু তাহাতে শাস্তি ভোগের কোনই তারতম্য হয় না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে সকল শারীরিক রোগ হয়, উহাদের সত্য কারণ আমরা বহু সময়েই নির্দ্দেশ করিতে পারি না। চিকিৎসকগণও ইহাতে বহু সময় অকৃতকার্য্য হন। কোন কোন সময় Postmortem diagnosise হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ বা রোগিগণই যখন শারীরিক ব্যাধির কারণই নির্ণয় করিতে পারেন না, তখন আমরা যে অন্যবিধ নানারূপ শাস্তি পাই, তাহার কারণ যে অজ্ঞাত থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতপক্ষে সেই সকল কারণ বর্ত্তমান জীবনে প্রায়ই অজ্ঞাত থাকে, যদিও তাহাতে শাস্তি ভোগের কোনই ত্রুটী হয় না। সুতরাং একবার মাত্র মানব জন্ম স্বীকার করিয়াও আমরা দেখিতে পাইলাম যে শাস্তি আমাদের নিকট আসে বটে, কিন্তু কারণ বহু সময়েই অজ্ঞাত থাকে। যদি বর্তমান জীবন সম্বন্ধেই ইহা সত্য হয়, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের জন্য শাস্তি যখন আমরা বর্ত্তমান জন্মে ভোগ করি, তখন যে উহার কারণ আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এস্থলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে প্রশ্নকর্ত্তা যদি চিন্তাশীল হন, তবে তিনি শাস্তির সম্পূর্ণ কারণ না জানিতে পারিলেও তাহার বর্ত্তমান জীবনের সংস্কার ও গতিদ্বারা বর্তমান জীবনে প্রাপ্ত শাস্তির কারণ অনুমান করিতে পারেন, সেই পাপ পূর্ব্বজন্মকৃতই হউক্ অথবা বর্ত্তমান জীবনেই সংঘটিত হউক্। আর সাধনার উন্নত অবস্থায় যে ক্রমশঃ সকল কারণ জানিতে পারা যায়; তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, ইহা

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ বলেন যে মানবগণ মৃত্যুর পর Day of Judgement (শেষ বিচারের দিনের) জন্য অপেক্ষা করেন। সেই দিনে মৃতদিগের মধ্যে কতক জনকে স্বর্গে নেওয়া হয় ও কতক জনকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করা হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মের মতে খ্রীষ্টদেবকে যিনি স্বীকার করেন না, তাহারই উক্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। ব্যবহারিক ভাবে (formally) খৃষ্টান হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায়, এইরূপ উক্তি অনেকেই সমর্থন করিবেন না। তবে প্রকৃত খৃষ্টান হইতে পারিলে অর্থাৎ প্রকৃতভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে যে স্বর্গে গমন করা যায়, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এখন ধর্ম্ম বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক্। অর্থাৎ "মানব একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে ও তাহার মানব জন্মের কর্ম্ম অনুযায়ী সে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ করে," এইমত কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা দেখা যাউক্। এমন কোটী কোটী নরনারী আছেন যাহারা শৈশবেই মানবলীলা সংবরণ করেন। সেই অবস্থায় তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ মোটেই হয়না। পাপ ও পুণ্য যে কি বস্তু, তাহাও তাহারা জানিতে পারে না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, মোক্ষ ও বন্ধন যে কি, তাহা তাহাদের জ্ঞানগম্য হওয়া ত দূরের কথা। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বর্গ বা নরক কোন ব্যবস্থাই হওয়া বিধেয় নহে। কারণ, সেই সকল নরনারী জীবনে সজ্ঞানে পাপ-পুণ্যের কোনই ধার ধারে নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মানব একটী জন্মে অতি অল্প অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও গুণ সাধনা করিতে পারেন। ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে মুক্তি অথবা ব্রহ্মে তন্ময়তার, নির্ব্বাণ বা লয়ের আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা যে কেহই একটীমাত্র জন্মে প্রাপ্ত হইবে, ইহা ধারণা করাও অসম্ভব। পরমোন্নত সাধকগণও যে বহু জন্মে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি যে অনেকেই নানা পাপে পাপী ও নানা দোষে দুষ্ট এবং সেই অবস্থা নিয়াই তাহারা দেহত্যাগ করেন। সুতরাং যদি এই এক জন্মের

কর্ম্মের জন্যই মানবের শেষ বিচার হয়, তবে কোটীর মধ্যে একজন সেই অনন্ত নরকের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে কি কোটীর মধ্যে একজনের সুখের নিমিত্ত এই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, আর অন্য সকলের জন্য অনন্ত নরক বা Eternal perdition এর ব্যবস্থা? তাহা কখনও হইতে পারে না। অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেমরাজ্যে অনন্ত নরকের বিধান হইতেই পারে না। ইহা সহজ বোধ্যও বটে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে এই সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা যিনি, তিনি অনন্ত প্রেমময় ও অনন্ত মঙ্গল-ময় এবং প্রেমই সৃষ্টির কারণ। ইহাতে ক্রমশঃ সুখের বিধান। আমাদের দুঃখের অবস্থা কয়েকটী মণ্ডল পার হইলেই দূরীভূত হয়, কিন্তু অনন্ত প্রায় মণ্ডল আমাদের অনন্ত সুখের বিধানের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা যতই উন্নত হইব, ততই স্থূল সুখের কামনা আমাদের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইবে। এখন পাঠক বিবেচনা করিবেন যে মানবের একমাত্র জন্ম যুক্তিযুক্ত না মানবের জন্মজন্মান্তরের সাধনা দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তির উপযুক্ততা লাভ করিবে, ইহা যুক্তি সঙ্গত; মানবের মধ্যে অনেকেই অনন্ত নরক ভোগ করিবে, না প্রত্যেকেই উপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা দোষপাশ মুক্ত হইবেন ও ক্রমোন্নতি লাভ করিবেন এবং অবশেষে ব্রহ্মানন্দ পারাবারে ডুবিয়া থাকিবেন ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিজ জীবনে পূর্ণ করিবেন, ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত।* উপসংহারে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে "জীবের একবার মাত্র জন্ম"

* "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখিয়াছি। সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক জীবেরই অনন্ত অনন্ত গুণাধার পরব্রহ্মে তন্ময় হইতে হইবে, তাহারই অপার দয়ায় তাঁহারই অনন্ত গুণে গুণবান হইয়া পরিণামে মহাপ্রলয় কালে পূর্ণমুক্তি লাভ করিবেন। সুতরাং অনন্ত নরক বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। অনন্ত প্রেমময় পরম পিতা যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্যই প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যখন তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্য কিছু হইতে পারে না, তখন কোটী কোটী জীবের পক্ষে অনন্ত নরকের বিধান হইলে সেই সুমহান, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সৃষ্টি পরীক্ষাময়ী, তাই ইহাতে দুঃখ আছে, পাপের শাস্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য নহে বা

এই মতের অনুসরণকারী বলিতে পারেন যে জীব মাত্রই পূর্ব্ব পরম চৈতন্য হইতে আসিয়া যখন সর্ব্বপ্রথম নিম্নতম জীবভাবে দেহে আবদ্ধ হন, তখনই তাঁহার জীবভাবে জন্ম হইল এবং তাহার অসংখ্য স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ লয় করিতে মহাপ্রলয়ে যখন তিনি পূর্ণামুক্তি লাভ করিয়া শেষদেহ লয়ে ব্রহ্মে পূর্ণ ভাবে মিলিত হইবেন, তখনই তাঁহার দেহের সম্পূর্ণ মৃত্যু সংঘটিত হইবে বা জীবভাবের লয়ের শেষ পরিণতি হইবে। ইহা ভিন্ন জীবের যে জন্ম মৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুমান করি, তাহা তাহার (জীবের) পক্ষে পট পরিবর্ত্তন মাত্র অথবা সাঁপের খোলস বদলান মাত্র। সুতরাং মানবের জন্ম একবার মাত্র এবং তাহার দেহের মৃত্যুও একবার মাত্র। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে উক্ত অর্থে তাহার মত সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত মতাবলম্বিগণ অর্থাৎ খৃষ্টান, মুসলমান ও ইহুদি ধর্ম্মাবলম্বিগণ কখনই উক্ত অর্থে জন্মান্তর বিরোধী মত পোষণ করেন না। আমরা যে জন্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহাকেই তাহারা একটী মাত্র জন্ম বলিয়া মনে করেন। তাহারা যে অর্থে জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করেন, সেই ভাবেরই খণ্ডনার্থ আমরা আলোচনা করিয়াছি। জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশান্তর্গত 'চিদাভাস' সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সেই অংশ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে যে দর্শনই মানবের জন্মান্তরবাদ এবং ইতর জীব সমূহও যে ক্রমোন্নতির প্রণালীতে নিম্নস্তরে বহু জন্মের পর মানব জন্ম লাভ করে, এই দুই তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা বহু কঠিন সমস্যার সূক্ষ্ম বিচারে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে বাধা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু স্থলে আলোচনা করিয়াছি। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এই যে প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর স্বয়ং বহু ভাবে ভাসমান হইয়া নিজ সন্তানদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিবেন অর্থাৎ

তাহা হইতেও পারে না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক জীবকে অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বে গ্রহণ করিবেন। ইহাই তাঁহার প্রেমলীলা। এই সুমহান্ উদ্দেশ্য একমাত্র পৃথিবীতে একমাত্র জন্মে বা বহু ভাবে বহু জন্মে সংসাধিত হয় না বা হইতেও পারে না। তাই তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে অনন্ত সাধনার উপযোগী করিয়া অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য মণ্ডল সৃজন করিয়াছেন। উহাদের সকলই পৃথিবীমণ্ডলবাসিদের পক্ষে পরলোক মধ্যে গণ্য। এই পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অতি সামান্য বক্তব্য পাঠকের নিকট নিবেদন করিতে যাইতেছি। পরলোক সম্বন্ধে আমাদের কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহ পরলোক সম্বন্ধীয় অতি অল্প তত্ত্বই জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই পরলোকের তুলনায় বিশ্বে পৃথিবী একটী বিন্দু মাত্র। সুতরাং এই সম্বন্ধে আমার ন্যায় সাধন-ভজন-হীন এবং অপরা বিদ্যায়ও হীনাবস্থের পক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। অনন্ত স্নেহময় পরমপিতা তাঁহার নিজ অপার স্নেহ গুণে এই দুষ্কর কার্য্যে আমার একান্ত ভাবে সহায় হউন, ইহা কাতর প্রাণে ও ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

ওঁং জন্ম-মরণ-নিবারণং মুক্তিদাতারং ওঁং

ওঁং

অস্মাৎ পৃথিব্যামপরত্র মণ্ডলে
দেহেঽত্র দেহান্তরতশ্চ তারিণঃ।
প্রেম্ণঃ প্রদাতুশ্চ নিধেশ্চ তন্নিধেঃ
নমো নমস্তে চরণে সুমঙ্গলে ॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

পরলোক তত্ত্ব।

আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারিয়াছি এবং এই সম্বন্ধে আরও জানিতে পারিব। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষার জন্য এই প্রেমলীলাময়ী সৃষ্টির সম্ভব হইয়াছে। স্বগুণ পরীক্ষার অর্থই এই যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা প্রত্যেক জীবকে অপূর্ণতা হইতে ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত করাইতেছেন এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণা মুক্তিতে প্রত্যেকেই তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন।* এই বিষয়ে পূর্ব্বেই নানা স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহার সমর্থনে আরও যুক্তি ইতঃপর প্রদর্শিত হইবে। অতএব আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। (১) জীবাত্মা সমূহ অমর। ব্রহ্মই স্বয়ং বহু জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং আত্মা একমাত্রই, কখনই বহু নহেন। ব্রহ্মের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব যখন সর্ব্ববাদি সম্মত, তখন জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯শ হইতে ২৪শ সংখ্যক শ্লোক সমূহ (ক) সুস্পষ্ট ভাবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পরলোকের অস্তিত্ব কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। উহারা যে সেই উপনিষদে বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাতে কোনই সংশয় নাই। এই জন্যই শ্রাদ্ধ বাসরে গীতা ও কঠোপনিষদ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্যান্য উপ-

---

* লয়ের অর্থ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

(ক) "জড়ের বিকার কেন" অংশে শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিষদেও আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মই স্বয়ং বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নানা দর্শনে নানা প্রকারে জীবাত্মার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মই স্বয়ং বহু জীবাত্মা ভাবে ভাসমান এই তত্ত্বাবলম্বনে যেমন সকল কঠিন সমস্যার সুমীমাংসা লাভ হইয়াছে, এরূপ আর কোনও তত্ত্বাবলম্বনে হয় নাই। পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন যে এই তত্ত্ব ও উপনিষদুক্ত তত্ত্ব একই। সুতরাং জীবাত্মা যে অমর, তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাতও হইতে পারে না। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ-দ্বয় এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। জীব = আত্মা + দেহ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবের প্রধান অংশ অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং পরমাত্মাই। সুতরাং সেই অংশ অনন্ত ও অমর। তাঁহার অন্য অংশ দেহ। উহা অবশ্য মরণশীল। কিন্তু জড় পদার্থ মরণশীল হইলেও সকলেই এক-কালে মরে না। জীবের ত্রিবিধ দেহ। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। উহাদের গঠন অনুযায়ী উহাদের লয়ের কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। শেষ কারণ-দেহের লয় হইতে প্রায় অনন্ত কালের প্রয়োজন হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কারণ-দেহ ব্যোম প্রধানভাবে গঠিত। ব্যোম যেমন আদিতে সৃষ্ট, সেইরূপ উহার লয়ও সর্ব্বশেষে হইবে। সুতরাং কারণ-দেহের লয়ও মহাপ্রলয়কালে সম্ভব হইবে।

(২) জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি আছে। প্রেমলীলাময় পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রেমলীলার উদ্দেশ্যই যখন প্রত্যেক জীবাত্মাকে পূর্ণত্ব দান, তখন যে তাহাদের প্রত্যেকেরই অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে কখনই সন্দেহের রেখাপাত হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণে নিত্য গুণবান বা তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। সুতরাং জীবাত্মারও পূর্ণত্ব লাভ করিতে অনন্ত একত্বের একত্বে ভূষিত হইতে হইবে, ইহা সহজবোধ্য। এই সম্বন্ধে "সোঽহং জ্ঞান" অংশে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আমাদের অনন্ত উন্নতি আছে এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পূর্ণামুক্তি লাভের কোনই আশা নাই।

আমরা যে অপূর্ণ, তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমরা যে পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত, তাহা আমরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিতে পাই যে আমরা যত পাই, আরও তত চাই। বাসনা-কামনা পূরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও দেখিতে পাই যে আমাদের একটী কামনা পূর্ণ হইলেই অথবা তাহা না হইতেই তাহা হইতেও অধিকতর সুখদায়িনী অন্য কামনার বশবর্ত্তী হই। কিছুই আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে জীবনের প্রারম্ভে সামান্যাবস্থ হইয়াও যদি কালে কালে কেহ ধনে জনে সমৃদ্ধ হন, তথাপিও তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। হিটলার একজন সামান্য wall painter মাত্র ছিলেন। তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাকে কোথায় আনিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। বহু ধনে ধনবান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে তাহার ধন স্পৃহা তৃপ্ত হয় নাই, বহুজনের চালককে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে তিনি তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন, তিনি হয়তঃ পৃথিবীর একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দী লোক-প্রিয় জন নেতা হইতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, প্রভুত্বমদে গর্ব্বিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে তিনি আরও অধিকতর সংখ্যক লোকের উপর, এমন কি পৃথিবীর সকলের উপর তিনি প্রভুত্ব করিতে প্রয়াসী, যাহারা পদে অত্যুন্নত স্থানে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদেরও ঐ একই দশা জানিবেন। যাহারা কোন এক প্রকার অপরা বিদ্যায় পারদর্শী, তাহারা সেই বিদ্যায় আরও গভীরতা লাভ করিতে প্রয়াসী এবং পরে অন্যান্য শাখায় পারদর্শী হইতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। অপরা বিদ্যাও অসীম। সুতরাং তাহার বিদ্যালাভের তৃষ্ণা মিটে না বা মিটিতে পারে না। এই যে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সকল শ্রেণীর সকল প্রকার লোকের অতৃপ্তি এবং "আরও চাই, আরও চাই" ভাব দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা অনন্তত্ব লাভ করিবার অধিকারী। পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যে ধন, জন, পদ, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধেই কেবল সত্য, তাহা নহে, আধ্যাত্মিক

জগতেও ঐ একই অবস্থা। সাধক প্রথমে একটু ভক্তি, একটু প্রেম, একটু জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল হন, কিন্তু তাহা লাভ করিলেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি পরম পিতার এক একটী গুণে একত্ব লাভ ক'রতেই প্রয়াসী হন। আবার তাহা লাভ হইলেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। * এই তৃপ্তি ও অতৃপ্তি তাঁহাকে অনন্তের দিকে বহন করিয়া লইয়া যায়, যাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণামুক্তি লাভ না করেন অর্থাৎ অনন্তত্ব সম্পূর্ণরূপে লাভ না করেন। এই অতৃপ্তি দূষণীয় নহে। ইহাকেই Divine Discontent (দিব্যা অতৃপ্তি) বলা হয়। ইহা হৃদয়ে নাই, এমন ব্যক্তি জগতে নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে সাধারণের ভিতর এই ভাবের অল্পাধিক্য আছে। এই ভাবের আধিক্য থাকিলেই অর্থাৎ মানব যদি তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় অতৃপ্তি জন্য তীব্র বেদনা ভোগ করে, তবেই সে তাহা হইতে উন্নততর অবস্থায় গমন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে যাহারা দূষণীয় পন্থা অবলম্বন করেন, তাহারা নিশ্চিতই নিন্দনীয় হন। কিন্তু যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়া নিজেদের নানাবিধ অবস্থার উন্নতি সাধন করেন, তাহারা সকলেরই প্রশংসা ভাজন হন। এই অতৃপ্তি হইতে আমরা দুইটী তত্ত্বের অনুসন্ধান পাই। প্রথমটি এই যে আমরা সকলেই অতি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান ও বহুভাবে অভাবগ্রস্থ। দ্বিতীয়টী এই যে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্রাবস্থায় সন্তুষ্ট নহি। "আমরা কেন সন্তুষ্ট নহি" এই প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভ করিতে গেলেই আমরা জানিতে পারিব যে আমাদের মধ্যে অনন্ত পিপাসা বর্ত্তমান। আবার জিজ্ঞাস্য হইবে যে কেন এই অনন্ত পিপাসা, কেন এই অভূত-পূর্ব্ব রাক্ষুসী ক্ষুধা? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে আমাদের স্বরূপই অনন্ত, বিরাট, সুমহান্। কিন্তু আমরা লীলার্থ ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। আবার আমাদের লাভ করিতে হইবে অনন্ত ব্রহ্মের

* পরম পিতার কোন এক গুণে অনন্তত্ব লাভ করাকেই একত্ব বলে। এইরূপ অনন্ত একত্বের একত্ব লাভের জন্যই জীবাত্মার অনন্ত সাধনা।

অনন্তত্ব। সুতরাং আমাদের অতৃপ্তি ও অনন্তের জন্য পিপাসা অনিবার্য্য। আমরা কখনই অল্পে সুখী হইতে পারি না, সুখী থাকিতে পারি না। এই জন্যই মহর্ষি সনৎ কুমার নারদকে বলিয়াছিলেন "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কেন আমরা একটী পার্থিব সুখভোগের পর অন্য একটী সুখের জন্য লালায়িত হই। ইহার উত্তর এই যে অনন্ত সুখই আত্মার স্বভাব। আত্মা অনন্ত সুখ, শান্তি বা আনন্দের নিকেতন। কিন্তু দেহাবদ্ধাবস্থায় মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় আমরা অবস্থিত। অর্থাৎ আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। তাই আমরা অনন্ত সুখের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখই খুঁজিয়া বেড়াই। অনন্ত মানস সরোবরের অতি সুনির্ম্মল জলের অভাবে সমল কুপোদকে তৃষ্ণা মিটাইতে চাই। আশা, তৃপ্তি লাভ করিব। কিন্তু হায়রে! তৃষ্ণা কি তাহাতে কখনও মিটে? না, তাহা মিটে না বা মিটিতেও পারে না। আমরা যে অনন্ত অমৃত সাগরের অধিকারী, আমরাও সেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্ঞান-প্রেমামৃত সিন্ধুতে নিত্যই সুবিনিমগ্ন হইয়াই আছি। আমাদের সেই সত্যজ্ঞান কোথায়? আমাদের সেই দিব্য প্রেম কোথায়, যাহার বলে আমরা সেই অবস্থা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি? যে পর্য্যন্ত আমাদের তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত ভাবে লাভ না হইবে, যে পর্য্যন্ত সেই তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ না হইবে, সেই পর্য্যন্তই অতৃপ্তি আমাদের সাথের সাথী হইয়াই থাকিবে। হায়রে! আমাদের অনন্তের জন্য অনন্ত পিপাসা আমরা ক্ষুদ্র পার্থিব বিষয় ভোগ দ্বারা মিটাইতে চাই। আমরা যে দুধের সাধ ঘোল দ্বারা মিটাইতে চাই। আমরা যে সেই অনির্ব্বচনীয়া সুধার আস্বাদন বিষ পান জনিত মত্ততার দ্বারা লাভ করিতে চাই! আমরা যে অনন্তের সন্তান! আমরা যে স্বরূপতঃ অনন্ত! আমরা কেমনে অল্প লইয়া তৃপ্ত থাকিব? অতএব আমাদের পক্ষে অনন্তের অনুসন্ধান একমাত্র কর্ত্তব্য। অনন্তেই যে সুখ একমাত্র লব্ধব্য তাহা জানা আমাদের উচিত। মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ত কত জনের আয়ু সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। এখন অনন্তের পদে আত্মসমর্পণ

করিতে প্রস্তুত হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার অনন্ত উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অমর আত্মার অনন্ত উন্নতি বিধানের জন্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা বিশ্বে কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে অনন্ত উন্নতি অনন্ত সাধনা সাপেক্ষ, সুতরাং ইহা অনন্ত প্রায় কাল ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। একটী মাত্র জন্মে সেই অনন্ত সাধনা অসম্ভব এবং অনন্ত অভিজ্ঞতা লাভও অসম্ভব। আবার একটী মাত্র মণ্ডলে শতবর্ষব্যাপী জীবনেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নহে। আবার একটী মাত্র মণ্ডলে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিলেই অনন্ত উন্নতি সাধিত হয় না। একটী মাত্র মণ্ডলের অভিজ্ঞতা কতটুকু, সেই সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। অনন্ত মণ্ডলের অনন্ত অভিজ্ঞতার তুলনায় পৃথিবীর অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার একটী অঙ্গ পৃথিবী পরিভ্রমণ। এই কার্য্যদ্বারা ভ্রমণকারী বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন, বহু শিক্ষা প্রাপ্ত হন। মানুষ যতই নিজেকে ছড়াইয়া দিবেন, তিনি ততই উদার হইবেন। কেবল কূপমণ্ডূকতা দ্বারা অল্প শিক্ষাই লাভ হয়। ইহা যদি পার্থিব ব্যাপারে সত্য হয়, তবে যে আধ্যাত্মিক জগতে ইহা আরও সত্য, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমাদের অনন্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে অনন্ত প্রায় মণ্ডল ভ্রমণ করিতে হইবে, অনন্ত প্রায় সাধনা করিতে হইবে। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ত্রিবিধ দেহের সংখ্যা অনন্তপ্রায়। একমাত্র স্থূলতম দেহে সকল দেহের সাধনা ও অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব। আমরা আরও দেখিয়াছি যে আমাদের বর্ত্তমান দেহ রজস্তমঃপ্রধান ভাবে গঠিত। সত্ত্বও উহাতে আছে বটে, কিন্তু পরিমাণে অল্প। সুতরাং ইহাতে সত্ত্বপ্রধান দেহের সাধনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সত্ত্বপ্রধান দেহের সাধনার তুলনায় অতি অল্প সাধনাই এই দেহে সম্ভব হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত সত্ত্বপ্রধান দেহের সংখ্যার তুলনায় রজস্তমঃ প্রধান দেহের সংখ্যা অত্যল্প মাত্র অর্থাৎ এক পরার্দ্ধ মাত্র। সুতরাং

অনন্ত উন্নতির অধিকাংশই সত্ত্বপ্রধান দেহে সাধিত হয়। অতএব এই যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আমরা দেখিতেছি বা অনুমান করিতেছি, বিজ্ঞান যাহাদের তথ্য বিন্দু বিন্দু ভাবে জগৎকে প্রদান করিতেছেন এবং যাহাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানিতে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন, উহারাই আমাদের অনন্ত প্রায় কালের নিবাস স্থল। আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুযায়ী আমরা ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর মণ্ডলে গমন করিব। এই বিষয়ে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে ও অন্যান্য স্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সকল মণ্ডল পৃথিবীবাসীর পক্ষে পরলোক। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের অনন্ত উন্নতি সাধনের জন্যই পরম প্রেমময় পরম পিতা পরলোকের সৃষ্টি ও পুনর্জন্মের বিধান করিয়াছেন। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পূর্ব্ব অংশেই লিখিত হইয়াছে। অনন্ত উন্নতি সাধনের অন্য কোন পন্থা বিশ্বে নাই, সুতরাং কেহই তাহা দেখাইতে পারিবেন না। অনন্ত উন্নতি সাধন একটী তুচ্ছ ব্যাপার নহে। ইতিপূর্ব্বে নানা স্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রত্যেক জীবের জীবনে অনন্ত উন্নতি সাধনই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সুমহান্ কার্য্য শুধু একটী মাত্র মণ্ডলে একটী মাত্র জন্মে সুসম্পন্ন যে হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা বহুস্থলে দেখিয়াছি যে ক্রম সৃষ্টির একটী বিশেষ প্রণালী। ক্রম ভিন্ন কিছু হয় নাই ও হইবেও না। কিন্তু একটী মাত্র মণ্ডলে একটী মাত্র জন্মে অনন্ত উন্নতি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব হইলে ক্রম প্রণালীর কোনই অর্থ থাকে না। আবার একটী মাত্র মণ্ডলেই যদি জীবের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিত, তবে অনন্ত প্রায় মণ্ডল সৃষ্টির কিছুই প্রয়োজন ছিল না। এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" অংশ দ্রষ্টব্য। আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী নহেন, তাহারা যুক্তিযুক্ত ভাবে বহু জন্মও স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের পূর্ব্বে একটী বাসস্থানের প্রয়োজন এবং

তাহাই পরলোক। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা সকলেই অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানের ফলে এখন পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণে ৩০,০০০,০০০,০০০ নক্ষত্র ধরা পড়িয়াছে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত নক্ষত্রের বিষয় তাহারা জানিতে পারিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিয়াছি যে বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীই জীবের একমাত্র বাসভূমি নহে। উক্ত অংশে আমরা আরও দেখিয়াছি যে বিশ্বে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান। এখন যদি বলা হয় যে পৃথিবীর লোকের পক্ষে পৃথিবীই আদি ও অন্ত, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অন্যান্য মণ্ডল সেই সেই মণ্ডলবাসীদিগের পক্ষেও আদি ও অন্ত, অর্থাৎ জীবের উন্নতি তাহার নিজ নিজ মণ্ডলে সীমাবদ্ধ, তাহার উন্নতি সাধন জন্য অন্য কোন স্থান নাই। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে পৃথিবীতে কেহই অনন্ত আত্মিক উন্নতি লাভ করা দূরের কথা, অনেকেই অল্প আধ্যাত্মিক উন্নতিও অর্জ্জন করিতে পারে না। অন্যান্য মণ্ডলবাসীদের সম্বন্ধেও অবশ্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কোন মণ্ডলবাসীই অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোনও মণ্ডলের জীবের জীবনে সংসাধিত হইতে পারে না। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান স্রষ্টার সুমহতী ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের অন্যান্য মণ্ডলেও আত্মোন্নতি সাধন জন্য গমন করিতে হইবে। এই বিরাট বিশ্ব প্রত্যেক জীবের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কোনও জীব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্র নহে। প্রত্যেক জীবের জীবনে একমাত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশ্বের প্রত্যেক অণু পরমাণুটী সৃষ্ট। জড় জগৎ সমগ্ররূপে জীবের জন্যই। জীব ভিন্ন ও তাহাদের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন উহার অন্য কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তর্কস্থলে ধরিয়া নেওয়া যাউক যে প্রত্যেক মণ্ডলের অধিবাসীদিগের পক্ষে সেই সেই মণ্ডলেই অনন্ত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে

দেখিয়াছি যে মণ্ডল সমূহ একই প্রকারে গঠিত নহে। যদিও উহারা প্রত্যেকেই জড় পদার্থ দ্বারা রচিত, তথাপিও উহারা অণু পরমাণুর নানাভাবের সংযোগে সম্ভব হইয়াছে। সেই জন্যই কোন কোন মণ্ডল ক্ষিতিপ্রধান, কোন কোন মণ্ডল অপ্‌ প্রধান, কোন কোন মণ্ডল তেজঃ প্রধান, কোন কোন মণ্ডল মরুৎ প্রধান, আবার কোন কোন মণ্ডল ব্যোম প্রধান। আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতেছেন যে মণ্ডলগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। আমরা আরও দেখিয়াছি যে দেহও ঐরূপ নানা মণ্ডলে অধিবাসের জন্য নানাভাবে রচিত হইয়াছে। * মণ্ডল সমূহ যখন নানাভাবে রচিত, মণ্ডলবাসিদিগের দেহও অবশ্য নানাভাবে রচিত হইবে। "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে পারলৌকিক আত্মাদিগের দেহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যেমন বৃত্ত ক্ষেত্র মধ্যে যত প্রকার নিয়মিত সরল রৈখিক ক্ষেত্র থাকিতে পারে, তন্মধ্যে নিয়মিত ত্রিভুজ ক্ষেত্র অল্প সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট ও অল্প স্থান ব্যাপী, তদ্রূপ পরম পিতার সৃষ্টিতে যত প্রকার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে তোমাদিগের দৃশ্যমান এই স্থূল জগৎ পরলোক অপেক্ষা অল্পতর গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত। যেমন বৃত্ত মধ্যস্থ সম চতুর্ভুজ, সম পঞ্চভুজ, সম ষড়্‌ভুজ, সম শতভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্র ক্রমশঃ উক্ত ত্রিভুজ অপেক্ষা অধিক বাহুবিশিষ্ট ও অধিক স্থানব্যাপী, সুতরাং বৃত্তের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী, তদ্রূপ পারলৌকিক উন্নত আত্মাদিগের দেহও** চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, শত ইত্যাদি সংখ্যক গুণ বিশিষ্ট, এবং তাঁহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন ও পরম পিতার অধিক নিকটবর্ত্তী। কিন্তু যেমন বৃত্তমধ্যস্থিত নিয়মিত সরল রৈখিক ক্ষেত্রের বাহু সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, উহা কখনই বৃত্তের সমান হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, কখনই পরমপিতার তুল্য

* "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে ৬০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

** পারলৌকিক আত্মাদিগেরও দেহ আছে, উহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এই মাত্র প্রভেদ।

হইতে পারে না (ক)। জলচর জীবদেহ এবং স্থলচর জীবদেহ যখন বিভিন্ন প্রকারে গঠিত, তখন সূক্ষ্ম মণ্ডলের দেহও অবশ্য সূক্ষ্মভাবে গঠিত হইবে। * অতএব আমরা দেখিলাম যে বিভিন্ন মণ্ডলে বিভিন্ন প্রকারের দেহে জীবগণ বাস করেন। আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে দেখিয়াছি যে স্থূলতম দেহে বাধার পরিমাণ অত্যধিক এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহে বাধার পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। যে স্থলে বাধার পরিমাণ অল্প, সেই স্থলে উন্নতির পরিমাণ অধিকতর এবং দ্রুততর। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীর মত অনুসরণ করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সূক্ষ্ম মণ্ডলের জীবের পৃথিবীর জীব

(ক) বৃত্ত সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে যে বৃত্ত মধ্যস্থ সরল রৈখিক ক্ষেত্রে বাহুর সংখ্যা যদি বৃত্তের পরিধির বিন্দুর সংখ্যার তুল্য হয়, তবে সেই ক্ষেত্র বৃত্তের সহিত এক হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে ব্রহ্মরূপ পরম বৃত্ত যে পরিধি শূন্য, ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু দেহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন ক্ষেত্রই উহা যত বড়ই হউক না কেন, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশ দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিশ্ব সীমাবদ্ধ। সুতরাং অত্যুন্নত মহাত্মাগণও অনন্ত প্রায় কাল অনন্ত ক্ষুদ্র ভাবে বর্ত্তমান থাকিবেন। একমাত্র অনন্ত করুণাময়ের অপার করুণায় মহাপ্রলয়কালে ত্রিবিধ দেহের বিগমে জীব সমূহ ক্রমশঃ পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। অর্থাৎ দেহে থাকিতে ব্রহ্মের সহিত কেহই এক হইতে পারেন না। এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য!

* এস্থলে ইহা বক্তব্য যে ক্ষিতি ও অপ্ প্রায় এক প্রকারের পদার্থ। এই জন্য কেহ কেহ পঞ্চভূত না বলিয়া চারিটী ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহারা ক্ষিতি ও অপ্‌কে একই ভূত বলিয়া থাকেন। উভয় প্রকার জীব দেহেই ক্ষিতি ও অপ্ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান বলিয়া উহাদের পার্থক্যের পরিমাণ সাধারণের পক্ষে বহিদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা সহজ নহে, কিন্তু উহারা যে বিভিন্ন ভাবে গঠিত, তাহা বিজ্ঞানও বলিবেন। আমরা দেখিয়াছি যে কোন কোন রোহিত মৎস্যও রন্ধনার্থে কটাহের উপর কিছু সময় রাখিলে উহার অধিকাংশই জল হইয়া যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে উহার দেহ অপ্ প্রধান ভাবে গঠিত। আমরা ইহা বুঝিতে আরও চিন্তা করিতে পারি যে স্থলচর জীব জলে বহুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, আবার জলচর জীবও স্থলে বহুকাল বাঁচে না। ইলিস মৎস্য ত জল হইতে উত্তলিত হইলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়!

অপেক্ষা দ্রুততর উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং অনন্ত উন্নতি লাভে তাঁহারা পূর্ণামুক্তি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে এবং অতি শীঘ্র লাভ করেন। ধরা যাউক্, পৃথিবীতে শতবর্ষব্যাপী জীবনে যদি পূর্ণামুক্তি লাভ করা যায়, বৃহস্পতি মণ্ডলে তাহা দশ বৎসরে, ধ্রুবলোকে দশ দিনে ইত্যাদি রূপে অল্প হইতে অল্পতর কালে বিভিন্ন মণ্ডলে লাভ করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন মণ্ডলের জীবের পক্ষে বিভিন্ন গতিতে পূর্ণামুক্তি লাভের বিধান পক্ষপাতলেশ শূন্য সর্ব্ব মণ্ডলের সর্ব্বজীবের একমাত্র অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত সমতাপূর্ণ, অনন্ত জ্ঞানময় ও অনন্ত ন্যায়বান স্রষ্টার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে পরলোক আছে এবং আমাদের অনন্ত উন্নতি সাধনের জন্য অনন্ত প্রায় মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীর মত তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়াও দেখা গেল যে তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে। আবার যদি পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ ব্যাপার সমূহ (facts and figures) দ্বারা এই বিষয় বিচার করা হয়, তবুও দেখিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীতে একবার মাত্র জন্মে শতবর্ষ-ব্যাপী জীবন যাপন করিলেও পূর্ণামুক্তি ত দূরের কথা, অধিক উন্নতি লাভও সম্ভব নহে। সুতরাং অন্য মণ্ডলেও সেই ভাবে অর্থাৎ একটী মাত্র জন্মে পূর্ণামুক্তি লাভ অসম্ভব, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি কোনও মণ্ডলবাসীর পক্ষে পরলোক না থাকে, তবে প্রত্যেক মণ্ডলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের একই পন্থা বর্ত্তমান থাকিবে। পৃথিবীতে এক প্রকার বিধান এবং অন্য মণ্ডলে অন্যরূপ বিধান সম্ভব নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে যখন পূর্ণামুক্তি লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাহা যখন পৃথিবীতে একমাত্র জন্মে অসম্ভব, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহার (পূর্ণামুক্তির) জন্য জ্ঞান-প্রেমময় স্রষ্টা অবশ্যই এমন বিধান করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে আমরা উন্নতি সাধন করিতে করিতে পূর্ণামুক্তি লাভ করিতে পারি। সেই বিধানই পরলোক এবং পুনর্জ্জন্ম যে স্থানে বাস করিয়া এবং যাহা দ্বারা আমরা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিব। বিরুদ্ধবাদীর মতে সৃষ্টির সর্ব্ব প্রধান প্রণালী অর্থাৎ ক্রম প্রণালী যে একেবারেই বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে পৃথিবী মণ্ডলই জীবের একমাত্র বাসভূমি। এই বিশ্বাস ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। যদি পৃথিবীই জীবের একমাত্র বাসভূমি হয় এবং অন্যান্য মণ্ডল জীব শূন্য হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অসংখ্য মণ্ডল কেবল মাত্র পৃথিবীকে যথা স্থানে রাখিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। উহারা জড় পিণ্ড বই আর কিছুই নহে, উহাদের অন্য কোন কার্য্য-কারিতা নাই। বিশ্বে একটী, দুইটী মণ্ডল নাই, সহস্র সহস্র কোটী কোটী মণ্ডলও নাই, উহাতে আছে অসংখ্য পরার্দ্ধ মণ্ডল। সুতরাং ইহা যে একান্তই অযৌক্তিক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অন্যান্য মণ্ডলও জীবের বাসোপযোগিভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। তবে ইহা সত্য যে প্রত্যেক মণ্ডল একই ভাবে গঠিত নহে। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত নির্ঘণ্ট দেখিলে এই সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যাইবে। এই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে জীব সমূহও যেমন সকলেই সকলের সহিত মিলিত, সেইরূপ বিশ্বের অণু পরমাণুটী পর্য্যন্ত অতি সুদূরে অবস্থিত মণ্ডলের সহিত সম্পর্কিত। এমন কোন জীব নাই বা এমন কোন মণ্ডল নাই, যে বা যাহা অন্য জীব এবং মণ্ডলের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতার জ্ঞান-প্রেমময় বিধানে আমরা সকলেই সকলের সহিত সংযুক্ত। আমরা কেহই কাহারও হইতে পৃথক্ নহি। সুতরাং এক মণ্ডল-বাসীর পক্ষে অন্য অসংখ্য মণ্ডল যে প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। Theory of Gravitation and theory of Relativity দ্বারা এক মণ্ডলের সহিত অন্য মণ্ডলের সম্পর্ক বুঝিয়াই শেষ করিলে সম্পূর্ণ মীমাংসা লাভ করা যাইবে না, অত্যল্প আংশিক জ্ঞান লাভ হইবে মাত্র। ইতিপূর্ব্বে অনন্ত উন্নতি সাধনের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনন্ত উন্নতির কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে কতজন সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, অথবা কত জনই বা ধর্ম্ম সাধন জন্য জীবনে চেষ্টা করেন। ইহা ভিন্ন কত নর নারী অল্প বয়সে ধর্ম্ম যে

কি বস্তু তাহা জানিবার বহুকাল পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করে। পরলোক এবং পুনর্জন্ম না থাকিলে তাহাদের জীবন ত একেবারেই বৃথা যাইত। তাহারা কোথায় কিভাবে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিত? সুতরাং ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রেমময় স্রষ্টা প্রত্যেক জীবের জীবনে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য অবশ্যই এমন বিধান করিয়াছেন যে, যাহাতে প্রত্যেকেরই অনন্ত উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং যে বিধানে কেহই বাদ পড়েন না। সেই বিধানই পরলোক ও জীবাত্মা মাত্রেরই পুনর্জন্ম। অনন্ত ন্যায়বান পরম পিতা পাপীর শাস্তিদাতা এবং পুণ্যবানের পুরস্কর্ত্তা। আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, মহাপাপী পাপকার্য্য সাধন করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ না করিয়াই দেহত্যাগ করেন। আবার অনেক সাধু আছেন, যাহারা পুণ্য কর্ম্মের পুরস্কার তাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মে লাভ করেন না। অনন্ত ন্যায়বানের রাজ্যে এরূপ বিসদৃশ্য বিধান সম্ভব নহে। অবশ্যই বলিতে হইবে যে এমন কোন বিধান আছে, যাহা দ্বারা উহা সম্পন্ন হয়। পরলোক এবং পুনর্জন্মই সেই বিধান। একমাত্র পরলোকে উহা সংসাধিত হইতে পারে না, আবার একমাত্র পুনর্জন্ম দ্বারাও উহা সম্পন্ন হয় না। উভয় প্রকারেই উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপনিষদে কর্ম্মানুযায়ী পরলোকে উন্নতির উল্লেখ আছে। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই পরলোকে বিশ্বাসী এবং পাপীর শাস্তির জন্য নরক এবং সাধুর পুরস্কারের জন্য স্বর্গের বিধান সেই সকল শাস্ত্রে বর্ত্তমান। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশের শেষ ভাগ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে কতগুলি আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। উহাদের মধ্যে কতগুলি নিম্নগ্রামের এবং উহাদিগকে আমরা বাসনা কামনা শব্দে অভিহিত করি। আবার অনেকের হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বর্ত্তমান থাকে। সাধকদিগের হৃদয়ে অত্যুচ্চ সদাকাঙ্ক্ষারও উদয় হয়। ঐ সমস্ত কামনা বাসনা পৃথিবীতেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দ্বারা লয় করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পারলৌকিক সাধনারও প্রয়োজন আছে। সাধকদিগের অত্যুন্নতা

আকাঙ্ক্ষা সমূহ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হওয়ার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারাও সত্যভাবে অনুমান করা যায়। অথচ সেই সকল সদাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই। পরম পিতা যখন ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই সদাকাঙ্ক্ষা সকল পূর্ণতার জন্যও বিধান করিয়াছেন এবং তাহাই অসংখ্য পরলোকে ক্রমশঃ উন্নত সাধন দ্বারা পূর্ণ হইবে। কামনা বাসনা পূরণের যখন ব্যবস্থা আছে, তখন সদাকাঙ্ক্ষা সমূহ, অপূর্ণ থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। দেখা যায় যে পৃথিবীতে সেই সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এমন স্থান আছে, যেথায় উহারা পূর্ণ হইবে এবং সেই স্থানই পরলোক। অনেকে পরলোকতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মনে করেন যে উহা পৃথিবীস্থ লোককে ভয় দেখাইবার জন্য পুরোহিত দিগের বিধান। ইহা চার্ব্বাকপন্থীদিগের মত হইতে পারে, কিন্তু বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহলোকের পর পরলোক বর্ত্তমান। তাঁহাদের পৌরহিত্য বা অর্থের প্রতি কোন লোভ নাই। তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সাধারণের স্বভাবই এই যে তাহারা বিষয়টীকে সমগ্র এবং গভীরভাবে চিন্তা করে না, আংশিক ও হাল্কা ভাবেই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাতেই তাহাদের সিদ্ধান্ত সকল সময় সুসঙ্গত হয় না। তাহারা ইহলোকে ধন, মান, ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া যখন স্রষ্টাকে ভুলিয়া থাকে, তখন পরলোককে যে অস্বীকার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহারা মনে করে যে পার্থিব ভাবে কার্য্য করিলেই ত অনেক ব্যাপার সংসাধন করা যায়, তবে কেন পরলোকের চিন্তা? যাহারা ইহ সর্ব্বস্ব মনে করেন, তাহাদিগেরই এইরূপ চিন্তার উদয় হয়। এইরূপ চিন্তা কয়েক প্রকারের লোকেরই মধ্যে সঞ্চরণ করে। যাহারা নিতান্ত কুৎসিৎ বা ভীষণচরিত্র, যাহারা হাল্কা ভাবের চিন্তা নিয়াই দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন, যাহারা ধন-মদে এবং প্রভুত্বমদে সর্ব্বদা মত্ত, যাহারা ধন ঐশ্বর্য্যে এইরূপ অবস্থা

সম্পন্ন হইয়াছেন যে তাহারা মনে করেন যে তাহাদের আর কিছু চাহিবার নাই, যাহারা স্থূল সুখকেই একমাত্র লভনীয় ও লোভনীয় মনে করেন এবং উহার উপরে যে অনন্ত সুখ, শান্তি ও আনন্দ আছে, তাহার কোনই ধারণা নাই, তাহারাই পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই তাহাদের কুব্যবসা অচলা থাকিতে পারে না। স্থূল, যাহারা চিন্তা ও কার্য্যে ইহ সর্ব্বস্বতার পরিচয় দেন, তাহারাই পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে পরলোক চির বর্ত্তমান এবং তাহা এত বিস্তৃত যে পৃথিবী উহার নিকট পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র। যতদিন পশুভাব প্রবল থাকে, যতদিন মানব নানা প্রকার মোহে মুগ্ধ থাকে এবং মদমত্তাবস্থায় কাল যাপন করে, তত দিনই সে পরলোক সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারে। কিন্তু মানবের যাহা বিশেষ সম্পত্তি অর্থাৎ চিন্তা, ইহার আশ্রয় যখন মানব গভীর ভাবে গ্রহণ করে, তখনই সে বুঝিতে পারে যে পরলোক আছে। প্রথমতঃ সচ্চিন্তা আসিলেই ধর্ম্ম চিন্তা আসে এবং ধর্ম্ম চিন্তা আসিলেই পরলোকের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। কঠোপনিষদ পাঠেও আমরা এই তত্ত্বই লাভ করিতে পারি। নচিকেতাকে এমন পার্থিব সুখ সম্পত্তির প্রলোভন দেখান হইয়াছিল, যাহা হইতে পার্থিব কামনা বাসনা আর অধিকতর সুখের কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে তাঁহাতে পার্থিব কামনা বাসনা রাহিত্য জন্মিয়াছে, তখনই যম অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ তাঁহার (নচিকেতার) নিকট পরলোকতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ মানব যখন ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করে এবং সেই জন্য যখন তাহার কামনা রাহিত্য উপস্থিত হয়, তখন সেই ধর্ম্মের সহায়তায় অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা সংশোধিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে পর-লোক তত্ত্ব প্রতিভাত হয় এবং ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। কেহ কেহ ধর্ম্ম আদি মানবের ভয়োৎ-পন্ন সামগ্রী মাত্র মনে করেন। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা আমাদের

অন্তর্নিহিত স্বভাব। তাই খ্রীষ্টদেবও বলিয়া গিয়াছেন যে Man does not live by bread alone but by every word of God. এই স্বভাব কেহই উৎপাটন করিতে পারেন নাই ও পারিবেও না। পৃথিবীতে যে বহুকাল যাবত মানববাস করিতেছে, তাহাতে কেহই সন্দেহ করে না। বিজ্ঞানও তাহাই বলেন। কিন্তু মানবের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ভাব এবং পরলোকের চিন্তা বিজ্ঞানোজ্জ্বল, ইহসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান যুগেও বিদূরিত হয় নাই। বরং দেখা যায় যে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ও পরলোকের অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, যাবত তাহাদের হৃদয়ে অনন্য সুলভ চিন্তা বিরাজিত থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের সৎ ও অসৎ, ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ জ্ঞান থাকিবেই এবং তাহা হইতেই তাহারা ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিবে। উহা কেবল মানবের বদ্ধমূল মিথ্যা সংস্কার নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মানব সৃষ্টির পর এত সুদীর্ঘ কালে উহা অন্ততঃ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইত এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উহা হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। সত্যই নিত্য স্থায়ী, মিথ্যা কখনও এত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ধর্ম্মই প্রকৃতভাবে মানব হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে। যদিও বর্ত্তমান যুগে অধর্ম্ম অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে অনেকেই এই ইহসর্ব্বস্বতারূপ কঠিন রোগের মহৌষধ খুজিতেছেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই জানিতে পারা যায় যে পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সকলেই শান্তির জন্য উন্মত্তভাবে চীৎকার করিতেছেন। এই শান্তি তখনই লভ্য হইবে, যখন মানব সত্যভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে এবং জীবনে জীবনে উহা সাধিত হইবে। উহারা খেলো পদার্থ নহে। উহারা না থাকিলেই মানুষ বাঁচিয়াও জীবন্মৃতবৎ, পশুবৎ অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে নাস্তিকগণ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে চিরকালই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া

আসিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রের সাহায্যেও এই অন্যায় যুদ্ধ বহু-কাল যাবত পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কোথায়ও তাহাদের প্রকৃত জয় হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। তাহারা সাময়িক এবং বাহ্যিক (superficial) জয়ে উৎফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু অচিরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গও পরাজিত হইয়া উন্মুক্ত দ্বারে ধর্ম্মের পদানত হইয়াছে। পৃথিবীতে যে সকল অন্যায়, যে সকল অত্যাচার এতকাল সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ফলও মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে মঙ্গলেই পরিণত হইবে। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এখন তর্কস্থলে ধরিয়া নেওয়া যাউক্ যে ধর্ম্মভাবের উৎপত্তির মূলে মানুষের ভয়। ইহাতেও দেখা যাইবে যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান এই স্থলেও কার্য্য করিতেছে। আমাদের হৃদয়ে পরমপিতা ভয় দিয়াছেন, সুতরাং ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইব। আমরা অনেক সময় দেখি যে পৃথিবীর সাহায্যে আমরা ভয়ের কারণ দূর করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের অদৃশ্য রক্ষিণী শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় ও তাঁহার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করি। এই ভাবেই ক্রমশঃ আমাদের ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয় ও সাধনার উচ্চ স্তরে সেই ভয়ও লুপ্ত হয়। পৃথিবীতে বহু বহু মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, যাহারা ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন মনের একটী ভাবমাত্র নহে। উহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। ব্রহ্মদর্শনে কোনওরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা মনের ভাব মাত্র বা Illusion হইতে পারে না। আর ব্রহ্মদর্শনকালে মনেরও লয় হয়, সুতরাং মনের ভাবের প্রশ্নেরই উদয় হইতে পারে না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। অতএব দেখা গেল যে পরমপিতা এমন বিধান করিয়াছেন যে আমরা নৈসর্গিক ভাবেই ধর্ম্মরাজ্যের দ্বারে উপনীত হইব। সুতরাং যদি বলা যায় যে ভয়ের জন্য আমরা ধর্ম্মের শরণ লইয়াছি, তবে তাহাতে কোনই মিথ্যা হইল না। যাহা আমাদের অন্তর্নিহিত সম্পদ, তাহা জাগ্রত করিতে

নিসর্গসম্বন্ধ ভয় দ্বারা সম্ভব হইয়াছে মাত্র। ইহাতে দোষের কিছুই হয় নাই। যদি অন্যান্য দোষ পাশ সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে উহাদের বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত ব্যবহারে উৎকৃষ্ট গুণনিচয় লাভ হয়। পরমপিতা অপার দয়াগুণে আমাদের প্রকৃতিতে যাহা দিয়াছেন, তাহারই সদ্ব্যবহারে আমরা বহু সম্পদ লাভ করিব এবং তাহাই সহজ পন্থা। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে প্রকৃতিকে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া নহে, কিন্তু উহার সদ্ব্যবহারেই আমরা লাভবান হইব এবং উৎকৃষ্ট গুণরাশির বিকাশ সাধনে সমর্থ হইব। বর্ত্তমান যুগে Spiritualist দিগের চেষ্টায় পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। Sir Oliver Lodge প্রমুখ বহু সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বহু Seance-এ উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ও প্রমাণ প্রয়োগে পরলোক-তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছেন। সুতরাং পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবার সুযোগ নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু দর্শনেও উহা স্বীকৃত হইয়াছে। "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে পরলোক সম্বন্ধে ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাও বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। পরলোক তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। পরলোক সম্বন্ধে আমাদের অসংখ্য তত্ত্ব জানিবার আছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অভাবে তাহা পাঠককে উপহার দিতে পারিলাম না। পাঠক আমাকে সেজন্য ক্ষমা করিবেন। যাহা লিখিত হইল, ইহা দ্বারাও আমরা সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পরলোকের অস্তিত্ব সত্য, সত্য, মহাসত্য। আমরা সৃষ্টির সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতসৃষ্টি, মণ্ডলসৃষ্টি, জীবসৃষ্টি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। আমরা জীবের তিন ভাগ সম্বন্ধেও অর্থাৎ ইতর জীব, মানব ও পারলৌকিক আত্মা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের জীবন সাধনার জন্যই, আমরা প্রথমতঃ অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হই এবং আমাদের জীবন পথে

বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম জন্মান্তরে এবং পরলোকে সাধনা দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া আমাদের অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে হইবে। এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে এই সমস্ত কার্য্যের মূলে ব্রহ্মের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা চির বর্ত্তমান। আমরা এখন ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি। অনন্ত স্নেহময়, অনন্ত দয়ার আধার, অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা এই সুকঠিন কার্য্যে আমার সহায় হউন্, ইহা তাঁহার নিকট ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করি।

ওঁং সর্ব্ব-লোক-শরণ্যং অনন্ত-সাধন-ধনং ব্রহ্ম ওঁং ॥

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—পরপৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ওঁ

হে সত্যম্, হে শিবম্, হে অসীম সুন্দরম্,
হে আনন্দ, হে অমৃতময়।
কি যে মহা প্রেমে মন, কর তুমি আকর্ষণ,
আপনার করিবে আমায় ;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে তাই, আমিও তোমারে চাই,
সঁপে দিতে চাহি আপনায় ;
তব রূপ অনুপম, মধুরং মধুরম্,
মধুময় যেন সমুদায়।
পুলকে হৃদয় মম যেন মধুকর সম
মধুর স্বরূপে ডুবে রয়।

ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব

ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব বিষয়টী যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নিকটই সুকঠিন, তাহা নহে, কিন্তু বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিতগণও ইহার কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে কত আলোচনা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। উহাদের মধ্যে যে বহু সত্য তত্ত্বও নিহিত রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও মানবকুল ধারণা করিতে পারে নাই যে ব্রহ্ম অনন্ত মঙ্গলে নিত্য পরিপূর্ণ এবং তাঁহার সকল কার্য্যই সেই মঙ্গল ভাব প্রসূত, সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে মঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহা তাঁহাদের নিকট এখনও সমস্যা মধ্যে পরিগণিত। এই সুকঠিন সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। এই মহান কার্য্য সম্পাদনার্থ পরম দয়াল পরম পিতা তাঁহার সেবকাধম সন্তানকে তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান করুন, ইহা তাঁহার পরম মঙ্গলময় শ্রীচরণ প্রান্তে একান্ত প্রাণে প্রার্থনা করি। ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব বুঝিতে পাঠককে

নিম্নলিখিত অংশ সমূহ বিশেষ ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "(১) সৃষ্টির সূচনা, (২) লীলাতত্ত্ব, (৩) স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন, (৪) আত্মা ও জড়ের মিলন, (৫) গুণ বিধান, (৬) জড়ের বাধকত্বের কারণ, (৭) অব্যক্তের পরিণাম ও (৮) ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী।" উক্ত স্থল সমূহে লিখিত তত্ত্ব সমূহ হৃদয়ঙ্গম হইলেই ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। "ব্রহ্ম নিত্য ও পূর্ণ মঙ্গলময়" এই পরম তত্ত্ব বুঝিতে আমাদের প্রথমতঃই হৃদয় হইতে মঙ্গল সম্বন্ধে বহু কুসংস্কার দূরীভূত করিতে হইবে। 'মঙ্গল' বলিতে আমরা জনসাধারণ বুঝি যে আমরা যাহাই করি না কেন, কিছুতেই যেন আমাদের তথা কথিত সুখ সাচ্ছন্দ্যের বিন্দু মাত্রও অভাব না ঘটে। আমরা লোভপরবশ হইয়া অতি-ভোজন করিব, কিন্তু কোনরূপ অসুস্থ হইব না; অতিশয় পরিশ্রম করিব, কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত হইব না, প্রত্যহ অতিরিক্ত নিদ্রায় বহুকাল ব্যয় করিব, কিন্তু দেহ অকর্ম্মণ্য হইবে না, অত্যন্ত অলস ভাবে গৃহে শয়ন করিয়াই থাকিব, কিন্তু ষোড়শোপচারে খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রত্যহই অনায়াস-লভ্য হইবে, ইন্দ্রিয় সংযম করিব না, কিন্তু নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিব না; বিদ্যা উপার্জ্জন করিব না, কিন্তু বিদ্বানগণের যশঃ লাভ করিব; জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য কোনই সাধনা করিব না, কিন্তু জ্ঞানিগণ সুলভ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিব, ধর্ম্ম পথে চলিব না, কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের প্রাপ্য আত্ম-প্রসাদ লাভ করিব, পাপ কার্য্য অবাধে করিতে থাকিব, কিন্তু সেই জন্য জীবনে কখনও শাস্তি আসিবে না; সাধন ভজন করিব না, সর্ব্ব-রিপুর অধীন হইয়াই চলিব, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিব ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ আমরা শারীরীক, মানসিক ও আধ্যা-ত্মিক উন্নতি লাভার্থ সর্ব্ববাদিসম্মত পথে চলিব না, অপরন্তু বিপরীত পথেই চলিব, যাহা খুসী তাহাই নির্ব্বিচারে সম্পাদন করিব, কিন্তু সেই জন্য আমাদের ষোল আনা সুখ শান্তিতে যেন বিন্দু মাত্রও ক্রুটী না ঘটে, এইরূপ হইলেই আমাদের মঙ্গল হইল, ইহাই সাধারণের ধারণা।

চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে অবশ্যই পূর্ব্বোক্তি প্রযোজ্য নহে। তাহারা জানেন যে বিধি বিরোধী কার্য্য করিলেই কর্ত্তার অবাঞ্ছিত, কিন্তু অবশ্য-ম্ভাবী বিপরীত ফল আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে ধনবল, জনবল, স্বাস্থ্য, প্রভুত্ব প্রভৃতি যাহাদের আছে, তাহাদেরই মঙ্গল হইতেছে। "বিশ্বে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই" এই উক্তি অতি সত্য। কিন্তু যে অর্থে আমরা মঙ্গল মনে করি, সেই অর্থে তাহাদেরও মঙ্গল হইতেছে না। এইরূপ ধন জন প্রভৃতিতে যাহারা পরিপূর্ণ, তাহাদের কাহারও কাহারও হৃদয়েও শ্মশানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে দেখা যায়। ঐ প্রকারের বহু ব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে সহজেই দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখা যায়। তাহাদের পতন যত সহজ, অন্যের পক্ষে উহা তত সহজ নহে। তাই খ্রীষ্টদেব বলিয়া গিয়াছেন যে ধনীদের পক্ষে মোক্ষলাভ সূচীর ছিদ্র মধ্যে উষ্ট্রের প্রবেশ লাভের ন্যায় সুকঠিন। মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের সাধারণের যখন এইরূপ মিথ্যা ধারণা বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব বুঝিতে আমাদের বিশেষ ভাবে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা উপরি উপরি চিন্তা করিলে এই সুকঠিন সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (observation and experiment) দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতিই বৈজ্ঞানিকদিগের শিক্ষয়িত্রী। আমরাও যদি একান্ত চিত্তে নিসর্গদেবের শরণাপন্ন হই, তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করি। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা প্রকৃতিতে বিশ্বের অসংখ্য সমস্যার সমাধান নিজ অভ্রান্ত হস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। এখন আমরা সেই লিপি পাঠ করিতে শিক্ষা করিলেই এই বিষম সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিব সন্দেহ নাই। অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা আমাদিগের নিকট তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন, ইহার জন্য তাঁহার মঙ্গল চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেছি। জগতে যে বিপরীত শক্তি সমূহ কার্য্য করিতেছে, সেই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত আলোচনা পাঠক স্মরণ করিবেন।

তাহাতে জানা যাইবে যে পরমেশ্বরেই বিপরীত গুণের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। সেইজন্য জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বিপরীত শক্তি দেখিয়া দুইটী পৃথক্ সত্বার অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। পরম পিতার দয়া অনন্ত, ন্যায়পরতাও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার হইতে অনন্ত মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কোনই আশঙ্কা নাই। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন ঃ—"সে যেমন ন্যায়ের নিধি, তেমনি প্রেম জলধি, সব বিধি তাঁর বিধি, তবে বল কিবা ভয় ?" মানুষ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করে না, অথবা ন্যায়পর হইয়া দয়া শূন্য কার্য্য করে। কিন্তু উভয় গুণ যাঁহাতে অনন্ত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান, তাঁহাতে এরূপ বৈষম্য কখনও থাকিতে পারে না। তথায় Justice is always tempered by mercy and vice versa অথবা ন্যায় কখনও করুণার বিরুদ্ধে কার্য্য করে না, অথবা করুণা কখনও ন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন না। সর্ব্বদা উভয়ে মিলিত ভাবেই কার্য্য করেন। সুতরাং বিপরীত শক্তি তাঁহাতে আছে বলিয়াই কখনও আমাদের অমঙ্গল হয় না বা হইতেও পারে না। বরং বিপরীত তত্ত্বই সত্য, অর্থাৎ তাঁহাতেই অনন্ত বিপরীত গুণের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অনন্ত মঙ্গলময়। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশের অন্তর্গত "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশ পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মে যখন অনন্ত কোমল ও অনন্ত কঠোর গুণের অপূর্ব্ব একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল থাকিতেই পারে না এবং সেই মঙ্গল ভাবোৎপন্ন কার্য্য মাত্রই যে মঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকিবে, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য তত্ত্ব। মানুষ কেন কার্য্যসমূহকে মঙ্গল ও অমঙ্গলে বিভাগ করে, আর পরমপিতার সকল কার্য্যই বা কেন অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আশা করি। হিন্দু সমাজে একটী প্রবাদ আছে যে মৃত্যুর পরে ভীষণ ভীষণ যমদূতগণ পাপীদিগকে নরকবাসের নিমিত্ত লইতে আসে, কিন্তু সুন্দর ও শান্ত বিষ্ণু বা শিব দূতগণ পুণ্যাত্মাদিগকে স্বর্গে নিবার জন্য আসেন।

ইহার সত্যাসত্য বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং উহার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু একথা সত্য যে মানুষ যতদিন পাপে লিপ্ত, নানা দোষে দুষ্ট, পাশরাশি দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, ততদিনই তিনি ধর্ম্মরাজ, বিচারপতি ও অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বরের ভীষণ ভাবই সম্মুখে দেখিবেন। কারণ, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই পাপের শাস্তি আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু জীব যখন অনন্ত কৃপাময়ের কৃপায় শিবত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ দোষপাশ রাশির রজস্তমোহংশ হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহার কোনই ভয় নাই, কোন আশঙ্কাও নাই। তখন আর তিনি পরমপিতার ভীষণ ভাব দর্শন করেন না। বরং তিনি তখন অনন্ত প্রেমময়ের সুন্দর ও মধুর রূপই দর্শন করেন, ন্যায়বান পরম-পিতার নিকট হইতে তখন তিনি পাপের শাস্তি পান না, কিন্তু পুণ্যের (ক পুরস্কারই লাভ করেন, ভগবৎ কৃপায় সাধনার উন্নতাবস্থায় আত্মপ্রসাদই প্রাপ্ত হন। ৺বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় গাহিয়াছেন:— "তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়। জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়॥" পাঠক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীও এই সম্পর্কে পাঠ করিবেন। "ত্বং ভীষণো ভীষণ ভাবকানাং পাতুশ্চ পাতা চ ভয়ং ভয়ানাং। ভয়াপহারী বিপদগ্নিবারি হৃন্মোহন স্তেহসুভবেন শান্তিঃ। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" পরম পিতাকে কোন কোন ভক্ত "সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরম্" মন্ত্রে পূজা করেন। এই মন্ত্রে সাধক পরব্রহ্মকে পর পর কি ভাবে দেখেন, তাহা উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাধক পরমপিতাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া ধারণা করেন। পরম পিতার করুণায় যখন তিনি পাপ, দোষ ও পাশরাশি হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি তাঁহাকে শিবম্ বলিয়া জানেন। * উক্ত অবস্থা লাভের পর আরও উপাসনা ও

(ক) পুণ্য অর্থে এই স্থলে আত্মিক সাধন ভজন ও সৎকার্য্য সমূহকে বুঝায়।

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।৫ মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যে শিব শব্দের দুইটী অর্থ করা হইয়াছে। প্রথমটী মঙ্গলময়, দ্বিতীয়টী অবিদ্যা ও অবিদ্যা সম্ভূত

সাধনা দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া পরমপিতাকে সুন্দরম্ বলিয়া জানেন। কারণ, তখন সাধকের হৃদয় হইতে অন্ধকার তিরোহিত হয়। নিজের অন্তর হইতে যখন সকল কৌৎসিত্য অপসারিত হইল, তখন সাধক পরব্রহ্মকে সুন্দর ভিন্ন আর কি ভাবিবেন? ইহার পর সাধক পরম সুন্দরের আকর্ষণে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। যে স্থানেই সৌন্দর্য্য, সেই স্থানেই আকর্ষণ এবং সেই স্থানেই প্রেম অবশ্যম্ভাবিরূপে আবির্ভূত হয়। যখন সাধক পরমপিতার অপার কৃপায় তাঁহার প্রেমে তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তখন তিনি প্রেমময়কে মধুরং বই আর কি ভাবিবেন? তখন তিনি স্বতঃই "পূর্ণমানন্দম্" "পূর্ণমমৃতম্" বলিয়া উঠেন। উক্ত অবস্থা চতুষ্টয় দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে সাধক শিবত্ব লাভ করিলে অর্থাৎ দোষ পাশের রজস্তমোহংশ লয় করিতে পারিলে পরম পিতাকে সুন্দর বলিয়া জ্ঞান করেন।* শিবত্বলাভে পরমপিতাকে সুন্দর বলিয়া জানিবার আরম্ভ হয়, কিন্তু মধুরং জ্ঞানে অর্থাৎ প্রেমে একত্ব লাভে উক্ত জ্ঞানের (সুন্দরং জ্ঞানের) পরিপক্কতা আনয়ন করে। তাঁহারই যে অপরূপ প্রেম সুন্দর মধুর রূপ। সৎপুত্র যেমন বয়স্ক অবস্থায় উপনীত হইয়া বুঝিতে পারেন যে তাহার স্নেহময় পিতা হইতে তাহার বাল্যে বা যৌবনে প্রাপ্ত শাস্তি তাহার মঙ্গলের জন্যই ও তাহাতে তাহার পিতার স্নেহই বর্ত্তমান ছিল এবং সেই শাস্তির জন্য তিনি সৎপথে পরিচালিত হইয়া শুভ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ শিবত্ব প্রাপ্ত সাধক যতই প্রেমময়ের প্রেমে ডুবিতে থাকেন, ততই তিনি বুঝিতে পারেন যে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় প্রাপ্ত শাস্তি পরমপিতার প্রেমেরই দান, আকারের ভেদ মাত্র. ততই তিনি বুঝিতে থাকেন যে

কামাদি দোষ রহিত এবং অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম স্বরূপ চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অত্যন্ত আনন্দ দায়ক। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

* উক্ত অবস্থায় সাধকের শিবত্ব লাভের অবস্থার আরম্ভ মাত্র। অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ ভিন্ন শিবত্ব পূর্ণভাবে লব্ধ হয় না। উহা পূর্ণমুক্তির পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই সম্পর্কে সোঽহং জ্ঞান অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

এই সৃষ্টি তাঁহার প্রেমেরই সৃষ্টি, ইহাতে প্রেম বাদ দিয়া কোন কার্য্যই হয় না, সুতরাং ইহাতে শুভ ভিন্ন অশুভের তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান নাই। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "তাঁহার পূর্ব্বাবস্থায় প্রাপ্ত শাস্তি পরমপিতার প্রেমেরই দান, আকারের ভেদমাত্র" উক্তিতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহাতে কবিত্ব আছে, কিন্তু সত্য নাই। প্রেম কখনও এরূপ ভীষণ শাস্তি দিতে পারেন না। এ বিষয়ে সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে "সৃষ্টির সূচনা" ও "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশদ্বয়ে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা সম্ভূত। পুনরুক্তির ভয়ে এস্থলে এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইল না। সুতরাং ত্রিবিধ গুণের যে কার্য্যই হইবে, তাহার উপর প্রেমের প্রভুত্ব আছে সন্দেহ নাই। তমোগুণের ধ্বংস, রজোগুণের উৎপত্তি ও সত্ত্বগুণের পালনই কার্য্য। সুতরাং তমোগুণ জন্য ধ্বংসও প্রকারান্তরে প্রেমেরই কার্য্য। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে প্রলয় কার্য্যও প্রেম দ্বারাই সংসাধিত হয়। পরমর্ষি গুরুনাথ একটী স্তোত্রে লিখিয়াছেন:— "মঙ্গল চরণে নমি তামসদায়ক (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" তমঃ পরম পিতারই দান। ইহাও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্ট। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আমরা আরও জানিতে পারিব। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে জড় জগৎ ও জীবাত্মা সকলেই অপূর্ণ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। সুতরাং জীবন সাধনাময়। সুতরাং অপূর্ণতা ও পরীক্ষা পদে পদেই বর্ত্তমান। ইতিপূর্ব্বে নানা স্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য যে মহাসত্য, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। "এসব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।" ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে স্থলে প্রেম, সেই স্থলেই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বিপরীত শক্তির বিরোধিতায় বা অন্য কোন কারণে আমাদের অমঙ্গল হইতেছে,

এই আশঙ্কা অমূলক। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে স্থিতি ও প্রেমেতেই লয়। "যে স্থলে প্রেম, সেই স্থলেই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান" উক্তির উপরও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আমরা পৃথিবীতে দেখি যে মাতা পিতা সন্তানের জন্য ও দম্পতি ও বন্ধুদ্বয় পরস্পরের জন্য যে কার্য্য করেন, তাহা সকল সময় মঙ্গল উৎপাদন করে না, বরং তাহা দ্বারা কখনও কখনও অমঙ্গলই উৎপন্ন হয়। ইহা সত্য। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মাতা পিতা যখন স্নেহ দ্বারা এবং দম্পতি এবং বন্ধুদ্বয় যখন প্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন, তখন স্নেহের বা প্রেমের পাত্রের মঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু তাহারা অপূর্ণ, সুতরাং তাহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও কাহারও পক্ষে উহা অত্যন্ত ভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহারা মঙ্গল সম্পাদন করিতে যাইয়া স্নেহের বা প্রেমের পাত্রের সময় সময় অমঙ্গলই করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম পিতার সম্বন্ধে ত তাহা সম্ভব নহে। কারণ, তিনি নিত্যই অনন্ত জ্ঞানাধার। তিনি নিত্যই জানেন যে কাহার কোন অবস্থায় কি প্রকারে মঙ্গল উৎপন্ন হইবে। সুতরাং আমরা অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার বিধানে নিত্য মঙ্গলই প্রাপ্ত হই। এমন কি আমাদের নিজ দোষে বা অন্য দ্বারা যে অমঙ্গল সৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহার অপার প্রেম গুণে মঙ্গলেই পরিণত হয়। স্থূল, মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল সৃষ্টিতে নাই। ব্রহ্ম সঙ্গীতে আছে—"মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম, মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল-নিদান।" ইহা পরম সত্য। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন ঃ—

অনন্ত মঙ্গলময় পিতা যে আমার।
মঙ্গলে এ অমঙ্গল রহে গুণে যাঁর।
তিনি যে মঙ্গলময়, চাহ কি তার পরিচয় ?
পরিচয় বিশ্বময়, হের একবার।
বাসনা মঙ্গল করে, কিন্তু নাহি শক্তি ধরে,
হেন নরে তাহা পারে, মঙ্গল গুণেতে তাঁর।

অমঙ্গল রাশি হ'তে সুমঙ্গল বিধি মতে;
সদা জনমে জগতে মঙ্গল ভাবেতে তাঁর।
আশু-দুখ-কণা হে'রে কেন চপলতা ধরে,
দেন বিষ কণা 'পরে বিষনাশী সুধাভার।

ব্রহ্ম যে অনন্ত প্রেমময়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, জগতে প্রেম বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত-ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই সৃষ্টির মূলে অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার প্রেমময়ী ইচ্ছা। তিনি যে নিত্যই জীব সমূহকে প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নানাস্থলে বিশেষতঃ "সোহহং জ্ঞান" ও "মায়াবাদ" অংশদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে। আমরা যে শাস্তি পাই, ইহাতে অবশ্যই বলিতে হইবে যে একজন শাস্তা আছেন, যিনি আমাদের অন্যায় কার্য্য সমূহ বিচার করিয়া শাস্তি দেন। এখন প্রশ্ন হইবে যে শাসন করিবার অধিকার কাহার আছে? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যাহার প্রেম আছে, তিনিই কবল তাহার প্রেমের পাত্রকে শাসন করিতে পারেন। অন্য কাহারও উপর শাসনের অধিকার নাই। সংসারে দেখা যায় যে, যে যাহাকে ভাল বাসে না, সে তাহাকে শাসন করিতেও যায় না। নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিকে কেহ শাসন করিতে প্রস্তুত নহেন। হৃদয় প্রেমশূন্য, অথচ অন্যায় দেখিলেই শাসন করিতে গেলে বহু সময়েই অনর্থপাত হয়। সংসারে আরও দেখা যায় যে স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় পিতা তাহাদের বিপথগামী পুত্রকে শাসন করেন। উদ্দেশ্য এই যে সেই শাসনে তাহার মঙ্গল সাধিত হইবে। মাতা পিতা যখন শাসন করেন, তখন তাহাদের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু তাহারাও মানুষ, তাই সময় সময় সেই স্নেহের শাসনেও ক্রোধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরম প্রেমময় পিতায় দোষলেশাশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। কারণ, তিনি নিত্য নির্ব্বিকার, দোষপাশ লেশ শূন্য শিব, নিত্য নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন দেবতা। সুতরাং তাঁহার শাসন সর্ব্বদাই অবিমিশ্র প্রেম শাসন। অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই শাসন ন্যায় জন্য এবং ন্যায়ানুমোদিত, কিন্তু তাঁহাতে নিত্য প্রেম

বর্ত্তমান বলিয়া উহা মঙ্গলই উৎপাদন করে। এস্থলে "ব্রহ্মের জীব-ভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী অংশে ৬৬৩-৬৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বিষয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন। উহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে মানুষ যতই বিপথগামী হউক, না কেন, নিত্য প্রেমময়ের অপূর্ব্ব প্রেম সর্ব্বদাই তাহার সাথে সাথে বর্ত্তমান থাকে এবং প্রেমের সেই অব্যর্থ আকর্ষণ যথা সময়ে বিধিমতে তাহাকে আবার সরল পথে উচ্চতর স্থানে আনয়ন করিবে। ভক্ত রজনীকান্ত গাহিয়াছেন :—
"আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া, ভাবি, ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।"
পার্শ্বের লিখিত চিত্রে দেখা যাইবে যে কখ নামক সরল রেখাই আমাদের মোক্ষ লাভের একমাত্র সরল সত্য পথ। যদি কেহ 'গ' বিন্দু হইতে বক্রপথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ বিপথগামী হন, তবে

(*Note* খ হইতে ঙ, খগঘঙ ও খগচঙ রেখা সমূহের দূরত্ব সম-পরিমাণ হওয়া চাই।)

তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার দ্বারা তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বুঝিতে হইবে যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা তাহার জীবনেও সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধন করিবেন। সুতরাং তিনি অধিক দূরে যাইতে পারিবেন না। কারণ তাহার স্বাধীনতাও অন্যান্য গুণের ন্যায় সীমাবদ্ধ। অপরদিকে নিত্য প্রেমময়ের প্রেম তাহাকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে। সেই প্রেমের আকর্ষণ জন্যই তাহাকে পুনরায় একমাত্র সরল পথে ফিরিতে হইবে। ধরা যাউক,

যে সেই পরিবর্ত্তনের স্থান "ঘ" বিন্দু। তাই তিনি বক্র পথে ঘুরিয়া ঙ বিন্দুতে পুনরায় সরলপথ প্রাপ্ত হন। বক্রপথে ঘুরিবার কারণ এই যে তাহার মধ্যে জাগরণ আসে বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ হৃদয় হইতে বিপথগামিত্বের কারণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করিতে পারেন না। তাই তাহার ঘুরিয়া আসিতে হয় এবং তাহার দীর্ঘকাল ব্যয়িত হয়। আবার যদি অন্য কোন অত্যধিক পাপে পাপী হন, অর্থাৎ অধিকতর বিপর্থগামী হন, অর্থাৎ যদি তিনি 'গ' বিন্দুতে বক্রপথ অবলম্বন করিয়া 'ঘ' বিন্দুতেও পরিবর্ত্তিত না হইয়া আরও পাপের পথে অগ্রসর হইয়া 'চ' বিন্দু অর্থাৎ পাপের চরম স্থানে উপস্থিত হন, তবে তিনি অনন্ত করুণাময়ের করুণায় সরল রেখা ভাবেই 'ঙ' বিন্দুতে উপস্থিত হইবেন। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। বঙ্গদেশে জগাই মাধাই, ইউরোপে সলের এবং আরব দেশে ওমরের পরিবর্ত্তন এই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—
"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে?
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া—এনেছ তোমার দুয়ারে" এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কাহারও পক্ষে ক্রমশঃ সৎপথ-প্রাপ্তি এবং কাহারও পক্ষে অল্প সময়ে উহার প্রাপ্তির কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে প্রথমোক্ত বিপথগামীর পক্ষে অন্বয়ী সাধনা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অত্যধিক পাপে লিপ্ত থাকায় বিপথের শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার জীবনে ব্যতিরেকী সাধনা হইয়াছে। তাই তিনি পরিবর্তনের পর অল্পেই পুনরায় সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। একটী বলকে যত উর্দ্ধ হইতে যত জোড়ে কঠিন ভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়, উহা তত জোড়ে ততোঽধিক উচ্চে উত্থিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত হইতে সৎপথ প্রাপ্তির কাল অল্পতর হইয়াছে বটে, কিন্তু 'গ' বিন্দুতে বক্রপথ অবলম্বনের মুহূর্ত্ত হইতে সৎপথ প্রাপ্তির সময় অন্য ব্যক্তির সহিত সমতুল। অতএব আমরা যে ভাবেই চলি না কেন, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত মঙ্গলময় পরম-

পিতা আমাদিগকে তাঁহার প্রেম ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেই,ইহা ধ্রুব সত্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ইহার উত্তরও প্রোক্ত উদ্ধৃত অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। জীবের স্বভাব প্রেম। তিনি সর্ব্বদাই সজ্ঞানে অজ্ঞানে প্রেমময়ের সহিত অপূর্ব্ব প্রেম মিলনে মিলিত হইতে চাহেন। যতকাল না সেই মিলন সম্ভব হইবে, তত কালই তিনি দুঃখ ভোগ করিবেন, ততকালই পরম সুখের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে চাহিবেন বটে, কিন্তু সেই অমূল্য রত্ন তাহার নিকট দুর্ল্ভই থাকিবে। সকলেই প্রকৃত সুখ চায়। সুতরাং জীব তখন সেই প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইবেন এবং অসৎ পথ ত্যাগ করিয়া সাধন ভজনে নিযুক্ত হইবেন এবং সৎপথে চলিতে থাকিবেন। যদি কেহ বক্র পথে চলেন, তবে তিনিও একদিন সৎপথ পাইবেন বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্লেশ, অনুতাপ ও গ্লানি অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু নিত্য সৎপথাবলম্বীর পক্ষে সর্ব্বদাই সুখলাভ এবং তিনি পরম দয়াল পরম পিতার দয়ায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া চির সুখী হন। তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। উভয় পথেরই গন্তব্য স্থান একই। যেনেষ্টং তেন গম্যতাম। এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ কবি নজরুল ইসলামের রচিত সঙ্গীতটী নিম্নে উদ্ধার করিলাম। "ব্যথা দাও বলে, কে বলে তোমায় নিরমম? জানি তুমি প্রিয়, প্রিয়তর হতে প্রিয়তম। অন্তরে মম দিবস রাত, দাও প্রিয় মোরে যত আঘাত, ততই আমারে টেনে লও কাছে বন্ধু সম। আমার চলার পথে যে কাঁটা, বিছায়ে চরণ রাঙ্গাও, সে রঙে আমার ভুলের নেশার স্বপন ভাঙ্গাও। নয়নে দিয়েছ নয়ন বারি, তাইতো তোমারে ভুলিতে নারি, অশ্রুকণা যে তোমার প্রেমের স্মরণ মম।।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এই সৃষ্টি লীলা প্রেম লীলাময়ের প্রেমলীলা মাত্র। অনন্ত প্রেমময় পিতা আমাদিগকে তাঁহারই অনন্ত গুণে বিভূষিত করিবার জন্যই এই লীলা করিতেছেন। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে নিত্য প্রেমাকর্ষণে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার প্রেমাকর্ষণ হইতে অধিকতর

শক্তিশালী আকর্ষণ আর জগতে নাই। সুতরাং আমাদের সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তাঁহারই দিকে অবিরত আকৃষ্ট হইতেছি। পরম পিতার অপার দয়ায় জীব সমূহের প্রত্যেকেই স্বাধীন ইচ্ছা লাভ করিয়াছেন। পরম পিতা অনন্ত স্বাধীন। জীব তাঁহারই অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবেরও যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে বলিতে হইবে, উহা যতই সীমাবদ্ধ হউক না কেন। ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার প্রেমময়ী উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই প্রত্যেক জীবে তাঁহারই অনন্ত গুণের বিকাশ সংসাধন করিবেন। এই বিকাশের প্রণালী অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে প্রেমময় বিধাতা জীবকে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারাই সেই উন্নতি বা বিকাশ সাধন করাইতেছেন। শিল্পী যেমন মৃৎপিণ্ড বা প্রস্তর খণ্ডকে নিজ স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা নানা মূর্ত্তিতে পরিণমন করে, কিন্তু সেই পরিণতির জন্য মৃৎপিণ্ডের বা প্রস্তর খণ্ডের কোনই স্বাধীনতা সুতরাং দায়িত্ব নাই, পরম প্রেমময় পরম পিতা কখনই জীব সম্বন্ধে সেইরূপ বিধান করেন নাই। বরং ইহাই তাঁহার প্রেমের বিধান যে জীব সমূহ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার যথোপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা তাহাদের গুণরাশির ক্রমশঃ বিকাশ সাধন করেন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে জীব কাষ্ঠ লোষ্ট্র নহেন এবং তাহারও স্বাধীনতা আছে এবং এই স্বাধীনতা জড় ও জীবের পার্থক্য সূচক একটী প্রধান চিহ্ন। আরও বলা যাইতে পারে যে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারই আমাদের উন্নতি ও অবনতি আনয়ন করে। যখন স্বাধীনতা আমাদিগকে সৎপথে বা অনুকূল পথে পরিচালনা করে, তখন উহাকে স্বাধীনতাই বলা হয়। কিন্তু যখন উহা অসৎপথে বা বিপরীত পথে পরিচালনা করে, তখন উহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। আমাদের সম্মুখে দুইটী পথ প্রসারিত রহিয়াছে। আবার স্বাধীনতাও আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতার সৎ বা অসদ্ব্যবহার দ্বারা উন্নতি বা অবনতি অর্জ্জন করিতে পারি। আমরা যদি জড় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান ও স্বাধীনতা শূন্য হইতাম, তবে আমাদের উন্নতি

বা অবনতি সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকিত না। প্রস্তর খণ্ডের উহাদের কিছুই নাই। সুতরাং দেখা যায় যে আমাদের জ্ঞান ও স্বাধীনতা আছে বলিয়াই আমরা সৎ ও অসৎপথ অবলম্বন করিতে পারি ও করি এবং সেই জন্যই উন্নতি বা অবনতি, সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হই। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে আমাদের স্বাধীনতা থাকা উচিত কিনা। স্বাধীনতার অপব্যবহারই যখন অবনতি ও দুঃখ আনয়ন করে, তখন উহা না থাকিলেই ত ভাল হইত। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে প্রোক্ত উভয় ভাবের মধ্যে আমরা স্বাধীনতাকে পছন্দ করিব। কখনই জড় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান ও স্বাধীনতা বর্জ্জিতভাবে থাকিতে আমাদের ইচ্ছা থাকা উচিত নহে। প্রেমময় বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্বাধীনতাই দেন নাই, সদসৎ বিচারবুদ্ধিও দিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিবেক থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, তবে উহার ফলের জন্য আমরাই দায়ী। সর্ব্বোপরি বুঝিতে হইবে যে স্বয়ং ব্রহ্মই দেহযোগে স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ জীবভাবে ভাসমান। ব্রহ্মের অনন্ত গুণই জীবে ক্ষুদ্র ভাবে বর্ত্তমান। এই অনন্ত গুণের পূর্ণ বিকাশ সাধনই জীবের সাধনা। ব্রহ্মে যখন অনন্ত গুণ বর্ত্তমান, তখন তাঁহাতে অনন্ত স্বাধীনতা নামক গুণও বর্ত্তমান। সুতরাং অংশভাবে ভাসমান জীবেও সেই গুণ ক্ষুদ্র ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদিগেতে অবশ্যম্ভাবিরূপে স্বাধীনতা আগমন করিয়াছে। ব্রহ্মের স্বভাবে যখন স্বাধীনতা অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান, জীবেও উহা সীমাবদ্ধ ভাবে থাকিবেই। ইহার বাধা হইতে পারে না। আবারও প্রশ্ন হইবে যে জগতে দুইটী পথ বর্ত্তমান কেন, একমাত্র সৎপথ থাকিলেই হইত। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে উহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্যই। সেই জন্যই আমাদের সম্মুখে বাধা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে নানা স্থলে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আমরা স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার দ্বারা যতই অগ্রসর হইব, ততই আমাদের উন্নতি লাভ হইবে। অতএব অনুকূল পথে— একমাত্র সত্য পথে না চলিয়া যদি কেহ স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা

বক্র পথে চলেন, তবে তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্তু অবশেষে তাহাকে প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথ অবলম্বন করিতেই হইবে। বক্রগতির পরিমাণ যতই অধিক হইবে, দুঃখের বা শাস্তির পরিমাণও সেইরূপই হইবে। কারণ, প্রেমময় পিতা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে নিজ অনন্ত প্রসারিত প্রেম ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেনই। সুতরাং আমরা যতদূরেই যাই না কেন, তাঁহার অব্যর্থ প্রেমাকর্ষণ আমাদিগকে তাঁহার দিকে টানিতে থাকিবেই। সেই আকর্ষণের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই এবং উহা অব্যর্থ। সুতরাং একদিন না একদিন তাঁহার শ্রীচরণতলে উপনীত হইবই। জগতে দেখা যায় যে প্রেমের শক্তি অপরাজেয়। প্রেম অপ্রেমকে জয় করিতে পারে ও করে। অপ্রেমের যে জয় দেখা যায়, তাহা অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু প্রেমের জয় চিরকাল স্থায়ী। সেইরূপ আমরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া সাময়িক ভাবে ভগবৎ প্রেমাকর্ষণ হইতে দূরে বিচরণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান ব্রহ্মপ্রেমের জয় হইবেই হইবে এবং সেই অব্যর্থ আকর্ষণই আমাদিগকে তাঁহারই নিকট উপস্থিত করিবেই করিবে। একটী অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। একটী শান্ত, সুশীল এবং মাতাপিতার বাধ্য বালক। তাহার মাতা পিতা যে সকল সদুপদেশ দেন, তাহা সে পালন করে। সুতরাং সেই বালকটী যে কেবল বিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ হয়। সৎপথে চলিতে কখনও তাহার দ্বিধা হয় না এবং সেই জন্য সে সকলের প্রীতি ভাজন হয় এবং ক্রমশঃ উন্নতির শিখরে আরোহন করিতে পারে। অন্য একটী বালক দুষ্ট, অশান্ত এবং সর্ব্বদাই মাতাপিতার অবাধ্য। সে বিদ্যালয়ের নিকটে যাইতেও প্রস্তুত নহে। মাতাপিতা প্রথমতঃ তাহাকে নানাবিধ সদুপদেশ দান করেন, নানা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাহার মতি গতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন তাহার প্রতি নানা প্রকার শাস্তির বিধান করেন। যদি মাতাপিতার স্নেহ মমতা অফুরন্ত

হয়, তবে তাহারা কখনই পুত্রের সংশোধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন না। তাই তাহারা অবশেষে তাহাদের স্নেহ মিশ্রিত শাসন দ্বারা বিপথগামী সন্তানকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। উপরে যাহা উক্ত হইল তাহার অর্থ এই যে মানব যদি উন্নতির পথে অনুকূল ভাবে চলেন, তবে তিনি প্রেমময়ের প্রেমাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ আনন্দে অগ্রসর হইবেন। আর যদি কেহ প্রতিকূল পথে চলেন, তবুও সেই প্রেমাকর্ষণ একই ভাবে তাহাকে টানিতে থাকিবে। কিন্তু তাহার প্রতিকূল গতির জন্য তাহার বেগ পাইতে হইবেই। কারণ, একদিকে প্রেমময়ের অব্যর্থ প্রেমাকর্ষণ এবং অন্য দিকে স্বাধীনতার অপব্যবহারকারী উচ্ছৃঙ্খল মতি মানবের বিপরীত গতি। এই বেগই শাস্তি এবং ইহাকেই আমরা অমঙ্গল বলি। দোটানায় পড়িলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—ত্রিবিধ অবস্থায়ই যে দুঃখ লাভ অবশ্যম্ভাবী, তাহা সকলেরই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের জয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং আমাদের মঙ্গলও অনিবার্য্য। অতএব আমরা গাইতে পারি :—
"তোমারি জয়, তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়। যে জন চায় সে ত তোমায় পায়, যে জন না চায় সেও তোমায় পায়। ঘোর পাপের পাপী মানব তনয়, প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়, তব প্রেম ফাঁদে যখন প'ড়ে যায়, তখনই সে তৃণ-সম হয়। অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়, ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়, তব প্রেমাস্বাদন যদি একবার পায়, শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায় (তৃণসম) (কৈলাস চন্দ্র সেন-ব্রহ্মসঙ্গীত)"। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"কত যে করুণা তাঁর, বারেক স্মররে মন। অযাচিত করুণার নাহি হেন নিদর্শন। যে জন স্মরে না তাঁরে, পড়িয়া কলুষ ঘোরে, নিজ গুণে তারি তারে, করেন কোলে ধারণ। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে তৃতীয় ব্যক্তি যখন স্বাধীন, তবে তিনি কেন পাপের পথে অনন্ত কাল চলিতে পারিবেন না। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, বিষয়টীকে আরও সরল

করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথমতঃ জীব ব্রহ্মের অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং তাহাতে অনন্ত স্বাধীন পরব্রহ্মের পূর্ণ স্বাধীনতার একটু অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বর্ত্তমান। জীবের স্বাধীনতা কখনই পূর্ণ নহে, উহা সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাও (স্বাধীনতার অপ-ব্যবহারও) সীমাবদ্ধ। সে কখনও অনন্ত ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না। তাহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সেই ইচ্ছা পূরণে নিতান্তই অক্ষম। আমাদের সকল ইচ্ছা, তাহা সৎই হউক্ অথবা অসৎই হউক্ যে পূরণ হয় না, বরং ইহা যে প্রায় সর্ব্বদাই প্রতিহত হইতেছে, তাহা আমরা নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিব। এস্থলে পশু প্রবৃত্তির একান্ত অধীন ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার সীমাবদ্ধতার একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। গোপালক তাহার রক্ষিত গরুটীকে এমন ভাবে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে যে উহা যেন তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই বিচরণ করিয়া উহার আহার গ্রহণ করে, কখনও যেন সীমার বাহিরে যাইয়া তাহার (গোপালকের) অথবা অন্যের কোন অনিষ্ট না করে। পশুটী যেমন রজ্জু দ্বারা রচিত বৃত্ত অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, কারণ বন্ধন রজ্জু এবং বন্ধনের মূল খুটা (কাষ্ঠ খণ্ড) উহাকে বাধা দেয়, সেইরূপ পশু প্রবৃত্তির দাসত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিও অত্যধিক দূরে যাইতে পারে না। কারণ, তাহার বন্ধন রজ্জু অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম এবং স্বয়ং অনন্ত প্রেমের আধার পরব্রহ্মই সেই কাষ্ঠখণ্ডের স্থানীয়। যদি বলেন যে গরু উহার বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া দূরে যাইতে পারে এবং বন্ধনের মূল খুটাকেও সে উন্মূলন করিতে পারে, সেইরূপ সেই ব্যক্তিই বা কেন উহা করিতে পারিবে না? ইহার একমাত্র উত্তরই এই যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কারণ, ব্রহ্মের প্রেমরজ্জু ছিন্ন করা যেমন অসম্ভব, প্রেমময় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াও তেমনি অসম্ভব। এস্থলে ইহাও আমাদের বুঝিতে হইবে যে বন্ধন রজ্জু যদি বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয় ও উহাকে যদি বিশাল বটবৃক্ষের সহিত বন্ধন করা হয়, তবে পশুর পক্ষে সেই বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করা অসম্ভব। জগৎ ও জাগতিক

ব্যাপার যে সীমাবদ্ধ, ইহা আমরা জানি। পাপ কার্য্যের অধিকাংশের সহিত জাগতিক সম্পর্ক অত্যধিক। সুতরাং পাপ কার্য্যেরও সীমা আছে। জাগতিক কোন ব্যাপারই যখন অসীম নহে, তখন পাপ-কার্য্যও অসীম হইতে পারে না। অন্বয়ী ও ব্যাতিরেকী সাধনা সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মূল প্রশ্নটীর উত্তর ব্যাতিরেকী সাধনার তত্ত্বে নিহিত আছে। পরমর্ষি গুরুনাথ এই সম্বন্ধে "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থের ভক্তি প্রবন্ধে এবং "তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা" গ্রন্থের 'ঈশ্বরের স্বরূপ' অংশে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনু-সন্ধিৎসু পাঠক উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত-ভাবে জানিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অংশও যতদূর সম্ভব তাঁহারই ভাষায় লিখিত হইল। "জগতে যত প্রকার সাধনা আছে, সকলই দুই প্রকার। যথা—অনুকূল ভাবে সাধনা বা অন্বয়ী সাধনা এবং বিপরীত ভাবে সাধনা বা ব্যতিরেকী সাধনা। মনে কর পান দোষাসক্ত ব্যক্তির পান দোষ দূর করিতে হইবে। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে ;—প্রথমতঃ অল্পে অল্পে কমাইয়া ঐ দোষ ত্যাগ করান। ২য়তঃ, ঐ দোষের অতি বৃদ্ধি দ্বারা ঐ দোষ পরিহার করান।" "এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটী অন্বয়ী সাধনা ও শেষটী ব্যতিরেকী সাধনা"। ব্যতিরেকী সাধনা অপেক্ষা অন্বয়ী সাধনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। "যে সকল ব্যক্তি স্বকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে অন্বয়ী সাধনা আর তাহাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তাহাদিগের পক্ষেই ব্যতিরেকী সাধনা কর্ত্তব্য।" এক্ষণে আমাদিগের প্রশ্ন সম্বন্ধে উত্তর দিতে "আমাদিগকে প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক যে সকল মনোবৃত্তি দিয়াছেন, তৎসমুদায় দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ই সম্পন্ন হইতে পারে।" "কাম দ্বারা যেমন পাপ হইতে পারে, তেমনিই উহার প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রভৃতি বহু পুণ্যও হইতে পারে।" আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে আমাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। "আমাদিগকে দ্বিতীয়তঃ স্বীকার

করিতে হইবে যে, মানব মন অত্যন্ত কার্য্য প্রবণ, কোনরূপ কার্য্য না করিয়া উহা থাকিতে পারে না। আপন আপন মনের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বিষয়টী সহজে প্রতীয়মান হইবে।" আমাদিগকে তৃতীয়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে "কার্য্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উহার করণগুলির অবসাদ হয় এবং কার্য্যের পরাকাষ্ঠা হইলে কার্য্যের করণগুলিরও অবসাদের পরাকাষ্ঠা হয়, অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা কার্য্য করিতে একেবারে অসমর্থ হইতে হয়। মনে কর তুমি হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যখন ঐ পরিশ্রম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, তখন হস্ত পদাদিও অবসন্ন হইয়া আসিবে। আর যখন ঐ পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা হইবে, তখন হস্ত পদাদিরও অবসাদের পরাকাষ্ঠা হইবে, অর্থাৎ তুমি উহাদিগের দ্বারা কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে" "আমাদিগকে ৪র্থতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা আমাদিগের ছিল, তাহার অত্যন্ত অভাব হইলে আমরা তাহার জন্য হাহাকার করি ও তাহা পাইবার জন্য স্বতঃই উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হই, অথবা যে যে পদার্থ আমাদিগের প্রাপ্য বলিয়া জানি, তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎমাত্রও না পাইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হই এবং প্রাপ্তির উপায় আশ্রয় করিয়া উহা পাইতে চেষ্টা করি।" "এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ব্যক্তি অধর্ম্ম কার্য্য করিতে অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অধর্ম্মসাধনা বৃত্তিগুলি অবশ্যই কার্য্যাক্ষম হইবে, আবার মন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং সে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি আশ্রয় করিবে? এইটী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ন্যায় তাহার ধর্ম্ম কার্য্য সাধনের মূল। অথবা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই পুনরায় ব্যাতিরেকমুখী হইয়া যাইবে। এই রূপেই অতিশয় অধর্ম্মচারিগণ ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।" "অপর, যাহারা ধর্ম্মের কণা মাত্র লাভ করিয়াও অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ৪র্থ স্বীকৃতের ১ম অংশ অনুসারে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইবে। আর যাহারা জন্মাবধি ধর্ম্মের মুখ দেখেন নাই এবং কার্য্য দোষে অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে, তাহারাও ৪র্থ স্বীকৃতের

দ্বিতীয় অংশ অনুসারে ধর্ম্ম করা তাহাদের উচিত বলিয়া যখন জানিতে পারিবে, তখন উহার জন্য ব্যাকুল হইবে এবং উহা পাইবার উপায় আশ্রয় করিয়া তাহা পাইতে চেষ্টা করিবে।” অতএব এখন আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে পাপের দিকে অবাধ এবং অসীম গতি ত নাইই, বরং ইহা ধ্রুব সত্য যে তাঁহার অপরাজিত মঙ্গল বিধানে সকলেরই অবশেষে তাঁহারই পাদপ্রান্তে উপনীত হইতে হইবে। “নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়”। অনন্ত প্রেমময়ের রাজ্যে অসংখ্য প্রেমের বিধান নিয়ত কার্য্য করিতেছে। ইহা যে ভগবৎ প্রেমে মগ্ন সাধকই জানিতে পারেন, তাহা নহে, কিন্তু গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। আমরা যদি শারীরিক বিধানের বিষয় চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে শরীরে যদি কোন প্রকারের বিষ প্রবিষ্ট হয়, তবে দেহ সেই বিষকে বাহিষ্করণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দেহে বিষ প্রবেশ করিলেই উহাকে তাড়াইবার জন্য দেহের বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হয়। ইংরেজীতে এই শক্তিকেই Power of resistance বলা হয়। এই শক্তি যে দেহে যত অধিক, সেই দেহে বিষক্রিয়া তত অল্প। সুতরাং সেই দেহ তত দীর্ঘজীবী। যদি বিষ বর্জ্জন করিতে দেহের চেষ্টা না থাকিত, তবে দেহের আশু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইত। সেইরূপ দোষ ও তজ্জনিত পাপ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিলে তাহা দূর করিয়া দিবার জন্য আত্মা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। যে পর্য্যন্ত না উহা সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত হয়, ততক্ষণই এই প্রচেষ্টা চলিবে। কারণ, আত্মার স্বভাব দোষ পাশ রাহিত্য এবং তিনি হৃদয়কেও সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে চাহেন অথবা হৃদয়কে আত্মার গুণরাশিতে বিভূষিত করাই জীবনের সাধনা এবং উদ্দেশ্য। আবার পরম প্রেমময় পরম পিতার অব্যর্থ প্রেমাকর্ষণ নিত্য বর্ত্তমান। আমাদিগকে তাঁহার নিকট যাইতেই হইবে, তাঁহার মত হইতেই হইবে। সুতরাং উহার বিরোধী যাহা পথে দাড়াইবে, তাহা বহিষ্করণ করিতেই হইবে। এই দ্বন্দ্ব হইতেই শারীরিক রোগের ন্যায় আমাদের ভাষায় কথিত অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। এখন

প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে বিষ ত সময়সময় দৈহিক শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলবান হইয়া দেহকে নিপাত করে। তবে কি দোষপাশও সেই প্রকার আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? যদি তাহাই হয়, তবে মঙ্গল কি প্রকারে সংঘটিত হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পার্থিব দেহ ত চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু আত্মা ত অমর। তিনি ত স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহ দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত। তিনি যদি এক দেহে দোষপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে না পারেন, তবে পরলোকে সূক্ষ্মদেহে অথবা পুনর্জ্জন্মে তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন, এবং যতদিন না মুক্ত হইতে পারিবেন, তত দিনই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে এবং যুদ্ধ জন্য যে অশান্তি, তাহা তিনি ভোগ করিবেন। এই অশান্তিকে অমঙ্গল বলা সঙ্গত হইবে না। ইহা জীবনের লক্ষণ। যে জীবন দোষপাশ মুক্তও নহে এবং যাহার পাপের সহিত সংগ্রামও নাই, সেই জীবন ত মৃত জীবন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীবন পরীক্ষাময়, সুতরাং যুদ্ধময়। সুতরাং আমরা সজ্ঞানে অজ্ঞানে দোষ পাশের সহিত, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতেছি। প্রত্যেক জীবের জীবনেই ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা চলিতেছে। অতএব দেখা যায় যে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে সুতরাং মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের স্থান নাই। এস্থলে পাঠক "স্রষ্টার বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রেমের শক্তিই বলবত্তমা। সুতরাং প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে প্রেমের জয়ই সুসম্পন্ন হইবে। সুতরাং মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে পাপ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার প্রেম, তাঁহার করুণা অনন্ত অসীম। সুতরাং প্রেমের জয় অবশ্যম্ভাবী। জড় জগতেও যে দুইটী বিপরীত শক্তির কার্য্যে মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আকর্ষণ ও বিকর্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই দুইটী বিপরীত শক্তি জগতে কার্য্য না করিত, তবে সৃষ্টি ও স্থিতি সম্ভবই হইত না। পৃথিবীতে যদি রাত্রি না থাকিয়া কেবল দিনই থাকিত, তবে উহা সাহারা মরুভূমিতে অথবা তাহা হইতেও আরও ভীষণতর অবস্থায় পরিণত হইত। যে বসন্তকাল

কবিদিগের গানে কতই সুন্দর ও মধুররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যে বসন্ত-কাল Wordsworth প্রভৃতি কবিদিগকে উন্মাদ প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, যে বসন্তকাল বিরহী ও বিরহিনীকে উন্মাদ অবস্থায় আনয়ন করে বলিয়া শুনা যায়, যে বসন্তকালে বৃক্ষলতা সমূহ সতেজ হইয়া নববেশ ধারণ করে, যে বসন্তকালে মলয়ানিল প্রবাহিত হইলে মৃতপ্রায় রোগী সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, যে বসন্তকালে সর্ব্বদিকে নানা-বিধ সুরভিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া মধুলোভী ভ্রমরদিগকে সর্ব্বদা আহ্বান করে, যে বসন্তকালে কোকিলের কুহু ধ্বনি এবং নানাবিধ বিহঙ্গের সুমধুর কূজনে সর্ব্বদেশ পরিপূর্ণ হয়, সেই একমাত্র বসন্ত থাকিলেই কি পৃথিবীতে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম? বর্ষা না হইলে আমাদের খাদ্য শস্য কোথায় হইতে আসিত? গ্রীষ্ম ও শীত না থাকিলেই বা নানা প্রকার শস্য ও ফল ফুল কোথায় হইতে পাইতাম? এক কথায় বলিতে গেলে উক্ত তিন ঋতু না থাকিলে বসন্ত কালের মূল্য কি এত বৃদ্ধি পাইত? দিবা, রাত্রি ও ষড়ঋতু না থাকিলে জীবন দুর্ব্বহ হইত। মনুষ্যকৃত Parliament এও দেখা যায় যে উহাতে একটী বিরুদ্ধ দল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবেই। এই বিরুদ্ধ পক্ষ না থাকিলে উক্ত সভা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এক পক্ষ যাহা করিবে, তাহাই নির্ব্বিচারে আইনে পরিণত হইলে উহাতে যে বিশেষ বিশেষ ত্রুটী থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত। স্থূল, বিরুদ্ধ শক্তি সমূহ (opposing forces) বর্ত্তমান না থাকিলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে বিশ্ব পর্য্যন্তের সংস্থান ও উন্নতি অসম্ভব হইত। সুতরাং প্রকৃতিতে এবং জীবের জীবনে বিরুদ্ধ শক্তি মঙ্গলের জন্যই কার্য্য করে, ইহা সুনিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে বিপরীত গুণের অপূর্ব্ব একত্ব জন্যই জগতে চিরকাল মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের মধ্যে কতগুলি বৃত্তি আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলিকে রিপু বলা হয়। উহারা আমাদের এতদূর শত্রুতা সাধন করে যে উহাদের মধ্যে কতক-

গুলিকে রিপু আখ্যা দান করা কর্ত্তব্য। উহাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। উহাদের ভয়ে আমরা সর্ব্বদা অস্থির। এমন কোন অপকর্ম্ম নাই, যাহা এই ষড়রিপুর জন্য অনুষ্ঠিত না হয়। ইহাদের লয় সাধন না করিতে পারিলে মুক্তির আশা কোথায়? কিন্তু ইহাও প্রমাণ করা যায় যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ উহারাও প্রয়োজনীয়. উহারাও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই, উহাদের সৃষ্টিরও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, উহাদের অস্তিত্বও সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পাদনের অনুকূলেই, প্রতিকূলে নহে। "উহারাই সুমহান্ গুণ নিচয় লাভ করিবার নিদান। যেমন বায়ু না থাকিলে ক্ষণমাত্র বাঁচিয়া থাকা যায় না, আবার বায়ুর প্রবল ভাব সংঘটিত হইলে জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া যায়; যেমন অগ্নি না থাকিলে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ কর্ম্মই প্রায় অসম্পন্ন থাকে, আবার অগ্নি ঘোরতররূপে প্রজ্জ্বলিত হইলে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে; তদ্রূপ, ব্যুৎক্রমে চিন্তা করিলে যেমনই কামাদির অতি প্রভাবে পাপ, তাপ ও অশান্তির পরাকাষ্ঠা সংঘটিত হয় এবং পরিশেষে ম্লান বদনে বিষণ্ণ চিত্তে দেহ ত্যাগ করিতে হয়, তেমনই উহারা না থাকিলে প্রেমাদির বিকাশ হইতে পারে না।"* কাম আদি রিপু এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান রিপু ইহার সম্বন্ধে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কামের ন্যায় আমাদের শত্রু আর নাই এবং উহার অধিকার সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যাপিয়া। কিন্তু ইহা না থাকিলে জীব সৃষ্টি অসম্ভব হইত। আবার সাধনা দ্বারা কামই যে দোষাংশ বিবর্জ্জিত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা আমরা ২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে দেখিয়াছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রেমই দেহ সংসর্গে আগমন করিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই কামের আকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রেমের বৃদ্ধি হইলে কাম উহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ সম্বন্ধেও ঐরূপই বলা যাইতে পারে। উহা যেমন বহু অনিষ্টের মূল, তেমনি প্রথম অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ক্রোধ শূন্য হইলে

* তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

সেই ব্যক্তি পদে পদেই বিপদে পতিত হয়। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ক্ষমা প্রদর্শন করিলে জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার এই ক্রোধকে সংস্কার করিলেই তেজঃ এবং ন্যায়পরতা গুণ লাভ হয়। লোভকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। আস্বাদনে জিহ্বার তৃপ্তি প্রথম ভাগের অন্তর্গত এবং পার্থিব বাসনা কামনা দ্বিতীয় পর্য্যায় ভুক্ত। প্রথম প্রকারের লোভ মোটেই না থাকিলে দেহ রক্ষা অসম্ভব হইত, যদিও উহার অপব্যবহারে বহু অনিষ্ট সংসাধিত হয়। অরুচি অর্থাৎ আস্বাদনে অসমর্থতা একটী বিষম রোগ। উহার অত্যন্ত বৃদ্ধিতে মানুষ মৃত্যু মুখে পর্য্যন্ত পতিত হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের লোভ যদিও মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি উহা মোটেই না থাকিলে উপযুক্ত ভাবে জীবন যাপন অসম্ভব হইত। পৃথিবীতে আদিম মানবগণ যে অবস্থায় জীবন যাপন করিতেন, বর্ত্তমান মানবও তাহা হইতে উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন না। এই লোভই সংস্কৃত হইয়া যখন ব্রহ্ম লাভের জন্য বলবতী ইচ্ছায় পরিণত হয়. তখন সাধক ব্রহ্মের গুণরাশি উপার্জ্জন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন। ইহাতেই লোভের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং উহা তখন রিপুত্ব বিবর্জ্জিত হইয়া পরম মিত্রের ন্যায় কার্য্য করে। মোহ হইতে দেহাত্মবোধ এবং অন্যান্য বহুবিধ দোষ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রথমেই যদি মানব বুঝিতে পারিত যে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা, অপমান দেহেরই, আত্মায় নহে, তবে দেহের জন্য যেরূপ যত্ন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যাহা না হইলে সে ধর্ম্ম সাধনার্থ দেহের কোনই সাহায্য পাইত না, কখনও সে সেইরূপ ভাবে দেহের যত্ন করিত না। "শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এই মহাবাক্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আবার এই মোহই গুণ সাধনার পক্ষে বিশেষ সহায়। সাধন কালে সাধনীয় গুণের প্রতি যদি সাধকের মোহ থাকে, অর্থাৎ সেই গুণই তাহার পক্ষে একান্ত শুভজনক, এবং যে প্রকারেই হউক সেই গুণ সাধনা করিতেই হইবে, এই ধারণা যদি তাহার হৃদয়ে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা সাধককে সেই গুণ সাধনায় একাগ্র ও অধ্য-

বসায়শীল করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সাধক তাঁহার অবলম্ব্য গুণের প্রতি অত্যধিক ভাবে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন। যথা জ্ঞানী জ্ঞানের পক্ষপাতী, প্রেমিক প্রেমের পক্ষপাতী, ন্যায় পরায়ণ ন্যায়ের, সাধু সাধুতার পক্ষপাতী ইত্যাদি। আমরা সংশয়কে বড়ই জ্বালা দায়ক দোষ বলিয়া থাকি। কিন্তু এই সংশয় না থাকিলে জ্ঞান লাভ বা উহার উন্নতি সম্ভব হয় না। এই সংশয় মোহ জনিত। সুতরাং মোহ প্রকারান্তরে জ্ঞানোন্নতি লাভে সাহায্য করে। প্রেম সাধনায় মোহের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই মোহ তত্ত্বজ্ঞান লাভে লয় প্রাপ্ত হয়। অহংকার না থাকিলে "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা", "আমি জ্ঞাতা" ইত্যাদি ভাব থাকে না। এমতাবস্থায় যে জীবন যাপন, জ্ঞান অর্জ্জন, সাধন ভজন একান্ত অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আবার এই অহংকার না থাকিলে আত্মোন্নতি কেন কোন উন্নতিই সম্ভব নহে। সাধক যখন সাধনা করেন, তখন যদি তিনি অহংকারকে বর্জ্জন করেন, তবে তাহার পক্ষে সাধনায় অগ্রসর হওয়া একান্ত অসম্ভব। এই অহংকার কোথায় হইতে আসিল? পরমর্ষি গুরুনাথ অন্তঃকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত যাইয়া বলিয়াছেন:—"চৈতন্যাংশ দেহে বদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্ঞানময়ত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন বোধ তাহার বুদ্ধিতে পরিণত হয়। বুদ্ধির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সংশয়াত্মক মনের উৎপত্তি হয়। তখন 'এইটী কর্ত্তব্য কিনা" ইত্যাদি ভাব আসিতে থাকে। অমনই অহংকার উৎপন্ন হইয়া চিত্তের সাহায্যে লুপ্ত স্মৃতির আভাস যোগে ইহা আমি করিতে পারি ইত্যাদি অভিমানের সঞ্চার করে"।* এই স্মৃতির আভাস কি? উহা আত্মার পূর্ব্ব পরম চৈতন্যাবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের আভাস। ইহা হইতেই তিনি মনে করেন যে তিনি সকলই করিতে পারেন। কারণ, পূর্ণ ব্রহ্ম (পূর্ব্ব পরম চৈতন্য) সর্ব্বশক্তিমান।

* তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা। চৈতন্যাংশ অর্থে বুঝিতে হইবে যে পরম চৈতন্য অংশভাবে ভাসমান। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য।

নিঃশক্তিক সাধনায় অর্থাৎ আমি কিছুই নহি. সকলই তিনি ; আমি নামক পদার্থ তাঁহার শ্রীহস্তের যন্ত্র মাত্র, এই ভাবের অত্যুন্নতিতে অহংকার লয় হইতে থাকে বটে, কিন্তু কারণ-দেহ থাকিতেও উহার সম্পূর্ণ লয় হয়, তাহা মনে হয় না। এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" অংশে উদ্ধৃত অংশে লিখিত আছে যে একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণও অহংকার হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। এস্থলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে সেই অহংকার সাত্ত্বিক অহংকার। উহা ত্রিবিধ দেহের বিগমে সম্পূর্ণ-রূপে নিঃশেষিত হয়। অর্থাৎ পূর্ণামুক্তিতে অহংকারের লয়, নতুবা নয়। অপর দিকে মানুষ অহংকার দ্বারা চালিত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। সে অহংকারে মত্ত হইয়া নিজের এবং অন্যের কত অনিষ্ট করে, তাহা কে বর্ণনা করিবে? মাৎসর্য্য বহু অশান্তির কারণ বটে, কিন্তু মাৎসর্য্য না থাকিলে অর্থাৎ অন্যের উন্নতিতে দুঃখ বোধ না থাকিলে মানবের সেই উন্নতি লাভের জন্য আত্যান্তিকী চেষ্টা আসে না। Healthy rivalry বলিয়া একটী উক্তি আছে। এই প্রতিযোগিতা মানবকে সাধারণ কার্য্যে এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় বিশেষ সাহায্য করে। এই জন্য একটী উত্তম ছাত্রের সহিত একটী অনুন্নত ছাত্র একত্র বাস করিলে সেও উত্তরোত্তর উন্নত হয়। এই জন্যই সংঘের সাধকগণের মধ্যে প্রতি-যোগিতা থাকিলে তাহাদের উন্নতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তন সাধনায় ইহার লয় হয় বলিয়া মনে হয়। এই দোষ ব্রহ্মের কোন গুণ বিকারে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। তিনি অনন্ত ও পূর্ণ ব্রহ্ম। তাঁহাতে কোনরূপ প্রতিযোগিতার ভাব থাকা অসম্ভব। কারণ, জীব ও জড় জগৎ চিরকাল তাঁহারই একান্ত অন্তর্গত ভাবে বর্ত্তমান। আমাদের অপূর্ণতাই ইহার জননী। আমাদের স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রধান দোষ। কিন্তু মানব যদি জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে স্বার্থপর না হইয়া নিঃস্বার্থপর হইত, তবে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত। আমরা শিশুর জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখিতে পাই যে তাহারা সর্ব্বদা স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। কারণ, তাহাতে

তাহার জীবন রক্ষার সাহায্য করে। বয়স্ক মানবের পক্ষেও এই স্বার্থপরতা উপকারেই আসে। এইরূপ প্রত্যেক উন্নতিশীল সাধক জীবনে স্বার্থপরতা, স্বার্থ-পরার্থ-পরতা, নিঃস্বার্থতা ও স্বার্থ পরার্থের একার্থতা ক্রমশঃ লাভ হয়। সুতরাং স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রধান দোষ হইলেও উহা দ্বারা আমাদিগের কোন কোন অবস্থায় আমরা উপকারই প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলই উৎপন্ন হয়। ক্ষণস্থায়ী সুখকে অনেকে নিতান্ত ভাবে অবহেলার বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৈরাগ্যপথ সমর্থন কারীরা বিশেষভাবে উহার নিন্দা করেন। কিন্তু "ক্ষণিক সুখও একান্ত হেয় নহে। কারণ, প্রথমে জড়াবস্থ আত্মা ক্ষণিক সুখ ভোগ দ্বারাই বিমল স্থায়ী সুখের অপূর্ব্ব মধুরিমা অনুভব করিতে সমর্থ হয়।" * হিন্দুশাস্ত্রে কাম অর্থাৎ বাসনা পূরণকেও ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকে চতুর্ব্বগ বলা হইয়াছে। প্রথমে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ সাধু মহাজন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিধি নিষেধ মানিয়া জীবন পথে চলিতে হইবে। তৎপর ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে এবং ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কামনা পূরণ করিতে হইবে এবং ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা করিয়া মোক্ষ মার্গে চলিতে হইবে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে পরমপিতা আমাদিগকে যে সকল জাত গুণরাশি অর্থাৎ দোষপাশরাশি দান করিয়াছেন, উহাদের অপব্যবহারেই আমাদের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহাদের সদ্ব্যবহারে ইষ্ট সিদ্ধিই হইয়া থাকে। উহারা যথোপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলেই আমরা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট গুণরাশি লাভ করিতে পারি। "সর্ব্বং অত্যান্তং গর্হিতং" বাক্য আমাদের অনুধাবন যোগ্য। বৃত্তি সকলের অত্যধিক অপব্যবহারেই মানুষ মানুষ হইয়াও পশুবৎ আচরণ করে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক পদার্থেরই বিপরীত গুণ আছে। রিপু সমূহ যে আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে ও করে, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উহার মধ্যে এমন

* তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা

কিছু আছে, যাহা দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। উহাদের সদ্ব্যবহার দ্বারাই তাহা সংসাধিত হইতে পারে। উহাদের অসদ্ব্যবহারে যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, ইহা ত আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে রিপু সকল উপযুক্ত ব্যবহারে রিপুত্ব ত্যাগ করিয়া বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করে এবং উহারা গুণরাশির বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। নদী পার হইলে পথিক যেরূপ খেয়ার নৌকা ত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়, সাধকও উৎকৃষ্ট গুণরাশি লাভ করিলে অপকৃষ্ট গুণরাশির অর্থাৎ দোষপাশ রাশির লয় করেন। তখন উহারা আর কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জাত গুণ-রাশিই দোষের নহে, কিন্তু উহাদের অপব্যবহারেই দোষ উৎপন্ন হয়। তাই ভক্তগণ গাহিয়াছেন:—"কাম রিপু প্রেম মিত্র হইবে দেখ বিচিত্র, পশু হবে দেব চরিত্র, শত্রু মিত্রে এক ভাবনা (তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত)।" "আমার রিপু পরিচারিকাদল আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন। (ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল)।" "বাসনা কামনা যত, তারা হবে পুণ্যব্রত, তোমার কাছে নিয়ে যেতে —বন্ধুর সমান। * (ভক্ত মনমোহন)"। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে কুপ্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ দোষপাশ রাশি আমাদের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সহজে পূর্ণ হইবে বলিয়াই

* এ সম্বন্ধে 'মায়াবাদ' অংশের অন্তর্গত "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে আমরা আরও আলোচনা দেখিতে পাইব। আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ হইতেও বুঝিতে পারিব যে জাত গুণ রাশির বাধা দিবার শক্তি আছে। অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই জাতগুণরাশির বিধান করিয়াছেন। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা আমরা যদি উহাদিগকে সাধনার অনুকূল ভাবে ব্যবহার করি, তবে উহাদের দ্বারা আমাদের উন্নতিই সাধিত হইতে পারে। আমরা নৈসর্গিক ভাবে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহারই সদ্ব্যবহার দ্বারা আমরা ক্রমশঃ উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিব, ইহাই অনন্ত মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্য। কারণ, ঐরূপ বিধানই জীবের পক্ষে সহজ এবং অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য।

উহারা আমাদিগেতে আসিয়াছে। ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ প্রেম। সুতরাং তিনি নিত্য মঙ্গলময়। তিনি যে বিধান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকিবে। অনন্ত স্নেহময় পিতা কখনই এমন বিধান করেন নাই যাহাতে আমরা শাস্তির জন্যই শাস্তি ভোগ করিব। এস্থলেও আমাদের স্বাধীনতা ও সদসৎ বিচার বুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। সুতরাং দোষ রাশির সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্বে দোষারোপ করা যায় না। জগতে প্রাকৃতিক উপদ্রব যথা—ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু এই সকলও অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেরই অন্তর্গত। অন্য একটা পৃথক শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এই সকল অনিষ্ট ঘটাইতেছে না, ইহা সত্য। বরং ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে উহারা জগতের উপকার করিতেছে। আমরা অল্প লইয়া থাকি, অল্প লইয়াই বিচার করি, বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের কথা মোটেই চিন্তা করি না। আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র ও অসম্যক্, তাই আমরা সর্ব্বদাই ভ্রান্ত। সেইজন্যই এই সকল ব্যাপারকে অমঙ্গল বলিয়া মনে করি। কিন্তু বিশ্বতশ্চক্ষু, অনন্ত উদার অনন্ত জ্ঞানময়ের কাছে সকলই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বা অতি সঙ্কীর্ণ সুতরাং অতি ক্ষুদ্র। আমরা বর্ত্তমানই দেখি, সুদূর অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখি না। জ্ঞান সসীম বলিয়া বর্ত্তমানের বিচারেও আমরা বহু সময়ই ভুল করি। আমরা নিজ জীবনে এমন অবস্থা দেখি, যাহা আমাদেরই অন্যায় কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র,-কিন্তু যখন আমরা সেই বিষময় ফল ভক্ষণ করিতেথাকি, অর্থাৎ অন্যায় আচরণের ফল স্বরূপ দুঃখের কশাঘাত আমাদের পৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম একেবারেই ভুলিয়া যাই ও অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ দোষী করি, যেন অদৃষ্ট কর্ম্ম ফল ব্যতীত ভূত প্রেত জাতীয় অন্য একটী বাহিরের বস্তু। আমাদের দুর্দ্দশা এতদূর অগ্রসর হয় যে আমাদিগেরই অন্যায়ের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করিলে সময় সময় আমরা অনন্ত প্রেমময় পরমপিতাকে পর্য্যন্ত দোষী সাব্যস্ত করিতে

ত্রুটী করি না। অর্থাৎ যিনি আমাদের প্রত্যেককে একমাত্র পুত্রকে মাতাপিতা যত ভাল বাসেন, তাহা হইতেও অনন্ত গুণে নিত্য ভাল বাসেন, যিনি আমাদের প্রত্যেককে সর্ব্বস্বধন বলিয়া চিরকাল জ্ঞান করেন, যিনি আমাদের একজনকেও মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িয়া থাকেন না, যিনি তাঁহার অনন্ত সুগভীর প্রেমে আমাদিগকে নিত্য একান্ত ভাবে তাঁহারই অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিধ দোষ-পাশ-লেশ-শূন্য, যিনি নিত্য নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, যিনি নিত্য নিরাকার, নির্ব্বিকার, অশরীরী এবং যিনি সত্ত্ব গুণেরও অতীত, তাঁহাকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করি। যখন আমাদের দৃষ্টি এতই ক্ষুদ্র, এতই সীমাবদ্ধ ও তমসাচ্ছন্ন যে নিজ ক্ষুদ্র জীবনের আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির পর্য্যন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, তখন সেই অসম্যক দৃষ্টি লইয়া বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যে আমরা একান্ত বিভ্রান্ত হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বের প্রত্যেক অনু পরমাণুটী পর্য্যন্ত একে অন্যের সহিত গ্রথিত ও বিশ্ব মহাকালে অবস্থিত। সুতরাং অসমগ্র দৃষ্টি সম্পন্ন অজ্ঞানী মানবের পক্ষে অসীম দেশ কালের ঘটনার বিচারে যে ভ্রম হইবে, তাহা মোটেই অসম্ভব নহে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ের নির্ভুল কার্য্যের বিচারে প্রবৃত্ত হই। স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সমগ্র ভাবে চিন্তা না করিলেই সংসারে অমঙ্গল দেখি, আর সমগ্র ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অমঙ্গল থাকে না। হৃদয় যতই উন্নত হইবে, যতই উদার হইবে, যতই বিশ্বকে সমগ্র ভাবে ধারণা করিতে শিক্ষা করিব, ততই আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইব। এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্তদ্বারা সরল করা যাইতে পারে। কোন এক স্থানে কোন এক মহিলাকে Chloroform প্রয়োগে অজ্ঞান করান হইয়াছে এবং তৎপর তাহার গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ করিবার জন্য অথবা তাহার গর্ভস্থ অর্বুদ (tumour) উন্মূলন করিবার জন্য তাহার প্রতি Caezarian

operation করান হইতেছে। একটী অশিক্ষিত যুবক, যিনি কখনও ঐরূপ অস্ত্রোপচার প্রত্যক্ষ করেন নাই অথবা উহার সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই অবগত নহেন, যদি হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ বিভৎস ব্যাপার লক্ষ্য করিতে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসকগণের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন এবং এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু যখন তাহাকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে যে উক্তরূপ অস্ত্রোপচার সেই মহিলার পক্ষে নানাভাবে মঙ্গলজনক হইবে, তৎনই সে চিকিৎসকগণের প্রতি ক্রোধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে তাহাদের চরণে প্রণত হইবে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে যে অসম্যক্ দৃষ্টিতে ভীষণ অমঙ্গল চিন্তার উদয় হয় বটে, কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সেই ঘটনায় মঙ্গলই উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ অসম্যক্ দৃষ্টিতে অমঙ্গল এবং সম্যক দৃষ্টিতে মঙ্গল বুঝিতে হইবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:—"তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথায়ও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই। মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ, তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।" আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বের সকল অণু পরমাণু যেমন একে অন্যের সহিত গ্রথিত, সেইরূপ আমরাও (জীবাত্মাগণ) একে অন্যের সহিত এবং সকলেই একমাত্র বিভু এবং অনন্ত পরমাত্মার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত।* বিশ্ব বিধাতা বিশ্বকে সুবিধানে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যখনই আমাদের ক্ষুদ্রোদপি ক্ষুদ্র স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা দ্বারা সেই বিধান লঙ্ঘন করি, তখনই সমুদায় বিশ্বে সেই আঘাতের সাড়া পড়িয়া যায়, যখনই সেই কার্য্য বিধির বিধানের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনই বিশ্বের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ

* "গুণ বিধান" অংশ দ্রষ্টব্য। স্থূল, আত্মা এক ও অখণ্ড, কখনই বহু নহেন, বহুভাবে ভাসমান মাত্র।

অবশ্যম্ভাবিরূপে আমাদিগের নিকট শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। Action মাত্রেরই reaction আছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans বলেন :—"We cannot move a finger without disturbing all the stars (in the universe). (The stars in their Courses)". "বঙ্গানুবাদ :—বিশ্বের সকল নক্ষত্রে সাড়া না দিয়া আমরা একটী অঙ্গুলি নড়াইতে পারি না। *" স্থূলের শক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্মের শক্তি অধিকতরা। সুতরাং যখনই আমরা সূক্ষ্মভাবে বিধি লঙ্ঘন করি, তখন কেবল স্থূল জগতে নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম জগতেও আমরা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করি এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল প্রাপ্ত হই। জল নিম্নগামী। কেহ যদি বর্ষাকালীন খরস্রোতা নদীকে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ যে নিকটস্থ নগর গ্রাম প্রভৃতি স্থান জল প্লাবনে প্লাবিত হইবে, তাহাও তাহার জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেইরূপ মানব তাহার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পরম পিতার বিধানের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন বটে, কিন্তু সেই রুদ্ধ শক্তি আসিয়া যে তাহাকে অন্য ভাবে আঘাত করিবে, তাহাও সুনিশ্চিত। আমরা দেখিতে পাই যে বিবিধ বহু বাদ্য যন্ত্র সহযোগে যখন ঐক্যতান বাদ্য (Concert) বাজিতে থাকে, তখন যদি উহাদের মধ্যে কোন বাদক বেতালে বাজাইতে থাকেন, তবে সমস্ত বাদ্যের তাল ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেই

---

* এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে বিশ্বনাথের ইচ্ছার অনুকুলভাবে কার্য্য করিলেও অর্থাৎ সৎ কার্য্যের জন্যও আমাদের অঙ্গুলি উত্থিত হইলে বিশ্বময় সাড়া পড়িবে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে না। বরং অনুকুল ভাবের কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তাহাতে বিশ্বের উপকার এবং আনন্দ উৎপাদন করিবে এবং ফল স্বরূপ আমরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু অসৎ কার্য্যের জন্য অঙ্গুলি উত্থিত হইলে উহার প্রতিফল স্বরূপ আমরা শাস্তি পাইব। উভয় ভাবের কার্য্যেই বিশ্বে সাড়া পড়িবে বটে, কিন্তু একটীর ফল বিশ্বময় আনন্দ ও অন্যটীর ফল বিশ্বময়ী বিশৃঙ্খলা। কিন্তু একটী বিশ্বের উদ্দেশ্যের অনুকূলে বলিয়া উহাতে কর্ম্ম কর্ত্তাকে বিশ্ব অভিবাদন জানাইবে, আর অন্যটী বিশ্বের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল বলিয়া তিনি তিরস্কার লাভ করিবেন।

ব্যক্তি তিরস্কৃত হন। আবার যদি বহু গায়ক একই রাগিণীতে, একই সুরে একত্রে গান গাহিতে থাকেন, এবং যদি তাহাদের মধ্যে কোন গায়ক বেসুরে গান গাহিতে থাকেন, তবে সেই স্থলেও ঐ একই অবস্থা সংঘটিত হয়। আবার মিলন সভায় আলোচনার ফলে এমন একটী হাওয়া রচিত হয় যে সকলেই যেন একটী বিশেষ রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন যদি কেহ সেই রসের বিরোধী কোন আলোচনা উত্থাপন করেন, তবে অবশ্যই সেই রস ভঙ্গ হয় এবং সকলেই দুঃখিত হন। এরূপ কেন হয়? উপরোক্ত স্থলত্রয়ে একটী তাল, সুর ও রস প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু কোন এক ব্যক্তি প্রতিকূল অবস্থা আনয়ন করায় সেই প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই সেই ব্যক্তি তিরস্কৃত হয়। আমাদেরও সেই অবস্থা। বিশ্বে একটী বিশেষ সুরে সঙ্গীত গীত হইতেছে, উহা বিশেষ তালে চলিতেছে এবং উহাতে একটী বিশেষ রসধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি কেহ সেই সুর, তাল, মান, লয় বিশুদ্ধ প্রেমরস পরিপূর্ণ সুন্দর মধুর ও মঙ্গল বিধানের প্রতিকূলে বিঘ্ন সংঘটন করেন, যদি কেহ সেই সুরচিত প্রেম মধুর ছন্দ ভঙ্গ করেন, তবে তিনিও তিরস্কৃত হইবেন অর্থাৎ শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বিশ্বে যে মহা-সঙ্গীত সর্ব্বদা গীত হইতেছে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ কবিগণও বলিয়া গিয়াছেন। ইহা কবি কল্পনা নহে। মহাত্মা নানক, কবির প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পরম পিতার শ্রীপাদ পদ্মে বিশ্বের আরতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জড় ও জীব যে পরম পিতা পরমেশ্বরের মহিমা ওঁংকার ধ্বনি দ্বারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার অষ্টোত্তর শত ব্রহ্মস্তোত্রে গাহিয়াছেন। "ব্রহ্মসঙ্গীতে" বহু সাধক রচিত প্রোক্তভাবের বহু সঙ্গীত বর্ত্তমান। কেহ বলিতে পারেন যে পরমেশ্বরের বিধানে এত বিভিন্ন, এত বিপরীত ভাবের অবস্থা জগতে চলিতেছে যে তাহা দ্বারা "একটী সঙ্গীত গীত হইতেছে" ইহা কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে পাঠককে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত বিষয় স্মরণ

করিতে অনুরোধ করি। বৈচিত্রের মধ্যে একত্বই, বহুর মধ্যে, নানাত্বের মধ্যে একত্বই (unity in diversity-ই) জগতের মহাবিধান। তাই সেই মহা বিধান অনুযায়ী চলিতে যাইয়া জড় ও জীব নানা স্থানে নানা ভাবে কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু সুর, তাল, মান, লয় পূর্ণ ঐক্যতান বাদ্যের ন্যায় একই হইতেছে, তাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সুরে, অনন্তভাবে ব্রহ্মের জয়গান গাহিতেছেন সত্য। কিন্তু উহাদেরও সুর ও তাল, মান ও লয় একই। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন :—"জড় জীব একতানে, নানাভাবে নানাস্থানে, তোমার মঙ্গল নাম করিছে কীর্ত্তন। (ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল)।" যদি কেহ উপরোক্ত ভাবের অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক ঈশ্বর, এক বিশ্ব, এক বিধান। যতই বহু, যতই নানা আমরা প্রত্যক্ষ করিনা কেন, উহারা সকলেই এক মহতো মহীয়ানের অন্তর্গত এবং তাঁহার নানা বিধান অন্যান্য নানা পদার্থের ন্যায় তাঁহারই একই বিধানের অন্তর্গত। তিনি নিত্যই এক, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, তিনি নিত্যই সর্ব্বতোভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' সুতরাং তাঁহার বিধানও এক বই দুই বা বহু হইতে পারে না। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা" অংশে লিখিত এক ও বহুর আলোচনা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। এই সম্পর্কে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্বয়ং ব্রহ্মই অনন্ত বিপরীত গুণের মিলন স্থান। তাঁহাতেই বিপরীত গুণদ্বয়ের একত্ব সম্পন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেইরূপ অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। সুতরাং তাঁহাতে বহু আছেন, ইহাও যেমন সত্য, আবার তিনি সেই বহুর একত্বে এক, ইহাও তেমনি সত্য। এই জন্যই মাণ্ডুক্যোপনিষদে তাঁহাকে "শিবমদ্বৈতম্," বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে সুতরাং তিনি শিব ও অদ্বৈত। ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রোক্ত অংশে বর্ত্তমান। জগৎ সেই অনন্ত একত্বের একত্ব যিনি, তাঁহা হইতে আসিয়াছে, সুতরাং উহাতে বহু, নানা আছে বটে, কিন্তু উহারাও একই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং জগতে একটী মাত্র সুমধুর সঙ্গীত যে গীত

হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা যদি অবাধে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির পথে চলিতে পারিতাম এবং ভগবদ্বিধি লঙ্ঘনের জন্য অবশ্যম্ভাবিরূপে শাস্তি না পাইতাম, তবে সৃষ্টি রক্ষাই পাইত না— উহা নিশ্চয়ই উচ্ছন্ন যাইত। সুতরাং বর্ত্তমান বিধানের বিপরীত কোন ব্যবস্থা হইলে অমঙ্গলেরই উদ্ভব হইত, মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে মঙ্গল দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতএব এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ভগবদ্বিধান সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে মঙ্গলই প্রসব করিতেছে, আমাদের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে তাঁহার নিত্য সুমঙ্গল বিধানের উপর দোষারোপ করি। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে কোন ব্যক্তি মানব দৃষ্টিতে নিষ্পাপ এবং এমন কি সাধু জীবনই যাপন করিতেছেন, অথচ তিনি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণের মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে এরূপ কেন হয়। ইহার উত্তর বুঝিতে বর্ত্তমান অংশ পাঠ করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। অনন্ত ন্যায়বান ধর্ম্মরাজের শাসনে কখনও বিনা পাপে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। তবে যে আমরা সকল সময় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তাহার হেতু এই যে আমাদের জ্ঞান সর্ব্বদাই অপূর্ণ, বিকৃত অথবা আমরা সাধারণে তমসাচ্ছন্ন এবং আমাদের সম্যক্ দৃষ্টি নাই। তাই আমরা বিচারে সর্ব্বদা ভ্রান্ত মীমাংসায় উপস্থিত হই। উক্ত প্রকারের সাধু প্রকৃতির মানবও কোন না কোন প্রকারের পাপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান জন্মকৃতই হউক্ অথবা জন্মান্তরে কৃতই হউক্। জন্মগতই হউক্ অথবা স্বয়ং কৃতই হউক্।* কেহ কেহ জগতে প্রাকৃতিক উপদ্রবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইতে চাহেন যে প্রকৃতিতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহা যে স্বয়ং ঈশ্বরকৃত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই

* মানব পিতৃপুরুষগণের পাপ স্বীকার করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলেন যে, আমরা পিতৃপুরুষগণের শারীরিক ব্যাধি প্রাপ্ত হই।

এবং উহাতে যে জগতে অমঙ্গল হইতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সুতরাং জগতে যে অমঙ্গল হইতেছে, সেই সম্বন্ধে কি বলিবার আছে? কেহ কেহ ভূমিকম্প সম্বন্ধে বলেন যে এক এক ভূমিকম্পে শত শত মানবও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। তাহাদের সকলেই এমন কি পাপ করিয়াছিল যে তাহাদের সকলকেই একই দিনে একই অবস্থায় দেহত্যাগ করিতে হইল? আবার কোন কোন সময় ঝড়ে জাহাজ আরোহিগণ সহ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। তাহারাও এমন কি পাপ করিয়াছিল যে সকলেই একই সময় পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল? Railway Collision এবং জলপ্লাবনেও বহুলোক একই সময় প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই প্রশ্ন প্রযোজ্য। উক্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর পৃথিবীর ভাবে সম্পূর্ণ সন্তোষকর রূপে দেওয়া অসম্ভব। কারণ, কেহই facts and figures দ্বারা অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রমাণ দ্বারা পার্থিব ঘটনার যেরূপ বিচার করা হয়, সেইরূপ ভাবে বলিতে পারেন না যে ঐ সকল ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু তাহাদেরই বর্ত্তমান অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল, সুতরাং মঙ্গলের জন্য। ইহার কারণ এই যে একটী ঘটনার পশ্চাতে বহু বহু কারণ বর্ত্তমান, উহাদের অনেকের সম্বন্ধেই আমরা অজ্ঞ। আমরা Immediate Cause ধরিয়াই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই। এই সম্বন্ধে আমাদের যে চিন্তা আসিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের বিশেষ বিবেচনার জন্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে যে আমাদের কর্ম্মফল ব্যতীত আমাদের দুর্দ্দশা অসম্ভব। ইহাও দেখা যাইবে যে ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা দ্বারা জগতে মঙ্গলই সমুৎপন্ন হইতেছে। আমাদের জ্ঞানাভাব জন্য মঙ্গলকে অমঙ্গল মনে করিতেছি। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যুক্তিযুক্ত অনুমান দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রমাণ। উক্ত ঘটনা সমূহে যে সকল ব্যক্তির মৃত্যু হইল, তাহাদের কোন পাপের জন্য উক্ত অবস্থা সংঘটিত হইল, ইহা যেমন সাধারণে বলিতে পারে না, প্রশ্ন কর্ত্তাও সঠিক ভাবে বলিতে পারেন না যে তাহাদের মৃত্যু কোনই পাপের জন্য সম্ভব হয় নাই, ঘটনা চক্রে হইয়াছে মাত্র। পাঠক মনে

রাখিবেন যে ক্রমময়ী সৃষ্টিতে আকস্মিকতা (chance) বলিয়া কিছুই নাই। একই সময় এক সঙ্গে অনেক লোকের মৃত্যু হইলে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ মনে করি যে কেহই উহার জন্য দায়ী নহেন। সমবেদনা ও করুণরস আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসেও সত্যানুসন্ধানে বাধা প্রদান করে। পাঠক অবশ্যই জানেন যে ভূমিকম্পে এক স্থানের এবং জাহাজ ডুবিতে জাহাজস্থ সকল লোকেরই মৃত্যু হয় না। অনেকের প্রাণ রক্ষাও পায়। ইহা ভিন্ন যৌথ ভাবে পাপ কার্য্যের সংঘটন যে পৃথিবীতে হয় না, একথা বলা চলে না। পৃথিবীতে প্রায়শঃই যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধে দুই পক্ষ থাকে। যুদ্ধ মাত্রই পাপ কার্য্য। কেবল আত্ম রক্ষার্থ যে যুদ্ধ হয়, পৃথিবীর নরনারীর বর্ত্তমান অবস্থায় উহাকে পাপ জনক বলা উচিত কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইনেও আত্ম রক্ষার্থ লোক হত্যায়ওশাস্তির বিধান নাই। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ শত্রুকে যতটুকু আঘাত দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইতে অতিরিক্ত আঘাত দিলে আত্মরক্ষাকারীও শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ আত্মরক্ষার্থ যদি কোন জাতি যুদ্ধ করেন ও সেই অজুহাতে অতিরিক্ত লোকক্ষয় করেন, তবে সেই জাতিও পাপ স্পৃষ্ট হইবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর যাহারা প্রথম আক্রমণকারী (aggressor) তাহারা যে পাপ করেন, সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যায় যে কেবল প্রকৃত ভাবে আত্মরক্ষাকারীই যুদ্ধে পাপস্পৃষ্ট হন না। কিন্তু অন্য সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে।*

(পাদটীকা)

* কেহ কেহ যুদ্ধ মাত্রই পাপ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কারণ, যুদ্ধ মাত্রেই হিংসা অনিবার্য্য। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধে পাপের সম্ভাবনা নাই। অথবা যদিই বা থাকে, তবে অনন্ত ক্ষমাময়, অনন্ত করুণাময় পরম পিতা তাহা ক্ষমা করেনবলিয়া বিশ্বাস করি। কারণ, কেবল আত্মরক্ষার্থ ব্যক্তিবর্গ নিরুপায় হইয়াই যুদ্ধারম্ভ করেন। সুতরাং তাহাদের কর্ম্মের উপর তাহাদের কোন হাত নাই, অর্থাৎ তাহা অনিবার্য্য। সকল প্রকার জীব জন্তুগণ, এমন কি বৃক্ষলতারও নিজ নিজ শক্তি

অনুসারে আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা বর্ত্তমান। ইহা সকলেরই নৈসর্গিক প্রবৃত্তি। অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতা আমাদিগকে এই প্রবৃত্তি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। আবার চেতন পদার্থের কথাই বা বলি কেন? চৈতন্যশূন্য জড় পদার্থও যে আত্ম-রক্ষার্থ বাধা প্রদান করে, তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে। এক খণ্ড কাষ্ঠে একটী প্রেক প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিলেই তাহা করা যায় না। সেই কাষ্ঠ খণ্ড তাহার সাধ্য মত সেই কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এই-রূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। স্থূল, বিশ্বের সর্ব্বত্রই এক বিধান কার্য্য করিতেছে। One God, One Law, One Universe. ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি সমূহ আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের অপব্যবহারেই পাপ, মহাপাপ সংঘটিত হয়। কিন্তু উহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহারে আমাদের মঙ্গলই উৎপন্ন হয়। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অপব্যবহারে পাপ, সদ্ব্যবহারে উপকার। যখন নৈসর্গিক বৃত্তি সমূহ সম্বন্ধে কেহই এই তত্ত্বের ব্যতিক্রম প্রদর্শন করিতে পারেন না, তখন আত্মরক্ষারূপ মহাবৃত্তির সদ্ব্যবহারে যে পাপ হইতে পারে না, ইহা সহজ বোধ্য। গভীর ভাবে বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিষয় আছে, তাহার সকলই পাপ ও পুণ্য মিশ্রিত। আমাদের কর্ত্তব্য হইবে যে আমরা নিষ্পাপ হইয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের পাপ অংশ যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ না করিতে পারে, যাহাতে পুণ্য অংশ আমরা লাভ করিতে পারি, এইরূপ ভাবে আমরা জীবন যাপন করি। কেহ বলিতে পারেন যে এইরূপ ভাবে কার্য্যতঃ জীবন চলে না। "ধরি মাছ, না ছুই পানি" সম্ভব নহে। সবিশেষ সাধনা দ্বারা যে বিশিষ্ট সাধকগণ উক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। হংস নীরক্ষির মিশ্রিত পদার্থ হইতে ক্ষিরই গ্রহণ করে, নীরভাগ পরিত্যাগ করে। অতএব এইরূপ কার্য্য কঠিন হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নহে। আর জগৎ ত জীবগণের পরীক্ষার, সাধনার স্থানই বটে। এস্থলে সাধন ভজন বিহীন ব্যক্তি যে পাপে লিপ্ত হইবেন, দুঃখ ভোগ করিবেন, ইহাও সত্য। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই মাত্র বলা যায় যে আত্মরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পরানিষ্ট চিন্তা ও হিংসা হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াও যদি তিনি

পরিশেষে বাধ্য হইয়া পাপস্পৃষ্ট হন, তবে তাহার উপরে অনন্ত ক্ষমা-ময় পরমপিতা নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিলেই যথেষ্ট হইল। দার্শনিক তত্ত্বের দোহাই দিয়া আরও একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। তাহা এই যে দেহ আত্মা নহে। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, ইহা মৃত্যুর অধীন। সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে দেহাত্ম-বোধ পরিত্যজ্য বলিয়াছেন। আমাদের এই গ্রন্থেও সেই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। দেহ যখন আত্মা নহে, তখন দেহের মৃত্যুতে দেহীর মৃত্যু হইবে না। তবে কেন সেই দেহ রক্ষার্থ আমরা হিংসা প্রবৃত্তির বশবর্তী হইব? প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নেই ইহার এক প্রকার স্থূল উত্তর নিহিত রহিয়াছে। যদি কেহ দেহ আত্মা নহে বলিয়া আত্ম-রক্ষার্থ হত্যাকারীর উন্মুক্ত শানিত অসি হইতে নিজ দেহ রক্ষা করিতে কাহাকেও নিষেধ করা হয়, তবে হত্যাকারীর দেহও ত তিনি নহেন বলিতে পারা যায়। তাহার দেহ হনন করিলে তিনিও হত হইবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আক্রমণকারীকে হনন করিলে অর্থাৎ তাহার দেহ নাশ অথবা তাহার পঞ্চভূতাত্মক দেহ নষ্ট হইবে মাত্র, কিন্তু তিনি অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ত অস্পৃষ্ট থাকিবেন। প্রশ্ন কর্ত্তাকে গীতার শ্লোকে বলিতে পারা যায়:—"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ (২।১৯)।" "বঙ্গানুবাদ:—যে মনে করে যে শরীরকে হনন করিলে, যে মনে করে যে শরীরী হত হইল, সে দুইজন কিছুই জানে না, কেন না এ হতও হয় না, হননও করে না। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (২।২০)॥" "বঙ্গানুবাদ:—শরীরী কখনও জন্মেও না, একবার হইয়া আবার হয়ও না। ইহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, অবস্থান্তর প্রাপ্তি নাই, শরীর বধ করিলে ইহার কখনও বধ হয় না। (গৌর গোবিন্দ রায়)।" এখন সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেহ আত্মা নহে বটে. কিন্তু জীবাত্মা কোনও এক প্রকার (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) দেহে বাস করিবেনই। যদিও ঐ সকল দেহ জড় দ্বারা নির্ম্মিত, তথাপি উহা তুচ্ছ তাচ্ছিলের বস্তু নহে। কারণ, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা জগতে আসিয়াছি এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত উহাতেই বাস করিতে হইবে. উহা অবলম্বন করিয়াই আমাদের অতি সুদীর্ঘ জীবনের সাধন ভজন করিতে হইবে। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে কথিত

হয় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীর স্বাভাবিক নিয়মে যখন মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, তখন উহার জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত হইবে না বটে, কিন্তু সেই জন্য শরীরকে অন্য দ্বারা হত হইতে দেওয়াও উচিত হইবে না অথবা নিজ শরীরের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া জীবনকে হ্রস্ব করাও উচিত নহে। পরম পিতা আমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান শরীর দ্বারা বর্ত্তমান জীবনে তাহা যথাসাধ্য সফল করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করিয়া শরীরকে তুচ্ছ করি ও সেই জন্য শরীর নষ্ট হয়, তবে প্রকারান্তরে আত্মহত্যারই অপরাধে অন্ততঃ আংশিক ভাবে যে অপ-রাধী হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পাঠকের নিকট এই অনুরোধ যে এই গুরুতর বিষয়টী আংশিক ভাবে বিচার করিবেন না। প্রশ্ন কর্ত্তার প্রশ্ন শ্রুতিমধুর ও চিত্তাকর্ষক বটে। পৃথিবীতে যে ঐরূপ মৃত্যুর জন্য মৃত ব্যক্তি বহু প্রশংসা প্রাপ্ত হয়, ইহাও সত্য বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা যেন তিনি মোহাচ্ছন্ন না হন। তিনি যেন গভীর ভাবে এবং যথা সম্ভব সমগ্র ভাবে বিচার করিয়া এই কঠিন সমস্যার সুমীমাংসায় উপনীত হন। এক ব্যক্তি যদি বিনা দোষে অন্য ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হন ও তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন যদি আক্রমণকারীকে তিনি বধও করেন, তবে তাহাতে তাহার অক্ষমণীয় পাপ হইবে না বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতি বিশেষ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। কেহ হয়তঃ বলিবেন যে প্রেম দ্বারা অপ্রেম জয় করিতে হয়। যদিও ইহা মহাবাক্য মধ্যে পরিগণিত, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ কার্য্যতঃ অসম্ভব। কারণ, উপরোক্ত মহাবাক্য সর্ব্বদা সর্ব্বতো ভাবে পালন করা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন, জাতির পক্ষে যে ইহা একান্ত কঠিন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষার্থ আঘাত করিবার পূর্ব্বে যেমন সকল প্রকারের সচ্চেষ্টা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ জাতির পক্ষেও মিলনের সর্ব্বপ্রকার সাধু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেই সকল চেষ্টার মধ্যে প্রেমের মিলনের চেষ্টাই যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং প্রেম দ্বারা জয়ের প্রণালীই বিরুদ্ধ পক্ষ-দ্বয়ের সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়। তাহাতে অকৃত কার্য্য হইলেই কেবল আত্ম-রক্ষার্থ যুদ্ধ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায়। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে অত্যুন্নত সাধকগণের পক্ষেই প্রেম দ্বারা অপ্রেম বিশেষ ভাবে জয়

করা যায়। ইহার জন্য তাহার কি অবস্থা লাভ করিতে হয়, তাহা "ইতর জীবের কথা" অংশে উদ্ধৃত বিষয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি স্বয়ং প্রেমিক হইলেই হইবে না, অজাত শত্রু হওয়াও প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা পাঠক মনে করিবেন না যে সাধারণ ব্যক্তি বা অল্লোন্নত ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের জন্য মাত্রও চেষ্টা করিবে না, ইহা আমরা বলিতেছি। সকল ব্যক্তিরই অল্লাধিক পরিমাণে প্রেম দ্বারা অপ্রেম জয় করিবার অধিকার আছে এবং উহা তাহার কর্ত্তব্য। সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে তাহাদের দৈনিক জীবনে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের পূর্ব্বোক্তির অর্থ এই যে সাধকের উন্নতির পরিমাণানুযায়ী তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে এবং পরমোন্নত দিগের মধ্যে অত্যুন্নত সাধকই পূর্ণভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন। প্রায় সকল যুদ্ধেরই মূল কারণ স্বার্থপরতা, প্রভুত্ব এবং অহঙ্কার। উহারাই নানা আকারে যুদ্ধের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে প্রেমই এই মহাব্যাধির মহৌষধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যুদ্ধোদ্ধত ব্যক্তিবর্গের প্রেম তৎকালে দোষ-পাশ দ্বারা একান্ত ভাবে আবৃত থাকে। এই জন্যই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যুদ্ধের ফলে কেবল পরাজিত জাতিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহা নহে, কিন্তু জয়ী জাতিও বিশেষ ভাবে আত্মানিষ্ট সম্পাদন করেন। সুতরাং উভয় পক্ষেরই আপোষ মীমাংসা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, উহা দ্বারা যুদ্ধ জন্য অতিশয় ক্ষতির হস্ত হইতে উভয় পক্ষই রক্ষা পাইতে পারেন। পৃথিবীতে কোন বস্তুই নিছক মন্দ নহে। উহার ইষ্টানিষ্টত্ব ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে যুদ্ধের ফল সর্ব্বাবস্থায় অনিষ্ট কারক। যেমন মদ্য রোগ বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে গ্রহণীয় হইলেও উহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বথা অস্পৃশ্য, অপেয়, অঘ্রাতব্য বলা হয়, তেমনি যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমাদের বুঝিতে হইবে যে উহা সর্ব্বথৈব পরিত্যাজ্য। পরিশেষে বক্তব্য এই যে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে আমরা আমাদের অন্যায় কার্য্য দ্বারা আমাদের যে অনিষ্ট সংঘটন করি, অথবা অন্য দ্বারা আমাদের যে অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহাও অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা তাঁহার অনন্ত মঙ্গল গুণে মঙ্গলেই পরিণমন করিয়া দেন। সুতরাং যুদ্ধ সমূহ দ্বারা যুদ্ধ রত পক্ষ সমূহের এবং পৃথিবীর যে ক্ষতি হয়, তাহাই তাঁহার অনন্ত মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় মঙ্গলেই পরিণত হয়। বর্ত্তমানে মানবের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণার

সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের ফলে যদি মানব জাতির মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি সংস্থাপিত হয়, তবে গত মহাযুদ্ধদ্বয় যে মঙ্গল প্রসব করিয়াছে, তাহাতে কেহই সন্দেহ করিবেন না। এই সম্পর্কে সামান্য একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। গত যুদ্ধে বহু শত বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে সমুদ্র গর্ভস্থিত সেই সকল জাহাজ অবলম্বনে সুদুর ভবিষ্যতে মনুষ্য বাসের জন্য দ্বীপ প্রস্তুত হইবে। আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্থানাভাব যুদ্ধের একটী কারণ। সুতরাং অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইবে, ইহা আশা করা যায়। Out of evil, cometh good. বিষয়টী কঠিন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইহার সকল দিক আলোচিত হইল না। ইহা হইতে বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তাই এস্থলেই ইহা সমাপ্ত করিলাম। (পাদটীকা সমাপ্ত)

(৮০০ পৃষ্ঠা হইতে পুনরাবৃত্তি)

এক এক যুদ্ধে সহস্র সহস্র, সময় সময় লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষয় হয়। যাহারা ইহার সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবের কারণ, তাহারা যে নর-হত্যার জন্য পাপী সে বিষয়েও কিছু চিন্তা করিবার নাই। সুতরাং যদি সেই সকল নর হত্যাকারী পুনর্জন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে প্রশ্নোক্ত ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়; তবে তাহাদের পাপের ফলেই যে উক্ত দুর্দ্দশা তাহারা প্রাপ্ত হইল বলিতে বিশেষ কোন দোষের কথা বলা হইল না। একই সময় একসঙ্গে অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু কেন হইল, এ প্রশ্নও উঠিতে পারে না। কেন না, তাহারাই অনেকে একত্র হইয়া একই সময় বহু নর হত্যা করিয়াছিল। সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলে পৃথিবীতে কে কোন পাপে কি শাস্তি পায়, তাহা সাধারণের পক্ষে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মহাপুরুষগণ তাহা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণের সন্তোষকর ভাবে পার্থিব প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে পারা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও অতি সুকঠিন। পাপের জন্য যে প্রত্যেকেই শাস্তি ভোগ করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত, যদি পাপী সর্ব্বপাপ বিনাশন অনন্ত করুণাময়ের করুণাকণা লাভে অসমর্থ হন। সুতরাং

উক্ত ভাবে মৃত ব্যক্তিগণ যে পাপের ফলস্বরূপ মৃত্যুরূপ শাস্তি পান নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? তাহারা যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এবং বর্ত্তমান জন্মে মোটেই পাপ করেন নাই, এমন হইতেই পারে না। সুতরাং তাহারা পাপেরই ফল স্বরূপ এইরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন, ইহা বলিলে কোন অযৌক্তিক কথা বলা হইবে না। আমরা মনে করি যে মিথ্যা কথা, চুরি, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতিই পাপ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। দেহ সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ করিলেও পাপ হয়, ও তাহার জন্য নানারূপ ব্যাধি শাস্তি স্বরূপ উপস্থিত হয়। অতি বড় ধার্ম্মিকও যদি শরীরে ঠাণ্ডা লাগান, তবে তাহার সর্দ্দি হইবে এবং তাহার উপর আরও অত্যাচার করিলে জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগও হইতে পারে। তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে রোগের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন না। ইহাই সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম। যদি বলা হয় যে এমন ধার্ম্মিক আছেন, যিনি বিশেষ শক্তি দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ দূরে রাখিতে পারেন, তবে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার বিভূতিই সেই স্থানে নিবারক ও আরোগ্য কারক (Preventive and Curative) ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। যোগিগণ যে শরীরের উপর অধিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের অভ্যাস ও যোগ ক্রিয়ার ফল। পাঠক মনে রাখিবেন যে হঠযোগীর পক্ষে যে শারীরিক নিয়ম, সাধারণের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। শিশুর পক্ষে, যুবকের পক্ষে, এবং বৃদ্ধের পক্ষে একই শারীরিক নিয়ম পালনীয় নহে। আবার যদি সন্তরণে অপটু কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি একখানি শতছিদ্র নৌকায় নদীতে বেড়াইতে যান, তবে তিনি যে নৌকা সহ নদীগর্ভে গমন করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। যদি কেহ বলেন যে ধার্ম্মিকের কেন ঐরূপ মৃত্যু হইল, তবে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেই ঘটনার জন্য পরমেশ্বরকে দায়ী করিবেন না। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আসা যাউক। ভূমিকম্পে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় কেন? সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে লোক ক্ষয় হয় কেন? আগ্নেয় গিরির মুখের ধারে অথবা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে

বাস করিলে ভূমিকম্পসহ গৃহ (Quake-Proof Building) ভিন্ন খারাপ বাড়ীতে বাস করিলে যদি ভূমিকম্পের সময় যদি সেই সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে জন্য তাহারাই দায়ী।* বর্ত্তমানে দেশে যেরূপ সংবাদ প্রচার হইতেছে, তাহাতে সকলেরই জানা উচিত, কোন কোন স্থানে ভূমিকম্প হয়। সেই সেই স্থানে বাস না করিলেই ভূমিকম্পের হাত হইতে এড়ান যায়। কিন্তু আমরা কি তাহা করিয়া থাকি? বিহার প্রদেশে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্বেও ঐ স্থানে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প থাকায় সেই সময় এত অধিক লোক ক্ষয় হয় নাই। তাহা জানিয়াও সেই সকল স্থানে সাধারণ ভাবে গঠিত বাটীতে লোক সকল বাস করিতেছিল। ফল যাহা হইয়াছে, তাহা ত আমরা দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের বা অন্যান্য স্থানের যে সকল স্থানে বারংবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানে বহুলোক পুনরায় খারাপ বাড়ীতে বাস করিতেছে। সুতরাং তাহাদের মৃত্যুর জন্য তাহারাই দায়ী। ঝড়ে সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে লোকের মৃত্যু হয় বটে। যাত্রীগণ যদি পূর্ব্বে আবহাওয়ার বিষয় বিশেষরূপে জানিয়া জাহাজে উঠেন, তবে বিপদের সম্ভাবনা অল্পতর হয়। অকুল প্রায় মহাসমুদ্রের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। পথে বিপদের সম্ভাবনা অধিক। যাহারা যাতায়ত করেন, তাহারা সেইরূপ বিপদের আশঙ্কা (Risk) মস্তকে গ্রহণ করিয়াই যাত্রা করেন। অত বড় মহাসমুদ্রে বড় ঝড় উঠিলে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জাহাজ ডুবিতে পারে, ইহা তাহাদের সকলেরই যাত্রার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া লওয়া উচিত। "মহাসমুদ্রে জাহাজ আছে, সুতরাং পরমেশ্বরের উচিত যে তিনি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ঝড় বহাইবেন না, অথবা ঝড় উঠিলেও জাহাজের চতুর্দ্দিকে

---

* শুনিয়াছি শিলং সহরে এমন ভাবে বাড়ী তৈয়ার করা হয় যে তাহাতে ভূমিকম্প কিছু করিতে পারে না। দরিদ্রগণ যেরূপ বাড়ীতে বাস করে, সাধারণতঃ ভূমিকম্পে উহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না।

তাহা থামাইয়া দিবেন।” এরূপ আশা করা কতদূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। মানুষের কর্ত্তব্য যে জাহাজ এতদূর শক্তিশালী করিয়া প্রস্তুত করা হয় যে প্রবলতম ঝড়েও উহা সমুদ্রে সুস্থির থাকিতে পারে, নতুবা আরোহিগণ নিজ দায়িত্বে যাত্রা করিবেন, অন্যকে দায়ী করিতে পারিবেন না। যাহারা জ্যোতির্বিদ্যায় (astrology)তে বিশ্বাসী, তাহারা বলিবেন যে ঐসকল বিপদ সঙ্কুল স্থানে শুভ দিনে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। আধুনিকদিগের মধ্যে অনেকে এবং বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য করেন। Astrologyও বিজ্ঞানের একটী বিভাগ। শুনা যায় যে কোন কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ইহাতে বিশ্বাসী। এই শাস্ত্রে গুপ্ত কিছুই নাই। ইহা গণনার উপর নির্ভর করে। তবে হইতে পারে যে এই বিজ্ঞান এখনও নির্ভুল (perfect) নহে। এক অর্থে কোন বিজ্ঞানই নির্ভুল নহে। জড় স্বাধীন নহে কিন্তু অদৃষ্ট বদ্ধ। উহাকে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। এই জন্যই সূর্য্য চন্দ্রের উদয়, অস্ত ও গ্রহণ, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনা বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারা যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে মানুষ ত জড় পদার্থ নহে, তাহার ত স্বাধীনতা আছে, তবে কেন সে গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব দ্বারা নিয়মিত হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মানবাত্মার স্বাধীনতা আছে সত্য ; কিন্তু যতদিন সে জড় ভাবে জড়িত থাকে, অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, ততদিন সে জড়ের ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হয়। তাহার প্রমাণের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। যাহারই দেহাত্মভেদ জ্ঞান জন্মে নাই, তিনিই জানেন যে তিনি দেহ দ্বারা অধিক সময় পরিচালিত হন। তিনি দেহের সুখে সুখী, দেহের দুঃখে দুঃখী। তিনি কাম ক্রোধাদির রিপু দ্বারা সর্ব্বদাই পরিচালিত। দেহ জড়, সুতরাং তাহা প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মানব যে পরিমাণে নিজেকে অজড় মনে করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তিনি দেহের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। স্থূল ভাবে বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে জীব=আত্মা+দেহ। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত। সুতরাং দেহের উপর গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব

থাকিবে, তাহা স্বল্পই হউক্ অথবা অধিকই হউক্। দেহ প্রভাবান্বিত হইলেই অন্তঃকরণও প্রভাবান্বিত হইবে। এবং আমরা অন্তঃকরণ দ্বারা চালিত হইব এবং আমাদের সেইরূপ কার্য্যের ফল ভোগ করিব। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আত্মার উপর গ্রহ উপগ্রহের কোনই প্রভাব নাই। অতএব জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা জড় ভাবাপন্ন মানবের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে পারা যায় বলিলে কোন অযৌক্তিক কথা বলা হইল না। এস্থলে জড় বাদীর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি ত মনুষ্যকে একটী জড়পিণ্ড বই আর কিছুই মনে করেন না. সুতরাং তাহা যে জড়ের নিয়মের অধীন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এস্থলে কাশীধামের মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বামীর একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার একজন বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্য কাশীধাম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁহাকে সেই দিন কাশী হইতে বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করেন এবং তাহার পরের দিন যাইতে বলেন। শিষ্যের ঐ দিনে বাড়ীতে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি বাড়ীতে যাইবার জন্য পুনরায় স্বামীজির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি (স্বামীজি) তাঁহাকে (শিষ্যকে) বাড়ীতে যাইতে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু যে Train এ তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল, সেই Train ভিন্ন অন্য এক Train এ যাইতে আদেশ দিলেন। পরে জানা গেল যে, যে Train এ উক্ত শিষ্যের যাওয়ার কথা ছিল, উহার সহিত অন্য Train এর সংঘর্ষ (collision) হইয়াছিল। এই ঘটনা অবশ্যই স্বামীজি জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা জানিয়া বলেন নাই। উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই জানিয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখের কারণ এই যে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে মানব ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন এবং স্বাধীনতা পরিচালনে অদৃষ্টকে দূরে রাখিতে পারেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সমুদ্রে ঝড় উঠাও পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেরই অন্তর্গত। সমুদ্রে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইলেই উহা স্থল ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহার দূষিত বায়ু সংশোধন

করে। Oxygen gasও অত্যধিক পরিমাণে সমুদ্র ভাগ হইতে স্থল ভাগে আসে। উহার আরও অনেক উপকারিতা আছে। মুরসুমি বায়ু প্রবাহিত হইলে আমাদের দেশে বর্ষাকাল উপস্থিত হয় এবং উহার জন্য নানাবিধ শস্য ফল ফলাদি আমরা লাভ করি। ভয়ানক গরমের পর বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে দেশ যেন সুশীতল হয়। অন্যথা দেশ বাসের অনুপযুক্ত হইত। বিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগ Meteorological Department এই সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও অনেক তত্ত্ব দান করিতে পারিবেন। ভূমিকম্প সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ভূমিকম্পের নানাবিধ উপকারিতা আছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ (Geologiots) তাহা অবগত আছেন। তাহার একটী হইয়াছে এই যে তাহা ভূ ভাগকে উত্তোলন করে। হিমালয়ও নাকি এককালে জলগর্ভে নিহিত ছিল। যদি ভূ ভাগের নানা ভাবের বৃদ্ধি ভূমিকম্পের একটী প্রধান কারণ হয়, তবে সেই প্রাকৃতিক নিয়ম কি পরমেশ্বরের বন্ধ করা উচিত? সমুদ্রমগ্ন আরোহীর ন্যায় আমরা বলিতে পারি যে ভূমিকম্প হয় হউক্, ভূমি উত্তোলিত ও বিস্তৃত হউক, কিন্তু যাহারা সেই সকল স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদের শরীরে যেন কুশাঘাতও লাগে না। ইহা কতদূর সম্ভব ও যুক্তি সঙ্গত, তাহা সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে কাগজে দেখিয়াছিলাম যে প্রসিদ্ধা Air Woman, Miss Amy Johnson তাহার Aeroplane এ উঠিবার সময় নিজে দেখিয়াছিলেন যে আকাশের অবস্থা ভাল না। তাহাকে বিমান ঘাটীর কর্ম্মচারিগণও সেই অবস্থায় উড়িতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই সতর্কবাণী গ্রাহ্য করিয়াছিলেন না। ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা ত সকলেই জানেন। ইহার জন্য অবশ্যই কেহ পরমেশ্বরকে দায়ী করিবেন না। বরং বলা যায় যে Miss Johnson জানিয়া শুনিয়া প্রকারান্তরে আত্মহত্যা করিয়াছেন। এস্থলে যাহা হইয়াছে, জাহাজ ডুবিতেও তাহা হয়। কেবল সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে হয়, এই মাত্র প্রভেদ। অথবা সূক্ষ্ম ভাবের বিচারেরও সকল সময় প্রয়োজন হয় না। Titanic জাহাজ যে

ডুবিয়াছিল, তাহার কারণও যাহা, Miss Amy Johnson এর পূর্ব্বোক্ত ঘটনাও তাহা। ভাসমান বরফের পাহাড় (avalanche of snow) বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে, একথা একখানি জাহাজ পূর্ব্বাহ্নেই itanic জাহাজকে জানাইয়াছিল, কিন্তু Captain সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে Titanicকে সমুদ্রে কিছু করিতে পারিবে না। তাই তিনি পূর্ণ বেগে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন এবং উহা বরফের পাহাড়ের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া জলমগ্ন হইল। Railway Collision প্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। ইহার মূলে অনেক সময় কর্ম্মচারীদিগের সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবের অসাবধানতা। মাঝে মাঝে দুষ্ট লোকদিগের ধ্বংস ক্রিয়াও (sabotage) ইহার কারণ হয়। সুতরাং মানবই ইহার জন্য দায়ী। ভূমিকম্পে সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, জল প্লাবন সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। প্লাবনের একটী প্রধান কারণ Railway এবং অন্যান্য ব্যবস্থা তৈয়ারী করা। জল নিম্নগামী। ইহা প্রকৃতির একটী নিয়ম। যদি কোন কারণে ইহার গতি রোধ করা হয়, তবে উহা এক স্থানে কিছুকাল জমিয়া পরে নিকটস্থ গ্রাম ও নগর প্লাবন করিবে। ইহাও প্রকৃতির নিয়মের অন্তর্গত। সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে জল প্লাবনের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা নিবারণের ব্যবস্থা হয় না, অথচ লোক সকল সেই সকল স্থানে বসবাস করিতেছে। মানুষ যদি ঠেকিয়াও না শিখে, তবে সেই জন্য পরমেশ্বর প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জলকে উর্দ্ধগতিতে প্রধাবিত করিবেন না। এই জল প্লাবনেও ভূমির উর্ব্বরতা, জাল জঞ্জাল পরিষ্কার অর্থাৎ শোধন কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা সেই সেই স্থানের বিশেষ উপকার সাধন করে। আর অন্য প্রকারের প্লাবন অর্থাৎ সমুদ্রে বান ডাকা, জোয়ারের জলে প্লাবন দ্বারাও উক্ত প্রকার কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হয়। আমাদের জন্মভূমি পবিত্র বঙ্গদেশও সমুদ্রের প্লাবন দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য দেশও গঠিত হইয়াছে ও হইবে। জল প্লাবন রোধ করিবার জন্য বর্ত্তমানে নানারূপ কার্য্য হইতেছে। উহাতে অত্যন্ত অধিক

পরিমাণে শক্তি (Power) উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহা দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইতেছে। যে সকল স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হইত, সেই সকল স্থান এখন বহু ভাবে উপকৃত হইতেছে। মোটামুটী বুঝিতে গেলে আমাদের বলিতে হয় যে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি তাহা না করিয়া কেহ বসবাস বা চলাফেরা করেন, তবে বিপদ তাহার মস্তকে লইয়া বেড়াইতে হইবে। সে জন্য যেন তিনি মঙ্গলময় পরমপিতাকে দায়ী না করেন। কেহ বলিতে পারেন যে মানব অজ্ঞতা বশতঃও অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে মানবের অজ্ঞতার জন্য তাহারাই দায়ী। ইংরেজীতে একটী কথা আছে Ignorance of law is no excuse. আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু তথাপিও একথা বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে আমরাই তাহার জন্য দায়ী, পরমেশ্বর নহেন। যাঁহার অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি, তাঁহার সম্বন্ধে সকল বিষয় বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান না করিয়া হাল্‌কা ভাবে ও সাধারণভাবে (in a general way) মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। স্থূল, অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতা কাহার কোন দিক হইতে বিপদ আসিতে পারে জানিয়াই তাহা নিবারণের জন্য ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত বুদ্ধি, স্বাধীনতা, অধ্যবসায়, চেষ্টার সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল পথে চলি, তবেই আপনা আপনি সেই সকল বিপদের হস্ত হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। স্থূল, প্রত্যেক মানবই তাহার কর্ম্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করেন। এমন হইতে পারে না যে বিনা দোষে অনন্ত ন্যায়বান পরমেশ্বর কাহাকেও শাস্তি দেন। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা হইতে পারে, তাহাতে বহু লোক নানা প্রকার ভোগ ভুগিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তি যে কোনই শাস্তি পাইবেন না, ইহাও ধ্রুব সত্য। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে এই বুঝিতে পারা যায়

যে আমাদের সকলের নিরাপদ স্থানে সুনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া থাকিতেই হইবে, বাহিরে গেলেই বিপদ। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল ঘরে বসিয়া থাকার প্রশ্ন উক্ত আলোচনায় আসে না। তবে অতিরিক্ত সাহসিকতার জন্য অতিরিক্ত বিপদ-সম্ভাবনা (Risk) স্বীকার করিতে হইবে, এই মাত্র। কোন এক ব্যক্তি সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও যদি বিদ্যা অর্জ্জন না করেন, ও সেই জন্য সে মূর্খ থাকেন, তবে জীবনে যে তিনি দুঃখ পাইবেন, তাহার জন্য তিনিই দায়ী। সেইরূপ মানব যদি ভগবদত্ত জ্ঞান এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিতেও উহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া বিপদ গ্রস্থ হন, তবে তাহার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। আমরা অনেক সময় সভ্যতার জন্য নিজেদের বিপদ নিজেরা ডাকিয়া আনি। পাঠক মনে রাখিবেন যে সভ্যতা আমাদিগকে অবিমিশ্র সুখ দান করে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে Motor Car ছিল না। নূন্যাধিক ৬০ বৎসর যাবত এই যানটী ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে যাতায়তের ও কাজকর্ম্মের সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণের অনিষ্টও যথেষ্ট হইতেছে। এক বৎসরে Motor accident এর জন্য পৃথিবীতে হতাহতের সংখ্যা ঠিক করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ঐ একমাত্র কারণে সহস্র সহস্র লোক হতাহত হয়। Motor চালকগণের দোষে অনেক সময় ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু Motor Machine এর এরূপ অবস্থা হয় নাই যে চক্ষুর নিমেষে গাড়ী আপনা আপনি থামিয়া যাইবে। আর অপ্রশস্ত রাস্তায় দ্রুত-গতিতে গাড়ী চালান হয়, সেই স্থানে শত শত লোক কার্য্যানুরোধে চলা ফেরা করে। সুতরাং দুর্ঘটনা সম্ভব হয়। যেরূপ দ্রুত গতিতে Motor, Bus, Lorry চালান হয়, তাহাতে উহার জন্যই পৃথক একটী সুপ্রশস্ত পথ নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহা কোথায়ও আছে কি? অথচ সেই সকল মৃত্যুর জন্য অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে দায়ী করা হয়। ইহা কতদুর সঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। সভ্যতা সুখের সঙ্গে জগতে কত যে দুঃখ আনয়ন করিতেছে, তাহা

নির্ণয় করা অসাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পর্যন্ত আমরা আমাদের রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা না করিয়া আমাদেরই কৃত যান বাহনে আরোহন করিয়া অথবা অনুপযুক্ত গৃহে বাস করিয়া বিপদের সম্মুখীন হই, সেই পর্য্যন্তই তাহার জন্য নিজদিগকেই একমাত্র দায়ী মনে করিতে হইবে। পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিবেন না যে আমরা বলিয়াছি যে সভ্যতা পৃথিবীতে আমাদের জন্য কেবল দুঃখ আনয়ন করিয়াছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা এই যে সভ্যতা সুখ সুবিধার সহিত বহু দুঃখ দৈন্যও আনয়ন করিয়াছে। ইহাও সত্য যে পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে যাইয়া আমরা সেই দিকে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে আমরা অন্য দিক একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা কেন পৃথিবীতে আসিয়াছি, কোথায় হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে ও পৃথিবীতে আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি? এই সব বিষয় সম্বন্ধে এখন অত্যল্প সংখ্যক মানবই চিন্তা করেন। Plain living and high thinking আমাদের মোটেই লক্ষ্য নহে, উহার বিপরীত ভাবই অর্থাৎ high living and plain thinkingই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বস্তু হইয়াছে। মানব যে ইহ সর্ব্বস্বতারূপ মহারোগে অত্যন্ত ভাবে আক্রান্ত, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে যাহার জন্য জগতে মানবের আগমন, সেই বস্তুটীকে লাভ করিতে যতটুকু প্রয়োজন, তাহার জন্যও সচেষ্ট হওয়া। অতিরিক্ত করিতে গেলেই মানব সাধারণের দুঃখ দৈন্য অবশ্যম্ভাবী। আমরা আবারও বলিতেছি যে জগতে জাগতিক উন্নতি অবশ্যই সাধন করিতে হইবে, কিন্তু ধর্ম্মকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিতে হইবে। আর্য্যগণও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্ব্বর্গের আদিতে ধর্ম্মকেই স্থান দান করিয়াছেন। সর্ব্বকার্য্যের সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম চালকরূপে বর্ত্তমান থাকিলে পার্থিব উন্নতি ভয়াবহ না হইয়া আনন্দ জনকই হইতে পারে।* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম

* ধর্ম্ম অর্থে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ বিধি নিষেধ সমূহ বুঝায়। বর্ত্তমান ধর্ম্ম অর্থে সাধারণতঃ ধর্ম্ম এবং মোক্ষ সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যকেই বুঝায়।

শিরোভাগে বর্ত্তমান থাকিলে Atomic Energy দ্বারা পৃথিবীতে শত সহস্র হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম শিরোধার্য্য না হইবে, সেই পর্য্যন্তই অর্থ ও কাম কিছুতেই উপযুক্ত পরিমাণ সুখ দান করিবে না, জ্বালা, যন্ত্রণা বৃদ্ধিই করিবে। তবে ইহাও এই প্রসঙ্গে দৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে যে আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া জগতে যতই অন্যায় অত্যাচার করি না কেন, অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা তাঁহার অনন্ত মঙ্গল গুণে উহা-দিগকেও মঙ্গলেই পরিণমন করিবেন। ধন্য প্রেমময়! ধন্য তোমার অপূর্ব্বা প্রেমলীলা! তুমি যে নিত্যই অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত মঙ্গল বিধানই করিতেছ, ইহাতে কি কোন সংশয় আছে? উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে নৈসর্গিক দুর্ঘটনা বলিয়া আমরা যাহাদিগকে আখ্যা দান করি, তাহাতে বিশ্বের মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। উহা দ্বারা অমঙ্গল কখনই হয় না বা হইতেও পারে না। তবে যে আমরা অমঙ্গল দেখিতে পাই, তাহা আমাদের অসম্যক্ দৃষ্টি জনিত। আমাদের আপাত অমঙ্গলের জন্যও আমরাই দায়ী। রোগ কেন হয়? সকলেই এক বাক্যে বলিবেন যে শারীরিক নিয়ম ভঙ্গই রোগের প্রধান কারণ। সেই রোগ হইলে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার রোগ নিবারণের জন্যও বিধান আছে। সেইরূপ আমরা যে পাপ করি, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিধান আছে। আবার যাহাতে পাপ না হইতে পারে, তাহারও বিধান আছে। আবার যদি আমরা বিপথে গমন করি, তবুও যাহাতে আমরা পুনরায় সেই একমাত্র সরল ও মঙ্গল পূর্ণ পন্থা অবলম্বন করিতে পারি, তাহারও বিধান আছে। স্থূল, বিশ্বে কিছুতেই অমঙ্গল হইতেছে না বা হইতেও পারে না। নৈসর্গিক বিধান যে সর্ব্বদাই মঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহা আমরা আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। পৃথিবীকে আজ আমরা যেরূপ দেখিতেছি, উহা আদি হইতেই এইরূপ ছিল না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে আদিতে সূর্য্য মণ্ডল হইতে কতক

উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। উহাই কালক্রমে বর্ত্তমান পৃথিবীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় আসিতে কত অসংখ্য ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কিন্তু সেই নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে আমরা পৃথিবীকে পাইয়াছি। গ্রহগণও ঐরূপ ভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে কি আমরা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিব না যে ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত মঙ্গলময় এবং আমরা যে সকল অমঙ্গল দেখিতেছি. তাহাও মঙ্গলের জন্যই? আর এক ভাবেও আমরা পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। তাহা সৃষ্টির ক্রম প্রণালী। পৃথিবী যখন প্রস্তুত হইতেছিল, অর্থাৎ ইহা যখন অত্যধিক উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ (gaseous matter) মাত্র ছিল, তখন পরম পিতা মানব কেন, কোনও জীব সৃষ্টি করেন নাই। উত্তপ্ত gas হইতে যখন জলের ও তাহা হইতে স্থল ভাগের উৎপত্তি হইল এবং উহারা যখন শীতল ভাবাপন্ন হইল, তখনই ক্রমশঃ নানাবিধ জীব সৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জলচর, তৎপর উভচর ও পরিশেষে স্থলচর জীবের উৎপত্তি অনুমিত হয়। এইরূপ ক্রমময়ী সৃষ্টিতে যে কত কোটী কোটী বৎসর লাগিয়াছে, তাহা অনিশ্চিত। এই সকল সময়ই পৃথিবীর অবস্থা অধিক হইতে অধিকতররূপে জীববাসের উপযোগী হইতেছিল। পৃথিবী এক এক শ্রেণীর জীবের সৃজন লালন ও পালনের উপযুক্ত হইতেছিল, আর সেই সকল জীব সৃষ্ট হইতেছিল। পৃথিবীতে মনুষ্যই শেষ জীব সৃষ্টি। পৃথিবীর মনুষ্য বাসের উপযুক্ত অবস্থায়ই সে এখানে আগমন করিয়াছে। পরম প্রেমময় পরমপিতা তাহাকে অত্যুত্তপ্ত gas এর মধ্যে সৃষ্টি করেন নাই। বরং এই কথাই বলা যাইতে পারে যে বসুন্ধরা যখন মানবকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য সামগ্রী সম্ভারে পরিপূর্ণা হইয়াছে, তখনই সে সৃষ্ট হইয়াছিল। নর সৃষ্টির আদি অবস্থায় প্রাকৃতিক উপদ্রব ও হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে মানবকে যেরূপ শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল, তাহাও পরমপিতা তাহাকে দিয়াছিলেন। অতএব ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে ক্রমময়ী সৃষ্টির কারণ তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা

এবং প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হইলে নানা প্রকার জীবের সৃজন ও পোষণ হয়, তিনি তৎ তৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই প্রকৃতিতে সেইরূপ অবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ Darwin এর মতে Protoplasm হইতে ক্রমশঃ পৃথিবীস্থ নানা জাতীয় জীবকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। Chance variation কে এক শ্রেণীর জীব হইতে অন্য শ্রেণীর জীবের পরিণতির কারণের মধ্যে একটী কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে ক্রম সৃষ্টির অবশ্যই একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। নতুবা নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে জীবদেহের পরিণতি অসম্ভব হইত। উক্ত মতদ্বয়ের সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও আমরা ইহা স্বীকার করি যে একটী মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই জীব নিম্নতম স্তর হইতে মানব জন্ম লাভ করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে "ইতর জীবের কথা", 'মায়াবাদ" ও 'সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশত্রয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের ক্রম বিকাশবাদ (Evolution theory) সম্বন্ধে আলোচনা 'ইতর জীবের কথা" অংশে বর্ত্তমান। উহাও নির্দ্দেশ করিতেছে যে জীব ক্রমশঃ নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিতে করিতে মানব জন্ম লাভ করে। মানব যে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, ইহাও হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। সুতরাং উহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ জীবের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তরে ক্রমোন্নতি হয়। অতএব উভয় মত পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা পাই যে জীবের উর্দ্ধগতিই নিয়তি। অর্থাৎ অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে উন্নতিই জীবনের পরিণতি। পৃথিবীতে মানবই শ্রেষ্ঠতম জীব। কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে মানব জীবনেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। কত লক্ষ লক্ষ নর নারী ধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা জানিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বিশ্বে মানবই জীবের শেষ পরিণতি নহে।

অন্যান্য মণ্ডলেও মানব অপেক্ষাও উন্নততর সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে জীবের বাস আছে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুস্থলে লিখিত হইয়াছে। কারণ-দেহে জীবের অত্যুন্নতি লাভ হয়। এই কারণ-দেহের সংখ্যা অনন্ত প্রায়। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে জীবের নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে বাস করিতে হইবে। অর্থাৎ অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে সুতরাং মঙ্গল বিধানে জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিবে। অতএব আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে আমরা যতই দুঃখ কষ্ট ভোগ করি না কেন, ইহার ফল পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে আমাদের নিকট ক্রমোন্নতিই আনিয়া দেয়। আমাদের পতন, অধঃ-পতন আছে সত্য, কিন্তু উহা জীবনের পরিণতি নহে। উহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আমাদের পক্ষে উন্নতিই পরিণাম এবং উহা চিরকাল স্থায়ী বা অনন্ত-কাল-স্থায়ী। পৃথিবীর আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। বৈজ্ঞানিকগণও বলেন যে জীবদেহ ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মানব দেহে পরিণত হইয়াছে এবং মানব দেহেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। গভীরতর ভাবে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ক্রমোন্নত দেহে স্থূল ভূতের অংশ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং সূক্ষ্ম ভূতের অংশও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার মানব দেহের মধ্যেও ভূত পরিমাণের তারতম্য আছে। মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত মানবের দেহে স্থূল ভূতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্পতর এবং সূক্ষ্ম ভূতের পরিমাণ অধিকতর। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ক্রমশঃ উন্নত মানব দেহে তদপেক্ষা অনুন্নত মানব দেহ হইতে সূক্ষ্ম ভূতের পরিমাণ অধিকতর। সৃষ্টি ক্রমময়ী। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে এমন সকল মণ্ডলে তাহার যাইতে হয়, যে সকল স্থলে তিনি ক্রমশঃ সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যে সকল দেহে সূক্ষ্ম

ভূতের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং স্থূল ভূতের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। শেষে তিনি কারণদেহ প্রাপ্ত হন এবং কারণ-দেহেরও ক্রম আছে। অর্থাৎ অবশেষে তিনি এমন দেহ প্রাপ্ত হন, যাহাতে কারণত্বেরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, অর্থাৎ সেই শেষ দেহে তিনি জীবভাবে যতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহার পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। এই ভাবে চিন্তা করিয়া আমরা পাইলাম যে জীবের স্থূলদেহে লব্ধ যে সকল দোষ পাশ ও তজ্জনিত দুঃখ ক্লেশ আমরা ভোগ করি, তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ সুখই আমাদের পরিণাম, দুঃখ নহে। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য। আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে জীবদেহ স্থূলতমা অবস্থা হইতে সূক্ষ্মতমা অবস্থা এবং সূক্ষ্মতমা অবস্থা হইতে কারণতমা অবস্থা অথবা অবনততমা অবস্থা হইতে উন্নততমা অবস্থায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ উন্নতিই সৃষ্টির বিধান। যদি অবনতির বিধান হইত, তবে জীবের উন্নততমা অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অবনততমা অবস্থায় নামিয়া আসিতে হইত। Hot gaseous matter বর্ত্তমান পৃথিবী সৃষ্টি না করিয়া উহা (বায়বীয় পদার্থ) হইতেও খারাপ কিছুতে পরিণত হইত, বৈজ্ঞানিক মতে Protoplasm হইতে উন্নত মানব দেহ সৃষ্ট না হইয়া উহা (protoplasm হইতেও খারাপ কিছুতে পরিণত হইত। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে বিশ্বে যে বিধানই হইয়াছে, তাহাই মঙ্গল বিধান। কারণ, উহার ফলে আমাদের অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সত্তা, অনন্ত অনন্ত অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ হইবে। ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও স্থান নাই। পৃথিবীতে মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেই আমরা পূর্ব্বে শক্তির প্রমাণ পাইব। মানবের মধ্যে পাপ, প্রলোভন, দুঃখ, ক্লেশ, লজ্জা, অপমান, দোষপাশের গভীর অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও মানব আদিযুগের বর্ব্বর অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সে কেবল বৈজ্ঞানিক উপায়ে, বুদ্ধি, কৌশল প্রয়োগ করিয়াই পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র তাহা নহে, কিন্তু

আধ্যাত্মিক বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অবশ্যই বলিতে হইবে যে মানব আশানুরূপ উন্নতি লাভ করেন নাই, কিন্তু আদিযুগের মানুষ অপেক্ষা সে যে অধিকতর উন্নত, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বর্ত্তমান শতাব্দীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা পার্থিব উন্নতি অধিকতর ভাবে সংসাধিত হইয়াছে। কারণ, যাহার যত অনুশীলন হইবে, তাহার তত উন্নতি হইবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির অভাবে আমাদের পার্থিব মতিগতি ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে না, তাই আমাদের কার্য্য সমূহ আধ্যাত্মিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে না। এই জন্যই পৃথিবীতে স্বকৃত আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ব্যাধি এবং নানাবিধ আপদ বিপদ বর্ত্তমান। তাই ভক্ত চূড়ামণি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন ঃ—"স্বখাত সলিলে ডুবি মরি শ্যামা।" ইহা যেমন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য, তেমনিই পৃথিবীর পক্ষেও প্রযোজ্য। পাঠক মানবের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ব্বলিখিত আলোচনা স্মরণ করিবেন। মানব অনন্ত স্বাধীন পরমেশ্বরের অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং কার্য্য বিষয়েও তাহার কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা যেমনই পরম বস্তু, উহার অপব্যবহারে তেমনিই বিষময় ফল ফলে। আমরা সকলেই জানি যে, যে বস্তু যত উপকারী, উহার অপব্যবহারে উহা ততদূর অপকারী হয়। সর্ব্বশেষে এই আশার বাণী নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রচার করা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে যতই অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হউক্ না কেন, ঝড়ের রাত্রি একদিন অবশ্যই প্রভাত হইবে এবং সুখ সূর্য্য পৃথিবীতে অবশ্যই উদিত হইবেন। যাহা কিছু আমরা অমঙ্গল মনে করিতেছি, তাহাই ভবিষ্যতে মঙ্গলে পরিণত হইবে। অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই Resultant effect মঙ্গলই এবং মঙ্গলই ক্রমশঃ জীবদিগকে উন্নতি দান করিতেছে ও করিবে। ইহা গত ইতিহাস দ্বারা সুপ্রমাণিত হইতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন উত্থান ও পতন আছে, জাতীয় জীবনেও উত্থান ও পতন অবশ্যই আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া পৃথিবীতে যে ভীষণতম ঘটনা সমূহ ঘটিয়াছে, সাধারণের হৃদয়ে যেমন সত্য, জ্ঞান, প্রেম, ন্যায় প্রভৃতি গুণরাশি অত্যন্ত ম্লান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বার্থ, হিংসা, অহংকার, দোষ, পাশ, কলুষ এবং সর্ব্বোপরি কূট রাজনীতি (Politics) যেমন সেই স্থলে রাজত্ব করিতেছে, তেমনি অনন্ত প্রেমময় সুতরাং অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে আবার এই মহা অমঙ্গল হইতে মহামঙ্গল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে এই পৃথিবীমণ্ডলে আবার আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইবে। আজ যাহারা নিরাশায় ম্রিয়মান হইয়া আছেন, আজ যে সকল সাধুগণ পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া হাহাকার করিতেছেন, তাহারাই ভবিষ্যতে সত্য জ্ঞান, প্রেম ও ন্যায়ের জয় সন্দর্শন করিয়া মঙ্গলময় পরম পিতাকে হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে ধন্যবাদ দান করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাও নিম্নলিখিত শ্লোকে এই মর্ম্মেই বলিয়াছেন যে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখন পরম মঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গল বিধানে মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে পৃথিবী আবার শান্ত ভাব ধারণ করে। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ (৪/৭)।" সুতরাং আমাদের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। গ্রহণান্তে রাহুগ্রস্থ সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় আবার পৃথিবীতে ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। এবার যেমন বিপদ অত্যধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, পৃথিবীতে সমষ্টিগত উন্নতিও তেমনি অত্যধিক পরিমাণে যে সংসাধিত হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। "যত মুস্কিল, তত আছান" এই মহাবাক্য স্মরণে রাখিতে পারিলেই হইল। আমরা ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে শেষ ফল মঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত জীবনে তথা সমষ্টিগত জীবনে উন্নতিই পরিণাম। বিশ্বে নিয়ত পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং নানাভাবের যুদ্ধ বিগ্ন উপস্থিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে পরিশেষে জীবের ভাগ্যে অনন্ত উন্নতি লাভই প্রেমময়ের প্রেমের দান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংরেজীতে একটী কথা আছে। "There is a silver lining in the darkest cloud." অত্যন্ত

ঘনকৃষ্ণ মেঘেও একটী বিদ্যুৎ রেখা দেখা যায়। আবার মেঘ যতই ঘন হউক, উহার পরিণাম ফল বর্ষণ এবং পরিশেষে সূর্য্যোদয়। আবার সেই মেঘবারিই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে। সুতরাং পরিণাম ফল যে মঙ্গলে পরিপূর্ণ, ইহা অবধারিত সত্য। "অমঙ্গল রাশি হ'তে সুমঙ্গল বিধি মতে, সদা জনমে জগতে মঙ্গল ভাবেতে তাঁর।" সেইরূপ বর্ত্তমান জগৎ ঘোর তমসচ্ছন্ন হউক্ না কেন, জ্ঞানিগণ, ভক্তগণ উহার মধ্যেও আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন। সেই আশা কখনও মরীচিকায় পরিণত হইবে না, কিন্তু ঘন মেঘের প্রচুর বারির ন্যায় পৃথিবীতে অত্যধিক মঙ্গল উৎপাদন করিয়া পৃথিবীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবে; জ্ঞানিগণ, ভক্তগণ, প্রেমিকগণ জগতে পরম জ্ঞান-প্রেম-সূর্য্যের, পরম মঙ্গলময় পরম সূর্য্যের বিশেষ প্রকাশ দর্শন করিয়া আনন্দ বারিধি নীরে নিমগ্ন হইবেন। হে অনন্ত প্রেমময় পিতঃ! এই পৃথিবী তোমারই প্রেমগুণে সৃষ্ট। এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমারই বহু সুসন্তান তোমারি প্রসাদে তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু আজ পৃথিবী বিপন্না। ধর্ম্ম সূর্য্য রাহুগ্রস্থ। তুমি এখন পৃথিবীর প্রতি প্রসন্ন হও। হে অনন্ত দয়াময় পিতঃ! তোমার অপার দয়াগুণে পৃথিবীতে শীঘ্র শীঘ্র অতি শীঘ্র সেই মহাশুভ দিন আনয়ন কর, যে দিন জগতে সুপ্রভাত হইবে, যে দিন জগতের নর-নারীর হৃদয়ে সত্য, প্রেম, জ্ঞান, ন্যায়, সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি তোমার পরম গুণরাশি সর্ব্বদা বিরাজ করিবে, যেদিন ধর্ম্মানুশীলন, ধর্ম্মান্দোলন, ধর্ম্মোৎসব, ধর্ম্ম সাধনাই মানবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইবে, যে দিন পার্থিবতা, ইহ সর্ব্বস্বতা চির বিদায় গ্রহণ করিবে, যে দিন সংসার ধর্ম্মের শাসনে শাসিত হইবে, দেহ মন আত্মার একান্ত অধীন হইয়া সতত কার্য্য করিবে, জগতের নরনারী তোমার শ্রীহস্তের দান স্বরূপ পরিত্রাণ লাভ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিবেন। দয়াময়! দয়া কর!

ওঁ

আমরা আরও একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্ম

পরম মঙ্গলময়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে এই সৃষ্টি কার্য্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত অপূর্ণাবস্থায় জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের পথে প্রায় অনন্ত বাধা স্থাপিত করা হইয়াছে। সেই সকল বাধা অতিক্রম করাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই তাঁহার গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা হইবে। আমরা অনন্ত প্রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাতেই অত্যন্তভাবে তন্ময় হইয়া চিরকাল বাস করিব, ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। সুতরাং পরীক্ষা আমাদের পদে পদেই বর্ত্তমান। যে স্থানে বাধা অতিক্রম করিবার পরীক্ষা, সেই স্থানেই প্রথমতঃ একটু দুঃখ, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সেই দুঃখ আর স্মৃতিতে থাকে না অথবা উহা অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সেই কষ্ট স্বীকার করাই যে আমাদের কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও তখন অতি সহজেই ধারণা করিতে পারা যায়। ইহা যেমন পার্থিব বিষয়ে সত্য, আধ্যাত্মিক বিষয়ে উহা তেমনি সত্য। পরীক্ষার আকার নানা জীবনে নানা কর্ম্মফলে, নানা ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে এমন কখন হয় না যে আমরা যে শাস্তি বা দুঃখ পাই, তাহা আমাদের কর্ম্মফল হইতে কঠোরতর। আবার আমরা যে শাস্তি পাই, তাহাই পরমমঙ্গলময় পরমপিতা তাঁহার অনন্ত মঙ্গল গুণে মঙ্গলেই পরিণমন করেন। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ জীবন-বেদ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করি, তবেই আমরা এই উক্তির সত্যতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে "Out of evil cometh good" এখন আমরা নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাইব যে জড় পদার্থের জন্মের সার্থকতাও যেন দুঃখের মধ্য দিয়া সংসাধিত হয়। জীব ও জড় জগতের বিধান সমূহের মূলে একমাত্র মঙ্গলময় ব্রহ্মেরই ইচ্ছা। সুতরাং উভয় প্রকার বিধানেই সাদৃশ্য বর্ত্তমান। "One God, One Law, One Universe" বাক্যটী স্মরণ করিতে হইবে। ধূপের সার্থকতা সকলকে সুগন্ধ দান। কিন্তু উহা দগ্ধ না হইলে সেই কার্য্য সম্ভব হয় না। ধান্য জন্মের

সার্থকতা মানবকে অন্নদান, কিন্তু ধান্যের অন্নাকারে পরিণত হইতে প্রথমতঃ রৌদ্রের উত্তাপে উহার শুষ্ক হইতে হয়, তৎপর উদখলে নিষ্পেষিত এবং অবশেষে অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ বা কোমল হইতে হয়। এই অবস্থা সমূহ পার না হইলে উহার চরম সার্থকতা লাভ হয় না। স্বর্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও দেখিতে পাই যে আকরেপ্রাপ্ত স্বর্ণের সহিত স্বর্ণেতর বহুপদার্থ মিশ্রিত থাকে। উহাকে বারংবার প্রবল দহনে দগ্ধ করিলে এবং দাহকালে শ্যামিকা নামক পদার্থ বিশেষ সংযোগ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। আবার সেই বিশুদ্ধ স্বর্ণও পুনরায় দগ্ধ হইয়া এবং বারংবার আঘাত প্রাপ্ত হইলেই উহা অলঙ্কারে পরিণত হইয়া স্বর্ণ জন্মের সার্থকতা লাভ করে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে চরম সার্থকতা লাভের পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে হয় বটে, কিন্তু তাহা আমদিগের নিকট পরিণামে একমাত্র মঙ্গলই আনয়ন করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে চন্দন, ধান্য প্রভৃতি অচেতন জড় পদার্থ। উহাদের সুখও নাই, দুঃখও নাই, সুতরাং মঙ্গলা-মঙ্গল নাই। সুতরাং উহাদের জন্মের সার্থকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। আমরাও বলি যে জড় পদার্থের সুখ দুঃখ নাই। কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে জগতে কিছুই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রয়োজন যখন সেই সেই পদার্থ দ্বারা সিদ্ধ হইবে, তখনই উহাদের সৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদিত হইল বলিতে হইবে। যথা—ধান্যের জন্ম তখনই সার্থক হয়, যখন উহা অন্নাকারে পরিণত হইয়া মানবের শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা এবং ঐরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে জীব ও জড় জগতে একই মঙ্গল বিধানে কার্য্য হইতেছে, যে বিধানানুযায়ী জীব ও জড় উভয়ই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়া সিদ্ধির অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। পাঠক এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে অদৃষ্টবাদ মীমাংসা সম্বন্ধে লিখিত বিষয় (১৩২-১৩৫ পৃঃ) স্মরণ করিবেন। উহাতে দেখা যাইবে যে জীবগণ এক একটী গুণ-

প্রধান ভাবে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবেই প্রথমতঃ অনন্ত গুণ অত্যল্প পরিমাণে এবং কোনও একটী গুণ কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ধরা যাউক্ যে সেই একটী গুণ প্রেম, জ্ঞান, সরলতা, একাগ্রতা প্রভৃতি। এখন উহাদের মধ্যে কোন কোন গুণ সাধনার প্রথমাবস্থায় অধিক আয়াস ভিন্ন কাটিয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তাহাকে উক্ত গুণ সাধনায় অধিকতর আয়াস স্বীকার করিতে হয়। তাই সে প্রথম অবস্থায় সুখ লাভ করিল এবং দ্বিতীয় অবস্থায় দুঃখ লাভ করিল, ইহা বলা যাইতে পারে। অপর একটী গুণ সাধনায় ইহার বিপরীত অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে। অর্থাৎ সেই গুণ সাধনার প্রথম অবস্থা কঠিন সুতরাং দুঃখ জনক এবং দ্বিতীয় স্তর অল্পায়াসসাধ্য সুতরাং সুখদায়ক। এইরূপ ভাবেও জীবের জীবনে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কঠোর গুণ সাধনায় প্রথমে দুঃখ, পরে সুখ, কিন্তু কোমল গুণ সাধনায় প্রথমে সুখ পরে দুঃখ। কিন্তু এই সাধনা জনিত দুঃখকে অমঙ্গল আখ্যা দান করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। কারণ, সেই সাধনার স্তর উত্তীর্ণ হইলেই জীবের আত্মোন্নতি এবং সাময়িক দুঃখের অবসান। সুতরাং তাহা মঙ্গল বই অমঙ্গল ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা এমন কোন বিশ্বের কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে উহার গঠনই এমন ভাবের হইবে যে উহাতে পরীক্ষার স্থান থাকিবে না। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে আমরা অপূর্ণভাবে ভাসমান এবং সর্ব্বদাই পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত। সুতরাং দুঃখ কষ্ট অনিবার্য্য। কোনই জাগতিক দুঃখ কষ্ট থাকিত না, আমরা সর্ব্বদাই আমাদের সত্য স্বরূপ যে "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ", তাহাতেই নিত্য অবস্থিতি করিতে পারিতাম, যদি আমরা জন্ম মুহূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্মের অনন্ত গুণে বাস্তবেও পূর্ণভাবে চলিতে পারিতাম। অর্থাৎ যদি বিশ্বের অনন্ত প্রায় জীব অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্ম ভাবেই জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু সেই অবস্থা সংঘটিত হইলে অর্থাৎ সকল

জীবই নিত্য পূর্ণ থাকিলে জড় জগতের সৃষ্টিরই কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, জড় জগৎ আমাদের বাধা স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ অপূর্ণকে পূর্ণত্ব দান করাই সৃষ্টি। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "গুণ বিধান" অংশদ্বয়ে দেখিতে পাইয়াছি। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষারূপ সৃষ্টি কার্য্যের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। কারণ, সকলই যখন পূর্ণ, তাঁহাদের মধ্যে অনন্ত গুণ বাস্তবেও পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ও বিকশিত, তখন গুণরাশির বিকাশের শক্তির আবশ্যকতা কোথায়? সুতরাং শক্তির বাস্তব পরীক্ষাও অসম্ভব। অর্থাৎ সকলেই যদি পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেন, তবে সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যে গঠিত হইবে? অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্মের কল্পনাও যে অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অনন্ত প্রেমময় বিধাতা যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হইয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না। সুগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিও বিশ্বের এমন একটী খসরা (Scheme) প্রস্তুত করিতে পারিবেন না যাহাতে জীবের কোনরূপ দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে বর্ত্তমান সৃষ্টির বিধান মঙ্গলে পরিপূর্ণ। "সৃষ্টির সূচনা" ও "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয়ে আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্ব সৃষ্টিতে কোনই ত্রুটী হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমে নিত্য পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার এই জ্ঞান-প্রেমময়ী বিশ্বলীলায় দোষলেশাশঙ্কা আমাদের অজ্ঞান সম্ভূতা মাত্র। যাঁহাতে অনন্ত ও পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম নিত্য বিরাজিত, তাঁহার দ্বারা যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতেই পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে দুঃখ কষ্ট আমাদের মঙ্গলের জন্যই। উহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতেও পারে না। শিশু নিজে নিজেই হস্ত পদ সঞ্চালন করে। এক অর্থে ইহাতে তাহার কষ্ট হয়। কিন্তু উহার ফলে তাহার শরীর সবল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেহ শারীরিক পরিশ্রম

করিলে তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, সহজেই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং নানারূপ ব্যাধির হস্ত হইতে সে উদ্ধার পাইবে। এস্থলেও প্রথমে দুঃখ ও পরিণামে সুখ। পাঠক মনে রাখিবেন যে রজোগুণ দুঃখাত্মক এবং উক্তবিধ ক্রিয়া সমূহ রজোগুণোৎপন্ন। মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও বাধা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহা অতিক্রম করিতে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয় কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই আত্মোন্নতি ও তজ্জনিত সুখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের সম্মুখে যে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা আত্মার গুণরাশির সুবিকাশের জন্যই। কষ্টের জন্য আমাদিগকে কষ্ট দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে বা হইতেও পারে না। সাঁতার শিখিতে হইলে জলে নামিতে হয়, মাঝে মাঝে জলে ডুবিতে হয় এবং বিশেষ চেষ্টা থাকিলে উহা শিক্ষা করা যায়। কার্য্যের উদ্দেশ্য দ্বারাই কর্ত্তার বিচার করা কর্ত্তব্য। কেহ ক্রোধ বা হিংসা বশতঃ যদি কাহাকেও আঘাত করে, তবে তাহার কার্য্য অন্যায় বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। আবার চিকিৎসক যখন রোগ মুক্তির জন্য রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন তখন তাহার কার্য্য মঙ্গল জনক বলিয়াই কথিত হয়। ব্রহ্মের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য যখন অতি সুমহান্ অর্থাৎ জীবদিগকে পূর্ণতা দান সুতরাং উহাদের ফল যখন মঙ্গলেই পরিপূর্ণ, তখন যে উহাতে কোনই দোষ ক্রুটী থাকিতে পারে না, ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? এস্থলে প্রশ্ন হইবে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে সাধকের দুঃখ লাভই সার হইল। সুতরাং তাহাতে তাঁহার মঙ্গল কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পরমপিতার মঙ্গল বিধানে কোন কার্য্যই বিফলে যায় না। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে কিছু না কিছু সুফল ফলিবেই। অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর গীতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃসমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভি জায়তে॥ অথবা যোগিনামেব কুলে

ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥" (৬-৪০/৪৩)।"বঙ্গানুবাদ :—শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে সে ব্যক্তির কোথায়ও বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কল্যাণানুষ্ঠান করে, সে কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহু বর্ষ বাস করতঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে। লোকে ঈদৃশ জন্ম দুর্ল্লভতর। হে কুরুনন্দন, এই জন্মে পূর্ব্ব দেহে যে বুদ্ধি ছিল, তাহা সে প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নশীল হয়। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" যাহারা পরলোক এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহেন, তাহারাও যদি তাহাদের বিফলতা সম্বন্ধে গভীর ভাবে অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে তাহাদের সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম্ম সমূহ একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই, বরং তাহাতে তাহাদের শক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছে। ইংরেজীতে একটী কথা আছে Failures are but the pillars of success এই উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারেন। পূর্ব্বে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা এবং ঐরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব যে বাধা অতিক্রমের চেষ্টা দ্বারাই আমাদের শক্তি সমূহের সুবিকাশ সাধিত হয়। জীবনে জীবনে গুণরাশির ক্রমবিকাশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আমরা যে অত্যন্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই অন্ধকারের কারণ যে আমাদের অত্যন্ত অজ্ঞান, তাহাও আমাদের সকলেরই জানা আছে। সুতরাং যে পর্যন্ত না আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিব, সেই পর্য্যন্তই আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন : "প্রেমভক্তি রেকাগ্রত্বং, সরলতা পবিত্রতা। বিশ্বাস শ্চেতি ষড়্‌জ্ঞেয়া গুণাঃ পরমসংজ্ঞকাঃ॥ "জ্ঞানান্মোক্ষো" বাচ্য মেতদ্ বহুক্তং সাধুসত্তমৈঃ। তজ্জ্ঞানঞ্চ ফলং জ্ঞেয়ং ষণ্ণামেষাং

মনোরমম্॥” “বঙ্গানুবাদ :—প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা এবং বিশ্বাস এই ছয়টী পরম গুণ। “জ্ঞান হইতে মোক্ষ” এইরূপ উক্তি বহু সাধু করেন। সেই জ্ঞান এই ছয়টী গুণের মনোরম ফল বলিয়া জানিবে।” (মন্তব্য :—এই স্থলে জ্ঞান অর্থে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সেই জ্ঞান নহে। ইহা দিব্য জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান।) আমাদের নিকট সর্ব্বদাই সমস্যা বর্ত্তমান। এই যে পৃথিবীতে সাধারণে দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা, অপমান, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা দেখিতেছে তাহাতে সাধারণ কেন, অনেক সুশিক্ষিত পণ্ডিতও ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্বে সন্দিহান। এই যে অন্ধকার, এই যে সমস্যা, ইহাও আমাদের একটী কঠিন পরীক্ষা। অর্থাৎ আমরা যাহারা স্থূল দৃষ্টিতে কেবল অমঙ্গলই দেখিতেছি, তাহাদেরও নিকট উহা একটী পরীক্ষা। তাহাদেরও সাধন ভজন দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে, প্রেমময়ের রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তখনই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই জ্ঞান “অতএব সুতরাং” দ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞান নহে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে জগতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহাই বিশ্বের কীটানুকীট হইতে পরমোন্নত পরমর্ষির মঙ্গলের জন্যই। এই মঙ্গল বিধানে কেহই বাদ পড়েন না। সাধকের আরও উন্নত অবস্থায় তিনি বুঝিতে পারিবেন যে দুঃখও তাঁহারই প্রেম হস্তের দান। তখন তিনি সত্যভাবে ব্রহ্মকে “শিবমদ্বৈতম্” বলিয়া জানিবেন। তখন আর তাঁহার নিকট কোন সমস্যাই থাকিবে না, তখন সাধারণের নিকট যাহা পরীক্ষা, তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ। তিনি তাঁহারই অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া থাকিয়া তখন দিবানিশি হৃদয়ের গভীরতম স্থল হইতে ধন্যবাদ দিবেন। অতএব দেখা গেল যে জগতে যত কিছু অন্ধকার, যত কিছু সমস্যা, উহারাও আমাদের পরীক্ষার জন্যই আসিয়াছে। কিছুই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে সাধন ভজন দ্বারা অন্ধকার নিরসন করিতে হইবে, সমস্যা সমূহের সত্য মীমাংসা লাভ করিতে হইবে। সন্দেহ, সংশয়কে ভয় করিলে চলিবে না। উহাদের

জন্যই আমরা সত্য তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব। স্থুল আমাদের অনন্ত প্রায় জীবন সাধনাময়। পরমপিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারই তত্ত্ব জানিতে হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে যে আমরা আবরণে আবৃত, আমরা অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। উহা সত্ত্বেও আমাদিগের তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভক্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তিনি যেন আমাদিগের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন। ইহাই তাঁহার প্রেমলীলা বা স্বগুণ পরীক্ষা। সর্ব্বোপরি বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবেই। উহা কখনও অপূর্ণ থাকিবে না বা থাকিতে পারে না। ইহা সহজ বোধ্য। তিনি যে নিত্যই আমাদিগকে অনন্ত প্রেমে অব্যর্থ সন্ধানে আকর্ষণ করিতেছেন এবং উন্নতিই যে আমাদের একমাত্র পরিণতি, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং যদি আমরা তাঁহার বিধান শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার দিকে অনুকূল পথে অগ্রসর হই, তবে আমাদের দুঃখের মাত্রা অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। আর যদি প্রতিকূল পথে আমাদের গতি নির্দ্ধারণ করি, তবে বাধা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। প্রতিকূল গতিতে যে বাধা বৃদ্ধি হয়, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য। কিন্তু শেষে আমরা পরমোন্নতি বা চরমোন্নতি লাভ করিবই। ইহাই অনন্ত প্রেমময়ের সুতরাং অনন্ত মঙ্গলময়ের অমোঘ মঙ্গল বিধান জানিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান অংশের প্রথম ভাগেই বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। Greatest good of the greatest number বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে। আমরা সেই মতের পক্ষপাতী নহি। আমরা বলি যে পরম প্রেমময়, পরম মঙ্গলময়ের রাজ্যে Greatest good for each and every member of the universe from the lowest to the highest. ব্রহ্মে যে অনন্ত কোমল-কঠোরাত্মক গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলে নিত্য পরিপূর্ণ। জগতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য দ্বারা যে ব্যক্তি বিশেষেই মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে,

কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই উচ্চতম হইতে নিম্নতম লোক এবং উন্নততম মহাত্মা হইতে নিম্নতম অবস্থায় অবস্থিত জীব—সকলেই সমান ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কারণ, জীব ও জগৎ তাঁহারই চির অন্তর্গত এবং তাঁহারই একমাত্র অখণ্ড, অমেয় শক্তিশালী প্রেম সূত্রে নিত্য সুকৌশলে গ্রথিত। অনন্ত বিপরীত গুণের মিলনে যখন নিত্য মঙ্গলের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, তখন তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য দ্বারাই যে সকলেরই মঙ্গল হইতেছে. ইহা সুনিশ্চিত। ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত প্রেমময় এবং নিত্যই অনন্ত সমতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কাহারও মঙ্গল করিতে যাইয়া অন্য কাহারও অমঙ্গল বিধান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি এক জনের জন্য শত সহস্রের অমঙ্গল করেন না। আবার লক্ষের জন্যও একজনের অমঙ্গল করেন না। তিনি আমাদের ন্যায় অজ্ঞান ও অক্ষম নহেন যে পৃথিবীতে যেমন বহুর মতে বর্ত্তমানে বহু কার্য্য পরিচালিত হয়, তেমনি বহুর স্বার্থ রক্ষার চিন্তা দ্বারাই পরিচালিত হইবেন এবং অল্পের মঙ্গল তিনি বিবেচনার মধ্যে গণ্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন না, ইহা হইতেই পারে না। তিনি নিত্য অনন্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং নিত্য অনন্ত শক্তিশালী। সুতরাং তিনি একই কালে সকলের জন্যই সমভাবে মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। অবশ্য সেই মঙ্গলকে আমাদের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে আমরা অমঙ্গল মনে করিতে পারি বটে. কিন্তু অনন্ত জ্ঞানময়ের নিকট তাহাও মঙ্গলেই পরিপূর্ণ। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে বহুর মত দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব সকল সময় ন্যায় সঙ্গত হয় না, এবং সময় সময় ন্যায় বিরুদ্ধই হয়। ইতিপূর্ব্বে ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত Sir James Jeans-এর উক্তিতে পাঠক দেখিয়াছেন যে আমাদের একটী অঙ্গুলি হেলনেও সমস্ত বিশ্ব কম্পিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত জগতের জড় পদার্থ সমূহ এমন সুকৌশলে ও সুদৃঢ়ভাবে এক সূত্রে গ্রথিত যে একটীতে আঘাত লাগিলেই সেই আঘাত বিশ্বময় বিস্তৃত হয়। পরমাত্মার গুণ ও শক্তি জড়ের গুণ ও শক্তি হইতে আরও কত অসংখ্য গুণে যে সূক্ষ্ম সুতরাং অধিকতর শক্তিশালী, তাহা কে নির্ণয়

করিবে? সুতরাং তাঁহার শক্তি যে এককালে একদেশে মাত্র কার্য্য করিবে, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহার কার্য্য মাত্রই সমস্ত বিশ্বের সকল জীব ও জড়ের উপর যথোপযুক্তরূপে কার্য্য করিবে এবং সেই কার্য্যের ফল সকলের পক্ষেই চিরমঙ্গলে পরিপূর্ণ। কোন জীবেরই উহা দ্বারা অমঙ্গল হয় না বা হইতেও পারে না। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" এবং "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশদ্বয়ে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব ও শিবত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিতে হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি কখনও একের মঙ্গল করিতে যাইয়া অন্যের অমঙ্গল বিধান করিতে পারেন না। পাঠক মনে রাখিবেন যে ব্রহ্মই একমাত্র শিব। অর্থাৎ অনন্ত একত্বের একত্ব তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তিনি নিত্য ও পূর্ণ শিব। সুতরাং তিনি কখনও অমঙ্গল করিতে পারেন না। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্থূল ভাবে বিচার করিতে গেলে উক্তমতের উপর নির্ভর করিয়া অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে উহাতে বহু ত্রুটী লক্ষিত হইবে। Nature works in a spirit of compensation বলিয়া আর একটী মত প্রচলিত আছে। দরিদ্রের গৃহে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার পরিমাণ অধিক, কিন্তু ধনীর গৃহে সকল সময় তদ্রূপ নহে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। আরও দেখা যায় যে বহু প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকগণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্রভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ধনীদিগের মধ্যে হইতে কেহই ধার্ম্মিক হন নাই, একথা আমরা বলি না। প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক দিকের মধ্যে অনেকেই যে দরিদ্র ছিলেন, একথা সত্য। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও দেখা যায়। সুতরাং আমরা যদি বলি যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে এক ভাবে দুঃখ প্রাপ্ত হন, তবে তিনি অন্যভাবে সুখ প্রাপ্ত হইবেন, তবে তাহা অযৌক্তিক উক্তি বলিয়া মনে করি না। "যত মুস্কিল, তত আছান" বাক্যটী পাঠক মনে রাখিবেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তিনি "দেন বিষ কণা' পরে বিষনাশী সুধাভার"। এই বিষয়টী ধারণা করিতে সম্যক জ্ঞানের

প্রয়োজন। সাধারণের পক্ষে সম্যক্ জ্ঞানের বিচারের শক্তি নাই। তাই তাহারা বহু সময়েই ভ্রান্ত হন। ইতিপূর্ব্বে পারলৌকিক বিধান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের দুঃখের অবস্থা অল্প সংখ্যক মণ্ডল পার হইলেই হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু অধিক হইতে অধিকতর সুখের জন্য অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান। এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" অংশে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে এই মতবাদ অর্থাৎ Nature works in a spirit of compensation সত্য। Compensation-এর অর্থ ক্ষতিপূরণ। এই জন্য আপত্তি হইতে পারে যে পরমপিতা কি আমাদের প্রথমে ক্ষতি সম্পাদন করিয়া পরে উহার পূরণ করেন, যেমন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ অপকারী ব্যক্তির পূরণ করিবার বিধান আছে। ইহার উত্তরে আমাদের বলিতে হয় যে পরমপিতা কোন অবস্থায়ই আমাদের ক্ষতির বিধান করেন না। আমাদের কর্ম্মদোষে আমাদের নিজেদের যে ক্ষতি আমরা সম্পাদন করি, তাহাই তিনি নানা ভাবে মঙ্গলে পরিণত করিয়া দেন। ইহাই অনন্ত মঙ্গলময়ের অমোঘ বিধান। পরম পিতার প্রেমময় সুতরাং মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা কখনই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি না। যে সকল শাস্তি আমরা ভোগ করি, তাহা যে পরিণামে মঙ্গলই উৎপাদন করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই যে নিজকৃত ক্ষতি এবং তজ্জন্য শাস্তিকেই আমরা ক্ষতি বলিয়া মনে করি এবং পরিণামে মঙ্গল সংঘটনকেই ক্ষতি পূরণ বলিতে হইবে। এ স্থলে অবশ্যই বক্তব্য যে শাস্তির আরম্ভ হইতেই মঙ্গল উৎপত্তি হইতে থাকে। পরমপিতার দত্ত শাস্তিও সর্ব্বদাই মঙ্গল প্রসূ। তবে সেই মঙ্গল যখন পরিপক্কাবস্থায় উপনীত হয়, তখনই উহাকে আমরা মঙ্গল বলিয়া থাকি। আমরা জানি যে কিছুই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না মানব দেহের নখ রোমের উৎপত্তির সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু কেবল বর্দ্ধিত অবস্থায়ই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। সেইরূপ আমরা আমাদিগের নিজেদের যত্নই

ক্ষতি করিনা কেন, অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতা তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মঙ্গলেই পরিনমন করিতেছেন। কিন্তু আমরা পরিপক্ক অবস্থায় মাত্র উহাকে মঙ্গল বলিয়া বুঝিতে পারি, যদি আমাদের তখন মঙ্গল ধারণা করিবার যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকে। জীবের জীবন গুণরাশির উন্নতি বা বিকাশ সাধন মাত্র। কোন কোন গুণ সাধনে প্রথমে দুঃখ এবং পরে সুখ। এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে সুখ এবং দুঃখ প্রত্যেক জীবনে আগমন করে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নানা গুণরাশির উন্নতি বা বিকাশের জন্য নানা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারও জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখময় নহে। সুখ, দুঃখ প্রত্যেক জীবনেই বর্ত্তমান। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে Nature works in a spirit of compensation. অবশেষে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে এই তত্ত্বটী আমাদের প্রত্যেকের গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা উহার মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারিব, নতুবা হালকা ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িব। যথা—যদি কেহ মনে করেন যে তাহার বড় রকম অনিষ্ট সংঘটিত হওয়ার পরেই কেন সেই পরিমান মঙ্গল উৎপন্ন হইল না, তবে তাহাকে বলিতে হইবে যে ক্রমই সর্ব্বকার্য্যের মূলে বর্ত্তমান সুতরাং মঙ্গলের পরিপক্কাবস্থা অর্থাৎ যাহাকে আমরা সাধারণতঃ মঙ্গল বলিয়া থাকি, তাহা কাল সাপেক্ষ। ইহার পশ্চাতে যে আরও কত কারণ আছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক দেখা যায়। একদল বলেন যে পৃথিবী দুঃখে পরিপুর্ণ। তাহাদের মতে যে মানুষের আনন্দ দেখা যায়, মানুষের মুখে যে হাসি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল ক্ষণস্থায়ী নহে, কিন্তু অন্তঃসার শূন্য—তাহা প্রকৃত আনন্দই নহে, অন্তর বস্তুতঃ দুঃখে পরিপূর্ণ। আর এক দল বলেন যে পৃথিবীতে দুঃখ নাই, সুখই বর্ত্তমান। যে সামান্য দুঃখ দেখা যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তাঁহারা বলেন যে আমরা জীবনের কতটুকু সময় দুঃখ বোধ করি, আমরা কতটুকু সময় বিষন্ন মুখে থাকি? তাহারা বলেন যে পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা সতী কতদিন দুঃখ ভোগ

করেন ? কালই তাহার দুঃখ হরণ করিয়া দেয়। তিনি আবার পুত্র কন্যা সহ আনন্দে সংসারে সংসারী হন। পুত্রশোকে শোকাতুরা স্নেহময়ী জননী কতদিন শোকার্ত্তা থাকেন ? তিনিও অল্পদিন মধ্যে শোকভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ সহ সংসারে আনন্দে বিচরণ করেন। সত্য বটে, কখনও কখনও পুত্র শোকাতুরা স্নেহময়ী মাতা এবং পতি বিরহিনী প্রেমময়ী সতী শোকের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং গণিত শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী উহাকে negligible quantity (তুচ্ছ বা নগন্য সংখ্যা) বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। আমরা কিন্তু ইহার কোন মতেরই পক্ষপাতী নহি। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে উক্ত উভয় মতই ভ্রান্তিপূর্ণ। পৃথিবীতে দিবা ও রাত্রি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, যে পরিমাণে আলোক, সেই পরিমাণে অন্ধকার, যে পরিমাণে সুখ, সেই পরিমাণে দুঃখ, যে পরিমাণে দয়া, সেই পরিমাণে নিষ্ঠুরতা। জড় ও আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ আরও বহু বিপরীত অবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং জগতে দুঃখই আছে. অপ্রেমই আছে, কিন্তু সুখ নাই, প্রেম নাই, ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। আমরা দেখিতে পাই যে সর্ব্বদাই বিপরীত কার্য্য হইতেছে, অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে পরম পিতাতেই কোমল ও কঠোর গুণরাশির অপূর্ব্ব মিলন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কার্য্য মাত্রই মঙ্গল প্রসূ। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে সুখের শক্তি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। তাই জগতে সুখের প্রভাবই দৃষ্ট হয় এবং দুঃখ পরাভূত অবস্থায় অধিক সময় বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য দ্বিতীয় দলের উক্তি অনেকটা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কঠিন সমস্যা সমূহের সুমীমাংসার জন্য আপ্ত বাক্যও একটী বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যে আপ্ত বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব প্রমাণিত হয় কিনা। মাণ্ডুক্যোপ-

নিবন্ধে তুরীয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তাঁহাকে শিব বলা হইয়াছে। মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর যে ব্রহ্মকে শিব ভাবে জানিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দ্বারা কথিত উপনিষদ্ পাঠেই অবগত হওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্র (পুরাণ) সংহার কার্য্যের অধিপতি দেবতাকে শিব বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে কার্য্যটীকে আমরা অত্যন্ত অমঙ্গল জনক মনে করি, সেই মৃত্যুর অধিপতি দেবতাকেই শিব বলা হইয়াছে। "স্রষ্টার বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে God শব্দের অর্থই মঙ্গলময় বা শিব। আদি শব্দ Good এবং প্রচলিত শব্দ God. মহাদার্শনিক Plato সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া দার্শনিক Whitehead লিখিয়াছেন যে সমস্ত ইউরোপীয় দর্শন তাহার (Plato-এর) মতের পাদটীকা মাত্র। সেই মহামনা Plato "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের একজন বিশিষ্ট উপাসক ছিলেন। পরমর্ষি গুরুনাথের এই সম্বন্ধীয় উক্তি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য একটী উক্তিও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :— "শ্মশানে, ভবনে শিব, বসিয়া নাশে অশিব।" "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে সত্যধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বিষয় পাঠক পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে তিনি উহাতে ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত ভাবে আমাদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি যে কত স্থলে কতভাবে লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ সমূহ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন ধর্ম্ম সঙ্গীত হইতে উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্ম নিত্য পরম শিব। সকল পবিত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রই একবাক্যে ব্রহ্মকে মঙ্গলময় বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা আপ্তবাক্য অনুসরণ করিলেও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম অনন্ত এবং নিত্য মঙ্গলময়। কেবল আপ্ত বাক্যই বা বলি কেন? এরূপ সাধক অত্যন্ত বিরল নহেন, যাঁহারা হাসি মুখে দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা, অপমান সহ্য করিয়া মঙ্গলময়ের জয় সঙ্গীত সরল ও সত্য ভাবে গাহিতেছেন। এরূপ সাধকও বিরল নহেন, যাঁহারা শোক দুঃখের মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পান; তাঁহারা কখনই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ত্বে—প্রেমময়ের প্রেমময়ত্বে সন্দেহের লেশমাত্রও

পোষণ করেন না, যদিও তাঁহারা বিপদের তীব্র মুহূর্ত্তে অতি বাঞ্ছনীয়া আনন্দাবস্থা হৃদয়ে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। অতএব শব্দ প্রমাণ বা আপ্ত বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম নিত্য অনন্ত মঙ্গলময় এবং তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। "মায়াবাদ" জীবাত্মার কোন প্রকারের দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেই মতে জগৎই মিথ্যা মায়া মাত্র, উহাদের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নাই। জীবাত্মার দুঃখ আছে, ইহা "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদের বিস্তারিত আলোচনা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। উক্ত প্রবন্ধের "চিদাভাস" অংশে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে জীবের কার্য্যসমূহের মধ্যে কোন অংশ জীবাত্মার কার্য্য ও কোন অংশ অন্তঃকরণের কার্য্য। মায়াবাদ দ্বারা প্রচারিত চিদাভাস দ্বারা প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণই যে জীবের সকল কার্য্য সম্পাদন করে না, ইহা সেই স্থলে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় মাত্র বলিয়াছেন। যিনি গুণহীন এবং যাঁহার কোন কার্য্যই নাই, তাঁহাকে কি প্রকারে শিব বলা যাইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ যে ব্রহ্মকে শিব বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই উভয় উপনিষদ্ই মায়াবাদের প্রামাণ্য উপনিষদ্। মাণ্ডুক্যোপনিষদ ত মায়াবাদে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন:—"তুমি হে শিব মঙ্গল কারক হে, তুমি প্রেম সরোজ প্রভাকর হে।" ব্রহ্ম কেবল সত্যস্বরূপ নহেন, তিনি শিবও, সুতরাং মঙ্গলকারক ব্রহ্মও বটেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণে গুণবান ও অনন্ত গুণাতীত এবং তাঁহাতে অনন্ত বলবতী ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, সুতরাং তিনি অনন্ত মঙ্গলে নিত্য পরিপূর্ণ। তিনিই একমাত্র নিত্য ও পূর্ণ শিব। তাই তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি হইয়াছে এবং প্রলয়ও সেই একই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। তাই জগতে কখনও অমঙ্গল

সম্পাদিত হইতে পারে না। সৃষ্টির সূচনার মুহূর্ত্ত হইতে মহাপ্রলয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনই মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের ছায়াপাতও হয় নাই বা হইবেও না বা হইতেও পারে না। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে নিবেদিত হইয়াছে। আমরা এত সময় যুক্তি যোজনা দ্বারা পরমমঙ্গলময় পরমপিতার মঙ্গলময়ত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন পাঠককে তাহার সহজ জ্ঞানের রাজ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে এই অনন্ত প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের কীটানুকীট হইতে উন্নততম মহাত্মা পর্য্যন্ত সকল জীবের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষা কর্ত্তা যখন অনন্ত প্রেমে নিত্য পরিপূর্ণ, যখন সেই অনন্ত প্রেমের শক্তিও অনন্ত ও অপরাজেয়, যখন সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ত্রিবিধ কার্য্যই প্রধান ভাবে প্রেম দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে বা হইবে, অর্থাৎ যখন সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপারটী প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র, তখন তাঁহার রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কোনওরূপ সম্ভাবনা নাই বা থাকিতেও পারে না। প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রেমলীলা সম্পাদন করিতে যাইয়া, তাঁহারই আত্মতুল্য সন্তানগণের অমঙ্গল বিধান করিতেছেন, ইহা কেহই কল্পনা করিতেও পারেন না।* তবে যে আমরা দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান, অত্যাচার, বাধা, বিঘ্ন দ্বারা সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত হইতেছি, তাহার অবশ্যই এমন একটী বিশেষ কারণ বর্ত্তমান, যাহাতে কোনওরূপ দোষ ত্রুটী থাকিতে পারে না। কারণ, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত পবিত্রতাতে নিত্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর নিত্যই দোষপাশলেশ শূন্য। সেই কারণটীই আমাদের অনন্ত গুণ ও শক্তিরাশির ক্রম বিকাশ অথবা প্রত্যেক জীবের জীবনে সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা ফলবতী করা অথবা প্রত্যেক জীবকে অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বে পরিণমন করা। আমরা উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে জগতে আসি নাই এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বহু বাধার একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং

* এই সৃষ্টি যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" ও "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অবশ্যম্ভাবী। আবার আমরা অকুল সাগরে কর্ণধার বিহীন, বাত্যা-বিতাড়িতা, অর্দ্ধ নিমজ্জিতা, শতছিদ্রা, ক্ষুদ্রা তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আসি নাই। অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে অবশ্যই আমাদের বাধা বিঘ্ন ক্রমশঃ অপসারিত হইবেই। এমন দিন প্রতি জীবনে আসিবেই যে দিন জীব সত্য ভাবে বলিতে পারিবে :—"যাহারি নাও, তাঁরই নদী, যে ফেল্‌বে তোরে বাণের মুখে, সেই ত তরীর কর্ণধার (অতুল প্রসাদ)।" এমন দিন প্রত্যেক জীবনে অবশ্যই আসিবে, যে দিন জীব সর্ব্বান্ধকার হইতে মুক্ত হইবেন, ঝড় ঝঞ্ঝা আর তাহার জীবনে থাকিবে না, অনন্ত প্রেমে, অনন্ত জ্ঞানে প্রত্যেক জীব অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার নিত্য প্রেম ক্রোড়ে নিত্য স্থান লাভ করিবেন. তাঁহারই অনন্ত গুণে গুণী হইতে থাকিবেন, নিত্য পরম শিবের সন্নিধানে নিত্য বাসে শিবত্ব লাভ করিয়া বিশ্বে যে মঙ্গল ভিন্ন বিন্দু মাত্রও অমঙ্গল নাই, ইহা সত্য জ্ঞানে সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে পারিয়া (Realise করিয়া) ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন, এমন দিন প্রত্যেক জীবনে আসিবে, যে দিন জীব অতল প্রেম জলধিতে নিত্য নিমগ্ন থাকিয়া হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত মঙ্গলময়কে নিত্য ধন্যবাদ দিবেন এবং পরিশেষে সেই অতুলনীয় মঙ্গল চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। আরও একটী বিষয় চিন্তা করিলেও সহজ জ্ঞানেই আমরা বুঝিতে পারিব যে পরম পিতার সকল বিধানই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহা এই যে ব্রহ্ম কেবল অনন্ত প্রেমময় নহেন. অনন্ত জ্ঞানও তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মের প্রেম ও জ্ঞান সু তরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ের জ্ঞান ও প্রেম পূর্ণ কার্য্যে কোনও রূপ ক্রটী থাকিতে পারে না। যাহা কিছু দোষ ক্রটী বলিয়া আমরা অনুমান করি, আমাদের বুঝিতে হইবে যে তাহা আমাদের অজ্ঞান ও সুখপ্রিয়তার ফল মাত্র। পূর্ণ জ্ঞানে যে দোষ-লেশাশঙ্কা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রকৃতির অসংখ্য

বিধানের অল্প কয়েকটি মাত্রের তত্ত্ব আবিষ্কার করতঃ জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (observation and experiment) দ্বারাই এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আলোচ্য সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিতেও সেই একই প্রণালী অবলম্বন করিলেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণ অবশ্যই তাঁহার মঙ্গল বিধান সমূহ যে জানিতে পারিবেন, তাহা সুনিশ্চিত। "তিনি যে মঙ্গলময়, চাহ কি তার পরিচয়? পরিচয় বিশ্বময়, হের একবার। (পরমর্ষি গুরুনাথ)।" অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা প্রকৃতিকে কেবল দোষ ত্রুটি শূন্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রকৃতিতে নিজ পরিচয়ও অভ্রান্ত লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যিনিই তাহা পাঠ করিতে পারিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত প্রেমে, অনন্ত মঙ্গলে, অনন্ত গুণে নিত্য পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে সন্দেহের স্থান কোথায়? এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জগতে যে সকল অন্যায় অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে, তাহা কি প্রকারে ব্রহ্মের অনন্ত স্বাধীন, অনন্ত সুপবিত্রা, অনন্ত জ্ঞানপূর্ণা ও অনন্ত প্রেমময়ী নিত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধ নহে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে প্রথমেই আমাদিগের স্মরণ করিতে হইবে যে বিশ্বলীলা ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা। তাই তিনি তাঁহার একটি স্বরূপের (অব্যক্ত স্বরূপের) অবলম্বনে স্বীয় সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জড় জগৎ ও তদুৎপন্ন দেহ দ্বারা আমাদের বাধা * সৃষ্ট হইয়াছে। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির

---

* আমরা ষড়্‌রিপু, অষ্টপাশ ও অন্যান্য জাত গুণকে দোষ বলি। নৈসর্গিক দুর্ঘটনাকেও সৃষ্টির দোষ বা ত্রুটী বলা হয়। ইংরেজীতে এই সকলকেই এক কথায় Evil বলা হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে এই সকলেরই দুইটী দিক আছে। উহাদের এক দিক শুভ্র ও অপর দিক তমসাচ্ছন্ন। সুতরাং উহাদিগকে Evil আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইবে না। উহাদিগকে বাধা (Obstacle) বলিলেই সঙ্গত হয়। উহারা বাধা রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে, বাধা প্রদানই উহাদের কার্য্য। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

সূচনা" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশদ্বয়ে লিখিত বিবরণ আমাদিগের স্মরণ করিতে হইবে। জড়োৎপন্ন বাধাই আমাদিগের দোষ পাশ এবং পাপ জননের কারণ। জড়জগৎ যে চির বিকৃত এবং জড় সংসর্গে যাহা কিছু আসে, তাহাই যে অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃত, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং জগতে যে দোষ পাশ এবং তদুৎপন্ন পাপরাশি দেখিতেছি, তাহা জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই সম্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে। জড় সঙ্গে জাত দোষপাশ রাশি বা জাতগুণ রাশি উৎপন্ন না হইলে আমাদের পরীক্ষা অসম্ভব হইত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উহারা তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থে জগতে আসিয়াছে। একটি কথা আমাদের স্মরণে রাখিতে পারিলেই এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা লাভ করা যায়। তাহা এই যে ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি হইতে বলবত্তরা শক্তি বিশ্বে কাহারও থাকা দূরের কথা, উঁহার তুল্য শক্তিও জগতে কাহার বা কিছুরই নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ইচ্ছাই কার্য্যকরী হইতে পারে না। আবার যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটি শুষ্ক পত্রও বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে পারে না, তাঁহারই জগতে তাঁহারই সেই সুমহতী ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি প্রকারে এত বড় দুর্ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইতে পারে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে জগতে সকল কার্য্যই তাঁহারই ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জাতগুণরাশি আমাদের পরীক্ষার্থ বাধারূপে সৃষ্ট হইয়াছে। সেই জাত গুণ রাশি হইতেই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারে সকল প্রকার সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মই তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা জড় জগৎ এমন সুকৌশলে গঠন করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উপযোগী হইয়াছে অর্থাৎ জড় জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী। তিনি যেমন সত্ত্বের বর্দ্ধক, তেমনি তিনি তামসদায়ক। তিনিই নিত্য জীবন দাতা, আবার তিনিই দেহের সাময়িক মৃত্যু আনয়ন করেন। তিনিই বিঘ্ন দাতা, আবার তিনিই সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন। তাই কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—"জনমে মরণে

শোকে আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে।" "বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি— বল ভাই ধন্য হরি। ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য পাটে, ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি। সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি, ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি। আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে, ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি ধন্য হরি!" আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা এবং সেই জন্যই জড় জগৎ বাধারূপে সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই রূপে ভাবের জগতে পাপ অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্তমান থাকিবেই। একমাত্র পুণ্যময় জগতে পরীক্ষার স্থান কোথায়? আমরা আরও দেখিয়াছি যে জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহাই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় মঙ্গলেই পরিণত হইতেছে। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে জগতে অমঙ্গল দেখিলেও সম্যক্ জ্ঞানের বিচারে ব্রহ্মের ইচ্ছার প্রতি বিন্দু মাত্রও দোষারোপ করা যায় না। আর যখন তিনি সকলই মঙ্গলে পরিণমন করিতেছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য কখনই দোষযুক্ত হইতে পারে না। All's well that ends well মহাবাক্যটি পাঠক স্মরণে রাখিবেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জগতে যখন উভয়বিধ কার্য্যেরই সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তখন জীব কেন পাপ পূণ্যের জন্য দায়ী হইবে? ইহার উত্তর বুঝিতে ইতিপূর্ব্বে লিখিত বিষয় আমদের স্মরণ করিতে হইবে। পরমপিতা যেমন দুইটি পন্থার বিধান করিয়াছেন, তেমনি তিনি জীবদিগকে স্বাধীন ইচ্ছাও দিয়াছেন। জীব সেই স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা যদি সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হন, তবে তিনি ক্রমশঃ সুখময় রাজ্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। আর যদি তিনি স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার অবলম্বনে অসৎ পথে অগ্রসর হন, তবে তাহার দুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে তাঁহার জীবনে অবশ্যই শুভদিন উপস্থিত হইবে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জড় পদার্থের সদ্ ব্যবহার ও অপব্যবহারেই পুণ্য ও পাপ অর্জ্জিত

হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে দোষপাশ রাশির অর্থাৎ জাতগুণ রাশির সদ্ব্যবহারে আমরা উত্তম ফলই প্রাপ্ত হই। ইতিপূর্ব্বে যাহা নানা স্থলে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে পাপ পুণ্যের জন্য মানবই দায়ী। আমরা যতকিছু দোষ লক্ষ্য করিতেছি, যতকিছু তজ্জাতীয় অন্যায় কার্য্য সমূহ সংঘটিত হইতেছে, উহারা সকলেই চিরবিকৃত জড় জগতের সহিত আত্মার সম্পর্কে উৎপন্ন হয়। আবার জড় জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ বাধা রূপে সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বলেন যে এইরূপ ভীষণ বাধা কেন সৃষ্ট হইল, তবে বলিতে হয় যে উহার উত্তর পুর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠকের ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরমপিতা বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উহা কখনও অমঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, তাহার কার্য্য মাত্রই মঙ্গলে পরিপুর্ণ। কি প্রকারে যে মঙ্গল উৎপন্ন হয়, তাহা পুনরায় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ব্রহ্মে অনন্ত একত্বের একত্ব নিত্য সম্পাদিত। অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ নিত্য মিলিত হইয়া আছে। জগৎ গঠনে ও পরিচালনায় যেমন প্রেম আছে, তেমনি জ্ঞান আছে, যেমন করুণা আছে, তেমনি ন্যায় আছে ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই সেই অনন্ত গুণের অনন্ত শক্তির একীভূত শক্তির ফল মাত্র। সুতরাং সেই একীভূত শক্তির ফল অবশ্যই মঙ্গলপ্রসূ হইবে। তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, সুতরাং তিনি নিত্য অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আবার কেহ কেহ পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের জন্য অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনিই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাহারই অল্পাধিক দুঃখ ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে, ইহা দেখিয়া ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্বে সন্দেহ পোষণ করেন তাহাদের নিকটে পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা ইতিপূর্ব্বে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের একত্ব হইয়াছে। সুতরাং সেই সুখ-দুঃখময় পরম বিধাতার কার্য্যরূপ বিশ্বে যে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই স্থান প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। জিজ্ঞাসু বলিতে পারেন যে উক্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে একমাত্র

প্রেমজনিত দুঃখই বর্ত্তমান। কিন্তু জগতে আমরা বহু প্রকার দুঃখ লক্ষ্য করি। ইহার উত্তরে আমাদের বলিতে হইবে যে জড় জগৎ চিরবিকৃত এবং উহার সংসর্গে যাহা আসিবে, তাহাই বিকৃত হইবে। জীবাত্মার প্রেমজনিত দুঃখ পরমাত্মার সরল গুণই বটে, কিন্তু অন্যান্য দুঃখ জড় সংসর্গে জাত। স্থূল জগতে যাহাই দেখিতেছি, তাহাই বিকৃত। সুতরাং পরমপিতার প্রেমজনিত দুঃখ জগতে হুবহু দেখিতে পাইব না। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অপূর্ণের দুঃখ অনিবার্য্য। এস্থলে ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই আমরা সকল মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব যে ঐরূপ নানাবিধ দুঃখ সৃষ্ট না হইলে পরীক্ষা অসম্ভব হইত। এই সম্পর্কে "ইচ্ছা শক্তি" অংশে লিখিত বিষয় স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে জগৎ তাঁহার গুণরাশির আভাস সমূহ দ্বারা গঠিত। এই জন্যই জগৎ সুখ-দুঃখময়। অতএব, আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মে সুখ ও দুঃখ আছে বলিয়াই তাঁহারই জগতে উহারা আসিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম এইরূপ ভাবের দুঃখ জীবের জন্য সৃষ্টি করিলেন কেন। ইহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি। পাঠক জানেন যে সুখ এবং দুঃখ বিপরীত গুণ এবং উভয়ই ভাব পদার্থ। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" এবং অন্যান্য স্থলে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সুখকে পরমর্ষি গুরুনাথ তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—মলিন সুখ, ঈষৎ মলযুক্ত সুখ এবং সম্পূর্ণ মলশূন্য সুখ। 'যাহা আপাততঃ সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরিশেষে অত্যল্প সুখ এবং অত্যন্ত দুঃখ ও গ্লানি বলিয়া জানা যায়, তাহাকে মলিন সুখ কহে।" "জড় জগতের সমস্ত বস্তু, সমস্ত পার্থিব ক্রিয়া সুখ দুঃখ মিশ্রিত, উহাদের একটী লাভ করিতে যাও, অন্যটী অবশ্যই উপস্থিত হইবে। এই নিমিত্ত বিহিত-কার্য্য সাধনেও কিঞ্চিৎ দুঃখানুভব হয়। তজ্জন্যই ঐরূপ কার্য্য জনিত সুখকে 'ঈষৎ মল যুক্ত সুখ' বলা হইয়াছে।" "যে সুখে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, যাহা অত্যুন্নত মহাত্মাগণ ব্যতীত অন্যের অপ্রাপ্য, তাহাকে সম্পূর্ণ মলশূন্য সুখ বা শান্তি বা ব্রহ্মানন্দ কহে।"

"সুখের যে তিন প্রকার ভাগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শান্তি ব্যতীত অপর দুই প্রকার সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত ভাবেই থাকে। শান্তি বা ব্রহ্মানন্দ অমিশ্র, উহাতে কোন প্রকার দুঃখ মিশ্রিত থাকে না।"
"যখন দুঃখ বোধ না হইলে সুখ বোধ হয় না, ক্ষুধাজনিত ক্লেশানুভব না হইলে আহার-জনিত তৃপ্তি-সুখ অনুভূত হয় না, পিপাসার যন্ত্রণা বোধ না হইলে পানজনিত আনন্দানুভব হইতে পারে না, অর্থাভাব না হইলে অথবা দুরাকাঙ্ক্ষার ক্লেশ না থাকিলে অর্থ প্রাপ্তিতে সুখ প্রাপ্তি সম্ভাবিত নহে, জ্ঞানাভাব প্রতীতি না হইলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সুখ-বোধ হওয়া অসম্ভব. বিচ্ছেদ যাতনা উপস্থিত না হইলে মিলনে সুখ বোধ হইতে পারে না, অন্ধকারে ক্লেশানুভব না হইলে আলোকে আমোদ প্রাপ্তি সুদুর্ঘট, তখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে দুঃখ না হইলে সুখ হয় না। ফলতঃ বস্তুর পৃষ্ঠদ্বয়ের ন্যায়, দিবা ও রাত্রির ন্যায় এবং সুষুপ্তি ও জাগরণের ন্যায় প্রথম দুই প্রকার সুখ ও দুঃখ চিরকাল পরস্পর সাপেক্ষ। একের লাভ করিতে গেলেই অন্যটী অবশ্যই উপস্থিত হইবে। এই জন্যই মহাত্মারা উক্ত দ্বিবিধ সুখ ও দুঃখকে এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং সংসারে দুঃখ না থাকিলে উক্ত দ্বিবিধ সুখও থাকিতে পারে না। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার সুখ কখনও চৈতন্যাংশে একক ভাবে থাকে না,* দুঃখের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট তৃতীয় প্রকার সুখ দুঃখ-স্পর্শ-শূন্য। উহা মুক্ত বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মহাত্মাগণ ব্যতীত অন্যের অপ্রাপ্য (ক)"
অতএব দেখা গেল যে অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতা পরীক্ষার জন্য দুঃখের সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। সেই দুঃখ অন্তে সুখের বিধানও করিয়াছেন। মানব কেবল সুখ সুখ বলিয়া চীৎকার করে বটে. কিন্তু একথা ভুলিয়া যায় যে প্রথম দুই প্রকারের সুখলাভ করিতে

* ব্রহ্মই ক্ষুদ্র জীবভাবে ভাসমান। এই জন্যই জীবকে চৈতন্যাংশ বলা হইয়াছে। কারণ, দেহবন্ধতার জন্য ব্রহ্মের অনন্ত গুণই বাস্তবে অংশ ভাবে পরিণত হইয়াছে।

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

গেলেই দুঃখ লাভও অনিবার্য্য। যদি বলেন যে জীব সমূহের প্রথম জন্মাবধি একমাত্র ব্রহ্মানন্দ রূপ পরম সুখ থাকিলেই ত হইত, তবে বলিতে হয় যে তৃতীয় প্রকার সুখের কথা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মে অনন্ত পরিমাণে নিত্য বর্ত্তমান। যদি প্রত্যেক জীবকে সেইরূপ অনন্ত পরিমাণ সুখই প্রথমাবধি প্রদত্ত হইত; তবে সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। সকল জীবই যদি প্রথম জন্মাবধি পূর্ণব্রহ্ম হইত, তবে অসংখ্য ব্রহ্ম জগতে থাকিত, ইহা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা। আবার দুঃখের বিধান করিয়াই যখন তিনি সুখ দানে বিরত হন নাই, অথবা রাত্রির পরে দিবার ন্যায়, ভীষণ ঝড়ের পর প্রকৃতির শান্ত নির্ম্মল ভাব ধারণের ন্যায়, তাঁহার অপূর্ব্ব মঙ্গল বিধানে দুঃখের পর অবশ্যম্ভাবিরূপে সুখ যখন আসিবেই, তখন যে পরমপিতা মঙ্গলময়, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? পাঠক ইতিপূর্ব্বে লিখিত বিষয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে দুঃখ দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্ট হয় না, মঙ্গলই উৎপন্ন হয়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে উক্ত দুই প্রকার সমল সুখ অর্থাৎ দুঃখ জনিত সুখ ভিন্নও তৃতীয় প্রকার সুখ আছে এবং তাহাকেই ব্রহ্মানন্দ বা শান্তি বলা হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে উহা একমাত্র মুক্ত বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত সাধকেরই প্রাপ্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জীব কারণ-লোকে গমন করিতে পারিলে অথবা পৃথিবীতে থাকিতেই কারণ-দেহলাভের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রাপ্ত হইলে পরব্রহ্মের কৃপায় তাঁহার একটী গুণে ব্রহ্মদর্শন হয়। ইহাকেই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি, মুক্তি বা একত্ব প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ভুবঃ লোক হইতেই কারণ-লোক আরম্ভ, অর্থাৎ ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যম্ —এই ষড় লোক কারণ-লোক। ভূলোক মাত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারীর জন্য সৃষ্ট। উহাতে মাত্র পরার্দ্ধ মণ্ডল বর্ত্তমান; কিন্তু প্রোক্ত ষড় লোকে অসংখ্য মণ্ডল। সুতরাং জীবাত্মা উক্ত ষড় লোকে অনন্ত প্রায় কাল বাস করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। সুতরাং আমাদের সুখই যে

অনন্ত, ইহাই প্রমাণিত হইল। যে দুঃখের ধারণা বহন করিয়া মানব সাধারণ ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্বে দোষারোপ করেন, তাহা কালের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী বলিলেই হয়। অবশ্যই বলিতে হইবে যে সাধারণে যে সুখের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত এবং যাহা না পাইয়া তাহারা হাহাকার করিতেছে, যাহা লাভের জন্য তাহারা না করিতেছে, এমন কার্য্যই নাই, সেই সুখও উক্তরূপ দুঃখের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। যাহারা পৃথিবীতে কেবল সুখই চাহেন, কিন্তু দুঃখ মাত্রও চাহেন না, তাহারা ভুলিয়া যান যে উহারা পরস্পর সাপেক্ষ। একটীর দ্বার রোধ কর, অপরটীও আসিবে না। সুতরাং সেই প্রকার আপত্তিকারীর প্রার্থিত বিশ্বে দুঃখ থাকিবে না, সুতরাং প্রথম দুই প্রকার সুখও থাকিবে না। সুতরাং গুণ পরীক্ষা অসম্ভব হইবে, সুতরাং সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না। আবার একমাত্র সুনির্ম্মল সুখ বা ব্রহ্মানন্দ যদি জীবের প্রথম জন্মাবধিই থাকিত, তবুও যে সৃষ্টি একান্ত ভাবে অপ্রয়োজনীয় হইত, তাহাও ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব আমরা সুখ দুঃখের আলোচনা দ্বারাও ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে পরমপিতা তাঁহার অনন্ত শক্তিশালিনী জ্ঞান-প্রেমময়ী সুতরাং মঙ্গলময়ী ইচ্ছা দ্বারা বিশ্বের জন্য যে বিধান করিয়াছেন, তাহা চিরকাল মঙ্গলে পরিপূর্ণ। মঙ্গলময় বিধাতা যদি জগতের জন্য অন্যরূপ বিধান করিতেন, তবে যে কেবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যই সাধিত হইত না, তাহা নহে, কিন্তু সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও থাকিত না এবং যদিই বা সৃষ্টি হইত, তবে উহাতে অমঙ্গল বই মঙ্গল উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ তিনি যাহা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই ভীষণ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইত, তাঁহার সৃষ্টি এতই দোষ ক্রটী শূন্য।* সর্ব্বশেষে আমরা ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব সমর্থনার্থ অন্য একটী বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এই বিষয় সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও বহু স্থলে লিখিত হইয়াছে,

* সুখ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থে বর্ত্তমান। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা পাঠ করিলে বহু তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

তথাপিও এই বিষয়টীর গুরুত্ব জানিয়া একস্থলে ইহার আলোচনা সঙ্গত মনে করি। ইহা তাঁহার পরলোক সম্বন্ধীয় বিধান। সুতরাং যাহারা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন, যাহারা পৃথিবীকেই আমাদের আদি ও অন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যাহারা কেবল পার্থিব অতি সাধারণ যুক্তি দ্বারাই দর্শনের সকল মীমাংসা লাভ করিতে প্রয়াসী, সুতরাং যাহাদের বিচারের সামগ্রী (materials) অবশ্যম্ভাবীরূপে সীমাবদ্ধ এবং সিদ্ধান্তও ঐকদেশিক, তাহাদের পক্ষে এই অংশ বিশেষ সন্তোষ-জনক হইবে না বটে, কিন্তু এই গ্রন্থ ত সর্ব্বপ্রকার নর নারীর জন্যই প্রচারিত। সুতরাং এই সম্বন্ধেও আমরা যাহা বুঝিয়াছি তদবলম্বনে পরলোকতত্ত্ব দ্বারাও ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পরলোকের অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে বিশেষতঃ "পরলোক তত্ত্ব" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে পরলোক ও জন্মান্তর এই দুইটী তত্ত্ব বাদ দিলে ব্রহ্মের মঙ্গল-ময়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, পরলোক ও জন্মান্তর বাদ দিলে আমাদের জীবন অত্যন্ত অপূর্ণ থাকে। আর পৃথিবীই ত বিশ্ব নহে। বিশ্বে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান এবং উহারাই আমাদের পক্ষে পরলোক। এই আলোচনার প্রথমেই "পরলোক তত্ত্ব," "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশত্রয়ে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। উহাদিগেতে ইহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরলোক আছে এবং উহা এত বিস্তৃত যে উহার তুলনায় পৃথিবী পরমাণুবৎ প্রতীয়মান হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে নরক ভাবে আখ্যাত মণ্ডলের সংখ্যা অল্প। তৎপর কয়েকটী মণ্ডল না স্বর্গ না নরক। তৎপরেই স্বর্গ নামে আখ্যাত মণ্ডল আরম্ভ। ৩৯৯ শ্রেণী পার হইলেই স্থূল দেহ সুলভ বিশেষ দোষ প্রশমিত হয়। তৎপর সূক্ষ্ম দেহ। পরার্দ্ধ মণ্ডল পার হইলেই দোষ পাশ-রাশির রজস্তমোহংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এস্থলে আমাদের ধারণীয় কোন পাপই থাকে না। পারলৌকিক আত্মা এই অবস্থায় নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হন। এই অবস্থাই ভবসিন্ধু পারের অবস্থা বা পরিত্রাণের

অবস্থা। ইহাব পর যে ষড় লোক তাহাতে সত্ত্বের রাজত্ব সুতরাং সেই সকল মণ্ডল পারলৌকিক আত্মার পক্ষে সুখময় স্থান। এই ভুবঃ মণ্ডল হইতে জীবের ব্রহ্ম দর্শন আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ নানা গুণে তিনি একত্ব লাভ করিতে থাকেন। আমাদের সাধন ভজনও অনন্ত, উন্নতিও অনন্ত। সুতরাং পারলৌকিক আত্মা যতই অগ্রসর হইবেন, ততই দোষ পাশের সাত্বিক অংশও ক্রমশঃ লয় হইতে থাকিবে। এই সকল মণ্ডলে সাধক যে কতই অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে থাকেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজানিত সুতরাং তাহার আভাস প্রদান করাও আমাদের অসাধ্য। ইহাকে যদি কেহ স্বর্গসুখ বলিতে চাহেন, তবে তিনি তাহা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে নিম্নস্তরের কোটী কোটী স্বর্গ পার হইয়া ঐ মণ্ডল সমূহে গমন করিতে হয়। ক্রমশঃ উচ্চতর লোকে ক্রমশঃ আনন্দাধিক্য। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে পার্থিব সুখের অত্যাধিক্য এই সকল মণ্ডলে বর্ত্তমান। পার্থিব বাসনা কামনার সম্পূর্ণ লয় না হইলে ঐ সকল মণ্ডলে গমনই অসম্ভব। সুতরাং সেই স্থলের সুখ বিশুদ্ধ আত্মিক সুখ। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে অত্যল্প কয়েকটী মণ্ডল পার হইলেই আমরা নরক হইতে উদ্ধার পাই এবং উহার পর ক্রমশঃ সুখময় মণ্ডল সমূহ বর্ত্তমান। আবার সেই সুখময় মণ্ডল সমূহ সংখ্যায় অসংখ্য। সুতরাং প্রেমময় স্রষ্টার বিধানে সুখই অনন্ত। আমরা যাহাকে দুঃখ বলি, সেইরূপ দুঃখ পরার্দ্ধ মঙ্গল পার হইলেই সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়, কিন্তু চির সুখের জন্য অসংখ্য মণ্ডল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং পরমপিতা যে অনন্ত প্রেমময় ও অনন্ত মঙ্গলময়, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে উক্ত বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় কেহ বিশ্বাস না করিলেও ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে পরলোক আছে এবং উহা অসংখ্য মণ্ডলে পরিপূর্ণ এবং সেই সকল স্থান সমূহ ক্রমশঃ সুখময়। ইহা মূলতঃ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত। আমরা দেখিয়াছি যে বিজ্ঞান অসংখ্য মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য

ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে আলোচনা "সোঽহং জ্ঞান" অংশে বর্ত্তমান। তাহাতেও দেখা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত মত ও সেই মত এক প্রকারের। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার প্রেমলীলার্থ আমাদিগকে জগতে আনিয়া কেবল দুঃখই দিতেছেন না কিন্তু তিনি ক্রমশঃ অনন্ত সুখের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি ক্রমশঃ জীবদিগকে নিজেকে দান করিতেছেন এবং এককালে সম্পূর্ণ ভাবে আমাদিগের প্রত্যেককে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য। সুতরাং তাঁহার অনন্ত মঙ্গলময়ত্বে ত্রুটীর লেশাশঙ্কা করাও আমাদিগের পক্ষে অপরাধজনক হইবে। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পরমপিতার কোন কার্য্যই অমঙ্গলের জন্য নহে। তাঁহাতেই বিপরীত গুণের মিলন জন্য একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টিতে বিপরীত ভাবের কার্য্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাঁহার কোন কোন কার্য্য আপাত দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলিয়া বিবেচিত হইলেও সমগ্রভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রকৃত পক্ষে কিছুই অমঙ্গল উৎপাদন করে না বা করিতেও পারে না, বরং নিত্যই তাঁহার জগতে মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন স্বাধীন ও বিরোধী সত্ত্বর কল্পনা যে একান্ত অযৌক্তিক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্রষ্টব্য। হে মানব! আপনি কি এখনও অনন্ত প্রেমময় সুতরাং অনন্ত মঙ্গলময়ত্বে সন্দেহ পোষণ করিতেছেন? তবে নিজ হৃদয় পটে পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটী চিত্র অঙ্কন করুন। দেখিতে পাইবেন যে পৃথিবীতে দুঃখের আতিশয্য বর্ত্তমান। মানব নানাবিধ বহু দুঃখে সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট, প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত, অত্যুগ্র দুঃখাগ্নিতে বিদগ্ধ। এস্থলে লজ্জা আছে, প্রাণঘাতক অপমান আছে; অকাল মৃত্যু আছে, এস্থলে বিরহ আছে, বিচ্ছেদ আছে, এস্থলে পতি বিরহে সতী নানা ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন, সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি অকালে কালের কবলে পতিত হইয়া সমস্ত পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে ভিক্ষুকের অবস্থায়

আনয়ন করে; এস্থলে সবল দুর্ব্বলের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, ধনী দরিদ্রদিগকে উৎপীড়ন করে, অহঙ্কারী নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত নহে. এস্থলে কত প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যায় কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা গণনা করিবে? এস্থলে অন্নাভাব আছে, স্বাস্থ্যাভাব আছে ভীষণ ভীষণ রোগ আছে. শিক্ষা দীক্ষার অভাব আছে, এস্থলে কত শত যুদ্ধে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নর নারী অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছে. কত মহামারী দুর্ভিক্ষে, কত ভূমিকম্পে. জলপ্লাবনে, ঝড় ঝঞ্ঝায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর কোলে চির শয়ান হইতেছে। এস্থলে ষড়রিপু ও অষ্ট পাশের প্রবল তাড়নায় মানব ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া অন্তরে ও বাহিরে চির প্রজ্জ্বলিত দুঃখানলে বিদগ্ধ হইতেছে। কাহারও জীবনে সুখ সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল, কিন্তু তাহার ইহ জীবনে দুঃখের অমানিশার আর অবসান হইল না। কত নির্ম্মম, কত কঠোর, কত ভীষণ ভীষণ দুর্ঘটনায় কত শত লোক সর্ব্বদাই হাহাকার করিতেছে। কত লোক জীবন সংগ্রামে মৃত্যু হইতেও নিষ্ঠুরতর ভাবে বারংবার পরাজিত হইয়া সদা বিষণ্ন চিত্তে জীবনাতিপাত করিতেছে। এস্থলে সতী সাধ্বীর সতীত্ব অপহৃত হইতেছে, এস্থলে সাধক জীবন দূরের কথা, সাধু জীবন যাপন করাও কত সময় অসম্ভব হইয়া উঠে। এস্থলে বিশ্বাস ঘাতকতা, কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্তর কোনই অভাব নাই বলিতে কোনই ত্রুটী হয় না,। এস্থলে রক্ষকও ভক্ষক হইতে দেখা যায়. এস্থলে মানব অতি সামান্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের এবং সময় সময় উপকারী ব্যক্তিরও সর্ব্বনাশ সাধন করে। এস্থলে অরাজকতাও দৃষ্ট হয়। আরও গভীরতর দুঃখের বিষয় এই যে এস্থলে ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের ভান করিয়া কত যে অধর্ম্ম কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে পৃথিবীতে বহু লোকেই দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। দুঃখের কথা আর কত বলিব? পাঠকগণ নিজ নিজ হৃদয়ে চিন্তা করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন যে পৃথিবীতে দুঃখের কখনও অভাব হয় না, উহার প্রাচুর্য্যই

বর্ত্তমান। হায়! হায়! তবে কি জীবন এই অসীম প্রায় দুঃখ দিয়াই গঠিত? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। অপর দিকের চিত্র দেখুন, দেখিতে পাইবেন যে পৃথিবীতে সুখও স্বচ্ছন্দ পরিমাণে বর্ত্তমান। এস্থানে ধনী ধন দ্বারা তাঁহার সর্ব্ববিধ আরাম বিরাম, আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছে ধন দ্বারা সে প্রায় সকল অভাব পূরণ করিতেছে, ধনী নানা স্থানে নানা ভাবে দান করিয়া বহু পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে, কত দরিদ্র-দিগকে সাহায্য করিতেছে, অন্ন দান করিতেছে, নানা তীর্থক্ষেত্রে ধর্ম্ম-শালা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ধন্য হইতেছেন, এস্থানে পতিপত্নী মিলনানন্দ ভোগ করেন, মানব মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ এক পরিবারে বাস করিয়া সুখ শান্তি ভোগ করেন, এস্থানে বিপদে সাহায্য দানের জন্য বহু হস্ত প্রসারিত হয় এস্থানে রোগের চিকিৎসার জন্য বহু দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, এস্থলে সর্ব্বসাধারণকে সুখ শান্তি বিধান জন্য বহু বহু প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান, এইরূপ Social Service Institutions ক্রমশঃ দেশে দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; এস্থানে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্যও বহু প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান; এস্থানে মানব শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানের আস্বাদন পাইতেছে, কত জ্ঞানী কত তত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন; কত জ্ঞানী কত নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন; কত শত সহস্র ব্যক্তি সাধন ভজন করিয়া অপূর্ব্ব সুখ শান্তি, সুমধুর আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছেন, এস্থলে কত মহাত্মা ঈশ্বরের মহিমা ও ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ধন্য জীবন ও সার্থক জন্মা হইতেছেন। স্থূল, পৃথিবীতে সর্ব্ব সাধারণকে সুখ শান্তি দিবার জন্য বহু স্থানে বহু বহু চেষ্টা হইতেছে, এস্থলে মানব যে আরও কত শত সহস্র ভাবে সুখ ভোগ করিতেছে, তাহা কে বর্ণনা করিবে? এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীতে যদি একমাত্র দুঃখই বর্ত্তমান থাকিত এবং সুখের শক্তি যদি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা না হইত, তাহা হইলে পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হইত। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে সমষ্টি-গত ভাবে মানব জাতি অপেক্ষাকৃত সুখেই বাস করিতেছে। দেখিতে

পাইবেন যে দুঃখময় জগতে সুখ সূর্য্যও উদিত হয়, ঝঞ্ঝা রাত্রি অসীম-কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না, এককালে অবশ্যই সেই ঘোর অমনিশার অবসান হইবেই হইবে।* এমন একদিন প্রত্যেক জীবনে আসিবে, যে দিন হইতে সেই জ্ঞান-প্রেম সূর্য্য আর অস্তমিত হইবেন না, চিরকাল হৃদয় আকাশে অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত থাকিবেন। সুখের, আনন্দের সীমা থাকিবে না। সেই নিত্য প্রেমময়ের অনন্ত উদার প্রেম ক্রোড়ে বসিয়া নিত্য অনন্ত প্রেমানন্দ সুধা অনন্ত জ্ঞান সহকারে নিত্য পান করিবে, সকল দুঃখ জ্বালার চির অবসান হইবে। কবিবর রবীন্দ্রনথের মঙ্গল সঙ্গীত আমরা এই সম্পর্কে স্মরণ করি। "পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস মেঘে আকাশ ডোবা, আনন্দে তুই পুবের দিকে দেখনা তারার শোভা।" দুঃখ আছে সত্য, মৃত্যু আছে সত্য, জ্বালা, যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান, পরাজয় আছে সত্য, কিন্তু তথাপিও বলিব অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে সকলই মঙ্গলে পরিপূর্ণ। কেন ইহা বলিতেছি, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে নিবেদন করিয়াছি। যিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমে নিত্য বিভূষিত, বিশ্বকার্য্য যাঁহার প্রেমলীলা মাত্র, যাঁহার প্রেমের শক্তি অন্যান্য গুণের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা, তিনি আমাদিগকে অসীম প্রায় যন্ত্রণা দিয়া তামাসা দেখিতে আমাদিগকে অনন্ত প্রেমে জন্ম দান করিয়া তাঁহারই প্রেমরাজ্যে আনয়ন করেন নাই, অথবা তিনি নিরুপায় হইয়া আমাদিগের দুঃখ দৈন্যের নীরব দ্রষ্টা ভাবে পরিদর্শন করিতেছেন মাত্র, ইহাও সত্য নহে। যিনি নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞান, যিনি নিত্য প্রেম, তাঁহার রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান নাই বা থাকিতেও পারে না, যে সৃষ্টির মূলে অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম, যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রেমময়ের প্রেম, যে অনন্ত প্রেমময় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রেম দ্বারা সম্পাদন করিতেছেন, যে প্রেমের জন্য প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া-

* পৃথিবীতে যে পরিমাণ দুঃখ, সেই পরিমাণ সুখ, যে পরিমাণে লজ্জা অপমান, সেই পরিমাণে সম্মান, যে পরিমাণে বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ, সেই পরিমাণ স্বাস্থ্য সুখ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেন, সম্পাদন করিতেছেন এবং যিনি এককালে প্রত্যেক জীবকে অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বে গ্রহণ করিয়া এই মহা যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিবেন, সেই প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে অনন্ত মঙ্গল ভিন্ন যে আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না, ইহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে? ইহাও আমরা বলিতে পারিব না যে সৃষ্টি কার্য্যে বিধাতার নিশ্চিতই বিষম ভুল হইয়াছে, নতুবা এরূপ ভীষণ অবস্থা সমূহ জগতে সংঘটিত হইতে পারিত না। অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞান দ্বারা রচিত বিশ্বে যে ভ্রান্তির লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মের জ্ঞান অপার অনন্ত এবং আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানে বিন্দু মাত্রও ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, আমাদের সন্দেহই মিথ্যা। ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ, ন্যায় স্বরূপও বলিব, আবার বলিব যে তাঁহারই ইচ্ছা দ্বারা রচিত জগতে অমঙ্গল আছে, ইহা স্ববিরোধী উক্তিই হইবে। হে নিত্য জ্ঞান-প্রেমময় পিতঃ! হে মঙ্গল স্বরূপ, হে শিবম্, কবে তোমার মঙ্গল স্বরূপ, কবে তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দর্শন করিয়া জগতের নর নারী ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে? কবে দুঃখ বিপদে, লজ্জা, অপমানে, জ্বালা যন্ত্রণায় তোমার মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া-পাতও হইবে না। কিন্তু তোমারই প্রেমস্বরূপ, তোমারই মঙ্গল স্বরূপ তাঁহারা দর্শন করিবেন এবং সকল দুঃখ বিপদ তোমারি প্রেমের দান ভাবে পরমানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে থাকিবেন :—তুমিই "সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরম্।" হে অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! তোমারি সন্তানদিগকে তুমি নিজ গুণে দয়া কর। তাঁহাদের জীবনে জীবনে তোমারই প্রেমলীলার উদ্দেশ্য পূর্ণ কর। তাঁহারা ধন্য হউক্, সার্থক জনম হউক্, তোমারি প্রেমের জয়গান অবিরাম গতিতে গাহিতে থাকুক্। পৃথিবী অতুলনীয় স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক্। ওঁ। আসুন্ আমরা সকলে মিলিয়া পরম প্রেমময় পরমপিতার জয় গান করি।

তোমার প্রেমের জয় হে পিতঃ! তোমার প্রেমের জয়।
(তোমারি প্রেমের জয় হে পিতঃ! তোমার প্রেমেরি জয়।)
তোমার প্রেমে সৃষ্টি স্থিতি, তোমার প্রেমে প্রলয়গীতি,
তোমার প্রেমের নাইকো ক্ষতি, নাইকো কখন লয়।
নিত্য প্রেম জ্যোতিঃ তুমি, প্রকাশিছ বিশ্ব খানি,
প্রেমেই লীলা কর তুমি, (ওহে) প্রেমলীলময়।
তোমার প্রেমে এলাম মোরা, তোমার প্রেমে বিশ্ব গড়া,
প্রেমেতেই বাঁধা ধরা, প্রেমেই সমুদায়।
ঘরে ঘরে প্রেমের লীলা, বিশ্বে তোমার প্রেমের মেলা,
প্রেমই ভবার্ণবে ভেলা, ওহে প্রেমময়।
আনলে মোদের এ সংসারে, তোমার মতন করবার তরে,
(তুমি) প্রকাশিয়া হৃদয় ঘরে, (সবে) করবে প্রেমময়।
যত কিছু অমঙ্গল, দুঃখ বিপদ ঘেরা জাল,
তোমার প্রেম সুবিশাল, (করবে) মঙ্গলেতে লয়।
(তোমার প্রেমলীলায় বিপদ এলে, প্রেমের টানেই যাবে চলে,
সুন্দর করে নিবে বলে, (তাই) এ বিধান হয়।
প্রেমে নিত্য টানছ সবে, প্রেমের জয় হবেই হবে,
(সকল) আপদ বিপদ কেটে যাবে, (সবাই) হইবে নির্ভয়।
(তোমার) অনন্ত প্রেমের টান, কদাচ না হয় বিরাম,
(শেষে) পাব নিত্য প্রেমধাম, (এতে) নাহিক সংশয়।
(তখন) সকল আঁধার কেটে যাবে, সকল ভ্রান্তি দূর হইবে,
প্রেমলীলার সাক্ষাৎ ভাবে, পাব সকল পরিচয়।
(তখন) আনন্দ সাগর জীবনে, (মোরা) মগ্ন রব অনুক্ষণে,
অনিমেষে হেরব প্রাণে, (তোমায়) নিত্যানন্দময়।
(শেষে) নিত্য প্রেমে নিত্য জ্ঞানে, জ্ঞান-প্রেমময় প্রাণে,
রাখবনা আর "আমি জ্ঞানে", (তোমার) প্রেমেই হব লয়।
(মোরা প্রেমেই হব লয়) *

উপসংহারে স্থূল ভাবে এই মাত্র বক্তব্য যে পরম পিতার মঙ্গলময়ত্বে সংশয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে মানব সাধারণ তাঁহাকে জগতের স্নেহান্ধ জনক জননীর ন্যায় দেখিতে ইচ্ছা করেন—যে জনক

---

* "তোরা আয়না সবে ভাই, সে খেলা খেলাই, যে খেলা খেলিলে জীবের জন্ম মৃত্যু নাই" গানের সুরে সমস্বরে গীত হইতে পারে।

জননী স্নেহান্ধতা বশতঃ সন্তানের দোষ দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়াও তাহাকে যে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য কেবল শাসন করেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার প্রতি এমন ভাবের ব্যবহার করেন, যাহাতে তাহার দোষ দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানব ভুলিয়া যান যে ব্রহ্ম যেমন একাধারে স্রষ্টা ও পাতা, তেমনি তিনিই প্রলয় কর্ত্তা, তিনি যেমন অনন্ত করুণার আধার, তেমনি অনন্ত ন্যায়বান দণ্ডদাতা পিতা, তাঁহাতে যেমন অনন্ত প্রেম নিত্য বর্ত্তমান, তেমনি তিনিই একমাত্র অনন্ত ও নিত্য জ্ঞানাধার, তাঁহাতে যেমন অনন্ত কোমল গুণ নিত্য বর্ত্তমান, তেমনি তাঁহাতেই অনন্ত কঠোর গুণও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনিই অনন্ত কোমল-কঠোরাত্মক গুণরাশির একমাত্র নিত্য অনন্ত আধার অর্থাৎ তিনিই অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, সুতরাং তিনিই নিত্য ও পূর্ণ মঙ্গলময়। দ্বিতীয়তঃ— মানবের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ। তিনি বর্ত্তমান সম্বন্ধেই শত শত ভাবে ভ্রান্ত, সুদূর অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে তিনি অত্যন্ত পরিমাণে ভ্রান্ত হইবেন, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমরা তিক্ত ঔষধকে সর্ব্বদা ভয় করি এবং পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত কিন্তু উহা আমাদিগকে স্বাস্থ্য সম্পদ দান করে। সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় একে অন্যকে ভুল বুঝি এবং সেই জন্য কত অনর্থের উৎপত্তি হয়। আবার যখন সম্যক্ জ্ঞান লাভ করি, তখন মনের বৃথা অনৈক্যের জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়ের একটী প্রধান কারণ সম্যক্ জ্ঞানাভাব, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তৃতীয়তঃ—আমাদের চিন্তাশীলতার একান্ত অভাব। মানব সাধারণ গভীর ভাবে কখনও চিন্তা করে না যে সে কোথায় হইতে আসিয়াছে, কেন পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহার মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, তাহার স্রষ্টা, পাতা, রক্ষা কর্ত্তা কে, এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? যদি সে ইহ সর্ব্বস্ব মনোভাব দ্বারা সর্ব্বদা চালিত না হইয়া প্রোক্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর লাভের জন্য চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তিনি অবশ্যই বুঝিতে

পারেন যে একজন অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা এই বিশ্বের কর্ত্তা, তিনি যাহাই করিতেছেন, তাহাই আমাদের মঙ্গলের জন্যই। অন্যান্য সংস্তরও যে তিনি লাভ করিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। চতুর্থতঃ—আমাদের সহজ জ্ঞানের বিকৃতি। মানবে সহজ জ্ঞানের বিকৃতি সম্পাদিত হইলেই তাহাতে বহু দোষের উৎপত্তি হয়, বিশেষতঃ উহা সত্য জ্ঞান লাভের পরিপন্থী হইয়া দাড়ায়। ক্ষেত্রতত্ত্ব শাস্ত্রে যেমন স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তি স্বরূপ, জ্ঞান শাস্ত্রেও সহজ জ্ঞান সেইরূপ ভিত্তি স্বরূপ। সহজ জ্ঞানের বিকৃতি না হইলেই মানব বুঝিতে পারে যে আমাদের স্রষ্টা অনন্ত প্রেমময় ও অনন্ত জ্ঞানাধার, সুতরাং তিনি নিত্য অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা একমাত্র মঙ্গলই পাইতে পারি, তিনি কখনই আমাদিগের অমঙ্গল বিধান করিতে পারেন না। আমরা জীব মাত্রই তাঁহার সন্তান। আমরা তাঁহার অনন্ত উদার প্রেমক্রোড়ে তাঁহারই দ্বারা প্রেমান্তর্গত ভাবে নিত্য অবস্থিত। তিনি অনন্ত প্রেমময় ও সর্ব্বশক্তিমান। এই সৃষ্টি ব্যাপার তাঁহারই প্রেমলীলা। সুতরাং তাঁহারই সৃষ্টিতে তাঁহারই অনন্ত প্রেমের বিধানে তাঁহারই আত্মতুল্য সন্তানগণ যে কখনও অমঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহা সহজ বোধ্য। সৃষ্টি কার্য্যে তাঁহার ভুল ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহার জ্ঞানও নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ। আবার ইহাও বলিতে পারা যায় না যে তিনি ভূত সকলকে নিয়মিত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। এই আশঙ্কা যে একান্তই ভিত্তিহীনা, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিজ হাতে গড়া জড় পদার্থের কাছে পরাজয় স্বীকার করিবেন, ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারেন। আর এইরূপ উক্তির অর্থ দাড়ায় এই যে তিনি অনন্ত জ্ঞান-ময় নহেন, তাঁহার নিশ্চয়ই জ্ঞানের অভাব আছে, নতুবা তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট জগতে নানাবিধ বহু ত্রুটী লক্ষ্য করা যায় কেন। ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণাশক্তি না থাকে, যেমন নলের দোষের ছিদ্র পাইয়া শনি তাঁহাতে প্রবেশ করিতে ও নানারূপ

বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং নলের সেই জন্য বিশেষ ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত প্রেমে—পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ প্রেমে নিত্যই পরিপূর্ণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে উক্তরূপ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মেরত কোনও রূপ দুর্দ্দশা হইবে না, যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা বিশ্বেরই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে প্রকৃত পক্ষেই যদি অমঙ্গল হয়, তবে তাহাতে যে কেবল তাঁহার কোনও না কোনও এক প্রকার ত্রুটী প্রমাণ করিবে, তাহা নহে, কিন্তু সেই অমঙ্গল তাঁহারই। কারণ, জীবকুল তাঁহারই আত্মতুল্য সন্তান। অসংখ্য জীবকে তিনি চিরকাল উত্তমর্ণ অভেদ জ্ঞানে তাঁহার অনন্ত উদার প্রেম ক্রোড়ে অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অমঙ্গল হইলে সেই অমঙ্গল তাঁহাতেই বর্ত্তিবে। কেহই জানিয়া শক্তি থাকিতে নিজ অমঙ্গল সৃষ্টি করে না। সুতরাং ব্রহ্মও আমাদিগের অমঙ্গল করিতেছেন না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। পঞ্চমতঃ—আমাদের নিকট বিপদ, পরীক্ষা আসিলেই ভীত ও সংত্রস্ত হই। বিপদকে বরণ করিতে পারি না এবং আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বশতঃ বিপৎপাত মাত্রই একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ি। পুরাণোক্ত সমুদ্র মন্থন উপাখ্যান যদি আমরা নিম্নলিখিত ভাবে ধারণা করিতে পারি, তবেই দেখিতে পাইব যে সৃষ্টি ব্যাপার ব্রহ্মের প্রেমময়ী সুতরাং মঙ্গলময়ী লীলা মাত্র। ইহাতে বিন্দু মাত্র দোষ ত্রুটী নাই বা থাকিতে পারে না। কথিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে বিষ এবং অমৃত উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল। সংসার সমুদ্র মন্থনেও যে আমাদের দুঃখ এবং সুখ উভয়ই উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। দোষপাশরূপ বিষ যে আমাদের চির সাথী ইহাও সকলে জ্ঞাত আছেন। এই দোষপাশরাশি হইতেই আমাদের যত বিঘ্ন বিপদের উৎপত্তি। উহা বিষ বৃক্ষের বিষময় ফলই বটে। উহাদিগকেই আমরা অমঙ্গল বলিয়া থাকি। কিন্তু যদি কেহ পরমর্ষি ভোলানাথের ন্যায় সেই বিষরাশি গলাধঃকরণ করিতে পারেন, সমস্ত বিষ যদি

সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিতে পারেন, অর্থাৎ যদি দোষপাশরাশি হৃদয়ে সম্পূর্ণ ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, তবে পরমর্ষি ভোলানাথ যেমন শিব হইয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ শিবত্ব লাভ করিতে পারেন। আমাদের পথে বাধা বিঘ্ন, দুঃখ বিপদ, জ্বালা যন্ত্রণা, লজ্জা অপমান আসে। আমরা যদি উহাদিগকে অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার প্রেমের দান বলিয়া সত্য ভাবে বরণ করি, তবে আর অমঙ্গল থাকে না। পরমর্ষি ভোলানাথ যেমন বিষ পান করিতে অস্বীকার করেন নাই, বরং সানন্দ চিত্তে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, আমরাও যদি সত্য ভাবে সেইরূপ বিপদ আপদ পরম প্রেমময় পরম পিতার প্রেমের দান বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারি, তবেই আপাত অমঙ্গলত্বের অমঙ্গলত্ব চলিয়া যাইবে, তবেই আমরা সেই অনন্ত মঙ্গলময়ের অনন্ত শক্তিশালী মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইব। একটী তত্ত্ব ধারণা করিলেই ইহা সহজ বোধ্য হয়। তাহা এই যে প্রকৃত পক্ষে বিন্দুমাত্রও অমঙ্গল জগতে নাই, যে অমঙ্গল জগতে দেখিতেছি, তাহা আপাত অমঙ্গল বটে, কিন্তু উহার সত্য অস্তিত্ব নাই। কারণ, আমাদের দৃষ্ট অমঙ্গল রাশি অবশ্যম্ভাবীরূপে মঙ্গলে পরিণত হইবে। অর্থাৎ উহা Blessing in disguise. এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি আমরা সেই অমঙ্গলকে জোড় করিয়া আটিয়া ধরি, তবে উহার, মুখোস খসিয়া পড়ে অর্থাৎ উহার অমঙ্গলত্ব দূরীভূত হইয়া উহার সত্যভাব বা প্রকৃত মঙ্গল ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা এই যে অমঙ্গল দেখিলেই ভীত হইতে হইবে না, মোহগ্রস্থ হইতে হইবে না, বরং উহাকে বরণ করিতেই হইবে এবং সত্য জ্ঞান দ্বারা উহাকে বারংবার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তাহা কৃত হইলেই আমরা দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃতে দেখিতে পাইব যে অন্ধকার সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাবই সেই তথাকথিত অমঙ্গলের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ সেই অমঙ্গল পূর্ণ কার্য্যটী মঙ্গলেই পূর্ণ, ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। শিবের পক্ষে পৃথিবীজাত অমৃতের অর্থাৎ পার্থিব সুখের প্রতি কোনই আসক্তি নাই। কারণ, অনন্ত

অমৃতের অনন্ত সুগভীর নিত্য উৎস শিবত্ব প্রাপ্ত সাধকের নিকট চির উৎসারিত। "সে কোন্ জোছনা দেশ. সই সইরে, (যেথা) অগণন চকোর সুধা পানে বিভোর, তাঁরা নাহি জানে নিত্য সুখ বইরে। (সাধক ইন্দুভূষণ)।" তিনি সেই অপূর্ব্ব অনন্ত অমৃতরস নিত্য পান করিয়াই মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার নিকট পার্থিব ভোগ সুখ সুতরাং হীন বা তথাকথিত অমৃত অতি তুচ্ছ। অতএব আমরা এই উপাখ্যান দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পৃথিবীতে আপাত অমঙ্গল আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই অমঙ্গলও মঙ্গলেই পরিপূর্ণ। তথাকথিত অমঙ্গলকে বরণ করিলেই উহার আবরণ খসিয়া যায় এবং উহার প্রকৃত রূপ যে মঙ্গলরূপ, তাহা বিকশিত হইয়া উঠে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নানাবিধ দুরবস্থার ভিতর মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সেইসকল দুরবস্থা বরণ করিতেই হইবে, তাহাতে অভিভূত হইতে হইবে না। তিনি যে দুঃখ বরণ, বিপদ বরণ, ও দুঃখাতীতত্ব লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু অমূল্য সঙ্গীত পৃথিবীতে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলী পাঠে বুঝিতে পারা যায়। "অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো। সকল দ্বন্দ বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো *॥ পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ, সেই তো তোমার গেহ। সমর ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেই তো তোমার স্নেহ। সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান, সেই তো তোমার দান। মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ, সেই তো তোমার প্রাণ। বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি, সেই তো স্বর্গভূমি। সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, সেই তো আমার তুমি ।** কেহ কেহ বলেন যে

* ভাল শব্দের অর্থ মঙ্গল, Good.

** কবিবর এস্থলে দুঃখ বিপদ হইতে যে অনাবিল মঙ্গল উৎপন্ন হয়, তাহার উপরেই বিশেষ ভাবে জোড় দিয়াছেন। কিন্তু বিচারতঃ দেখিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে সুখ এবং দুঃখ, জন্ম এবং মৃত্যু,

সৃষ্টিতে যখন এত বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মের এই সৃষ্টি না করিলেইত হইত। তিনি যেমন নিজ অনন্তজ্ঞানে, অনন্তপ্রেমে, অনন্ত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান ছিলেন, তেমন ভাবেই থাকিলেই ত হইত, এই সৃষ্টির প্রয়োজন কি ছিল? ইহার উত্তরে পাঠককে মাণ্ডুক্যোপনিষদের শেষ মন্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি, উহাতে তুরীয় ব্রহ্মকে শিবমদ্বৈতম্ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে, তিনিই কেবল শিব হইতে পারেন। সুতরাং যিনি শিব, তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। এমন নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গলময় যিনি, তিনি যখন সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন এই সৃষ্টিতে কখনই অমঙ্গল থাকিতে পারে না, আসিতে পারে না। যে কার্য্যে অমঙ্গল নাই, বরং যে কার্য্যে নিত্য মঙ্গলই সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ কার্য্য যদি তিনি লীলার্থ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার ত্রুটী কোথায়? অতএব এই ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল যে নিত্য শিব হইতে এবং নিত্য শিব দ্বারা যে সৃষ্টি রচিত ও পুষ্ট, তাহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই বা থাকিতে পারে না। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অনন্ত প্রেমময় ও অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতা তাঁহার প্রেমময়ী সুতরাং মঙ্গলময়ী ইচ্ছা

আনন্দ এবং বিষাদ সকলেই সম ভাবে আমাদিগকে মঙ্গল দান করে। ইহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায়ও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কবিবরও তাহা বহু স্থলে গাহিয়া গিয়াছেন। ৮৪১-৮৪২ পৃষ্ঠায় যে সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে জনমে মরণে উভয় অবস্থায়ই আমরা অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার নিকট হইতে সমভাবেই মঙ্গল লাভ করি। বর্ত্তমানে উদ্ধৃত সঙ্গীতে দুঃখ বিপদ হইতেই মঙ্গল লাভ হয়। তাহা যে সজোরে বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে পৃথিবীতে সকলেই যেন "কেবল অমঙ্গল" "কেবল অমঙ্গল" বলিয়া কেবলই উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাই কবিবরও যেন এই মিথ্যা চীৎকারের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ বলিয়াছেন যে অন্ধকার, বিরোধ, মলিনতা, সংগ্রাম, শূন্যতা, মৃত্যু, সর্ব্বজনের সহিত সংবন্ধতা সুতরাং সংগ্রাম পরিপূর্ণ সংসার প্রভৃতি যাহা কিছু, তাহার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। কারণ, সুখ, শান্তি, আনন্দে যে মঙ্গল বর্ত্তমান, তাহা ত সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং উহাদের উল্লেখ এস্থলে অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ ঐ স্থলে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দ্বারা তাঁহারই সৃষ্ট বিশ্ব পালন করিতেছেন। ইহাই যে সত্য, সত্য, পরম সত্য, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সংশয়ের স্থান নাই। আসুন আমরা সকলে হৃদয়ে ভক্তি ভরে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ পরমপিতার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হই এবং ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং ওঁং এই অরূপ রূপ একাগ্র চিত্তে ধ্যান করি। ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা লিখিত হইল। জানি না পাঠকের নিকট ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে পাঠক গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন, ইহা তাঁহার নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ। এই প্রবন্ধের সমাপ্তির সহিতই সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ও সমাপ্ত হইল, যদিও এই সম্বন্ধে আরও বহু বহু তত্ত্ব লিখিত হইতে পারে, ইহা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে বহু কঠিন সমস্যার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহার মীমাংসা যে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য পরম দয়াল পরম পিতাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি। আমার হৃদয়ে তিনি যে বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে আমি সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইয়াছি, তিনিই আমার অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে চিন্তারাশির জাগরণ করিয়াছেন, তিনিই যথোপযুক্ত ভাবে ও ভাষায় বলিবার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহারই অপার দয়ায় তাহা আমি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনিই ধন্য। পিতঃ! তুমিই ত সমুদায়! তুমিই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তুমিই অনন্ত প্রেমের আধার, তুমিই অনন্ত দয়ার আধার। তুমিই বুদ্ধি প্রেরণ কর, তুমিই শক্তি দান কর। তুমিই মুককে বাচাল কর, তোমারই প্রেমলীলায় সকলই সংঘটিত হইতেছে। তোমাকেই অগণ্য ধন্যবাদ। তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য। এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আত্মা ও জড়ের পার্থক্য বিচারে আমরা অগ্রসর হইতেছি। সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা জড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপ অবলম্বনে তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি শালিনী ইচ্ছা দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তিনিই সেই জড় দেহ যোগে বহু জীবাত্মা

ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আমরা "গুণ বিধান", 'জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশত্রয়ে দেখিয়াছি যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা এবং তিনি নিত্য অখণ্ড থাকিয়াও অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং আত্মা ও জড় যে পৃথক্, তাহা বুঝিতে পারা যায়।* অন্যান্য অংশও অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মা ও জড় পৃথক্। এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে যাইতেছি। পরমদয়াল পরমপিতা আমাকে সত্য জ্ঞান দান করুন, যাহাতে এই সম্পর্কীয় সমস্যা সমূহের সরল, প্রাঞ্জল ও সর্ব্বোপরি সত্য মীমাংসা আমি পাঠক দিগের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অবশেষে আমরা পরমর্ষি গুরুনাথের ভাব ও ভাষার অবলম্বনে অনন্ত মঙ্গলময় পরম পিতার শ্রীচরণে প্রণত হই।

অনন্ত সন্তান সুবৎসল প্রভো
রনন্ত সন্তানক সদ্গুণস্য তে।
অনাদ্যনন্তস্য সতশ্চ পালিনো
নমো নমস্তে চরণে সুমঙ্গলে॥
অস্যাং পৃথিব্যাং অপরত্র মণ্ডলে
দেহেঽত্র দেহান্তরতশ্চ তারিণঃ।
প্রেম্নঃ প্রদাতুশ্চ নিধেশ্চ তন্নিধেঃ
নমো নমস্তে চরণে সুমঙ্গলে॥
মঙ্গল চরণে তব নমি হে তারণ,
মঙ্গল চরণে নমি সন্তান পালন।
মঙ্গল চরণে তব নমি গুণময়,
মঙ্গল চরণে নমি অনাদি অভয়।
মঙ্গল চরণে নমি প্রেমের নিধান,
মঙ্গল চরণে নমি প্রেমের বিধান।

---

* পৃথক অর্থে বিভক্ত নহে, কিন্তু Distinct. আত্মা ও জড়ের সম্পর্ক ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই practically জড় জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আবার ব্রহ্মই স্বয়ং জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং আত্মা ও জড় বিভক্ত ভাবে পৃথক্ হইতে পারে না।

মঙ্গল চরণে তব নমি হে তারক,
অপূর্ব্ব করিলা সৃষ্টি জ্ঞানের সাধক।
মঙ্গল চরণে নমি তামস দায়ক,
মঙ্গল চরণে নমি সত্ত্বের বর্দ্ধক।
মঙ্গল চরণে নমি অনৃত নাশক,
মঙ্গল চরণে নমি সত্যের দায়ক।
বাক্যের অতীত তুমি গুণের অতীত,
করজোড়ে ডাকি তোমা নাথ হ'য়ে ভীত।
তারহে তারহে তার তার সনাতন,
নিস্তার নিস্তার মোরে পতিত পাবন।

ওঁং সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং ওঁং।

ওঁং

আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্য তেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বিদ্যমান থাকিলেও জড়াত্মবোধ নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখ লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মস্তিষ্ক নহে এবং প্রাণও নহে। আত্মা ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্ পদার্থ। একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে, অন্য কাহারও চৈতন্য নাই। (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মা ও জড়ের পার্থক্য বিচার।

জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি ?

সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহারই সুমহীয়সী শক্তিসম্পন্না ইচ্ছায় ব্যোমের উৎপত্তি হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সেই ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি এবং তাঁহারই ইচ্ছায় উহাদের যোগে নানাবিধ পদার্থ সৃষ্ট হইল। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে ব্রহ্মই যখন সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং জগৎ যখন তাঁহারই কার্য্য, তখন সেই উপাদান জাত জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ অর্থাৎ পরমাত্মাই যেন অংশ ভাবে ভাসমান, অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়াও কার্য্যতঃ বা বাস্তবে অংশ ভাবে ভাসমান, অর্থাৎ পরমাত্মায় যে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান, জীবাত্মায় তাহা সমস্তই পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও

উঁহারা দেহাবদ্ধতা বশতঃ অংশ ভাবে বা সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান। উঁহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত (বিকাশ প্রাপ্ত) হইতে হইতে পরম পিতার গুণরাশির সহিত একীভূত হইবে অর্থাৎ জীবাত্মা পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হইতে হইতে যদি পরমপিতার কৃপা প্রাপ্ত হন এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিনির্মুক্ত হন, তবে পরমপিতাতে মিলিয়া মিশিয়া যাইবেন. অর্থাৎ দেহের আবরণে পরমাত্মার জীবত্ব প্রাপ্তি এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি।* অপর পক্ষে জড় পরমপিতার সাক্ষাৎ অংশ নহে। উহা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের পরিণামে উৎপন্ন, সুতরাং উহা পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন, সুতরাং আত্মা ও জড় এক হইতে পারে না। জড়ের কারু-কার্য্য বা নামরূপ অংশের বিকার আছে, উহা নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার বিকার নাই, তাঁহা নিত্য নির্ব্বিকার। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্রষ্টব্য। আমরা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা জড় এবং আত্মার পার্থক্যের কিঞ্চিৎ আভাস লাভ করিতে পারি। রাজার ঔরস পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ উভয়ই তাহার প্রজা বটে, কিন্তু রাজকুমার এবং সাধারণ প্রজার মধ্যে পার্থক্য অধিক(ক)। প্রজা রাজা হয় না, কিন্তু রাজকুমার রাজা হন, রাজার সম্পত্তির অধিকারী হন। প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রজাবৎসল রাজার পক্ষে রাজপুত্র এবং সাধারণ প্রজা সমান। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে রাজার আত্মজ পুত্রই রাজার একমাত্র উত্তরাধিকারী, প্রজাগণ নহে। আর অত্যন্ত প্রজাবৎসল হইলেও তিনি কখনও পুত্র এবং প্রজাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। রাজার প্রতি পুত্রের দুই প্রকারের দাবী থাকে। এক পুত্রত্বের দাবী, আবার প্রজাত্বের দাবী। জীবাত্মা

---

* পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক এবং জীবাত্মাকে কেন পরমাত্মার অংশ বলা হয়, তাহা "গুণবিধান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পূর্ণা-মুক্তি সম্বন্ধেও 'সোঽহং জ্ঞান" অংশে লিখিত হইয়াছে। পূর্ণামুক্তি কথার কথা নহে। উহা অনন্ত প্রায় সাধনা ও কাল সাপেক্ষ।

(ক) ধাত্বর্থ অনুসারে পুত্রকেও প্রজা বলা হয়। "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" মহাবাক্য স্মর্ত্তব্য।

ও জড়ে প্রায় সেই একরূপই প্রভেদ। জীবাত্মা এককালে তাঁহার একমাত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবেন, অর্থাৎ পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। সেই জন্যই পরমপিতা তাঁহাকে জগতে আনিয়াছেন। পরমাত্মাই ত স্বয়ং দেহ যোগে জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আর জড় জগৎ তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট। মহাপ্রলয়ে জড়ের কারুকার্য্য অংশ অর্থাৎ নামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই কারুকার্য্য সমূহকেই সাধারণে জড় পদার্থ বলে (খ)। যাহার অবলম্বনে উহারা রচিত হইয়াছে, সেই অব্যক্ত স্বরূপের কোনই পরিবর্ত্তন নাই। অর্থাৎ উহা জড় জগৎ রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত ভাবে ব্রহ্মেই নিত্য বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে। যাহা হইবে, তাহা এই যে মহাপ্রলয়ে উহার পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্বের অবসান হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও জড় তুল্য হইতে পারে না। জড়ের সৃষ্টি জীবাত্মার জন্যই। ইহা সাংখ্য দর্শনও স্বীকার করেন। কিন্তু জীবাত্মা জড়ের জন্য নহে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা ও জড়ের তুলনা মূলক সম্পর্ক আরও স্ফুটতর ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। পরমাত্মার সহিত জীব ও জড়ের সম্পর্ক বুঝিতে মাতাপিতার সহিত সন্তানের এবং তাহাদের কোনও অঙ্গুলির একটু নখ হইতে উৎপন্ন পদার্থের তুলনা করা যাউক্। মাতাপিতার দেহের সার অংশ দ্বারা জীবাত্মার আবাস ভূমি সন্তানের দেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত নখ খণ্ড হইতে এমন কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহাতে মানবাত্মা বাস করিতে পারেন।' এস্থলে পূর্ব্বোক্ত সন্তান বীজ মাতাপিতা দেহের সাক্ষাৎ অংশ বলিয়া এবং সেই অংশ তাঁহাদের দেহের সমস্তই অংশতঃ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া মানব দেহ-রূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ দেহের সাক্ষাৎ অংশের পরিণামে আর একটী দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু নখ মাতাপিতার দেহের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ। উহা দেহের সাক্ষাৎ

(খ) "অব্যক্তের পরিণাম" ও "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশদ্বয়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান।

অংশ হইলেও সমস্ত দেহের সমস্ত গুণ অংশতও ধারণ করে না। সুতরাং তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু স্বভাবতঃই মাতা পিতার দেহের সারাংশ হইতে উৎপন্ন বস্তু অপেক্ষা বহু গুণে অপকৃষ্ট। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে অনন্ত গুণময় পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ জীবাত্মা তাঁহার অনন্ত গুণের একটী মাত্র গুণ হইতে উৎপন্ন জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ ও উৎকৃষ্ট। ইহার পরেও প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় পরমপিতার সাক্ষাৎ অংশ নহে বটে, কিন্তু পরম্পরা ভাবে অংশ অর্থাৎ জড় পরমপিতার পরম্পরা ভাবে অভেদ অর্থাৎ অংশের অংশ। সুতরাং উহাকে আত্মা বলিতে দোষ কি? আমরা ত বলি যে জড় পরমপিতার সহিত পরম্পরা ভাবে অভেদ। কিন্তু পরব্রহ্ম এবং জড়ে ভেদের মাত্রা এত অধিক যে উহার সীমা নাই বলিলেই চলে। ইহা বুঝিতে পাঠক "অব্যক্তের পরিণাম" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশদ্বয় পাঠ করিবেন। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে পরম পিতার ইচ্ছা সহযোগে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জড় জগতের উৎপত্তি। তাঁহার প্রেমময়ী ইচ্ছাই জড় জগতের উৎপত্তির কারণ এবং ইহার গুণরাশির অধিকাংশই তাঁহার সেই ইচ্ছা জন্য সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ধারণায় জড় জগতে উপাদান কারণত্ব হইতে নিমিত্ত কারণত্ব অত্যধিক। সাধারণে কেন, মায়াবাদও নাম রূপকেই জগৎ বলেন। নাম রূপ বা Phenomena বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ইচ্ছাকৃত। যদিও জগৎ পরমপিতার কোন একটী স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, তথাপি উক্ত কারণ বশতঃ তাঁহাতে এবং জড়ে ভেদের মাত্রা অত্যধিক। নিম্নলিখিত একটী অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী আরও একটু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটী আম্র ফল গ্রহণ করা যাউক্। এক্ষণে যদি ঐ ফলটীর কিয়দংশ কেহ গ্রহণ করেন, তবে উহাকে আমরা বৃক্ষের সাক্ষাৎ অংশ বলিতে পারি বটে, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে উহা বৃক্ষের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু যদি উক্ত ফলটীর একটু মাত্র অংশ দ্বারা অম্বল প্রস্তুত করা হয়, তবে উহার পরিণাম হইল। কারণ, তখন আর তাহা আম্র ফল বা উহার অংশ ভাবে

বর্ত্তমান থাকিল না। উহা চিনি, মসল্লা, জল ও উত্তাপ সহযোগে একটী নূতন পদার্থ সৃষ্ট হইল, যাহাতে আম্র ফলটীর অংশটুকুও বিকৃত হইয়া অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। জড় পদার্থও যে ঐরূপ একটী বিকৃত পদার্থ, তাহা নিম্নলিখিত রূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম পিতার অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহার সাক্ষাৎ অংশ বটে, কিন্তু তাঁহা তাঁহার অনন্ত স্বরূপের মধ্যে একটী মাত্র স্বরূপ, অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ অংশতঃও বর্ত্তমান নাই। তাঁহার সেই অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছা উঁহাকে নানাবিধ নামরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিতে পাইয়াছি। এই যে নানাবিধ নামরূপ সম্বলিত অব্যক্ত স্বরূপ, তাহাই জড় পদার্থ নামে আমাদিগের নিকট পরিচিত। অম্বলে যেমন আম্র ফলের সাক্ষাৎ অংশ বিকৃত অবস্থায় পরিণত ও তাহাতে আম্র ফলের অংশটুকু ভিন্ন বহু পদার্থ বর্ত্তমান এবং তাহা প্রস্তুত করিতে ক্রিয়ার সুতরাং ইচ্ছার প্রয়োজন, সেইরূপ পরম-পিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ নানা নামরূপ সম্বলিত হইয়া সীমাবদ্ধ জগৎরূপে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাতে যে সেই স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর দিকে আম্র ফলটী বৃক্ষের সাক্ষাৎ অংশ। উহার মধ্যে বৃক্ষের সকলই বর্ত্তমান। কারণ, ঐ ফলটী দ্বারা অন্য একটী বৃক্ষ সৃষ্ট হইতে পারে। সেইরূপ জীবাত্মায় ব্রহ্মের অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তিই বর্ত্তমান। কিন্তু উঁহারা দেহজাত দোষপাশ দ্বারা আবৃত। পরম পিতার ইচ্ছায় আবার জীবাত্মা দোষপাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ও অন্য গুণে বিভূষিত হইয়া অবশেষে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। উক্ত দৃষ্টান্তে দেখা যাইবে যে আম্র বৃক্ষের ও অম্বলের মধ্যে ভেদের মাত্রা অত্যধিক। সেইরূপ পরব্রহ্মে ও জড় পদার্থে ভেদের মাত্রা অসীম। অর্থাৎ আত্মা বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপকে বুঝাইবে, কিন্তু জড় বলিলে তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের ও পরিণামে উৎপন্ন জড় পদার্থ বুঝাইবে। পূর্ণ পদার্থ ও উহার অংশের পরিণত পদার্থের

মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং আত্মা ও জড়ের মধ্যেও পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যদি আত্মার শব্দার্থ ধরিয়া এই বিষয়ের বিচার করি, তবুও জড় আত্মা পদবাচ্য হইতে পারে না। আত্মা শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ যিনি বিভু। ৫২২ পৃষ্ঠায় আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিত হইয়াছে। জড় কখনও সর্ব্ব-ব্যাপী নহে। সুতরাং জড় আত্মা হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে বিশ্ব একটি গোটা বস্তু। সুতরাং এই অর্থ ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে জড়ও বিশ্ব ব্যাপী। সুতরাং তাহা যে সর্ব্বব্যাপী, ইহা বুঝিতে পারা যায়। জড়কে যদি বিশ্বব্যাপীও বলা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে উহা সর্ব্বব্যাপী নহে। কারণ, বিশ্ব ত সসীম, কিন্তু ব্রহ্ম (আত্মা) অনন্ত অপার। ব্রহ্ম যে জড়ের অতীত, ইহা বহু দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং আমরা সৃষ্টি তত্ত্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলেন যে বিশ্ব সসীম—অনন্ত নহে। কিন্তু ব্রহ্ম যে অনন্ত অসীম, সে বিষয়ে সকল আস্তিক দর্শনই একমত। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আত্মা শব্দ কেবল তাঁহাতেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এবং জড় জগৎ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী নহে বলিয়া উহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু জীবগণও ত সসীম। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে "জীবাত্মা" শব্দ ব্যবহৃত হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আত্মা একই, কখনই দুই বা বহু নহেন। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "গুণ বিধান" অংশে দেখিতে পাইয়াছি। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু দেহাবদ্ধ ভাবে ভাসমান বলিয়া সসীমত্ব প্রাপ্ত। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে সেই জড়ই আমাদের সসীমত্বের কারণ। জীবাত্মা যখন মহাপ্রলয়ে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন, তখন তিনি ত্রিবিধ সকল দেহ হইতে বিনি-র্মুক্ত হইবেন, অর্থাৎ জড়ের আবরণ আর তাহার থাকিবে না। অতএব দেখা গেল যে জড় এমন একটি পদার্থ যাহা নিজে ত সসীমই, উহার সংসর্গে যে আসে, তাহাকেও সীমাবদ্ধ করে। আরও একটী বিষয়

আমাদের চিন্তা করা করা কর্ত্তব্য। জীবাত্মা যখন স্বরূপতঃ পরমাত্মা, তখন তাঁহাতেও অনন্ত গুণ বর্ত্তমান। দেহাবদ্ধ হওয়ায় উঁহারা বীজাকার প্রাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জড়ের বাধা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ গুণরাশির বিকাশ করিতে হইবে, ইহাই জীবগণের কর্ত্তব্য এবং ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীবগণ যেমন সাধনা দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভে প্রেম, একাগ্রতা, দয়া প্রভৃতি পরমাত্মার সরল গুণ রাশিতে একত্ব লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহার অনন্তত্ব গুণেও একত্ব লাভ করিতে পারিবেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ আত্মার যে স্বাভাবিক গুণ "অনন্ত অসীমত্ব", তাহা তাঁহার (জীবের) ক্রমশঃ লাভ হইতে হইতে পূর্ণামুক্তিতে তাহা পূর্ণ হইবে।* কিন্তু জড় চিরকালই সান্ত থাকিবে। জড় কখনও বিশ্বের বাহিরে গমন করিতে পারিবে না। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই থাকিবে, কিন্তু পঞ্চ-ভূতাত্মক জড় জগৎ আর থাকিবে না, অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাজনিত জগতে আমরা অব্যক্ত স্বরূপে যাহা দেখিতে পাই, অর্থাৎ নামরূপ, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তখন তিনি তাঁহার সৃষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছা সংহরণ করিবেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে শিল্পী যখন পুনরায় মৃত্তিকায় পরিণমন করে, তখন যেমন তাহার কর্ম্মজনিত পুতুলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মৃত্তিকা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, তেমনি থাকে, সেইরূপ পরমপিতার ইচ্ছা দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপে নামরূপে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আর থাকিবে না, কেবল মাত্র অব্যক্ত স্বরূপই থাকিবে। সুতরাং দেখা গেল যে জীবগণের আত্মাও আত্মাই বটেন, কিন্তু জড়কে আত্মা বলিতে পারা যায় না। এস্থলে বিশেষ ভাবে বক্তব্য এই যে অব্যক্ত স্বরূপ নিত্যই অবিকৃত ছিল.

---

* এই সম্পর্কে পাঠক পরমর্ষি গদ্রনাথ কৃত "দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে বহুতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পূর্ণামুক্তিতে যখন জীবের অনন্তত্ব লাভ হইবে, তখন আর তিনি জীব থাকিবেন না, ত্রিবিধ দেহের বিগমে তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইবেন। কারণ, পার্থক্যের চিহ্ন দেহ তখন আর থাকিবে না।

আছে ও থাকিবে। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। জড় জগৎ চৈতন্য বিহীন, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং অনন্ত চৈতন্যময় পরমাত্মা হইতে উহার পার্থক্য যে কতদূর, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। "গুণ বিভিন্নতা জন্য আত্মা ও জড় এক নহে" এবং "জড়ের চৈতন্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া" অংশদ্বয় এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন যে জড়ে জীবের ন্যায় চৈতন্য নাই বটে, কিন্তু উহাতে ঈষৎ চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্য লেশ বর্ত্তমান। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ তাহারা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন। "(১) অনন্ত চৈতন্যময় ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান কারণ, সুতরাং তাঁহার হইতে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ জড় জগৎ সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্য বর্জ্জিত হইতে পারে না। উহাতে চৈতন্য লেশ অবশ্যই থাকিবে। (২) অনন্ত চৈতন্যময় ব্রহ্ম সর্ব্বময় বিভু। তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বর্ত্তমান। ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার চৈতন্য সত্ত্বা যখন জড়ের মধ্যেও আছে; তখন জড় চৈতন্য-লেশ-বর্জ্জিত হইতে পারে না। (৩) ব্রহ্মের অনন্ত গুণের মধ্যে কোনটীই অভাবাত্মক গুণ হইতে পারে না। অচেতনত্বের অর্থ চৈতন্য শূন্যতা। সুতরাং উহা একটি অভাবাত্মক গুণ। উহা ব্রহ্মের গুণ হইতেই পারে না।" উপরোক্ত যুক্তিত্রয়ীর খণ্ডনার্থে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা ইহা বলিতে চাহি যে জড়ের চৈতন্য বা চৈতন্য লেশ আছে, ইহা কোনও উল্লেখ যোগ্য বিজ্ঞান শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, অথবা দর্শন শাস্ত্র স্বীকার করেন না। উহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে জড় চৈতন্য শূন্য। নাস্তিকগণ চৈতন্য শূন্য জড় ভিন্ন সৃষ্টিতে কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা বৈজ্ঞানিকের মত বলেন যে জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। তাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অন্তঃকরণের কার্য্যকে জড়েরই কার্য্য বলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, জ্ঞানী ও মূর্খ, পাপাত্মা ও মহাত্মা সকলেই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে জড় চৈতন্য শূন্য। সুতরাং অন্য যুক্তি অবলম্বন না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে জড় চৈতন্য শূন্য। কারণ, ঐরূপ আপত্তি প্রত্যক্ষ,

অনুমান ও আপ্তবাক্য রূপ প্রমাণ অথবা সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ বিরোধী। এখন আমরা উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডনার্থ নিম্নে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। "(১) আমরা 'স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে* দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান। তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ সত্ত্বাত্মক গুণের অনন্ত মিশ্রণে গঠিত এবং অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের অনন্ত সংমিশ্রণে যে অনন্ত একত্ব সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার একতম স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মে একমাত্র চৈতন্যই বর্ত্তমান, কিন্তু অচৈতন্য মাত্রও নাই, এরূপ কল্পনা ভুল। তাঁহাতে উক্ত উভয় গুণই অনন্ত পরিমাণে এবং অনন্ত ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া একীভূত ভাবে আছে ইহাই সত্য। আমরা 'স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" ও "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অচৈতন্যও বর্ত্তমান। তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব তাঁহার একতম স্বরূপ এবং ইহা আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি যে ঐ স্বরূপটী চৈতন্য শূন্য। আমরা আরও দেখিয়াছি যে জড় জগতের উপাদান ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ। সুতরাং উৎপন্ন উৎপাদকের গুণ লাভ করিয়া চৈতন্য শূন্য হইয়াছে (ক)। ব্রহ্মে যদি একমাত্র চৈতন্যই বর্ত্তমান থাকিত, অচৈতন্য মাত্রও না থাকিত, তবে জগতে অচৈতন্যের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইত না। উপাদানে যে গুণের অস্তিত্ব মাত্রও নাই, উৎপন্নে তাহার লেশও থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীর আপত্তিতেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। (২) 'দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত চৈতন্য সহ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বটেন, ইহাতে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই। কিন্তু সেই জন্যই জড়ে চৈতন্য লেশও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। জড় যে পূর্ণ চৈতন্যবান নহে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট

---

* এই আলোচনার সঙ্গের উক্ত অংশ এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয়ে লিখিত সদৃশ আলোচনা পাঠক দেখিবেন।

(ক) "গুণভেদ হেতু জড় আত্মা নহে" অংশে দেখিতে পাইব যে জড়ের অর্থ সম্পূর্ণ চৈতন্য শূন্য পদার্থ।

এবং সর্ব্ববাদি সম্মত। ইহা আপত্তিকারীও স্বীকার করেন। যদি জড়ে অনন্ত চৈতন্যময় পরমেশ্বরের ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমানতার জন্যই উহাতে চৈতন্য লেশ আছে বলিতে হয়, তবে উহাতে পূর্ণ চৈতন্যই বা থাকিবে না কেন? তিনি ত অনন্ত চৈতন্য সহ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণ ভাবেই বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহার অনন্ত চৈতন্য চৈতন্য-লেশে পরিণত হইবার কোনই কারণ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার অনন্ত চৈতন্য জড়ে এতদূর নিঃশেষিত হইয়া বর্ত্তমান আছে যে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই উহাকে চৈতন্য শূন্যই বলেন, উহার মধ্যে চৈতন্যের কোনই সন্ধান পান না। তিনি সর্ব্বত্র জড়ে বর্ত্তমান থাকার জন্যই যদি জড়ে চৈতন্য থাকিত, তবে ত অনন্ত চেতন ব্রহ্মের ন্যায়ই জড়ে যে কেবল অনন্ত চৈতন্য বর্ত্তমান থাকিত, তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মের অন্যান্য অনন্ত গুণও জড়ে অনন্ত পরিমাণে—পূর্ণ পরিমাণে দেখা যাইত। কারণ, তিনি তাঁহার অনন্ত গুণ সহ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই অনন্ত এবং নিত্য, তিনি মুহূর্ত্তের তরেও এক বা একাধিক গুণ বিবর্জ্জিত অবস্থায় থাকিতে পারেন না। সুতরাং চৈতন্যের ন্যায় তাঁহার অনন্ত গুণও জড়ে পূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ব্রহ্মের গুণরাশি যথা জ্ঞান, প্রেম সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি জড়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জড়ে চৈতন্যও নাই, যদিও ব্রহ্মে অনন্ত চৈতন্য নিত্য বর্ত্তমান। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিভু, এসম্বন্ধে কাহারও কোনও আপত্তি না থাকিলেও তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপিত্বের জন্যই জড়ের যাহা নিজস্ব স্বভাব তাহার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। তথাপিও যদি বলা হয় যে তাহাও সম্ভব, তবে জড়ের পূর্ণ ব্রহ্মত্বে পরিণত হইতে হয়। অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জড় সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। (৩) তৃতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে দ্বিবিধ সত্ত্বাত্মক কিন্তু বিরুদ্ধ-গুণ-রাশি ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান। অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের অনন্ত ৫ ,২ যে তাঁহার একতম স্বরূপ, ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং অচৈতন্য একটী সত্বাত্মক গুণ। চৈতন্য শূন্যতা বা অচৈতন্যই তাঁহাতে ভাবাত্মক (positive) গুণ ভাবে বর্ত্তমান। ভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃ ঐগুণটীকে এমন একটী শব্দ দ্বারা আমরা প্রকাশ করি, যাহাতে মনে হয় যে অচৈতন্য একটী অভাবাত্মক গুণ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা সত্য নহে। বিপরীত গুণ দেখিলেই একটী ভাবাত্মক ও অপরটী অভাবাত্মক মনে করিতে হইবে না। এস্থলে সুখ এবং অসুখের (দুঃখের) দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উহারা বিরুদ্ধ গুণ, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে উভয়ই সত্বাত্মক গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে নঞ অব্যয়ের একটি অর্থ বিরুদ্ধ। সুতরাং অচৈতন্যের অর্থ চৈতন্যের অভাবাত্মক বিরুদ্ধ গুণ।" আবার Logic-এ দেখা যায় যায় যে অনেক শব্দ আকারে (formএ) অভাবাত্মক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহারা ভাবাত্মক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হাইতে পারে যে Idle শব্দটী আকারে positive (ভাবাত্মক), কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা Negative (অভাবাত্মক), অর্থাৎ উহা absence of activity বুঝায়। আবার unwise এবং unhappy শব্দদ্বয় আকারে Negative (অভাবাত্মক), কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা positive (ভাবাত্মক), যেহেতু উহারা যথাক্রমে Foolish and positive suffering বুঝায়। "(১) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। (২) আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। (৩ শান্তং শিবমদ্বৈতম্। (৪) শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" উক্ত শ্রুতিমন্ত্র সমূহে আমরা নিম্নলিখিত শব্দ চতুষ্টয় দেখিতে পাই। "(১) অনন্তম্ (২) অমৃতম্ (৩) অদ্বৈতম্ (৪) অপাপবিদ্ধম্। (১) অনন্তত্ব শব্দের অর্থ অন্ত শূন্যতা ধরিলে উহাকে আকারে অভাবাত্মক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু যদি উহার অর্থ বিরাটত্ব, ভূমাত্ব, মহত্ত্ব, অত্যন্ত বৃহত্তমত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ধরা যায়, তবে আর উহাকে অভাবাত্মক শব্দ বলা যায় না। স্বামী শঙ্করাচার্য্য অনন্তত্বকে ব্রহ্মের একটী স্বরূপই বলিয়াছেন। সুতরাং উহা অভাবাত্মক হইতে পারে না। (২) অমৃতত্ব শব্দের অর্থ মৃত্যুশূন্যতা। শূন্যতা দেখিলেই যদি শব্দকে অভাবাত্মক বলিতে হয়, তবে আকার বশতঃ

উহাকেও সেই পর্য্যায় ভুক্ত করিতে হয়, কিন্তু এক অর্থে মৃত্যুকেই অভাবাত্মক শব্দ বলা যাইতে পারে। কারণ, মৃত্যুর অর্থ দেহে আত্মার অভাব। অন্য অর্থে দেহের পক্ষে মৃত্যু যেমন সুনিশ্চিত, এমন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মের মৃত্যু নাই। তিনি নিত্যই পূর্ণমমৃতং। সুতরাং ঐ শব্দ আকারে মাত্র অভাবাত্মক। অমৃতত্বের অর্থ যদি নিত্যত্ব করা যায়, অর্থাৎ যাহার কখনও মৃত্যু নাই তাহার ভাব, তবে উহাকে ভাবাত্মক শব্দ বলা যাইতে পারে। 'সুধাকে' যদি অমৃত শব্দের প্রতিশব্দ বলা হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে উহা ভাবাত্মক শব্দ। নিম্নলিখিত সঙ্গীতাংশে বুঝিতে পারা যায় যে সুধা সুতরাং অমৃত ভাবাত্মক শব্দ। কারণ, উহা তাহা না হইলে কখনই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। 'প্রেমসুধা ঢেলে দেও প্রাণে। (প্রেমময়) সঞ্জীবিত মৃত প্রাণ যেই সুধাপানে। (ভক্ত মনমোহন)' (৩) "অদ্বৈতম্" শব্দের অর্থ যদি দ্বিতীয় শূন্যতা বা দ্বিতীয় রাহিত্য ধরা যায়, তবে আকারে উহা অভাবাত্মক শব্দ হয় বটে, কিন্তু উহার অর্থ যদি "এক" ধরা যায় (একমেবাদ্বিতীয়ম্), তবে উহাকে ভাবাত্মক শব্দ বলিতে হইবে। অদ্বৈতত্বকে ইংরেজীতে Monism as opposed to Dualism and Plularism বলা হয়। সুতরাং উহাও ভাবাত্মক শব্দ। (৪) অপাপবিদ্ধতা অর্থে পাপ শূন্যতা মনে করিলে যদি উহাকে অভাবাত্মক শব্দ বলিতে হয়, তবে উহা আকারে তাহাই বটে, কিন্তু যদি উহার অর্থ পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেজঃ, পূর্ণ জ্যোতিঃ ধরা যায় তবে আর উহাকে অভাব পর্য্যায় ভুক্ত করা যায় না। পাপ অন্ধকারবৎ। সুতরাং যে স্থলে পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেজঃ এবং পূর্ণ জ্যোতিঃ নিত্য বর্ত্তমান, সে স্থলে পাপ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং উহাও একটী ভাবাত্মক শব্দ। অতএব শব্দের আকার দর্শনে উহাকে ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক মনে করিলে আমাদের সময় সময় বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।" সত্ত্বগুণ প্রকাশক, কিন্তু তমোগুণ আবরক। উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ। সত্ত্বে তমঃ নাই, আবার তমঃতে সত্ত্ব নাই। কিন্তু উভয়েই যে ভাবাত্মক গুণ, ইহা সর্ব্ববাদি-

সম্মত। উহাদের কোনও একটি যদি অভাবাত্মক গুণ হইত, তবে প্রত্যেক জড় পদার্থে সত্ত্ব ও তমঃ উভয় গুণই একই কালে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। সাংখ্য প্রকৃতির উপাদানও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রধানে সত্ত্বের বর্ত্তমানতার জন্য তমঃ এর অভাব হয় নাই। সুতরাং তমঃ অভাবাত্মক গুণ নহে। জড় জগতে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কিন্তু উহারাও প্রত্যেক পদার্থে ভাবাত্মক ভাবে বর্ত্তমান আছে। আমরা আরও একটি শব্দকে গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে পারি। সেই শব্দটি শুষ্কতা। শুষ্কতার অর্থ রস শূন্যতা, কিন্তু শুষ্কতা একটি ভাবাত্মক শব্দ। আমরা সাধারণতঃ যখন মরুভূমির অথবা ইস্পাতের অথবা পাষাণের শুষ্কতা সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন যে তাহাতে শুষ্কতার ধারণা করি, উহাকে কি কখনও অভাবাত্মক গুণ বলিয়া মনে করি? আপত্তি হইতে পারে যে প্রত্যেক ক্ষিতি পদার্থেই জল (অপ্) বর্ত্তমান। কারণ, পঞ্চীকরণের পর বায়ুতেও রস আছে। সুতরাং উক্ত পদার্থ প্রকৃত ভাবে শুষ্ক নহে। তাহাতেও রসের অংশ আছে। ইহার উত্তরে পাঠককে পঞ্চীকরণের পূর্ব্বে তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। সেই কালে উক্ত তিন পদার্থ সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক ছিল বলিতে হইবে। কারণ, অপের তখনও সৃষ্টি হয় নাই এবং পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণও হয় নাই। অতএব দেখা গেল যে বিশুদ্ধ শুষ্কতাও একটি গুণ। উহার অর্থ রস শূন্যতা হইলেও উহা ভাবাত্মক গুণই বটে। এ বিষয়ের সমালোচনা করিতে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এস্থলে বিচার কালে ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ ধরিয়া আমাদের বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ সেই গুণটীই যে কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণে তাঁহার যে এক একটী স্বরূপ হইয়াছে, সেই স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না। অর্থাৎ কেবল তাঁহার চৈতন্যের বিষয়ই চিন্তা করিতে হইবে, অথবা কেবল তাঁহার অচৈতন্যের বিষয়ই চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, আমাদের বিচার্য্য বিষয় কেবল অচৈতন্য। অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের অনন্ত সংমিশ্রণে যে একত্ব বা স্বরূপ হয়, তাহা

এস্থলে বিচার্য্য নহে। অর্থাৎ অচৈতন্য একটী ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক গুণ, ইহাই কেবল এস্থলে বিচার্য্য। ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপই দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণ দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে তাঁহার এক একটী স্বরূপ গঠিত। এই-রূপ অনন্ত একত্বের একত্বে তিনি নিত্য বিভূষিত। তাঁহার এক একটী স্বরূপ স্থিত দুই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের প্রত্যেক গুণ পৃথক্ ভাবে চিন্তা করিলে উহার একটি গুণ অপর বিরুদ্ধ গুণ হইতে স্বাধীন অর্থাৎ একটী গুণে অপর বিরুদ্ধ গুণ নাই। সুতরাং একটী অপর-বিরুদ্ধ-গুণ-শূন্য বলিতে হইবে। সুখে দুঃখ নাই, আবার দুঃখেও সুখ নাই, ন্যায়ের মধ্যে করুণা নাই, আবার করুণার মধ্যে ন্যায় নাই; জ্ঞানের মধ্যে প্রেম নাই, আবার প্রেমের মধ্যে জ্ঞান নাই,* ধর্ম্মের মধ্যে অধর্ম্ম নাই, আবার অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম নাই, (ক) কোমলত্বের মধ্যে কাঠিন্য নাই, আবার কাঠিন্যের মধ্যে কোমলত্ব নাই। সেইরূপ চৈতন্যে অচৈতন্য নাই, আবার অচৈতন্যেও চৈতন্য নাই। সুতরাং সুখ এবং দুঃখ, করুণা এবং ন্যায়, জ্ঞান এবং প্রেম, কোমলত্ব এবং কাঠিন্য এবং চৈতন্যও যেরূপ ভাবাত্মক গুণ, অচৈতন্যেও সেইরূপ ভাবাত্মক গুণ বলিতে হইবে। একটী গুণে যদি অপর-বিরুদ্ধ গুণ-শূন্যতাই অভাবাত্মকতার একমাত্র কারণ বলিতে হয়, তবে উপরোক্ত গুণগুলি সকলেই অভাবাত্মক বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। দার্শনিকগণ অন্ধকারকে অভাব পদার্থ বলেন। কারণ, আলোকের অভাব হইলেই অন্ধকার উৎপন্ন হয়, আবার আলোকের বর্ত্তমানতায় অন্ধকারের অভাব হয়। যদি অন্ধকার অভাব পদার্থ হয়, তবে বলিতে হইবে যে একই স্থানে একই কালে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই

---

* প্রেমকে অন্ধ বলা হয়। প্রেম রসে পরিপূর্ণ। ইহা কেবল ভক্ত-দিগের উক্তি নহে, যে কোন প্রেমিক ইহা নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অপর দিকে জ্ঞান তেজে, জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। জ্ঞানে রসের ভাব নাই, কিন্তু উহা আলোকে পরিপূর্ণ এবং অন্ধকার নাশ করে।

(ক) ধর্ম্ম অর্থে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অধর্ম্ম অর্থে নিয়ম বিরোধিতা বুঝিতে হইবে।

থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ভাব এবং উহার অভাব পদার্থের ঐরূপ ভাবে অবস্থিতি অসম্ভব। এখন আমরা জীব সম্বন্ধে চিন্তা করি। জীবে চেতন আত্মা ও অচেতন দেহ উভয়ই একই কালে বর্ত্তমান। যদি অচৈতন্য অভাব পদার্থই হইত, তবে জীবে উহার অস্তিত্ব সম্ভবই হইত না। কারণ তাহাতে চৈতন্যময় আত্মা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন। আলোক গৃহে আনীত হইলে যেমন অন্ধকার সম্পূর্ণ রূপে পালাইয়া যায়, দেহে আত্মার প্রবেশ মুহূর্ত্ত হইতে নির্গমন পর্য্যন্ত দেহের অচৈতন্য সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হইত। কিন্তু আমরা দেহকে চৈতন্য শূন্য জড় পদার্থ বলিয়াই জানি এবং উহাতে জড়ের ধর্ম্ম ভিন্ন আত্মার ধর্ম্ম নাই। উহা Organic matter হইলেও উহা জড় বই আর কিছুই নহে। দেহকে কেহ চৈতন্যবান বলেন না, কিন্তু চৈতন্যময় আত্মা দ্বারা উহা চালিত, ইহাই সকলে বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম জড় জগতে ওত-প্রোত ভাবে বর্ত্তমান। জড়ের অচৈতন্য যদি অভাব পদার্থই হইত, তবে অনন্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় অচেতন জড় পদার্থের অচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইত। অর্থাৎ জড় জগতে চৈতন্য ভিন্ন অচেতন কোন পদার্থই থাকিত না। কিন্তু জড়ে যে কোনরূপ চৈতন্য আছে, তাহা আমরা অনুভব করি না এবং আপত্তিকারীও জড়কে পূর্ণ চৈতন্য-বান বলেন না, কিন্তু উহাতে চৈতন্যের লেশমাত্র আছে, ইহাই বলেন। আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে চৈতন্যময় ব্রহ্মের সংসর্গে জড়ে চৈতন্যলেশ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে জড়ে চৈতন্যলেশ উপস্থিত হইবে কেন, পূর্ণ চৈতন্য উপস্থিত হইবে না কেন। গৃহে অত্যুজ্জ্বল আলোক আসিলে উহার সকল অন্ধকার পালায় না কি ? অনন্ত চৈতন্যময় ব্রহ্ম যে স্থানে বর্ত্তমান, সেই জড়ের সকল অচৈতন্য লুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ চৈতন্য বর্ত্তমান থাকিবে না কেন ? অর্থাৎ জড়ে একমাত্র চৈতন্যই পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান থাকিবেন না কেন ? আপত্তিকারীর মতে অচৈতন্য অভাব পদার্থ। এস্থলে উল্লেখ যোগ্য যে মায়াবাদিগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলেন বটে, কিন্তু জড়কে চৈতন্য শূন্যই বলিয়া থাকেন। আপত্তিকারীর পূর্ব্বোক্ত আপত্তির

উত্তরে আরও বলা যাইতে পারে যে অচেতনত্ব যদি অভাবাত্মক গুণই হয় এবং অচেতন পদার্থে যদি চৈতন্য লেশই বর্ত্তমান থাকে, তবে উহাতে পৌনে ষোল আনা অচেতনত্ব আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এত অধিক পরিমাণ অচেতনত্ব উহাতে কোথায় হইতে আসিল? আমরা দেখিয়াছি যে অচৈতন্য অভাবাত্মক গুণও নহে। সুতরাং বলিতে হইবে যে উহা উপাদানে ছিল। চৈতন্যই যদি পরম পিতার একমাত্র স্বরূপ হইত, তবে জড়ে বিন্দুমাত্রও অচৈতন্য আসিতে পারিত না। কারণ, আপত্তিকারীর মতেও উপাদানে যাহা নাই উৎপন্নে তাহা আসিতে পারে না, সুতরাং জড়ে চৈতন্যলেশ না থাকিয়া বরং পূর্ণ চৈতন্যই থাকিত। আপত্তিকারী বলেন যে অচেতনত্ব অভাবাত্মক গুণ। আবার তাহার মতেই দেখা যায় যে জড়ে অচৈতন্যের পরিমাণ অত্যধিক এবং চৈতন্যলেশ মাত্র বর্ত্তমান। যদি তাহাই হয়, তবে জড়ে পৌণে ষোল আনা অচৈতন্য রূপ অভাবাত্মক গুণ আছে, এবং জড়ের ধর্ম্মই সেইরূপ অভাবাত্মক। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে উপাদানে যাহা আছে, উৎপন্নেও তাহা থাকিবে। সুতরাং পরম উপাদান পরমেশ্বরেও অভাবাত্মক গুণ আছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু উহা যে সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব, তাহা তিনিও স্বীকার করেন। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে অচেতনত্ব একটি ভাবাত্মক গুণ। ভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃ এবং আমাদের সংস্কার বশতঃ উহাকে আমরা অভাবাত্মক গুণ বলিয়া থাকি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অনেক শব্দ আকারে অভাবাত্মক হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভাবাত্মক। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জড় চৈতন্য শূন্য এবং উহার অচেতনত্ব একটি ভাবাত্মক গুণ। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে চৈতন্য শূন্য জড় পদার্থ কখনই আত্মা পদবাচ্য হইতে পারে না। একমাত্র আত্মায়ই চৈতন্য নিত্য বর্ত্তমান, জড়ে তাহা নাই বা থাকিতে পারে না। অধিকন্তু আমরা দেখিয়াছি যে জড় চির বিকৃত। উহাতে চৈতন্য ভিন্ন আত্মার অন্যান্য গুণ, যথা—প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা

প্রভৃতি গুণের একান্ত অভাব। উহা পরমাত্মার অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপও নহে, কিন্তু একটী স্বরূপের অবলম্বনে কারুকার্য্য বা নামরূপ মাত্র। অতএব জড়কে যুক্তিযুক্ত ভাবে আত্মা বলিতে পারা যায় না। জড় যে আত্মা হইতে পারেনা, সেই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা ক্রমশঃ বর্ত্তমান অধ্যায়ে দেখিতে পাইব। আমরা প্রথম অধ্যায়েও দেখিয়াছি যে জড় কখনও আত্মা নহে এবং তাহা হইতেও পারে না।

ওঁং দেহাত্ম-ভেদ দাতারং অনন্ত-চৈতন্যময়ং ওঁং

ওঁ

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে,
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে।
এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে।
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা
জাগে।। (রবীন্দ্রনাথ)

প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন

পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সমস্তই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেকটী ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল পদার্থের সত্তায় ব্রহ্মসত্তা প্রতীয়মান হয়। মনে কর, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় একটি নদী দর্শন করিতেছ। নদী পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছ, এখনও সেইরূপ দেখিবে, অধিকন্তু প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্ম উহাতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। সুতরাং অন্তরেও যেমন ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে, বাহিরেও তদ্রূপ ব্রহ্ম দর্শন হওয়াতে তোমার মুক্তিলাভ হইল, ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলা যায়।" নদী অর্থাৎ নদীর জড় দেহ যদি আত্মাই হইত অর্থাৎ জড় যদি আত্মাই হইত, তবে পরব্রহ্মকে দর্শন করিবার সময় নদীকেও ব্রহ্ম বলিয়া দেখা যাইত, অর্থাৎ নদীকে পৃথক্ ভাবে দেখা যাইত না। কারণ, আত্মায় আত্মায় কোনই বিভেদ নাই এবং দ্রষ্টা তখন মোহমুক্ত তন্ময়। পরব্রহ্ম অখণ্ড আত্মা, সুতরাং নদীকে পৃথক্ ভাবে দেখিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে জড় আত্মা নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন অখণ্ড, তখন জড় জগৎ তাঁহা হইতে কিরূপে পৃথক্ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এবং তদ্ভিন্ন অপর একটী জড় জগৎ কি প্রকারে একই কালে অবস্থিতি করিতে পারে। এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ—জড় বলিতে আমরা পঞ্চ মহাভূত এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন জগৎ বুঝি। ইহাদের মধ্যে আদিভূত অর্থাৎ ব্যোম প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এমন দেশ নাই যেখানে ব্যোম নাই। অর্থাৎ ব্যোমের অভাব কোথায়ও হইতে পারে না। পাঠক মনে রাখিবেন যে ব্যোমই জড জগতের আদি। ব্যোম জড় পদার্থ হইয়াও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাববশতঃ যখন সমগ্র জড় জগতের সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তখন যিনি স্বয়ং কোন জড় পদার্থ নহেন এবং যিনি ব্যোম হইতেও অনন্ত গুণে সূক্ষ্মতর এবং ব্যোমেরও উপাদান কারণ, সেই অনন্ত শক্তিমান বিভু যে জড় জগতের সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন, অথচ তাহাতে তাঁহার খণ্ডিত হইতে হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? জড় জগতে স্থানাবরোধকতার শক্তির কথা প্রশ্ন কর্ত্তার মনে পড়ে বলিয়া এবং জড় ও উহার ধর্ম্ম ভিন্ন সাধারণের চিন্তা করিবার শক্তি নাই বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হয়। পরমপিতা যে জড় পদার্থ নহেন এবং দেশ কালে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও উহাদের অতীত, একথা তিনি ভুলিয়া যান। এস্থলে শ্রুতি হইতে আমাদের মত সমর্থক তিনটী মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ২/১৭)।" "বঙ্গানুবাদ :— যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদায় জগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি। (তত্ত্বভূষণ)।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। (কঠোপ-নিষদ্ ৩।১২)।" "বঙ্গানুবাদ :—এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা

দর্শন করেন। (তত্ত্বভূষণ)" "তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ (কঠোপনিষদ্ ২।১২)।" "বঙ্গানুবাদ :—সেই দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ যাঁহাকে সহজে দেখা যায় না, গূঢ়, প্রতি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান মাত্র গ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত. পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্ম যোগ ঘটিত জ্ঞান দ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ শোকের অতীত হন। (তত্ত্বভূষণ)।" উপরোক্ত মন্ত্রত্রয়ে পরমাত্মা যে গূঢ় রূপে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, তাহাই কেবল বলা হয় নাই। কিন্তু তিনি সাধারণের নিকট জড় পদার্থের ন্যায় প্রকাশিত নহেন, কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞই তাঁহার দিব্য জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, এই কথাও বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত পরমর্ষি গুরুনাথের উক্তি এবং এই মন্ত্রত্রয় যেমন সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছে, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সাধক হৃদয়ে কেমন অপূর্ব্ব ভাবে একই সত্য প্রকাশিত হয়, তাহার এই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই যে জড় জগৎ পরমপিতার অনন্ত স্বরূপের একটি মাত্র স্বরূপের পরিণামে তাঁহারই ইচ্ছায় রচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "ইচ্ছাশক্তি" ও "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। কঠিন পদার্থকে বায়বীয় পদার্থে লয় করা যায়। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। সৃষ্টির ক্রম প্রণালী স্বীকার করিলে বায়ুকেও ব্যোমে পরিণমন করা যায়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ সকল পদার্থ (কঠিন হইতে বায়বীয় পদার্থ) ব্যোমে লয় করা যায়। আবার সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ব্যোমই জড় জগতের আদি। ব্যোম পরম পিতার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছা সহযোগে উৎপন্ন ও মহাপ্রলয় কালে সমস্ত জগৎ বিপরীত ক্রমে পরম পিতার সেই স্বরূপেই লয় প্রাপ্ত হইবে। আবার আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্যোম জড় জগতে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছে। অব্যক্ত স্বরূপ অবশ্যই ব্যোম হইতেও অত্যন্ত ভাবে সূক্ষ্মতর। কারণ, উঁহা ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ, সুতরাং স্বভাবতঃই সূক্ষ্মতম এবং ব্যোম

হইতে কখনই স্থূলতর হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যোম যখন সেই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপ যখন ব্যোমের উৎপাদক, তখন উহা ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর না হইয়াই পারে না। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত।* অতএব জড় জগতের সার সেই অব্যক্ত স্বরূপ যে সম্পূর্ণ জড় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। ব্রহ্মের সেই স্বরূপটী তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং তিনি অখণ্ড হইয়াও সমগ্র জড় জগৎ ব্যাপিয়াই রহিয়াছেন। অতএব জড় জগৎকে পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করিয়াও ব্রহ্মকে অখণ্ড বলিতে এবং তিনি যে সর্ব্বব্যাপী বিভু ইহা ধারণা করিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না ** এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯।৪ এবং ১০।৪২ শ্লোকদ্বয় পাঠক দেখিবেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সমগ্র জড় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং তাঁহার একাংশে অর্থাৎ একটী মাত্র স্বরূপে জগৎ স্থিত। এই সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের ৯।৫ ও ৯।৬ শ্লোকদ্বয়ও দ্রষ্টব্য। আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে জড় জগতের সৃষ্টির উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ এবং নিমিত্ত কারণ তাঁহারই ইচ্ছা-শক্তি। সেই অনন্ত শক্তিশালিনী ইচ্ছার জন্যই অব্যক্ত স্বরূপ নানা

* পরমর্ষি গুরুনাথ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক স্থূল পদার্থ-তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী সূক্ষ্ম পদার্থে লীন হয়। এই নিয়মানুসারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, কালে সেই সূক্ষ্মতমে সকলেরই লয় হইতে পারে। আর ঐ সূক্ষ্মতম যিনি, তিনিই জগতের আদি কারণ। অতএব জগতের আদি কারণ এক ভিন্ন একাধিক হইতে পারে না। কারণ একাধিক কল্পিত হইলে, যিনি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, তাঁহাতেই অপরের লয় হইবে। যদি বলেন উভয়েই তুল্য সূক্ষ্ম, তাহা হইলে প্রথম দোষ এই যে, যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ একে লীন হইতেছে, তখন যে, শেষ লয় স্থান একই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা স্বীকার না করিলে এই ক্রমপূর্ণ জগতে অক্রমতা দোষ কল্পনা করিয়া হাস্যাস্পদ্ হইতে হয়। দ্বিতীয় দোষ এই যে যখন একটী সূক্ষ্মতমের স্বীকারেই কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে, তখন প্রমাণ ব্যতিরেকে একাধিকের কল্পনা করা অসঙ্গত।" (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা).

** আমরা বহুবার পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। সেই সকল স্থলে 'পৃথক্' অর্থে বিভক্ত ভাবে বিভিন্ন নহে, কিন্তু উহার অর্থ Distinct.

নামরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই নিত্য সত্য, কিন্তু মৃন্ময়ী মূর্ত্তির নামরূপের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছা জনিত যে রূপ গুণ জড় জগতে আমরা দেখিতেছি, তাহা আপেক্ষিক ভাবে সত্য। অর্থাৎ পরমপিতার উক্ত ইচ্ছার মুহূর্ত্ত হইতে উহার সংহরণ পর্য্যন্ত উহাদের (নামরূপের) অস্তিত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহাদের অস্তিত্ব, নতুবা উহারা কখনই নিত্য নহে। অর্থাং অনন্ত ও নিত্য সত্য স্বরূপ পরম পিতার প্রেমময়ী ইচ্ছার উপর জড় জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সেই সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনেই জড় জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি করিতেছেন। সুতরাং জড় জগতের অস্তিত্ব তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ জড় জগং উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দ্বারা উংপন্ন এবং তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। আবার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মেরই একটী স্বরূপ ও একটী শক্তি, সুতরাং জড় জগৎ ব্রহ্মেরই উপর সম্পুর্ণ রূপে নির্ভর করে। সুতরাং যাহা নিত্য সত্য নহে, তাহা অনাদি অনন্ত হইতে পারে না. কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে। এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে জড় জগৎ যখন ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং উঁহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত, তখন জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জড় জগৎ ব্রহ্মের একটী মাত্র স্বরূপ হইতে উৎপন্ন। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে এই বিশ্ব রচিত। আবার পরম পিতার ইচ্ছায় উঁহা (অব্যক্ত স্বরূপ) নানা নামরূপ সম্বলিত জগৎ রূপে ভাসমান হইয়াছেন। জড় জগং বলিতে কেবল অব্যক্ত স্বরূপই বুঝিতে হইবে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই অব্যক্ত স্বরূপ যাহা পরমপিতার ইচ্ছায় নানা নামরূপে ভাসমান হইয়াছেন, তাহাই জড় জগৎ। অর্থাৎ পরম পিতার ইচ্ছায় নানা শোভা সৌন্দর্য্যে সুশোভন এবং কারুকার্য্য খচিত তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপই জড় জগৎ। দুই প্রকারের এক একখানি

কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণালঙ্কারের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে হার কখনও বলয় নহে এবং বলয় কখনও হার নহে, যদিও উভয়ের মূলে স্বর্ণই একমাত্র পদার্থ বর্ত্তমান। স্বর্ণ হিসাবে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও নিজ নিজ কারুকার্য্য হিসাবে যে উহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।* আবার তুল্য মূল্যের এবং তুল্য পরিমাণের স্বর্ণখণ্ডের সহিত যদি উক্ত অলঙ্কারদ্বয়ের তুলনা করা যায়, তবুও আমরা পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। অব্যক্ত স্বরূপ স্বর্ণ স্বরূপ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জড় জগৎ রচিত হইয়াছে এবং অলঙ্কারের কারুকার্য্যই জড় জগতের নামরূপ স্থানীয়। কেহ কেহ নামরূপকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন, কিন্তু তাহা অবহেলার বস্তু নহে। কারণ, কেহই স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য বাদ দিয়া উহাকে কেবল স্বর্ণ ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। যদি তাহা পারিতেন, তবে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের বিভিন্নতা লোপ পাইত। অতি স্থূল ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য্য সম্বলিত স্বর্ণালঙ্কারের মূল্যের পার্থক্য অত্যধিক। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে জাগতিক নামরূপের পশ্চাতে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ চির বর্ত্তমান। অব্যক্ত স্বরূপ বাদ দিলে নামরূপ দাঁড়াইতে পারে না, যেমন স্বর্ণ বাদ দিয়া কারুকার্য্য দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং নাম-রূপ তুচ্ছ পদার্থ নহে। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি এবং স্বর্ণালঙ্কার শব্দদ্বয় লোক প্রসিদ্ধ। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে যদি মৃত্তিকায় এবং স্বর্ণলঙ্কারকে যদি স্বর্ণে লয় করা যায়, তবে আর উহারা মূর্ত্তি বা অলঙ্কার পদবাচ্য থাকে না। মৃন্ময়ী মূর্ত্তির অর্থ মৃৎ (মৃত্তিকা) দ্বারা গঠিত মূর্ত্তি। সেইরূপ স্বর্ণা-লঙ্কারের অর্থ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত অলঙ্কার। উহারা কেবল মৃত্তিকা বা

---

* আচার্য্য শংকর বেদান্ত দর্শনের ৪।১।৪ সূত্রের ভাষ্যে ইহাই বলিয়াছেন। "যাহা রুচক, তাহাই স্বস্তিক (রুচক ও স্বস্তিক পূর্ব্বকালের অলঙ্কার বিশেষ। এরূপ ঐক্য নাই। তবে কিনা সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে (এও সুবর্ণ ও সেও সুবর্ণ এই ভাবে ঐক্য আছে।) অতএব সুবর্ণত্ব প্রকারে অভেদ থাকিলেও তদ্দ্বয়ের (স্বস্তিক ও রুচকের) যথেষ্ঠ বিশেষ (প্রভেদ) আছে। (কালী-বর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ)।

স্বর্ণ নহে। বস্তুতঃও উহাদিগকে ঐরূপ ভাবে অর্থাৎ মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ ভাবে নির্দ্দেশ করিলে পদার্থদ্বয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হয় না, পাক্ষিক বর্ণনা করা হয় মাত্র। যদিও মৃন্ময়ী মূর্ত্তির এবং স্বর্ণালঙ্কারের সর্ব্বত্রই যথাক্রমে মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান, কোথায়ও উহাদের অভাব নাই, এবং মূর্ত্তি ও অলঙ্কারের নামরূপ উহাদের (মৃত্তিকা এবং স্বর্ণের) অবলম্বনেই রচিত, তথাপি উভয় পদার্থে কারু-কার্য্য অর্থাৎ মূর্ত্তিত্ব এবং অলঙ্কারত্ব মৃত্তিকা এবং স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়াই পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ জড় জগৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত এবং তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উঁহাতেই (অব্যক্ত স্বরূপেই) সুরচিত নানা কারুকার্য্য সমূহ। উহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র অব্যক্ত স্বরূপ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তথাপিও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি এবং স্বর্ণালঙ্কারের ন্যায় মৃত্তিকা ও স্বর্ণ খচিত কারুকার্য্য সমূহের ন্যায় অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে গঠিত নামরূপময়ী জড় জগৎ পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান বলা যাইতে পারে। সুধী পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন যে এই পার্থক্যের অর্থ বিভাগ (Division বা Separation) নহে, কিন্তু প্রভেদ (Distinction) মাত্র। এস্থলেও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ও স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ হইতে বিভক্ত না হইয়াও পৃথক্ ভাবে প্রকাশমান, জাগতিক নামরূপও ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে বিভক্ত না হইয়াও পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হয়। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে এবং স্বর্ণালঙ্কারকে যেমন কেবল মৃত্তিকা বা স্বর্ণ বলা যায় না অথবা উপর খোদিত কেবল কারুকার্য্য সমূহকেও মূর্ত্তি বা অলঙ্কার বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উভয় দ্বারা রচিত পদার্থকেই আমরা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বা স্বর্ণালঙ্কার বলিয়া থাকি, সেইরূপ কেবল অব্যক্ত স্বরূপকেই জড় জগৎ বলা যাইতে পারে না, অথবা কেবল নামরূপকেও জগৎ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উভয় দ্বারা গঠিত পদার্থকেই জগৎ বলা যাইতে পারে।* স্থূল ভাবে বলিতে গেলে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ

* এই স্থলে বিষয়টী আরও সরল করিতে হইলে বলিতে হয় যে স্বর্ণা-লঙ্কারের কারুকার্য্য যেমন স্বর্ণ ভিন্ন অবস্থান করিতে পারে না, স্বর্ণ যেমন

হইবে যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড় জগৎ যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা মহাদার্শনিক Kant কথিত Phenomena এবং ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই Noumenon. Phenomenon এবং Noumenon শব্দ দ্বয়ের অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। Phenomenon—An appearance: the appearance which anything makes to our consciousness as distinguished from what it is in itself Noumenon—An unknown and unknowable substance or thing as it is in itself—opposite to phenomena or the form through which it becomes known to the senses or the understanding. (Chambers). Noumenon-কে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (unknown and unknowable)—এই জন্যই বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গ্রাহ্য নহেন। ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন অনেকে সন্দিহান, তখন ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর অব্যক্ত স্বরূপ যে সাধারণের ধারণাতীত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। স্থূল, জড় ভাবে জর্জ্জরিত অবস্থায় কেহই ব্রহ্মের কোনও স্বরূপের সত্তা ধারণা করিতে পারে না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশ দ্রষ্টব্য। অতএব দেখা গেল যে অনন্ত গুণময় ও অনন্ত জ্ঞানময় পরম শিল্পী তাঁহারই আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহারই অনন্ত গুণের ভাবরাশি তাঁহারই অনন্ত শক্তিময়ী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহারই একতম স্বরূপ অব্যক্ত স্বরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সম্পর্কে "ইচ্ছা শক্তি" অংশ দ্রষ্টব্য। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ দ্বারা প্রকৃতিতে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কেবল নামরূপ মাত্র এবং উহাদিগকেই আমরা সাধারণতঃ জগৎ বলি। তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ

কারুকার্য্যের ভিতর ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, জাগতিক কারুকার্য্যও সেইরূপ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না। অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপও জাগতিক নামরূপকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছেন। সুতরাং কারুকার্য্য সম্বলিত ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকেই জড় জগৎ বলা যাইতে পারে। সুতরাং জড় জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ ভাবে ভাসমান বলিতে হইবে

তাঁহারই কারুকার্য্য সমূহ ব্যাপিয়া ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। উঁহাই Noumenon. আমরা জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহা পরম শিল্পীর শিল্প নৈপুন্য বই আর কিছুই নহে। মৃন্ময়ী মূর্ত্তির যেমন মৃত্তিকাই পারমার্থিক সত্য, কিন্তু শিল্পীর ইচ্ছা জনিত কারুকার্য্যের নিত্য সত্তা নাই, সেইরূপ অব্যক্ত স্বরূপই নিত্য সত্য, কিন্তু জড় জগৎ বলিয়া যাহা সাধারণের নিকট পরিচিত, অর্থাৎ নামরূপ, তাহারও নিত্য সত্তা নাই। সাধারণে যাহাকে জড় জগৎ বলে, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে The universe is **artificial but not natural.** অর্থাৎ পরম শিল্পীর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে রচিত নামরূপ চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু নিত্য স্থায়ী নহে, অর্থাৎ জাগতিক নামরূপ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপে ছিল না বা এককালে থাকিবে না, কিন্তু তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহারই একতম স্বরূপ, সুতরাং উহা নিত্য, অনাদি অনন্ত। কত শত শত কবি প্রকৃতিতে মহা শিল্পীর শিল্প কৌশল দর্শন করিয়া পরম সুন্দরের অপার সৌন্দর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাসের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়লাভে মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম দেশের সুমধুর ভাবরাশি জগতে প্রকাশ করিয়া নিজেরা ধন্য হইলেন এবং জগৎকে ধন্য করিলেন ; কত শত শত ভক্ত প্রকৃতির লীলা দর্শনে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলারই সন্ধান পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং ক্রমশঃই প্রেমানন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন, কত শত জ্ঞানী প্রকৃতির কারুকার্য্যের অন্তরালে অনন্ত জ্ঞানময়ের অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন ; আবার কত শত জ্ঞানী অনন্ত জ্ঞানময় যে প্রকৃতির পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, মর্ম্মে মর্ম্মে সুগভীর ভাবে—সুস্পষ্ট ভাবে, অসংখ্য ভাবে আত্ম পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ধারণা করিয়া অনন্ত আনন্দ নীরধি নীরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাহা কে ইয়ত্তা করিবে ? প্রেমলীলাময় স্রষ্টা তাঁহারই স্বহস্ত রচিত প্রকৃতি দেবীকে কতই সুন্দর কতই মধুর, কতই মনোহর সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা কে বর্ণনা করিবে ? কিন্তু হায় ! তিনি যে নিত্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়,

তিনি যে অনন্ত ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, তাঁহার সেই সত্য পরিচয় প্রকৃতি হইতে লাভ করিবার যত্ন না করিয়া আমরা কেবল মোহমুগ্ধ ভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করিতেছি এবং প্রকৃতির বিকৃতি লইয়াই জীবন যাপন করিতেছি। তিনি যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," তিনি যে 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি", তিনি যে "সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং" তাহা যে মহাপ্রকৃতি গ্রন্থ হইতেই আমরা অভ্রান্ত ভাবে জানিতে পারি, তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়াই আছি। হে পরম করুণাময় পরমপিতা, তুমি কবে আমাদের এই মোহ আবরণ উন্মোচন করিবে, কবে জগতের সেই শুভদিন আসিবে, যে দিন প্রকৃতিতে তোমাকে প্রকৃতি নাথ ভাবে দর্শন করিয়া জগতের নর নারী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে? পিতঃ! তোমার অপার দয়াগুণে জগতে সেই শুভদিন শীঘ্র শীঘ্র আনয়ন করিয়া জগৎকে সর্ব্বপ্রকার জাল জঞ্জাল হইতে মুক্তি দান কর, অধঃপতিত জগৎকে তুমি নিজ হস্তে শীঘ্র উত্তোলন কর, বিপথগামী জগৎকে সৎপথে একমাত্র সত্য পথে পরিচালনা কর। তোমারি প্রেমের, তোমারি দয়ার জয় হউক্। জগতের নর নারী উন্মুক্ত হৃদয়ে সত্য ভাবে তোমারি বিজয় গান গাহিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হউক্। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে নানা নামরূপে বিকৃত এবং অনন্ত অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মের তুলনায় অতীব ক্ষুদ্র জগৎ অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির নিত্য আধার পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিলে বিশেষ কোন ত্রুটী হয় না। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জড় জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। কারণ, তাঁহার হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন অন্য কিছু কোথায় নাই বা থাকিতে পারে না। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। জীব এবং জগৎ তাঁহারই অন্তর্গত। পার্থক্যের অর্থ যে বিভাগ নহে, কিন্তু Distinction, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এখন একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে আরও সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা একটি অতি বৃহৎ বৃত্তের কল্পনা করি এবং উহার মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কন করি। আবার এই শেষোক্ত (অতি ক্ষুদ্র) বৃত্তটীকে অবলম্বন করিয়া উহার দ্বারাই একটি অতি ক্ষুদ্র

সুশোভন পদ্ম রচিত হউক্। পদ্মটী বৃহত্তর বৃত্তের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্গত এবং বৃত্তের মধ্যস্থ অতিক্ষুদ্র দেশ অবলম্বনে অঙ্কিত ও অবস্থিত এবং সেই দেশটুকু ব্যতীত উহার অস্তিত্ব অসম্ভব বটে, কিন্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট পদ্মটীকে আমরা বৃহত্তর বৃত্ত হইতে পৃথক্ বলিয়াই ধারণা করি, যদিও উহা (পদ্মটী) বৃহত্তর বৃত্তের সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্গত বই বিভিন্ন নহে। এই বৃহত্তর বৃত্তটীই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ স্থানীয়। উঁহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সুতরাং উঁহা তাঁহাতে অবিচ্ছিন্ন ভাবেই নিত্য বর্ত্তমান। পদ্মটি বিশ্ব স্থানীয়। উহা সেই অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে রচিত এবং উঁহাতেই স্থিত। সুতরাং উহা অনন্ত অব ক্ত স্বরূপের অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ ও অংশ ভাবে ভাসমান, আবার অব্যক্ত স্বরূপ যখন ব্রহ্মে নিত্য ও অনন্ত ভাবে অবস্থিত, তখন বিশ্বও ব্রহ্মের অন্তর্গত ভাবে অবস্থিত। বৃত্ত মধ্যস্থ পদ্মটী যেমন উহার অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ ভাবে পরিচিত, বিশ্বও তেমনি বিশ্বেশ্বর পর-ব্রহ্মের সুম্পূর্ণরূপে অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ ভাবে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম জড় জগতে অবস্থিত, অথচ জড় জগৎ হইতে পৃথক্ এবং জড় জগতে অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া জড় জগৎ নিয়মিত করিতেছেন। আবার এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে পরমেশ্বর এই জড় জগৎ হইতে "নির্লিপ্ত ভাবে বিভিন্ন আছেন।" কারণ, তিনি বিকৃত ভাবের সহিত একান্ত ভাবে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। নির্লিপ্ততার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল পদ্ম পত্রে জল। পদ্মপত্রে জল থাকে বটে, কিন্তু পদ্মপত্র জলের সহিত লিপ্ত হয় না। অর্থাৎ পদ্মপত্রে জল থাকা আর না থাকা পদ্ম পত্রের পক্ষে একই কথা। অর্থাৎ পদ্ম পত্রে জল থাকিলে পদ্ম পত্রের কিছুই আসিয়া যায় না। শ্রীমদ্ভবদ্গী-তার "ন মাং কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্লোক পাঠক এই সম্পর্কে দেখিবেন (ক)। উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমরা অনায়াসেই ব্রহ্মকে এক-

(ক) "সৃষ্টির সূচনা" অংশে ২১ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক ও উহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে পরম পিতার নির্লিপ্ততার তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

মেবাদ্বিতীয়ম্‌ বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। কারণ, জীবাত্মা সমূহ যে স্বরূপতঃ পরমাত্মাই এবং অবিচ্যুত হইয়াও বিচ্যুত ভাবে অংশ ভাবে ভাসমান, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অর্থাৎ আত্মা একই, কখনই দুই বা বহু নহেন। বাকী থাকিল জড় জগৎ। উহার সম্বন্ধেও দেখিলাম যে উহা অব্যক্ত স্বরূপের কারুকার্য্য খচিত ভাবে ভাসমান অংশ মাত্র। ব্রহ্ম যেমন তাঁহার হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন দেহ-যোগে অখণ্ড থাকিয়াও অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, তাঁহার অনন্ত অব্যক্ত স্বরূপও সেইরূপ পরমপিতার ইচ্ছায় স্বোৎপন্ন জড় জগৎ দ্বারা অখণ্ড থাকিয়াও অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ। উঁহাব অংশ বা খণ্ড হইতে পারে না। উঁহা জড় জগৎ ভাবে, অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। অতএব দাঁড়াইল এই যে অনন্ত ব্রহ্মের একটি মাত্র স্বরূপের অবলম্বনে জড় জগৎ রচিত হইয়াছে। আবার আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে সেই অংশটুকুও অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপ পরমপিতার ইচ্ছায় জড় জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন বটেন, কিন্তু উঁহা স্বয়ং অবিকৃতই আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিলাম যে জাগতিক কারুকার্য্যও অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে রচিত। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বে কিছুই নাই, এই মহাসিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি। তিনিই সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা ভাবে জীবাত্মা ও জড় জগৎ ভাবে ভাসমান। এস্থলে ইহা অবশ্যই পুনরায় বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের পরিণতিতে জড় জগৎ উৎপন্ন। যদি বলেন যে অব্যক্ত স্বরূপের উপর অঙ্কিত কারুকার্য্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, তবে বলিতে হইবে, ইহার উত্তর পূর্ব্বেই বিস্তারিত

গীতায় নির্লিপ্ততার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান। অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মে সেই আদর্শের নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। "মায়াবাদ" অংশেও এই বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান। এস্থলে নিম্নোদ্ধৃত গীতোক্ত শ্লোকটীও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ (৯।৪)

উক্ত অধ্যায়ের ৯।৫ ও ৯।৬ শ্লোকও এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। স্থূল, জীবাত্মা ও জড় জগৎ পৃথক্ ভাবে ভাসমান মাত্র, এই তত্ত্ব হৃদ্গত হইলেই ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন হয় না। আমরা যদি আরও একটু অগ্রসর হই, তবে দেখিতে পাইব যে দুইটি বস্তু যথা—আত্মা ও জড় ভিন্ন কিছুই নাই। যদি জীবের কথা উল্লেখ করেন, তবে বলিব যে জীব আর কিছুই নহে, কেবল আত্মার সহিত জড় দেহ যোগে জীবের উৎপত্তি। জীবের ত্রিবিধ জড় দেহ বিদূরিত হউক্ আত্মা তখনই তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ রূপে মিলিত হইবেন বা তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবেন। আবার জড় সম্বন্ধে দেখিলাম যে উহা অব্যক্ত স্বরূপ এবং উঁহার অবলম্বনে উঁহার উপর কারুকার্য্য। এস্থলেও দেখিতে পাই যে এই কারুকার্য্য সমূহ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না এবং মহা-প্রলয়ান্তে উহারা থাকিবে না, কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপ থাকিবেন। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ, সুতরাং দাঁড়াইল এই যে আত্মাই একমাত্র নিত্য সত্য এবং তাঁহারই একটী বিন্দুর অবলম্বনে তাঁহা দ্বারাই তাঁহারই ইচ্ছায় কারুকার্য্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং সেই কারুকার্য্য সমূহ আপেক্ষিক ভাবে সত্য, কিন্তু নিত্য সত্য নহে। উহারা ব্রহ্মের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং একান্ত ভাবে তাঁহারই অন্তর্গত ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্ম যে একমেবাদ্বিতীয়ম এই পরম সত্য ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন নহে। মানব দেহের কোন একটি স্থলের চর্ম্ম যদি দেহীর ইচ্ছায় চর্ম্ম ভাবে রাখিয়াও অন্য আকারে পরিণত করা হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তিত আকার মানব দেহেরই একান্ত অন্তর্গত, কিন্তু উহাতে পৃথক্ ভাবে ভাসমান মাত্র। সেইরূপ জড় জগৎ ব্রহ্মের একটি মাত্র স্বরূপের পরিণতিতে উৎপন্ন অর্থাৎ অনন্ত গুণ নিধান ব্রহ্মের একটি স্বরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় একটি অতি অপূর্ব্ব সুন্দর ও সুশোভন পদ্ম ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং উহা ব্রহ্মের একান্ত ভাবে অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। দেহও যেমন উক্ত পরিণতিতে এক ও অখণ্ড রহিয়াছে, ব্রহ্মও সেইরূপ এক ও অখণ্ডই আছেন। যাহা আমরা কৃত্রিম দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি,

তাহা একটী নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। মাতৃ জাতির দেহে বাল্যকালে স্তন থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে বক্ষঃস্থলে চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চর্ম্ম দ্বারাই পরমপিতার ইচ্ছায় মাতৃস্তন প্রস্তুত হয়। উদ্দেশ্য এই যে সন্তান মাতৃস্তন্য সুধা পান করিয়া পুষ্ট হইবে। এই স্তন যেমন জন্মাবধি মাতৃদেহে থাকে না, কিন্তু যথোপযুক্ত কালে পরমপিতার ইচ্ছায় দেহের চর্ম্মাবলম্বনে উৎপন্ন ও স্থিত হয় এবং উহা যেমন দেহের অন্তর্গত থাকিয়াও পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জড় জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের একটী স্বরূপের অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্ট এবং অব্যক্ত স্বরূপের সুতরাং ব্রহ্মেরই একান্ত ভাবে অন্তর্গত থাকিয়াও পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং জগতের পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্ব সত্ত্বেও ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুন্নই থাকে। মাতৃদেহে স্তন উৎপন্ন হইলে উহা এবং উহাতে স্থিত স্তন যেমন সম্পূর্ণ রূপে বিভক্ত বস্তুদ্বয় ভাবে থাকে না, কিন্তু মাতৃদেহ আমরণ কাল এক অখণ্ডই থাকে, সেইরূপ অব্যক্ত গুণের অবলম্বনে জড় জগতের উৎপত্তি এবং উহাতেই স্থিতি হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম বা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ বিভক্ত হন নাই, কিন্তু নিত্যই এক অখণ্ডই আছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে মাতৃস্তনের চর্ম্মই একমাত্র উপাদান নহে, কিন্তু উহাতে রক্ত মাংস প্রভৃতি একাধিক পদার্থ আছে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে জড় জগতের উপাদানে অব্যক্ত স্বরূপ ভিন্ন ও পরমপিতার ইচ্ছায় তাঁহারই অন্যান্য গুণের আভাস দ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ ও উঁহার শক্তির অবলম্বনে যেমন বহু পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এস্থলেও চর্ম্মকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া শরীরের অন্যান্য পদার্থ সহযোগে মাতৃস্তন প্রস্তুত হইয়াছে। চর্ম্মকেই মাতৃস্তনের প্রধান অবলম্বন বলিবার কারণ এই যে অতিবৃদ্ধকালে মাতৃস্তন কেবল চর্ম্মেই পরিণত হয়, উহাতে অন্যান্য পদার্থ (মাংস প্রভৃতি) অত্যল্প থাকে। কাহারও কাহারও পক্ষে অতি বৃদ্ধবয়সে মাতৃস্তন প্রায় বালিকার স্তন চিহ্ন অবস্থায় পরিণত হয়। সেইরূপ ধারণাতীত কালে অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে জড় পদার্থ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষে একেবারেই লয় প্রাপ্ত হইবে। প্রোক্ত

বিস্তারিত আলোচনায় আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে জড় জগৎ এক অর্থে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বটে, আবার উহা তাঁহারই একান্ত অন্তর্গত। অর্থাৎ জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন না হইয়াও পৃথক্ (Distinct) ভাবে ভাসমান মাত্র। জীব জগতেও আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত না হইয়াও বিচ্যুত ভাবে ভাসমান মাত্র। এস্থলেও আমরা তাহাই দেখিতে পাইলাম। আবার "অব্যক্তের পরিণাম" এ দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের পরিণাম হইয়াও উঁহা অবিকৃতই আছে। উভয়ত্রই সেই একই বিধান একই ভাবে কার্য্য করিতেছে। এক স্থলে ব্রহ্মই স্বয়ং এবং অন্য স্থলে তাঁহারই একটী স্বরূপ অখণ্ড থাকিয়াও পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অর্থাৎ প্রেমলীলাময়ের প্রেমের অপূর্ব্ব বিধান সর্ব্বত্র—জীব ও জড় জগতে—সমভাবে কার্য্য করিতেছে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে এই অংশের সহিত "অব্যক্ত কি" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এই অংশত্রয় অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। সুতরাং অব্যক্ত, অব্যক্তের পরিণাম এবং উঁহাদের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে হইলে সমস্ত বিষয়টী বিশেষ ভাবে জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে আমরা প্রোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় বুঝিতে পারিলাম যে জড় ও আত্মা সম্পূর্ণ রূপে এক নহে। ধন্য পরম প্রেমময় পরমপিতা! ধন্য অনন্ত জ্ঞানময় বিশ্বকর্ম্মা! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব বিধান! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল! ধন্য তোমার সুমহতী ইচ্ছাশক্তি! উঁহা দ্বারা যে কত বিবিধ বিধানে জগৎ রচনা করিয়াছ, কে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবে? কে সেই প্রকৃতি দেবীর অসীম সৌন্দর্য্য, অপার মাধুর্য্য ও অশেষ জ্ঞানোন্মেষকারিণী রচনা পারিপাট্য যথাযথ বর্ণনা করিতে সমর্থ? ধন্য জ্ঞান-প্রেমময় পিতা! তুমি যে এই প্রকৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিরাজমান আছ। তুমিই ধন্য! তোমারই জ্ঞান-প্রেমময়ী লীলা ধন্যা! তোমার প্রেম লীলার্থ রচিতা প্রকৃতিদেবী ধন্যা! আমরা যাহারা তোমারই—একমাত্র তোমারই প্রেমময়ী ইচ্ছায় তোমারই প্রেমলীলা সন্দর্শনার্থ

তোমারই জগতে আসিয়াছি—আমরাও ধন্য। হে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম! হে শান্তং শিবমদ্বৈতং! হে অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ ওঁং! তুমি যে অদ্বিতীয়, তুমি যে একমাত্র, তুমি ভিন্ন যে কেহ বা কিছু নাই, ইহা তোমার অপার দয়াগুণে আমাদিগকে সত্য জ্ঞানে, দিব্য জ্ঞানে জানিতে দেও, যাহা যুক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিলাম, তাহা Realise করিতে দেও। আমরা তোমার একমেবাদ্বিতীয়ত্ব ধারণা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। পিতঃ! তুমিই ধন্য, ধন্য, ধন্য!

ওঁং

ওঁং জড়-জীব-কারণং অনন্ত প্রেমলীলাময়ং একমেবাদ্বিতীয়ং ওঁং

ওঁ

নাস্ত্যাকৃতি র্নো বিকৃতি র্ন সীমা
ন কারণ স্তে হ্যখিল কারণন্ত্বম্।
হেতোশ্চ হেতু র্মনসো মনস্ত্বম্
প্রাণস্য প্রাণো নয়নস্য নেত্রম্॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

বিকার হেতু জড় আত্মা হইতে পারে না।

আমরা জগতে অসংখ্য পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা দেখিতেছি। আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে ব্যোম. ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাদেরই নানাবিধ সংমিশ্রণে জাগতিক পদার্থ সমূহ গঠিত হইয়াছে।* আবার ইহাও দেখিয়াছি যে প্রলয় কালে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে. তেজঃ মরুতে, মরুৎ ব্যোমে এবং ব্যোম ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা সর্ব্বদাই এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং সূক্ষ্মে স্থূলের লয় দর্শন করিয়া থাকি। একই পদার্থেরও নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ জগতের পদার্থগুলির নিয়ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সর্ব্বকালে এই অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র স্থির ও অচঞ্চল কে? আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে তিনি একমাত্র আত্মাই। সকলেই বিকারের অধীন ; কিন্তু একমাত্র স্থির, ধীর, নিত্য অচঞ্চল—আত্মাই ; তিনিই একমাত্র "শান্তং শিবমদ্বৈতম্", তিনিই একমাত্র নিত্য নির্ব্বিকার। জড় যদি আত্মাই হইত, তবে উহার কোন কালেই কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত না, উহাও নিত্য নির্ব্বিকার আত্মার ন্যায় নিত্যই নির্ব্বিকার থাকিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সমূহ, এবং শ্রুতির সমভাবাপন্ন উক্তি সকল আমাদের দেশে কতই আদরের হইয়াছে। ইহাতে শোকার্ত্তের সান্ত্বনা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের আনন্দ। ইহাতে

---

* "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে জড় জগতের উৎপত্তির জন্য অব্যক্ত স্বরূপের সুতরাং ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই।

দেহাত্মভেদ কেমন সুন্দর ভাবে সূচিত হইয়াছে। "য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বীজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" "বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥" "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥" "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ (২।১৯-২৪)" "বঙ্গানুবাদ:—যে মনে করে যে শরীরী হনন করিল, যে মনে করে যে শরীরী হত হইল, সে দুজন কিছুই জানে না, কেন না এ হতও হয় না, হননও করে না। (১৯)। শরীরী কখনও জন্মেও না, একবার হইয়াও আবার হয়ও না। ইহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, অবস্থান্তর প্রাপ্তি নাই, শরীর বধ করিলে ইহার কখনও বধ হয় না। (২০)। যে ব্যক্তি শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম ও ক্ষয় বিরহিত বলিয়া জানে, সে কেমন করিয়া, হে পার্থ, কাহাকে বধ করে বা করায়? (২১)। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নবীন দেহ প্রাপ্ত হয়। (২২)। শস্ত্র ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নিও ইহাকে দগ্ধ করে না, জলও ইহাকে আদ্র করে না, বায়ুও ইহাকে শোষণ করে না। (২৩)। কেননা ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, ও অশোষ্য, অবিনাশী, সর্ব্বগত, স্থির স্বভাব, অচল, সর্ব্বকালে একরূপ বিশিষ্ট, চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য, অবিকারী, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। (২৪)।" উপরোক্ত শ্লোক সমূহে আত্মা ও জড়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য (striking contrast) কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে যেন প্রত্যেক শব্দই বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিতেছে যে জড় আত্মা

নহে, জড় সর্ব্ববিধ বিকারের অধীন, আর আত্মা স্থির, নির্ব্বিকার, অচঞ্চল, একটী অকিঞ্চিৎকর, অপরটী সুমহান্—একমাত্র যত্নের, একমাত্র লক্ষ্যের বস্তু। দেহের মৃত্যুতেও আত্মার (দেহীর) কিছুই আসিয়া যায় না। এত বড় জোড়ের সহিত দেহকে তুচ্ছ করিয়া আত্মার প্রাধান্য গীতা, উপনিষদ্ ভিন্ন অল্প স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার কোনই বিকার নাই, আত্মা অজর অমর, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে। স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।২৫)"। জড়ের মৃত্যু হয় কেন? জড়ের ধ্বংস আছে। যদি "ধ্বংস" শব্দে আপত্তি থাকে, তবে বিশ্বে স্থিতি কালে জড় পদার্থের লয় আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মায় ত লয়, ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন নাই। দেহের সহিত যুক্ত হওয়ায় জীবে যে মিশ্র ও জাত গুণ রাশি দেখা যায়, তাহা ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের অবসানেই শেষ হইয়া যাইবে। জড়ের ধ্বংস আছে বলাও বিশেষ দোষাবহ নহে। কারণ, মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা সংঘটিত হইবে। তখন জড় নামক পঞ্চভূতাত্মক কোনও পদার্থ থাকিবে না। যদি বলেন যে উহারা পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপে লয় হইবে, তবে বলিতে হয় যে তাহা হইলেও বলিতে পারা যায় যে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপে জড়ের আকার লয় হইবে বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাজনিত জড়ের যে অংশ অর্থাৎ নামরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর থাকিবে না, তাহা ধ্বংসই হইবে। পাঠক "ইচ্ছাশক্তি" অংশে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত দৃষ্টান্ত স্মরণ করুণ। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে মৃত্তিকায় লয় করিলে মৃত্তিকাই অবশিষ্ট থাকে। শিল্পীর ইচ্ছাজনিত অর্থাৎ কর্ম্মজনিত মৃত্তিকাতে যে নামরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর থাকে না। অতএব জড় নামক পঞ্চভূতাত্মক কোন পদার্থই তখন থাকিবে না। এখন নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই সত্য প্রমাণিত হইতে পারে। মৃত মানব যখন দগ্ধ হয়, তখন শবে স্থিত পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। আবার একটী গোটা বৃক্ষকে যদি অগ্নিতে দহন করা যায়, তবে উহারও পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। এই উভয় স্থলে কি

হয়? ইহাই হয় যে উভয় স্থলেই পঞ্চভূত যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু উহাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে রচিত মানব দেহ এবং বৃক্ষ দেহ আর থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ রচনায় পঞ্চভূতের যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল অর্থাৎ পঞ্চভূতের উপর কারুকার্য্য, তাহা আর থাকিবে না, অর্থাৎ উভয় দেহ অবস্থার ধ্বংস হইল। কিন্তু পঞ্চভূতের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না, উহারা যেমন ছিল, তেমনি রহিল। সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে! পরম পিতার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জড় জগৎ রচিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ান্তে সেই কারুকার্য্য সম্বলিত অব্যক্তের কারুকার্য্য সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক জগৎ আর থাকিবে না। কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপ যেমন ছিলেন, তেমনি থাকিবেন। অর্থাৎ উঁহার কারুকার্য্য সম্বলিত ভাবে ভাসমানত্বের অবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপের তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে জড় জগৎ রচনার জন্য অব্যক্ত স্বরূপের প্রকৃত পক্ষে কোনই বিকার হয় নাই। উঁহা পরম পিতার ইচ্ছায় জড় জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং মহাপ্রলয়ে ভাসমানত্বের অবস্থা যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব জড় যে আত্মা নহে, তাহা সম্পুর্ণ রূপে বুঝিতে পারা গেল। পাঠক সৃষ্টি-তত্ত্ব অধ্যায় পাঠ করিবেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে পরম-পিতার অব্যক্ত স্বরূপ এবং ইচ্ছাশক্তি জড় জগতের মূলে। জড় জগৎ অনাদি অনন্ত নহে, সুতরাং উহা ব্রহ্মে নিত্য স্থায়ী নহে, কিন্তু উহা তাঁহার ইচ্ছা জনিত। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহকে কেহই আর কোন নামে সম্বোধন করে না। তাহার শোকার্ত্ত আত্মীয়গণ শোকে অন্ধ হইয়া কান্দিয়া কান্দিয়া সময় সময় সেই শবকে সম্বোধন করিলেও উহা কোনই উত্তর দেয় না। যে দেহ সামান্য একটু আঘাত সহ্য করিতে পারিত না, সেই দেহকে তখন কঠিন বন্ধনে বান্ধিয়া নিলেও উহা কোনই বেদনার কথা জানাইবে না, এমন কি অগ্নি দহনে দগ্ধ হইলেও শবদেহ নির্ব্বাক থাকে। যে

দেহের জন্য সেই ব্যক্তি না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই, যে দেহকে বহু অর্থ ব্যয়ে নানাবিধ আহার্য্য পানীয় বস্তু দ্বারা বহু বৎসর সে ভরণ-পোষণ করিয়াছে, যে দেহকে নানা সুগন্ধি তৈল, চন্দন ও পুষ্পসার প্রভৃতি দ্বারা এতদিন চর্চ্চিত করিয়াছে, আজ কেন তাহা বহু সময় ধরিয়া দগ্ধ হইতে হইতে ভস্ম রাশিতে পরিণত হইতেছে, অথচ দেহে কোনই সারা নাই। দাহকালীন শবদেহের উপর যে সকল ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ বন্ধন, দহন, আঘাত প্রভৃতি, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি মানুষের জীবিতাবস্থায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে, তবে সে কি অনর্থ উৎপাদন করে, তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু শব কেন নীরব ? মৃত্যুর পর দেহের এরূপ নূতন ও বিপরীত ব্যবহারের কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে দেহে দেহাতীত এমন কোন বস্তু ছিলেন, যাঁহার অভাবেই মৃতদেহ সর্ব্বকর্ম্মে অক্ষম, সর্ব্বজ্ঞান শূন্য ও সর্ব্বভাব বিবর্জ্জিত। সকলেই জানেন যে সেই বস্তুটী আত্মা। দেহ যদি আত্মাই হইত, তবে কেন দেহের উপরোক্ত দুর্দ্দশা সংঘটিত হইল ? জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা আত্মার বিশেষ ধর্ম্ম। কারণ, জীবাত্মা যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অংশ ভাবে ভাসমান। কিন্তু শবদেহে উক্ত কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং দেহকে (জড়কে) আত্মা বলা যাইতে পারে না। যাহারা জড়কে আত্মা বলেন, তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তাহাদের একটা অঙ্গুলির কোন স্থান যদি কাটিয়া যায় ও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বহির্গত হয়, তবে সেই রক্তের একটী মাত্র বিন্দুকে তাঁহারা কি বলিবেন ? তাহারা কি উক্ত রক্ত বিন্দুকে তাহাদের দেহ বলিবেন ? কখনই না। তাহারা বলিবেন যে উহা তাহাদের দেহের এক বিন্দু রক্ত মাত্র। এস্থলে "দেহের" শব্দটীর প্রতি পাঠক একটু লক্ষ্য করিবেন। এখানে দেহ শব্দটীর ষষ্ঠী বিভক্তির এক বচন হইয়াছে। উক্ত বাক্যে দেহ কখনও কর্ত্তৃকারক বা কর্ম্মকারক ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। উহাতে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে। উক্ত বাক্য নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইলে তাহারা তাহাদের মনের ভাব সত্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে না। "উক্ত

রক্ত বিন্দু তাহাদের দেহ।" উক্ত রক্ত বিন্দু দেহ হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা উহাকে দেহের একটী অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করিতে পারি। এখন ঐ রক্ত বিন্দুকে যদি উত্তাপ দেওয়া হয়, তবে তাহা সমস্তই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। উক্ত বাষ্পকে কখনই আমরা তাহাদের দেহ অথবা উহার রক্ত বিন্দুইও বলিব না। কারণ, উহা বিকৃত হইয়া আর রক্তাকারে নাই, তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়াছে। আত্মা ও জড়ের সম্পর্কও তাহাই। অব্যক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে একটী মাত্র স্বরূপ। সুতরাং তাঁহা তাঁহার অনন্ত অংশের একটী অংশ মাত্র অথবা সমগ্র ব্রহ্মের বা আত্মার তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। উঁহা তাঁহারই ইচ্ছা সহযোগে পরিণত হইয়া নানা নামরূপে জড় জগদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিকৃতির যে নানা স্তর আছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রক্তজাত বাষ্পকে যেমন আমরা সত্য ভাবে দেহ বলিতে পারি না, তেমন কোনরূপ জড় পদার্থকেই আমরা আত্মা বলিতে পারি না। অতএব আমরা দেখিলাম যে জড়ের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ ও পরিণতি-রূপ বিকার আছে, কিন্তু আত্মার ঐ সকল বিকার নাই। সম-লক্ষণ হইলেই দুই বস্তুকে এক বলা যায়। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে জড়ের বিকার আছে, কিন্তু আত্মার কোনই বিকার নাই। সুতরাং জড়কে আত্মা বলা যাইতে পারে না।

ওঁং সত্যং নিত্য-নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁ

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যম্ পুরুষং মহান্তম্॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

আত্মায় লিঙ্গভেদ নাই

নর দেহ পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যেতর বহু জীবদেহে ঐরূপ লিঙ্গভেদ আছে। এই লিঙ্গভেদ দেহেরই, আত্মার নহে। আত্মার মধ্যে পুরুষত্ব, স্ত্রীত্ব ও ক্লীবত্ব যে লিঙ্গভেদ নাই, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। আবার আত্মা যে নিত্য নিরাকার, তাহাও সর্ব্ব-শাস্ত্রের মত। সুতরাং তাঁহাতে কোন ইন্দ্রিয়ও নাই। উপরে লিখিত শ্লোক সমূহেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।* কঠোপনিষদ্ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন :—"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ (৬।৮)" "বঙ্গানুবাদ : —অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। (তত্ত্বভূষণ)"। অতএব দেহ সুতরাং জড় যে আত্মা নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জড় যদি আত্মাই হইত, তবে এরূপ বিভাগ হইতে পারিত না। কারণ, আত্মা তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। অর্থাৎ দেহই যদি আত্মা হইত, তবে লিঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইত না। কারণ, আত্মা নিত্য অলিঙ্গ। তাঁহার কোনওরূপ চিহ্ন নাই। আমরা "গুণ বিধান" অংশে দেখিয়াছি যে আত্মায় আত্মায় কোনই পার্থক্য নাই এবং সৃষ্টিতে

---

* এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইয়াছে।

আমরা যাহা কিছু বৈচিত্র্য দর্শন করি, তাহা সমুদায় জড় জনিত। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে আমরা আরও দেখিয়াছি যে লিঙ্গ সম্পন্ন জড় দেহই আমাদের বন্ধনের কারণ এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমে আমাদের পূর্ণামুক্তি। যাহারা জড়কে আত্মা বলেন, তাঁহারাও অবশ্যই বলিবেন যে দেহই জীবাত্মার সীমাবদ্ধতার কারণ। সুতরাং জড় দেহই আমাদের পৃথক্ পৃথক্ নামরূপের কারণ। অতএব যাহা আত্মার চির বন্ধনের কারণ এবং যাহা আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাসমান করিয়াছে, তাহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা দ্বারা আত্মা আবদ্ধ হইতে পারে না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে আত্মার উন্নতির বাধা রূপে জড় সৃষ্ট হইয়াছে। আত্মা আত্মার বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং জড় আত্মা নহে। ব্রহ্ম যে নিত্য নিরাকার ও নির্ব্বিকার, তাহা উল্লেখ যোগ্য দর্শন শাস্ত্র মাত্রই বলেন। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রও পরমেশ্বরকে নিরাকারই বলেন। যদি বলেন যে বহু হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাকে সাকার বলিয়াছেন, তবে বলিতে হয় যে হিন্দু শাস্ত্র সমূহের শিরোভাগে অবস্থিত উপনিষদ্ ব্রহ্মকে নিরাকারই বলেন। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে সকল হিন্দু শাস্ত্র সাকার বাদ প্রচার করেন, তাহারাও বলেন যে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের রূপ নাই, কিন্তু সাধকদিগের হিতার্থ তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন: চিন্ময়স্যা-প্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" "অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও অশরীরী, কিন্তু সাধকগণের হিতের নিমিত্ত সেই অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়।" এই শ্লোক দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম অশরীরী, চিন্ময়, অপ্রমেয়। সুতরাং তাঁহার কোনই রূপ নাই, সুতরাং তিনি নিরাকার এবং অরূপ, ইহা বুঝিতে পারা যায়। উক্ত উভয় শ্লোকেই রূপকে কল্পনা মাত্র বলা হইয়াছে। সুতরাং যাহা কল্পনা মাত্র, তাহা যে মিথ্যা, ইহা বলাই বাহুল্য। আবার শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে কোন

বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের মত। সুতরাং উপনিষদ্ দ্বারা প্রতিপাদিত নিরাকারবাদই যে সত্য, তাহা নিঃসংশয়িত চিত্তে বলা যাইতে পারে। লিঙ্গ অর্থে শারীরিক অঙ্গ বিশেষকে কেবল বুঝায় না, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ চিহ্ন, অর্থাৎ নামরূপ। জড়েরই নামরূপ আছে, কিন্তু ব্রহ্মের কোনও নামরূপ নাই। এই সম্বন্ধে "ইচ্ছাশক্তি" অংশে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয় পাঠক দেখিবেন। সুতরাং তিনি এই অর্থেও নিত্যই অলিঙ্গ। আবার জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু দেহ যোগে পরমপিতার ইচ্ছায় সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান। সুতরাং ব্রহ্মে যাহা নাই, জীবাত্মায় তাহা থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মারও কোনওরূপ লিঙ্গ নাই। কিন্তু জড় দেহের তথা জড়ের নানাবিধ লিঙ্গ আছে। সুতরাং জড় আত্মা হইতে পারে না।

ওঁং অলিঙ্গং অনন্ত-অরূপ-রূপং একরূপং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

অনন্ত গুণের ধাম পালিছ ভুবন,
আপনি নির্লিপ্ত রহি, লিপ্ত করি জন,
পাপীজনে পাপ হ'তে করিয়া উদ্ধার,
গুণহীনে গুণদান করি বারবার,
নিষ্পাপ সগুণে শক্তি করিয়া প্রদান,
ধন্য, ধন্য, ধন্য নাথ, গুণের নিধান। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

গুণ-ভেদ হেতু আত্মা ও জড় এক নহে।

"জড়" শব্দে অচেতন (চৈতন্য শূন্য) পদার্থকেই বুঝায়। সুবল চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিধান হইতে "অচেতন", "জড়", "জড় জগৎ" ও "জড় পদার্থ" শব্দগুলির অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। "অচেতন= যাহার চেতনা নাই এরূপ। ন (নাই) চেতনা যাহার, (বহুব্রীহি)। জড়=অচেতন। জড় জগৎ=জড় পদার্থ সমূহ। জড়=চৈতন্য শূন্য পদার্থ। (জড়ের জগৎ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বা জড়রূপ জগৎ, রূপক কর্ম্মধারয়)। জড় পদার্থ=চৈতন্য শূন্য পদার্থ, অন্যের বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে যাহা চলিতে বা থামিতে পারে না, মৃৎ প্রস্তরাদি, কর্ম্ম-ধারয়।" জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান হইতে প্রোক্ত শব্দগুলির অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। "অচেতন=ন= অ (নাই) চেতনা (জ্ঞান) যার (বহুব্রীহি) বিণ, জীবন বা চেতনা শূন্য: জড়। জড় =অচেতন পদার্থ। জড় জগৎ=চৈতন্যহীন স্থাবর জগৎ। জড় পদার্থ=যে সকল পদার্থের চেতনা নাই।" উভয় অভিধানে লিখিত অর্থ সমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা গেল যে জড় অর্থে চৈতন্য শূন্য পদার্থ এবং অচেতন শব্দের অর্থ চৈতন্য শূন্য। সুতরাং জড়, জড় জগৎ, জড় পদার্থ সকলেই চৈতন্য শূন্য। আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিলে উহাতে (জড়ে) চৈতন্য লেশও যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রেই উক্ত অর্থে উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয়

পদার্থকেই চৈতন্য শূন্য বলেন। অনাত্মাও জড় শব্দেরই তুল্য। আত্মা ও অনাত্মা, চেতন ও জড় বিরুদ্ধ ভাবাত্মক শব্দ। জড় কেবল অচেতন নহে, কিন্তু অচৈতন্য উহার বিশেষ গুণ। আধ্যাত্মিক গুণ ও জড়ীয় গুণের বিভাগ করা হইয়াছে। জড় যদি আত্মাই হইত, তবে উহাতে আত্মার সকল গুণ থাকিত। জ্ঞান, প্রেম, সরলতা, একাগ্রতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণকে আত্মার গুণ বলে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে জড়ের চৈতন্য নাই, জ্ঞান নাই, প্রেম নাই ইত্যাদি।* জড় আত্মা পদ বাচ্যও হইবে অথচ উহাতে আত্মার গুণ থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না। আত্মাতে নিত্য সুখ বর্ত্তমান, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। একমাত্র আত্মাই সুখের একমাত্র আধার। আমরা সকল জীবেই সুখ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এমন কি উদ্ভিদেও সুখ আছে ইহা মনু বলিয়া গিয়াছেন এবং Sir. J. C. Bose তাহা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ-সমন্বিতাঃ।" "অর্থাৎ ইহাদেরও অন্তর্গত চৈতন্য আছে। ইহারাও সুখ-দুঃখ-বিশিষ্ট।" আমরা "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশেও দেখিয়াছি যে আত্মাই সুখের একমাত্র অনন্ত আধার। আত্মা ভিন্ন সুখ কোথায়ও নাই বা থাকিতে পারে না। জড় পদার্থে যে সুখ নাই, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষই করিতেছি। কেহই কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই যে প্রস্তর খণ্ডের বা মৃৎ পিণ্ডের সুখ আছে। "এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বাহ্য বস্তুতে (জড় পদার্থে) সুখ না রহিল, তবে সুখ কোথায় আছে? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, সুখ যাঁহার গুণ, সুখ তাঁহাতেই থাকে, অর্থাৎ চৈতন্যবান বিনা অচেতন কখনও সুখী হইতে পারে না, সুতরাং সুখ চৈতন্যবানেই থাকে। এই সিদ্ধান্তে প্রথম আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি চৈতন্যবানেই থাকে, তবে মনুষ্য মাত্রেই ত চৈতন্যবান,

---

* জড়ের যে প্রেম নাই, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সত্য। আবার জড় এমনি পদার্থ যে উহার সংসর্গে প্রেম আসিলে, উহা অতি বিকৃত হইয়া ভীষণতম দোষ—কাম রিপু উৎপন্ন হয়। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আত্মার গুণ ও শক্তি জড় সংসর্গে আসিলে অল্পাধিক বিকৃত হইবেই।

তবে তাহারা সকলে কেন সুখী নহে? ইহার উত্তর এই যে মনুষ্য-মাত্রেই চৈতন্যবান হইলেও, তাহারা সাধারণতঃ জড়ের সহিত—জড় ভাবের সহিত এতদূর সম্বন্ধ যে, আপনাদিগকেও অনেক সময় জড় বলিয়া ভাবে, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধি-ভ্রম সাধারণতঃ বিদ্যমান আছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তিময়ী মায়া (ক) তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা জড়ত্ব হইতে আপনাদিগকে নির্ম্মুক্ত করিতে না পারে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের এই ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও হৃদয়ে অবস্থিতি করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না এবং ততদিন পর্য্যন্তই তাহাদিগের জড় পদার্থাবলম্বনে সুখ সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ জড়াবস্থায় জড় পদার্থ বিশেষ-অবলম্বনে তাহাদিগের আন্তরিক জড়তার যে বিনাশ-বিশেষ সংঘটিত হয়, তাহাতেই তাহারা সুখী হইয়া থাকে। যিনি কখনও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন যে জড়-পদার্থের আশ্রয় ব্যতীতও সুখ আছে। পক্ষান্তরে, জড়পদার্থে সুখ নাই, প্রতিপন্ন হইল। অতএব ইহা নিশ্চয়ই যে চৈতন্যেই সুখ অবস্থিতি করে। পরন্তু মনুষ্য যে পর্য্যন্ত যে পরিমাণে জড়ত্বে বদ্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে জড়ের সংসর্গ না থাকিলে সে সুখী হইতে পারে না। অতএব জড় ভাব-সমন্বিত চৈতন্যাংশের সুখ-লাভ জড় পদার্থ অবলম্বনে হয়, কিন্তু জড়ে কখনও সুখ থাকে না। অর্থাৎ বাহ্য বস্তু অবস্থা বিশেষে চৈতন্যাংশের ইচ্ছার অনুরূপ হইলে, তাহাতে সুখের স্ফুর্ত্তি হয় মাত্র, নতুবা উহাতে সুখের সত্তা নাই। "সুখ চৈতন্যবান আত্মার গুণ বলিয়া আত্মাই উহার আধার" (খ)। জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীনতা আত্মার একটী প্রধান গুণ। আত্মার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু জড়ের ঐ গুণ মাত্রও নাই। উহাকে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহা অত্যন্ত ভাবে অদৃষ্ট বদ্ধ। "এই দুই কারণ-বশতঃই চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদির উদয় অস্ত, ঝটিকা,

---

(ক) মায়া অর্থ অজ্ঞানতা, মায়াবাদের মায়া নহে।

(খ) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

বৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় বহু পূর্ব্বে স্থির করা যাইতে পারে। এই কারণ-বশতঃই যতদূর মনুষ্যের আয়ত্ত হইয়াছে, জড় সংক্রান্ত তত দূরের সমস্ত বিষয়ই সুবুদ্ধি, চিন্তাশীল বিজ্ঞান-জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞেয় হইতে পারে ইত্যাদি" (খ)। কিন্তু জীবাত্মা অদৃষ্টাধীন নহে। তাহার স্বাধীনতা পরমপিতার অনন্ত স্বাধীনতা হইতে প্রাপ্ত। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, জীব কেন তবে অদৃষ্টাধীন হয়। ইহার উত্তরে পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে লিখিত বিষয়ের ন্যায় বলিতে হইবে যে সাধারণ জীব এত অধিকরূপে জড় ভাবে জড়িত যে সে নিজেকে জড় দেহ বই আর কিছুই মনে করে না। সুতরাং জড়ের নিয়মানুযায়ী তাহার অদৃষ্ট নিয়মিত হয়। কিন্তু জীব যতদূর নিজেকে এই জড়ত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিতে পারিবে, তিনি তত দূর স্বাধীন হইবেন। জীবের জড়াংশ অর্থাৎ শরীরাদি জড় বলিয়া অবশ্যই অদৃষ্টায়ত্ত, কিন্তু জীব যদি আত্মা-ধীন হয়, তবে তিনি সেই রূপ অদৃষ্টকেও অতিক্রম করিতে পারেন। অতএব দেখা গেল যে পরমাত্মা অনন্ত স্বাধীন এবং জড় অদৃষ্ট বদ্ধ। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা, কিন্তু দেহাবদ্ধ বলিয়া অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবাত্মারও স্বাধীনতা আছে। যতই তাহার হৃদয়ে সেই মহদ্‌গুণ বিকশিত হইতে থাকিবে, তিনি ততই সেই জড়াংশের অদৃষ্টত্ব অতিক্রম করিতে পারিবেন। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে জড় ও আত্মা এক নহে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপে কোনই পার্থক্য নাই, কিন্তু জীবাত্মা দেহে আবদ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যান, অর্থাৎ দেহই তাঁহার বাস্তব অবস্থায় সসীমত্বের কারণ এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার সকল দোষ পাশ দেহ সংযোগে উৎপন্ন। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। জীব সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হয় ও পরমপিতার গুণরাশিতে বিভূষিত হয়, ইহা প্রায় সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। জড় যদি আত্মাই হইত, তবে উহাও জীবের ন্যায় জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি নানাবিধ আত্মার গুণে উন্নতি লাভ করিত ও পরমপিতার দর্শন লাভ

(খ) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

করিত। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহ দেখিতেছেন বা শুনিতেছেন না যে জড় পদার্থ কোনও প্রকারের কোনও আত্মিক গুণ লাভ করিয়াছে, অথবা কোন ধর্ম্ম বা দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন যে জড় ঐরূপ পরমোন্নতি লাভে সমর্থ। এক কথা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, যে পদার্থ জ্ঞান শূন্য, তাহা যখন আত্মোন্নতি কি পদার্থ, তাহাই জানে না, তখন উহা সেই আত্মোন্নতির জন্য সাধনা কি প্রকারে করিবে? যে দর্শন শাস্ত্র জড় ও আত্মা এক বলেন, তাহা জড়ের আত্মোন্নতি নাই কেন, সেই সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। জড় চিরদিনই জড় আছে ও একই ভাবে থাকিবে, কিন্তু কোন কোন জীব তাঁহার সাধনা বলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া এত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন যে পৃথিবীর সাধারণ মানবে সেই উন্নতির যথাযথ ধারণাও করিতে পারে না। এই জন্যই সেই সকল পরমোন্নত সাধকগণকে শেষে লোকে পরমেশ্বরের আসনে বসাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন মানুষ যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু জড় যেই তিমিরে সেই তিমিরে সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান। এতদ্দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মা ও জড় এক পদার্থ নহে। "মায়াবাদের" অন্তর্গত "নেতিনেতিবাদ" অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্ম কোন প্রকার জড় পদার্থ নহেন বা কোন প্রকার জড়ীয় অবস্থাও নহেন। উক্ত অংশে প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদের বহু মন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই সকল মন্ত্র পাঠে সুদৃঢ় ভাবে ধারণা হইবে যে জড় কখনও আত্মা হইতে পারে না। দুইটী বস্তুর তারতম্য করিতে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি যে সেই পদার্থ দ্বয়ের ধর্ম্ম অর্থাৎ উহাদের কি কি গুণ ও শক্তি আছে। যদি একের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া যায়, তবে সেই পদার্থদ্বয়কে দুইটী না বলিয়া একই পদার্থ বলা যাইতে পারে। আমরা উপরোক্ত নানা আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে আত্মার গুণ জড় পদার্থে নাই। সুতরাং আত্মা ও জড় এক হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জড়ের উপাদান যখন ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই গুণের যাহা ধর্ম্ম,

অর্থাৎ নিরাকারত্ব, সাকারত্ব ও অচৈতন্য, তাহা ত জড়ে বর্ত্তমান আছে এবং ইহা এই গ্রন্থের নানা স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার উত্তরে প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে অব্যক্ত স্বরূপের যাহা ধর্ম্ম, তাহা হুবহু জড়ে বর্ত্তমান নাই। উহারা বিকৃত অবস্থায় উহাতে (জড়ে) বর্ত্তমান আছে বটে। অব্যক্ত স্বরূপ মূল এবং জড় বিকৃত। সুতরাং উহারা সম্পূর্ণ রূপে এক হইতে পারে না। আর আত্মার গুণ বলিলে ত তাঁহার একটী মাত্র গুণ বুঝায় না। আত্মার গুণ অসংখ্য, অনন্ত। সুতরাং সেই অনন্ত গুণের একটী মাত্র গুণ হইতে উৎপন্ন এবং চির বিকৃত ও সীমাবদ্ধ জড় পদার্থকে নিত্য নির্ব্বিকার অনন্ত গুণ নিধান আত্মা বলা যায় না। অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অত্যন্ত ভাবে গুণ-বৈষম্য হেতু জড় আত্মা পদ বাচ্য হইতে পারে না।

ওঁং অনন্ত-গুণ-নিধানং নিত্য-নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

আমি জড় ভাবে ত্যজিবারে ভবে,
বিভো কি এভাবে পারিব কথন !
দেহে আত্মজ্ঞান যত করি হান,
ততই অজ্ঞান করে আক্রমণ।
"আমি জড় নই, সচেতন হই",
কত ভাবি তবু চেতনা ত নাই,
দেহে আত্মবোধ তবু যায় কই ?
কৃপা কর দাসে প্রকাশি এখন। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

দেহাত্মভেদ জ্ঞান

আমরা "পরলোক তত্ত্ব" এবং "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশদ্বয়ে দেখিতে পাইয়াছি যে মানব ইহলোকের দেহ সর্পের নির্ম্মোকের (খোলশের) ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন এবং সেই স্থানের উপযুক্ত দেহ ধারণ করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে জীব অসংখ্য দেহ সহ প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। "বিকার হেতু জড় আত্মা হইতে পারে না" অংশে উদ্ধৃত গীতোক্ত শ্লোক সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে যে আত্মা অক্ষয় ও অমর এবং নিত্য স্থায়ী। ইহাও বলা হইয়াছে যে আত্মা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্রের ন্যায় পরলোকে নূতন দেহ ধারণ করেন। "পরলোক তত্ত্ব" অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে উপরোক্ত তত্ত্ব সত্য। উক্ত অংশে আমরা আরও দেখিতে পাইয়াছি যে দেহে দেহী আত্মা আছেন এবং তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলে উহা শবাকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার কোনই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যাহারা ইহ-সর্ব্বস্ববাদকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারাও সুনিশ্চিত ভাবে জানেন যে মানবের মৃত্যু হইলে তাহার দেহে

চৈতন্য মাত্রও থাকে না এবং একদিন তাহাদেরও সেই অবস্থা সংঘটিত হইবে। কারণ, মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত অবস্থা পৃথিবীতে দেখা যায় না। এই জন্যই ইংরেজীতে Death Sure কথা প্রচলিত হইয়াছে। এই যে সজীব অবস্থায় মানবের চৈতন্যের প্রকাশ এবং মৃতাবস্থায় চৈতন্যের সম্পূর্ণ লোপ, ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে সজীব অবস্থায় দেহে এমন একটী চৈতন্যময় বস্তু থাকে, যাহার বর্ত্তমানতায় মানবে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। আবার সেই বস্তুটী দেহ ত্যাগ করিলে উহাদের কোন কার্য্যই শব দেহে দেখা যায় না। সেই বস্তুটী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে উহা আত্মা। "আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মস্তিষ্ক নহে এবং প্রাণও নহে। একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে, অন্য কাহারও চৈতন্য নাই।"* এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে "জীবাত্মা" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী, তাহারা দেহ ও আত্মা যে পৃথক্, তাহা বলিবেনই। তাহারাও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অতএব দেহ যে আত্মা নহে, তাহা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইল। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবের অসংখ্য দেহ এবং সেই সকল দেহ ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে উন্নততর মণ্ডলে যাইতে যাইতে লয় হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মণ্ডলে আত্মা যে দেহ ধারণ করেন, তাহা হইতে উন্নততর লোকে গমন কালে সেই দেহেরও মৃত্যু হয়। এইরূপ হইতে হইতে সর্ব্বশেষ কারণদেহের যখন মৃত্যু বা লয় হয়, তখনই জীবাত্মা পূর্ণামুক্তি লাভ করেন, অথবা পূর্ব্ব পরম চৈতন্যে সম্পূর্ণ রূপে গমন করেন, অথবা সর্ব্ব প্রকার নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপ লাভ করেন, অথবা পৃথক্ অস্তিত্বের শেষ চিহ্নরূপ শেষ কারণদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে একীভূত হন। সুতরাং দেখা গেল যে আত্মা ক্রমশঃ দেহত্যাগ করিতে করিতে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে বিদেহী বা অশরীরী হন। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে আত্মা চিরকাল দেহাবদ্ধ থাকেন বটে, কিন্তু

---

* তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

তাঁহার অসংখ্য দেহগুলি আত্মা নহে। কারণ, পার্থিব দেহের ন্যায় পারলৌকিক দেহও পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ উহাদেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু আত্মা ক্রমশঃ উন্নতিই লাভ করেন (ক), তাঁহার কখনও মৃত্যু হয় না। এখন প্রশ্ন হইবে যে দেহ সম্পূর্ণরূপে জড় পদার্থ, সেই সম্বন্ধে কাহারও কোনই আপত্তি নাই। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে যে দেহও পরম্পরাভাবে ব্রহ্মেরই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সেই স্বরূপ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং দেহকে তুচ্ছ করিবার কি আছে? আর জীবাত্মা যখন স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, তখন অব্যক্ত স্বরূপও জীবাত্মারও স্বরূপ। সুতরাং দেহের যে মূল ভিত্তি, তাহা ত জীবাত্মারই সম্পত্তি। সুতরাং সেই দেহকে তিনি কেন ভেদ বা পৃথক্ মনে করিবেন? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের যে চিন্তা আসিয়াছে তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। এই সমস্যা কঠিন। অনন্ত জ্ঞানাধার, অনন্ত দয়ার আধার, অনন্ত স্নেহময় পরমপিতা তাঁহার অজ্ঞান সন্তানের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কেঁ তাঁহার সত্য জ্ঞানের দিব্যালোকে আলোকিত করুন, যাহাতে আমি এই সমস্যার সরল, প্রাঞ্জল ও সত্য মীমাংসা লাভ করিতে পারি। দয়াময় পিতঃ! তোমার অপার দয়াগুণে নিজ সন্তানের মোহ আবরণ উন্মোচন কর। তোমার করুণায় সকলি হইতে পারে। হে করুণাময় পিতঃ! নিজ গুণে নিজ সন্তানের প্রতি করুণা কটাক্ষপাত কর। আমি কৃতার্থ হই এবং প্রাণ খুলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দান করিয়া আমিও ধন্য হই। প্রোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃই আমাদিগের বক্তব্য এই যে আমরা জড়কে কখনও তুচ্ছ করিতে বলি নাই। যাহা বলিয়াছি তাহা এই যে চির বিকৃত দেহ যে আত্মা নহে, এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে চির অচেতন এবং স্বল্প ও বিকৃত গুণ বিশিষ্ট জড় দেহ কখনই নিত্য চেতন এবং অনন্ত গুণধাম আত্মা হইতে পারে

(ক) পারলৌকিক দেহেরও যে মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উন্নতির অর্থ পরমাত্মার গুণরাশির ক্রমবিকাশ।

না। অচেতন জড় দেহ যন্ত্র মাত্র এবং সচেতন আত্মা উহার যন্ত্রী। যন্ত্রীর হস্তে উহা ক্রীড়ার পুতুল মাত্র। আমরা জড়কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার কখনই পক্ষপাতী নহি, কিন্তু উহাকে উহার যথাস্থানে আসন দান করিতে চাই। পৃথিবীতে দুই প্রকারের মানব দেখা যায়। এক প্রকার মানব দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দেহেরই সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। দেহ ভিন্ন যে বিশ্বে কিছু আছে, তাহা তাহারা বুঝিতে চাহেন না, অর্থাৎ দেহই তাহাদের সুখ, শান্তি ও আনন্দ দান করে। অন্য কোথায়ও যে তাহা আছে, তাহার অনুসন্ধান তাহারা করেন না। অর্থাৎ তাহারা ইহসর্ব্বস্ব জ্ঞানই লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম, পরলোক ও পরমেশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানিতে চাহেন না। আর অন্য প্রকারের মানব বৈরাগ্য পথের অন্তে গমন করিয়া দেহকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন। তাহারা জড়কে নানা ভাবে নিপীড়নও করেন। আমরা এই উভয় পন্থার কোন পন্থাই গ্রহণ করি না। জড় জগৎ সুতরাং দেহ অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলার্থ সৃষ্ট। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিতেই পরমপিতার ইচ্ছায় তাঁহার একটী স্বরূপ হইতে ইহা উৎপন্ন। পরমপিতা যখন জড় জগৎ ভিন্ন তাঁহার প্রেমলীলা সম্পাদন করিতেছেন না, তখন জীব কি প্রকারে সেই জড় সুতরাং দেহ ভিন্ন, সেই সুমহান্ উদ্দেশ্য নিজ জীবনে সাধন করিবেন? আমরা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" মন্ত্রের পক্ষপাতী। পরমপিতা যখন একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে জড় জগৎ এবং দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আমাদের সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিজ জীবনে সাধন জন্য জড়ের যে প্রকার ও যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র উহার ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার অধিক করিলেও যেমন অনর্থপাত হইবে, উহার অল্প করিলেও অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। আমরা আবারও বলি যে জীবের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যার্থই জড় এবং দেহ সৃষ্ট। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় আত্মোন্নতি দান করিতে পারে না। আত্মাই পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা তাঁহার গুণরাশির বিকাশ সাধন করেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য

এই যে ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে জড় আমাদের বাধারূপে সৃষ্ট। এই জন্যই জড়ের সাহায্যে আমরা জড়ের বাধা অতিক্রম করিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হই। অর্থাৎ কণ্টক দ্বারা দেহবিদ্ধ কণ্টক উৎপাদনের ন্যায় জড় দ্বারা জড়ের বাধা অতিক্রম করিবার কিঞ্চিৎ সাহায্য আমরা লাভ করি, এইমাত্র। এই সম্বন্ধে "গুণ বিধান" অংশে ৫৫৩-৫৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয় দ্রষ্টব্য। এই স্থলে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশও দ্রষ্টব্য। যাহা বাধা রূপে সৃষ্ট, তাহাতে বাধা অতিক্রম করিবার শক্তিও অবশ্য বর্ত্তমান। প্রোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তর দিবার পূর্ব্বে গ্রন্থের নানা স্থলে আত্মা ও জড় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু অংশ ভাবে ভাসমান। আত্মাতে পরমাত্মার অনন্ত গুণ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত বলিয়া উহারা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। সাধনা ও উপাসনা দ্বারা উহাদের বিকাশ সাধন সম্ভব এবং প্রত্যেক উন্নতিশীল জীবনে তাহাই হয়। এই বিকাশ ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ এবং পূর্ণামুক্তিতে অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহের বিগমে জীবাত্মা পূর্ণামুক্তি লাভ করেন। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশও এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আর জড় ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপে তাঁহার ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সম্বলিত পদার্থ। সুতরাং জড় বলিতে তাঁহার অনন্ত অব্যক্ত স্বরূপের অবলম্বনে উঁহা দ্বারা পরম পিতার ইচ্ছায় উৎপন্ন কারুকার্য্য সমূহ। "প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে কেবল অব্যক্ত স্বরূপই জড় নহে, আবার উঁহার উপরে দৃষ্ট কেবল কারুকার্য্যই জড় নহে। উভয় মিলিয়া যে পদার্থটী হইয়াছে, তাহাই জড় জগৎ। এই সম্পর্কে "অব্যক্ত কি?" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয়ও দ্রষ্টব্য। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে জীব অসংখ্য দেহ সহ জন্মগ্রহন করেন। উহাদের মধ্যে প্রথমাবধি বহু দেহ স্থূল এবং শেষের অসংখ্য দেহ কারণদেহ। মধ্যের বহু বহু কোটী দেহ সূক্ষ্ম দেহ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে জীবাত্মা অনন্ত

পরমাত্মার অংশ ভাবে ভাসমান। সুতরাং উহা ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশিত। আবার জড় দেহ পরম পিতার ইচ্ছায় অব্যক্ত স্বরূপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান অংশ। এই দেহই আত্মার আবরণ ভাবে কার্য্য করিতেছে। এই দেহ আত্মার গুণরাশির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেছে এবং শেষদেহ সূক্ষ্মতম বা কারণতম। আমরা দেখিয়াছি যে অব্যক্তে কারুকার্য্য বর্ত্তমান। ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য যে স্থূল জড়ে কারুকার্য্য অত্যধিক এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম জড়ে কারুকার্য্য অল্প হইতে অল্পতর এবং ব্যোমে ইহা অল্পতম। এই জন্যই ব্যোমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবাত্মা যতই তাঁহার গুণরাশির বিকাশ সাধন করিতেছেন, যতই তিনি স্ব স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তিনি দেহের স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কারণ, কারণতর এবং কারণতম ভাব ত্যাগ করিতে-ছেন, অথবা অন্য ভাষায় বলিলে বলিতে হয় যে দেহ ক্রমশঃ অব্যক্ত স্বরূপের দিকেই অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপের অংশ ভাবে ভাসমান দেহের কারুকার্য্য ক্রমশঃই লয় প্রাপ্ত হইয়া জড় দেহ ক্রমশঃ অব্যক্ত স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। অবশেষে পূর্ণামুক্তিতে জীবের ইহাই হইবে যে তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ তখন আর তাঁহার কোনরূপ দেহ থাকিবে না, কেবল অব্যক্ত স্বরূপই থাকিবেন। কারণ, তখন আর তিনি জীব নহেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দেহাবস্থায় দেহে অব্যক্ত বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু উঁহাতে কারুকার্য্যও বর্ত্তমান। এই কারুকার্য্যই দেহের ক্রম-লয়ের সহিত ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিকৃতিই আবরণের কারণ। এই বিকৃতি যত অধিক, আবরণের গভীরতাও ততোঽধিক হইবে। সুতরাং আত্মা হইতে দেহ পৃথক্। ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে জড় এবং আত্মার পার্থক্য নানাভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলেও দেখিলাম যে আত্মা এবং অব্যক্ত স্বরূপের পরম্পরাভাবে বিকাররূপ জড় দেহের পার্থক্য আছে। মোটামুটী

ভাবে বুঝিতে গেলে ইহা বুঝিলেই হয় যে কারুকার্য্যই বিকারের কারণ এবং সেইজন্যই অব্যক্ত স্বরূপ জড়ে পরিণত। সুতরাং কারুকার্য্যই অথবা বিকৃতিই আত্মা ও জড়ের ভেদের কারণ। আবার অন্যভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে অব্যক্ত স্বরূপও ত আত্মার অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপ। সুতরাং উঁহাও পূর্ণ আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মা যখন স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, তখন তিনি স্বরূপে পূর্ণই হইবেন। সুতরাং সেই অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে উৎপন্ন জড়াবলম্বনে গঠিত দেহ যে আত্মা হইতে পৃথক্, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, অব্যক্ত ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ এবং নিত্য সাথী। সেইরূপ জীবাত্মার দেহও তাঁহার আদি জন্মমুহূর্ত্ত হইতে পূর্ণামুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার চিরসাথী। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত, তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপও অনন্ত। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ নিত্য অবিকৃত। সুতরাং তাঁহা তাঁহার আবরণ রূপে কার্য্য করে না। আবার সসীমভাবে ভাসমান আত্মার দেহও ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ এবং চির বিকৃত। তাই উহা জীবাত্মার আবরণ ভাবে কার্য্য করে। "জড় পরম্পরাভাবে ব্রহ্মের সহিত অভেদ" এই বাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্মের সহিত জড়ের অতি দূর সম্পর্ক। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে ভেদের মাত্রা অসীমপ্রায় এবং অভেদের মাত্রা অত্যল্প। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বর্ত্তমান অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেহের সহিত জীবাত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক। অর্থাৎ দেহের সহিত জীবাত্মার ভেদের মাত্রা অত্যন্ত অধিক বা অসীমপ্রায়, কিন্তু অভেদের মাত্রা অত্যল্প। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা। সুতরাং স্বরূপ অবলম্বনে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জীবাত্মারও অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের পরিণামে যে বিরাট জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, উহারই একটি ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র অংশ তাঁহার দেহ। সুতরাং উহা যে তাঁহার স্বরূপের তুলনায় পরমাণুর পরমাণু হইতে ক্ষুদ্র, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং সেইজন্যই জীবাত্মা ও দেহের ভেদের মাত্রা অসীম

বলিলেই হয়। আবার যেটুকু ভেদের কথা বলিলাম, তাহাও দেহের মূল ভিত্তি অব্যক্ত স্বরূপের সহিত মাত্র, কিন্তু উহাতে সন্নিবেশিত কারুকার্য্যের সহিত নহে। সুতরাং দেহের সহিত ভেদই অর্থাৎ বিকৃতির সহিত জীবাত্মার ভেদ সম্পর্কই বর্ত্তমান, অভেদ সম্পর্ক নাই। আর কারুকার্য্য বিবর্জ্জিত অব্যক্ত স্বরূপকে ত দেহ বলা যায় না এবং উহাকেও দেহ বলাও হয় না। সুতরাং দেহের সহিত জীবাত্মার ভেদই Practically সত্য। এই সম্পর্কে ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেহাত্মভেদ আলোচনা কালে জীবাত্মার স্বরূপের কথাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের তখন জীবভাবের কথা চিন্তা করিতে হইবে না। জীব অর্থে দেহ + আত্মা। জীবের ভাব সমূহ কখনও দেহ বাদ দিয়া চিন্তা করা যায় না। আর আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল দেহাত্মভেদ। এই সম্পর্কে কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের উক্তি পাঠক দেখিবেন। উহাতে যে তিনি দেহাত্মভেদ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট। সাধক মাত্রই দেহাত্মবোধকে মহাদোষ মধ্যে গণনা করেন এবং ইহার অপনয়নের নিমিত্ত নিজে কতই না সাধনা করেন ও অন্যকে উপদেশ দেন। যাঁহার দেহাত্মভেদ-জ্ঞান বিকশিত হইয়াছে, তাঁহার এই দুঃখ-যন্ত্রণাময় সংসারে কোনই চিন্তার কারণ নাই। যত দুঃখ তাহা দেহকে "আমি" ভাবি বলিয়া। রোগযন্ত্রণা উপস্থিত হইলে যদি সাধক সত্যভাবে চিন্তা করিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং রোগগ্রস্থ নহেন, তাঁহার শরীরই রোগগ্রস্থ, তবে তাঁহার দুঃখের কারণ থাকে না। অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই সাধনা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু একেবারে অসাধ্য নহে। সংসারে কতপ্রকারের দুঃখ আসে, কত রকম লজ্জা অপমান আসে, যদি সাধক সত্যভাবে ধারণা করিতে পারেন যে তিনি আত্মা, তাঁহার লজ্জা অপমান কিছুই নাই, তাঁহার কোনও জ্বালা যন্ত্রণা নাই, তাঁহার কোনই দুঃখ দৈন্য নাই, আত্মাকে এই সকল স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা কিছু গোলমাল সকলই দেহের মাত্র, তবে আর সংসার তাঁহাকে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিতে পারে না। মহাত্মা অশ্বিনী

কুমার দত্ত শরীরকে "পচাটা" বলিতেন। বস্তুতঃও যাহা একদিন ধ্বংস হইবে, তাহার দিকে আমরা অত্যধিক মনোযোগ দিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। যে অসুবিধা নাই, যে দুঃখ নাই, যাহাতে অপমান নাই, আমরা ইচ্ছা করিয়া কখনও কখনও কল্পনা করিয়াও সেই সকল অসুবিধা, দুঃখ ও অপমান সৃষ্টি করি। দেহাত্মবোধ হইতেই সকল ভীষণ ভীষণ দোষ, মোহ এবং অহংকারের উৎপত্তি। ইহা হইতেই দূষণীয় কার্য্য সমূহ সংঘটিত হয়। "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশে উদ্ধৃত দক্ষ সংহিতার শ্লোকদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাই যে, দেহ এবং অন্তঃকরণ নিম্নস্তরের বস্তু। উহাদের অতীত না হইলে আমাদের মুক্তি কোথায়? অতএব জড় যে আত্মা নহে, কিন্তু আত্মার গুণরাশির বিকাশের বাধক, তাহা বুঝিতে পারা গেল। দেহাত্মভেদ প্রকাশক ভক্তের বাণী জগতে প্রচারিত হইয়াছে এবং বহু সুমধুর সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। সেই সকল সঙ্গীতের মধ্যে এমন অনেক গান আছে যে তাহা মনে প্রাণে গীত হইলে মনে হয় যেন সেই সময়ের জন্য শ্রোতা মোহমুক্ত হইলেন। শুনিয়াছি যে, মহাকবি এবং মহাসাধক হাফেজের গজল পাঠও শ্রবণে সংসারের অসারতা উপলব্ধি হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের গজল পড়িতে ভালবাসিতেন এবং উহা পড়িতে পড়িতে ভাবে বিভোর হইতেন। দেহাত্ম-জ্ঞান, জড়াত্ম-বোধ, অনাত্মা পদার্থে আত্মজ্ঞান শব্দ সমূহ এক পর্য্যায় ভুক্ত। এই সকল মিথ্যা জ্ঞান হইতে মুক্ত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা যে স্বরূপে পরমাত্মাই এই দিব্যজ্ঞান লাভ হইলেই অথবা Realisation হইলেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হইল।

ওঁং সারাৎসারং পরাৎপরং নিত্যমদেহং ওঁং

ওঁ

স্বপনের মত সুখ সংসারে অসার।
ধর্ম্ম ছাড়ি তাহে কেন মজ বারেবারে।
দুর্গন্ধ ঠাঁই মাংস পিণ্ড, তাহে দিবে কিরে পিণ্ড,
সব কাজ কর্ব্বে পণ্ড, ত্যজ ত্যজ ছার।
যে দ্বারেতে রেতোমুক্তি, সে দ্বারে নাহিক মুক্তি,
সাধু-উক্তি ভক্তি মুক্তি, এতে নাহিক বিচার।
সত্যধর্ম্ম জ্যোতিঃ ল'য়ে যাও আনন্দে মজিয়ে,
বিভুর চরণতলে, পাইবে মুকতি সার। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

উপনিষদুক্তা আখ্যায়িকা যোগে আত্মা ও জড়ের পার্থক্য বিচার

ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত নারদ-সনৎকুমার সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে ঋষি নারদ ঋষি সনৎকুমারের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া বলিতে-ছেন যে তিনি চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র অবগত আছেন। কিন্তু এই প্রকার বিদ্বান হইয়াও তিনি মন্ত্রবিৎ মাত্র, আত্মবিৎ নহেন। ঋষি সনৎ কুমার বলিলেন যে নারদ যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা নামমাত্র। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি যতদূর, তাহারও গতি ততদূর হয়। এইরূপে তিনি নাম অপেক্ষা বাক্, বাক্ অপেক্ষা মন, মনঅপেক্ষা সঙ্কল্প, সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অপেক্ষা বল, বল অপেক্ষা অন্ন, অন্ন অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা তেজঃ, তেজঃ অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি, স্মৃতি অপেক্ষা আশা, আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে যাহারা বাক্, মনঃ, সংকল্প প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, উহাদের গতিও যতদূর, তাঁহাদের (সেইরূপ উপাসকদিগের) গতিও ততদূর। অর্থাৎ যাঁহারা জড় এবং অন্তঃকরণের অবস্থা সমূহই সমুদায় (সর্ব্বস্ব) মনে করেন, তাহাদের জড়ের রাজ্যেই বাস করিতে হয়, আত্মার রাজ্য

তাহাদের হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তৎপর ঋষি সনৎ কুমার প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ দেখাইয়া বলিলেন যে "সত্যস্বরূপকে বিশেষ রূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত এবং সত্য স্বরূপের বিজ্ঞান মনন সাপেক্ষ, মনন শ্রদ্ধা সাপেক্ষ, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্ম সাপেক্ষ ও কর্ম্ম সুখ সাপেক্ষ বলিয়া তিনি শেষে বলিলেন যে ভূমাই সুখ স্বরূপ, অল্পে সুখ নাই।" ভূমার লক্ষণে তিনি বলিলেন যে যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্টি গোচর হয় না, অন্য কিছু শ্রবণ করা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহাই অল্প। যাঁহা ভূমা, তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল। শেষে ঋষি সনৎ কুমার বলিলেন:—"তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্ন-মাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সংকল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যা-ত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭২৬-১)।"
"বঙ্গানুবাদ:—এই প্রকার দ্রষ্টা, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকটে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব। আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্র সমূহ, আত্মা হইতে কর্ম্ম সমূহ, আত্মা হইতে এই সমুদয়ই উৎপন্ন হয়। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মই সত্য ও ভূমা এবং অন্য সকল তাহা হইতে উৎপন্ন। ইহা দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে জড় আত্মা নহে এবং কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। জড় উৎপন্ন পদার্থ। উহা কি ভাবে উৎপন্ন

এবং উহা যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের অবলম্বনে তাঁহারই ইচ্ছায় একটু কারুকার্য্য খচিত পদার্থ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উহা 'আত্মা' পদ বাচ্য হইতে পারে না। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে মহর্ষি সনৎ কুমার ভূমাতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মই আছেন, জড় জগৎ নাই। কিন্তু অবশেষে ব্যাখ্যা বিস্তারে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেই একান্ত ভাবে অবস্থিত এবং উহার অস্তিত্ব ব্রহ্মের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সপ্তম ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মকে জগতের অন্তর্যামী ভাবে বলা হইয়াছে। মহর্ষি সনৎ কুমার ৭।২৪।১ মন্ত্রে প্রথমতঃ বলিলেন যে ভূমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহাতে যদি নারদের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাই তিনি আবার বলিলেন যে তিনি স্বীয় মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত নহেন। অর্থাৎ তিনি নিরালম্ব। "সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং" (মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র)। সেইরূপ এস্থলেও ঋষি প্রথমতঃ যাহা বলিলেন, উহার সহিত তাঁহার শেষ উক্তির সমন্বয় করিয়া প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ চিন্তা করিতে কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠক ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তমখণ্ড হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে দেব ও অসুরগণ শুনিতে পাইলেন যে প্রজাপতি পাপরহিত, জরারহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসা রহিত, সত্যসঙ্কল্প ও সত্যকাম আত্মার অনুসন্ধান দিতে পারেন, যাহার জ্ঞান লাভ হইলে সমুদায় লোক ও সমুদায় কামনা লাভ করা যায়। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ইন্দ্র এবং বিরোচনকে প্রজাপতির নিকট তত্ত্ব জানিতে পাঠাইলেন। উভয়ে প্রজাপতির নির্দ্দেশে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বাস করিয়া প্রজাপতির নিকট আগমনের কারণ জানাইলেন। তিনি প্রথমতঃ

বলিলেন যে চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় এবং জলে যে স্বমূর্তির প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তিনিই আত্মা, অমৃত ও অভয় এবং তিনিই ব্রহ্ম। এই উপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র ও বিরোচন চলিয়া গেলেন। বিরোচন নিশ্চিন্তরূপে বুঝিলেন এবং অসুরদিগকে উপদেশ দিলেন যে, দেহই সমুদায় এবং দেহের পরিচর্য্যায়ই ইহলোক ও পরলোক লাভ করা যায়। এই তত্ত্বকেই আসুরী উপনিষদ্ বলে। অপর দিকে ইন্দ্র পথে যাইতে যাইতে মনে করিলেন যে দেহ সুমার্জ্জিত হইলে জলস্থ দেহও সুমার্জ্জিত হয়, অন্ধ হইলে তাহাও অন্ধ হয় ইত্যাদি, নিজেদের দেহের বিকারে প্রতিবিম্বেরও বিকার হয়। আত্মার তাহা হইতে পারে না। কারণ, আত্মার ঐরূপ বিকার অসম্ভব। সুতরাং তিনি প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিলেন। উপদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র পুনরায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বাস করিলে তাঁহাকে প্রজাপতি এবার বলিলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষই অমৃত, অভয়, তিনিই ব্রহ্ম। ইন্দ্র পুনরায় শান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন এবং পথে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে যদিও স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষদেহ বিনষ্ট হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, দেহ খঞ্জ হইলে উহা খঞ্জ হয় না, অন্ধ হইলে উহা অন্ধ হয় না, তথাপি স্বপ্ন পুরুষ দুঃখ পায়, ক্রন্দন করে ইত্যাদি। সুতরাং এ তত্ত্বও সত্য নহে। অর্থাৎ আত্মার এইরূপ বিকার অবস্থা সম্ভব নহে। সুতরাং ইন্দ্র পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রজাপতির নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিলেন। আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসু হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে নিদ্রিতাবস্থায় প্রসুপ্ত জীবই আত্মা, তিনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম। ইন্দ্র পুনরায় শান্ত মনে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে সুষুপ্তি কালে জীবের আত্ম বিষয়ে কোনই জ্ঞান থাকে না ও ভূত সমূহকেও জানিতে পারে না। এই সময় ইহা বিনষ্ট হয় অথবা যেন বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ নিজেরই জ্ঞান যখন একরূপ বিলুপ্ত এবং তমঃ দ্বারা একান্তভাবে অভিভূত, তখন এই অবস্থা আত্মা হইতে পারে না। তিনি আবার প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া প্রজাপতির নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিলেন। উপদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বাস করিলেন ও জিজ্ঞাসু হইলে প্রজাপতি প্রকৃত আত্মার বিষয় উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন: "মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা-শরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরী-রস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" (ছান্দোগ্য-৮।১২।১)। অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরানীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্। ছান্দোগ্য—৮।১২।৪।" "অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। (ছান্দোগ্য—৮।১২।৫)।' বঙ্গানুবাদ:—"হে মঘবন্! এই শরীর মর্ত্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্থ। (কিন্তু) ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংযোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; (অর্থাৎ ইহা প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে) অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।" "তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের (অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকার) যে স্থলে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী পুরুষ (বর্ত্তমান); চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। (দেহের মধ্যে থাকিয়া) যিনি বুঝিতেছেন যে "আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি," তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন "আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছি," তিনিই আত্মা; বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন—"আমি ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি," তিনিই আত্মা; শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য।" "আর যিনি এই বুঝিতে-ছেন যে "আমিই ইহা মনন করিতেছি" তিনিই আত্মা, মন ইহার দৈব

চক্ষু। তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্য বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ)"। উক্ত আলোচনায়ও আমরা দেখিলাম যে শরীর অর্থাৎ জড় মর্ত্ত্য এবং আত্মা অশরীরী এবং অমৃত। শরীর আত্মার যন্ত্র মাত্র। সুতরাং আত্মা ও জড় এক নহে এবং হইতেও পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে রাজর্ষি জনক এক মহাযজ্ঞে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম বিদ্বানকে সহস্র গাভী ও বহু সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বহু দার্শনিক বিচার হইয়াছিল। ঋষি উদ্দালক আরুণির "অন্তর্যামী" সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন :—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যা-ম্যমৃতঃ।" "যোহপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোহন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোহপোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মন্তর্যাম্যমৃতঃ।" (বৃহ-৩।৭।৩-৪) "বঙ্গানু-বাদ :- যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, (অথচ) পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।" "যিনি জলে অবস্থিত অথচ জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে জানে না, কিন্তু জল যাঁহার শরীর এবং যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।" ঋষি ঠিক উক্ত রূপে একই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, যিনি অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, দিক্ সমূহে, চন্দ্রতারকে, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, সর্ব্বভূতে, প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে, জীববীজে অবস্থিত, অথচ উপরোক্ত পদার্থ সমূহ হইতে পৃথক্, তাহারা যাঁহাকে জানে না, কিন্তু তাহারা যাঁহার শরীর এবং তাঁহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই

আমাদের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী এবং অমৃত ও অভয়।* উক্ত উক্তিতেও আমরা দেখিলাম যে স্বয়ং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই বলিতেছেন যে ব্রহ্ম বিশ্বে অবস্থিত বটে অথচ তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্, বিশ্ব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি বিশ্বের অন্তরে থাকিয়া বিশ্বকে নিয়মিত করিতেছেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে জড় আত্মা নহে, কিন্তু জড় আত্মা হইতে পৃথক্। জড় ও আত্মার পার্থক্য সূচক নিম্নলিখিত উপনিষদুক্ত মন্ত্র সমূহ পাঠক দেখিতে পারেন। বাহুল্য ভয়ে উহারা উদ্ধৃত হইল না এবং যে সম্বন্ধে উহারা উক্ত হইয়াছে, তাহাও লিখিত হইল না। "কেনোপনিষদ্—১।২-৮।" "কঠোপনিষদ্—১।২।১৩-১৪, ২।২।৩-৫ এবং ২।৩।১৭" "ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৮।১৪।১" অতএব উপনিষদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জড় আত্মা নহে।

ওঁং শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং পূর্ণমমৃতম্ ওঁং

* অযথা প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বিস্তার ও পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতির আশংকায় এস্থলে উক্ত সংবাদের ৫ হইতে ২৩ মন্ত্র ও উহাদের প্রত্যেকটীর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না, কিন্তু উপরোক্ত অংশে উহাদের সমস্ত অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে ঋষি ২১টী মন্ত্রে (৩ হইতে ২৩ মন্ত্র পর্য্যন্ত) যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বকেই বুঝায়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহের (৩।৭।৩-২৩ মন্ত্র সমূহের) উপর পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিম্নোধৃত মন্তব্যের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "পৃথিব্যাঃ অন্তর'—এই অংশের অর্থ 'পৃথিবী হইতে পৃথক'। এস্থলে 'পৃথিব্যাঃ' পঞ্চমীর একবচন। শংকর ষষ্ঠী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া এই অংশের অর্থ করিয়াছেন—'পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া'। এ প্রকার করিলে 'পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্' এবং 'পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ' এই উভয় অংশের অর্থ একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এই ব্রাহ্মণে এই প্রকার ২১টী মন্ত্র আছে। ১১টী স্থলে ৫মী কি ষষ্ঠী বিভক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ১০টী স্থলে পঞ্চমী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন অদ্ভ্যঃ, অন্তরীক্ষাৎ, আদিত্যাৎ, দিগ্ভ্যঃ তারকাৎ, আকাশাৎ ইত্যাদি। এই ২১টী মন্ত্র একই প্রকার। সুতরাং সর্ব্বত্রই একই বিভক্তি। সুতরাং সর্ব্বত্রই ৫মী বিভক্তি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।"

প্রোক্ত স্থল সমূহে "পৃথক্" শব্দের অর্থ Distinct, বিভক্ত নহে।

ওঁ

এই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, ইঁহার চৈতন্য
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়,
মস্তিষ্ক বা প্রাণ অর্থাৎ জীবনী শক্তি
নহে। একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে,
অন্য কাহারও চৈতন্য নাই। (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা ।

জড়ের চৈতন্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া

পরলোকগত Sir J. C. Bose আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে ধাতু পদার্থের অনুভূতি আছে। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ বিজ্ঞানজগৎ এখনও গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ইহা এখনও theory মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে নাই। জড়ের আধ্যাত্মিক গুণ নাই এবং থাকিতেও পারে না, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেই গুণরাশির মধ্যে প্রধান গুণ (জ্ঞান) তাহা যে জড়ে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আমাদের আলোচনার অধিকার নাই বটে, তবে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ যখন ইহা স্বীকার করেন নাই, তখন এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে Sir J. C. Bose যাহাকে জ্ঞান বলিয়াছেন, তাহা সেই পদার্থের অবস্থা ভেদ মাত্র বলা যাইতে পারে। পরীক্ষাকালীন নানা নূতন অবস্থার আবির্ভাবে ঐরূপ সংঘটিত হয়। জড় অচেতন এবং উহা চৈতন্য দ্বারা চালিত হইলে চলে এবং উহা থামাইলে থামে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র বলিতেছেন এবং ইহা যে সত্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ত চিরকাল জড়কে অচেতন বলিয়াই আসিতেছেন এবং সেই মতই বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি বলিতে পারা যায়। অন্তঃকরণ যে জড়েরই কার্য্য, তাহাও বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। চিন্তাশক্তিকে তাহারা জড়োৎপন্ন মাত্র মনে করিয়া জড় এবং অন্তঃকরণের পার্থক্য লোপ করিতে চাহেন।* আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি যে জড়-

* অন্তঃকরণ সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে ২৯৯-৩০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

জগতের বিধান বহুস্থলে আধ্যাত্মিক জগতের বিধানানুরূপ। দুইটী বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে। অঙ্গারই হীরকে পরিণত হয়। অপর দিকে তমসাচ্ছন্ন মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরমোন্নত হন, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানজ্যোতিতে নিত্য পূর্ণ থাকে, অন্ধকার আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। অঙ্গারের পক্ষে হীরকে পরিণতি উহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু নানাবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যে নানা পদার্থের সহিত উহার সংযোগ হয়, তাহারই ফলে উহা হীরকে পরিণত হয়। অর্থাৎ নানা প্রণালীর অবলম্বনে উহার উপরে যে Physical and Chemical action হয়, তাহারই ফলে পরিণামে উহা হীরকখণ্ডে পরিণত হয় এবং অত্যুজ্জ্বলতা ধারণ করে। এই যে অঙ্গারের পক্ষে নানাবিধ জড়ের ক্রিয়া, তাহা পরম চেতন পরমপিতার ইচ্ছায়ই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জড় নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকিতে বাধ্য। আমরা ইহা কেনোপনিষদ পাঠেও জানিতে পারি। এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" এবং "কল্পবাদ" অংশদ্বয়ে লিখিত বিষয় দ্রষ্টব্য। অপর দিকে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাঁহার সাধন ও ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। উভয় পক্ষেই চেতনের ক্রিয়া। মানবেও যে স্বাধীনতা আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি এবং ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইব। মানবের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ দৃষ্টও বটে। এস্থলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে মানবের অন্যান্য গুণও যেমন সীমাবদ্ধ, তাহার স্বাধীনতাও সেইরূপ সসীম। আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছি যে পরমপিতার ইচ্ছায় জীব নিম্নতম স্তরে আদিজন্ম লাভ করে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় এবং নিজ সাধনা বলে তিনি অত্যুন্নত হইয়া পরিশেষে ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। অপর দিকে পরমপিতার ইচ্ছায়ই তাঁহার একটী স্বরূপের অবলম্বনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পোষণ করিতেছেন এবং মহাপ্রলয়ান্তে উঁহা তাঁহারই ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হইবে। উঁহাতে যে কারুকার্য্য সংঘটিত হইয়াছে,

তাহা ধ্বংস হইবে এবং সেই স্বরূপ কারুকার্য্য বিবর্জ্জিত হইবে। অর্থাৎ ইহার পৃথক্‌ভাবে ভাসমানত্ব আর থাকিবে না। পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থলেই চেতনের ইচ্ছা—চেতনের ক্রিয়া। জড় সৃষ্টি ও পুষ্টি পরম চেতনের ইচ্ছায় সম্ভব হইয়াছে, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় উহা লয়প্রাপ্ত হইবে। এই দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে. জড় ও আত্মিক রাজ্যে একরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে এবং চেতনের ইচ্ছা ভিন্ন চৈতন্যশূন্য জড় পদার্থ কিছুই করিতে পারে না। অতএব জড় এবং চেতনে অনুরূপ অবস্থা দেখিলেই উহারা চেতন বা অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ সঙ্গত হইবে না। প্রত্যেক অবস্থার মর্ম্ম গভীর চিন্তা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, নতুবা ভ্রান্তি অনিবার্য্য। ধাতু পদার্থ spirit-এর মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিলে উহাতে পরিবর্ত্তন অনুমিত হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে উহাতে চৈতন্য আছে। ঐ পরিবর্ত্তন জড়ীয় পরিবর্ত্তন মাত্র, অর্থাৎ Physical and Chemical action এর ফল মাত্র। মানব যদি মদ্য অথবা অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করে, তবে তাহার মধ্যেও উত্তেজনা দেখা যায়। ইহার অর্থ এই মাত্র যে ঐরূপ পদার্থ পান করিলে শারীরিক জড়তার যে সাময়িক ভাবে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষয় হয়, তাহাতেই ঐরূপ অনুভব হয়। নতুবা উত্তেজক পদার্থ মানবকে জ্ঞান দান করিতে পারে না, উহা জ্ঞান বিরোধী জড়াবরণ যৎ সামান্য উন্মোচন করে মাত্র অথবা বলিতে পারা যায় যে উহা দেহকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে এবং সাময়িক ভাবে তমঃ অবস্থা হইতে রজঃ অবস্থায় আনয়ন করে। আত্মার জ্ঞান নিত্য। তাঁহা জড়াবরণে আবৃত বলিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেই আবরণ যতটুকু উন্মুক্ত হইবে, জীব ততটুকু মাত্র জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবেন। এই তত্ত্ব আত্মার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও সত্য। অর্থাৎ অনন্ত গুণই আবরণে আবৃত এবং উহাদের আবরণ যতই উন্মোচন করা হইবে, ততই সাধক সেই সেই গুণের দিকে অগ্রসর হইবেন। কেহ কেহ বলেন যে Sir J. C. Bose এর আবিষ্কার সত্য, কিন্তু তিনি ভারতবাসী। এত বড় আবিষ্কার তাঁহার

দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগের পক্ষে কষ্টকর। আমাদের তাহা বিশ্বাস নহে। কারণ, বিজ্ঞান ত সুস্পষ্ট পরীক্ষিত সত্য তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে। "সূর্য্য আলোক দান করে," এই বৈজ্ঞানিক সত্য তত্ত্ব কোনও বিদ্বেষ বা মিথ্যা সংস্কার দ্বারা যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, তেমনি Sir J. C. Bose এর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে জগৎ সমক্ষে ধরিলে উহাকে নাকচ করিবার শক্তি বিজ্ঞান জগতের কেন, কোন ব্যক্তিরই নাই। কেহ কেহ বলেন যে Sir J. C. Bose এর আবিষ্কার বেদান্ত তত্ত্বের সহিত এক। এই উক্তি যে সত্য নহে, তাহা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদিগণের শিরোমনি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সমূহ পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্বৈতবাদিগণ জড়কে চৈতন্য শূন্য ও অনাত্মা শব্দে অভিহিত করেন। তাঁহারা জড়কে সম্পূর্ণ মিথ্যাই বলিয়া থাকেন। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব কেবলম্।" তাহারা বলেন যে মায়ার অপগমে সকলই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু নামরূপ ভাবে আমরা যাহা দেখি, তাহা অর্থাৎ জড় জগৎ আর তখন থাকে না। এই সম্বন্ধে মায়াবাদ অংশে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অদ্বৈতবাদিগণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। শঙ্কর স্বামী বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে জড় পদার্থ চৈতন্য শূন্য :—"যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়গোচরয়োর্ব্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বি-রুদ্ধ-স্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মানামপি সুতরা-মিতরেতর ভাবানুপপত্তিঃ।" "অর্থাৎ এখানে যুষ্মৎ পদের অর্থ—অনাত্মা জড় পদার্থ মাত্র, যাহাকে 'ইদং' (এই) বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, আর অস্মদ্ পদের অর্থ চিৎ স্বভাব আত্মা হয়। বিষয়ী—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় আছে বলিয়াই তিনি বিষয়ী, আর যুষ্মৎ পদার্থ—জড় বস্তু হয় তাহার বিষয়, অর্থাৎ চিৎপ্রকাশ্য। উক্ত যুষ্মৎ-প্রতীতিগম্য বিষয় ও অস্মৎ-প্রতীতিগম্য বিষয়ী (চৈতন্য), উভয়ই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব, অন্ধকার ও আলোক

যেমন বিরুদ্ধ স্বভাব, অহংপ্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং প্রত্যয়গম্য জড় স্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে ; যাহা অন্ধকার, তাহাও আলোক নহে। এইরূপ যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে 'এবং যাহা অনাত্মা তাহাও আত্মা নহে ; সুতরাং অহং জ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদং জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতর ভাব অর্থাৎ পরস্পরা ধ্যান বা তদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ আত্মায় অনাত্মায় তদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়গত ধর্ম্ম সমূহেরও জাড্য চৈতন্যাদি গুণেরও পরস্পর তদাত্ম্য-ভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (কালীবর বেদান্তবাগীশ)।" অন্যান্য পন্থার বৈদান্তিকগণও জড়কে জড় বা চৈতন্য শূন্যই বলিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত আবিষ্কার বেদান্তানুমোদিত নহে। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দর্শনও যথা—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক জড়কে চৈতন্যশূন্যই বলেন। অতএব দেখা হইতেছে যে কেবল বেদান্ত দর্শনই নহে, কিন্তু ভারতীয় সকল হিন্দু দর্শনই জড়কে ঈষৎ চেতনাবান অর্থে অচেতন অথবা পূর্ণ চৈতন্যবান বলেন নাই, বরং উহাকে চৈতন্য শূন্যই বলিয়াছেন। উপসংহারে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে কোন বিজ্ঞানই জড়ে চৈতন্য আছে, ইহা কখনও প্রমাণ করিতে পারিবে না। জড়ের বিশেষ ধর্ম্ম যে অচৈতন্য (চৈতন্য শূন্যতা) ইহা অতীব সত্য।

ওঁ চৈতন্যাচৈতন্যস্বরূপং ব্রহ্ম ওঁ

ওঁ

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন

পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনকালে জীবাত্মা তাঁহার (পরমাত্মার) জ্ঞান লাভ করেন এবং গুণ বা গুণরাশির সাহায্যে তাঁহার উপাসনা করেন। তখন বহিরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণ জীবাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি অনির্ব্বাচ্য, তিনি অবাঙ্‌মনসাধিগম্য অর্থাৎ তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের ত গ্রাহ্যই নহেন, এমন কি অন্তঃকরণ দ্বারাও তাঁহাকে ধরা যায় না, জানা যায় না। এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ পরমাত্মার দর্শনলাভ করিতে পারে না কেন। এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে পরমেশ্বরের দর্শন কি, সামান্য একটু ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়। আমাদের মধ্যে দেখি যে মুর্খ জ্ঞানীকে বুঝিতে পারে না। সে জ্ঞানীর জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার কোনও সত্য ধারণা হয় না। এমন কি, এক শ্রেণীর জ্ঞানী অন্য শ্রেণীর জ্ঞানীকে সেরূপভাবে ধারণা করিতে পারেন না। যথা—সাহিত্যে পণ্ডিত পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী কোন ব্যক্তির জ্ঞানকে যথোপযুক্তরূপে ধারণা করিতে পারেন না। তবে মুর্খ হইতে তিনি অধিকতর ভাবে ধারণা করিতে পারেন বটে, কারণ, তাহার একপ্রকার বিদ্যা অধিগত হইয়াছে। বিদ্যা হিসাবে সাহিত্য এবং পদার্থবিদ্যা উভয়ই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেমিক নহেন, কেবল শুষ্ক বিষয় নিয়াই কাল যাপন করেন, তিনি কখনও অত্যুন্নত প্রেমিকের প্রেম ধারণা করিতে পারেন না; কেবল তাহাই নহে, বহু সময় তিনি ঐরূপ প্রেমিককে বিদ্রূপও করেন ও তাঁহার প্রেম লঘুভাবে দেখেন। সুতরাং যদি কেহ প্রেমগুণে পরমোন্নত অবস্থা লাভ না করেন, তবে তিনি অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম কি প্রকারে ধারণা

করিবেন ? দুইজন পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি যেমন একে অন্যের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারেন, দুইজন উন্নত প্রেমিক যেমন পরস্পরকে ধারণা করিয়া প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হন, সেইরূপ যখন সাধক কোন এক গুণে পরমোন্নত অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি পরমপিতার সেই গুণে তাঁহার দর্শন লাভ করেন। অর্থাৎ এক বা একাধিক গুণে পরম পিতার সহিত একীভূত না হইলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। এই সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথের উক্তি নিম্নে নিবেদিত হইল। "কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি প্রেমিক, ইহারা স্বাবলম্ব্য গুণের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই ঐ সকল গুণের চরমোৎকর্ষ স্থান ঈশ্বর নিরীক্ষিত হন।"—(তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। একত্ব সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "একত্ব এক প্রকার মুক্তি। জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ আছে তন্মধ্যে কোন এক গুণে অনন্তত্ব লাভ করাকেই একত্ব কহে। কেন না, ঐ গুণে সে জগদীশ্বরের সহিত এক হইল।"* কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলিয়া গিয়াছেন :—"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ? কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? যতদিন ভবে না হবে না হবে তোমার অবস্থা আমার সম, ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।" এই উক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে এক ভাবাপন্ন না হইলে পরস্পর পরস্পারের সুখ, শান্তি, দুঃখ, বেদনা কিছুই সম্যক রূপে ধারণা করিতে পারে না। যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে দুই জনের মধ্যে গুণের একত্ব হইলে একে অন্যকে ধারণা করিতে পারে, কিন্তু উভয়ের ভাবের একীকরণ না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। এখন আমরা দেখিব যে বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে কেন ধারণা করিতে পারে না! আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জড় পরমপিতার ইচ্ছা সহযোগে তাঁহার একটী স্বরূপের পরিণামে উৎপন্ন এবং উহা চিরবিকৃত। এই বিকৃতি জন্য উহা স্বভাবতঃই নিত্য

* তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের দর্শনে অসমর্থ। কারণ, চির বিকৃত পদার্থ নিত্য নির্ব্বিকারের সহিত কখনও এক হইতে পারে না। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ চির বিকৃত, সুতরাং উহারা কখনও নিত্য নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের দর্শনে সমর্থ নহে (ক)। এস্থলে যদি আমরা বিকার শব্দের অর্থ ধারণা করি, তবে এই বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবে। বিকার ছয় প্রকার। এস্থলে পরিণাম বিকারই বুঝিতে হইবে (খ)। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই হুবহু জড় জগৎ নহে, কিন্তু উঁহা তাঁহার ইচ্ছায় পরিণত হইয়া নানা নামরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাই জড় পদার্থ। সুতরাং জড় পদার্থ আর ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ ভাবেই থাকিল না। সুতরাং উহা কখনও নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না। আর একটী বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে জড় কেন পরমপিতার দর্শন করিতে সমর্থ নহে! ইতঃপর আধ্যাত্মিক ও জড়ীয় গুণ সম্বন্ধে বলা হইবে। তাহা হইতে ইহা জানা যাইবে যে পরমাত্মায় একমাত্র আধ্যাত্মিক গুণই বর্ত্তমান, কিন্তু জড় পদার্থে সেই সকল গুণের কিছুই নাই। আমরা এখন দেখিলাম যে দুই জনের মধ্যে গুণের একত্ব হইলে পরস্পর পরস্পরকে ধারণা করিতে পারে, কিন্তু জড়ের যখন কোনই আধ্যাত্মিক গুণ নাই, তখন সে কি প্রকারে পরমপিতার গুণ ধারণা করিতে পারিবে? সুতরাং জড়ের পক্ষে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ণ ব্যোমের সত্ত্বাংশ দ্বারা, ত্বক্ মরুতের সত্ত্বাংশ দ্বারা, চক্ষু তেজের সত্ত্বাংশ দ্বারা, জিহ্বা রসের সত্ত্বাংশ দ্বারা এবং নাসিকা ক্ষিতির সত্ত্বাংশ দ্বারা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে। ইহার জন্যই আমরা ব্যোমের গুণ শব্দ কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, ত্বক্ দ্বারা মরুতের গুণ স্পর্শ অনুভব করি, চক্ষুর দ্বারা তেজের

(ক) অন্তঃকরণ সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য।

(খ) "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখা গিয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণাম হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। কিন্তু জড় পদার্থ চির বিকৃত, কারণ, উহা হুবহু অব্যক্ত স্বরূপ নহে।

গুণ রূপ দর্শন করি, জিহ্বা দ্বারা অপের গুণ রস আস্বাদন করি এবং নাসিকা দ্বারা ক্ষিতির গুণ গন্ধ গ্রহণ করি। আরও একটু অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে আমরা কর্ণ দ্বারা স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণ করিতে পারি না বা উহাদের জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। সেইরূপ ত্বক দ্বারা শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ, চক্ষু দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ ও জিহ্বা দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও গন্ধ এবং নাসিকার দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গ্রহণ করিতে পারি না বা উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। অর্থাৎ যে জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ভূত প্রধান ভাবে গঠিত, সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতেরই গুণ ধারণা করিতে পারে, অন্য ভূতের গুণ ধারণা করিতে পারে না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে স্পর্শ গুণ সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমাদের সমস্ত দেহই সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও অল্পাধিক পরিমাণে ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং যে স্থানে ত্বক্ আছে, সেই স্থানেই স্পর্শ গুণের অনুভূতি আছে। নতুবা জ্ঞানেন্দ্রিয়ত্ব হিসাবে ত্বক্ ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্পর্শ শক্তি নাই। আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মরুতের দুইটী গুণ, যথা—শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিনটী গুণ, যথা—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অপের চারিটী গুণ, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ক্ষিতির পাঁচটী গুণ, যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সুতরাং পূর্ব্বে যে লিখিত হইল যে ব্যোমের একটী গুণ শব্দ, বায়ুর একটী গুণ স্পর্শ, তেজের একটী গুণ রূপ, অপের একটী গুণ রস এবং ক্ষিতির একটী গুণ গন্ধ, ইহা সত্য নহে। ইহার উত্তর দুই ভাবে প্রদত্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ যে সকল গুণ যে সকল ভূত সম্বন্ধে আপত্তি অংশে লিখিত হইল, উহারা মিশ্রিত পঞ্চভূতের গুণ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চভূত সৃষ্টি হইবার পর উহারা পরমপিতার ইচ্ছায় পঞ্চীকৃত পঞ্চ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে যে সকল ভূত বর্ত্তমান, তাহা বিশুদ্ধ ভূত নহে। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে মিশ্রণের কত স্তর আছে, তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের বুঝিতে

হইবে যে ব্যোমের গুণ শব্দই, মরুতের গুণ স্পর্শই, তেজের গুণ রূপই, অপের গুণ রসই, ক্ষিতির গুণ গন্ধই। উহাদের যে অন্যান্য গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উহাদের গুণ নহে, অন্য ভূত বা ভূতসকল উহাদের মধ্যে মিশ্রিত আছে বলিয়া সেই সেই ভূতের গুণ আমরা লক্ষ্য করি। যথা জলের রূপ। ইহা অপের গুণ নহে, কিন্তু মিশ্রিত অপে তেজঃ অংশের গুণ, অর্থাৎ জলে যে রূপ দেখা যায়, তাহা তেজেরই রূপ, অপের নহে ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্ত্তমানের মিশ্রিত ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমান্বয় নিজস্ব গুণ, বিশেষ গুণ বা প্রধান গুণ। অন্যান্য গুণ উহাদের আছে বটে, কিন্তু তাহা সংমিশ্রণ জন্য এবং উহারা অপ্রধান গুণ। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চভূতের গুণরাশি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মতানুযায়ী ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের গুণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। উহাদের মধ্যে যে অন্য গুণ দেখা যায়, তাহা ভূতগণের পঞ্চীকৃত পঞ্চ হইবার জন্য সম্ভব হইয়াছে। অন্য মতানুযায়ী ব্যোমের বিশেষ গুণ শব্দ এবং বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ এবং উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত গুণ শব্দ, এইরূপ তেজের বিশেষ গুণ রূপ এবং উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত শব্দ ও স্পর্শ; অপের বিশেষ গুণ রস এবং উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ এবং উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত গুণ চতুষ্টয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। এই মতাবলম্বিগণও ভূতগণের পঞ্চীকরণ স্বীকার করেন এবং ঐরূপ মিশ্রণ জন্য যে উহাদের নানা গুণরাশি দেখা যায়, তাহাও বলিয়া থাকেন। প্রথম মতানুসরণ করিয়া আমরা প্রশ্নের প্রথম উত্তর দান করিয়াছি। এখন দ্বিতীয় মত অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমান্বয় ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ ও ক্ষিতির বিশেষ গুণ বা প্রধান গুণ, কিন্তু উৎপাদক হইতে প্রাপ্ত উহাদের অন্যান্য গুণ অপ্রধান। অতএব দেখা গেল যে উক্ত আপত্তিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কোনই হানি হইল না। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে বিশেষ বিশেষ বিষয় আছে, তাহা যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

অর্থাৎ কর্ণের একমাত্র বিষয় শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস এবং নাসিকার গন্ধ ধারণা করিবার শক্তি আছে অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ের মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই আলোচনা দ্বারাও আমরা দেখিলাম যে, যে জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ভূতের সত্ত্বাংশ প্রধানভাবে গঠিত, সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই ভূতের গুণই ধারণা করিতে পারে, অন্য ভূতের গুণ ধারণা করিতে পারে না। অর্থাৎ অন্য ভূত সমূহের জ্ঞান আমাদিগকে দিতে পারে না, অতএব আধ্যাত্মিক জগতের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুইজনের গুণের একীকরণ না হইলে পরস্পর পরস্পরকে ধারণা করিতে পারে না, তাহা জড়জগতেও আমরা দেখিতে পাইলাম। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে বহিরিন্দ্রিয়, যাহা জড় পদার্থ মাত্র, তাহা ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না। এখন অন্তঃকরণের সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। অন্তঃকরণের গঠন পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা তাহা গঠিত। সুতরাং তাহাও জড় এবং তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে আত্মাকে ধারণা করিতে পারে না। কারণ, জড় সত্ত্বভাবাপন্নই হউক্ অথবা তমোভাবাপন্নই হউক, উহা জড়ই। সুতরাং উহার গুণ জড়ের গুণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাবস্থায় জড়ের অবস্থা ভেদ হয় মাত্র, সুতরাং অন্তঃকরণের যন্ত্র জড়ের গুণ ভিন্ন অন্য কিছু ধারণা করিতে পারে না। অন্তঃকরণ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা গঠিত, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অর্থাৎ পাঁচটী বিষয়ই একা ধারণা করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণের এক একটী এক এক বিষয় ধারণা করিতে পারে, এইমাত্র প্রভেদ। অন্তঃকরণ সম্বন্ধে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উহাতে কেবলমাত্র জড়ই নহে, কিন্তু উহার এক অংশ আত্মিকও বটে। সুতরাং সেই অংশ কেন ব্রহ্মদর্শন করিতে পারিবে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে আত্মার গুণরাশি অন্তঃকরণের জড়যন্ত্রের সংসর্গে আসিয়া

বিকৃত ভাবেই প্রকাশিত হয়, উহারা কখন বিশুদ্ধ আত্মিক গুণ ভাবে প্রকাশিত হয় না। এস্থলে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দৃষ্টান্ত সহ বিস্তারিত আলোচনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই জন্যই অন্তঃকরণ আত্মিক গুণ সম্বন্ধে যাহা লাভ করে, তাহা সর্ব্বদাই বিকৃত। আবার মস্তিষ্কও কেবল অন্তঃকরণ নহে এবং আত্মিক অংশও অন্তঃকরণ নহে। উহাদের মিলিত অবস্থাই অন্তঃকরণ। মৃতব্যক্তির মস্তিষ্ককেও অন্তঃকরণ বলা হয় না। আবার জীবাত্মার গুণরাশিকেও অন্তঃকরণ বলা হয় না। অন্তঃকরণ যখন মিশ্রিত ও বিকৃত পদার্থ, তখন উহা কি প্রকারে অনন্ত সরল ও নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম দর্শন করিবে? অন্তঃকরণকে কেন জড় বলা হইয়াছে, তাহাও প্রোক্ত অংশে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে অন্তঃকরণ দ্বারা আমরা যাহা লাভ করি, তাহা সমস্তই অন্তঃকরণের যন্ত্রের মধ্য দিয়া পাই, অর্থাৎ উহার যন্ত্রই অন্তঃকরণের সকল প্রকাশ করে। সেই যন্ত্র জড় বলিয়া অন্তঃকরণকে জড় বলা হইয়াছে। অন্তঃকরণ = অন্তরে স্থিত যন্ত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও যন্ত্র। উহারা বাহিরে স্থিত বলিয়া উহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় বলে। জড়ীয় গুণ ও আধ্যাত্মিক গুণ পৃথক্। ইহা ইতঃপর লিখিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে জড়ের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা নাই, অর্থাৎ আত্মিক কোন গুণই নাই। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ জড়। উহাদেরও কোনও আত্মিক গুণ নাই। সুতরাং আত্মিকগুণ শূন্য বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ পূর্ব্ব প্রমাণানুযায়ী ব্রহ্মদর্শনে অসমর্থ। আর জড়ের যখন জ্ঞানই নাই, তখন উহা পরমাত্মার জ্ঞানলাভ কিরূপে করিবে? দেখা গিয়াছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও এক একটী মাত্র ভূতের গুণ ধারণা করিতে পারে, অন্য ভূতের গুণই যখন ধারণা করিতে পারে না, তখন উহারা কি প্রকারে অজড় ও অনন্ত গুণনিধান পরব্রহ্মকে ধারণা করিবে? আবারও আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং উহারা স্বয়ং ব্রহ্মদর্শনে অসমর্থ, ইহা সত্য। কিন্তু উহারাও কখনও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। উহাদের জ্ঞানলাভের শক্তি ত

নিজেদের নহে, তাহা আত্মারই, উহারা যন্ত্র মাত্র। সুতরাং আত্মা কেন উহাদের মাধ্যমে অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে না? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে বহিরিন্দ্রিয়গণ বাহিরের জ্ঞানলাভার্থেই গঠিত। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ (কঠোপনিষদ—৪।১)" "বঙ্গানুবাদ: স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্যই মনুষ্য বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত চক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। (তত্ত্বভূষণ)।" পরমপিতা বহিরিন্দ্রিয় সকলকে বহির্ম্মুখ করিয়া দিয়াছেন। অন্তঃকরণ বহিরিন্দ্রিয়গণ যাহা আনিয়া দেয়, তাহা লইয়া কার্য্য করে। বহিরিন্দ্রিয়গণ স্থূল ভাবে কার্য্য করে, অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম ভাবে এবং সময় সময় অতি সূক্ষ্ম ভাবে কার্য্য করে। অন্তঃকরণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। করণ অর্থে যাহা দ্বারা কার্য্য করা যায়। আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়গণই কেবল করণ নহে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও জ্ঞান লাভার্থে করণ মাত্র অর্থাৎ যন্ত্র মাত্র। উহারা বহিঃস্থিতঃ, কিন্তু অন্তঃকরণ অন্তরে স্থিত। উহাও যন্ত্র বিশেষ এবং জ্ঞান লাভার্থ সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। হিন্দু শাস্ত্রে মনকে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হয়। ইহা সকলেরই জানা আছে যে আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ রূপ জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ইহা সম্ভব হয় না যদি আমাদের মস্তিষ্কের অভাব হয়। আমরা মস্তিষ্ক বিহীন হইলে অথবা মস্তিষ্কের ক্রিয়া রাহিত্য হইলে কোন জ্ঞানই আমরা লাভ করিতে পারি না। সুতরাং মস্তিষ্কই আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান প্রকাশের যন্ত্র বা অন্তঃকরণের যন্ত্র। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মার জ্ঞান ও অন্যান্য গুণ এবং শক্তি সমূহ জড় যন্ত্রের সংসর্গে আগমন জন্য বিকৃত হয় এবং সেই জন্য অন্তঃকরণ ব্রহ্মদর্শনে

অসমর্থ। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অন্তঃকরণ যখন পাক্ষিক ভাবে আত্মিক, তখন উহা ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না বটে, কিন্তু সুমার্জ্জিত হইলে উহাতে ব্রহ্মের গুণ প্রতিভাত হইতে পারে। এস্থলে নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিকে সত্ত্বময়ী কর, মনকে স্থির ও একাগ্র কর এবং অহংকারের অসারতা ধারণা কর, তবেই দেখিতে পাইবে যে সত্ত্বময়ী সুতরাং স্বচ্ছা বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে, তখনই স্বরূপাবস্থা লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন উপস্থিত হইবে এবং তখনই অসার পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সারাংসারের প্রতি প্রযত্ন হইবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইতে পার, তবেই অচিরে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবে। (তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা)"। জীবাত্মা পরমাত্মায় একান্ত ভাবে অবস্থিত। "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই"। সুতরাং আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করিতে জড়ের মধ্যবর্ত্তিতার (medium এর) সাহায্য লইবার আবশ্যকতা কোথায়? জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত নিত্য অবছিন্ন ভাবে সংযুক্ত। সুতরাং আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করিতে অন্য জড়ীয় যন্ত্রের প্রয়োজন কি? বহিরিন্দ্রিয়ের লয় অন্তঃকরণে ও অন্তঃকরণের লয় জীবাত্মায় হইলেই অর্থাৎ সাধক যখন নিজে সর্ব্ব প্রকার জড় ভাব হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ যখন "তিনি আত্মাই, দেহ বা অন্তঃকরণ নহেন" এই দিব্য জ্ঞান তাঁহাতে উজ্জ্বল হয়, তখনই তিনি পরমাত্মার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন, ইহার পূর্ব্বে নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে "তুমি আর আমি মাঝে কিছু নাই" এই জ্ঞানের সমুৎকর্ষলাভ হওয়া প্রয়োজনীয়। জড় যে কেবল ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু উহা ব্রহ্মদর্শনের বাধা উৎপাদন করে। সেই জন্যই জড়ভাবে জড়িত জীব তাঁহার দর্শনলাভ করিতে অসমর্থ। কারণ, তিনি নিজেকে দেহ (জড়) ভিন্ন অন্য যে কিছু, তাহা ধারণা করিতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত এই মোহের হাত হইতে তিনি নির্ম্মুক্ত নহেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের আশা কোথায়? এই সম্পর্কে পাঠক "গুণ বিধান" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশদ্বয়ে

লিখিত আলোচনা স্মরণ করিবেন। তাহাতে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে দেহই আমাদের আবরণ, দেহের জন্য আমরা পরম পিতার দর্শন লাভ করিতে পারি না। ব্রহ্ম যে বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ গ্রাহ্য নহেন, সেইরূপ ভাব প্রকাশক কয়েকটী শ্রুতি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল : "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ। (৩) যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (৪) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (৫) যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (৬) যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (৭) যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (৮) (কেনোপনিষদ্ প্রথম খণ্ড)।" "বঙ্গানুবাদ :—'তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন; মনের গম্য নহেন।" "যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, তাঁহাকর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয় অর্থাৎ উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "লোকে যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদেরা বলেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুগোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "যাঁহাকে লোকে কর্ণদ্বারা শুনিতে পায় না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন অর্থাৎ জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "যাঁহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আঘ্রাণ করে না, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই যে

পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোতৃমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—৩।৮।১১)।" "বঙ্গানুবাদ: হে গার্গি! এই অক্ষরকে দেখা যায় না, (কিন্তু) তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, (কিন্তু) তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না (কিন্তু) তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না (কিন্তু) তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ মন্তা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদাঙ্করত্ন)।" "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্—৩।১।৮)।" "বঙ্গানুবাদঃ—পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" উপনিষদ্ হইতে আরও বহু উক্তি উদ্ধার করা যায়, বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে এইরূপ বহু সঙ্গীত বর্ত্তমান। একটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল: "অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে! প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে।" ইহার সম অর্থসূচক শ্রুতির মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২।৯)।" "বঙ্গানুবাদ:—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোন বস্তু হইতে ভয়প্রাপ্ত হন না। (তত্ত্বভূষণ)।" নবযুগ প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের

সঙ্গীতে আছে :—"মন যাঁরে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে? সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়।" আমরা এত সময় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ কেন পরমাত্মাকে দেখিতে পারে না, তাহারই আলোচনা করিলাম। এখন আমরা বিরুদ্ধবাদিকে এই প্রশ্ন করিতে পারি কিনা যে উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ "আমাকে" অর্থাৎ শরীরীকে দেখিতে পায় কিনা। তিনি হয়তঃ বলিবেন যে অন্তঃকরণ আত্মাকে জানিতে পারে। কারণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা দ্বারাই "আমি আছি" এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। এইরূপ ভাবে আমরা বুঝিতে পারি বটে যে 'আমি আছি,' কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঐ জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। ঐরূপভাবে "অতএব", "সুতরাং" দ্বারা আত্মার দর্শন হইল, একথা বলা চলে না।* আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন হওয়া চাই। আমরা ঘোর তমসাচ্ছন্ন, তাই আমরা অনেক সময় দেহকেই আত্মা বলি। মনের উপরে যে আত্মা আছে, এই ভাবের সত্য ধারণা কত জনের আছে? এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা মনকেই শেষ সীমা বলিয়া থাকেন ও পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর না বলিয়া Universal Mind বলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিতে প্রস্তুত নহেন। নিজেকেও নিজের দেখিতে হইবে। তাহাও জড় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা সম্ভব নহে। এস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথের একটা সঙ্গীতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "কেঁদে বলে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে, (ওরে) ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা, বুদ্ধি কৌশলে? আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক কর তাই, পরে দেখবে আছেন তিনি, ভাবতে কিছু হবে না হবে না।" এই "আমি আছি" ঠিক করিতে গেলেই মোহ হইতে, অহংকার হইতে এবং দেহাত্মবোধের হস্ত

---

* এই উক্তি দ্বারা পাঠক ইহা মনে করিবেন না যে আমরা উক্ত প্রকার জ্ঞান কিছুই নহে, ইহা বলিতেছি। যাহা আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য, তাহা এই যে (উক্ত প্রকার জ্ঞান) যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, কিন্তু উহা সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে বহুস্তর নিম্নে অবস্থিত।

হইতে মুক্ত হওয়া চাই, অর্থাৎ শিবত্ব লাভ করা চাই। প্রথমে "আমি কি বস্তু" না জানিলে আমি যাঁহার অংশভাবে ভাসমান, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সেই জ্ঞান দিবার ক্ষমতা নাই। কেন দিতে পারে না, তাহার যুক্তি পরমাত্মা পক্ষেও যাহা, এস্থলেও তাহা। এক্ষেত্রেও সাধনা একই। এত সময় আমরা যুক্তির অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রহ্ম অন্তঃকরণ ও বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। এখন শব্দ প্রমাণের সাহায্যে এই বিষয় আলোচনা করিব। যিনি সে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি তদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একটী প্রমাণ। এই প্রমাণকে আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ কহে (ক)। কেহ কেহ শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা সর্ব্বদাই কার্য্যতঃ আপ্তবচন স্বীকার করিতেছি। আপ্তবচন যদি মানুষ স্বীকার না করিত, যদি পূর্ব্বতনের অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ নিজেকে সম্পদশালী করিতে শিক্ষা না করিত, তবে মানুষ কখনও বর্ব্বরাবস্থা হইতে সুসভ্য সোপানে আরোহণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ যখন এই আপ্তবচন অবিসংবাদিত, তখন তাহা এই সমস্যার সমাধানে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান বিষয়ে সকল ঋষিই অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী সাধকগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে আমরা বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারি না এবং তাঁহার দর্শনার্থ আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণ জীবাত্মায় লয় করিতে হইবে এবং এইরূপভাবে জীব যখন অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় শিবত্ব লাভ করিবেন, তখন তিনি ব্রহ্মদর্শনের উপযুক্ত হইবেন।* দক্ষসংহিতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় উপরোক্ত ভাব সমর্থন করে। "বহির্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভির্মুখানি বৈ।

(ক) আপ্ত বচনের প্রামাণ্য সম্বন্ধে উক্ত তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

* "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" এই অর্থেই শিবত্ব শব্দ এই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্ব্বশ্চৈবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।। (১৯) সর্ব্বভাব-বিনি-র্ম্মুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ। এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যু গ্রন্থ-বিস্তরঃ।। (২০) "বঙ্গানুবাদ :—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়দিগকে অন্তর্মুখ করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়কে মনে এবং মনকে জীবাত্মায় যোজনা করিবে। (১৯) (এবং) সর্ব্বভাব-বিনির্মুক্ত হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় নিক্ষেপ করিবে। ইহাই ধ্যান এবং ইহাই যোগ। অবশিষ্ট সকল গ্রন্থ-বিস্তার মাত্র অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত যাহা যাহা বলা হয়, সে সমস্ত কেবল গ্রন্থের আয়তন-বৃদ্ধির জন্যই জানিবে। (২০) (পরমর্ষি গুরুনাথ)" উপনিষদ্ হইতে এই সম্বন্ধীয় কয়েকটী মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে আমরা উপরোক্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। "যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।। (কঠোপনিষদ্ ৩।১৩)" "বঙ্গানুবাদ :—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবা-ত্মাতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সর্ব্ববিকার শূন্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন। (তত্ত্বভূষণ)।" "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্।। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।। (কঠোপনিষদ্—৬।১০-১১)" "বঙ্গানুবাদ :—যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয় চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরম গতি বলেন। সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হন। যেহেতু যোগ উৎপত্তি ও অপায়ধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে, অতএব অপায় পরিহারের জন্য অপ্রমত্ত থাকা উচিত। (তত্ত্বভূষণ)।" বর্ত্তমান প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত মন্ত্রটীও ঐরূপ একটী মন্ত্র। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল। "প্রণব অর্থাৎ ওঁংকার ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং

শরের ন্যায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন।" (২-২।৪) (তত্ত্বভূষণ)। (মন্তব্য ঃ—এস্থলে আত্মারই মগ্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের উল্লেখ মাত্রও নাই। "অপ্রমত্তেন" শব্দ দ্বারা মনের লয় সূচিত হইয়াছে।) পরমর্ষি গুরুনাথ রচিত উক্ত ভাব সমর্থক একটী সঙ্গীত ও অন্য একটীর অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "মনরে বড় দুঃখ তোমার। (তুমি) দুঃখের ভাগী হও কিন্তু, সুখের ভাগী নহ আমার। অসার সংসার মাঝে যাহা কিছু রে বিরাজে, (তুমি) তাহা ল'য়ে সেজে গুজে থাক ওরে রে অনিবার। যখন সৌভাগ্য রবি, দেখায় মোরে নিজ ছবি, (ওরে) তখন লীন তব ছবি, দুর্ভাগ্য এ হ'তে কি আর? (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" 'অনাথের নাথ তুমি, তুমি চিরালম্ব ভূমি, বাক্যেরো অগম্য তুমি, মনোঽতীত জ্ঞানময়। মন না পেয়ে তোমারে, আসে নাথ দুঃখে ফিরে, লীনমনা কভু জীবে দেখা দেও কৃপাময়। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।' ব্রহ্ম সঙ্গীত হইতেও ঐরূপ ভাবের দুইটী সঙ্গীতের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ অনন্ত অম্বর। আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার, ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর। সে সঙ্গীতে হ'লে লীন, মনোবীণা স্পন্দহীন তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর! (মনোবীণা স্পন্দহীন হওয়ার অর্থই মনের লয়)।' "(তোমার) অখিল লীলারসে ডুবাব মানস হে। আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।" (মন্তব্য ঃ—এস্থলে "অখিল লীলারস" অর্থে প্রেমকে বুঝাইয়াছে। বিশ্বলীলা যে পরম পিতার প্রেমলীলা, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রেমে মনের লয় করিতে গায়ক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে অন্তঃকরণের লয় সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ সাধক ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহারই দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব এস্থলেও ভগবদ্দর্শন সময়ে মনের লয় হয়, ইহাই গীত হইয়াছে।) প্রোক্ত মহাত্মাগণ নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং সত্যকে পরমব্রতভাবে গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের উক্তিতে সন্দেহের কোনই কারণ থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ এই বিষয়ে সকলেই যখন একমত। অতএব শব্দ প্রমাণ দ্বারাও বুঝিতে পারিলাম যে জড় অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ব্রহ্মদর্শনে অসমর্থ। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ (এ সকলই জড়) পরমাত্মাকে দেখিতে বা জানিতে পারে না। কিন্তু জীব পরম করুণাময় পরমপিতার করুণায় পাপ, দোষ ও পাশমুক্ত হইলে ব্রহ্মদর্শনের উপযুক্ততা লাভ করেন। তখন তিনি যদি ব্রহ্মের কোনও এক গুণে পরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তবে অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় সেই গুণের চরমোৎকর্ষস্থান অর্থাৎ ঈশ্বর নিরীক্ষিত হন। "একত্ব একপ্রকার মুক্তি। জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ আছে, তন্মধ্যে কোনও গুণে অনন্তত্ব লাভ করাকেই একত্ব কহে। কেন না, ঐ গুণে সে জগদীশ্বরের সহিত এক হইল। একারণ আর্য্য শাস্ত্রে তাদৃশ পুরুষ ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (ক)।" ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণের অনন্ত মিশ্রণে যে একটী স্বরূপ হইয়াছে, তাহা নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার অনন্ত অরূপ-রূপ দর্শন এক বা একাধিক গুণে একত্ব লাভে সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে "সোঽহং জ্ঞান" এবং "গুণ বিধান" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে দেহধারী জীব কোটী কোটী গুণে একত্ব লাভ করিলেও পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না। কারণ, সেই অসংখ্য একত্বও অনন্ত একত্বের একত্বের কণা বই আর কিছুই নহে। এস্থলেও পূর্ব্বে আলোচিত তত্ত্বই প্রযোজ্য হইল। অর্থাৎ সাধক যে গুণে একত্ব লাভ করেন, তিনি পরমপিতাকে সেই গুণে দর্শন করেন। সাধক যে পরম পিতার অন্যান্য গুণে উন্নত হন না, তাহা নহে, তবে তিনি যে গুণে পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই গুণের ন্যায় অনন্ত ভাবে ব্রহ্ম দর্শন করেন না, যেমন কোন এক

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিষয়ই বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়েরও সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে নিরাকার পরব্রহ্মের দর্শন লাভ অসম্ভব। কীর্ত্তন বা উপাসনার অবস্থায় যে আনন্দানুভূতি তাঁহারা লাভ করেন, উহাকেই তাঁহারা ব্রহ্মদর্শন বলিয়া থাকেন। আমরা এই অনুভূতিকে তুচ্ছ করিতেছি না, কিন্তু এই অনুভূতি ব্রহ্মদর্শন নিশ্চিতই নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যধিক। প্রোক্ত আপত্তির উত্তর ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের আরও যে চিন্তা আসিয়াছে, তাহা বিনীত ভাবে নিম্নে নিবেদন করিতেছি। অনন্ত স্নেহময় পিতা তাঁহার অধম সন্তানের ধৃষ্টতা, ক্ষমা করুন, এই প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে ব্যাকুল জানাইতেছি। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মদর্শনে অসমর্থ, সুতরাং চক্ষুও ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শন কালে আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণ জীবাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই পরম শুভ মুহূর্ত্তে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাই বর্ত্তমান থাকেন। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ লীনাবস্থায় থাকায় তাহাদের কোনই ক্রিয়া থাকে না বা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ উহারা থাকিয়াও থাকে না। পরমাত্মা নিরাকার বটেন, কিন্তু তাঁহারই অংশ ভাবে ভাসমান জীবাত্মাও ত নিরাকার। সুতরাং নিরাকার আত্মা নিরাকার পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এস্থলে নিম্নলিখিত তত্ত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীবাত্মা যে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, ইহা ধারণা করা কঠিন হইবে না। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান জড় সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয় এবং চারি ভাগে প্রকাশিত হয়। যথা—বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার। আবার আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণ বহিস্থ পদার্থের জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ আত্মার যন্ত্র মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে এই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। উহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। অতএব

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যে সকল জ্ঞানের কার্য্য করে, উহার মূলে আত্মার জ্ঞান বর্ত্তমান। অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান যে বিকৃত, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, অন্তঃকরণ ও বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার মূলে আত্মার জ্ঞান থাকিলেও উহা বিকৃত। এই তত্ত্ব বিপরীত ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মার জ্ঞানে দর্শনাত্মক, শ্রবণাত্মক, স্পর্শণাত্মক, আঘ্রাণাত্মক, আস্বাদনাত্মক, বুদ্ধি-মনঃ-অহঙ্কার-চিত্তাত্মক এই নববিধ ভাব কারণরূপে বর্ত্তমান। যদি তাহাই না হইত, তবে অন্তঃকরণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ঐ সকল জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। অর্থাৎ আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞানই দেহ সংসর্গে নববিধ বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। স্থূল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে অন্তঃকরণ আত্মার যন্ত্র এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের যন্ত্র। সুতরাং উহাদের মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাদের কারণ অবশ্যই আত্মায় বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বাবা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে স্থূল জ্ঞান বলা যাইতে পারে, অন্তঃকরণ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান বলা যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার জ্ঞান নিত্যই কারণাকারে বর্ত্তমান। এই স্থূল ও সূক্ষ্মজ্ঞান বিকৃত, কিন্তু আত্মার জ্ঞান নিত্য বিশুদ্ধ ও সত্য। উহা যে নিত্য মললেশ শূন্য, তাহা বলাই বাহুল্য * আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পরমাত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, কিন্তু তিনি নিত্যই কারণ এবং কারণের অতীত। সুতরাং আমরা স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে যে জ্ঞান লাভ করি, সেইরূপ ভাবের জ্ঞান তাঁহাতে নাই। তাঁহার জ্ঞানও কারণাকারে তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। স্থূল ভাবে

* এই সম্পর্কে মায়াবাদ অংশে চিদাভাস সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ে পাঠক দেখিবেন। উহাতে আত্মার কার্য্য ও অন্তঃকরণের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান। এই আলোচনা সুদীর্ঘ ও জটিল, তাহা এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ অসম্ভব।

বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাঁহার অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি স্থূল, সূক্ষ্মের অতীত কারণরূপে নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহাতে স্থূল বা সূক্ষ্ম রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ আছে, অথবা জীবাত্মা পরমাত্মার দর্শনকালে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ যেরূপ স্থূল ভাবে বিষয় জ্ঞান লাভ করে, তাহাই হইয়া থাকে, তবে তিনি বিষম ভূল করিবেন। তিনি নিত্যই অরূপ এবং নিত্যই চরম কারণ। এই সম্পর্কে ইচ্ছাশক্তি অংশে ৪২০-৪২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতা পাঠক দেখিবেন। সুতরাং তাঁহাতে কখনই কোনও প্রকারের কোনও স্থূল বা সূক্ষ্মরূপ নাই। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মার কারণ-রূপই দর্শন করেন মাত্র। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে পরমাত্মাই জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। তিনি দেহাবদ্ধ বলিয়া অপূর্ণ, কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ই এক। অতএব জীবাত্মা যখন অনন্ত কৃপাময় পরমাত্মার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন, এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ লীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান সেই অনন্ত প্রেমময় পরমাত্মার অপরূপ প্রেম সুন্দর মধুর রূপ দর্শন করিতে পারেন, সেই অনন্ত রসাধার প্রেমরসময় নিত্য নিষ্কলঙ্ক প্রেমসুধাকরের অপূর্ব্ব প্রেমসুধা পিয়াসু চকোরবৎ পান করিতে পারেন, সেই নিত্য প্রস্ফুটিত শুভ্রতম অনন্তদল প্রেমমহাপদ্মের অপূর্ব্ব সুধাগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারেন, সেই অনন্ত প্রীতির উৎস পরম কবির নিত্য অনাহত অতি সুমধুর প্রেমসঙ্গীত সাক্ষাৎ ভাবে শ্রবণ করিতে পারেন, সেই অনন্ত সুন্দর নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতির গভীরতম নিবিড়তম অমৃত স্পর্শ লাভ করিতে পারেন, সেই অনন্ত অপরূপ নিত্য, অতলস্পর্শ জ্ঞানসিন্ধু নিত্যগুরুর নিকট হইতে সাক্ষাৎ ভাবে অনন্ত প্রকারের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে পরব্রহ্ম নিত্য নিরাকার, নির্ব্বিকার, এবং সম্পূর্ণরূপে অরূপ হইয়াও অনন্ত রূপে নিত্য রূপবান, তাঁহাতেই প্রেম-সুন্দর মধুর রূপ নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই অনন্ত সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিত্য আধার, তিনিই অনন্ত সুনির্ম্মল জ্যোঃতিতে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়, তিনিই

অনন্ত সুমধুর লাবণ্যে নিত্য শ্রীমান্, প্রকৃতির সুন্দরতম পদার্থের রূপও তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিকট অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার অনন্ত অরূপ-রূপের তুলনা জগতে মিলে না, মিলিতে পারে না। তিনি অরস ইহা সত্য, কিন্তু তথাপিও তাঁহাতেই মৃতসঞ্জীবনী প্রেমসুধা অনন্ত অনন্ত পরিমাণে নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই অনন্ত মাধুর্য্যের একমাত্র নিত্য আধার, তিনিই প্রেমামৃতসিন্ধু যথায় প্রেমিকগণ নিত্য সুবিনিমগ্ন হইয়া তাঁহারই প্রেমসুধা পানে নিত্য নিরত থাকিয়া জীবনের সফলতা লাভ করেন। তিনি অগন্ধ হইয়াও তাঁহারই অপূর্ব্ব প্রেমসুগন্ধে ভক্তজনকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহারই প্রেমসুধাগন্ধে অন্ধ হইয়া "কই তুমি, কই তুমি" বলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ান, তাঁহারই অনন্তঅপূর্ব্ব সুমধুর গন্ধের নিকট মধুরতম পুষ্পগন্ধও কিছুই নহে। তিনি নিত্য অশব্দ হইলেও তাঁহাতেই অনাহত প্রেমগীতি সুমধুরতম সুরে নিত্য সংগীত হইতেছে, তাঁহার সেই সুমিষ্ট মধুর সঙ্গীতের নিকট "কোকিল-কাকলি ছার", তিনি স্থূল বাক্য বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারই সাধকগণের নিকট তিনি সাক্ষাৎ ভাবে অনন্ত তত্ত্ব অনাহত ধ্বনিতে এরূপ সরল, প্রাঞ্জল, সুন্দর ও মধুর ভাবে প্রকাশ করেন যে তাহাতে আর সন্দেহের লেশ মাত্রও থাকে না বা থাকিতেও পারে না। তিনি অস্পর্শ হইয়াও অপূর্ব্ব স্পর্শে সকলকে স্পর্শ করেন, সেই সুদুর্লভ পরশমনির স্পর্শ লাভ করিতে পারিলেই হৃদয়ের সকল লৌহ বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাঁহারই প্রেম সুকোমল স্পর্শ এত নিবিড়, এত গভীর যে সাধকগণ তাহা লাভ করিয়া সকল পার্থিব সুখ তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং অবিরাম গতিতে তাঁহারই দিকে প্রধাবিত হইতে থাকেন, তাঁহারই গভীরতম প্রেমস্পর্শে প্রেমিকগণ তাঁহাতেই আত্মহারা হইয়া তাঁহারই অপূর্ব্ব প্রেম ক্রোড়ে নিত্য বাস করিতে পারেন। অর্থাৎ পরমাত্মায়ই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাত্মক জ্ঞান সকলই কারণরূপে বর্ত্তমান এবং জীবাত্মা সেই অরূপ রূপ, অরস-রস, অগন্ধ-গন্ধ, অশব্দ-শব্দ এবং অস্পর্শ-স্পর্শের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাই প্রেমিক সাধক ইন্দুভূষণ গাহিয়া-

ছেন :—"সাকার ডুবিয়া মরে, নিরাকার কূপে, নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে।* (এক) নিরাধার মহাপ্রাণ দিবানিশি জাগে, কই সে

* এস্থলে পরমপিতার সাকারত্ব (২য় পংক্তিতে বর্ণিত ভাব) আমাদের দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কল্পিত কোনও সাকার পদার্থের রূপ নহে। আমরা সাকার পদার্থকে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়ে এই প্রকার নিশ্চিত বুদ্ধির উদয় হয় যে আমরা দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে সংশয়ের কোনই কারণ থাকে না। অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের নিশ্চিত বুদ্ধির উদয় হয়। জীবাত্মা যখন পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন সেই জ্ঞান আমাদের সাকার বস্তুর দর্শন লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর ও সুষ্পষ্টতর। সেই অবস্থায় সকল অন্ধকার বিলুপ্ত হয় এবং অপরূপ দর্শনোপযোগী দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে "নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে"। অর্থাৎ সাকার পদার্থ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও আস্বাদন করিয়া আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়তা ও তৃপ্তি লাভ করি, জীবাত্মা পরমাত্মার দর্শনে তাহা হইতেও অনন্ত গুণে অপার তৃপ্তি ও দিব্য জ্ঞান সুতরাং সুদৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে কখনই কোনই সংশয় আসে না বা আসিতেও পারে না। কারণ, সেই জ্ঞান সুবিমল ব্রহ্মজ্ঞান। উহাতে কোনও প্রকারের বিকৃতি থাকে না। সুতরাং উহা নিত্য সত্য ও অনন্তকাল ব্যাপী। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন :—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে (২।২-৮)।" "বঙ্গানুবাদ :— সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয় গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয় বাসনা ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কর্ম্ম সমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রতিরোধক সকাম কর্ম্ম সমূহ) ক্ষয় হয়। (তত্ত্বভূষণ)" Realisation শব্দ বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঐ একই তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। Real শব্দের অর্থ বাস্তব সত্য এবং এই অর্থ হইতেই Realism, Realistic প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। Realism মতবাদিদের মধ্যে অনেকে Real বলিতে জড় জগৎকেই বুঝেন। জড় জগৎকে Real বলা হয় এইজন্য যে উহার অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জন্য Realism অর্থে সত্য ধারণা বুঝায়। তাহার কারণও পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থাৎ Real বস্তু দেখিলে আমাদের যে অটল প্রতীতি লাভ হয়, তাহাকেই Realisation বলে, অর্থাৎ যাহা বুঝিলাম, যাহা জানিলাম, তাহা হৃদ্গত সত্যে পরিণত হইল। উহার সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিল না। সুতরাং "আমরা ব্রহ্ম স্বরূপ Realise করিলাম" ইহার অর্থ আমরা ব্রহ্মকে এরূপ ভাবে দর্শন করিলামযে তাঁহাতে আর সংশয়ের লেশ মাত্রও থাকিল না, অর্থাৎ তাঁহাকে এমন ভাবে দর্শন করিলাম যে সেই সম্বন্ধে আর কোনও কালে কোনই সন্দেহ আসিবে না, যেমন আমরা কোন জড়

দেশ সই কই রে?" আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে পরমপিতা অনন্ত অরূপরূপে নিত্য বিভূষিত, সুতরাং সেই অরূপরূপ দর্শনও অপূর্ব্ব। যে পরম সৌভাগ্যবান মহাপুরুষ পরম পিতার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তিনিই তাহা জানিতে পারেন, কিন্তু সেই অরূপ রূপের অনির্ব্বচনীয়তা হেতু তিনিও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। কারণ, সেই অপরূপ-রূপের তুলনা জগতে মিলে না। আমরা পার্থিব কোনও বস্তুর বর্ণনা করিতে যাইয়া অন্য পার্থিব পদার্থের তুলনা দ্বারাই অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করি। পরমপিতার অনন্তরূপের তুলনা যখন জগতে পাওয়া যায় না, তখন তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহার সেই অতুলনীয় অরূপ-রূপের আভাস জগতে দান করিতে চিরকালই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে পরমপিতার দর্শনের আভাস সূচক দুইটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। অনন্ত প্রেমময় পরম কবি যে কবি হৃদয়ে অন্য সাধারণের অনির্দ্ধার্য্য অপূর্ব্ব মধুর ভাব রাশি ফুটাইয়া তুলেন, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ধন্য প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর! ধন্য তোমার প্রেমলীলা! তুমি যে কত ভাবে নিজ পরিচয় দান করিয়া নিজের দিকে অব্যর্থ প্রেমাকর্ষণে আমাদিগকে টানিতেছ, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দাপ্লুত না হইয়াই পারে না। তুমি যে কেবল প্রকৃতি দেবীকে নানা সুন্দর মধুর রূপে সাজাইয়া আমাদিগকে তোমার পরিচয় দান

পদার্থ দেখিলে সেই দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কোনও সংশয় থাকে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জ্ঞানেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেও সন্দেহের উদয় হয়, সময় সময় উহা ভ্রান্ত বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান সংশয়-লেশ শূন্য। কারণ তিনিই একমাত্র Real, একমাত্র সত্যস্বরূপ এবং জড় জগতের Realityও (সত্ত্বাও) তাঁহারই Reality হইতে (সত্য স্বরূপ হইতেই) আসিয়াছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে "নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে"। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী" বা বস্তুজ্ঞান অন্তঃকরণের উৎপন্ন পদার্থ। অর্থাৎ বুদ্ধি 'অতএব' "সুতরাং" প্রভৃতি বিচার দ্বারা স্থির করে। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন জনিত জ্ঞানে কোন বিচারের স্থান নাই, তাহা এতই Real, সুস্পষ্ট, এতই সুদৃঢ়।

করিতেছ, তাহা নহে ; কিন্তু তুমি জ্ঞানী, কবি, সাধক, প্রেমিক, ভক্ত সুসন্তানদিগের মাধ্যমে তোমার বাণী আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াও আমাদিগকে তোমারই দিকে নিয়ত টানিতেছ। বিশ্বে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, তাহাই আমাদের তোমার কাছে যাইবার সহায় রূপেই সৃষ্টি করিয়াছ। ধন্য প্রেমময়! ধন্য তোমার জ্ঞান-প্রেমময়ী লীলা! আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাকে চিরকাল হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে ধন্যবাদ দান করিয়া নিজে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার তুল্য ধন্যবাদার্হ ত জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই !!! "মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়-পুর-মাঝে! চরণতলে কোটী শশী সূর্য্য মরে লাজে! গর্ব্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া, সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে। একি পুলক-বেদনা বহিছে মধুবায়ে! কাননে যত পুষ্প ছিল, মিলিল তব পায়ে। পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে, নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে। (রবীন্দ্রনাথ)।" "কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে, মোহ-তিমির নাশে, প্রেমমলয়া বয়? ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি, আদরে মোরে ডাকি হেসে হেসে কথা কয়।। কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়ন-কোণে রয় ।। সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম, মুগ্ধ মানসে মম নাশে পাপ, তাপ ভয় ।। বিষয়-বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত, পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয়। চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণ তলে, স্তম্ভিত রিপুদলে বলে হোক তব জয় ।।* (রজনীকান্ত)।" উক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জড় কখনও ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে না। একমাত্র আত্মাই তাঁহার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয়। এত দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জড় কখনই আত্মা নহে।

ওঁং অবাঙ্‌মনসোগোচরং ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ব্রহ্ম ওঁং

---

* উদ্ধৃত সঙ্গীতদ্বয়ও বলিতেছেন যে ব্রহ্মদর্শনকালে বহিরিন্দ্রিয় ও মনের লয় হয়।

ওঁং

হে ক্ষুদ্র ! হে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র মানব ! তুমি যখন অপর এক বা একাধিক মানবকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিতে পার না, তখন সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে কিরূপে আত্মতুল্য বোধ করিবে ? হে ক্ষুদ্রতম প্রস্তরকণা ! তুমি কিরূপে ও কোন্ সাহসে আত্ম সদৃশ বিবেচনা করিবে ? হে ক্ষুদ্র মানব ! যখন তুমি তোমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত কোনও আত্মাকে কস্মিন্ কালে আত্মতুল্যবোধে সমর্থ নহ, তখন তোমা অপেক্ষা অনন্ত গুণে উন্নত পরমপিতাকে কিরূপে আত্মতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহস কর ? (সতধর্ম্ম) ।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মা ও জড় সম্বন্ধে শাস্ত্রমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

সোহহং জ্ঞান

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জড় যে আত্মা নহে, ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। এখন আমরা আত্মা ও জড় সম্বন্ধে শাস্ত্রমতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। এই সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দর্শন শাস্ত্রে নানাবিধ মত বর্ত্তমান। উহাদের সকলের সমালোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে অসম্ভব। তাই যে দুইটী মত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সেই দুইটীর মধ্যে প্রথমটী মায়াবাদ। মায়াবাদ বলিতে বহু তত্ত্ব বুঝায়। সেই সমুদায়ের যথাসম্ভব আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইবে। সাংখ্যমত জড়কে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উহা নিরীশ্বর দর্শন এবং বহু পুরুষবাদী। সুতরাং সেই মতও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তাই সেই সম্বন্ধেও আলোচনা

করিতে যাইতেছি। যাঁহারা উক্ত মত সমূহের প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই মহাপণ্ডিত। আর আমি অজ্ঞান ক্ষুদ্র মানব। তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার সহিত আমার বিদ্যা যথাক্রমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং গোষ্পদের সহিত উপমিত হইতে পারে, অথবা তাহা হইতেও অত্যধিক ভাবে গুরুতর। সুতরাং তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তির সমালোচনা করা আমার স্থায় বিদ্যাহীনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এস্থলে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, তিনি যে একজন পরম পণ্ডিত ও পরম সাধক ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত আমার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তালব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। তাই এই সুকঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন ব্যক্তিত্বের বিষয় চিন্তা না করিয়া লিখিত বিষয় যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহাই দেখেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে অযৌক্তিক কথা ব্রহ্মার হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে না এবং বালকের যুক্তিযুক্ত উক্তিও গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয় সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, আমার বিদ্যাহীনতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। পাঠকের নিকট আরও প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন ইহা মনে রাখেন এবং তাহার নিজ শক্তি দ্বারা আমার অভাব পুরণ করেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে প্রোক্ত পণ্ডিতগণের সকল মতের সহিতই আমাদের অনৈক্য নাই। যে যে বিষয়ে অনৈক্য বর্ত্তমান, তাহাদের সমালোচনা করিব মাত্র। ইহাও বক্তব্য যে এই কার্য্যে আমি বিশুদ্ধ সমালোচনার পন্থাই অনুসরণ করিব। উহার সীমা লঙ্ঘন করিব না। আচার্য্য শঙ্করের মতানুবর্ত্তিগণের মতে বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ্ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শিক্ষা দিতেছেন। ইহা হইতে দুইটী তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমটী এই যে জীব ব্রহ্মকে সোঽহং জ্ঞান করিতে পারেন। দ্বিতীয়টী জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। আমরা

প্রথমতঃ সোঽহং জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তৎপর দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধে 'মায়াবাদ" অংশে আলোচিত হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রকাশিত সত্যধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থদ্বয়ের প্রেম ও অভেদ জ্ঞান প্রবন্ধদ্বয়ে প্রথমোক্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান। পাঠক সেই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবেন যে সাধকের পরমোন্নত অবস্থায়ও পরমাত্মার সহিত সোঽহং জ্ঞান অসম্ভব। এই বিষয়টী এত বিস্তৃত যে তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিত গেলে আর এক-খানি গ্রন্থ গড়িয়া উঠে। সুতরাং তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। এই সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত বিষয় বিশেষতঃ "আত্মা ও জড়ের মিলন", "জড়ের বাধকত্বের কারণ", "গুণ বিধান" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ সমূহ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সোঽহং জ্ঞান কি ? এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমতঃই প্রেমের সম্বন্ধে লিখিতে হয়। সাধক প্রেম সাধন করিবেন। প্রথমতঃ দুইজন পুরুষ, দুইজন নারী অথবা নর-নারী প্রেম সাধনা আরম্ভ করেন। দম্পতির পক্ষেই প্রেম সাধনা সহজ। দাম্পত্য প্রেমই সর্ব্ব প্রেমের মূল। যখন তাহারা উভয়ে প্রেমের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা প্রকৃত প্রেমে আবদ্ধ হন এবং প্রেম সাধনা চলিতে থাকে, তখন প্রেমের বৃদ্ধি সহকারে পরস্পরের মধ্যে অভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রকার অভেদ-জ্ঞানের অতি উন্নত অবস্থায় সোঽহং জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পাঠক মনে রাখিবেন যে এই অভেদ-জ্ঞান ও সোঽহং জ্ঞান দুইজন সাধকের বা দুইজন সাধিকার মধ্যে সাধিত হয়। উক্ত প্রকার প্রেমকে প্রকৃত প্রেম ও অভেদ-জ্ঞানকে পার্থিব বা সমর্ণ অভেদ-জ্ঞান কহে। ইহা ভিন্ন পাক্ষিক প্রেম আছে, তাহাও অভেদ-জ্ঞানে পরিণত হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং একাগ্রতা সহকারে বিশেষ সাধনা করিলেও অভেদ-জ্ঞান লাভ করা যায়। অভেদ-জ্ঞান বহু প্রকারের আছে। তন্মধ্যে তিনটী প্রধান। যথা—উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞান, সমর্ণ অভেদ-জ্ঞান এবং অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান। অন্তর্গত করিয়া অভেদকে উত্তমর্ণ, সমান ভাবে অভেদকে সমর্ণ, এবং অন্তর্গত হইয়া অভেদকে অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান

কহে। পরমপিতা সকলকে উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করিতেছেন। অত্যুন্নত মহাত্মাগণও অনুন্নত আত্মাদিগকে উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করেন। একে অন্যকে সমান ভাবে পরস্পর যে অভেদ-জ্ঞান করেন, তাহাকে সমর্ণ অভেদ-জ্ঞান কহে। এই অভেদ-জ্ঞানের উন্নত অবস্থাকে সোহহং জ্ঞান কহে। উন্নততর আত্মাকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আত্মা যে অভেদ-জ্ঞান করেন, তাহাকে অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান কহে। পরমপিতার সহিত অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞানের জন্য পরমন্নোত মহাত্মাগণের মধ্যেও যাঁহারা অত্যুন্নত, তাঁহারা সাধনা করেন। এই সাধনা অত্যন্ত কঠিন। এই সাধনার কাঠিন্যের পরিমাণ বুঝিতে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে ইহার পূর্ব্বে সাধকের নিখিল জগতের প্রতি অভেদ-জ্ঞান সাধনে সিদ্ধ হইতে হয়। এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে "উক্তরূপ অভেদ-জ্ঞানকারী অভেদ-জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় জগতে নিখিল মানবকে সোহহং জ্ঞান করেন। অর্থাৎ সকলেই যে "আমি" এইরূপ বোধ করেন। অধিক কি, তাঁহার যখন অভেদ-জ্ঞানের আরও বৃদ্ধি হয়, তখন তিনি মানুষের কথা দূরে থাকুক্, দেব, দানব, দৈত্য প্রভৃতি এবং পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিকেও "সোহহং" ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমুন্নত সময়ে বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, সাগরাদিও তদীয় "সোহহং" জ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং তৎকালে তিনি বোধ করেন যে "একমাত্র অনাদি অনন্ত পরমপিতা পরমেশ্বর ও আমি এই উভয়ই কেবল বিদ্যমান।" কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তৎকালে তদীয় অন্তর্গত ভাবে থাকে (ক)।" উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সাধকের কতদূর উন্নতি হইলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অভেদ জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারা যায়। পরম পিতার সহিত অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান যে আরও কত কঠিন, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারা যায়। উক্তরূপ সাধক অনন্তাতীত পরমপিতা পরমেশ্বরকে অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন এবং পরমপিতার নিকট নিরন্তর কঠোর রোদন করেন। "বহু

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

চেষ্টার পরে যদি ঈশ্বর-প্রেম-সম্পন্ন সাধকের প্রতি প্রেমময় পরমেশ্বর প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই সৌভাগ্যবান সাধক স্রষ্টার প্রতি অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সমর্ণ অভেদ-জ্ঞান (সমানে সমানে যে অভেদ-জ্ঞান তাহা) যে কখনও হইতে পারে তাহা বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্রষ্টার প্রতি কখনও 'সোহহং' জ্ঞান জন্মে না. কারণ, সমর্ণ বা পার্থিব অভেদ-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই সোহহং-জ্ঞানের নামান্তর (ক)।" পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে "অনন্ত গুণনিধি জগৎপতির অনন্ত গুণের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি কোটী কোটী গুণেও একত্ব প্রাপ্ত হয় তথাপিও ঐ কোটী কোটী একত্বও অনন্ত একত্বের কণামাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ, পরমপিতা পরমেশ্বর অনন্ত-একত্বের একত্ব স্বরূপ। মানব অনন্ত একত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার তুল্য হইতে পারে না, কেননা, সেই অনন্ত একত্বের যে একীভবন, তাহাই জগদীশ্বরের স্বরূপ। জীবের পক্ষে স্বপ্রযত্নে অনন্ত একত্ব লাভই অসম্ভব, তাহাতে আবার ঐ অনন্ত-একত্বের একত্ব-লাভ যে একান্ত অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য খ)।" এস্থলে ইহা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে যে কোন সাধকই পরমপিতাকে উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করিতে পারেন না। কারণ, কেহই অনন্ত অনন্ত অনন্ত ভাবে অনন্ত উন্নত পরমেশ্বর হইতে উন্নততর হইতে পারেন না, তাঁহার অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থা নাই বা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অভেদ-জ্ঞান ও অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান সম্পন্ন সাধকরত্ন পরমর্ষি গুরুনাথের একটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিবেন যে পরমোন্নতদিগের মধ্যে অত্যুন্নত পরম সাধকও সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। "আমি তোমারি নাথ! আমারি ধন হে তুমি। তোমার মঙ্গল চরণে পড়ে আছি সদা আমি। অনন্ত প্রায় এ ব্রহ্মাণ্ড সকলি তোমার কাণ্ড, আমারি অভেদ ভাণ্ড এ বিশ্ব সকলি আমি। আকাশ, বায়ু, অনল, কি সলিল কিবা স্থল, আমি আছি সর্ব্বস্থল, এ

(ক) (খ) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

বর দিয়াছ তুমি। কিন্তু তবু তব অন্ত, না পাইনু প্রাণ কান্ত! কেমনে হইব শান্ত. শ্রান্ত ক্লান্ত এবে আমি। কিবা দেব কি দানব,যক্ষ, রক্ষ,কি মানব, তোমারি প্রেমের গুণে সকলি ত বিভো আমি। কিবা পশু, পাখী যত, কীট পতঙ্গ অযুত, তোমারি প্রেমের গুণে সকলি ত বিভো আমি। তরুলতা আদি যত, নদ হ্রদাদি পর্ব্বত, তোমারি প্রেমের গুণে সকলি ত বিভো আমি। কিন্তু তবু তব অন্ত না পাইনু প্রাণ কান্ত! কেমনে হইব শান্ত,শ্রান্ত ক্লান্ত এবে আমি।" যখন দুই জন সাধক পরস্পর সোহহং জ্ঞান সাধনে সিদ্ধ হন, তখন উভয় সাধকই বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ একে অন্যের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হন না। কারণ, উভয় সমান। যদি তর্ক স্থলে ধরিয়াও নেওয়া যায় যে কোন সাধক পরম পিতার সহিত সোহহং জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা হইলে পরমেশ্বর ও সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক—উভয়ই বর্ত্তমান থাকিবেন।* সোহহং জ্ঞান লাভের পর সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকও ব্রহ্মের গুণরাশি তুল্য হইল, তখন দুইজন ব্রহ্ম হইলেন ও বহু সাধক ঐরূপ সোহহং জ্ঞান লাভ করিলে একই সময় বহু ব্রহ্ম হইলেন, অর্থাৎ সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকের সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রহ্মের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইহা সোহহংবাদিগণও বলিয়া থাকেন। দুই বা ততোহধিক ব্রহ্ম থাকিতে পারে না। কারণ, বহু ব্রহ্মের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছার উদয় হইলে তাঁহাদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। যাহাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, উহারা আর ব্রহ্ম থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং সোহহংবাদ সত্য নহে। সাধক সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তিনি ব্রহ্মেরই তুল্য হইলেন। ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ। মায়াবাদিগণও বলেন যে অনন্তত্ব ব্রহ্মের তিনটী স্বরূপের একটী স্বরূপ (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম)। সুতরাং সাধক ব্রহ্মের সহিত সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাঁহারও (সাধকেরও) অনন্তত্ব পূর্ণ হইবে। কারণ, তিনি তখন ব্রহ্মের সহিত তুল্য এক। সুতরাং দুইজন অনন্ত

* মায়াবাদিগণও বলেন যে সোহহং জ্ঞান লাভের পরেও প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য সাধকের বাঁচিয়া থাকিতে হয়।

হইলেন—একজন স্বয়ং পরব্রহ্ম এবং অন্যজন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধক। দুইজন অনন্ত হইতে পারে না। ইহা দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত। কারণ, দুইজন অনন্ত হইলে একজন দ্বারা অন্য সীমাবদ্ধ হন। কাহারও অনন্তত্ব থাকে না। এস্থলে অনন্তত্ব শব্দে আমাদের অধার্য্য অনন্তত্ব বুঝিতে হইবে না, কিন্তু প্রকৃত অনন্ত—সত্য অনন্ত, অর্থাৎ যাঁহার অন্ত প্রকৃত পক্ষেই নাই, তাহাই বুঝিতে হইবে। অতএব একজন মাত্রই অনন্ত হইতে পারেন, দুই বা ততোঽধিক কখনও অনন্ত হইতে পারেন না এবং সেই অনন্ত একমাত্র ব্রহ্মই। সুতরাং সাধকের পক্ষে সোঽহং জ্ঞান লাভ বা সর্ব্বপ্রকারে সত্য ভাবে পূর্ণ অনন্তত্ব লাভ অসম্ভব। মায়াবাদিগণ আপত্তি করিতে পারেন যে তাঁহারা কখনও বলেন না যে দুই বা ততোঽধিক ব্রহ্ম হন। তাঁহারা জীবাত্মাকেই কূটস্থ ব্রহ্ম বলেন। অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সুতরাং সোঽহং জ্ঞানে দুই বা ততোঽধিক ব্রহ্মের প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তাঁহারা প্রচার করেন যে "জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্"। অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম এবং জীবই সাধনা দ্বারা মায়ার আবরণ উন্মোচন করিতে পারিলে দেহে থাকিতে থাকিতেই (Here and now) সোঽহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সুতরাং জীবই ব্রহ্ম হইলেন। কূটস্থ ব্রহ্মকে যখন ব্রহ্মেরই তুল্য বলা হয়, তখন তিনি ত নিত্যই ব্রহ্মকে সোঽহং জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু মায়াবাদী প্রত্যেক জীবকে সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত বলেন না। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে জীবের তখনই সোঽহং জ্ঞান লাভ হয়, যখন তাঁহার হৃদয়ে কূটস্থ ব্রহ্মের নিত্য সোঽহং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। অর্থাৎ যখন হৃদয়ের মায়ার আবরণ তিনি সম্পূর্ণ ভাবে উন্মোচন করিয়াছেন। ইহা যখন দেহে থাকিতে থাকিতেই সম্ভব বলা হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে দুই ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন—তাঁহাদের মধ্যে এক পরব্রহ্ম এবং অন্য ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধক। সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকও যে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য যে দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং তাঁহার নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা ইতঃপর পঞ্চদশীর শ্লোক

সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং সেই সাধককে—সেই দেহাবদ্ধ জীবকে অবশ্যই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করিতে হইবে। এ বিষয়ে ক্রমশঃ আরও লিখিত হইতেছে। সোঽহং (তিনি আমি), তত্ত্বমসি (তিনি তুমি হও), অহং ব্রহ্মাস্মি (আমি ব্রহ্ম হই) প্রভৃতি বাক্যে দুই জনের সম্পর্ক বুঝায়। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে সোঽহং জ্ঞান লাভ হইলেও সাধক ব্রহ্মের সহিত সমান হইয়া বর্ত্তমান থাকেন। কারণ, দুইজন বর্ত্তমান না থাকিলে কে কাহার সহিত সমান হয়? মহাপ্রলয় কালে ত্রিবিধ দেহ বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে জীবের লয় হইবে, অর্থাৎ জীবের ভেদ-সূচক অস্তিত্ব বা ভাসমানত্ব লোপ পাইবে, ইহা ধারণা করা যায়। কিন্তু জীব বা জীব সমূহ সোঽহং জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সমান ভাবে দেহে বর্ত্তমান থাকিবেন, ইহা ধারণা করা অসম্ভব। ইহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আবার যদি বলা হয় যে সোঽহং জ্ঞানও যাহা, পরমাত্মায় লয় প্রাপ্তিও তাহা, তবে বলিতে হয় যে জীব ব্রহ্মে লয় হইলে সোঽহং জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? তখন তিনি পৃথক্ একজন অথচ ব্রহ্মের সমান, এরূপ ভাবে পরমাত্মাতে বর্ত্তমান থাকেন না। জলোর্ম্মি যেমন মহাসমুদ্রে মিলিয়া গিয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তিনিও সেইরূপ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দেহ দ্বারা পৃথক্‌কৃত সত্ত্বা লোপ করিয়া দেন। তখন তাঁহার "স" ও "অহং" ভাব থাকে না বা থাকিতে পারে না। জীবের অর্থ আত্মা + দেহ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেহ তিন প্রকার। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। জীবাত্মা কখনও দেহ ভিন্ন থাকিতে পারিবেন না। মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দেহেই অবস্থিতি করিতে হইবে। জীব যতই উন্নত হউন না কেন, কোনও না কোনও এক প্রকার দেহে তাঁহার বাস করিতেই হইবে। তিনি যদি ব্যোমপ্রধান দেহেও বাস করেন, তথাপি তাঁহার দেহ সত্ত্বপ্রধান সম্পন্ন থাকিবে। সত্ত্বের গুণও বন্ধন, ইহা পাঠক মনে রাখিবেন। অর্থাৎ জীব যতই একত্ব লাভ করুন, তিনি কখনও অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ যে

পর্যন্ত জীব দেহে আছেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি অল্পাধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। দেহে থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত উন্নত অবস্থায়ও তিনি অনন্ত অসীমত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। আবার যদি বলা যায় যে জীব দেহ শূন্যাবস্থায় কেন সোহহং জ্ঞান লাভ করিবেন না, তবে বলিতে হয় যে সেই অবস্থা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। "জীব = আত্মা + দেহ। ∴ জীব − দেহ = আত্মা"। তখন কেবল আত্মাই বর্ত্তমান থাকেন। তখন দেহ বর্ত্তমান না থাকায় তাঁহাকে জীব সংজ্ঞায় আখ্যাত করা যায় না। তখন আর তাঁহার দেহবদ্ধতা জন্য কোন প্রকারের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না বা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ "আমি", "তুমি", "ইনি", "উনি" প্রভৃতি পৃথকত্ব সূচক ভাব আর থাকে না। তখন এক অখণ্ড পরমাত্মা। সুতরাং কে কাহাকে সোহহং জ্ঞান করিবেন? সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক্ না কেন, ব্রহ্মের সহিত জীবের সোহহং জ্ঞান অসম্ভব। দার্শনিক বলেন যে অহং ভাব অন্তঃকরণের একাংশ অহংকারের ফল। "অহংকারের জন্যই "আমি", "তুমি", "তিনি", "ইনি", "ইহা", "উহা" ইত্যাদি দ্বৈত ভাবের উৎপত্তি হয়।" অহং শব্দটী সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে ইহা অন্য হইতে ভেদ বোধক শব্দ। যে স্থানে দশ ব্যক্তি আছেন, সেই স্থানেই ভেদ নির্দ্দেশক "আমি," "তুমি" প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকেন। যে স্থলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাস্তি, সে স্থলে "অহং" এবং "সঃ" শব্দের বা ভাবের কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।১।১৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। তিনি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশক "অহং", "সঃ" প্রভৃতি ভাব কিম্বা ভাষা থাকিতে পারে না। এই অহংকার ত্রিবিধ দেহের বিগম ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় না। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত উক্তি নহে। মহাভারত হইতে ইতঃপর উদ্ধৃত অংশেও আমরা দেখিতে পাইব যে একত্ব প্রাপ্ত সাধকও অহংকার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নহেন। তাঁহাতেও

সাত্ত্বিক অহংকার বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ত্রিবিধ দেহের বিগমের পূর্ব্বে সোহহং জ্ঞানের কোনই সম্ভাবনা নাই। আবার ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে ত্রিবিধ দেহের বিগমে যখন জীবাত্মা ব্রহ্মে লয় হইবেন, তখন সোহহং ভাবের অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ, তখন একমাত্র অখণ্ড আত্মাই বর্ত্তমান থাকিবেন। কে কাহাকে সোহহং বলিবেন। ইতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে মহাপ্রলয় কালের পূর্ব্বে ত্রিবিধ দেহের সম্পূর্ণ লয় সম্ভব নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মহাপ্রলয় হইতে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইবে। উহা একদিনে সম্পন্ন হইবে না। এই সম্পর্কে কল্পবাদ অংশ দ্রষ্টব্য। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কেহই সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। অর্থাৎ দেহে থাকিতে থাকিতে সেই আশা ফলবতী হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যতকাল দেহ, ততকালই দেহী বা জীব এবং ততকালই আমিত্বের বর্ত্তমানতা। আবার পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে আমিত্বের বর্ত্তমানতায় সোহহং জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং জীবাবস্থায় সোহহং জ্ঞান অসম্ভব। আবার দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মে লয়াবস্থায়ও সোহহং জ্ঞান অসম্ভব। অতএব আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে কোন অবস্থায়ই সোহহং জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে! সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের সোহহং জ্ঞান কথার কথা মাত্র। পরমপিতা অনন্ত গুণে গুণবান। অর্থাৎ তাঁহার গুণরাশি সংখ্যায় অনন্ত ও তাঁহার প্রত্যেক গুণই অনন্ত ভাবে উন্নত। অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। সেই রূপ অনন্ত গুণের সত্য ও পূর্ণ ধারণা করা কাহারও পক্ষে সাধ্য নাই। সুতরাং সেই অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিতে জীবের পক্ষে অনন্ত সাধনা করিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। সুতরাং আমাদের অনন্ত গুণের অনন্ত সাধনা অনন্তকাল সাপেক্ষ। পাঠক যদি নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে একটু চিন্তা করেন, তবেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে পর্য্যন্ত আমরা অনন্ত গুণাধার পরম-পিতার অনন্ত গুণে গুণী না হইতে পারিব, সেই পর্য্যন্তই আমাদের পূর্ণামুক্তি অসম্ভব। এখন আমরা দেখিতে পাই যে সেই অনন্ত গুণের

ধারণার কথা দূরে থাকুক, সেই সকল গুণ যে কি, তাহাই বা কোন মানব জানেন? পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ও ধর্ম্ম সঙ্গীত বর্ত্তমান, তাহাতে ব্রহ্মের যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল গুণের (যথা— সত্য, প্রেম, অনন্তত্ব প্রভৃতির) সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে দ্বিসহস্রের অধিক কিছুতেই হইবে না। কোনও শাস্ত্রে অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত গুণের কথা দূরে থাকুক, কোটী কোটী গুণেরও বর্ণনা বা উল্লেখও নাই। প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগে এমন কোনও মহাপুরুষ জন্মেন নাই, যিনি জগৎ সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে অনন্ত গুণ-ধাম ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ কি কি, তাহা তিনি সম্পূর্ণ রূপে জানেন অথবা তিনি সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছেন। অতএব মানব যখন অনন্ত গুণের নামই জানেন না, তখন অনন্ত গুণের ধারণা তিনি কি প্রকারে করিবেন? অনন্ত গুণের সাধনাও আরও দূরস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে পরমপিতা পরমেশ্বরের যে অনন্ত কল্যাণময় গুণের কথা বলা হয়, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল সত্ত্ব-গুণকে নানা আকারে কার্য্য জগতে প্রকাশ করেন। তাহাই প্রেম, দয়া, করুণাদি ভাবে আমরা দেখিতে পাই। ইহা যে সত্য নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জড়ের গুণ। মায়াবাদে মায়াই ত্রিগুণাত্মিকা। সুতরাং উক্ত ত্রিগুণ ব্রহ্মের গুণ নহে! সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির উপাদান, উহারা পুরুষের গুণ নহে। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য (২২৪-২৩২ পৃষ্ঠা)। আমরা তাহাতে দেখিয়াছি যে উক্ত তিনটী গুণ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছা দ্বারা জড়ের ধর্ম্মরূপে সৃষ্ট। অর্থাৎ পরমপিতা জড়কে এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে উহা দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ ত্রিবিধ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং যাহা জড়ের ধর্ম্ম, তাহা যে ব্রহ্মের গুণ হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মের অনন্ত গুণই নিত্য, কিন্তু জড়ের গুণ অনিত্য। জড়ের যখন আদি ও অন্ত আছে, তখন উহার গুণ কখনই নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই ভাবে চিন্তা করিলেও

বুঝিতে পারা যায় যে সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের গুণ হইতেই পারে না। আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ। উহাও জীবের নিজ সত্য স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখে। নতুবা তাহা বন্ধনের কারণ হইতে পারিত না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সত্ত্বগুণকে বন্ধনের কারণ বলেন। পরমপিতার কল্যাণময় গুণরাশি অর্থাৎ জ্ঞান, প্রেম, দয়া প্রভৃতি কখনই আমাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, প্রেমদ্বারা মুক্তি প্রভৃতি উপদেশ পরমোন্নত সাধকগণ দিতে পারিতেন না। সত্ত্বগুণই বলুন, অথবা রজস্তমোগুণ সম্বন্ধেই বলুন, উহারা আবরণ বই আর কিছুই নহে, কেবল আবরণের মাত্রার পার্থক্য মাত্র। জীব যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হন, তখন তাঁহার আবরণের গাঢ়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাই তাঁহার স্বরূপে যাহা বর্ত্তমান, অর্থাৎ কল্যাণময় গুণরাশি, তাহা তিনি জানিতে পারেন ও উহারা সত্ত্বের সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে সুযোগ লাভ করে অর্থাৎ দেহরূপ যন্ত্রের বাধকতা সত্ত্বের পরিমাণানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সাংখ্যদর্শনেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এর প্রথম উল্লেখ বলিয়া মনে হয়। "মায়াবাদ" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মায়ার যে ত্রিগুণ, তাহা সাংখ্যপ্রকৃতির অনুকরণে রচিত। সাংখ্য উহাদিগকে জড়ের গুণ বা উপাদান বলিয়াছেন। সুতরাং উহারা আত্মিক গুণরাশি উৎপাদন করিতে পারে না। বরং উহারা গুণরাশির প্রকাশের বাধা প্রদান করে। উহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, তাই উহা আত্মার গুণরাশির বিকাশের অধিকতর সাহায্য করে, এই মাত্র। সত্ত্বকে শাস্ত্রকারগণ স্বচ্ছ বলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণই আবরক বা বন্ধন রজ্জু। উহাদের আবরণের শক্তির পার্থক্য মাত্র বর্ত্তমান। সত্ত্বগুণে স্বচ্ছতার আধিক্য থাকায় ব্রহ্মের স্বরূপ সত্ত্বের পরিমানানুযায়ী সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাই সাত্ত্বিক হৃদয়ে ব্রহ্মের গুণরাশির প্রকাশ দেখা যায়। স্বচ্ছ কাচের নিকট একটী জবাকুসুম স্থাপিত হইলে উহার লোহিত বর্ণ কাচে প্রতি-

ফলিত হয়, কিন্তু উহা কখনই কাচোৎপন্ন নহে। উহা জবাকুসুমেরই বর্ণ, কাচে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐরূপ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। সেইরূপ জ্ঞান, প্রেম, দয়া, করুণাদি ব্রহ্মেরই স্বরূপ। উহারা সাত্বিক হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র, কিন্তু উহারা কখনও সত্ব গুণোৎপন্ন নহে। অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা পাইলাম যে ব্রহ্মে অনন্ত কল্যাণময় গুণ নিত্য বর্ত্তমান। উঁহারা তাঁহারই; একমাত্র তাঁহারই সম্পদ। উহা জড় হইতে অথবা জড় সংসর্গে উৎপন্ন হয় নাই। বিশ্ব যে কি বিরাট, তাহা বুঝিতে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অংশ দ্রষ্টব্য (২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা)। বিজ্ঞানও এখন বলিতেছেন যে বিশ্ব যে কত বড়, তাহা ধারণা করা অসম্ভব। এই সকল মণ্ডল বৃথা সৃষ্ট হয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। উহারা উন্নত আত্মাদিগের বাসের জন্যই সৃষ্ট। তাঁহারা সেই সকল মণ্ডলে বাস করিয়া সাধন ভজন দ্বারা ক্রমশঃই উন্নততর লোকে গমন করিবেন, ইহাই ক্রমময়ী সৃষ্টির এক-মাত্র কর্ত্তার উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে জীবগণ বাস করিতেছে এবং তাহাদের বাসের জন্য এই মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য মণ্ডলে যদি কোন জীব বাসই না করেন, তবে কি অনন্ত প্রায় মণ্ডল পৃথিবীকে কেবল যথাস্থানে রক্ষা করিতেই সৃষ্ট? তাহা ভিন্ন উহাদের কি আর অন্য কোনও সার্থকতা নাই? যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী, তাহারা পরলোকে পরলোকগত আত্মা বাস করেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। হিন্দু শাস্ত্রে ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের উল্লেখ আছে। বেদান্তে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ব্রহ্মার লোক পরলোকগণবাসিগণের নিবাস স্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" ও "পরলোক তত্ত্ব" অংশদ্বয়ে বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই। মণ্ডলগুলি যখন অসংখ্য, তখন আমাদের উন্নতিও অনন্তপ্রায় কাল ধরিয়া হইতে থাকিবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। আমরা অনেকে সাধারণতঃ পৃথিবীকেই অথবা কোন একটী দেশ বিশেষকে বিশ্ব বলিয়া মনে করি এবং পৃথিবী ভিন্ন যে অনন্তপ্রায় মণ্ডল আমাদের বাসের ও উন্নতি সাধনের জন্য সৃষ্ট ও বর্ত্তমান, তাহা বিশ্বাস

করি না, অথবা ভুলিয়া যাই। তাই আমরা অল্পকাল মধ্যেই "নির্ব্বাণ", লয় প্রভৃতি আশা করি। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সেই আশা ফলবতী হওয়া সম্ভব নহে। আমরা বাক্যে অনেক কথা প্রকাশ করিতে পারি অথবা পুস্তকে অত্যধিক ভাবে লিখিত পারি বটে, কিন্তু যাহার অনন্তপ্রায় বিশ্বের সত্য ধারণা হইয়াছে, অসংখ্যপ্রায় মণ্ডলের কি কি কার্য্য এবং কোথায় কোথায় কোন কোন গুণ গুলির পরিপক্কতা লাভ করে, অর্থাৎ যাহার সৃষ্টি সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান আছে, তিনি কখনও ধারণীয় কালের মধ্যে "নির্ব্বাণ", লয় প্রভৃতি কদাচ সম্ভব তাহা স্বীকার করিবেন না। স্থূল পরলোক এত বিস্তৃত যে উহার নিকট পৃথিবী পরমাণুতুল্যও নহে। অথচ সেই পৃথিবীস্থ নর-নারীদিগের মধ্যে অনেকে তাহাতে বিশ্বাসীও নহেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রে পরলোকের সবিশেষ বর্ণনা নাই। যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতিষ শাস্ত্র (Astronomy) এ সম্বন্ধে একেবারেই নির্ব্বাক্। তাহারা অনেক মণ্ডলে যে জীবের বাস আছে, তাহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। উহা মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতি দুই একটী মণ্ডলে চিন্তাশীল জীব (Intelligent beings) বাস করেন বলিয়া অনুমান করেন। তাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে নীহারিকা পূর্ণ স্থানকে মণ্ডলগুলির উৎপত্তির উপাদানে পরিপূর্ণ বলিতেন। এখন তাহারা জানিতে পারিয়াছেন যে যাহাকে নীহারিকা স্থান বলা হইত, উহার মধ্যে কোটী কোটী মণ্ডল অবস্থিত। এই আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্ব অসংখ্য মণ্ডলে পরিপূর্ণ এবং আমাদের অধিবাস ও অনন্ত সাধনার জন্য অনন্ত প্রেমময় পিতার অনন্ত মহিমাপূর্ণা সৃষ্টি। ব্রহ্ম যে অনন্ত, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রই বলেন। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রসারতা অনুসারে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করি। ফলে পরমাণুতুল্য বালুকণা হইয়াও মানব অনন্ত হিমাচলকে সোঽহং মনে করে। ইহা হইতে ভীষণতর অহংকারময়ী

উক্তি আর কি হইতে পারে ? পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "তাঁহাকে কি ইতি করা যায় ? তিনি চিনির পাহাড়। পিপড়ের এক দানাতে পেট ভরে যায়, কিন্তু সে মনে করে সমস্ত পাহাড়টা মুখে করে নিয়ে যায়"। "শিব, শুক, নারদ তিনজন ব্রহ্মসাগরে যান। নারদ নিকটে গিয়া দেখিয়াই হো হো করে ফিরে আসেন। শুক মাত্র স্পর্শ করেছেন। শিব মাত্র তিন গণ্ডূষ জল পান করেছেন। ব্রহ্মসাগর নারদাদি শুধু দর্শন করেছেন, শুকাদি স্পর্শন করেছেন, আর শিব তিন গণ্ডূষ জল পান করেছেন।" যদি শিব, শুক, নারদের ন্যায় জ্ঞানী-ভক্ত মহাপুরুষগণই সোঽহং জ্ঞান লাভ না করিতে পারেন, তবে পৃথিবীতে এমন কে আছেন, যিনি সেই অবস্থা লাভ করিবেন ? নানা শাস্ত্রে ও নানা সঙ্গীতে পরব্রহ্মের অনন্তত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে। বিশ্ব আমাদের পক্ষে অধার্য্য অনন্ত হইয়াও তাঁহার নিত্য প্রেমক্রোড়ে যে শিশুবৎ অবস্থিত, তাহাও বহু শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। নিম্নে উক্ত ভাব প্রকাশক কয়েকটী উক্তি পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে জীবের পক্ষে সোঽহং জ্ঞান অসম্ভব। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)"। "নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমোনমঃ, নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং অসীমানন্ত গুণায়। নমস্তুভ্যং অনন্তায় অনন্ত শক্তিশালিনে, অনন্তানন্ত কান্তায় অনন্তানন্ত রূপায়। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)" "অনাদি অনন্ত নাথ অনন্ত শান্তি নিলয়, অনন্ত সাধন বলেও, তাঁরে নাহি পাওয়া যায়। তবে তাঁর করুণা বিনা, সে ধন ত কভু মিলে না, এক মনে এক প্রাণে, যাঁচিব তাঁর দয়ায়। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)" "অনন্ত গুণ-নিধান, অনন্ত সুখ আলয়, অনন্ত ব'লেও অন্ত, নাহি পায় এ হৃদয়। অনন্ত গুণ গণনে, অনন্ত-উন্নত গুণে, সে গুণীর গুণ অন্ত, কেমনে হ'বে নিশ্চয়। অনন্তের অন্ত যদি, নাহি পেলেম এ অবধি, তবে যে পাইব তাঁয়, এ আশা ত নাহি হয়। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" 'অনন্ত ভুবন, তব গুণ গান, করি অন্ত কান্ত!

না পায় কখন ; সে অনন্ত গুণ কণা করি দান, এ কাতর জনে, তারক, নিস্তার। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" "জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি, যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে। জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর, তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে। (রবীন্দ্রনাথ)।" "অগম অপার তুমি হে, কে জানে কে জানে তোমায় ? অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে ভ্রাম্যমান দিবসরজনী। (ব্রহ্ম-সঙ্গীত)" "অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় ? জগত শিশুর মতো চরণে ঘুমায়ে রয়। কোটী রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা, অযুত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়। (ব্রহ্মসঙ্গীত)" "অসীম অগম্য তুমি হে ব্রহ্ম, কী বুঝিব তব আমি ? জানিনা তোমারে, জানিছ আমারে, এই শুধু জানি। কোথা তব আদি, কোথা তব অন্ত, খুঁজিয়া না পাই, তুমি হে অনন্ত, নিরাধার প্রাণ এক মহান্, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী। মহাভাব তুমি, ভাব পরাভূত, মহাজ্ঞান তুমি, বিজ্ঞানাতীত, অনাদি কাল তোমাতে বাহিত, তোমাতে রয়েছ তুমি। (সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন)" "উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে, 'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে। (ব্রহ্মসঙ্গীত)" "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—আসীন সেই বিশ্ব শরণ তাঁর জগত মন্দিরে। অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমামগন—তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে। (রবীন্দ্রনাথ)" "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর, সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে। (রাজা রামমোহন রায়)" "ভজ রে ভজ তাঁরে। নিখিল বিশ্ব অবিরত দেশে কালে যাঁর মহিমা প্রচারে রে। অপার যাঁর শক্তিসাধ্য, যিনি সুর-নর-পরমারাধ্য, শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, বন্দ্য বেদ বন্দে যাঁরে রে। (ব্রহ্মসঙ্গীত)" "গাওরে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে, গায় কোটী চন্দ্র তারা 'জয় ব্রহ্ম জয়"। (ব্রহ্মসঙ্গীত)"

"অনন্তের পানে অনন্তের টানে জীবন নদী ছুটিছে রে। লোক লোকান্তরে চেতন জড়ে সতত তাঁহারে খুঁজিছে রে। (ব্রহ্মসঙ্গীত)" এই সম্পর্কে মহানির্ব্বান তন্ত্রোক্ত "নমোস্তে সতেতে" ইত্যাদি স্তোত্র দ্রষ্টব্য। তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে, "মহোচ্চৈপদানাং নিয়ন্তৃত্বমেকং"। এই রূপ আরও শত শত মহাজন বাণী সংগ্রহ করা যায়। পাঠক মনে রাখিবেন যে পরমাত্মাকে ব্রহ্ম, অনন্ত, বিরাট, মহতোমহীয়ান্, ভূমা প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করা হয়। পরমাত্মাকে ব্রহ্মও বলিব, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও সোঽহং বলিব, ইহা স্ববিরোধী উক্তি বই আর কিছুই নহে। কোন কোন পাশ্চাত্য দর্শন জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি স্বীকার করেন। ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যেও অনেকেই সোহহং বাদ, নির্ব্বাণ ও মায়াবাদ স্বীকার করেন না। মায়াবাদে অনন্তত্বকে ব্রহ্মের একটী স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম)। ব্রহ্ম যখন অনন্ত, তখন সান্ত জীব কখনই অনন্তত্ব লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং অনন্তত্ব লাভ না করিলে অনন্তের সহিত সোহহংজ্ঞান যে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা ধারণা করা সহজ। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীব তাঁহার শেষ কারণ-দেহের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই সান্ত থাকিবেন। ত্রিবিধ দেহের বিগমের পূর্ব্বে তিনি পূর্ণভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে মায়াবাদে জীবাত্মাকে কূটস্থ ব্রহ্মই বলা হয়, তিনি ব্রহ্মই (জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্)। সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মকে দর্শন করিবেন, ইহাতে সান্ত অনন্তের প্রশ্ন উদয় হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মায়াবাদিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকেও জীব পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং হিন্দু দেবদেবীগণের মধ্যে যে তিন জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও তাঁহাদের অত্যুন্নতি সত্ত্বেও জীবত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন নাই, ইহা মায়াবাদ অনুসারে বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের দেহেও কূটস্থ ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যতই পরমোন্নতি লাভ করুন না কেন, অনন্ত অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মের নিকট তাঁহারাও সান্ত। যদি বলেন যে তাঁহাদের আত্মাই অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মই

পরব্রহ্মকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা জীব ভাবে ব্রহ্মদর্শন করেন না, তবে বলিতে হয় যে যতকাল দেহ, ততকালই জীব। জীব = দেহ + আত্মা। ত্রিবিধ দেহের বিগমের পূর্ব্বে কাহারও জীবত্ব যায় না। আবার যে পর্য্যন্ত দেহ বর্ত্তমান, সেই পর্য্যন্তই আবরণের অল্পাধিক্য বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং জীব কখনই পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কখনও ব্রহ্মের সহিত সোহহংজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যদি বলেন যে কূটস্থ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম ত একই, তবে দুই বা ততোহধিক ব্রহ্মের কথা কেন বলা হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে কূটস্থ ব্রহ্ম যদি পূর্ণব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একই হন, এবং যদি দেহ-বদ্ধতা জন্য তিনি অপূর্ণ ভাবে ভাসমান না হইয়াই থাকেন; তবে তিনি দেহে থাকিতে থাকিতে পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে দর্শন করিতে পারেন। সুতরাং তিনি নিত্যই সেই ভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্ম দর্শন করিতে-ছেন বলিতে হইবে। কারণ, কূটস্থ ব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই এবং উভয়ই সম্পূর্ণরূপে এক। সুতরাং সেই কূটস্থ ব্রহ্মের ব্রহ্ম-দর্শনে জীবের পক্ষে মোক্ষের অবস্থা আসিতে পারে না। কূটস্থ ব্রহ্ম ত নিত্যই ব্রহ্ম দর্শন করিতেছেন। যদি কোন এক নির্দ্দিষ্ট কালের ব্রহ্ম দর্শনেই মোক্ষ লাভ হয়, তবে জীবের পক্ষে মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম-মুহূর্ত্তেই বা মোক্ষ লাভ হইবে না কেন? তাঁহার নিত্য মোক্ষাবস্থাই থাকিবে না কেন? আবারও মায়াবাদী বলিবেন যে অবিদ্যার আবরণ উন্মুক্ত না হইলে কখনই জীবের মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে মায়াবাদে কূটস্থ ব্রহ্ম নিত্য নিষ্ক্রিয়। তাঁহার স্বীয় জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের আভাস মাত্র অন্তঃকরণে পতিত হয়। মায়াবাদিগণ বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকারকে অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র বলেন। অন্তঃকরণকে জড় বলা হয়। তাঁহাদের মতে অন্তঃকরণে চিদাভাস পতিত হইয়া উহা (অন্তঃকরণ) ঐরূপ ভাবে চেতনের ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয় যে আমাদিগকে সত্যজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান দিতে পারে না, ইহা তাহারাও স্বীকার করেন। কারণ, কূটস্থ ব্রহ্মের চিদাভাস মাত্র (তাঁহার নিজস্ব জ্ঞান নহে) জড়

অন্তঃকরণে পতিত হইয়া বৃত্তি চতুষ্টয় উৎপাদন করে। সুতরাং সেই বৃত্তি সমূহ অচেতন জড়ের বা মায়ার সুতরাং বিকৃত। সুতরাং উহাদের দ্বারা জীবের পক্ষে কখনই কূটস্থ ব্রহ্মের ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইল, তবে কূটস্থ ব্রহ্ম যে পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিতেছেন বা কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে দর্শন লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে জীব কখনই সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং জীবের কখনই মোক্ষ হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আরও আপত্তি হইতে পারে যে কূটস্থ ব্রহ্ম যদি পূর্ণ ব্রহ্মই হন, তবে তাঁহার মোক্ষের জন্য চেষ্টা কেন? তাঁহাকে মায়া বা অবিদ্যাই বা আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে কেন? মায়া কি তাঁহার জ্ঞানাগ্নির তেজে ভস্মীভূত হয় না? কূটস্থ ব্রহ্ম ত পূর্ণব্রহ্মের ন্যায় নিত্য জ্ঞানময়। যদি বলেন যে মায়াই এই সমস্ত করিতেছে, তবুও বলিতে হইবে যে মায়ার এমন কোন নিজস্ব শক্তি থাকিতে পারে না, যাহা দ্বারা তিনি স্বয়ং ব্রহ্মকে (কূটস্থ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম একই) আবরণ করিয়া খেলা করেন। যদি মায়াই কূটস্থ ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারেন, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে মায়া তাঁহার (কূটস্থ ব্রহ্মের) উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে অপূর্ণ ভাবে বা সসীম ভাবে প্রকাশ করিতেছে। মায়ার আশ্রয় ত্রিগুণ সম্পন্ন দেহ। সুতরাং দেহই যে কূটস্থ ব্রহ্মকে অপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতেছে, তাহা বলিতে হইবে।* অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও দেহাবদ্ধাবস্থায় তাঁহার অপূর্ণ ভাবে বা সসীম ভাবে প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা স্বীকার না করিলে সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হইতে পারে না। আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় নিজ-স্বরূপ-বিশেষোৎপন্ন দেহে থাকিয়া বহু ভাবে সুতরাং ক্ষুদ্রভাবে এবং সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং অখণ্ড থাকিয়াও বিচ্যুত ভাবে বা অংশ

* অপূর্ণতার কারণ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের নানা অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইতঃপর লিখিত অংশেও দেখা যাইবে যে দেহই জীবাত্মার অপূর্ণতার কারণ।

ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং যতদিন দেহবদ্ধ, ততদিনই তিনি অত্যন্ত উন্নত হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মের তুলনায় সান্ত, সসীম এবং অপূর্ণ ভাবে ভাসমান থাকিবেন। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। যদি স্বীকার করাও যায় যে মায়াই কূটস্থ ব্রহ্মকে দেহে আবদ্ধ করে এবং পরে মোক্ষদান করে, তবুও বলিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত দেহ অথবা উপাধি বর্ত্তমান, সেই পর্য্যন্তই মায়ার প্রভাবও বিদ্যমান থাকিবে, তাহা অল্পই হউক বা অধিকই হউক। দেহে থাকিতে থাকিতে কূটস্থ ব্রহ্ম মায়ার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন না। যদি তাহাই পারিতেন, তবে তিনি মায়া দ্বারা দেহে আবদ্ধও হইতেন না। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে সাংখ্য বলেন যে প্রধানই নিষ্ক্রিয় পুরুষকে দেহে আবদ্ধ করেন, আবার প্রধানই তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। মায়াবাদে এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি না থাকিলেও উহা বিশ্লেষণ করিলে সাংখ্যোক্ত মতেই আসিয়া উপনীত হইতে হয়। প্রধানের স্থানে মায়াকে বসাইলেই হয়। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের তুল্য নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষে মায়ার আবরণ বা বন্ধনই সম্ভব নহে। যদি বন্ধনও স্বীকার করা যায়, তবুও তাঁহার পক্ষে মোক্ষের কোনই অর্থ থাকে না। তিনি নিষ্ক্রিয় সুতরাং তাঁহার কোন চেষ্টা থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—তিনি পূর্ণব্রহ্ম তুল্য। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালই সমান, অথবা তিনি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায় দেশ কালে থাকিয়াও দেশ কালের অতীত। যখন তিনি দেহে আছেন, তখন তিনি দেহেই থাকুন। তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধির কোনই কারণ থাকিতে পারে না। তিনি ত নিত্যই অবিকৃত ও নিষ্ক্রিয়। তিনি ত নিত্যই পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিতেছেন অথবা পূর্ণব্রহ্ম ভাবেই বর্ত্তমান আছেন। পূর্ণব্রহ্মেরও যেমন মোক্ষের জন্য কোনই প্রয়োজন বা চেষ্টা নাই বা থাকিতে পারে না, কূটস্থ ব্রহ্মেরও সেইরূপ মোক্ষের কোনও আবশ্যকতা বা চেষ্টা থাকিতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত জীব দেহে থাকিবেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি অপূর্ণ বা সসীম। সেই অপূর্ণতার কারণ মায়াই বলুন, সত্ত্ব,

রজঃ এবং তমঃ-এর বন্ধনই বলুন, দেহাবদ্ধতাই মূল কারণ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ যে জড়ের, তাহা সাংখ্যও বলেন। সুতরাং উক্ত গুণ-ত্রয়ের মূলে জীবদেহ। পুরুষ যখন মুক্ত হন, তখন আর তিনি দেহ-বদ্ধ নহেন। দোষপাশরাশি জাত গুণ, অর্থাৎ দেহসংসর্গে জাত। সুতরাং দেহই উহাদের মূলে। মায়াকে যদি মোহ অর্থে ধরা যায়, এবং সেই অর্থেই সাধারণে উহাকে বুঝে, তবে উহাও জাত গুণ। উহাও ষড়রিপুর মধ্যে একটী প্রধান রিপু। আবার মায়াবাদীর মায়ারও দেহ বা উপাধি ভিন্ন কূটস্থ ব্রহ্মে কোন অধিকার নাই বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং আমরা যে ভাবেই চিন্তা করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে দেহই আমাদের অপূর্ণতার বা সসীমত্বের কারণ। অতএব যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা দেহে বাস করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত তিনি ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ না করিবেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি অপূর্ণ বা সসীম থাকিবেন এবং তিনি কখনও পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবেন না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যে সকল পরমর্ষি পরমপিতার সহিত অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানে যুক্ত, তাঁহাদের অপূর্ণতা এবং সাধারণ মানবগণের কথা দূরে থাকুক, উন্নত মহাত্মাগণেরও অপূর্ণতার পার্থক্যের পরিমাণ অত্যধিক, তাঁহার পুর্ণতার দিকে এতই অগ্রসর হইয়াছেন। এই জন্যই ব্রহ্মের সহিত অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞানের অবস্থাকেই জীবের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলা হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—'তাঁহারা ত্রিবিধ অভেদ-জ্ঞানের মধ্যে জগদীশ্বরের প্রতি উত্তমর্ণ অভেদ-জ্ঞানের একান্ত অসাধ্যতা এবং সমর্ণ অভেদ-জ্ঞানের অসাধ্যতা প্রযুক্ত অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান করিতে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অভেদজ্ঞান-সাধনা সম্পন্ন হইলে শেষোক্ত অভেদ-জ্ঞান করিতে সমর্থ হন। এবং ঐগুণ-প্রভাবে প্রেমানন্দময়, জ্ঞানময়, সৎ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পর-ব্রহ্মের অন্তর্গত থাকিয়া অনন্ত প্রায় প্রেমানন্দ-সুধা পরম-জ্ঞান-সহকারে ভোগ করিতে থাকেন। ইহাই জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য। এই অবস্থাই প্রকৃত মুক্তি, ইহাই প্রকৃত মোক্ষ। এই অবস্থাকে কেহ কেহ "লয়", কেহ কেহ "নির্ব্বাণ" ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার

কেহ কেহ "সোহহং" জ্ঞান বলিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু জগদীশ্বরে যে স্বপ্রযত্নে "সোহহং" জ্ঞান হইতে পারে না, এবং মানবের প্রতিও যে "সোহহং"-জ্ঞান-সাধনা অতীব দুরূহ ব্যাপার, তৎসমুদায় 'অভেদ-জ্ঞান" অংশে সবিশেষ বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, এই অতুল্য অনুপমেয় অবস্থায় যে পরমানন্দ—পরম সুখ, তাহার বর্ণনা করা মানবের পক্ষে অসাধ্য (তত্ত্বজ্ঞান সাধনা)"। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে এই অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞানের সুধাময়ী অবস্থারও আরম্ভ, উন্নতি ও পরিপক্কাবস্থা অবশ্যই আছে, যেমন সকল উন্নত অবস্থারই এই তিনটী ভাগ বর্ত্তমান থাকে। কারণ, ক্রমই বিশ্বের একটী বিশেষ প্রণালী এবং উহা সর্ব্বত্রই কার্য্য করে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে জীবের উন্নতি দেহে থাকিতে কখনই শেষ হয় না। তিনি ক্রমশঃই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন, যাবত না তিনি ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কোন জীবাত্মাই সম্পুর্ণরূপে দেহমুক্ত হইতে পারেন না, সুতরাং কেহই পূর্ণামুক্তি লাভ করিতে পারেন না। কারণ, ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি, অন্যথা নহে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দেহ থাকিলেই জীবাত্মার অন্য কোন দোষ থাকুক আর নাই থাকুক, অহংকার থাকিবেই। কারণ সত্ত্বগুণও দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। জীব যতকাল পর্য্যন্ত নিজেকে "আমি" বলিয়া মনে করিবেন (সেই আমি তামসিক বা রাজসিক অহংকার (আমিই) হউক, অথবা সাত্ত্বিক আমিই হউক), ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণামুক্তি লাভ করেন না। অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানেও সাধকের পূর্ণামুক্তি হয় না। সুতরাং কোনও প্রকারের দেহাবদ্ধাবস্থায় পূর্ণামুক্তি অসম্ভব। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত আছে:—"মহাভূতাণীন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ। ত্রৈলোক্যং সেশ্বরং (ক) সর্ব্বম্ অহংকারে প্রতিষ্ঠিতম্॥ যথেহ নিয়তঃ কালো দর্শয়ত্যার্ত্তবান্ গুণান্। তদ্বদ্ ভূতেষ্বহঙ্কারং (খ) বিদ্যাৎ কর্ম্ম-প্রবর্ত্তকম্॥" "অর্থাৎ মহাভূত

(ক) এখানে ঈশ্বর শব্দে পরব্রহ্ম নহেন; মহত্ত পুরুষ অথবা সম্রাট্।
(খ) অহংকারঃ পরেষাং তুচ্ছীকরণম্।

সমূহ, ইন্দ্রিয়গণ, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ ও ঈশ্বর-সংকৃত নিখিল ত্রৈলোক্য অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পঞ্চ মহাভূত, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; সমুদায়ে ইন্দ্রিয়-দশক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণত্রয়—ইহারা অহঙ্কার-প্রভাবেই স্থিতি করিতেছে। অধিক কি, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুক্তপুরুষগণ এবং সমস্ত ভুবন অহঙ্কার-প্রভাবেই বিদ্যমান আছেন। অহঙ্কারের লয় হইলে জগতের লয় হয়। যেমন এই জগতে নিয়ত কাল ঋতু-সংক্রান্ত গুণ-সমূহ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রাণিজগতে অহঙ্কারকে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবে। অহংকারের অভাব হইলে, কর্ম্মেরও অভাব হয় এবং কর্ম্মাভাবে জগৎ-স্থিতি-ব্যাঘাত জন্মে। এ কারণ অহংকারের অভাব হইলে যে, জগৎ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই (পরমর্ষি গুরুনাথ)"। এই উক্তি হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুক্ত পুরুষগণও অহংকার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নহেন। সুতরাং দেহ থাকিতে জীবাত্মার সীমাবদ্ধতা যায় না। আবার মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দেহেরও লয় নাই, সুতরাং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও তিনি কখনও অনন্ত অসীমত্ব লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি চিরকালই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাকে চিরকালই অনন্ত পরব্রহ্মের নিকট ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে থাকিতেই হইবে, অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা চিরকাল অংশ ভাবে ভাসমান থাকিবেন, অথবা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে মুক্তি অসংখ্য। যথা—পাপ হইতে মুক্তি, দোষপাশ হইতে মুক্তি, পরমপিতার কোন একটী গুণে একত্ব লাভে মুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিবিধ দেহের বিগমেই পূর্ণামুক্তি, অন্যথা নহে। দেহ মাত্রই জড় পদার্থ দ্বারা রচিত, সেই জড় স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক অথবা কারণই হউক, অর্থাৎ তমঃ-প্রধান, রজঃপ্রধান বা সত্ত্বপ্রধান হউক। দেহ থাকিলে উহার ধর্ম্মও থাকিবে, অর্থাৎ দেহানুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দেহীকে দেহে বদ্ধ

করিবে। সুতরাং ত্রিবিধ দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু দোষ (উহা যতই সূক্ষ্ম এবং স্বল্প হউক্ না কেন) থাকিয়াই যাইবে। পাঠক মনে রাখিবেন যে "দোষের নিঃশেষতাই গুণের পরাকাষ্ঠা" (ক)। আবার আত্মার জড় সংসর্গে আগমন জন্য দোষপাশের উৎপত্তি এবং এই জন্যই উহাদিগকে জাত-গুণ কহে। সুতরাং দোষ গুণের আবরক। যদি সকল দোষ সম্পূর্ণ রূপে লয় হয়, তবে গুণ সমূহকে আবরণ করিবে কে? তবে ত জীবের অনন্ত গুণ লাভই হইল। সেই অবস্থায় ব্রহ্মে লয় ভিন্ন অন্যগতি নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে দোষ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয় না, সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে জীবের ব্রহ্মে লয়ও হয় না। শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় ত্রিগুণের অতীত হইবার উপদেশ আছে। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ অত্যন্ত কঠিন। তমঃ এবং রজঃ অবস্থার আতীত্য পরার্দ্ধ শ্রেণী (Spheres) পার হইলেই লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সত্ত্ব গুণের অতীত হইতে শেষ ছয়টী লোকে স্থিত অসংখ্য মণ্ডলে সাধনার প্রয়োজন।* সুতরাং উহা লয়ের জন্য অসীম কালের প্রয়োজন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পূর্ণামুক্তির সম্ভাবনা নাই। অংশ ভাবে ভাসমান আত্মার অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে বটে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সেই পরিবর্ত্তন পূর্ণ হইয়া অখণ্ড আকারে পরিণত হইবে না। "সত্যধর্ম্ম" গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। "একজন পরমোন্নত সাধক যেন .৯ হইতে অনন্ত কাল উন্নতি দ্বারা .৯৯, .৯৯৯, ৯৯৯৯ ইত্যাদিরূপে .৯° হইলেন। কিন্তু উহাও যে এক হইতে ক্ষুদ্রতর তাহার প্রমাণ এই—

(ক) পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত "অদ্ভূত উপন্যাস"।

* পাঠক মনে রাখিবেন যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনই বন্ধনের কারণ। রজস্তমোগুণে দুঃখ দান করে। তাই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য সকল উন্নত সাধকই ব্যগ্র হন। কিন্তু সত্ত্বগুণ অন্তঃকরণ-বৃত্তি-ধর্ম্ম সুখ ও জ্ঞান দান করে বলিয়া সাধক উহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উহা আত্মার স্বীয় জ্ঞান বা আনন্দ নহে। উহাদিগকে প্রকৃতভাবে লয়ের জন্যই দীর্ঘ ও কঠিন সাধনার প্রয়োজন।

১·০০০০০০
·৯৯৯৯৯ ‥ ইত্যাদি অনন্ত সংখ্যক
·০০০০০০ [ইত্যাদি (অনন্ত —১) সংখ্যক শূন্য] ১। (খ)”

অতএব দেখা গেল যে জীবাত্মার দুইটী অবস্থা। তিনি স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও বাস্তবে চিরকালের তরে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক চির বর্ত্তমান ও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ভেদ অথবা দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে নিরসন অসম্ভব। জীবাত্মার চিরস্থায়িনী সীমাবদ্ধাবস্থা চিন্তা না করিয়া যদি নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় কেহ “সোঽহং” অথবা “অহং ব্রহ্মাস্মি” প্রভৃতি উক্তি সমর্থন করেন তবে তিনি বিষম ভূল করিবেন। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ যেমন অভেদ সত্য, সেইরূপ দেহাবদ্ধতা জন্য সীমাবদ্ধতা নিমিত্ত ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ভেদাভেদ তত্ত্বই সত্য। ভেদাভেদ তত্ত্ব সত্য বলায় বুঝিতে হইবে না যে প্রচলিত কোন মত বিশেষকে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের ভেদাভেদ তত্ত্ব “ব্রহ্মের জীবভাবের ভাসমানত্বের প্রণালী” অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক মনে রাখিবেন যে জীবাত্মার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সকলেই একমত এবং ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। পাঠক এই সম্বন্ধে ব্রহ্ম সূত্রের ৩।২।২৭-২৯ সূত্রত্রয় (“উভয়ব্যপদেশত্ত্বাদ্‌হি কুণ্ডলবৎ”, “প্রকাশাশ্রয়বদ্ধাতেজস্ত্বাৎ” এবং ‘পূর্ব্ববদ্বা”) দেখিবেন। তাহাতে দেখা যাইবে যে মহর্ষি ব্যাসদেব ভেদাভেদ

(খ) স্বপ্রযত্নে কেহই ব্রহ্মে লয় হইতে পারেন না। ঈশ্বরেচ্ছা হইলে সকলেই তাঁহাতে ক্রমশঃ লীন হইতে পারেন। মহাপ্রলয় কালে পরমপিতার সেইরূপ ইচ্ছারই উদয় হইবে এবং সেই মহালীলার পূর্ণতার জন্যই বিশ্ব ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পর্কে “সৃষ্টির সূচনা” অংশ দ্রষ্টব্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের প্রেমলীলাময়ী ইচ্ছা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা এবং জিহীর্ষা। সুতরাং উপরোক্ত অনন্তকালের অর্থ “যাহার অন্ত সাধারণ মানব লাভ করিতে পারে না।” যাহা সৃষ্ট, তাহা এক কালে লয় পাইবেই। বিশ্ব উৎপন্ন, সুতরাং উহার লয় অবশ্যম্ভাবী, তাহা যতই সুদূর ভবিষ্যতে বা অধার্য্য ভবিষ্যতে হউক না কেন। এই সম্পর্কে ‘সৃষ্টি সাদি কি অনাদি” অংশ দ্রষ্টব্য। স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যাহার সৃষ্টি আছে, তাহারই লয় আছে। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই ষড়বিধ বিকারের অধীন।

তত্ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। শ্রুতিতে অদ্বৈত ভাবও যেমন আছে, দ্বৈতাদ্বৈত ভাবও তেমনি বর্ত্তমান। নিম্নে কয়েকটী স্থলের উল্লেখ করা গেল। শ্রুতির সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—৪।৬) নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" "বঙ্গানুবাদ:—দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ অর্থাৎ শরীর আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই বলা হইয়াছে। আবার তাঁহাদিগকে পরস্পরের সখাও বলা হইয়াছে। অতএব ভেদ ও অভেদ দুইই বলা হইল। "সখা" শব্দে এক অর্থাৎ অভেদ বুঝায়। "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানু মতঃ সুহৃদ্। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥" এই সমপ্রাণ হওয়ার অর্থই অভেদ। উক্ত উপনিষদেই ৩।১।৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সাধক ব্রহ্মদর্শন করিলে পাপ মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভেদাভেদ তত্ত্বই সত্য। প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্) প্রজাপতির উক্তি হইতেও দ্বৈতাদ্বৈত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ পরমাত্মার উপাসনা করেন। অর্থাৎ-পরলোকের অত্যুন্নত স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে ব্রহ্মদর্শন সহজে হয়, সেই স্থানেও উপাস্য উপাসক ভেদ আছে। কৌষীতকী উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে রূপকে ব্রহ্মলোকে পরব্রহ্ম ও সাধকের মিলনের একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতেও ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। উহাতে ভেদাভেদ তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ সেই ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আচার্য্য রামানুজ কথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই তৎপরবর্ত্তী ভেদাভেদবাদ সমূহের জনক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ড হইতে ষোড়শ

খণ্ড পর্য্যন্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাবাক্যই সোহহংবাদের সমর্থনে মায়াবাদিগণ উল্লেখ করেন। কিন্তু উহার বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে উহা জীব-ব্রহ্মবাদ সমর্থন করে না। উক্ত স্থল সমূহের প্রত্যেক খণ্ডেই লিখিত আছে যে "এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।" সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা বটেন, কিন্তু জীব পরমাত্মা হইতে পারে না। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে আমরা সুস্পষ্ট দেখিয়াছি যে জীবাত্মা স্বরূপে ব্রহ্মই বটেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে জীবাত্মার দুইটী অবস্থা—একটী স্বরূপ অবস্থা এবং অন্যটী বাস্তব অবস্থা। স্বরূপ অবস্থায় তিনি ব্রহ্মের সহিত অভেদ এবং বাস্তব অবস্থায় ভেদ। মায়াবাদও প্রকৃত পক্ষে যে এই দুই অবস্থা স্বীকার করেন, তাহাও পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা সোহহংবাদ সমর্থিত হয় না, বরং আমাদের মতই অনুমোদিত হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জীব অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু আত্মা+দেহ। আত্মাই যে দেহবদ্ধতা জন্য ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত স্থল সমূহে শ্বেতকেতু অর্থে শ্বেতকেতুর হৃদয়েস্থিত অণিমা বস্তু অর্থাৎ তাঁহার আত্মা, কিন্তু মহর্ষি আরুণির পুত্র দেহসম্পন্ন শ্বেতকেতু নহেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে "উপনিষদুক্তা আখ্যায়িকা যোগে আত্মা ও জড়ের পার্থক্য বিচার" অংশে দেখিয়াছি যে মহর্ষি সনৎ কুমার কথিত ভূমাতত্ত্ব ও ভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রোক্ত উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ষড়বিংশ খণ্ডে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতেই সুমুদায় হইয়াছে। সুতরাং ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন। ভারতবর্ষে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী এবং সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমানগণ সোহহংবাদী। ইহা ভিন্ন কোন কোন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ মাঝে মাঝে উক্ত প্রকারের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল মহাপুরুষগণের শ্রীচরণ প্রান্তে বারংবার ভক্তিভরে প্রণত হইয়া

বিনীত ভাবে এই কথা বলিতে হইতেছে যে তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি সমূহ সম্পূর্ণ উক্তি নহে। তাঁহাদের সম্মুখেও অনন্ত উন্নতি বর্ত্তমান। সাধারণতঃ যে সকল মহর্ষি অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানে পরমপিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ঐরূপ উক্তি করিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা পরম পিতার সহিত অভেদের একটু আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে সেই অভেদও ত্রিবিধ অভেদের মধ্যে অধম অর্থাৎ অন্তর্গত হইয়া অভেদ। ইহা দ্বারা যেন কেহ ইহা মনে না করেন যে আমরা সেই সকল সাধকদিগকে তুচ্ছ করিতেছি। সেই সকল সাধক পরমোন্নতদিগের মধ্যেও অত্যুন্নত। তাঁহাদের গুণ ও শক্তিরাশি আমরা ধারণাই করিতে পারি না। কিন্তু তথাপিও সত্যানুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত একত্বের অনন্ত একত্বে নিত্য বিভূষিত পরব্রহ্মের নিকট তাঁহারাও ক্ষুদ্র। আবার মনে রাখিতে হইবে যে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞানও সমর্ণ অভেদ জ্ঞান বা সোঽহং জ্ঞান নহে ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যধিক। অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকও ঈশ্বর ভক্তির লয়ে সমর্থ নহেন। কারণ, তিনি নিজে পরমপিতার নিকট ক্ষুদ্রই মনে করেন। (আর অনন্তের নিকট ত সকলেই ক্ষুদ্র)। কিন্তু সমর্ণ অভেদ জ্ঞানে ভক্তি থাকিতে পারে না। কারণ, সমানে সমানে ভক্তির স্থান নাই।পাঠক মনে রাখিবেন যে, "যিনি অনাদি ও অনন্ত, যিনি অনন্ত-উন্নত-অনন্ত-গুণের অনন্তরূপে অনন্ত নিধান, যিনি পূর্ণ ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন ও সর্ব্বসুখশান্তি-বিধাতা, পার্থিব ভক্তির বিদ্যমানতায় ও লয়েও যাঁহার প্রতি অনন্তরূপে অনন্তকাল অনন্তজগতের অনন্তভক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতাই একমাত্র অনন্ত কালের ভক্তিভাজন" ।* ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির যখন লয় হয় না, তখন ব্রহ্মপ্রেম কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার সহিত সোঽহং জ্ঞান লাভ অসম্ভব। সোঽহং জ্ঞানের পূর্ণতা ও প্রেমের পূর্ণতা একই বস্তু। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে বিষয়টী আরও একটু পরিষ্কার হইবে বলিয়া মনে করি। একজন বিশিষ্ট

* সত্যধর্ম্ম।

রাজার সাতটী পুত্র বর্ত্তমান। তিনি একদিন সকলকে ডাকিয়া নিম্ন-লিখিত ভাবে জ্ঞাপন করিলেন। "তোমরা আমার আত্মজ। তোমাদের সকলেরই আমার সম্পত্তিতে সমান অধিকার। কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে তোমাদের কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল আমার পুত্র বলিয়াই আমার রাজত্বের অধিকারী হইবে। তোমরা ইহাও মনে করিও না যে অনভিজ্ঞ মাতা পিতা যেমন আহ্লাদে ছেলেকে নির্ব্বিচারে সু ও কু উভয়বিধ বস্তু দান করে, সেইরূপ ভাবে তোমরা কুপথে চল, আর সুপথেই চল, আমি তোমাদিগকে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিব। তোমাদিগের ভরণ, পোষণ, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতির জন্য সাধারণ ভাবে যাহা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তোমাদিগকে দিব বটে, কিন্তু নিজ নিজ গুণ ও শক্তি বিকাশ করতঃ রাজত্ব পাইবার উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে হইবে। আমার অপার ঐশ্বর্য্য ও ইহার ইহাই নিয়ম যে সকলেই সমান ভাবে ইহা পাইতে পারিবে। অথচ সেই সম্পত্তি কিছুতেই নিঃশেষ হইবার নহে। তোমরা যত্ন কর, চেষ্টা কর, নিরন্তর সাধনায় রত থাক। দেখিবে সকলেই ক্রমশঃ সম্পত্তির পর সম্পত্তি লাভ করিতেছ। আমার নিকট পৃথিবীর ন্যায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ নাই। যে সাধনা করিয়া যতটুকু উপযুক্ততা লাভ করিবে, সে ততটুকু সম্পত্তি পাইবে। মনে করিও না যে আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিব। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিব। যদি তোমরা একপদ অগ্রসর হও, তবে আমি তোমাদের সহস্র পদ অগ্রসর করিয়া দিব।" উক্ত দৃষ্টান্তে যাহা বলা হইয়াছে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থাও তাহাই। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মার সহিত এক বলিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য পাইবার অধিকারী বটে, কিন্তু সেই জন্যই তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। জীবাত্মা অশেষ দোষপাশে আবদ্ধ, এমন কি, সত্ত্বগুণও তাঁহাকে দেহে বদ্ধ করিয়া রাখে ও ভ্রম জন্মায়। সুতরাং সাধনা ও উপাসনা দ্বারা তাঁহার গুণোন্নতি লাভ করিয়া দোষপাশরাশির ক্রমশঃ লয় করিতে হইবে। পরম পিতার অনন্ত গুণ, সুতরাং জীবাত্মার গুণরাশির বিকাশ করি-

বার জন্য এইরূপ সাধনা অনন্ত কাল চলে বলিয়াই সোঽহং জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যান্য স্থলে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। স্থূল, আমরা যতকাল ত্রিবিধ দেহ সমূহ হইতে মুক্ত না হই, ততকালই আমাদের বন্ধন ও ততকালই আমাদের অপূর্ণতা। সুতরাং সাধনাও অনন্ত। পাঠক এই সম্পর্কে সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের পরীক্ষা, তাহা স্মরণ করিবেন। ব্যাপারটী নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র নহে, বরং ইহা চিরকাল স্থায়ী। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় যখন স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই, তখন জীব-ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে কেন এত সমালোচনা। ইহার উত্তরে প্রথমতঃই বক্তব্য এই যে পাঠক গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে জীবে অনন্ত সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া জীব কখনও অনন্ত নহেন, কিন্তু তিনি চিরকাল সান্ত।* জীব যত বড়ই হউক্ না কেন, তিনি যত আত্মোন্নতি লাভ করুন্ না কেন, তিনি জীবই এবং যতকাল তিনি দেহাবদ্ধ থাকিবেন, ততকালই তাঁহাকে ক্ষুদ্র থাকিতে হইবেই, ততকালই তিনি সান্ত ও সীমাবদ্ধ। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা বলিবার অর্থ কি? উহার অর্থ এই যে পরমাত্মার অনন্ত গুণ ও শক্তি জীবাত্মায়ও আছে বটে, কিন্তু উঁহারা গাঢ় এবং কঠিন আবরণে চির আবৃত। গুণোন্নতি বা স্বরূপ অবস্থা লাভের অর্থ এই যে সেই আবরণ রাশি উন্মোচন করিয়া পরমাত্মার গুণ ও শক্তিরাশির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সুতরাং সেই আবরণ রাশি পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত না হইলে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করা অসম্ভব। আবার যে পর্য্যন্ত জীবের সেই আবরণ ক্ষুদ্রাকারে বা সূক্ষ্মাকারে থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই তিনি পূর্ণ ব্রহ্মত্ব দাবী করিতে পারেন না। কোন জীবই কোন কালেও পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না, অর্থাৎ

---

* জীবের বাস্তব অবস্থা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। এই বাস্তব ও স্বরূপ অবস্থার পার্থক্য দূরীকরণই আমাদের অনন্তপ্রায় জীবনের কার্য্য। উপাধিও (দেহও) তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে। উহাই আমাদিগকে চিরকাল বন্ধন করিয়া রাখিবে।

অনন্ত গুণরাশির পূর্ণ বিকাশ সাধন হয় না। তিনি মহাপ্রলয় কালে একমাত্র ব্রহ্মকৃপায় ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হইবেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বহুস্থলে লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইবে। জীব বলিতে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকেও বুঝায়। ইহা "ইতর জীবের কথা" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং সোঽহংবাদীও ইহা স্বীকার করেন। বৃক্ষাত্মাও জীবাত্মা, সুতরাং তিনিও স্বরূপতঃ পরমাত্মা। কিন্তু বৃক্ষ নিজেকে ব্রহ্ম বলিবে, ইহা আমাদের ধারণার অতীত। মানব ও দেবতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁহাদেরও দেহ বর্ত্তমান। তাঁহাদের দেহ উন্নত প্রকারের। সুতরাং ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর বাধা সম্পন্ন, এইমাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ গুণ বিকাশের উপযুক্ততা ক্রমশঃ সেই সকল দেহে অধিক হইতে অধিকতর। কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে কোনও প্রকারের দেহে থাকিতে থাকিতে অনন্ত গুণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। একটী তত্ত্ব চিন্তা করিলেই এই বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবে। জীবের আদি জন্ম সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ' অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি জন্ম লাভ কালীন দেহাবদ্ধ হইবার কালে ব্রহ্মই স্বয়ং জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হন। দেহাবদ্ধ হইলেই অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয় এবং জীবাত্মা দোষপাশে আবদ্ধ হন। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের জীব-ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেহই আমাদের আবরণ এবং এই আবরণ সম্পূর্ণ লয় না হইলে পূর্ণামুক্তি বা ব্রহ্মে লয় অসম্ভব।* যে দেহের জন্য দোষপাশের আবরণ বা বন্ধনের আরম্ভ, সেই দেহের সম্পূর্ণ শেষ না হইলে দেহজাত দোষপাশরাশিও শেষ হয় না, তজ্জনিত বন্ধন বা আবরণেরও শেষ হয় না, সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মত্বও লাভ হয় না। দেহ সাত্ত্বিকই হউক্ অথবা তামসিকই হউক্, যে স্থলেই দেহ, সেই স্থলেই অল্পই হউক্ বা অধিকই

* এই সম্পর্কে 'জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও 'গুণবিধান" অংশদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

হউক, সূক্ষ্ম ভাবেই হউক অথবা স্থূল ভাবেই হউক, দোষপাশ তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবেই। সুতরাং জীব চিরকাল জীবই থাকিবেন, তিনি কখনও দেহধারী হইয়া ব্রহ্ম হইতে পারিবেন না। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছেন যে এক পাউণ্ড Steel-এ যে Energy নিহিত আছে, তাহা মুক্ত করিতে পারিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Navyকেও ধ্বংস করা যায় (ক)। এক পাউণ্ড Steel এর মধ্যে যে অত্যধিক সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তাহা আমরা জানি মাত্র। কিন্তু অর্দ্ধসের পরিমাণ লৌহখণ্ড কতস্থানে কতভাবে পড়িয়া থাকে, উহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই হইতেছে না। উহাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, তাহার বিকাশ সাধন না করিতে পারিলে উহারা সেই ভাব প্রকাশে সমর্থ হয় না। জীবাত্মারও উক্ত অবস্থা। তাঁহাতে অনন্ত সম্ভাবনা নিত্য বর্ত্তমান বটে, কিন্তু উপাসনা ও সাধনা দ্বারা গুণরাশির বিকাশ সাধন করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেই হইবে। সুতরাং তাঁহার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল সেই জন্যই তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না। গ্রীক দার্শনিক মহামনা Plato সৃষ্টিকার্য্যে Ideology অর্থাৎ শেষ উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাবিত হওয়ার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের বহু প্রসিদ্ধ দার্শনিকও এই মতের পক্ষপাতী। সেই মতানুযায়ী যদি আমরা এই বিষয়ের চিন্তা করি, তবে আমাদের বলিতে হয় যে একটী বটবৃক্ষের বীজের ভিতর বটবৃক্ষটী Potentially বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সেই জন্যই সেই বীজটী বলিতে পারে না যে উহা বটবৃক্ষই। সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও এবং পূর্ণভাবে পরমাত্মত্ব লাভই তাঁহার পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইলেও তিনি কখনও বলিতে পারেন না যে তিনি পরমাত্মাই। কারণ, অনন্ত উন্নতি বা অনন্ত বিকাশ সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান, এবং তাঁহার পক্ষে Potentiality-কে (সম্ভাবনাকে) actuality-তে (বাস্তবে) পরিণমন করিতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা

(ক) Atomic Bomb-এর ক্রিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা ধারণা করা যায়।

করিতে হইবে। বটবীজ যেমন ২০।৩০ বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত (Full grown) বটবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, জীবের পক্ষে যে সেইরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহা মায়াবাদিগণও স্বীকার করিবেন। কারণ, তাহাদের মতেও জীবাত্মা ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মানব দেহ ধারণ করেন এবং মানব দেহ ধারণ করিয়া নিম্নকুলে দুই লক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার পরেও উত্তম হইতে উত্তম জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে জীবাত্মার উত্তম মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে বহুকাল অতীত হয়। মায়াবাদিগণ পরলোকে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত কালের সঙ্গে পরলোক বাসের কাল যোগ করিতে হইবে। পরলোকে আমাদের কর্ত্তব্য ও উন্নতি আছে, ইহা সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়, এবং আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে উপনিষদও তাহাই বলেন। সুতরাং অত্মোন্নতি লাভ করিতে হইলে আরও বহুকাল যে ব্যায়িত হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে পূর্ণামুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা কখনও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে এই গ্রন্থের অন্যত্র দেহাত্ম-ভেদ জ্ঞান লাভ করিতে বলা হইয়াছে। যদি তাহাই সম্ভব হয়, তবে সেই সাধনে সিদ্ধ সাধক কেন পরমাত্মাকে সোঽহং বলিতে পারিবেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে দেহাত্মভেদ সাধনা করিতে হইবে সত্য। সাধক যতই উন্নত হইবেন, তিনি ততই ধারণা করিতে পারিবেন যে দেহ এবং আত্মা পৃথক্। এই সাধনায় তিনি অত্যধিক ভাবে কৃতকার্য্যও হইবেন বটে, কিন্তু এই সাধনা যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে সত্ত্বগুণও আমাদিগকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারিত না। সাধকের জাত-গুণ-রাশির তামাসিক ও রাজসিক অংশ লয় হইলেই তাহার দোষ-পাশের লয় হইল বলা হয়। উহাদের সত্ত্বাংশ লয় হইতে আরও অত্যধিক বিলম্ব হয়। কিন্তু সকল দোষের সম্পূর্ণ ভাবে লয় কারণ-দেহে থাকিতেও সম্ভব নহে। ভগবৎ কৃপায় পরমোন্নতি লাভ হইলে

দোষের সত্ত্বাংশও ক্রমশঃ লয় হইতে থাকে, ইহা আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য। পাঠক মনে রাখিবেন যে "দোষের নিঃশেষতাই গুণের পরাকাষ্ঠা"। সুতরাং দোষ গুণের আবরক। যদি সকল দোষই দেহে থাকিতে থাকিতে সম্পূর্ণ রূপে লয় হয়, তবে আত্মার অনন্ত সরল গুণকে আবরণ করিবে কে? তবে ত জীবের দেহে থাকিতে থাকিতেই অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ হইল? কিন্তু তাহা যে সম্ভব নহে, তাহা এই প্রবন্ধের নানা স্থলে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেহী চিরকাল অপূর্ণ থাকিবেন এবং নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তাঁহার অনন্ত অসীমত্ব লাভ অসম্ভব। ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদাভেদ সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক দেহ থাকিতে থাকিতে কখনও শেষ হইবে না অর্থাৎ চিরকাল স্থায়ী। ইহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। আমরা একটী অতি দীর্ঘ সূত্রের কল্পনা করি এবং তাহাতে অসংখ্য গ্রন্থিও বর্ত্তমান ইহা চিন্তা করি। এস্থলে সমগ্র সূত্রটী ব্রহ্মস্থানীয় এবং সূত্রের গ্রন্থিবদ্ধ স্থল সমূহ জীবগণ ভাবে চিন্তনীয়। (সূত্রে মনিগণা ইব) গ্রন্থিও ঐ সূত্রাংশ দ্বারা রচিত। ইহাতে বাহির হইতে কিছু আনিয়া যোগ করা হয় নাই। এখন জীবগণ সাধনা দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপা লাভে গ্রন্থি মোচন করিবেন, ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধক যখন ব্রহ্মের সহিত একটী গুণে একত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার গ্রন্থি মোচন আরম্ভ হয়। এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে গ্রান্থ একবার খুলিলেই সেই সূত্রটুকু আসল সূত্রের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে, সুতরাং প্রথম ব্রহ্ম দর্শনেই সাধক বন্ধন মুক্ত হইলেন। বন্ধন মোচনের আরম্ভের কথা বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে সূত্রের প্রত্যেক গ্রন্থিতেই অসংখ্য পাক বর্ত্তমান, ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে। সাধক এক একটী একত্ব লাভ করিবেন ও তাঁহার বন্ধনের এক একটী পাক খসিয়া সেই সূত্রটুকু মূল সূত্রে মিলিয়া যায়। অর্থাৎ বন্ধন লয় প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থির পাকেরও অন্ত নাই। ব্রহ্মের অনন্ত

গুণ। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে যে আমাদেরও অনন্ত একত্ব লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদেরও অনন্ত প্রায় গ্রন্থির পাক মোচন করিতে হইবে। এই সাধনা চিরকাল চলে বলিয়াই জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারেন না। অর্থাৎ গ্রন্থি মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কখনও সম্পূর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃই বন্ধন মোচন হইতে থাকায় তিনি পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হন। এই সূত্র গ্রন্থি সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিলাম অর্থাৎ ক্রমশঃ উহার মোচন, জীব সম্বন্ধেও তাহাই হইতেছে। জীবের অসংখ্য দেহ সুতরাং অসংখ্য বাধা বিঘ্ন। তাহার এই বাধা বিঘ্ন সমূহ যতকাল অসংখ্য পাকের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে নিরসন না হইবে, ততকালই তিনি সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ। তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে অনন্তত্ব লাভ করিতে পারেন না। তাহার পক্ষে বন্ধন থাকিবেই, তাহা সাত্ত্বিকই হউক্ অথবা অন্য প্রকারেরই হউক্। সুতরাং সোহহং জ্ঞান লাভ অসম্ভব এবং ভেদাভেদবাদই সত্য। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদাভেদ সম্পর্ক চিরকাল স্থায়ী। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে জীবাত্মার স্বরূপের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উক্ত মতাবলম্বীগণ অবশ্যই বলিবেন যে তাহারা উপাধির কথাও বলিয়াছেন। একথা সত্য। কিন্তু সমস্ত অনর্থের মূল ত উপাধিকে তাহারা অতি তুচ্ছ করেন, মিথ্যাই বলেন। তাহারা এমনও বলেন যে "রজ্জু সর্প নহে" ইহা শুনিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রান্তি দূরীভূত হয়, সেই রূপই "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোহহং" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতেই পূর্ণ ব্রহ্মত্ব বা সোহহং জ্ঞান লাভ হয়। উহা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও সাধকগণ বুঝিতে পারিবেন। শুনা যায় জ্ঞান-মার্গাবলম্বী সাধকগণের মধ্যে অনেকেই ২২৪ দিন মাত্র গুরুসেবা করিয়া সোহহং হইয়াছে বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন। পাঠকবর্গকে একবার সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে অনুরোধ করি। ব্রহ্মের অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ। প্রত্যেক জীবের সেই অনন্ত

গুণের প্রত্যেক গুণে একত্ব লাভ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, সেই অনন্ত একত্বের একত্বও তাঁহার লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত। সুতরাং তাঁহার সমান হইতে অর্থাৎ সত্যভাবে সোহহং বলিতে জীবেরও অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিতে হইবে। ইহা অতিশয় সহজবোধ্য যে এই সাধনা অনন্ত-প্রায় কালসাপেক্ষ। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে লয় বা পূর্ণামুক্তি সম্ভব নহে। সোহহং যে কখনও সম্ভব নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। আমাদের উপাধির কারণ কি? উপাধির মূলেও ত দেহই। আমরা যদি ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অবিদ্যা কি অবলম্বন করিয়া থাকিবে? বিশ্ব যে অনন্ত প্রায়, সুতরাং আমাদের দেহও যে অনন্ত প্রায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত মতের সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করেন না, জগৎকে জগৎ বলিয়াই দেখেন এবং সেই রূপই ব্যবহার করেন। আবার যাহারা তপস্যা ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেহান্তে দেবযান পথে যাইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বিদ্যুতেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকে যাইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত লয়ের প্রতীক্ষায় বাস করেন।*

---

* মহাত্মা শংকরাচার্য্য ব্রহ্মলোকের অর্থ "ব্রহ্ম এব লোকঃ" ভাবে করিয়াছেন। সত্যসত্যই ব্রহ্মের অবস্থানের জন্য বিশেষ কোন লোক নাই বা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের নিকট স্বর্গ ও নরক, সুস্থান ও কুস্থান বলিয়া কিছুই নাই। তিণি সর্ব্বব্যাপী বিভু। তিনি দেশকালে আবদ্ধ নহেন। তিনি দেশকালে থাকিয়াও দেশকালের অতীত। সুতরাং বিশ্বেও তিনি আবদ্ধ নহেন, কিন্তু বিশ্বেরও অতীত। হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বকে ব্রহ্মের একপাদে অবস্থিত বলেন এবং ব্রহ্মের অবশিষ্ট ত্রিপাদ বিশ্বের বাহিরে। সুতরাং সেই মতেও ব্রহ্ম কখনও বিশ্বের কোন এক লোকে, কোন এক মণ্ডলে, বা কোনও এক বিশেষ দেশে বাস করিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে ব্রহ্মলোক তবে কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, যে সকল মণ্ডলে সহজেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, অর্থাৎ যেস্থানে সাধকগণের কারণ-দেহে বর্ত্তমান থাকার জন্য অর্থাৎ সত্ত্ব প্রধান দেহে বাস করিবার জন্য সহজেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি লাভ হয়, সেই সকল স্থানকেই এক অর্থে ব্রহ্মলোক বলা যাইতে পারে। যদিও ইহা পুনরায় বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের কোনই লোক নাই। এই

এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। আমরা দেখিতে পাইলাম যে মায়াবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মলোকে যাইয়াও সাধকগণ অসংখ্য বৎসর জীবন যাপন করেন এবং অবশ্যই সেই সময় তাঁহারা কারণ-দেহে বাস করেন প্রত্যেক জীবেরই কোনও না কোনও এক প্রকার অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণ-দেহে বাস করিতে হইবেই। তিনি কখনও দেহ-শূন্যাবস্থায় থাকিতে পারেন না। কারণ-দেহ সত্ত্ব প্রধান। সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ, সুতরাং সেই দেহেও সাধক পূর্ণামুক্তি লাভ করেন না। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম এবং একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণেরও অহংকার বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে দোষমুক্ত নহেন, অর্থাৎ উপাধি মুক্ত নহেন। সুতরাং মহা-প্রলয়ের পূর্ব্বে কেহই সম্পূর্ণরূপে উপাধি বিবর্জ্জিত হন না। আবার উপাধি বর্জ্জিত না হইলে পূর্ণভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ অসম্ভব! অতএব মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সোহহং জ্ঞান লাভ অসম্ভব। মায়াবাদিগণ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মে লয়ের জন্য প্রতীক্ষা করেন। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে তাঁহাদের চরম উন্নতি লাভ হইয়াছে, কেবল কল্পান্তের জন্য প্রতীক্ষা মাত্র, তবে

সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। উক্ত অর্থে ভুবঃ লোক হইতে সত্য লোক পর্য্যন্তের সকল মণ্ডলই ব্রহ্মলোক পর্য্যায়ভুক্ত। পাঠক মনে রাখিবেন যে সাধক উন্নতি অনুযায়ী ক্রমশঃ উর্দ্ধলোকে গমন করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার ব্রহ্ম দর্শন সহজ হইতে সহজ-তর হয়। সুতরাং ভুবঃ লোকে সাধক যত সহজে ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন সত্য-লোকে তাহা হইতে অত্যধিক পরিমাণে সহজেই ব্রহ্ম দর্শন করেন অথবা নিত দর্শন লাভ করেন। এই সকল মণ্ডলে সাধকের দেহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনি হয় যে, তাহাতে ব্রহ্ম দর্শনের বাধা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ব্রহ্মলোক অর্থে কেহ কেহ ব্রহ্মার লোক বলেন। তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ব্রহ্মা নামক পরমোন্নত মহাপুরুষ তাঁহার উন্নতি অনুযায়ী এক সময়ে একটী মাত্র মণ্ডলে বাস করিতে পারেন। কিন্তু তিনি একই সময়ে বহু মণ্ডলে বাস করেন না। তিনি যখন যে মণ্ডলে উন্নতি অনুযায়ী বাস করেন, তখন কেবল সেই মণ্ডলকেই ব্রহ্মার লোক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে "তেষু ব্রহ্মলোকেষু" অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বহু। পাঠক দেখিবেন যে আমাদের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মার লোকও বহু।

তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের জীবন দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ইহা নিয়ত যুদ্ধে ব্যাপৃত ও গতিশীল। আমাদের বাসনা কামনার শান্তি নাই। কেবল তাহাই নহে। সাধকগণ জানেন যে তাঁহাদের একটু উন্নতি হইলেই তাঁহারা আরও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন। অনন্ত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জীবের অন্তর্নিহিত স্বভাব। উন্নতি, তাহার পর উন্নতি, তাহার পর আরও উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু জীব কখনও তৃপ্ত হন না। তাই কবিবর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ—"তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর"। এই উন্নতি (ও তজ্জন্য তৃপ্তি) এবং অতৃপ্তি পর্য্যায়ক্রমে অনন্তপ্রায় কাল চলিতে থাকিবে, কিন্তু ব্রহ্মকে পূর্ণ ভাবে লাভ হইবে না। সুতরাং তৃপ্তিরও পূর্ণতা এবং অতৃপ্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি কখনও হইবে না বা হইতেও পারে না। অতএব বলা যাইতে পারে যে জীব Dynamic, কিন্তু Static নহে। সুতরাং সাধকগণ যে ব্রহ্মলোকে যাইয়াও অর্থাৎ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াও সুদীর্ঘকাল বসিয়াই থাকিবেন, ইহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সৃষ্টি ক্রমপ্রণালীর অন্তর্গত। এমন কোন কার্য্য দেখা যায় না যাহা এই প্রণালী বহির্ভুত ভাবে সম্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই ক্রমপ্রণালীর কার্য্য নিরীক্ষণ করা যায়। প্রত্যেকেরই ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে এবং এই গতি অনন্তপ্রায় কাল চলিতে থাকিবে। এই ভাবে জীব চরমোন্নতি লাভ করিয়া মহাপ্রলয়কালে ত্রিবিধ দেহের বিগমে পরমপিতার কৃপায়—তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন, নতুবা নহে।* পরমোন্নত সাধক যদি ব্রহ্মকে পূর্ণ ভাবেই লাভ করিতে পারিবেন, তবে ত তাঁহার মায়াও তখনই সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইত এবং তিনিও তখন পূর্ণ ব্রহ্মই হইতেন। তাঁহার আবার দেহেই বা বাস কেন?

---

* ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রলয় কালে জীবের পূর্ণমুক্তি হইবে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে সেই কালও অনন্ত প্রায়। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টির বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে অধার্য্য কাল লাগিয়াছে। সেইরূপ মহাপ্রলয় সম্পূর্ণ হইতে অধার্য্য কালের প্রয়োজন হইবে। তাহা এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইবে না।

তাঁহার দেহের বা উপাধির প্রয়োজনীয়তা বা কোথায়? ব্রহ্মলোকে মহাত্মাগণ পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ দর্শন লাভ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকিবার বিরুদ্ধে তিনটী গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।—প্রথমটী এই যে ঐ প্রকার সম্ভব হইলে ব্রহ্মলোকে অনেক পূর্ণ ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন। কারণ তখন তাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সুতরাং সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত মহাত্মা, কেবল কল্পান্তের জন্য অপেক্ষা ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। একাধিক ব্রহ্ম কখনও থাকিতে পারেন না। মায়াবাদিগণও একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মতত্ত্বের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে দেহে থাকিতেই পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিলে পূর্ণ ব্রহ্মেরও দেহধারী পূর্ণ অবতার রূপে আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। যদি দেহে থাকিতে থাকিতেই পূর্ণ ব্রহ্মের তুল্য হওয়া যায়, তবে পূর্ণ ব্রহ্মের পক্ষেও দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ এবং পূর্ণ ভাবে প্রকাশে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কোন ব্রহ্মবাদীই পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ অবতারত্ব গ্রহণ স্বীকার করেন না। মায়াবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। তৃতীয় আপত্তি এই যে মায়াবাদ বলেন যে কোন সাধক পৃথিবীতে দেহে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তিনি স্থূলদেহের অবসানেই ব্রহ্মে লয় হন। ব্রহ্মজ্ঞানী পারলৌকিক সাধকেরও কেন সেইরূপ তৎকালীন কারণ-দেহের তৎক্ষণাৎ অবসান হইবে না এবং তিনি কেন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মে লয় হইবেন না? উভয়ই ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার পক্ষে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য দেহে বাস করিবারও কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে এরূপ বিভিন্ন বিধান কেন? এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে কারণ-দেহও একটী নহে—অসংখ্য। যে দেহে থাকিতে থাকিতে প্রোক্ত পারলৌকিক মহাত্মা পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার কেবল সেই মণ্ডলের কার্য্য শেষ হইল নহে, কিন্তু তদুপরি অসংখ্য মণ্ডলের কার্য্য শেষ হইল। সুতরাং সেই দেহ সমূহেরও সেই মুহূর্ত্তেই লয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহারও ব্রহ্মে লয় সেইরূপই অবশ্যম্ভাবী। পূর্ণব্রহ্ম দর্শনের পর আর এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহাতে তিনি দেহে আবদ্ধ হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত অযথা প্রতীক্ষা করিবেন।—যদি কেহ

বলেন যে জীবকে যখন Dynamic বলা হইল, তখন ব্রহ্মও Dynamic, অর্থাৎ তাঁহারও অনন্ত ক্রমশঃ হইতে থাকিবে, তবে বলিতে হয় যে অপূর্ণেরই উর্দ্ধগতি, কিন্তু যিনি নিত্য পূর্ণ, যাঁহাতে অনন্ত গুণের অনন্ত উন্নতির নিত্যই নিরতিশয়ত্ব বর্ত্তমান, তাঁহার সম্বন্ধে আর উন্নতির প্রশ্নের উদয় হয় না বা হইতেও পারে না। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে তবে কি ব্রহ্ম Dynamic নহেন? ইহার উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে তিনি যদি Dynamicই না হইতেন, তবে আমরা জগতে অসীম শক্তির খেলা দেখিতে পাইতাম না। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাঁহার ইচ্ছাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তাঁহাতে ইচ্ছাশক্তি নিত্য বর্ত্তমান বলিয়াই তাঁহার জগদ্রূপ কার্য্যে শক্তির ক্রিয়া আমরা সন্দর্শন করিতেছি। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা", "লীলাতত্ত্ব" এবং "ইচ্ছাশক্তি" অংশত্রয় দ্রষ্টব্য। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে অনন্ত Dynamism এবং অনন্ত Staticism-এর অনন্ত মিশ্রণে যাহা, তাহা তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশও দ্রষ্টব্য। মায়াবাদে বলা হয় যে, যে সকল সাধক দেহে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহান্তে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। আচার্য্য রামানুজ এই মতের বিরোধী। এই মত আমাদেরও অনুমোদিত নহে। কারণ সত্যধর্ম্মাবলম্বী ঋষিগণ পরলোক সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে পরমোন্নত সাধকগণ অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণও পরলোকে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছেন। তাঁহারা এখনও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন নাই বা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন নাই। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে উপাধি যে আছে এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমের পূর্ব্বে যে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, ইহা বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবে কোনই পার্থক্য প্রদর্শিত হইল না। আমরাও বলি যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য না থাকিলেও কার্য্যতঃ (For all practical purposes) পার্থক্য চির বর্ত্তমান। মায়াবাদী অবশ্যই

বলিবেন যে উপাধি নিয়া এত চিন্তার কোনই কারণ নাই। পাঠক ইহার উত্তর বুঝিতে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত বিষয় স্মরণ করিবেন। তাহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে এক ব্রহ্মই লীলার্থ স্বেচ্ছাক্রমে বহু ভাবে সুতরাং সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই সৃষ্টি তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তির পরীক্ষা অথবা Practical Demonstration, অর্থাৎ এই কার্য্য তাঁহারই। সুতরাং কার্য্য জগৎ একেবারে বাদ দিয়া কেবল স্বরূপ চিন্তা করিলেই জীবের সম্বন্ধে সত্য ও সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। এই জড় জগৎ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। ইহা সৃষ্ট না হইলে লীলা অসম্ভব হইত। পরিশেষে বলিতে হয় যে "আমি কি' ইহা সত্য ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে গেলেই আমাদের স্বরূপ অবস্থা ও বাস্তব অবস্থা উভয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে এবং উহার ফলে ভেদাভেদ তত্ত্বেই আমরা উপনীত হইব। মায়াবাদিগণ সোহহংবাদের একটী দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন যে নদী যেরূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করে, সেই-রূপ জীবাত্মাও ব্রহ্ম দর্শনে নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে মিলিত হন। সুতরাং জীব যে সোহহং জ্ঞান লাভ করেন, তাহা সত্য। আপাত দৃষ্টিতে এই দৃষ্টান্তটীর চতুর্দ্দিক সমঞ্জসীভূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে নদী মহা-সাগরের সহিত মিলিত হইলেও উহার নদীত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় না। ইহা সকলেই জানেন যে নদী সাগরে মিলিত হইবার পরে উহাকে আর নদী বলা হয় না বটে, কিন্তু সাগর সঙ্গমের পশ্চাতে উৎ-পত্তি স্থল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ নদী নদীই থাকে। সুতরাং একবার বা দুইবার —কোটী কোটী বার ব্রহ্ম দর্শনেও সাধকের তাঁহার সহিত সোহহং জ্ঞান লাভ হয় না বা হইতেও পারে না। তাঁহাকে এক বা একাধিক গুণে—অনন্ত গুণে নয়—দর্শন করা যায় মাত্র। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সাধক সেই অনন্ত একত্বের একত্বে ভূষিত না হইতে পারিবেন, অর্থাৎ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণে গুণবান ও অনন্ত গুণাতীত না হইতে পারেন,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না।* অনেকের ধারণা যে একবার মাত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিলেই হইল, তাহার পর সাধকের আর কর্ত্তব্য নাই অর্থাৎ উহাই শেষ। এই ধারণা যে সত্য নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে নানাস্থলে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে যে গুণে বা গুণ সমূহে সাধক একত্ব লাভ করেন, তাঁহাকেও (ব্রহ্মকেও) সেই সেই গুণে গুণময় ভাবে দেখেন। কেনোপনিষদে দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষতঃ উহার ৩য় মন্ত্রে এই ভাবটী অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রটী এই :—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥" "বঙ্গানুবাদ :—যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই; কিন্তু অসম্যগ্দর্শীদিগের নিকট তিনি বিজ্ঞাত, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরা মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন। (তত্ত্বভূষণ)।" অতএব কেনোপনিষদ্ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন ক্ষণিকের ব্যাপারও ত নহেই, যুগ যুগান্তর সাধনায়ও তিনি উত্তমরূপে—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হন না। এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে ইতঃপর লিখিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ত্রিবিধ দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং কারণদেহের সংখ্যা অসীম প্রায়। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে জীবের যতই একত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ততই তিনি কারণ হইতে কারণতর, কারণতর হইতে কারণতম দেহ লাভ করেন অর্থাৎ দেহ সমূহ ক্রমশঃই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহের সংখ্যা অনন্তপ্রায় হওয়ায় জীবের

* পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটী মুণ্ডক উপনিষদের ৩।২।৮ মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে উক্ত উপনিষদের ৩।১।১৩ মন্ত্র সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে উহা জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ বাদের পক্ষপাতী।

উন্নতিও অনন্ত প্রায় কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। কখনই মহা-প্রলয়েব কালের পূর্ব্বে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহ বিমুক্ত হইতে পারিবেন না। চিন্তা করিলে নদীর অবস্থাও তাহাই। সে আজ সাগরে মিলিত হইতে পারে মাত্র। সে বহুকাল বহু দেশ পর্যটন করিয়া একমুখী, দ্বিমুখী, অথবা গঙ্গার ন্যায় শতমুখী হইয়া সাগর লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন পৃথিবীর ক্ষিত অংশ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিনই নদীকে আমরা নদীই বলিব। কিন্তু মহাপ্রলয়ের কালে যখন পৃথিবীর ক্ষিতি ভাগ ক্রমশঃ জলে পরিণত হইবে, তখন নদীর নদীত্ব লোপ পাইতে পাইতে অবশেষে একেবারেই লোপ পাইবে, এবং তখনই, কেবল তখনই উহাকে আর নদী বলা যাইবে না। অর্থাৎ যখন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী মহাসাগর সৃষ্টি হইবে, তখন উহাতে সকল নদীই ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইবে।* সেইরূপ জীবগণ সাধনা দ্বারা এবং ভগবৎ কৃপা লাভে এক, দুই, তিন ইত্যাদি গুণে একত্ব লাভ করিতে থাকিবেন ও বাধা স্বরূপ তাঁহার দেহ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইতে থাকিবে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে যেমন নদী সম্পূর্ণরূপে সাগরে পরিণত হইতে পারে না, সেইরূপ জীবও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে শেষ কারণতম দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় হইতে পারেন না। কারণ, একত্বের সংখ্যা অনন্ত এবং ব্রহ্মের সহিত সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অথবা তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধকেরও অনন্ত একত্বের একীভবন করিতে হইবে। সুতরাং জীবেরওমহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পূর্ণামুক্তি বা লয় হয় না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে উক্ত দৃষ্টান্ত সোহহং বাদ সমর্থন করে না, বরং আমাদেরই মত বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেছে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মের সহিত পূর্ণমিলন বা পূর্ণামুক্তি বা তাঁহাতে লয় প্রাপ্তি অসম্ভব। মায়াবাদিগণ

---

* সৃষ্টির ক্রম "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম" কিন্তু লয়ের ক্রম উহার বিপরীত। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা কতক hot gaseous matter ছিল। উহা প্রথমে জলে পরিণত হয় এবং জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং পৃথিবী লয়ের কালে ক্ষিতি জলে লয় হইবে।

সোঽহং বাদ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে জলের বুদ্‌বুদ্‌ যেরূপ জলের সহিত মিশিয়া যায়, উহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ জীব উপাধি বিবর্জ্জিত হইলেই ব্রহ্মে মিশিয়া যান। তখন আর তাঁহার পৃথক্‌ সত্তা বা নামরূপ থাকে না। এই দৃষ্টান্তটী সম্বন্ধে চিন্তা করিলে হৃদয়ে প্রথমতঃই এই প্রশ্ন উদয় হইবে যে বদ্বুদ পদার্থটী কি। সকলেই জানেন যে উহা আর কিছুই নহে, কেবল একটু খানি জল ও একটু খানি বায়ু। উভয় মিলিত হইয়া বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়। যত সময় পর্য্যন্ত উহা মিশ্রিত অবস্থায় থাকিবে, তত সময় পর্য্যন্ত বদ্বুদের জীবন। যখন কোন কারণে সেই মিশ্রণ ভঙ্গ হইয়া যায়, তখন জলটুকু জলে মিশিয়া যায় এবং বায়ুটুকু বায়ুতে মিশিয়া যায়। জীবের অবস্থাও তাহাই। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও তাঁহারই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি স্বেচ্ছায় দেহযোগে ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। এই দেহ অর্থাৎ ত্রিবিধ দেহ যে পর্য্যন্ত না শেষ হইবে, সেই পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে পূর্ণামুক্তি অসম্ভব। বুদ্বুদের জল যেমন কোন এক কারণে বায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় জলে মিশিয়া যায় ও নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব বা নামরূপ লোপ করে, সেইরূপ বহু সাধনায় বা অনন্ত সাধনায় মহাপ্রলয় কালে জীবের ব্রহ্মে লয় সম্ভব, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নহে। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে জলের বদ্বুদ যেমন সামান্য কারণে জলে মিশিয়া যায়, তেমন জীব কেন অল্প সাধনায় মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয় হইতে পারিবেন না। পাঠক এই দুইটীর তুলনা করিতেছেন বটে, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে জীবই বা কি এবং জল বুদ্বুদই বা কি। উহাদের পার্থক্য এত অধিক যে তাহা চিন্তা করা যায় না। বুদ্বুদের উদ্দেশ্য অতি সামান্য। সুতরাং তাহা ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধ হয়। কিন্তু জীবের উৎপত্তির উদ্দেশ্য যে কত মহান্‌, তাহা আমরা প্রথম অধ্যায়েই দেখিয়াছি। অথবা এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জীবের জন্যই এই মহিমাময়ী সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য হইতে মহত্তর উদ্দেশ্য সৃষ্টিতে নাই বা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের সুমহতী ইচ্ছা প্রত্যেক জীবনে

সংসাধিত হইবেই। সেই সকল জীবন যে বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। বরং ইহাই যুক্তিযুক্ত যে উহা অনন্ত প্রায় কাল স্থায়ী। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নানাস্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই এই বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব দৃষ্টান্ত দ্বয়ের আলোচনায়ও আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদের অনন্ত ক্রমোন্নতি লাভ করিতে হইবে এবং সোহহং জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আমাদের ত্রিবিধ দেহের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই ব্রহ্মত্ব দাবী করিতে পারিব না। অথবা তখনও আমরা ব্রহ্মত্ব দাবী করিতে পারিব না। কারণ, তখন "আমি" বলিয়া কিছুই থাকিবে না। প্রথম দৃষ্টান্তের আলোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর লয় কালে সাগর যখন সমস্ত ক্ষিতি ভাগকে গ্রাস করিবে, তখন নদী বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। সেইরূপ মহাপ্রলয় কালে যখন জীবকুল ব্রহ্মে লয় হইবেন, তখন আর জীব বলিয়া কিছুই থাকিবে না। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মাও মায়া-দ্বারা উপহিত এবং তাঁহার কার্য্যও মায়া দ্বারা পরিচালিত। তিনি পূর্ব্ব কল্পের অত্যুত্তম সাধক ছিলেন, তাই বর্ত্তমান কল্পে তিনি সৃষ্টি কর্ত্তারূপে সৃষ্ট। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল নিম্নে লিখিত হইল। বিষ্ণুপুরাণ মতে—৩১১০৪০০০০০০০০০০ মানব বর্ষ। মনুসংহিতা মতে—১০৩৬৮০০০০০০০০০০০০০ মানব বর্ষ। অর্থাৎ এক একটী কল্প ব্যাপিয়া এক একজন ব্রহ্মা থাকিবেন। সুতরাং কল্প লয়ের পূর্ব্বে তাঁহার আয়ু শেষ হইতে পারে না। অথবা তাঁহার আয়ুঃ শেষ হইলেই মহাপ্রলয় হয়। ব্রহ্মা যখন মায়া দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সোহহং জ্ঞান লাভ করেন নাই। কারণ, সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক মায়ার অধীন নহেন। এ অবস্থায় তাঁহারই সৃষ্ট মনুষ্য তাঁহার পূর্ব্বে সোহহং জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা অনুমান যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বর্ত্তমান কল্পে যিনি ব্রহ্মা হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বকল্পে সাধক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই জন্যই তিনি এই অনন্য সাধারণ বিশেষ ভার প্রাপ্ত। যদি বলা হয় যে ব্রহ্মাও সাধনা দ্বারা বর্ত্তমান কল্পেই মহা-

প্রলয়ের বহু পূর্ব্বেই সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন ও সেই সময় হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত যে তাঁহার মৃত্যু হয় না, তাহার কারণ এই যে তাঁহার প্রারব্ধ ফল ভোগ করিতে হইবে, তবে বলিতে হয় যে কলি-যুগের কোন এক ব্যক্তি সোহহং জ্ঞান লাভ করিবার পর বড়জোড় শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ফল ভোগ করিবেন অর্থাৎ সাংসারিক ভাবে কর্ম্ম করিবেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু ব্রহ্মার (পূর্ব্ব কল্পের শ্রেষ্ঠতম সাধকের) পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী কালের মধ্যে অন্যতর কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ মতের আয়ুষ্কাল তাঁহার ভোগ করিতেই হইবে। সোহহং জ্ঞান লাভের পর একজনের পক্ষে শতবর্ষ মাত্র এবং শ্রেষ্ঠতম সাধকের পক্ষে বহু কোটী বৎসর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিষম ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। উক্তমতে সোহহং জ্ঞান লাভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, সুতরাং কোন সাধকের পক্ষেই তাহা লাভ করিয়া একদিনও বাঁচিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন এবং স্বভাবতঃই তিনি সৃষ্টির অধীন বা মায়ার থাকিতে ইচ্ছা করেন না। পাঠক মনে রাখিবেন যে তিনিও জীবপর্য্যায় ভুক্ত এবং তিনিও মায়া দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। সুতরাং সোহহং জ্ঞান লাভের পরেও তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকার অর্থ এই যে তখনও তিনি মায়া দ্বারা পরিচালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে থাকিবেন। ইহা কতদূর যুক্তিসহ, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। সাধক বহু লক্ষ জন্মের পর কত কঠোর সাধনা করিয়া উক্ত অবস্থা লাভ করেন বলিয়া কথিত হয়, তাহার পরেও যদি ব্রহ্মে লয়ের জন্য সহস্র সহস্র কোটী কোটী বৎসর অযথা অপেক্ষা করিতে হয়, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুঃখজনক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এই কথাই সত্য যে কল্পান্তের পূর্ব্বে তাঁহার সোহহং জ্ঞান লাভ হয় না। তিনি অত্যুত্তম সাধক, তাঁহার পক্ষেই যদি সোহহং জ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়, তবে তাঁহার হইতে নিম্নতর উন্নত সাধকদের পক্ষে কল্পান্তের পূর্ব্বে উহা আরও অসম্ভব। যদি বলা হয় যে সোহহং জ্ঞান

প্রাপ্ত সাধকের পক্ষে সৃষ্টিতে বাঁচিয়া থাকা ও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়া উভয়ই সমান, তবে বলা যাইতে পারে যে তাহা অসম্ভব। আমাদের এই অনুমান যে সত্য তাহা পঞ্চদশী হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাতেও লিখিত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক উক্তরূপ কর্ম্মভোগ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহে। "প্রারব্ধ কর্ম্মপ্রাবাল্যাদ্ ভোগেম্বিচ্ছা ভবেৎ যদি। ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেব ভুঙ্‌ক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ॥ ভুঞ্জা নাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ। নাদ্যাপি কর্ম্মণাচ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্॥" (পঞ্চদশী—৭-১৪৩।১৪৪)"। "বঙ্গানুবাদ:—যদি জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রাবল্য হেতু বিষয় ভোগে ইচ্ছা হয়, তথাপি তাঁহারা বল পূর্ব্বক ধৃত পুরুষের ন্যায় তাহা অত্যন্ত কেশ সহকারে ভোগ করিয়া থাকেন; আর শ্রদ্ধাবান সেই সংসারী জ্ঞানীরা সকল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে ইহা বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন যে, হায়! অদ্যাপি আমাদের কর্ম্ম ক্ষয় পাইল না। (পঞ্চানন তর্করত্ন)"। উক্ত মতে লয়ের অবস্থাই শেষ অবস্থা বা পূর্ণামুক্তি। সুতরাং তাহা ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থারও অধিক প্রভেদ। যদি তাহাই না হয়, তবে লয়কেই একান্ত বাঞ্ছনীয় বলা হইয়াছে কেন? কোন সোহহং-জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক কি কখনও অসীম কাল সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করেন? যদি তাহাই হইত, তবে আমরা উক্তরূপ বহু সাধককে আজ দুঃখ দুর্দ্দশা প্রপীড়িত সংসারের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিয়া মানবের দুর্দ্দশা নাশ করিতে দেখিতাম। মানব ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধকগণকে অনেকেই যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিতেন এবং তাহাদের মুক্তির পথ অধিক-তর প্রশস্ত হইত। এস্থলে পাঠক গোলকধাম খেলার চিত্র স্মরণ করিবেন। সেই স্থলে এই একটী মহান্ সত্য তত্ত্ব চিত্রিত হইয়াছে যে গোলকের অব্যবহিত পূর্ব্ব স্থান হইতেও পতন হইয়া নরকে নামিতে হয়। এক ব্রহ্ম ভিন্ন কোন স্থানই যে নিরাপদ নহে, তাহা গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও প্রকাশিত হইয়াছে। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ

পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (৮।১৬)" "বঙ্গানুবাদ ঃ—ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক আছে, সকল গুলিতে গিয়া আবার পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়, আমায় পাইয়া আর পুনর্জন্ম হয় না। (গৌর গোবিন্দ রায়)" ব্রহ্মলোকে দেবদেবীগণ সত্ত্বপ্রধান দেহে বাস করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। আরও অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে সেই স্থানের দেবদেবীগণ ব্রহ্মানন্দ সাগরে নিমগ্ন। সে স্থানে স্থূল ভাবের দেহ বা কার্য্য নাই। সেইরূপ স্থান হইতেই যদি পতনের সম্ভাবনা থাকে, তবে স্থূল দেহে বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া সেই দেহোপযোগী কার্য্য করিয়া সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকের যে পতন হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? সুতরাং শেষ স্থলই অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিরাপদ স্থান, ইহা প্রমাণিত হইল। পাঠক এই সম্পর্কে মনে রাখিবেন যে সাধক যতই পরমোন্নত হউক না কেন, তাঁহার দোষপাশরাশি লয় ভাবে থাকিলেও উহাদের নিরতিশয় ধ্বংস হয় না। কারণ, জগতে কোনও দ্রব্য বা গুণ পদার্থের ধ্বংস নাই, কেবল অবস্থা সমূহেরই ধ্বংস আছে। আর লয়ের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলির গুণের ও নিখিল জড় পদার্থেরই লয় আছে। কোন গুণের লয় হইলে সেই গুণ একেবারে রহিত হয় না, তবে লীন হইলে উক্ত লয়শীল গুণ লয়-ভাজন গুণের সম্পূর্ণ অন্তর্গত হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মের অবস্থা ত সেরূপ নহে। তাঁহাতে দোষপাশরাশি অর্থাৎ জাত গুণরাশি কোন কালে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই ও ভবিষ্যতে থাকিবে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম ও মুক্ত পুরুষগণেরও অহংকার বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ যতকাল দেহ, ততকালই আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক এবং পরব্রহ্ম উভয়ে—সাধক সশরীরে এবং পরব্রহ্ম স্বস্বরূপে একই কালে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক, ব্রহ্মা বা অপর কোন সাধক মহাপ্রলয় কালের পূর্ব্বে সোঽহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পঞ্চদশীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সমূহ হইতে আমরা পাই

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ হঠাৎ নিরস্ত হয় না। অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার ভোগ কালে আপনার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। এই অজ্ঞানতাই সময় সময় প্রবল হইয়া (প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই বলুন অথবা অন্য কারণেই হউক) সাধককে বিপথে নিয়া যাইতে পারে কিনা তাহা সুধী পাঠক বিবেচনা করিবেন। কথিত আছে যে সাধকের প্রারব্ধ বশতঃ বারংবার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্রয় হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সোহহং জ্ঞানীর পতন অনিবার্য্য না হইলেও উহার একান্ত সম্ভাবনা আছে। "জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুশ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্ব্ববৎ। ছিন্ননাম ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে॥ রজ্জুজ্ঞানেহপি কম্পাদিঃ শনৈ রেবোপশাম্যতি। পুনরন্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ॥ এবমারব্ধ ভোগোহপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ। ভোগকালে কদাচিৎতু মর্ত্ত্যোহহমিতি ভাসতে। (পঞ্চদশী—৭।২১৯, ২৪০, ২৪৪)" "বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানী পুরুষ তখন আপনাকে ভোক্তা বলিয়া ব্যবহার করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তবে কেবল ছিন্ন নামক ব্যক্তির ন্যায় লজ্জার সহিত ক্লিষ্ট হইয়াও অগত্যা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করে মাত্র (২১৯)। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুজ্ঞান হইলেও সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার সেই রজ্জু অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার ভোগকালেও কখনও কখনও আপনার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। (২৪০, ২৪৪) (পঞ্চানন তর্করত্ন)।" "সোহহং জ্ঞান লাভের পরেও প্রারব্ধ ফল ভোগের নিমিত্ত সাধকের ব্রহ্মে লয় হইবার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে" এই উক্তি সম্বন্ধে নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। সাধক সোহহং জ্ঞান লাভ করিলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রারব্ধ ফলভোগের প্রয়োজন কি? তিনি ত

ব্রহ্মই। তিনি কি নিজেই নিজেকে সেই ফল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না? অথবা তিনি কি তাঁহাকে সেই সামান্য শক্তি সম্পন্ন ফল হইতে মুক্তি দিতে পারেন না? ব্রহ্ম কি কখনও কর্ম্মফল ভোগ করেন? উক্তরূপ সাধককে যখন পরব্রহ্ম সকল দোষ, পাশ ও সর্ব্বোপরি সকল বিঘ্নের মূল কারণ মায়া হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মফল হইতে কি তিনি তাঁহাকে (সাধককে) মুক্ত করিতে পারেন না? যদি তাহাই না পারেন, তবে নিম্নোদ্ধৃত মহাবাক্যটীর অর্থ কি? "তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে। অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসম বিঘ্ন-বাধা যায় দূরে। (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।" উক্ত মহাবাক্য যে সত্য, অতি সত্য. তাহা বহু সাধক নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও সেই ভাবে জগৎ সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। মহাপুরুষদের জীবনে ও উক্তিতেও আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ উক্তি সত্য। আমরা পঞ্চদশীর শ্লোক সমূহ হইতে বুঝিতে পারি যে সাধক সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। এখন একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বনে এই তত্ত্বের একটু আলোচনা করা যাউক্। ধরা যাউক্ যে কোন সাধক তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়সের কালে সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ শতবর্ষ ব্যাপী জীবন যাপন করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের উপার্জ্জিত কোন কোন ফল ভোগ করিতে বর্ত্ত-মান জন্ম ধারণ করা হইয়াছে, তাহা কেহ সুনিশ্চিত ভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে বলিতে পারেন না। কেহ যে ইহা কখনও বলিয়াছেন, তাহাও জানা যায় না। সুতরাং সেই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল স্বরূপ তিনি কি এই সুদীর্ঘ জীবনে বাধ্য হইয়া ভীষণ অন্যায় কুৎসিৎ ও পাপ জনক কার্য্য করিবেন? ইহাও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কারণ, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত। তাঁহার দ্বারা তখন কোন পাপজনক কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না। দেখা যায় যে জীবনের প্রারম্ভে সাধক পাপী; এমন কি মহাপাপীও থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার উন্নতির সাথে সাথে তিনি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইতে থাকেন। মহোন্নত অবস্থায় তাঁহার রিপু দমন হয়, এবং পর-

মোন্নত অবস্থায় তাঁহার দোষ পাশ-রাশির রজস্তমোহংশ লয় প্রাপ্ত হয় এবং অত্যুন্নতি লাভে দোষ-পাশ-রাশির সাত্ত্বিক অংশও লয় হইতে থাকে। এরূপ কখনও হইতে পারে না যে কোন সাধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তথাপিও প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সকল প্রকার কুকর্ম্ম তিনি করিতে থাকিবেন। কেহ রাজত্ব করিবেন কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিবেনা এবং তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত হীন কার্য্য সমূহ বাধ্য হইয়া তিনি করিতে থাকিবেন, এরূপ অবস্থা অসম্ভব। আর সোহহং জ্ঞান লাভের পরেও কর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু মায়াবাদ অনুযায়ী থাকা উচিত নহে। মায়াবাদে ব্রহ্মের কোন ক্রিয়া নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। সুতরাং সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধকেরও সেই অবস্থার কোন কর্ম্ম বা তজ্জনিত বিকার থাকিবে না বা থাকিতে পারে না। উক্তমতে সাধকের কাছে ত সকলই একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি যখন জগৎ, নিজ দেহ প্রভৃতিকেও ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন ও গত জীবন মায়ার খেলা মাত্র বিবেচনা করেন, তখন তাঁহার ক্রিয়া কি প্রকারে সম্ভবে? যদি বলা হয় যে প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে দেহ হইয়াছে, ও উহার যোগে যাহা পরিণতি, তাহা অবশ্যম্ভাবী; তবে ত জড় জগতের অস্তিত্ব ও উহার শক্তি স্বীকার করা হইল এবং বলা হইল যে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধকও সেই শক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মফলে অন্তঃকরণে যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহারই প্রেরণায় পুনঃ জন্ম এবং ঐ সকল জন্মের নানাবিধ ভোগ। (পাঠক মনে রাখিবেন যে অদ্বৈতবাদে অন্তঃকরণও জড় এবং আত্ম জন্মেন না ব মরেন না)। অদ্বৈতবাদী জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—অন্ততঃ ব্রহ্মের নিকট। সুতরাং সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকের নিকটেও উহার কোনও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জড়ের বা মায়ার শক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত সাধকের উপরও কার্য্য করিতে পারে। ইহা কখনও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এস্থলে অন্য একটী তত্ত্বেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে ব্রহ্ম

অনন্ত স্বাধীন। সুতরাং যে সাধক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত, তাঁহাতেও অবশ্যই অনন্ত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। সুতরাং অনন্ত স্বাধীন সাধকের নিকট জড় সংস্কার জনিত প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ যে অসম্ভব হইতেও অসম্ভব, তাহা সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। আর হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ীই বলিতে পারা যায় যে সর্ব্ব সংস্কার নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সোহহং জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। যখন সোহহং জ্ঞান লাভ হইল, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহার সংস্কার রাশি ত বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সেই প্রাক্তন সংস্কারের ফল তিনি সোহহং জ্ঞান লাভের পরেও কেন ভোগ করিবেন? অতএব এই ভাবেও চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে কাহারও সোহহং জ্ঞান হইতে পারে না। যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতেই সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক মুক্ত হইতে না পারেন, তবে বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলের ভোগের জন্যও তাঁহার পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, তিনি বর্ত্তমান জন্মের জন্ম মুহূর্ত্ত হইতেই সোহহং জ্ঞান সম্পন্ন সাধক নহেন। বর্ত্তমান জন্মে তাঁহার সাধনা করিতে হইয়াছে এবং সোহহং জ্ঞান লাভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্ম করিতে হইয়াছে ও পরেও অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং সেই কর্ম্ম ফলের ভোগের জন্য তাঁহার পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আবার সেই জন্মেও কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী ও উহার ফলও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সোহহং জ্ঞান লাভ করিয়াও অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াও তিনি যদি কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে না পারেন, তবে তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণও করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন জন্মেই ব্রহ্মে লয় হওয়া অসম্ভব। "পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মকেই অদৃষ্ট কহে। এস্থলে বক্তব্য এই যে 'পূর্ব্বার্জ্জিত' পদে যখন 'বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত' বুঝাইতেছে, তখন উহা বর্ত্তমান জন্মকৃত বা জন্মান্তরোদ্ভূত কিংবা "পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান উভয় জন্মে সম্পাদিত" এই তিন প্রকারই হইতে পারে। এই ত্রিবিধ কর্ম্মই পরবর্ত্তিনী অবস্থার সম্পাদন বিষয়ে যে একতম কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (ক)।" অতএব দেখা গেল যে প্রাক্তন কর্ম্ম, সঞ্চিত কর্ম্ম ও

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলের কোনই পার্থক্য নাই। উহারা সকলেই অদৃষ্ট নামে পরিচিত। সুতরাং উহাদের ফলও যে একরূপ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে সাধক যখন সোহহং জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার সকল কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে অকর্ম্ম, অর্থাৎ তখন আর তিনি কর্ম্ম দ্বারা বাধিত হন না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই তত্ত্ব সত্য নহে। মায়াবাদী কর্ম্মফলের উপর অত্যন্ত জোড় দিতেছেন, নতুবা তিনি বলিতে পারেন না যে সোহহং জ্ঞান লাভের পরও প্রাক্তন কর্ম্মের জন্য সাধক বাঁচিয়া থাকিবেন। ইতি-পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে সকল কর্ম্মের ফলই ফলিবে এবং নানাবিধ কর্ম্মের ফলের কোনই পার্থক্য নাই। কোন কোন কর্ম্মের ফল তখনই ভোগ করিতে হয়, কোন কোন কর্ম্মের ফল দুদিন পরে, কোনটীর বা বিলম্বে, কোনটীর বা বর্ত্তমান জন্মে, এবং কোনটীর বা পরজন্মে ফল ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সোহহং জ্ঞান লাভের পর দীর্ঘ জীবন যাপন করিলে যে দেহধারীর পক্ষে এমন কোন কর্ম্ম হইবে না, যাহার জন্য হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল আলোচনা করিলাম বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১৫শ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যেও এইরূপ ভাবেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্ম করিলে সকল প্রকার ফলই ফলিতে পারে। স্থূল ভাবে বুঝিতে গেলে ইহা চিন্তা করিলেই হয় যে নির্ম্মুক্ত পুরুষদিগের অর্থাৎ সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকদিগের পক্ষে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মে লয়ের জন্য প্রতীক্ষা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে মুক্ত পুরুষেরও বাধ্য হইয়া সংসার করিতে হয়। অতএব তিনিও মৃত্যু পর্য্যন্ত মায়া বা জড়ের অধীন থাকেন। কিন্তু মায়াবাদী তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতি লাভ হইয়াছে এবং তিনি গতসন্দেহ

হইয়াছেন। "নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। (১৮।৭৩)" "বঙ্গানুবাদ:—আমার মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার প্রসাদে স্মৃতি লাভ হইল, এখন আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি. স্থির হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব"। উক্ত শ্লোকের অর্থই এই যে গীতোপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের দিব্য জ্ঞান লাভ হইয়াছে। অন্ততঃ একথা বলা যাইতে পারে যে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা পাঠে তাঁহার অথবা পাণ্ডব পক্ষে যাহারা যোগদান দিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে কখনও প্রকাশ পায় না যে তাহারা নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শ্রবণ করিয়াও এবং তাঁহার সখা এবং সর্ব্বদার সাথী হইয়াও সেই গ্রন্থের সর্ব্বোত্তম উপদেশ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কার্য্যকরা, সাধন করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সোহহং জ্ঞান লাভ হইলেও নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্য করা সুকঠিন। আর পঞ্চদশীর পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকেরও কর্ম্ম সম্পাদনের কালে তাঁহার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। যাহা হউক্, এখন আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করি। যদি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত অর্থাৎ সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক প্রারব্ধ কর্ম্মফলের হাত হইতে উদ্ধার না পাইতে পারেন, তবে তিনি সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল হইতে বা কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবেন? সকল প্রকার কর্ম্মই পূর্ব্বে সম্পাদিত, তবে কেন সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে উক্ত সাধক বাধ্য হইবেন না? ধরা যাউক, উক্ত সাধক পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে কোন কোন মহাপাপের কার্য্য করিয়াছেন। কর্ম্মফল যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে কেন তিনি সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন না? যদি বলা হয় যে সাধকের তত্ত্বজ্ঞান সকল সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়াছে, তবে প্রারব্ধ

কর্ম্মফলও কেন সেইভাবে ক্ষয় হইবে না? কেন তিনি সোহহং জ্ঞানলাভের মুহূর্ত্তেই সর্ব্ব কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ হইতে পারিবেন না? ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল কি আমরা ইহজন্মেই ভোগ করি না? অগ্নিতে হাত দিলে তাহা দগ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম্মের ফল ভোগ হইল। আবার ঔষধ সেবন করিলে এবং যথোচিত পথ্য গ্রহণ করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা ভোগ ক্ষয় হইল। এইরূপে স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা বর্ত্তমান জন্মে অনেক কর্ম্ম আমরা করিয়া থাকি এবং উহার ফল ভোগ করি অথবা স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিয়া উহার হাত হইতে উদ্ধার পাই। সুতরাং সোহহং জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল যেমন ক্ষয় হয়, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলও সেইরূপ ক্ষয় হইতে পারে। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি-মন্ত্রের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।। (মুণ্ডকোপনিষদ্—২।২।৮)। "বঙ্গানুবাদ—সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয় বাসনা ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় হয়। (তত্ত্বভূষণ)।" এস্থলে ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষির সকল কর্ম্মই (কর্ম্মাণি) ক্ষয় হয় বলা হইয়াছে। প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং কেবল প্রারব্ধাতিরিক্ত কর্ম্ম সমূহেরই ক্ষয় হয় ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা যে উদ্ধৃত মন্ত্রে বলা হয় নাই, ইহা সত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও উহাই দেখিতে পাই। "যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে-হর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। (৪।৩৭)।" "বঙ্গানুবাদ :—যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সমূহকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। (গৌরগোবিন্দ রায়)।" এস্থলে সমুদায় কর্ম্ম (সর্ব্ব কর্ম্মাণি) বলিয়াই সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, অর্থাৎ সকল কর্ম্মই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়।

এই শ্লোকেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয় না, কিন্তু অন্য দুই প্রকারের সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয়, এইরূপ বলা হয় নাই। অতএব পূর্ব্বে বলা যে হইয়াছে যে কর্ম্মক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা সত্য। কারণ, উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম যে থাকিয়া যাইবে, তাহা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে পাওয়া যায় না। এই তত্ত্ব ইহলোকস্থ সোহহং জ্ঞানীর পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, পরলোকস্থ সোহহং জ্ঞানীর পক্ষেও সেই একই ভাবে প্রযোজ্য। আবার কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে আত্মা দেহে থাকিতে পারেন না। আর তাঁহার জীবভাবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও থাকে না। কারণ, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সোহহং লাভ করিলেই জীবের বিদেহ হইতে বাধ্য, তিনি ইহলোকস্থ হউন্ অথবা পরলোকস্থই হউন্। অথচ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কল্পের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যুর অর্থই মহা-প্রলয়। সুতরাং ব্রহ্মা কখনও মায়ামুক্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ কেহই মায়ামুক্ত হইতে পারেন না, অথবা কেহই সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধকগণ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুহূর্ত্তেই তাঁহারাও বিদেহ হইতে বাধ্য। কিন্তু কথিত আছে যে তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তাঁহারা সোহহং জ্ঞান লাভ করেন না। স্থূল কথা, দেহে থাকিতে থাকিতে কেহই সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কেন পারেন না, তাহা ইতি পূর্ব্বেও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক, তিনি ব্রহ্মাই হউন্, পরলোকবাসীই হউন অথবা ইহ-লোকবাসীই হউন, সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক জীবভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। যখন বলা হয় যে তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা সোহহং জ্ঞান লাভ করেন না, কিন্তু পূর্ণত্বের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। যখন বলা হয় যে কল্পান্তে

ব্রহ্মা ও পরলোকবাসী ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মে লয় হন, তখন বুঝিতে হইবে যে উহার পূর্ব্বে তাঁহারা সোহহং জ্ঞান লাভ করেন নাই। আবার মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা সোহহং জ্ঞান লাভ করিলে মৃত্যুর সাথে সাথে ব্রহ্মে লয় হন। ইহার অর্থ এই যে তাঁহাদের স্থূল দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে নহে, কিন্তু ত্রিবিধ দেহের বিগমে বা শেষ কারণ দেহের মৃত্যুতে তাঁহারা ব্রহ্মে লয় হন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের ৪।১।১৫ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে কুলালচক্রের ঘূর্ণন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা একেবারে বন্ধ হয় না। সেইরূপ যে সকল কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহার মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ Inertia নামক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আশ্রয় লইয়া বলা হইল যে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দেহের পতন হইতে পারে না। Inertia জড়ের ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাও জড়ের ধর্ম্ম যে উহা চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। সুতরাং কুলালচক্রের গতি তখনই বন্ধ হইবে, যদি কোন চৈতন্যবান পুরুষ উহা থামাইয়া দেয়। সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকে চৈতন্য পূর্ণ ভাবে বিকশিত। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেই প্রাক্তন কর্ম্মের গতি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক ব্রহ্মের সমতুল্য। সুতরাং তাঁহার ন্যায় অনন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে সামান্য কর্ম্মফল রোধ করা যে অতি সুসাধ্য, তাহা সহজ বোধ্য। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চদশীর শ্লোকে দেখা গিয়াছে যে সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক আনন্দের সহিত জীবন যাপন করেন না, সুতরাং ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক যে তিনি স্বতঃই নিজ স্বাধীনতা দ্বারা তাঁহারপ্রাক্তন কর্ম্মের ফল রোধ করিবেন। সুতরাং জড়ের স্বাভাবিক শক্তির দোহাই দিয়াও বুঝিতে পারা যায় না যে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্ম সূত্রের ৩।৩।৩২ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে দেখা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত বহু ঋষি ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন নাই। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মও গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর এই স্থূল দেহ পাত হইলেই ব্রহ্মে লয় হইতে হইবে, ইহাই আচার্য্যের

সিদ্ধান্ত * কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঋষির পক্ষে যে তাহা সম্ভব হয় না, ইহার কারণ তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা লোকস্থিতির জন্য লয় হইতে পারেন না। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মা. বিষ্ণু ও শিবকেও জীব পর্য্যায় ভুক্ত বলেন। ব্রহ্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শিব ও বিষ্ণুও লোক-স্থিতির জন্য বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। কারণ, হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড চলিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহারাও লয় প্রাপ্ত হন নাই, বলিতে হইবে। অতএব দেখা গেল যে দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ এবং সৃষ্টির আদিযুগ হইতে যাঁহারা পরমোন্নত, তাঁহারাও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয় হইতে পারিবেন না। তবে কেন অখ্যাত অজ্ঞাত ব্রহ্মদর্শী মানবগণ দেহান্তে ব্রহ্মে লয় হইবেন? অথবা যদি লোক-স্থিতির কথাই বলা হয়, তবে শেষোক্ত মহাপুরুষগণই বা কেন লোক-স্থিতির জন্য বর্ত্তমান থাকিবেন না? পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণ ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নারদ. ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ হইতে শ্রেষ্ঠতর অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি কেন তাঁহারা (অজ্ঞাত সোহহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকগণ) লাভ করিবেন? উভয় প্রকারের মহাপুরুষগণ যখন তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত. অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত, তখন তাঁহাদের পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ বিধান কি প্রকারে সম্ভব হয়? এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে লয় হওয়াই শেষ পরিণতি। সুতরাং তাহাই শ্রেষ্ঠতম অবস্থা, ইহা উভয় পক্ষ সম্মত। সুতরাং একজন ব্রহ্মদর্শী দেবতা বা ঋষির পক্ষে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত লয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তৎপরবর্ত্তী অন্য ব্রহ্মদর্শীর পক্ষে স্থূল দেহান্তেই ব্রহ্মে লয় অসম্ভব। যখন আমরা জানিতেছি যে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠতম দেবগণ, যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শির ও সুবিখ্যাত ঋষিগণ, যথা ভৃগু, নারদ প্রভৃতির ব্রহ্মে লয়ের জন্য মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, তখন আমরা এই সত্য সিদ্ধান্তে অনায়াসেই উপনীত হইতে পারি যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কাহারও ব্রহ্মে লয় হওয়া অসম্ভব, অথবা কাহারও পক্ষে সোহহং জ্ঞান

* বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পাদের শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

লাভ অসম্ভব। যাহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই, হিন্দুশাস্ত্রও যাহাদের সম্বন্ধে এমন উক্তি করেন নাই যে তাঁহারা সোঽহং জ্ঞান লাভান্তে ব্রহ্মে লয় হইয়াছেন এবং যাঁহাদের স্থূল দেহান্তে ব্রহ্মে লয় সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই, তাঁহারা স্থূল দেহান্তেই ব্রহ্মে লয় হইতে পারেন না বা হইয়াছেন, ইহা কল্পনা বই আর কিছুই কিছুই নহে * Dr. Radhakrishnan "Cultural Heritage of India" (Ist Edition) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি শঙ্করাচার্য্যের এই মতের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"It is usually thought that at death the soul attains full liberation or Videhamukti. It is not easy to reconcile this view with Sankara's other statement that Apantaratmas Vrigu and Narad even after death work for the saving of the world. They are said to be the possessors of the Complete Knowledge of the Vedas." "বঙ্গানুবাদ :— ইহা সর্ব্বদা বিবেচিত হয় যে আত্মা দেহের মৃত্যুতে পূর্ণামুক্তি বা বিদেহমুক্তি লাভ করেন। অপান্তরাত্মাগণ যথা ভৃগু, নারদ প্রভৃতি মৃত্যুর পরও লোকস্থিতির জন্য কার্য্য করেন অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকেন। শঙ্করের এই উক্তির সহিত পূর্ব্বোক্তির সামঞ্জস্য করা যায় না। তাঁহারা বেদসমূহের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ইহা বলা হয়।" এখন আমরা মায়াবাদে কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মায়াবাদে সগুণ ব্রহ্ম অতি দূরবর্ত্তী অচিন্ত্য ভবিষ্যতে নিঃশেষিত হইবেন, অর্থাৎ এক একটী জীবের পূর্ণামুক্তিতে তাঁহার একটু একটু অংশ ব্রহ্মে লয় হইতে থাকিবে, যেমন বর্ত্তমান বিজ্ঞান মতে সূর্য্য আলোক বিতরণ জন্য প্রতিদিনই ক্ষয় হইতেছে ও এককালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইবে। উক্ত লয়ের পূর্ব্ব

* এই সম্পর্কে ইতঃপর লিখিত শ্রুতি বাক্যের সমালোচনায়ও আমরা দেখিতে পাইব যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কেহই ব্রহ্মে লয় হইতে পারেন না।

পর্য্যন্ত তিনি মায়োপহিত অবস্থায় থাকেন। যদিও তিনি মায়াকে চালনা করেন, তথাপিও তিনি মায়াদ্বারা সীমাবদ্ধ। কথিত আছে যে তিনি পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ সুতরাং অপূর্ণ মায়াবাদে পরব্রহ্ম গুণশূন্য ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের গুণরাশি আছে ও তিনি মায়া-যোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। পরব্রহ্মের আদর্শই অবশ্য উচ্চতম আদর্শ। সুতরাং সেই সর্ব্বাদর্শের আদর্শ লাভের জন্য জীবাত্মার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, সগুণ ব্রহ্মেরও সেইরূপ আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহাই স্বাভাবিক—অপূর্ণ পূর্ণকে লাভের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল এবং ইহাই সৃষ্টিতে দেখা যায় অথবা বলা যায় যে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। পাঠক মনে রাখিবেন যে জীবাত্মা (কুটস্থ ব্রহ্ম) এবং সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই, কেবল উপাধির তারতম্য মাত্র। মায়াবাদে জীব সোহহং জ্ঞান লাভ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মে লয় হইবেন অর্থাৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম অনন্ত প্রায় কাল সেই অপূর্ণ অবস্থায়ই থাকিবেন? অর্থাৎ এক অর্থে যিনি স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয় কর্ত্তা, তিনি শেষ স্থান—ব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন না, কিন্তু তাঁহারই সৃষ্ট জীব একের পর একজন মুক্তি লাভ করিতে থাকিবেন, ইহা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। পাঠক মনে রাখিবেন যে মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম চিরকাল মায়োপহিত থাকাই অবশ্য দূষণীয়। কারণ, পরব্রহ্ম কখনও মায়োপহিত নহেন। এস্থলে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগের প্রশ্ন উদয় হইতে পারে না। কারণ, সগুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। তাঁহার কোন পূর্ব্বজন্ম কল্পিত হয় নাই। সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও আলোচনা আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিতে পাইব। ব্রহ্মা ও সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে জীবের পক্ষে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয় হওয়া অসম্ভব। সোহহং জ্ঞান যে একান্ত অসম্ভব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।১৪।২ মন্ত্রস্থ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেহথ সম্পৎস্যে।" উক্তির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা হয়। "তাঁহার সেই

পর্য্যন্তই বিলম্ব. যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তর (দেহপাতের পর) সে সৎ সম্পন্ন হয়।" মায়াবাদিগণ এই শ্রুতির উক্তরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে মানব এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে দেহান্তে (মনুষ্য দেহের মৃত্যুতে) তিনি ব্রহ্মে লয় হন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবযান পথে যে উর্দ্ধগতি ও পরে ব্রহ্মলোকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত বাসের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা সগুণ ব্রহ্মের উপাসকের পক্ষে মায়াবাদিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন উক্ত বাক্যের সরল অর্থ কি, তাহা জানিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ১ম ও ২য় মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "(১) যথা সৌম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষ-মানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বোদঙ্ বাধরাং বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষে বিসৃষ্টঃ। (২) তস্য যথাভিহননং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি।"

"বঙ্গানুবাদঃ হে সৌম্য! যেমন কোন পুরুষের চক্ষু বন্ধন করিয়া তাহাকে (যদি) কোন বিজন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে যেমন পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ, বা দক্ষিণাভিমুখ বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে "চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে।" "তখন যেমন কেহ তাহার চক্ষু বন্ধন মোচন করিয়া বলে —'এই দিকে গন্ধার, এই দিকে গমন কর" সে যেমন (তখন) গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং (অভিজ্ঞ লোকের উপদেশে পথ বিষয়ে) পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গন্ধার প্রদেশেই উপস্থিত হয়— তেমনি আচার্য্যবান পুরুষই জানেন যে—"যে পর্য্যন্ত আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব, সেই পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব; তাহার পর আমি সৎস্বরূপকে

প্রাপ্ত হইব (ক) (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" ইহাতে জানা যায় যে কোন ব্যক্তি আচার্য্য লাভ করিলেই অর্থাৎ চক্ষুর বন্ধন উন্মুক্ত হইলেই, অর্থাৎ পথের ইঙ্গিত পাইলেই তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মলাভ হয় না। সদ্‌গুরু লাভ হইলে তিনি সৎ পথ পাইলেন এবং সেই পথে চলি ত চলিতে অর্থাৎ বহু সাধনা করিতে করিতে, এবং গুরু ও নানা সাধু মহাজনের নিকট নানা উপদেশ লাভ করিতে করিতে অর্থাৎ বহু সাধকের সহায়তায় যখন তিনি দোষ-পাশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হন, তখন তিনি সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করেন।* এস্থলে তুইটী শব্দের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমটী 'বিমোক্ষ্যে'। 'বিমোক্ষ'' শব্দের অর্থ "দেহ হইতে বিমুক্তি" অর্থা দেহপাত কি প্রকারে বুঝায়, তাহা আমরা বুঝি না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে দেহত্যাগকেই যে মুক্তি কোথায়ও বলা হয়, তাহা আমাদের জানা নাই। সুতরাং 'বিমোক্ষ' শব্দ সম্পুর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক ভাবে কেন ধরা হইবে না? অর্থাৎ "বিমোক্ষ" অর্থে বিশেষ প্রকারে মুক্তি (মোক্ষ) ধরিলেই এস্থলে উহার সরল ও সত্য অর্থ হয় বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান", সৃষ্টিতত্ত্ব ও তত্ত্বমসি বাক্যের বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। এই অধ্যায়টী আধ্যাত্মিক আলোচনায় পূর্ণ। উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ও তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যার সম্পর্কে কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়কে ব্রহ্ম প্রকরণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে দেহ হইতে মুক্তির কথা না বলিয়া ব্রহ্মদর্শনের পূর্ববা-

(ক) উক্ত দুই স্থলে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর প্রথম পুরুষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উক্ত মন্ত্রের উপর বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সুদীর্ঘ মন্তব্য পাঠক দেখিতে পারেন। যাহা হউক্ উহাতে আমাদের বক্তব্যের কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।

* এস্থলে ব্রহ্ম সঙ্গীতের "মন চল নিজ নিকেতনে" সঙ্গীতটী মনে পড়ে, উহার একটু অংশ নিম্নে উদ্ধার করিলাম। "সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম, পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ সে পান্থ নিবাসিগণে।"

বস্থা অর্থাৎ দোষপাশের আবরণের হস্ত হইতে মুক্তির কথা যদি বলা যায়, তবে তাহাই ত সত্য ও সরল ব্যাখ্যা হইবে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয়টী "সম্পৎস্যে"। ইহার অর্থই বা কেন ব্রহ্মের লয় বলা হয়, তাহাও আমাদের ধারণার অতীত। উহার অর্থ "সংস্বরূপ প্রাপ্ত" অর্থাৎ "ব্রহ্ম লাভ' হইলেই সরল ব্যাখ্যা হইল। ব্রহ্ম লাভ হইলেই যে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা সম্প্রদায় বিশেষের ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু উহা সর্ব্বসাধারণ, এমন কি সাধকবৃন্দও তাহা মনে করেন না। মায়াবাদও বলেন না যে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই তিনি ব্রহ্মে লয় হন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে একবার মাত্র ব্রহ্ম দর্শনেই ব্রহ্মকে পূর্ণ ভাবে দেখা যায় না। মুক্তি অনন্ত সংখ্যক। একমাত্র ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি ও ব্রহ্মে লয়। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে উক্ত মন্ত্রের শেষাংশের সরলার্থ এই:—"সেই প্রকার আচার্য্যবান পুরুষ জানেন যে যতদিন আমি বিশেষ মুক্তি লাভ না করিব, তত দিনই আমার বিলম্ব, তারপর আমি সংস্বরূপ প্রাপ্ত হইব।" অর্থাৎ নানাবিধ দোষপাশের হস্ত হইতে বিমুক্ত না হইয়া অর্থাৎ আমাদের আবরণ রাশির উন্মোচন করিতে না পারিলে ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ মায়া বা অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্তিকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। এস্থলে সেই একই শব্দের অর্থে "স্থূল দেহের মৃত্যু" কেন বলা হয়, তাহা আমরা বুঝি না। যদি ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে বলেন যে এস্থলে বিমোক্ষ শব্দে স্থূলতম দেহ হইতে মুক্ত হওয়া, দেহপাত বা দেহের মৃত্যুকে বুঝায়, আর "সম্পৎস্যে" অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ হওয়ার অর্থ ব্রহ্মে লয় হওয়া বুঝায়, তথাপিও তাহাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রশ্ন হইবে যে "বিমোক্ষ" শব্দে কোন দেহ হইতে মুক্তি বুঝিতে হইবে? আমাদের দেহ ত ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং দেহের সংখ্যা অনন্ত প্রায়। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রেও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং বিমোক্ষ অর্থে দেহ হইতে মুক্তি বুঝায়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে শেষ কারণ-দেহ হইতে মুক্তির কথা উপনিষদ্ লক্ষ্য করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারেন ? বরং ইহাই সত্য যে উপনিষদের ঋষি জানিতেন যে ত্রিবিধ দেহের বিগম ভিন্ন সাধকের পূর্ণামুক্তি লাভ বা ব্রহ্মে লয় হয় না। সুতরাং যদি উক্ত শব্দে দেহ হইতে মুক্তিই বুঝায়, তবে শেষ কারণ-দেহ হইতেই মুক্তি বলিতে হইবে, আমাদের স্থূলতম দেহ হইতে মুক্তির কথা হইতেই পারে না। কারণ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং আপামর সর্ব্বসাধারণ মানবেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। উহার জন্য সাধনার কোনই প্রয়োজন নাই। বরং বিপরীত সাধনায়ই উহা সহজ লভ্য এবং উক্তরূপ মৃত্যুকে কেহ মোক্ষ বলেন না, বিশেষরূপ মোক্ষ ত (বিমোক্ষ ত) দূরের কথা। যদি বিমোক্ষ অর্থে একান্তই দেহের মৃত্যু বলিতে হয়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে ত্রিবিধ দেহের বিগমে বা শেষ কারণ-দেহের মৃত্যুতে বিমোক্ষ হয় এবং সেইরূপ পূর্ণামুক্তিতে ব্রহ্মে লয় হওয়া যায়। সুতরাং সেই অর্থে সম্পংস্যে শব্দের অর্থও ব্রহ্মে লয় বুঝাইতে পারে। এখন মায়াবাদী প্রশ্ন করিতে পারেন যে ত্রিবিধ দেহের বিগম অবস্থা লাভ করিতে যে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে জীবের ত্রিবিধ দেহের বিগম বা পূর্ণামুক্তি বা ব্রহ্মে লয় হইতেই পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬।২।১৫ মন্ত্রের সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মলোক একটী নহে,* বহু এবং সেই সকল মণ্ডলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত সাধকগণ বাস করেন। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে সেই সকল পরমোন্নত মহাপুরুষগণ কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মে লয় হন। প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কল্পবাদ সত্য নহে। সুতরাং তাঁহারা যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ত্রিবিধ দেহের বিগম, পূর্ণামুক্তি বা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন না, তাহা তাহাদের সিদ্ধান্ত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এখন উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা দেখা যাউক্। ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত ৫।১০।২ মন্ত্রে আছে যে দেবযান পথ-

---

* ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

যাত্রী ক্রমশঃ বিদ্যুতে গমন করেন। সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলাভ করান। এস্থলে সাধকের ব্রহ্মে লয়ের কোনই উল্লেখ নাই। 'মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষো মানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।" "বঙ্গানুবাদ:—মাস সমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে (গমন করেন)। সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্ম লাভ করান। ইহাই দেবযান পথ। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪।১৫।৫ মন্ত্রেও ঐ একই তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। উহাতে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।" অর্থাৎ "এই স্থলে গমন করিলে (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে) আর মানবকে আবর্ত্তে (সংসার আবর্ত্তে) ফিরিয়া আসিতে হয় না।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে আছে যে দেবযান পথযাত্রী সাধক ক্রমশঃ বিদ্যুতের অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন মনোময় পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান। তিনি সেই সকল ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন। সাধক ব্রহ্মে লয় হন, তাহা এস্থলেও বলা হইল না। "তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চিরভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। (বৃহ—৬।২।১৫)।" "বঙ্গানুবাদ:—যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা অরণ্যে সত্য ভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন (কিংবা শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা করেন) তাঁহারা—(ইহারা সকলেই চিতাগ্নির) অর্চ্চিতে গমন করেন। সেই অর্চ্চি হইতে তাঁহারা দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাস সমূহ হইতে দেবলোকে,

দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তখন এক মনোময় পুরুষ সেই স্থলে) আগমন করিয়া বিদ্যুল্লোক প্রাপ্ত * মানবদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তাঁহারা সেই (সকল ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন; সে স্থল হইতে আর তাঁহাদিগের পুনরাবর্ত্তন হয় না। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত রত্ন)।" এস্থলেও বিদ্যুৎ প্রাপ্ত সাধক ব্রহ্ম লাভ করেন বলা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মলোকে যাইয়া চিরকাল বাস করেন, সুতরাং তিনি ব্রহ্ম লাভ করিয়াও ব্রহ্মে লয় হন না বলা হইল। আমর দেখিলাম যে উভয় উপনিষদে দেবযান যাত্রী সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন না। তবে কেন পৃথিবীস্থ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত সাধক স্থূল দেহান্ত মাত্রই ব্রহ্মে লয় হইবেন ? একই শ্রেণীর সাধকের জন্য অর্থাৎ উভয়ই যখন ব্রহ্মপ্রাপ্ত, তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পাঠক মনে রাখিবেন যে পারলৌকিক মহাত্মাদিগেরও দেহ আছে। তাহা সূক্ষ্ম বা কারণ এবং আমাদের দেহ স্থূল, এই মাত্র প্রভেদ। উন্নতি হইলেই অর্থাৎ এক মণ্ডল হইতে অন্য মণ্ডলে উন্নীত হইলেই নিম্নতর মণ্ডলের দেহ ত্যাগ করিয়াই যাইতে হয়, অর্থাৎ সেই দেহের মৃত্যু হয়। মণ্ডল যখন অসংখ্য, দেহও সেইরূপ অসংখ্য। সুতরাং দেহের মৃত্যু সংখ্যাও সেইরূপ অসীম।** পৃথিবীর পরমোন্নত সাধকগণ সেই সকল উন্নত মণ্ডলে উপযুক্ত সাধনা না করিয়া এবং সেই সকল স্থানের অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই পৃথিবীর কার্য্যান্তে ব্রহ্মে লয় হইবেন, ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই বহু মণ্ডলের সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে পরমোন্নত সাধকের

---

* "বিদ্যুৎলোক" ঠিক অনুবাদ হয় নাই। "বৈদ্যুতম্" এর অর্থ "বিদ্যুতের অবস্থা"। সেইরূপ "বৈদ্যুতান" এর অর্থ বিদ্যুৎ দশা প্রাপ্তমানব সমুদায়কে, 'বিদ্যুৎলোক" প্রাপ্ত নহে। উভয় স্থলেই বিদ্যুৎ লাভের কথাই বলা হইয়াছে, বিদ্যুৎলোকের কথা বলা হয় নাই।

** পরলোকেও যে মৃত্যু আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনা আছে (১২।৯।৩।১২, ১০।৪।৩।১০)।

পক্ষেও পৃথিবীতে কারণ-দেহের কার্য্য হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু শেষ হয় না। যদি কোন পরম সৌভাগ্যবান পরমর্ষি পুরুষ পৃথিবী হইতে একেবারে সত্য লোকে যান, তাহা হইলেও অসংখ্য মণ্ডলের সাধনা বাকী থাকিবে। কেহই পৃথিবীত থাকিতে থাকিতে সপ্তলোকের অসংখ্য মণ্ডলের উপযুক্ত সাধনা সম্পূর্ণ করিতে পারেন না (ক)। অতএব কোন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত সাধক মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন না, ইহাই উপনিষদের সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হইয়াছে যে সাধক "তেষু ব্রহ্মলোকেষু" (সেই সমুদায় ব্রহ্মলোকে) বাস করেন। এস্থলে ব্রহ্মলোক একটী নহে বলা হইল। উহারা বহু অর্থাৎ সাধক প্রথমতঃ যখন ব্রহ্মের একটী গুণে একত্ব লাভ করেন, তখন তিনি সত্ত্ব প্রধান মণ্ডলে অর্থাৎ কারণ-লোকে বাস করেন। সেই কারণ-লোকের মণ্ডল সমূহের অন্ত নাই বলিলেই হয়। অর্থাৎ কারণ-লোকে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান। সুতরাং তাহা অনন্তপ্রায় অথবা তাহার সীমা আমাদের ধারণার অতীত। পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে পরমোন্নত সাধকগণ উক্ত মণ্ডল সমূহে যাইয়া নিশ্চল ভাবে থাকেন, ইহা আমাদের মনে করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহারাও ক্রমোন্নতি প্রণালীর অধীন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে ব্রহ্মলোক একটীই, কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মলোকের সম্মানার্থে বহু বচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমাদের তাহা মনে হয় না। সেই সকল মণ্ডল জড় পদার্থ মাত্র। উপনিষদের ঋষি যে ভক্তিভাব প্রণোদিত হইয়া জড় পদার্থের সম্মানার্থ বহু বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা যুক্তি সম্মত নহে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বিমোক্ষ শব্দে "বি" উপসর্গ ব্যবহারের কি আবশ্যকতা ছিল। আমরা বলিব যে উক্ত উপসর্গের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান। তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে। "বি" উপ-

(ক) সপ্তলোকের মণ্ডল সংখ্যা ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ভুবর্লোক হইতেই কারণ-দেহ আরম্ভ। এক সত্য লোকেই পরার্দ্ধ ৬৪ মণ্ডল বর্ত্তমান।

সর্গের অর্থ "বিশেষ প্রকারে বা বিশেষ রূপে" অর্থাৎ সাধক বিশেষরূপে আবরণ মুক্ত হন। বিশেষরূপ মুক্তি কি? পরমর্ষি গুরুনাথ সত্যামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"সংসারবন্ধনান্মুক্তিঃ ষড়বিধাদ্ বিষয়াত্তথা। ত্রিবিধাৎ কলুষান্মুক্তিঃ পাশাদষ্ট বিধাত্তথা॥ দেবতেজোদর্শনজা দেব-দর্শন-সম্ভবা। ব্রহ্মতেজো-দর্শনজা ব্রহ্ম-দর্শন-সম্ভবা॥ দ্বাবিংশী খলু মুক্তিস্তু কথ্যতেঽনন্ত সংখ্যিকা। আনন্ত্যান্মুক্তিদাতৄণাং গুণানাং পরমাত্মনঃ।" "বঙ্গানুবাদ:—সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি, ছয় প্রকার বিষয় হইতে মুক্তি, ত্রিবিধ কলুষ হইতে মুক্তি, অষ্টবিধ পাশ হইতে মুক্তি, দেবতেজোদর্শনে মুক্তি, দেবদর্শনজনিতা মুক্তি, ব্রহ্মতেজঃ দর্শনে মুক্তি, ব্রহ্মদর্শনজনিতা মুক্তি, এই দ্বাবিংশ প্রকারের মুক্তি। কিন্তু পরমাত্মার মুক্তিদাতা গুণরাশির অনন্তত্ব হেতু অনন্ত সংখ্যক মুক্তি বলা হয়।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে স্থূলতম দেহের মৃত্যুকে মুক্তি বলা হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ বিমোক্ষ, তাহা ব্রহ্মতেজোদর্শনজা মুক্তি। দেখা যায় যে উহার পূর্ব্বে ২০ প্রকারের মুক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং ২০ প্রকারের মুক্তির পর যে মুক্তি, তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ মুক্তি বা বিমোক্ষ বলিতে হইবে। বিশেষতঃ উক্ত প্রকারের মুক্তির পরই ব্রহ্মদর্শনলাভ সহজ হয় অর্থাৎ ঐরূপ মুক্তির পরে সাধক ক্রমশঃ একত্ব লাভ করিতে থাকেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে ঐরূপ মুক্তির পরে ব্রহ্মদর্শন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ হয়, অর্থাৎ "সম্পৎস্যে"। এস্থলেও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের অনন্তগুণ এবং প্রত্যেক গুণে একত্ব লাভকেই এক একটী মুক্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং মুক্তিও অনন্ত। সুতরাং ব্রহ্মলাভ হইলেই অর্থাৎ তাঁহার প্রথম দর্শনেই পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ হয় না বা তাঁহাতে সাধকের লয়ও হয় না। এই সম্পর্কে আরও একটী বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উল্লিখিত উপনিষদের মন্ত্রেই আমরা দেখিয়াছি যে সাধক বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হইলেই মনোময় পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলাভ করান। এই বিদ্যুৎ কি? উহা আর কিছুই নহে কেবল ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ। অর্থাৎ সাধক যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, তখন তিনি

ব্রহ্মদর্শনের উপযুক্ত হন। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম তেজোদর্শনে সাধক যাবতীয় দোষপাশের রজস্তমোহংশ হইতে মুক্তি সহকারে শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই অবস্থাকেই দোষ-পাশ-মুক্তাবস্থা বা শিবত্ব লাভের অবস্থা বলা হইয়াছে। "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। প্রোচে পশুপতিস্তন্ত্রে এবং বাক্যং মহার্থকম্॥ (সত্যামৃত)" "অর্থাৎ এই অবস্থা লাভ হইলেই সাধকের শিবত্ব লাভ হয়। এস্থলে শিব অর্থে পূর্ণ পবিত্র। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র মতেও এই অবস্থাকে অতি উচ্চ অবস্থা বলা হয়।" * শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, তাহা প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। এস্থলেও সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুতের কথা আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যোতিঃ দর্শন হয়॥ "নীহার-ধূমার্কা-নিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্। এতানি রূপাণি পুবঃ-

* ধ্যানাবস্থায় সাধকের উন্নতির পরিমাণানুযায়ী যে অবস্থা দৃষ্ট বা অনুভূত হয়, পরমর্ষি সাধক গুরুনাথ তাহার ক্রম নিম্নলিখিত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "১ম—ঘোরতর অন্ধকার। ২য় - বিরল অন্ধকার। ৩য়—স্বল্প কাল স্থায়িনী বা দীর্ঘকাল স্থায়িনী মূর্ত্তি। ৪র্থ—দেবগণের জ্যোতিঃ। ৫ম—দেবদর্শন ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন। ('দেব' শব্দে ইহলোকস্থ এবং পরলোকস্থ উন্নত আত্মাদিগকে বুঝায়।) ৬ষ্ঠ—ব্রহ্মের সত্ত্বাজ্ঞান। (জগদীশ্বর যে সাধকের চতুর্দ্দিকে এবং অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অটল প্রতীতি।) ৭ম—ব্রহ্মতেজোদর্শন। এই অবস্থায় দেহী যাবতীয় জাত গুণের রজস্তমোহংশ হইতে মুক্তি সহকারে শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মতেজোদর্শনে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানলাভ, প্রেমলাভ ও আনন্দলাভ হওয়াতে অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়া থাকে। ৮ম—ব্রহ্মদর্শন। ৯ম—পরম প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেম অঙ্কে আরোহন। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান লাভ।" পরমর্ষি গুরুনাথ আরও লিখিয়াছেন যে শেষোক্ত অবস্থা চতুষ্টয় প্রথমে ধ্যানাবস্থায় লাভ করিতে হয় বটে, কিন্তু পরে সাধকের এরূপ অবস্থা হয় যে সাধারণে যাহাকে ধ্যান বলে, তাহা যে তিনি করিতেছেন, এরূপ বোধ হয় না। অথচ সত্ত্বাবোধ বা দর্শনাদি সর্ব্বাবস্থাতেই হয়। 'মায়াবাদ" অংশে ব্রহ্মজ্যোতিঃ সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ও এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। (এই তত্ত্ব সত্যধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা গ্রন্থদ্বয়ে ধ্যান সম্বন্ধে লিখিত বিষয় অবলম্বনে লিখিত।)

সরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ।। (২।১১)"। "বঙ্গানুবাদ :— শিশির, ধূম, সূর্য্য অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র এই সকল ক্রমশঃ অভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মদর্শন প্রকাশ করে (পরমর্ষি গুরুনাথ)।" উক্ত উপনিষদ্ হইতে আরও একটী মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"৩।৮ "বঙ্গানুবাদঃ—এই মহান্ আদিত্য বর্ণ (অর্থাৎ প্রকাশরূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) অজ্ঞানের পরপারস্থ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমৃত প্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই।" উক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মের একটী মাত্র স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি আদিত্য বর্ণ অর্থাৎ তিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ। এস্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞানময়ও বলা হয় নাই। ব্রহ্মের অনন্ত রূপ বা গুণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মের বহু গুণের বা স্বরূপের উল্লেখ আছে (ক)। এস্থলে তাঁহাকে কেবল জ্যোতির্ম্ময় বলার অবশ্যই বিশেষত্ব (significance) আছে বুঝিতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে তিনি অন্ধকারের পরপারে বর্ত্তমান। তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে আমরা পাইলাম যে একদিকে মৃত্যু ও অন্ধকার এবং অন্যদিকে অমৃত ও জ্যোতিঃ। ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মতেজোদর্শনে দোষপাশরাশির রজস্তমোহংশ লয় প্রাপ্ত হয় এবং শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব লাভ হয়। আমরা জানি যে দোষপাশরাশির রজস্তমোহংশই আমাদিগকে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতেই লইয়া যায় এবং উহাদের গাঢ় অন্ধকারে আমরা আবৃত বলিয়া ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারি না। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "গুণ বিধান" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। দোষপাশের রজস্তমোহংশের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে সত্ত্বের রাজত্ব। সে স্থলে তমঃ নাই, অথবা থাকিলেও তাহা কার্য্যকর ভাবে নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উল্লেখ আছে। অতএব

(ক) "মায়াবাদ" অংশে উক্ত উপনিষদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। তাহাতেই উহা প্রমাণিত হইবে।

বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মতেজঃ দর্শনে আমাদিগের অন্ধকারের কারণ—মৃত্যুর কারণ জাত গুণরাশি বা দোষপাশরাশির রজস্তমোহংশ হৃদয় হইতে দূরীভূত হইলে পরম পিতার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং-ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্-৩।১।৩)।" "বঙ্গানুবাদ :—যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের উৎপত্তিস্থান পরমপুরুষ জগদীশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন।" এস্থলেও ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনে সাধকের রজস্তমঃ গুণের লয় ও শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইল। রজস্তমোগুণ আমাদের পাপ এবং পুণ্যের বিশেষ কারণ এবং উহারাই আমাদের বিশেষরূপে আবরণের কার্য্য করে। উহাদের লয় হইলে সাধক সত্ত্বভাবাপন্ন হন। তৎপর পরমপিতার অপার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার একটী গুণে একত্বলাভ করেন। সাম্যং অর্থে একত্বং অর্থাৎ জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ আছে, তন্মধ্যে কোনও একটী গুণে সাধকের অনন্তত্ব লাভ হয় অর্থাৎ ঐ গুণে তিনি জগদীশ্বরের সহিত এক হইলেন। পরমপিতার আংশিক দর্শনকেই অর্থাৎ এক বা ততোহধিক গুণে তাঁহার দর্শনকেই সাধারণতঃ ব্রহ্মদর্শন বলা হয়। কারণ, জীবের পক্ষে পূর্ণব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"দেবদেবীগণ প্রভা বিকাশয়ে বটে শোভা, তা'হতে বিমল বিভা ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধরে ওরে। ব্রহ্মের সে অনন্ত অংশ জগৎ করে অবতংস, যাহে হয় মায়া* ধ্বংস বুঝে না তা, কিরূপ ধন। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।" অতএব বুঝিতে পারা যায় যে ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে সাধকগণ তাঁহার অপূর্ব্ব অতুলনীয় জ্যোতিঃ দর্শন করেন। পাঠক একটী কথা মনে

* মায়া অর্থে অজ্ঞানতা, মায়াবাদের মায়া নহে।

রাখিলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাহা এই যে সূর্য্য দেখিবার বহু পূর্ব্বে উহার জ্যোতিঃ দেখা যায় অথবা উষাকালে সূর্য্যালোক দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে অনতিবিলম্বেই সূর্য্য উদয় হইবে, অথবা আমরা সূর্য্যদর্শন করিতে পারিব। সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্মজ্যোতিঃ সাধক দর্শন করেন এবং তাহার পর তাঁহার ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ কি সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মকে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ও বলা হয়। অনেকে জ্যোতির অর্থ "জ্ঞান" এইরূপ রূপকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্মের জ্যোতিঃও অনন্ত, তাহাও আমাদিগের বুঝিতে হইবে। এস্থলে জ্যোতিঃ দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে সেই অতুলনীয় জ্যোতিঃ আমাদের দৃষ্ট কোন জ্যোতির ন্যায়। উঁহা অনন্ত অরূপের একটী অরূপ-রূপ বটেন, কিন্তু উঁহা কখনই কোনও সৃষ্টরূপ নহেন। কঠোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই:—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (২।২।১৫)। "বঙ্গানুবাদ:—সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায়? অর্থাৎ এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। (তত্বভূষণ)।" অতএব আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্ম-জ্যোতির সহিত সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের জ্যোতির তুলনাই হইতে পারে না। আরও দেখিলাম যে তাঁহার জ্যোতির আভাসেই উহারা জ্যোতিষ্মাণ। উহাদের জ্যোতিঃ চক্ষুগ্রাহ্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিঃ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গ্রাহ্য নহেন। কারণ তাঁহা জড়বস্তু নহে। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখিয়াছি। চর্ম্মচক্ষে সেই অতুল জ্যোতিঃ দেখা যায় না, বা অন্তঃকরণ দ্বারা

তাহা ধারণা করা যায় না। একমাত্র আত্মাই যখন স্বভাবে থাকেন, তখন তিনি ব্রহ্মের অপার কৃপায় তাঁহার অনুপমেয় জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারেন। আত্মার জ্ঞান আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই জ্ঞানই অন্তঃকরণের এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বিকৃত ও নানাভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মা তাঁহার জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারেন। একত্বপ্রাপ্ত সাধকগণ বলিয়াছেন যে তাঁহারা অরূপের রূপরাশি দর্শন করেন। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"ওহে নাথ প্রেমময়, তুমি কি অপূর্ব্ব ধন! শব্দ নহ, কিন্তু তব শুনা যায় মধুর বচন। তুমি নাথ রূপাতীত, কিন্তু হও দৃষ্টি গত, কি ভাষায় বলিব নাথ, সে অরূপ-রূপ দর্শন। রসের অতীত তুমি, কিন্তু হও রস-ভূমি, নীরসে রস দেও তুমি, তুমি হে অনন্ত গুণ। গুণ পঞ্চকের অতীত, অনন্ত গুণ পূরিত, প্রেমেতে তার জগত, কে বুঝবে তোমার গুণ।" বেদ এবং বেদান্তেও যে পরমপিতাকে বহু স্থলে জ্যোতির্ম্ময় বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। "আনন্দং রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" মন্ত্রের সাধারণতঃ এই অর্থ করা হয় যে 'যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।" কিন্তু উহার নিম্নলিখিত অর্থও হইতে পারে :—"ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ এবং যিনি প্রকাশ পাইতেছেন অর্থাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ।" ঋগ্বেদের মন্ত্র "আবিরাবির্ম্মএধি"। এস্থলেও ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময় বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে "ইচ্ছাশক্তি" অংশ ও ৪২০-৪২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী প্রসিদ্ধ মীমাংসা এই যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মের জ্যোতিঃ না থাকিলে আমরা জগতে জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতাম না। যিনি কেবল সকল কার্য্যের নহেন, কিন্তু সকল কারণেরও কারণ (কারণং কারণানাম্), তিনি অবশ্যই সকল জ্যোতিরও কারণ, অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি স্থূল জ্যোতিঃ নহেন, তিনি সূক্ষ্ম জ্যোতিঃও নহেন, কিন্তু তাঁহার অনন্ত জ্যোতিঃ তাঁহাতে নিত্য কারণা-

কারে বর্ত্তমান। অথচ সেই অরূপ জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যের নিকট কেবল জ্যোতিষ্ক সমূহের জ্যোতিঃই যে খদ্যোৎবৎ নিষ্প্রভ, তাহা নহে, কিন্তু ঋষি, মহর্ষি, পরমর্ষিদিগের জ্যোতিঃও সেই অতুল্য জ্যোতির নিকট নিষ্প্রভ। কারণ, তাঁহাদের জ্যোতিঃ সেই অনন্ত জ্যোতিরই আংশিক বিকাশ মাত্র। ব্রহ্মকে তেজোময় বলাও হয়। "যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োহমৃতময় পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—২।৫।১৪)" "বঙ্গানুবাদ :—এই আত্মায় (অর্থাৎ দেহে) যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে জীবাত্মারূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সমুদায় বস্তু। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন।" যাঁহার তেজঃ আছে, তাঁহার অবশ্যই জ্যোতিঃ আছে। Electricity তেজঃ পর্য্যায় ভুক্ত। উহার রূপবত্তাও আছে। যেমন বিদ্যুতের আলোক, বিজলি আলোক ইত্যাদি। সুতরাং যিনি অনন্ত তেজের আধার, তাঁহার জ্যোতিঃ অবশ্যই আছে। সুতরাং অনন্ত তেজোময় পরম পুরুষে অবশ্যই অনন্ত জ্যোতিঃ নিত্য বর্ত্তমান বলিতে হইবে। বেদান্ত দর্শনের "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" (১।১।২৪) সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে আমরা পাই যে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ। অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহার জ্যোতিঃ স্থূল জ্যোতিঃ নহে। অতএব আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ আছে এবং প্রাকৃতিক সকল প্রকার জ্যোতিঃ সেই পরম জ্যোতির আভাস মাত্র। একথা বলা চলে না যে ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময় বলিলে তাঁহাকে সাকারই বলা হইল। কারণ, সেই জ্যোতিঃ অনুপম অরূপ-রূপ বিশিষ্ট হইয়াও জড় জ্যোতির ন্যায় নহে। আমাদের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ রূপে জড়ীয় রূপবিহীন হইয়াও অনন্ত অনন্ত অনন্ত অরূপ-রূপে নিত্য রূপবান এবং তিনি অনন্ত রূপে নিত্যই প্রকাশিত। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যখন একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণই ব্রহ্মের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভাষা না পাইয়া নিরস্ত হন

এবং বলিয়া উঠেন যে তিনি অনির্বচ্চনীয়, তখন মাদৃশ হীন জন তাঁহাদের স্বল্পাদপি স্বল্প এবং তথাকথিত জ্ঞান লইয়া কি প্রকারে সেই অপরূপ প্রেম সুন্দর মধুর রূপের, সেই নিত্য অরূপের রূপ মাধুরী বর্ণনা করিবে? মহাকবিগণও যখন চন্দ্রের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করিতে পরাস্ত হন, তখন যাঁহার "শ্রীচরণ তলে কোটী শশী সূর্য্য মরে লাজে", সেই জীব মাত্রেরই চিদাকাশে নিত্য বিরাজিত, নিত্য নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন পূর্ণ প্রেমচন্দ্রের অরূপ-রূপ মাধুরিমার বর্ণনা ভক্তিহীন, প্রেমবিহীন এবং জ্ঞানশূন্য মাদৃশ অধমের পক্ষে যে একান্ত অসাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য। পাঠক দয়া করিয়া আমার অক্ষমতা ক্ষমা করিবেন। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ব্রহ্মতেজোদর্শনের পূর্ব্বে সাধক যে সকল মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইতে ব্রহ্মতেজোদর্শনজা মুক্তি যে বিশেষ মুক্তি (বিমোক্ষ), তাহা সুনিশ্চিত। কারণ, তাহার পরই অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় ব্রহ্মদর্শন লাভ সুসম্ভব হয়। আমরা উপনিষদুক্ত মন্ত্র কয়েকটীর সমালোচনায় পাইলাম যে উহাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ বর্ত্তমান। "(১) ব্রহ্মতেজোদর্শনে সাধকের আবরণ বিশেষ ভাবে উন্মুক্ত হয়। (২) উক্তরূপ মুক্তির পর ব্রহ্মদর্শন সহজ হয়। (৩) ব্রহ্মদর্শন হইলেই অর্থাৎ তাঁহার একটী গুণে তাঁহার সহিত একত্ব লাভ হইলেই সাধকের ব্রহ্মে লয় হয় না। (৪) মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সাধকের ব্রহ্মে লয় অসম্ভব। তিনি অসংখ্য লোকে ক্রমোন্নতি লাভ করিবেন অর্থাৎ একত্বের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।" যদি "বিমোক্ষ" শব্দে দেহ হইতে মুক্তি বুঝায়, ইহা কেহ বলিতে চাহেন, তবে বলিতে হইবে যে উহা ত্রিবিধ দেহের বিগমেই সম্ভব হয়। উহা স্থূলতম দেহের মৃত্যুতে কখনই সম্ভব নহে। উপনিষদ্ অনুযায়ীও বুঝিতে পারা যায় যে পারলৌকিক ব্রহ্মদ্রষ্টৃগণও মহাপ্রলয়ে পূর্ণামুক্তি লাভ করেন। সুতরাং পৃথিবীস্থ ব্রহ্মদ্রষ্টৃগণের সম্বন্ধেও ঐ একই বিধান সুসম্ভব, কদাচ বিভিন্ন বিধান হইতে পারে না। ইহা ভিন্নও নানা যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পূর্ণামুক্তি বা বিদেহমুক্তি অর্থাৎ ত্রিবিধ

দেহের বিগমে ব্রহ্মে লয় অসম্ভব। আর বিমোক্ষ শব্দের অর্থ বিশেষ মোক্ষ বা Particular মোক্ষ বা Special মোক্ষ, কিন্তু পূর্ণমোক্ষ বা শেষ মোক্ষ নহে। ত্রিবিধদেহের বিগমে ব্রহ্মে লয়কে পূর্ণামুক্তি, পূর্ণমোক্ষ বা শেষ মোক্ষ বলিলেই সত্যভাব প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মতেজোদর্শনজা মুক্তিকে কেন বিমোক্ষ বা বিশেষ মোক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। মানব দোষ-পাশের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতেই উদ্ধার পাইতে ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ব্রহ্মতেজোদর্শনে সেইরূপ মুক্তিই লাভ হয় অর্থাৎ ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আলোচ্য মন্ত্রে যে উপমাটীর পর বিমোক্ষের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বন্ধন হইতে মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনে দোষপাশের রজস্তমোহংশের লয় হয় এবং শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব লাভ হয়। এই অবস্থায়ই জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করেন। সুতরাং এই অবস্থায় বন্ধনের Aggressive ভাবের লয় হয়। সত্ত্বাবস্থাও বন্ধন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে বন্ধন বলা হয় না। ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনের পর ব্রহ্মলাভ হয় (সম্পংস্যে) অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়। আলোচ্য মন্ত্রেও বলা হইয়াছে যে বিমোক্ষের পর ব্রহ্মলাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মে লয় হয়, একথা বলা হয় নাই। বিমোক্ষ শব্দে শেষ কারণ দেহ হইতে মুক্তি বুঝাইলে "ব্রহ্মলাভ করিব" না বলিয়া "ব্রহ্মে লীন হইব" বলা হইত। কারণ, ব্রহ্মে লয় হইলে কে কাহারে লাভ করে? পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনের পর ব্রহ্মদর্শন এবং তদনন্তর ব্রহ্মলোক সমূহে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতরভাবে চিরকাল বাস। সুতরাং উহাকেই যে বিশেষ মোক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ব্রহ্মদর্শন যে একবারেই সম্পূর্ণরূপে হয় না বা হইতে পারে না, সেই সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে কেনোপনিষদও বলিতেছেন যে একবারে ব্রহ্মদর্শন পূর্ণ হয় না। কেনোপনিষদ্ দৃষ্টে আরও বুঝিতে পারা যায় যে এই সত্য তত্ত্ব কেবল কেনোপনিষদ্ বক্তা ঋষি দ্বারাই কথিত নহে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণও

উহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভ অর্থে ইহাই বরাবর বুঝায় যে ব্রহ্মের কোন এক গুণে তাঁহাকে দর্শন অর্থাৎ তাঁহার আংশিক দর্শনই সম্ভব, পূর্ণ দর্শন কখনই সম্ভব নহে। পূর্ণ দর্শন যখন অনন্ত প্রায় কাল সাপেক্ষ, তখন পূর্ণামুক্তিও অনন্তকাল সাপেক্ষ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালের পূর্ব্বে পূর্ণামুক্তি বা বিদেহ মুক্তি বা ত্রিবিধ দেহের বিগমে মুক্তি বা ব্রহ্মে লয় অসম্ভব। এই সম্বন্ধে ইতঃপর আরও সরলভাবে লিখিত হইতেছে। তাহাতে দেখা যাইবে যে দেহে থাকিতে থাকিতে পূর্ণ দর্শন হয় না। অনন্ত করুণাময়ের করুণায় যখন ত্রিবিধ দেহের লয় হয়, তখনই পূর্ণামুক্তিলাভ হয়। সেই অবস্থা কাহারও পক্ষে স্বপ্রযত্নে লভ্য নহে, কিন্তু উহা ভগবৎকৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পাদের সূত্র সমূহ বিশেষতঃ ২য় পাদের ৭ম ও ১২শ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর স্বামী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানীর সূক্ষ্মদেহ মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথেই তিনি ব্রহ্মে লীনতা প্রাপ্ত হন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বিশেষভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ১১শ মন্ত্র এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ৬ষ্ঠ মন্ত্রের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী যে সোঽহং জ্ঞানলাভ করিয়া স্থূল দেহান্তে ব্রহ্মে লীন হন না, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি। স্বামী রামানুজাচার্য্য এবং স্বামী নিম্বাকাচার্য্য এবং বহু বিশিষ্ট দার্শনিক উৎক্রমণের পক্ষপাতী। তাঁহাদের ভাষ্য দর্শনে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আধুনিক দার্শনিক দিগের মধ্যে সাধু সন্তদাস বাবাজী তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত নিম্বাকাচার্য্যকৃত ভাষ্যে শঙ্কর স্বামীর মত যুক্তিযুক্ত ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পৃথিবীতে মানবের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না বা হইতেও পারে না। এই বিশ্বে যে অসংখ্য মণ্ডল বর্ত্তমান, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞানও তাহা এখন স্বীকার করেন। এই সকল মণ্ডল

কেন সৃষ্ট হইয়াছে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্যই, নতুবা ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আবার জড় জগৎ জীবের জন্যই। জীবের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনেই জড় জগতের সার্থকতা, নতুবা জগৎ সৃষ্টির অন্য কোন কারণ ছিল না। সাংখ্য দর্শনও বলিয়াছেন যে জড় জীবের জন্যই। যদি পৃথিবীবাসিগণ অথবা অন্যান্য স্থূল মণ্ডলের আদিম দেহধারিগণ আদিম দেহ ত্যাগেই পূর্ণামুক্তি লাভ করেন, তবে বিশ্বের সেই অসংখ্য মণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সদ্য মুক্তি বা পূর্ণামুক্তি যে এত সহজলভ্য ধন নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লিখিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে অনেকে ধারণা করেন যে একবার মাত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে পারিলেই অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত অনন্ত গুণের কোনও একটী গুণে পরমপিতার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারিলেই হইল। আমরা ১০২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে দেখিয়াছি যে মুক্তিও অনন্ত এবং ত্রিবিধ দেহের বিগম ভিন্ন ব্রহ্মে লয় অসম্ভব। আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব যে একটী মাত্র একত্ব লাভ করিলেই ব্রহ্মকে পূর্ণ ভাবে দেখিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রথমবার দর্শনেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে দর্শন করা যায় না। ইহাও প্রমাণিত হইবে যে জীব দেহে থাকিতে থাকিতেই (সেই দেহ স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক, অথবা কারণই হউক কখনই পূর্ণ ভাবে দর্শন করিতে পারিবেন না। একটী কথা মনে রাখিলেই হয় যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং যে সাধক একটী মাত্র একত্ব লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মের পরমাণুবৎ অংশের সহিত মিলিত হইলেন মাত্র অথবা তিনি অনন্ত সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ উন্নতি লাভ করিলেন মাত্র। পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিবেন না যে আমরা একত্ব প্রাপ্ত পরম সাধকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। যাহা উক্ত হইল, তাহার অর্থ এই যে পরম সাধক আমাদের মহাভক্তিভাজন বটেন, কিন্তু ব্রহ্মের অনন্ত উন্নতির নিকট তাঁহার উন্নতি অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পূর্ণ মিলন অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা 'ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন' অংশ পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্ব সাধারণের ধারণা

বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে মোক্ষের অঙ্কুরকেই অর্থাৎ প্রথম একত্ব লাভকেই শেষ মুক্তি বা পূর্ণামুক্তি বা মোক্ষ বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তদর্শনের ৪।২।৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যাঁহারা স্থূলতম দেহে দেহান্তে সদ্য মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাও দেহেথাকিতেথাকিতে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সম্পর্কে পরমর্ষি গুরুনাথের নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহাতে পাঠকের ভ্রম জন্মিতে পারে যে, কেবল স্থূলদেহের কার্য্যই স্থূলদেহাবস্থানকালে সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাত্মা সাধকগণ স্থূলদেহে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত দেহের কর্ত্তব্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন, কেহ কেহ সূক্ষ্ম দেহের কতকগুলি কার্য্যও করেন, কেহ কেহ বা সূক্ষ্ম দেহেরও সমস্ত কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক কারণ-দেহের কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই "জীবন্মুক্ত" শব্দের প্রকৃত-বাচ্য (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে জীবন্মুক্ত পুরুষগণও কারণ-দেহের কার্য্য আরম্ভ করেন মাত্র, শেষ করেন না। কারণ দেহ যে অসংখ্য, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" ও "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশদ্বয়ে আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে মানব কারণ-দেহেও অনন্তপ্রায় কাল বাস করিয়া পূর্ণামুক্তির অধিকারী হন, কখনই ইহার পূর্ব্বে নহে। এখন আমরা শঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত উক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্রদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ইহা অতি বিস্তারিত ভাবে সম্ভব নহে। কারণ, বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইতি পূর্ব্বেই দীর্ঘ হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।২।১১ মন্ত্রঃ—

"যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাঽয়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎপ্রাণা ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃত শেতে।" "বঙ্গানুবাদঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন কি প্রাণ সমূহ উর্দ্ধলোকে উৎক্রমন করে? কিংবা (উৎক্রমণ করে) না? যাঃ—না, (তাহারা) এই দেহেই সম্মিলিত হয়। সে স্ফীত হয়, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয় এবং বায়ু দ্বারা পূর্ণ

হইয়া এই মৃত (দেহ) শয়ন করিয়া থাকে। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)" শঙ্কর স্বামী এই মন্ত্র দ্বারা বলিতে চাহিয়াছেন যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে উৎক্রমণ সম্বন্ধে "না" বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানীদের সম্বন্ধেই। কিন্তু আলোচ্য মন্ত্র এবং পূর্ব্বাপর মন্ত্রসমূহ সমস্ত প্রকরণটী বিশ্লেষণ করিলে কোথায়ও ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা পাওয়া যায় না। প্রথম গ্রহ এবং অতিগ্রহ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। তৎপর মহর্ষি অগ্নিকে মৃত্যু বলিয়াছেন এবং অগ্নিকে অপের অন্ন বলিয়াছেন। যিনি এই তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ অপ্ দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় বা অপ্ অগ্নির মৃত্যু স্বরূপ, এই তত্ত্ব জানেন, তিনি অগ্নি দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পান অর্থাৎ এই তত্ত্ব জানিলে অগ্নিরূপ মৃত্যুর ভয় নিবারিত হয়। কিন্তু শঙ্কর স্বামী অর্থ করিয়াছেন যে, যিনি এরূপ জানেন, তিনি পূণর্মৃত্যু জয় করেন অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করেন। প্রকরণে এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা এবং তাঁহার অমৃতত্বলাভের কথা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকরণে আত্মিক আলোচনা নাই, সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞানীর বা অমৃতত্ব লাভের প্রশ্নই উদয় হয় না। এই প্রকরণে প্রত্যক্ষ বিষয় সমূহ মাত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে কয়েকটী শারীরিক যন্ত্র ও উহাদের বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তৎপর অগ্নিতে যে মৃত্যু হয় এবং জল অগ্নি নিবারক, ইহাও বলা হইয়াছে। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জানিয়াই যদি অমৃতত্ব লাভ হয়, তবে ইহা হইতে বহু শত গুণে কঠিনতর সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিলেও অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে হয় ন, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহার পরেই আলোচ্য মন্ত্র। আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরে বুঝিতে পারা যায় যে পুরুষের মৃত্যু হইলে তাহার প্রাণ সমূহ (পঞ্চ প্রাণ) উর্দ্ধ দিকে গমন করে কি না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উত্তরে "না" বলিলেন। এস্থলেও ব্রহ্ম জ্ঞানীর কথা নাই। সকল মানব সম্বন্ধেই এই প্রশ্নোত্তর। যাজ্ঞবল্ক্য যাহা আলোচ্য মন্ত্রে বলিলেন, তাহাও প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পুরুষের প্রাণ সমূহ দেহেই মিলিত হয় এবং বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয় এবং বায়ু

দ্বারা পূর্ণ হইয়া এই মৃত দেহ শয়ন করিয়া থাকে। ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। এস্থলে ইহা বলিলে সঙ্গত হইবে না যে এই মন্ত্র কেবল মাত্র ব্রহ্মবিৎ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। শঙ্কর স্বামীও সেই সম্বন্ধে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। তৎপর মহর্ষি বলিলেন যে নাম পুরুষকে ত্যাগ করে না। তৎপর গোপনীয় আলোচনা দ্বারা স্থিরী-কৃত হইল যে পাপকারী পাপ ভোগ করে এবং পুণ্যকারী সুফল প্রাপ্ত হয়। এস্থলে প্রশ্ন হইবে যে যাজ্ঞবল্ক্য এই উপনিষদেরই ৪।৪।৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে উভয় প্রকার পুরুষেরই প্রাণ উৎক্রমণ করে না। কামনাবানের প্রাণ উৎক্রমণ করে, কিন্তু কামনাহীনের নহে। আবার ৪।৪।৮ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় মহর্ষি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ আছে। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রে কেন প্রাণের উৎক্রমণ তিনি অস্বীকার করিলেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আলোচ্য প্রকরণে দৃষ্ট বিষয় মাত্র আলোচিত হইয়াছে। আটটী গ্রহ, আটটী অতিগ্রহ, অগ্নি ও জল ইহাদেরই মাত্র আলোচনা বর্ত্তমান। ইহারা সকলেই স্থূল। অতীন্দ্রিয় কিছুই আলোচিত হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে মৃত শরীর ও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে মাত্র আলোচিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দেহ উর্দ্ধে গমন করুক বা নাই করুক, মৃত দেহে যাহা সংঘটিত হয়, তাহাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্থূল প্রাণ সমূহের কথাই বলা হইয়াছে, সূক্ষ্ম দেহের, সূক্ষ্ম প্রাণের কোন কথাই বলা হয় নাই। এই মন্ত্রে "প্রাণাঃ" অর্থে যদি স্থূল পঞ্চ প্রাণ গ্রহণ করা যায়, তবে "স্ফীত হয়, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়, এবং বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া সেই মৃতদেহ পড়িয়া থাকে" বাক্যের অর্থও সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। এই প্রকরণের শেষ সিদ্ধান্ত "পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হয় এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান হয়।" সুতরাং বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক জীবই কর্ম্মের অধীন। তিনি পাপ করিলে পরলোকে কুফল ভোগ করিবেন এবং পুণ্য করিলে পরলোকে সুফল ভোগ করিবেন। এস্থলে পুণ্য অর্থে কূপ খনন বা অন্যবিধ পার্থিব সৎকার্য্য বুঝিতে হইবে না, কিন্তু সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যই বুঝিতে হইবে।

সুতরাং বিদ্বানও পুণ্যবানই বটেন। তিনিও পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিবেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার সাধন ভজন দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যধামে গমন করিবেন। "মৃতমনুধাবতি ধর্ম্মাধর্ম্মম্" বাক্য আমাদের স্মরণ করিতে হইবে ইতঃপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।১ এবং ৩।১৪।৪ মন্ত্রের এবং শাণ্ডিল্য বিদ্যার আলোচনা কালে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে বিদ্বান অবিদ্বান সকলেরই উৎক্রমণ আছে। সুতরাং আলোচ্য মন্ত্র বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষেধ করিতে পারে না। উল্লিখিত মন্ত্র সমূহেও বলা হইয়াছে যে কর্ম্মানুযায়ী পুরুষ ফল লাভ করে। শঙ্কর স্বামী এই প্রকরণে যে বিদ্বান ব্যক্তিদের মাত্র প্রাণ উৎক্রমণ করে না বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার কষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হয়। "তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিংচেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎপুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। (বৃহ—৪।৪।৬)।" "বঙ্গানুবাদ :—সেই বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—"পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্ম সহ সেই দিকে গমন করে"। "এই লোকে পুরুষ যে কর্ম্ম করে, সে (স্বর্গাদি লোকে) তাহার ফল লাভ করিয়া সেই (স্বর্গাদি) লোক হইতে এই কর্ম্ম লোকে পুনরায় আগমন করে।" কামনাবান্ পুরুষের বিষয়ে (এই প্রকার), এখন কামনাবিহীন পুরুষের বিষয় উক্ত হইতেছে। :—যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" শঙ্কর স্বামী এই মন্ত্র দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে কামনাবান পুরুষের লিঙ্গদেহ উৎক্রমণ করে, কিন্তু কামনা বিহীন পুরুষের প্রাণ সমূহ উৎক্রমণ করে না। এস্থলে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রমন্তি" বাক্যের "তস্য" স্থলে মাধ্যন্দিন শাখায় "তস্মাৎ" বলা হইয়াছে। শরীর হইতে উৎক্রমণের নিষেধ বলা হয় নাই, শরীরী পুরুষ হইতে

প্রাণ সমূহ উৎক্রমণ করে না বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে "তস্য" বা তস্মাৎ শব্দে শরীরী পুরুষকেই বুঝাইবে। কারণ, ইহাতে শরীর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই। অর্থাৎ "তস্মাৎ" শব্দে পুরুষাৎ বুঝিতে হইবে। রামানুজ স্বামী আরও বলেন যে "তস্য" শব্দও সময় সময় "তাহার হইতে" অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি "নটস্য শৃণোতি" উদাহরণ দিয়াছেন। উহার অর্থ "নট হইতে শ্রবণ করে" অর্থাৎ অপাদানার্থে ৬ষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইবে যে "তস্য" স্থলে "তস্মাৎ" পাঠ গ্রহণ করিয়া এবং "তস্মাৎ" অর্থে "শরীরাৎ" না বুঝাইয়া "পুরুষাৎ" বুঝাইবে বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শেষ বাক্যটী "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" দ্বারা সুস্পষ্ট যে তিনি "ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন"। যদি তিনি ব্রহ্মই হইলেন, তবে আর তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ সমূহের উৎক্রমণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে স্থূল দেহ ত্যাগে কেহই পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। তিনি যত সংখ্যক গুণে একত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মের ততটুকু মাত্র লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ। তাঁহাকে কখনও পূর্ণ ভাবে দেখা যায় না। কেনোপনিষদের ১।২-৩ মন্ত্রদ্বয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মকে পূর্ণ ভাবে দর্শন করিতে পারা যায় না। স্থূলতম দেহে থাকিতে সেইরূপ একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণেরও যে সকল স্থূলতম দেহ জনিত অবশ্যম্ভাবী আবরণের বাধা ভোগ করিতে হয়, সেই দেহ ত্যাগের সহিত তাহাও আর থাকে না। পঞ্চদশীর যে সকল শ্লোক ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পার্থিব মানব দেহ শত সংশোধনে সংশোধিত হইলেও সম্পূর্ণ রূপে সংশোধিত হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ, এই দেহের প্রধান উপাদান ক্ষিতি, সুতরাং দেহ তমঃপ্রধান। উত্তম সাধকগণ বহু কঠোর সাধনা দ্বারা ইহার অধিকাংশ লয় করেন বটে, কিন্তু স্থূলতম দেহে থাকিতে থাকিতে ইহার সম্পূর্ণ রূপে লয় হইতে পারে না। ইহা দেহের

বা প্রকৃতির Inherent defect. আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে সাধনা অনন্ত এবং সেই জন্যই অসংখ্য মণ্ডল সুতরাং অসংখ্য দেহ। পৃথিবীতে থাকিয়াই যদি সাধনার শেষ করা যাইত, তবে অসংখ্য মণ্ডল এবং দেহ সৃষ্টির কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এস্থলে আমাদের আরও একটী বিষয় চিন্তা করিতে হইবে যে যিনি পার্থিব দেহে থাকিতে থাকিতে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, তিনি কেন আয়ুঃ নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইলেই ধ্যানস্থ হইয়া ব্রহ্মে লয় হন না? তাঁহার কেন অন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদেব চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের প্রথম ৪ মন্ত্রে কথিত অবস্থার মধ্য দিয়া লয় হইতে হয়? একত্ব প্রাপ্ত সাধকও অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী পুরুষও স্থূল দেহেই ব্রহ্মে লয় হন না, কিন্তু কারণ-দেহ সহ স্বোপার্জ্জিত কারণ-লোকে গমন করেন। আলোচ্য মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এস্থলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? যদি ব্রহ্মজ্ঞানী স্থূল দেহের মৃত্যুর সাথে সাথেই পূর্ণ ব্রহ্মই হন, তবে আর তিনি "ব্রহ্মকে পাইবেন" বলিবার কোনই অর্থ থাকে না। যিনি ব্রহ্মই হইলেন, তিনি আর কি করিয়া ব্রহ্মকে পাইবেন। তিনি ত স্বয়ংই ব্রহ্ম। সুতরাং এস্থলে "ব্রহ্ম হইবার" অর্থ "ব্রহ্ম ভাবাপন্ন অর্থাৎ কোন কোন গুণে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া", কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্ম হইয়া নহে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে একটী কেন, কোটী কোটী গুণে একত্ব লাভ করিলেও, কোনও মানব ব্রহ্মের সমান হইতে পারেন না। কোটী কোটী একত্বও ব্রহ্মের অনন্ত একত্বের একত্বের তুলনায় মহাসমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ। উপনিষদে সর্ব্বস্থলেই ব্রহ্ম শব্দে পূর্ণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, হিরণ্য গর্ভকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং "ব্রহ্মৈব সন্" অর্থে "ব্রহ্ম ভাবাপন্ন" বলিলে কোনও ত্রুটী হয় বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মকে লাভ করা এবং ব্রহ্মে লীন হওয়া যে এক নহে, তাহা সহজ বোধ্য। মানব নগর প্রাপ্ত হয় বলিয়া সে নগরে লীন হয় না। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি কামনাবান ও কামনাবিহীন উভয় প্রকার পুরুষের সহিতই

তাঁহাদের প্রাণ সমূহ উৎক্রমণ করে, তবে আলোচ্য মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একই কথা বলা হইল কেন ? অর্থাৎ মন্ত্রের ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উভয় প্রকার পুরুষের মৃত্যুর পর অবস্থাদ্বয়ের Contrast করা হইয়াছে। একের পক্ষে প্রাণ সমূহের উৎক্রমণ ও অন্যের পক্ষে উহার নিষেধ বুঝাইতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে এই স্থলে Contrast হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রাণ সমূহের উৎক্রমণ সম্বন্ধে নহে. কিন্তু পুনরাবর্ত্তন সম্বন্ধেই। কামনাবান পুরুষের পুনরাবর্ত্তনের কথা সুস্পষ্ট ভাবে আলোচ্য মন্ত্রে উল্লেখ আছে। কামনাবিহীন. আপ্তকাম ও আত্মকাম সাধকের পুনরাবর্ত্তন নাই। কারণ তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী নহে. তাহা উপনিষদ্ বহু স্থলে বলিয়াছেন। ১০০৩-১০০৪পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গীতার শ্লোকেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। উপনিষদ্ এবং অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র পুনরাবর্ত্তনকে বড়ই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহার পুনরাবর্ত্তন নাই তিনিই অমৃতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন. অন্যে নহে। উপনিষদ পাঠে ইহাই মনে হয় যে অমৃতত্ব লাভ ও পুনরাবর্ত্তন বারণ একই কথা। আরও বলা যাইতে পারে যে ভাষা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, সেই ব্যাখ্যাই মুখ্য ব্যাখ্যা। কিন্তু ভাষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, উহাকে অবশ্যই গৌণ ব্যাখ্যা বলিতে হইবে। বিবাদীয় স্থলে মুখ্য ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা উচিত। আমরা তাহাই করিলাম। আবার বক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রাহ্মণেরই ৮ম মন্ত্রে অতি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মবিদ্ ধীর সাধক উর্দ্ধে স্বর্গে গমন করেন। এই অবস্থায় আমরা আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত ভাবে করিতে পারি না। সুতরাং শঙ্কর স্বামীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আমরা অসমর্থ। প্রোক্ত ৮ম মন্ত্র ও উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ। (৪।৪।৮)।" "বঙ্গানুবাদ : এ বিষয়ে এই সমুদায় শ্লোক আছে :—(এই যে) সূক্ষ্ম পুরাতন পথ

বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি ইহা স্পর্শ করিয়াছি, আমি (ইহা) প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মবিদ্ ধীর ব্যক্তি বিমুক্ত হইয়া সেই পথে এই লোক হইতে উর্দ্ধদিকে স্বর্গলোকে গমন করেন। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন) ।” শঙ্কর স্বামী এস্থলে স্বর্গের অর্থ মোক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ভাবে ও ভাষায় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মবিদ্ ধীর এই লোক হইতে উর্দ্ধ স্বর্গলোকে গমন করেন, ইহা যখন সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে, তখন কি প্রকারে আমরা শঙ্কর স্বামীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি? মোক্ষ লাভার্থ যে উর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করিতে হয় না, ইহাই ত শঙ্কর স্বামীর প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য কথিত এবং প্রকরণে ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অব্যবহিত পরেই উক্ত এই মন্ত্র দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ সমূহ উৎক্রমণ করে এবং তিনি কারণ-দেহ সহ স্বর্গলোকে গমন করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৪।৬ ও ৪।৪।৮ মন্ত্রদ্বয়ই যাজ্ঞবল্ক্য কথিত। দ্বিতীয় মন্ত্রের (৪।৪।৮ মন্ত্রের) অর্থ সুস্পষ্ট এবং উহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ধীর ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাগণের উৎক্রমণ আছে। সুতরাং ৪।৪।৬ মন্ত্রেরও সেইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, নতুবা শ্রুতি বিরোধ হইবে। বিশেষতঃ উভয় উক্তিই যখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যেরই। স্বর্গ শব্দ সাধারণ ভাবে পারলৌকিক সুখধাম সমূহকেই বুঝায়। কিন্তু এস্থলে কারণ-লোককেই বুঝাইবে। কারণ, যাঁহারা একবার মাত্রও ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা একটী মাত্র গুণেও একত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্থূল দেহান্তে কারণ-লোকে গমন করেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কারণ-লোক ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্যম্ এই ছয় লোক এবং এই ছয় লোকে অসংখ্য মণ্ডল অবস্থিত। ইহার পরের মন্ত্র ও উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। “তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ। (বৃহ—৪।৪।৯) ।” “বঙ্গানুবাদ :—(পণ্ডিতগণ) বলেন—এই পথে শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ ও লোহিত বর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞ) এই পথ লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ এবং

তেজোযুক্ত ব্যক্তি এই পথে গমন করেন। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-রত্ন)।" ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মবিদের ঊর্দ্ধ গমনের পথ শুক্ল, নীল, হরিৎ ও লোহিত বর্ণ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ নাড়ী দ্বার হইতে সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করেন এবং তথা হইতে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধামে গমন করেন। এই নাড়ী পথই নানাস্থলে নানা বর্ণের থাকে। এই সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ খণ্ড বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। * উহাতেও এই পথকে নাড়ীপথই বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী এই পথকে মোক্ষভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উপনিষদের অন্যান্য মন্ত্র এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রসমূহ এই মন্ত্রসহ পঠিত হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে নাড়ীপথই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর স্বামীও সকল বর্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। একমাত্র শুক্লবর্ণকে নির্ম্মল বলিয়াছেন। এস্থলে আরও একটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে এস্থলে সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ এবং তেজোযুক্ত সাধকবর্গ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ পরমোন্নত মহাপুরুষগণই দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। শঙ্কর স্বামীর মত এই যে ব্রহ্মবিদ্ হৃদয়েই ব্রহ্মে লীন হন, তাঁহার কোন গতি নাই। কারণ, ব্রহ্মে লীন হইতে গতির কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিভু। তিনি হৃদয়েও আছেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ সেই স্থানেই লীন হইতে পারেন। কিন্তু এই মন্ত্র সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মবিদের মৃত্যুকালে গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নাড়ীপথে গমন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বার হইতে চলিয়া যান অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন। অতএব আমরা দেখিলাম যে ৪।৪।৬ মন্ত্রের শঙ্কর ব্যাখ্যা এই মন্ত্রেরও বিরুদ্ধ। সুতরাং এস্থলেও শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ৮ম মন্ত্রে যে পথের উল্লেখ করা হইয়াছে, ৯ম মন্ত্রে উহারই বিস্তার করা হইয়াছে। বিবাদীয় মন্ত্রদ্বয়ের

* ছা—৮।৬।৫-৬ মন্ত্রদ্বয়ের উপর ইতঃপর লিখিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

বক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয়ও তাঁহারই উক্তি এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণভুক্ত যাহার ৬ষ্ঠ মন্ত্রই বিশেষভাবে সমস্যা আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং ৬ষ্ঠ, ৮ম ও নবম মন্ত্র একত্রে সংস্কারবিহীন হইয়া পাঠ করিয়াও কি বলিতে হইবে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ নিষেধ করিয়াছেন? এখন আমরা বিভিন্ন উপনিষদের আরও কয়েকটী মন্ত্র উল্লেখ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে বিদ্বানেরও উৎক্রমণ আছে। সকল মন্ত্র ও উহাদের বঙ্গানুবাদ আমরা উদ্ধার করিতে পারিব না। কারণ, তাহা করিলে প্রবন্ধ আরও দীর্ঘতর হইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মূল গ্রন্থ সমূহে উহা দেখিবেন এবং আমাদের অনিবার্য্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। ছান্দোগ্য-৩।১৪।১ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে যে যেমন কর্ম্ম করে, এই দেহ হইতে গমন করিবার পরও পুরুষ সেই প্রকার হয়। সুতরাং সকলেরই উৎক্রমণ আছে। ব্রহ্মবিদেরও দেহত্যাগের পর পরলোকে যাইতে হয় এবং তাঁহার কর্ম্মানুযায়ী ফললাভ করেন। এই প্রকরণের চতুর্থ মন্ত্রও এই সঙ্গে পঠিত হইলে সিদ্ধান্ত আরও সুস্পষ্ট হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণের (ঋগ্বেদ-১০।৬।৩।১এ) বিবৃত শাণ্ডিল্য বিদ্যা পাঠেও জানা যায় যে ব্রহ্মবিদ্ স্থূল দেহান্তে পরলোকে গমন করেন। প্রোক্ত মন্ত্রদ্বয় ও শাণ্ডিল্য বিদ্যা কর্ম্মের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যে যেমন কর্ম্ম করে, পরলোকেও তিনি সেইরূপ ফল ভোগ করেন। উহারা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।২।১২ মন্ত্রের একার্থ বাচক মন্ত্র (Parallel passage)। এই মন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহারা "মৃতমনুধাবতি ধর্ম্মাধর্ম্মম্" বাক্যের সমর্থক। সুতরাং উহারা উৎক্রমণের পক্ষপাতী। ছান্দোগ্য- ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪-১৫ খণ্ডদ্বয়। ইহাদের হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ আছে। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্ত দর্শনের ১।২।১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, অক্ষি-পুরুষ-জ্ঞাতা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ দেবযান পথে পরলোক গমন করেন। শঙ্কর স্বামী অক্ষি-স্থিত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং অক্ষি-পুরুষ-জ্ঞাতা এবং

ব্রহ্মবিদ্ একই দেবযান পথে গমন করেন, ইহাও বলিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর মতেই পাওয়া যায় যে ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ আছে। ছান্দোগ্য-পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ১০ম খণ্ড—পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব রূপকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দশম খণ্ডের প্রথমমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি পথে গমন করেন। শ্রদ্ধার অর্থ কি? ইহার সাধারণ অর্থ একপ্রকার বিশ্বাস। শ্রদ্ধা শব্দকে আমরা সাধারণতঃ সম্মানার্থে ব্যবহার করি। ইহাকে ভক্তির নিম্নস্তরের অবস্থাও বলা হয়। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রকৃত অর্থ সমস্ত চেতন-পদার্থে অভেদ-জ্ঞান। সুতরাং ইহা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। তপস্যা অর্থে সাধনা বুঝায়। সুতরাং যিনি সমস্ত চেতন-পদার্থে অভেদজ্ঞান করেন এবং সাধন-ভজন করেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্ না হইয়াই পারেন না। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন:—"প্রেমের সমুন্নত পরিণতির ফলই শ্রদ্ধা। বিশেষতঃ প্রেমের উন্নতি করিতে পারিলেই অর্থাৎ স্নেহ ও ভক্তিকে প্রেমরূপে পরিণতি করিতে পারিলে শ্রদ্ধা সবিশেষ প্রেমভূষণে বিভূষিত হইয়া অতুল আনন্দ বিধান করে।" (সত্যধর্ম্ম)। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে ব্রহ্মজ্ঞেরও উৎক্রমণ আছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ছান্দোগ্য ৫।১০।১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "যাঁহারা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা" ইত্যাদি। সুতরাং উপনিষদুক্ত একমাত্র পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার কথাই বলেন নাই। শ্রদ্ধাগুণ অর্জ্জন ও সাধন-ভজন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বৃহ-৩।২ ব্রাহ্মণের উপর মন্তব্যও দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য-৮।৩।৪ মন্ত্র—এস্থলেও বলা হইয়াছে যে প্রসাদগুণযুক্ত আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মকৃপাপ্রাপ্ত আত্মা বা ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত আত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া স্বরূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের উৎক্রমণ আছে। ছান্দোগ্য-৮।৬।৫ মন্ত্র—ইহাতে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা ওঁ ধ্যান করিতে করিতেই

দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধে গমন করেন। এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে মানবের যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণে তিনি আদিত্যে গমন করেন। এই আদিত্যই ব্রহ্মলাভের দ্বার। যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা বিদ্বান নহেন, তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না। অতএব দেখা গেল যে বিদ্বানেরও উৎক্রমণ আছে। ছান্দোগ্য-৮।৬।৬ মন্ত্র —ইহাতে বলা হইয়াছে যে হৃদয়স্থিত ১০১টী নাড়ীর মধ্যে একটী মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। যিনি এই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অপর নাড়ী সমুদায় বিভিন্ন দিকে যাইবার জন্য (অর্থাৎ অপর নাড়ী দ্বারা অন্যান্য দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না)। ইহা হইতেও বিদ্বানের উৎক্রমণ বুঝিতে পারা যায়। দুইপ্রকার যাত্রী—বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্। বিদ্বান্ মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে উৎক্রান্ত হন। নাড়ীদ্বারেই তাঁহার গতি শেষ হয় না। শঙ্কর স্বামী কিন্তু নাড়ীদ্বারকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য-৮।১২।৩ মন্ত্র—ইহাতে আত্মার কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রকরণও আত্মা সম্বন্ধীয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রসাদগুণপ্রাপ্ত আত্মা শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ সম্পন্ন হন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিদ্বানেরও উৎক্রমণ আছে। যিনি ব্রহ্মপ্রসাদ প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মকৃপা প্রাপ্ত বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত তাঁহাকে উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞ বা বিদ্বানই বলেন। ছান্দোগ্য-৮।১।৬ মন্ত্র —এই খণ্ডে দহর বিদ্যা কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে এবং সত্য কামনা সমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্ব্বলোকে পরাধীন হয়; আর যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্য কামনা সমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্ব্বলোকে তাঁহার স্বাধীন আচরণ হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বিদ্বানেরও উৎক্রমণ আছে। ছান্দোগ্য-৮।১৩।১ মন্ত্র—ইহাতে বলা হইয়াছে যে হৃদয়স্থিত ভেদরহিত ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বর্ণে গমন করি, আবার বিচিত্র হইতে ব্রহ্মে গমন করি। অশ্ব যেমন লোম কম্পিত করে, তেমনি পাপকে বিদূরিত

করিয়া, চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি শরীর হইতে মুক্ত হইয়া এবং কৃতাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করি। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মবিদ্ দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৃহদারণ্যক-৩।৮।১০ মন্ত্র—এস্থলে বলা হইয়াছে যে যিনি এই অক্ষর-পুরুষকে না জানিয়াই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি কৃপা-পাত্র। আর যিনি এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ইহলোক হইতে পরলোকে প্রস্থান করেন। সুতরাং তাঁহারও উৎক্রমণ আছে, তিনি দেহে থাকিতেথাকিতে ব্রহ্মে লীন হন না। ইহাও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যেরই উক্তি। তথাপি ও কি বলিতে হইবে যে বিবাদীয় মন্ত্রদ্বয় বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষেধ করে? বৃহদারণ্যক-৪।৪।২ মন্ত্র—এস্থলে বলা হইয়াছে যে পুরুষের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হয়। এই জ্যোতিঃ দ্বারা এই আত্মা চক্ষু হইতে বা মূর্দ্ধা হইতে বা অপর কোন অঙ্গ হইতে বহির্গত হন। সেই আত্মা উৎক্রমণ করিলে মুখ্য প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে, মুখ্য প্রাণ অনুগমন করিলে সমুদায় প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে। এস্থলে সকল আত্মারই উৎক্রমণ কথিত হইয়াছে, বিদ্বান অবিদ্বান বলিয়া কোনও প্রভেদ করা হয় নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত ছান্দোগ্য ৮।৬।৬ মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্র পঠিত হইলে বলিতে পারা যাইবে যে বিদ্বান মূর্দ্ধা দ্বারা বহির্গত হন এবং অবিদ্বান অন্যান্য দ্বার দিয়া বহির্গত হন। এই ব্রাহ্মনেরই ৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সেই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া একটী নবতর কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করেন। সেইরূপ পিতৃগণের ন্যায়, কিংবা গন্ধর্ব্বগণের ন্যায়, কিংবা দৈব, প্রাজাপাত্য, ব্রাহ্ম কিংবা অন্য কোন ভূতের ন্যায়। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে সকল প্রকার উন্নতির স্তরের আত্মাগণেরই উৎক্রমণ আছে। ব্রাহ্মরূপ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত বিদ্বানগণের রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মানবগণ নিজ নিজ উন্নতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহপ্রাপ্ত হন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞই মূর্দ্ধা দ্বারা বহির্গমন করিয়া ব্রাহ্মরূপ প্রাপ্ত হন।

আলোচ্য মন্ত্রদ্বয়ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত। বৃহদারণ্যক-৬।২ ব্রাহ্মণ— ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলেও প্রযোজ্য। এই উপনিষদে একটু পার্থক্য এই যে ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যিনি এই বিদ্যা জানেন এবং যিনি অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং সত্যকে উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুর পর দেবযান পথে গমন করেন। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সত্য অর্থে সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। সুতরাং যাঁহারা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করেন। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম কখনই অপর ব্রহ্ম নহেন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম – ইহাই ত শঙ্কর স্বামীর একমাত্র ব্রহ্মমন্ত্র। এই উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে "যিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং শ্রদ্ধা ও সত্যের উপাসনা করেন, তিনি" ইত্যাদি। সুতরাং একমাত্র পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানিলেই কেহ দেবযান পথে গমন করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে শ্রদ্ধা সাধন করিতে হইবে এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উভয় উপনিষদেই কোথায়ও অপর ব্রহ্মের উল্লেখ নাই। কঠ—৬।১৬ মন্ত্র—ইহাতে বলা হইয়াছে যে হৃদয়ে একশত এক নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে সুষুম্না নাম্নী একটী নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। অন্তকালে পুরুষ এই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে আসিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। নানাবিধ গতি বিশিষ্টা অন্যান্য নাড়ী বহির্গমনের অর্থাৎ সংসার গতি প্রাপ্তির কারণ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে উৎক্রমণের পর অমৃতত্ব লাভ হয়, উহার পূর্ব্বে নহে। সুতরাং একমাত্র বিদ্বানই সুষুম্না পথে মূর্দ্ধায় গমন করিয়া বহির্গত হন। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে দেহে থাকিতে থাকিতে আপেক্ষিক অমৃতত্ব মাত্র লাভ হয়। কৌষীতকি—১ম অধ্যায়—সকলেই মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। চন্দ্র ব্রহ্মবিদ্‌কে দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে প্রেরণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ আছে বলিতে হইবে। মুণ্ডক—১।২।১১ মন্ত্র—ইহাতে বলা হইয়াছে যে ধীর জ্ঞানিগণ তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন। তাঁহারা বিরজঃ অর্থাৎ কামনা

শূন্য হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে গমন করেন যে স্থানে সেই অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ আছেন। সুতরাং ধীর ও জ্ঞানিগণের উৎক্রমণ আছে। এস্থলে অবিনাশী অব্যয় আত্মার কথা অর্থাৎ পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা প্রভৃতির বিনাশ আছে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে তাঁহারা পরব্রহ্মে লয় হইবেন। সুতরাং অপর ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চাগ্নির বিদ্যার প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। আরও তাঁহাদিগকে শান্ত (ধীর , জ্ঞানী এবং বিরজঃ (কামনা বিহীন) বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে এই মন্ত্র প্রোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের বিস্তার মাত্র। আবার সমস্ত মন্ত্রটীতে বলা হইয়াছে যে ধীর, জ্ঞানিগণ (ব্রহ্মবিদ্গণ সূর্য্যদ্বার দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সুতরাং ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৪।৮ মন্ত্রের Parallel passage। সুতরাং এখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বানের উৎক্রমণ সমর্থন করে। মুণ্ডক—৩।১।৫·৬ মন্ত্রদ্বয়—ইহাতে বলা হইয়াছে যে সত্য তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পরব্রহ্ম লভ্য এবং সত্য দ্বারা দেবযান নামক পথে আপ্তকাম (কামনাবিহীন) ঋষিগণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের পরমধামে গমন করেন। সুতরাং ঋষিগণেরও (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণেরও) উৎক্রমণ আছে এবং তাঁহাদেরও দেবযান পথে গতি হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক কথিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্পর্কে যাহা যাহা বলা হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকের ৪।৪।৬ এবং ৪।৪।৮ মন্ত্রদ্বয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শব্দ সমূহ বা উহাদের ভাব প্রোক্ত মন্ত্র সমূহের সহিত Common. সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্—বৃহ-৪।৪।৮) নিত্য ব্রহ্মচর্য্য (অরণ্যে বাস), আপ্তকাম, বিততঃ, "সত্যস্য পরমং নিধানং" (অর্থে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোকের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যে লোকে জীবাত্মাগণ সহজেই ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকেন)। এস্থলে ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা) শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে বিবাদীয় মন্ত্রদ্বয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঐ একই তত্ত্ব বলিতে চাহিয়াছেন। শ্রুতি মন্ত্র দ্বারাই যখন উহাদের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, তখন ব্যক্তি বিশেষের অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? মুণ্ডক—৩।২।৬ মন্ত্র—এস্থলে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিদ্ এবং পরম তত্ত্ব লাভকারী সাধক মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্ম-লোকে সম্যগ্ ভাবে মুক্ত হন। অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে সত্যলোকে তিনি ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তি লাভ করেন। পৃথিবীর স্থূলতম দেহ ত্যাগেই পূর্ণামুক্তির কথা বলা হয় নাই। মুণ্ডক—৩।২।৭ মন্ত্র—এই মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত পাঠ করিতে হইবে। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে মহাপ্রলয় কালে পূর্ণামুক্তিতে শেষ দেহের সম্পূর্ণরূপে লয় হয় এবং জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা এই শ্রুতিমন্ত্রদ্বয় দ্বারা সমর্থিত হইল। ঐতরেয়—২।৪ মন্ত্র—এস্থলে বলা হইয়াছে যে সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বামদেব শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমর হইলেন। ঐতরেয়—৩।৪ মন্ত্র—ইহাতে বলা হইয়াছে যে বামদেব ঋষি জ্ঞানময় আত্মা দ্বারা এই লোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমর হইলেন। বামদেব সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি যে পরম মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্কর স্বামীও বামদেবের ঋষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যদি স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তবে যে বিদ্বান মাত্রই দেহ হইতে উৎক্রমণ করেন, তাহা শ্রুতি বিশ্বাসী সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেন—২।৪-৫ মন্ত্রদ্বয় পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে ধীর জ্ঞানিগণ সমুদায় বস্তুতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া অমর হন। সুতরাং ধীর ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ আছে। এই দুই মন্ত্র যাজ্ঞবল্ক্য কথিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৮।১০ এবং ৪।৪।৮ মন্ত্রদ্বয়ের সমর্থণ সূচক। কেন—৪।৯ মন্ত্র—ইহাতেও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মবিদ্ অনন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। সেইরূপ স্বর্গলোকই যে অধার্য্য অনন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ইতি-

পূর্ব্বেই বহু স্থলে কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই মন্ত্র হইতেও আমরা পাইলাম যে বিদ্বানেরও উৎক্রমণ আছে। প্রশ্ন—১।১০ মন্ত্র—এস্থলে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করেন. তাঁহারা উত্তর মার্গ দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন। ইহা হইতে কেহ পুনরাবর্ত্তন করে না। অতএব ইহা শেষ গতি। ইহার পূর্ব্ব মন্ত্রে অবিদ্বানের কথা আছে। তাহাদের পুনরাবর্ত্তন আছে। উহাকে পিতৃযান পথ বলা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য মন্ত্রে উল্লিখিত পথ দেবযান পথ। দুই প্রকার মানব—এক প্রকার লোক ইষ্টাপূর্ত্তকে কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন। পথও দুই প্রকার, যথা—পিতৃযান ও দেবযান। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞেরও উৎক্রমণ আছে। এই মন্ত্রেও ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা তপস্যার (আত্মার অন্বেষণের) কথা আছে। ইহাও পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্পর্কে লিখিত বিষয়ের সহিত তুল্যার্থবোধক মন্ত্র। প্রশ্ন—১।১৫-১৬ মন্ত্রদ্বয়—পঞ্চদশ মন্ত্রের শেষ ভাগে বলা হইল তাঁহাদেরই ব্রহ্মলোক যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে এবং যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ষোড়শ মন্ত্রেও বলা হইয়াছে যে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই, যাঁহাদের মধ্যে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই। সুতরাং জ্ঞানিগণের উৎক্রমণ আছে, ইহা সুনিশ্চিত। এস্থলে মায়ার অর্থ যদি মায়াবাদীর মায়া ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে যাঁহার মায়ার আবরণ খসিয়া গিয়াছে অর্থাৎ সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও উৎক্রমণ আছে। এস্থলেও তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্য-স্বরূপের উপাসনার উল্লেখ আছে। প্রশ্ন—৫।৫ এবং ৭ মন্ত্রদ্বয়—ইহা-দিগেতে বলা হইয়াছে যে যিনি ত্রিমাত্রা যুক্ত ওঁং অক্ষর দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি সূর্য্যলোক লাভ করেন। তিনি সাম মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। সেই জীবঘন হইতে তিনি পরাৎপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীর প্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞেরও উৎক্রমণ আছে। যিনি ওঁং ধ্যান করেন. তিনি নিশ্চিতই পরব্রহ্মের উপাসক। এই মন্ত্র এবং পূর্ব্বোল্লিখিত

ছান্দোগ্য ৮।৬।৫ মন্ত্র একার্থ বাচক। প্রশ্ন—৬।৭ মন্ত্র ইহাতেও ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী সামমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিগণ ওঁং মন্ত্র সাধনা দ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যিনি শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে জ্ঞানী সেই ওঁং মন্ত্র সাধনা দ্বারাই লাভ করেন। সুতরাং এই মন্ত্রও ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রমণ সমর্থন করিলেন। শ্বেতাশ্বতর—১।১৫-১৬ মন্ত্রদ্বয় পাঠে জানা যায় যে সত্য এবং তপস্যা দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অন্বেষণ করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করেন। এস্থলে দেখা গেল যে উপাসনায় সত্য ও তপস্যার শক্তি অত্যন্ত বলবতী। সুতরাং বিভিন্ন ঋষির উক্তিতে পাওয়া গেল যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্পর্কে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য। অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধা, সত্য ও তপস্যার উপাসনা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচারী হইয়া সত্যস্বরূপের উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধা সাধন করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাধন ভজন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম লাভ করিয়া দেহান্তে দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। উপরোক্ত মন্ত্র সমূহের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা গেল যে পার্থিব দেহান্তে ব্রহ্মবিদ্ ঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করেন। এই সকল সুস্পষ্ট মন্ত্র থাকিতে উৎক্রমণের নিষেধ কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না। পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন যে উল্লিখিত মন্ত্র সমূহ কোথায়ও অপর ব্রহ্ম, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতির কাহারও কোনই উল্লেখ নাই। প্রত্যেক মন্ত্রেই ব্রহ্মকেই (মায়াবাদের পরব্রহ্মকেই) লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্র সমূহের আলোচনায় আরও বুঝিতে পারা যায় যে বিবাদীয় মন্ত্রদ্বয় ভিন্ন অন্যান্য সকল মন্ত্রই সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে উৎক্রমণ সমর্থন করে। কেবল সেই দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যদি উহা-দিগকে বিচার কালে বাদ দেওয়াও হয়, তবুও যে উপনিষদ্ উৎক্রমণ সমর্থন করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে। বিবাদীয় মন্ত্রদ্বয়ের বক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি অন্যান্য বহু মন্ত্রে ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করিয়াছেন। সেই সকল মন্ত্রও উহাদের

সহিত একই অধ্যায়ভূক্ত; কোন কোনটী একই ব্রাহ্মণভূক্ত। একই ঋষি বিভিন্ন স্থলে বিপরীত মত প্রকাশ করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যখন অন্য সকল মন্ত্র সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই, তখন আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উৎক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রামাণ্য দ্বাদশখানি উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদদ্বয় প্রাচীনতম। উপনিষদ্ পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সেই উপনিষদদ্বয়ে উক্ত বহু তত্ত্ব পরবর্ত্তী উপনিষদে স্থানলাভ করিয়াছে এবং সেই সকল তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এক অর্থে পরবর্ত্তী উপনিষদ্ সমূহকে পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদে লিখিত কোন কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষ্যও বলিতে পারা যায়। সেই সকল উপনিষদ যদি একবাক্যে উৎক্রমণ সমর্থন করেন, তবে সেই ঋষিকৃত ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করিব। এ অবস্থায় আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আমরা অসমর্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার-৮।২৪-২৫ শ্লোকদ্বয়ে সুস্পষ্টভাবে দুই প্রকার গতির কথাই আছে। একটী ব্রহ্মবিদের জন্য এবং অন্যটী পুণ্যকারীদিগের জন্য। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ দেবযান পথে গমন করেন এবং পুণ্যকর্ম্মকারী পিতৃযান পথে গমন করেন। উহাদের পরের শ্লোকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পথদ্বয়কে অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান পথদ্বয়কে শাশ্বত বলা হইয়াছে। একটীতে মোক্ষলাভ হয় সুতরাং অনাবৃত্তি, অন্যটীতে পুনরাবর্ত্তন আছে। গীতার মূলে উপনিষদ। উহাকে উপনিষদের ভাষ্যও বলা যাইতে পারে। এইজন্য উহা প্রস্থানত্রয়ের একটী সুতরাং প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্কর স্বামী নিজের মত সমর্থনে গীতা হইতে বহুল উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি নিজ মতানুযায়ী গীতার ভাষ্যও প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থেও যখন সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ সমর্থিত হইয়াছে, তখন কি প্রকারে আমরা আচার্য্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি? এখন বেদান্তদর্শন অবলম্বনে দেখা যাউক যে শঙ্কর স্বামীর মত কতদুর যুক্তিযুক্ত। উক্ত দর্শনের সূত্রসমূহ উপনিষদের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সুতরাং উহাদের পুনরালোচনা করিব না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে মাত্র সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। ৪।২।১২ সূত্রকে আচার্য্য শঙ্কর দুইভাগ করিয়াছেন। যথা—"প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শরীরাৎ" এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্"। তিনি প্রথমটীকে পূর্ব্বপক্ষ এবং দ্বিতীয়টীকে উত্তরপক্ষ বলিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ এবং আচার্য্য নিম্বার্ক উভয়ই উহাদিগকে একটী সূত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বপক্ষ "প্রতিষেধাদিতি চেৎ" এবং উত্তরপক্ষ "ন. শরীরাৎ স্পষ্টহ্যেকেষাম্"। ভক্তিভাজন সন্তদাস বাবাজি শংকর স্বামী গঠিত সূত্র-দ্বয়ের নিম্নোদ্ধৃতরূপে সমালোচনা করিয়াছেন। "পক্ষব্যবর্ত্তন স্থলে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে 'তু' অথবা 'বা' অথবা 'ন বা' ইত্যাদি শব্দ উত্তর স্থানীয় সূত্রে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসূত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তাহা না করিয়া যেরূপভাবে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে সূত্রার্থ এইরূপই বোধ হয় যে সূত্রের 'স্পষ্টোহ্যেকেষাম্" অংশ "প্রতি-ষেধাদিতি চেন্ন শরীরাৎ" এই অংশের পোষক, তদ্বিপরীত-মত-জ্ঞাপক নহে। এই দুই অংশ বিভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দুই সূত্ররূপে যেরূপ শংকরাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রের কোন তারতম্য হয় না। এই সূত্রের গঠনের সহিত অপর দুইটী সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা—ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্র। দ্বাদশ সূত্র যথা—"ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক মতদ্বচনাৎ।" এই স্থলে "ভেদাৎ" এই অংশ পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তৎপর-স্থিত 'ইতিচেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন "ন" এবং তৎপরেই কেন নহে, তাহার কারণ, "প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" এই বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং "অপিচৈবমেকে" এই ত্রয়োদশ সূত্রদ্বারা উক্ত কারণের সমর্থন করিয়াছেন। এই চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের দ্বাদশ সংখ্যক সূত্র, যাহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে, তাহার গঠন পূর্ব্বোক্ত ৩য় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক সূত্রদ্বয়ের ঠিক অনুরূপ। পূর্ব্ব প্রদর্শিত রীত্যনুসারেই ইহার অর্থ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা,

"প্রতিষেধাৎ" এই অংশ পূর্ব্ব-পক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত "ইতিচেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বক্তা সূত্রকার বলিতেছেন "ম" এবং কেন নহে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন "শরীরাৎ", এবং তৎপরবর্ত্তী "স্পষ্টোহ্যেকেষাম্" বাক্যের দ্বারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব সূত্রের গঠনের বিচার দ্বারা সূত্রের উভয়াংশ একই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই অনুমিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর যে একাংশকে পূর্ব্ব পক্ষ এবং অপরাংশকে সেই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সূত্রের গঠন বিচারে অনুমান করা যাইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ভাবে এক সূত্রকে দুই সূত্রে বিভাগ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আচার্য্য শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মোপাসকের এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের জন্য বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৫৭ সংখ্যক সূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সর্ব্ববিধ বিদ্যারই এক ফল ব্রহ্ম প্রাপ্তি। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম সূত্রের ৪।৪।১৯ সূত্রের ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম সূত্রের ১।১।১১ সূত্রের ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। অবশেষে ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদের শেষ ১০টী সূত্রে এই সমস্যা সম্বন্ধে তিন জন সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের মত লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কৃত শ্রীভাষ্যের সংস্করণে উহা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "এই কার্য্যাধিকরণে প্রধানতঃ তিন প্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মতটী বাদরী নামক আচার্য্যের, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটী পূর্ব্বমীমাংসাকার আচার্য্যজৈমিনির, তৃতীয় সিদ্ধান্তটী স্বয়ং সূত্রকার বাদরায়ণের। তন্মধ্যে বাদরী নামক আচার্য্য বলেন— যাঁহারা কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ব্রহ্মলোকে গত সেই বিদ্বানেরা সেখানে ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে হিরণ্য গর্ভের সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, সর্ব্বব্যাপী পর-

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে আর কোথায়ও যাইতে হয় না, সুতরাং তাঁহাদের অর্চ্চিরাদি পথে প্রবেশেরও আবশ্যক হয় না। আচার্য্য জৈমিনি বলেন - যাঁহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাঁহাদিগকেই মার্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক লইয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাঁহাদিগকে লইয়া যায় না। সূত্রকার বাদরায়ন এ মতে সম্মত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন— যাঁহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই, অথবা যাঁহারা কেবল কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ কোন নিয়ম করা সম্ভব হয় না, কারণ, তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; শ্রুতিতে কার্য্য ব্রহ্মোপাসক ও পরব্রহ্মোপাসক উভয়েরই অর্চ্চিরাদি পথে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনর্ব্বার প্রবেশ না করা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় উপাসকেরই গতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ এই যে, যাঁহারা কোনপ্রকার জড়বস্তুকে প্রতীকরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ জড় বা জড় সংসৃষ্ট চিৎবস্তুর উপাসনা করেন, কেবল তাঁহাদেরই অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি হয় না; তাঁহারা অর্চ্চিরাদি পথে না যাইয়াই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। প্রতীক অর্থে একদেশ বা অংশ মাত্র। সুতরাং পরিপূর্ণ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে তদেক দেশ নামাদি জড় বস্তু স্বরূপে অবলম্বন বা ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতীকাবলম্বন বা প্রতীকোপাসক বলা হয়।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সূত্রকার প্রথমে অন্য দুই জনের মত উদ্ধার করিয়া উহাদের আংশিক ভাবে খণ্ডন করতঃ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর বাদরী আচার্য্যের মতকেই সূত্রকারের মত বলিয়াছেন। ইহা যে হইতে পারে না, তাহা সহজ বোধ্য। কারণ, প্রথমেই পূর্ব্বপক্ষ থাকে এবং সেই জন্য উহাকে পূর্ব্ব (প্রথম) শব্দে বিশেষিত করা হয়। শেষে উত্তর পক্ষ বা সিদ্ধান্ত পক্ষ হয়। আপত্তি প্রদর্শিত না হইলে উত্তর কি

প্রকারে হইবে? এইরূপ যুক্তির সারবত্তা আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি নিজ মত সংস্থাপনের জন্য প্রচলিত সুরীতির বৈপরীত্য সমর্থন করিয়াছেন। বাদরী সূত্রকার নহেন, বাদরায়ণই সূত্রকার। সুতরাং শেষ বক্তাকেই সূত্রকার বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে উভয়বিধ উপাসকেরই উৎক্রমণ আছে। ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পাদ কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সূত্রকার উৎক্রমণের পক্ষপাতী। আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে জীবন্মুক্ত সাধকের পক্ষে উৎক্রমণের কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন স্থান বিশেষে যাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং পার্থিব দেহান্তেই তিনি ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। তিনি এই কারণে গতির বিরুদ্ধে অত্যধিক ভাবে জোর দিয়াছেন। দেখা যাউক্, এই আপত্তিও কত যুক্তি সঙ্গত। আমরাও বলি যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিভু। তিনি নিত্যই সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্যই কোন দেশ বিশেষে গমন অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। কোন তীর্থ ক্ষেত্রে কোন বিগ্রহ দর্শন করিতে হইলে অবশ্যই গতির আবশ্যকতা আছে। সেই স্থানে না গেলে সেই বিগ্রহ দর্শন করা যায় না। কিন্তু কেবল ব্রহ্ম দর্শনের জন্যই গতির আবশ্যকতা নাই। তিনি নিত্যই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে আছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের একটী বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। তাহা এই যে ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ, তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে কোন সাধকেরই পৃথিবীতে থাকিয়া অনন্ত উন্নতির অনন্ত সাধনা হয় না বা হইতেও পারে না। এই অনন্ত উন্নতি সাধন জন্যই পার্থিব দেহান্তে অসংখ্য মণ্ডলে অসংখ্য দেহে বাস করিয়া অনন্ত সাধনা প্রত্যেক সাধকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দেহান্তে যে তিনি পরলোকে গমন করেন, তাহা সাধনার জন্যই, উহার অন্য কোন কারণ নাই। গতি গতির জন্য নহে, কিন্তু অসংখ্য প্রকার দেহে বাস করিয়া ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতি এবং ক্রম মুক্তি লাভ। মুক্তি অনন্ত

প্রকার এবং মহাপ্রলয় কালে পূর্ণামুক্তি ব্রহ্মকৃপায় লাভ হয়। আচার্য্য শংকরও বলিয়াছেন যে পার্থিব দেহে থাকিতে থাকিতে আংশিক ভাবে মাত্র অমৃতত্ব লাভ হয়। আমরাও বলি যে স্থূলতম দেহে থাকিতে থাকিতে বহু গুণে একত্ব লাভ করা যায় বটে, কিন্তু কোটী কোটী একত্বও অনন্ত একত্বের একত্বের নিকট মহাসমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম লাভের জন্য গতির প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের সাধনা সম্পূরণের জন্য অসংখ্য মণ্ডলে বাস অযৌক্তিক নহে। যদি বলেন যে পৃথিবীতেই সাধকোত্তমগণ কেন দেহান্তে পূর্ণামুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না তবে বলিতে হয় যে এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই বহু স্থলে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের ধারণাই যখন কোন মানবের নাই, তখন পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই কি প্রকারে তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত একত্বের অনন্ত একত্ব স্বরূপের সাধনা সম্পূর্ণ করিবেন? এইরূপ চিন্তা দ্বারা আমরা অনন্ত, বিরাট, সুমহান্ ব্রহ্মকে আমাদের সীমাবদ্ধ অন্তঃ-করণের মতনই ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়া লই, তাঁহার আর অনন্তত্ব, ব্রহ্মত্ব থাকে না। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে বিদ্যুৎলোকে উপাসকের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। যদি পৃথিবীতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত সাধকের পার্থিব দেহান্তে ব্রহ্মে লীন হইতে হয়, তবে উক্ত উপাসকগণই বা কেন বিদ্যুৎলোকের দেহান্তেই ব্রহ্মে লীন হইবেন না? তাঁহাদের কেন ক্রমোন্নতি, তাঁহাদের কেন মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা? ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক উপাসকেরই অনন্তপ্রায় কাল অসংখ্য মণ্ডলে অনন্ত সাধনা করিতে হইবে এবং মহাপ্রলয়কালে ভগবৎ কৃপায় ব্রহ্মে লীন হইবেন বা পূর্ণামুক্তি লাভ করিবেন। ব্রহ্মের গুণও অনন্ত, সুতরাং তাহা লাভ করিতে সাধনাও অনন্ত। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ দ্রষ্টব্য। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আচার্য্য শংকর যে ভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য গতির আবশ্যকতা মনে করেন, সেই ভাবে সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিতেও গতির প্রয়োজন নাই। মায়াবাদ অনুসারে সগুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের মায়োপহিত

এক চতুর্থাংশ, বিশ্বও ব্রহ্মের একপাদে স্থিত। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপী। সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিতে কোন দেশ বিশেষে যাইবার এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে প্রত্যেক পরমোন্নত মানবাত্মারই দৈহিক মৃত্যুর পরে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী স্বোপার্জ্জিত ধামে গমন করিতে হয়. অসংখ্য মণ্ডলে বাস করিয়া ক্রম সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে হয় এবং মহাপ্রলয় কালে শেষ কারণ-দেহের বিগমে ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের সহিত জীবের সোঽহং জ্ঞান কোন কালেই সম্ভব নহে। পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে উপনিষদ আমাদের মতই সমর্থন করেন। আমরা সীমাবদ্ধ জীব। আমরা সসীম বস্তু ভিন্ন প্রত্যক্ষ করি না। সসীম বস্তু ভিন্ন আমাদের সাধারণের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। এই অভ্যাসবশতঃ এবং আমাদের চিন্তার সুবিধার জন্য অসীম অনন্ত বস্তুকেও আমরা সসীম ও ক্ষুদ্র করিয়া লই। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই বলিলেই হয়। ঐ একই অভ্যাসবশতঃই বহু সাধক স্বয়ং নিরাকার পরব্রহ্মেরই নানারূপ সাকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া উহার পূজা অর্চ্চনায় তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহাতেই ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন হয়। যাঁহারা সাকার মূর্ত্তির পূজা করেন না, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ একই অভ্যাসবশতঃ পরব্রহ্মকে নিজের মনগড়া একটী ক্ষুদ্র বস্তু মনে করেন। তিনি যে স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন. কিন্তু সকল কারণের কারণ, এবং কারণেরও অতীত, তিনি যে সকল আদর্শের আদর্শ—অন্য সকল আদর্শ যাঁহার নিকট দাঁড়াইতেই সমর্থ নহে, এমন যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ ও শক্তির অনন্ত আধার হইয়াও অনন্ত গুণ এবং শক্তির অতীত পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও অনেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আদর্শ অনুসারে ক্ষুদ্র ভাবেই গড়িয়া লয়, এবং ক্ষুদ্র বস্তুর উপাসনা করে। অনেক সময় আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা পরমেশ্বরকে

নিজেদের হৃদয়ের প্রসার অনুসারে হাতগড়া সীমাবদ্ধ গুণরাশি ভূষণে ভূষিত করি। এমনি আমাদের দুর্দ্দশা। স্থূল, আমাদের হৃদয় এতই ক্ষুদ্র, যে পরব্রহ্মকেও মনোমত গড়াইতে এবং সসীমবস্তু ভাবে চিন্তা করিতে দ্বিধা বোধ করি না। আবার মানবের সহিষ্ণুতাও অত্যল্প। তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই অনায়াসেই অত্যধিক লাভের আশা পোষণ করেন—রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহেন, তাঁহারা প্রতীক্ষার অত্যধিক ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। এই অল্পায়াসে বা অনায়াসে ধর্ম্মের উচ্চতম শিখরে আরোহণের বাসনার জন্যই পৃথিবীতে ধর্ম্ম সাধনে বাহ্যাড়ম্বরের (ceremomies) অধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এই জন্যই জীবনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি, হৃদয়ের উদারতা, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা, নির্ভরতা প্রভৃতি গুণরাশির অত্যুন্নতিই যে ধর্ম্ম সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা মানব ভুলিয়া যান অথবা সেই দিকে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প দৃষ্টি দান করেন। কারণ, এই সকল কার্য্যে কঠোর আন্তরিক সাধনার একান্ত প্রয়োজন; কারণ, উহারা কখনই অনায়াস লভ্য নহে। মুক্তি লাভার্থ সাধনার কঠোরতা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন :—"যদি সুখ চাহ মনঃ, বহ আগে দুঃখ ভার। নতুবা সে সুখ-কণা মিলিবে না জেনো সার। যদি কমল তুলিতে, বাসনা করহ চিতে, প্রস্তুত হও কণ্টক জ্বালা, যাহা সহিবারে পার। রত্নাকর-রত্নচয়, যদি পাইতে আশয়, ত্যজ যাদোগণ ভয়, লবণ বারির আর। প্রণয় পয়োধি জলে চাহ ডুব্‌তে কুতুহলে, ভাবনা তরঙ্গ তালে, অতি দূরগম - সদা বিরহ সমীরে, তনুতরী মগ্ন করে, ইহা সহিতে যে পারে, প্রেম সুখ ঘটে তার। শিরোমণি ফণিনীর, চাহ যদি হও ধীর, বিকট দংশন তার, অতি জ্বালাময়—যদি সে জ্বালা সহিতে, পার তুমি কোন মতে, তা হ'লে পার পাইতে, সে মণি অতি সুন্দর।" অন্যান্য মহাসাধকগণও সাধনার কঠোরতা ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে বহু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।* আশা ও কল্পনারূপিনী

* জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ" অংশে উদ্ধৃত পরমর্ষি গুরুনাথের অন্য একটী সঙ্গীত এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

ভগ্নী দুইটী আমাদের হৃদয়ের চির সহচরী থাকিয়া যদিও আমাদের উপকারে রত, যদিও উহাদের সাহচর্য্য ভিন্ন আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হইত, তথাপিও বলিতে হইবে যে উহারা সময় সময় আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায় ও তাহার ফলে আমাদের বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতে হয়। আশা যে অনেক সময় মরীচিকায় পরিণত হয়, তাহা কে না জানেন? রাতারাতি বড় মানুষ হইতে গিয়া কপর্দ্দক শূন্য হইতে হইয়াছে, এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কল্পনা বাহুল্যে যে আমরা কত আকাশ কুসুম এবং শূন্যোদ্যান সৃষ্টি করি, কতই দিবাস্বপ্ন দর্শন করি, তাহা সকলেরই জানা আছে। সাধারণ ব্যক্তিবর্গ অল্পায়াস লভ্য ধর্ম্মই চায়। কিন্তু অত্যুন্নত সাধকগণ জানেন যে বহু বহু সাধনায়ও সিদ্ধির অবস্থায় সময় সময় উপনীত হইতে পারা যায় না। কত সাধকের হৃদয় হইতে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উত্থিত হইতে থাকে। আবার এমন সাধকেরও অভাব নাই যাঁহারা বিভূতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধনে সমর্থ বলিয়া নিজ দিগকে অত্যন্ত উন্নত মনে করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সেই বিভূতির খেলা ও তজ্জনিত অহংকার ও পরিতৃপ্তিই তাঁহাদিগকে উন্নতির উচ্চতর সীমায় উত্থিত হইতে দিতেছে না। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন যে "যাঁহারা বিভূতি অর্থাৎ সিদ্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাঁহাদিগের ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন অতি সুদুর্ল্লভ।" অতএব দেখা গেল যে আমরা সসীমকে চাই, সসীমকে নিয়াই থাকি এবং অল্পায়াসে ধর্ম্মের শীর্ষ সীমায় আরোহন করিতে বা পূর্ণামুক্তি লাভ করিতে চাই। এমন কি, আমরা অত্যধিক সাধনা না করিয়াই অনন্ত কালের সাধনীয়া পূর্ণামুক্তি পার্থিব দেহে থাকিতে থাকিতেই প্রত্যাশা করি। সুতরাং আমাদের স্বভাব যখন এইরূপ ভাবে গঠিত, তখন ইহাও কল্পনা করা বা আশা করা অসম্ভব নহে যে অল্পায়াসেই সেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণনিধান, সেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত শক্তির আধার, সেই অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত আমরা সম্পূর্ণ রূপে একত্ব লাভ করিব অথবা তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মতুল্য বোধ করিব বা সোঽহং জ্ঞান

লাভ করিব। উক্তরূপ মানব মনের গতির জন্যই অজ্ঞাতসারেই অনন্ত কালের আরাধ্য পরমারাধ্য পরব্রহ্মকে, অনন্ত কালের ভক্তি-ভাজনকেই সোহহং জ্ঞান করিয়াছি বলিয়াই কেহ কেহ প্রচার করেন। কিন্তু সেই অবস্থা যে সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব, তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি। অবশেষে বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ এবং তিনি নিত্য অশরীরী। আর জীব দেহধারী সুতরাং সীমাবদ্ধ। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ লাভার্থ প্রয়াসী বটেন, কিন্তু সেই অনন্ত কাল সাধনের ধনকে, সেই পরমরতনকে সমর্ণ অভেদ জ্ঞান বা সোহহং জ্ঞান করিতে তিনি অসমর্থ। কোন সাধক তাঁহার স্বাবলম্ব্য গুণের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই ঐ গুণের চরমোৎকর্ষ স্থান অর্থাৎ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয়। এই ভাবে যে ব্রহ্ম দর্শন, তাহা তাঁহার আংশিক দর্শন মাত্র, উহা কখনই পূর্ণব্রহ্ম দর্শন নহে। কারণ, ব্রহ্মের একটী মাত্র গুণে সাধক তখন একত্ব লাভ করেন। "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশে আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে তুল্যই তুল্যকে জানিতে পারে। অসমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে নিম্নতর ব্যক্তি কখনই উন্নততরকে সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে না। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম দর্শনের অর্থ ব্রহ্মের অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে একত্ব লাভ করা অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বগুণে, সর্ব্বশক্তিতে, সর্ব্বপ্রকারে সাধকের সমতা লাভ করা। অতএব সাধকের অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারেন না বা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সমতা লাভ বা সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন হইবে যে হিন্দু শাস্ত্র বলেন যে একবার মাত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই হইল। তাঁহার আংশিক দর্শনের কথা বলা হয় কেন? এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, নিম্নে আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। আমরা আমাদের সম্মুখের বস্তুটীকে দেখি বটে, কিন্তু যদি একটু চিন্তা করা যায়, তবেই বুঝিতে পারিব যে উহার কতটুকু অংশ আমরা একবারে দেখিতে পাই। এই

বিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের Epistomology অংশে যে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমরা কখনও জড় পদার্থটীকে একই সময় সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না। এক কথা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে আমরা তৃণ হইতে পর্ব্বত, মহাসমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি যতকিছু জড় পদার্থ আজন্ম দেখিয়াছি বা দেখিতেছি, তাহাদের একটীকেও আমরা অদ্য পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দেখি নাই। যখন জড় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেই আমরা এতদূর অসমর্থ, তখন ব্রহ্মকে, অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎকে অর্থাৎ অনন্ত অনন্ত অনন্তকে অর্থাৎ যাঁহার গুণ গণনে অনন্ত এবং যাঁহার সেই অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণ অনন্ত ভাবে অনন্ত উন্নত, তাঁহাকে—সেই অবাঙ্‌মনসোঽহগোচরকে আমরা একবারেই সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইব না, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এই ত গেল জড় পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের অক্ষমতা। এখন আমরা একটী মানব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। আমাদিগের সাধারণের ধারণা এই যে আমরা মানবকে দেখি, সুতরাং তাহাকে সম্পূর্ণ রূপেই দেখি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সত্য নহে। তাহার শরীর জড় পদার্থ, সুতরাং জড় পদার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তাহার জড় দেহ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাহার শরীরকে একবারে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। এখন অন্য ভাবে চিন্তা করা যাউক্। যদু নামক ব্যক্তিকে তাহার মাতা পিতা স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহার স্ত্রী তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাহার পুত্র কন্যা ভক্তি ভাবে দেখেন, তাহার বন্ধু প্রণয়ের ভাবে দেখেন, তাহার ভ্রাতা-ভগ্নীগণ তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, ইত্যাদি প্রকারে তাহার প্রতিবেশী, সমাজস্থ ব্যক্তি এবং দেশস্থ ব্যক্তি-বর্গ, জ্ঞানী, ভক্ত এবং কর্ম্মিগণ তাহাকে নানা ভাবে, বিভিন্ন প্রকারে দেখেন। অবশ্য সকল প্রকার ব্যক্তিগণই সাধারণ ভাবে তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিতে এক একটী বিশেষ ভাবের বিশেষ রূপ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য সাধনা করিলে সেই ব্যক্তিকে একাধিক ভাবে দেখা

যাইতে পারে, কিন্তু একজনে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে কখনও দেখেন না, প্রথম বারে ত নহেই। পরমপিতারও দর্শনও সেইরূপ। কেহ প্রেমে, কেহ জ্ঞানে, কেহ সরলতায়, কেহ বা পবিত্রতায় একত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। সকল প্রকার পরমোন্নত সাধকই তাঁহাদের অবলম্ব্য বিশেষ বিশেষ গুণ ব্যতীত অর্থাৎ যে যে গুণে তাঁহারা একত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সেই গুণ ব্যতীত পরমপিতার অন্যান্য গুণরাশি সম্বন্ধেও কিছু কিছু উন্নতি লাভ করেন সত্য, কিন্তু এক একটী গুণে একত্ব লাভ কালীন তাঁহারা অনন্ত গুণরাশিতে একত্ব লাভ করেন না। যথা কোন পরমোন্নত সাধক পরমপিতার প্রেম গুণে একত্ব লাভ করিলেন। সেই কালে তিনি জ্ঞান, সরলতা, একা-গ্রতা, প্রভৃতি গুণে উন্নত হইবেন বটে, কিন্তু সেই সকল গুণে তিনি একত্ব লাভ করিবেন না। অর্থাৎ সাধক পরম পিতার অন্যান্য গুণ-রাশির পরমোন্নত অবস্থা অর্থাৎ সর্ব্ব গুণে একত্ব লাভের অবস্থা একই কালে লাভ করিবেন না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সাধক যতই উন্নত হইবেন, তিনি ততই নানা গুণে ক্রমশঃ একত্ব লাভ করিতে থাকিবেন এবং পরম পিতার দর্শনও ক্রমশঃই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। আমরা এই বিষয়টী আরও এক ভাবে চিন্তা করিতে পারি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে M.A., M.Sc., পরীক্ষার জন্য নানা বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ ইংরেজী, কেহ বাঙ্গালা, কেহ বা সংস্কৃত সাহিত্য, কেহ গণিতে, কেহ বিজ্ঞানে, কেহ বা দর্শনে ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা দেন। আবার এই সকল বিষয়েও বিভিন্ন Group আছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তবে তিনি সেই বিষয়েই ততটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গণিত সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যা হয়ত একটী Matriculate এর ন্যায়, অথবা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক। আবার বিপরীত ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে গণিতে First Class First M. Sc এর ইংরেজী সাহিত্যে বিদ্যা First Class First M. A. in English এর বিদ্যা হইতে অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাঁহারা Doctorate

উপাধি লাভ করেন, তাঁহারা এক এক বিষয়ে Specialist হন। তাহাদের বিষয়ের সংখ্যা অগণ্য বলিলেই হয়। এই সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ এক একটী বিষয়ে M-A. বা M. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অথবা এক একটী বিষয়েই specialist হইয়া Doctorate উপাধি লাভ করেন। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে কেহ কেহ বিভিন্ন বিষয়ে এবং সময় সময় বিপরীত বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। পরমপিতার গুণরাশিতে একত্ব লাভও ঐ প্রকারেই সম্ভব হয়। সাধক এক একটী গুণে, সময় সময় বিপরীত গুণে একত্ব লাভ করিতে থাকেন। পৃথিবীতে অপরা বিদ্যার বিষয় যেমন অসংখ্য এবং কেহই সকল বিদ্যার একই সময়ের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র জীবনেও সম্পূর্ণ ভাবে পারদর্শী হইতে পারেন না, সেইরূপ একই সময় দূরে থাকুক, সমগ্র জীবনেও পরম পিতার অনন্ত গুণে কেহই একত্ব লাভ করিতে পারেন না। পৃথিবীতে প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার অপরা বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিতে যখন আমরা এতই শক্তিহীন, তখন ব্রহ্মের অনন্ত গুণ রাশির ধারণা করিতে অর্থাৎ অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিতে যে আমরা আরও অশক্ত হইব, তাহা বলাই বাহুল্য। একই সময়ে সেই অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব ব্রহ্মের অনন্ত গুণ সাধনায় সাধকের যে অনন্ত প্রায় কাল ব্যয়িত হইবে, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে? ইতিপূর্ব্বে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের উক্তি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে সাধক পরলোকে ব্রহ্ম লাভ করিয়াও ব্রহ্মলোক সমূহে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত লয়ের জন্য এই প্রতীক্ষা কেন? সেই প্রতীক্ষার কারণই এই যে তিনি কোন এক গুণে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু তাঁহারও ক্রমশঃ নানা গুণে একত্ব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম অবস্থা লাভ করিতে হয়। নতুবা অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। কেনোপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই যে সাধক কখনও ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে পারেন

না, তাঁহার সম্বন্ধে সাধকের আংশিক জ্ঞান হয় মাত্র। অনন্তের কি কখনও অন্ত পাওয়া যায়? তবে তাঁহারই অনন্ত দয়ায় মহাপ্রলয় কালে সকলকে ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্তি দিবেন, তাহাতেই তাঁহাতে লয় সম্ভব হয়। অনন্তকে যদি সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যাইত, তবে ত তিনি ফুরাইয়া যাইতেন, তবে ত তিনি পুরাতন হইয়া যাইতেন, তবে আর সেই সাধক তাঁহাকে আর চাহিতেন না। ভক্ত গাহিয়াছেন। "অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর? (কালী-নাথ ঘোষ)" তিনি নিত্য অনাদি অনন্ত সুতরাং তিনি পুরাতন হইয়াও নিত্যই নূতন। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন:—"তুমি সুন্দর সুন্দর, মধুর মধুর, চির নূতন তুমি হে। (মনমোহন চক্রবর্ত্তী)"। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কথা চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে ইহাতে ক্রম প্রণালী সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ক্রম বাদে কিছু হয় নাই বা হইবেও না। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ বিষয়ে এক মত। জড় বিজ্ঞানও জড় রাজ্য সম্বন্ধে সেই একই মত প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিও যে একই ক্রম প্রণালীর অন্তর্গত, তাহাও সাধক জীবন অনুসন্ধান করিলেই প্রমাণিত হইতে পারে। জড় রাজ্য ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে একই বিধান কার্য্য করিতেছে, তাহাও অন্যান্য স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক ব্রহ্ম, এক বিধান, এক বিশ্ব, ইহা অতি সত্য। সর্ব্বকার্য্যেই যখন ক্রম প্রণালীর বর্ত্তমানতা, তখন অনন্ত অনন্ত অনন্ত রূপী পরব্রহ্মকে একবারেই সাধক সম্পূর্ণ রূপে দেখিবেন, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইতি-পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অনন্তের জন্য সাধনার অনন্তপ্রায় কালের প্রয়োজন, ইহলোকে বারংবার জন্ম গ্রহণ দ্বারা এবং পরলোকে অত্যন্ত দীর্ঘকাল বাসে ভগবৎ কৃপায় সেই সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায়। পরব্রহ্ম সামান্য বৃক্ষ ফল নহেন যে সাধক তাঁহাকে চাহিবা মাত্রই সম্পূর্ণ ভাবে লাভ করিবেন। তিনি ক্ষুদ্র ফল নহেন যে সাধক ইচ্ছা মাত্র তাঁহা গলাধঃকরণ করিবেন। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বা বৃহত্তম। তাঁহাতেই বৃহত্ত্বের নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সোহহংবাদীও ব্রহ্মকে অনন্তই বলেন। যখন একটী তৃণকেও আমরা একবারে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, যখন একটী ক্ষুদ্র মানবকেও আমরা সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাই না, যখন আমরা আমাদের নিজ দিগকেও একবারে দেখিতে পারি না, তখন প্রথম দর্শনেই কি প্রকারে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে দর্শন করিব? ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। পাঠক একটী কথা মনে রাখিলেই সহজ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন। তাহা এই যে জীবাত্মা যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পর-ব্রহ্মের নিকট তিনি চিরকাল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। পরমর্ষি গুরুনাথ নিখিল জগতের প্রতি অভেদ জ্ঞানকারী সাধকের পরিপক্কাবস্থা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:—"এই সুপবিত্র মহত্তম অবস্থায় নিরন্তর পীযুষরসাধিক অনুপম আনন্দ-রস-প্রবাহ তদীয় হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, সুতরাং শারীরিক ক্লেশ, মানসিক সন্তাপ ও অন্যান্য রূপ যাতনা উপস্থিত হইতে না হইতেই প্রজ্জলিত অনলে তৃণ কণার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। আহা! এতাদৃশী অবস্থা কি পরমানন্দ-সন্দোহসঙ্কুল। কি মধুময়ী! সুধাময়ী!! ইহার স্মরণেও হৃদয় আনন্দরসে আপ্লাবিত এবং নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রু-সলিলে পরিপূর্ণ হয়।"* "হায়! এই অনন্ত-প্রায় সুখময়ী অবস্থায়ও উল্লিখিত সাধকগণের হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দন-ধ্বনির বিরাম থাকে না। তাঁহারা সেই অনন্তাতীত পরমপিতা পর-মেশ্বরকে অভেদ-জ্ঞান করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন, পিতার নিকট নিরন্তর কঠোর রোদন করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি করুণ ভাবে পরিপূর্ণ করেন, সেই অপূর্ণ-ভাব-পরিপূরিত রোদন-নিনাদে কত কঠোর অবিশ্বাসীর হৃদয় অবিশ্বাস-মুক্ত হয়, পাষণ্ডের হৃদয় বিগলিত হয়, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, নদী, হ্রদ, সাগরাদিও পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। পাপী পাপ-রাজ্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে আনীত হয়, দাম্ভিকের প্রবল দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়, দৈত্য-দানবাদি

* নিখিল জগতের প্রতি সোহহং জ্ঞানকারীর অবস্থা সম্বন্ধে "ইতর জীবের কথা" অংশে উদ্ধৃত অংশও এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

দেবভাব ধারণ করে এবং দেবগণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া জগতের গৃহে গৃহে নৃত্য করিতে থাকেন।” “বহু চেষ্টার পর যদি ঈশ্বর-প্রেম-সম্পন্ন সাধকের প্রতি প্রেমময় পরমেশ্বর প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই সৌভাগ্যবান্ সাধক স্রষ্টার প্রতি অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু সমর্ণ অভেদ জ্ঞান যে কখনও হইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্রষ্টার প্রতি কখনও সোহহং জ্ঞান জন্মে না, কারণ, সমর্ণ বা পার্খিব অভেদ-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই সোহহং জ্ঞানের নামান্তর। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা ।” পরমোন্নতদিগের মধ্যে অত্যুন্নত পরমর্ষিগণেরই যখন সমর্ণ অভেদ জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান লাভ করিতেই অসীম প্রায় সাধনা করিতে হয়, তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে পরব্রহ্মের সম্পূর্ণ দর্শন সহজ সাধ্য ত নহেই, কিন্তু একান্ত অসাধ্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অধমর্ণ অভেদ-জ্ঞান এবং সমর্ণ অভেদ জ্ঞানের পার্থক্য অত্যধিক এবং অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ না করিলে অর্থাৎ সমর্ণ অভেদ-জ্ঞান না হইলে অনন্ত একত্বের একত্বে যিনি নিত্য বিভূষিত, সেই অনন্ত অসীম সুন্দরকে পূর্ণ ভাবে দর্শন করা যায় না। এস্থলে প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মদর্শন কি কখনও সম্পূর্ণ হয় না। জীব কি কখনও অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত তুল্যতা লাভ করিতে পারিবেন না? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই এক প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছি যে জীবের পক্ষে অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ বা পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন কখনই হইতে পারে না। ব্রহ্মের পূর্ণ দর্শনের অর্থ যখন পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুল্যতা লাভ, তখন পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে দুই তুল্য ব্রহ্ম—এক অশরীরী পূর্ণ ব্রহ্ম (যিনি সর্ব্ববাদিসম্মত) এবং অন্য জন দেহী-পূর্ণ-ব্রহ্ম তখন বর্ত্তমান থাকিবেন। এরূপ বহু সাধক পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন করিলে বহু দেহী-পূর্ণ-ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকিবেন। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পূর্ণ-ব্রহ্ম-দর্শন বা সোহহং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আবারও প্রশ্ন হইবে যে মহাপ্রলয়েও কি সাধক-

দিগের পক্ষে সোঽহং জ্ঞান লাভ হইবে না। যদি তাহাই না হয়, তবে অসংখ্য মহোন্নত, পরমোন্নত সাধকদিগের এই অসীম প্রায় সাধনার পরিণতি কোথায় ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান লাভ কোনও কালে কোন অবস্থায়ই সম্ভব নহে। মহাপ্রলয়েও উহা অসম্ভব। তবে মহাপ্রলয়ে সর্ব্ব জীব ক্রমশঃ ব্রহ্মের অপার কৃপায় ত্রিবিধ দেহের বিগমে তাঁহাতে লয় হইতে থাকিবেন। ইহা দ্বারা কেহ বুঝিবেন না যে মহাপ্রলয়ে জীবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। এস্থলে "সৃষ্টির সূচনা" এবং "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত বিষয় আমরা স্মরণ করি। অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলার উদ্দেশ্যই এই যে ব্রহ্ম অনন্ত প্রায় জীবকে ক্রমশঃ উন্নতি দান করিতে করিতে তাঁহাতে লয় করিবেন অথবা তিনি প্রত্যেক জীবকে নিজেকে ক্রমশঃ দান করিতে করিতে পরমোন্নত হইতে পরমোন্নত করিয়া মহাপ্রলয়ে তাঁহারই মধ্যে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ তিনি জীবাত্মাদিগকে ত্রিবিধ দেহ হইতে মোচন করিবেন অথবা পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্ব নিঃশেষে শেষ করিবেন অথবা ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের আর কোনও রূপ পৃথক্ অস্তিত্বের চিহ্ন রাখিবেন না। এই কার্য্যে যে অনন্ত প্রায় কালের আবশ্যকতা, তাহাও ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং ইহা অতি সহজেই অনুমেয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেক জীব অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধানে ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবেন এবং তাঁহারই কৃপায় অনন্ত প্রায় উন্নতি লাভ করিবেন। অবশেষে প্রত্যেক জীবই অনন্ত একত্বের একত্ব সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই সাধনায়ও যে ধারণাতীত কাল ব্যয়িত হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। এই সাধনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত কৃপাময়ের অপার কৃপায় প্রত্যেক জীব শেষ কারণ-দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন। জীবের পক্ষে দেহে থাকিতে থাকিতে উক্ত সাধনা কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে দুই বা ততোঽধিক ব্রহ্মের একই কালে বর্ত্তমানতার আপত্তি উত্থাপিত হইবে। যদি বলেন যে পূর্ণ-ব্রহ্ম-দর্শন ও শেষ-দেহ-লয়,

একই সময় (simultaneously) সংঘটিত হইতে পারে, তবে বলিতে হয় যে ক্ষণেকের তরেও দুই জন ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা অসম্ভব। ত্রিবিধ দেহের বিগমেই পূর্ণামুক্তি, পূর্ব্বে নহে। পূর্ণ-ব্রহ্ম-দর্শনই যদি শেষ-দেহ-লয়ের কারণ হয়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে কারণ ও কার্য্য পূর্ব্বে এবং পরে বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং পলকের তরে হইলেও দেহী দেহাবদ্ধাবস্থায়ই পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন করিলেন এবং সেই হেতুই পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহা যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যাহারা অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে পূর্ণ ব্রহ্মই দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যদি জীব দেহে থাকিতে থাকিতেই ব্রহ্মের পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, সুতরাং তিনি সোহহং জ্ঞান লাভ করেন। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ণ ব্রহ্মের পক্ষে জড়ীয় দেহ ধারণ করার কল্পনাও সত্য। কারণ, দেহে থাকিতে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিলে পূর্ণ ব্রহ্মের পক্ষে দেহ ধারণে কোনই দোষ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা যে অসম্ভব, তাহা সকল ব্রহ্মবাদীই স্বীকার করিবেন। সোহহংবাদীও তাহা অস্বীকার করিবেন না। মায়াবাদে বলা হয় যে ব্রহ্মদর্শনে মোক্ষ হয়। এই মোক্ষের অর্থ কি? মোক্ষ অর্থে যদি অজ্ঞান বা মোহ হইতে মুক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানের বা মোহের সম্পূর্ণরূপে বিলোপ বুঝায়, তবে তাহা দেহে থাকিতে কিছুতেই সম্ভব হয় না। কারণ, কোনও রূপ দেহে থাকিতেই "আমি", "তুমি", "ইনি", "উনি" ভাব অর্থাৎ দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ রূপে নিরসন হইতে পারে না। আর মোক্ষ অর্থে যদি উপাধির বিলোপ বুঝায়, তবে তাহাও দেহ থাকিতে থাকিতে সম্ভব হয় না। কারণ, উপাধি ত দেহ আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান। যতকাল দেহ, তত কাল উপাধি বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক না কেন, ব্রহ্মের পূর্ণ দর্শন জীবের পক্ষে দেহে থাকিতে সম্ভব নহে। ইতিপূর্ব্বে উপনিষদের সমর্থন সহ প্রদর্শিত হইয়াছে যে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে লয় হওয়াও অসম্ভব এবং

পার্থিব (স্থূলতম) দেহের অবসানেই ব্রহ্মে লয় হওয়া অসম্ভব। সর্ব্ব-শেষে বলিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের নিত্য স্বভাবই অনন্ত অসীমত্ব। সেই অনন্তত্ব কেবল আমাদের অধার্য্য অনন্ত নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনন্ত। সেই অনন্তের কেহই অন্ত পান না বা পাইতেও পারেন না। জড় জগতের সীমা আমরা ধারণা করিতে না পারিলেও উহা যে সীমাবদ্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদও বলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশে অবস্থিত, সুতরাং জড় জগতের যাহা কিছু, তাহাই সীমাবদ্ধ, সুতরাং দেহও সীমাবদ্ধ। জীবাত্মা যে দেহে আবদ্ধ তাহা "আত্মা ও জড়ের মিলন", "গুণ বিধান", "জড়ের বাধকত্বের কারণ", এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ চতুষ্টয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সসীম-দেহবাসী আত্মাও সসীম অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। কারণ, জীবাত্মা দেহ ভিন্ন বাস করিতে পারেন না। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম দেহযোগে ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আবার দেহ ব্যোম প্রধানই হউক্ অথবা একমাত্র ব্যোম দ্বারাই প্রস্তুত হউক্, উহা কখনই বিস্তারিত হইয়া ব্যোম রাজ্য অর্থাৎ বিশ্বকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা সর্ব্বদাই জড় সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। ভগবৎ কৃপা লাভে যখন তিনি শেষ দেহ হইতে বিমুক্ত হন, তখনই কেবল তখনই তিনি অনন্ত অসীমত্ব বা পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সেই অবস্থায় তিনি "তিনি" ভাবে অর্থাৎ জীবাত্মা ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন না। তখন তাঁহার দেহাবদ্ধতা ফুরাইয়া যাইবে, সুতরাং পৃথক্ অস্তিত্বও বা ভাসমানত্বও সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইবে, সুতরাং জীবত্বও থাকিবে না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে জীবাত্মা দেহে থাকিতে থাকিতে অসীমত্ব লাভ করিতে পারেন বটে, তাঁহার অসীমত্ব বিশ্বব্যাপীও হইতে পারে, কিন্তু জড় সংযোগ থাকা পর্য্যন্ত তিনি কখনও তাহা অনন্ত অসীমত্বে পরিণমন করিতে পারেন না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সম্পর্কে পরমর্ষি গুরুনাথ কৃত "দেহাবদ্ধ

আত্মার অসীমত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। অতএব এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে জীবের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। এত সময় আমরা যুক্তি যোজনা দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান কোনও কালে সম্ভব নহে। এখন পাঠককে সহজ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান একান্ত অসম্ভব। আমরা পৃথিবীতে অল্পাধিক আড়াই শত কোটী নর নারী বাস করি। আমরা সকলেই একমাত্র বিশ্ব স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট। তিনিই আমাদের একমাত্র অনন্ত প্রেমময় জন্মদাতা পিতা। কিন্তু আমরা যদি অনুসন্ধান করি, তবেই বুঝিতে পারিব যে লক্ষের মধ্যে একজনও পরমপিতার পুত্র বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করেন না। মুখে "অতএব", "সুতরাং" প্রভৃতি দ্বারা আমরা কেহ কেহ পরমপিতার সন্তান বলিয়া মনে করি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন সত্য ভাবে পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া এবং নিজেকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া জ্ঞান করি। তাঁহাদের মধ্যে কতজন সেই অনন্ত গুণ নিধির উপযুক্ত পুত্র বলিয়া নিজ হৃদয়ে সত্য ভাবে জ্ঞান করেন। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা নিজদিগকে ব্রহ্মের তুল্য বোধ করা দূরে থাকুক, তাঁহার সন্তান বলিয়াও সত্য ভাবে ধারণা করিতে পারেন না বা সন্তানের উপযুক্ত হন নাই, সুতরাং ব্রহ্মের সন্তানত্বের দাবী করিতে পারেন না। যাঁহারা মহোন্নত বা অত্যুন্নত হন, তাঁহারাও যে ব্রহ্মকে আত্মতুল্য মনে করিতে পারেন না, ইহা ইতি পূর্ব্বেই নানা ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং কোন মানবই যদি সোঽহং জ্ঞান লাভ না করিতে পারেন, তবে কে সোঽহং জ্ঞান করিবেন? এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের সহিত সোঽহং জ্ঞান অসম্ভব। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রস্তর কণা হইয়া অনন্ত হিমাচলকে কখনই আত্মতুল্য বোধ করিতে পারি না। যিনি বড় হইয়াছেন, তিনিও যে সোঽহং

বলিতে পারেন না, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদেশ। প্রশান্ত মহাসাগর জলভাগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর। কিন্তু উহারা কি ক্রমান্বয় বলিতে পারে যে আমিই পৃথিবীর মধ্য ভূভাগ বা জল ভাগ। কখনই নহে। মহাপ্রলয়কালে যখন সকলেই নামরূপ ত্যাগ করিবে, তখন সকলেই একাকার হইবে। সুতরাং আর কোন পার্থক্য থাকিবে না। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে যখন সকল জীব শেষ দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইবেন, তখন আর পৃথক্ অস্তিত্বের চিহ্নও থাকিবে না, সকলেই একাকার হইবেন অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকিবেন। তখন কে কাহাকে সোঽহং বলিবেন? এখন শব্দ প্রমাণ সাহায্যে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক্। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে উপনিষদ্ সোঽহং বাদ স্বীকার করেন না। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য সম্বন্ধে আলোচনায়ও আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই; কিন্তু জীব দশায় তিনি ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমরা আরও দেখিয়াছি যে অন্যান্য বিষয়েও উপনিষদ্ আমাদের মত সমর্থন করেন। যাঁহারা বলেন যে উপনিষদ্ সোঽহং বাদও বলেন, তাঁহারা বিষম ভুল করিতেছেন। স্থূল কথা এই যে ঋষিগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে জীবাত্মার স্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ একই এবং ব্রহ্মই প্রেমলীলার্থ বহু ভাবে, ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি স্বরূপে সম্পূর্ণ রূপে এক থাকিয়াও বাস্তবে নিজেকে বহু ভাবে, অংশ ভাবে, ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অবিচ্যুত হইয়াও বিচ্যুত ভাবে ভাসমান। এই জন্য স্বরূপে উভয়ই এক অখণ্ড সুতরাং অভেদ, কিন্তু বাস্তবে ভেদ। এই তত্ত্ব "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিবৃত হইয়াছে। এই তত্ত্বাবলম্বনে সকল ঔপনিষদিক মন্ত্রের ধর্ম্ম সঙ্গত, যুক্তি সঙ্গত, সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করা যায়, কোন কষ্ট কল্পনা বা মত বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও চলিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্র সমষ্টিগত ভাবে চিন্তা করিলে উহা সোঽহং বাদের বিরোধী। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বিশেষ ভাবে ভেদাভেদ বাদ প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা সোহহং বাদের বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সোহহং বাদ সমর্থন করেন না। খ্রীষ্টদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন "I and my Father are one". এই উক্তিও যে জীবাত্মার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। নতুবা তিনি অন্যান্য স্থলে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পরমেশ্বরকে পিতা জ্ঞানেই করিয়াছেন। তিনি একস্থানে ইহাও বলিয়াছেন "Why callest thou me good. If is my Father who alone is Good. তিনি বহু স্থলে নিজেকে Son of man বলিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্র পিতার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ রাত্রির ঘটনাবলি ও প্রার্থনা গম্ভীর ভাবে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি তাঁহার পরমপিতার নিকট নির্ভরশীল প্রার্থনাকারী। আবার তাঁহার শেষ বাক্যেও (Father, forgive them, for they know not what they are doing) তিনি তাঁহার অনন্ত স্নেহময় পিতার নিকটই "পিতা" বলিয়াই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এস্থলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে খ্রীষ্টদেব পরমপিতার ভক্ত, পরমপিতার প্রতি প্রেম সম্পন্ন এবং পরমপিতার প্রতি নির্ভরশীল সুসন্তান ছিলেন। যাঁহার এই তিনটী গুণ থাকে, তিনি কখনও পরমপিতাকে সোহহং বলিতে পারেন না। খ্রীষ্টদেবের স্বর্গারোহণের বহুকাল পরে খ্রীষ্ট জগৎ যে Trinity (ত্রিত্ববাদ) প্রচার করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই। খ্রীষ্টানগণও God the Father, God the son, and God the Holy Ghost এই ত্রিত্ববাদ প্রচার করেন। সুতরাং পরমেশ্বরের সহিত খ্রীষ্টদেবের পিতাপুত্র সম্পর্ক যে বর্ত্তমান, তাহা তাঁহারাও অস্বীকার করেন না। পিতা পুত্রের সম্পর্ক স্বীকৃত হইলেই এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হইতে হইবে যে খ্রীষ্টদেব পরমেশ্বরের সহিত সোহহং জ্ঞানে আবদ্ধ নহেন কিন্তু তাঁহারই অন্তর্গত মাত্র। এস্থলে আরও বলিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টানগণ নিজদিগকে এবং পৃথিবীর সকল নর নারীকে পরমপিতার পুত্র কন্যা বলেন, কিন্তু তাঁহারা যে

পরমপিতার সহিত সোঽহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ইহা কখনও ঘুণাক্ষরেও বলেন না। এই ত্রিত্ববাদ হিন্দুদিগের ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃজন, পালন ও লয়কারিণী শক্তিত্রয়ীর প্রতীক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্বন্ধে উক্তি হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ পুরাণে যেমন এক পরমেশ্বরকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, খৃষ্টানগণও সেই একই পরমেশ্বরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে Holy Ghost বলিতে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি একজন পারলৌকিক মহাত্মা। তিনি খ্রীষ্টদেবের সহায় স্বরূপ ছিলেন বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রত্যেক মহাপুরুষেরই এক একজন সাহায্যকারী পারলৌকিক মহাত্মা থাকেন। মহাপুরুষ মহম্মদেরও একজন পারলৌকিক মহাপুরুষ সহায় ছিলেন। তাঁহার নাম Zebrail। তিনি আত্মাকর্ষণে মহাপুরুষ মহম্মদের নিকট বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। এস্থলে "সত্য ধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল! "দেবদেবীর প্রতি ভক্তি করিবে। দেব দেবীগণ অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি এবং খৃষ্টানাদি শাস্ত্রানুসারে পবিত্র আত্মার প্রতি ভক্তি করিবে। ইঁহারা সকলেই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ ও আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছেন এবং পরমানন্দময় ধামে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন।" Holy Ghost শব্দের সরল শাব্দিক অর্থ ধরিলেও বুঝিতে পারা যায় যে তিনি একজন পারলৌকিক পবিত্রাত্মা বা মহাত্মা। Ghost এর অর্থ পৃথিবী হইতে পরলোকগত আত্মা। খ্রীষ্টান জগতে সকল খ্রীষ্টানগণই এই ত্রিত্ববাদ স্বীকার করে না। এই মত যে ভক্তির আতিশয্য প্রসূত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মুসলমান ধর্ম্মে মহাপুরুষ মহম্মদ কখনও সোঽহং জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন না। কোরাণ শরিফ্ হইতে নিম্নোদ্ধৃত সুরাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কেহই ব্রহ্মের সমতুল নহেন। সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধককে অবশ্যই ব্রহ্মের তুল্য বলিতে হইবে। "লাম্ ইয়ালিদ, ওয়াল্যাম জু উলাাদ্. ওয়াল্যাম্ ইয়াকুল লাহু কুফু ওয়ান্

আহদ্।” “অর্থাৎ (স্ত্রী-পুরুষবৎ) তাঁহা দ্বারা কেহ জন্ম প্রাপ্ত নহে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় হন নাই অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষোৎপন্ন নহেন। তাঁহার যোড়া কেহ নাই, তিনি একমাত্র নিরাকার জ্যোতিঃ-স্বরূপ।” মহাপুরুষ মহম্মদ খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত ত্রিত্ববাদ জানিতেন এবং খ্রীষ্টদেব যে পরমেশ্বরের অবতার ভাবে পূজিত হইতেছিলেন, তাহাও তাঁহার জানা ছিল।* পাছে মুসলমানগণও তাঁহার প্রতি ভক্তির আতিশয্য বশতঃ সত্য তত্ত্ব ভুলিয়া তাঁহাকেও পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জন্য তিনি নিজেকে আল্লার রসুল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষার্থী মাত্ররই নিম্নলিখিত মন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে, এই বিধান তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। “লা এলাহি এল্লেল্লা, মহম্মদ রসুল আল্লা।” “অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, মহম্মদ পরমেশ্বর দ্বারা (প্রেরিত)।” কোন কোন মুসলমান ভারতবর্ষীয় সোহহংবাদিদিগের সংস্পর্শে আসিয়া সোহহং বাদী হন। তাঁহারা সুফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের মন্ত্র “আনল হক্” (সোহহং)। মুসলমানগণ সর্ব্বসাধারণে এই মত গ্রহণ করেন নাই, বরং তাহারা এই মতের ঘোরতর বিরোধী। মুসলমানগণ কিছুতেই কাহাকেও পরমেশ্বরের আসনে বসাইতে প্রস্তুত নহেন। এমনি মহাপুরুষ মহম্মদের সুশিক্ষা। ধন্য মহাপুরুষ। ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার তেজঃ বীর্য্য! ঔপনিষদিক্ যুগের পর জগতে তোমার মত অল্প সংখ্যক মহাত্মাই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন। আরবের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে তুমি যে বহু বহু বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের তত্ত্ব প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলে, তাহার জন্য তোমাকে কোটী কোটী ধন্যবাদ। আর ধন্য তিনি, যিনি তোমাকে সকল আপদ বিপদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহময় ক্রোড়ে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি তোমাকে নির্লিপ্ত ভাবে সকল পার্থিব কার্য্য সাধনে শক্তি দিয়াছেন। তোমার সেই অনন্ত গুণনিধান ও অনন্ত

---

* খৃষ্টানগণ খৃষ্টদেবকে only begotten son of God বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত সেই উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শক্তি পরম পিতাকে বারংবার নমস্কার করি এবং তোমাকেও নমস্কার করিতেছি। ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারক ও মহাসাধক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সোহহং বাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরীধামের তৎকালীন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও কাশীধামের অপ্রতিদ্বন্দী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদে প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। তাঁহারই একজন অনুগত শিষ্য জীব গোস্বামী অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রচার করেন। সকল বৈষ্ণব জ্ঞানিগণই সোহহং বাদের বিরোধী। ব্রাহ্মধর্ম্ম সোহহং বাদ সমর্থন করেন না॥ রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ কেহই সোহহং জ্ঞান সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা ভেদাভেদ তত্ত্বেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় হইতে ব্রাহ্মগণ বিশেষ ভাবে ভক্তি মার্গাবলম্বী হইয়াছেন। অবশ্যই তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মকে তুচ্ছ করেন না। বরং উহাদিগকে তাঁহারা উচ্চ স্থানই দান করেন। ব্রহ্ম সঙ্গীত গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহারা পরমেশ্বরের সহিত পিতা পুত্রের সম্পর্কের পক্ষপাতী। Dr. হীরালাল হালদার, পূজনীয় সীতা নাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম জ্ঞানিগণ ভেদাভেদ তত্ত্বই সমর্থন করিতেন এবং সোহহং বাদের বিরোধী ছিলেন। শিখ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানক এবং অন্যান্য মধ্যযুগের মহাপুরুষগণও যথা—মহাত্মা কবীর, মহাত্মা দাদু প্রভৃতি সোহহং জ্ঞান সমর্থন করেন নাই। এস্থলে বক্তব্য যে বেদান্ত দর্শনও সোহহং জ্ঞান সমর্থন করেন না। ইহা বহু ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য একথা সত্য যে আচার্য্য শঙ্কর সোহহং ভাবেই উক্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহাতে প্রকৃত ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কষ্ট কল্পনা এবং যুক্ত্যাভাসের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সময় সময় স্বমত বিরোধী তত্ত্বও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম সূত্রের ২।৩।৪২ সূত্র (শঙ্কর

ভাষ্যে ১।৩।৪৩ সূত্রে) সুস্পষ্ট ভাবে ভেদাভেদ তত্ত্ব সমর্থন করে। আচার্য্য শঙ্করও তাহা নিজ ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ৪।৪।১৭ সূত্রে দেখা যায় যে জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে মুক্ত পুরুষের অধিকার নাই। সুতরাং মুক্ত পুরুষও সোহহং বলিবার অধিকারী নহেন। কারণ তাঁহাতে ব্রহ্মের পূর্ণাশক্তি বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত দর্শন প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার ন্যায় সেই সকল উপনিষদের ব্যাখ্যা অদ্য পর্য্যন্ত কেহ লিপি বদ্ধ করেন নাই। এই জন্য উপনিষদ্ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উদয় হইলে বেদান্ত দর্শনই সেই সম্বন্ধে চরম মীমাংসক বলা হয়। সেই বেদান্ত দর্শনই যখন ভেদাভেদ তত্ত্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন, তখন পরবর্ত্তী ভাষ্যকারদিগের মত যদি উহার বিরোধী হয়, তবে তাহা আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি। অতএব আমরা আপ্তবাক্য সাহায্যে বুঝিতে পারিলাম যে সোহহং বাদ সত্য নহে। আমরা দেখিলাম যে মানব এবং পারলৌকিক দেবতাগণ কখনও সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে ইতর জীবগণও উহা করিতে অসমর্থ। "সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশে আমরা জড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানিয়াছি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েও দেখিয়াছি যে জড় আত্মা হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা জীব ও জগৎ ব্রহ্মই বলেন, তাহাদের উক্তি যে সত্য নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইয়াও কেন তাঁহার সহিত সোহহং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে গেলেই বলিতে হয় যে দেহই সেই অবস্থার পরিপন্থী। যে পর্য্যন্ত দেহ, সেই পর্য্যন্তই তিনি জীব এবং সেই পর্য্যন্তই তিনি ক্ষুদ্র এবং ত্রিবিধ দেহের বিগমে মাত্র ব্রহ্মের সহিত একাকার হওয়া যায়। সুতরাং জড় কখনও আত্মা হইতে পারে না। যদি উহা আত্মাই হইত, তবে জীবাত্মা নিত্যই পরমাত্মার সহিত একাকার ভাবে থাকিতে পারিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিত না। পৃথক্ ভাবে ভাসমানত্বের কারণও দেহ, ইহা মনে রাখিলেই সকল প্রশ্নের সত্য মীমাংসা লাভ করা যায়। দেহ জড়, সুতরাং দেহ আত্মা হইতে পারে না।

যতক্ষণ জীবের দেহ বর্ত্তমান, ততক্ষণই তিনি ব্রহ্মের সহিত পূর্ণ মিলনে অসমর্থ। দেহই যখন ইহার কারণ, তখন উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের নানা অর্থ করা হয়। যথা ঃ—"(১) এই সমুদায় জড় ও চেতন (জীব ও জগৎ) ব্রহ্মই। (২) যেহেতু ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই উহা লয় প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য এই সমুদায় জীব ও জগৎ ব্রহ্মই। বেদান্ত দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ সূত্র "জন্মাদস্য যতঃ" মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৩) মায়াবাদ অনুযায়ী এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। দ্রষ্টার ভ্রমে রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হয়, সেইরূপ মায়াবশতঃ আমরা ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দর্শন করিতেছি। জ্ঞান হইলে যেমন সর্প আর থাকে না, একমাত্র রজ্জুই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মায়া ধ্বংস হয় এবং তখন আমরা একমাত্র ব্রহ্মকেই দেখিব, জড় জগৎকে দেখিব না।" প্রথম ও দ্বিতীয় রূপ ব্যাখ্যায় আমরা যাহা পাই, সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই নানাস্থলে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। তৃতীয় রূপ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অর্থাৎ মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। তাই ইহা ইতঃপর লিখিত হইতেছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাইব যে জড় জগৎ মিথ্যা নহে এবং পরব্রহ্মের ইচ্ছায়ই উহার সৃষ্টি হইয়াছে, স্থিতি হইতেছে এবং অচিন্ত্য দূরবর্ত্তী কালে উহার লয় হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য।

ওঁং নির্দ্ধার্য্য-নির্ব্বাচ্য দশাদ্বয়াতিগং
অনন্ত-একত্বানামেকত্বং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

কোনও কোনও দার্শনিকের মতে ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন এবং কাহারও কাহারও মতে এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য বিদ্যমান আছেন। মায়াবশতঃ লোকে জগৎ দর্শন করে, মায়ার বিগমে সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই সকল মত আমাদের অনুমোদিত নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে ব্রহ্ম জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তন্ময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (পরমর্ষি গুরুনাথ— তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)।

মায়াবাদ

মুখবন্ধ

এখন আমরা মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলে নানাভাব হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই আলোচনা সুশৃঙ্খল ভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে আমাদের ইহাকে নানা ভাবে বিভাগ করিতে হইবে। মায়াবাদ ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে ইহার প্রভাব এতদূর বিস্তার করিয়াছে যে বৈদান্তিক বলিলে শঙ্করাচার্য্যের মতানুগামী মায়াবাদিদিগকেই বুঝায়, যদিও প্রধানতঃ রামানুজাচার্য্য, নিম্বকাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ নিজ নিজ মতানুসারে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন দ্বাদশখানি প্রামাণ্য উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহা যদি প্রমাণ করা যায় যে মায়াবাদ উপনিষদ্ সমুহ দ্বারা সমর্থিত নহে, বরং উক্ত গ্রন্থ সমূহে মায়াবাদ বিরোধিনী উক্তিই বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান, তবে ইহা সহজেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব যে উপনিষদ্ সমূহ মায়াবাদের ভিত্তি ভূমি নহে। বেদান্ত দর্শনও (ব্রহ্মসূত্রও) যে মায়াবাদ সমর্থন করেন না, তাহা প্রোক্ত আচার্য্যগণ নিজ নিজ ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন যে মায়াবাদ সমর্থন করেন না, তাহা আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি

ভূমি প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদ্। যদি উহারা মায়াবাদ সমর্থন না করেন, তবেই বেদান্ত দর্শনও যে উহা সমর্থন করেন না, ইহাই প্রমাণিত হইল। তাই আমরা নিম্নলিখিত বিভাগানুযায়ী এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব :—"(১) মায়াবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। (২) মায়াবাদের সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদের লক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কি না? (৩) ব্রহ্ম নির্গুণ গুণ শূন্য, এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদ উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত হয় কিনা? (৪) নেতিনেতিবাদ দ্বারা ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হয় কিনা? (৫) মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম উপনিষদে পাওয়া যায় কিনা? (৬ মায়াবাদের চিদাভাস উপনিষদে পাওয়া যায় কিনা? (৭) মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ যুক্তি দ্বারা বাধিত কিনা?" যদিও উপরোক্ত ভাবে প্রবন্ধকে বিভাগ করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব, তথাপি উহারা যখন অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিলিত, তখন বাধ্য হইয়া এক অংশের বর্ণনার সময় অন্য অংশকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। সোঽহং জ্ঞান মায়াবাদের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা শ্রুতির বহু উক্তি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া মায়াবাদি-গণ বলিয়া থাকেন। অন্যান্য পন্থার বৈদান্তিকগণ সেই সকল শ্রুতি বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি বাক্য সমূহের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত মতের ব্যাখ্যা সত্য অথবা অন্যান্য ব্যাখ্যা সত্য, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। কারণ, আমরা ইতিপূর্ব্বেই সোঽহং জ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তা-রিত আলোচনা করিয়াছি এবং ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সোঽহং-বাদ সত্য নহে। মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণ শূন্য), নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় মায়াই তাঁহার একমাত্র শক্তি। এই দুইয়ের যোগে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। তিনি পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ। তিনি মায়োপহিত কিন্তু তিনি মায়াকে পরিচালনা করেন এবং উহার সহ-যোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। তিনি প্রথমতঃ পঞ্চতন্মাত্রা সৃষ্টি করেন, এই পঞ্চতন্মাত্রার সমষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ এবং পঞ্চ স্থূল ভূত সমষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে ব্রহ্মা বলা হয়। জীবাত্মা ও পরব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই, কেবল মায়োপাধি দ্বারা জীব উপহিত।

এই মায়াকে অবিদ্যা বলা হয়। জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র। আত্মার আভাস বুদ্ধিতে পতিত হইয়াই আমাদের সকল কার্য্য করায়। ইহাকেই চিদাভাস বলা হয়। জড় জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র। অতএব মায়াবাদের সমালোচনার উপরি লিখিত বিষয় সমূহের আলোচনা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিবার পূর্ব্বে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "জ্ঞানযোগে" যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাকেই মায়াবাদের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। "বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন প্রকৃত মায়াবাদ তত্ত্বের অভ্যুদয় হয় নাই। আমরা বেদে এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই—'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে', ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া শব্দ ইন্দ্রজাল বা তত্তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া শব্দ তাদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। তৎপরে কিছুদিনের জন্য মায়া শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইত্যবসরে তৎ-শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্ত্তী সময় দেখা যায়, প্রশ্ন হইতেছে. "আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন"? ইহার এইরূপ নিগূঢ় ভাব ব্যঞ্জক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়:—"আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছে।" "নীহারেণ প্রাবৃতাজল্প্যাচাসুতৃপউকথ শাসশ্চরংতি।" এস্থলে মায়া শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু এই ভাবটী পরিব্যক্ত হইতেছে যে আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা—এই সত্যও আমাদিগের মধ্যে কুজ্ঝটিকাবৎ বর্ত্তমান। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে মায়া শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে ও নূতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে, নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরুক্ত হইয়াছে, অবশেষে মায়া বিষয়ক ধারণা একটী স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতরোপ-

নিষদে পাঠ করি—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মায়া শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া ছিলেন। বোধ হয় মায়া শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়াছে।" স্বর্গগত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয় উল্লিখিত ঋগ্বেদের মন্ত্রটী (ইন্দ্রো-মায়াভিঃ ইত্যাদি) সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে মায়া এস্থলে "নব্য বৈদান্তিকের মায়া নহে। ঋগ্বেদে, বিশেষতঃ এই স্থলে (৬।৪৭।৮এ) মায়াবাদের কোন চিহ্ন নাই।" আর একটী বিষয়ও এই সম্পর্কে চিন্তয়িতব্য। ইন্দ্র বৈদিক ৩৩ জন দেবতার একজন। তিনি কখনও ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই ব্রহ্মের কার্য্য নহে। সুতরাং তাঁহার (ইন্দ্রের) সম্বন্ধে কোথায়ও যদি মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে সেই শব্দকে ভিত্তি করিয়া মায়াবাদরূপ প্রকাণ্ড সৌধ প্রস্তুত করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। স্বর্গগত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে "যাহারা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া কল্পনা করেন, তাহারা সৃষ্টি বিষয়ে বড়ই ভ্রম করেন। তাহারা হয় সৃষ্টিকে কোন অনাত্ম শক্তিতে আরোপ করেন, অথবা সৃষ্টিকে মিথ্যা মায়িক বলেন। মায়াবাদী বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদী হইয়াও সাংখ্যের প্রভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়া শক্তিতে সৃষ্টি আরোপ করেন, কিন্তু উপনিষদে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।" পদ্ম পুরাণ প্রণেতা এই সকল কারণে মহাত্মা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিতেও ত্রুটী করেন নাই। সেই ভাব সূচক শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥" মহাত্মা রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে সুচিন্তিত পাণ্ডিত্য পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ নিম্বকাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মধবাচার্য্য, প্রভৃতি মায়াবাদ স্বীকার করেন

নাই। আমাদের সকলেরই ভক্তিভাজন মহাপুরুষ শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব মায়াবাদের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি যখন পুরীতে পণ্ডিত প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিতে ছিলেন, তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে বেদান্তের মায়াবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। তিনি উক্ত পণ্ডিত প্রবরকে এবং কাশীধামের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মায়াবাদ সমর্থক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে যুক্তি দ্বারা মায়াবাদের অসারতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে উক্ত পণ্ডিতদ্বয় পরিশেষে শ্রীশ্রী চৈতন্য দেবের পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব যে কেবল পরম ভক্ত ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাহা সর্ব্বজন বিদিত সত্য। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব প্রধান সুবিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত Sir Brajendra Nath Seal তাঁহার একজন প্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে শতকরা ৯০ জন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রচারিত মায়াবাদের বিরোধী। তিনি নিজেও উক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব George V Professor of Philosophy পরলোকগত দার্শনিক পণ্ডিত Dr. S. N. Das Gupta তাহার History of Indian Philosophy গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বৌদ্ধ শূণ্যবাদ হইতে অনেক ধার করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "Sankar and his followers borrowed much of their dialectic form of criticism from the Buddhists. His Brahman was very much like the Sunya of Nagarjuna. It is difficult indeed to distinguish between pure being and pure non-being as a Category. The debts of Sankara to the Self-luminosity of the Vijnanvad Buddhism can hardly be over-estimated. There seems to be much truth in the accusations againt

Sankara by Vijnan Bhikshu and others that he was a hidden Buddhist himself. I am led to think that Sankar's Philosophy is largely a compound of Vijnanvad and Sunyavad Buddhism with the Upanishad notion of the permanence of self superadded." 'বঙ্গানুবাদ :—শঙ্কর এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের সমালোচনার যুক্তি প্রণালী অনেকটা উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্ম অনেকটা নাগার্জ্জুনের শূন্যের ন্যায়। ইহা সত্য যে বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র এবং বিশুদ্ধ শূন্যকে পৃথকতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারা কঠিন। বৌদ্ধদিগের আত্মৌজ্জ্বল্য (Self-luminosity) তত্ত্বের নিকট শঙ্করের ঋণ বর্ণনাতীত। "শংকর নিজেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন" এইরূপ দোষারোপ যে বিজ্ঞান ভিক্ষু এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি যে শংকর দর্শন বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মিশ্রিত পদার্থ এবং আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে ঔপনিষদিক ভাব উহাতে উপরি উপরি জোড়া দেওয়া হইয়াছে।" উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে মায়াবাদ কি সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া কোথায় পরিণত হইয়াছে। প্রথমতঃ বেদে মায়াবাদ সংক্রান্ত কিছু পাওয়া যায় না। এ বিষয় ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। একমাত্র শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দুই এক স্থানের বিচ্ছিন্ন (Isolated) কোন বাক্য বা শব্দ উদ্ধার করিয়া মায়াবাদ যে শ্রুতি সম্মত, তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া হয়। কিন্তু সেই উপনিষদ্‌কে সমগ্র ভাবে ধরিলে কোন ব্যক্তি ইহা বলিতে পারিবেন না উহা মায়াবাদ সমর্থন করেন। এই সম্বন্ধেও বিস্তারিত ভাবে ইতঃপর লিখিত হইবে। ইহা হইতেও বুঝা যাইবে যে পরবর্ত্তী মায়াবাদী দার্শনিকগণ ক্রমশঃ সেই "কিছু না হইতে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ গড়িয়া উঠাইয়াছেন"। এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরই মায়ারই সৃষ্টি। এক অর্থে ইহা

ঠিকই হইয়াছে। কারণ, মায়াবাদের ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম মায়া মাত্র—কল্পিত, কিন্তু সত্য নহে। মহাত্মা শংকারাচার্য্যের পূর্ব্বে মহাত্মা গৌড়পাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়-পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্য কারিকায় এই সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদের এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহা দ্বারা একটী বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ (System of Philosophy) গড়িয়া উঠিয়াছে ও তিনি মায়াবাদ ভিত্তি করিয়া প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে শংকরাচার্য্য বৌদ্ধ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ প্রবলভাবে প্রচারিত হইতেছিল এবং ইহাও সত্য যে ভারতে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছিল। শংকরাচার্য্যের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দিদিগের সহিত বহু স্থলে বাক্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং ভারতকে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অবশেষে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্রহ্মের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সকল যুদ্ধেই যেরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিজেতা ও বিজিত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হন, এস্থলেও অবিকল তাহাই হইয়াছিল। শংকরাচার্য্যের প্রচারের ফলে নাস্তিক্য-বাদ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শংকরও উক্ত বৌদ্ধ-বাদদ্বয় দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মায়াবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া Dr. Dasgupta এমনও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে শংকরের মায়াবাদ অধিকাংশে বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্য-বাদের মিশ্রণ এবং ঔপনিষদিক ব্রহ্ম তদুপরি গ্রথিত হইয়াছে (superadded)। সাংখ্যমতও শংকরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতেছিল এবং সুধীব্যক্তিবর্গের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব গৃহ হইতে বাহির হইবার পর দুইজন বিশিষ্ট সাংখ্য মতাবলম্বী সন্ন্যাসীর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য শংকর সাংখ্য দর্শন হইতেও নিজ মতোপযোগী তত্ত্ব সমূহ আহরণ করিয়া মায়াবাদে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতের বিরুদ্ধেও তাঁহার অনেক তর্কযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি জ্ঞানপন্থাবলম্বী আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন। উক্ত উভয় মতই নিরীশ্বরবাদ পূর্ণ, কিন্তু আপাত বলবতী যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে উহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। উক্ত উভয় মতই শুষ্ক ও তথা কথিত জ্ঞানের উপর স্থাপিত। ফলে তিনি (শংকর) ব্রহ্মকে এমন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে তাহা শূন্য বাদের nea-rest approach হইয়াই দাড়াইয়াছে। অতএব মায়াবাদও প্রকৃত পক্ষে যে ঔপনিষদিক তত্ত্ব হইতে কোন কোন মূল বিষয়ে বিভিন্ন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ইতঃপর লিখিত অংশে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে মায়াবাদের মত সমর্থনার্থ শংকরাচার্য্য ঔপনিষদিক বহু তত্ত্বের নিজ মতানুযায়ী কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে ১০৫৫-১০৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ মহাশয়ের উক্তি পাঠক দেখিবেন। আমাদের পূর্ব্বোক্তির দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে শংকরাচার্য্য উপনিষদের সত্য তত্ত্ব সমূহ মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম যে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, তিনি যে নিত্য নির্ব্বিকার, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে আচার্য্য ঔপনিষদিক বহু তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতে ব্রহ্ম জ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ সাধনা, এবং অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তিনি যে ভারতকে নাস্তিক্যবাদ হইতে চির দিনের তরে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই জন্য ভারত তাঁহার নিকট চির ঋণী থাকিবে। তিনি যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। এস্থলে আমাদের বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে মায়াবাদ বলিলে মহাত্মা গৌড়পাদ, আচার্য্য

শংকর ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ দ্বারা যে ভাবে উহার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। আচার্য্য শংকর নিম্নলিখিত উপনিষদ্ সমূহকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম সূত্রের (বেদান্ত দর্শনের) ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন এবং উহা দ্বারা মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন:—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়. ঐতরেয়, কৌষীতকী, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক। মায়াবাদিগণ বলেন যে মায়াবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি প্রমাণ করিতে পারি যে উক্ত উপনিষদ্ সমূহ মায়াবাদের পূর্ব্বোক্ত নানা বিভাগ সমর্থন করেন নাই, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে মায়াবাদের মূলে উপনিষদ্ নহে, অন্য কিছু।

উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়

ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ছান্দোগ্য উপনিষদে মায়াবাদের উল্লেখ মাত্রও নাই। উক্ত উপনিষদের ৩।১৯।১-৩ মন্ত্র সমূহে সৃষ্টির কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। কি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে কথিত হয় নাই, কিন্তু সৎ হইতে উৎপত্তি ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উক্ত মন্ত্র সমূহের সহিত এই উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় খণ্ডের সহিত ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয়। শেষোক্ত স্থলে "সৎ" হইতে অর্থাৎ "ব্রহ্ম" হইতে জগদুৎপত্তির কথাই আছে। ৬।২-৬ খণ্ড সমূহে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বহু তত্ত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। প্রথমতঃই সৎস্বরূপ হইতে তাঁহার নিজ ইচ্ছায় তেজঃ, অপ্ ও অন্নের (ক্ষিতির) সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ অধ্যায়েই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান ও তত্ত্বমসি বাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পরব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায়ে ভূমাতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যায়টী সুদীর্ঘ, কিন্তু মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে মধু বিদ্যা ও নানাবিধ উপাসনার বিবরণ আছে এবং অবশেষে ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও মায়ার উল্লেখ

বা উহার বিবরণ নাই। এই প্রকরণটী (৬ষ্ঠ অধ্যায়) ব্রহ্ম প্রকরণ। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি কিন্তু উহা মায়া সৃষ্ট নহে। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌দ্বয় পুরাণতম উপনিষদ্। দেখা গেল যে ছান্দোগ্যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি সুস্পষ্ট ভাবে কথিত হইয়াছে। সুতরাং মায়া দ্বারা সৃষ্টি যে মিথ্যা কল্পনা, তাহা প্রমাণিত হইল। তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যার কথা আছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি আছে। এস্থলেও মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। শঙ্কর স্বামীও তাঁহার ভাষ্যে মায়ার কোনই উল্লেখ করেন নাই। বরং উহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন এবং পুষ্ট এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই জগৎ মায়ার খেলা মাত্র, ইহা এই মন্ত্রে বলা হয় নাই। সুতরাং এই মন্ত্র দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে জগৎ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি, মায়ার ইহাতে কোন হাত নাই। এস্থলে উল্লেখ যোগ্য যে বেদান্ত দর্শনের "জন্মাদস্য যতঃ" (১।১।২ সূত্র) এই মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। এস্থলে অশনয়া মৃত্যু হইতে জগতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী মৃত্যুরূপী প্রজাপতি বলিয়াছেন মৃত্যুর দ্বারা দেহের লয় হয়, কিন্তু উহা কিছু উৎপাদন করে না, ইহাই সকলে জানেন। কিন্তু এস্থলে মৃত্যু হইতে প্রথমে জল, তৎপর পৃথিবী, তৎপর অগ্নি ও পরে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা যেন কেমন মনে হয়। এস্থলে পঞ্চভূতের উৎপত্তির কথা নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ক্রমানুযায়ী তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে কথিত হয় নাই। বরং ক্রম অনেকটা বিপরীত। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে এই অংশটী রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাক্যের যাহা আপাত অর্থ, ভিতরের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন। আমরা রূপক সম্পূর্ণ রূপে ভেদ করিতে পরিলাম না। আমাদের মনে হয় যে মৃত্যু দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই কালে একমাত্র

নিরাকার পরব্রহ্মই ছিলেন এবং নামরূপ সমন্বিত জগৎ ছিল না। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে ব্রহ্ম শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। ১।৩।২৮ মন্ত্র—অসতো মা সদগময় ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্র। শ্রুতি নিজেই অসৎ এবং তমঃকে মৃত্যু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মৃত্যুকে মৃত্যুই বলিয়াছেন। সুতরাং এস্থলেও মায়াবাদের মায়া হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা দৃষ্ট হয় না। ১।৪।১-৬ মন্ত্র সমূহ—এই মন্ত্র সমূহে প্রজাপতি স্রষ্টা বলিয়া নানা ভাষ্যে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সৃষ্টি বর্ণনাও রূপকে আবৃত। ব্রহ্ম তাঁহার শক্তি বিশেষের (ইচ্ছার) সহিত যোগে এই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই এস্থলে রূপকের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। "প্রজাপতি নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভাগ করিলেন" ইহার অর্থ ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছার উদয় হইল। "সেই স্ত্রী এই প্রকার ভাবিল যে তাঁহাকে আপনা হইতে উৎপাদন করিয়া তাঁহাতেই উপগত হইতেছে।" ইহার অর্থ এই যে ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মেরই এবং তাঁহাতেই উদয় হইয়াছে। সুতরাং তাঁহা তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। ঐরূপ যোগ মানব নিয়মের একান্ত বিরুদ্ধ। ব্রহ্মের নানাবিধ ইচ্ছায় এই সৃষ্টি নানা ভাবে উৎপন্ন হইল এবং জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইল। ইহাই সংক্ষেপে এই রূপকের অর্থ। সুতরাং এই স্থলে ব্রহ্মই স্রষ্টা, ব্রহ্মা নহেন। প্রজাপতি অর্থে স্রষ্টা ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ৬ষ্ঠ অনুবাকে আছে "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। সুতরাং ব্রহ্ম এবং প্রজাপতি এক। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে উপনিষদে কোন কোন স্থলে রূপকে বলা হইয়াছে। যথা—কৌষীতকি উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে কথিত আখ্যায়িকা। ১।৪।১০ মন্ত্রের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ১।৪।১০-১৫ মন্ত্র সমূহে দেখা যায় যে পরব্রহ্মই স্রষ্টা। একই অধ্যায়ে দুই স্থলে দুইজন স্রষ্টার কথা বলা হইয়াছে, ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই মন্ত্র সমূহে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং মায়াবাদের মায়ার তখনও উৎপত্তিই হয় নাই, মায়াদ্বারা জগদুৎপত্তির কথা ত সুদূর পরাহত। ২।৫।১৮ মন্ত্র—অতি সংক্ষেপে সৃষ্টির কিঞ্চিৎ

বিবরণ আছে। পরব্রহ্ম স্রষ্টা। ইহাতে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। ২।৫।১৯ মন্ত্র—পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" আছে। এই মায়া যে মায়াবাদের 'মায়া নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর জল, অগ্নি প্রভৃতিতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং আমাদের দেহে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, তাহা একই এবং তাহাই আত্মা। অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে তেজোময়, অমৃতময় হইয়া বিরাজমান। এই ব্রাহ্মণের শেষ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন, যেমন ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ ব্রহ্ম বহুরূপী বা অনন্তরূপী। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত। এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ শক্তি. বিভূতি দ্বারা সিদ্ধ পুরুষগণ অনেকে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতে পারেন। সুতরাং মায়া শব্দে এস্থলে শক্তি অর্থই সুসঙ্গত হয়। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং এখনও দেখা গেল যে আধুনিক মায়াবাদের সহিত এই মন্ত্রের কোনই সম্পর্ক নাই। আমরা যেমন দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি, এস্থলেও সেই রূপই ইন্দ্র সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। ইহারই পূর্ব্ব মন্ত্রে অর্থাৎ অষ্টাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে তিনি সকল দেহ, সর্ব্বপদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং মায়ার প্রশ্ন এস্থলে উদিতই হইতে পারে না। ব্রহ্মাই যে স্রষ্টা, তাহা এই মন্ত্র দ্বারাও প্রমাণিত হইল। ৪।৪।৩-৪ মন্ত্রদ্বয়—"অবিদ্যাং গময়িত্বা"র অর্থ শঙ্কর মতে "অচেতনং কৃত্বা" অর্থাৎ পূর্ব্ব দেহকে অচেতন করিয়া। এস্থলে শরীর সম্বন্ধে উক্তি। সুতরাং শঙ্কর মতেও অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান। ৪।৪।১০ মন্ত্রে—শঙ্কর মতে এস্থলে অবিদ্যার অর্থ "কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করা"। শঙ্কর মতে জ্ঞানই একমাত্র বস্তু এবং কর্ম্ম ঘৃণিত। সুতরাং কর্ম্মের অনুবর্ত্তন অবিদ্যা বা মোহ বা অজ্ঞান জনিত। সুতরাং শঙ্কর মতেও অবিদ্যার অর্থ মোহ বা অজ্ঞান। ৫।১৫।১ মন্ত্রে—মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রার্থনা। সূর্য্যের যে হিরণ্ময় রূপ অর্থাৎ উজ্জ্বল রূপ তাহা দ্বারা সত্য স্বরূপ

ব্রহ্মের রূপ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই আবরণের উন্মোচনের জন্য প্রার্থনা, মায়ার আবরণের উন্মোচনের জন্য নহে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের সর্ব্ব প্রধান ঋষি বলিলেই হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাঁহার বহু প্রকারের দার্শনিক সমালোচনা বর্ত্তমান। কিন্তু কোথায়ও ঘুণাক্ষরে মায়াবাদের উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ (Pure Monism) স্বীকার করিলেই মায়াবাদ অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়া পরে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বাগ্রে মায়াবাদের প্রচার করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার কোন উক্তিতেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মায়ার উল্লেখ নাই। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে যাহারা বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই বলিবেন যে মায়া ভিন্নও ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহাতে তাঁহার একমেবাদ্বিতীয়ত্ব ক্ষুন্ন হয় না। উহাদিগেতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপ— অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই পরিণামে অব্যক্তের সুতরাং ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই। আবার সেই জগৎ হইতে নির্ম্মিত দেহযোগে তিনি বহু জীবভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। এই উভয় কার্য্যের মূলেই ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছা। প্রোক্ত অংশ সমূহ পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে যে মায়া ভিন্নও ব্রহ্মের একতম স্বরূপের পরিণামে তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদের কোনই আবশ্যকতা নাই। "অব্যক্তের পরিণাম", "গুণ বিধান", "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "ব্রহ্মের জীব-ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী"। বালাকি-অজাত শত্রু সংবাদেও মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। এই উপনিষদ্ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ উভয়ই বৃহদাকার এবং ইহাদের মধ্যে বহু সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। ইহাদের প্রাচীনত্ব ও বৈদিকত্ব অবিসংবাদিত। কিন্তু মায়াবাদের আলোচনা দূরে থাকুক, উহার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ

নাই। ঈশোপনিষদ্। ৭ম মন্ত্র—একত্ব দর্শনশীলের শোক ও মোহ থাকে না বলা হইয়াছে, কিন্তু মায়া থাকে না একথা বলা হয় নাই। মোহ ষড় রিপুর মধ্যে চতুর্থ রিপু। মোহ আমাদের সকলেরই আছে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু এই মোহই ব্রহ্মের শক্তি ভাবে মায়া নামে সগুণ ব্রহ্ম হইতে কীটানুকীট ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কেহ বলেন না। মোহ দোষ মধ্যে পরিগণিত। ইহা একটী জাত গুণ অর্থাৎ দেহ সংসর্গে জাত। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তাহা ব্রহ্মের শক্তি হইতেই পারে না। যাহা সৃষ্ট, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, তাহা কি প্রকারে বিশ্ব সৃষ্টি করিবে? ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র—বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।১৫।১ মন্ত্রের উপর ইতি পূর্ব্বে লিখিত মন্তব্য এস্থলে প্রযোজ্য। এই উপনিষদে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। কেনোপনিষদ্। এই উপনিষদে মায়াবাদের কোনই উল্লেখ নাই। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের অপার কৃপাগুণে বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতাকে তাঁহাদের অনুপযুক্ত অবস্থায়ও তিনি দর্শন দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অহঙ্কার দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত বলি কেন? তাহার উত্তর এই যে তাঁহারা তখন বিজয় মদে মত্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তখন মোহাচ্ছন্ন এবং ২) ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়াও তাঁহাকে তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই। অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের কৃপা হইলে মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থাকিতে থাকিতেও সাধক তাঁহার দর্শন পান। এস্থলে অজ্ঞানের কারণ অহংকার জনিত মোহ, মায়াবাদের মায়া নহে। এই উপনিষদ্ দৃষ্টে আরও দুইটী তত্ত্ব আমরা জানিতে পারি। তাহা এই যে ব্রহ্মের শক্তিই প্রকৃত জিনিষ, জড় ও জীব তাঁহার শ্রীহস্তের যন্ত্র মাত্র, তাঁহার শক্তি দ্বারাই চালিত। তাঁহাদের নিজস্ব পৃথক্ কোন শক্তি নাই। আমরা যাহাকে আমাদের শক্তি, জড়ের শক্তি বলি, তিনিই সেই সমুদায় শক্তির শক্তি বা সর্ব্বশক্তি মূলাধার বা সর্ব্ব শক্তিমান বা অনন্ত শক্তিমান। মায়াবাদে জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু এই উপনিষদুক্ত উপাখ্যানে ব্রহ্ম স্বয়ং তৃণকে তৃণ বলিয়াছেন।

দহন করা (অগ্নির শক্তি), গ্রহণ করা (বায়ুর শক্তি) ও বলিয়াছেন। অর্থাৎ জড়কে সত্য বলিয়াই তিনি অগ্নি ও বায়ুর সহিত কথনোপকথন করিয়াছেন। জড় যদি প্রকৃতই মিথ্যাই হইত, তবে ব্রহ্ম কখনও ঐরূপ ভাবে উহাদের সম্বন্ধে বলিতে বা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কঠোপনিষদ্। এই উপনিষদে অদ্বৈতবাদ সুস্পষ্ট। একস্থানে ইহা পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ইহ নানেব পশ্যতি (৪।১০)। এই উপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে আত্মা পরলোক, এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান, কিন্তু মায়াবাদের মায়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই উপনিষদের ৫।১২ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন এবং সেই রূপকেই অন্য দুই স্থলে অব্যক্ত বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে বা অন্যান্য স্থলে মায়ার উল্লেখ নাই। প্রশ্নোপনিষদ্। ১।৩ মন্ত্রে কবন্ধী ঋষি পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে এই সকল প্রাণী কোথায় হইতে জন্মে। ইহার উত্তরে (১।৪ মন্ত্রে) তিনি সৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলেন। এস্থলে শঙ্কর স্বামী প্রজাপতি অর্থে হিরণ্য-গর্ভ ও হিরণ্যগর্ভ অর্থে পূর্ব্ব কল্পের প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মন্ত্রের ভাষা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে।" ইত্যাদি। কিন্তু তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রায় একই রূপ ২।৬ মন্ত্রে পর-ব্রহ্মই সৃষ্টি কর্ত্তা। সেই উপনিষদে পরব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রটী পাঠকের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে উভয় মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য (substantial difference) নাই। ভাষাও প্রায় এক প্রকার। তৈত্তিরীয়োপ-নিষদের মন্ত্র যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সে সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ পাঠেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং প্রশ্নো-

পনিষদের মন্ত্রে প্রজাপতি অর্থে হিরণ্যগর্ভ স্রষ্টা ও তৈত্তিরীয়োপনিষদে পরব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিবার সুযোগ নাই। ব্রহ্মই যে স্বয়ং প্রজাপতি, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। প্রজাপতির পূর্ব্বকল্পের তপস্যার প্রশ্ন এস্থলে আসিতেই পারে না। যদি তাহাই বলিতে হয়, তবে তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্তি অনুযায়ী বলিতে হয় যে পরব্রহ্মেরও প্রজাপতির ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপ্ ধাতুর অর্থ কি, তাহা ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। অতএব প্রশ্নো-পনিষদের "প্রজাপতি" অর্থে পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে বলিলে কোনই ক্রটী হয় না। যাহা হউক্, যে অর্থই করা যাউক না কেন, উক্ত সৃষ্টি বিবরণে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। ১।১৬ মন্ত্রে মায়া শব্দ আছে। শঙ্কর স্বামী এই শব্দের 'মিথ্যা ব্যবহার' অর্থ করিয়াছেন। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় উহাকে "ছল" বলিয়াছেন। ৬।৪ মন্ত্রে সৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। পরব্রহ্মই স্রষ্টা। মুণ্ডকোপনিষদ্। ১।৭-৯—এই মন্ত্র সমূহে সৃষ্টির কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু মায়ার উল্লেখ নাই। এস্থলে পরব্রহ্মই কারণ, হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ, অন্ন প্রভৃতি তাঁহার হইতে জন্মিয়াছে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড—সৃষ্টির বর্ণনা আছে। পরব্রহ্মই একমাত্র স্রষ্টা। মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। ২।১।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যিনি পরব্রহ্মকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি ইহলোকেই অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন করেন। শঙ্কর স্বামী "সোঽবিদ্যা গ্রন্থিং বিকরতীহ সৌম্য" অংশের নিম্নলিখিত অর্থ করিয়া-ছেন। "স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যা গ্রন্থিং গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতাম বিদ্যা বাসনাং বিকরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্, হে সৌম্য প্রিয় দর্শন।" "বঙ্গানুবাদ—হে সৌম্য প্রিয় দর্শন, সেই লোক এবং প্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা গ্রন্থিকে অর্থাৎ দৃঢ়ীভূত অধর্ম্ম সং-স্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পরে নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয়। (দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)"। অবিদ্যা শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ পাপ, দোষ পাশ জাত অজ্ঞানতাকে

বা মোহকে অবিদ্যা বলা হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিরোধী যাহা, তাহা জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে অবিদ্যা বলা হয়। অর্থাৎ যাহা অবিদ্যা বিরোধী বা জ্ঞান বিরোধী, তাহাই অবিদ্যা। ইতঃপর লিখিত ২।২।৮ এবং ৩।১।৫ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠক দেখিবেন। সেই স্থলে ক্ষীণ দোষ হওয়ার অর্থও যাহা, অবিদ্যা গ্রন্থি দূর করার অর্থও তাহা। উহা মায়াবাদের মায়া বা অবিদ্যা নহে। ২।২।৮ মন্ত্রে—মুক্তির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মায়া হইতে মুক্তির কথা নাই। হৃদয় গ্রন্থি সকল অর্থাৎ বাসনা, কামনা ও সকল সংশয়ের শেষ হয় বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী হৃদয় গ্রন্থির ব্যাখ্যায় অবিদ্যা বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধি নিষ্ঠা কামনা বলিয়াছেন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে হৃদয় গ্রন্থি অর্থে বাসনা কামনা বুঝায় বটে, কিন্তু জাতগুণরাশিই প্রকৃত পক্ষে হৃদয় গ্রন্থি। ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনে যে উহাদের রজস্ত-মোহংশের লয় হয়, তাহা "সোহহং জ্ঞান" অংশে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। ৩।১।৫ মন্ত্রে ঐ অর্থেই "ক্ষীণ দোষাঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩।১।৫ মন্ত্র—শঙ্কর স্বামী "ক্ষীণ দোষাঃ" শব্দের অর্থ "ক্ষীণ ক্রোধাদি চিত্ত মলাঃ" করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ লিখিয়াছেন "বিধূত রাগাদি চিত্তমলাঃ" (নির্ম্মল হৃদয়)। দোষ শব্দে যে জাত গুণকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ক্ষীণ দোষাঃ শব্দের অর্থ যাহাদের দোষ পাশ রাশি অর্থাৎ জাত গুণ রাশি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩।২।৯ মন্ত্র—"গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি"। গুহা অর্থে হৃদয়। সুতরাং গুহাগ্রন্থি অর্থে হৃদয় গ্রন্থি। ২।১।১০, ২।২।৮ ও ৩।১।৫ মন্ত্র সমূহ সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। উপরোক্ত চারিটী মন্ত্রে আমরা মায়াদাদের মায়া পাইলাম না, কিন্তু আমাদিগেতে যে দোষ পাশ বর্ত্তমান, তাহারই উল্লেখ আছে। সেই দোশ পাশের লয় হইলেই জ্ঞান লাভ হয় ও ব্রহ্ম দর্শন হয়। এই সম্বন্ধে "সোহহং জ্ঞান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্। এই উপনিষদে তুরীয় ব্রহ্ম সম্বন্ধেও আলোচনা বর্ত্তমান, কিন্তু মায়াবাদের কোনই উল্লেখ নাই। স্রষ্টায় বিপরীত

গুণের মিলন" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে যিনি শিব, তিনি অনন্ত গুণধাম সুতরাং অনন্ত শক্তির আধার এবং অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির অতীত। তিনি নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় নহেন। তিনি একাধারে স্রষ্টা, পাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও প্রলয়কারী। ওঁং পঞ্চম প্রণব। উহার অর্থ— পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইবে। উহাতে দেখা যাইবে যে ওঁহার অর্থ "ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা এবং উহাদের অতীত অর্থাৎ তিনিই একাধারে অনন্ত গুণধাম ও অনন্ত গুণাতীত।" সুতরাং তিনিই শিবম্। তিনি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাহাও "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয় সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দ বল্লী—৯ম অনুবাক্। সৃষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু মায়ার উল্লেখ নাই। এস্থলে যে পরব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছে, তাহা শংকর স্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বর্ণনা। সেই সকল স্থলেও মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। ইহার পরেই ষষ্ঠ অনুবাকে প্রসিদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব সূচক মন্ত্র "সোঽকাময়ত" ইত্যাদি। কিন্তু উহাতে মায়াবাদের কোনই উল্লেখ নাই। বরং উহাতে ইহাই আছে যে তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ বহু ভাবে ভাসমান হইলেন এবং নিজে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৭ম অনুবাকে বলা হইয়াছে যে "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ইতি।" এই সকল স্থলেও মায়ার উপর নির্ভর করিয়া অথবা মায়া যোগে প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্ম ও পরে তাঁহার দ্বারা (সগুণ ব্রহ্ম দ্বারা) অন্যান্য সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কোন কথাই নাই। বরং উহার বিপরীত কথাই আছে যে তিনি (পরব্রহ্ম) স্বয়ংই নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার নাম হইল "সুকৃত"। তথাপি মায়াবাদী বলেন যে তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন নাই, মায়াই সকল করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। এই সকল মন্ত্রেই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য

করা হইয়াছে, ইহা মায়াবাদীও স্বীকার করেন। এই অধ্যায়েই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। এই মন্ত্রই মায়াবাদী গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না যে পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি বিষয়িনী উক্তি সমূহ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে নহে। ভৃগুবল্লীতে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রম বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মায়াবাদের কোনও অংশের উল্লেখ নাই। ঐতরেয়োপনিষদ্। সম্পূর্ণ প্রথম অধ্যায় সৃষ্টির সূচনা মূলক। কিন্তু কোথায়ও আভাসেও মায়ার উল্লেখ নাই। এস্থলে পরব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা। কৌষীতকি উপনিষদ্। প্রথম অধ্যায়ে সাধকের ব্রহ্ম দর্শন সুদীর্ঘ ভাবে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোথায়ও মায়া হইতে মুক্তির উল্লেখ নাই। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন এবং বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহাদিগেতেও মায়ার উল্লেখ নাই। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে আমরা পাইতেছি যে একাদশখানি উপনিষদে যে সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ব্রহ্মই (পর-ব্রহ্মই স্রষ্টা। কিন্তু তিনি তাঁহার মায়া নাম্নী শক্তি দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম (মায়াবাদের কল্পিত ঈশ্বর) জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ কোনই উল্লেখ নাই। উপনিষদে অনেক সৃষ্টি বিবরণ আছে, কিন্তু নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন:—"ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।২।৩ (তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ইত্যাদি)। প্রশ্নোপনিষদ্—১।৪ (প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত ইত্যাদি)। মুণ্ডকোপনিষদ্ -১।১।৮-৯ (তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ইত্যাদি)। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ —২।৬ (সোহকাময়ত বহু স্যাং ইত্যাদি)। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২।৭ (তদাত্মানং স্বয়ম কুরুত ইত্যাদি)। ঐতরেয়োপ-নিষদ্—১।১-২ (আত্মা বা ইদমেক ইত্যাদি)।" (অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ মন্ত্র সমূহ পুনরুক্ত হইল না। পাঠক ইতিপূর্ব্বে লিখিত অংশ পাঠ করিলেই তাহা দেখিতে পারিবেন)।* কেহ কেহ বলেন যে

* এই সকল মন্ত্রে ব্রহ্মই স্রষ্টা। মন্ত্রসমূহ প্রায় একই ভাবে, প্রায়

শ্রুতি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ ভাবে কিছুই লেখেন নাই। কারণ, ব্রহ্মই উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য। আমরাও স্বীকার করি যে ব্রহ্মই উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব সুশৃঙ্খল, বিস্তারিত সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে লিখিলে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে অধিকতর সুগম হয়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। আমাদের সকল বিজ্ঞান যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের উপর নির্ভর করে, তখন জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিবার পন্থা কোথায়? উপনিষদে এমন বহু প্রসঙ্গ আছে, যাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদনে আবশ্যক হয় না, ইহা অনেকেই বলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত একাদশ খানি উপনিষদে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে উপনিষদ্ বক্তা ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। অতএব যদি ঔপনিষদিক ঋষিগণের মত মায়াবাদের সহিত ঐক্য থাকিত, তাহা হইলেই অবশ্যই উপনিষদের নানা স্থানে নানা ভাবে লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী মায়ার বিস্তারিত বিবরণ নিশ্চয়ই থাকিত। কিন্তু অত্যাশ্চার্য্যের বিষয় এই যে ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য বহুতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই মায়ার কোনই উল্লেখ করেন নাই। মায়াবাদের মায়াই একরূপ সমুদায়। সুতরাং উপনিষদুক্ত বহু তত্ত্বের মধ্যে মায়ার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যদি ঔপনিষদিক ঋষিগণ মায়াবাদ জানিতেন বা তাহা সমর্থন করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহাদের উক্তিতে উহার উল্লেখ বা সমর্থন করিতেন। এই সকল কারণে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মায়াবাদ সম্বন্ধীয় কোনও তত্ত্ব ঋষিগণের মোটেই জানা ছিল না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে উক্ত উপনিষদ সমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন মুক্তিতত্ত্ব ও মুক্তির জন্য প্রার্থনার মধ্যেও মায়া হইতে মুক্তির কোনই জন্য প্রার্থনার উল্লেখ নাই। ইহা ভিন্ন বহু বিস্তারিত ও

একই ভাষায় লিখিত। সুতরাং উপনিষদ অনুযায়ী ব্রহ্মই যে স্রষ্টা, কিন্তু মায়া নহে, তাহা সুনিশ্চিত সত্য।

সুচিন্তিত দার্শনিক আলোচনাও বর্ত্তমান, কিন্তু কোথায়ও মায়াবাদের বিবরণ নাই। অর্থাৎ উক্ত একাদশ খানি উপনিষদে বহু ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, উপাসনা প্রণালী, মুক্তির জন্য প্রার্থনা, পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ও বিবিধ প্রকার আলোচনা বর্ত্তমান। কিন্তু মায়াবাদের একমাত্র অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তথাকথিতা ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেই কেন তাঁহারা একবারেই নীরব? দুইটী মাত্র স্থলে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে তাহাও মায়াবাদের মায়া অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে মায়াবাদ প্রোক্ত ঋষিগণের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উক্ত উপনিষদ সমূহ যেমন মায়াবাদ সমর্থন করেন নাই, তেমনি উহার বিরুদ্ধেও কোনও কথা বলেন নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উপনিষদ্ যুগে মায়াবাদের সৃষ্টিই হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থে উহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি মায়াবাদী হইতেন, অথবা ঘুণাক্ষরেও যদি মায়া তত্ত্ব তাঁহাদের জানা থাকিত, তবে কোন না কোন এক প্রকারে উহার উল্লেখ তাঁহারা অবশ্যই করিতেন। কারণ, মায়াবাদের মায়া একটী অতি সামান্য বিষয় নহে যে তাঁহারা ইহাকে তুচ্ছ (overlook) করিবেন। পাঠক মনে রাখিবেন যে মায়াবাদী উপনিষদের উপরেই মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত বলেন বলিয়াই এই অংশের অবতারণা, অর্থাৎ মায়াবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাই এই অংশের প্রতি-পাদ্য বিষয়। মায়াবাদী উপনিষদ্ সমূহকে অভ্রান্ত মনে করেন ও ঋষিগণ যে সকল সত্য সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছেন এবং তাহাই উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান, ইহা স্বীকার করেন। যদি তাহাই হয়, তবে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে এত অধিক কথা উল্লিখিত হইতে পারিল, কিন্তু মায়া-বাদ সম্বন্ধে উহারা একেবারে কেন নির্ব্বাক? সুতরাং অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে ঋষিদের দিব্য জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে মায়াবাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য বহু তত্ত্বের উদয় হয় নাই। বরং ইহাই সত্য যে

তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে পরব্রহ্মই স্বয়ং তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা এই সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। তিনিই ইহার একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ইহাতে মায়া বা অন্য কাহারও কোনই হাত নাই। সেইরূপ ভাবের বহু উক্তি ইতিপূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। একাদশ খানি উপনিষদের আলোচনায় আমরা আরও দেখিলাম যে মোহ প্রভৃতি দোষ পাশ রাশির হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাইতে হইবে। মোহও যাহা, মায়াও তাহা। মায়ার অর্থ চিন্তা করিতে করিতে যদি আমরা পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হই, তবেই দেখিতে পাইব যে মোহ এবং মায়া সম অর্থসূচক শব্দ (Synonymous terms)। মোহ ষড়রিপুর মধ্যে একটী প্রধান রিপু। ইহার প্রভাব সর্ব্বব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোহ এক অর্থে ভ্রম বা অজ্ঞানতা, সুতরাং ইহা মিথ্যার সহিত জড়িত, অথবা উহা আমাদিগকে ভ্রান্তি মার্গে পরিচালনা করে। এই মোহকেই মায়া উপাধি দান করিয়া একটী মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। নতুবা ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্বে মায়ার উল্লেখ নাই কেন? অতএব এই মত উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, অথবা ইহাকে তজ্জন্য অভ্রান্তও বলা যায় না। উহা পরবর্ত্তিগণের গঠিত নিজ মত মাত্র। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মোহ একটী জাতগুণ মাত্র, উহা কখনও মায়াবাদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়া নহে। মায়াকে অজ্ঞানও বলা যায়। এই অজ্ঞানতাই মোহ বা মোহের পরিণতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। এখন আমরা শ্বেতা-শ্বেতরোপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কথিত আছে যে এই উপনিষদে মায়াবাদ সমর্থক মন্ত্র বিদ্যমান। আমরা দেখিবে যে সেই সকল মন্ত্র আধুনিক মায়াবাদ কতদূর ও কি কারণে সমর্থন করেন। পণ্ডিতদিগের মতে উপনিষদ সমূহ চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—বৈদিক, আর্য, সাম্প্রদায়িক এবং কৃত্রিম। যে সকল উপনিষদে বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে অন্তর্গত মনে হয়, তাহাদিগকে বৈদিক উপনিষদ্ বলা হয়, ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

সেই শ্রেণী ভুক্ত। যে সকল উপনিষদ্ বৈদিক উপনিষদের সহিত এক ভাবাপন্ন এবং প্রসিদ্ধ ঋষি প্রণীত, কিন্তু যাহাদের বৈদিকত্ব সন্দিগ্ধ, তাহাদিগকে আর্ষ উপনিষদ্ বলে। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর এই শ্রেণী ভুক্ত। যে সকল উপনিষদে কোন পৌরাণিক দেবতাকে ব্রহ্মের অবতার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে. অর্থাৎ যাহা বৈদিক উপনিষদের মূল ভাবের বিরোধী, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ বলা হয়। ইহা ভিন্ন যে সকল উপনিষদে আর্য্যধর্ম্ম বহির্ভুত মত প্রকাশিত হইয়াছে. তাহাদিগকে কৃত্রিম উপনিষদ্‌বলে।উপনিষদের মোট সংখ্যা ১০৮। তন্মধ্যে উপরোক্ত দ্বাদশ খানি উপনিষদই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই দ্বাদশ খানি উপনিষদের উপর নির্ভর করিয়া বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মায়াবাদও এই কয়েকখানি উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। আমরা দেখিলাম যে পণ্ডিতগণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বৈদিক উপনিষদ কিনা সন্দেহ করেন। ইতঃপর যে আলোচনা হইবে, তাহাতে সেই সন্দেহ অত্যধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইবে বলিয়া মনে হয়। এই উপনিষদ পাঠে আমরা দেখিতে পাইব যে সাংখ্য দর্শন ইহার উপর কত অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যোগশাস্ত্রের প্রভাবও আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। আমরা এই বিষয়টী সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। ১।২ মন্ত্র— অন্যান্য বিষয়ের সহিত স্বভাব ও পুরুষ সৃষ্টির কারণ নহে বলা হইয়াছে। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ পাওয়া গেল। ১।৪ মন্ত্র—কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের রূপের সহিত চক্রের বর্ণনা করিতে যাইয়া নিম্নলিখিত সাংখ্য-যোগ শাস্ত্র সমূহের ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "ত্রিবৃতং— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা বেষ্টিত। ষোড়শ অন্তবিশিষ্ট—পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। পঞ্চাশৎ অর – পঞ্চাশৎ প্রত্যয় — বিপর্য্যয় বা ভ্রম। বিংশতি-প্রতি-অর—দশ ইন্দ্রিয় ও উহাদের বিষয়। ষড় অষ্টক -- ভূম্যাদি প্রকৃতি অষ্টক, ত্বগাদি ধাতু অষ্টক, অনিমাদি ঐশ্বর্য্য অষ্টক, ধর্ম্মাদি ভাব অষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টক ও দয়াদি গুণাষ্টক। নানারূপ

একপাশ—কামনা। মার্গত্রয়—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান। নিমিত্তদ্বয়—পুণ্য ও পাপ।" অন্য কোন উপনিষদে এই সকল ভাব বা পরিভাষা নাই। এমন কি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উল্লেখও নাই। ১।৫ মন্ত্র—উক্তরূপ ভাব বর্ত্তমান। পঞ্চস্রোত—চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চ-উৎস—পঞ্চভূত। পঞ্চ আবর্ত্ত—রূপাদি পঞ্চ বিষয়। পঞ্চ দুঃখ—গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ। পঞ্চাশদ্ভেদ—লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি। পঞ্চপর্ব্ব—অবিদ্যা, অহংভাব, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। সাংখ্য সারে ইহাদিগকে পঞ্চক্লেশ বলা হইয়াছে। অন্য কোন উপনিষদে এই সকল পরিভাষা নাই। পাশ শব্দ বৈদিক পরিভাষা নহে। একমাত্র কঠোপনিষদে ১।১।১৮ এবং ২।১।২ মন্ত্রে মৃত্যু পাশের মাত্র উল্লেখ আছে। অন্য কোনও রূপ পাশের কোনই উল্লেখ নাই। পাশ শব্দ তান্ত্রিক পরিভাষা বলিয়া মনে হয়। "'ঘৃণা লজ্জা ভয়াশঙ্কে জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।' প্রোচে পশুপতি স্তন্ত্রে এবং বাক্যং মহার্থকম্॥ (সত্যামৃত)" বঙ্গানুবাদ:—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি, এই অষ্টপাশ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত সদাশিব। তন্ত্রে পশুপতি (মহাদেব) এই মহার্থক বাক্য বলিয়াছেন।" ১।৮, ১।১১, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩ ও ৬।১৩ মন্ত্র সমূহে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম জ্ঞানে সর্ব্বপাশ মুক্তি হয়। ৪।১৫ মন্ত্রে মৃত্যু পাশের উল্লেখ আছে। ১।৯ মন্ত্রে—ভোক্তৃ—ভোগ্যার্থ যুক্তা অজা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতি (প্রধান) অনাদি এবং তাহাই সাংখ্য পুরুষের ভোগ্যা। পরমন্ত্রে (১১০) প্রধান শব্দ স্পষ্ট ভাবেই ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে মায়াকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সাংখ্য প্রকৃতিকে প্রধান শব্দে কথিত হয়। ১।১০ মন্ত্রে প্রকৃতি বুঝাইতে প্রধান শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্বমায়া নিবৃত্তি অর্থে সর্ব্বমোহ নাশ, মায়াবাদের মায়ার নিবৃত্তি নহে। যদি তাহাই হইত, তবে সেই অর্থে অন্যান্য উপনিষদ্‌ও মায়া শব্দ ব্যবহার করিতেন;

১৷১১ মন্ত্রে—সাংখ্য শব্দ "কেবলম্" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সকল দোষ পাশ হইতে মুক্তির কথাই আছে, মায়ার কথা নাই। ২৷৯-১২ মন্ত্র সমূহে যোগ বিষয়ক উক্তি বর্ত্তমান। ৩৷১২ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে সত্ত্বের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। সত্ত্ব গুণ সাংখ্য হইতে আনীত। ৪৷৫ মন্ত্রে—"লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং একাং অজাং" ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত সাংখ্য প্রধানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্য প্রধানই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্ন। সত্যকে শুভ্র বলা হইয়াছে। কারণ, সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ। রজঃকে লোহিত বলা হইয়াছে। রক্তের বর্ণ লোহিত। রক্ত আমাদের সমুদায় শারীরিক শক্তির মূলে। শাক্তগণ রক্তবর্ণকে শক্তির প্রতীক বলেন। রজঃ গুণ কর্ম্মে চালনা করে। সুতরাং উহা শক্তির কারণ। তমোগুণ যে কাল, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, তমঃ শব্দের অর্থ যে অন্ধকার, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কেহ কেহ তেজঃ, অপ্ ও অন্ন লক্ষণা প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতিতে আরও দুইটী ভূত আছে। যথা—ব্যোম ও মরুৎ। উহারা প্রকৃতি হইতে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। পঞ্চভূতের দুইটী বাদ দিলে প্রকৃতি অপূর্ণা থাকিলেন। সুতরাং সেই ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে মাত্র তিনটী ভূতের [তেজঃ, অপ্ ও অন্নের (ক্ষিতির)] উৎপত্তির বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী উপনিষদে পাঁচটী ভূতেরই (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের) কথাই আছে। এই উপনিষদেও পাঁচটী ভূতের কথা আছে। (১৷৫, ৬৷৩ এবং ৬৷৬ মন্ত্র সমূহ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রকৃতি বলিলে তিনটী ভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুকে বুঝায় না। আলোচ্য মন্ত্রে প্রকৃতিকে অজা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঔপনিষদিক প্রকৃতি অজা নহে। উহা ব্রহ্মের ইচ্ছায় উৎপন্ন, সুতরাং সাদি। কিন্তু সাংখ্য প্রকৃতি অনাদি। সাংখ্য প্রধাম বহু প্রজা সৃষ্টি করে। এক অজ অর্থাৎ পুরুষ (জীব) প্রধানকে ভোগান্তে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়, অন্য অজ অর্থাৎ অন্য জীব প্রধানকে ভোগ করে।* ইহাও সাংখ্যের ভাব। এই মন্ত্রে মায়ার প্রশ্ন

* সাংখ্যমতে অজ শব্দে নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষকেও বুঝাইতে

আসিতে পারে না। কারণ, প্রকৃতিকেই সাক্ষাৎ ভাবে পুরুষ ভোগ করে বলিয়া মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অর্থ অতি সুস্পষ্ট এবং ইহাই সাংখ্য মত। মায়াবাদের সাক্ষী মাত্র কূটস্থ ব্রহ্ম মায়াকে সাক্ষাৎ ভাবে ভোগ করে না, যেমন সাংখ্য পুরুষ সাংখ্য প্রকৃতিকে ভোগ করেন। সাংখ্য পুরুষকে ভোক্তাও বলা হয়। "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্"। ইহাও সাংখ্য মতই বটে। প্রকৃতি সকল করেন। পুরুষ সাক্ষী মাত্র। কিন্তু উপনিষদে যে ব্রহ্মই স্রষ্টা, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৷৯-১০ মন্ত্রদ্বয় সম্বন্ধে মন্তব্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অজা শব্দ সাংখ্য প্রধানকে বুঝাইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে মায়া যে ত্রিগুণ সম্পন্না, তাহাও সাংখ্য প্রধানের অনুকরণে উহাতে যুক্ত হইয়াছে। ৫৷২ মন্ত্রে ঋষি কপিলকে (সাংখ্য দর্শন প্রণেতাকে) ব্রহ্ম প্রথমে জন্ম দেন ও জ্ঞানে পোষণ করেন বলা হইয়াছে। মহর্ষি কপিলের প্রতি ভক্তিবশতঃ ঋষি শ্বেতাশ্বতর যে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট। অন্যথা এই স্থলে কপিলের নামের কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। পাঠক এখন বুঝিবেন যে এই উপনিষদে সাংখ্য প্রভাব এত অধিক কেন। অন্য কোন উপনিষদে মহর্ষি কপিলের কোনই উল্লেখ নাই। আমরা জানি যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদান্ত ও সাংখ্যমত মিলাইবার চেষ্টা হইয়াছে। যদি ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, তবুও একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে গীতায় বেদান্তের ন্যায় সাংখ্য হইতেও বহু ভাব উদ্ধার করা হইয়াছে এবং গীতাকার যে মহর্ষি কপিলের নিকট কৃতজ্ঞ, তাহার প্রমাণ এই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন যে সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি শ্রেষ্ঠ। (সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ (১০-২৬)। অর্থাৎ কপিল মুনি সিদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই উভয় গ্রন্থই সাংখ্যের নিকট ঋণী, তাই উভয় গ্রন্থে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ৫৷৫ মন্ত্রে—"সর্ব্বান্ গুণান্" শব্দে

পারে। কারণ, পুরুষ অনাদি। এই পুরুষই দেহাবদ্ধ জীব হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ অভিমান করেন। এই জন্য অজ শব্দে এখানে জীবকে বুঝিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে বুঝায়। ৫।৭ মন্ত্রে—গুণান্বয় শব্দে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত বুঝায়। ত্রিগুণও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিবর্ত্ম ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান যাহার আছে। এইটী সাংখ্য পরিভাষা বলিয়া মনে হয়। ৬।৩ মন্ত্রে—অষ্টতত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার)। ইহা সাংখ্য পরিভাষা। মায়াবাদে অন্তঃকরণ বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহংকার দ্বারা গঠিত। ৬।১০ মন্ত্রে—প্রধান জাত তন্তু দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি জাত দেহ দ্বারা নিজেকে আবরণ করিয়াছেন। সাংখ্য প্রধানকেই প্রকৃতি বলা হয়, মায়াকে নহে। ৬।১৩ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে সাংখ্য ও যোগ দ্বারা প্রাপ্য বলা হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের একত্র প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। সাংখ্য অর্থে জ্ঞান এবং যোগ অর্থে চিত্ত সমাধান (চিত্তবৃত্তি নিরোধ) বলিয়াই শেষ করিলে ঠিক হইবে না। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের প্রভাব পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইল। ৬।১৬ মন্ত্রে-ব্রহ্মকে প্রধানের পতি—"প্রকৃতি নাথ" বলা হইয়াছে। "গুণেশ" শব্দ ত্রিগুণের নিয়ামক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিয়ামক বলা হইয়াছে। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে এই উপনিষদ্ সাংখ্য ও যোগ দ্বারা যে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, তাহা বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু তাহাতে মায়াবাদের কি আসিয়া যায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সাংখ্য প্রধান ও মায়া সম্পূর্ণরূপে এক না হইলেও প্রায় এক। যেমন প্রধান পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, মায়াও যে তাহাই, তাহা "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে প্রদর্শিত হইবে। উভয়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্না। সাংখ্য প্রধানই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়। মায়াবাদে ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে, তাই মায়াবাদী সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন। তিনিও নিষ্ক্রিয় কিন্তু মায়োপহিত এবং সেই মায়াই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। জীবাত্মা বা কূটস্থ ব্রহ্ম অবিদ্যা উপহিত। তিনিও নিষ্ক্রিয়। অন্তঃকরণ চিদাভাস যুক্ত হইয়া সকল কার্য্য করেন। অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং উহা মায়ার সৃষ্টি, সুতরাং মায়াই সকল করিতেছে। "মায়াবাদের বিরুদ্ধে

যুক্তি” অংশ পাঠ করিলেই মায়াবাদ যে সাংখ্য দ্বারা কতদূর প্রভাবিত, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপনিষদেও গীতার ন্যায় ঔপ-নিষদিক মতের সহিত সাংখ্য মত মিলাইবার বৃথা চেষ্টা হইয়াছে ও সেই জন্যই তৎকালে প্রচলিত মায়াবাদের কোন কোন ভাব আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্য একাদশ খানি উপনিষদে আমরা সাংখ্য প্রভাব মোটেই দেখিতে পাই না, কিন্তু এই উপনিষদে সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের প্রভাব যে অত্যধিক, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অসঙ্গত হইবে না যে সাংখ্য প্রভাব ভারতে যখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই উপনিষদও সেই সময়ে অথবা তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত। সেই কাল বৈদিক যুগের অনেক পরে, ইহা সুনিশ্চিত। এই উপনিষদের আধুনিকত্ব সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ এই যে বৈদিক উপনিষদ জ্ঞান আলোচনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহাতে ভক্তি ভাব প্রধান। ৪।৩-৪ এবং ৪।২১-২২ মন্ত্র সমূহে ব্রহ্মকে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা হইয়াছে। ৬।২৩ মন্ত্রে পরব্রহ্মে পরা ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাই দ্বাদশ খানি উপনিষদের মধ্যে ভক্তি সম্বন্ধে একমাত্র সুস্পষ্ট উল্লেখ। ব্রহ্মকে ঈশ, দেব, পুরুষ, ভগবান, প্রভু, বরদ, ভুবনেশ শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ শব্দ ৬ বার, দেব শব্দ ২৭ বার, এবং পুরুষ শব্দ ৭ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র উপনিষদ্ খানিতে ব্রহ্মকে Personal God ভাবে (পুরুষরূপী ঈশ্বর ভাবে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে ঋষি মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল শব্দ দ্বারা একমাত্র পরব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (১।৭ ও ১।১৬ মন্ত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য)। অতএব আমাদের মনে হয় যে এই উপনিষদ্ আধুনিক। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাঠক আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন। নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মের স্থলে রুদ্র, শিব, মহেশ্বর, ঈশান ও দেব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠক জানেন যে ঐ সকল শব্দে (দেব শব্দে অন্য দেবতাকেও বুঝায়) প্রধানতঃ মহাদেবকেই বুঝায়। রুদ্র—৩।২, ৩।৪, ৩।৫, ৪।১২, ৪।২১, ৪।২২। শিব—৩।১১, ৪।১৪, ৪।১৬, ৫।১৪ (শিবাং

কুরু—৩।৬)। শিবাতনু—৩।৫। মহেশ্বর—৪।১০, ৬।৭। ঈশান—৩।১২, ৩।১৫, ৩।১৭, ৪।১১। দেব—১।৮, ১।১০, ১।১১, ১।১৪, ২।১৫, ২।১৬, ২।১৭, ৩।৩, ৪।১, ৪।১১, ৪।১৬, ৪।১৭, ৫।৩, ৫।৪, ৫।১৩, ৫।১৪, ৬।১, ৬।৫, ৬।৭, ৬।১০, ৬।১১, ৬।১৩, ৬।১৮, ৬।২০, ৬।২৩ (উল্লেখ দুইবার)। কঠোপনিষদে ভূত ভবিষ্যতের ঈশান বলিয়া একই ভাবে তিন স্থলে উল্লেখ আছে। (২।১৫, ১২ এবং ১৩)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ভূত ভবিষ্যতের ঈশান বলিয়া একবার ও সকলের ঈশান বলিয়া দুইবার মাত্র উল্লেখ আছে। (৪।৪।১৫, ৪।৪।২২ ও ৫।৬।১)। অন্য কোন উপনিষদে ঈশান শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ব্রহ্ম অর্থে রুদ্র শব্দ কোন উপনিষদেই ব্যবহৃত হয় নাই। রুদ্র দেবতাগণ (বহু বচনে) ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।৭ ও ৩।১৬।৪ মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। শিব শব্দ একমাত্র মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৭ম ও দ্বাদশ মন্ত্রে পরব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহেশ্বর শব্দ আর কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই। দেব শব্দ একমাত্র কঠোপনিষদের ১২।১২ মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই উপনিষদে এই সকল শব্দের বহুল প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য্য (significance) আছে বলিয়া মনে হয়। ৩।৫ ও ৩।৬ মন্ত্রে ব্রহ্মকে গিরিশন্ত অর্থাৎ যিনি গিরিতে থাকিয়া সুখ বিস্তার করেন ও গিরিত্র (গিরি রক্ষক) বলা হইয়াছে। হিন্দুগণ জানেন যে শিবের (মহাদেবের) প্রধান বাসস্থান কৈলাস গিরি। ঋষি রুদ্র শব্দ ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ। কিন্তু বেদে একাদশ রুদ্র দেবতা। রুদ্র শব্দে ব্রহ্মের ভীষণত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্রে আছে :—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।" পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার রচিত স্তোত্রে লিখিয়াছেন :—"ত্বং ভীষণো ভীষণ ভাবকানাম্। পাতুশ্চ পাতা চ ভয়ং ভয়ানাম্।।" কঠোপনিষদ বলিয়াছেন :—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। (২।৩।২)" ঋষি উক্ত ভাবেই রুদ্রের অর্থ করিয়াছেন। তিনি এই সকল শব্দ এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহাতে পরব্রহ্ম ভিন্ন ঐ শব্দ সমূহের অন্য অর্থ করা যায় না। আমরাও সেই ভাবেই উহাদের

ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু সমস্তটা বিষয় চিন্তা করিলে কি মনে হয় না যে তিনি শিবের (মহাদেবের) ভক্ত ছিলেন, অথবা তিনি ব্রহ্মকে শিব ভাবেই উপাসনা করিতেন। শেষ অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। গীতাকার বলিয়াছেন যে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) একাদশ রুদ্রদিগের মধ্যে শঙ্কর (মহাদেব) অর্থাৎ মহাদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুদ্র। শৈবগণের মধ্যে কেহ কেহ মায়াবাদী। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতই তাহার প্রমাণ। সুতরাং ঋষির সহিত মায়াবাদিদিগের মতের কোন কোন অংশে ঐক্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অন্যান্য উপনিষদের তুলনায় এই উপনিষদে অন্য স্থল হইতে বহুল উদ্ধার করা হইয়াছে। যথা:— ২।১৬ (যজুঃ—৩২-৪৬), ৩।৩ (ঋক্—১১।৮১।৩), ৩।৫ (যজুঃ—১৬-২), ৩।৬ (যজুঃ—১৬।৩), ৩।১৪ (ঋক্—১০।৯০), ৩।২০ (কঠ—১।২।২০), ৩।১৩ (কঠ—২।৩।১৭), ৪।৬ (ঋক্—১।১৬৪।২১), ৪।৭ (মুণ্ডক—৩।১), ৪।১৭ শেষ পংক্তিদ্বয় (কঠ—২।৩।৯ শেষ পংক্তিদ্বয়), ৪।২০ প্রথম পংক্তিদ্বয় (কঠ—২।৩।৯ প্রথম পংক্তিদ্বয়), ৬।১৪ (কঠ—২।২।১৫)। পৃথিবী যখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, উপনিষদকার ঋষিগণ তাঁহাদের নিজ সাধনা লব্ধ মহাসত্য সকল জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অংশই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান এবং ইহা তাঁহাদের বিশেষত্ব। অন্য স্থল হইতে উদ্ধার করার ভাব তাহাদের মধ্যে অত্যল্প। পরবর্ত্তী স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি উপনিষদ্ হইতে ভাব ও ভাষা যে অধিক পরিমাণে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যথা:—"সর্ব্বনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ "অর্থাৎ সকল উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ উহার দোহন কর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস্য, সুধীগণ ভোক্তা এবং গীতারূপ অমৃতই উহার দুগ্ধ।" এই ভাবে চিন্তা করিলেও উক্ত উপনিষদ্ খানি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না যে এই উপনিষদ এমন কালে কথিত হইয়াছিল, যখন সাংখ্য ও যোগ বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং মায়াবাদের কোনও কোনও বিষয়

আলোচিত হইতেছিল। মায়া তখনও আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদে পরিণত হয় নাই। এই উপনিষদের ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে ইহার ভাষা বৈদিক অথবা তৎপরবর্ত্তী যুগের অথবা মিশ্রিত। পাঠক এস্থলে মনে রাখিবেন যে, যে ব্যক্তি যে প্রকার সাহিত্যে অভিজ্ঞ, তিনি কিছু লিখিতে গেলে সেই ভাষাই তাঁহার লেখার ভিতর আসিয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ এই উপনিষদের সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন:—"এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রসাদ গম্ভীর এবং অনেকটা আধুনিক সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ, তথাপি স্থানে স্থানে ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত অর্থ সঙ্গতি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়।" উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে এই উপনিষদ্ পূর্ব্বোক্ত একাদশ খানি উপনিষদ্ হইতে বহু ভাবে ভিন্ন। পরব্রহ্মই সমুদায়, ইহাতেই কেবল উহাদের সহিত ঐক্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মিলনের জন্য এই উপনিষদে নিষ্ফলা চেষ্টা হইয়াছে। ১৷১০ ও ৬৷১৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রধানকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ১৷৯-১০ ও ৪৷৫ মন্ত্র সমূহে অজা শব্দ যে সাংখ্য প্রধানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আবার ৪৷১০ মন্ত্রে মায়াকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। জানিনা উপনিষদ্কার ঋষি মায়াকে ও সাংখ্য প্রধানকে একই মনে করিয়াছেন কি না। যদি তাহাই না হয়, তবে একই উপনিষদে এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? যাহা হউক, এই মায়া যে আধুনিক মায়াবাদের মায়া নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে ও ইতঃপর লিখিত বিষয় সমূহ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এখন আমরা এই উপনিষদের মায়া সম্বন্ধীয় অন্যান্য মন্ত্র সমূহের আলোচনা করিতেছি। ১৷৩ মন্ত্রের দেবাত্ম শক্তিকে মায়াবাদী মায়া বলেন। মায়াবাদের মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না, তাহা "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া ব্রহ্মাতিরিক্ত কল্পিত একটী বস্তু। "দেবাত্ম শক্তি" শব্দে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বুঝায়। সেই-

রূপ অর্থ করিলে অন্যান্য উপনিষদের সৃষ্টি-মূলা উক্তি সমূহের সহিত ঐক্য হয়। অন্যথা এগার খানি উপনিষদে লিখিত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব ঋষি এস্থলে আনয়ন (Introduce) করিতেছেন বলিতে হয়। ইচ্ছা (ঈপ্সা নহে) যে ব্রহ্মের স্বকীয়া শক্তি, ইহা "সৃষ্টির সূচনা" ও "লীলাতত্ত্ব" অংশদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার একতম স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলেও ইচ্ছাশক্তির কথা বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আমরা দেখিতে পাই যে ৬।১২ মন্ত্রে ব্রহ্ম এক বীজকে বহু করিয়াছেন। "করোতি" শব্দ দ্বারা ইচ্ছাশক্তি সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, ইচ্ছার পরিণাম যে কর্ম্ম, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ইহার অন্য অর্থ করিলে শ্রুতি বিরোধ হয়। যদি কেহ বলেন যে এই স্থলে "দেবাত্ম শক্তি" শব্দে "ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি" মনে করা কষ্ট কল্পনা, তবে বলিতে হয় যে সেই আপত্তি যুক্তি সঙ্গত নহে। "শক্তি" শব্দের অর্থ কি? সামর্থ্যসূচক্ শক্ ধাতুর উত্তর "ক্তিন্" প্রত্যয় যোগে আমরা শক্তি শব্দ পাই। যাহার দ্বারা কোনও রূপ কার্য্য সম্পাদিত হয়, যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার উপযুক্ত, এবং যাহা কারণের আত্মভূত, তাহাই শক্তি ও শক্তির যাহা ফল, তাহাই কার্য্য। "কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং।" এখন আমরা আমাদের কার্য্যের বিশ্লেষণ করি। কার্য্যের মূলে আমাদের কোন শক্তি পাই? তাহা ইচ্ছা শক্তি। সকলেই জানেন যে ইচ্ছা অন্তরের ভাব এবং কার্য্য উহার বহিঃ প্রকাশ মাত্র। ইচ্ছা কোথায় থাকে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহা আমাতে থাকে। সুতরাং কারণ রূপে আমি, ইচ্ছা শক্তি আমার ও কার্য্য ইচ্ছা শক্তির। সেইরূপ এই বিশ্বরূপ কার্য্য ব্রহ্মেরই ইচ্ছা শক্তির ও সেই ইচ্ছাশক্তি তাঁহাতেই— সেই কারণের কারণে নিহিত রহিয়াছে। অতএব দেখা গেল যে

এস্থলে ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যখন সকল কার্য্যের মূলে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান, তখন বিশ্বরূপ কার্য্যের মূলেও যে অনন্ত শক্তিমানের ইচ্ছা শক্তি নিহিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? মায়া নাম্নী অন্য একটী শক্তির অযথা কল্পনার যখন প্রয়োজন দেখা যায় না, তখন কেন আমরা সেইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" এবং "ইচ্ছা শক্তি" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই বিষয়টী অন্য ভাবে চিন্তা করিলেও সেই একই তত্ত্বে উপনীত হইতে পারা যায়। "স্বগুণৈঃ" শব্দে কেহ কেহ "সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণৈঃ" বলিয়াছেন। আমরা সেইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করি না। নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত মন্ত্রের পংক্তিদ্বয়ের অন্বয় করা যাইতে পারে। "ধ্যানযোগানুগতাঃ তে (ঋষয়ঃ) নিগূঢ়াম্ (অতি গুপ্তাম্) দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈঃ (আত্ম গুণৈঃ) অপশ্যন্।" এস্থলে 'স্বগুণৈঃ"র অর্থ আত্মগুণৈঃ (নিজ গুণ সমূহ দ্বারা) অর্থাৎ সাধক যখন বহু গুণে একত্ব লাভ করেন অর্থাৎ বহু গুণে ব্রহ্মে তন্ময় হন, তখন তিনি একান্ত বাঞ্ছনীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং তখন সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁহাতে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তখন তিনি জানিতে পারেন যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বিশেষকে বীজ ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছা যোগে এই বিশাল সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ জীবাত্মার গুণ হইতেই পারে না। ইহা মায়াবাদীও স্বীকার করিবেন না। সাংখ্য উহাকে পুরুষের গুণ বলেন না, কিন্তু পুরুষাতিরিক্ত প্রধানের গুণ বা উপাদান বলেন। যদি বলা হয় যে কোন কোন স্থলে দেহকেও আত্মা বলা হইয়াছে, তবে বলা যাইতে পারে যে আত্মার অর্থ আত্মাই. অন্য কিছুই নহে। "গুণবিধান" অংশে আত্মার অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। "জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি ?" এবং "জীবাত্মা" অংশদ্বয়ে আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান। যে স্থলে দেহকে আত্মা শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে, সে স্থলে উহা অত্যন্ত গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "দেহাত্মভেদ" শব্দ দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে আত্মার মুখ্য অর্থ কখনই দেহ

হইতে পারে না। আর জড়ের গুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ দ্বারা ব্রহ্মের শক্তি দেখিবার সম্ভাবনা কোথায়? "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। বহিরিন্দ্রিয় মনে ও মনঃ জীবাত্মায় লয় হইলে ব্রহ্ম দর্শন সম্ভব হয়। অর্থাৎ জীব যখন নিজের স্বরূপ অজড় অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারই কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন। উক্ত অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব জড়ের দর্শন ব্রহ্ম দর্শন করাইবার শক্তি নাই। আর উক্ত ত্রিবিধ গুণ যখন আবরণ, তখন উহারা ব্রহ্ম দর্শনে বাধা জন্মাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব দর্শন করাইতে পারে না। ১।৮, ১।১১, ২।১৫, ৪।১৬ এবং ৫।১৩ মন্ত্র সমূহে ব্রহ্ম জ্ঞানে সর্ব্ব পাশ মুক্তি হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু মায়া হইতে মুক্তির কথা নাই। "ক্ষীণ দোষাঃ" শব্দের উপর ইতিপূর্ব্বে লিখিত মন্তব্য পাঠক পাঠ করিবেন। ১।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের চিন্তন ইত্যাদিতে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। মায়া শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পরের মন্ত্রেই (১।১১) ব্রহ্ম জ্ঞানে সর্ব্ব পাশ মুক্ত হওয়া যায় বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর পাশ মুক্তির কথাই আছে। সুতরাং বিশ্বমায়ানিবৃত্তি শব্দের অর্থ সর্ব্ব পাশ হইতে মুক্তি। আমাদের জাত গুণ রাশিই দোষ পাশ নামে কথিত হয়। উহাদের লয় সাধন হইলে আমরা অনায়াসে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিতে পারি। ইহাদের সহিত মায়ার কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই স্থলে মায়াবাদের মায়াকে লক্ষ্য করা হয় নাই। ৩।১ মন্ত্র —কেহ কেহ 'জালবান' শব্দের মায়াবী অর্থ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই (জগতের উপাদান কারণই) জাল শব্দ বাচ্য। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা জানি যে জগৎ অত্যন্ত জটিলতাময় এবং ইহার রহস্য সকল দুর্ভেদ্য। সুতরাং এইরূপ বিধান যিনি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই রহস্যময়, অনন্ত জ্ঞানী ও অনন্ত কৌশলী। এস্থলে ৪।১০ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য ও "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

তাহাতেও দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম মায়াবাদের মায়াবী নহেন। ৩।২ মন্ত্রে রুদ্র শব্দে ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য স্থলে এই উপনিষদে ব্রহ্মকে রুদ্র বলা হইয়াছে। বৈদিক রুদ্র দেবতা ১১ জন। এস্থলে রুদ্রকে (ব্রহ্মকে) স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয় কর্ত্তা বলা হইয়াছে। মায়ার সাহায্যে যে তিনি ঐ কার্য্য করেন, তাহা বলা হয় নাই। ৪।১ মন্ত্র—বিশ্ব পরব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে ও তাঁহাতে যাইবে বলা হইয়াছে, কিন্তু মায়ার উল্লেখ নাই। ৪।৪ মন্ত্র—পরব্রহ্ম হইতে ভুবন সমূহ জাত। মায়ার উল্লেখ নাই। ৪।৯ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে মায়ী এবং জীবকে "মায়য়া সন্নিরুদ্ধ" বলা হইয়াছে। ৪।৬-৭ মন্ত্র দ্বয় হইতে দেখা যায় যে দেহাত্মবোধ জনিত দোষেই জীব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে এবং সেই জন্যই সে মোহ দ্বারা দেহে বদ্ধ থাকে। এস্থলেও "মায়য়া সন্নিরুদ্ধ" অর্থে দোষ পাশ দ্বারা আবদ্ধ বুঝিতে হইবে। ১।৮ ও ১।১০ মন্ত্রের উপর ইতিপূর্ব্বে লিখিত মন্তব্য পাঠক দেখিবেন। এই উপনিষদে বহু স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে পাশ মুক্তি হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং মায়া হইতে মুক্তি ও সর্ব্ব পাশ মুক্তি একই কথা। পর মন্ত্রের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ৪।১০ মন্ত্রে—মায়াকে প্রকৃতি ও মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। ১১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে এই উপনিষদে ৬ স্থলে সাংখ্য প্রধানকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, আর এ স্থলে কেন মায়াকে প্রকৃতি বলা হইল? এইরূপ বহু স্থলে দোষ পাশ রাশি দ্বারা মানব আবদ্ধ ও ব্রহ্ম জ্ঞানে সর্ব্ব পাশ মুক্তি বলা হইয়াছে। আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ এবং ব্রহ্ম চিন্তন দ্বারা বিশ্ব মায়া নিবৃত্তি হয়. ইহাও বলা হইয়াছে। ইহা কি মায়াবাদের মায়া, অথবা কবিত্ব সূচিকা উক্তি অথবা জটিলতাময়ী, আশ্চর্য্য ভাবময়ী, রহস্যময়ী সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া ব্রহ্মকে মায়ী ও জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলা হইয়াছে, অথবা ঐ সমুদায় ভাব মিশ্রিত ভক্তির উচ্ছাস।* যদি

ঋষি শ্বেতাশ্বতর যে পরম ভক্ত ও মহাকবি ছিলেন, তাঁহার উপনিষদই তাঁহার প্রমাণ। এই উপনিষদে ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার মাধুর্য্য এবং ভক্তিভাবের গভীরতা যথেষ্ট পরিমানে বর্ত্তমান।

মন্ত্রটী সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া সরল ভাবে অর্থ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে এস্থলে মায়াবাদের মায়ার কিঞ্চিৎ অংশ ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু একই উপনিষদে এক স্থলে মায়াবাদের উল্লেখ, বহু বহু স্থলে সাংখ্য প্রকৃতির উল্লেখ এবং অন্যান্য স্থলে মায়াবাদ বিরোধিনী বহু উক্তি থাকে, তথাপিও কি বলিতে হইবে যে ঐ উক্তি মায়াবাদ সমর্থন করে? মায়াবাদিগণ সম্পূর্ণ পৃথককৃত (Isolated) উক্ত মন্ত্রটী পাঠকের সম্মুখে সর্ব্বদাই উপস্থিত করেন ও বুঝাইতে চাহেন যে মায়াবাদ শ্রুতি সম্মত। কিন্তু সেই অর্থে যে এই স্থলে মায়ার উল্লেখ হয় নাই, তাহা উপনিষদ খানি বিশেষ ভাবে এবং এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আর যদি বলা হয় যে মন্ত্রের যাহা অর্থ, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তবে বলিতে হয় যে কঠিন বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে বাক্য, প্রকরণ (context) এবং গ্রন্থে যে ভাব-ধারা বর্ত্তমান, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য করিয়া অর্থ সাব্যস্ত করিতে হইবে। নতুবা ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। যদি শেষোক্ত পন্থাই—সেই পন্থাই সমীচিন—অবলম্বন করিতে হয়, তবে উক্ত মন্ত্রে মায়াবাদ সমর্থিত হয় নাই বলিতে হইবে। আর যদি বাক্যের অর্থই এ স্থলে কেবল মাত্র গ্রহণীয় হয়, তবে এই উপনিষদে মায়াবাদ খণ্ডনকারিণী এত অনেক উক্তি আছে যে ঐরূপ দুই একটী বিক্ষিপ্ত বাক্য বা শব্দ (Stray Words or sentences) উহাদের নিকট দাড়াইতেই পারে না। ঐরূপ ভাবে অর্থ করিলে আরও বলিতে হয় যে এই উপনিষদে বহু স্ববিরোধিনী উক্তি বর্ত্তমান। তাহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে এই উপনিষদের মূল্য বর্দ্ধিত হয় কিংবা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন এবং সেই অনুযায়ী মায়াবাদীর মত গ্রহণ করিবেন অথবা সমগ্র উপনিষদের অর্থ গ্রহণ করিবেন. তাহাও বিবেচ্য। মায়া-বাদের যে বিভাগ প্রথমতঃই করা হইয়াছে, সেই অনুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই উপনিষদ্ সাংখ্য প্রধানকেই (১।৯, ১।১০, ৬।১০ ও ৬।১৩ মন্ত্র সমূহে) প্রকৃতি এবং ১।৯ মন্ত্রে ব্রহ্মকেই প্রধানের পতি বলিয়াছেন। ইহা (এই উপনিষদ্) ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল

বিশেষণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কেহ নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় বলিবেন না। উহাতে নেতিনেতিবাদ সূচক যে সকল উক্তি আছে, তাহা দ্বারাও ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা যাইতে পারে না। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সক্রিয় ও সগুণাত্মক এত অনেক বিশেষণ অন্য কোনও উপনিষদে নাই। পরব্রহ্ম যে পুরুষরূপী ভগবান (Personal God), তাঁহার যে গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়, তাঁহাকে যে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করা যায়, তাঁহার নিকট যে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান যায়, তাঁহার প্রতি যে আমাদের পরা ভক্তি লাভ করিতে হইবে, ইহা যেমন ভাবে এই উপনিষদে বলা হইয়াছে, এমন ভাবে আর কোনও উপনিষদে বলা হয় নাই। মায়া শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। যথা :—মোহ, অন্ধকার, অজ্ঞতা, অজ্ঞান, অবিদ্যা, দোষ রাশি আনীত অন্ধকার, পাশরাশি জনিত অন্ধকার, জটিলতাময় সংসারের দুর্ভেদ্য রহস্য, আশ্চর্য্য ভাবের অব্যক্ত কারণ ইত্যাদি। পুরাণে বা অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্ম শাস্ত্রে অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্র বৈদিক যুগের পর লিখিত, তাহাতে মায়াবাদ-প্রকাশিকা-উক্তি আছে, কিন্তু উহাদের অন্যান্য শত শত উক্তি এবং ঐরূপ বহু গ্রন্থ সমগ্র ভাবে মায়াবাদ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব শাস্ত্র মায়বাদ গ্রহণ করেন নাই, বরং বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পুরাণে এবং ভক্তি ও কবিত্ব পূর্ণ গ্রন্থ সমূহে কোথায়ও কোথায়ও মায়ার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ সর্ব্বপ্রধান ভাবে দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনিও কর্ম্ম করেন। (গীতা—৩।২২ ও ৩।২৩-২৪)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তিনি প্রেমময়। (১৮-৬৫)। গীতাতে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ—তিনই আছে। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া কেহই বলিতে পারেন না যে উহাতে মায়াবাদ সমগ্র ভাবে সমর্থিত হইয়াছে, যদিও শঙ্কর স্বামী প্রভৃতি মায়াবাদিগণ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থেও মায়ার উল্লেখ আছে। স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মায়াবাদ স্বীকার করেন না, বরং উহা উহার

বিরোধী। পণ্ডিত শাস্ত্রীও কখনও মায়াবাদ স্বীকার করিতেন না। তিনি পরব্রহ্মকে Personal God বলিয়া মানিতেন এবং সেই ভাবেই তাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা করিতেন ও দয়াময় পরম-পিতার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেন। এইরূপ মহা পণ্ডিত, ভক্ত, কৃপাবাদী ও মহাকর্ম্মীর ব্রহ্মস্তোত্রেও মায়ার উল্লেখ আছে। যথা :— "পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহনীহার-সংবৃতে, ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা। ত্বৎকৃপা-তরণীং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং, মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমেহমৃতম্ ॥" এইরূপে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে মায়াবাদের প্রচার ও প্রসার হইবার সময় হইতে লিখিত, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে মায়ার অল্পাধিক উল্লেখ আছে, যদিও অনেক গ্রন্থই সমগ্র ভাবে যে কেবল মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে, বরং উহারা মায়াবাদের বিরোধী। অনেক স্থলেই মোহ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে ১০৮২-১০৮৩ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞান যোগ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠক দেখিবেন। উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মায়াবাদ কিছু না হইতে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়াছে। উহার মূলে যে মায়া শব্দ এবং অত্যাশ্চর্য্যজনক ভাব (ইন্দ্রোমায়াভিঃ ইত্যাদি) তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরে সৃষ্টি রহস্য দুর্ভেদ্য ও আমরা মোহনীহারে আবৃত, এই ভাব দ্বারা ক্রমশঃ মায়াবাদ পরিপুষ্ট হইতেছিল। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিতে চাহেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে পারেন না। তাই শেষে এইরূপ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল যে ইহা কখনও ভেদ করা যাইতে পারে না এবং ইহা মায়া মাত্র অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল মায়া জালে আবৃত মাত্র। পঞ্চদশী হইতে যে সকল শ্লোক ইতঃপর উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শংকর স্বামীই মায়াবাদকে একটী সম্পূর্ণ মতবাদে পরিণমন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে নানা পণ্ডিতের নিকট নানা ভাবে মায়া শব্দ বোধগম্য হইত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এমন

সময় রচিত যে সময় মায়াবাদ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু মায়াকে নানা জনে নানা অর্থে চিন্তা করিতেন। আমাদের মনে হয় যে ঋষি শ্বেতাশ্বতর সেইরূপ ভাবেই মায়াকে চিন্তা করিতেন এবং তাহাই তিনি মায়া শব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। মায়া শব্দের তাঁহার অর্থে এবং শঙ্করাচার্য্যের সময়ের মায়া শব্দের অর্থের মধ্যে যে অত্যধিক পার্থক্য, তাহা ত প্রমাণ করা যায়। আমাদের মনে হয় যে জটিলতাময় দুর্ভেদ্য সৃষ্টি রহস্য এবং অত্যাশ্চার্য্য সৃষ্টির অব্যক্ত কারণ—এই দুইটী ভাবই তাঁহার নিকট মায়ার ভিত্তি হইয়াছিল। তিনি যদি মায়াবাদের মায়াকেই মায়া বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি এরূপ উপনিষদ্ রচনা করিতে পারিতেন না। সাংখ্য প্রকৃতিও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল এবং তিনি উহাকে এবং মায়াকে একই পর্য্যায় ভুক্ত করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি কখনও মায়াকে এবং কখনও প্রধানকে প্রকৃতি বলিতে পারিতেন না। ৫।৩ মন্ত্রে—মায়াবাদী অবশ্যই মায়ার কথা বলিবেন। কিন্তু ৬।১২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে "যিনি এক বীজকে বহুধা করেন"। অতএব জাল দ্বারা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকে বুঝাইতেছে।* ৩।১ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উপরোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে উহা মায়াবাদ সমর্থন করেন নাই। বরং সাংখ্য প্রকৃতিকেই আমরা বহু স্থলে পাই। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সাংখ্য প্রকৃতিকেই মায়াভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং দোষ পাশ হীনতাকেই মায়া হইতে মুক্তি বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একাদশখানি উপনিষদের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে উহাদের মধ্যে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। এই উপনিষদেও দোষ পাশ রাশি হইতে মুক্তি প্রার্থনীয় বলা হইয়াছে। এস্থলেও মায়ার অর্থ মোহ চিন্তা করিলে সকল বিষয়ের সুমীমাংসা লাভ করা যায়। অতএব মায়াবাদ যে দ্বাদশ খানি উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই উক্তি ভিত্তিহীনা।

* ৬।১২ মন্ত্র সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে আলোচনা আছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম ইচ্ছাশক্তি যোগে অব্যক্ত স্বরূপ (সৃষ্টিবীজ) হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত কি না?

এখন আমরা দেখিব যে উক্ত দ্বাদশ খানি উপনিষদ্ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ গুণ ও শক্তি শূন্য বলিয়াছেন কিনা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য লিখিবার পূর্ব্বে "ব্রহ্ম" শব্দে কি বুঝায়, তাহা লিখিত হইতেছে। বৃহ + মন্ = ব্রহ্ম। বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—যাহার অন্য নাম বড় বা মহান্। মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধি রাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্—যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ (বড়) বা ব্যাপক আর নাই, তিনিই ব্রহ্ম (ক)। উক্ত অর্থ অনুযায়ী ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে যে স্থলেই ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থলেই অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্মকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইবে না, যদি মন্ত্রে অথবা প্রকরণে (context-এ) অন্য কোন প্রকার অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে না বুঝায়। ব্রহ্ম একই—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁহার হইতে বড় কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে "পর" শব্দে বিশেষিত করা দার্শনিক ভাবে নিষ্প্রয়োজনীয় (superfluous)। তবে ভক্ত অবশ্যই ভক্তি ভাবে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে পরব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্ম, পরাৎপর পরব্রহ্ম বলিবেন। তাহাতে কোনই ত্রুটী না হয়। কারণ, ব্রহ্মকে একবার অনন্ত বলিলেই তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা হয় না, তাই ভক্ত তাঁহাকে বারংবার অনন্ত বলেন। ভক্ত সেইরূপ একবার মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে না পারায় বারংবার "আরও বড়, আরও বড়" বলেন অথবা ইহাও সম্ভব যে ভক্ত ব্রহ্মকে অনন্ত বলিয়া তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে "আরও বড়" বারংবার বলেন। কিন্তু বিচারতঃ ব্রহ্ম বলিলে এমন একজনকে বুঝায় যাঁহার সমানও কেহ নাই, উপরে থাকাত দূরের কথা। সুতরাং জ্ঞান শাস্ত্রে ব্রহ্মই শেষ কথা। ব্রহ্মকেই পাশ্চাত্য দর্শনে Absolute বলা

(ক) কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ—প্রথম অধ্যায়—৫৫ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে। মায়াবাদিগণ বলেন যে উপনিষদে যে স্থলে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব বা অন্যবিধ কর্ত্তৃত্ব দেখা যাইবে, সেই স্থলেই সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ তাঁহাদের কল্পিত ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। পাঠক সগুণ ব্রহ্ম অর্থে ইহা বুঝিবেন না যে একই ব্রহ্মের সগুণত্ব ও গুণাতীতত্বের মধ্যে প্রথম ভাব। মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে। মায়াবাদীর সগুণ ব্রহ্ম মায়োপহিত ও সীমাবদ্ধ। তিনি পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ মাত্র। সুতরাং তিনি নিরতিশয় বৃহৎ নহেন। সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করাই ভূল। তাঁহার উপরে মায়াবাদের পরব্রহ্ম বর্ত্তমান। সগুণ ব্রহ্মও যেমন পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ. বিশ্বও সেইরূপ পরব্রহ্মের একপাদে স্থিত। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম কেবল মাত্র সীমাবদ্ধ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। উহার উর্দ্ধে তিনি নাই বিশ্ব অনন্ত নহে। মানব বিশ্বের সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না বলিয়া সময় সময় উহাকে অনন্ত বলেন বটে, কিন্তু সেই অনন্ত সত্য অনন্ত নহে, আমাদিগের ধারণাতীত সীমাবদ্ধ মাত্র। ইহা যেমন মায়াবাদীর উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি বৈজ্ঞানিকও বলেন যে বিশ্ব অনন্ত নহে। অতএব সগুণ ব্রহ্ম যখন সীমাবদ্ধ, তখন তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ অর্থাৎ প্রকৃত ভাবে অনন্ত পদ বাচ্য হইতে পারেন না এবং উপনিষদে ব্যবহৃত ব্রহ্ম শব্দে তাঁহাকে বুঝাইতেও পারে না। পৃথিবীকেই যাহারা বিশ্ব মনে করেন, তাহারাও যেমন ভূল করেন, সেইরূপ কেবল মাত্র বিশ্ব ব্যাপী, কিন্তু সত্য অনন্ত নহেন, অধিকন্তু মায়োপহিত আত্মাকে যদি ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করা হয়, তবে সেইরূপ ভ্রমই হইবে সন্দেহ নাই। কারণ, মায়াবাদীর নিজ উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের সগুণ ব্রহ্ম মায়োপহিত এবং পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ, সুতরাং তাঁহার তুলনায় সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র। আর মায়োপহিত আত্মা (তিনি যত বড় শক্তিশালীই হউন্ এবং সেই মায়া সত্ত্ব প্রধানই হউক্, অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী হউক্) ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। মায়াবাদী পরব্রহ্মকে মায়ো-

-সহিত বলেন না। উপনিষদে অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, মায়াবাদের কল্পিত সগুণ ব্রহ্ম নহেন। উপনিষদে যে যে স্থলে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে পাঠ যদি মায়াবাদীর উক্তি সমর্থন না করে, তবে আমরা তাহা (মায়াবাদের উক্তি) অনুমোদন করিতে অসমর্থ। উপনিষদের প্রত্যেক উক্তিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করিতে হইবে। আমরা কোনও মত বিশেষের স্বীকৃতি অনুসারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। ইতিপূর্ব্বে ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মই (পরব্রহ্মই) একমাত্র স্রষ্টা, অন্য কেহ নহেন। একথাও বলা হইয়াছে যে তিনি "স্বয়মকুরুত" এবং সেই জন্য তাঁহার একটী নাম সুকৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি গুণ শূন্য বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে সগুণ ও সক্রিয় তাহা উপনিষদের অন্যান্য উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিলে বুঝিতে হইবে না যে তিনি আমাদের ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্ম করেন। তাঁহাতে যে সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা নিত্য বর্ত্তমান, ইহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার সেই ইচ্ছা শক্তিই কার্য্য করেন। তাঁহার কোনও কার্য্যের জন্য কোনও যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন :—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।। (৩।১৯)" "বঙ্গানুবাদ :—সেই পরমাত্মা হস্তপাদ শূন্য হইয়াও বেগবান্ ও গ্রহীতা। তিনি অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞেয় বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা নাই। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে প্রথম ও মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।" সুতরাং তিনি সক্রিয় বলিলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে এবং তাঁহার সকল কার্য্য সেই একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা কেহ বুঝিবেন না যে ব্রহ্ম ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বিভিন্ন। ইচ্ছাশক্তি তাঁহারই অনন্ত শক্তির একটী শক্তি এবং উঁহা তাঁহাতেই নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং সেই ইচ্ছাশক্তি

দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহা তাঁহারই কার্য্য। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা", "লীলাতত্ত্ব" এবং "ইচ্ছাশক্তি" অংশত্রয় দ্রষ্টব্য। এখন উপনিষদের অন্যান্য উক্তি সকলের আলোচনায় আরও কি কি পাওয়া যায়, তাহা দেখা যাউক্। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, ইতঃপর যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইবে, সেই সকল মন্ত্রেই যে ব্রহ্মকেই (অর্থাৎ মায়াবাদের পর-ব্রহ্মকেই) বুঝাইয়াছে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকে সেই সকল মন্ত্রে লক্ষ্য করা হয় নাই। যদি প্রত্যেক মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উহার বঙ্গানুবাদ দিয়া ও কি প্রণালীতে প্রত্যেক মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ইহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইত, তবে বিষয়টী পাঠকের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইত বটে, কিন্তু ঐরূপ ভাবে আলোচনা করিতে হইলে একমাত্র মায়াবাদ সম্বন্ধে পৃথক্ একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। তাই তাহা হইতে বিরত হইলাম। পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক নানামতের ভাষ্যের সাহায্যে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলেই যে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনই সংশয় নাই। উক্ত প্রকার অনুসন্ধান করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে উপনিষদ্ মায়াবাদ সমর্থন করেন না এবং পরব্রহ্মকে নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় বলেন না। বরং তাঁহাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ আলোচনা সম্পর্কে আমাদের একটী কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। তাহা এই যে শক্তি গুণ নিষ্ঠ। গুণেরই শক্তি। যেমন কোন ব্যক্তির দয়া থাকিলে পরোপকার করিতে তাহার শক্তি হয়। দয়া না থাকিলে পরোপকারের প্রশ্নই উদিত হয় না। অগ্নির তেজঃ নামক গুণ আছে বলিয়া উহার দাহিকা শক্তি আছে। যাহার প্রেম আছে, তিনিই মিলন করিতে পারেন, তিনিই বহুকে এক করিতে পারেন ইত্যাদি। সুতরাং যাহার গুণ আছে, তাহারই শক্তি আছে, আবার যাহার শক্তি আছে, তাহারই সদৃশ (corresponding) গুণ আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৩।১৪।২ মন্ত্রে—সত্য সঙ্কল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস শব্দ সমূহ ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন যে এই অধ্যায়ে অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি সম্পন্ন সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে মায়াবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি কষ্ট কল্পনা দ্বারা এই অধ্যায়ের ব্রহ্ম (প্রথম মন্ত্র), আত্মা (৩য় মন্ত্র) ও ব্রহ্ম (৪র্থ মন্ত্র) শব্দের অর্থ মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম ভাবে করিয়াছেন। ১ম মন্ত্রে ব্রহ্মের অর্থ মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ("অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"র পরই ২য় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। "তজ্জলানিতি"ও যাহা, উক্ত ২য় সূত্রও তাহা। যদি বলেন যে প্রথম সূত্রের ব্রহ্মের অর্থ (মায়াবাদের) সগুণ ব্রহ্ম, তবে বলিতে হইবে যে তাহা হইতেই পারে না। সূত্রকার প্রথম সূত্রেই পরব্রহ্ম সম্বন্ধে না বলিয়া মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকেই যদি লক্ষ্য করিতেন, তবে তাহার সর্ব্ব প্রথমেই সুস্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম শব্দের সেইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা উচিত ছিল। কারণ, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে ব্রহ্ম শব্দে অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্মকেই বুঝায়। সূত্রকার যদি প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থে কোন শব্দ ব্যবহার করেন, তবে তাহার কারণ প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। যখন তিনি ঐরূপ ভাবের কিছুই করেন নাই, তখন ব্রহ্ম শব্দে সর্ব্ববাদিসম্মত ও প্রচলিত অর্থই আমরা গ্রহণ করিব। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে লিখিত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ও তৎপরবর্ত্তী আলোচনা আমাদের চিন্তয়িতব্য। বেদান্ত দর্শন মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলিবেন, পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিবেন না, অর্থাৎ মূল ছাড়িয়া ফুল লইয়া ন্যায়-প্রস্থান-রূপ ভারতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র সূত্রকার লিখিবেন, ইহা উল্লেখ যোগ্যই নহে। দর্শন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও তাহা হইতেও সূক্ষ্মতমে যায়, যে পর্য্যন্ত কারণের কারণকে অথবা কারণাতীতকে না পাওয়া যায়। সেই পর্য্যন্তই দর্শন চলিতে থাকিবে। তাহার গতির বিরাম হইবে না। অতএব বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায় বিশেষের কল্পিত ও সীমাবদ্ধ

সগুণ ব্রহ্মের বিষয়ই লিখিয়াছেন বলিলে আর্য্য ঋষিদিগের গৌরব ক্ষুন্ন হয় কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই উপনিষদেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। সেই এক, সীমাবদ্ধ এবং মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম নহেন। কারণ, তাঁহার উপরে পরব্রহ্ম বর্ত্তমান। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মকে জানিলে পরব্রহ্মকে জানা হয় না। কিন্তু পর-ব্রহ্মকে জানিলে সগুণ ব্রহ্মকে জানা হয়। কবিগণ ফুলের বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্যের চিত্র আঁকিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করেন বটে, কিন্তু দার্শনিক সেই ভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি প্রকৃতি হইতে প্রকৃতি নাথকে (From Nature to Nature's God) লাভ করিবার জন্যই অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তিনি ফুল ছড়িয়া মূলে যাইবেন, এবং মূলেরও কোথায় কারণ, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ দর্শনে সেই কারণের কারণ—পরম কারণ সম্বন্ধে না বলিয়া মায়াবাদের কল্পিত সীমাবদ্ধ সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব্ব মীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা", আর বেদান্ত দর্শনের (উত্তর মীমাংসার) প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। সকলেই জানেন যে উপনিষদ্ মোক্ষ শাস্ত্র। সুতরাং উহার উপর ভিত্তি করিয়া যে দর্শন রচিত হইয়াছে, তাহাতেও যে মোক্ষের উপদেশ থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। মায়াবাদিগণও বলেন যে মোক্ষের অর্থ পরব্রহ্মের সহিত সোহহং জ্ঞান লাভ, সগুণ ব্রহ্মের সহিত নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে এই দেহে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইলেই দেহান্তে পরব্রহ্মে লয় হওয়া যায়। আর সগুণ ব্রহ্মের উপা-সনায় দেহত্যাগে দেবয়ান পথে গমন, বিদ্যুৎ প্রাপ্তি, ব্রহ্ম দর্শন ও লয়ের জন্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না হইয়া মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই পারে না। সুতরাং এই অধ্যায়ে পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও এই

শাণ্ডিল্য বিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইতেও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল। "সত্যই ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে। তাহার পর এই পুরুষ ক্রতুময়। সে যে প্রকারে ক্রতুমান হইয়া এই লোক হইতে গমন করে, সেই প্রকার ক্রতুমান হইয়াই মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয়। সে আত্মাকে উপাসনা করিবে—এই আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, ভা রূপ, আকাশাত্মা, কামরূপী, মনের ন্যায় বেগবান্, সত্য সঙ্কল্প, সত্য ধৃতি, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বদেশের প্রভু, সর্ব্বদেশে অনুব্যাপ্ত, বাগিন্দ্রিয় রহিত, অনাদর (উদাসীন)। যেমন ব্রীহি বা যব, বা শ্যামাক, বা শ্যামাক তণ্ডুল, তেমনি এই দেহস্থ হিরন্ময় পুরুষ। ধূমরহিত জ্যোতিঃর ন্যায় ইহা দ্যৌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমুদয় ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাণের আত্মা (প্রাণ), ইনিই আমার আত্মা। ইহলোক হইতে গমন করিয়া, এই আত্মাকেই লাভ করিব। যাহার এই প্রকার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, (ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে) তাহার কোন সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য ইহাই বলিয়াছেন এবং ইহা এই প্রকারই। (১০।৬।৩।১) (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদ্—১৭৬ পৃষ্ঠা)।"
আমরা যদি বেদান্ত দর্শনের ২।১।৩০ সূত্রের (সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" এর) শঙ্কর ভাষ্য পাঠ করি, তবে দেখিতে পাইব যে আচার্য্য উক্ত শব্দ সমূহ (সত্য সঙ্কল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ এবং সর্ব্বরস) পরব্রহ্মেরই বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রশ্ন কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন, তাহা কিসে জানিলে?" ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিলেন "পরদেবতা সর্ব্বশক্তি সম্পন্না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাগিন্দ্রিয় বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, সত্য সঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন।" অতএব পরব্রহ্ম যে সগুণ ও সক্রিয়—নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নহেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন।* ৩।১৪।৪

* সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, প্রভৃতি শব্দে ইহা বুঝিতে হইবে না যে পরব্রহ্ম

মন্ত্রে—পুনরায় পরব্রহ্মকে সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস বলা হইয়াছে। সুতরাং পরব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। ৮।১।৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী এস্থলেও ঈশ্বর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদিও তিনি এই মন্ত্রের প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পাঠক মনে রাখিবেন যে মায়াবাদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এক। জীব অবিদ্যা দ্বারা উপহিত, এই মাত্র প্রভেদ। ৮।৭—১ম ও ৩য় মন্ত্র—আত্মাকে সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রদ্বয় প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদের মন্ত্র। এই সংবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এস্থলে আত্মা অর্থে পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ১।৪।১০ মন্ত্রে—বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ"। তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া আছে। ৩।৭।৩-২৩ মন্ত্র সমূহে—দেখা যায় যে ব্রহ্ম, পৃথিবী, জল প্রভৃতি পদার্থ সমূহে অবস্থিত, অথচ উহাদের হইতে পৃথক্, উহারা যাঁহাকে জানে না, কিন্তু উহারা যাহার শরীর এবং উহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি উহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি আত্মা, ইনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত। ব্রহ্ম জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী। সুতরাং তিনি সক্রিয়।* ৩.৮।৯ মন্ত্র—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে ইত্যাদি। ব্রহ্মের শাসনে (কর্ত্তৃত্বে বা ইচ্ছায়) চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, কাল বিধৃত রহিয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম শাসনকর্ত্তা, অতএব সক্রিয়। ৪।৪।১৫ মন্ত্রে—আত্মাকে ঈশান বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে আত্মা অর্থে যে পরব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা পূর্ব্বাপর মন্ত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। "ঈশান" অর্থে শাসন কর্ত্তা বুঝায়। যিনি শাসন কর্ত্তা, তিনি নিশ্চয়ই সক্রিয়।

জাগতিক গন্ধ বা রস। তিনি নিত্য অরূপ অথচ অনন্ত রূপ, তিনি নিত্য জ্ঞান, অথচ তিনি অনন্ত প্রেমরসময়। এই সম্পর্কে "ইচ্ছাশক্তি" অংশ দ্রষ্টব্য।

* 'উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকা যোগে আত্মা ও জড়ের পার্থক্য বিচার" অংশে এই মন্ত্র সমূহের আলোচনা বর্ত্তমান।

৪।৪।২২ মন্ত্রে—পরব্রহ্মকে "সর্ব্বস্যবশী, সর্ব্বস্য ঈশান, সর্ব্বেশ্বরঃ, ভূতপালিঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি গুণধাম ও শক্তিমান। ৪।৫।৬ মন্ত্র—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত সুপ্রসিদ্ধ প্রেমতত্ত্ব। উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম অনন্ত প্রেমময়। এই মন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে ১৪৮-১৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্ম প্রেমময় ও সক্রিয়। ৫।৬।১ মন্ত্রে—হৃদয়স্থ পুরুষকে সকলের ঈশান বলা হইয়াছে। তিনি পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নহে বা হইতেও পারেন না। সুতরাং পরব্রহ্ম সক্রিয়। ৬।৩।৬ মন্ত্র—সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। "প্রচোদয়াৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি বুদ্ধি প্রেরণ করেন, তিনি সক্রিয়। এস্থলে বক্তব্য যে শঙ্কর স্বামী গায়ত্রী মন্ত্র ব্রহ্ম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সূর্য্য পক্ষে নহে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও গায়ত্রী মন্ত্র ব্রহ্ম পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশোপনিষদ্। ৮ম মন্ত্রে—মনীষী অর্থে মনের নিয়ন্তা। শঙ্কর মতে মানব প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কবি অর্থে সর্ব্বদৃক্। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদৃক্, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া নিশ্চিতই আছে। এই মন্ত্রে পরব্রহ্মই লক্ষ্য। সুতরাং যিনি নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদৃক্, তিনি নির্ব্বিশেষ বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। কেনোপনিষদ্। ১।১।২ মন্ত্র—প্রথম মন্ত্রে প্রশ্ন হইল "কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন, প্রাণ, বাক্, চক্ষু ও শ্রোত্র কার্য্য করে।" উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মই এই সমস্ত কার্য্যের কারণ—তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদি। সুতরাং তিনি ইচ্ছাময়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পরমপিতার ইচ্ছায়ই সকল কার্য্য হয়। তাঁহার কার্য্য করিতে আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের—যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এই মন্ত্রদ্বয় পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ১।৪-৮ মন্ত্র সমূহে—ব্রহ্মের শক্তিতেই বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও নাসিকা কার্য্য সম্পাদন করে বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি ইচ্ছাময়। ৩।১ মন্ত্র—ব্রহ্ম দেব হিতার্থে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদিগকে বিজয় দান করেন।

সুতরাং তিনি ইচ্ছাময়।* সমস্ত ৩য় খণ্ডে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান। জীব তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কেহই কিছু করিতে সমর্থ নহেন। তিনি ইচ্ছাময়। পাঠক মনে রাখিবেন যে দেবগণও জীব পর্য্যায় ভুক্ত। এই সম্পর্কে ১০৯৩-১০৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত কেনোপনিষদ্ সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্য পাঠক দেখিবেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম কৃপাময়। কঠোপনিষদ্। ১।২।২৩ মন্ত্রের—দ্বিতীয় অংশের অর্থে শঙ্কর স্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত রূপও হইতে পারে এবং তাহাই সুসঙ্গত মনে হয়। "যে সাধককে পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য। তাঁহার নিকট তিনি স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন।" ইহাতে ব্রহ্মকে কৃপাময় বলা হইয়াছে। কেনোপনিষদ্ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত মহাবাক্য যে সত্য, সত্য, পরম সত্য, তাহা সমগ্র কেনোপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। "ব্রহ্ম-কৃপাহিকেবলাম্।" ২।১।৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে ঈশান বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ২।১।১২ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে পুরুষ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। পুরুষ শব্দে ব্রহ্ম যে Personal God, কিন্তু নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নহেন, তাহা বুঝাইতেছে। ২।১।১৩ মন্ত্রে—পূর্ব্ববৎ। ২।২।৮ মন্ত্রে—বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জাগ্রত থাকিয়া কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছাময়। ২।২।১২ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বশী অর্থাৎ নিয়ন্তা বলা হইয়াছে। "যঃ করোতি" দ্বারাও তিনি যে সক্রিয়, তাহা বলা হইয়াছে। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে এই মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে এই মন্ত্রে ব্রহ্মের ইচ্ছায় জগৎ উৎপন্ন, ইহা বুঝাইতেছে। তাঁহার

* যদি উপাখ্যানটীকে রূপক ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্মের কৃপায়ই আমরা পাপের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করি ও পরিশেষে মোক্ষ লাভ করি। পরমপিতা ইচ্ছাময়। তাঁহারই ইচ্ছাই সর্ব্বত্র জয় যুক্ত হইতেছে। আমাদের শক্তি তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন মূল্য হীনা। আধ্যাত্মিক ও জড়ীয় শক্তির মূলে ব্রহ্মেরই শক্তি, ইহাই এই উপনিষদে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম সক্রিয়।

একটী গুণের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন। সুতরাং তিনি গুণময়। সুতরাং নির্ব্বিশেষ নহেন। ২।২।১৩ মন্ত্রে—"যো বিদধাতি কামান্" বাক্যে তিনি যে সক্রিয়, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। ২।৩।১৩ মন্ত্র—নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্ব ভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥" এস্থলে সাধনার ক্রম বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী এস্থলে সোপাধিক ও নিরুপাধিক সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এইরূপ ব্যাখ্যার কোনই প্রয়োজন নাই। এই মন্ত্র নিম্নলিখিত ভাবে অন্বয় করা যাইতে পারে। "অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চ উপলব্ধব্যঃ)। উভয়োঃ (উপলব্ধ্যো মধ্যে) অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্ব ভাবঃ প্রসীদতি।" "অর্থাৎ 'ব্রহ্ম আছেন' ইহা উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার তত্ত্বভাবও (অর্থাৎ তিনি যে একাধারে অনন্ত গুণ ও অনন্ত গুণাতীত) উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। এই উপলব্ধির মধ্যে ব্রহ্মের সত্তা স্বরূপ উপলব্ধি কারক সাধকের নিকট তাঁহার তত্ত্বভাব প্রকাশ পায়। ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্ব মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা প্রাপ্তব্য নহেন। যাঁহারা "তিনি আছেন" এইরূপ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা তাঁহাকে কিরূপে উপলব্ধি করিবে ? এই মন্ত্রের অর্থ এই যে "ব্রহ্ম আছেন' এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা ও সাধনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তির ব্রহ্মের অস্তিত্বেই বিশ্বাস নাই, তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য অন্য সাধনার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহা জলে জল ঢালার ন্যায় নিষ্ফল। অর্থাৎ "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি", অর্থাৎ সাধনার প্রারম্ভে আস্তিক্য বুদ্ধি যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ঋষি বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। ইহার পরই আলোচ্য মন্ত্র। উহার অর্থ এইযে সাধক সর্ব্বাগ্রে উক্ত আস্তিক্য বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে যখন ব্রহ্মের সত্তা স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, তখন তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) তত্ত্বতঃ অর্থাৎ তিনি যে অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত,

তাহাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয় ভাবেই ব্রহ্ম উপলব্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মের অস্তিত্বের অনুভূতি প্রথমে প্রয়োজনীয়। তাঁহার অন্যান্য স্বরূপের ধারণা পরপর হয়। "তত্ত্ব ভাবেন" ভা শব্দের অর্থ এই যে ব্রহ্ম যে অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ যাহা, তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। "স্বরূপ" অর্থে এস্থলে কেবল সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্বই বুঝাইবে না, তিনি যে অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ, ইহাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তিনি যাহা, তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা নিম্নোদ্ধৃত মহাবাক্য সমূহেও দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের সত্য স্বরূপই চিন্তনীয় ও সাধনীয়। সত্য স্বরূপের উল্লেখের পর তাঁহার অন্যান্য গুণের (স্বরূপের) উল্লেখ আছে। "(১) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। (২) অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। (৩) সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরম্। (৪) নমস্তে সতেতে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি। (৫) সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম। (৬) ওঁং সত্যং পূর্ণমমৃতং ওঁং। (সত্য ধর্ম্মে উপদিষ্ট ব্রহ্মোপসনার আদি ও অন্তে অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে জপনীয়।)।" এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে লিখিত ধ্যানাবস্থায় যে সকল অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধিই প্রথমে এবং অন্যান্য অবস্থা ক্রমশঃ লাভ হয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মকে সোপাধিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া তৎপর নিরুপাধিক ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাকে প্রথমতঃ সত্য স্বরূপ ভাবে দর্শন করিতে হইবে, তৎপর তাঁহাকে বুদ্ধির অতীত ভাবে দর্শন করিতে হইবে। "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম দর্শন কালে অন্তঃকরণ জীবাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহাকে সত্যস্বরূপ ভাবে দর্শন করিতে হইলেও বুদ্ধির অতীত অবস্থায় জীবের উপনীত হইতে হইবে। ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ ভাবে দর্শন করিতে জীবাত্মার পক্ষে বিশ্বের অবস্থা প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং এই স্থলে ব্রহ্মকে সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভাবে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। জগৎ বর্ত্তমান,

সুতরাং উহার সৃষ্টিকর্ত্তাও আছেন অর্থাৎ তিনি সত্য এই ভাবে যদি ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং এই অর্থেই যদি তিনি সোপাধিক মনে করা হয়, তবে ত জগৎকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করা হইল এবং মায়াবাদের জগন্মিথ্যাবাদ খণ্ডিত হইল। আলোচ্য মন্ত্রের প্রকৃত ভাব ইতি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদ্। মন্তব্যের কিছু নাই। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মই স্রষ্টা। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। মুণ্ডকোপনিষদ্। ১৷১৷৯ মন্ত্র—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল জানেন, সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষ রূপে সকল জানেন, যাঁহার তপঃ জ্ঞানময়। এই মন্ত্র দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া আছে। তিনি নিজেকেও নিজে জানেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে বৃহদারণ্যকের ১৷৪৷১০ মন্ত্রের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি। সুতরাং জ্ঞানকে তাঁহার গুণ না বলিয়া পারা যায় না। ২৷২৷৮ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে পরাবর শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী পরাবর শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে "যিনি কারণরূপে পরশ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবরহীন।" ইহাতে ব্রহ্মের কার্য্যরূপও বলা হইল, কেবল কারণরূপ ও কার্য্য রূপের মধ্যে তারতম্য করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ২৷২৷১১ মন্ত্রে—"ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং" বলা হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ। শঙ্কর স্বামী প্রথমে এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপই বটে বলিয়া পরে লিখিয়াছেন যে "রজ্জুতে যে রূপ অজ্ঞানাত্মক সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ অব্রহ্ম বুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, ইহাই বেদের উপদেশ। মায়াবাদে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব কেবলম্" বলা হয়। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে আবার তাহা ব্রহ্ম স্বরূপ কেমনে হইবে ? উহা ত কোনও সত্য বস্তুও নহে। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে। ২৷২৷৮ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। গীতাও সেই কথাই বলিয়াছেন।

সুতরাং যাহা মিথ্যা, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেই পারে না। ৩।১।১-২ মন্ত্রদ্বয়—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৪।৬-৭ মন্ত্রদ্বয় সম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ৩।১।১ মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অপূর্ব্ব প্রেমমিলনে—সখ্য ভাবে মিলিত। সুতরাং ব্রহ্ম প্রেমময়। ইহাতে আরও আছে যে জীবাত্মা মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন এবং শক্তিহীনতা জন্য শোক করেন। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৩।১।৩ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" বলা হইয়াছে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। পূর্ব্বাপর মন্ত্র পাঠ করিলেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। পরব্রহ্ম কর্ত্তা ঈশ ও পুরুষ। সুতরাং তিনি যে ইচ্ছাময়, তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা একটী শক্তি বিশেষ, তাহাতে কোনই সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। শক্তি গুণনিষ্ঠ। যাঁহার শক্তি আছে, তাঁহার গুণও বুঝিতে হইবে। ৩।২।১ ও ৩।২।৮ মন্ত্রদ্বয়ে—পরব্রহ্মকে পুরুষ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি Personal God, সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। <u>মাণ্ডূক্যোপনিষদ্</u>। সপ্তম ও দ্বাদশ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে শিব বলা হইয়াছে। আমরা 'স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের মিলন হইয়াছে বলিয়াই তিনি শিব। সুতরাং তিনি অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। যিনি মঙ্গলময়, তিনি যে সক্রিয়, তাহা সহজ বোধগম্য। <u>তৈত্তিরীয়োপনিষদ্</u>। ২।১ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী এই তিনটীকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। উঁহারা যে ব্রহ্মের গুণ, তাহা বলিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কারণ, তাহা বলিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব থাকে না। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে বিশেষণ সমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে। আর লক্ষণ সাধারণতঃ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য জ্ঞাপন করে। ইহার অর্থ এই যে লক্ষণ বিশেষ্যের পরিচায়ক অর্থাৎ ইতর ভেদ বোধক। আর বিশেষণ বস্তুর পরিচায়ক

নহে, অপর বিশেষণের ব্যবর্ত্তক মাত্র। ঘটের লক্ষণ কুম্ভ-গ্রীবাদি বিশিষ্ট। এই লক্ষণ ঘটকে কুম্ভ-গ্রীবাদি শূন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিতেছে। আর নীল উৎপলের নীল গুণটী বিশেষণ, উহার রক্তাদি গুণান্তরের ব্যবর্ত্তক মাত্র, কিন্তু উৎপলের পরিচায়ক নহে। অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা বিশেষ্যকে Emphasise করা হয়; আর বিশেষণ দ্বারা বিশেষণকেই Emphasise করা হয়। নতুবা উভয়ই এক। পাঠক দেখিবেন যে উভয়ই বিশেষণ—গুণ প্রকাশক মাত্র। নীল উৎপল বলিলে উৎপলের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু উহার একটু খানি পরিচয় পাই। অর্থাৎ একটী মাত্র গুণের পরিচয় পাই। সেইরূপ ঘটের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইল, উহা দ্বারাও ঘটের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। আর লক্ষণের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে যে উহাও বিশেষণ বই আর কিছুই নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরাও বলি যে ব্রহ্মের সত্যত্ব বা অস্তিত্ব একটী মাত্র গুণ, জ্ঞানও সেইরূপ একটী মাত্র গুণ, অনন্তত্ব এবং আনন্দও এক একটী গুণ। ইহাদের এক একটী লক্ষণ দ্বারা অথবা চারিটি একত্র যোগেও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য যদি বলা যায় যে ব্রহ্মের এক একটী গুণ তাঁহার এক একটী অংশ মাত্র, তবে উক্ত চারিটি গুণ-বাচক শব্দ তাঁহার চারিটি মাত্র অংশের পরিচায়ক মাত্র। উহাদের দ্বারাও অনন্ত গুণনিধিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না অথবা বুঝাইতেও পারে না। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ ব্রহ্মের চারিটী পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ। উক্ত চারিটী শব্দের চারিটী পৃথক্ পৃথক্ অর্থ, সুতরাং উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের একটী স্বরূপ বুঝায় বলিলে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।* অতএব লক্ষণ ও বিশেষণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ই গুণ প্রকাশক মাত্র। লক্ষণও যে বিশেষণ, তাহা

* পাঠক এই সম্পর্কে "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশ দেখিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে অনন্ত গুণরাশি বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহাদের অনন্ত মিশ্রণে উঁহারা একীভূত হইয়া আছে এবং তিনি অনন্ত গুণেরও অতীত।

ব্রহ্মানন্দ বল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যে শংকর স্বামী স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের ১।১।১৫ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন —"যস্মাদ্ ব্রহ্ম বিদাপ্নোতি পরম্" "ইত্যুপক্রম্য সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাস্মিন্ মন্ত্রে যদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতং সত্য জ্ঞানানন্ত বিশেষণে নির্দ্ধারিতং ইত্যাদি।" "বঙ্গানুবাদ:—শ্রুতি 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়' এই রূপ বলিয়া ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত এইরূপ মন্ত্র বাক্য বলিয়াছেন। এই মন্ত্রে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ব্রহ্মই সত্যাদি বিশেষণের নিরূপিত হইয়াছেন। (দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)"। এস্থলে শঙ্কর স্বামী সুস্পষ্ট ভাবে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন। বলা হয় যে লক্ষণ সাধারণত: সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে লক্ষ্যের পার্থক্য জ্ঞাপন করে। মায়াবাদে ব্রহ্মই সমুদায়, সুতরাং তাঁহাতে সজাতীয় ও বিজাতীয় অন্য কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। অএতব উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারেও তাঁহাতে লক্ষণের বিশেষ অর্থে লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে উপনিষদে পরব্রহ্মের নানাবিধ গুণরাশি তাঁহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথায়ও সত্যং জ্ঞান-মনন্তম্' অথবা 'সত্যং জ্ঞানমানন্দম্'কে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ এবং তাঁহার অন্যান্য গুণরাশিকে তটস্থ লক্ষণ ভাবে ইঙ্গিতেও বর্ণিত হয় নাই। "সত্যং" যেমন তাঁহার একটী বিশেষণ, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, গুণী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা প্রভৃতিও সেইরূপ এক একটী গুণ বা বিশেষণ। উপনিষদে এক বিশেষণের সহিত অন্য বিশেষণের কোনও তারতম্য করা হয় নাই। ইহা মায়াবাদের কষ্ট কল্পনা বই আর কিছুই নহে। মায়াবাদী অবশ্যই বলিবেন যে উপনিষদ্ গুরুশাস্ত্র। উহা সংক্ষেপে তত্ত্ব সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন নাই। ইহার উত্তর বুঝিতে পাঠককে ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উপনিষদ বেদের জ্ঞান ভাগ বা মোক্ষ শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রামাণ্য উপনিষদ সমূহ নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে

পাইবেন যে উহাতে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে, যাহাতে মোক্ষ প্রতিপাদনে উহাদের কোনই আবশ্যকতা মনে করা যায় না। যদি বলা যায় যে উপনিষদে এমন কোন আলোচনা নাই, যাহা মোক্ষ প্রতিপাদনে প্রয়োজনীয় নহে, সকল আলোচনাই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মোক্ষ প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই, তবে তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিয়াও উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল ঔপনিষদিক আলোচনা পরোক্ষ ভাবে মোক্ষ প্রতিপাদন করে বলা হইল, তাহাদের হইতে অবশ্যই আলোচ্য বিষয় অত্যধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয়। কারণ, তাহা 'ব্রহ্ম কিং স্বরূপ' এই মহা-প্রশ্নের বিচারে অবশ্যম্ভাবী রূপে উপস্থিত হইবে। ইহা ভিন্ন উহাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব ও সুযুক্তিপূর্ণ বিস্তারিত দার্শনিক সমালোচনাও বর্ত্তমান, অথচ মায়াবাদের এই বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে কোথায়ও কোনও উল্লেখ নাই কেন? ইহা দ্বারা কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে বৈদিক ঋষিগণের জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে কখনই মায়াবাদের পূর্ব্বোক্ত মত (নির্ব্বিশেষবাদ) স্থান লাভ করিতে পারে নাই এবং তাঁহারা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণ নিধান। অতএব আমরা পাইলাম যে উপনিষদুক্ত বিশেষণ সমূহ (সত্যং জ্ঞানমনন্তং সহ) ব্রহ্মের বিশেষণই (গুণই) বটে। উঁহারা বিশেষণ (গুণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে। নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রমাণ নাই, স্বীয় অনুভব সিদ্ধও বলা যায় না। কারণ, বিশেষণ ভিন্ন বস্তুর প্রতীতি হয় না বা হইতেও পারে না। গুণের একটী অর্থও রূপ। সুতরাং উহাকে লক্ষণ বলিলে দোষ কি? মায়াবাদিগণ সত্য, জ্ঞান, ও অনন্তত্বকে ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপ বলেন। যদি উহারা স্বরূপ হয়, তবে উহারা যে "ব্রহ্মের স্বগুণ", ইহা সহজ বোধ্য। অপের লক্ষণের মধ্যে তারল্য ও নিম্নগামিত্ব আমরা দেখিতে পাই। উক্ত লক্ষণদ্বয় কি উহার গুণ নহে? সত্যের অর্থ যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, তাহা যদি সেই রূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবে তাহা সত্য। ইহা যদি ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপ হয়,

তবে কি তাহা তাঁহার গুণ নহে? অর্থাৎ তিনি নিত্য নির্ব্বিকার, তিনি অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইহাই কি তাঁহার অনন্ত গুণরাশির মধ্যে একটী গুণ নহে? শঙ্কর স্বামী জ্ঞান অর্থে অবরোধ বা উপলব্ধি বলেন। উপলব্ধি অর্থে কি জ্ঞানক্রিয়া বুঝায় না? আচার্য্য রামানুজ এই তিনটীকেই ব্রহ্মের গুণ বলিয়াছেন। আমাদের মতেও ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিলে জ্ঞান তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে একটী গুণ বুঝায়। জ্ঞানের কার্য্য জানা। জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞানক্রিয়া আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ"। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য উপনিষদ্ হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজে নিজেকে জানেন এবং সকলকে জানেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া আছে ইহা নিঃসন্দেহ। জ্ঞানের কার্য্য জানা। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে তাহার জ্ঞান আছে, কিন্তু তিনি জানেন না, তবে কি উহারা স্ববিরোধী উক্তি হইবে না? মায়াবাদিগণ মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি বলেন। তাহা স্বীকার করিলেও আমাদের অন্তঃকরণের আদি স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পাঠক এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দেখিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মার জ্ঞান দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃত ভাবে চারি ভাগে প্রকাশ পায়। যথা—বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহঙ্কার। সুতরাং জ্ঞানকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়াও উদ্ধার পাওয়া গেল না। অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞানই থাকিল, কিন্তু পার্থক্য হইল এই যে যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, তাহা বিকৃত ও অপূর্ণ জ্ঞান। পরমাত্মার দেহ নাই, সুতরাং তাঁহার দেহ সংসর্গ নাই। ইহা উভয় পক্ষ সম্মত। অতএব তাঁহার জ্ঞান নিত্য, অনন্ত ও অবিকৃত, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান সত্য, নিত্য ও পূর্ণ। মায়াবাদে অন্তঃকরণ জড়, মনঃ অন্তঃকরণেরই অন্তর্গত। যদি আমাদের জ্ঞানকে আত্মার গুণ না বলিয়া কেবল অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ বলা হয়, তবে কি আমরা জড়বাদে আসিয়া উপস্থিত হই না? জড়বাদে আমাদের অন্তঃকরণ আর কিছুই নহে, কেবল মস্তিষ্ক। অন্তঃকরণের নানাবিধ অবস্থা, যথা জ্ঞান,

ভাব ও ইচ্ছা কেবল শারীরিক জড় পদার্থ সমূহের সংমিশ্রণের (Physical and Chemical action এর) ফল মাত্র। যেমন পিত্ত প্রস্তুত হয় তেমনি মস্তিষ্কেরও ঐ সকল অবস্থা নানাবিধ সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় মাত্র, ইহাই জড়বাদ। জড়বাদী বলিবেন যে সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষের দেহে বর্ত্তমানতার জন্য অথবা মায়াবাদের চিদাভাসের (দেহে নিষ্ক্রিয় আত্মার বর্ত্তমানতায় তাহার আভাস মাত্রের) জন্য শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া যদি সম্ভব হয় মনে করেন, তবে শারীরিক নানাবিধ জড় পদার্থের Physical and Chemical action এও বা কেন মনের নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হইবে না? দেখা যায় যে দুই বা ততোঽধিক জড় পদার্থ এক স্থানে থাকিলে তাহার ফলে মানবের চেষ্টা ভিন্নও কোন কোন কার্য্য হয়। "চিদাভাস' অংশে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে নির্গুণ (গুণ শূন্য) এবং নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মের দেহে বর্ত্তমানতার জন্যই অন্তঃকরণের কোনই কার্য্য হইতে পারে না। অতএব আমরা আমাদের জ্ঞানকে কেবল অন্তঃকরণ বৃত্তি বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। 'ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান আছে, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও জানেন না" এই উক্তিদ্বয় স্ববিরোধী, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে প্রদীপ গৃহকে আলোকিত করে, কিন্তু নিজেকে আলোকিত করে না। ইহা কি সত্য? জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মাত্রই যেমন অন্যকে প্রকাশ করে, তেমনি নিজেকেও প্রকাশ করে। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বলিল, এখন গৃহের বস্তু সমূহ যেমন প্রকাশ পাইতেছে, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটীও তেমনি প্রকাশ পাইতেছে। উহা নিজেকে প্রকাশ না করিয়া অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে জ্ঞান ব্রহ্মের একটী গুণ এবং সেই গুণ দ্বারা তিনি নিজেকে এবং তাঁহার অন্তর্গত সকল পদার্থকে জানেন। নতুবা জ্ঞানময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাহার তপঃ জ্ঞানময় ইত্যাদি উক্তির কোনই অর্থ থাকে না। পাঠক মনে রাখিবেন যে উহারা শ্রুতিতে পরব্রহ্মের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, যে প্রণালীতে মানবের বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা লক্ষ্য

করিয়াই ব্রহ্মের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম হয়। মানুষের যেমন জ্ঞান লাভের জন্য অন্য একটী পদার্থের প্রয়োজন হয়, ব্রহ্মেরও ঠিক সেই ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এইরূপ চিন্তা করিতে যাইয়াই আমাদের ঐরূপ ভুল হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান তাঁহার হইতে ক্ষুদ্রাংশেও পৃথক্ নহে। তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ নাই। তাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ অর্থাৎ আমরা যাহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বলি, তাহা তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার জ্ঞানলাভের জন্য যেমন অন্য পদার্থের প্রয়োজন হয় না, তেমনি তাঁহার জ্ঞান লাভের জন্য অন্তঃ-করণের যন্ত্র মস্তিষ্ক ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলেও তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয় না। কারণ, তিনি নিত্যই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে বৃহদারণ্যকের ১।৪।১০ মন্ত্রের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানেন। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত আলোচনা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম যদি নিজেই জ্ঞাতা ও নিজেই জ্ঞেয় হন, তবে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তিনি নিজেই কর্ত্তা ও নিজেই কর্ম্ম বলা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মায়াবাদী যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন, তখন তিনি কেন স্বীকার করেন না যে ব্রহ্মই কর্ত্তা এবং তিনিই কার্য্য। (পরাবর শব্দের ইতিপূর্ব্বে লিখিত অর্থ পাঠক দেখিবেন।) অর্থাৎ ব্রহ্মই তাঁহার হইতে এবং তাঁহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে লিখিত তৈত্তিরীয়োপনিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অনুবাক্ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। শঙ্কর স্বামী এস্থলে ব্রহ্মে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়া এক ব্রহ্মই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই হইতে পারেন না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৬ সূত্রের (আত্ম-কৃতেঃ পরিণামাৎ সূত্রের) ভাষ্যে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক্। "ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎ কারণং ব্রহ্ম প্রক্রিয়ায়াং তদা-ত্মানং স্বয়মকুরুত ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি

কর্ম্মত্বং, স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং, পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামানাত্মনমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষুপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।" "বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, উপাদান, এতৎ প্রতি অন্য হেতু এই যে শ্রুতি ব্রহ্ম প্রকরণে "ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন"—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন। এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ করিয়াছেন। 'আপনাকে' এতদ্বারা কর্ম্মত্ব (ক্রিয়ামানত্ব বা কৃতির বিষয়) এবং আপনিই করিলেন এতদ্বারা কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। যদি বল, যাহা পূর্ব্ব সিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে কিরূপে তাহার ক্রিয়ামানতা ঘটনা হয় ? সম্ভব হয় ? (যাহা থাকে না, তাহা কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত।) ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই পূর্ব্ব সিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম) আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকার রূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্ব সৃষ্টির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং শব্দ দ্বারা লব্ধ হইতেছে। (কালীবর বেদান্তবাগীশ)।" এস্থলে সুস্পষ্ট ভাবে আচার্য্য বলিতেছেন যে ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব উভয়ই সম্ভব। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে এমন কেহ বা কিছু (ব্রহ্ম ভিন্ন) ছিলেন না বা থাকিতেও পারেন না। যদি সৃষ্টিরূপ বিশাল কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মের কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ রূপ কোন দোষ না হয়, তবে তিনিই জ্ঞাতা ও তিনিই জ্ঞেয়, ইহা বলিতেই বা দোষ হইবে কেন ? এস্থলে উপরোক্ত ব্যাখ্যা সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিছুই আসিয়া যায় না। কারণ, শঙ্কর মতে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ কোনও স্থলেই হইতে পারে না—তাহা তিনি পরব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম অথবা জীব, যিনিই হউন্ না কেন। অবশ্য আমাদের মতে এই

সূত্র একমাত্র পরব্রহ্মেই প্রযোজ্য এবং শঙ্কর স্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। এই সূত্র তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম অনুবাকের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই অধ্যায় যে ব্রহ্ম প্রকরণ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সম্পর্কে সুষুপ্তি অংশে উদ্ধৃত শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে কূটস্থ ব্রহ্মের (জীবাত্মার) জ্ঞাতৃ ভাব আছে। অর্থাৎ তিনি জানেন। সুতরাং তিনি সক্রিয় ব্রহ্ম ও কূটস্থ ব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই, দ্বিতীয় অবিদ্যা উপাহিত, এই মাত্র। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্মও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শঙ্কর মতে দেখা গেল যে তিনি সক্রিয়। সুতরাং ব্রহ্মও সক্রিয়। সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।১৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের চক্ষুরাদি জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি জানেন এবং কর্ম্ম করেন। "স বেত্তি বিশ্বং"। তিনি সকলই জানেন বলিলে তাঁহাকে জ্ঞাতা ভিন্ন আর কি বলা যায়? ইহা ভিন্ন উপনিষদ্ সমূহে ব্রহ্মের আরও অনেক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, যাহা দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাতা ও কর্ম্মকর্ত্তা বলা হইয়াছে পাঠক পূর্ব্ব লিখিত অংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রহ্মের গুণরাশিকে বিশেষণ ভাবে নির্দ্দেশ করাই লক্ষণ (স্বরূপ, ও গুণ সম্বন্ধে বিবাদের মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। যদি ব্রহ্মের প্রত্যেক গুণকেই বিশেষণ গুণ না বলিয়া বিশেষ গুণ বলা হয়, তবে এই সমস্যার মীমাংসা সহজ লব্ধ হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন। "আত্মার গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ কহে। ইহাদিগের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করে না, এজন্য ইহাদিগকে বিশেষ্য গুণ বলে। (সত্যধর্ম্ম)।" অর্থাৎ আত্মার গুণরাশি প্রত্যেকেই স্বয়ং স্বাধীন ভাবে পরিচিত। অর্থাৎ 'সত্য' বলিলে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইবে না। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্যস্বরূপ, তিনি ভিন্ন অন্য কোথায়ও সত্য নাই। জগতে যাহা সত্য দেখি, তাহা তাঁহার সত্যের আভাস বা ক্ষুদ্রাংশে প্রকাশ বই আর কিছুই নহে। সেইরূপ জ্ঞান বলিলেও অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করা হইবে না, প্রেম বলিলেও অন্য কাহাকে লক্ষ্য করা হইবে না, কেবল একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝাইবে।

সেইরূপ পবিত্রতা, একাগ্রতা, সরলতা প্রভৃতি অনন্ত গুণ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। সেই একজনকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা. ভগবান, ঈশ্বর যে শব্দেই আমরা নির্দ্দেশ করি না কেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণও সকলেরই আছে। সুতরাং জ্ঞান বা প্রেম বলিলে একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝাইবে কেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি অনন্ত সরল গুণ একমাত্র ব্রহ্মেই নিত্য অনন্ত ভাবে পূর্ণ আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ। অন্য কুত্রাপি একটী সরল গুণও নাই। তবে যে আমরা জীবে আধ্যাত্মিক গুণ দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মেরই গুণরাশি নানা জীবে নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কোথায়ও কোনও সরল গুণের অঙ্কুর মাত্র, কোথায়ও সরল গুণের আংশিক বিকাশ মাত্র। আবার একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণে কোন কোন গুণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং নানা জীবে অপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে হৃদয়ে যতটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছেন, সেই বিকাশকেই আমরা জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি শব্দে প্রকাশ করি। ব্রহ্মে ভিন্ন কোন সরল গুণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ, ব্রহ্মের অনন্ত গুণ নিত্য অখণ্ড। উঁহারা কখনও বিভক্ত হয় না। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মই স্বয়ং বহু জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" সুতরাং আমরা সত্য বলিলে একমাত্র সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝিব। সেইরূপ জ্ঞান বলিলে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝিব, প্রেম বলিলে এক-মাত্র প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝিব ইত্যাদি। আমরা ব্রহ্ম ও আত্মা শব্দের ধাত্বর্থ জানিয়াছি। সুতরাং ব্রহ্ম বলিলে একমাত্র নিরতিশয় বৃহত্ত্ব স্বরূপ এবং আত্মা বলিলে অনন্তব্যাপিত্ব স্বরূপ যিনি, তাঁহাকেই বুঝিব। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত স্বরূপ অথবা অনন্ত গুণ এবং সেই সকল গুণ স্বাধীন ভাবে পরিচিত। সুতরাং সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও চলিতে পারে। আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বও ত (বৃহত্তমত্ব ও অনন্তত্বও ত)

একটী বিশেষ্য গুণই। উঁহাও সত্য, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি অনন্ত গুণ-রাশির সহিত এক পর্য্যায় ভুক্ত। যদি বলেন যে অনন্ত গুণের সমষ্টি বা একত্ব যিনি, তাঁহাকেই আমরা ব্রহ্ম বলিয়া থাকি, তবু আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে অনন্ত একত্বের একত্বও একটী গুণ বা স্বরূপ এবং উঁহাও বিশেষ্য গুণ। কারণ, উঁহা একমাত্র অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপেই বর্ত্তমান, উঁহা অন্য কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে প্রেম প্রভৃতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র, কিন্তু উঁহারা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ নহে, তবে বলিতে হয় যে গুণ বা স্বরূপ হিসাবে জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। জ্ঞানও নিত্য, অনন্ত ও পূর্ণ, প্রেমও নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ। জ্ঞান কখনই ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন বা হইতে পারেন না। জ্ঞান ব্রহ্মে নিত্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান। প্রেম সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি প্রযোজ্য। ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে তাঁহার জ্ঞান স্বরূপের যে রূপ চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁহার প্রেম স্বরূপেরও সেই একই রূপ চিন্তারই আবশ্য-কতা বর্ত্তমান। জ্ঞান বাদ দিয়া ব্রহ্ম চিন্তা যেরূপ অসম্পূর্ণ, প্রেম বাদ দিয়াও তাঁহার চিন্তাও সেইরূপ অসম্পূর্ণ। এইরূপ ব্রহ্মের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে সেই সকল গুণ নিত্য, অনন্ত ও পূর্ণ। সত্য, জ্ঞান, ও অনন্তত্ব যেরূপ লক্ষণ বা স্বরূপ, উঁহারাও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বরূপই বটে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে রূপের একটী অর্থ। সুতরাং স্বরূপের অর্থ স্বগুণ অর্থাৎ নিজের গুণ। সুতরাং স্বরূপ ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকিল না। অতএব আমরা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে লক্ষণ, গুণ, রূপ, স্বরূপ, বিশেষণ প্রভৃতি শব্দ একই অর্থ প্রকাশক, কেবল ভাষার মারপ্যাচ মাত্র। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ আছে, ইহা সত্য, এবং সেই অনন্ত গুণের একত্বের অর্থাৎ অনন্ত একত্বের একত্বে তিনি নিত্য বিভূষিত। সুতরাং তাঁহার একটী গুণ, স্বরূপ বা লক্ষণ এবং সেই অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্যনীয় স্বরূপকেই ওঁং প্রণব দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহার আরও বিস্তারিত বিবরণ "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে

আমরা দেখিতে পাইব। ২।৭ মন্ত্রে ব্রহ্মকে "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ প্রেমময় বলা হইয়াছে। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃত-মুচ্যতে।" তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে স্বয়ং-কর্ত্তা বলা হয়। ইহাতে ব্রহ্মকে যে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। এই মন্ত্রের পরেও ব্রহ্মকে কিরূপে নিষ্ক্রিয় বলা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান কারণ, তাহাও উক্ত মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। জগৎ যে মায়ার খেলা নহে, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে ? এই প্রকরণ যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শঙ্কর ভাষ্য হইতেও তাহাই বুঝিতে পারা যায়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই প্রকরণের অন্তর্গত। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। ঐতেরেয়োপনিষদ্। ১।১৩-১৪ মন্ত্রে—ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ দর্শন করিলেন। সেই জন্য পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া আছে। ১।১ মন্ত্রে তিনি যে জগৎ স্রষ্টা, তাহা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। কৌষীতকী উপনিষদ্। ৩।৮ মন্ত্রে—পরমাত্মাকে লোকপাল ও সর্ব্বেশ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৪।১৯ মন্ত্রে—"যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি।" এস্থলে ব্রহ্মকে সকল পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সমুদায় জগৎ তাঁহার কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ১।৬ মন্ত্রে ব্রহ্মকে প্রেরিতারম্ বলা হইয়াছে। প্রেরিতার—প্রেরয়িতা। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ১।৭ মন্ত্রে—বলা হইয়াছে যে বেদান্তে পরব্রহ্ম উদ্গীত হইয়াছেন। সুতরাং এই উপনিষদে উক্ত ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, পুরুষ, অক্ষর, ঈশ প্রভৃতি শব্দে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা হইল। যদি সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা হয়, তবে তাহা কষ্ট কল্পনা মাত্র। পরব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা এই ভাবত্রয় বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি সক্রিয়। তিনি যদি ভোক্তা ও ভোগ্য হইতে পারেন, তবে

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতে দোষ কি ? এই উক্তিতে কি কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ হয় নাই ? ১।৯ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ ও অকর্ত্তা দুইই বলা হইয়াছে। মায়াবাদে জগৎ মিথ্যা, সুতরাং ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ বলার অর্থ মিথ্যারূপ। ভক্তগণ ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন। গীতার বিশ্বরূপ বর্ণনা পাঠে তাঁহাকে সক্রিয় বলা হয়। অকর্ত্তা অর্থ জীবের ন্যায় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি সংসার ভাব নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় ইহা বলা হয় নাই। কারণ, এই উপনিষদেই বহু স্থলে তাঁহাকে সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ইত্যাদি বহু কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। একস্থানে এমনও বলা হইয়াছে যে তাঁহার 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ।" ৩।১৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে তাঁহার জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই করেন। সুতরাং তিনি অকর্ত্তা নহেন। আমাদের মনে হয় যে ব্রহ্ম মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি দ্বারা কার্য্য করেন না বলিয়া তাঁহাকে অকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ১।১০ মন্ত্রে -ব্রহ্ম প্রধানকে এবং জীবকে নিয়মন করেন ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৩।১ মন্ত্রে—ব্রহ্ম সম্বন্ধে "ঈশানিভিঃ" অর্থাৎ "স্বশক্তিভিঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তিতেও "ঈশানিভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে" বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান এবং নিজ শক্তি দ্বারা সমুদায় লোক নিয়মন করেন। সুতরাং তিনি সক্রিয়। মায়াবাদী মায়া ভিন্ন ব্রহ্মের অন্য কোন শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু উপরোক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মকে বহু শক্তিমান বা সর্ব্বশক্তিমান বলা হইয়াছে। সেই মায়া শক্তিও ব্রহ্মের যোগে কার্য্য করে না, কিন্তু উহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ কৃতা। ৩।২ মন্ত্রে — ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। রুদ্র অর্থে ব্রহ্ম, দেবতা নহেন। বৈদিক রুদ্র দেবতা ১১ জন, কিন্তু এস্থলে বলা হইয়াছে যে রুদ্র একই, দ্বিতীয় রুদ্র নাই। রুদ্র অর্থে যে ব্রহ্মের ভীষণ ভাব বুঝায়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয় কিন্তু নির্ব্বিশেষ নহেন। ৩।৩ মন্ত্রে—ব্রহ্ম আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন,

মানবকে বাহু ও পক্ষীকে পক্ষ দিয়াছেন বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৩।৪ মন্ত্রে—পরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৩।৫ মন্ত্রে পরব্রহ্মকে শিব বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির আধার বুঝিতে হইবে। যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ ও শক্তি নাই, তিনি শিব হইতে পারেন না। এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" ও "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশ দ্রষ্টব্য। সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। ৩।১১ মন্ত্রে—পরব্রহ্মকে ভগবান বলা হইয়াছে। ভগবান শব্দে সর্ব্বশক্তিমান বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকে কেহ কেহ বেদান্তের ভাষ্য বলেন। এস্থলে ব্রহ্মকে শিবও বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয় সুতরাং নির্ব্বিশেষ নহেন। ৩।১২ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে প্রভু, পুরুষ. সত্ত্বের প্রবর্ত্তক ও ঈশান বলা হইয়াছে সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৩।১৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে অমৃতত্বস্য ঈশান বলা হইয়াছে। মন্তব্য পূর্ব্ববৎ। ৩।১৭ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে প্রভু ও ঈশান বলা হইয়াছে। মন্তব্য পূর্ব্ববৎ। ৩।১৮ মন্ত্রে—স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোকের নিয়ন্তা বলা হইয়াছে। মন্তব্য পূর্ব্ববৎ। ৩।১৯ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে "স বেত্তি বেদ্যং" বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে প্রথম দুই পংক্তিতে ব্রহ্মকে সক্রিয় ও জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি কর্ম্ম করেন এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৩।২০ মন্ত্রে—"ধাতুঃ প্রসাদাৎ" উক্তি দ্বারা ব্রহ্মকে বিধাতা ও কৃপাময় বলা হইয়াছে। সকল ঋষিই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিবেন যে পরম কৃপাময় স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রসন্ন না হইলে তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। ব্রহ্মকে ঈশও বলা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৪।১ মন্ত্রে—"বহুধা শক্তিযোগাদ্" বলা হইয়াছে। ইহাতেও ব্রহ্মের বহু প্রকারের শক্তির উল্লেখ আছে। অতএব মায়াই তাঁহার একমাত্র শক্তি নহে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৪।৬ মন্ত্রে—মায়াবাদে জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র। তিনি মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে পারেন না। যদি বলা হয় যে এস্থলে চিদাভাসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব।

কারণ, মন্ত্রের প্রথম পংক্তিদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দেহ-বৃক্ষে সখ্য ভাবে নিত্য যুক্ত। চিদাভাসের উল্লেখ নাই। আর পরমাত্মার সহিত কল্পিত চিদাভাসের যে সখ্য হইতে পারে না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। এই মন্ত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম প্রেমময়। "অভিচাকশীতি" অর্থে পশ্যতি। অতএব ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া আছে। ৪।৭ মন্ত্রে—জীবাত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তিনি বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি দেহজাত দোষপাশরাশির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই দোষপাশরাশির লয়ে মোক্ষ। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য। সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। ৪।১১ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে ঈশান, বরদ ও দেব বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয় ও জ্যোতির্ম্ময় সুতরাং সগুণ। ৪।১৩ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের নিয়ন্তা বলা হইয়াছে। তিনি ঈশ, সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৪।১৪ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক রূপ ও শিব বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি গুণ-বান ও শক্তিমান। ৪।১৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে ভুবনের গোপ্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৪।১৭ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৪।২১ মন্ত্রে—রুদ্র শব্দে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, রুদ্র নামক দেবতাকে নহে। কারণ, প্রথমেই তাঁহাকে অজাত বলা হইয়াছে। দেবতাদিগেরও জন্ম আছে। একমাত্র পর-ব্রহ্মেরই জন্ম নাই, আদি নাই। ৩।২ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। মায়াবাদ অংশের অন্তর্গত ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে রুদ্র সম্বন্ধে মন্তব্যও দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের ভীষণত্বের ভাব গ্রহণ করিয়া এস্থলে রুদ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা "রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" মন্ত্র যোগে নিষ্পন্ন হয়। ব্রাহ্মগণ এস্থলে রুদ্র অর্থে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করেন। যাঁহার ভীষণত্ব গুণ আছে, তিনি অবশ্যই সগুণ, আবার যিনি পালন করেন, তিনি অবশ্যই সক্রিয়। ৫।৪ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে ভগবান ও দেব বলা হইয়াছে। ৩।১১ এবং ৪।১১ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ৫।৫ মন্ত্রে—"পচতি" "পচ্যান্" ও "বিনি-

যোজয়েৎ” শব্দ সমূহ দ্বারা ব্রহ্মের ক্রিয়া বুঝাইতেছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৫।১৩ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বের স্রষ্টা ও অনেকরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে ঋষি বারংবার ব্রহ্মকে অনেকরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি নির্গুণ (গুণ শূন্য) হইতে পারেন না। ৫।১৪ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে “কলা সর্গকর” অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাকে শিব এবং ভাবাভাবকর (সৃষ্টি ও লয় কর্ত্তাও) বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৬।২ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে জ্ঞানবান, কালের কর্ত্তা, গুণী এবং সর্ব্ববিৎ বলা হইয়াছে। তাঁহারই নিয়মিত কর্ম্মরূপে ক্ষিত্যাদি প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৬।৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ ও ভবভূত (কার্য্য কারণাত্মক) বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৬।৬ মন্ত্রে—ব্রহ্মের প্রভাবে এই প্রপঞ্চ জগৎ ভ্রাম্যমান হইতেছে, ইহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে ধর্ম্মাবহ, পাপানুদ এবং ভগেশ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৬।৭ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে ভুবনেশ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ৬।৮ মন্ত্রে—“পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ।” বলা হইল। ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে এবং জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বলা হইল। ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে এবং জ্ঞানক্রিয়া বল-ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বলা হইল। এস্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া আছে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইল। সুতরাং মায়াই তাঁহার একমাত্র শক্তি, ইহাও বলা যাইতে পারে না। ৬।১১ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে কর্ম্মধ্যক্ষ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। তাঁহাকে নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ রহিত বলা হইয়াছে। “নেতিনেতি বাদ” অংশে এই উপ-নিষদের ৬।৩-৪ মন্ত্রদ্বয় সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এস্থলে মায়াবাদের নির্গুণ ব্রহ্মের উল্লেখ হয় নাই, ইহা স্থির নিশ্চয়। এই উপনিষদে ব্রহ্মের এত অধিক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে যে তাহাতে তাঁহাকে অনন্ত কল্যাণময় গুণশূন্য কিছুতেই বলা চলে না। ইতিপূর্ব্বে এই উপ-নিষদের উক্তি সমূহ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহা

পাঠ করিলেই পাঠক অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রহ্মের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই, তাহা মায়াবাদীও স্বীকার করেন। ঋষি সেই অর্থেই এস্থলে নির্গুণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ ও নির্গুণ উভয় বিশেষণই একই মন্ত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং নির্গুণ শব্দের অন্য অর্থ অর্থাৎ গুণশূন্য বা নির্ব্বিশেষ অর্থ অসম্ভব। এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, আবার ৬৷১৬ মন্ত্রে ব্রহ্মকে গুণী বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম গুণী ও নির্গুণ দুই অর্থে সম্ভব হয়। এক অর্থে তিনিই স্বয়ং অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত। ইহার বিস্তারিত আলোচনা "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে লিখিত হইয়াছে। অন্য অর্থ এই যে তিনি অনন্ত গুণে গুণবান কিন্তু ত্রিগুণ শূন্য অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাঁহাতে নাই। শেষোক্ত অর্থই এই মন্ত্রে এবং ৬৷১৬ মন্ত্রে প্রযোজ্য। পাঠক মনে রাখিবেন যে এই উপনিষদ্ সাংখ্য দর্শন দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৩৷১৪ শ্লোকেও নির্গুণ শব্দ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ শূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৪৷১৪ মন্ত্রে ব্রহ্মকে "অনেক রূপং" বলা হইয়াছে। নির্গুণের অনেক রূপ বা গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং এস্থলে নির্গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ শূন্য। ৬৷১২ মন্ত্রে ব্রহ্মকে বশী ও একবীজকে বহুকারী বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি ইচ্ছাময় ও সক্রিয়। এই মন্ত্র সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে লিখিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ৬৷১৩ মন্ত্রে—"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি কর্ম্ম কর্ত্তা বা সক্রিয়। ৬৷১৫ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে হংস বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৬৷১৬ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে বিশ্বকৃৎ, বিশ্ববিৎ, কালের কর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববিৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং গুণেশ বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ, সক্রিয় এবং তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াও আছে। এই মন্ত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যের বিষয় এই যে ব্রহ্মকে গুণী ও গুণেশ বলা হইয়াছে। এই স্থলে গুণী শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই। উহারা মায়া বা প্রধানের গুণ। গুণেশ অর্থে তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিচালক বুঝায়। এই উপ-

নিষদের ৫।৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েৎ যঃ।" অর্থাৎ যিনি সত্ত্ব, রজ: ও তমোগুণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োগ করেন। এস্থলে গুণী অর্থে ব্রহ্ম ত্রিগুণময় বুঝায় না। মায়াবাদীও তাহা স্বীকার করিবেন না। পাঠক এখন বুঝিবেন যে ৬।১১ মন্ত্রের নির্গুণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ শূন্য। ৬।১৭ মন্ত্রে—"ভুবনস্য গোপ্তা" বলা হইয়াছে। তাঁহাকে ঈশ সংস্থ (ঈশ রূপেন সংস্থিতঃ) ও তিনি জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করেন, ইহা বলা হইয়াছে। সমস্ত মন্ত্রে ব্রহ্মকে সক্রিয় বলা হইয়াছে। জগৎ শাসনের অন্য কোন কারণ নাই। সুতরাং তিনি সক্রিয়। ৬।১৯ মন্ত্রে ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম শক্তি ব্যঞ্জক বিশেষণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থে বুঝায় যে তিনি জীবের ন্যায় হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে মায়াবাদী এই উপনিষদের একটী মন্ত্র (৪।১০) দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহে যে মায়াবাদ শ্রুতি সম্মত, কিন্তু উহার বহু বহু উক্তি দ্বারা যে মায়াবাদের বহু মত খণ্ডিত হয়, তাহা এই উপনিষদের আলোচনায় আমরা পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে দ্বাদশ খানি উপনিষদের আলোচনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে পরব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয় এবং তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণগুলি বলিতেছেন যে তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও লয় কর্ত্তা, তিনি প্রভু, নিয়ন্তা, ভগবান, ভগেশ, গুণেশ, কর্ম্মাধ্যক্ষ, বশী, বিধাতা, বুদ্ধির প্রেরয়িতা, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি গুণী, অনন্ত গুণধাম, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অমৃত, প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময়, অদ্বৈত, শান্ত, শিব, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কৃপাময় ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং তিনি যে অনন্ত গুণাধার ও সর্ব্বশক্তিমান এই সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে উপনীত হইতে পারি। অর্থাৎ উক্ত দ্বাদশ খানি উপনিষদ্ কোথায়ও পরব্রহ্মকে নির্গুণ (কল্যাণময় গুণ শূন্য) বা শক্তি শূন্য বলেন নাই। সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। পাঠক এই স্থলে

লক্ষ্য করিবেন যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ পরব্রহ্মের সক্রিয়তা ও সগুণতা সম্বন্ধে নানা প্রকারের বহু বহু বিশেষণ দিয়াছেন। একাদশখানি উপনিষদে কোথায়ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। একমাত্র শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এক স্থলে মাত্র(৬।১২) ও অন্য স্থলে (৬।১৯) নিষ্ক্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে উক্ত শব্দদ্বয় মায়াবাদের অর্থে সেই সেই স্থলে ব্যবহৃত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে এই উপনিষদের সগুণতা ও সক্রিয়তা বাচক বহু বহু উক্তির কোনই অর্থ থাকিত না। সেইরূপ উক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়) এই উপনিষদে যত অধিক, অন্য কোন উপনিষদে তত নহে। পাঠক কোন শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতে মন্ত্র, প্রকরণ (Context) এবং সমস্ত গ্রন্থের ভাবধারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। এইরূপ ভাবে বিচার না করিলে উক্ত উপনিষদের কোন কোন উক্তি স্ববিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পরব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তিমান, তাহা ব্রহ্মসূত্রও বলিয়াছেন। উক্ত দর্শনের ২।১।৩০ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্র শক্তি যোগাদুপপদ্যতে বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চ ইত্যুক্তং তৎ পুনঃ কথম মুখগম্যতে বিচিত্র শক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে সর্ব্বপেতাচ তদ্দর্শনাৎ। সর্ব্বশক্তিযুক্তাচ পরাদেবতেত্যেব গন্তব্যং, কুতঃ তদ্দর্শনাৎ। তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্য নাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পায়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ইত্যেবং জাতীয়কা।" "বঙ্গানুবাদ :— বলা হইল বিচিত্র শক্তি ব্রহ্ম বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চ (জগৎ) উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন, তাহা কিসে জানিলে ? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলা হইল "সর্ব্বপেতাচ তদ্দর্শনাৎ" (সূত্র) অর্থাৎ যে সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্ত ইহা অবগত হও। কেননা, প্রমাণভূত শ্রুতি তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবতা সর্ব্বশক্তি সম্পন্না, ইহা "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস,

সর্ব্বব্যাপী, বাগিন্দ্রিয় বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, সত্যসঙ্কল্প", "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", হে গার্গি! "এই অক্ষরের শাসন হেতু চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত আছে" শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। (কালীবর বেদান্তবাগীশ)।" অতএব শঙ্কর ভাষ্যেই আমরা পাইলাম যে পরব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সত্য সঙ্কল্প, ইত্যাদি। আমরা উক্ত শ্রুতি সমূহ পূর্ব্বেই উদ্ধার করিয়াছি। সেই সকল স্থলেও দেখা গিয়াছে যে এই সকল শব্দ পরব্রহ্মেরই বিশেষণ, মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মের নহে। পাঠকের হৃদয়ে প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির আধার, কিন্তু উপনিষদে তাঁহার অত্যল্প গুণ ও শক্তির কথা কেন বর্ত্তমান? ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উপনিষদ্ জ্ঞান শাস্ত্র, উহা ভক্তি শাস্ত্র নহে যে ব্রহ্ম গুণ সূচক স্তব, স্তোত্র ও সঙ্গীতে উহা পরিপূর্ণ থাকিবে। দ্বাদশ খানি উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি ভাব বর্ত্তমান এবং তাহাতে পরমপিতার গুণকীর্ত্তন অপেক্ষাকৃত অধিকতর। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন যে সেই সকল গ্রন্থে ব্রহ্মের এত গুণ বর্ণনাও নাই।

নেতিনেতিবাদ্

সাধারণের মধ্যে একটী ধারণা আছে যে শ্রুতি নেতিনেতি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। এখন আমরা দেখিব যে এই ধারণার মূলে সত্য আছে কিনা? প্রথমতঃ আমরা উক্ত উপনিষদ সমূহ হইতে নেতিনেতি বাচক শব্দগুলি উদ্ধার করিব এবং দেখিতে চেষ্টা করিব যে সেই সকল শব্দে জাগতিক পদার্থ, উহার গুণ বা অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াছে অথবা ব্রহ্মের গুণরাশি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে,

ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৮।৭।৩—আত্মা পাপ রহিত, জরা রহিত, মৃত্যু রহিত, শোক রহিত, অশনেচ্ছা রহিত ও পিপাসা রহিত বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম জাগতিক ভাব ও অবস্থা বর্জ্জিত। জগৎ সংসর্গে আমাদের পাপ সংঘটিত হয়। পাপ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। ৮।৭।৪ - ব্রহ্মকে অমৃত ও অভয় বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মের মৃত্যু নাই, ভয়ও নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ২।৩।২ মন্ত্রে— ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্য নিরাকার ও নির্ব্বিকার। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই। এই সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৪।১৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ২।৩।৬ মন্ত্রে—"অথোত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্।" বলা হইয়াছে। সমস্ত প্রকরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম জাগতিক পদার্থ নহেন। ২।৫।১৯ মন্ত্রে—অপূর্ব্ব, অনপরম্ (যাঁহার পরবর্ত্তী কিছুই নাই), অনন্তরম্, অবাহ্যম্। ব্রহ্ম জাগতিক অবস্থা বিবর্জ্জিত। ৩।৮।৮ মন্ত্রে—অক্ষর ব্রহ্মকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরসঃ, অগন্ধ, অচক্ষুষক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর, অবাহ্য, তিনি কিছুই ভোজন করেন না এবং তাঁহাকে কেহ ভোজন করে না। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি জাগতিক কিছুই নহেন। ইহাই যে নেতিনেতি বাদের মূল মন্ত্র, তাহা বুঝিতে বোধ হয় আর বাকী থাকিল না। ৩।৯।২৬ মন্ত্রে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান সম্বন্ধে বলিয়া শেষে উক্ত হইল যে সেই আত্মা নেতিনেতি। পুনরায় বলা হইল যে তিনি অগ্রাহ্য, অশীর্য্য, অসঙ্গ, অবদ্ধ, অহিংসিত। পূর্ব্ব মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য এস্থলেও প্রযোজ্য। ৪।২।৪ মন্ত্র—৩।৯।২৬ মন্ত্রের ন্যায়। ৪।৪।২২ মন্ত্র—ব্রহ্ম লাভেচ্ছু সাধকের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, উহাও কামনা। ইহা বলিয়া এই আত্মা নেতি নেতি বলা হইল। ইহার পর ব্রহ্ম সম্বন্ধে ৩।৯।২৬ মন্ত্রের শব্দগুলির উল্লেখ আছে। ৪।৪।১৫ মন্ত্র—অজ। আত্মা জন্মে না। ৪।৫।২৫ মন্ত্র –৩।৯।২৬ মন্ত্রের ন্যায়। ঈশোপনিষদ্। ৪র্থ মন্ত্র—অনেজৎ (ব্রহ্মকে অচল বলা হইল)। ৮ম মন্ত্র—অকায়, অব্রণ, অস্নাবিরং ও অপাপবিদ্ধ। শারীরিক অবস্থা ও পাপরহিত। কেনোপনিষদ্। নেতিনেতিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্যের কিছু নাই। কঠোপনিষদ্। ১।৩।১৫ মন্ত্রে—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অগন্ধ, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম জাগতিক ব্যাপার নহেন।

প্রশ্নোপনিষদ্। ৪।১০ মন্ত্র—অছায়ম্, অশরীরম্, অলোহিতম্। ৫।৭ মন্ত্র—অজর, অমৃত, অভয়। মুণ্ডকোপনিষদ্। ১।১।৬ মন্ত্র—অগ্রাহ্য, অদ্রেশ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপানিপাদ, অব্যয়। ২।১।২ মন্ত্র—অমূর্ত্ত, অজ, অপ্রাণ, অমনাঃ। ২।২।৯ মন্ত্র—বিরজ (মল বর্জ্জিত), নিষ্কল (নিরবয়ব)। ৩।১।৮ মন্ত্র—ব্রহ্ম চক্ষু, বাক্য বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। এস্থলেও তাঁহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্। ৭ম মন্ত্রে—বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ (বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মনোমাত্র গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা—বাসনাময় সূক্ষ্মভূক) নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ (বাহ্য বিষয়ভূক) নহেন, উভয়প্রজ্ঞ (জাগ্রৎ স্বপ্ন উভয়ের অন্তরালে প্রজ্ঞা যাঁহার) নহেন, প্রজ্ঞানঘন (সুষুপ্তি অবস্থায় স্থিত) নহেন, প্রজ্ঞ (দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞান যুক্ত) নহেন, অপ্রজ্ঞ (অচৈতন্য) নহেন। তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ (বর্ণনাতীত), অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, প্রপঞ্চোপশম (বিষয়াতীত), অদ্বৈত। প্রোক্ত কোন শব্দেই ব্রহ্মের সরল গুণের অপলাপ করা হয় নাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে এই মন্ত্রে নেতিনেতি প্রণালীতে তুরীয় ব্রহ্মের বর্ণনা হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও তিনি অসত্য, অজ্ঞান, অপ্রেম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, বরং তিনি জড়, জড়ীয় গুণ, বা জড়ীয় অবস্থা সমূহ নহেন, ইহাই বলা হইয়াছে। ১২শ মন্ত্রে তাঁহাকে শিব বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে, তিনিই শিব। সুতরাং ব্রহ্মে অনন্ত গুণ বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহাতে জড়ীয় গুণ বা অবস্থা নাই। ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন ও অপ্রজ্ঞ নহেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীবাত্মা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যেরূপ যেরূপ বিজ্ঞান লাভ করেন, ব্রহ্ম তাহা নহেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আত্মার জ্ঞান দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয় এবং চারি ভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মে অনন্ত জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান। তিনি

অশরীরী বলিয়া জীবের বিজ্ঞান তাঁহাতে নাই। তাঁহাতে আছে কেবল বিশুদ্ধ, সত্য, নিত্য, অনন্ত অবিকৃত জ্ঞান। তাই বলা হইয়াছে যে তিনি জীবের নানাবিধ বিজ্ঞান নহেন। দ্বাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের লিখিত অবস্থা সমূহ জাগ্রত, স্বপ্নাবস্থ ও সুষুপ্ত জীবের মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে নেতিনেতি কথন দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। "ননু আত্মশ্চতুষ্পাত্বং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয় কথনেনৈব চতুর্থস্যান্তঃ প্রজ্ঞাদিভ্যোহন্যত্বে সিদ্ধে 'নান্ত প্রাজ্ঞম্' ইত্যাদি প্রতিষেধোহনর্থকঃ। ন, সর্পাদি বিকল্প প্রতিষেধেনৈব রজ্জুস্বরূপ প্রতিপত্তিবৎ ত্র্যবস্থস্যৈব আত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপিপাদায়িষিতত্বাৎ "তত্ত্বমসি" ইতিবৎ।" বঙ্গানুবাদ :—ভাল, আত্মার চতুষ্পাদত্ব প্রতিজ্ঞার পর পাদত্রয় নিরূপণেই ত "অন্তঃপ্রজ্ঞ" প্রভৃতি হইতে চতুর্থপাদের পার্থক্য সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং 'নান্তঃপ্রজ্ঞং' ইত্যাদি প্রতিষেধ বাক্য নিরর্থক বা অনাবশ্যক। না, নিরর্থক হয় না ; কারণ, কল্পিত সর্পাদি পদার্থের নিষেধ দ্বারাই যেমন রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তেমনি অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্মারই এখানে (ঐ অবস্থাত্রয়ের প্রতিষেধ দ্বারা) তুরীয় ভাব প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত, যেমন "তৎত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে। (দূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)। ১২শ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব এবং অদ্বৈত বলা হইয়াছে। শিব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের অনন্ত গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ২।৭ মন্ত্রে—ব্রহ্মকে অদৃশ্য, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিরুক্ত (অনির্ব্বচনীয়), অনিলয়ন (অনাধার) ও অভয় বলা হইয়াছে। সকলই জড় সম্পর্কীয়। ঐতরেয়োপনিদ্। নেতিনেতি বাদ সম্বন্ধে মন্তব্যের কিছু নাই। কৌষীতকী উপনিষদ্। ৩।৮ মন্ত্র—অজর, অমর। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ২।১৫ মন্ত্র—অজ (জন্ম রহিত), সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধম্ (সর্ব্ববিষয়ৈঃ অসংস্পৃষ্টং)। ৩।১০ মন্ত্র—অরূপ, অনাময় (অরোগ)। ৩।১৯ মন্ত্র—অপানিপাদ, অচক্ষু, অকর্ণ। ৩।২০ মন্ত্র—অক্রতু (অকাম)। ৩।২১

মন্ত্র—অজর। ৪।১ মন্ত্র—অবর্ণ। ৩।৪ মন্ত্র—অনাদি (দেশ ও কাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।) ৫।১৪ মন্ত্র—অনীড়াখ্য (অশরীর)। ৬।৩-৪ মন্ত্রদ্বয়—প্রকৃতিতত্ত্ব ভূত সমূহ হইতে ভিন্ন হইয়া নির্গুণ হওয়া যায়। অতএব এস্থলে নির্গুণ শব্দের অর্থই ত্রিগুণাতীত হওয়া অর্থাৎ জড়ীয় গুণ হইতে মুক্ত হওয়া বা দেহাত্মভেদ জ্ঞান লাভ করা। ৬।৬ মন্ত্র—"ত্রয়কালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ" (দেশকালাতীত) বলা হইয়াছে। ৬।১৯ মন্ত্রে—নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ যিনি মনুষ্যের ন্যায় ক্রিয়া করেন না, অথাৎ যাঁহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনই কর্ম্ম করিতে হয় না। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে নিষ্কল বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহার আকার নাই, তিনি হস্তপদাদি দ্বারা ক্রিয়া করেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই সম্পর্কে এই মন্ত্র সম্বন্ধে 'নির্ব্বিশেষ' বাদ অংশে ১১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে নিরবদ্য (নির্দোষ) ও নিরঞ্জন (জ্যোতির্ম্ময়) বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যে সকল শব্দের পূর্ব্বে "নঞ" উপসর্গ আছে, সেই সকল শব্দ আকারে অভাবাত্মক মনে হয় বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। আকারে অভাবাত্মক হইলেই যে প্রকৃত পক্ষে সকল শব্দই অভাবাত্মক হয়, তাহা নহে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি ?" অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সেই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অনন্ত, অমৃত, অদ্বৈত; অপাপবিদ্ধ শব্দ সমূহ আকারে অভাবাত্মক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভাবাত্মক। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় পাইলাম যে নেতিনেতি উক্তি সকল ভৌতিক পদার্থ অথবা উহাদের গুণ বা অবস্থা বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র। কোথায়ও বলা হয় নাই যে ব্রহ্ম অসত্য, অজ্ঞান, অপ্রেম, অশান্ত, অজ্যোতিঃ, অশিব ইত্যাদি। ব্রহ্মে অনন্ত সরল গুণ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু কোনও উপনিষদে কোথায়ও বলা হয় নাই যে তিনি সেই সকল আত্মিক গুণহীন। মাণ্ডূক্য উপনিষদের ৭ম মন্ত্রে যে তুরীয় ব্রহ্মের কথা আছে, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম জড় নহেন এবং জীবের কোনও প্রকারের বিজ্ঞানও নহেন। সেই বর্ণনায়ও কোথায়ও বলা হয় নাই যে তিনি

অনন্ত কল্যাণময় গুণহীন বরং শিব শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার। জীবের যে প্রকার জ্ঞান আছে, তাঁহার সেইরূপ জ্ঞান নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্ণ ও অবিকৃত, কিন্তু জীবের জ্ঞান অপূর্ণ ও বিকৃত। সুতরাং জীবের জ্ঞান যে ব্রহ্মের জ্ঞানের তুল্য নহে, ইহা সহজ বোধ্য। সেইরূপ ব্রহ্মের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। অতএব উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত নেতি-নেতি বাক্য বা শব্দ সমূহ দ্বারাও প্রমাণিত হইল না যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। যাহা প্রমাণিত হয় তাহা এই যে ব্রহ্ম জড় নহেন, জড়ীয় গুণ নহেন বা জড়ের কোনও রূপ অবস্থাও নহেন। এখন নেতিনেতি-বাদের মূল কোথায়, সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। কোনও একটী বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে দুই ভাবে তাহা সম্ভব হয়। উহার একটীকে অন্বয়ী উপায় ও অন্যটীকে ব্যতিরেকী উপায় বলে। কোন এক ব্যক্তি কোন আশ্রমী ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে যদি তিনি বলেন যে তিনি গৃহস্থাশ্রমী, তবে অন্বয়ী উপায়ে মীমাংসা পাওয়া গেল। আর যদি তিনি বলেন যে তিনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী বা ভিক্ষু নহেন, তাহা হইলেও সে গৃহস্থাশ্রমী, তাহা জানা গেল। কিন্তু এই শেষোক্ত জানার প্রণালী সরল নহে, অর্থাৎ সিদ্ধান্তে পৌছিতে আমাদের অনেক ঘুরিয়া আসিতে হইবে। এই জন্য এই পন্থাকে ব্যতিরেকী উপায় বলে। ব্যাতিরেকী উপায়ের একটী নিয়ম এই যে আলোচ্য বিষয়ের সীমা থাকা আবশ্যক, নতুবা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যেমন কোন এক ব্যক্তির নাম জানিতে হইলে সে যদি তাহার কি নাম, তাহা বলে, তবেই তাহার নাম জানা যায়, নতুবা সে যদু নহে, মধু নহে ইত্যাদি বলিলে তাহার নাম জানিবার কোনই উপায় নাই। কারণ, নাম অসংখ্য। এই হেতু ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যতিরেকী প্রণালীতে কিছুই জানা যায় না। কারণ, তিনি যাহা নহেন, অর্থাৎ জাগতিক পদার্থ সমূহ, উহাদের গুণ ও অবস্থা সমূহও অসীম। তিনি আকাশ নহেন, বায়ু নহেন, ইত্যাদি যতই বলা যাইবে, জড় পদার্থের সীমা না থাকায় ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না।

শাস্ত্রকারগণ উভয় ভাবেই ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা জানিতেন যে এইরূপ ব্যতিরেকী প্রণালী দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা নিরর্থক, কিন্তু তথাপিও যে তাঁহারা কখনও কখনও ব্যতিরেকী প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মের যে কিং স্বরূপ, তাহা সম্পুর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও তত হানি নাই, কিন্তু কোনও সসীম পদার্থকে তাঁহার স্থানীয় রূপে বোধ হইলে অনেক হানি হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহারা বারংবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কেহ যেন জগৎ, জাগতিক পদার্থ সমূহ, উহাদের গুণ বা অবস্থা সমূহকে ব্রহ্মজ্ঞান না করেন, অর্থাৎ জড় কখনও যেন আত্মা বলিয়া গৃহীত না হয়। কারণ, সকল অনিষ্টের মূল সেই স্থানে। আমরা এই আলোচনায় পাইলাম যে দ্বাদশ খানি উপনিষদের নেতিনেতি মূলক শব্দ বা বাক্য সমূহ জড় সম্বন্ধীয় উক্তি মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় বা উহার নানাবিধ গুণ বা অবস্থা সমূহ নহেন। আমরা আরও দেখিতে পাইলাম যে জাগতিক পদার্থ, উহাদের গুণ বা অবস্থা সমূহ অসীম বলিয়া নেতিনেতির বিরাম হয় না বা হইতেও পারে না। অর্থাৎ এই প্রণালীতে আমরা কখনও সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না বা পারিব না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ইহা দ্বারা (নেতিনেতিবাদ দ্বারা) সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমাদের ঘুরিয়া আসিতে হইবে। অর্থাৎ ইহা Indirect or negative procedure, সুতরাং ইহা অন্বয়ী প্রণালী হইতে হেয়। ইহার বিশেষ ক্রটী এই যে, এই প্রণালী অবলম্বনে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। নেতিনেতি-বাদের মূল কোথায় উক্ত আলোচনায় তাহারও অনুসন্ধান আমরা পাইলাম। অতএব ঐরূপ উক্তি দ্বারা ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ, তাহাও বলা যায় না। কারণ, উক্ত প্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্ম যে কি, তাহাই যখন নির্ণীত হইল না বা হইতেও পারে না, তখন তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ এই প্রশ্নের মীমাংসা এই প্রণালীর সাহায্যে লাভ করা অসম্ভব। পাঠক এস্থলে মনে রাখিবেন যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলায় মায়াবাদী অজ্ঞেয়তাবাদের (agnosticism-এর) আশ্রয় গ্রহণ

করিতেছেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন যে ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, তাঁহাকে জানা যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয়। কারণ, তিনি অনন্ত একত্বের (স্বরূপের বা গুণের) একত্ব স্বরূপ বলিয়া এবং তাঁহার অনন্ত সংখ্যক গুণের প্রত্যেকটী অনন্ত ভাবে উন্নত বলিয়া, ভাষার অল্পশক্তিত্ববশতঃ ও তাঁহার সম্পূর্ণ উপমা স্থূল জগতে নাই বলিয়া কেহই তাঁহাকে বাক্যে অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন না, এমন কি ব্রহ্মদ্রষ্টা মহর্ষিগণও বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। ইহার জন্যই ব্রহ্মানন্দকে মূকাস্বাদনবৎ বলা হইয়া থাকে। পাঠক মনে রাখিবেন যে মায়াবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের অর্থ তিনি গুণ শূন্য ও ক্রিয়া-শক্তি শূন্য। সেইরূপ নির্ব্বিশেষত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব কখনই এক নহে। অতএব "নির্ব্বিশেষবাদ" ও "নেতিনেতিবাদ" অংশদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা পাইলাম যে উপনিষদ্ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থাৎ গুণ শূন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে না। বরং উহারা সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে পরব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। এস্থলে ইহা অবশ্য উল্লেখ যোগ্য যে নেতিনেতিবাদ দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় না, কেবল তিনি যে জড় নহেন, ইহাই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তিনি যে কি, তাহা নেতিনেতিবাদ বলিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সুতরাং যাঁহারা নেতিনেতিবাদের উপর অধিক মূল্য স্থাপন করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্তি-মার্গাবলম্বী, সে সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। বিচারের পক্ষে অন্বয়ী প্রণালীই উৎকৃষ্ট এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই সাধক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবেন। অবশ্যই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানা যাইবে না কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কারণ, কেহই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানেন না বা জানিতেও পারেন না। এই সম্পর্কে সোঽহং জ্ঞান অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অবশ্য সাধক জানেন যে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই তাঁহার হৃদয়ের ধন পরমরতনকে গভীর, গভীরতর, গভীরতম ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম

এখন আমরা মায়াবাদে কল্পিত সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মায়াবাদ অনুযায়ী কোন এক অনিশ্চিত সুদূর অতীতে পরব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তি যোগে পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ মায়োপহিত হইয়াছে। এই মায়োপহিত চৈতন্যই সগুণ ব্রহ্ম। পাঠক এই সম্বন্ধে "নির্বিবশেষবাদ" অংশে লিখিত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ও সেই সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পাঠ করিবেন। উপনিষদ্ যে মোক্ষ শাস্ত্র, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে লাভ না করিলে মোক্ষ হয় না, ইহা মায়াবাদীও স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল "সোঽহং জ্ঞান" অংশে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার দেবযান পথে গতি, পরলোকে ব্রহ্মদর্শন লাভ এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম প্রাপ্তি। আর মানবের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে এই স্থূলতম দেহ ত্যাগেই ব্রহ্মে লয়। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য অত্যধিক। সুতরাং উপনিষদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সগুণ ব্রহ্ম নহেন। আমরা দেখিয়াছি যে উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের কোনই উল্লেখ নাই। হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মায়াবাদে তাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্ট। অনেক উচ্চ দর্শনেই এক ব্রহ্মকেই সগুণ ও গুণাতীত উভয়ই বলা হয়। কিন্তু মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম সেই মতের নির্গুণ (গুণ শূন্য) ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং মায়োপহিত আর একজনও তাঁহার এক চতুর্থাংশ। নির্গুণ ব্রহ্ম গুণহীন ও নিষ্ক্রিয়, আর সগুণ ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। তিনি মায়া দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। এই সম্পর্কে পাঠক ১১২৩-১১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।২ মন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য দেখিবেন। তাহাতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে উপনিষদে ও বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলিতে একমাত্র পরব্রহ্মকেই বুঝায় এবং তিনিই সগুণ ও ও গুণাতীত, কিন্তু মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকে নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার শ্রীভাষ্যের

"আভাসে" বলিয়াছেন যে শঙ্কর স্বামী ও রামানুজ স্বামী উভয়েরই কষ্ট কল্পনা দোষ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যাহারা কোন মত বিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যক মতে তাঁহার কষ্ট কল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে।" অতএব আমরা পাইলাম যে শঙ্কর ভাষ্যে যথেষ্ট কষ্ট কল্পনা আছে। কিন্তু সকল কষ্ট কল্পনা হইতে অত্যাশর্য্যজনক কষ্ট কল্পনা এই যে তিনি উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত ব্রহ্ম শব্দকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের অর্থে ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত সগুণ ব্রহ্ম অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ উপনিষদ্ পাঠ করিলে পাই একমাত্র ব্রহ্ম, কিন্তু শঙ্কর মতে পাই দুই ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ, অর্থাৎ মূলেই গোলমাল। যে স্থলেই ক্রিয়া অথবা গুণ সূচক উক্তি আছে, সেই স্থলেই তিনি ব্রহ্ম শব্দে সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং শব্দত্রয়কেও তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ (কিন্তু গুণ নহে) বলিয়াছেন। ইহার ফলে পরব্রহ্মের জ্ঞান আছে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া নাই, ইহা বলিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন, যদিও উপনিষদে নানাস্থলে তাঁহার জ্ঞানক্রিয়ার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি। এই সম্পর্কে "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে লিখিত বিষয়ও পাঠক দেখিবেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পরব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম এবং কূটস্থ ব্রহ্ম, তিনই যখন ব্রহ্মই, তখন সগুণ ব্রহ্ম কেন সগুণ ও সক্রিয় এবং পরব্রহ্ম এবং কূটস্থ ব্রহ্ম কেন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সগুণ ব্রহ্ম ও কূটস্থ ব্রহ্ম উভয়ই মায়োপহিত। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে যে সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব মূলক বাক্য বর্ত্তমান, তাহা মায়াবাদের নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। আবার মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকেও যদি সেই ভাবাপন্ন করা যায়, তবে সেই সকল উক্তি কোথায় প্রযোজ্য হইবে? তাই সগুণ ব্রহ্মকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা বলিতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে মায়াতে যে চিদাভাস পতিত হয়, সেই আভাসও মায়া এবং মায়ার অধিষ্ঠান চেতন, এই তিনের

একত্র মিলনকে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মও নিষ্ক্রিয়। চিদাভাস-প্রতিবিম্বিত মায়াই কার্য্য করে। এই কল্পনা যে মায়াবাদ অনুসারেও যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ—মায়ার যে তিনটী গুণ—যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আছে এবং উহারা যে সাংখ্য দর্শনের অনুকরণে কল্পিত, তাহা ইতি পুর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণ্য উপনিষদে উক্ত গুণত্রয়ের কোনই উল্লেখ নাই, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। উহারা যে জড়ের গুণ (সাংখ্যমতে প্রকৃতির গুণ বা উপাদান), সেই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। উক্ত গুণত্রয় যে জড়ের, তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও উপলব্ধ হইতে পারে। জীব সম্বন্ধে বলা হয় যে কূটস্থ ব্রহ্মের চিদাভাস অন্তঃকরণে পতিত হয় বলিয়া জড় অন্তঃকরণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে জীবের কার্য্যে যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রকাশ দেখি, তাহা চিদাভাস জড়ে পতিত হয় বলিয়া সম্ভব হয়, ইহা মনে করিলেও করিতে পারা যায়। জীবের জড় দেহ যদি না থাকিত, তবে জড়ের যে গুণত্রয়, তাহা আমরা জীবে দেখিতে পাইতাম না। সগুণ ব্রহ্মের কোনও জড় দেহ কল্পিত হয় নাই। অথচ মায়াবাদ অনুযায়ী চিন্তা করিলে তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে আমরা গুণত্রয়ের পরিচয় পাই।* সগুণ

---

* কেহ কেহ বলেন যে সগুণ ব্রহ্মে যে মায়া আছে, তাহা কেবল সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণা। তাহাতে রজঃ এবং তমঃ নাই। কিন্তু সেই মায়ায় যদি রজঃ ও তমঃ না থাকিত, তবে উহা সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে পারিত না, স্থিতি মাত্র করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—তিন কার্য্যই সম্পাদন করেন বলিয়া কথিত হয়। আবার মায়াকে ত্রিগুণ-সম্পন্নাও বলা হয়। উহা কি প্রকারে উহার গুণচয় (রজঃ এবং তমঃ) বর্জ্জিত হইয়া সগুণ ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিবে? সুতরাং এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মায়া ব্রহ্মের শক্তি, সুতরাং উহা তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই নিত্য বর্ত্তমান থাকা উচিত। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিতে উক্ত গুণত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যদি মায়াতে ত্রিগুণ আছে স্বীকার করা যায়, তবে মায়া যাঁহার শক্তি, সুতরাং মায়া যাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত,

ব্রহ্মের চিদাভাস জড়ের উপর পতিত না হইলে কি প্রকারে উক্ত তিন প্রকার গুণের প্রকাশ দেখিতে পাইব? উক্ত গুণত্রয় জড়ের এবং জড় ভিন্ন উহাদের প্রকাশ অসম্ভব। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে সগুণ ব্রহ্মের জড় দেহ নাই বটে, কিন্তু তিনিও মায়োপহিত এবং উহার চিদাভাস মায়ার উপর পতিত হইয়া মায়াই ত্রিগুণময়ী ভাবে কার্য্য করে। মায়া যে ত্রিগুণ সম্পন্না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মায়াবাদে মায়াকে পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কথিত হয়। কোন এক অনিশ্চিত সুদূর অতীতে পরব্রহ্ম এবং মায়ার যোগে তাঁহার এক চতুর্থাংশ মায়োপহিত হইয়া সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং পরব্রহ্মে অনাদিকাল হইতে মায়া বর্ত্তমান। মায়া যখন ব্রহ্মেরই শক্তি, তখন তাহা নিশ্চয়ই নিত্যা হইবে। সুতরাং পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ মায়া যোগে সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টির কোনই অর্থ থাকে না। তিনি ত নিত্যই মায়াময় এবং তাঁহার তিন চতুর্থাংশেও মায়া নিত্য বর্ত্তমান। যদি সগুণ ব্রহ্মের চিদাভাস মায়ার উপর পতিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য করিতে পারে, তবে স্বয়ং পরব্রহ্মের চিদাভাস মায়ার উপর পতিত হইয়া কেন উক্ত কার্য্যত্রয় সম্পাদন করিতে পারিত না? মায়াবাদ অনুযায়ী পরব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম এবং কূটস্থ ব্রহ্ম তিনই ব্রহ্ম এবং তাঁহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সগুণ ব্রহ্মের জড় দেহ নাই, পর ব্রহ্মেরও জড় দেহ নাই। মায়া উভয়ের নিকট বর্ত্তমান। সুতরাং পরব্রহ্মের চিদাভাস মায়ার উপর পতিত হইতে দোষ ছিল কি? বরং তাহাই এক অর্থে যুক্তিযুক্ত হইত। কারণ, সেইরূপ কল্পনায় সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন হইত না। অর্থাৎ পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ কল্পনার কোনই প্রয়োজন হইত না। পরব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার চিদাভাস

তাঁহাতেও ত্রিগুণ আছে, বলিতে হইবে। ইহা মায়াবাদীও স্বীকার করিবেন না। যাঁহাতে আত্মিক গুণই নাই (ব্রহ্ম নির্গুণ), তাঁহাতে যে জড়ীয় গুণ থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং মায়াতে ত্রিগুণ থাকিতেই পারে না। আর যদি তর্ক স্থলে উহা স্বীকার করাও যায়, তবে মায়াতে সর্ব্বদা ত্রিগুণ থাকা প্রয়োজনীয়।

মায়ার উপর পতিত করিয়া উহাকে কার্য্যক্ষম করিতে পারিতেন। অথবা তাঁহারও কোনই প্রয়োজন ছিল না। মায়া যখন ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া কথিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উভয় নিত্যযুক্ত এবং পরব্রহ্মের চিদাভাস স্বতঃই নিত্য মায়ার উপর পতিত হইত এবং তাহাতেই উহা কার্য্যক্ষম হইতে পারিত। সুতরাং মায়াবাদের যুক্তির অনুসরণে বুঝিতে পারা যায় যে স্বয়ং সগুণ ব্রহ্ম (তাঁহার চিদাভাস নহে) তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা মায়াকে পরিচালনা করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ—যদি সগুণ ব্রহ্মের চিদাভাসই মায়ার উপর পতিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইত, তবে উপনিষদের সৃষ্টির সূচনামূলক উক্তি সমূহ কাহার উপর প্রযোজ্য হইবে? সেই সকল উক্তিতে ব্রহ্মের ইচ্ছা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। যথা—সোহকাময়ত ইত্যাদি। ব্রহ্ম সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার চিদাভাস অথবা চিদাভাস-প্রতিবিম্বিত মায়াও নহে। উপনিষদের উক্তি সমূহে উহাদের (মায়া ও চিদাভাসের) কোনই উল্লেখ নাই, উহাদের কোনও আভাসও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্য সমূহ চিদাভাস-প্রতিবিম্বিত মায়ার প্রতিও কষ্ট কল্পনা দ্বারাও প্রযোজ্য হইতে পারে না। আর যদি সগুণ ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হন, তবে তাঁহার চিদাভাসেও সক্রিয়তা আসিতে পারে না। মূলে যাহা নাই, আভাসে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতঃপর লিখিত "চিদাভাস" অংশে দেখিতে পাইব। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে উপনিষদে ব্যবহৃত ব্রহ্ম শব্দ একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মেই প্রযোজ্য হইতে পারে। আমরা যদি ব্রহ্মকেই দুই ভাবে চিন্তা করি, যথা সগুণ ও গুণাতীত তবুও ঔপনিষদিক্ সৃষ্টির সূচনা মূলক উক্তি সমূহ একমাত্র পরব্রহ্মেই প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ তিনি সগুণ ভাবে সৃষ্টি করিয়াও নিত্য গুণাতীত। ইহার বিশেষ বিবরণ "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি' অংশে আমরা দেখিতে পাইব। মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মেও উহাদিগকে যুক্তিযুক্ত ভাবে আরোপ করা যায় না। মায়াবাদ যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহাতে বরং মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মে উহাদিগের আরোপ Plausible (আপাত

সন্তোষ জনক কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে), কিন্তু তাঁহার চিদাভাসে অথবা চিদাভাস-প্রতিবিম্বিত মায়াতে কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ—"সগুণ ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি গুণবান। যাঁহার গুণ আছে, তাঁহারই শক্তি আছে। প্রত্যেক গুণেরই শক্তি থাকা অনিবার্য্য। কোন গুণই শক্তিহীন নহে। সুতরাং ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাতে গুণের ন্যায় শক্তিও বর্ত্তমান। চতুর্থতঃ—চিদাভাস সম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত হইতেছে। উহাতে দেখা যাইবে যে জীবে চিদাভাসের কল্পনা উপনিষদ্ সমর্থন করেন না। উপনিষদ্ অনুযায়ী বিচার করিতে গেলে জীবাত্মাই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। উহাতে চিদাভাসের কোনই উল্লেখ নাই। জীব সম্বন্ধেই যদি চিদাভাস অপ্রমাণিত হয়, তবে তাহা যে সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে মাত্রও প্রযোজ্য নহে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। উপনিষদে কোথায়ও এরূপ উল্লেখ নাই যে সগুণ ব্রহ্মের চিদাভাস মায়াতে পতিত বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। স্থূল, চিদাভাস বা ঐরূপ ভাবদ্যোতক কোন শব্দই উপনিষদে উক্ত হয় নাই। পঞ্চমতঃ—মায়াবাদিগণ বলেন যে উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মের বিশেষণগুলি সগুণ ব্রহ্মে প্রযোজ্য, নির্গুণ ব্রহ্মে বা পরব্রহ্মে নহে। যদি সেই সগুণ ব্রহ্মও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে উহারা কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে? সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম গুণবান ও সক্রিয়। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে Dr. মহেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় সগুণ ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় মনে করিতেন না বলিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপরোক্ত মত যুক্তিযুক্ত নহে।

চিদাভাস

মায়াবাদে জীবাত্মা (কূটস্থ ব্রহ্ম) এবং পরব্রহ্ম একই। জীবাত্মাও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার আভাস বুদ্ধিতে পতিত হইয়া আমাদের সকল কার্য্য করায়। আমাদের অন্তঃকরণে ও বাহিরে যে সকল চিন্তা

বা কার্য্য হইতেছে, তাহা চিদাভাস-প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ আত্মা সাক্ষী মাত্র। সাংখ্য মতেও পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং তাঁহার বর্ত্তমানতার জন্যই বুদ্ধি কার্য্য করে। দেখা গেল যে চিদাভাস কল্পনা সাংখ্যপ্রসূতা। উক্তরূপ মায়াবাদের চিদাভাস সম্বন্ধীয় কোনও উক্তি আমরা কোনও উপনিষদে পাই নাই। বরং আমাদের আত্মাই স্বয়ং কার্য্য করেন, এইরূপ ভাবের উক্তিই পাইয়াছি। জীবাত্মা জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা এইরূপ ভাব প্রকাশিকা ঔপনিষদিক উক্তির নিম্নে উল্লেখ করিলাম। পাঠক উপনিষদ্ পাঠে আরও ঐরূপ উক্তি দেখিতে পাইবেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৪।৬-৭ এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।১।১-২ মন্ত্র সমূহ পাঠক পাঠ করিবেন। উহারা একই মন্ত্র। প্রথম মন্ত্রে (৪।৬ এবং ৩।১।১) বলা হইয়াছে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর সখ্য ভাবে যুক্ত দুইটী পক্ষী দেহ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন ও অন্য জন সাক্ষী মাত্র। দ্বিতীয় মন্ত্রে (৪।৭ ও ৩।১।২) বলা হইয়াছে যে জীবদেহ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীনতাবশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্থ। কিন্তু তিনি যখন সাধক সেবিত ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমা দর্শন করেন, তখন তিনি শোক মুক্ত হন। এই মন্ত্রদ্বয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই আমরা পাই যে জীব স্বয়ংই ভোক্তা। তিনি যদি স্বয়ংই ভোক্তা হন, তবে তিনি স্বয়ংই সক্রিয়, কখনও সাক্ষী বা উদাসীন নহেন। প্রথম মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে জীবাত্মাকে ভোক্তা এবং পরমাত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে, জীবাত্মাকে সাক্ষী বলা হয় নাই। এস্থলে আমরা চিদাভাসের উল্লেখ পাই না, কিন্তু জীবাত্মার স্বকৃত কর্ম্ম পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১২।৪-৫ মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে আত্মাই দ্রষ্টা, চক্ষু দর্শন করিবার যন্ত্র মাত্র। এই ভাবে আরও বলা হইয়াছে যে আত্মা অভ্রাতা, বক্তা, শ্রোতা ও মন্তা নাসিকা, বাক্, শ্রোত্র ও মন যথাক্রমে আঘ্রাণ, বাক্য, শ্রবণ ও মননের যন্ত্র মাত্র। ইহাতেও আমরা পাই যে জীবাত্মাই স্বয়ং দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কার্য্য করেন, চিদাভাস নহে। কঠোপনিষদের ১।৩।৪ মন্ত্রে জীবাত্মাকে সুস্পষ্ট

ভাবে ভোক্তা বলা হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মাকে রথী বলা হইয়াছে। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তে ত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ (কঠ—১৷৩৷৩-৪)" "বঙ্গানুবাদ :—আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে রশনা (লাগাম) বলিয়া জান। মনীষীরা ইন্দ্রিয় দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপরসাদি বিষয় সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাকে (অর্থাৎ শরীরীকে বা জীবাত্মাকে) ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া থাকেন।" কেহ প্রথম মন্ত্রের অর্থে বলিতে পারেন যে সারথী যেমন রথ চালায়, তেমনি বুদ্ধি আমাদিগকে চালায়। রথী অর্থাৎ আত্মা সাক্ষী মাত্র। দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া সেই আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে রথী সাক্ষী মাত্র নহেন, তিনি যেরূপ ভাবে রথ চালাইতে বলেন, সারথী সেইরূপ ভাবেই রথ চালান ও চালাইতে বাধ্য। তাঁহার সারথীর নিজের কোনই স্বাধীন ইচ্ছা নাই। কারণ, যোদ্ধা ত রথীই, সারথী নহে। যোদ্ধাই জানেন যে কোথায় কিরূপ ভাবে রথ চালাইলে বা রাখিলে তিনি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন। সারথী রথীর ইচ্ছা অনুযায়ীই কার্য্য করেন। মহাবীর অর্জ্জুনও (রথী) তাঁহার সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন :—সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত। (গীতা-১৷২১)। "বঙ্গানুবাদ :—হে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর।" এস্থলে পাঠকের পাঠকের "আমার" শব্দটী লক্ষ্য করিতে হইবে। রথীরই রথ, সারথীর নহে। আর রথী যে সময় যোদ্ধা, তখন তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র বলা যায় না। এস্থলেও রথী তাঁহার রথকে তাঁহারই ইচ্ছামত স্থানে স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ না হইলে আমরা এই বাক্যে "বলিয়াছিলেন" স্থলে "আদেশ করিয়াছিলেন" লিখিতাম। অর্থাৎ যোদ্ধার ইচ্ছানুযায়ীই রথ চালিত হয়, সারথীর ইচ্ছায় নহে। এই জন্যই মহাবীর কর্ণকে সুতপুত্র অর্থাৎ যোদ্ধা নহেন, কিন্তু সারথীর পুত্র মাত্র

বলিয়া বিদ্রূপ করা হইত। সুতরাং মন্ত্রোক্ত উপমা জীবেও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ আত্মার (রথীর) ইচ্ছানুযায়ী সারথীরূপ বুদ্ধি, শরীররূপ রথ, মনঃরূপ লাগাম ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব দ্বারা পরিচালনা করেন। প্রশ্নোপনিষদের ৪।৯ মন্ত্রে জীবাত্মাকে দ্রষ্টা, স্রষ্টা শ্রোতা, ঘ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে। তিনি স্বয়ংই এই সকল কর্ম্ম করেন, ইন্দ্রিয় সকল যন্ত্র মাত্র। মন্ত্রে চিদাভাসের কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং জীবাত্মা সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় নহেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা পাই :—"ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (বৃহ—৬।৩।৬)। অর্থাৎ যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করেন। এস্থলে পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরয়িতা। মায়াবাদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং মায়াবাদ অনুযায়ী জীবাত্মাই বুদ্ধির প্রেরয়িতা হওয়া উচিত। আর মায়াবাদে পরব্রহ্মও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মকে যদি বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা বলা যায়, তবুও মায়াবাদে অন্য এক অংশ যে ভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হয়। যাহা হউক্, পরমাত্মাই হউন্ বা জীবাত্মাই হউন্, তাহা এস্থলে ততদূর বিচার্য্য নহে, কিন্তু চিদাভাসের জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয় না, তাহা এই মন্ত্রেও পাইলাম। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে মহাত্মা শঙ্কর গায়ত্রী মন্ত্র ব্রহ্ম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে সূর্য্য পক্ষের ব্যাখ্যার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে না। কারণ, আমরা এখন মায়াবাদের আলোচনা করিতেছি এবং আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। অতএব উপরোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে উপনিষদ্ অনুযায়ী চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে জীবাত্মাই সমুদায়। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই কার্য্য হয়, অর্থাৎ তিনিই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা, চিদাভাস নহে। উপনিষদে চিদাভাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়াবাদ অনুযায়ী চিদাভাসের অর্থ কূটস্থ ব্রহ্মের আভাস। অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় জড় অন্তঃকরণে নানাবৃত্তি আমরা অনুভব করি। এই মতের সমর্থনে তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন যে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া ক্রিয়াশীল করে, তদ্রূপ দেহে

আত্মার উপস্থিতির জন্যই জড় অন্তঃকরণও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি আছে এবং সেই শক্তিই উহার ক্রিয়া দ্বারা লৌহকে ক্রিয়াশীল করিতে সমর্থ হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি বাদ দিলে কেবল উহার উপস্থিতিতেই লৌহ আকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ চুম্বকের নিজের ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে উহা লৌহকে ক্রিয়াশীল করিলে পারে না। সেইরূপ কূটস্থ ব্রহ্মের নিজের ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে অর্থাৎ নিজে নিষ্ক্রিয় হইলে জড় অন্তঃকরণকে ক্রিয়াশীল করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিলে বলিতে হয় যে কূটস্থ ব্রহ্ম নিজের ক্রিয়াশক্তি (Energy) transmit প্রেরণ করেন বলিয়াই অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন বা হইতেও পারেন না। তাঁহারও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহাতেই জড় অন্তঃকরণ কার্য্য করে বুঝিতে হইবে। বলা হয় যে চুম্বক যেমন স্বতঃই লৌহ আকর্ষণ করিয়া ক্রিয়াশীল করে, সেইরূপ কূটস্থ ব্রহ্মও কোনও শক্তি প্রয়োগ করেন না, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি মাত্রই কার্য্য হয়। যদি তর্কস্থলে এই আপত্তিও গ্রহণ করা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে কূটস্থ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তি স্বতঃই স্ফূরিত হইতেছে এবং সেই শক্তির জন্যই অন্তঃকরণ কার্য্য করে। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্মেও ক্রিয়া শক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে চুম্বক কোনই কার্য্য করে না, নিষ্ক্রিয়ই থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন যে উহাতেও শক্তি বর্ত্তমান এবং সেই শক্তির প্রভাবেই লৌহ আকৃষ্ট হয়। আবার যদি বলা হয় যে চুম্বকের স্বভাব বশতঃই লৌহ আকৃষ্ট হয়, তবে বলিতে হইবে যে লৌহকে আকর্ষণ করাই চুম্বকের একটী ধর্ম্ম। চুম্বকের যদি উহা ধর্ম্ম না হইত, তবে উহা লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। অর্থাৎ চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি বাদ দিলে লৌহ সম্বন্ধে উহা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন। সুতরাং ক্রিয়াশক্তি আছে বলিয়াই উহা লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে যে আত্মার শক্তি আছে বলিয়াই অন্তঃকরণকে ক্রিয়াশীল করিতে পারে। আবার চুম্বক কেন লৌহকে আকর্ষণ

করিতে পারেন?" ইহার উত্তরে যেমন বলিতে হইবে যে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি আছে, তেমনি ইহাও বলিতে হইবে যে উহারা এক জাতীয় পদার্থ। তাহারা এক জাতীয় পদার্থ না হইলে কখনই চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। চুম্বক কখনই শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আরও একটী বিষয় চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে উহারা (চুম্বক ও লৌহ) একজাতীয় পদার্থ। তাহা এই যে লৌহ খণ্ড চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইতে হইতে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। Like alone can act upon like ইহা বিজ্ঞান জগতে সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। সুতরাং উহারা যে একজাতীয় পদার্থ, তাহা স্থিরীকৃত হইল এবং এই জন্য চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে।* এখন মায়াবাদীর নিকট প্রশ্ন হইতে পারে যে তিনি কি বলিতে চাহেন যে কূটস্থ ব্রহ্ম এবং জড় পদার্থ (মায়াবাদী অন্তঃকরণকে জড় মাত্র বলেন) এক জাতীয়। ইহা তিনি কখনও স্বীকার করিবেন না বা করিতে পারেন না। কারণ, তিনি জড় জগৎকে মিথ্যাই বলিয়া থাকেন, মায়ার খেলা মাত্র বলেন—উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; এক জাতীয় পদার্থ ত স্বীকার করা ত দূরের কথা। অতএব মায়াবাদ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মার আভাসে জড়ে কোনও ক্রিয়া হইতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে সাংখ্য মতেও নিষ্ক্রিয় পুরুষের উপস্থিতিতেই জড় অন্তঃকরণ চালিত হয়। সেই মত সমর্থনার্থ সাংখ্যবাদিগণ উক্ত প্রকার চুম্বকের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন। সেই মতেও পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব। পুরুষ জ্ঞ-স্বরূপ, প্রকৃতি চেতনশূন্যা, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, পুরুষ নির্ব্বিকার, প্রকৃতি পরিণামশীলা, সুতরাং বিকৃতি-স্বভাবা। পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রকৃতির বন্ধন হইতে উহারই

* "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অধ্যায়ের এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। উহাদিগেতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জড় ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারে।

তাঁহার পক্ষে মোক্ষ, কিন্তু প্রকৃতির সকল কর্ম্মই পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের জন্যই। উহারা যখন পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব, তখন উহারা কখনই এক জাতীয় পদার্থ নহে বা হইতেও পারে না। সুতরাং পুরুষের উপস্থিতিতে জড় অন্তঃকরণ পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ চালিত হইতে পারে না। (সাংখ্য অতি সুস্পষ্ট ভাবে অন্তঃকরণকে জড় এবং প্রকৃতি পুরুষকে বিপরীত তত্ত্ব বলেন)। যদি বলেন যে বুদ্ধি সত্ত্বগুণ-প্রধানা, সুতরাং উহার স্বচ্ছতাবশতঃ পুরুষের আভাস উহাকে (বুদ্ধিকে) ক্রিয়াশীল করে, তবে বলিতে হয় যে সাংখ্যমতে সত্ত্বগুণও প্রকৃতির একতম উপাদান। সুতরাং উহা যত স্বচ্ছই হউক না কেন, উহা জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং উহা কখনও সাংখ্য পুরুষের সহিত এক জাতীয় পদার্থ হইতে পারে না। যাহা হউক্, সাংখ্যও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব প্রোক্ত ভাবে সাংখ্য মতের এই অংশ অর্থাৎ দেহে পুরুষেরউপস্থিতিতে জড় অন্তঃকরণের ক্রিয়াশীলত্ব খণ্ডিত হইল বলিতে হইবে। এখন আমরা দেখিব যে এই শক্তি কি। আমরা যদি একটী বলকে (Ball-কে) অন্য বলের প্রতি নিক্ষেপ করি, তবে প্রথম বলের শক্তি অন্য বলে সংক্রামিত (Transmitted) হইয়া উহাকেও গতিশীল করিতে পারে, অর্থাৎ প্রথম বলে যে ক্রিয়াশক্তি (Energy) ছিল, তাহা দ্বিতীয় বলে প্রেরণ (Trasmit) করিয়া দেয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বলের গতি প্রথম বলের গতি মাত্র. সুতরাং প্রথম বলে ক্রিয়াশক্তি ছিল। পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে কোন সচেতন ব্যক্তি প্রথম বলে প্রথমতঃ শক্তি প্রদান করে এবং সেই শক্তিই দ্বিতীয় বলে সংক্রামিত হয়। উক্ত মত গ্রহণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে কূটস্থ ব্রহ্মেও ক্রিয়াশক্তি আছে, নতুবা জড় অন্তঃকরণ পরিচালিত হইতে পারে না। অচেতন জড়কে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে, ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। ক্রিয়ার অর্থ কি? উহার অর্থই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বর্ত্তমান এবং সেই ইচ্ছার জন্যই জীবে কার্য্য সম্ভব হয়। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তেও দেখিলাম যে চেতন পদার্থই প্রথমতঃ শক্তি প্রেরণ করে। চিদাভাসের

বিষয়ও যদি চিন্তা করা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে কূটস্থ ব্রহ্মে যাহা নাই, তাহা চিদাভাসে থাকিতে পারে না। যদি বলেন যে চিদাভাস দ্বারা চালিত হইয়া অন্তঃকরণ কার্য্য করে, তবুও বলিতে হইবে যে আভাসেই যদি ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়, তবে তাহার মূলে অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মে যে ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি অত্যধিক ভাবে বর্ত্তমান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; মূলে যে শক্তি নাই, আভাসে তাহা আসিতে পারে না। একটী জবাকুসুম দর্পণের সম্মুখে সংস্থাপিত হইলে উহার চিত্র কাচে প্রতিফলিত হইয়া ফুলটীর রক্ত বর্ণই প্রদর্শন করে। আমরা কখনও উহাতে কৃষ্ণবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ লক্ষ্য করি না। অর্থাৎ যাহা পুষ্পে বর্ত্তমান, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। পুষ্পে যাহা নাই, তাহা কাচে কখনই প্রতিফলিত হয় না বা হইতেও পারে না। আমরা শান্ত ভাবের আদর্শ বুঝিতে একজন সমাধিস্থ যোগীপুরুষের চিত্র চিন্তা করিতে পারি। তাঁহাকে দর্পণে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, ধীর। আবার একটী যুদ্ধরত ব্যক্তিকে দর্পণে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। সুতরাং দেখা যায় যে মূলে যাহা যাহা থাকে, আভাসেও তাহাই প্রকাশিত হয়, নূতন কিছুই আসে না বা আসিতেও পারে না। বিপরীত ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ গুণ শূন্য) ও নিষ্ক্রিয় এবং তাঁহার কোন ইচ্ছাশক্তিও নাই। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কোনই ক্রিয়া থাকিতে পারে না অথবা তিনি ক্রিয়াশক্তি রহিত। কূটস্থ ব্রহ্মও নিষ্ক্রিয় এবং ব্রহ্মেরই তুল্য। সুতরাং তাঁহাতেও কোনও ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না। ইহা মায়াবাদীও স্বীকার করেন। যদি মায়াবাদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবুও বলিতে হইবে যে কূটস্থ ব্রহ্মেই (জীবাত্মায়ই) যখন কোন ক্রিয়াশক্তি নাই, তখন তাঁহার আভাসেও কোনও ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না। যাহা মূলে নাই, তাহা ফুলে থাকিতে পারেনা, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং ক্রিয়াশক্তি শূন্য আভাস দ্বারা জড় অন্তঃকরণ চালিত হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি

যে জড়কে চালাইতে হইলে অন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু মায়াবাদ অনুসারে কূটস্থ ব্রহ্মেই যখন কোন ক্রিয়াশক্তি নাই, তখন দেহে তাঁহার উপস্থিতির জন্যই অন্তঃকরণ চালিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আভাসের পক্ষে অন্তঃকরণকে চালনা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। সাংখ্য অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে জড় বলিয়া থাকেন এবং ইহাও বলেন যে দেহে পুরুষের উপস্থিতির জন্যই জড় অন্তঃকরণ কার্য্যক্ষম হয়। মায়াবাদও সেই তত্ত্বের অনুকরণে অন্তঃকরণকে জড় মাত্রই বলেন এবং দেহে কূটস্থ ব্রহ্মের উপস্থিতির জন্যই তাঁহার আভাস দ্বারা চালিত হইয়া জড় অন্তঃকরণে নানাবৃত্তির উদয় হয় বলিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মে কোনই ক্রিয়া নাই, সুতরাং তাঁহার আভাসেও কোনও ক্রিয়া থাকিতে পারে না। ফলে দাড়াইল এই যে জড় অন্তঃকরণ স্বাধীন ভাবেই জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাজনিত কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতেছে। অতএব জড়-বাদ অনুযায়ী আমাদের দেহের ভূত পদার্থ সমূহের Physical and Chemical action-এ এই অন্তঃকরণের উৎপত্তি এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ জড়ীয় ক্রিয়া মাত্র ও উহাদের পশ্চাতে আত্মার কোনই ক্রিয়া নাই, ইহা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মায়াবাদ তাহা কখনও স্বীকার করেন না এবং আমরাও তাহা স্বীকার করি না। মায়াবাদ অনুযায়ী কূটস্থ ব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই। দেহে কূটস্থ ব্রহ্মের উপস্থিতির জন্যই যদি জড় অন্তঃকরণ চারিটি বৃত্তি সম্পন্ন ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তবে দেহাতিরিক্ত জড় পদার্থ সমূহ কেন ঐরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারে নাই? ব্রহ্ম ত সর্ব্বব্যাপী বিভু। এমন জড় পদার্থ নাই, যেথায় তিনি ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান নাই। ব্রহ্মের একমাত্র উপস্থিতিই সকল কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারের সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্ভব হইত। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না। অন্যবিধ কার্য্যও যত্রতত্র দেখা যায় না। যথোপযুক্ত কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে নানা স্থলে দেখিয়াছি যে কর্ম্মের অর্থই ইচ্ছার বহি-

প্রকাশ এবং ইচ্ছা ভিন্ন কোন কর্ম্মেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে চেতনের ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান থাকিবেই। কেবল চিন্ময় কিন্তু নিষ্ক্রিয় আত্মার উপস্থিতিতেই তাঁহার আভাস দ্বারা অর্থাৎ চিদাভাসের জন্যই অন্তঃকরণ চালিত হয়, ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। চিদাভাস জন্য যে অন্তঃকরণ কার্য্য করিতে পারে না, সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। মায়াবাদ অনুযায়ী কূটস্থ ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণ শূন্য) ও নিষ্ক্রিয়। ইতিপূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে সেইরূপ জীবাত্মার উপস্থিতিতেই অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। যদি তর্ক স্থলে ইহা স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে চিদাভাস অন্তঃকরণকে ক্রিয়াশীল করিতে পারে, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কূটস্থ ব্রহ্ম অসংখ্য প্রকারে ক্রিয়াশীল। কারণ, মূলে যদি ক্রিয়া না থাকে, তবে উঁহার আভাসে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না, যেমন নিষ্ক্রিয় নিশ্চল পুরুষের মূর্ত্তির ছায়াতে কোনই ক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু আমরা দেখি যে প্রত্যেক অন্তঃকরণ অসংখ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। আবার নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মের আভাসে যদি অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয়, ইহা একান্ত স্বীকার করিয়াই নেওয়া যায়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সেইরূপ অন্তঃকরণ এক প্রকার মাত্র কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। কারণ, মায়াবাদের কূটস্থ ব্রহ্মের নানাবিধ গুণ নাই, একমাত্র চিদাভাস দ্বারা অন্তঃকরণের জ্ঞানক্রিয়া মাত্র সম্পন্ন হইতে পারে।* কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে অন্তঃকরণ কেবল জ্ঞানের কার্য্য করিতেছে না, কিন্তু কঠোর এবং কোমল গুণ রাশির এবং ইচ্ছার কার্য্য করিতেছে।

---

* চিদাভাসে অন্তঃকরণে জ্ঞানের আভাস পতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোনই ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ, মায়াবাদে জ্ঞানকে আত্মার একটী স্বরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে যে সেইস্বরূপের কোনই ক্রিয়া নাই। আর আত্মার একটী লক্ষণের কথাই বলি বা কেন? সমগ্র আত্মাই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া থাকিতে পারে না। তথাপিও এস্থলে স্বীকার করিয়া নেওয়া গেল যে চিদাভাস অন্তঃকরণে জ্ঞানের ক্রিয়া মাত্র হইতে পারে।

অর্থাৎ অন্তঃকরণ অসংখ্য প্রকার কার্য্য করিতেছে। এই যে অন্তঃকরণ নানাবিধ কার্য্য করিতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই হইতে পারে না, কেবল একমাত্র] কারণই এই যে অন্তঃকরণ জীবাত্মার নানা গুণের কার্য্য করিতেছে এবং ইহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত অথবা অন্তঃকরণ আত্মার কার্য্যক্ষেত্র মাত্র। মায়াবাদে এবং সাংখ্যের সু-প্রসিদ্ধ চুম্বকের দৃষ্টান্তেও আমরা পাইয়াছি যে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ মাত্রই করিতে পারে কিন্তু উহাতে যে সকল শক্তি নাই, তাহা লৌহকে দান করিতে পারে না। সেইরূপ মায়াবাদের গুণ ও শক্তিশূন্য নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্ম অন্তঃকরণকে অস'খ্য প্রকার শক্তিতে শক্তিমান করিতে পারে না।* কিন্তু অন্তঃকরণে নানা প্রকার শক্তির ক্রিয়া আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সুতরাং আমাদের বলিতে হইবে যে সকল প্রকার সকল ক্রিয়ার উৎস জীবাত্মায়ই বর্ত্তমান আছে। তিনি অন্তঃকরণের জড়ীয় যন্ত্রকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালান। তাই উহা সকল প্রকার সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। জীবাত্মার কোন শক্তি না থাকিলে অন্তঃকরণও অবশ্যম্ভাবিরূপে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইতে বাধ্য হইত। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে অন্তঃকরণের দুই অংশ, একটী আত্মিক ও অন্যটী পাঞ্চ-ভৌতিক। অর্থাৎ আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি অন্তঃকরণের জড়ীয় অংশের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেন, তাই অন্তঃকরণের কার্য্য হয়। আত্মা ভিন্ন যে অন্তঃকরণের জড় যন্ত্র কিছুই নহে, তাহা আমরা সকলেই জানি। বিজ্ঞান জগৎ এখন মনস্তত্ত্বকে জড় বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে অন্তঃকরণের সকল সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে উহা কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাই বলা হয় যে Psychology is the most imperfect science (মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান)। এই অপূর্ণতার কারণ অনু-সন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে আমরা যাহাকে অন্তঃ-

* এস্থলে জ্ঞানের কথাও উল্লিখিত হইল না, কারণ, মায়াবাদে আত্মার জ্ঞানক্রিয়া নাই।

করণ বলি. তাহা কেবল জড় মাত্র নহে. কিন্তু উহাতে আত্মার গুণ ও শক্তির ক্রিয়াও বর্ত্তমান। জড় বিজ্ঞান অন্তঃকরণের জড়ীয় অংশের জ্ঞান লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু আত্মা ত স্বাধীন। তাঁহার গুণ ও শক্তি জড় রাজ্যের নিয়মাধীন নহে। সুতরাং জড় বিজ্ঞান অন্তঃকরণের আত্মিক অংশের কার্য্যকলাপের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাই Psychology অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে উপনিষদ্ মায়াবাদের চিদাভাস সমর্থন করেন না। এখন আমরা দেখিতে পাইলাম যে যুক্তি দ্বারাও উক্তমত সমর্থিত হয় না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে চিদাভাস অন্তঃকরণকে পরিচালনা করে, এই মত সত্য নহে। এস্থলে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে জীবের সকল কার্য্যই কি আত্মা দ্বারা কৃত হয়। এই প্রশ্ন অতি সুকঠিন। অনন্ত জ্ঞানাধার, নিত্য জ্ঞানসিন্ধু, অনন্ত দয়ারআধার পরমপিতা তাঁহার দয়া কণাদানে তাঁহার অধম সন্তানের অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয় তাঁহার দিব্য জ্ঞানে, সত্য জ্ঞানে উজ্জ্বল করুন, ইহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। তিনি তাঁহার অপার স্নেহ গুণে দীনহীনকে আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে সে এই কঠিন সমস্যার সত্যমীমাংসা নিজ হৃদয়ে লাভ করিয়া জগতে প্রকাশ করিতে পারে। জীব অর্থে আত্মা + দেহ। অন্তঃকরণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য. তাহা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উহা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। অন্তঃকরণ আত্মার কার্য্য ক্ষেত্র। অন্তঃকরণ অর্থে অন্তরে স্থিত যন্ত্র। বহিরিন্দ্রিয় যেমন যন্ত্র, অন্তঃকরণও সেইরূপ অন্তরে স্থিত একটী যন্ত্র মাত্র। আত্মা যাহা ইচ্ছা করেন, অন্তঃকরণ বহিরিন্দ্রিয়গণ দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করে। এখন প্রশ্ন হইবে যে জীবের সকল কার্য্যই যদি আত্মারই কার্য্য হয়, তবে বলিতে হয় যে আত্মা অন্তঃকরণ ও দেহ দ্বারা অন্যায়, মিথ্যা, কুৎসিৎ, ভীষণ-ভীষণ কার্য্যাদি সম্পাদন করেন। ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে

দোষপাপরাশি আত্মার ধর্ম্ম নহে। "যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও তিরোহিত হয়, তাহাকে জাত গুণ কহে। যথা—কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি" * অর্থাৎ উহারা জাত গুণ। উহারা কখনও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। হৃদয়েই উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। "দোষ কারণ, পাপ কার্য্য। দোষ চালিত হইয়া যাহা করা যায়, তাহার অধিকাংশই পাপ এবং পাপ করিবার জন্য যাহাতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই দোষ।"* মূল যে স্থলে নাই, ফল সে স্থলে থাকিতে পারে না। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার কার্য্য কখনও অন্যায় বা মিথ্যা হইতে পারে না। অথচ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে জীব ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। আত্মাই যখন দেহ ও অন্তঃকরণের কর্ত্তা, তখন এরূপ কেন হয়? ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের প্রথমেই স্মরণ করিতে হইবে যে "ইতর জীবের কথা" অংশে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জীব ইতর জীব ভাবে বহু বহু জন্মের পর মানব জন্ম লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে নানা স্থলে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে প্রত্যেক জীবে অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য দেহ বর্ত্তমান। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার দেহের বিষয় প্রধানতঃ আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় প্রয়োজনীয়। তমঃপ্রধান, রজঃ-প্রধান, সত্ত্বপ্রধান, রজস্তমঃপ্রধান এবং রজঃ-সত্ত্বপ্রধান। জীব মানব জন্ম লাভের পূর্ব্বে তাহার তমঃপ্রধান ও রজস্তমোপ্রধান বহু ইতরজীব দেহে বাস করিতে হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের সগুণ পরীক্ষা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহারই একতম স্বরূপ অব্যক্ত গুণ যোগে তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই নানা স্থলে নানা ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মেরই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জড়ের উৎপত্তির জন্য জড়ও যথেষ্ট শক্তি সম্পন্না হইয়াছে। "আত্মা এবং জড়ের মিলন", "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "ব্রহ্মের জীব ভাবে

* সত্যধর্ম্ম।

ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশত্রয়ে আমরা দেখিয়াছি যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জড়ের উৎপত্তির জন্য এবং পরমপিতার ইচ্ছায় জড় এবং আত্মার মিলন সম্ভব হইয়া জীব হইয়াছে এবং জড়দেহ জীবের বাধকের কার্য্য করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে দেহ যতই তমোভাবাপন্ন থাকিবে, উহা ততই অধিক পরিমাণে বাধা জন্মাইবে। অর্থাৎ দেহের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, ও কারণত্ব অনুযায়ী বাধার পরিমাণ অধিক, অল্প ও অত্যল্প হইবে। জড় এবং দেহ উৎপন্ন বস্তু সুতরাং বিকৃত। আত্মার যাহা কিছু ভাব দেহ এবং অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহাই অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃত হইবেই হইবে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে প্রত্যেক জাতীয় জীবের শরীরের গঠন এক নহে। আবার এক-জাতীয় জীবের প্রত্যেকের শরীরও একরূপ নহে। তাই আত্মার ইচ্ছা নানা দেহে নানা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় এবং এই জন্যই বিকৃতির মাত্রা অল্পাধিক হয়। মনুষ্য জীবনে শরীর ও মনের নানা-বিধ অবস্থার যে বিকৃতির মাত্রার পার্থক্য হয়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা একটি শান্ত, সাধু চরিত্র, ন্যায় ও সত্যপরায়ণ যুবকের বিষয় চিন্তা করি। তিনি পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন যে একজন বলবান ব্যক্তি একটা দুর্ব্বলের উপর অন্যায় ভাবে অত্যাচার করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে ন্যায় ভাব জাগ্রত হইল এবং তিনি অত্যাচারীকে এরূপ শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতেছেন এবং এই অন্যায় অত্যাচারের বিষময় ফল তাহার অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অত্যাচারী তাহার উপদেশে এতই মুগ্ধ ও অনুতপ্ত হইল যে তিনি (অত্যাচারী) অশ্রুপূর্ণ লোচনে অত্যাচারিত ব্যক্তির এবং উপদেষ্টার নিকট বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন। যদি একটা ক্রোধনস্বভাব বিবাদপ্রিয় যুবকের সম্মুখে উক্তরূপ অত্যাচার সংঘটিত হয়, তবে তাহার হৃদয়েও ন্যায় ভাব জাগ্রত হইবে বটে, কিন্তু তিনি অত্যাচার থামাইতে যাইয়া নিজেই সেই ব্যাপারকে এতই জটিল করিয়া তুলিবেন যে তিনি নিজেই শেষে অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিয়া পাপগ্রস্থ

হইবেন। উভয়ের হৃদয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই প্রেরণা দ্বারাই তাঁহারা অত্যাচার নিবারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তবে কেন বিপরীত ফল দাঁড়াইল? ইহার একমাত্র মীমাংসাই এই যে বিপরীত ভাবাপন্ন দেহ ও অন্তঃকরণের সংস্পর্শে আসিয়া আত্মার সেই সদিচ্ছা বিপরীত ভাবে প্রকাশিত হইল। এস্থলে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে সূর্য্যালোক যেমন নানা বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া নানা বর্ণ প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার সদিচ্ছাও নানা ভাবে অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া নানা ভাবে বিকৃত হয়। জীবের অন্তঃকরণের অবস্থানুযায়ী বিকারের তারতম্য হয়। এখন বিকৃতির মূল কারণ জানিতে আমরা অতি নিম্নস্তরের জীবের বিষয় চিন্তা করি। ধরা যাউক যে তখন জীবাত্মা ইচ্ছা করিলেন যে তিনি অন্য জীবের সহিত প্রেমে মিলিত হইবেন। তাঁহার এই সদিচ্ছা তাঁহার অত্যন্ত তমোভাবাপন্ন দেহ ও অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় উহা অতি বিকৃত ভাবেই প্রকাশিত হয়। দেহের গঠন অনুযায়ী বিকৃতির মাত্রা অল্লাধিক হয়। শরীরের পুনঃ পুনঃ এইরূপ কার্য্য হইতে থাকিলে উহাতে একটী সংস্কার জন্মে বা একটী অভ্যাস গঠিত হয়। ক্রমশঃ এই সংস্কার বা অভ্যাস এত দৃঢ়মূল এবং প্রবল হয় যে উহাই জড়ীয় দেহ এবং অন্তঃকরণকে আত্মার ইচ্ছা ভিন্নও চালাইতে সক্ষম হয়। এইরূপ ভাবেই বহু সংস্কার গঠিত হয় এবং এইরূপ ভাবেই উহারা প্রবল আকার ধারণ করে। এই সংস্কার সংশোধিত না হইলে জন্মে জন্মে উহারা আরও প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। এইরূপ ভাবেই জীবের বহু সু ও কুসংস্কার গঠিত হইতে হইতে তিনি মানব জন্ম লাভ করেন। উহাদের মধ্যে কুসংস্কারের সংখ্যা ও প্রাবল্যই অধিক। কারণ, ইতর জীবদেহ সমূহ অত্যন্ত তমঃ প্রধান। আমরাও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ইতর জীবদেহে তমঃ এর কার্য্য অত্যধিক। রজঃ এর কার্য্য যাহা দেখি, তাহাও অতি নিম্নস্তরের

এবং অত্যধিক ভাবে তমোমিশ্রিত। সেই সকল দেহেও সত্ত্বের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু উহার মাত্রা এতই অল্প যে কোন কোন জীবে উহার অস্তিত্ব অনুভব করা সুকঠিন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পরমপিতা মানবকে বহু বহু কুসংস্কারে জড়িত করিয়াই কি প্রথম জন্ম দান করেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে উহাই সত্য তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ—পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে দুঃখ প্রারম্ভে না থাকিলে সুখ লাভ হয় না। আর যদিই বা হয়, তবে সেই সুখের গভীরতা ততখানি থাকে না। ক্ষুধার তীব্রতা না থাকিলে আহার জনিত সুখ বা তৃপ্তি লাভ করা যায় না, পিপাসার্ত্ত না হইলে জল পানে আনন্দ কোথায়? এইরূপ শত শত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা সত্য ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব যে কার্য্যের প্রথমে দুঃখ ও পরে সুখ। কোন কোন স্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে সেই সেই স্থলে আনন্দাতিশয্যবশতঃ দুঃখের চিন্তা লুক্কায়িত থাকে অথবা দুঃখ পরোক্ষ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ দুঃখের মাত্রা সুখের পরিমাণ হইতে অল্পতর হয় বলিয়া দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমমহালীলার উদ্দেশ্য তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা, সুতরাং দুঃখ যে প্রারম্ভে থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই দুঃখ কোনই কর্ম্ম জনিত নহে, কিন্তু গুণ জনিত। এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহাও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে প্রেমময় বিধাতার বিধান। সুতরাং ইহা সকল কার্য্যের সহিত যুক্ত। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন:—"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" শাস্ত্রকার বলেন:—"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" অর্থাৎ দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না। "সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে। ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্॥" "বঙ্গানুবাদ:- গাঢ় অন্ধকারে যেমন দীপ দর্শনে সুখ হয়, তদ্রূপ দুঃখানুভবকারীর নিকটেই সুখ শোভা পায়।" জীবের জীবনেও সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। জীবের জীবন বলিতে আদি জন্মের প্রথম মুহূর্ত্ত

হইতে ত্রিবিধ দেহের বিগমে পূর্ণামুক্তির মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। জীবের জীবনে প্রথম ভাগে সে দুঃখ ভোগ করে এবং শেষ জীবনে সে সুখ লাভ করে। সুতরাং জীবের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সে স্থলেও ঐ একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ প্রথমে দুঃখ এবং পরে সুখ।* অতএব যদি বলা যায় যে জীবের জীবনে প্রথমতঃ দুঃখের ভাগ অত্যধিক এবং পরজীবনে সুখের ভাগ অত্যধিক, তবে সাধারণ নিয়মের কোনই ব্যতিক্রমের কথা বলা হইল না। আমরা 'ইতর জীবের কথা" অংশে দেখিয়াছি যে জীব প্রথমতঃ অতি হীন অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোন্নতি দ্বারা মানব জীবন, দেব জীবন এবং ঋষি জীবন লাভ করেন। উহাতে পর্ব্বতের দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে পর্ব্বতস্থ আত্মায় চৈতন্য অত্যন্ত স্বল্পাবস্থায় (Irreducible minimum অবস্থায়) আনীত হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত "অদ্ভুত উপন্যাস" গ্রন্থে সাধকদিগের প্রতি প্রস্তরময় দেহ হইয়া অচেতনবৎ এক স্থানে অবস্থিতি করিতে আহ্বানের উপদেশচ্ছলে বলা হইয়াছে :—"যদি আপনারা প্রকৃত চৈতন্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাদিগকে একেবারে অচেতন হইতে হইবে।" "যদি আপনারা প্রকৃত চৈতন্য—যথার্থ জ্ঞান—পাশ-চ্ছেদক বোধ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন এবং ঐ অতুল্য মহাধন লাভের পূর্ব্বে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে আগমন করুন, নতুবা নহে"।** আমরা যদি সাধক জীবন সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় পাষাণ সম কঠিন থাকে, সহস্র সহস্র কুসংস্কার তাঁহার হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া—জমাট বাঁধিয়া অবস্থিতি করে, তাঁহার

* এস্থলে পাঠক "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ-দ্বয় দেখিবেন। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবের শেষ জীবনে সুখের পরিমাণ এত অধিক যে তাহার তুলনায় আমাদের দৃষ্ট বা অনুমিত দুঃখ অকিঞ্চিৎকর।

** এই উদ্ধৃত অংশে 'অচেতন', শব্দ বহির্দৃষ্টিতে অচেতন বা অচেতনবৎ বুঝিতে হইবে।

হৃদয়ে দোষ-পাশের অন্ধকার গাঢ় ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সাধনা দ্বারা, সময় সময় কঠোর সাধনা অবলম্বন করিয়া তিনি জীবন পথে অগ্রসর হন। এই দোষপাশ, এই কুসংস্কার, এই মিথ্যা সংস্কার সকলই পরীক্ষার্থ আমাদের সম্মুখে সংস্থাপিত হয়। উহাদিগকে দমন করিবার, উহাদিগকে লয় করিবার শক্তি দ্বারাই আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হয়। প্রথম প্রথম এরূপ অবস্থাও হয় যে সাধককে যেন আর অগ্রসর হইতে দেয় না, সময় সময় নিরাশা, সংশয় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু তিনি যদি সাধনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তবে ক্রমশঃ সেই সকল বাধা অপসারিত হয় এবং তিনি ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারেন। সাধক ইন্দু ভূষণ রায় মহাশয়ও গাহিয়াছেন :—"পাষাণ ভেদিয়া উঠে জীবনের ফুলরে।" প্রকৃত পক্ষেও অতি কঠিন অবস্থা হইতে মানবের যাত্রা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে মানব জীবনে প্রকৃত উন্নতি আসিবেই, তাহা এজন্মেই হউক্ অথবা অন্য জন্মেই হউক্, ইহলোকেই হউক্ অথবা পরলোকেই হউক্। অতএব ইহা সত্য যে জীব পরিণামে অনন্ত উন্নতি লাভ করিবেই এবং তাহার প্রথমে অচেতন অবস্থায় অর্থাৎ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অবস্থায় আসিতে হইবে। ইহা দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্যই ইতর জীব জীবন প্রারম্ভে স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু পরিণামে অনন্ত সুখ, শান্তি ও আনন্দ বর্ত্তমান। ইহাতে সংশয়ের কোনই কারণ নাই। যদি প্রারম্ভে দুঃখের বর্ত্তমানতা স্বীকার করা যায়, তবে যে ইহার পর সুখ লাভ অনিবার্য্য, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, দুঃখের পর সুখ লাভ সর্ব্বদাই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" অতএব ইতর জীব জীবনে যে আমাদের বিশেষ দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে জন্য ভয়ের কোনই কারণ নাই। কেননা, জীবনের প্রোক্ত ভাগ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি মাত্র এবং ভবিষ্যতে অনন্ত সুখ শান্তি বিধানের জন্যই বুঝিতে হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—"জীবনের যত দুঃখ,

সবই হবে তোদের সুখ'। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—"কবে দুঃখ জ্বালা হইবে বরণ মালা"। আবার যদি জীবের সমগ্র জীবনকে ইতর জীব জীবন, মানব জীবন, দেব জীবন ও ঋষি জীবন ভাবে বিভাগ করা যায়, তবে দেখা যায় যে প্রথম জীবনের অধিকাংশই দুঃখময়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ দুঃখ-সুখময় এবং চতুর্থাংশ সুখময়। সুতরাং সাধারণ নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে পারলৌকিক জীবনেই কেবল দেবত্ব ও ঋষিত্ব লাভ হয় না, মানব জীবনেও তাহা সাধনা দ্বারা লাভ করা যায়। তবে ইহা সত্য যে মানব জীবনেই (ইহলোকে) সম্পূর্ণ রূপে অনন্ত উন্নতি লাভ সম্ভব নহে। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন :—"মহাত্মা সাধকগণ স্থূল দেহে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত দেহের কর্ত্তব্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন, কেহ কেহ সূক্ষ্মদেহের কতকগুলি কার্য্যও করেন, কেহ কেহ বা সূক্ষ্মদেহের সমস্ত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক কারণদেহের কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই "জীবন্মুক্ত" শব্দের প্রকৃত বাচ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই পৃথিবীতে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অত্যল্প মাত্র।" (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)। অতএব প্রথমে দুঃখ আছে বলিয়া সেই ইতর জীব জীবনকে তুচ্ছ করিতে হইবে না। কারণ, উহাই জীব জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থা। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে ইতর জীব জীবনেও সুখ আছে, সাধনাও আছে তাহা যতই অল্প হউক না কেন। এই সম্পর্কে 'ইতর জীবের কথা' অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। অন্য ভাবে চিন্তা করিলেও আমরা দেখিতে পারি যে আমাদের আদর্শের হিসাবে ইতর জীবের দুঃখ অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাদের দুঃখ অত্যন্ত নহে। কারণ, নিম্নস্তরের দেহ দ্বারা উহাদের জ্ঞান এতদূর অবরুদ্ধ যে উহাদের নিজেদের অবস্থা নিজেরা বুঝিতে পারে না। তাই উহারা শারীরিক কষ্টকেই অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শরীরের প্রতি আঘাত প্রভৃতিকেই একমাত্র দুঃখের কারণ মনে করে। মানবের নিম্ন-স্তরেও প্রায় ঐরূপ দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া মনে করা হয়। মধ্যম স্তরের

মানব সাধারণ এই সম্বন্ধে উহা হইতে একটু উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহারাও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, স্বার্থ-পরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা এতদূর বিপর্য্যস্ত যে তাহারা তাহাদের প্রকৃত দুঃখের অনুভূতি সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। যদি তাহাদের হীন অবস্থার প্রকৃত জ্ঞানই থাকিত, তবে পৃথিবীতে এক সভ্য জাতির সহিত অন্য সভ্য জাতির পর পর এরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে পারিত না, পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য সমাজ সমূহে এরূপ কৌৎসিত্য, কদাচার, এইরূপ হিংসা, দ্বেষ, এইরূপ দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যা-চার, এইরূপ চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি ভীষণ ভাবে সর্ব্বদা চলিতে পারিত না। আমাদের দুঃখের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া চিরদিনই মহাপুরুষগণ দুঃখবোধ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা মানবকে আধ্যাত্মিক ভাবে অগ্রসর না করিয়া উহা বহু স্থলে নানাবিধ অন্যায় কার্য্যের সাহায্য করিতেছে। আরও গভীর দুঃখের বিষয় এই যে মানব সভ্যতার এমন কি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এরূপ অত্যাচার নাই, যাহা সে করে না। এই সকল ভীষণ অন্যায়কারীদের প্রকৃত দুঃখের উপলব্ধি ত নাইই, অধিকন্তু তাহারা তথাকথিত শিক্ষালব্ধ কূট বুদ্ধি দ্বারা সেই সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করে। সুতরাং হীন অবস্থায় অবস্থিত জীবগণ প্রকৃত দুঃখের অনুভূতিতে বঞ্চিত বলিয়া সর্ব্বদা ঘৃণ্য নহে। অতএব ইতর জীবের বাস্তব দুঃখ অত্যন্ত অধিক নহে। যদি হীন অবস্থা সম্বন্ধেই বিবেচনা করা যায়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে ইতর জীব জীবনই হীনতম এবং ক্রমোন্নতির নিয়মা-নুযায়ী উহারা ক্রমশঃ উন্নততর দেহ প্রাপ্ত হয় এবং হীনতা হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইতে থাকে এবং পরে মানব জীবন ও তৎপরে দেব জীবন লাভ করে। সুতরাং সকলের পক্ষেই যখন একই বিধান, তখন ইতর জীবকে তুচ্ছ করা কর্ত্তব্য নহে। উহারাই ত ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীর জীব ভাবে জগতে বিচরণ করিবে। অনন্ত প্রেমময় পরমপিতা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা রচিত জড় ত্রিগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্ন করিয়াছেন। সৃষ্টি যে ক্রম

প্রণালীর অন্তর্গত, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি যদি নিম্নলিখিত ভাবে জীবদেহ গঠন করিয়া থাকেন, তবে সেই জন্য কোন ত্রুটী লক্ষিত হয় না "(১) তমঃপ্রধান দেহ। নিম্নতম স্তরের ইতর জীবের দেহ। (২) রজস্তমঃ প্রধান দেহ। তমঃ এবং রজঃ নানাবিধ সংমিশ্রণে নানাবিধ রজস্তমঃ প্রধান দেহ গঠিত হইয়াছে। ইতর জীবের উচ্চস্তরের দেহ রজস্তমঃ প্রধান। উহাতে তমঃ এর প্রভাব অত্যধিক এবং রজঃ অতি নিম্নস্তরের কার্য্য করে। মানবের নিম্নস্তরের দেহও রজস্তমঃ প্রধান। উহাতেও নিম্নস্তরের রজঃ শক্তির কর্ম্ম বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তমঃও উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। (৩) রজঃ প্রধান দেহ—মানবের মধ্যম স্তরের দেহ রজঃ প্রধান। উহাতে তমঃ এর পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত দেহের তুলনায় হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং রজঃ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই রজঃ নিম্ন এবং উচ্চ উভয় স্তরের কর্ম্মই করে। (৪) রজঃ-সত্ত্ব প্রধান দেহঃ—উচ্চস্তরের মানবের এবং নিম্নস্তরের দেবগণের দেহ। এই দেহে রজঃ উচ্চ স্তরের কার্য্য করে এবং সত্ত্ব হৃদয়কে অধিকার করে। (৫) সত্ত্ব প্রধান দেহ—অত্যুন্নত মানবের এবং ঋষি, মহর্ষি তুল্য দেবদিগের দেহ। এই দেহে সত্ত্বই সর্ব্ব প্রধান ভাবে জীবের চিন্তা, ভাবনা ও কর্ম্মের গতি নির্দ্দেশ করে। (৬) একমাত্র সত্ত্ব—শেষের দেহেই একমাত্র সত্ত্বই বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ তমঃ এবং রজঃ থাকিয়াও যেন উহাতে নাই। অর্থাৎ উহারা সত্ত্বের অত্যধিক প্রভাবে যেন লয় প্রাপ্ত। পরমোন্নতদিগের মধ্যে অত্যুন্নত পরমর্ষিদিগেরই এই প্রকার দেহ। সেই দেহের অবস্থা সম্বন্ধে আমার ন্যায় হীন জনের কিছু না বলাই সঙ্গত। জীবের সেই অবস্থা এতই উচ্চ, এতই আনন্দ পূর্ণ, এতই সত্য, জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি অসংখ্য গুণে পরিপূর্ণ যে সেই দেহ কখনই নিত্য ব্রহ্ম দর্শনে বাধা উৎপাদন করে না। সেই দেহের এবং সত্ত্ব প্রধান দেহের বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য। অথচ সেই সকল দেহের সংখ্যা অনন্ত প্রায়। সুতরাং ইতর জীব জীবনের বা মানব জীবনের নিম্নতম এবং মধ্যম স্তরে যদি আমাদিগের কিঞ্চিৎ দুঃখ ভোগ করিতেও হয়, সেই জন্য

আমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। কারণ, অনন্ত সুখ শান্তি আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান এবং জীব যতই হীনাবস্থাপন্ন হউক না কেন, কেহই সেই অপরিমেয় পরম সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে না। কেন না, তাহাই জীবের পরিণতি, তাহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাহা প্রত্যেক জীবের জীবনে সংসাধিত হইবেই। আমাদের এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে প্রারম্ভিক দুঃখ পরিণামে সুখ প্রাপ্তির প্রস্তুতি মাত্র। ক্ষুধার তীব্রতা না থাকিলে আহার্য্য পদার্থের আস্বাদন পাওয়া যায় না। ক্ষুধারাহিত্য বা অরুচি একটী কঠিন রোগ। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য মানব নানাবিধ পরিশ্রম করেন এবং বিকৃত ঔষধ সেবন করেন সুতরাং দুঃখ প্রাপ্ত হন।" আমরা "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে পরম-পিতা তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষার জন্যই এই প্রেমমহালীলার সংঘটন করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকে ক্রমশঃ প্রত্যেক হৃদয়ে বিকাশ করিতেছেন এবং সেই জন্যই তিনি দেহকে জীবাত্মার বাধারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিম্নস্তর হইতে ক্রমবিকাশের জন্যই নিম্নতম জীবদেহ তমোগুণ দ্বারাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদিগের দেহ ক্ষিতিপ্রধান বা ক্ষিতিপূর্ণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম দেহ এবং সেই জন্যই পৃথিবীতে মানবই শ্রেষ্ঠতম জীব। মানবদেহের গঠন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে মানবই কেবল স্বাধীন ভাবে উল্লেখ যোগ্য সাধনা দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারেন। অন্য জীবে সাধনা আছে বটে, কিন্তু তাহা অত্যল্প এবং অধিকাংশে mechanical সুতরাং মানব যে অত্যধিক ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ জীবন পথে অগ্রসর হইবে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা জীবনে ক্রমশঃ সফল করিতে থাকিবে, ইহাই ত যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। যদি মানবজীবন সর্ব্ব সংস্কারবর্জ্জিত ভাবেই আরম্ভ হইত, তবে সর্ব্বসাধারণের দেহও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত মানব-গণের দেহের ন্যায় সুগঠিত হইত; বর্ত্তমানে যে অনেকেই রজস্তমঃ-প্রধানদেহ ধারণ করেন, তাহার প্রয়োজন হইত না, সকলেই রজঃ-সত্ত্বপ্রধানদেহ ধারণ করিতেন। আমরা মানবের তিনটী অবস্থা

স ম্বন্ধে বলিয়া থাকি। যথা—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। মানবের মধ্যে যখন রজস্তমোভাব প্রধান এবং সেই রজঃ অতি নিম্নস্তরের ব্যাপারই সংসাধন করে, তখন তাহাকে পশুত্বের গ্রামে অবস্থিত বলা হয়। তাঁহার মধ্যে যখন রজঃ-সত্ত্ব-প্রধান ভাব হয় এবং সেই রজঃ যখন উচ্চস্তরের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকে এবং সত্ত্বও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহাকে মনুষ্যত্বের গ্রামের বা স্বগ্রামের অধিবাসী বলা যায় মানব যখন সত্ত্বভাব-প্রধান ভাবে বাস করেন, তখন তিনি দেবভাবে পূর্ণ হইয়া থাকেন এবং পৃথিবীবাসী হইয়াও স্বর্গসুখ ভোগ করেন। পাশ্চাত্য গ্রন্থে দেখা যায় যে মানবের মধ্যে animal propensities বা animality আছে। যুদ্ধের প্রধান কারণ জাতি বিশেষের শক্তি বৃদ্ধি। তাই তাহাদের মূল মন্ত্র হয় Might is right. ইহাকে Law of Junglesও বলা হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যাহা কিছু কু, তাহা মানবের জান্তব জীবনের উপার্জ্জিত সংস্কার। অন্য ভাবে জীবের জীবন বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমটী ইতরজীবেরজীবন, দ্বিতীয়টী মনুষ্যজীবন ও তৃতীয়টী 'দেব-জীবন। ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক জীবেরই এই তিনটী স্তরের মধ্য দিয়া পরমপিতার দিকে যে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন যে "মনুষ্য জীবনের প্রথম অবস্থা অনেক অংশে পশুতুল্য; কিন্তু ক্রমোন্নতি দ্বারা ঐ পশুভাব ক্রমশঃ দূরীকৃত বা নিস্তেজ হইতে থাকে এবং দেবভাব প্রাপ্তি দ্বারা প্রথমে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও পশ্চাৎ দেবত্ব উৎপন্ন হয়।" (ক) যদি মানব সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত ভাবে জীবন আরম্ভ করিত, তবে প্রোক্ত তিন শ্রেণীর দেহের মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর দেহই অর্থাৎ তাহার নিজস্ব দেহই তিনি মানব ভাবে প্রথমজন্মে প্রাপ্ত হইতেন। তিনি কেন নিম্নতম দেহ—পশুগ্রামের দেহ প্রাপ্ত হইবেন? সুতরাং পরীক্ষার উপযুক্ত বাধা বর্ত্তমান থাকিত না। উপযুক্ত বাধা না থাকিলে উপযুক্ত পরীক্ষাও সম্ভব হইত না। মানবের অতি নিম্নতম স্তরেও দেখা যায় না যে তিনি

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত ভাবে জন্ম গ্রহণ করেন। বরং ইহার বিপরীত অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তিনি বহু বহু সংস্কার সহ মানব জীবন আরম্ভ করেন এবং সংস্কাররাশির মধ্যে অধিকাংশই কুসংস্কার এবং পশুভাব পূর্ণ। অপর দিকে ইতর জীবের অতি নিম্নস্তরেই সংস্কারবর্জ্জিতপ্রায় অবস্থা থাকে। কারণ, উহার পূর্ব্বে তাহার কর্ম্ম থাকে না বা সংস্কার গঠনের উপযুক্ত অত্যল্প কর্ম্মই থাকে এবং তাহার পিতৃপুরুষগণেরও প্রায় ঐ একই অবস্থা। পাশ্চাত্য দার্শনিক Descartes বলেন যে শিশুগণের Mind (অন্তঃকরণ) Iabula Rasa (clean slate) এবং ক্রমশঃ তাহাতে সংস্কার গঠিত হয়। মানব শিশু যে সংস্কারবর্জ্জিতভাবে জন্মগ্রহণ করে না, ইহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে জীবহৃদয় c'ean slate তখনই, যখন সে জীবভাবে প্রথম জন্ম গ্রহণ করে * কেহ বলিতে পারেন যে মানব শিশুর মধ্যে যে সংস্কার আমরা দেখিতে পাই, তাহা সে দেহের সহিত পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে লাভ করিয়াছে। ইহার উত্তরে আমরা পাঠককে 'জন্মান্তর বাদ" সম্বন্ধে লিখিত বিষয় স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। উহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে heredity ই মানবের সংস্কারের একমাত্র কারণ নহে। জন্মান্তরে উপার্জ্জিত সংস্কারও আমরা বহন করিয়া লইয়া আসি। মানবজন্মই যদি তাহার প্রথম

---

* এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমাবস্থার জীবের কর্ম্মের ধারণা আমাদের নাই বলিয়া আমরা অতি নিম্ন স্তরের জীবের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে নিম্নতম স্তরের জীবদেহ এত অধিক তমোভাবাপন্ন যে সাধারণে উহাদিগকে চেতনা শূন্যই মনে করেন। সেই সকল দেহে রজোভাব অত্যল্প বা সাধারণের দৃষ্টিতে নাই বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সেই সকল দেহের কর্ম্মের বিচার আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এস্থলে আরও বক্তব্য যে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ মানবের একবার মাত্র জন্ম স্বীকার করেন। তাই তাহারা শিশু হৃদয়কে Iabula Rasa বলিয়া থাকেন। কিন্তু পরীক্ষা করিলেই ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। হৃদয়ে তখনই Iabula Rasa থাকে যখন জীব নিম্নতম স্তরে তাহার আদি জন্ম লাভ করে এবং ক্রমশঃ তাহার হৃদয় সংস্কারাচ্ছন্ন হয়।

জন্ম হইত, তবে মানবের প্রথম জন্মেই তাহার মধ্যে এত অসংখ্য কুসংস্কার আমরা দেখিতে পাইতাম না। ইহা আমাদের সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারি। কারণ, মানবের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট স্তূপীকৃত সংস্কার কখনই এক মুহূর্ত্তে উপার্জ্জিত হইতে পারে না। ক্রমই সৃষ্টির বিশেষ প্রণালী। সুতরাং মানবজন্ম লাভের পূর্ব্বে ইতরজীবভাবে তিনি ক্রমশঃ বহু বহু জন্মে সেই সংস্কাররাশি গঠন করেন এবং পরিশেষে বহু জন্মে মানবদেহে এবং পরলোকে সূক্ষ্মদেহে সাধনা দ্বারা উহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। মানুষের সর্ব্বসংস্কার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্ত, ইহা যদি স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়, তবে আমরা চিন্তা করিতে করিতে আদি পুরুষেই উপস্থিত হইতে পারি। সেই আদি মানবগণ জন্মের সহিত অবশ্যই মধ্যম প্রকারের দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, তাহাই তাহার নিজস্ব শরীর। সেই দেহ যে কি প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই দেহে কু ভাবের আধিক্য থাকিবে না। যাহা কিছু সেই জন্মেই শরীরজাত, তাহা দূরীকরণ সহজসাধ্য ও অল্পকাল সাপেক্ষ হইবে। সুতরাং তাহাদের সন্তানগণও অনেক কুসংস্কার সহ জন্মগ্রহণ করিবে না। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে উহাতে মানব বংশ কেবল মধ্যম প্রকারের শরীরের শরীরী হইবে এবং প্রত্যেকেরই সংস্কার বিশেষতঃ কুসংস্কার অত্যল্প থাকিবে এবং উহাদের হাত হইতে অল্পায়াসেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীতে ইহার বিপরীতই দেখা যায় অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন মানবের সংখ্যাই অত্যধিক। একথাও বলা চলে না যে মানব বহু মানবজন্মে কুসংস্কাররাশি অর্জ্জন করিয়াছেন। কারণ, আমরা যদি মানবের আদি স্তরে যাই, তবেই দেখিতে পাই যে তাহাদের মধ্যেই কুসংস্কারের সংখ্যা ও প্রাবল্য অত্যধিক। ক্রমশঃ সভ্যজাতীয় মানবের মধ্যে কুসংস্কারের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জীব মানবদেহ ধারণের পূর্ব্বে বহুকাল ইতরজীব ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল এবং তজ্জন্য সে রাশি রাশি কুসংস্কার

অর্জ্জন করিয়াছিল। নানা ইতরজীবজীবনে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংস্কার অর্জ্জিত ও অবস্থিত হয় বলিয়া উহারা হৃদয়ে ঘনীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয় এবং উহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এত কঠিন হয় যে মানবের বহু জন্মেও তিনি উহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন না। কেহ বলিতে পারেন যে মানবের প্রথম জন্মেই তিনি পরমপিতার ইচ্ছায় বহু সংস্কার সহ জন্মগ্রহণ করেন। পরমপিতার ইচ্ছায় যখন সকলই হইতে পারে, তখন তিনি কেন এইরূপ ভাবে মানবকে পৃথিবীতে আনয়ন করিতে পারিবেন না। ইহার উত্তরে "গুণবিধান" অংশে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পরমপিতার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বটে, কিন্তু জাগতিক বিধান অনুধাবন করিলে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় যে তাঁহার ইচ্ছা প্রণালীবিশেষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই প্রণালীতে ক্রমও বিদ্যমান। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে এই অসংখ্য সংস্কার একদিনে স্তূপীকৃত হয় নাই, উহা ক্রমশঃ সুদীর্ঘকালে ও সুদীর্ঘ প্রণালীতে সম্ভব হইয়াছে। জীবের জীবনে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারাও সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সূর্য্যগ্রহণে আমরা দেখিতে পাই যে সূর্য্য ক্রমশঃ চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হইতে হইতে সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। আবার যখন মোক্ষ হয়, তখনও ক্রমশঃ ছায়া অপসারিত হইতে হইতে অবশেষে সূর্য্য সম্পূর্ণভাবে আবরণ মুক্ত হয়। জীবের দশাও তাহাই। জীবহৃদয়ও নানাবিধ সংস্কার-জালে ক্রমশঃ আবৃত হইতে থাকে। জীবের বহু বহু জন্ম ভিন্ন এত অধিক সংস্কার উপার্জ্জিত ও গ্রথিত হইতে পারেনা। সুতরাং এই আবরণ বিস্তৃত ও ঘনীভূত হইতে হইতে তাহাকে ইতর জীবভাবে বহু জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই আবরণই জীবের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। এই আবরণ উন্মোচনই জীবের পক্ষে সাধনা। পূর্ণ গ্রহণে সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইতে যেমন অধিক কালের প্রয়োজন হয়, তেমনি আবরণ মুক্ত হইতেও অধিক সময়

ব্যয়িত হয়। আমরা সকলেই জানি যে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইতে আমাদের বহুকালের প্রয়োজন হয়। দেখা যায় যে সাধারণের পক্ষে একজন্মে ইহজীবনে এই সাধনা ফলবতী হয় না। প্রকৃতপক্ষেও বহুজন্মে এবং পরলোকে বহুকাল বাস ও সাধনা দ্বারা এই সংস্কার মুক্ত হইতে হয়। সুতরাং ইহা যুক্তিযুক্ত ভাবেই অনুমান করা যাইতে পারে যে সেই সকল সংস্কার বহুকাল ব্যাপিয়া অর্জ্জিত এবং পুষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। যে পদার্থ উৎপন্ন হইতে অধিক কালের প্রয়োজন হয়, উহার লয়েও অধিক কাল ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। সংস্কার লয়ের কাল অতি সুদীর্ঘ, ইহা যখন আমরা জানি, তখন সেই সংস্কার উৎপন্ন ও দূরীভূত হইতেও যে অধিককাল আবশ্যক হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এই সূত্রাবলম্বনে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে মানবের প্রথম জন্মেই যদি সকল সংস্কার অর্জ্জিত হইত, তবে উহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভও একজন্মে অথবা দুই তিন জন্মে সম্ভব হইত। কিন্তু তাহা যে সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইতরজীবজীবনের প্রথমাবধি সংস্কার গঠিত হইতে থাকে, এবং বহু বহু সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায়ই মানবজন্ম লাভ হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে এই সংস্কাররূপ আবরণ অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল বিধানেই বটে। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বগুণ পরীক্ষা। আবরণ উন্মোচনের শক্তি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। প্রথম ব্রহ্মদর্শনে—প্রকৃত মোক্ষের আরম্ভ হয় এবং নানাগুণে সাধকের একত্বলাভেই আবরণের ক্রমশঃ হ্রাস হয়। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "সোহহং জ্ঞান" অংশও দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে ইতরজীবভাবে জীবের প্রথম জন্ম হয়। জীব যে বহু যোনি ভ্রমণান্তর দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে, তাহা "ইতর জীবের কথা" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত ভাবে প্রথম মানবজন্ম গ্রহণ করিতে পারেন

না। হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম্মবাদ এবং প্রত্যেক জীবের পক্ষে বহুযোনি ভ্রমণবাদও বলিবেন যে মানব মাত্রই বহু কুসংস্কার সহ প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। মানবজন্মকে দুর্লভ বলা হয় এই জন্যই যে মানব-দেহে জীব বহু আধ্যাত্মিক সাধনা এবং পরমপিতার উপাসনা করিতে সমর্থ হয়। স্বগুণ পরীক্ষার জন্যই নিম্নতম স্তর হইতে জীবের সংস্কার স্তুপীকৃত হইতে থাকে এবং উহা আবরণের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। উদ্দেশ্য এই যে জীব মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া সেই স্তুপাকার সংস্কার জন্ম-জন্মান্তরে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ দূর করিতে থাকিবে এবং এই দেহজাত সংস্কাররাশি এবং দোষপাশরাশি বিদূরিত করিবার শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের শক্তির পরীক্ষা হইতেছে ও হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতর জীবদেহ তমঃপ্রধানভাবে গঠিত এবং সেই তমঃএর আবরণই যথেষ্ট। উহাকে সংস্কার দ্বারা আরও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রায় সম্পূর্ণ তমঃএর আবরণে জীব বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু রজোগুণেরও কার্য্য আছে। রজোগুণের ফলেও যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সংস্কার গঠিত হয়। দেহ ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতেছে, কিন্তু সংস্কার গঠিত হইতেছে না ইহা হইতেই পারে না। ইতরজীবজীবনে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহার অধিকাংশই রজোগুণের নিম্নস্তরের ক্রিয়া। কারণ, তাহাদের দেহ তমঃপ্রধান। সুতরাং প্রায় সকল কার্য্যের গতিই নিম্ন দিকে। সুতরাং উহাদের দ্বারা কুসংস্কাররাশিই অত্যধিক ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। রজঃ দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে তমঃ অপ-সারিত হইতে পারে না। তমঃ ক্রমশঃ অপসারিত না হইলে জীব ক্রমশঃ উন্নততর দেহের অধিকারী হইতে পারে না। আবার রজঃএর ক্রিয়া দ্বারা সংস্কার গঠিত হয় এবং তমঃপ্রধান দেহে সেই সকল ক্রিয়া অধি-কাংশ স্থলেই কুসংস্কার উৎপাদন করে। এইরূপ ভাবেই প্রধানতঃ রজঃ এবং তমঃ এর মিশ্রণে জীবের কুসংস্কাররাশি ক্রমশঃ উৎপন্ন ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইরূপ ভাবেই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জীব মানবজন্ম লাভ করে। আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে ইতর

জীবদেহ ঊর্দ্ধ দিকে ক্রমশঃ অধিকতর রজঃপ্রধান। সত্ত্বগুণও প্রত্যেক দেহে বর্ত্তমান, যদিও ইতরজীবদেহে উহার পরিমাণ অত্যল্প সুতরাং ক্রমশঃ অধিকতর। স্থূল ভাবে বিষয়টী বুঝিতে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে গুণের শক্তির পরীক্ষার জন্যই জীবে প্রথমতঃ বিশেষরূপে বাধার সৃষ্টি এবং উহাকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি দ্বারাই নানা গুণের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। যদি বাধা সমূহ সৃষ্টিই না হইত, তবে উহা-দিগকে অতিক্রম করিবার প্রয়োজনও থাকিত না এবং গুণরাশির শক্তির পরীক্ষা অসম্ভব হইত। এস্থলে আরও একটী বিষয়ের ধারণা জন্মিলে এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তাহা এই যে মানব যদি ইতরজীবজীবনের কুসংস্কাররাশি দ্বারা একান্ত ভাবে আবদ্ধ না হইয়া মানবজন্ম গ্রহণ করিত, তবে তাহার মানবীয় শক্তি দ্বারা কেবল মানব-দেহ-জনিত আবরণের বাধা অতিক্রম করা এত সুকঠিন হইত না। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে আবরণরাশি উন্মোচন করা অসাধ্য না হইলেও অতি দুঃসাধ্য। তাই সাধকগণের হৃদয় বিদারণ ক্রন্দন ধ্বনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কত সাধক সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই একাধিক মানবজীবন যাপন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সংস্কার অভ্যাস উৎপাদন করে এবং অভ্যাসের কি বলবতী শক্তি, তাহা ইতঃপর বর্ণিত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কাররাশিও দেহ এবং অন্তঃকরণের কার্য্য জনিত। সুতরাং উহাদের মূলেও দেহ। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে দেহের স্বাভাবিক আবরণ সংস্কারোৎপন্ন আববণের যোগে আরও ঘনীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে জীবগণ নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী দেহ লাভ করেন। সুতরাং ইহা সত্য যে আমাদের জান্তব সংস্কার সমূহ যদি সুদীর্ঘকাল হইতে উৎপাদিত না হইত, এবং সেই জন্য উহারা যদি দৃঢ়মূল না হইত, তবে উহাদিগকে উৎপাটিত করা মানবের পক্ষে কঠিন হইলেও অত্যন্ত সুকঠিন হইত না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে মানবের পক্ষে যদি দেহমাত্রের আবরণ উন্মোচন সহজসাধ্য হইত, তবে বৃক্ষ কেন উহার আবরণ সহজেই

উন্মোচন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না। বৃক্ষজন্ম আদি জন্ম না হইলেও উহা জীবের প্রায় আদিতেই সংঘটিত হয়, ইহা মনে করা যাইতে পারে। কারণ, বৃক্ষজন্ম ইতরজীবের অতি নিম্নস্তরেই সংঘটিত হয়, ইহা মনে করা যাইতে পারে। কারণ, বৃক্ষ ইতরজীবের অতি নিম্নস্তরেই অবস্থিত। সুতরাং উহাতে অল্পই সংস্কার বর্তমান থাকে এবং সেই সংস্কারও কখনই ঘনীভূত, দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ইহা কখনও বলা হয় নাই যে দেহমাত্রের আবরণ উন্মোচন সহজসাধ্য। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে দেহমাত্রের আবরণ উন্মোচনও কঠিন বটে, কিন্তু সংস্কাররাশির জন্য উহা আরও কঠিনতর হয়। অর্থাৎ দেহের স্বাভাবিক আবরণ এবং সংস্কার যোগে উহার যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, এই উভয়ের পার্থক্য অত্যধিক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বৃক্ষদেহের গঠন ও মানবদেহের গঠন এক নহে। বৃক্ষদেহ একান্তভাবে তমঃপ্রধান, কিন্তু নিম্নস্তরের সাধারণ মানবের দেহও রজস্তমঃপ্রধান। তাহার দেহের গঠনই এই প্রকার যে সে যত্নবান হইলে আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে। পৃথিবীতে মানবই যে শ্রেষ্ঠতম জীব এবং সে যে নানাবিধ শক্তিতে শক্তিমান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মানবের তিনটী অবস্থা। যথা—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। সাধারণ মানুষ রজস্তমঃ-প্রধান। সেই রজঃ নিম্নস্তরের। মনুষ্য পদবীতে উন্নীত ব্যক্তিগণ রজঃসত্ত্বপ্রধান দেহ ধারণ করেন এবং সেই রজঃ উচ্চস্তরের কার্য্য পরিচালনা করে। দেবত্বপ্রাপ্ত মানবগণ সত্ত্বপ্রধান দেহ ধারণ করেন। যদি মানব ইতরজীবজীবনের সংস্কার সহ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে তিনি রজঃ-সত্ত্ব-প্রধান দেহ ধারণ করিতেন এবং তাহার স্বাভাবিক শক্তিতেই দেহমাত্রের আবরণ উন্মোচন বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পতর কঠিন হইত। মানব যে প্রকার দেহই লাভ করুক না কেন, উহার গঠনই এই প্রকার যে সে সংস্কারবর্জ্জিত কেবলমাত্র দেহের স্বাভাবিক বাধা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই দূর

করিতে পারিত, তাহার দেহ বৃক্ষদেহ নহে, পশুপক্ষীর দেহও নহে। মানবদেহের এমনি গঠন যে উহাতে জ্ঞানের বিকাশ অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন হয়। বৃক্ষের কথা দূরে থাকুক, পশুও কখনও চিন্তা করিতে পারেনা যে সে কোথায় হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে ও কোথায় যাইবে, সে কখনও সাধন ভজন দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এখন একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এক ব্যক্তিকে যদি গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় এবং সেই স্থানে তাহাকে আনন্দে রাখিবার জন্য অল্প বন্দোবস্ত থাকে, তবে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সেই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। কারণ, সেই গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া চিরকাল আনন্দ ভোগ করিবার উপযোগী বহু সামগ্রী তাহার নাই। যাহা কিছু আনন্দের বস্তু আছে, তাহা অল্পকালেই পুরাতন হয়, এবং সেই জন্য উহা আর তাহাকে আনন্দ দান করিতে পারে না। তখন সেই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবেই জাগ্রত হয় এবং তিনি বাহির হইবার জন্য পথ খুঁজিতে থাকেন ও অবশেষে উহা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তিকে সেই স্থলে আনন্দে রাখিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন থাকে, তবে তিনি গৃহের বাহিরে যাওয়া দূরে থাকুক, গৃহের যে বাহির আছে, সেই স্থলে যে অপার আনন্দ সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহাই তিনি অসার আমোদের বিষম মোহে ভুলিয়া যান এবং সেই সকল আমোদই বারংবার সম্ভোগ করিবার জন্য প্রয়াসী হন। এস্থলে প্রথম অবস্থা কেবলমাত্র দেহের স্বাভাবিক আবরণের অবস্থা এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেহ এবং সংস্কার জনিত ঘন আবরণের অবস্থা মনে করিতে হইবে। সংস্কার দেহজাত দোষ-পাশকে এত দৃঢ় ও বলবান করে যে সেই বন্ধনকে ছেদন করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন হয়। অভ্যাস জন্য এমন এক প্রকার মোহ উৎপন্ন হয় যে উহা মানবের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি উভয়কেই অবশ করিয়া ফেলে এবং পুরাতন কু যাহা, তাহা লইয়া

থাকিতে প্রবর্ত্তনা দান করে। অভ্যস্ত কুসংস্কারকে ছাড়িতে সে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। আমরা যদি নিজ নিজ জীবন গভীরভাবে আলোচনা করি, তবেই আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে সমর্থ হইব, আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই দেহের আবরণ এবং উহাতে যুক্ত দেহজাত সংস্কাররাশির আবরণের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। মানুষ সংস্কারের অন্ধকারে অন্ধ হইলে যে কতদূর অধঃপতিত হইতে পারে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। মানব প্রকৃত আনন্দ চায়। কিন্তু সাধারণে তাহা পায় না। সুতরাং কৃত্রিম আনন্দকে যখন সে পায় এবং সংস্কারবশতঃ যখন সে মনে করে যে উহাই তাহার পক্ষে পরমার্থ, তখন আর তাহার পক্ষে কঠিন নিগঢ় ভঙ্গ করিবার প্রশ্নই উপস্থিত হয় না। এই জন্যই সংস্কারের বন্ধন এত ভীষণ কঠিন, এই জন্যই বহু সাধক সংস্কারের জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া আকুল হন। তাই ভক্ত তাঁহার সাধক জীবনের প্রারম্ভে গাহিয়াছিলেন :—"অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়, কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।" নিম্নলিখিত উপাখ্যানে এই বিষয়টী আরও সুস্পষ্ট হইবে। ভীষণ ঝড়ে ভীষণ ভাবে তরঙ্গায়িত কোন এক নদীতে কোন এক ব্যক্তি এবং একটি ভল্লুক উভয়ই জলমগ্ন প্রায় অবস্থায় হাবুডুবু খাইতেছে। যেমন ইংরেজীতে একটী কথা আছে, Drowning man catches at a straw (মগ্নপ্রায় মানব [বাঁচিবার জন্য] একটী তৃণকেও ধরে), মানুষটীও সেইরূপ একটী ভল্লুককে একটী মোটা কম্বল মনে করিয়া উহাকে আশ্রয়ভাবে তাড়াতাড়ি ধরিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য-বশতঃ দেখিতে পাইল যে সেই কম্বল আশ্রয়ের কার্য্য না করিয়া তাহাকে আরও জলমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ, জীবন রক্ষার জন্য সেও যেমন কম্বলরূপী ভল্লুকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, ভল্লুকও তেমনি উহার জীবন রক্ষার জন্য সেই ব্যক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া-ছিল এবং কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছিল না। নদীতীর হইতে দর্শকবৃন্দ সেই ব্যক্তিকে কম্বল ছাড়িয়া দিতে বারংবার বলিয়াছিল,

কিন্তু সে তাহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিল না। তাই সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল :—"হাম্ তো কম্বল ছোড়্ দিয়া, কম্বল হাম্‌কো নেহি ছোড়্‌তা" (আমিত কম্বল ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়িতেছে না।) আমাদের সাধারণের অবস্থাও তাহাই। এমন অনেক বৈরাগ্যাবলম্বী সাধক আছেন, যাঁহারা শরীরের উপর অত্যন্ত কঠোর শাসন করেন, সময় সময় অঙ্গ বিশেষকে ধ্বংস পর্য্যন্ত করেন, প্রলোভনের স্থান বা কর্ম্ম হইতে দূরে প্রস্থান করেন, কিন্তু তথাপিও কু অভ্যাসে চির অভ্যস্ত মন সংযত হইতে চাহেনা, স্মৃতি হৃদয় হইতে সুদূরে অবস্থিতি করে না, কুদিকে যাইবার জন্য অথবা কুচিন্তা করিতে অত্যাগ্রহ কিছুতেই নিবারিত হয়না। সংস্কারের এইরূপই ভীষণ অত্যাচার আমাদের প্রত্যেককেই অল্পাধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়। আমরা দেহের অত্যাচার হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেই দূরে থাকিতে পারি না। ইহার উপর যখন সংস্কাররাশি আসিয়া উহার সহিত যোগদান করে, তখন আমাদের শত আকুল ক্রন্দনেও যেন কুল পাই না। সংস্কারের আরও ভীষণ ফল এই যে মানব সময় সময় বুঝিতে পারে যে সে বিষম অন্যায় করিতেছে, কিন্তু তথাপিও সেই চিরাভ্যস্ত কুকর্ম্ম বা কুচিন্তার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, অথবা উহা তাহার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন হয়। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কারও দেহজাত এবং জন্মার্জ্জিত, উহারা দেহেই সঞ্চিত ও পুষ্ট হয়। সুতরাং দেহই যত অনর্থের মূল। অর্থাৎ দেহই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাধা। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে মানবজীবনই জীবের মধ্যম স্তর (Intermediate stage)। ইতরজীবজীবনই পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতির স্তর। অর্থাৎ পরীক্ষা যতদূর কঠিন হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ ভাবের বাধা তাহার জীবনে উৎপাদন করাই এই স্তরের কার্য্য। মানবজীবনই প্রকৃত পরীক্ষার ক্ষেত্র। দেবজীবনেও পরীক্ষা আছে বটে,

কিন্তু রজস্তমঃ এর আবরণ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে, এবং পরে মোটেই থাকে না। তাই সেই পরীক্ষা এত ক্লেশদায়িনী নহে। সত্ত্ব-প্রধানদেহেও পরীক্ষা আছে বটে, কিন্তু সেই পরীক্ষায় ক্লেশ আরও অল্পতর। জীবের অনন্ত জীবনই পরীক্ষাময়, কিন্তু নিম্নস্তরের ক্লেশে যেরূপ জ্বালা, যন্ত্রণা, বৃশ্চিকদংশন সর্ব্বদার জন্য বর্ত্তমান থাকে, অত্যুচ্চস্তরে তাহার কিছুই থাকে না। সেই অবস্থার ক্লেশ অসহনীয় বা জ্বালাময় নহে। আমাদের মনে হয় যে সেই ক্লেশে আনন্দের আভাসও আছে। কোন সাধক পরমপিতার প্রেমমগ্নতা লাভ করিতে না চাহেন এবং সে পরমানন্দাবস্থা লাভের পূর্ব্বে প্রেমময়ের বিরহানলে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহেন? সকল সাধকই ঐরূপ বিরহক্লেশ আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ, তাহারা জানেন যে বিরহানলে দগ্ধ হইলেই প্রেমবিরোধী যত কলুষ, যত ফাঁকি হৃদয়ে স্তূপীকৃত হইয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা ভস্মীভূত হইবেই এবং স্বর্ণ যেমন দগ্ধ হইলে উহাতে স্বর্ণেতর সকল জঞ্জাল ভস্মীভূত হইয়া উজ্জ্বলতম পদার্থরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বর্জ্জিত এবং প্রেম-ভূষণে ভূষিত হইয়া অত্যুজ্জ্বলতা ধারণ করিবে। তাঁহারা আরও জানেন যে বিরহ দ্বারা ক্রমশঃ প্রেমের গভীরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত প্রেমা-ধারকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ততা দান করিবে। প্রসঙ্গক্রমে পরমর্ষি গুরুনাথের একটী সঙ্গীত হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "প্রণয় পয়োধি জলে, চাহ ডুব্‌তে কুতুহলে, ভাবনা তরঙ্গ তালে, অতি দূরগম—সদা বিরহ সমীরে, তনুতরী মগ্ন করে, ইহা যে সহিতে পারে, প্রেম সুখ ঘটে তার।" যদি বলেন যে অনন্ত প্রেমময় অনন্ত দয়ার আধার পরমপিতা কেন এত কঠোর বিধান করিলেন, তবে বলিতে হয় যে ফলও যেমন উৎকৃষ্ট, পরীক্ষাও সেইরূপ কঠোর করা হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের জীবনে ব্রহ্মত্ব লাভই সাধনা। এই ফলটী যে উৎকৃষ্টতম, সে বিষয়ে কাহারও কোনই সংশয় নাই। সুতরাং পরীক্ষাও যে কঠিন-তম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে রাখিত হইবে যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি। যদি পরীক্ষা না থাকিত, তবে

বাধারও প্রয়োজন থাকিত না। সুতরাং এই সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল না। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সংস্কার অতি ভীষণ জিনিষ। ইহা মরিয়াও মরে না। আমাদের জীবন যে নানা ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা ত আমরা দেখিতেই পাইতেছি। ইহার অধিকাংশই সংস্কারজনিত বাধার পরিণাম। দেহের বাধা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে দূরীভূত হইতে পারে, কিন্তু সংস্কারের বাধা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে সংস্কার বহুকালে সঞ্চিত হয় এবং ইহা মজ্জাগত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন contagious রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল রোগ বহুকাল ধরিয়া দেহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা দেহের ধাতুকেও বিষাক্ত করে এবং সেই সকল রোগ দুশ্চিকিৎস্য হয়। পিতৃপুরুষগণ হইতে যে সকল রোগ দেহে আসে, তাহাও ঐ একই কারণে দুশ্চিকিৎস্য। কলিকাতা নগরীর একজন সুশিক্ষিত এবং সুচিকিৎসক আমাকে বলিয়াছেন যে প্রকৃতিগত রোগের চিকিৎসা নাই, অর্থাৎ উহাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা অসম্ভব। Homeopathic শাস্ত্রে এই সকল মজ্জাগত রোগের জন্য High Potency, সময় সময় লক্ষ বা ততোঽধিক potency পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হয়। ইহার অর্থ এই যে দেহের সূক্ষ্মঅংশও রোগাক্রান্ত এবং উহার চিকিৎসা ঔষধের সূক্ষ্মতম ভাগ দ্বারাই সম্ভব মাত্র। সেইরূপ দেহের উপরি উপরি বাধা অতিক্রম করা কঠিন হইলেও অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য। কিন্তু বহু জন্মার্জ্জিত সংস্কারজনিত বাধা অতিক্রম করা অতীব কঠিন। এই জন্যই সাধকগণ সেই সকল সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। ইহা স্থূলভাব দ্বারা অতিক্রম করা যায় না। পরমপিতার উপাসনা ও গুণসাধনাই এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ। পাঠক মনে রাখিবেন যে এই পশুভাব আমরা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলি, সেই জাতীয় মানবের মধ্যেই কেবল বর্ত্তমান নহে। সকলেই অবগত আছেন যে এই পশু-

ভাব সকল জাতির সকল বংশের এমন কি উচ্চশিক্ষিত বলিয়া যাহারা পরিচিত. তাহাদিগের মধ্যেও ভীষণ ভাবে বর্ত্তমান। সকল সাধকই এই পশুভাব দূরে সংস্থাপন করিতে ব্যাকুল। আবার ইহা এতদূর মজ্জাগত যে মহোন্নত সাধকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও সময় সময় ইহারই জন্য পতনের ভীষণ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সুতরাং ইহা যে মনুষ্য জীবনের তুই চারি জন্মের উপার্জ্জিত সংস্কার নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্যজীবনে সংস্কার উপার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু উহাদিগকে নিরসন করিবার চেষ্টাও চলিতে থাকে। সুতরাং সংস্কার প্রত্যেক জন্মেই কিছু কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইতরজীবজীবনে সংস্কার উপার্জ্জনের মাত্রা অত্যধিক, কিন্তু ক্ষয়ের মাত্রা অত্যল্প। তাই সেই সকল কুসংস্কার সুদৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হয় সুতরাং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এবং সেই জন্যই সাধকদিগের এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু জন্ম সাধনা করিতে হয়। প্রত্যেক সাধকই যে এই জন্য ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে এবং তুঃখাশ্রুপ্লাবিত বক্ষে বহুবার পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত সংশয়ের কারণ নাই। মোটা-মুটি ভাবে বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে জীবের আদিজন্মেই তাহার হৃদয় Clean slate থাকে, যেমন সমুদ্রসংলগ্ন চরভূমিতে কেবল শুভ্র বালুকারাশি ধু ধু করিতে থাকে, কিন্তু অন্যবিধ জঞ্জাল থাকে না। ক্রমশঃ উহাতে নানাবিধ বন্যবৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত ক্ষেত্রকে জঙ্গলাকীর্ণ করে, যেমন বঙ্গোপসাগরের নিকটস্থ সুন্দরবনের অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। এই অবস্থাকেই ইতরজীবজীবনের অবস্থা মনে করিতে হইবে। ক্রমশঃ সেই ক্ষেত্র আবাদ হইতে থাকে এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা নানা প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায়ও ঐ স্থান চিরকাল থাকে না, কিন্তু সুদীর্ঘকাল থাকে বটে, এই অবস্থা-কেই মানবজীবনের অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রই পরি-ণামে সমৃদ্ধশালিনী নগরীতে পরিণত হয়, যেমন কলিকাতা নগরীও প্রাচীনকালে উক্ত প্রকারের জঙ্গলাকীর্ণ বঙ্গোপসাগরের চরভূমি ছিল। এই অবস্থাকে দেবজীবনের সহিত উপমিত হইতে পারে। কারণ,

এই অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ে স্থিত ব্যক্তিদের ন্যায় অতি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে জীবনের সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারেন. যেমন নগরবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে সকল প্রকার Amenities of life ভোগ করিতে সমর্থ হন। এস্থলেও দেখা যায় যে প্রকৃতির নিয়মে ক্ষেত্র প্রথমে পরিষ্কার থাকে এবং পরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়। তৎপর মানবের চেষ্টায় উহাই পরিণামে জঙ্গলশূন্য হইয়া উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং মানবকে নানা ধনে ধনী করে। সর্ব্বশেষে উহা নগরে পরিণত হয়। অর্থাৎ উহা তখন ক্ষেত্রের সার্থকতা লাভ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই একই বিধান কার্য্য করিতেছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে ইতরজীবজীবন পরমপিতার মঙ্গল বিধানেই সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই জীবনে অসংখ্য কুসংস্কার অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হয় এবং দ্বিতীয় জীবনে উহাদিগকে নির্ম্মল করিতে হয়। শেষ জীবন যদিও পরীক্ষাশূন্য নহে; তথাপিও আমাদের আনন্দ, সুখ ও শান্তির স্থান। সুতরাং দেখা গেল যে প্রথমে জঙ্গল উৎপাদন, দ্বিতীয়ে সেই জঙ্গল আবাদ এবং নানাবিধ শস্য ও ধনসম্পত্তি আহরণ এবং তৃতীয়ে নগরপত্তন ও তাহাতে নানা সুখে বসবাস। অতএব এত সময় যাহা বলিতে চেষ্টা করিলাম. তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে জীবজীবন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ইতরজীবজীবন, দ্বিতীয় মানবজীবন এবং শেষে দেবজীবন। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্যজীবনেরও প্রথম অবস্থা অধিকাংশে ইতরজীবের ন্যায়। কিন্তু মানব সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ তমোভাব দূর করিতে থাকেন। ইহাতেও বহু জন্ম অতিবাহিত হয়। সেই সময়েও তাহার সাধনার প্রকার ও প্রাবল্য অনুসারে সু ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পায়। মানব যদি স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা সৎপথে যাইবার সাধনা না করিয়া বিপরীত সাধনা করেন, তবে তাহার ইতরজীবজীবনের উপার্জ্জিত কুসংস্কার আরও বৃদ্ধি পায়। তবে মানবের দেহের গঠনই এইরূপ যে অনন্ত মঙ্গলময়

পরমপিতার মঙ্গলবিধানে মানব ক্রমশঃ কুসংস্কার দূর করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করেন। অতএব মানবে যে আমরা কুভাব দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ও অতিশয় প্রবল এবং তাহাই তাহাকে কুদিকে পরিচালনা করে। অভ্যাসের ফলে মানবের নির্দ্দিষ্ট সময় ক্ষুধা পায় এবং অভ্যাসের জন্যই দৈহিক নানা কার্য্য অভ্যস্তভাবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিতে হয়, নতুবা ক্লেশ পাইতে হয় এবং সময় সময় শারীরিক ক্ষতিও সংঘটিত হয়। একজন সাধক বলিয়াছিলেন যে ক্ষুধার ন্যায় নিয়মিত সময়ে তাহার উপাসনা পায়। প্রত্যেক উপাসনাশীল ব্যক্তি এই উক্তি সমর্থন করিবেন। মানব জীবনে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় যে দেহ এবং অন্তঃকরণ মানবকে অনেক সময় বাধ্য করিয়া অন্যায় কার্য্য করায়। সে জানে যে, যে কার্য্য করিতে সে যাইতেছে, তাহা অন্যায়, তথাপিও যেন যন্ত্রচালিতের ন্যায় উহা করিতে সে বাধ্য হয়। এমন কি, যে সকল কার্য্যের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপস্থিত হইবে বলিয়া সে বিশেষভাবে জানে, সেইরূপ কার্য্যও দেহ এবং অন্তঃকরণের অভ্যাসবশতঃ তাহা দ্বারা কৃত হয়। মদ্যপায়ী জানেন যে মদ্যপানের ফল অতি বিষময়, আবার কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিও জানেন যে তিনি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ ভাবেই অধঃপাতে যাইতেছেন, কিন্তু তথাপিও সে উক্তরূপ কার্য্য সমূহ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ বুঝিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ইহা তাহাদের দেহ এবং অন্তঃকরণের অভ্যাসের ফলে উৎপন্ন ভীষণা শক্তি, যাহার নিকট সেই দেহধারীও অবনত। অভ্যাসের শক্তি এতই বলবতী হয় যে দেহধারীর অবস্থা জড়বৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার যেন আর কোনই ইচ্ছাশক্তি (will-power) থাকে না। আবার ইহাও দেখা যায় যে মানব যে কার্য্য করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, সেই কার্য্যও অভ্যাসদোষে তাহার করিতে হয় এবং সময় সময় সংস্কার তাহাকে জোর করিয়া অন্যায় কার্য্য করায়। এই অবস্থা সাধকজীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধকের প্রথম জীবনে তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত বহু পাপকার্য্য

হইতে বিরতির জন্য প্রচেষ্টা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তিনি কি সামান্য চেষ্টায়ই সেই সকল কু-অভ্যাস হইতে পরিত্রাণ পান? কখনই নহে। তাঁহাকে বহুকাল প্রবল রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। কখনও জয় ও কখনও পরাজয় হয়। প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃই তিনি পরাজিত হন এবং সেই দুঃখে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে পরমকরুণাময় পরমপিতার শ্রীচরণতলে উপস্থিত হইয়া ব্যাকুল প্রাণে মর্ম্মবেদনা নিবেদন করেন এবং পরিত্রাণের জন্য কাতরভাবে বারংবার প্রার্থনা করেন। আবার উপাসকের প্রথমাবস্থায় দেখা যায় যে উপাসনার সময় তাঁহার মন কিছুতেই একাগ্র হইতে চাহে না। সর্ব্বদাই নানা অভ্যস্ত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতে মন ব্যস্ত। তিনি (উপাসক) বহুবার মনকে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করেন এবং সময় সময় তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। কিন্তু চঞ্চল মন আবার ছুটিয়া যায় এবং নানা অসার চিন্তায় এতই নিমগ্ন হয় যে তিনি যে উপাসনার্থ তখন উপস্থিত, তাহাও তিনি ভুলিয়া যান। উপাসক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেও এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। উপাসক অবশ্যই বিশেষভাবে ইচ্ছা করেন যে তিনি একাগ্রচিত্তে পরম-পিতার উপাসনা করিয়া ধন্য হন ও কৃতার্থ হন। কিন্তু তবুও কেন তাঁহার এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়? ইহার ইহাই একমাত্র উত্তর যে তাঁহার চিরাভ্যস্ত বিষয়ই চিন্তা করে এবং তাঁহার শরীরের এমনি দুরবস্থা হয় যে উহা মনকে চঞ্চল করিতে এবং চঞ্চল করিয়া রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে সাধক ও উপাসক-গণই নানা রিপু দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে সকলেই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কিন্তু সাধারণের সেইরূপ অনুভূতি ও অনুতাপ নাই। বরং মহাপাপে সর্ব্বদাই লিপ্ত (অর্থাৎ যাহারা hardened sinner), তাহারা যে কেবল নিজেদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু তাহারা পাপকার্য্যে একরূপ পৈচাশিক আনন্দ (Fiendish delight) অনুভব করে। সাধক ও উপাসকগণ তাঁহাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারেন এবং সেই জন্য বিশেষ

ভাবে বেদনাও অনুভব করেন। ইহার কারণ আত্মদৃষ্টি ও পরমপিতার উপাসনা। কারণ, সত্যস্বরূপ, নিত্য নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন পরমদেবতার গুণরাশি চিন্তা করিলেই নিজে যে কতদূর কলঙ্কিত ও ক্ষুদ্র, তাহা অবশ্যম্ভাবিরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। কবিবর রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতাংশে আমরা সেই একই তত্ত্ব জানিতে পারি। "তোমায় দিতে পূজার ডালি, বেরিয়ে পড়ে সকল কালি, পরাণ আমার পারি নে তাই পায়ে থুতে॥ এতদিন তো ছিল না মোর কোন ব্যথা, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা। আজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে - দিয়ো না গো, দিয়ো না আর ধুলায় শুতে॥" কু অভ্যাসের কি ভীষণা শক্তি? উহা যে আমাদিগকে জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এখন প্রশ্ন হইবে যে আত্মার দেহবাসকালে তাঁহার দেহের এবং অন্তঃকরণের এরূপ ভীষণ অভ্যাস হইবে কেন, যাহাতে কর্ত্তাই দেহে জড়বৎ অবস্থিতি করিবেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জড় বিজ্ঞান বলেন যে জড়ের Inertia আছে অর্থাৎ কোন একটী পদার্থকে চালাইয়া দিলে সে চলিতে থাকিবে, যদি উপযুক্ত বাধা উপস্থিত হইয়া উহার গতিরোধ না করে। দেহ ও অন্তঃকরণ (পাঞ্চভৌতিক অংশ) জড়। সুতরাং উহারা বারংবার যে কার্য্যে অভ্যস্ত হইবে, সেই সকল কারণ উপস্থিত হইলেই আবার উহারা সেই ভাবেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। দেখা যায় যে জড় চালিত হইলে চালক চালনা বন্ধ করিলেও উহা কিছুকাল চলিতে থাকে। Train Collision ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। Driver (চালক) গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করেন, Brake ভাল করিয়া কষেন, কিন্তু তথাপিও গাড়ী পূর্ব্বভাবের বিপরীত ভাবে যাইতে কিছু সময় নেয় এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই অন্য গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ হয়। একখানা Train ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিতেছে। কোন ব্যক্তি যদি সেই অবস্থায় গাড়ী হইতে নামেন, তবে তিনি যে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইবেন ও ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সুনিশ্চিত। তিনি অবশ্যই ইচ্ছা করেন নাই যে তিনি ঐরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থা

সংঘটিত হয় কেন? ইহার কারণই এই যে সেই ব্যক্তির দেহ (যাহা জড় মাত্র) গাড়ীর বেগে বেগবান। সুতরাং তাহার আত্মা ইচ্ছা করুন্ আর নাই করুন্, তাহার শরীরের অর্থাৎ জড়ের ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য হয়। আবারও প্রশ্ন হইবে যে মৃত দেহও ত সংস্কার ও অভ্যাস-পূর্ণ। তবে কেন তাহা কারণ উপস্থিত হইলে সংস্কার অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইলে শরীর সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হয়—উহা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ জড়ে পরিণত হয়। উহার বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদিও বিকল হইয়া যায়। ইহাই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান, আর আত্মার শক্তি অবলম্বনেই যখন অন্তঃকরণের (অন্তরে স্থিত যন্ত্রের) সমুদায় শক্তি, তখন আত্মা দেহে না থাকিলে যে সেই যন্ত্র একান্ত অপটু হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অন্তঃকরণের গঠন চিন্তা করিলেই এই বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। আত্মা দেহে না থাকিলে মস্তিষ্ক দেহে থাকে বটে, কিন্তু অন্তঃকরণের আত্মিক অংশ অর্থাৎ আত্মার গুণ ও শক্তিরাশি কোন কার্য্যই করে না। সুতরাং মস্তিষ্কের (অন্তঃকরণের যন্ত্রের) কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। সুতরাং দেহেরও কোনই ক্রিয়া হয় না। দেহের ক্রিয়ার মূলে যে মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব সেই দেহ দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত কার্য্য সমূহ পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। এস্থলেও জড়ীয় Inertia অতি সামান্য ভাবে দেখা যায়। চিকিৎসকগণ বলেন যে মৃত্যু তিন প্রকার। যথা—মস্তিষ্কের মৃত্যু, ফুসফুসের মৃত্যু এবং হৃদ্‌যন্ত্রের (Heart এর) মৃত্যু। মস্তিষ্কের মৃত্যু হইলেও জীবনী শক্তি (প্রাণ ক্রিয়া) দেখা যায়। Heart এর মৃত্যু হইলেও Lungs এর ক্রিয়া সকল সময় তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয় না। শেষকালে মৃতদেহে কুম্ভক এবং অবশেষে শেষ প্রশ্বাস দেখা যায়। সময় সময় কুম্ভক একাধিক বার হয়। তাহাও এই জড়ীয় Inertia এর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। দেখা গিয়াছে যে কূর্ম্মের মস্তক ছেদন এবং উহার দেহকে দুই ভাগে বিভাগ করিলেও উহার হৃদ্‌যন্ত্র চলিতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইবে যে দেহ ত মৃত্যুর সহিতই শেষ হইয়া যায়, সুতরাং

সেই দেহ ও অন্তঃকরণ (অন্তরেস্থিত যন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক) উহাদের সর্ব্ব সংস্কার সহ বিনষ্ট হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রত্যেক জীবেই অসংখ্য দেহ বর্ত্তমান এবং উহারা সকলেই জড়দেহ। সকল দেহেই অন্তঃকরণ বর্ত্তমান। কারণদেহেও অন্তঃকরণ ও জ্ঞানে-ন্দ্রিয় পঞ্চক বিদ্যমান আছে। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আলোচনা বর্ত্তমান। সুতরাং একপ্রকার দেহ সংস্কারাবদ্ধ হইলে অন্যান্য সূক্ষ্মতর দেহ এবং অন্তঃকরণও অল্লাধিক প্রভাবিত (affected) হয়। কারণ, ত্রিবিধ শরীরই পাঞ্চভৌতিক। উহারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে পৃথক্ মাত্র। সংস্কার পদার্থ সূক্ষ্ম। সুতরাং উহা সূক্ষ্ম অন্ত.করণের উপর সহজেই কার্য্য করে। আবার দেহে স্থিত সূক্ষ্মতর দেহের সূক্ষ্মতর অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। আর অন্তঃকরণ জড় হইলেও উহার সকল শক্তির উৎস আত্মা। এই জন্যই মানব দেহত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিলেও তাহার সংস্কার সমূহ বর্ত্তমান থাকে। কারণ, সূক্ষ্মদেহে কেবল আত্মাই থাকেন না, অন্তঃকরণও থাকে। মোটামুটী বুঝিতে গেলে ইহা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে মৃত্যুকালে আত্মা লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্মদেহ) সহ দেহ হইতে বহির্গত হন। সেই দেহই এবং তন্মধ্যস্থ অন্তঃকরণ উভয় আমাদের দৈহিক কার্য্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেও সেই সমুদায় সংস্কার সহ পৃথিবীতে পুনরায় উপস্থিত হন। যে সকল মানবাত্মা সাধনভজন দ্বারা পরলোকে আত্মোন্নতি লাভ করিয়া পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক কুসংস্কার লয় প্রাপ্ত হয়। আস্তিক মাত্রই 'বিশ্বাস করেন যে মানব দেহত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীর ধারণ করেন এবং পুনর্জন্ম হইলে সেইরূপ সূক্ষ্মদেহ অথবা উন্নততর সূক্ষ্মদেহ লইয়াই মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং মৃত্যু হইতে পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত কালের মধ্যে কেহ যদি আত্মিক উন্নতি লাভ করেন, তবে তিনি উন্নতির পরিমাণানুযায়ী কুসংস্কার হইতে মুক্ত থাকিবেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে তিনি যদি তাহার হইতে অনুন্নত মাতাপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহার কুসংস্কার

সমূহ নূতন দেহের দোষে আরও দৃঢ়মূল হয় এবং সুসংস্কার সমূহ নিষ্প্রভ হয়। আবার যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ উন্নততর মাতাপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তবে ইহার বিপরীত ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহার সুসংস্কার সমূহ দৃঢ়মূল হয় এবং কুসংস্কাররাশি নিষ্প্রভ হয়। আমাদের প্রোক্ত কু-অভ্যাস এবং কুসংস্কারজনিত দেহ ও অন্তঃকরণের কার্য্য সমূহের বিরুদ্ধে অবশ্যই আত্মা নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল কু-অভ্যাসের ফলে আপাতসুখের লালসায় অন্ধ হইয়া আমরা আত্মার নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করি। আবার বারংবার নিষেধ অগ্রাহ্য করিবার ফলে দেহ এবং অন্তঃকরণের সংস্কার এমন প্রবল হয় যে আমরা সেই অন্যায় কার্য্য সমূহকেই সমর্থন করি। এইরূপ কেন হয়, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি কেহ প্রাতরুত্থান অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি প্রথমতঃ একটী Alarming Time Piece নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী চাবি দিয়া রাখেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘড়িতে শব্দ হইল, কিন্তু তিনি তাহার পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ তখন শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাই তিনি alarm-এর কাটা বন্ধ কবিয়া পুনরায় নিদ্রিত হন. এইরূপ ভাবে কিছুদিন alarm এর শব্দে জাগরণ ও পুনরায় নিদ্রা চলিতে লাগিল। প্রাতরুত্থানের ভাব দূরীভূত হইল। অবশেষে তাহার নিদ্রা এতদূর গভীর হয় যে তিনি আর alarm এর শব্দ শুনিতে পান না, জাগ্রত হওয়া ত দূরের কথা। অভ্যাসের এইরূপ ফলই হয়। আমরা অভ্যাসবশতঃ—সংস্কারবশতঃ অনেক অন্যায় কার্য্য করি, তাহার জন্য প্রথম প্রথম কার্য্যের পূর্ব্বে হৃদয়ে বাধা অনুভব করি এবং কার্য্যান্তে অনুতাপ ভোগ করি বটে, কিন্তু শেষে অভ্যাসের প্রাবল্যবশতঃ উহাদিগকে আর অন্যায় বলিয়াই মনে হয় না। বরং সেই সমুদায় কার্য্যে আমরা উৎসাহিত হই। আমাদের মধ্যে সুমতি ও কুমতি বলিয়া দুইটী ভাগ লক্ষ্য করিতে পারি এবং অনেকেই তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই সুমতিকেই বিবেক (conscience) বা আত্মার বাণী বলা হয়। সুতরাং কুমতিকে অভ্যাসদোষে বিকৃত অন্তঃকরণের দুষ্ট পরামর্শ বলা

যাইতে পারে। আত্মা যে কখনও কুকার্য্য করিতে পারেন না. বা কুমতি প্রে ণ করিতে পারেন না, ইহা সহজবোধ্য এবং ইহা পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আত্মার একটী স্বরূপ চৈতন্য যাহা তাঁহার কখনও লোপ পায় না। বরং তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদাই অন্ত করণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা যখন কোনও কার্য্য না করি, তখনও চিন্তা করি। স্বপ্নেও জ্ঞানের কার্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। সুষুপ্তিতেও জ্ঞান থাকে কারণ, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইলে "তিনি যে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন" এই প্রতীতি তিনি লাভ করেন। সুষুপ্তিকালে জ্ঞান না থাকিলে উল্লিখিতা প্রতীতির উৎপত্তি হইতে পারিত না। এই জ্ঞানই হৃদয়ের তারতম্য অনুসারে অল্লাধিক বিকৃত হয়। সুতরাং হৃদয় এই জ্ঞানকে উহার অভ্যস্ত বিকৃতভাবে বিপরীত দিকে লইয়া যায়। যাহার হৃদয় কু-অভ্যাস দোষে যত দুষ্ট, তাহার হৃদয় ততদূর বিপরীতগামী হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। জীবাত্মার প্রেম প্রভৃতি গুণ ও ইচ্ছাশক্তি আছে। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে আমরা নানাভাবের নানা শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা দেহে থাকিতে অন্তঃকরণ কোনও না কোন আকারে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে। আবার অন্তঃকরণের জড়ীয় অংশের উপর আত্মারই ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ সংসাধিত হওয়ায় এবং অনন্ত গুণময় ও ইচ্ছাময় আত্মার সংসর্গে চিরকাল বাসের ফলে উহাও (অন্তঃকরণের জড়ীয় অংশ) আত্মার নিত্য প্রবহমান শক্তি অবলম্বনে কখন কখন পূর্ব্বাভ্যস্ত কার্য্য মাত্র করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে যে অন্তঃকরণের পাঞ্চভৌতিক অংশ পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত কোন কার্য্যই স্বয়ং সম্পাদনে সমর্থ নহে। এখন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে অন্তঃকরণ কেন আত্মার জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণের এবং ইচ্ছাশক্তির এরূপ বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে। ইহার উত্তর বুঝিতে আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ", 'জড়ের বাধকত্বের কারণ", এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ সমূহে এই সম্পর্কে

লিখিত বিষয় স্মরণ করি। জড় আত্মার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহার সৃষ্টিরও বিশেষ সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে বলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে চিরবিকৃত জড় ব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই উহা সবিশেষ শক্তিতে শক্তিমান। পরমপিতার ইচ্ছায় উহা বাধক রূপেই সৃষ্ট। সুতরাং উহা যে বাধা উৎপাদন করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরমপিতা যখন নিজ অব্যক্তস্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছাসহযোগে সৃষ্টদেহ সংযোগে নিজেই বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন, অর্থাৎ দেহই সেই অংশভাবে ভাসমান জীবাত্মাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই দেহে স্থিত অন্তঃকরণ যে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণ ও শক্তিকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বরং ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষারূপ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অনুধ্যান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অন্তঃকরণের উক্তাশক্তি সেই মহান্ উদ্দেশ্যের অনুকূলেই বটে। একটী কথা মনে রাখিলেই এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা লাভ করা যায়। তাহা এই যে জড় চিরবিকৃত। সুতরাং উহার সংসর্গে যাহাই আসিবে, তাহাই উহা দ্বারা অল্লাধিক প্রভাবিত হইবেই। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে অন্তঃকরণ আমাদের চিন্তা ও কার্য্য করিতে পারে, যতক্ষণ আত্মা দেহে বর্ত্তমান থাকিবেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে আত্মা কোন এক সুদূর অতীতে তাঁহার কার্য্যদ্বারা অন্তঃকরণকে চালাইয়া দিয়াছেন এবং উহার সেই অভ্যাসবশতঃ সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে। আত্মার ইচ্ছায় প্রত্যেক জীবনে অসংখ্য অসংখ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ইহা সত্য। তবে সেই কার্য্যসমূহ দেহ এবং অন্তঃকরণের বিকৃতির মাত্রানুযায়ী বিকৃতও হইতেছে। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে কোন কার্য্য আত্মার ইচ্ছাজনিত এবং কোন কার্য্য অন্তঃকরণের, তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। জ্ঞানিগণই এই ভেদ সহজে বুঝিতে পারেন। আত্মা অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া কার্য্য করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মার ইচ্ছা কখনই দুষ্টা হইতে পারে না। কারণ, দোষপাশ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সেই ইচ্ছা প্রকাশিত হয় যে অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া, উহার গঠন অনু-যায়ী তাহা অল্পাধিক বিকৃত হয়। ইহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আবার অন্তঃকরণ দ্বারা কৃতকার্য্য তখনই ভাল হয়, যখনই উহা সু-অভ্যাসের, সুসংস্কারের ফল হয়। উহা মন্দ হয় তখন, যখন উহা কু-অভ্যাস, কুসংস্কারের ফল হয়। কু-অভ্যাসের যেমন অসীম শক্তি, সু-অভ্যাসেরও সেইরূপ অসীম শক্তি। অভ্যাসের এইরূপ বলবতী শক্তি জানিয়াই মানবকে Bundle of habitsও বলা হইয়া থাকে। এই অভ্যাসই যখন সুভাবে চালিত হইতে থাকে, তখন উহাকেই সাধনা বলা হয়। এই জন্য পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন :—"অভ্যাসঃ সাধনা বাচ্যঃ।" সংস্কারের অত্যধিক প্রভাব বুঝিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের মধ্যে অধিকাংশ স্বপ্নই যে অমূলক ও অন্তঃকরণের দোষে সংঘটিত হয়, তাহা আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব। আমরা যে সকল বিষয় সম্বন্ধে কার্য্য বা আলোচনা দ্বারা আবাল্য সংস্কার গঠন করি সেইরূপ ভাবেই আমরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। সেই অমূলক স্বপ্নরাশির মধ্যে আবার অধিকাংশ স্বপ্নই নিতান্ত অসার বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা সাধনভজন দ্বারা সেই সকল অসার সংস্কার সমূলে উৎপাটন করিয়া সেই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধীয় ভাবনারাশি বদ্ধমূল করিয়াছেন এবং যাহারা অসার বিষয় সম্পর্কে আর কোনই স্বপ্ন দেখেন না, কিন্তু অত্যুচ্চাঙ্গের চিন্তাই তাহাদের স্বপ্নের বিষয়ীভূত হয়। একটী কিংবদন্তী আছে যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলিয়াছিলেন যে তিনি সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজদের আচরণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন সকল বাঙ্গলা ভাষায়ই সম্পন্ন হয়। ইহা আবাল্য অভ্যাসজনিত সং-স্কারের ফল বই আর কিছুই নহে। তিনি শত চেষ্টায়ও সেই বদ্ধমূল সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই বা উহা লয় করিতে পারেন নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মার কৃতকার্য্যই যখন বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অবশ্যই উহার কুফল তিনি ভোগ করিবেন।

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছা কখনই দুষ্টা নহে। সুতরাং যে হৃদয়ের দোষে আত্মার সদিচ্ছা বিকৃত হইয়া অসাধু ভাবে প্রকাশিত হয়, সেই দুষ্ট হৃদয়ই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে। এস্থলে মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" (বঙ্গানুবাদ—৯৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) এই মন্ত্র হইতে হইতে আমরা পাই যে জীবাত্মা মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন। অতএব হৃদয়ের দোষদুষ্ট কর্ম্মের তিক্ত ফল তিনি ভোগ করেন না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সর্ব্বসাধারণে যে সকল কার্য্য করে, তাহার মধ্যে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা অবিমিশ্র ভাবে দুষ্ট, আবার এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা নিরবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ। সুতরাং কর্ম্মফলের যে অংশ সুন্দর ও মধুর, তাহাই জীবাত্মা ভোগ করেন, আর উহার তিক্ত অংশ দুষ্ট হৃদয় ভোগ করে। অর্থাৎ কর্ম্মের যে অংশটুকু আত্মা দ্বারা কৃত, উহার ফল আত্মা ভোগ করেন এবং হৃদয়দোষে দুষ্ট অংশটুকুর ফল হৃদয় ভোগ করে। আত্মা কখনও অন্যায়, মিথ্যা বা অপবিত্র কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং সেইরূপ ভাবের কর্ম্মের ফলও তিনি ভোগ করেন না। কু-অভ্যাসের ফল এতদূর প্রসারিত ও ভীষণ বলিয়াই সাধনা ও ব্রহ্মোপসনার বিধান। কারণ, উক্ত কার্য্যদ্বয় দ্বারা সুসংস্কার সমূহ ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইবে এবং উহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অপর দিকে কুসংস্কারগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে হইতে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন আত্মার ইচ্ছানুযায়ীই দেহ সম্পূর্ণরূপে চালিত হইবে। তখন আর দেহ এবং অন্তঃকরণ সুপথে চলিতে দ্বিধা বোধ করিবে না, অথবা সহজে এবং পরিশেষে অতি সহজে আত্মার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইবে। পূর্ব্বে যেমন সুপথে চলাই কঠিন বোধ হইত, সেই অবস্থায় কুপথে চলাই কঠিন হইবে এবং অবশেষে উহা একেবারেই অসম্ভব হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত কার্য্যদ্বয় দ্বারা হৃদয়কে যতই দোষ রাশি বিবর্জ্জিত করা হইবে, যতই উহা জালজঞ্জাল হইতে মুক্ত হইবে,

যতই উহা নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র এবং পবিত্র হইবে, এক কথায় যতই উহা সংশোধিত হইবে, ততই আত্মার উন্নতি বা বিকাশ সাধিত হইবে। সর্ব্বশেষে দেহ, মন, প্রাণ (আত্মা) একই সুরে বাজিতে থাকিবে, একই তালে মানে নৃত্য করিবে এবং জীবনকে অমৃতে পরিপূর্ণ করিবে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে হিন্দুশাস্ত্র সমূহ জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারের অত্যধিক প্রভাব স্বীকার করেন। উহারা ইহাও বলেন যে আমাদিগের যে কেবল কুসংস্কাররাশি হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তাহা নহে, কিন্তু সুসংস্কারও দূর করিতে হইবে। অর্থাৎ হৃদয়কে সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত করিতে হইবে, প্রকৃত পক্ষেও উহাই অত্যুচ্চ সাধনার একটী বিশেষ প্রণালী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আমরা সুসংস্কার বর্জ্জন করিব কেন? উহারা আমাদিগকে সৎপথে চলিবার সাহায্যই করে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সুসংস্কার সমূহ সত্য সত্যই আমাদিগকে অত্যধিক ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু উহারা সংস্কার বই গুণ নহে। সুতরাং উহাদেরও লয় সাধনের প্রয়োজন আছে। আত্মিক উন্নতি লাভ করিতে করিতে সাধকের নিকট ব্রহ্মের গুণরাশিই একমাত্র লভনীয় ও লোভনীয় বলিয়া মনে হয় এবং উহাদিগকে লাভ করিবার জন্যই সাধক ব্যাকুল হন। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যের বস্তু ছিল, তাহা তখন ব্রহ্মের গুণরাশির বৃহত্তর সাধনায় সামান্য লাভ বলিয়া মনে হয় এবং সময় সময় উহা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করে। এ বিষয়ে ইতঃপর আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী সুস্ফুট ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বদেশ হিতৈষণা আমাদের প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সাধনীয় বস্তু। যে দেশের মাটি জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত, যে দেশের শস্য, ফুল, ফল প্রভৃতি দ্বারা আমাদের দেহ পরিপুষ্ট, যে দেশের ব্যক্তিবর্গ, মাতা, পিতা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিরূপে আমাদের দেহ মনকে সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, সেই দেশের হিতকামনা আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সাধক যখন আত্মিক উন্ন-

তিতে অত্যধিক অগ্রসর হন, তখন তাঁহার পক্ষে এই জন্মভূমি এবং পৃথিবীর অন্যান্যদেশ একপর্য্যায় ভুক্ত হয়। তখন আর তাঁহার হৃদয়ে জন্মভূমির জন্য কোনই পক্ষপাতিত্ব থাকে না। অর্থাৎ তখন তাঁহার পক্ষে জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য এবং অন্যান্য দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের পরিমাণ ও মূল্য একই হয়, কখনই ন্যূনাধিক হয় না। তখন তাঁহার বিশাল হৃদয়ে প্রত্যেক দেশের হিতের জন্যই সমভাবে চিন্তা বর্ত্তমান থাকে এবং তিনি সেইরূপ সমভাবেই সকল দেশের জন্যই হিতজনক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে শত্রুদেশ, বা মিত্রদেশ বলিয়া কিছু ভাব থাকা দূরের কথা, কোন দেশের প্রতিই, এমন কি জন্মভূমির প্রতিও তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহার নিকট তখন স্বদেশ বিদেশ একই। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে স্বদেশহিতৈষণা যেমন দেশবিশেষের উন্নতির কারণ হইয়াছে, তেমনিও ইহারও অপব্যবহারে অথবা ইহাকে অত্যধিক মূল্য দান করায় জগতে যে কতদূর অনর্থপাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইতিহাস পাঠক এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই যে পৃথিবীতে ভীষণ যুদ্ধের পর ভীষণতর যুদ্ধ হইয়াছে এবং ক্রমশঃই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া ভীষণতম অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, ইহার মূলেও সেই উৎকট স্বদেশহিতৈষিতা (ultra patriotism), তাই জগতে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এখন জাতীয়তার পরিবর্ত্তন করিয়া আন্তর্জাতিকতা (Inter-nationalism) প্রচার করিতেছেন। পরমোন্নত সাধকের পক্ষে পৃথিবীমণ্ডলের দেশসমূহের প্রতি যে কেবল পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না, তাহা নহে, কিন্তু তিনি ক্রমশঃ সকল মণ্ডলকেই সমভাবে দেখিবেন। অর্থাৎ একমাত্র বিশ্বই তাঁহার জন্মভূমি এবং বিশ্বের সকল মণ্ডলই তাঁহার নিকট সমভাবে মূল্যবান, সকলের প্রতিই তাঁহার সম মমতা। সকল সংসারী ব্যক্তির পক্ষেই সন্তানপালন, তাহাদিগকে শিক্ষাদান, তাহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে যত্ন ও চেষ্টা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু পরমোন্নত সাধক যখন অত্যুন্নত অবস্থা লাভ করেন এবং সকলের

প্রতি সমতাজ্ঞান সাধন করেন, তখন তিনি সকলের প্রতি হৃদয়ে সমভাব পোষণ করিবেন, তিনি তখন সকলের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করিবেন, তিনি আর তখন নিজ পুত্র এবং দীনহীন ভিক্ষুক পুত্রের মধ্যে কোনই ভেদ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহার সেই সাধনা পূর্ণ হইল না। এই সাধনা অতীব কঠিন এবং পার্থিব দেহে থাকিতে থাকিতে সংসারী হইয়া এই সাধনা আরও কঠিন। কারণ, সংসারে থাকিলেই পূর্ব্বসংস্কার এবং ব্যবহার তাঁহার সাধনায় পরিপক্কতা লাভে পদে পদেই বাধা জন্মায়। উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের রহস্য বুঝিতে ব্রহ্মের সৃষ্টিলীলার মর্ম্ম ধারণা করিতে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা এই যে পরমপ্রেমময় পরমপিতা প্রত্যেক জীবকে ক্রমশঃ উন্নত করিতে করিতে তাঁহারই অনন্ত গুণরাশি দান করিয়া নিজের মত প্রস্তুত করিবেন এবং অবশেষে মহাপ্রলয়কালে তাঁহারই অপার কৃপায় সকলকে ক্রমশঃ পূর্ণামুক্তি দান করিবেন, অর্থাৎ তাঁহারই প্রায় তুল্যভাবে উন্নত এবং আত্মতুল্য প্রিয়তম সন্তানদিগকে পুনরায় তাঁহারই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। এবিষয়ে "সোহহং জ্ঞান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তদ্বয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের কোন বিশেষ দেশ বা মণ্ডলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। তাঁহার নিকট সকল মণ্ডল, সকল দেশ তুল্য। তাঁহার নিকট কোন Favoured Land (বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত দেশ) বা Favoured Nation (বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত জাতি) নাই বা থাকিতে পারে না। আবার তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তিই বিশেষ অনুগ্রহের ভাজন বা বিশেষ প্রেমের পাত্র নহেন। তাঁহার নিকট ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব হইতে উন্নততম পরমর্ষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে চির বর্ত্তমান, সকলেই তাঁহার অনন্ত প্রসারিত, অনন্ত উদার, নিত্য প্রেমক্রোড়ে সমভাবে নিত্য অবস্থিত। সাধকেরও এই পরম বাঞ্ছনীয়া পরমোন্নতা অবস্থা লাভ করিতে হইবে। এখন আবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে যদি আমাদের সু এবং কু উভয় প্রকার সংস্কারসমূহ বিবর্জ্জিত হয়, তবে আমাদের থাকিল কি? ইহার উত্তরে

বক্তব্য এই যে ব্রহ্মেরও ত কোনই সংস্কার নাই, কিন্তু অনন্ত সরল গুণ-রাশিই তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। সেইরূপ পরমোন্নত সাধকের উভয়-বিধ সংস্কার সমূহ বিদূরিত হইলেও তাঁহার যে স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত সরল গুণরাশি তাঁহারই মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। তখন সাধকের হৃদয় আত্মাময় অবস্থা লাভ করে অর্থাৎ তিনি ক্রমশঃ ব্রহ্মের ন্যায় হইতে থাকিবেন। এস্থলে আমাদের "গুণ বিধান" অংশে লিখিত বিষয় স্মরণ করিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা এবং জীবের অনন্ত সাধনা সেইরূপ বিকাশের জন্যই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সাধারণ (average) সাধকের পক্ষে কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই কঠিন। পরমোন্নত সাধকদিগের পক্ষে সুসংস্কার-রাশি হইতে মুক্ত হওয়া আরও কঠিন। ইহার দুইটী কারণ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ—যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সুসংস্কার দীর্ঘতরকাল স্থায়ী। কারণ, কুসংস্কার বর্জ্জন না করিয়া কেহই সুসংস্কার দূর করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হন না। অর্থাৎ এই সাধনা অত্যুন্নতা অবস্থায় আরম্ভ হয়। অন্য কারণ এই যে সুসংস্কার-দূর করিতে প্রথমতঃ সাধকের মোহের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। এই মোহ সাত্ত্বিক মোহ। সুতরাং ইহার শক্তি অত্যধিক। এই মোহের কারণ এই যে প্রত্যেকেই সুসংস্কারকে অতিশয় যত্নের সহিত দীর্ঘকাল হৃদয়ে পোষণ করেন এবং সুসংস্কার জনিত সাত্ত্বিক সুখ ভোগ করেন। সুতরাং উহার প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আসক্তি জন্মে। কেবল সাধক নহে, কিন্তু সকলেই কুসংস্কারের হস্ত হইতে অল্লাধিক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সুসংস্কার হইতে উদ্ধার পাইতে চাওয়া দূরের কথা, উহাকে অতি যত্নে পোষণ করিতেই সকলেই ব্যাকুল থাকেন। এই জন্যই উহাদিগকে বর্জ্জন করা সুকঠিন। পরিশেষে বলিতে হয় যে আমাদের পরিণতি চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জড় এবং জড়সংসর্গজাত যাহা কিছু, তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং জড় এবং জড়জাত যাহা কিছু, তাহা ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অব-

লম্বনীয় থাকিবে, যতক্ষণ উহারা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হইবে। কিন্তু পথিক যেমন নদী পার হইয়া খেয়ার নৌকা পরিত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরে চলিয়া যায়, সেইরূপ উহাদের কার্য্য সাধিত হইলেই উহারাও কালে কালে—উপযুক্ত কালে পরিত্যক্ত হইবে। সুসংস্কারও জড়সংসর্গ জাত এবং জড়কে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং তাহাও পরিত্যক্তব্য। থাকিবে কি? প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আবারও বলি "আমি স্বরূপে যাহা, তাহাই থাকিব, জড়সংসর্গে আগমন জন্য আমার যাহা কিছু অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা আর থাকিবে না এবং অবশেষে পূর্ণামুক্তিতে শেষ জড়-দেহও থাকিবে না। অর্থাৎ জড় ছিল না ও থাকিবেও ন', কিন্তু আত্মা ছিল ও থাকিবে। সূর্য্যগ্রহণে চন্দ্রের ছায়া ক্রমশঃ অপসারিত হয় এবং সূর্য্য ক্রমমোক্ষ লাভ করে। সেইরূপ জীবের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বর্জ্জন করিয়া তিনি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহা তাহার হইতে হইবে। অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণ বিকশিত অনন্ত গুণরাশিসম্পন্ন আত্মা ভাবে প্রকাশিত হইতে হইবে। সূর্য্য যেমন পূর্ণমোক্ষে তাহার প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সূর্য্য যাহা, তাহাই প্রকাশ করে, সেই পূর্ণামুক্তিতে জীবের সত্যস্বরূপই প্রকাশিত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ত্রিবিধ গুণই (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃই) জড়জাত এবং তিনই আবরণের কার্য্য করে, ঘনত্বের পার্থক্য আছে মাত্র।" কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে এই তত্ত্ব যত অল্প কথায় লিখিত হইল, ইহার সাধনা অর্থাৎ সুসংস্কাররাশির বর্জ্জন তদ্রূপ সহজ। এই সাধনা অত্যুন্নতা অবস্থায় আরম্ভ হইলেও চিরকাল স্থায়ী। ইহাকেই সত্ত্ব-গুণের আতীত্য সাধনা বলা যাইতে পারে। Froyd-এর Psycho-analysis-এর মতে জীবের কোন স্বাধীনইচ্ছা নাই,। তাহার subconscious region-এ যাহা আছে, তাহা দ্বারাই তিনি চালিত হন। তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে মানবে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু বহু জন্মের সংস্কার স্তুপীকৃত হইয়া বর্ত্তমান

থাকে এবং তাহা দ্বারা সে বহু সময় চালিত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু মানবের আত্মাও আছেন এবং তিনি স্বয়ং ইচ্ছাও করেন এবং অন্তঃকরণ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার ইচ্ছা যখন দেহ ও অন্তঃকরণের মাধ্যমে জগতে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা বিকৃত হয় এবং যন্ত্রের বিকৃতির মাত্রানুযায়ী সময় সময় অতি বিকৃতও হয়। সুতরাং Froyd যাহাকে subconscious region-এর ভাবরাশি বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহারা মানবেরই বহু বহু জন্মোপার্জ্জিত রাশিকৃত সংস্কার সমূহ মাত্র এবং উহারাও আমাদের কর্ম্মফলে উৎপন্ন। স্বপ্ন সকলকে সাধারণে অমূলক চিন্তামাত্র বলেন। সকল স্বপ্নই যে অমূলক, তাহা নহে। দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে "বাত্তিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চাপি বর্জ্জয়েৎ।" অর্থাৎ বায়ুর, পিত্তের বা কফের বৃদ্ধিজনিত স্বপ্নকে বর্জ্জন করিবে, অর্থাৎ উহারা অলীক (ক)। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে দৈহিক দোষে মনও অল্পাধিক বিকৃত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু উক্তভাবে বিকৃত এবং চঞ্চলস্বভাব মনের সময় সময় সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ারাহিত্য হয় না। মানব সুষুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্কল্প স্বভাব উহার পূর্ব্বার্জ্জিত বহু সংস্কার দ্বারা যাহা সৃষ্টি করে, তাহাকেই স্বপ্ন বলে। এইরূপ ভাবের স্বপ্ন সকল অমূলক। ইহাকেই ইংরেজীতে Hallucination of the fevered brain বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নই এই শ্রেণী ভুক্ত। ইহা ভিন্ন যে সকল স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংঘটিত। সুতরাং উহাদের আলোচনা এস্থলে অপ্রয়োজনীয়। অমূলক স্বপ্ন সমূহ যে অন্তঃকরণেরই সৃষ্টি এবং আত্মা যে উহাদের সাক্ষী মাত্র তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার ইচ্ছাদ্বারাই আমাদের অন্তঃকরণ ও দেহের কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহাদের অধিকাংশই সাক্ষাৎভাবে আত্মার ইচ্ছাজনিত কতকগুলি দেহ এবং অন্তঃকরণের অভ্যাসের—সংস্কারের ফল। শেষোক্ত কার্য্য সমূহের মূলেও আত্মার কর্ম্মসমূহ বর্ত্তমান এবং তাঁহারই

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা।

শক্তি অবলম্বনে কৃত, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেহে আত্মার কেবল উপস্থিতির জন্যই দেহ এবং অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয় না। কিন্তু উহাদিগকে বারংবার চালাইলে উহাদিগের নানারূপ বহু অভ্যাস গঠিত হয় এবং সেই অভ্যাসবশতঃ দেহ এবং অন্তঃকরণ কোন কোন কার্য্য করে, কিন্তু সেই অভ্যাসের মূলের ক্রিয়াসমূহ আত্মারই নিজ ইচ্ছাকৃত। এস্থলে আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে যে জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহার নিজের কোনই স্বাধীন ইচ্ছা নাই। এই সম্বন্ধে "কল্পবাদ" অংশে লিখিত বিষয় পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে জড়ের ক্রিয়া সমূহ চৈতন্যের (পরমাত্মার বা জীবাত্মার) ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পাঠক এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম অনুধাবন করিবেন। "মনে স্বতঃ যে চিন্তা প্রবাহ (জ্ঞান কল্পনাদি) চলিতেছে, তাহাও যখন যোগজ ইচ্ছা দ্বারা রোধ করা যায়, তখন বলিতে হইবে উহারাও ইচ্ছামূলক। কোন ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাহা অস্বাধীন ইচ্ছায় পরিণত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের স্বতঃচেষ্টা সকলও হটযোগের দ্বারা রোধ করা যায়। অতএব উহারা অস্বাধীন চেষ্টা হইলেও মূলতঃ ইচ্ছার অনধীন নহে। এইরূপে ইচ্ছাই প্রধান কর্ম্ম। সেই ইচ্ছা পূর্ব্বসংস্কার বিশেষ যখন বা যতখানি আমাদের অনধীন হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, তখন তাহাই অদৃষ্ট বা ভোগভূত কর্ম্ম। আর সেই ইচ্ছা যখন বা যতখানি আমাদের অধীন হইয়া অর্থাৎ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে, তাহাই পুরুষকার-রূপ কর্ম্ম" (পাতঞ্জল দর্শন—সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত—৫২৮-১৯ পৃষ্ঠা)। পাঠক মায়াবাদের চিদাভাস এবং আমাদের মতের পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। মায়াবাদে বলা হয় যে কূটস্থ ব্রহ্ম জীবদেহে বর্ত্তমান। তিনি নির্গুণ (গুণ শূন্য) এবং নিষ্ক্রিয়। তিনি ব্রহ্মই, অবিদ্যা উপহিত এই মাত্র পার্থক্য। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া নাই। অথচ মায়াবাদী বলেন যে চিৎস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মের আভাস জড় অন্তঃকরণে পতিত হইয়া

উহাকে পরিচালনা করে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এবং ইহাও বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা যদি নিজেই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে তাঁহার আভাস দ্বারা কোন গুণ বা ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। আদি পদার্থে যাহা মাত্রও নাই তাঁহার আভাসে যে তাহা থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটী মানবমূর্ত্তি যখন দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তখন উহাকে মানবমূর্ত্তি বলিয়াই চিনিতে পারা যায়। আবার যদি একটী পশুর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তখন উহাকে পশু-মূর্ত্তিই বলা হয়। কখনই মানুষমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া পশুমূর্ত্তি ধারণ করে না এবং পশুমূর্ত্তিও প্রতিফলিত হইয়া মানবমূর্ত্তি ধারণ করে না। আবার যদি কোন মানব বা পশু অঙ্গভঙ্গি করে, অর্থাৎ ক্রিয়া করে, তবেই প্রতিফলিত মূর্ত্তিতেও ক্রিয়ার আভাস দেখা যাইবে, কিন্তু যদি তাহারা সুস্থির থাকে, তবে প্রতিফলিত মূর্ত্তিতেও অর্থাৎ উহাদের আভাসেও কোনই ক্রিয়া দেখা যাইবে না। অর্থাৎ মূল পদার্থ যখন যেমন অবস্থাপন্ন হয়, আভাসেও তখন তেমন ভাব প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যায় যে মূলে যাহা না থাকে, আভাসেও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম যদি নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ হন, তবে তাহার আভাসও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইত। উহা কখনই জীবে দৃষ্ট অসংখ্য গুণ ও ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারিত না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে এই ভাবটী সাংখ্যমতের অনুকরণ। সাংখ্যপুরুষও ঐরূপ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তাঁহার দেহে উপস্থিতির জন্যই বুদ্ধি ক্রিয়াশীলা হয়। অতএব সাংখ্যমতও যে সত্য নহে, তাহা বলা যাইতে পারে। সেই সম্বন্ধে ' সাংখ্যমত বিচার" অংশে লিখিত হইয়াছে। এদিকে আমাদের মতে জীবাত্মায় ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান এবং তিনি সক্রিয়। আত্মার ইচ্ছাই সকল কার্য্যের মূলে। ঐ সকল কার্য্যের অধিকাংশই আত্মার ইচ্ছা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অন্তঃকরণের যোগে সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন কার্য্য অন্তঃকরণ পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আত্মারই শক্তি অবলম্বনে সম্পাদন

করিয়া থাকে। এই অভ্যাস গঠনের মূল অনুসন্ধান করিলেই আমরা আত্মার ইচ্ছা দেখিতে পাই। জন্মান্ধব্যক্তি কখনও স্বপ্নে রূপবিষয়ক চিত্র দেখিতে পায় না। ইহার কারণ এই যে দেহ এবং অন্তঃকরণ চক্ষুরূপ যন্ত্রহীনতার জন্য রূপ-দর্শন অভ্যাসে অভ্যস্ত নহে। এইরূপ যিনি জন্মবধির, তিনি স্বপ্নে শব্দবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় আত্মার দেহে উপস্থিতিতেই অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাভিন্ন চিদাভাস দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয় না বা হইতেও পারে না এবং আত্মার ইচ্ছাই সর্ব্বকর্ম্মের মূল কারণ। মায়াবাদী যদি ইহার পরও আপত্তি উত্থাপন করেন যে অন্তঃকরণ দ্বারা কৃত অভ্যস্ত কর্ম্মসমূহ চিদাভাস দ্বারা কৃতকর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতে হইবে, তবে বলিতে হয় যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিস্তারিত আলোচনায় এই-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, সেই সকল কর্ম্মের মূলেও আত্মার নিজকৃত কর্ম্ম এবং উহারা (অন্তঃকরণ দ্বারা কৃত আলোচ্য কর্ম্মসমূহ) অভ্যস্তকর্ম্ম মাত্র এবং সেই সকল কর্ম্মও সচ্চি-দানন্দস্বরূপ এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীবাত্মার শক্তি অবলম্বনে কৃত হয় বলা হইয়াছে। আবার যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে উক্ত কর্ম্মসমূহ চিদাভাসজনিত, তবুও বলিতে হইবে যে নিষ্ক্রিয় আত্মার আভাসে কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে জীবাত্মা সক্রিয়। কিন্তু মায়াবাদী তাহা স্বীকার করিবেন না। আমাদের মতে স্বয়ং ব্রহ্মেরই ইচ্ছা আছে এবং সেই প্রেমময়ী ইচ্ছার জন্যই এই সৃষ্টিলীলা সংঘটিত হইয়াছে। সেই অনন্ত ব্রহ্মের অংশভাবে আভাসমান জীবাত্মায়ও ইচ্ছাশক্তি চির বর্ত্তমান। সুতরাং যদি চিদাভাসেই সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইহা বলা হয়, তবে সেই আভাস সক্রিয় জীবাত্মারই আভাস বলিতে হইবে। কিন্তু উহা কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় আত্মার আভাস নহে বা হইতেও পারে না। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূলে ক্রিয়াশক্তি থাকিলেই আভাসে ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীত অবস্থা সম্ভব নহে, অর্থাৎ মূলে ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে উহা আভাসে থাকিতে পারে

না। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মায়াবাদের কূটস্থ ব্রহ্ম এবং সাংখ্যপুরুষ সেই মতদ্বয় সম্মত জড় অন্তঃকরণের সহিত একজাতীয় পদার্থ নহেন। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্ম বা সাংখ্যপুরুষ স্বয়ংভাবেও অন্তঃ-করণের উপর কোন ক্রিয়া বর্ত্তাইতে পারেন না—তাঁহাদের দেহে উপস্থিতিতেই তাঁহাদের আভাসের পক্ষে জড়ের উপর ক্রিয়া ত দূরের কথা। এদিকে আমরা "আত্মা ও জড়ের মিলন", "জড়ের বাধকত্বের কারণ", "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ চতুষ্টয়ে আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মা ও জড় উভয়ই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছেন বলিয়া উঁহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। ইহাও ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আমাদের মতে জীবাত্মাই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় একজাতীয় পদার্থ বলিয়া অন্তঃ-করণ আত্মার সংসর্গে প্রভাবিত হয়, ইহা যুক্তিযুক্তভাবেই বলা যাইতে পারে। লৌহ যেমন চুম্বকের সহবাসে থাকিয়া চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভাবে যদি বলা হয় যে অন্তঃকরণও আত্মার সহবাসে থাকিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত কোন কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তবে ইহা অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু মায়াবাদী ও সাংখ্য তাহা বলিতে পারিবেন না। কারণ, কূটস্থ ব্রহ্ম এবং সাংখ্যপুরুষ আর জড় অন্তঃকরণ একজাতীয় পদার্থ নহে এবং কূটস্থ ব্রহ্ম ও পুরুষ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তাঁহাদের আভাসে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আত্মা একমাত্র চিৎস্বরূপ নহেন। তাঁহাতে প্রেম প্রভৃতি অনন্ত গুণ এবং ইচ্ছাশক্তি নিত্য বর্ত্তমান। চিদাভাস বলিতে মায়াবাদ ও সাংখ্য মনে করেন যে ব্রহ্ম বা পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ মাত্র, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়াও নাই, অর্থাৎ তিনি জানেনও না। ইহা যে সত্য নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মা যখন স্বরূপতঃ অনন্ত গুণে গুণবান এবং অনন্ত ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিমান এবং দেহে অংশভাবে ভাসমান এবং অন্তঃকরণকে যখন আত্মার কার্য্যক্ষেত্র বলা হয়, [illegible] আত্মার অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণের কার্য্যই অন্তঃকরণের মাধ্যমে [illegible]শিত হয় বলিতে হইবে, কখনই আত্মার একমাত্র জ্ঞানই প্রকাশিত হয় না। আত্মাকে

যে সাধারণতঃ চৈতন্যস্বরূপ বলা হয়, তাহা অতীব সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা যদি কেহ বলিতে চাহেন যে আত্মা একমাত্র চৈতন্যস্বরূপই, কিন্তু তাঁহাতে অন্য গুণরাশি নাই, তবে সেই উক্তি সত্য হইবে না। চৈতন্য আত্মার প্রধান গুণ বটে, সুতরাং এককথায় আত্মাকে বুঝাইতে সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই নিষ্পত্তি করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা অনন্তস্বরূপ। তিনি অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ ওঁং। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে প্রেমও আত্মার একটী প্রধান গুণ এবং উহারও যে শক্তি অসীম, তাহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। এই বিশ্বলীলা প্রেম দ্বারাই প্রধানভাবে সংসাধিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" এবং "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ-দ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জীবের সমস্ত কার্য্যকে স্থূলভাবে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করেন। যথা—Knowing, Feeling and Willing (জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা) ; এই ভাবকে ভোগও বলা হয় অর্থাৎ জীব জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। অর্থাৎ Knowing শব্দে আমরা জ্ঞানের ক্রিয়া বুঝি, Feeling শব্দে কোমল গুণরাশি পর্য্যায়ভুক্ত গুণের ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি এবং Willing শব্দ দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বুঝায়। আমরা যদি অন্তঃকরণের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে ইহাতে যেমন জ্ঞান আছে, তেমনি ভাব এবং ইচ্ছাশক্তিও আছে। সুতরাং কেবল চিদাভাস অর্থাৎ কেবল জ্ঞানাভাস দ্বারা অন্তঃকরণ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাজনিত ত্রিবিধ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। কেহ কেহ জ্ঞানই অন্তঃকরণের একমাত্র উৎস বলেন, আবার কেহ কেহ ভাবকে (Feelling-কে) সকল ক্রিয়ার জনক বলেন। অন্তঃকরণে তিনই বর্ত্তমান। অন্তঃকরণে যে জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহা যেমন সত্য, তেমনি ভাব এবং ইচ্ছাও যে উহাতে বর্ত্তমান, ইহাও তেমনি সত্য। ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ কোথায় ? এখন জীবের ক্রিয়ার উৎপত্তি কোথায়, তাহা বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে অধিকাংশ কার্য্যই ভাবজাতীয় গুণ হইতে উৎপন্ন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জ্ঞানের ক্রিয়াও

অন্তঃকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জাতীয় ক্রিয়া ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম ভাবজাতীয় গুণরাশিজনিত ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন। জ্ঞান জানেন এবং ভালমন্দ নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ আলোকপাত করেন। ন্যায়দর্শন মতে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ও জ্ঞান জীবাত্মার অনুমাপক হেতু। এস্থলের ইচ্ছার অর্থ ঈপ্সা বা পাইবার ইচ্ছা। সুখের জন্য বাসনা ও তজ্জন্য চেষ্টা এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ হইতেই অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে পরম-প্রেমময় পরমপিতার প্রেমগুণের জন্য তাঁহার বহু হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে তাঁহার সৃষ্টিতেও সেইরূপ প্রেমজাতীয় গুণরাশি হইতে অর্থাৎ কোমল গুণরাশি হইতে অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং সেই ইচ্ছা অন্তঃকরণের মাধ্যমে বাহিরে প্রকাশিত হইলেই উহাকে কার্য্য বলা হয়। পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিবেন না যে সৃষ্টিতে জ্ঞানের কোন কার্য্য নাই। সৃষ্টি যে জ্ঞানমণ্ডিতা সেই সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে সৃষ্টিবিষয়িনী ইচ্ছা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমসম্ভূতা এবং জ্ঞান এই সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রলয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্যকারী। তাই এই বিশ্বের সকল প্রণালী, সকল কার্য্য নির্ভুল ত্রুটী শূন্য। অতএব দেখা গেল যে চিদাভাস বা জ্ঞানাভাস মাত্র দ্বারা অন্তঃকরণ চালিত হয় না বা হইতেও পারে না। উপসংহারে বক্তব্য এই যে জীবদেহ জীবাত্মার বাধকরূপে যে সৃষ্ট, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত স্মরণে রাখিতে পারিলেই এই অংশের নানাবিধ সমস্যা সরল ভাবে মীমাংসিত হইবে।

মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় পাইয়াছি যে উপনিষদ্ মায়াবাদের নিম্নলিখিত তত্ত্বসমূহ সমর্থন করেন না, বরং মায়াবাদ খণ্ডনের বহু তথ্য আমরা উহাতে লাভ করিয়াছি:—"(১) সৃষ্টিতত্ত্ব

অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্রষ্টা নহেন। (২) নির্ব্বিশেষবাদ অর্থাৎ পরব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। (৩) নেতিনেতিবাদ দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদন। (৪) মায়াবাদে সগুণ ব্রহ্ম। (৫) চিদাভাস" কেহ বলিতে পারেন যে মায়াবাদ উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন যুক্তি। যদি যুক্তিরূপ ভিত্তির উপর মায়াবাদ সংস্থাপিত করিতে পারা যায়, তবেই মায়াবাদ সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জগতে সকল দর্শনই এমন কি ভারতীয় সকল দর্শনও শ্রুতির উপরই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া উদ্ভূত বা পরিপুষ্ট হয় নাই, যদিও একথা সত্য যে ভারতীয় সকল ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র অল্পাধিক পরিমাণে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে শ্রুতির নিকট ঋণী। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মায়াবাদীও এইরূপ ভাব (Stand) গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। তিনি অবশ্যই বলিবেন যে শ্রুতিই তাঁহার দর্শনের ভিত্তিভূমি এবং শ্রুতিই মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যায় নানাবিধ যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মায়াবাদ সত্য এবং উহা শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক্, ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উপনিষদ্ মায়াবাদ সমর্থন করেন না, এখন আমরা দেখিব যে মায়াবাদ যুক্তি দ্বারাও খণ্ডিত হইতে পারে। মায়াবাদিগণ মায়ার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়া থাকেন:—"অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি।" "অর্থাৎ মায়া অজ্ঞানই, সৎ ও অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়; ইহা ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞানবিরোধিনী, ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ।" মায়াবাদিগণ মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলেন। মায়াবাদী ব্রহ্মকে নির্গুণ (গুণ শূন্য) বলেন। তাঁহার মায়া ভিন্ন অন্য কোন শক্তি আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। আমরা দেখিয়াছি যে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্বও তাহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ বা লক্ষণ, কিন্তু গুণ নহে। অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিশেষ। এই জন্য মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগকে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী বলা হয়। অগ্নি যতক্ষণ আছে, উহার দাহিকাশক্তিও ততক্ষণ থাকে। ব্রহ্ম

যখন নিত্য, তখন তাঁহার একমাত্র মায়াশক্তিও নিত্যা অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য। মায়াবাদী ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ বলেন। স্বয়ং সত্য-স্বরূপের সমুদায়ই সত্যে পরিপূর্ণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাতে সত্য ভিন্ন অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। তাঁহাতে বা তাঁহার যাহা কিছু, তাহা সকলই নিত্য সত্য। আবার শক্তি শক্তি-মানের সহিত নিত্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি মায়াকে অবশ্যই নিত্যা বলিতে হইবে। অথচ মায়াবাদী মায়াকে সদসৎ বলেন। ইহা কি স্ববিরোধী উক্তি নহে? অতএব যে বস্তু আজ আছে, কাল নাই, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ বা শক্তি কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহার কোন শক্তিই অসৎ বা তথা-কথিত সদসৎ হইতেই পারে না। কিন্তু মায়াবাদী বলেন যে জীবের যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন মায়া ধ্বংস হয়। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় মায়া যখন থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারা মায়া যখন ভস্মীভূত হয়, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মে মায়াশক্তি নাই। কারণ, ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত ও পূর্ণজ্ঞান। সুতরাং তাঁহাতে মায়ার অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহা সহজবোধ্য। মায়াবাদীও ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপই বলেন। সুতরাং মায়া সৎ হইতে পারে না। তথাপিও যদি বলা হয় যে ব্রহ্মে মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অতুল্য জ্যোতিঃ ও মায়া একই কালে একই স্থানে থাকিতে পারে না। যদি ব্রহ্মজ্ঞানে সাধকের মায়া ধ্বংস হইতে পারে, তবে যিনি নিত্য ও অনন্তজ্ঞানে পরিপূর্ণ, যিনি সত্যস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় (ভা-রূপ) ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদান্তে এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হন, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব হয়? শক্তি ও শক্তিমান অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। ব্রহ্মের নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানা-গ্নিতে কি মায়া ভস্মীভূত হয় না? যদি বলেন যে তাহা হয় না, তবে বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম অপেক্ষা সাধকের শক্তি বলবত্তরা। কারণ, সাধক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়া ধ্বংস করেন, কিন্তু যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, মহান্ ও অনন্ত জ্ঞানাধার, সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানই মায়া ধ্বংস

করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান ভিন্ন জগতে কোন জ্ঞানই নাই, সেই অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্মের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া সাধক মায়া ধ্বংসে সমর্থ, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞানাধার যিনি, তিনি সেই কার্য্যে অসমর্থ। ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আবার তাঁহারা উহাকে অসৎও বলেন না। কারণ, অজ্ঞান সময়ে মায়ার প্রতীতি হয়। এই সম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে। মায়াকে ভাবরূপ বলা হইয়াছে। আবার মায়াবাদিগণ বলেন যে মায়া ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় থাকে না, যেমন আলোকের বর্ত্তমানতায় অন্ধকার থাকে না। দার্শনিকগণ অন্ধকারকে অভাবপদার্থই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং মায়াও অভাবপদার্থ পর্য্যায়ভুক্ত, উহা কখনও ভাব পদার্থ নহে। আবার মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহা ভাব পদার্থ বই অভাবপদার্থ হইতেই পারে না। অতএব মায়াবাদীর এই সিদ্ধান্তও সত্য নহে। "পদার্থ দুই প্রকার, যথা—ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থ পাঁচ প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া), জাতি ও সম্বন্ধ (ক)।" ভাষা-পরিচ্ছেদ গ্রন্থে লিখিত আছে:—"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।" "অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী পদার্থ।" সুতরাং ভাবাভাব কোন পদার্থ দার্শনিকগণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেইরূপ সদসৎ কোন পদার্থের অস্তিত্ব বা উল্লেখ অন্য কোন দর্শনে দেখা যায় না এবং উহা ধারণাতীত। মায়াবাদিগণ বলেন:—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্।" অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই। অতএব উক্তমতে আমরা দুইটী বস্তু পাই—সত্য ও মিথ্যা। এতদ্ভিন্ন সত্য-মিথ্যা অথবা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, এইরূপ কোন পদার্থ মায়াবাদীও এস্থলে নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং প্রকৃত ভাবে বুঝিতে গেলে আচার্য্য শঙ্করও সদসৎ কোন পদার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সদসৎ শব্দের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন

(ক) সত্যধর্ম্ম।

যে মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহা সঠিক অর্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সদসৎ=সৎ+অসৎ=সত্য+মিথ্যা। অর্থাৎ উহা এমন একটী বস্তুর বিশেষণ যাহার একাংশ সত্য ও অন্য অংশ মিথ্যা। মায়াবাদী উহার যে অংশকে সৎ বলেন, তাহা যে মিথ্যা এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র, তাহা আমরা ইতঃপর দেখিতে পাইব। সুতরাং মায়া সর্ব্বৈবমিথ্যা, কখনই সদসৎ নহে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে মায়াবাদী মিথ্যার দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই ভ্রমকে তাহারা মিথ্যা বলেন বটে, কিন্তু এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে উহা মিথ্যা হইলেও অজ্ঞান অবস্থায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়তঃ—আকাশকুসুম ও শশশৃঙ্গ। এই দুইটী বস্তু কেহই কোন দিন দেখেন নাই, সুতরাং উহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং রজ্জুতে সর্পদর্শন ভ্রমজনিত। এই ভ্রমের কারণ নানাবিধ। যথা—চক্ষুরোগ, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, অল্পালোক, রজ্জুর সর্পাকারে অর্থাৎ আঁকা-বাঁকা ভাবে অবস্থান, পূর্ব্বসংস্কার প্রভৃতি। এই যে আমাদের ভ্রম, ইহা নানাপ্রকারের এবং নানাভাবেই সংঘটিত হয়। আমরা যদি স্বপ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে অধিকাংশ স্বপ্নই মিথ্যা। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনা সমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা বস্তু সমূহের কোনও অধিষ্ঠান নাই। উহা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারের ফল মাত্র। অতএব দেখা গেল যে প্রোক্ত উভয় প্রকার পদার্থই সম্পূর্ণ মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পদর্শনের কারণ ভ্রম (Error)। এই প্রকার ভ্রমকেই Illusion বলা হয়। এখন ভ্রম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক আমরা অসংখ্য প্রকার ভুল করি। ভুলের কারণও অনেক। নিম্নলিখিত কারণ সমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও প্রধান কারণ আমাদের স্বাভাবিক অপূর্ণতা। অপূর্ণ জীবে যাহা আমরা জ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে পূর্ণজ্ঞান নহে। আত্মার জ্ঞানই মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ বিকৃতজ্ঞান চারি ভাবে কার্য্য করে। যথা—বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার। ইহাদিগের সমষ্টিকেই

অন্তঃকরণ বলা হয়। আত্মার জ্ঞান নিত্য শুদ্ধ, কিন্তু উহা মস্তিষ্ক সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয়। আবার অন্তঃকরণের ভাব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহিঃপ্রকাশিত হইলে উহা আরও বিকৃত হয়। কাহারও মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণ আত্মার জ্ঞান বিশুদ্ধ ও সমগ্র ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। ইহার উপর সকলেরই মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণ অল্লাধিক বিকৃত ও অপটু (Defective)। আবার ইহার উপর বহু সঞ্চিত সংস্কার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আত্মার জ্ঞান অতি বিকৃত ভাবেই বাহিরে প্রকাশিত হয়। আত্মার জ্ঞান আছে, ইহা সত্য। কিন্তু অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না ইত্যাদি। আবার চক্ষুরোগ থাকিলে দ্বিচন্দ্র কেন, বহু চন্দ্রও দেখা যায়। কিন্তু চন্দ্র একটী। সেইরূপ কর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এক কথায় অন্য কথা শুনে। সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়ের Defect থাকিলে যে জ্ঞানের বিকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক অল্লাধিক বিকৃত এবং উহা স্বাভাবিক ভাবেই অপূর্ণ ও জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। সুতরাং উহা আত্মার জ্ঞান পূর্ণভাবে ধারণা ও প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়গণ যন্ত্র মাত্র। উহারা যে অপূর্ণ ও অল্লাধিক Defective, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং উহারা আত্মার সমগ্র জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে কর্ণ, চর্ম্ম, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ক্রমান্বয় ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির সত্ত্বাংশপ্রধানভাবে গঠিত এবং মস্তিষ্ক এই পঞ্চ-সত্ত্বাংশের সমষ্টি প্রধানভাবে গঠিত। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ। সেই জন্য মস্তিষ্ক আত্মার জ্ঞানের প্রতিবিম্ব ধারণা করিতে পারে। আবার আমাদের পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় নানাভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত বলিয়া বাহিরের বস্তু সমূহ উহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। মস্তিষ্ক জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে এবং অন্তঃকরণের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে আত্মার জ্ঞানে ভ্রম নাই বটে, কিন্তু উহা দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয় এবং মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়-

গণের defect-এর পরিমাণ অনুযায়ী বিকৃতির মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে এই তত্ত্ব সত্য। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক্। সূর্য্যের রশ্মি শুভ্রবর্ণ। কিন্তু উহা যখন নানাবর্ণের কাচের মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তখন আমরা উহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখি। সেইরূপ আত্মার জ্ঞান নিত্য বিশুদ্ধ, কিন্তু যখন উহা যেরূপ মস্তিষ্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন উহা সেইরূপ ভাবেই বিকৃত হয়। মস্তিষ্ক-বিকৃতির মাত্রা যত অধিক হইবে, আত্মার জ্ঞানও ততোহধিক বিকৃতভাবেই প্রকাশিত হইবে। এই ভ্রমের মাত্রা ততই কমিতে থাকিবে, যতই আমরা মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণের defect দূর করিতে পারি। আত্মার জ্ঞান কখনই অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ নহে! কিন্তু যে সকল যন্ত্রের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত হয়, উহাদের defect-এর জন্য সেই জ্ঞান বিকৃত হইবেই। সময় সময় যন্ত্রগুলির বিকৃতির মাত্রা এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে উহা জ্ঞানকে অত্যধিক ভাবে আবরণ করিয়া রাখে এবং একেকে অন্য ভাবে প্রদর্শন করায়। উন্মাদ ও Hysteria রোগের acute অবস্থায় রোগী অধিষ্ঠান ব্যতীতও নানা অবাস্তব বস্তুও দেখে। তাহাদের পক্ষে আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গ দেখা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহা যখন সত্য, তখন রজ্জুতে সর্পদর্শন, মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু সমূহ যেমন মিথ্যা, আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতিও তেমনি মিথ্যা। এই সকল স্থলে মিথ্যাত্বের কোনই পার্থক্য নাই। কারণ, স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সমূহের কোনই অধিষ্ঠান নাই এই তিন প্রকার পদার্থের (যদি উহাদিগকে একান্তই পদার্থ বলা হয়) কোনই উপাদান কারণ নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে রজ্জু-সর্প বা মিথ্যা স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সমূহ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নহে, বিকৃত জ্ঞানও নহে, কিন্তু মিথ্যা কল্পনা মাত্র। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞান নহে। উহার মধ্যে জ্ঞান বা সত্যের লেশ মাত্রও নাই। সুতরাং সেইরূপ জ্ঞানকে জ্ঞান বলাও যাহা, বন্ধ্যাপুত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করাও তাহা। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে রজ্জু-সর্পের জ্ঞান এবং শশশৃঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা

ও এক পর্য্যায় ভুক্ত। মিথ্যা মিথ্যাই। There cannot be any degree of unreality. যাহা একমাত্র subjective ভাবেই উৎপন্ন, অর্থাৎ Imaginary thinking দ্বারা রচিত, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাই, কখনই সত্য নহে, সাময়িক ভাবেও নহে। Principal and Philosopher Stephen তাঁহার Problems of Metaphysics গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"In the pursuit of knowledge the greatest danger is mixing up what we imagine and what we know. We have to distinguish between ideas constituting knowledge and ideas constituting imagination." "অর্থাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান কালে ঘোরতর বিপদ হইতেছে যে আমরা আমাদের জ্ঞানকে আমাদের মানসিক কল্পনার সহিত মিশ্রণ করিয়া লই। সুতরাং মানসিক কল্পনা ও জ্ঞানকে পৃথক ভাবে বুঝিতে হইবে।" সুতরাং দার্শনিক Stephenও বলিতেছেন যে জ্ঞান এবং মানসিক কল্পনা এক নহে—উহারা বিভিন্ন—একটী সত্য, অন্যটী মিথ্যা। তাঁহার এই উক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প প্রতীতি হয়, তাহা মস্তিষ্ক-বিকৃতি দ্বারা উৎপন্ন ভাব মাত্র, উহা জ্ঞান নহে। সুতরাং উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। উহা যে মিথ্যা, তাহা মায়াবাদীর নিজ উক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি বলেন "রজ্জুতে সর্প-ভ্রম"। ভ্রম যে জ্ঞান হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভ্রম বিপরীত পদার্থ। দর্শনশাস্ত্র মূল অনুসন্ধান করিবে। উহা বাহিরের স্থূল বা ভ্রান্ত প্রকাশ লইয়াই বিচার করিবে না। আমরা ভ্রমের মূল অনুসন্ধানে পাইলাম যে রজ্জু-সর্পের এবং মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহের অস্তিত্ব কোন কালেও ছিল না, নাই বা থাকিবে না। সুতরাং উহারাও আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যাই। উহাদের জন্য ভিন্ন Category সৃষ্টি করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। রজ্জুকে সর্পে পরিবর্ত্তিত হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনা সমূহ কেহ কখনও জাগরণ অবস্থায় বাস্তব ভাবে দেখে নাই। সুতরাং উহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা। Illusion-

এর জন্য যে অধিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন নাই, তাহা এখন প্রদর্শিত হইতেছে। বাতুলতা ও Hysteria রোগের উৎকট অবস্থায় বাতুল ও স্ত্রীলোক অধিষ্ঠান ব্যতীতও বহু অবাস্তব বস্তু দেখিতে পায়। আবার যদি কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করে, তবে সেও সময় সময় জাগরণ অবস্থায়ও সেই স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পায়। সেইরূপ কোনও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোনও বিষয়ের জন্য দুশ্চিন্তা দ্বারা বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইলে সেই সম্বন্ধীয় কিছু না কিছু জাগরণ অবস্থায়ও দেখিতে পায়। দুই ব্যক্তির কল্পনা করা যাউক্। একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক, চক্ষুরোগগ্রস্ত, Nervous, ভীরু স্বভাব। অন্যজন সুস্থ-মস্তিষ্ক, চক্ষুরোগ হীন, শান্ত স্বভাব ও সাহসী। উভয়েরই অবশ্য সর্প সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার আছে। এই দুই ব্যক্তি যদি অল্পালোকে আঁকাবাঁকা ভাবে স্থাপিত রজ্জু দেখে, তবে প্রথম ব্যক্তি উহাকে সর্প মনে করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কখনই উহাকে সর্প মনে করিবে না। বরং প্রথম ব্যক্তি যখন সাঁপ সাঁপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে বলিয়া দিবে যে উহা সর্প নহে, কিন্তু রজ্জু মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যেকেই বহু বহু অবাস্তব বস্তু দেখে। স্থূল, বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি সংস্কার, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির জন্য স্বপ্নে যেমন নানা প্রকার অবাস্তব বস্তু দেখে, জাগরণে ও সেইরূপ দেখিতে পারে। পার্থক্য এই যে জাগরণে দেখা মস্তিষ্ক-বিকৃতির উৎকট অবস্থায় মাত্র সম্ভব হয়। কারণ, সাধারণের জ্ঞান তখন বিশেষ ভাবে জাগ্রত থাকে। তাই ভ্রমের সম্ভাবনা অল্পে পরিণত হয়। সুতরাং রজ্জু অধিষ্ঠান ব্যতীতও Illusion হইতে পারে সুতরাং Illusion এর জন্য অধিষ্ঠান অবশ্যই প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সকলেরই অল্পাধিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে এবং স্বপ্নে ও জাগরণে যে সকল অবাস্তব বস্তু দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও পূর্ব্বসংস্কার। আবার এই দুইটীর মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকৃতিই সর্ব্বপ্রধান কারণ। অধিষ্ঠানের জন্য কোনই অবশ্য

প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি দ্রষ্টার মস্তিষ্ক-বিকৃতি না থাকে, চক্ষুরোগ না থাকে, যদি সর্প সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার না থাকে, যদি অল্পালোক না থাকে ইত্যাদি, তবে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অসম্ভব হইত। উহা আঁকা-বাঁকা থাকিলেও নহে। দিবা দ্বিপ্রহরে যখন সূর্য্য আলোক দিতেছে এবং আকাশ মেঘশূন্য, তখন সুস্থ-মস্তিষ্ক, চক্ষুরোগহীন, পূর্ব্বসংস্কার বিবর্জ্জিতের পক্ষে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সকল অবস্থাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতি, পূর্ব্বসংস্কার প্রভৃতি রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের প্রধান কারণ, অধিষ্ঠান নহে। নিম্নলিখিত কথা-গুলির উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "No two men agree. No two clocks can go together." এমন দুইটী মানুষ নাই, যাহাদের দেহের গঠন সম্পূর্ণরূপে এক। দুইটী যমজ ভাই বা দুইটী যমজ বোনের দেহও সম্পূর্ণরূপে এক নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর জীবজন্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আবার কেহই এমন ভাবে দুইটী জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে না, যাহারা সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে নানা ব্যক্তির নানা অবস্থা। আবার ইহাও দেখা যায় যে কেহ বা পশুজীবন যাপন করিতেছে, অপর জন দেবজীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু সকল প্রকার মানুষকে মানুষ বলা হয়। বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু এবং মনুষ্যকৃত আসবাবের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন এক একটী শ্রেণীতে ভুক্ত করা হয়। যথা—সকল সিংহই সিংহ, সকল ব্যাঘ্রই ব্যাঘ্র, সকল Tableই Table, সকল Chairই Chair ইত্যাদি। সুতরাং মিথ্যা মিথ্যাই, উহার প্রকারভেদের কোনই প্রয়োজন নাই। যদি প্রকারভেদ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক কৃত্রিম বস্তু, প্রত্যেক নৈসর্গিক পদার্থ, এক একটী পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। সুতরাং Category অসংখ্য হইবে। তাহা কিন্তু কেহই বলে না। অংক শাস্ত্রে দেখা যায় যে কোন কোন অংকের দুই বা ততোহধিক প্রণালীতে (processএ) ফল বাহির করা যায়। সকল প্রণালীতে একই ফল প্রাপ্ত হওয়া

যায়। সেইরূপ আকাশকুসুম, মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহ এবং রজ্জু-সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন process-এ বলিয়া দিতেছে যে উহারা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আরও একভাবে আমরা মিথ্যা অনুমান করি। কেহ **Aeroplane**-এ অতি উচ্চ স্থান হইতে কলিকাতানগরী দর্শন করিলে উহাকে অত্যধিকভাবে ক্ষুদ্র দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই নগরী ক্ষুদ্র নহে। সূর্য্য হইতে বৃহত্তর নক্ষত্রগুলিকেও বিন্দু মাত্র বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ অনুমান মিথ্যা। ইহার কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা। এইরূপ বহু প্রকারের ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই সকল মিথ্যাই সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। উহাদের মিথ্যাত্বের প্রণালীগত যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উহারা সমভাবে সর্ব্বৈব মিথ্যা। যদি বলেন যে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে শশশৃঙ্গ এবং রজ্জু-সর্পের মিথ্যাত্বের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তবে বলিতে হয় যে আরও সূক্ষ্মতর ভাবে চিন্তা দ্বারা মূলে পৌঁছিলে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উভয়ই সম্পূর্ণ মিথ্যা—মিথ্যা কল্পনা প্রসূত বই আর কিছুই নহে। উহারা কখনও ছিল না, নাই এবং থাকিবে না। রজ্জু-সর্পের সাময়িক অস্তিত্বও ছিল না, উহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রজ্জু-সর্প সম্বন্ধে তথাকথিত জ্ঞান জ্ঞান নহে। মিথ্যাজ্ঞানকে কেহই জ্ঞান বলে না। উহার তথাকথিত সাময়িক অস্তিত্বও সত্য অস্তিত্ব নহে, উহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। উহারা ভ্রম মাত্র, উহাদের মধ্যে সত্যজ্ঞান ও সত্য অস্তিত্বের লেশ মাত্রও নাই। রজ্জু-সর্প কোন বস্তুই নহে। উহা ভ্রম মাত্র। আমরা বস্তু নির্ণয় করিতে সর্ব্বপ্রথমে দেখিব যে উহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ আছে কিনা। উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কোনও বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের কোনই উপাদান কারণ নাই। নিমিত্ত কারণ দ্রষ্টার মস্তিষ্ক-বিকৃতি, চক্ষুরোগ প্রভৃতি। সুতরাং রজ্জু-সর্প কখনও কোনও বস্তু নহে। উহার বস্তুসত্তা মোটেই নাই। ইহাও বলিতে পারা যাইবে না যে রজ্জুই সর্পের উপাদান কারণ। কারণ, রজ্জুকে রজ্জুজ্ঞানে দেখা যায় যে রজ্জুর কোনই পরিবর্ত্তন হয়

নাই। রজ্জু যদি প্রকৃতই সাময়িক ভাবে সর্পে পরিবর্ত্তিত হইত, তবে উহার আকারেরও অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইত। ক্ষিতিপদার্থ মাত্রেরই পরিবর্ত্তনে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু এস্থলে রজ্জুর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং রজ্জু রজ্জু-সর্পের উপাদান কারণ নহে। সুতরাং রজ্জু-সর্প প্রকৃত বস্তু নহে। উহা দ্রষ্টার মস্তিষ্ক-বিকার প্রসূত ভ্রম সুতরাং মিথ্যা মাত্র। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে কোন অভিধানেই রজ্জুকে রজ্জু-সর্পের উপাদান বলিবে না। উহা উপাদানের অর্থের মধ্যেই পড়ে না। মায়াবাদী ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ মন্ত্রদ্বয়ে দেখা যায় যে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৬ সূত্রে ("আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"-এ) দেখা যায় যে ব্রহ্ম নিজ হইতে এবং নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রজ্জুতে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দৃষ্ট সর্পের কোনই উপাদান কারণ পাওয়া যায় না। জাগতিক বস্তু সকলের (কল্পনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রসূত ভাব সকলের নহে) প্রত্যেকেরই উপাদান ও নিমিত্তকারণ থাকিবে। উহাদিগেতে উক্তকারণ দ্বয়ের একটীরও অভাব থাকিবে না। যদি দেখা যায় যে উহার একটীরও অভাব আছে, তবে আমাদের বুঝিতে হইবে যে উহা প্রকৃত পক্ষে কোনই বস্তু নহে, কিন্তু উহা মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রসূত ভাব মাত্র। যখন উহা বস্তু বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে না, তখন উহা মিথ্যা মাত্র। উহার সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞান নহে, কিন্তু ভ্রম মাত্র। সুতরাং উহা সত্য হইতে পারে না। মিথ্যা কোনকালেও সত্য হইতে পারে না। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে রজ্জু-সর্প, মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহ, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা এবং মিথ্যাত্বের বিচারে উহারা একপর্য্যায় ভুক্ত। যাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইল, তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে রজ্জুতে সর্পদর্শনকে জ্ঞান-পর্য্যায় ও সত্যপর্য্যায় ভুক্ত করা হইয়াছে। অথচ উহা যে ভ্রম মাত্র সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে ভ্রমকে (Illusion-কে) জ্ঞান ও সত্যপর্য্যায় ভুক্ত

করাই অযৌক্তিক হইয়াছে এবং ইহা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ভ্রম যে সত্যজ্ঞান ও সত্য অস্তিত্ব হইতে পারে না, ইহা সহজবোধ্য। অতএব আমরা দেখিলাম যে রজ্জু-সর্প, মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহ, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি সমভাবে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। উহাদের মিথ্যাত্বের কোনই প্রভেদ নাই। রজ্জু-সর্প ও মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহের তথাকথিত সাময়িক অস্তিত্ব ও তৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সত্য ও জ্ঞানপর্য্যায় ভুক্ত করাই অসঙ্গত হইয়াছে। মায়াবাদ বলেন যে পরব্রহ্মের উপর মায়ার কোনই কার্য্য নাই, তিনি মায়োপহিত নহেন। মায়াবাদে মায়াকে পরব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে। ইংরেজীতে কথাটী বলিতে হইলে বলিতে হয় যে Maya is a part and parcel of Brahmo. শক্তির উপর শক্তিমানের অবশ্যই প্রভাব আছে। কারণ, শক্তিমান্ ও শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। শক্তি বাদ দিয়া শক্তিমান্ এবং শক্তিমান্ বাদ দিয়া শক্তি কথার কথা মাত্র। মায়াবাদে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তাঁহার জ্ঞানেরও কোন ক্রিয়া নাই, ইহা বলা হইয়া থাকে। অথচ মায়াকে তাঁহার শক্তি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সেই মায়ারই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি আছে, ইহাও মায়া-বাদীর মত। নিষ্ক্রিয়ের কোন শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অদ্ভুত শক্তিশালিনী মায়ারূপিনী শক্তি আছে, ইহা বন্ধ্যাপুত্রবৎ স্ববিরোধিনী উক্তি। মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ বা গুণশূন্য বলিয়া কথিত হয়। শক্তি মাত্রই গুণনিষ্ঠ। গুণেরই শক্তি। শক্তি কখনও স্বাধীন নহেন বা হইতেও পারেন না। সুতরাং গুণশূন্য ব্রহ্মে কোনরূপ শক্তিই থাকিতে পারে না। অথচ মায়াবাদে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মায়ারূপিনী শক্তির কল্পনা করা হইয়াছে ক)। এতদ্ভিন্ন

(ক) এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলেন, তাহা যদিও সত্য নহে, তথাপি উক্তিদ্বয়ে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ গুণশূন্য কখনও ক্রিয়াশীল হইতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি যেমন সর্ব্বগুণ শূন্য, তেমনি সর্ব্বশক্তি শূন্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মায়াবাদেই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অত্যদ্ভুতা ক্রিয়াশীলা মায়া-রূপিনী ব্রহ্মশক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা বলিলেও চলিবে না যে

মায়া যখন ব্রহ্মের শক্তি, তখন অবশ্যই উহা তাঁহার অন্তর্গত। কিন্তু নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানাগ্নির নিকট অন্ধকাররূপিনী মায়ার বর্ত্তমানতা থাকিতে পারে না। মায়াকে অন্ধকারের সহিতও তুলনা করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মায়া থাকে না, ইহাও মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং যে স্থানে জ্ঞান, সেই স্থানেই জ্যোতিঃ এবং সেই স্থানেই অন্ধকারের অভাব। সুতরাং অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সুতরাং অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের মধ্যে অন্ধকার বা অজ্ঞানতারূপিনী মায়ার অবস্থান অসম্ভব। অতএব বলিতে হইবে যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে, উহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কল্পিত কিছু। মায়াকে অজ্ঞান বলা হইয়াছে, সুতরাং উহা অচেতন। জগতে দেখা যায় যে চেতনের ইচ্ছা ভিন্ন অচেতন চালিত হইতে পারে না। জড়কে (অচেতন পদার্থকে) চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহারা বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং ইহা বুঝিতে পারা যায় যে অচেতন মায়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে উহার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মই উহার শক্তিকে চালাইতে পারেন। যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিতে হইবে, সুতরাং তিনি সগুণও বটেন। কারণ, গুণহীনের শক্তিও নাই। মায়াবাদ কিন্তু তাহা স্বীকার করিবেন না। একথা বলিলেও চলিবে না যে ব্রহ্মের উপস্থিতিতেই মায়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে নিষ্ক্রিয় পুরুষের উপস্থিতিতে কোথায়ও কোনই ক্রিয়া হইতে পারে না। অতএব ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গেল যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে। কিন্তু উহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কল্পিত কিছু। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে মায়াবাদ মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহাকে এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে উহাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত না বলিয়া পারা যায় না। এস্থলে যাহা বলা হইল এবং অন্যান্য স্থলে মায়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা চিন্তা

মায়ারই ক্রিয়া, কিন্তু ব্রহ্মের কোনই ক্রিয়া নাই। কারণ, শক্তির ক্রিয়া ও শক্তিমানের ক্রিয়া একই। শক্তিমানের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার কোনও শক্তির কোনই ক্রিয়া হইতে পারে না।

করিলেই সাধক বুঝিতে পারিবেন যে মায়াবাদ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় প্রমাণ করিতেই অতি ব্যগ্র। কারণ, সেই মতে "ব্রহ্মের ইচ্ছা আছে" ইহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মকে অপূর্ণ বলা যায়। মায়াবাদের উক্ত আশংকা যে অমূলক, তাহা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশচতুষ্টয়ে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত কারণবশতঃই মায়াবাদ পরব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তিকে পৃথক (abstraot) করিয়া এবং নানা কল্পিত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া জগতের সমক্ষে মায়া নামে উপস্থিত করিয়াছেন। কারণ, সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করার সুযোগ কোথায়? ইংরেজীতে কথাটী বলিলে বলিতে হয় যে:—"Maya is a false abstraction of the creative, preservative and destructive power of Brahmo. False, beoause Brahmo and His power are insepa rably conneeted and cannot be cut asunder as has been done in the Mayavad." মায়াবাদী মায়ার সুস্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা দিতে না পারায় উহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিলেই কি সকল সমস্যার সুমীমাংসা হইল? অন্ধকার কি আরও ঘনীভূত হয় না? যদি বলা যায় যে মায়াবাদী মায়ার সাহায্যে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির সন্তোষজনক মীমাংসা না করিতে পারিয়াই উহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে সেই উক্তির মূলে সত্য বর্ত্তমান কি না, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। বিরুদ্ধবাদী যখনই মায়াবাদের কোনও ত্রুটী প্রদর্শন করেন, তখনই অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়ার উল্লেখ করিয়া সকল প্রশ্নের তথাকথিত মীমাংসা করা হয়। আমাদের মনে হয় না যে অন্য কোন মতের দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সাধারণের অজ্ঞাত। দর্শনশাস্ত্র সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সেই অজ্ঞাত (কাহারও কাহারও মতে অজ্ঞেয়) তত্ত্বকে পাঠকের নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু সেই দর্শনই যদি উহার প্রধান অবলম্বনকে অনির্ব্বচনীয় বলেন,

তবে কেমনে তিনি পাঠককে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে আনিবেন—তমঃ হইতে জ্যোতিঃতে আনিবেন? অনির্ব্বচনীয় দ্বারা অনির্ব্বচনীয়ের কোনই অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়, আবার মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্নাও বলা হইয়াছে। এই তিনটী গুণ ব্রহ্মের নহে, ইহা উভয় পক্ষ সম্মত। আমাদের মনে হয়, যে সাংখ্যদর্শনই প্রথমতঃ জগতে প্রচার করিয়াছেন যে উহার প্রধান বা প্রকৃতি ত্রিগুণসম্পন্না। তাহা হইতেই মায়াবাদ মায়াকে ত্রিগুণ-সম্পন্না বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, পুরাণ প্রভৃতি সাংখ্যদর্শন হইতে এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভিন্ন একাদশখানি উপনিষদে এই তিনটী গুণের কোনই উল্লেখ নাই। সেই উপনিষদও সাংখ্য হইতে অন্যান্য বহু ভাবের সঙ্গে প্রকৃতি যে ত্রিগুণ-সম্পন্না, তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মায়া ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যদি মায়ার তিনটী গুণ থাকে, তবে ব্রহ্মেরও তিনটী গুণ আছে বলিতে হইবে। কারণ, শক্তির শক্তি শক্তিতেই নিহিত আবার শক্তি শক্তিমানে নিহিত। কিন্তু মায়াবাদী ইহা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না যে ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ আছে। আমরাও তাহা স্বীকার করি না। কথিত আছে যে মায়া ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া আছে, অর্থাৎ সরল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টিতেও পরব্রহ্মের মায়াশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহা কি কখনও সম্ভব? মায়া ব্রহ্মের শক্তিও হইবে, কিন্তু তাঁহাতে নিত্য অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে না, ইহা যে অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মে অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তি নিত্য বর্ত্তমান এবং উঁহারা পরিমাণে নিত্য অনন্ত। উহাদের একটীরও কোনও প্রকারের ভাগ হইতে পারে না। ব্রহ্ম এক, অখণ্ড ও একরস, ইহা মায়াবাদীও বলেন। সেইরূপ তাঁহার প্রত্যেক গুণ ও শক্তি অখণ্ড। উহাদের বিভাগ হইলে ব্রহ্মেরও বিভাগ হয়।

সুতরাং তাঁহার কোনও গুণ বা শক্তির কোনও প্রকারের বিভাগ একেবারেই কল্পনাতীত। মায়ার অর্থ মোহ। ইহা ষড়রিপুর একটী অর্থাৎ চতুর্থ রিপু। মোহ জাতগুণ অর্থাৎ উহা আত্মার জড়সংসর্গে জাত। উহা আত্মার গুণ নহে। উহা আত্মাকে স্পর্শ করে না বা করিতেও পারে না। হৃদয়েই উহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। মোহের লয় না হইলে গুণের সবিশেষ উন্নতি বা বিকাশ হয় না ও অন্ধকার যায় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন লাভ হয় না। মায়াকে মোহভাবেই সাধারণে গ্রহণ করেন এবং তাহাই যথেষ্ট। যখন মোহ জীবাত্মার গুণও নহে, তখন তাহা ব্রহ্মের শক্তি বা গুণ হইতেই পারে না। ভ্রম, ভুল, মোহ, অজ্ঞান ব্রহ্মের শক্তি, ইহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং মায়া দ্বারা কল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য নহে। যদি তর্ক স্থলে ধরিয়াও নেওয়া যায় যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি, তবে শক্তিমান্ ভিন্ন সেই শক্তি কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। সেই শক্তিমান্ই ব্রহ্ম। মায়াবাদ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলেন ও একজন সগুণ সীমাবদ্ধ ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কখন কি ভাবে পরব্রহ্ম হইতে উক্তরূপ কল্পিত সগুণ-ব্রহ্ম মায়োপহিত হইলেন, তাহা মায়াবাদ বলিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে পরব্রহ্মের স্বভাবানুযায়ী অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবে এরূপ সংঘটন হইয়াছে, তবে বলিতে হয় যে স্বভাবানুযায়ী এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না ইহা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" এবং "কল্পবাদ" অংশদ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলেন যে আলোকদানের জন্য সূর্য্য প্রত্যহই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং এককালে (তাহা যতই দূরবর্ত্তী হউক না কেন) সূর্য্য আর থাকিবে না। সেইরূপ মায়াবাদের সীমাবদ্ধ সগুণ ব্রহ্মের শেষ আছে বলিয়া কথিত হয়। কারণ, জীবগণ যখন মুক্ত হইতে হইতে আর কোন জীব থাকিবে না, তখন সগুণ ব্রহ্মও নিঃশেষিত হইবেন। ইহাই মায়াবাদের কল্পনার পরিণতি। যাহার অন্ত আছে, তাহার আদিও আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সকল জীবের মুক্তি হইতে অবশ্যই অনন্তপ্রায় কাল ক্ষয় হইবে। কিন্তু মায়াবাদে যখন সেই

কালের শেষ আছে বলা হইল, তখন সগুণ ব্রহ্মের মায়োপহিত অবস্থার আদি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা যতই পশ্চাদ্বর্ত্তী হউক্ না কেন। অতএব মায়াবাদ অনুযায়ী ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত যে পরব্রহ্মের ইচ্ছায় কোন এক অনাদি প্রায় মুহূর্ত্তে তাঁহার একচতুর্থাংশ তাঁহারই মায়াশক্তি দ্বারা উপহিত হইয়া সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হইয়াছেন। মায়াবাদী কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিতে প্রস্তুত বটেন, কিন্তু ইচ্ছা যে তাঁহারই শক্তি বিশেষ, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। কারণ, তাহা হইলে আর তাঁহাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা চলে না। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় রাখিতে যাইয়া অন্য আর একজন নিম্নতর ব্রহ্মের এবং একটী ব্রহ্মাতিরিক্ত শক্তিকে নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানময় ব্রহ্মের সদসদ্রূপিনী শক্তিভাবে কল্পনা করিতে মায়াবাদ বাধ্য হইয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মে মায়াবাদী যে সকল গুণ আরোপ করেন, তাহা যে একমাত্র পরব্রহ্মেরই গুণ, তাহা মায়াবাদী ভিন্ন সকলেই স্বীকার করিবেন। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই, কেবল সগুণ ব্রহ্ম মায়োপহিত ও তজ্জন্য সীমাবদ্ধ। উক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে। উহা ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী কল্পিত কিছু। মায়াকে যতই বিশ্লেষণ করা যাইবে, ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে উহা Plato কথিত বিরোধ-পরায়ণ স্বাধীন-সত্ত্ব'-বিশিষ্ট পদার্থের সঙ্গে উহার অধিকাংশে মিল আছে। মায়াবাদে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয় বটে, কিন্তু যে ভাবে মায়া কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই বলা সঙ্গত হইবে না। আমাদের মনে হয় যে Bible-এর সয়তানবাদ এবং সাংখ্যের প্রকৃতিবাদের সঙ্গে উহা অধিকাংশে মিল রক্ষা করে। তবে একথা সত্য যে মায়াবাদ সয়তানবাদের ন্যায় স্থূল ভাবাপন্ন নহে। ইহা সূক্ষ্ম বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। "আত্মভেদ, জগৎ সত্য ও ঈশ অন্য" এই তিনটী মাত্র মায়াবাদ ও সাংখ্যদর্শনের পার্থক্য সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে মায়াবাদে এবং সাংখ্যমতে পার্থক্য কতদূর সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে লিখিত হইয়াছে যে মায়াবাদ সাংখ্য অনুকরণে রচিত তাহা পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন। মায়াবাদ অনুযায়ী জগন্মিথ্যাবাদের বিরুদ্ধে বহু সুযুক্তি বর্ত্তমান। সেই সম্বন্ধে ইতঃপর লিখিত হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ মায়াবাদের "স্বীকৃতির" উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। বেদান্তদর্শনের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই মন্ত্র তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম অনুবাকের উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করভাষ্যেও শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তাঁহারই উপাদানত্বে এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই সূত্রে ব্রহ্মের পরিণামে জগদুৎপত্তির কথাও আছে। "পরিণাম" শব্দটী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই তত্ত্ব শ্রুতি এবং বেদান্তদর্শন উভয় দ্বারা প্রমাণিত হইল। তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্ত মন্ত্রদ্বয় ব্রহ্মপ্রকরণে স্থিত। ঐ প্রকরণ হইতেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্র আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হইল, তবে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের উপাদানত্বে এবং ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বে যে জগতের উৎপত্তি, তাহা কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? দেখা যায় যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ বা কিছু জগতের চতুঃসীমার মধ্যে আসেন নাই। আর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বা অন্য কেহ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইলে ব্রহ্মই সীমাবদ্ধ হন। সুতরাং তাহাও অসম্ভব। এই সকল আলোচনায় শ্রুতি ও দর্শনের মধ্যে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র, এই সিদ্ধান্তে কিরূপে আসিতে পারে? উপনিষদে আরও বহু স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট। অনেকে বহুস্থলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলেন। এই মন্ত্র সম্পূর্ণভাবে এইরূপ:—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" এই

মন্ত্রের প্রথম অংশের (অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-এর) উল্লেখ করিয়াই অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কিন্তু জগৎ একেবারেই মিথ্যা, মায়া মাত্র। তাহারা উহার সহিত "তজ্জলানিতি"র উল্লেখ করেন না। এই মন্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ আসিয়াছে (সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ), ব্রহ্মে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই লীন হইবে। এই মন্ত্রের এবং অন্যান্য সমভাবাপন্ন ঔপনিষদিক মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) সূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্রুতি মন্ত্র সমূহ উল্লেখ যোগ্য। "(১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।" "(২) আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—৩।১ ও ৩।৬)" "(৩) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। মুণ্ডক—২।১।৩)।" "(৪) তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। (ছান্দোগ্য-৬।২৩)।" এই সম্পর্কে তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬।৭ অনুবাক ও উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এই সকল মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় যে ব্রহ্ম হইতেই তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ উৎপন্ন। ইহাতে মায়ার কোনই হাত নাই। সুতরাং ব্রহ্মের উপাদানত্বে যে জগতের উৎপত্তি, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। মায়াবাদ উপনিষদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। উপনিষদ্ যখন বলেন যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, তখন সেই জগৎকে মায়াবাদ কেন এবং কি প্রকারে মিথ্যা বলেন? উপনিষদ্‌কে অভ্রান্ত বলিব, আবার জগৎকে মিথ্যা বলিব, ইহারা স্ববিরোধী উক্তি। উপনিষদের উক্তিকে শব্দ প্রমাণও বলা হয়। আচার্য্য শঙ্করও তাহাই বলেন। তবে কি প্রকারে সেই শব্দ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া জগন্মিথ্যাবাদ স্থাপন করা যায়। উক্ত উপনিষদের ৭ম অনুবাকে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে "তদাত্মানং

স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে” সুতরাং ব্রহ্মই স্বয়ং নিমিত্ত-কারণ, মায়া নহে। উহার পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে তিনিই বহু হইলেন এবং শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে তিনিই জগতের সমুদায় হইলেন। সুতরাং তিনি যে উপাদান কারণ, তাহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি থাকিতেও এবং উহাতে মায়ার উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও আচার্য্য শংকরের ন্যায় মহাজ্ঞানী জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বেদান্তদর্শনও এই ভাবে আলোচ্য মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সূত্র রচনা করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যায় আচার্য্যও একই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার বেদান্তদর্শনের “দৃশ্যতে তু” (২'১।৬) সূত্রের ভাষ্যেও আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের সত্তাই জগতের সত্তা। “অথোচ্যেত, অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্বনুবর্ত্তমানো গোময়াদীনাঞ্চ বৃশ্চিকাদিষ্বিতি ব্রহ্মণোঽপি তার্হি সত্তালক্ষণ স্বভাবঃ আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে।” “বঙ্গানুবাদ :—যদি বল, পুরুষের ও গোময়ের যে পার্থিব স্বভাব আছে, সেই স্বভাব কেশ নখাদিতে ও বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়. সুতরাং তদনুসারে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবের অভাব হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে, সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও আছে। তদনুসারে ব্রহ্মের সহিত আকাশাদির প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব সংরক্ষিত হইবেক। (কালীবর বেদান্তবাগীশ)” এস্থলেও দেখা যায় যে আচার্য্য শঙ্করের নিজ ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের সত্তাই জগতের সত্তা। এস্থলে প্রকৃতি-বিকৃতির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃতি জগৎ তাঁহারই বিকৃতি বা পরিণাম। সুতরাং জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহাও শঙ্কর বলিতেছেন। সুতরাং যে পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং যাহার সত্তায় ব্রহ্মসত্তা চিরবর্ত্তমান, সেই পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, তাহা উভয়পক্ষ সম্মত। সুতরাং সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সুতরাং তাঁহারই উপাদানত্বে গঠিত জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রে এবং সেই

সূত্র যে শ্রুতিমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার হইতেই এবং তাঁহার দ্বারাই জগৎ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদোক্ত মায়া দ্বারা কিছু না হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। কিছু না হইতে যে জগৎ আসে নাই, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।২।১-৩ মন্ত্রত্রয় সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করিয়াছে। উহাদিগকে মায়াবাদের খণ্ডন মন্ত্রও বলা যাইতে পারে। ঋষি আরুণি সুস্পষ্ট ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে জগৎকে সৎ বলিয়াছেন। পাঠকের এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে আচার্য্যের উক্তির কারণ এই যে সাংখ্যবাদী প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং জগৎ চৈতন্যশূন্য। সুতরাং উহারা সমলক্ষণ নহে। সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম-প্রভব হইতে পারে না। আচার্য্য জগতকে চেতনাবান বলেন নাই, চৈতন্যশূন্যই বলিয়াছেন। প্রকৃতির বিকৃতির বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পূর্ণ সমলক্ষণ হইতে পারে না, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি উপমা দিয়াছেন যে মানবদেহের এবং গোময়ের পার্থিবত্ব স্বভাব যেমন কেশ নখাদিতে আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাস্বভাব জগতে আছে। তাঁহার তর্কের প্রণালী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতির বহু লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ যদি বিকৃতিতে পাওয়া যায়, তবেই প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব প্রমাণিত হইল। তাই তিনি ব্রহ্মের তিনটী লক্ষণের একটী মাত্র লক্ষণ অর্থাৎ সত্তা-লক্ষণ জগতে আছে, এই প্রমাণ দ্বারা তিনি বাদীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান, ইহাও আচার্য্য বলিয়াছেন। যদি ব্রহ্মের সত্তায় জগতের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়, তবে উক্ত উপমার কোনই force থাকে না। আর সাংখ্যবাদী যে জগৎকে চৈতন্যশূন্য বলিয়াছেন, তাহা সত্যজগতের অচৈতন্য, মায়া দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা-জগতের সহিত প্রধানোৎপন্ন জগতের কোনই সম্পর্ক নাই। যদি ব্যবহারিক সত্তা লক্ষিত হইত, তবে আচার্য্য বলিতেন যে জগতের কোন সত্তাই নাই, যাহা দেখা যাইতেছে, উহা ভ্রম মাত্র সুতরাং মিথ্যা এবং তিনি 'অনুবর্ত্তমানঃ' শব্দের পর 'ইব' শব্দ যোগ করিতেন।

পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে "ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে, সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও আছে।" অর্থাৎ তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে আকাশাদি পদার্থের সত্তা ব্রহ্মের সত্তা হইতে প্রাপ্ত। তিনি ইহা লিখেন নাই যে ব্রহ্মের সত্তাই আকাশাদি পদার্থে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ সত্তাহীন বা অস্তিত্ব-শূন্য বা মিথ্যা। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান, জগতের সত্তা কখনই ব্যবহারিক সত্তা মাত্র নহে। ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান সেই জগৎ যে মিথ্যা, ব্যবহারিক ভাবে মাত্র সত্য, ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা যে কেহ বুঝিতে পারেন। অতএব "দৃশ্যতেতু" সূত্রের ব্যাখ্যায় যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে জড় জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান, সুতরাং উহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। এস্থলে দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটী স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যটী সমুদ্র-তরঙ্গ। এই উভয়ই জাগতিক পদার্থ। ইহাদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্বর্ণালঙ্কারের অলঙ্কারত্ব বা কারুকার্য্য এবং সমুদ্রতরঙ্গের তরঙ্গত্ব যথাক্রমে স্বর্ণ ও সমুদ্রজলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। উহাদের হইতে স্বর্ণ ও সমুদ্রজল বাদ দিলে স্বর্ণালঙ্কারের অলঙ্কারত্ব (কারুকার্য্য) এবং তরঙ্গের তরঙ্গত্ব বা উহাদের নামরূপের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং প্রোক্ত সূত্রদ্বয় ও উহাদের ভাষ্যের অবলম্বনে আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ=ব্রহ্ম+নামরূপ। স্বর্ণালঙ্কার এবং সমুদ্রতরঙ্গের নামরূপ যেমন স্বর্ণ ও সমুদ্রজল হইতে বিভিন্ন (বিভক্ত) নহে, কিন্তু পৃথক্ (Distinct), জগতের নামরূপও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত ভাবে বিভিন্ন নহে, কিন্তু পৃথক্ (Distinct) ভাবেই ভাসমান। প্রোক্ত পদার্থদ্বয়ের নামরূপ যেমন উহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সত্তাশূন্য কথার কথা মাত্র হয়, সেইরূপ জগৎ হইতে উহার উপাদান পদার্থ ব্রহ্মকে বাদ দিলে সেই নামরূপ কথার কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ঐরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বর্ণালঙ্কার

ও সমুদ্রতরঙ্গের স্বর্ণ ও সমুদ্রজল বাদ দিয়া কেবল মাত্র উহাদের নাম-রূপের চিন্তা অসম্ভব। তাই উহাদিগকে False abstraction বলা যাইতে পারে। সেইরূপ উপাদান বাদ দিয়া জাগতিক নামরূপ সম্বন্ধেও চিন্তা অসম্ভব। সুতরাং কেবলমাত্র জাগতিক নামরূপের চিন্তা ও False abstraction. কারণ, কেহই কখনই জড় পদার্থের নামরূপ হইতে ব্রহ্মকে বাদ দিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন হইবে যে আমরা ত কেবল নামরূপই দেখিতেছি। সুতরাং উহাদের চিন্তা করিতে পারি না, একথা সত্য নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা কেবল নামরূপের চিন্তা করি না। আমরা কখনও মৃত্তিকা বাদ দিয়া ঘটের নামরূপের চিন্তা করিতে পারি না। ঘটের স্থূল উপাদান মৃত্তিকাই বটে, কিন্তু ঘটের ultimate analysis-এ আমরা ব্রহ্মেই উপনীত হইব। ইহা যখন স্বীকৃত যে জগতের উপাদান ব্রহ্ম, তখন প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই উপাদান ব্রহ্ম। ঘটের মৃত্তিকাকে অপে লয় করিলে মৃত্তিকা থাকিবে না বটে, কিন্তু অপ্ থাকিবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা ব্রহ্মেই উপনীত হইব। সুতরাং ঘটের আদি উপাদান ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন জাগতিক নামরূপের চিন্তা অসম্ভব। তথাপিও যে ব্রহ্মের চিন্তা না করিয়া আমরা ঘটের নামরূপের চিন্তা করি, তাহার কারণ এই যে আমরা জড়ভাবে জর্জ্জরিত, তাই আমরা স্থূল লইয়াই থাকি এবং স্থূলকে স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্মকে সহজে স্বীকার করিতে চাহি না। অর্থাৎ আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাই। আর ইহা যখন সত্য যে উপাদান ভিন্ন নামরূপের কোনই অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারে না এবং ইহাও যখন সত্য যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, তখন ব্রহ্মভিন্ন জাগ-তিক নামরূপের অস্তিত্ব নাই। এখন আমাদের প্রশ্ন হইবে যে মায়াবাদ কেন আচার্য্য শঙ্কর স্বীকৃত সত্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল নামরূপকেই জগৎ বলিয়াছেন। আমরাও বলি যে Falsely abs-tracted নামরূপের কোনই অস্তিত্ব নাই, ছিল না বা থাকিবে না। যদি জগৎ অর্থে ব্রহ্মবাদে উহার কেবল নামরূপকেই ধরা যায়, তবে

উহা মিথ্যা বটে, কিন্তু জগৎ কেবলমাত্র নামরূপই নহে, উহার উপাদানভাবে ব্রহ্ম চিরবর্ত্তমান। আবার উপাদানশূন্য নামরূপ বলিয়া কিছুই নাই। ঘটের কেবল নামরূপকে ঘট বলা হয় না। ঘট= মৃত্তিকা+কারুকার্য্য বা নামরূপ। সুতরাং দেখা যায় যে মায়াবাদ জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার অত্যাগ্রহে জগতের একটী ভীষণ ভাবের মিথ্যাসংজ্ঞা দিয়াছেন। অর্থাৎ জগৎ উপাদানশূন্য সুতরাং ভিত্তিশূন্য নামরূপ মাত্র বলা হইয়াছে। অথচ মায়াবাদ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলেন। ইংরেজীতে একটী কথা আছে :— Give the dog a bad name and hang it. এক্ষেত্রেও কি সেই কু-পন্থা অবলম্বিত হয় নাই? জগৎ প্রকৃতপক্ষে যাহা নহে, উহার সেইরূপ একটী সংজ্ঞা দিয়া উহাকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। ইহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠক বিবচনা করিবেন। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য মহাদার্শনিক Kant বলিয়াছেন যে Phenomena-র পশ্চাতে Noumenon বর্ত্তমান এবং তাহাই Thing in itself. সুতরাং তিনিও বলেন যে Phenomenaই সমুদায় নহে। ইহা নামরূপ মাত্র এবং আসল বস্তু উহার উপাদান ভাবে মূলে বর্ত্তমান। অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাই জগতের সত্তা। অর্থাৎ Noumenon ভিন্ন Phenomena-এর অস্তিত্ব অসম্ভব। মনুষ্যের এরূপ শক্তি নাই যে ব্রহ্মসত্তা বাদ দিয়া কেবল জাগতিক নামরূপকেই স্বাধীন ও বিভক্ত ভাবে দেখিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্ম+নামরূপ=জগৎ বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মের সহিত কি কিছু যোগ হইতে পারে। আমরাও বলি যে ব্রহ্মের সহিত কিছুই যোগ হইতে পারে না। এক্ষেত্রেও স্বর্ণালঙ্কারের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে উহা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু উহারই উপাদানত্বে উহা হইতেই উহারই নামরূপ রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ নামরূপ স্বর্ণ হইতে বিভক্ত না হইয়াও পৃথক্ (Distinct) ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং জাগতিক নামরূপ তাঁহার হইতে বিভিন্ন না হইয়াও তাঁহার হইতে রচিত হইয়া পৃথক্ (Distinct) ভাবে

ভাসমান। এই ভাবটী বুঝাইতে যাইয়া ভাষায় বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম + নামরূপ = জগৎ। নতুবা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সহিত কিছুই যুক্ত হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। মায়াবাদ সত্য শব্দের অর্থ বলেন "ত্রিকালে অবাধিত সত্য বা নিত্য।" মায়াবাদ উপনিষদের অভ্রান্ততায় দৃঢ় বিশ্বাসী। এখন দেখা যাউক্ উপনিষদ্ সত্য শব্দের অর্থ কি বলেন। "সত্য" শব্দের নিরুক্ত সম্বন্ধীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।৫।১, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।৩।৫ এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬ মন্ত্র সমূহ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতত্ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি। (বৃহ—৫।৫।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—সেই দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সত্য তিনটী অক্ষর যুক্ত। "স" একটী অক্ষর, "তি" (অর্থাৎ "ৎ") একটী অক্ষর এবং "যম্" (অর্থাৎ য = ।) একটী অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর সত্য এবং মধ্যবর্ত্তী অক্ষর অসত্য। সুতরাং এই অসত্য ("ৎ" অক্ষর) উভয় দিকে সত্য দ্বারা আবেষ্টিত। এই জন্য (ইহা অসত্য হইলেও) সত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন, অসত্য তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" "তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মার্ত্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। (ছান্দোগ্য—৮।৩।৫)।" "বঙ্গানুবাদ :—(সত্যম এই শব্দের) এই তিনটী অক্ষর—সৎ (বা স), তি, যম্। এই যে "সৎ" অক্ষর, ইহা অমৃত। আর যে "তি" অক্ষর তাহা মর্ত্ত্য। "যম্" অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে (অর্থাৎ "সৎ" ও "তি" কে অথবা অমৃত ও মর্ত্ত্যকে) নিয়মিত করা হয়। যেহেতু ইহা দ্বারা এতদুভয়কে নিয়মিত করা হয়, এই জন্য ইহার নাম যম্। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চা-নিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। (তৈত্তি—২।৬)।” “বঙ্গানুবাদ :—(ব্রহ্ম) তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যাহা কিছু আছে,—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন, সেই জন্যই ব্রহ্মকে সত্য বলে। (তত্ত্বভূষণ)।” ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে স্বয়ং নিত্য সত্য ব্রহ্ম এবং মৃত্যুশীল জাগতিক পদার্থ সমূহ সত্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৫।৫।২ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে আদিত্যকেও (জড় সূর্য্যকেও) সত্য বলা হইয়াছে। মায়াবাদ যখন উপনিষদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র মনে করেন এবং সেই দর্শনকে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থাকেন, তখন প্রামাণ্য তিনখানি উপনিষদের “সত্য” শব্দের প্রোক্ত অর্থ গ্রহণ না করিয়া মায়াবাদ নিজকৃত ব্যাখ্যা অর্থাৎ যাহা ত্রিকালে অবাধিত সত্য, তাহাই একমাত্র সত্য, অন্য সমুদায় মিথ্যা, এরূপ ব্যাখ্যা কেন অবলম্বন করিলেন? আমরাও বলি যে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য, কিন্তু তাঁহারই উপাদানত্বে যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও আমরা সত্য বলিতে বাধ্য। ইহার অন্যথা যে করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে হেতু জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আছে, যে হেতু সেই উপাদানের আদি-কারণ বা আদি-উপাদান সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই এবং যে হেতু জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সেই হেতুই জগৎ সত্য। রজ্জু-সর্পের উপাদান নাই। কেহই যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে পারেন না রজ্জুই রজ্জু-সর্পের উপাদান। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ব্যোম ভিন্ন অন্য কোনও জড় পদার্থ হইতে কিছু উৎপন্ন হইলে উহা বিকৃত হয়। অর্থাৎ উপাদান উৎপন্নে পরিণত হইলে উহা বিকৃত হয়। কিন্তু সর্পের উৎপত্তির জন্য রজ্জুর কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং রজ্জু উহার উপাদান নহে, এবং রজ্জু-সর্প কোনই জড় পদার্থ নহে। উপাদান শব্দের অর্থ চিন্তা

করিলেও রজ্জুকে সর্পের উপাদান বলা যাইতে পারে না। সূত্র বস্ত্রের উপাদান, কাঠ নৌকার উপাদান ইত্যাদি। সুতরাং রজ্জুকে কিছুতেই তথাকথিত সর্পের উপাদান বলা যাইতে পারে না। রজ্জু সর্পের সাময়িক অস্তিত্বও নাই। কারণ, যাহা দেখা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র, উহা কোনও পদার্থ নহে। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞান নহে। মিথ্যা অস্তিত্ব অস্তিত্ব নহে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব জাগতিক নামরূপ কখনও স্বাধীন ভাবে ছিল না বা থাকিতেও পারে নাই। সুতরাং জাগতিক নামরূপ কখনই উপাদান বর্জ্জিত ভাবে থাকে না। সুতরাং উপাদান সহ নামরূপের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে শঙ্কর মতে জগতের উপাদান ব্রহ্মই। সুতরাং জাগতিক পদার্থ সমূহ সত্য। যে পদার্থের উপাদান ব্রহ্ম, তাহা যে মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা সহজবোধ্য। মায়াবাদ কল্পবাদ স্বীকার করেন। কল্পবাদ অনুযায়ী জগৎ নিত্য। বলা হয় যে কল্পান্তে জগৎ ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং কল্পারম্ভে পুনরায় বিকশিত হয়। সুতরাং সমষ্টি-জগতের (universe as a whole-এর) কখনই নিরন্বয় ধ্বংস হয় না। উহা কল্পের পর কল্পক্রমে অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতেছে এবং চলিবে। সুতরাং উহাও নিত্য সত্য। জগতের যে পরিবর্ত্তন, তাহা উপরি উপরি মাত্র। মূলগত (Fundamentally) কোনই পরিবর্ত্তন নাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে Matter and Energy-এর হ্রাস বৃদ্ধি নাই, আকারের মাত্র পরিবর্ত্তন হয়। আবার জাগতিক পদার্থ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, উহার কোন না কোন আকার থাকিবেই। সুতরাং মূলগত ভাবে আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, একটী আকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করে মাত্র, কিন্তু উহার কোনও না কোনও আকার থাকিবেই। অর্থাৎ আকারও নিত্য স্থায়ী। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে এ বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান। যাহা হউক, কল্পবাদ অনুযায়ী দেখা গেল যে জগতের ধ্বংস নাই, উহা নিত্য স্থায়ী। সুতরাং জগৎও ত্রিকালে অবাধিত সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং

মায়াবাদের সংজ্ঞানুযায়ী জগৎ সত্য হইতে বাধ্য। বহু দার্শনিক আছেন যাহারা জগৎকে অনাদি অনন্ত বলেন। মায়াবাদেও সেই মত গৃহীত হইয়াছে। যদি বলেন যে উহা ব্যবহারিক ভাবে মাত্র সত্য, তবে বলিতে হয় যে, যে জগৎ অনাদি অনন্ত, তাহা নিত্য সত্য। জগৎ নিত্য না বলিয়াই উহাকে মায়াবাদে ব্যবহারিক ভাবে সত্য বলা হয়। কিন্তু উহা যখন অনাদি অনন্ত, সুতরাং নিত্য সত্য, তখন "সত্য" শব্দের পূর্ব্বে "ব্যবহারিক" বিশেষণ লোপ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং এই ভাবেও জগৎ মায়াবাদ অনুযায়ী ত্রিকালে অবাধিতসত্য। মায়াবাদ জগৎকে মিথ্যা বলেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। মায়াবশতঃ লোকে ব্রহ্মের স্থলে জগৎ দর্শন করে। মায়ার বিগমে সকলই ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্ট হয়। জগতে বহু মহাজন অবশ্যই ব্রহ্মদর্শন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিযাছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাক্ষ্য দেন নাই যে মায়ার অপগমে জগৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় এবং একমাত্র ব্রহ্মই দৃষ্ট হন। প্রামান্য দ্বাদশখানি উপনিষদে বহু ঋষি বহু সারবান তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু জগন্মিথ্যাবাদ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দুগণ উপনিষদের বক্তাগণকে ঋষি বলেন। কিন্তু তাঁহারাও এইরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি সমূহ মায়াবাদিগণ নিজ মত সমর্থনে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কোথায়ও বলেন নাই যে জগৎ মিথ্যা। তাঁহার দ্বারা কথিত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ভেদাভেদ তত্ত্বই সমর্থন করেন। আচার্য্য রামানুজ উক্ত অধ্যায়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই মৈত্রেয়ীকে প্রকৃত প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যানে জাগতিক পদার্থও বাদ পড়ে নাই। উহাদিগকে অবশ্যই তিনি সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতেন। নতুবা উহাদিগের প্রতি প্রেমের কোনই অর্থ থাকে না। তিনিই অন্য স্থলে ব্রহ্মকে পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অন্য সকল হইতে প্রিয় বলিয়াছেন। এই দুই স্থলের ব্যাখ্যান দৃষ্টে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মকে তিনি প্রেমস্বরূপ এবং জগৎকে

সত্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণও জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি আরুণি কর্ত্তৃক কথিত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি জাগতিক নামরূপকে তুচ্ছ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহাদিগকে মিথ্যা বলেন নাই। আমরাও বলি যে ব্রহ্মের তুলনায় জাগতিক নামরূপ অতি তুচ্ছ বটে, কিন্তু সেই জন্য উহারা মিথ্যা হইতে পারে না। যে বস্তুকে আমরা তুচ্ছ করি, তাহাই মিথ্যা নহে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, যে নামরূপের অবিচ্ছিন্ন উপাদান ব্রহ্ম, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। কেহ কেহ দৃক্ ও দৃশ্য দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না। দ্রষ্টা সত্য, সুতরাং দৃশ্য মিথ্যা। দুইটী সত্য হইতে পারে না। একটী সত্য হইবে, সুতরাং দৃশ্য মিথ্যা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দৃশ্য দ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত ভাবে বিভিন্ন নহে, কিন্তু দ্রষ্টা হইতে উৎপন্ন হইয়া উহা পৃথক, (Distinct) ভাবে প্রতীয়মান হয়। এস্থলে দ্রষ্টা বলিতে আমাদের বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কিন্তু দেহযোগে ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। ব্রহ্ম যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন তিনি ভিন্ন অন্য কোন কিছুরই বস্তু-সত্তা নাই বা থাকিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক্ (Distinct) ভাবে ভাসমান হইলেও সমুদ্রেরই অন্তর্গত, সেইরূপ জগৎও পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহা ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং উহা ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত নহে, কিন্তু জগৎ অন্তর্গত ভাবে ব্রহ্মে চির বর্ত্তমান। Hegelian Philosophy-এর ভাষায় বলা যাইতে পারে যে জগৎ ব্রহ্মেরই Externalisation (বহিঃপ্রকাশ)। সুতরাং দৃক্ ও দৃশ্য বিভক্তভাবে ভিন্ন নহে। দৃক্ ও দৃশ্য যে এক প্রকারের, তাহা তাহাদের কার্য্য দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। উহারা পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারে ও করে। উহারা এক প্রকারের না হইলে, তাহা সম্ভব হইত না। Like alone can act upon like তত্ত্ব সর্ব্ববাদি-

সম্মত। দৃক্ ও দৃশ্যের একটী সত্য ও অন্যটী মিথ্যা হইলে উহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারিত না। সুতরাং দৃক্ ও দৃশ্য উভয়ই সত্য। মায়াবাদ জগন্মিথ্যাবাদের সমর্থনে রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রজ্জু-সর্প সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নহে এবং উহার সাময়িক অস্তিত্বও অস্তিত্ব নহে। উহারা ভ্রমোৎপন্ন। জগৎ সম্বন্ধে বিচারে জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, ভ্রমের বিশ্লেষণে জগতের মিথ্যাত্ব বা সত্যত্ব প্রমাণিত হয় না বা হইতেও পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক জলের ধর্ম্ম জানিতে স্বর্ণের বিশ্লেষণ করে না। কেহই সন্দেশের আস্বাদন পরীক্ষা করিতে কুইনাইন বটিকা জিহ্বার উপর সংস্থাপন করে না। জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বোক্ত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান" তত্ত্বের বিরোধী। সেই সম্পর্কে মহর্ষি আরুণি মৃৎপিণ্ড দ্বারা সমুদায় মৃন্ময় বস্তু, সুবর্ণপিণ্ড দ্বারা সমুদায় সুবর্ণময় বস্তু, নরুণ দ্বারা সমুদায় লৌহময় বস্তু জানিতে পারা যায়, বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা বলেন নাই যে মৃৎপিণ্ড দ্বারা লৌহময় বস্তু জানা যায়। রজ্জু-সর্প ও জগৎ যে এক জাতীয় নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ রজ্জু-সর্প-ভ্রম মাত্র। উহা জাগতিক পদার্থ হওয়া দূরে থাকুক, উহা কোন পদার্থই নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে রজ্জু-সর্পের কোনই উপাদান নাই, কিন্তু জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আছে। উপাদান-বিহীন পদার্থ জগতে নাই। জগতের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের বিচারে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" তত্ত্ব অনুযায়ী যদি জাগতিক পদার্থের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হইত, তবে জগৎ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মৃৎপিণ্ড, সুবর্ণ-পিণ্ড ও নখনিকৃন্তন দ্বারা ক্রমান্বয় মৃন্ময়, সুবর্ণময় ও লৌহময় পদার্থ সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটী মৃৎপিণ্ডের পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত মৃত্তিকার তত্ত্ব লাভ করা যায়। সেইরূপ জাগতিক কোন এক পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে জগতের সত্য তত্ত্ব লাভ করা যায়, কিন্তু জগদাতিরিক্ত মিথ্যার বিশ্লেষণে জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ

করা যায় না। পাঠক বিবেচনা করিবেন যে সম্পূর্ণ উপাদান-হীন সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হইবে যে জগতে অসংখ্য পদার্থ বর্ত্তমান। তাহা ত্যাগ করিয়া মায়াবাদ কেন মিথ্যা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত দিলেন। ইহার কোন সদুত্তর নাই। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্রষ্টব্য। তাহাতে সমুদ্র-তরঙ্গ ও স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপ হইতে সুতরাং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং উহা সত্য। দার্শনিক বিচারে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জগৎ আমরা সত্যভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। মায়াবাদও ইহাকে ব্যবহারিক ভাবে সত্যই বলেন। সুতরাং জগৎ সত্য। আমরা কখনও কখনও এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করি। তাহার কারণ এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও মস্তিষ্ক অপটু (defective)। আমরা সম্পূর্ণরূপে অপূর্ণ ভাবেই জগতে আসিয়াছি। সুতরাং ভুল ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই জন্য সকলেই সর্ব্বদা জগৎ ও জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে ভুল করিতেছে ও চিরকাল ভুল করিবে, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। এই বিষয়টী পাশ্চাত্যদর্শনের Epistomology পর্য্যায়ভুক্ত। উহা অতি বৃহৎ বিষয়। এস্থলে উহার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু সত্যভাবে ইহা সুপ্রমাণিত হইতে পারে যে জগৎ সত্য। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঔপনিষদিক ঋষিগণের মধ্যে কেহই বলেন নাই যে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। বরং ছান্দোগ্য -উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় খণ্ডের প্রথম মন্ত্রত্রয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে মায়া হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই এবং ব্রহ্ম ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই মন্ত্রত্রয়কে মায়াবাদখণ্ডনের মন্ত্রও বলা যায়। কারণ, ইহারা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে জগৎ কিছু না হইতে উৎপন্ন হয় নাই ও হইতেও পারে নাই। মায়ার সৃষ্টি বলাও যাহা, কিছু না হইতে সৃষ্টি বলাও তাহা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বৌদ্ধশূন্যবাদই মায়াবাদের জনক। পঞ্চদশী

মায়াবাদের একখানি বিশিষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। ব্রহ্মজ্ঞানী সম্বন্ধে অর্থাৎ যিনি মায়ামুক্ত হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে উহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ১০০৩ এবং ১০০৫ পৃষ্ঠায় (সোঽহংজ্ঞান) উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকটও জগৎ জগৎ বলিয়াই বর্ত্তমান থাকে। কেবল তাহাই নহে। তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ফল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করেন। সুতরাং "ব্রহ্মজ্ঞানে মায়ার ধ্বংস হয় এবং সেই জন্য একমাত্র ব্রহ্মই দৃষ্ট হন এবং জগৎ শূন্য হইয়া যায়" এই উক্তি সত্য নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কোন ঋষি এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য দেন নাই যে মায়ার অপগমে জগৎ শূন্য হয়। কোন মায়াবাদী ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াও ঐরূপ সাক্ষ্য দেন নাই। অপর দিকে ব্রহ্মদ্রষ্টা পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে সমস্তই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেকটী ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল পদার্থের সত্তায় ব্রহ্মসত্তা প্রতীয়মান হয়। মনে কর, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় একটী নদী দর্শন করিতেছ। নদী পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছ, এখনও সেইরূপ দেখিবে, অধিকন্তু প্রতীয়মান হইবে যে ব্রহ্ম উহাতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। সুতরাং অন্তরেও যেমন ব্রহ্মদর্শন হইতেছে, বাহিরেও তদ্রূপ ব্রহ্মদর্শন হওয়াতে তোমার মুক্তি লাভ হইল (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)"। অতএব ব্রহ্মদ্রষ্টার সাক্ষ্য বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না। জড় জগৎ থাকে, উহার জগত্বের লোপ হয় না। প্রোক্ত নদীর জল জলই থাকে। উহার বিশ্লেষণে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনই পাওয়া যাইবে। জলশূন্য নদী থাকে না। এস্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বব-স্থিতঃ॥ (৯।৪)" (৫০৫ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানা-বস্থায় জগৎ-সত্তা যে ওতপ্রোত ভাবে থাকে, ইহা অযৌক্তিক নহে। অতএব আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ

শূন্য হয় না। সুতরাং জগন্মিথ্যাবাদ সত্য হইতে পারে না। মায়াবাদে সৃষ্টির প্রধান কারণ এই যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার ও অদ্বৈত রাখিতেই হইবে। পরিণামবাদে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া মায়াবাদ মনে করেন। মায়া ও তজ্জাত বিবর্ত্তবাদ দাঁড় করিতে পারিলেই ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় ও নির্ব্বিকার রক্ষা করা যাইতে পারে মনে করিয়াই মায়াবাদের সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে বিশেষতঃ "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন, তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও দেখা গিয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই আলোচনার সহিত ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্বের কোনই বিরোধ নাই, বরং ঐক্য বর্ত্তমান। মায়াবাদ দ্বারা স্বীকৃত তত্ত্ব যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহাও উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কঠিন সমস্যার উহাতে সরল, প্রাঞ্জল ও যুক্তিযুক্ত সুমীমাংসা বর্ত্তমান। অতএব আমরা মায়াবাদেরই স্বীকৃতিতে নানাবিধ উক্তির বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে জগৎ মিথ্যা নহে। এখন জগন্মিথ্যাবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। মায়াবাদ বলেন যে রজ্জুতে সর্প-দর্শনের ন্যায় এই জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি। ইহার বিরুদ্ধে প্রথমতঃই বলিতে হইবে যে এই মত যে শ্রুতি-বিরোধী, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বহু স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি এই মত সত্য হয়, তবে আমাদের দেহ অর্থাৎ জড়জাত যাহা কিছু, তাহাই মিথ্যা। এমন কি, আমাদের অন্তঃকরণ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকারও মিথ্যা। সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই মিথ্যা। অতএব কোন শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অন্যান্য মতের ন্যায় মায়াবাদও মিথ্যা। সর্ব্বত্রই মায়ার খেলা। সুতরাং মায়াবাদও মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। সকলই যখন রজ্জু-সর্পের ন্যায় মিথ্যা, তখন মায়াবাদও সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে না, কিন্তু সত্য-

জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা। সুতরাং জগতের সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা। অতএব কোন শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সম্ভাবনা নাই। কোন এক দেশের কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে তাহার নিজের দেশের সকল লোকই মিথ্যাবাদী। একজন রহস্যপ্রিয় ন্যায়বাদী (Logician) তাহাকে বলিলেন যে "ক নামক দেশের সকল লোক মিথ্যাবাদী। আপনি সেই দেশেরই একজন লোক। অতএব আপনিও একজন মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ আপনার উক্তিও মিথ্যা।" উক্ত প্রণালী অনুসারে বলা যায় যে জগৎ যখন মিথ্যা, তখন পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় মায়াবাদীর যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত, অনুমান ও সিদ্ধান্ত সকলই মিথ্যা। অতএব আমাদের পথ প্রদর্শনের কোন উপায় রহিল না। এই জন্যই Dr. Edward Caird তাহার Essay on Idealism and Theory of Knowledge-এ বলিয়াছেন :—"The denial of the reality of the material world will inevitably lead to the denial of the reality of any other world (i.e. God) at all." "অর্থাৎ জড় জগতের সত্যতা অস্বীকার করিলে আমাদিগের বাধ্য হইয়া ব্রহ্মের সত্যতাও অস্বীকার করিতে হইবে।" বৃহদারণ্যকে উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পাঠক দেখিবেন। "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।" (২।৪।১০)। "বঙ্গানুবাদ :—যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তেমনি, অয়ি মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্ সমূহ, শ্লোক সমূহ, সূত্র সমূহ, অনুব্যাখ্যান সমূহ, ব্যাখ্যান সমূহ—এই সমুদায়ই সেই মহাভূত হইতে নির্গত হইয়াছে—এ সমুদায়ই তাঁহার হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" মায়াবাদী উক্ত মন্ত্রে বিশ্বাসী। বেদান্তদর্শনের "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যানে

আচার্য্য শঙ্কর তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উক্ত সূত্রের দুইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমটী পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি মন্ত্রে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমাদের নিকট সিদ্ধান্ত আসিবে যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বেদ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎভাবে যাহা উৎপন্ন, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আর হিন্দুগণ কোন অর্থেই বেদকে মিথ্যা বলেন না। সুতরাং ইহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের (সকল শাস্ত্রই মিথ্যার) সম্পূর্ণ বিরোধী।* দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে বেদই ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র হেতু। কিন্তু মিথ্যা বস্তু দ্বারা আমরা সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মকে কেমনে জানিব? ইহা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে (মায়াবাদের ভাষায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-বিরোধী আবরণ উন্মোচন করিতে হইলে) মায়াবাদের শাস্ত্রানুযায়ী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্র, দেহ ও অন্তঃকরণের (সমস্তই মায়াবাদে মিথ্যা) আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যার আলোচনায়ও আমরা পাইলাম যে ব্রহ্মোপদেশ যুক্ত বেদ মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।২ মন্ত্রে ব্রহ্মকে সত্য-সঙ্কল্প বলা হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে শ্রুতির বহু মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম আলোচনা করিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্মের কার্য্য মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ যখন ব্রহ্মেরই কার্য্য, তখন জগৎও মিথ্যা হইতে পারে না। আবার ব্রহ্মকে সত্যকামও বলা হয়। সেই সত্যকাম ব্রহ্মের সত্য কামনায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। (সোহকাময়ত ইত্যাদি)। সুতরাং সেই সত্য কামনার ফলে যে কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে

* আচার্য্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বেদকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই আমরা বেদের কথাই উল্লেখ করিলাম।

না।** অতএব জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে সত্য-স্বরূপ, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মায়াবাদও ইহা স্বীকার করেন। মায়াকে ব্রহ্মের একমাত্র শক্তি বলিয়া মায়াবাদে কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে শক্তি শক্তিমানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে এবং শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি চালিত হইতে পারে না। সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা যে কেহ ধারণা করিতে পারেন। অতএব জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। দর্শন শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বলিয়া কথিত হয়। আমরা সকলেই জগতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই কার্য্যে সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান সকলেই এক পর্য্যায় ভুক্ত। এই জগতে বাস করিয়াই মানবগণ জীবন যাপন করিতেছে, এই জগতে বাস করিয়াই প্রকৃতির সাহায্যে জ্ঞানী কত আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য লাভ করিতেছেন, এই জগতে বাস করিয়াই এই জগতের সাহায্যে আজ মানববৃন্দ কত অদ্ভুত কার্য্য নিচয় সম্পাদন করিতেছেন—পৃথিবীর সর্ব্বদিকে কত উন্নতি সাধন করিতেছেন, এই জগতে বাস করিয়াই সাধকগণ কত প্রকারের ও কত অধিক পরিমাণে আত্মোন্নতি লাভ করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়াও কি বলিতে হইবে যে জগৎ মিথ্যা? আমরা কি প্রকারে জ্ঞান লাভ করি? ইহার বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে একদিকে আমি ও অন্যদিকে বহির্জগৎ। Subject and Object উভয় মিলিত না হইলে মানবের জ্ঞান লাভ হয় না (ক)। সুতরাং প্রকৃতি ভিন্ন আমাদের পার্থিব জ্ঞানলাভের উপায় নাই। অন্য ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে অনন্ত জ্ঞানাধার প্রকৃতি-নাথ প্রকৃতিকে এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে আমরা তাহা হইতে বহু বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এমন কি ধর্ম্ম-

---

** এই কামনা ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র, কিন্তু সাধারণের বিদিত কামনা বাসনা নহে। ইহা আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি।

(ক) এস্থলে Empirical Knowledge-কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা তাহা হইতে জানিতে পারি। প্রকৃতির যদি সেইরূপ শিক্ষা দিবার শক্তিই না থাকিত, তবে প্রথম-জাত মানবকুল ও বর্ত্তমান মানবগণে কোনই পার্থক্য থাকিত না। মানবই প্রকৃতি-নিহিত জ্ঞান অনুসন্ধান করিতে করিতে আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য "গুণ-বিধান" অংশে এবং অন্যান্য স্থলে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে প্রকৃতি আমাদিগকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি বলিয়া দিতে পারেন, তাহার একটু মাত্র আভাস পাওয়া যাইবে। "পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি, অশনি প্রকাশে অসীম শকতি, বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি, চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল। উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল, মরিচীকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল, শিশির কহিছে তুমি নিরমল। পুষ্প কহে তুমি চির শোভা-ময়, মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়, গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়, ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল। নদী কহে তুমি তৃষ্ণা নিবারণ, বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন, নিশিথিনী কহে শান্তি নিকেতন, প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল। জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর, মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর, সতী-প্রেমে জানি তুমি সুমধুর, বিভীষিকা কহে পাপী অসরল। অনু-তাপী কহে তুমি ন্যায়বান, ভক্ত কহে তুমি আনন্দনিধান, সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্য পান, প্রকাশে তোমারি করুণা অতল। (ভক্ত রজনী-কান্ত)।" আমরা ধর্ম্মের তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে জাগতিক দৃষ্টান্তই দিয়া থাকি, তাহা যতই অসম্পূর্ণ হউক্ না কেন, অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দেই না বা দিতে পারি না। জগৎকে বাদ দিলে ধর্ম্ম শিক্ষা কেন, কোনই শিক্ষাই সম্ভব নহে। ব্রহ্মকে প্রকৃতি-নাথ বলিলে সেই সিদ্ধান্তকে কেহ কেহ anthropomorphism বলেন, তাহাদের সেই উক্তি ভূল। কারণ, anthropomorphism অর্থে Representation of the Diety in the form of a man or with bodily parts, the ascription to the Diety of human affections and passions. অর্থাৎ দেবতার মনুষ্যাকারে অথবা

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ চিত্র। তাহার প্রতি মনুষ্যোচিত মায়া মমতা ও রিপু সমূহের আরোপ। অর্থাৎ দেবতাকে মনুষ্যভাবে চিন্তা ও সেই মানুষ-রূপ দেবতার কখন মোহ, কখন কাম, কখন ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্যের আরোপ। পাঠক দেখিবেন যে বর্ত্তমান গ্রন্থে যে অর্থে ব্রহ্মকে প্রকৃতি-নাথ বলি, তাহা কখনও anthropomorphism হইতে পারে না। তাঁহার আরও মনে রাখিতে হইবে যে মানবে ও প্রকৃতিতে যে সকল সরল গুণের আভাস দেখি, তাহাই পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবে ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধে "ইচ্ছাশক্তি" অংশে আলোচনা আমরা স্মরণ করি। পরমাণুতে এবং বিশ্বে যেমন পার্থক্যের পরিমাণ অত্যধিক, তেমনি সাধারণ জীবের গুণ ও ব্রহ্মের গুণের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ব্যবধান। জীবের গুণ দেখিয়া ব্রহ্মের সেই গুণ আছে, ইহা সত্যভাবে অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু সেই অতুলনীয় গুণের সম্পূর্ণ সত্তা ধারণা করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মের গুণরাশি নিত্যই তাঁহাতে কারণাকারে বর্ত্তমান, আর জীবের গুণরাশি অনেকটা স্থূলাকারে প্রকাশিত হয়, জীবের গুণ ক্ষুদ্র এবং অপূর্ণ, আর ব্রহ্মের গুণরাশি অনন্ত এবং সম্পূর্ণ, ব্রহ্মের গুণরাশি বিশুদ্ধ, কিন্তু জীবের গুণ বিকৃত। জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় আছে সত্য। উহা এককালে ছিল না ও এককালে থাকিবে না, ইহাও সত্য। কিন্তু উহা যতকাল আছে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব লোপ করে কে? সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের উপাদানত্বে যাহা প্রস্তুত, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ইহাকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এখন প্রশ্ন হইবে যে যে জগৎ যদি উক্ত কারণে সত্য সাব্যস্ত করিতে হয়, তবে উহা নিত্য সত্য হইবে, কিন্তু উহা কখনই আদি-অন্ত-বিশিষ্ট সত্য অর্থাৎ অনিত্য সত্য হইতে পারে না। সত্যের একটী অর্থ নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য সত্য-স্বরূপ। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের বলিতে হইতেছে যে মায়াবাদে সৃষ্টিকে অনাদি অনন্তই বলা হয়। সুতরাং মায়াবাদী কখনও উক্ত কারণবশতঃ সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিতে পারেন না। কারণ, মায়াবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি নিত্য। এখন

আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমরা সৃষ্টিকে সাদি ও সান্ত বলি অর্থাৎ অনিত্য বলি, কিন্তু উহাকে সত্যও বলি। আবার এই আদিত্ব ও অন্তত্ব এত দূরবর্ত্তীকালে হইয়াছে ও হইবে যে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। এই জন্যই যে সৃষ্টিকে নিত্যা বলা হয়, তাহা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎও for all practical purposes নিত্য সত্য। আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে যে বিশ্ব সৃষ্ট। সুতরাং উৎপন্নের মধ্যে উৎপাদকের গুণ কিছু কিছু থাকিবে বটে, কিন্তু কিছু কিছু বিভিন্নতাও থাকিবে। উৎপন্ন কখনও হুবহু উৎপাদক হইতে পারে না। Product must always fall short of the original. ইহা যে সত্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে বিশেষতঃ "ইচ্ছাশক্তি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে তিনি বহু হইবেন। ইহা উপনিষদেরই উক্তি। এক যখন বহু হইয়াছেন, তখন সেই বহুর প্রত্যেকটী সেই এক হইতে ক্ষুদ্রতর বা সীমাবদ্ধ। ইহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে লিখিত আলোচনা পাঠে জানিতে পারা যাইবে যে প্রত্যেক জীব ও জগৎ সীমাবদ্ধ এবং সকলেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মের বহু হওয়ার অর্থ তিনি বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু ব্রহ্ম হন নাই। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আমরা সৃষ্ট সসীম পদার্থ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিত্য সত্য পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত অপার হইয়াও কালব্যাপ্ত অর্থাৎ কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ অনিত্য জগতের সৃষ্টি করিতে পারেন। মায়াবাদীও বলেন যে তাঁহাদের সগুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের মায়োপহিত এক চতুর্থাংশ। সুতরাং ব্রহ্ম অনন্ত হইয়াও যে সীমাবদ্ধ পদার্থ সৃজন করিতে পারেন, তাহা মায়াবাদ অনুযায়ীও বুঝিতে পারা যায়। আমরা যদি আরও গভীরতর ভাবে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে জড়জগতের মূলে ব্রহ্মের নিত্য অব্যক্ত-স্বরূপ। উঁহাকেই তিনি তাঁহার মহীয়সী শক্তিসম্পন্না

ইচ্ছা দ্বারা জড় জগৎরূপে পরিণমন করিয়াছেন। সুতরাং জড় জগতের উপাদান ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ এবং নিমিত্ত কারণ তাঁহার ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং জড়-জগতের অর্থ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ + তদুপরি ব্রহ্মকৃত কারুকার্য্য সমূহ। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" ও "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আমরা ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সৃষ্টির আদি ও অন্ত আছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে সৃষ্টি নিত্যা নহে। প্রকৃতপক্ষেও সৃষ্টি অনিত্যা। এখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে জড়জগতের এক অংশ এবং তাহাই মূল অংশ এবং প্রধান অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ নিত্য সত্য। উহার কোন লয় বা ক্ষয় হয় নাই বা হইতেও পারে না। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু "উঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অখণ্ড স্বভাববশতঃ উঁহার প্রকৃত পক্ষে কোনই বিকার হয় নাই। মহাপ্রলয় অন্তেও অব্যক্ত-স্বরূপ থাকিবে। সুতরাং জড় জগতের মূল এবং প্রধান অংশ ছিল, আছে ও থাকিবে। সুতরাং উহা নিত্য সত্য।" এখন প্রশ্ন হইবে যে সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের নিত্যা ইচ্ছা দ্বারা কি প্রকারে নিত্য অব্যক্ত-স্বরূপের উপর অনিত্য কারুকার্য্য সংঘটিত হইল। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ব্রহ্মে নিত্যা ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান আছে, ইহা সত্য। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কখনই ক্ষণস্থায়িনী নহেন। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছার আদি ও অন্ত আছে। সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছা ব্রহ্মের অনন্ত ও নিত্য ইচ্ছার একটী প্রকার মাত্র। ইহা বিশদ ভাবে বুঝিতে মানবের ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, কিন্তু সেই ইচ্ছারও প্রকার ভেদ আছে। আবার আমাদের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াই আমরা সর্ব্বদা ইহার প্রয়োগ করি না। আমাদের গমন করিবার ইচ্ছা হইলে আমরা গমন করিতে পারি, কিন্তু আমরা গমন করিবার

জন্য সর্ব্বদাই ইচ্ছা করি না। সেইরূপ আমাদের আহার করিবার ইচ্ছা হইলে আমরা আহার করিতে পারি বটে, কিন্তু আহার করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করি না ইত্যাদি। ব্রহ্মের ইচ্ছাও সেইরূপ নিত্যা হইয়াও উঁহার প্রকারভেদ আছে এবং সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছা তাঁহার অনন্ত ও নিত্যা ইচ্ছার একটী প্রকার মাত্র, যেমন সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা ও জিহীর্ষা সৃষ্টি-বিষয়িণী এক সুমহতী ইচ্ছার প্রকার ভেদ মাত্র। আবার তাঁহার নিত্যা ইচ্ছা আছে বলিয়াই যে তিনি নিত্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারও কোনই অর্থ নাই। তাঁহার ইচ্ছার মধ্যেই কার্য্য করিবার ও না করিবার উভয়বিধ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। তিনি যখন সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই মহা-শুভ মূহূর্ত্ত হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশ চতুষ্টয়ে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে ব্রহ্মের নিত্যা ইচ্ছাশক্তি হইতে অনিত্যা সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি-জাত বিশ্বের অংশ সম্ভব হইতে পারে। একটী উপমা দ্বারা এই তত্ত্বটীকে সরল করা যাইতেছে। অকূল মহা-সমুদ্রের একটী উর্ম্মির যেমন আদি-অন্ত আছে, সেই অনন্ত ইচ্ছা-সিন্ধুতে তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িনী ইচ্ছাও সেইরূপ একটী উর্ম্মি বই আর কিছুই নহে। এই বিশেষ ইচ্ছা চিরস্থায়িনী বটে, কিন্তু নিত্যা নহে। এই বিশেষ ইচ্ছা অনাদি অনন্ত না হইলেও ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে উঁহার আদি-অন্ত ধারণা করা মানব-সাধ্য নহে। এই জন্যই এই বিশেষ ইচ্ছাকে এবং সৃষ্টিকে নিত্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা নিত্যা নহে, যদিও ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নিত্যা। জগতের দুইটী কারণ—উপাদান ও নিমিত্ত। দেখা গেল যে উপাদান কারণ নিত্য এবং নিমিত্ত কারণ অনিত্য। নিমিত্ত কারণ ইচ্ছাশক্তি জগতের মাতৃস্থানীয়া। সুতরাং জগৎ যে অনিত্য হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমরা "ইচ্ছাশক্তি" অংশে দেখিয়াছি যে সৃষ্টি-কার্য্যে অব্যক্তের শক্তি অপেক্ষা ইচ্ছার শক্তি বলবত্তরা। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশরূপ কোন

কার্য্য ছিল না, অর্থাৎ তখন তাঁহাতে সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছার তখন উদয় হইয়াছিল না। সেই ইচ্ছাশক্তিকে কেহ কেহ ইচ্ছা মাত্র বলেন অর্থাৎ যখন ইচ্ছার কার্য্য হয়, তখনই উহাকে ইচ্ছাশক্তি আখ্যা দেওয়া কর্ত্তব্য। আবার যখন ইচ্ছার কোন কার্য্য হয় না, তখন উঁহাকে ইচ্ছা মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়। চিন্তা করিলে উভয়ই এক। উভয় অবস্থায়ই শক্তি বর্ত্তমান থাকে। এক অবস্থায় শক্তির ব্যবহার নাই, অন্য অবস্থায় শক্তির ব্যবহার বর্ত্তমান, এই মাত্র প্রভেদ। আমাদের ইচ্ছা-শক্তির বিশ্লেষণে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, কিন্তু কখনও উহার কার্য্য হয় এবং কখনও উহা কার্য্যবিরহিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য। কার্য্য মাত্রই সাদি ও সান্ত। কার্য্য কখনও অনাদি অনন্ত অর্থাৎ নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য যে অনিত্য হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কার্য্য কেন অনিত্য হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত অংশ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কোন না কোন এক প্রকার ইচ্ছার ফল। ইচ্ছা যদিও নিত্যা, তথাপি বিশেষ কার্য্য-জননী ইচ্ছা সেই নিত্যা ইচ্ছার প্রকার বিশেষ মাত্র কিন্তু উঁহা নিত্যা নহে। সাংখ্যমতের সৎকার্য্যবাদ আমাদের অনুমোদিত নহে। উপাদান ও নিমিত্ত কারণ যোগে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কেবল উপাদানে কার্য্য হয় না, আবার কেবল নিমিত্তেও কার্য্য হয় না। উভয়ের মিলনেই যখন কার্য্যের উৎপত্তি এবং উভয়ের মিলন যখন নিত্য, নহে, তখন কার্য্য সৎ অর্থাৎ নিত্য হইতে পারে না। এখন মন্তব্য হইতে পারে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি যখন নিত্যা এবং অব্যক্ত গুণও নিত্য তখন সৃষ্টিকে নিত্য বলিলেই সমস্যার সুমীমাংসা লাভ হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমাদের বলিতে হইবে যে তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা নিবেদন করিতেছি। মায়াবাদে সৃষ্টিকে অনাদি ও অনন্ত বলা হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে সেই মতেও সৃষ্টি সাদি ও সান্ত। সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলেও

এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। মায়াবাদী কল্পবাদ স্বীকার করেন। কল্পবাদ স্বীকৃত হইলেই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এক কল্পান্ত ও অন্য কল্পারম্ভের মধ্যে সৃষ্টি থাকে না। সুতরাং সৃষ্টি সাদি ও সান্ত, নিত্য নহে। যদি বলেন যে সৃষ্টি অব্যক্তে সূক্ষ্মভাবে থাকে, তবে বলিতে হয় যে অব্যক্ত-স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপ নিত্য। উঁহা তখন স্বমহিমায় বর্ত্তমান থাকেন। ব্রহ্মের ইচ্ছাজনিত কারুকার্য্য সমূহ উঁহাতে থাকে না বা থাকিতেও পারে না। এই সম্বন্ধে কল্পবাদ অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবার জগতে অসংখ্য প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। কোন কার্য্যকেই আমরা নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং জগৎ-রূপ কার্য্য অথবা তদন্তর্গত কার্য্য সমূহ নিত্য নহে। অতএব প্রস্তাবিত মীমাংসা দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের (নিত্য ইচ্ছা দ্বারা অনিত্য কার্য্য কেন হয় তাহার) সদুত্তর লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইবে। উহা যুক্তিযুক্ত বটে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি নিত্যা হইলেও তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছা সাদি ও সান্ত। আমরা "ইচ্ছাশক্তি" অংশে দেখিয়াছি যে জড় জগৎ গঠনে সেই বিশেষ ইচ্ছারই শক্তি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি অব্যক্তকে তাঁহার সুমহতী প্রেমলীলার উপযোগী-ভাবে পরিণমন করিয়াছেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে অব্যক্ত গুণ হইতে ইচ্ছাশক্তি বলবত্তরা। সুতরাং সেই চিরস্থায়িণী ইচ্ছা দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ জড় জগৎ, তাহাও চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু কখনও নিত্য নহে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে জড় জগতের অর্থ তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপ + তদুপরি তাঁহার ইচ্ছাজনিত কারুকার্য্য সমূহ। সুতরাং জড় জগতের অস্তিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছা বর্ত্তমান। অতএব জড় জগতের অস্তিত্ব সেই বিশেষ ইচ্ছার উদয়ের মহাশুভ মুহূর্ত্ত হইতে উঁহার সংহরণের শেষ মহাশুভ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। সুতরাং নিত্য সত্য পরমপিতার বিশেষ ইচ্ছা হইতে অনিত্য

জড় জগতের উৎপত্তি অসম্ভব বিবেচনা করিবার অবসর নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে সত্য শব্দের নিরুক্তে দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম নিত্য ও অনিত্য উভয়কে নিয়মন করেন বলিয়া তাঁহাকে সত্য-স্বরূপ বলা হয়। সুতরাং জগৎ অনিত্য হইলেও যে সত্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইল যে জড় জগতের জননী অর্থাৎ অনন্ত অনন্ত অনন্ত ও নিত্য ইচ্ছাময়ের নিত্যা ইচ্ছাসম্ভূতা সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছা অর্থাৎ বিবংহয়িষা অনিত্যা কিন্তু সুচিরস্থায়িণী বলিয়া জড় জগৎও অনিত্য কিন্তু সুচিরস্থায়ী হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপ সহযোগে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টিরূপ কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-দ্বয়ের মধ্যে একটী নিত্য ও অন্যটী অনিত্য বিধায় উহার একাংশ অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাজনিত অংশ অর্থাৎ নামরূপ অর্থাৎ কারুকার্য্য সমূহ অনিত্যই হইয়াছে। আবার আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এই বিশেষ ইচ্ছার আদি ও অন্ত আছে বটে, কিন্তু উহা এত দূরবর্ত্তী-কালে হইয়াছে ও হইবে যে উহাকে নিত্যা বলিলে এবং সৃষ্টিকেও নিত্যা বলিলে কোনও বিশেষ practical ত্রুটী হয় না। সৃষ্টির আদি-অন্ত মানবের অধার্য্য। এই সম্পর্কে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশ দ্রষ্টব্য। মায়াবাদী কি প্রকারান্তরে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? তিনি কি জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে বলেন না? তিনি বলেন যে ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রাপ্ত-সাধক দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক ভাবে জাগতিক ব্যাপার সংসাধন করেন। এই সম্বন্ধে "সোঽহং জ্ঞান" অংশে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মের অর্থ কি? জড় জগতের সহিত যুক্ত হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সুতরাং আমাদের সকল কর্ম্ম ও চিন্তাই মিথ্যা। কিন্তু মায়াবাদ অনুযায়ী প্রারব্ধ কর্ম্ম (যাহাও সেই মতে নিশ্চয়ই মিথ্যা) এতই বলবান যে ব্রহ্মজ্ঞান—সোঽহংজ্ঞান লাভ হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ মিথ্যার এতই বলবতী শক্তি যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও সেই মিথ্যার শক্তিতে অভিভূত হইতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্যের ন্যায়

তাঁহার দেহান্ত পর্য্যন্ত উহার ফলভোগ করিতে হইবে। মায়াবাদী জগৎকে মিথ্যা বলেন, কিন্তু উহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কি আমাদিগকে মিথ্যার সহিত আপোষ নিষ্পত্তি (Compromise) করা হয় না? উক্ত উপদেশ মত চলিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই দুই ভাবে চলিতে হয়। তাহা কি সাধনার অবস্থার প্রতিকূল নহে? অর্থাৎ মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়াও সত্য বলিয়াই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবিরূপে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, কেহই, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্ত-সাধককেও যখন মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যবহার মানিয়া জগতের সহিত চলিতে হয়, তখন সাধারণ মানব বা অল্পোন্নত মানবের পক্ষে জগৎ পদে পদে সত্য বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ কপট ব্যবহার ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কতদূর ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয় অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ মিথ্যা নহে। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে হিন্দুশাস্ত্র-লিখিত প্রতীক-উপাসনা দ্বারা মানব ক্রমশঃ নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই প্রতীক-উপাসনার বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি পাই? একটী জড়-পদার্থ, অন্যটী তন্নিহিত ভাব বা ভাবরাশি। ধরা যাউক্ জড়-সূর্য্যের পূজা। সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়। উহার এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় এবং তাঁহারই সেই অনন্ত জ্যোতির যৎকিঞ্চিৎ আভাসে সূর্য্য জ্যোতিষ্মাণ। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ (কঠ—২।২।১৫)।" (বঙ্গানুবাদ: (সোহহংজ্ঞানঅংশে) ১০২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। পাঠক আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে বুঝিবেন যে ব্রহ্মের জ্যোতিঃতে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়। কেবল তাহাই নহে। তিনি আরও জানিতে পারিবেন যে সূর্য্যের **Ultra Violet Rays, X' Rays, Radium Rays** মানব দেহের ক্ষয়কারী ক্ষতস্থান যেমন নিরাময়, সুস্থ ও সবল করিয়া স্বাভাবিকত্বে পরিণমন করে, তেমনি

ব্রহ্মজ্যোতিঃ সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল দোষপাশরাশি লয় করে। অতএব উক্ত ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে জগৎ ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের উন্নতি করিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দীক্ষারূপ জন্মের মাতা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা (বিশিষ্ট জ্ঞান)। অথচ এই জগতই, যাহা আমাদের সত্য-জ্ঞান দানের সাহায্য করে, মায়াবাদ অনুযায়ী মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ মায়া অর্থাঃ অবিদ্যা অথবা অজ্ঞান অথবা অন্ধকার জ্ঞান সাধিকা সৃষ্টির কর্ত্রী। ইহা হইতে অধিকতরা আশ্চর্য্য কল্পনা আর আছে কিনা, তাহা জানি না। পাঠক গভীর ভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে অসত্য কখনও সত্য-স্বরূপের নিকট পৌঁছাইতে পারে না, অন্ধকার কখনও অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় পরম-পুরুষকে প্রকাশ করিতে পারে না, অজ্ঞান-অন্ধকার (মায়া) কখনও অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। সুতরাং মিথ্যা জগৎ কখনও সত্য-স্বরূপ লাভের কারণ হইতে পারে না। মায়াবাদী জগৎকে স্বপ্নও বলেন। ইহার উত্তরে পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে জগৎ স্বপ্ন নহে। "এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ বলেন যে, 'তোমরা যাহাকে জাগরণাবস্থা বলিতেছ, উহাও স্বপ্ন। কারণ, স্বপ্ন যেমন অলীক, তোমরা যে বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নদী, গৃহাদি দর্শন করিতেছ, এসকলও তদ্রূপ অলীক, মায়াপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লক্ষিত হইতেছে। মায়াত্যাগ হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে'।" "মানিলাম এ জাগরণাবস্থা স্বপ্নাবস্থা; কিন্তু স্বপ্নে জাগরণাবস্থায় লক্ষিত পদার্থের কোনও না কোন বিষয় যখন অনুভূত হয়, তখন এই জাগরণখ্যাত স্বপ্নের জাগরণাবস্থা অবশ্যই আছে, বলিতে হইবে। অথচ তাহা অনুভূত হইতেছে না, তখন এই জাগরণাবস্থাকে স্বপ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।" "আরও দেখ যদি এই জাগরণকে স্বপ্ন বলিতে হয়, তবে এই জাগরণ তোমার মতে যে জাগরণের স্বপ্ন, তাহাও যে অন্য জাগরণের স্বপ্ন নহে, তাহাই বা কিরূপে বলিবে? এইরূপে ক্রমশঃ

জাগরণের জাগরণ ও তাহার জাগরণ ইত্যাদি স্বীকারে অনবস্থা নামক মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং এ জাগরণ প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন নহে। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)" পঞ্চদশী হইতে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি। "মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিনু। লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্তদীক্ষ্যতাম্॥ ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা। সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে॥ স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্। মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ॥ নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ। অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥ দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বী.র্য্যোণোৎপাদিতাঃ কথম্। কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্॥ বীর্য্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া। অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধ্যাবীর্য্যতঃ॥ ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব। অতএব মহান্তোহস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্॥ এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং। রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরম্॥ পর্য্যায়েন শিশুত্বযৌবনজরারোগৈরণেকৈর্বৃতং। পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥ দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্। ক্ব ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু॥ (৬।১৪০-১৪৮)।" "বঙ্গানুবাদ:—"যদি বল মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষ না ক.রিয়া তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করিব, তাহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, যদি মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমতঃ মায়ার লোক প্রসিদ্ধ যে লক্ষণ, তাহা আলোচনা কর। সে লক্ষণ এই যে যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অথচ স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এরূপ যে সকল ইন্দ্রজালিক ব্যাপার, তাহাকেই লোকে মায়া বলে।" "এই চরাচর জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত দেখিতেছি, কিন্তু কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না, অতএব পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা কর, এই জগৎ মায়াময় কিনা?" "যদি সমস্ত পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই জগতের কোন এক বস্তুর তথ্য নিরূপণ করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি কোনও না কোনও

পক্ষে অবশ্যই তাহাদের অজ্ঞান প্রকাশ পাইবে এবং তাহার তথ্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন।" "(মনে কর) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বীর্য্য দ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সকল কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা তাহাতে চৈতন্য সম্বন্ধ হয় ? তুমি ইহার কি উত্তর দিবে ?" "যদি উত্তর কর—বীর্য্যেরই এই প্রকার স্বভাব, তাহা তুমি কিরূপে নিশ্চয় করিতে পার এবং অন্বয় ব্যতিরেক বলিবে, বন্ধ্যা পুরুষের বীর্য্যে তাহারও তভঙ্গ দেখিতেছি।" "অতএব অবশেষে জানিনা বলিয়া তোমাকে অবিদ্যার শরণাপন্ন হইতেই হইবে. এই জন্য মহৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অবিদ্যার ইন্দ্রজালত্ব এবং জগতের ঐন্দ্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।" "ইহা হইতে অপর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আর কি আছে যে গর্ভস্থিত একবিন্দু রেতঃ চেতন প্রাপ্ত হইয়া হস্তপদ প্রভৃতি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হয়, এবং পর্য্যায়ক্রমে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দশাগ্রস্ত হয় ও নানা প্রকার রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, আর দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, ভোগ করে ও গমনাগমন করে।" "দেহের ন্যায় বটবৃক্ষাদির অতি ক্ষুদ্রবীজও বিচার পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখ যে কোথায় সেই ক্ষুদ্রতম বীজ, আর কোথায় বা প্রকাণ্ড বৃক্ষ। অতএব তাহা যে মায়া ইহা নিশ্চয় কর।" মায়া সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কয়েকটীতে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে সরল ভাবে বলিলেই হয় যে সৃষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। অর্থাৎ তাহা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় (unknown or unknowable) এবং মায়াবাদের অর্থই এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব অবিজ্ঞেয়। ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় সত্য, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় নহেন। এই সম্পর্কে কেনোপনিষদের ২।২ মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সাধক ব্রহ্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে—উত্তমরূপে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥" "বঙ্গানুবাদ : আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি। আমি

যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানিও যে এমনও নহে। 'আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানিনা যে এমনও নহে'—এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন। (তত্ত্বভূষণ)।" পরব্রহ্ম তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের নিকট তাঁহার স্বরূপ সমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ করেন, তাঁহার তত্ত্ব ভক্তকে জানান, যিনি ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার সত্য-জ্ঞান যাচ্ঞা করেন, পরম দয়াল পরমপিতা তাঁহার জ্ঞান-পিপাসু সন্তানের প্রার্থনা পূরণ করেন। সুতরাং জ্ঞানজ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল হৃদয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে ও হয়। নতুবা যে সকল সৃষ্টিতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদায়ই সমগ্রভাবে কল্পনা মাত্র বলিতে হয়। মায়াবাদীও তাহা স্বীকার করিবেন না। সৃষ্টিতত্ত্বের সরল ও প্রাঞ্জল মীমাংসা আছে, আমরা তাহাই অনুসন্ধান করিব। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে মায়া বলিয়া থামিলে আমাদের সত্যজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞান লাভের মূলে সংশয়। অনন্ত জ্ঞানময়ের রাজ্যে অজ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই। যখন ভগবৎ কৃপায় তাঁহাকেই জানা যায়, তখন তাঁহার তত্ত্ব সমূহ জানা যাইবে না, ইহা হইতেই পারে না। জগৎ এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত ও জাগতিক প্রায় প্রত্যেক ব্যাপার এত জটিলতা পূর্ণ যে উহার প্রকৃত তত্ত্ব অনেকেই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন না। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ইহার গঠন কতই জটিল। এক দেহ সম্বন্ধে কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইল, কত চিকিৎসা-শাস্ত্র রচিত হইল ও হইতেছে। কিন্তু এখনও ইহার সম্বন্ধে শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেল না, অথবা শীঘ্রও সেইরূপ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যে অসম্ভব, তাহা স্থির নিশ্চয়। জগতের জটিলতার জন্যই অসংখ্য প্রায় দার্শনিক মত সৃষ্ট হইয়াছে। যথা—Agnosticism, Monism, Dualism, Plularism, Idealism, Realism, Atheism ইত্যাদি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একই উপনিষদের উপর নির্ভর করিয়া বহু বহু মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য,

মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্যের এক একটী মত। ঐ সকল মত ভিত্তি করিয়া আবার বহু বিভিন্ন মত গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পাশ্চাত্য দেশেও নানামত আছে। বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন এক, অথচ তাহা হইতে তিনটী প্রধান মত উত্থিত হইল। আবার এক দর্শন বহু দর্শনের মত খণ্ডন করিতেছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মত সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। অন্ততঃ জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ কোন একটী বিশেষ মতকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু একথাও সত্য যে সৃষ্টিতত্ত্ব একটী এবং তাহা সত্য। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে তবে কি আমরা নিরাশ হইয়া অজ্ঞেয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিব? না, তাহা নহে। ব্রহ্মদর্শনের পর সৃষ্টিতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়! তখন তিনি দোষ-পাশের বাধা হইতে বিমুক্ত হন এবং অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন দর্শনের কোন স্থলে ভুল, কোন স্থলে অসম্পূর্ণতা, কোন স্থানে সত্য, কোন স্থানে সামঞ্জস্য, তাহা তখন তিনি দেখিতে পান। পঞ্চদশীর পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞেয়তাবাদ সমর্থন না করিয়াও সম্পূর্ণ সত্যভাবে বলা যাইতে পারে যে জ্ঞান-প্রেমময়, ইচ্ছাময় ও মহিমাময় পরব্রহ্মের কার্য্য সত্য সত্যই অত্যাশ্চর্য্য পূর্ণ। সৃষ্টিরহস্য সকল দুর্ভেদ্য। তাঁহার এক একটী কৌশলের রহস্য-ভেদ করিতে পৃথিবীতে কত শত শত বৎসর অতীত হইতেছে, তাহা কে জানে? কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে কিছু কিছু রহস্য ভেদও হইয়াছে। এখন তাহা সর্ব্বজন-সুলভ ও অবিসংবাদিত সত্যরূপে পরিণত হইতে যতকাল আবশ্যক হউক্ না কেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে অনেকানেক সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই। সুতরাং আমরা নিরাশ হৃদয়ে মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি না। মায়াবাদী ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের সহিত মায়ার তুলনা করেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে পঞ্চদশীও সেই ভাবের পক্ষপাতী। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আরও দেখিয়াছি যে

"মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" অর্থাৎ ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মায়াবাদিগণ এই মন্ত্রকেই মায়াবাদের সমর্থক মন্ত্র বলেন। কিন্তু ইহা যে মায়াবাদের সম্পর্ক শূন্য,তাহাও আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যাহা হউক্, আমরা এখন ইন্দ্রজালের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব যে উহা দ্বারা জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় কিনা। বাজীকর একর্কে অন্য দেখান সত্য। কিন্তু তাহা মায়া দ্বারা নহে। তিনি নানাবিধ কৌশল দ্বারা জড়-পদার্থ সহযোগে অর্থাৎ সত্য-বস্তু দ্বারাই ঐরূপ ভান করেন। তাহার সকল কার্য্যের সহায় সত্য-বস্তু সমূহ এবং তাঁহার ইচ্ছা ও তজ্জনিত কর্ম্ম, এই উভয়ই। এই দুই ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না। তাহার কার্য্যের উপাদান কিছুই মিথ্যা নহে এবং তাহার ইচ্ছাই উহার নিমিত্ত কারণ। ইন্দ্রজালের সমস্ত প্রণালী ও তাহাতে কি কি পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহা তিনি জানেন। আর তাহার অনুগত যাহারা অথবা তাহার নিকট শিক্ষার্থী যাহারা, তাহারাও জানেন। সেইরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং এই কৌশল জানেন ও তিনি যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে জানান, তিনি বা তাঁহারা জানেন। সেই পরম সৌভাগ্যবান সাধক দেখিতে পারেন যে পরমপিতার মহিমা অনন্ত এবং তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপকে (যাহা সত্য, উঁহাকে) ভিত্তি করিয়া তাঁহার সুমহীয়সী শক্তি-সম্পন্না-ইচ্ছা দ্বারা তিনি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন। পরব্রহ্মের কোন মিথ্যা-পদার্থ বা মিথ্যা-ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। তিনি স্বয়ং সত্য-স্বরূপ, জগতের কারণ স্বরূপ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও অবশ্য সত্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বাজীকর তাহার কৌশল ও সত্যবস্তু দ্বারা যাহা প্রদর্শন করেন, তাহা যখন মিথ্যা, তখন জগৎও মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা (অনিত্য) হইতে পারে না। বাজীকরের কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে তাহার সমগ্র কার্য্যই মিথ্যা নহে। সেইরূপ জগৎরূপ কার্য্যের মধ্যে সমুদায়ই মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য হইতে পারে না। জগৎ

দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটী ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ, অন্যটী উঁহাতেই (অব্যক্ত-স্বরূপেই) তাঁহারই ইচ্ছাজনিত কারু-কার্য্য বা নামরূপ সমূহ। মায়াবাদী দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন যে মৃত্তিকাই পারমার্থিক সত্য, কিন্তু উহাতে যে শিল্পীর ইচ্ছাজনিত (কর্ম্মজনিত) মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। আবার স্বর্ণই সত্য, কিন্তু উহাতে খোদিত কর্ম্মকারের কারুকার্য্য সমূহ সত্য নহে। অতএব আমরা দেখিলাম যে মূর্ত্তির মৃত্তিকা এবং স্বর্ণালঙ্কারের স্বর্ণ সত্য বটে এবং উহাদের অবলম্বন ব্যতীত শিল্পীর ইচ্ছাজনিত কারুকার্য্যসমূহ অবস্থিতি করিতেই পারে না, ইহাও সত্য; কিন্তু কারুকার্য্যসমূহও আপেক্ষিক ভাবে সত্য, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমরা কখনও কারুকার্য্যসমূহকে বাদ দিয়া মূর্ত্তিকে এবং অলঙ্কারকে কেবল মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ ভাবে চিন্তা করিতে পারি না। মৃত্তিকায় ও স্বর্ণে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল চক্ষু দ্বারাই দেখা যায়, তাহা নহে, কিন্তু স্পর্শজ্ঞানেও বলিতে পারা যায় যে উহারা কেবল মৃত্তিকা বা স্বর্ণ নহে, কিন্তু আরও কিছু। সুতরাং উভয় পদার্থের কারুকার্য্যসমূহ আপেক্ষিক ভাবে সত্য এবং উহারা নিত্য সত্য না হইলেও বহুকাল স্থায়ী বটে। সেইরূপ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ নিত্য সত্য এবং উহার অবলম্বনে যে কারুকার্য্যসমূহ আমরা জাগতিক দৃশ্য (Phenomena বা নামরূপ) ভাবে দেখিতেছি, তাহা আপেক্ষিক ভাবে সত্য অর্থাৎ উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উহারা নিত্য সত্য নহে কিন্তু মিথ্যাও নহে। মায়াবাদী স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃত্তিকা প্রভৃতিকে ক্ষিতি-পদার্থই বলিয়া থাকেন। উহারা যে ক্ষিতি-পর্য্যায়-ভুক্ত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহই উহাদের প্রকারভেদ অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বর্ণের সকল গুণ ও মূল্য সাধারণ মৃত্তিকার গুণ ও মূল্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে পৃথিবীতে যে যুদ্ধের পর যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে, তাহা কখনও সম্ভব হইত না। আবার অঙ্গার ও হীরকের তুলনা করিলেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

অঙ্গার কখনও হীরকের সহিত উপমিত হইতে পারে না, উহাদের পার্থক্য এত অধিক, যদিও বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে হীরক অঙ্গার-পদার্থ মাত্র কিন্তু গঠনের পার্থক্য। ব্যোম জড় জগতের প্রকৃতি বটে, কিন্তু জগতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না এবং কেহই একথা বলেন না যে এই জড়-জগৎ ব্যোম মাত্র। অতএব মূল পদার্থাবলম্বনে ইচ্ছাজনিত যে সকল কারুকার্য্য সংঘটিত হয়, সেই সকল কারুকার্য্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গ্রাহ্য। সুতরাং উহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। মাযাবাদীও প্রকারান্তরে এই সত্য স্বীকার করিয়া বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষও তাঁহার দৈহিক মৃত্যু পর্য্যন্ত জগৎকে সত্যভাবেই ব্যবহার করেন। জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহার এবং অন্য সাধারণের ব্যবহারের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তিনি প্রারব্ধ কার্য্যের ফল-স্বরূপ সকল কর্ম্মই মৃত্যু পর্য্যন্ত করিতে পারেন। উভয়ই জগৎকে সত্যভাবেই ব্যবহার করেন। সুতরাং উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যখন মায়াবাদ অনুযায়ী জগৎকে ব্রহ্ম ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের অপগমে রজ্জু-জ্ঞানের ন্যায় যখন মায়ার অপগমে জগৎকে ব্রহ্ম ভাবেই দেখা যায়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কেন তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য জগৎকে সত্যভাবে ব্যবহার করিবেন ? তাঁহার মধ্যেও দ্বৈতভাব এবং মায়ার ক্রিয়া থাকিবে কেন ?* সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ সত্য। সর্ব্বোপরি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম কখনও মিথ্যা মায়া দ্বারা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি কখনও মিথ্যা-ব্যবসায়ী অর্থ-লোলুপ বাজীকরের ন্যায় তাঁহার সত্য-স্বরূপ ও সত্যময়ী ইচ্ছা দ্বারা মিথ্যা জগৎ গঠন করেন নাই। তাঁহার করণ-স্বরূপ অব্যক্ত যেমন সত্য, তেমনি তাঁহার ইচ্ছাও সত্য। সুতরাং উহাদের যোগে উৎপন্ন জগৎ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। উঁহাদের মধ্যে অব্যক্ত-স্বরূপ যাঁহাকে ভিত্তি করিয়া জগৎ গঠিত

* 'সোঽহংজ্ঞান" অংশে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হইয়াছে. তাহা নিত্য সত্য। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ কখনও অসত্য বা অনিত্য হইতে পারে না। আবার উহাতে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাজনিত কারুকার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত অবশ্য স্থায়ী। অর্থাৎ সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছার বর্ত্তমানতা পর্য্যন্ত জগৎও স্থায়ী থাকিবে। সুতরাং উহাদের আপেক্ষিক এবং চিরস্থায়ী অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে জগৎ সম্বন্ধে সমস্যা অসংখ্য। পঞ্চদশীতে যাহা উক্ত হইয়াছে এবং ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে জাগতিক ব্যাপার সমূহ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। উহাদের জটিলতা ও কুটিলতা এত অধিক যে ঐ সকল সমস্যার রহস্য ভেদ করা সাধারণের কার্য্য নহে। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্ম কেন এত অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে বহু স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা আর কিছুই নহে, কেবল সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন জন্য। আমরা দেখিয়াছি যে সেই উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা এবং তাহা জীবনে জীবনে সংঘটিত হইতেছে। কেহই বা কিছুই ইহা হইতে বাদ পড়েন নাই বা পড়িতে পারিবেনও না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ জীবকে অসংখ্য আবরণে আবৃত করা হইয়াছে, তাহার পথে পদে পদে বাধা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কারণেই জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইয়াও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। এই কারণেই আমরা অজ্ঞান আঁধারে হাবুডুবু খাইতেছি, কুল কিনারা দেখিতেছি না। কিন্তু সেই জন্য হতাশ হইয়া মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিলে, দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সকল সমস্যার ক্রমশঃ সমাধান হইবে, অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে এবং সাধক দেখিতে পাইবেন যে জগৎ মায়ার সৃষ্টি নহে, মায়া ব্রহ্মের শক্তিই নহে এবং স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহার সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি যোগে তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপের অবলম্বনে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক জীবের বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে

প্রত্যেক জীব সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ সকল বাধা দূর করিয়া দিবেন, সকল আবরণ উন্মোচন করিবেন এবং পরিশেষে দিব্য-জ্ঞান লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন এবং সকল সমস্যার অতীত হইবেন। স্থূল, পরীক্ষার জন্যই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেই অন্ধকার দূরীভূত হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও জগৎকে জগৎ ভাবেই দেখিতে পারা যায়, অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতীয়মান হইবে যে ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। এই সিদ্ধান্তে ব্যবহারিক সত্তার প্রশ্ন উদয় হয় না বা হইতেও পারে না। অর্থাৎ জগৎকে সত্য-জগৎ-ভাবে ব্যবহার করিয়াও সমস্তই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হইতে পারে। "দেবর্ষি নারদের সিদ্ধি বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। দেবর্ষি ভগবানের প্রথম দর্শনে পর-মানন্দ লাভ করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ঐ আনন্দ আর পূর্ব্ববৎ না থাকায়, তিনি পুনর্দ্দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার উত্তর দৈববাণী দ্বারা এইরূপ প্রাপ্ত হন যে,—"নারদ! তুমি এক্ষণে আর আমার দর্শন প্রার্থনা করিও না। কারণ, "অবিপক্ক-কষায়াণাং দুর্দ্দর্শোহহং কুযোগিনাম।"—অর্থাৎ যাহাদিগের কষায়-রস পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যেমন পিয়ারা প্রভৃতির পরিপক্ক অবস্থায় কষায়-রস মাধুর্য্যে পরিণত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের কাম-ক্রোধাদিরূপ কষায়-রস প্রেম-ন্যায়পরতাদিরূপে পরিণত হয় নাই, মূল কথা যাহারা এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে নাই, সেই সকল কুযোগীর পক্ষে আমার দর্শন লাভ বড়ই কঠিন। তবে ভক্তিভাবের ও আগ্রহের আতিশয্য জন্য কেহ কেহ কখনও কখনও একবার মাত্র আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য দর্শন তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। অতএব বৎস! জিতেন্দ্রিয় হও, কামাদিকে বিশুদ্ধ প্রেমাদিতে পরিণত কর, তবেই আমার নিত্য-দর্শন প্রাপ্ত হইবে।"(ক) অতএব দেখা গেল যে ষড়-রিপু ও অষ্টপাশ হৃদয়ে থাকিতেও (মায়াবাদের ভাষায় মায়া অপ-গমের পূর্ব্বেও) ভক্তি ও ব্যাকুলতার আতিশয্য বশতঃ কখন কখন ব্রহ্ম-

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

দর্শন হইতে পারে। অর্থাৎ ভক্তি ও ব্যাকুলতার অত্যধিক বেগে তমোবাঁধ সাময়িক ভাবে কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও দোষ-পাশ-রাশির অর্থাৎ জাতগুণ-রাশির সম্পূর্ণরূপে লয় হয় না, কিন্তু সাময়িক ভাবে চাপা থাকে। উপরোক্ত শ্লোকে "দুর্দ্দর্শ" শব্দটীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে 'কুযোগীর" পক্ষে ব্রহ্মদর্শন কঠিন হইলেও একেবারেই অসম্ভব নহে। অতএব দেখা গেল যে মায়া ধ্বংস না হইলেও ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখা যায় এবং ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয় না। প্রামাণ্য উপনিষদ্ সমূহে অনেক উপাখ্যান বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন যে বেদ (বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্ সমূহ বেদের অন্তর্ভাগ সুতরাং বেদেরই অন্তর্গত) ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, নিঃশ্বসিত, সুতরাং অভ্রান্ত। বেদের উপাখ্যান সমূহও অভ্রান্ত সত্য। অর্থাৎ সত্য সত্যই উপাখ্যান লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে ঐ সকল উপাখ্যান সত্য নহে, কিন্তু সত্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য ঋষিগণ ঐ সকল আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। কারণ, সর্ব্ব সাধারণকে ঐরূপ ভাবে উপদেশ দিলে সহজেই উহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়। মায়াবাদী প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তিনি বেদের বিশেষতঃ বেদান্তের (উপনিষদের) সকল উক্তিই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে কিছুই বলিব না। অথবা এ সম্বন্ধে আমাদের নিজ মতেরও কোনই আলোচনা করিব না। কারণ, আলোচ্য বিষয়ে উহাদের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। কেবল মায়াবাদিগণের মতের উপর নির্ভর করিয়াই কেনোপনিষদের উপাখ্যানটীর আলোচনা করিব। কারণ, তাহাদের মতের সমালোচনা তাহাদের স্বীকৃত বিষয় দ্বারা হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত। উপাখ্যানে আছে যে দেবতাগণ ব্রহ্মের ইচ্ছায় অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া সেই কার্য্যটী তাঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিয়া বিজয়মদে মত্ত ছিলেন। তখন স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিজ গুণে কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং একে একে অগ্নি ও বায়ুদেব দ্বয়কে পরীক্ষা

দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহারা নিজ নিজ শক্তি দ্বারা একটী তৃণকেও পোড়াইতে বা নড়াইতে পারেন না। ইন্দ্রদেব ব্রহ্মের নিকট যখন আসিতেছিলেন, তখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি ও বায়ু সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথনও হইয়াছিল। কিন্তু তথাপিও তাঁহারা ব্রহ্মকে চিনিতে পারিলেন না। কথোপকথন সময়ে অগ্নি ও বায়ু উভয়ই দুই দুইবার "অহং" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তৃণকে তৃণ বলিয়া দেখিয়াছিলেন এবং তৃণকে পোড়াইবার ও নড়াইবার জন্য একান্ত চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া দেবতাগণের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি এই উপাখ্যান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং মায়াবাদী তাহাই করেন, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্মদর্শনেও মায়ার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না এবং ব্রহ্মদর্শনের পরেও সাধক যথাপূর্ব্ব জগৎকে জগৎ বলিয়াই দর্শন করেন ও সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার করেন। এই উপাখ্যানে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রহ্ম একটী তৃণকে অগ্নি ও বায়ুদেবের নিকট রাখিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগকে উহা পোড়াইতে ও নড়াইতে বলিয়াছিলেন। তৃণটী যদি মিথ্যা হইত, তবে ব্রহ্ম স্বয়ং কখনই সেই পদার্থটীকে বারংবার তৃণ বলিতে পারিতেন না ও দেবতার সম্মুখে উহা স্থাপন করিতে পারিতেন না। আর রজ্জু-জ্ঞানের পর সর্প-জ্ঞানের বিলোপের ন্যায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকও যখন জগৎকে ব্রহ্মই দেখেন, জড়-জগৎ বলিয়া কিছু দেখেন না, স্বয়ং ব্রহ্ম কিরূপে সেই মিথ্যা জড়-পদার্থকে জড়-পদার্থ বলিয়াই দেখিবেন ও জড়-পদার্থ ভাবে ব্যবহার করিবেন? ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সুতরাং জড়-জগৎ মিথ্যা নহে। মায়াবাদীর প্রিয়তত্ত্ব যে জগৎ ব্যবহারিক ভাবে সত্য, তাহাও এস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্ম কখনও তৃণটীকে ব্যবহারিক ভাবে তৃণ বলেন নাই বা বলিতে পারেন না। ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিভাব নাই। যদি তৃণ মিথ্যাই হইত, তবে তিনি উহাকে কখনই তৃণ বলিতেন না। অতএব শ্রুতি ও মায়াবাদের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত

হইল যে জগৎ সত্য। মায়াবাদে মায়াই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী। মায়া মিথ্যা এবং অজ্ঞান। জ্ঞান-শূন্যা এবং চেতনা-শূন্যা মায়া কখনই সৃষ্টি করিতে পারিত না। যদি তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে মায়া তাহা পারে, তবে বলিতে হইবে যে উহা কখনই Mathematical accuracy এর সহিত বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করিতে পারিত না। অজ্ঞান মায়া কেবল Chaos and Confusion সৃষ্টি করিতে পারিত। এইরূপ সুশৃঙ্খলা-পূর্ণা ও জ্ঞান-পূর্ণা সৃষ্টি কখনই করিতে পারিত না। একজন Perfect Idiot মানুষ হইয়াও Newton বা Einstein হইতে পারে না। সে কেবল জঞ্জালই উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু সুশৃঙ্খলার সহিত কোনই জ্ঞান-পূর্ণ কার্য্য করিতে পারে না। প্রকৃতি যে জ্ঞান-পূর্ণা এবং একমাত্র প্রকৃতির বিশ্লেষণে যে আমরা বহুতত্ত্ব লাভ করিতে পারি, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নানা স্থলে লিখিত হইয়াছে। আমাদের অসম্যক্ দৃষ্টিতে আমরা ইহার মধ্যে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা জ্ঞানে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সুতরাং এই সৃষ্টি মিথ্যা ও অজ্ঞান মায়ার সৃষ্ট হইতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্য বিশ্লেষণে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই যে সৃষ্টির একটা মহান্ উদ্দেশ্য আছে। উহার প্রমাণ স্বরূপ একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। পৃথিবী আদিতে A lump of hot gaseous matter মাত্র ছিল। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহা কালে একটী সুন্দরী, সুষমাময়ী বসুন্ধরা রূপে পরিণত হইয়াছে। উহা hot gaseous matter হইতে খারাপতর কিছুই হয় নাই। আধুনিক Biology বিজ্ঞান বলেন যে সৃষ্টির যদি কোনই উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে Protoplasm হইতে মানুষ পর্য্যন্ত না হইয়া উহা হইতে আরও কিছু খারাপতর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং সৃষ্টির যে একটী সুমহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহা সুস্পষ্ট। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অজ্ঞান ও মিথ্যা মায়ার কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। অতএব

মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় নাই এবং পরিচালিত হইতেছে না। ইহার পশ্চাতে স্বয়ং ব্রহ্মই বর্ত্তমান। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় ইহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইল যে জগৎ মিথ্যা নহে বা উহা মিথ্যা হইতেও পারে না। এখন প্রশ্ন হইবে যে জগতের মিথ্যাত্বের বিরুদ্ধে এইরূপ বহু বলবতী যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন মায়াবাদ জগৎকে মিথ্যা বলেন। গভীর ভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে মায়াবাদ ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিবার জন্যই মায়ার কল্পনা করিয়াছেন। উহা মনে করিয়াছেন যে জগতের সত্যতা স্বীকার করিলেই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পরিণাম একটী বিকার। সুতরাং ব্রহ্মেরও অবশ্য বিকার হইয়াছে। এই বিকার সমস্যার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই মায়াবাদ মায়ার কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন যে আমরাও ব্রহ্মকে নির্ব্বিকারই বলি। কোন ব্রহ্মবাদীই ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার না বলিয়া পারিবেন না। জগৎ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ইহা অতি সত্য। কিন্তু তথাপিও বলিতে হইবে যে জগৎ-সৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁহার বিন্দু মাত্রও বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশদ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠক তাহা স্মরণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে জগৎ ব্রহ্মের একটী স্বরূপ বিশেষ অবলম্বনে তাঁহার ইচ্ছায় উৎপন্ন এবং উঁহাতেই স্থিত বটে, কিন্তু জগৎ প্রসবের জন্য অব্যক্ত-স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। উক্ত অংশদ্বয়ে লিখিত বিষয় অতি দীর্ঘ, সুতরাং উহাদের পুনরুক্তি করিব না। ব্রহ্ম যে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাহাও উক্ত অংশদ্বয় পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে। পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে সত্যধর্ম্মানুমোদিত দর্শন অদ্বৈতবাদী। সত্যধর্ম্মাবলম্বী সাধক "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রের উপাসক ও সাধক। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—"এই পরিদৃশ্য-

মান ব্রহ্মাণ্ড ও ইহার অতীত যাহা কিছু সমস্তই এক, প্রকৃতপক্ষে ইহাতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, পঞ্চত্বাদি নাই. ইহা অনন্তকাল পূর্ণ একত্বে বিভূষিত, কিন্তু সাধক সদ্‌গুরুগণ স্ব স্ব শিষ্যাদির শিক্ষার জন্য ইহাকে বিভক্ত ভাবে, ব্যাষ্টি ভাবে বর্ণন করিয়া থাকেন। এই জন্যই আর্য্য শাস্ত্রে 'একে তিন, তিনে এক' বলে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, পালন কর্ত্তা একই, তিনি একই সৃষ্টি কর্ত্তা, একই পালন কর্ত্তা এবং একই লয় কর্ত্তা। পক্ষান্তরে সৃষ্টি বল, স্থিতি বল, লয় বল, এ তিনও একই ; আর স্রষ্টা বল, সৃষ্ট বল, সৃষ্টি বল, এ তিনও একই। কিন্তু এই সকল বিষয় জ্ঞান সাপেক্ষ।" কোন কোন দর্শন বলেন যে ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশের বিকার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ সৃষ্টির বহির্ভূত অংশ নির্ব্বিকারই আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। মায়াবাদ যদিও সম্পূর্ণরূপে এই কথা বলেন না, তথাপি উহা যাহা বলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশ মায়োপহিত হইয়া সগুণ-ব্রহ্ম সৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই কার্য্যেই ব্রহ্মের মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ তত্ত্বই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মায়া ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশকে মাত্র উপহিত করিতে সমর্থ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশের মাত্র বিকার হইয়াছে এবং তাঁহার তিন-চতুর্থাংশ নির্ব্বিকারই আছেন। আমরা এই মতের একান্ত বিরোধী। ব্রহ্মের কি কোনও অংশ হইতে পারে ? তিনি কি একটী জড়-দেশ যে তাঁহার এক-চতুর্থাংশ বা তিন-চতুর্থাংশ ভাগ হইতে পারে ? তিনি নিত্যই অখণ্ড ও অনন্ত পূর্ণময়ত্বে পরিপূর্ণ। তিনি অণুতেও পূর্ণ এবং অনন্তেও পূর্ণ। তাঁহার সম্বন্ধে দেশবাচক শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে থাকিয়াও নিত্য দেশ কালের অতীত। সুতরাং তাঁহার কোনই অংশ হইতে পারে না। "গুণ বিধান" অংশ এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। মায়াবাদও উক্ত তত্ত্ব স্বীকার করিয়াও কেন ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশ, তিন-চতুর্থাংশের কল্পনা করেন, তাহা আমরা জানি না। নিরপেক্ষ সুধী পাঠক বিবেচনা করিবেন যে এইরূপ উক্তি কতদূর যুক্তিযুক্ত বিচার সঙ্গত। জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশ কেন, তাঁহার বিন্দু মাত্রেরও বিকার হয়

নাই বা হইতেও পারে নাই। তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই আছেন, অথচ জীব ও জগৎ তাঁহার হইতেই, একমাত্র তাঁহার হইতেই আসিয়াছে। ইহার উপর মন্তব্য হইবে যে ইহাই ত মায়াবাদ। ইহার উত্তরে আমরা কিন্তু দৃঢ় ভাবে বলিব যে ইহা মায়াবাদ নহে। এই সৃষ্টিতে মায়ার কোনই হস্তই নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বহুস্থলে বহুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, উহা সৃষ্টি করিবে, ইহা ত দূরের কথা। তৈত্তিরীয়োপনিষদে কথিত "অহং বহুস্যাম্" মন্ত্রের বহুস্থলে বিশেষতঃ "সৃষ্টির সূচনা" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। উহাতে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম স্বয়ং অখণ্ড ও পূর্ণ থাকিয়াও দেহযোগে বহুভাবে সুতরাং অপূর্ণ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। মায়াবাদও বলেন যে কূটস্থ ব্রহ্ম (জীবাত্মা) পূর্ণ ব্রহ্মই, কিন্তু অবিদ্যা উপহিত। আমরাও বলি যে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পূর্ণ থাকিয়াও স্বেচ্ছায় স্বগুণোৎপন্নদেহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সুতরাং দোষপাশাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। এই সম্পর্কে "জড় ও আত্মার মিলন", "গুণ বিধান", "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ-চতুষ্টয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। পূর্ণ-ব্রহ্ম যে দেহাবদ্ধ হইতে পারেন, তাহা উহাদিগেতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদের কূটস্থ ব্রহ্মকেও (জীবাত্মাকেও) অবিদ্যা উপহিত বলা হয়। অবিদ্যা ও মায়া কোথায় হইতে আসে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে দেহজাত অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ-জাত দোষপাশ। উহাদিগকেই মায়া, মোহ, অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দে কথিত হয়। উহাদের উৎপত্তির অন্য কোন কারণ নাই। ইহাও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যতকাল ব্রহ্ম দেহযুক্ত না হন, ততকাল তিনি ত অবিদ্যা উপহিত হইতে পারেন না। সকলেই জানেন যে দেহে আবদ্ধ জীবাত্মা অপূর্ণ ও ক্ষুদ্র এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার একমাত্র মীমাংসাই এই যে তিনি পূর্ণ হইয়াও দেহযোগে অপূর্ণ ভাবে ভাসমান। ব্রহ্মের যে কোনও

প্রকারের কোনও অংশ হইতে পারে না. তাহা মায়াবাদীও বলেন এবং আমরাও তাহা স্বীকার করি। তাঁহাতে আচার্য্য রামানুজ কথিত স্বগতভেদও নাই। সুতরাং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের বহু হইতে হইলে তাঁহার বহুভাবে ভাসমান মাত্র হইতে হইবে। কারণ তাঁহার অখণ্ড ও পূর্ণ স্বভাববশতঃ তিনি খণ্ড খণ্ড হইতে পারেন না। ইহাই একমাত্র সত্য তত্ত্ব। তিনি নিজেও যেমন খণ্ডিত হইয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে নিজেকে অংশ করিয়া বহু হন নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত, নিত্য ও অখণ্ডনীয় স্বরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত-স্বরূপও তাঁহারই ইচ্ছায় বহু ভাবে অর্থাৎ জড় জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই কার্য্যের জন্য উঁহারও কোনই বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। অর্থাৎ অব্যক্ত-স্বরূপের পরিণতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকারই আছেন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্ম যেমন এক অখণ্ড থাকিয়াও বহু জীবাত্মা ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারই অব্যক্ত-স্বরূপও এক অখণ্ড থাকিয়াও বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অর্থাৎ জীব ও জড় জগতে অনন্ত গুণধাম ও শক্তিমান বিধাতার একই বিধান কার্য্য করিতেছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে One God, One Law, One Universe. পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সকল তত্ত্বই পূর্ব্বোক্ত অংশসমূহে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে অতি সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত-মাত্রের উল্লেখ করা হইল। পাঠক উক্ত অংশ সমূহ পাঠ করিলেই ইহাদের সন্তোষজনক মীমাংসা লাভ করিতে পারিবেন। এখন মন্তব্য হইবে যে এই ভাসমান অবস্থাকেই ত মায়াবাদে মায়া-মিথ্যা বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে এই ভাসমান অবস্থা মায়া দ্বারা সংঘটিত হয় নাই এবং ইহার বিন্দু-মাত্রও মিথ্যা নহে। অব্যক্ত-স্বরূপের এই ভাসমান অবস্থা নিত্য, অনন্ত এবং পূর্ণ প্রেমময়ের অসীম শক্তিশালিনী ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। ইহা অনিত্য বটে, কিন্তু চিরকাল বা আমাদের অধার্য্যকাল স্থায়ী এবং

সত্য। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। উহার আর পুনরুক্তি করিব না। ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তি আছে এবং তাঁহার সেই প্রেমময়ী ইচ্ছার জন্যই যে এই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, তাহা বহু স্থলে, বিশেষতঃ "সৃষ্টির সূচনা" এবং "ইচ্ছাশক্তি" অংশদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে। উহারও পুনরুক্তি করিব না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে স্বর্ণখণ্ডের স্বর্ণালঙ্কারে পরিণতিতে স্বর্ণের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মাত্র আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবার ঝড়ের সময় মহাসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গ-সৃষ্টিতেও মহাসমুদ্রের যৎকিঞ্চিৎ আকার পরিবর্ত্তিত হয়। এই যে আকারের পরিবর্ত্তন, ইহা স্বর্ণালঙ্কারের সম্বন্ধে কারুকার্য্য জনিত এবং মহাসমুদ্র সম্বন্ধে তরঙ্গ জন্য। ইহাদের দ্বারাই স্বর্ণ স্বর্ণালঙ্কারে নাম-রূপ এবং মহাসমুদ্র তরঙ্গাকারে ভাসমান হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই যে স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য এবং মহাসমুদ্রের তরঙ্গের আকার—ইহারাও সত্য, যদিও নিত্য নহে। ইহাদের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই সত্য। সুতরাং উহাদিগকে মিথ্যা মায়ার খেলা বলা যাইতে পারে না। স্বর্ণ-খণ্ডের এবং অব্যক্ত-স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য এই যে স্বর্ণ-খণ্ডের আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত-স্বরূপের আকারেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। কেন হয় নাই, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া প্রকাণ্ড মায়াবাদ দর্শন গ্রথিত হইয়াছে। যদি কেহ স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া জগৎ-সৃষ্টির দর্শন রচনা করেন, তবে মায়াবাদ যুক্তিযুক্ত ভাবে কোনই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উপমা যুক্তি নহে। যুক্তি দ্বারা তত্ত্বের মীমাংসা লাভ করিলে অনুকূল দৃষ্টান্ত বা উপমা প্রদর্শন করিলে সেই তত্ত্ব দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, এই মাত্র। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপমা কখনই পূর্ণ হয় না বা হইতেও পারে না। এখন দুইটী দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্টতর, তাহা পাঠক বিবেচনা

করিবেন। মায়াবাদের দৃষ্টান্তের ত্রুটী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও লিখিত হইবে। তাহাতে দেখা যাইবে যে সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্তে জগৎ সম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই আমরা লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ কর্ম্মকারের ইচ্ছায় (কর্ম্ম দ্বারা) স্বর্ণখণ্ড কারুকার্য্য সমন্বিত হইয়া স্বর্ণালঙ্কারে পরিণত হয়, উহা অলঙ্কার ভাবে স্থিতি করে এবং কর্ম্মকারের ইচ্ছায় উহা কারুকার্য্য-শূন্য স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হইতে পারে। সেইরূপ ব্রহ্মের প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহারই অব্যক্ত-স্বরূপ কারুকার্য্য সমন্বিত হইয়া জগদাকারে ভাসমান হইয়াছেন, স্থিতি করিতেছেন এবং সেই একই প্রেমময়ী ইচ্ছায় জাগতিক কারুকার্য্য (নামরূপ) বিবর্জ্জিত অবস্থায় পুনরায় পরিণত হইবেন। দুইটী দৃষ্টান্তের তুলনাকালে পাঠক ইহাও মনে রাখিবেন যে মায়াবাদ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট-পদার্থকেই (জগৎকেই) মিথ্যা বলিতেছেন, যদিও উহার সত্যতা মায়াবাদীও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন। আবার পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে আমাদের মতে পরিণাম স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং পরিণামের বিরুদ্ধে মায়াবাদের প্রধান আপত্তি অর্থাৎ পরিণাম হইলেই ব্রহ্মের বিকার অবশ্যম্ভাবী, ইহা আমাদের মতে দাঁড়ায় না। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্ম নিত্য অখণ্ড স্বভাব, অনন্ত সূক্ষ্ম বা কারণ এবং কারণেরও অতীত, অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র স্বভাব এবং সেইজন্যই অব্যক্ত-স্বরূপের পরিণতিতে জড় জগৎ সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু সেইজন্য তিনি বিকৃত হন নাই। মায়াবাদী অবশ্যই বলিবেন যে স্বর্ণখণ্ডের স্বর্ণালঙ্কারে পরিণতিতে উহার আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং উহার বিকৃতিও হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু অব্যক্তের সেইরূপ বিকারও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার উত্তরে আমাদের বলিতে হইবে যে অব্যক্ত-স্বরূপ ব্রহ্মের একটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরূপ এবং উঁহার অখণ্ড স্বভাব, কিন্তু স্বর্ণ-খণ্ড একটী স্থূলতম বস্তু এবং

বিভাজ্য। সুতরাং দৃষ্টান্তের যৎসামান্য পার্থক্য থাকিবেই। ইহা আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করেন। মায়াবাদের দৃষ্টান্তে এবং আমাদের দৃষ্টান্তে আরও সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। মায়াবাদ অনুযায়ী রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র রজ্জুই বর্ত্তমান থাকে। রজ্জু-জ্ঞানে সর্পত্ব বিনষ্ট হয়। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য স্বর্ণজ্ঞানে বিনষ্ট হয় না। যে কোন ব্যক্তি স্বর্ণালঙ্কারের স্বর্ণ ও কারুকার্য্য উভয়ের অস্তিত্ব একই-কালে দেখিতে পান। ঘন অন্ধকারেও স্পর্শজ্ঞান দ্বারা কারুকার্য্য সমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সেইরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ কেহই বিশেষতঃ জলযান-আরোহিগণ ঘন অন্ধকারেও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহারা সমুদ্র এবং তরঙ্গ উভয়ই দেখেন। আবার যখন সেই তরঙ্গাঘাতে জলযান জলমগ্ন হয়, তখন তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও সমুদ্র এবং তরঙ্গের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকার করেন, যদিও সকল অবস্থায়ই সকলেই জানেন যে তরঙ্গ আর কিছুই নহে, কেবল বায়ু বিতাড়িত জল মাত্র। উহার উপাদান একমাত্র জল। এই অবস্থায় সৃষ্টিতত্ত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য কেন আমরা স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব? রজ্জুতে সর্পভ্রম যে ভ্রান্তি মাত্র, ইহা মায়াবাদও স্বীকার করেন এবং ভাষায়ও ভ্রম শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য যে সৃষ্টি উহা সর্ব্ববাদিসম্মত। "কার্য্য" শব্দই সৃষ্টি-কার্য্যের দ্যোতক। সুতরাং মায়াবাদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিলে সৃষ্টিতত্ত্ব সমস্যার কোনই ক্রটী হইতে পারে না। এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে মহাকাশই ঘট সংযোগে ঘটাকাশ ভাবে ভাসমান হইয়াছে, তবে পূর্ব্বোক্ত পার্থক্যও থাকে না। কারণ, মহাকাশ ঘটাকাশে পরিণত হইলে আমাদের দৃষ্টিতে উহার আকারের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ, আকাশ এক অখণ্ডই আছে। ঘটের ভিতরে যে আকাশ, বাহিরেও সেই আকাশ, ঘটের মৃত্তিকা দ্বারা উহা খণ্ডিত হয় নাই বা হইতেও পারে

নাই। আবার ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ ইত্যাদি ক্রমে ভূত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যোমই জড় জগতের প্রকৃতি। কিন্তু এই কার্য্যে ব্যোমের কোনই বিকার হয় নাই। ইহার কারণ ব্যোমের অতি সূক্ষ্মতা ও অখণ্ডত্ব স্বভাব। ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে ব্যোমের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উঁহা ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্।" সুতরাং সেই স্বরূপ হইতে অনন্ত প্রেমময় স্রষ্টার অপার শক্তিশালিনী ইচ্ছায় জগৎ প্রসূত হওয়ায় উঁহারও কোনই পরিবর্ত্তন বা বিকার হয় নাই। জগৎ practically উঁহার অবলম্বনে ভাসমান হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই। এখন ভাসমান অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ইহাই আমরা পাই যে ভাসমান অবস্থার অন্তরালে আসল অবস্থা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। যাহা হয়, তাহা এই যে সত্য-বস্তু নিমিত্ত কারণ যোগে বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় যেমন স্বর্ণের স্বর্ণালঙ্কারে এবং মৃৎপিণ্ডের পুরুষ মূর্ত্তিতে পরিণতি। ভাসমান অবস্থাই Phenomenon এবং নিত্য-বস্তু Noumenon. এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীর অনুশীলনে একটী মাত্র প্রণালী দেখিতে পাই। অর্থাৎ সত্য-বস্তু নিমিত্ত কারণ যোগে পৃথক্ ভাবে ভাসমান হইয়াছে। ভাসমান অবস্থা সেই বস্তুটীকেই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ সত্য-বস্তু ওতপ্রোত ভাবে ভাসমান পদার্থে বর্ত্তমান আছে। উহা সেই সত্য-বস্তুটীর আশ্রয়েই বর্ত্তমান থাকে এবং কর্ত্তার ইচ্ছা হইলে উহা ভাসমান অবস্থা বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় আগমন করিতে পারে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভাসমান অবস্থায় একমাত্র আসল বস্তুটীই থাকে, অন্য কিছু উহাতে যুক্ত হয় না। সুতরাং ভাসমান অবস্থা মিথ্যা নহে, উহাও সত্য অবস্থা। স্বর্ণালঙ্কার = স্বর্ণ + কারুকার্য্য। কারুকার্য্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। উহা একাধিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আবার কারুকার্য্যের পার্থক্যের জন্যই স্বর্ণালঙ্কারের মূল্যের অল্পাধিক্য সংঘটিত

হয়। সুতরাং উহাকে মিথ্যা, মায়া বলা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। সেইরূপ জড় জগৎ = অব্যক্ত-স্বরূপ + তদুপরি কারুকার্য্য। জাগতিক কারুকার্য্য আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গ্রাহ্য। ইহার অস্তিত্ব আছে। সুতরাং উহাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার সুযোগ কোথায়? জগৎ যে পদে পদেই দৃঢ়ভাবেই বলিয়া দিতেছে "আমি আছি", "আমি আছি"। সোঽহংজ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকও যখন জড় জগৎকে সত্য ভাবেই ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, তখন উহার অস্তিত্ব অস্বীকারের কোনই তাৎপর্য্য নাই। উহা সাম্প্রদায়িক Dogmatic assertion মাত্র, যুক্তি নহে। আবার জাগতিক কারুকার্য্য বলিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা অব্যক্ত-স্বরূপ অবলম্বনে সৃষ্ট ও উঁহার আশ্রয়ে স্থিত এবং উহাতে উপাদান ভাবে একমাত্র অব্যক্ত-স্বরূপই বর্ত্তমান, উহাতে অন্য কিছু নাই এবং অনন্ত প্রেমময়ের ইচ্ছা হইলে উঁহা পুনরায় জাগতিক কারুকার্য্য বিবর্জ্জিত অবস্থায় আগমন করিবেন। অতএব আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জড় জগৎ যাহা ব্রহ্মের একটী নিত্য স্বরূপের অবলম্বনে সৃষ্ট ও স্থিত, তাহা সুনিশ্চিত ভাবেই সত্য, কখনই মিথ্যা নহে। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মায়াবাদ বিকার সমস্যা এড়াইবার জন্যই জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় দেখিলাম যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই। অর্থাৎ অব্যক্ত-স্বরূপ practically জগদাকারে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করিবার জন্য মায়া-কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। মায়াবাদের বিবর্ত্তবাদের অনুশীলন করিলেই দেখা যাইবে যে মায়াবাদ ব্রহ্মের বিকৃতি এড়াইবার জন্যই ঐরূপ পরিণাম বা বিবর্ত্ত প্রচার করিয়াছেন। উহার অন্য কোন কারণ নাই। বিবর্ত্তকেও এক প্রকার পরিণাম বলা হয়। আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি যে অব্যক্ত-স্বরূপের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইলেও উঁহা অবিকৃত থাকিতে পারে এবং আছে, তখন মিথ্যা মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই

আবশ্যকতা নাই এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জড় জগৎ—আমাদের মতে সমতুল্যা প্রকৃতি দেবী—আমাদের চিরশিক্ষাগুরু বিশ্বকে—মিথ্যা বলিবারও প্রয়োজনীয়তা মাত্রও নাই। সর্ব্বোপরি যে জড় জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতিপদেই উহার চির-অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করিতেছে, সেই জগৎকে মিথ্যা মায়া বলা যে কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এত সময় দেখিলাম যে অব্যক্ত-স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাববশতঃ জগৎ প্রসব করিয়াও উঁহা নির্ব্বিকারই আছেন, উঁহার বিন্দুমাত্রও বিকার হয় নাই বা হইতেও পারে নাই। মায়াবাদ বলেন যে মায়া ব্রহ্মের একমাত্র শক্তি, ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার আছেন, কিন্তু তাঁহার মায়াশক্তিই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও লয় করেন। আমরা "সৃষ্টির সূচনা" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশদ্বয়ে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি আছে এবং উঁহার অপার শক্তি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে জড় জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ এবং নিমিত্ত কারণ তাঁহার জ্ঞান-প্রেমময়ী সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছাশক্তি। যদি মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইয়া সমুদায় জগৎ-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তবে তাঁহারই সুমহতী জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তিই বা কেন তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপের স্বভাব-নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করিয়া উঁহারই অবলম্বনে জড় জগৎ ভাসমান করিতে পারিবেন না? আমরা "ইচ্ছাশক্তি" অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের ইচ্ছার অপার অসীম শক্তি। জগতেও দেখা যায় যে ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সম্পাদনে সমর্থ মহোন্নত সাধকদিগের ইচ্ছার শক্তিতে অত্যদ্ভুত কার্য্যনিচয় সম্পন্ন হইতে পারে, যাহার কারণ আমরা সকল সময় নির্দ্দেশ করিতে পারি না। সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহার অপার শক্তিশালিনী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যে জগৎকে তাঁহারই স্বরূপ বিশেষ অবলম্বনে ভাসমান করিতে পারেন এবং উহার পালন ও লয় কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। অতএব আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে অব্যক্ত-স্বরূপের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু এই কার্য্যে উঁহার কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং

ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং তাঁহার একমেবাদ্বিতীয়ত্ব অটুট রহিয়াছে, জগৎ সৃষ্টিতে তিনি বহু, নানা হন নাই। জগৎকে মিথ্যা বলিবার মায়াবাদ অনুযায়ী আরও কয়েকটী কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে:—"(১) জগতের অনিত্যতা—এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বহুস্থলে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উহাদের পুনরুক্তির আবশ্যকতা নাই। নিত্য সত্য ব্রহ্মে তাঁহারই ইচ্ছায় অনিত্য কিন্তু চিরস্থায়ী—আমাদের অধার্য্যকাল স্থায়ী জগৎ সত্য ভাবে ভাসমান হইতে পারে এবং তাহাই হইয়াছে। অনিত্যতার জন্য জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে দেখিতে পাইয়াছি যে সৃষ্টির আদি এবং অন্ত আমাদের পক্ষে অধার্য্য এবং এইজন্যই নানা দর্শনে উহাকে অনাদি ও অনন্ত অর্থাৎ নিত্য বলা হয়। মায়াবাদ যখন সৃষ্টির অনাদিত্ব ও কল্পবাদ স্বীকার করেন, তখন অনিত্যতার জন্য জগৎ মিথ্যা, একথা সেই দর্শন বলিতে পারেন না। অনিত্যতার জন্য যে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না, তাহাও বহু স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে পদার্থের সাময়িক অস্তিত্ব আছে, তাহাও সত্য। সত্য না হইলে কোন পদার্থই অস্তিত্ববান হইতে পারে না। স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্যকে এবং সমুদ্র-তরঙ্গের তরঙ্গত্বকে আমরা কখনই মিথ্যা বলি না। একটী কথা মনে রাখিলেই সমস্যার সমাধান হয় যে, যে পদার্থের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। আপত্তি হইবে যে রজ্জু-সর্পেরও ত সাময়িক অস্তিত্ব আছে, সুতরাং উহাও সত্য। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে রজ্জু-সর্প যে জাগতিক পদার্থ নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উহা ভ্রম মাত্র। উহার উপাদান নাই। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে সেই সাময়িক অস্তিত্ব অস্তিত্ব নহে এবং উহার সম্বন্ধে জ্ঞান জ্ঞান নহে কিন্তু ভ্রান্তিমাত্র।(২) জগতের রচনা, পালন ও লয়ের কৌশল এতই আশ্চর্য্যজনক যে ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণে উহাদের মর্ম্মভেদে সমর্থ নহেন। তাই তাহারা অজ্ঞেয়তাবাদের একটী প্রকার বিশেষ ভাবে মায়ার শরণাপন্ন হন। এই সম্বন্ধেও পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ

লিখিত হইয়াছে। আমরা কোন পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইতে পারি, কিন্তু সেই জন্যই সেই পদার্থ মিথ্যা হইয়া যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে বহু বহু তত্ত্ব প্রথমে অজ্ঞাত ছিল তাই সেই সকল Phenomenaকে আশ্চর্য্যজনক বলা হইয়াছে। পরে তত্ত্ব আবিষ্কারের সহিত সেই সেই Phenomena প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখনও অনেক নৈসর্গিক ঘটনাকে ভুতুরে ব্যাপার অর্থাৎ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলিয়া গণ্য করা হয়। এখনও আমরা বহু তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাত। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বহু তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকল তত্ত্ব এখনও আবিস্কৃত হয় নাই। সেই জন্য সেই সেই পদার্থ বা Phenomena মিথ্যা হইতে পারে না। শত শত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান নাই, কেবল বৈজ্ঞানিকগণই তাহা জানেন। সেই জন্য অজ্ঞদিগের নিকট সেই সকল সত্যতত্ত্ব আশ্চর্য্যজনক হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য উহারা মিথ্যা হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্‌গণ সৃষ্টিতত্ত্ব জানেন, কিন্তু সাধারণে তাহা জানে না বলিয়া উহা মিথ্যা হইতে পারে না। যে সকল তত্ত্ব অদ্য জানা হয় নাই, কিছুকাল পরে উহার প্রকৃত তত্ত্বও আমরা জানিতে পারিব, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক জানিয়াছি এবং বহু বহু তত্ত্ব এখনও সমস্যার মধ্যেই পরিগণিত। অনন্ত অনন্ত অনন্ত জ্ঞানাধার, অনন্ত প্রেমাধার এবং সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁহার অপার দয়াগুণে সকল সমস্যার সত্য মীমাংসা ক্রমশঃ দান করিবেন। সুতরাং সম্প্রতি তত্ত্বের সত্য মীমাংসা পাইতেছি না বলিয়াই জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। (৩) ব্রহ্মের তুলনায় জাগতিক কারুকার্য্য—নামরূপ অতি তুচ্ছ। কারণ, উহারা তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপন্ন, স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উহাদের আদি-অন্ত একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান" তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া ঋষি নামরূপকে (বিকার অংশকে) বাচারম্ভণ মাত্র, নাম পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তাঁহার মতে উহাদের কোনই মূল্য নাই। ইহার কারণ এই যে উহারা

পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য এবং উহারা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কখনই অবস্থিতি করিতে পারে না। উহাদের একমাত্র চির-অবলম্বন অব্যক্ত-স্বরূপ। উঁহা ভিন্ন নামরূপের অস্তিত্বের কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহার স্বয়ং ভাবে কোনই অস্তিত্ব নাই, এহেন নামরূপকে চিন্তাশীল ঋষি তুচ্ছ করিয়াছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মায়াবাদী জগৎকে নামরূপ মাত্র বলেন। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমাদের মতে জগতের অর্থ ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপ + কারুকার্য্য সমূহ বা নামরূপ। গণিতজ্ঞগণও negligible quantity-কে গণনার মধ্যে ধরেন না। সেই ভাবে জগতের নামরূপকে ব্রহ্মের তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে বস্তুকে তুচ্ছ মনে করি, তাহাই মিথ্যা নহে। যদি জড় জগৎ হইতে abstract করিয়া কেবল মাত্র নামরূপকেই ধরা যায়, তবে তাহা মিথ্যা বটে, কিন্তু সেইরূপ abstraction যে False abstraction, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নামরূপ অব্যক্ত-স্বরূপ দ্বারা গঠিত সুতরাং উহারা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে। (৪) জগতের অর্থ অব্যক্ত স্বরূপ + তদুপরি কারুকার্য্য সমূহ। ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উহাদের প্রথমটী Noumenon এবং দ্বিতীয়টী Phenomena. প্রথমটী আসল বস্তু, আর দ্বিতীয়টী প্রথমটার ভাসমান অবস্থা মাত্র, যেমন সমুদ্র এবং বায়ুপ্রবাহ যোগে তদুপরি ভাসমান তরঙ্গ। আমরা অব্যক্ত-স্বরূপকে দেখিতে পাই না, কিন্তু কারুকার্য্য বা নামরূপ মাত্র দেখিতে পাই। তাই আমরা নামরূপকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করি। অর্থাৎ Phenomena মাত্রই দেখি, কিন্তু যে আসল পদার্থের অবলম্বনে ভাসমান অবস্থা উৎপন্ন ও অবস্থিত, অর্থাৎ যে Noumenon-এর অবলম্বনে Phenomena-এর উৎপত্তি ও স্থিতি, তাহাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আবার অব্যক্ত-স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ এবং তাঁহাতে অবিছিন্ন ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্মের অবলম্বনেই জগৎ উৎপন্ন ও স্থিত। এই তত্ত্বই সত্য। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও সর্ব্বসাধারণ কেবল নামরূপকেই

জগৎ বলে এবং ব্রহ্মকে জগৎ হইতে বিভিন্ন মনে করে। এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের চিন্তা, ইহা মিথ্যা। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। নামরূপও ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপন্ন ও অবস্থিত। মায়াবাদী জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন নামরূপ মাত্র বস্তু বলেন এবং সেইরূপ জগৎকে মিথ্যা বলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে আমরা যাহাকে জগৎ বলি, মায়াবাদী উহার একাংশকে—তাহার ভাষায় তুচ্ছাংশকে জগৎ বলেন এবং এই জন্যই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। মায়াবাদী জগৎকে ব্রহ্ম হইতে বাদ দিয়াছেন, অথচ তিনি ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলেন। এই ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের চিন্তাই মিথ্যা। আবার নামরূপ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। নামরূপেরও অস্তিত্ব আছে, যদিও উহা অব্যক্ত-স্বরূপের অবলম্বনেই সৃষ্ট ও প্রকাশিত। মোট কথা, নামরূপকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করিতে গিয়াই নানা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। নামরূপ যে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদ্রকে বাদ দিয়া তরঙ্গের চিন্তা সম্ভব নহে। স্বর্ণকে বাদ দিয়া স্বর্ণালঙ্কারের চিন্তা সম্ভব নহে। সুতরাং যিনি ঐরূপ ভাবে চিন্তা করিবেন, তিনি অবশ্যম্ভাবিরূপে ভ্রমে পতিত হইবেন। বিকৃতি অসত্য, ইহা বলা চলে না। কারণ, বিকৃতির মধ্যে প্রকৃতি ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। আবার নামরূপকে মিথ্যাও বলা যায় না। স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্যের যদি বৈশিষ্ট্যই না থাকিত, উহা যদি কেবল মাত্র স্বর্ণই থাকিত, তবে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য্য সম্বলিত বিভিন্ন স্বর্ণ-খণ্ডের বিভিন্ন প্রকার মূল্য না হইয়া এক প্রকারই মূল্য হইত। সমুদ্রের তরঙ্গত্ব এবং স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য পৃথক্ (Distinct but not separate) ভাবে অনুভব করা যায়। স্বর্ণখণ্ড ও স্বর্ণালঙ্কার আর নির্বাত নিস্তরঙ্গ সমুদ্র ও তরঙ্গাকুল সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য সর্ব্বসাধারণেও লক্ষ্য করিতে পারে। এই পার্থক্যের কারণ স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য বা অলঙ্কারত্ব এবং সমুদ্রের তরঙ্গাকার বা তরঙ্গত্ব। সুতরাং উহারা অর্থাৎ নামরূপ পৃথক্ ভাবে (Distinct ভাবে) স্বর্ণ-খণ্ডে এবং সমুদ্রে বর্ত্তমান বলিতে হইবে।

অস্তিত্ববান পদার্থই যখন সত্য, তখন উহারাও সত্য। সেইরূপ জাগতিক কারুকার্য্যও অসত্য নহে।" মায়াবাদী বলেন যে ব্রহ্মই সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যে মায়াবাদ প্রকৃত ভাবে এই মত কতদূর সমর্থন করেন। ইতিপূর্ব্বে মায়াবাদ অনুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে পরব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। মায়া তাঁহার শক্তি। কখন ও কি প্রকারে ব্রহ্ম ও মায়ার যোগে সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্ট হইলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্ম জগতের কি প্রকারে উপাদান কারণ হইতে পারেন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম। ভ্রমের কারণ কি? অজ্ঞান। এই কারণ নিমিত্ত কারণ। অজ্ঞানের জন্য আমাদের ভ্রম হইতেছে। উপাদান কারণে সত্য-বস্তু থাকা চাই। নতুবা তাহাকে উপাদান কারণ বলা হয় না বা হইতেও পারে না। কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা কোন পদার্থ সৃষ্টি করা যায় না। মায়া মিথ্যা। কারণ, উহাকে অজ্ঞান, অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাই বলা হয়। উহা ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না, যেমন আলোকের উপস্থিতিতে অন্ধকার থাকে না। উহা যখন ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্বংস হয়, তখন উহা যে নিত্য নহে, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং মায়াবাদ অনুযায়ী মায়াও মিথ্যা। উহাকে সদসৎ বলা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে কিছুই বুঝায় না বা ঐরূপ কোন কিছু থাকিতেই পারে না, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আর মায়াবাদে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কথিত হয়। "লীলাতত্ত্ব" অংশে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দ্বয়ের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় যে কোনও শক্তি কখনও উপাদান কারণ হইতে পারে না। উপাদানের সত্য বস্তু (substance) অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব মায়া উপাদান কারণ হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে মায়া নিমিত্ত কারণ হইতে পারে, তবে বলিতে হয় যে মায়ার নিমিত্ত কারণত্বে ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না এবং মায়াবাদ মায়াকে যে ভাবে

সাজাইয়াছেন, তাহাতে উহাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত (কিন্তু সত্য নহে) কিছু বলিতে হইবে। আবার যদি মায়ার নিমিত্ত কারণত্ব মাত্র বর্ত্ত-মান থাকে, তবে মায়াবাদ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণত্ব উভয়ই কেন ব্রহ্মে আরোপ করেন? এখন দেখা যাউক্ যে মায়াবাদ অনু-যায়ী ব্রহ্ম স্বয়ং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কি না। তিনি নিমিত্ত কারণ নহেন; কারণ, মায়াবাদে তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। মায়ার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। ঐরূপ বস্তু থাকিতে পারে না। আর যদিও ধরিয়া নেওয়া যায় যে উহা থাকিতে পারে, তবে উহা নিশ্চিতই চেতন নহে। বিশেষতঃ উহাকে ত্রিগুণা ত্মিকা বলা হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ অচেতন জড়ের গুণ, উহারা সচেতন আত্মার গুণ হইতেই পারে না। মায়াবাদও এই সম্বন্ধে আমাদের সহিত একমত। সুতরাং মায়া অচেতন। অচেতন বস্তু স্বয়ং ভাবে নিজেকে বা অন্যকে চালনা করিতে পারে না। সুতরাং উহা কখনই নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে সগুণ ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় মায়া ত্রিবিধ সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ হইয়াছে, তবে বলিতে হয় যে আত্মার কেবল মাত্র উপস্থিতির জন্যই যে কার্য্য হইতে পারে না, ইহা বিশদ ভাবে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। আর তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্য যে তিনি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না, ইহা ত স্বতঃ সিদ্ধ তত্ত্ব। মায়া-বাদে ব্রহ্ম যখন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তখন তিনি উপাদান কারণও হইতে পারেন না, ইহাও স্বতঃ সিদ্ধ। উপাদান কারণই নিমিত্ত কারণ যোগে কার্য্যরূপে পরিণত হয়, কিন্তু মায়াবাদী পরিণামবাদ কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। "আমি বহু হইব" প্রভৃতি সৃষ্টির সাদিত্ব সূচক বাক্য সমূহ তাঁহাদের মতে সগুণ ব্রহ্মে প্রযোজ্য, নির্গুণ ব্রহ্মে নহে। অথচ ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৩ হইতে ১।৪।২৭ পর্য্যন্ত সূত্র সমূহের শঙ্কর ভাষ্যেই আমরা পাই যে পরব্রহ্ম আপনাকে আপনিই পরিণমন করিয়াছেন। মায়াবাদী বোধ হয় বলিবেন যে "ব্রহ্ম" অর্থে এস্থলে সগুণ ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে। এই সম্পর্কে ১১২১-১১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত

অংশ পাঠক দেখিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরব্রহ্মই উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব, মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্মসূত্র রচনাকালে মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বও ছিল না। অতএব প্রোক্ত বেদান্ত সূত্র সমূহে যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। পাঠক এস্থলে বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" ইত্যাদি এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে।"—এই তিন মন্ত্রই তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর মন্ত্র। ইহাকে ব্রহ্ম-প্রকরণ বলা হয়। প্রথম মন্ত্র অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" যখন মায়াবাদ অনুযায়ী পরব্রহ্মে প্রযোজ্য, তখন অন্য দুই মন্ত্র যে সেই একই পরব্রহ্মে প্রযোজ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নিজেই উপাদান এবং নিজেই নিমিত্ত কারণ। এই কার্য্যে মায়ার কোনই সম্পর্ক নাই এবং সেইরূপ কোন উল্লেখও নাই। তিনি স্বয়ং করিলেন, ইহাই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। এস্থলে রজ্জু ভ্রমের আশ্রয় হইয়া আছে। সুতরাং রজ্জু মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ। সেইরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া দ্বারা উৎপন্ন জগৎ বর্ত্তমান অর্থাৎ মায়বশতঃ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে উপাদান শব্দের অর্থ অথবা উপাদান বলিলে সাধারণে যাহা বুঝে, উহাতে তাহার কিছুই থাকিল না। আশ্রয় বলিয়া কোন পদার্থ আশ্রিত কোন পদার্থের উপাদান হইতে দেখা যায় না। গৃহে স্থিত মানব-দেহের উপাদান গৃহ নহে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই কার্য্য করিতে সমর্থ। কিন্তু সাংখ্য দর্শন পুরুষকে প্রকৃতির উপাদান বলেন না, বরং বিপরীত তত্ত্বই বলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপ হইতে তাঁহার ইচ্ছা সহযোগে জড় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তাহাই না হইত, তবে ব্রহ্মকে জড় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিবার কোনই অর্থ থাকিত না। অতএব জড় জগৎও

যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান, সেই জগৎ মিথ্যা, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত উক্তি হইতে পারে? সেই উক্তি স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই অংশতঃ বা পূর্ণভাবে মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। অপর পক্ষে মায়াবাদ অনুযায়ী মিথ্যা বস্তুর উপাদানের প্রয়োজন কোথায়? মায়াবাদে জগৎ মিথ্যা বা ফাঁকি। তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না। সুতরাং এই প্রকার মিথ্যার উপাদানের আবশ্যকতা কোথায়? মিথ্যার উপাদান সত্য হইতে পারে না। আমরা "ইচ্ছাশক্তি" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয়ে উদ্ধৃত কঠোপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয় এবং উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা স্মরণ করি। দেখা যাইবে যে উভয় উপ-নিষদ্ই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম তাঁহার একটী রূপ বা বীজকে বহু প্রকার করিয়াছেন। রূপ অর্থে গুণ। মায়াকে শক্তি বলা হয়। শক্তি কখনও রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। আর জগৎ যখন মিথ্যাই, তখন উহার আবার বীজের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বীজের অর্থই একটী Real substance অর্থাৎ ব্রহ্ম একটী সত্য পদার্থ হইতে বহুভাবাপন্ন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বীজ অবশ্যই ব্রহ্মের অংশ হইবে।* কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই বীজটীই জড় জগতের সত্য উপাদান। সুতরাং জড় জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা প্রোক্ত অংশদ্বয়ে দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম তাঁহার অব্যক্ত-স্বরূপকে বীজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উঁহা হইতে জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনি ত স্বয়ং চৈতন্য-স্বরূপ পরম পুরুষ বা একমাত্র পুরুষ। এই ভাবেই ব্রহ্ম স্বয়ং যে জগৎ সৃজন করিয়াছেন,

---

* অংশ অর্থে এস্থলে খণ্ডিত বা বিভক্ত অংশ নহে। ব্রহ্ম অনন্ত গুণের অনন্ত একত্ব স্বরূপ এবং সৃষ্টি বীজ তাঁহারই সেই অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপ। অখণ্ড ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। ভাষায় বুঝিবার জন্য অংশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতা "একাংশেন স্থিতো জগৎ" বলিয়াছেন।

তাহা যে মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা সহজ বোধ্য। বর্ত্তমান ও পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে কোনই কষ্ট কল্পনা নাই। কিন্তু যদি মায়াকে রূপ বা বীজ শব্দে অভিহিত করা যায়, তবে তাহা কষ্ট কল্পনাই বলিতে হইবে। কারণ, মায়া শক্তি মাত্র। শক্তিতে substance থাকিতে পারে না, আবার substance ব্যতীত কিছুই উপাদান কারণ বা বীজ হইতে পারে না। সুতরাং মায়া জগতের উপাদান বীজ হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর ও কঠোপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদ্ প্রাচীনতর। উভয়ের মধ্যে তুলনা করিতে গেলে কঠোপনিষদ্‌কেই প্রামাণ্য বলিতে হয়। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে লিখিত শ্বেতশ্বতরোপনিষদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম এক রূপকে বহু করিয়াছেন। রূপের অর্থ যখন গুণ, তখন যে উহা অব্যক্ত-গুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মন্ত্রটী কঠোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত। কারণ, মন্ত্রদ্বয়োক্ত শব্দ সমূহ প্রায় এক। "রূপ" স্থলে "বীজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং "বীজ" শব্দেও কঠোপনিষদুক্ত 'রূপই" অর্থাৎ গুণই বুঝাইতেছে। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রূপ এবং বীজ অর্থে ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপকেই বুঝাইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ব্রহ্মকে দুই স্থলে "অনেক রূপম্" বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনেক গুণ আছে এবং তাঁহার অব্যক্ত-গুণ, উঁহাদের মধ্যে একটী। অতএব আমরা সেই উপনিষদুক্ত বীজকে ব্রহ্মের একটী রূপ বলিতে পারি। প্রসঙ্গ ক্রমে এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে উভয় উপনিষদ্ই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম এক রূপকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়া জড় জগৎ সৃজন করিয়াছেন। উভয় মন্ত্রে "করোতি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যে সক্রিয়, তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় উপনিষদই বলিয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদে যে ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়, সেই মত সত্য নহে। এই সম্পর্কে পাঠককে ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৮-২০ সূত্রত্রয় এবং উঁহাদের শঙ্কর ভাষ্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তিনি দেখিতে

পাইবেন যে, সেই স্থলে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য * ও ব্রহ্মাভিন্ন, সেইহেতু শ্রুত্যুক্ত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" সিদ্ধ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ।" অতএব শঙ্কর মতেই আমরা জানিতে পারিলাম যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বা এক এবং উহা তাঁহার কার্য্য। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন জগৎকে মিথ্যা বলা যায় কিরূপে? আর বিপরীত ক্রমে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত ত একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম ও জগৎ এক বা অভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মও মিথ্যা"। "অভিন্ন" শব্দের অর্থ যদি "সম্পূর্ণ-এক" না বলিয়া "অংশতঃ এক" বলা যায়, তবুও জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। যে বস্তুতে ব্রহ্মের অংশও আছে, তাহাও সত্য না হইয়া পারে না। অতএব যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক না কেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন, তিনিই আবার জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারিবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আচার্য্য শংকর উভয় প্রকার স্ববিরোধী উক্তি করিয়াছেন। যদি বলা যায় যে জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে মাত্র এবং মায়ার অপগমে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্ত সাধক ব্রহ্মই দেখিতে পাইবেন, জগৎ দেখিবেন না, তাহা হইলেও প্রশ্নের সুমীমাংসা হইল না। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে "ব্রহ্ম উহার উপাদান" এইরূপ বলিবার কোনই অর্থ থাকে না। যাহা ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না বলা হয়, তাহার উপাদান ব্রহ্ম হইতেই পারেন না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চারি অংশে লিখিত বিষয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশেও ইহা নানা ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত-স্বরূপের উপাদানত্বে এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জড় জগৎ রচিত। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বলিবার কোনই কারণ নাই। মায়াবাদে ব্রহ্ম ও মায়াযোগে সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টিই সৃষ্টির আদি অধ্যায়। কারণ, সগুণ ব্রহ্মের আদি

---

* এস্থলেও জগৎকে ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না।

ও অন্ত আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সৃষ্টির দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে শক্তি স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। অর্থাৎ শক্তি দ্বারা কার্য্য করাইতে একজন শক্তিমানের আবশ্যকতা আছে। মায়াবাদী বলিবেন যে সগুণ ব্রহ্ম মায়াযোগে সৃষ্টি করেন, সুতরাং আমরা শক্তিমানকে পাইলাম। হাঁ, এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মকে মায়োপহিত করিলেন কে? অনন্ত জ্ঞানাধার পরব্রহ্মকে মায়া স্বয়ং সীমাবদ্ধ করিয়া সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে পারেন না! অবশ্যই এই কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন, নতুবা এত বড় ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই সেই কর্ত্তা। কারণ, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তখন ছিলেন না। কিন্তু মায়াবাদী তাহা স্বীকার করিবেন না। কারণ, তাহার মতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। উক্ত ভাব অস্বীকার করায় ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে "অনাদি সংযোগ" মায়াবাদ ও সাংখ্যমতে সমস্যা এড়াইবার একটী কৌশল মাত্র।* আমরা জগতে দেখিতে পাই যে কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সৃষ্টিরূপ মহান্ কার্য্যেরও একটী উদ্দেশ্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য কি? মায়াবাদী সেই উদ্দেশ্যকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়াছেন। "লীলাতত্ত্ব" অংশে বেদান্ত দর্শনের "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" সূত্রের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে লীলা বলিলেই সৃষ্টি ব্রহ্মের ইচ্ছা জন্য সম্ভব হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু মায়াবাদী তাহা স্বীকার করিবেন না। কারণ, তিনি ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলেন। আমরা উক্ত সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে পাই যে সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজাত। আমরা সেই স্থলে দেখিয়াছি যে সৃষ্টি স্বভাবজাত হইলে লীলাপদবাচ্য হইতে পারে না। আর যদি স্বভাবজাতই হয়, তবে ব্রহ্ম উহার উপাদান কারণ হইতে পারেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। সুতরাং এই

* "সাংখ্যমত" বিচারকালে এই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে মায়াবাদ অনুযায়ী সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। স্থূল যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। আবার সৃষ্টিকে স্বভাবজাতও বলা যায় না। কারণ, ইহা মিথ্যা মায়ার খেলা মাত্র। সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাবজাত পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না, ইহা সহজ বোধ্য। সুতরাং মায়াবাদ অনুযায়ী মিথ্যা সৃষ্টির উপাদান কারণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। অতএব একবার দেখা যায় যে মায়াবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান কারণ হইতে পারেন না। আবার দেখা গিয়াছে যে তিনি নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদের বিশ্লেষণে আমরা পাইলাম যে ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ নহেন এবং সৃষ্টির কোনই উদ্দেশ্য নাই, যদিও মায়াবাদী উক্ত তিন ভাবই স্বীকার করেন। "ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ" এই তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাস্থলে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহে ইতিপূর্ব্বেই বিশেষ ভাবেই লিখিত হইয়াছে :—"সৃষ্টির সূচনা', "লীলাতত্ত্ব", "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "ইচ্ছাশক্তি"। ব্যাসাধিকরণ মালা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশেও দেখা যাইবে যে উহা আমাদের মতই সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই তাঁহারই ইচ্ছায় এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। "নিমিত্ত মেব ব্রহ্মস্যাদ্ উপাদানঞ্চ বেক্ষণাৎ। কুলালবৎ নিমিত্তং তদ্ নোপাদানং মৃদাদিবৎ॥ 'বহুস্যাম্' ইত্যুপাদান-ভাবোঽপি শ্রুত ঈক্ষিতুঃ। একবুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মোভয়াত্মকম্॥" "বঙ্গানুবাদ :— (পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন) ব্রহ্ম (জগতের) নিমিত্ত কারণ রূপেই বর্ত্তমান, না উপাদান কারণও তিনি? এইরূপ সন্দেহে বলা হইতেছে যে ঈক্ষণ (বা জগৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা) হেতু ব্রহ্ম কুলালের ন্যায় নিমিত্ত কারণই বটেন, মৃদাদিবৎ উপাদান কারণ নহেন। তদুত্তরে (সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন) "বহুস্যাম্" (আমি বহু হইব)। ঈক্ষিতার এইরূপ উপাদান ভাব প্রতিপাদক বাক্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন, এক (ব্রহ্ম) জানিলে সব জানা যায়। (এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানম্),

এই শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্ম (নিমিত্ত ও উপাদান) উভয়বিধ কারণরূপেই বর্ত্তমান। (শ্রী নির্ম্মল চন্দ্র সেন মজুমদার সাংখ্যতীর্থ)।" মায়াবাদে জীব ও ব্রহ্ম এক, কিন্তু জীব অবিদ্যা উপহিত, সেই জন্য তিনি স্বস্বরূপ বিস্মৃত। জীবাত্মা যখন ব্রহ্মই, তখন তিনি মায়া দ্বারা আবৃত হইবেন কেন? যদি বলা যায় যে মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং উহা কূটস্থ ব্রহ্মকে আবরণ করিবার শক্তি রাখে, তবে মায়া পরব্রহ্মকেও আবরণ করিবার শক্তি রাখে, বলিতে হইবে। কারণ দেহাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কূটস্থ ব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে কোনই পার্থক্য ছিল না; তাঁহারা একই ছিলেন। কারণ, জীবের উপাধি দেহবদ্ধতা জন্যই। কিন্তু মায়া যে ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারেন না, মায়াবাদীও তাহা স্বীকার করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে শক্তি স্বাধীন ভাবে কোনই কার্য্য করিতে পারে না। অতএব মায়া স্বয়ং ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া জীব ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। আর দেহাবদ্ধাবস্থায়ই বা কূটস্থ ব্রহ্ম অবস্থান করিবেন কেন অর্থাৎ তিনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে মুক্তির জন্য কল্পের পর কল্প অপেক্ষা করিবেন কেন? তিনি যখন ব্রহ্মই, তখন তিনি ত মুহূর্ত্তেই মায়া ধ্বংস করিতে পারেন, অবিদ্যা ত তাঁহার নহে এবং হইতেও পারে না। সুতরাং কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষে এইরূপ মায়ার আবরণের কোনই অর্থ থাকিতে পারে না এবং মায়া বা অবিদ্যা তাঁহার উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানাগ্নির নিকট মায়া অবশ্যই ভস্মীভূত হইবে। তাঁহাকে কখনও আবরণ করিতে পারে না। ঐ একই কারণে, মায়া সগুণ ব্রহ্ম এবং কূটস্থ ব্রহ্মকেও আবরণ করিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা ত ব্রহ্মই। সুতরাং মায়া তাঁহাদের নিকটও দাঁড়াইতে পারে না, আবরণ করা ত দূরের কথা। আবার যদি বলা হয় যে পরব্রহ্মেরই ইচ্ছায় জীব তাঁহারই শক্তিরূপা মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া আছেন, তবে পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে

হইবে। তবে ত পরব্রহ্ম সক্রিয় হইলেন, কিন্তু মায়াবাদী তাহা স্বীকার করিবেন না। মায়াবাদী অবশ্যই বলিবেন না যে পরব্রহ্মের ইচ্ছায় জীব মায়োপহিত হইতে পারেন। আবার সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে তিনি কাহারও কাহারও মতে নিষ্ক্রিয়। অতএব তিনি মায়াকে পরিচালনা করিতে পারেন না। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সগুণ ব্রহ্ম বা কূটস্থ ব্রহ্মের কেবল উপস্থিতিতেই কোনই কার্য্য হইতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মও পরব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন মায়োপহিত হইয়া সৃষ্ট হইতে পারেন না। মায়াবাদী অবশ্যই বলিবেন যে আমাদের মতেও ত জীবাত্মাকে স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বলা হয়। তবে মায়াবাদের বিরুদ্ধে এই আলোচনা কেন? ইহার উত্তর বুঝিতে পাঠককে "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায় ও "সোঽহং জ্ঞান" অংশ বিশেষ ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম জীবাত্মাকে মায়ারূপিনী কোন মিথ্যা শক্তি দ্বারা আবরণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারই অসীম শক্তি সম্পন্না ইচ্ছায় তাঁহারই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার একটী স্বরূপোৎপন্ন জড় পদার্থ দ্বারা দেহ গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহারই আবরণে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। দেহ জড়, জড় ব্রহ্মেরই স্বরূপোৎপন্ন সুতরাং জড়ের শক্তি সেই স্বরূপ বিশেষ হইতেই প্রাপ্ত। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতে এই সম্বন্ধীয় সকল সমস্যার সমাধান আছে। উপনিষদের সৃষ্টি-বিষয়িণী উক্তি সমূহের সহিত অধিকাংশে আমাদের ঐক্য আছে, ইহা প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদী যে উহাদের কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। মায়াবাদে পরব্রহ্ম নির্গুণ (গুণ শূন্য) ও নিষ্ক্রিয়। আমাদের মতে তিনি এক বটেন, কিন্তু অনন্ত গুণাধার। একাধিক গুণ থাকিলে ব্রহ্ম দ্বৈত বা বহু হন না; আমরা প্রত্যেকেই বহুগুণ সম্পন্ন, তথাপিও আমরা প্রত্যেকেই এক একজন। রামানুজ স্বামী ব্রহ্মকে অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার বলিয়াছেন। তাহাতে মায়াবাদী আপত্তি করেন যে

তিনি যদি কল্যাণ গুণ সমূহের আধার হন, তবে হেয় গুণই বা কেন তাঁহাতে থাকিবে না। অর্থাৎ যাঁহার গুণ আছে, তাহার উভয় প্রকার গুণ থাকাই অবশ্যম্ভাবী। যদি এক প্রকারের গুণ না থাকে, তবে অন্য প্রকারের গুণও তাঁহাতে থাকা সম্ভব নহে। ইহার উত্তর বুঝিতে পাঠক জড় জগতের কথা চিন্তা করুন্। তিনি দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক জড় পদার্থের সাধারণ কতকগুলি গুণ আছে, কিন্তু এমন অনেক গুণ আছে, যাহা অনন্য সাধারণ। সুতরাং কোন কোন পদার্থে কোন কোন গুণ থাকিলেই যে তাহাতে সকল গুণই থাকিবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। এখন আমরা কল্যাণ গুণ এবং হেয় গুণ কি, তাহা জানিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্মের কল্যাণ গুণরাশি আছে বলিলেই বুঝিতে হইবে যে অনন্ত সরল গুণ, যথা— সত্য, জ্ঞান, প্রেম, দয়া, করুণা, কৃপা, সরলতা, পবিত্রতা, একাগ্রতা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি অনন্ত গুণ তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। সরল গুণরাশিই ব্রহ্মের কল্যাণ গুণ এবং জাতগুণরাশিই হেয় গুণ বা দোষ বলিয়া কথিত হয় এবং উহারা (জাতগুণরাশি) তাঁহাতে নাই বা থাকিতেও পারে না। এখন আমরা দেখিব যে হেয় গুণ বা জাতগুণ বা দোষ কোথায় হইতে আগমন করে। এই সম্পর্কে প্রথমতঃই পাঠক "সৃষ্টির সূচনা" ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশদ্বয়ে লিখিত বিষয় সমূহ স্মরণ করিবেন। উহাতে দেখা যাইবে যে মহান্ সরল গুণ প্রেম জড়-দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হইয়া কাম-দোষ রূপে পরিণত হয়। ঐরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ন্যায়পরতা গুণ জড়দেহ সংসর্গে বিকৃত হইয়া ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে আত্মার জ্ঞান জড়-সংসর্গে আসিয়া বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার ভাবে প্রকাশিত হয়। উহাদিগকে জ্ঞান বলা হয় না, কিন্তু উহারা বৃত্তি মাত্র। আত্মার অন্যান্য সরল গুণরাশিও সেইরূপ দেহ-সংসর্গে আসিলে নানা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। স্থূল, জড় চির বিকৃত। সুতরাং উহার সংসর্গে বিকারের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। কেন বিকৃত

হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। "চিদাভাস" অংশও দেখিতে হইবে। জীব অপূর্ণ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমাকর্ষণে সর্ব্বদাই পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত এবং পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা জ্ঞানে অজ্ঞানে ব্যাকুল। অপূর্ণের যে বহু ত্রুটী, তাহা আমরা পার্থিব কার্য্যেও দেখিতে পাই। ইংরেজীতে কথা আছে যে No human institution is perfect (মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানই পূর্ণ নহে)। ইহা যে সত্য, তাহা একটী বিষয়ে চিন্তা করিলেই অতি সহজেই ধারণা করিতে পারা যায়। দেশে দেশে যে আইন সভা আছে, তাহাতে বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ মিলিত হইয়া আইন প্রস্তুত করেন। কিন্তু অল্পকাল যাইতে না যাইতে তাহাতে দোষ ত্রুটী লক্ষিত হয়। সুতরাং আইন সভা সং-শোধক আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ amendment-এর উপর amendment চলিতে থাকে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের অপূর্ণতার জন্য দোষ উৎপন্ন হইতে পারে। এই সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। "পূর্ণ পরমাত্মার যে যে গুণ নাই, সৃষ্ট আত্মায় (ক) বা অপূর্ণ আত্মায় তদতিরিক্ত যে যে সীমাবদ্ধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় অংশের পূর্ণনিষ্ঠ গুণধারণায় অক্ষমতা ও জড়জগতের সহিত সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন গন্ধক ও পারদের অণু সকল অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, ও সেখানে মলিনতা জন্মে, কিন্তু তাপ সংযোগ করিলে উহা লোহিত বর্ণ হয়, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সীমাবদ্ধ গুণসমূহের যোগেও অপকৃষ্ট ও মিশ্র গুণের উৎপত্তি হইতে পারে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে,

---

(ক) "সৃষ্ট আত্মা" বলায় বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় তাঁহার অংশ ভাবে ভাসমান জীবাত্মা রূপে দেহাবন্ধাবস্থায় সুতরাং দোষ-পাশাবদ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান যিনি। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

যদি ঐ উৎকৃষ্ট গুণগুলি অসীম হয়, তবে কখনও অপকৃষ্টের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। মনে কর, একজনের দয়াবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু ন্যায়পরতা তাদৃশী নহে। এস্থলে সে অনায়াসে দয়ার বশীভূত হইয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব জগতে নাই। কিন্তু যে অনন্ত মহাত্মার দয়াও অনন্ত ন্যায়পরতাও অনন্ত তাঁহা হইতে অনন্ত মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশংকা নাই। সুতরাং অমঙ্গল-সাধনী বৃত্তির সন্নিবেশ তাঁহাতে কখনই হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। (সত্যধর্ম্ম)" এই সম্পর্কে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ দ্রষ্টব্য। অতএব ব্রহ্মের সরল গুণরাশি কখনও বিকৃত হয় না বা হইতেও পারে না। জীবের মধ্যে দোষ (জাতগুণ) আছে বলিয়া পরমাত্মায়ও দোষ অবশ্যই বর্ত্তমান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চিন্তাশীলতার অভাব বলিতে হইবে। জীব বলিতে আত্মা + দেহ। দেহ চিরবিকৃত জড় দ্বারা গঠিত। আত্মা বাদ দিলে যেমন জীবের সম্ভাবনা নাই, তেমন দেহ বাদ দিয়াও জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। দেহ বাদ দিলে আত্মা বর্ত্তমান থাকেন কিন্তু জীব থাকেন না। ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বহু স্থলে দেখিয়াছি। সুতরাং জীবে আমরা যে সকল গুণ দেখিতেছি, তাহা আত্মার দেহের অথবা উভয়ের যোগে উৎপন্ন বলিতে হইবে। পরমাত্মার দেহ নাই, সুতরাং দেহ সংসর্গে আসিবার ফলে যে জাত-গুণরাশি (দোষপাশরাশি) জীবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তাঁহাতে (পরমাত্মায়) থাকা অসম্ভব। দোষপাশকে জাতগুণ বলা হয়। কারণ, উহা দেহ সংসর্গে জাত। উহারা নিত্য নহে। যাঁহার দেহ নাই, তাঁহার দোষও থাকিতে পারে না! অতএব পরমাত্মায় যে বিন্দুমাত্রও দোষ বা হেয় গুণ থাকিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা গেল। এস্থলে আমরা কঠোপনিষদুক্ত নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখে নবাহ্যঃ ॥ (২।২।১১) ।" (বঙ্গানু-

বাদ :—৫৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-"গুণবিধান" অংশ)। অতএব আমরা পাইলাম যে ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত সরল গুণের সমষ্টি অথবা তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত। তাঁহার গুণরাশি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নাই। সুতরাং মায়াবাদের যে আশঙ্কা যে দুই বা ততোঽধিক গুণ থাকিলেই ব্রহ্মকে দ্বিধা, ত্রিধা প্রভৃতি করা হইবে. অর্থাৎ তাঁহার এক-মেবাদ্বিতীয়ত্ব থাকিবে না, তাহা ভুল। আমাদের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেমময়, জ্ঞানময় ইত্যাদি বলি। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্মের এক একটী একত্ব বলিলে আমাদের ধারণীয় দুই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ সত্ত্বাত্মক গুণ অনন্ত ভাবে মিশ্রিত বুঝায়। দুইটী বিপরীত গুণের একত্বে যে গুণ বা স্বরূপ হয়, সেইরূপ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে বা Permutation and Combination যে একটী গুণ বা স্বরূপ হইয়াছে, তাঁহাতেও তিনি নিত্য বিভূষিত, অথবা বলিতে হয় যে ঐরূপ অনন্ত গুণ একীভূত হইয়া (Concentrated হইয়া) তাঁহাতে বর্ত্তমান। অর্থাৎ পরব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার একটী মাত্র বিশেষণ, গুণ, স্বরূপ বা লক্ষণ নিত্য বর্ত্তমান। ইহা বলিলেও সেই উক্তি অতি সত্যই হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে সেই একীভূত স্বরূপটীর অন্তর্গত হইয়া অনন্ত স্বরূপও তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে আমরা সূর্য্য-রশ্মির বিশ্লেষণ করিতে পারি। সকলেই জানেন যে উহা শুভ্রবর্ণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা সপ্ত-বর্ণের সমষ্টি। সপ্তবর্ণ যথা—Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red. উহারা Concentrated হইয়া একটী বর্ণ—শুভ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ একীভূত হইয়া তাঁহার একটী মাত্র অনন্ত ভাবে শুভ্র স্বরূপ হইয়াছে এবং তাহা নিত্য অনন্ত মঙ্গলে (শুভে) পরিপূর্ণ। আমরা অন্য ভাবেও পরীক্ষা করিলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন ভাটার উপরিভাগে সকল বর্ণ মাখাইয়া উহাকে বিঘুর্ণন করিলে কোন বর্ণই দেখা যায় না, কিন্তু সকল বর্ণের সমষ্টি শুভ্র বর্ণই দেখা যায়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে পরব্রহ্মে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ অনন্ত মিশ্রণে একীভূত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু সেই একের মধ্যেই তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটী গুণ নিহিত রহিয়াছে। আবার যেমন সপ্তবর্ণের সমষ্টি সূর্য্যরশ্মি অতি শুভ্র, অন্ধকার হরণকারী ও আনন্দদায়ক, সেইরূপ অনন্ত একত্বের অনন্ত সংমিশ্রণে একীভূত বা একত্ব স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম নিত্যই অতুলনীয় অনন্ত শুভ্র জ্যোতিঃ-স্বরূপ, তমোনাশক ও পরমানন্দ দাতা। আমরা যদি পরব্রহ্মকে প্রেমময় বলি, তাহা হইলে তাঁহাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা হইল না। এইরূপে তাঁহাকে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ইত্যাদি ভাবে বর্ণনা করিলেও তাঁহাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা হয় না। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণের ইতি করা যায় না। এই জন্য পরব্রহ্মের যত গুণবাচক শব্দ পৃথিবীতে প্রকাশিত আছে, তাহা অসম্পূর্ণ, কেবল প্রণবই ওঁং (অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্ম অথবা অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত পর-ব্রহ্ম) একমাত্র শব্দ যাহা দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা যায়। এই সম্পর্কে নির্ব্বিশেষবাদ অংশে (১১৪০-১১৪২ পৃষ্ঠায়) লিখিত বিষয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। পরব্রহ্মে অনন্ত গুণ একীভূত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার যত কার্য্য, তাহার মূলেও সেই অনন্ত গুণের শক্তি বর্ত্তমান। মানবের কোন একটী গুণ সময় সময় এত প্রবল আকার ধারণ করে যে বিরুদ্ধ গুণের কথা দূরে থাকুক, অন্য কোন গুণ যে তাহাতে আছে, তাহা বোধগম্য হয় না। কিন্তু পরব্রহ্মের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তি বর্ত্তমান। তাহাতেই বিশ্বে নিয়ত মঙ্গল বই অমঙ্গল উৎপন্ন হয় না বা হইতেও পারে না। আমরা যে তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না, তাহারও একটী প্রধান কারণ তাহাই। আমরা চাই যে তিনি কেবল প্রেমেরই কার্য্য করেন, অর্থাৎ আমরা যতই অন্যায় করি, যতই পাপ করি, যতই বিদ্রোহ ঘোষণা করি না কেন, তিনি আমাদের মঙ্গল না দেখিয়া spoiled child-এর (আহ্লাদে ছেলের) স্নেহান্ধ এবং অজ্ঞ মাতাপিতা যেমন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া কেবলই তাহার

অন্যায় আবদার রক্ষা করেন, তেমনি তিনি আমাদিগকে কিঞ্চিৎমাত্রও শাস্তি না দিয়া সকল অন্যায় সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া প্রেমে বাধ্য হইয়া আমাদের সকল কামনা বাসনা পূরণ করেন। অর্থাৎ তিনি যেন অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত ন্যায়বান্, অনন্ত মঙ্গলময় পরব্রহ্ম থাকেন না। এইরূপ হইলে আমরা সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে সহজেই ধারণা করিতে পারি বটে, কিন্তু তিনি ত সেইরূপ ভাবে কার্য্য করেন না। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তি কার্য্য করে বলিয়া আমরা (যাহারা চিন্তাশীলতাহীন এবং সাধন ভজন বিহীন, তাহারা) তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না। মায়াবাদী বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম যখন এক, তখন তাঁহার বহু গুণ হইতে পারে না। ব্রহ্মে একাধিক গুণের কল্পনা করিলে তাহার মতে তাঁহার (ব্রহ্মের) একত্ব রক্ষা পায় না। এই আপত্তির প্রধান উত্তরই এই যে মায়াবাদে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্বকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। লক্ষণ, স্বরূপ ও গুণ যে একই তাহা ইতিপূর্ব্বে নির্ব্বিশেষবাদ অংশে (১১৩২-১১৩৬ ও ১১৪২ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের তিনটী গুণ থাকিলেও, তাঁহাতে বহুগুণ আছে বলিতে হইবে। যাঁহার তিনটী গুণ স্বীকৃত হইয়াছে, উক্ত কারণে (একমাত্র ব্রহ্মের একাধিক গুণ থাকিতে পারে না) তাঁহার অনন্ত গুণ অস্বীকারের পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। মায়াবাদী বলেন যে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত একই অর্থ বাচক, উহারা তিনটী নহে, একটী মাত্র। কিন্তু ভাষায় উহাদের তিনটী অর্থই বটে, একটী নহে। কষ্ট কল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে জোড় করিয়া উহাদিগকে একার্থ-বাচক-পদার্থ বলা যাইতে পারিলেও কোনও ভাষাবিৎ পণ্ডিত তাহা গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আর উহারা যদি একটীই হয়, তবে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলিবার প্রয়োজন কোথায়? সত্য অথবা জ্ঞান অথবা অনন্ত বলিলেই হইল। এস্থলে আরও বক্তব্য যে শ্রুতি ব্রহ্মের এই তিনটী গুণ ভিন্ন আরও অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উঁহারা যে পরব্রহ্মেরই গুণ, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে মায়াবাদে অনন্ত বলা হয়।

যিনি অনন্ত, তাঁহার স্বরূপও অনন্ত বলিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষদ্ হইতে মায়াবাদী নিজ মত সমর্থানর্থ বাক্য উদ্ধার করেন। সেই উপনিষদই ব্রহ্মকে অনেকরূপম্ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে অনন্ত স্বরূপ ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং আমরা যে বলি যে ব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্বে বা অনন্ত গুণের অনন্ত একত্বে নিত্য বিভূষিত অথবা তিনি অনন্ত স্বরূপ হইয়াও এক স্বরূপ মাত্র, তাহাই সত্য বলিতে হইবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে আমাদের মতে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ এবং একস্বরূপ। এই উভয়ই সত্য। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিবেন যে উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা ইহা সুসঙ্গতভাবে প্রদর্শিত হইল কিনা যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের একটী মাত্রই গুণ বা স্বরূপ। এস্থলে আবারও বলিতে হয় যে সেই গুণটীর ভিতরেই অনন্ত গুণ অনন্ত মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া একীভূত ভাবে বর্ত্ত-মান। সুতরাং উহা একই সত্য। মায়াবাদী ব্রহ্মকে একরস বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতানুসারে পূর্ব্বোক্ত কারণে উহার সমর্থন পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে আমরা সম্পূর্ণ-রূপে ধারণা করিতে পারিব যে তিনি একরসই বটেন। সেই অনন্ত প্রকার অনন্ত রসের অনন্ত মিশ্রণে একটী মাত্র পরম রস গঠিত, তাহাই তিনি। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র নিত্য পরম শিবম্। মাণ্ডূ-ক্যোপনিষদে ব্রহ্মকে শিব এবং অদ্বৈত ওঁং বলা হইয়াছে। আমরাও তাহাই বলিলাম। শিব যিনি, তিনি অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত, অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব মিলন সম্পাদিত হইয়াছে। অনন্ত একত্বের একত্ব যাঁহাতে নাই, তিনি পূর্ণ শিব হইতে পারেন না। আবার তিনিই যে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাহা এস্থলেও দেখিলাম এবং পূর্ব্বেও বহু স্থলে বিশেষতঃ "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যে একমাত্র ওঁং তাহাও প্রদর্শিত হইল। এই সম্পর্কে "সৃষ্টিতে বিপরীত গুণের মিলন" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মকে নির্গুণ (গুণ শূন্য) বলা চলে না। আমরা দেখিয়াছি যে

প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদ্ও মায়াবাদীর সেই মত সমর্থন করেন না, যদিও তাঁহারা বলেন যে উক্ত উপনিষদ্ সমূহ তাঁহাদের দর্শনের ভিত্তিভূমি। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে লিখিত শাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য সকল হিন্দু শাস্ত্রই এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ ব্রহ্মকে অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে গুণশূন্য বলিলে শূন্যবাদের দিকে অত্যধিক ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। এই জন্যই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদকে Nearest approach to Buddhism বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। এখন দেখা যাউক্ যে নির্গুণ শব্দের অর্থ গুণ-শূন্য বা অন্য কিছু। রামানুজ স্বামী এবং তাঁহার দর্শনের অনুবর্ত্তিগণ ব্রহ্মকে অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার বলেন। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্রহ্মকে Immanent and Trans-cendent বলা হইয়াছে। Immanent অর্থে The notion that the Intelligent and creative Prinniple of the universe that pervades the universe itself, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। Transcendent অর্থে Transcending all conditions, বিশ্বাতিগ ব্রহ্ম। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—"নির্গুণ শব্দার্থে সাধারণ লোকে গুণহীন বা গুণশূন্য অর্থ করিলেও শব্দশাস্ত্র-বিশারদ প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত জ্ঞানীরাই গুণাতীত বা গুণাতিক্রান্ত অর্থেই উহার ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যেরূপ স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার ব্যবহার আছে, তাহাতে উহার ঐ অর্থ ব্যতীত তত্তৎ স্থলে অন্য অর্থ অসঙ্গত হয় (সত্যামৃত)" গুণাতীত অর্থে বুঝায় যে পরমপিতা অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণে নিত্য পরিপূর্ণ, আবার তিনি উক্ত গুণ সমূহেরও অতীত। গুণাতীত বলিলে কখনও নির্গুণ বা গুণশূন্য (নির্গুণ—যাঁহার কোন গুণ নাই) বুঝায় না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে পরমপিতা অনন্ত গুণে গুণবান হইয়াও তিনি সেই সকল গুণ দ্বারা পরিচালিত হন না। অর্থাৎ তিনি অনন্ত গুণ-বানও বটেন, আবার তিনি সেই অনন্ত গুণের উর্দ্ধেও বটেন। ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া ব্রহ্মকে Transcendent বলা

হইয়াছে। Transcend শব্দের অর্থ "To rise above", অতিক্রম করা। অতীত শব্দের অর্থ অতিক্রান্ত হওয়া। সুতরাং গুণাতীত—গুণের অতীত—গুণাতিক্রান্ত। অতীত শব্দের অর্থ গত ধরিলেও উহাই বুঝায়। অর্থাৎ গুণাতীত অর্থে বুঝায় যে গুণরাশি তাঁহাতে গত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি গুণের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন বা তিনি গুণরাশির অধীন নহেন। পরমপিতার অনন্ত স্বাধীনতা আছে, সুতরাং তিনি তাঁহার গুণরাশিকেও তাঁহার অধীন করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সেই সকল গুণকে পরিচালনা করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তিনি সেই সকল গুণকে পরিচালনা নাও করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি উভয় অবস্থায়ই উঁহাদের অতীত ভাবে থাকিতে পারেন। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ সত্ত্বাত্মক গুণের মিলন হইয়াছে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত গুণে গুণবান, আবার তিনি নিত্যই সেই অনন্ত গুণের উর্দ্ধে বা অতীতও বটেন। তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় গুণ দ্বারা পরিচালিত হন না। God leads all Gunas but He is not led by them. একটী কথা বলিলেই গুণাতীতত্ব সম্বন্ধে আমাদের সত্য ধারণা হইবে। তাহা এই যে অনন্ত গুণ থাকিলেই অনন্ত গুণাতীত হওয়া যায়। যাঁহার অনন্ত গুণ নাই, তিনি অনন্ত গুণাতীত হইতে পারেন না। যিনি ক্রোড়পতি, তিনিই ক্রোড়ের অতীত হইতে পারেন, কিন্তু ভিক্ষুক ত নহেই, লক্ষপতিও ক্রোড়ের অতীত হইতে পারেন না। কারণ, ক্রোড়পতি হইতে তাহার মধ্যে তীব্র বা লুক্কায়িত কামনা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং তিনি অভাবগ্রস্থ। সুতরাং তিনি তাহাকে ক্রোড়পতিত্বের উর্দ্ধ সংস্থাপন করিতে পারেন না। ব্রহ্মেও সেইরূপ অনন্ত গুণ নিত্য বর্ত্তমান বলিয়াই তিনি নিত্য অনন্ত গুণের অতীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অনন্ত গুণ না থাকিলে তিনি অনন্ত গুণাতীত হইতে পারিতেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে "নির্গুণ" শব্দের উক্ত প্রকারে গুণাতীত অর্থ কেমনে সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সৃষ্টি যে সাদি ও

সান্ত, তাহা প্রথম অধ্যায়ের সৃষ্টির সাদিত্ব সূচক প্রথম অংশ চতুষ্টয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জগতের প্রতি ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির কোনই ক্রিয়া ছিল না, সুতরাং সেই অবস্থাও যাহা, আমাদের অর্থে অর্থাৎ আমাদের ধারণীয় গুণশূন্যাবস্থাও তাহা। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে ক্রিয়া আমরা সৃষ্টিকালে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকিতে পারে না, ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। কারণ, তখন জগৎ থাকিলে ত উহার সম্বন্ধে ক্রিয়া। এই গুণাতীত অবস্থাকেই আমাদের ভাবে ও ভাষায় ব্রহ্মের Normal অবস্থা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টিকালে তিনি নিজে বাধ্যবাধকতা শূন্যা ইচ্ছায় সগুণ অবস্থায় অর্থাৎ জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াশীল অবস্থায় আসিয়াছেন। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াশীল হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার গুণাতীতত্ব অবস্থা লয় প্রাপ্ত হয় নাই। উহা তাঁহার নিত্য অবস্থা। সুতরাং উহার ক্ষয় বা লয় নাই। সুতরাং সৃষ্টিকালেও তাঁহাতে গুণাতীতত্ব বর্ত্তমান আছে। ইতঃপর এই সম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে। অনন্ত অনন্ত অনন্ত মহাকালের তুলনায় সৃষ্টিকাল ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মাত্র।* সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়াশীল হওয়াও ততটুকু কালের জন্যই অর্থাৎ মুহূর্ত্তের জন্যই মাত্র। সুতরাং মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্য ক্রিয়াশীলত্ব বা সগুণ অবস্থা আমাদের ভাবে ও ভাষায় তাঁহার Extra-ordinary অবস্থা বলা যাইতে পারে। Normal অবস্থা এবং Extra-ordinary অবস্থা বলায় বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্মের দ্বিবিধ অবস্থা বা স্বভাব। তাঁহার যে নিত্যই একই স্বভাব, তাঁহাতে যে গুণময়ত্ব ও গুণাতীতত্ব নিত্যই বর্ত্তমান, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। আমাদের নিকট যাহা প্রতীয়মান হয়, আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে সেই ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইল মাত্র।

---

* হিন্দু শাস্ত্রেও এক কল্পকালকে অর্থাৎ সৃষ্টিকালকে একটী দিনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত কথাটীর সম্বন্ধে পাঠক চিন্তা করিবেন আমাদের প্রায় ১৬৫ বৎসরে নেপচুন গ্রহের এক বৎসর হয়। মহাকাল সম্বন্ধে "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে লিখিত হইয়াছে। উহার অর্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে ও বর্ত্তমানে যে কাল তাহাই।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে মায়াবাদ এই Normal অবস্থাকেই ব্রহ্মের নির্গুণ বা গুণশূন্যাবস্থা এবং Extra-ordinary অবস্থাকেই সগুণ অবস্থা বা সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা বলা হইয়াছে। গুণাতীতত্ব জন্য ব্রহ্মের এইরূপ আমাদের ধারণীয় নিষ্ক্রিয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় প্রাচীনগণ প্রথমতঃ নির্গুণ বা গুণশূন্য বলেন। কিন্তু পরিশেষে গুণাতীত অবস্থার সম্পূর্ণ অর্থ ভুলিয়া অর্থাৎ তিনি যে অনন্ত গুণময় হইয়াও অনন্ত গুণাতীত, এই ভাব ভুলিয়া কেবল উহার ফলের কথা মাত্র লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বা গুণশূন্য বলা হইয়াছে। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে সৃষ্টিকাল ভিন্ন অন্য সময় ব্রহ্ম যদি তাঁহার অনন্ত গুণের সকল গুণেরই অতীত থাকিতেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞান এবং প্রেম কি ভাবে তখন তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল? আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি না যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রেম যেন নাই অথবা ঐ সকল গুণ তাঁহাতে লয়-প্রাপ্ত ভাবে থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তাঁহাতে অনন্ত গুণ নিত্যই বর্ত্তমান, ইহাও যেমন সত্য, তাঁহার গুণাতীতত্বও নিত্যই আছে, ইহাও তেমনি সত্য। ইতি-পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণে জানেন যে ক্রিয়া না থাকিলে সেই ব্যক্তির সেই ক্রিয়ার সদৃশ (Corresponding) গুণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ক্রিয়ার অর্থ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু ইচ্ছা অন্তরের ভাব মাত্র। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত গুণই ছিল, ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু উঁহাদের কোনই বহিঃপ্রকাশ ছিল না।* কারণ তখন তিনি ভিন্ন আর কিছু ছিল না। তিনি তখন নিজেকেই নিজে জানিতেন, নিজের অস্তিত্ব নিজেই উপলব্ধি করিতেন এবং নিজেকেই নিজে প্রেম করিতেন।(ক) এই আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেমকে আমাদের

---

* বহিঃপ্রকাশ বলায় জগতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে অথবা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাই বুঝাইতেছে মাত্র। ইহা অবশ্যই সত্য যে ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। জীব এবং জগৎও তাঁহার অন্তর্গত ভাবে তাঁহাতেই চির বর্ত্তমান। "বহিঃপ্রকাশ" শব্দ এই অর্থেই আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের অন্তর বাহির নাই।

(ক) বৃহ—১।৪।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানিতেন।

অর্থে ক্রিয়া বলা যায় না। কারণ, উহাতে জ্ঞান বা প্রেমের বহিঃ-প্রকাশ নাই। অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের ভিন্ন পাত্র স্বরূপ জীব ও জগৎ তখন ছিল না। তাঁহার নিজের ভাব নিজেরই মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে গুণময়ত্ব ও গুণাতীতত্ব উভয় অবস্থাই নিত্য বর্ত্তমান আছে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বকালে তিনি গুণাতীত অবস্থায় ছিলেন বলিলে, তিনি সেইকালে গুণহীন ছিলেন বলা হয় না। যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। পরমপিতার অনন্ত করুণা ও অনন্ত ন্যায় গুণের অনন্ত একত্বে একটী একত্ব বা স্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে। যখন তিনি ন্যায় গুণে পাপীকে শাস্তি দেন, তখন তাঁহার করুণাগুণের লয় হইয়াছে বলা যায় না। আবার বিপরীত ভাবে বলা যাইতে পারে যে অনন্ত করুণাময় পরমপিতা যখন করুণা গুণে পাপীর পাপ মোচন করেন, তখন ন্যায়পরতাও লয় প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা হয়, তাহা এই যে প্রথমোক্ত ভাবে ন্যায়পরতার এবং শেষোক্ত ভাবে করুণার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। নতুবা প্রথম ভাবের অবস্থায় করুণা এবং দ্বিতীয় ভাবের অবস্থায় ন্যায়পরতা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উঁহাদের তখনও কার্য্য ছিল। সেই কার্য্য এই ভাবে ভাষায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। পরমপিতা ন্যায়গুণে যখন পাপীর শাস্তি দেন তখন করুণা সেই শাস্তিকে অত্যন্ত শাস্তিতে পরিণত হইতে দেন না এবং করুণা ন্যায় গুণের সহিত মিলিত হইয়া সেই শাস্তিকে মঙ্গলে পরিণমন করেন। আবার পরমপিতা যখন তাঁহার করুণায় পাপীর পাপ মোচন করেন, তখন তাঁহার ন্যায় গুণ জন্য পাপীর কিছু প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অন্ততঃ তাহার অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। করুণা কখনও ন্যায়কে অগ্রাহ্য করিয়া পাপীর পাপ মোচন করেন না, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া পাপীর মঙ্গল বিধানই করেন। কিন্তু পাপী যখন শাস্তি পায়, তখন আমরা মনে করি যে অনন্ত ন্যায়বান পরম-

বৃহ—৪।৫ ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ী সংবাদে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মেরও আত্মপ্রেম আছে।

পিতা পাপীর দোষে তাহাকে শাস্তিই দিতেছেন—ন্যায়দণ্ডই পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কোনই করুণা করিতেছেন না; আবার যখন পাপী পাপ মুক্ত হয়, তখন আমরা মনে করি যে অনন্ত করুণাময় পিতা পাপীকে তাঁহার করুণাগুণে পরিত্রাণই করিলেন। সেই কার্য্যে যে অনন্ত ন্যায়বান পরমপিতার ন্যায়গুণও বর্ত্তমান, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সৃষ্টির পূর্ব্বকালেও ব্রহ্মের সেই অবস্থাই ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গুণাতীতত্ব ও গুণময়ত্ব উভয় অবস্থাই তখন বর্ত্তমান ছিল। গুণরাশি যে তাঁহাতে ছিল না, তাহা নহে। অর্থাৎ তখন তিনি নিজে নিজেকেই জানিতেন, নিজে নিজেকেই প্রেম করিতেন এবং নিজেই নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনন্ত গুণাতীতত্ব ভাবও যুগপৎ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল গুণাতীতই ছিলেন এবং সৃষ্টিকালে কেবল গুণময়ই আছেন। এস্থলে একটী বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বিভিন্ন গুণের শক্তিরও বিভিন্নতা আছে। অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমময়ী লীলার উদ্দেশ্যই এই যে তাঁহার স্বগুণ পরীক্ষা, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে লিখিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নানাগুণে নানারূপ শক্তি বর্ত্তমান। এক গুণের শক্তি অপেক্ষা অন্য গুণের শক্তি বলবত্তরা। "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে অচৈতন্য হইতে চৈতন্যের, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের, দুঃখ হইতে সুখের, ন্যায়পরতা হইতে করুণার শক্তি বলবত্তরা এখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে গুণময়ত্ব হইতে গুণাতীতত্বের শক্তি বলবত্তরা। কারণ, গুণাতীতত্ব গুণে পরমপিতা গুণরাশির অতীত হন অর্থাৎ তাঁহার গুণাতীতত্ব জন্য তিনি গুণ দ্বারা পরিচালিত হন না, কিন্তু তিনি গুণকে পরিচালনা করেন। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে গুণাতীতত্বের শক্তি বলবত্তরা হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি গুণাতীত অবস্থায় ছিলেন বলিলে তিনি যেন গুণাতীতত্ব প্রধান ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন গুণরাশি ছিল না, ইহা মনে

করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে তখনও তাঁহার গুণরাশি বর্ত্তমান ছিল এবং তাঁহার নিজ সম্বন্ধে উঁহাদের ক্রিয়াও ছিল। আবার এই সকল বিষয় চিন্তা না করিলেও তিনি যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াশূন্য ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ক্রিয়ার উৎস শক্তি এবং শক্তি গুণ-নিষ্ঠ, ইহা যখন সত্য, তখন ক্রিয়া-শূন্যতাকেই গুণ-শূন্যতা মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং সেই জন্য যদি তাঁহাকে গুণ-শূন্য বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও ত্রুটী হয় নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মের গুণাতীতত্বের শক্তি যখন গুণময়ত্বের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা, তখন সৃষ্টিকালেই বা কেন সেই সকল গুণের ক্রিয়া হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা কখনও বলা হয় নাই যে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে তঁাহাতে তাঁহার গুণরাশির কোনই ক্রিয়া ছিল না। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই যে তিনি অনন্ত গুণাতীত ভাবে ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তখনও নিজেই নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন, নিজেই নিজেকে জানিতেন এবং প্রেম করিতেন ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই কালের উক্ত ভাব সমূহ তাঁহার নিজেরই ভাব এবং নিজেরই মধ্যে ছিল, কিন্তু উঁহাদের কোনই বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সুতরাং উঁহারা আমাদের নিকট ক্রিয়াপদ বাচ্য হইতে পারে না। এই বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ ভাবে আমাদের গুণাতীতত্ব শব্দের ধারণা করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত গুণ আছে বটে, কিন্তু তিনি উঁহাদের দ্বারা চালিত হন না, অপরন্তু তিনি উঁহাদিগকে পরিচালনা করেন। পৃথিবীতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। যেমন রাজা নিজে আইনের অতীত, কিন্তু তিনি আইন করেন এবং তাহা দ্বারা রাজ্য শাসন করেন। (The king is above law, but he enacts laws, applies them and administers the country with them). সুতরাং সৃষ্টিকালে যদি তাঁহার অনন্ত গুণরাশি দ্বারা তিনি ক্রিয়া করেন, তবে তাহাতে তাঁহার কোনই ত্রুটী হয় না। পরব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্বাধীনতায় নিত্য পরিপূর্ণ, সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন সৃষ্টি সম্ভব হইতে

পারে এবং তাহাতে তাঁহার অনন্ত গুণরাশির ক্রিয়া (ইচ্ছার বহিঃ-প্রকাশ) সম্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বোপরি আমাদের এই মাত্র বুঝিলেই হইল যে অনন্ত স্বাধীন পরব্রহ্মের অনন্ত স্বাধীন ইচ্ছায় সৃষ্টির সম্ভব হইতে পারে এবং লয়ও হইতে পারে। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে সৃষ্টিতে পরমপিতার অনন্ত গুণরাশির ক্রিয়া হইতেছে বটে, কিন্তু জগৎ-কার্য্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নির্লিপ্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নির্লিপ্ততার যে উচ্চতম আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে, ব্রহ্মে সেই অত্যুচ্চ আদর্শেরও নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নির্লিপ্ততা কি? পরমপিতার গুণাতীতত্বই সৃষ্টিকালে অত্যন্ত নির্লিপ্ততা ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। অতএব ব্রহ্মের গুণাতীতত্বই আছে বলিয়া সৃষ্টিকালে তাঁহার গুণরাশির ক্রিয়া হইতে বাধা নাই এবং জগতে ক্রিয়া হইতেছে বলিয়াই তাঁহার গুণাতীতত্ব লয় প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে তাঁহার অনন্ত গুণের ক্রিয়া জগতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত গুণাতীত বলিয়া নির্লিপ্ত ভাবে জগৎ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এখন একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী আরও পরিস্ফুট ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন উপমাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিদেশ হইতে আগত কোন এক মহাধনী ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সেই অর্থ হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারাই কোনওরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সেই জন্য সাধারণে তাহাকে দরিদ্র বলিয়াই জানেন। কিন্তু নিজ ধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান আছে এবং প্রোথিত অর্থের প্রতি তাঁহার মমতা আছে (মায়া নহে)।* কিন্তু তিনি নিজের ঐ সকল আন্তরিক ভাব সমূহের উর্দ্ধে উঠিয়া কখনই সেই অর্থের কিছু ব্যয় করেন না। এই ব্যক্তিকে ধনবান ও ধনহীন

* মম+তা=মমতা। "মম" এর ভাবকে মমতা বলে। "এই বস্তুটী আমার" এই জ্ঞানকে মমতা বলা হয়। মমতাকে সাধারণে মায়া বলে। কিন্তু ইহা ভুল। মমতা সরল, কোমল আধ্যাত্মিক গুণ।

উভয় আখ্যাই প্রদত্ত হইতে পারে। তিনি যে ধনবান সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সকল বিচারকই একবাক্যে তাঁহাকে উক্ত ধনের একমাত্র অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু তিনি যে ধনহীন, তাহাও নিঃসন্দেহ, যেহেতু সেই ধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান এবং ধনের জন্য মমতা (এই সকলই তাহার অন্তরের ভাবমাত্র, উহাদের কোনই বহিঃপ্রকাশ নাই) ভিন্ন সেই ধনের দ্বারা তিনি বাহিরের কোনই কার্য্য করেন না। বাহিরের জনগণ কেবল সেই অর্থের কোনই ক্রিয়া দেখেন না, তাহা নহে, কিন্তু সেই ধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত ধন থাকা না থাকা উভয়ই সমান। অনন্ত গুণাতীত পরব্রহ্মের সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। তিনি তখন গুণাতীত প্রধান ভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহার অস্তিত্ব, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি তখনও তাঁহাতে থাকে বটে, কিন্তু তিনি তাহা নিজ মধ্যেই অনুভব করেন মাত্র, জীব ও জগতের অভাবে তাঁহার গুণরাশির শক্তির বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ ক্রিয়া হয় না। আমরা ক্রিয়া দ্বারাই সদৃশ (Corresponding) গুণের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করি। যে স্থলে ক্রিয়া নাই, সেই স্থলে গুণেরও অভাব, ইহাই যখন আমাদের স্বাভাবিক ধারণা, তখন ব্রহ্মের গুণাতীত অবস্থাও যাহা, আমাদের ভাবে গুণ-শূন্যাবস্থাও তাহাই। সুতরাং সেই অবস্থাকে গুণহীন অবস্থা বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। বহুকাল পরে উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইল যে তিনি কোন একটী বিশেষ সৎকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যানুরোধে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি মোহান্ধ হইয়া কখনও কোন কার্য্য করিলেন না। তখনই, কেবল তখনই সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারিলেন যে সেই ব্যক্তি মহাধনী। সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সগুণ অবস্থাও তাহাই। তাঁহার গুণরাশির শক্তির বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ ক্রিয়া সমূহ আপামর সর্ব্বসাধারণে দেখিতেছেন। জীব জগতে তাঁহার

অনন্ত গুণ বিকশিত হইতেছে এবং জীব ও জড় জগতে তাঁহার অসংখ্য ক্রিয়া দেখা যাইতেছে। এখন তাঁহাকে আমরা সগুণ ব্রহ্মই বলিয়া থাকি। কারণ, এখন তাঁহার গুণরাশির শক্তির ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে। আবার এই অবস্থায়ও তিনি গুণাতীতও বটেন। কারণ, তাঁহার গুণাতীতত্বও নিত্য। তাই তিনি জগৎ-কার্য্য করিয়াও সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। উপরিলিখিত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে সৃষ্টিকালে ও সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয় কালেই ব্রহ্ম অনন্ত গুণময় ও অনন্ত গুণাতীত ছিলেন ও আছেন। তাঁহাতে কোন কালেই কোনও পরিবর্ত্তন আসে না বা আসিতে পারে না। তাঁহার Normal বা Extra-ordinary অবস্থা বলিয়া কিছু নাই। এই দ্বিভাব আমাদেরই কল্পিত বস্তু মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উহারা ভিত্তিহীন। সৃষ্টির পূর্ব্বকালে আমাদের ধারণীয় কোন ক্রিয়া তাঁহাতে ছিল না বলিয়াই তাঁহাতে গুণেরই অভাব ছিল অর্থাৎ তিনি গুণশূন্য এবং নিষ্ক্রিয়, এই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই ভাবই নানা আকারে নানা স্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কখনই নির্গুণ বা গুণ শূন্য ছিলেন না বা নাই। সৃষ্টিকালে তাঁহার অনন্ত গুণ দ্বারা অসংখ্য ক্রিয়া করিয়াও তিনি সদা নির্লিপ্ত অথবা অনন্ত গুণাতীত অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনন্ত গুণের ঊর্দ্ধেই নিত্য অবস্থিত, যদিও ইহা যথার্থ যে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে তিনি কেবল গুণময় মাত্র যেমন তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্গুণ বা গুণশূন্য ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা ইহাও বুঝিলাম যে গুণাতীত হইলেই গুণশূন্য হইতে হয় না। অতএব ব্রহ্ম যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণে নিত্য বিভূষিত এবং নিত্য অনন্ত গুণাতীত, এই তত্ত্বই সত্য, তিনি কখনও গুণশূন্য বা নিষ্ক্রিয় নহেন। গুণ বলিতে কেহ কেহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকেই বুঝেন। এই সকল গুণ জড়ের। উহারা ব্রহ্মের গুণ নহে। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সুতরাং ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণহীন বা নির্গুণ। গুণ বলিতে জড় জগতের গুণরাশি, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে কেহ কেহ লক্ষ্য

করেন। ব্রহ্মের জড়ীয় গুণ নাই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কঠোপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। (৩।১৫)।" "বঙ্গানুবাদ :—যিনি অশব্দ অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, গন্ধহীন। (তত্ত্বভূষণ)।" সুতরাং তিনি সেই অর্থে নির্গুণ বা গুণশূন্য। পাঠক এই সম্পর্কে "নেতিনেতিবাদ" অংশ দেখিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উপনিষদে নেতিবাচক শব্দ সমূহ জড়ের গুণ বা অবস্থা সমূহ লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র। সুতরাং সেই সকলকে যদি গুণ ধরা যায়, তবে তিনি নির্গুণ (গুণশূন্য) সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অনন্ত সরল গুণের অনন্ত আধার। তাঁহার অনন্ত সরল গুণ ঐ সকল শব্দে একবারেই অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। 'ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাঁহাকে জড় ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ দ্বারা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জড় আত্মা নহে। "নির্গুণ" শব্দের অর্থ যদি "গুণশূন্য" ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে ব্রহ্মে গুণরাশির অভাব আছে বলিতে হইবে। ব্রহ্মে অভাব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মে অভাবের বর্ত্তমানতা বোধ হয় মায়াবাদীও স্বীকার করেন না। মায়াবাদী ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ স্বীকার করেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্ব ব্রহ্মের গুণ এবং স্বরূপ ও গুণে কোনই পার্থক্য নাই। রূপের অর্থ যে গুণ, তাহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন। সুতরাং মায়াবাদী অন্ততঃ ব্রহ্মের তিনটী গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আর যদি একান্তই উঁহাদিগকে গুণ না বলিয়া স্বরূপ বলিতে হয়, তবে ব্রহ্ম প্রেম-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ, শিব-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, শান্ত-স্বরূপ, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, অদ্বৈত-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ ইত্যাদি ভাবে তাঁহার অনন্ত গুণকে প্রকাশ করা যায়। তাহাতে কোনই ত্রুটী হয় না। এই সম্পর্কে "নির্ব্বিশেষ বাদ" অংশে লিখিত বিষয় পাঠক দেখিবেন। উহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণই তাঁহার এক একটী স্বরূপ। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত স্বরূপ আছে।

আবার স্বরূপ যখন গুণই, তখন তিনি অনন্ত গুণাধার। মায়াবাদী বলিবেন না যে ব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপের অভাব আছে। আর ব্রহ্মে অভাব বা অপূর্ণতা থাকা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার ব্রহ্মে যদি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ আছে বলা যায় তবে তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ তাঁহাতে কেন থাকিবে না, ইহার কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর নাই। আর যদি বিপরীত ভাবে বলা যায় যে ব্রহ্মের যখন অন্যান্য স্বরূপ নাই, তখন তাঁহার উপরোক্ত তিনটী স্বরূপও নাই বলিতে হইবে, কারণ, মায়াবাদে তিনি নির্গুণ বা গুণশূন্য এবং রূপ অর্থে গুণ, তবে বলিতে হয় যে মায়াবাদী তাহা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে ইহা আমাদের ধারণার অতীত যে অভ্রান্ত উপনিষদে বিশ্বাসী মায়াবাদী কি প্রকারে প্রামাণ্য দ্বাদশখানি উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বারংবার উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ সমূহ তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিতে প্রস্তুত নহেন? তাঁহারা কেবল তৈত্তিরীয়োপনিষদুক্ত 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'-কেই ব্রহ্মের তিনটী মাত্র স্বরূপ ভাবে স্বীকার করেন। তাঁহারা কেন তাঁহার অন্যান্য উপ- নিষদুক্ত স্বরূপ সমূহকে স্বরূপ লক্ষণ বলিবেন না? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মায়াবাদী মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিশেষত্বের পক্ষপাতী। কারণ, উহাতে তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে ব্রহ্মকে শিব ও অদ্বৈত বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে মায়া- বাদী কখনই যুক্তিযুক্ত ভাবে এই দুইটী স্বরূপ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিতে পারেন না। মায়াবাদী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রের উপাসক বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহারা ব্রহ্মকে একরস বলেন। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা কি প্রকারে অদ্বৈতত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিতে পারেন? উহারা তাঁহার সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্বের ন্যায় তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ না হইয়াই পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব সাধিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি শিব হইয়াছেন। যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের মিলন হয় নাই, তিনি শিব হইতে পারেন না, ইহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

হইয়াছে। ব্রহ্ম যখন শিব, তখন তিনি অনন্ত গুণধাম সুতরাং অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন সুতরাং সক্রিয়, ইহা বুঝিতে হইবে। এক শিব শব্দ দ্বারাই ব্রহ্মের ত্রিবিধ ভাব প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ তিনি অনন্ত গুণময়, অনন্ত শক্তিমান ও সক্রিয়। মাণ্ডুক্যোপনিষদই যখন ব্রহ্মকে শিব বলিয়াছেন, তখন যুক্তিযুক্ত ভাবে মায়াবাদ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুতরাং মায়াবাদীও ব্রহ্মকে সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, শিব-স্বরূপ, অদ্বিতীয়-স্বরূপ বলিতে বাধ্য। মায়াবাদী অনন্তত্বকে ব্রহ্মের একটী স্বরূপ বলেন। অনন্ত শব্দের অর্থ কেবল ইহা হইতে পারে না যে তিনি কেবল অনন্ত ভাবে ব্যাপ্তই অর্থাৎ তাঁহাতে বৃহত্তমত্বের নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অনন্ত শব্দের প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্বভাবেই—অনন্ত ভাবেই অনন্ত, অর্থাৎ তাঁহার কোন ভাবেরই অন্ত পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ বা গুণ অনন্ত, তাঁহার শক্তি অনন্ত, এবং তাঁহার ক্রিয়াও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ তিনটী মাত্র নহেন। স্বরূপ অর্থে যখন গুণ, তখন তাঁহাতে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান। তাঁহার গুণ যখন অনন্ত, তখন তাঁহার শক্তিও অনন্ত, একমাত্র মায়াই তাঁহার শক্তি নহে। আবার মায়ার ন্যায় তাঁহার অনন্ত শক্তি সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ব্রহ্মের মহিমা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য সকলই অনন্ত ভাবে অনন্ত। তাই পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন: - "অনন্ত গুণনিধান, অনন্ত সুখ আলয়, অনন্ত ব'লেও অন্ত, নাহি পায় এ হৃদয়। অনন্ত গুণ গণনে, অনন্ত-উন্নত গুণে, সে গুণীর গুণ-অন্ত কেমনে হ'বে নিশ্চয়? যে ভাবে হেরি অনন্ত, শান্ত অনন্ত অনন্ত, অনন্ত অনন্ত কান্ত. অনন্ত আনন্দময়। অনন্তের অন্ত যদি নাহি পেলেম এ অবধি, তবে যে পাইব তাঁয় এ আশা ত নাহি হয়। তবু না ছাড়্‌ব যতন, কোথা র'বে সে রতন, লুকায়ে একায়ে, মোর বহায়ে বারি হিয়ায়। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)" মায়াবাদী ব্রহ্মকে একরস বলিয়াও তাঁহার তিনটী স্বরূপ স্বীকার করেন। যদি তিনটী স্বরূপ থাকিয়াও একরস হইতে পারা যায়, তবে বহু স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ থাকিলেও কেন একরস হইতে পারা

যাইবে না? ইহা যে সম্ভব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এক হইয়াও বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। ইহা উপনিষদেরই উক্তি (অহং বহুস্যাম্‌), সুতরাং তিনি একরস বা একমাত্র স্বরূপ হইয়াও অনন্ত স্বরূপ হইতে পারেন। আবার "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের মিলন হইয়াছে। একত্ব ও বহুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ। সুতরাং উহাদেরও যে তাঁহাতে অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই তাঁহাতে অনন্ত একত্বের একত্ব সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি একরস, ইহাও যেমন সত্য, তাঁহাতে অনন্ত গুণও আছে, ইহাও তেমনি সত্য। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে তাঁহার অনন্ত গুণ তাঁহাতে একীভূত হইয়া আছে, অর্থাৎ তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ বা একরস। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মে সরল কঠোর বহুত্ব বোধ আছে। তাঁহার বহুগুণ সুতরাং বহু শক্তি আছে বলিয়াই তাঁহাতে বহুত্ব বোধ সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাতে যদি বহু না থাকিত, তবে তাঁহাতে বহুত্বের জ্ঞান সম্ভব ছিল না এবং তিনি বহুর, নানার স্রষ্টাও হইতে পারিতেন না। যাহা তাঁহাতে নাই, তাহা সৃষ্টিতে আসিতে পারে না। এই সত্য তত্ত্ব এই গ্রন্থের বহু স্থলে কথিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা সর্ব্বদাই বিকৃত, কিন্তু ব্রহ্মে যাহা বর্ত্তমান, তাঁহা নিত্য অবিকৃত। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে কেহই নির্গুণ শব্দে ব্রহ্মকে অনন্ত সরল গুণশূন্য বলেন না। উপনিষদেও নেতিনেতিবাচক অন্যান্য উক্তিতে সেই ভাব আমরা দেখিতে পাই না। বরং ব্রহ্মের বহু গুণের উল্লেখ ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্রহ্ম একই এবং তিনি অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত। নির্গুণ ও সগুণ ভাবে একজন উচ্চতর ও একজন নিম্নতর ব্রহ্ম নাই, কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্রহ্মেই সগুণত্ব ও গুণাতীতত্ব উভয়ই নিত্য বর্ত্তমান। মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণশূন্য) এবং নিষ্ক্রিয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম ও মায়ার যোগে

সগুণ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) সীমাবদ্ধ ব্রহ্ম ভাবে সৃষ্ট হইয়াছেন। কথিত আছে যে অনন্ত ব্রহ্মের চতুর্থাংশ মায়োপহিত হইয়া সগুণ ব্রহ্ম হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা আরও দেখিয়াছি যে সগুণ ব্রহ্মের আদি ও অন্ত আছে, তাহা যত দূরবর্ত্তী কালেই হউক্ না কেন। তিনি অনাদি অনন্ত নহেন। সগুণ ব্রহ্মের যখন আদি আছে, তখন নিশ্চিত ভাবে অনুমান করিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই তাঁহার চতুর্থাংশ মায়োপহিত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের (পরব্রহ্মের) মধ্যে পার্থক্য কি? নির্গুণ ব্রহ্ম অনন্ত অসীম ও সগুণ ব্রহ্ম মায়োপহিত ও সীমাবদ্ধ, এই মাত্র পার্থক্য। সেই মায়া তাঁহার (সগুণ ব্রহ্মের) অধীন। তিনি মায়া যোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন। অন্যান্য মতালম্বিগণ ব্রহ্মের (মায়াবাদের পরব্রহ্মের) যে সকল গুণ আছে বলেন, মায়াবাদী সেই সকল গুণ সগুণ ব্রহ্মে আরোপ করেন। এখন প্রশ্ন হইবে যে সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশি কোথায় হইতে আসিল। মায়ার এইরূপ শক্তি নাই যে সে ঈশ্বরে গুণরাশি সৃষ্টি করে। মায়াকে ত্রিগুণ সম্পন্না বলা হয়। আরও কথিত আছে যে মায়ার দুইটী শক্তি—একটী আবরণ ও অন্যটী বিক্ষেপ। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি দেখিবেন যে জীবের পক্ষে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তিনই বন্ধনের কারণ। সত্ত্বও জীবকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে। সুতরাং এইরূপ গুণ ও শক্তি সম্পন্না মায়া ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত কল্যাণ গুণ ও শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। আর মায়া ঈশ্বরে সদ্গুণরাশি উৎপাদন করে, ইহা কতদূর সত্য, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই বিষয়টী অন্য ভাবে চিন্তা করা যাউক্। জীবের সর্ব্বদিকেই মায়া। উহা যদি ঈশ্বরে অনন্ত কল্যাণ গুণ সৃষ্টি করিতে পারে, তবে জীবেও তাহা কেন সম্ভব হয় না? মায়াবাদের জীবাত্মাও ত কূটস্থ ব্রহ্ম (জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্)। সত্ত্ব জড়ের গুণ, আত্মার গুণ নহে। সুতরাং সত্ত্বগুণ কল্যাণ গুণরাশি সৃষ্টি করে বলিলে বুঝিতে হইবে যে জড় কল্যাণ গুণ সৃষ্টি করিবার শক্তি রাখে। সত্ত্বগুণ যদি সগুণ ব্রহ্মে ও

জীবে কল্যাণ গুণ সৃষ্টি করিতে পারিত, তবে mechanistic theory of creation (জড়বাদ) যে বলে আমাদের চৈতন্য ও অন্যান্য গুণরাশি দেহস্থিত জড়ের Physical and Chemical action-এর ফল মাত্র, কিন্তু উঁহারা আত্মার চৈতন্য বা গুণ নহে, ইহা মায়াবাদীর স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তিনি তাহা কখনও স্বীকার করিবেন না। পাঠক মনে রাখিবেন যে মায়া ও সাংখ্য প্রধান উভয়ই ত্রিগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং এই ভাবে তুল্য। মায়ার শক্তি যদি সগুণ ব্রহ্মে কল্যাণ গুণরাশি উৎপাদন করিতে পারে, তবে সাংখ্য প্রধানও পুরুষকে গুণরাশি সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু সাংখ্য দর্শন পুরুষের পক্ষে তাহা দাবী করেন না। মায়া বহুলাংশে সাংখ্য প্রধানের অনুকরণে কল্পিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মায়া সগুণ ব্রহ্মে কল্যাণ গুণরাশি উৎপাদন করিতে পারে না। মায়া বাদ দিলে সগুণ ব্রহ্মের বাকী রহিল পরব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশ। সেই অংশে যদি গুণ ও শক্তিরাশি থাকে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে তিনি যাঁহার অংশ, সেই সকল কল্যাণ গুণ ও শক্তিরাশিও তাঁহারই অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই। কারণ, সমস্তে যাহা নাই, অংশে তাহা আসিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছাও আছে, ইহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তিনিই করেন। সুতরাং পরব্রহ্মেও অনন্ত কল্যাণ গুণ ও শক্তিরাশি (ইচ্ছাশক্তি সহ) নিত্য বর্ত্তমান, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সম্পর্কে "সোঽহং জ্ঞান" অংশ দ্রষ্টব্য। কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে দেবতাদের নিজেদের কোনই শক্তি নাই, সকল শক্তিই ব্রহ্মের (মায়াবাদের পরব্রহ্মের)। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মেরও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি ও গুণরাশি পরব্রহ্মেরই। পরব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ভিন্ন সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এবং জীবের কাহারও কোনও গুণ বা শক্তি নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মই। উপাধিই পার্থক্যের কারণ। উপাধি—মায়া ব্রহ্মকে আর উৎকর্ষ দান করিতে পারে না। বরং ব্রহ্মের অনন্ত গুণ নানাবিধ ভাবে আবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবনত ও সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান

করিতে পারে—ব্রহ্মের গুণরাশি বিকৃত করে ও অপূর্ণ রাখে, ইহা বলিলেই যুক্তি সঙ্গত হয়। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে সগুণ ব্রহ্ম তাঁহার গুণ ও শক্তি রাশি পরব্রহ্ম হইতেই লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে জড়ে আত্মিক গুণ রাশিও বর্ত্তমান, নতুবা অন্তঃকরণের মাধ্যমে সেই সকল গুণের প্রকাশ দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে আত্মার গুণ ও শক্তি-রাশিকে দেহ আবরণ করিয়াই রাখে, বিকৃতই করে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে দেয় না। যেটুকু প্রকাশ আমরা দেখি, তাহা গুণ-রাশির সত্য ও সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে, কিন্তু দেহ সংসর্গে উঁহাদের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ। দেহ যত হীন, অর্থাৎ যে দেহ যত তমঃ এবং রজঃ ভাবাপন্ন, সেই দেহ আত্মার গুণরাশি ততোঽধিক আবরণ করিয়া রাখে বা উঁহাদের প্রকাশের বাধা প্রদান করে। যথা পর্ব্বতের দেহ। পর্ব্বত আত্মার প্রায় কোন গুণই তাহার দেহ প্রকাশ করে না। কারণ, উহা ক্ষিতিময় বা তমোময়। এইরূপ ভাবে আমরা যত উন্নত দেহের বিষয় চিন্তা করিতে যাই, ততই দেখিতে পাইব যে গুণরাশির আবরণ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে। সত্ত্বগুণকে স্বচ্ছ বলা হয়, তাই সত্ত্ব প্রধান দেহে বাধার পরিমাণ অল্পতম। সুতরাং সেই দেহে আত্মার গুণরাশির বিকাশ অধিকতর ভাবে দেখা যায়। অতএব সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে কল্যাণ গুণরাশি আত্মারই সম্পদ। উঁহারা তমঃ, রজঃ বা সত্ত্বগুণের নহে। দেহে উঁহাদের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে আবরণের পরিমাণ অল্পাধিক হয় মাত্র। অর্থাৎ আবরণের আধিক্য, অল্পতা ও স্বল্পতা অনুযায়ী বাধার পরি-মাণের আধিক্য, অল্পতা ও সল্পতা হয়। তাই গুণরাশির প্রকাশের তারতম্য হয় মাত্র।* জড়ের কোন আত্মিক গুণ নাই। জড়ে জ্ঞান, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ আমরা দেখিতে পাই না। প্রশ্নকর্ত্তার একথা বলিলেও চলিবে না যে ঐ সকল গুণ যে জড়ে সূক্ষ্ম ভাবেও নাই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণের ভার তাহার

* "জড়ের বাধকত্বের কারণ" অংশে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান।

উপর (Burden of proof lies upon him)। সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে জড় চৈতন্য-শূন্য এবং আত্মিক গুণশূন্য। এই গ্রন্থেও তাহা বহুস্থলে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তাই ইহা প্রমাণ করিবেন যে মানবের এই ধারণা ভুল, যেমন বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছেন যে পৃথিবী অচল নহে, কিন্তু উহা সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিতেছে। বাদী অন্তঃকরণের অর্থাৎ উহার যন্ত্রের মস্তিষ্কের বিষয়ই কেবল উল্লেখ করিয়াছেন। যদি জড়ে আত্মিক গুণই থাকিত, তবে জীবের মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্রও উঁহা দেখিতে পাইতাম। কারণ, জীবদেহও যেরূপ জড়-পদার্থ, অন্য জড়ও সেইরূপ জড়-পদার্থ বটে। যদি বলেন যে মস্তিষ্ক পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত, তাই উহা হইতে কল্যাণ গুণ-রাশি উৎপন্ন হইতে পারে, তবে বলিতে হয় যে ব্যোম সত্ত্ব-প্রধান এবং উহা বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং মস্তিষ্ক যদি সদগুণরাশির কারণ হইতে পারে, তবে অন্যান্য জড়ও উহাদের কারণ হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে স্থিত সর্ব্বপ্রকার জড়েই সেই আত্মিক গুণ দেখিতে পাইতাম। একমাত্র জীবদেহের অন্তঃকরণে মাত্র (কিন্তু অন্য জড়ে নহে) যখন গুণরাশির বিকাশ দেখা যায়, তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে জীবাত্মারই গুণরাশি জীবদেহে বাধার পরিমাণ অনুযায়ী অল্লাধিক প্রকাশিত হয়। জড় যে চৈতন্য-শূন্য তাহা হিন্দু ষড়দর্শনই স্বীকার করেন। উপনিষদ্‌ও তাহাই বলেন। আচার্য্য শঙ্কর কেবল সেই মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি জড় জগৎকে মিথ্যাই বলেন। বিজ্ঞান ত এক বাক্যেই জড়কে চেতনাহীন বলেন। এই সম্পর্কে "জড়কে আত্মা বলিতে দোষ কি?" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। অতএব জড়কে আত্মিক গুণে গুণবান বলা যাইতে পারে না এবং সেই জড়ের গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জীবাত্মাতে বা সগুণ ব্রহ্মে কল্যাণ গুণরাশি সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং জীবে বা সগুণ ব্রহ্মে যে কল্যাণ গুণরাশি বর্ত্তমান, তাহা তাঁহাদেরই নিজ সম্পত্ত। মায়ার সম্পর্কে আসিয়া উহারা উৎপন্ন হইয়াছে অথবা

প্রতীয়মান হইতেছে, এই কল্পনা সত্য নহে। মায়াবাদে মায়ার দুইটি শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। একটী আবরণ ও অন্যটী বিক্ষেপ শক্তি। দেখা যাউক্ এই শক্তিদ্বয় দ্বারা জড় কল্যাণময় গুণের উৎপাদন করিতে পারে কিনা। আবরণের কার্য্য অন্ধকার সৃষ্টি করা। অন্ধকার দ্বারা যে কখনই কল্যাণ গুণ সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে দেখা যায় যে অন্ধকারই সকল ভয় ও অনিষ্টের মূল। অন্ধকারই ভয়ের কারণ, অন্ধকারেই বিষাক্ত হাওয়া সৃষ্ট হয়। Carbon gas-এর সহিত অন্ধকারের তুলনা আনয়ন করা যাইতে পারে। Carbon gas যেমন মৃত্যু আনয়ন করে, তেমনি অন্ধকারও মৃত্যু আনিতে পারে। মায়াকে অন্ধকারের সহিতও তুলনা করা হয়। যথা—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মায়ারূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ তমঃ-এর আবরণ কখনই কল্যাণ গুণ উৎপাদন করিতে পারে না। কূটস্থ ব্রহ্ম অবিদ্যা উপহিত। সুতরাং মায়া জীবাত্মার আবরণ। আবার ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া ধ্বংস হয়, যেমন আলোকের উপস্থিতিতে অন্ধকার বিনষ্ট হয়। সুতরাং মায়া-আবরণ যাহা অন্ধকার উৎপাদন করে, তাহা কল্যাণ গুণ উৎপাদন করে না বা করিতেও পারে না। বিক্ষেপও যে কল্যাণ গুণ উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা সহজ-বোধ্য। বিক্ষেপের অর্থ চঞ্চলতা। এই বিক্ষেপের মাত্রা অধিক হইলেই বাতুলতায় পরিণত হয়। বিক্ষিপ্ত চিত্তে উপাসনা অসম্ভব, সাধনাও অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা কোনও বিশেষ কার্য্য বা চিন্তা, ধ্যান ধারণা অসম্ভব। উপনিষদ্ বলেন "অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" এই মন্ত্রে পাওয়া যায় যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব্রহ্মে তন্ময় হওয়া অসম্ভব। "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে অন্তঃকরণ লয় না হইলে অর্থাৎ চঞ্চলতা সম্পূর্ণ লয় এবং স্থৈর্য্যের একাধিপত্য লাভ না হইলে ব্রহ্ম-দর্শন অসম্ভব। সুতরাং বিক্ষেপের কোন অবস্থায়ই কল্যাণ গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্পভ্রমে যে চিত্ত বিক্ষেপ হয়, সেইরূপ চিত্ত বিক্ষেপে ভয় এবং আশঙ্কাই উৎপন্ন হয় এবং দ্রষ্টা যদি দুর্ব্বল হৃদয় হয়, তবে উহাতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে

পারে। সুতরাং বিক্ষেপ দ্বারা কোনওরূপ কল্যাণ গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই বিক্ষেপকে রজোগুণের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে রজোগুণের জন্ম কোন কল্যাণ গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যে বিক্ষেপের কথা মায়াবাদের দৃষ্টান্তে পাই, তাহা রজোগুণের অতি নিম্নস্তরের অবস্থা। রজোগুণের উচ্চতর, উচ্চতম অবস্থায় আমাদিগকে সত্ত্বগুণের দিকে প্রেরণা দান করে। মায়াবাদের দৃষ্টান্তে (রজ্জুতে সর্পভ্রম) অন্য কোন শক্তির উল্লেখ নাই। তমঃ-এর শক্তি আবরণ এবং রজঃ-এর শক্তি বিক্ষেপ। কিন্তু দৃষ্টান্তে সত্ত্ব-গুণ পাওয়া যায় না। সত্ত্ব গুণ স্বচ্ছ। উহার স্বচ্ছতা জন্য ব্রহ্মের গুণরাশি উহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে, যেমন দর্পণে নিকটস্থ পদার্থ প্রতিফলিত হয়। দর্পণের সম্মুখে যে প্রকার পদার্থ রক্ষিত হইবে, দর্পণও সেইরূপ চিত্রে চিত্রিত হইবে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই "চিদাভাস" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সত্ত্বগুণে চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের আভাস পতিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি ব্রহ্মে গুণের সম্পূর্ণ অভাবই থাকিত, তবে সত্ত্ব গুণেও তাঁহার দ্বারা কিছুই প্রতিফলিত হইত না। সুতরাং সত্ত্বগুণও যে কল্যাণ গুণ উৎপাদন করিতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে লিখিত বিষয় পাঠক স্মরণ করিবেন। উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মার গুণ ও শক্তিই অন্তঃকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ জড় সংসর্গে প্রকাশিত হয় বলিয়া উহারা বিকৃত হয়। এই জন্যই আত্মার গুণের সমগ্র প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, বিকৃত প্রকাশই দেখি। তাই মায়াবাদে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকারকে বৃত্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা আত্মারই গুণ ও শক্তি এবং জড় সংসর্গ জন্য উহাদের বিকৃত ভাবের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। অবশেষে একটী কথা বলিলেই সিদ্ধান্ত সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহা এই যে মায়াবাদী ত্রিগুণ সম্পন্না মায়াকে আবরণই বলেন। সগুণ

ব্রহ্ম মায়োপহিত পরব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ এবং কূটস্থ ব্রহ্ম অবিদ্যা উপহিত। উপহিত অর্থে আবৃত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের বা কূটস্থ ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ মায়া তাঁহাদের স্বরূপ বা ব্রহ্মত্ব ঢাকিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ মায়ার আবরণ তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে দিতেছে না। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে আবরণের গাঢ়ত্বের পরিমাণ অনুযায়ী আবৃত পদার্থের রূপ বাহিরে অল্পাধিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং আবরণের যে রূপ থাকে, তাহা দ্বারা আবৃত পদার্থের রূপ বিকৃত হয়। ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অর্থাৎ জড় পদার্থ আবরণের কার্য্যই করিতে পারে, কিন্তু কল্যাণ গুণ উৎপাদন করিতে পারে না। পাঠক মনে রাখিবেন যে আত্মার কল্যান গুণ না থাকিলে, উঁহার আভাসে কল্যান গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা ইতিপূর্ব্বেই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শন ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে জীবাত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। উহাদের প্রথম তিনটি ইচ্ছারই প্রকারভেদ মাত্র। দ্বেষ অর্থে কোন পদার্থকে ইচ্ছা না করা এবং প্রযত্ন অর্থে কোন পদার্থকে পাইবার জন্য ইচ্ছা হইলে তাহা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা, সুতরাং উহাদের মধ্যে ইচ্ছা বর্ত্তমান। সাংখ্যমতেও জীবাত্মার সুখে ইচ্ছা ও দুঃখে দ্বেষ আছে। আমরা "গুণ বিধান" অংশে দেখিয়াছি যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত এক হইলেও দেহাবদ্ধ অবস্থায় অংশীভূত ভাবেই বর্ত্তমান। আমরা জীবাত্মার জ্ঞান, প্রেম, ও ইচ্ছা দেখিতে পাই। অবশ্যই জীবের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা অপূর্ণ ও বিকৃত। কিন্তু আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই অনুমান করিতে পারি যে জীবসমূহের জনক ব্রহ্মে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা অনন্ত, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ (অবিকৃত) ভাবেই নিত্য বিদ্যমান। মায়াবাদ অনুযায়ী পরমাত্মা (ব্রহ্ম) এবং জীবাত্মার কোন ভেদ নাই। জীবাত্মা সাক্ষী মাত্র ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু চিদাভাস বুদ্ধিকে চালনা করে। অর্থাৎ জীবে আমরা যে কার্য্য সমূহ দেখিতে পাই, তাহা আত্মার নহে, চিদাভাসের। আমরা জগতে দেখি যে মূল পদার্থকে উহার আভাস অপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে।

কিন্তু আভাসে মূল পদার্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। ছায়াতে কায়ার কিঞ্চিৎ পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়। পাঠক এই সম্পর্কে ১২৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্ত্রটী (ন তত্র সূর্য্যোভাতি ইত্যাদি) এবং ইতিপূর্ব্বে লিখিত প্রতীক উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিবেন। জড় সূর্য্যের জ্যোতিঃতে যদি আমরা পরম জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের পরিচয় পাই, তবে জীব দ্বারা অর্থাৎ চিদাভাস দ্বারা ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় অবশ্যই পাইতে পারি। কারণ, চিদাভাসের অর্থই কূটস্থ ব্রহ্মের আভাস। পাঠক ১২৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সঙ্গীতে দেখিবেন যে আমরা কোন বস্তু হইতে পরব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তির পরিচয় পাইতে পারি। জীবের মধ্যে আমরা নানা গুণ ও শক্তি দেখিতে পাই। তাহা যে বিকৃত ও অপুর্ণ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মায়াবাদে সেই সকল গুণ ও শক্তি চিদাভাসের খেলা বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মে যে সেই সকল গুণ ও শক্তি পুর্ণ ও অবিকৃত ভাবেই বর্ত্তমান আছে, তাহা আমরা যুক্তিযুক্ত এবং সত্য ভাবেই অনুমান করিতে পারি। আত্মার সরল গুণ রাশি যে জড় সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানময়, প্রেমময়, ইচ্ছাময় ইত্যাদি অনন্ত গুণে গুণময় ও অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্। জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা, তাহা "গুণ বিধান" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কারণ, জীব ও জগৎ তাঁহারই কার্য্য। * জগতে দেখি যে কোন এক ব্যক্তি কার্য্য বা চিন্তা করিলে সেই কার্য্য বা চিন্তায় তাহার স্বভাব ফুটিয়া উঠে। মানব অনেক সময় নিজের স্বভাব তাহার কার্য্য হইতে লুকাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু বুদ্ধিমানের নিকট তাহার স্বভাবের অন্ততঃ কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে যে মানবের চেহারা দেখিয়া তাহার মনের ভাব বলিয়া দিতে পারা যায় কিনা। এ বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। অতএব জগতে

---

* জীব অর্থে আত্মা+দেহ (অন্তঃকরণসহ) মিলিত পদার্থ। একমাত্র আত্মাই জীব নহেন। আত্মা ব্রহ্মের কার্য্য নহেন, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই।

বিশেষতঃ জীবের স্বভাবে যে সকল সদ্‌গুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনুমান করিতে পারি যে সেই সকল গুণ পরব্রহ্মে পূর্ণ, অনন্ত ও অবিকৃত ভাবেই নিত্য বর্ত্তমান। মায়াবাদী হয়তঃ বলিবেন যে মায়ার বিক্ষেপ শক্তিতে জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে। মায়ার সংজ্ঞা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সেই মিথ্যা মায়া উহার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা যে সগুণ ব্রহ্মে বা জীবে কল্যান গুণ ও শক্তি রাশি সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিষয়টী আমরা অন্য ভাবেও চিন্তা করিতে পারি। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় কেন? ভ্রমের কারণ এই যে রজ্জুতে তৎকালীন অবস্থা এরূপ হয় যে উহা অল্লান্ধকারে আবৃত থাকায় উহাতে সর্পের আকৃতির নিকটতম সাদৃশ্য সংঘটিত হয়। রজ্জু রজ্জুই থাকে, কিন্তু আমরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সর্প বলিয়া মনে করি। সুতরাং জগৎ ও জীব ব্রহ্মের nearest approach বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। অর্থাৎ তাহাদের গুণ ও শক্তিরাশি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মের মধ্যে উঁহারা পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও জগতে যখন নানাবিধ গুণ ও শক্তিরাশি আছে, ব্রহ্মেরও তেমন "পরাস্য শক্তি-বিবিধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (বঙ্গানুবাদ ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। জীব ও জগৎ দেখিয়া ব্রহ্মের গুণ ও শক্তির অনুমানে কোন প্রকারের ভুল আসিতে পারে না। কারণ, মায়াবাদও ব্রহ্মকে জীব ও জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়াছেন। কার্য্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই কারণ কে অবশ্যই পাইতে পারা যায়। যদি ইহাতেও আপত্তি হয়, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম জীব ও জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। পাঠক এই সম্পর্কে ১৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয় দেখিবেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে আচার্য্য শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্ম-কার্য্য ও ব্রহ্মা-ভিন্ন। সুতরাং উক্তরূপ অনুমান মায়াবাদ অনুযায়ী বলা যাইতে পারে। মায়াবাদী ব্রহ্মকে নির্গুণ (গুণ শূণ্য) বলেন বটে, কিন্তু জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বহু প্রামাণ্য দর্শন শাস্ত্র তাঁহাকে অনন্ত গুণ ও শক্তির

আধার বলিয়া কীর্তন করেন। ব্রহ্মপ্রেমে মগ্ন হইয়া যে সাধক সাধিকাগণ তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহাকে অনন্ত গুণাধার ভাবে উপাসনা ও সাধনা দ্বারা যে সাধক সাধিকাগণ পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। তাঁহারা জগৎ সমক্ষে সেইরূপ ভাবেই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। অপরপক্ষে কোন মায়াবাদী সাধক বলেন নাই যে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরে তিনি জগৎ বিবর্জ্জিত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মকেই লাভ করিয়াছেন, এবং দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই ভাবেই অর্থাৎ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ভাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন, ও পার্থিব ব্যবহারিক জীবন তাঁহার ছিল না। বরং আমরা "সোহহংজ্ঞান" অংশে ইহার বিপরীতই দেখিয়াছি। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রাপ্ত সাধক প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বহুকাল জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় যদি মায়াবাদ অবলম্বনে ব্রহ্মকে গুণ-শূন্য বলা হয়, যদি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্বকে তাঁহার গুণ না বলিয়া তাঁহার স্বরূপ বলা হয়, (যেন স্বরূপ ও গুণ পৃথক্), তবে আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে যে যাইতেছি, তাহা সুনিশ্চিত। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে যদি কেহ এই বুঝাইতে চাহেন যে তিনি অনির্ব্বাচ্য ও অনির্দ্ধার্য্য, তবে আমরাও সেই ভাব সমর্থন করি। তিনি "নির্দ্ধার্য্য নির্ব্বাচ্য দশাদ্বয়াতিগ" সত্য। কারণ, তাঁহার অনন্ত গুণ কেহই ধারণা করিতে সুতরাং নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এই সম্পর্কে পাঠক "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশ দেখিবেন। ব্রহ্ম অবাঙ্-মনসোগোচর বটেন, কিন্তু সেইজন্য তিনি গুণ-শূন্য নহেন। তাঁহাকে একটু একটু জানা যায়। এই সম্পর্কে পাঠককে কেনোপনিষদের ২য় খণ্ডের ১-৩ মন্ত্র সমূহ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। উহাদের অর্থ এই যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় না, কিন্তু তাঁহারই কৃপায় তাঁহারই অনন্ত গুণের এক একটীতে একত্ব লাভ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হওয়া যায়। মায়াবাদে সগুণ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) মায়োপহিত, জীবও মায়োপহিত। মায়াবাদী বলিবেন যে ঈশ্বর মায়োপহিত বটেন, কিন্তু জীব অবিদ্যা উপহিত। মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হয়।

ঈশ্বরে যে মায়া, তাহা সত্ত্ব-গুণ প্রধানা। তাহাতেও (সেই মায়াতেও যে রজঃ এবং তমঃ বর্ত্তমান, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে সমর্থ হইতেন না। কথিত আছে যে ঈশ্বর মায়াকে পরিচালনা করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করেন। অপর পক্ষে জীবে মায়া তমঃ প্রধানা, তাই সে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জীবের মায়ার মধ্যেও সত্ত্ব ও রজঃ অবশ্যই বর্ত্তমান। তাহাদের কার্য্যেই তাহা আমরা দেখিতে পাই। উভয়ের পক্ষেই মায়া একই, কেবল উহাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিমাণের পার্থক্য মাত্র। উভয়েরই মায়া বাদ দিলে জীব ও ঈশ্বরে কোন পার্থক্য থাকে না। এখন অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে উভয়ই যখন ব্রহ্মই, তখন একের উপাধি সত্ত্ব-প্রধান এবং অন্যের উপাধি তমঃপ্রধান হইল কেন। ইহার একমাত্র যুক্তি সঙ্গত উত্তরই এই যে যিনি পরব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বোপরি, যিনি ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনিই নিশ্চয় তাঁহার অসীম শক্তি-শালিনী ইচ্ছা দ্বারা এইরূপ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই বিধাতা—তিনি নির্গুণ (গুণ-শূন্য) ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ নির্বিশেষ নহেন। মায়াবাদী বলেন যে পরব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্ব তাঁহার স্বরূপ বটে, কিন্তু গুণ নহে। মায়া তাঁহার শক্তি। ইহারা ভিন্ন তাঁহার কোন গুণ বা শক্তি নাই। মায়াতে কার্য্য-শক্তি দেখিতে পাই। যথা—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। মায়া যখন ব্রহ্মেরই শক্তি, তখন উহা তাঁহাতে অভিন্ন ভাবে নিত্য বর্ত্তমান, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন যে শক্তি শক্তিমান্ ভিন্ন কার্য্য করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় ব্রহ্মের ইচ্ছা-শক্তি আছে বলিলে দোষ কি? কার্য্যকরী শক্তি যে শক্তিমানে থাকে, তাহাতে ইচ্ছাশক্তিও আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যই হয়না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইচ্ছা অন্তরের ভাব এবং কার্য্য উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেহ কেহ ইচ্ছার অর্থ ঈপ্সা এবং will এর অর্থ desire মনে করিয়া পূর্ণব্রহ্মে ইচ্ছার অস্তিত্ব অসম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জানিনা মায়াবাদীও সেই ভাবে ইচ্ছার

অর্থ গ্রহণ করিয়া উঁহাকে এত হীন মনে করেন কিনা। পাঠক এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা", "লীলাতত্ত্ব" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশত্রয় দেখিবেন। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি নাই বলিলে প্রকারান্তরে তাঁহাকে অপূর্ণই বলা হয়। এস্থলে অমাদের মনে রাখিতে হইবে যে নির্ব্বিশেষবাদ সম্পর্কে উপনিষদের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে শ্রুতি পরব্রহ্মকে সত্যকাম, সত্য-সঙ্কল্প, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, প্রভু, নিয়ন্তা, অন্তর্যামী, কর্ম্মাধ্যক্ষ, বিধাতা, গুণী, আনন্দ, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, প্রেমময়, কৃপাময়, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি এত অনেক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন যে তাঁহাকে আর ইচ্ছাময়, কর্ম্মকর্ত্তা, অনন্ত গুণে গুণবান না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। শক্তি গুণ-নিষ্ঠ। শক্তি গুণী শক্তিমান্ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহে। শক্তিমান্ গুণী বলিয়া তাঁহার দ্বারা শক্তি যে পথে চালিত হয়, সেই পথেই উহা চলিবে। উঁহার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই। যদি বলা হয়-যে সগুণ ব্রহ্মে সেই সকল গুণ ও শক্তিরাশি বর্ত্তমান সুতরাং নিয়মের ব্যত্যয় হইল না. তবে বলিতে হয় যে ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এই যে মায়াবাদের কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও শক্তিরাশি পরব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত। পাঠক এই সম্পর্কে ১২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয় পাঠ-করিবেন, তাহাতে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে প্রত্যেক শক্তিই গুণনিষ্ঠ। মায়া পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কথিত হয়। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে উহার পশ্চাতেও গুণ বা গুণরাশি বর্ত্তমান আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব মায়াবাদীর স্বীকার করিতে হইবে যে পরব্রহ্ম সগুণ। শক্তি আছে, কিন্তু ক্রিয়াশক্তি নাই অর্থাৎ শক্তিমান্ নিত্য নিষ্ক্রিয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে কোথায়ও দেখা যায় না। একথা অবশ্য সত্য যে শক্তিমান্ কখন কখন শক্তির ব্যবহার করেন এবং কখন কখন তাহা করেন না। কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলেন না। অতএব পরব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে শক্তি (Energy) কখনও স্বাধীন

ভাবে অবস্থিত নহে। উহা সর্ব্বদাই অন্য পদার্থ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। তেজঃ পদার্থ কখনও অন্য ভূত অবলম্বন না করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সেইরূপ মায়াও তাহার সদৃশ (corresponding) গুণনিষ্ঠ ভাবে থাকিতেই হইবে। এখন আপত্তি হইতে পারে যে মায়া ত ব্রহ্মের আশ্রয়ে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের আশ্রয়ে যে মায়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আর মায়া ব্রহ্মের কোন গুণের শক্তি, তাহা মায়াবাদী বলেন না। যদি মায়া ব্রহ্মের শক্তিই হয়, তবে তাঁহাতে উহার Corresponding গুণও থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং তিনি সগুণ। আবার যাহার শক্তি আছে অর্থাৎ Energy আছে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়, ইহা যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ মায়াবাদী মায়াকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অর্থাৎ কার্য্যকারিণী শক্তিমতী বলিয়া থাকেন। সুতরাং সেই শক্তি যাঁহার, তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় নহেন বা হইতেও পারেন না। সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই যে আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের ৪/৪/১৯ সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা অর্থাৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। এখন আমরা মায়াবাদের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। মায়াবাদ অনুযায়ী জগৎ মিথ্যা। আমরা মায়াবশতঃ ব্রহ্মের স্থলে জগৎ দর্শন করি, কিন্তু মায়ার অপগমে সমস্তই ব্রহ্ম দেখিব, জগৎ দেখিব না, যেমন রজ্জুই সত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ উহাতে সর্প দর্শন করি। জ্ঞানোদয়ে আবার রজ্জুই দেখিব, কিন্তু তখন আর সর্প থাকিবে না। যদি জগৎ কিছুই না হয়, তবে মায়াবাদের সগুণব্রহ্ম "অহং বহুস্যাম্" ইত্যাদি ভাবিয়া এবং আলোচনা করিয়া এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, ইহার অর্থ কি? রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইতে অন্ধকারের প্রয়োজন হয়। রজ্জু অন্ধকারে পতিতাবস্থায় বর্ত্তমান। উহা আপনা আপনি দ্রষ্টার ভ্রম জন্মাইতেছে। রজ্জু এস্থলে ব্রহ্ম-স্থানীয়। পাঠক বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন যে রজ্জু দ্রষ্টা সৃষ্টি

করে না। এক কথায় বলিতে গেলে উহা কিছুই করে না। কিন্তু সৃষ্টিতে মায়াবাদ অনুযায়ী কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছায় ক্রমান্বয় পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল, পঞ্চীকৃত হইল, নানাবিধ ভোগায়তন দেহে ব্রহ্মের প্রবেশ হইল, ইতর জীবভাবে ৮৪ লক্ষ জন্ম. ইহলোক-পরলোকে বারবার যাতায়াত ইত্যাদি ইত্যাদি বিরাট ও জটিলতাময় বিশ্ব সৃষ্ট হইল, পুষ্ট হইতেছে ও কালে লয়প্রাপ্ত হইবে। আবার মায়াবাদ অনুযায়ী কল্পের পর কল্প ক্রমে কতকাল সৃষ্টি চলিতে থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, আর একদিকে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্ম ও মায়াযোগে সগুণব্রহ্ম ও তাঁহার দ্বারা হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, জীব ইত্যাদি সৃষ্ট হইল ও তাহাদের দ্বারা এই বিরাট বিশ্ব চালিত হইতেছে। এই ভাবে সৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে গেলে মায়াই (ভ্রমই) ইহার একমাত্র কারণ, এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই উপনীত হইতে পারা যায় না। রজ্জুতে যেমন হঠাৎ সর্পজ্ঞান হয় ও হঠাৎ চলিয়া যায়, জগৎরূপ মিথ্যা পদার্থ সেইরূপ হঠাৎ হওয়া ও হঠাৎ চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ এই ব্যাপার ক্ষণস্থায়ী মাত্র হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা হিন্দু-শাস্ত্রে পাই যে কদাচিৎ দুই একটি মানব এই ভ্রমের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করেন এবং সেই কার্য্যে অবশ্যই তাঁহার কোটী কোটী বৎসর জীবন যাপন করিতে হয়। ইহা কি প্রকারের ভ্রম? রজ্জুতে সর্পভ্রম অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এইরূপ ভ্রম প্রায়শঃই হয় না। আর যদিই বা হয়, তবুও উহা অল্পক্ষণ মাত্রেই বিনা গোলমালে (Without any fuss and noise) নিষ্পত্তি হইয়া যায়। সুতরাং সেই তুচ্ছ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া এই জটিলতাময়ী (Complex) সৃষ্টিও ভ্রমজাত, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। বিশেষতঃ এই দৃষ্টান্তের সহিত সৃষ্টি ব্যাপারের অধিকাংশেরইঐক্য নাই। মায়া উহার শক্তি পরিচালনা করিয়া ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে ও ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারে, ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও উহা বিশাল বিশ্বের ন্যায় বাস্তব কিছু ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করিতে পারে না।

মায়াবাদী বলিবেন যে তিনি ত বিশ্বকে Real—বাস্তব বলেন না ; উহা ভ্রম মাত্র। ভ্রম বলিলেই ভ্রম হয় না। ভ্রম বলিলেই সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না। জগতের অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই বিশেষ ভাবে আমরা অনুভব করিতেছি। কেহ কখনও বলেন নাই যে জগৎ যে ভ্রম মাত্র, তাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মায়াবাদ অনুসারেও ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্ত সাধক ব্যবহারিক ভাবে দেহান্ত পর্য্যন্ত জগতে বাস করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল স্বরূপ সর্ববিধ জাগতিক কার্য্য করেন। যদি জগৎ প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাই হইত, তবে তিনি কেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার মুহূর্ত্ত হইতেই সম্পূর্ণ রূপে জগৎ বিবর্জ্জিত একমাত্র পরব্রহ্মকেই দেখেন না ? যেমন জ্ঞানোদয়ে রজ্জুই দৃষ্ট হয়, উহার সর্পত্ব আর থাকে না, সর্পের চিহ্ন মাত্রও তাহাতে অবশিষ্ট থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের মুহূর্ত্ত হইতে জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না ? তখন একমাত্র ব্রহ্মই কেন বর্ত্তমান থাকেন না ? মায়ার অপগমে জগৎ তাঁহার নিকট ব্রহ্মই এবং তিনিও স্বয়ংও তখন ব্রহ্মই। কারণ, তখন তিনি সোঽহংজ্ঞান প্রাপ্ত। অতএব দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিষম অনৈক্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের চারিটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথমটী রজ্জু, দ্বিতীয়টী আমি, তৃতীয়টী ভ্রমের কারণ অন্ধকার বা আমার চক্ষুরোগ বা উভয়ই, চতুর্থটী রজ্জুতে সর্পরূপ ভ্রান্তি। এই দৃষ্টান্তের সহিত সৃষ্টি ব্যাপার মিলাইতে হইবে। এস্থলে রজ্জু ব্রহ্ম-স্থানীয়। রজ্জুতে কোন ক্রিয়া নাই। উহা নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মও নিষ্ক্রিয়। আমি এস্থলে জীব। ভ্রমের কারণ অন্ধকার। তাহাই মায়া। কার্য্য সর্প-ভ্রম, অপর পক্ষে ব্রহ্ম স্থলে জগৎ দৃষ্টি। এই বিশ্লেষণে আমরা সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা প্রভৃতি ও তাঁহাদের কার্য্য দেখিতে পাই না। সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ (stage), ব্রহ্মের জীবদেহে প্রবেশ প্রভৃতি কোথায় হইতে আসে ? উহাতে দ্রষ্টাকেও (আমাকেও) সৃষ্টি করে না। উক্ত দৃষ্টান্তে রজ্জু সত্য। উহা নিজে যেমন

ছিল, তেমনিই থাকে। ব্রহ্মও সেইরূপ যেমন নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তেমনি তাঁহার নিষ্ক্রিয় থাকাই উচিত ছিল। অর্থাৎ তিনি মায়াবরণে আবৃত থাকিতেন বটে, কিন্তু অন্য দ্রষ্টার অভাবে তাঁহার সেই রূপ কেহ দেখিতেন না। রজ্জু যেরূপ দ্রষ্টা সৃষ্টি করে না, ব্রহ্মও সেইরূপ জীব-রূপী দ্রষ্টা সৃষ্টি করিতেন না। রজ্জুকে যেমন অন্ধকার সর্পাকারে পরিণমন করে, মায়া ব্রহ্মকে সেই অবস্থায় পরিণমন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? ব্রহ্ম কি কখনও মায়া দ্বারা আবৃত হইতে পারেন? মায়াবাদী অবশ্যই বলিবেন যে সূর্য্য মেঘাবৃত হন না, কিন্তু মানবের চক্ষুর সম্মুখে মেঘ আসে বলিয়া সে সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। এই দৃষ্টান্তও ঠিক হইল না। কারণ, সূর্য্য ও মানব দুইটী বস্তু। কিন্তু মায়াবাদে পরব্রহ্ম এবং জীব একই। (জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্)। সুতরাং অখণ্ড ব্রহ্মের মধ্যে মায়া আসিয়া জীব, ততোহধিক সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে পরব্রহ্ম মায়োপহিত হইয়া সগুণব্রহ্ম, জীব প্রভৃতি হইতে পারেন না। যদি তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে ব্রহ্ম মায়াবৃত হইতে পারেন, তবে তিনি সেইরূপ মায়াবৃত হইয়াই থাকুন। রজ্জু যেমন অন্ধকারে আবৃত হইয়া থাকে কিন্তু দ্রষ্টা বা সর্প ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সমূহ সৃষ্টি করে না, সেইরূপ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মায়াবৃত হইয়া জীব, জগৎ ও সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে পারেন না। অন্য দ্রষ্টা থাকিলে ত ভ্রম এবং বিক্ষেপ, নতুবা রজ্জু যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিতে বাধ্য। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই প্রমাণিত হয় না। আমরা আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিব যে ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম অসম্ভব। মায়াবাদে রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে অচেতন পদার্থে অচেতন পদর্থের ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। (সর্পের দেহও অচেতন পদার্থ)। কিন্তু মায়াবাদে চৈতন্যে অচেতন পদার্থের ভ্রমের কোন দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাতে মিথ্যা জগতের ভ্রম কিরূপে সম্ভব হয়? তিনি অনন্ত অবস্থ

অনন্ত জ্ঞানাধার। মায়াবাদেও জ্ঞান তাঁহার একটী স্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ করা। সুতরাং তিনি অনন্ত অনন্ত জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময়। অন্ধকারে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু আলোকময় স্থানে সে ভ্রম অসম্ভব, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং যিনি অনন্ত জ্ঞান-জ্যোতিঃতে নিত্য পরিপূর্ণ, তাঁহাতে অন্য বস্তুর ভ্রমের সম্ভাবনা মাত্রই নাই! এস্থলে মায়াবাদী বলিবেন যে আমরা মায়োপহিত বলিয়া ব্রহ্মকে দেখি না। মায়া আমাদের নিকট অন্ধকার সৃষ্টি করে, তাই ব্রহ্মে আমাদের জগৎ ভ্রম হয়। মায়াবাদে কূটস্থ ব্রহ্মও পরব্রহ্মই। মায়া তাঁহার নিকট কি প্রকারে দাঁড়াইবে? উহা কি তাঁহার তেজে ভস্মীভূত হইবে না? মায়া যে কূটস্থ ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারে না, তাহা ইতিপূর্ব্বেও বহুস্থলে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সেই আপত্তি গৃহীত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে উক্ত বিষয়টীকে আরও সরল কবিবে বলিয়া মনে হয়। একটী রজ্জুকে এরূপভাবে তড়িৎ যোগে আলোকিত করিয়া রাখা হউক, যাহাতে উহা যেন একটী রজ্জুর আকারের অত্যুজ্জ্বল আলোকময় পদার্থাকারে প্রকাশিত হয়। এস্থলে রজ্জু, ব্রহ্ম স্থানীয় এবং আলোক তাঁহারই অতুলনীয় জ্ঞান-জ্যোতিঃ। উক্ত পদার্থকে কোনও ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই সর্প বলিয়া ভ্রম করিবে না। কারণ, তখন রজ্জুতে অন্ধকারের সম্পূর্ণ অভাব। যদি বলা যায় যে অন্ধ ব্যক্তি ঐ আলোকময় পদার্থ দেখিবেন না, সেইরূপ মায়া দ্বারা আবৃত ব্যক্তিও ব্রহ্মকে দেখিবেন না, তবে বলিতে হয় যে তিনি (অন্ধ) আলোকময় পদার্থ না দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার স্থলে অন্য কোন বস্তুও দেখিবেন না। তাহার অন্ধতা জন্য কিছুই দেখিবেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আলোকময় রজ্জুতে সর্পভ্রমের কোনই সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ অনন্ত অনন্ত জ্ঞান-জ্যোতিঃতে নিত্য অত্যুজ্জ্বল ব্রহ্মে অন্য মিথ্যা বস্তুর ভ্রম একেবারেই অসম্ভব, তাহা জগৎই হউক্ বা অন্য কোন বস্তুই হউক্। আর আত্মা যদি মায়োপহিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিয়াও

নেওয়া যায়, তথাপিও বলিতে হইবে যে মায়োপহিত আত্মা অর্থাৎ জীব ব্রহ্মকেও দেখিবেন না এবং তাঁহার স্থলে জগৎও দেখিবেন না, অর্থাৎ তিনি মায়াদ্বারা অন্ধ হইয়াই থাকিবেন, ব্রহ্ম বা জগৎ কিছুই দেখিতে পাইবেন না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে গভীর অন্ধকারে রজ্জুই দেখা যায় না, উহার স্থলে সর্পভ্রম ত একান্ত অসম্ভব। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে ব্রহ্মে ভ্রমবশতঃ জগৎ দর্শন অসম্ভব। মায়া নিজে অচেতন ও অন্ধকার মাত্র। উহা নিজেকে নিজে কখনও কোথায়ও অল্পে এবং কোথায়ও ঘনত্বে পরিণমন করিতে পারে না। উহা চিরকাল একভাবেই ঘনান্ধকারই থাকিবে। মায়াবাদে মায়ার সহিত তুলনা-মূলক সর্ব্ব প্রধান দৃষ্টান্ত রজ্জুতে সর্পভ্রম। অন্ধকারই সর্পভ্রমের কারণ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ মায়ার একটী শক্তি আছে ও তাহা অন্ধকার এবং উহার অজ্ঞানতা জন্মে এবং এককে অন্যরূপ দেখায়। মায়াবাদী বলেন যে রজ্জুতে সর্প-দর্শনের পর দ্রষ্টার ভয় হয়, চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। সুতরাং তিনি চঞ্চল হন। অতএব বিক্ষেপও অন্ধকারেরই ফল বুঝিতে হইবে। মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্টা) ও দ্বিবিধা (আবরণ ও বিক্ষেপ) শক্তি-সম্পন্না বলা হইয়াছে। অন্ধকার আবরণের কার্য্য করিল। উহাকেই তমোগুণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আবার পরে ভয় হেতু বিক্ষেপ আসিল, তাই উহাকে রজোগুণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে সত্ত্বগুণের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। অন্ধকারের ফল স্বরূপ আমরা আপাততঃ এই দুইটী ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বিক্ষেপ দ্বারা অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা সৃষ্টিই হয় না, ধ্বংসও হয়। মানবে যখন ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল হয়, (সুতরাং বিক্ষেপ উপস্থিত হয়), তখন তাহা অনেক কিছু ধ্বংস করে। এমন কি, ক্রোধের প্রাবল্যের সময় অন্যান্য প্রবল রিপু সমূহও যেন সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ক্রোধ চিত্ত-বিক্ষেপের ফল বলিতে

হইবে। দৃষ্টান্তে যে শ্রেণীর ও যেরূপ বিক্ষেপের পরিচয় পাই, তাহা এত দুর্ব্বল ও গৌণ (weak and remote) যে উহা ত্রিগুণাত্মিকা বিরাট জড় জগৎ সৃষ্টির সহিত উপমিত হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে মানবের ভয়ই উৎপন্ন হয়, কিন্তু কেহ কখনও বলেন না যে ভয় জনিত বিক্ষেপ দ্বারা কোন জড় বা জীব সৃষ্টি হয়। ভয় মোহই উৎপাদন করে এবং এই ভয় অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত হইলে ভীত ব্যক্তি মূর্চ্ছিত পর্য্যন্ত হন ও কেহ কেহ মৃত্যুমুখেও পতিত হন। যখন ভীত ব্যক্তি চৈতন্য-হীন হন, অথবা সেইরূপ ভাবে মোহপ্রাপ্ত হন, তখন তাহার পক্ষে সৃষ্টি যে অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর পক্ষে পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে বিক্ষেপের ফলে ধ্বংস পর্য্যন্ত হইতে পারে। এস্থলেও দেখিলাম যে বিক্ষেপের ফলে মৃত্যুও হইতে পারে। কিন্তু ভয়রূপ বিক্ষেপের ফলে সৃষ্টি হয়, ইহা দেখা যায় না। অতএব দৃষ্টান্তানুযায়ী মায়াকে একমাত্র তমোগুণ-সম্পন্না বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মায়া অর্থে অন্ধকার সুতরাং মোহ বা অজ্ঞান মাত্র বুঝিতে হইবে, কিন্তু মায়াবাদের নানাভাবে সজ্জিতা মায়া নহে। তমোগুণের যেমন ধ্বংস-শক্তি আছে, মায়াও দৃষ্টান্তানুযায়ী সেই কার্য্যই করিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। যদি বলেন যে অন্ধকার রজ্জুতে সর্প সৃষ্টি করিতে পারে, সুতরাং মায়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিবে না কেন, তবে বলিতে হয় যে অন্ধকার যদি ঘন হয়, তবে রজ্জুতে সর্প-দৃষ্টি দূরের কথা, স্বয়ং রজ্জুকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ ঘনান্ধকারে রজ্জু সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, উহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অল্পান্ধকারই রজ্জুতে সর্প সৃষ্টির কারণ বলিতে হইবে। অর্থাৎ যখন যৎকিঞ্চিৎ আলোকের সহিত অন্ধকার মিশ্রিত থাকে, তখনই সর্প সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণান্ধকারে—ঘনান্ধকারে তাহা সম্ভব হয় না। মায়াতে ষোলআনা অন্ধকারই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। উহাতে উহার (অন্ধকারের) হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মায়াবাদী বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিতে মায়া ধ্বংস

হয়। সুতরাং উহা সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই সম্পর্কে ১২২৫, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখা যাইবে যে অন্ধকার কিছুই সৃষ্টি করে না। যদি বলেন যে অন্নান্ধকারের মধ্যে আলোকের অত্যল্প পরিমাণ মিশ্রণ আছে, সুতরাং সত্ত্বগুণের ক্ষীণ রশ্মি দেখা গেল, তবে বলিতে হয় যে উহাকে সত্ত্বগুণ বলিলেও উহা সৃষ্টি করে না। কারণ সত্ত্বগুণের স্বভাব সৃষ্টি করা নহে, উহা রজোগুণের স্বভাব। আমরা কিন্তু বলি যে মায়াতে ষোলআনাই অন্ধকার। মায়াকে যদি অজ্ঞান ধরা যায় এবং মায়াবাদী তাহাই বলেন, তবে উহা অন্ধকারই। অজ্ঞানে জ্ঞানের আলোক-রশ্মি কোথায়? উপনিষদে আছে "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" ইত্যাদি। এস্থলে চিন্তার পরে কার্য্য, কিন্তু দৃষ্টান্তে ক্রমান্বয় পাই অন্ধকারের আবরণ, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম, ভয় ও তজ্জনিত বিক্ষেপ। আমরা জড় জগতে পাই সৃষ্টি, স্থিতি, ও পরে লয়, কিন্তু দৃষ্টান্তে পাই তমঃ-এর কার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে অর্থাৎ অন্ধকারের আবরণ কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে এবং পরে উহারই ফল স্বরূপ বিক্ষেপ অর্থাৎ তমঃ-এর ফল স্বরূপ রজঃ উপস্থিত হয় এবং সেই রজঃ-এর ক্রিয়া ধ্বংস, সৃষ্টি নহে। জগতে প্রত্যক্ষ করি যে প্রথম সৃষ্টি হয় অর্থাৎ রজঃ গুণের ক্রিয়া হয়। উপনিষদেও পাই সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের চিন্তা ও তৎপরে সৃষ্টি-ক্রিয়া। কিন্তু দৃষ্টান্তে ক্রম বিপরীত। সাধারণ কার্য্যেও দেখা যায় যে তমঃ হইতে কার্য্য হয় না বরং রজঃ দ্বারা তমঃ-এর অধিকাংশ নাশ হইতে পারে। পালনের বিষয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিষয় উহাতে আদৌ নাই। অতএব উহাতে তমোগুণই পাইলাম বলিলেই হয়। সেই তমঃই সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। রজোগুণ সৃষ্টি করে, ইহা সাংখ্য ও মায়াবাদ উভয়েই স্বীকার করিবেন। দৃষ্টান্তে রজোগুণ গৌণভাবে বর্ত্তমান, ইহা মনে করা গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সৃষ্টি-কারক নহে, ধ্বংস-কারক। যাহা হউক, ধরিয়া লওয়া যাউক্ যে দৃষ্টান্তে তমঃ ও রজঃ গুণ পাওয়া গেল, যদিও সৃষ্টিতে দৃষ্ট কার্য্য সমূহ দৃষ্টান্তে দেখা যায় না। কিন্তু মায়া-

বাদে কথিত মায়ার অন্য গুণটী অর্থাৎ সত্ত্বগুণ মোটেই পাওয়া যায় না। মায়াবাদের দৃষ্টান্তে সেইরূপ কোন গুণ বা শক্তির উল্লেখ নাই, যাহা মায়ার সত্ত্বগুণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সত্ত্ব-গুণ স্বচ্ছ এবং উহার বর্ত্তমানতায় জ্ঞান ও সুখ লাভ হয়। কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তে জ্ঞানের অথবা সুখের কোনই উল্লেখ নাই। বরং সত্ত্বগুণের বিপরীত কার্য্যই আমরা দেখিতে পাইলাম। মায়াবাদী হয়তঃ বলিবেন যে দ্রষ্টার যখন জ্ঞান হয়, তখন সর্পভ্রম বিদুরিত হইয়া রজ্জু-জ্ঞান হয়। ইহা সত্ত্বগুণের ফল। এই উক্তি সন্তোষজনক নহে। কারণ, রজ্জু অথবা রজ্জু-সর্প দ্রষ্টাকে সেই জ্ঞান দান করে না। বরং উহা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিপরীত কার্য্যই করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দৃষ্টান্তে একমাত্র তমোগুণের কার্য্যই বর্ত্তমান। আবরণ ও বিপেক্ষকে সত্ত্বগুণের কার্য্য বলা যাইতে পারে না। যদি বলেন যে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। কারণ, উহাকে তমোগুণের কার্য্য বলা হইয়াছে ও তাহাই সত্য। উহা জ্ঞান নহে, কিন্তু অজ্ঞান বা ভ্রম। অজ্ঞান কখনও সত্ত্বগুণের কার্য্য হইতে পারে না। আবারও যদি বলেন যে দ্রষ্টা যে পরে জানিতে পারে যে উহা সর্প নহে কিন্তু রজ্জু, তাহাই সত্ত্বের কার্য্য। তবে আবারও বলিতে হয় যে সেই জ্ঞান রজ্জু-সর্প দান করে না। রজ্জু-সর্পই ভ্রম অর্থাৎ মায়ার কার্য্য, কিন্তু অন্য দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যে দ্রষ্টা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলেন, তাহা ত মায়ার কার্য্য নহে। মায়াবাদ সেই জ্ঞানকে মোক্ষ বা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করেন। উহা মায়া ধ্বংসই করে। সুতরাং মায়া কখনও সেই জ্ঞান দিতে পারে না। মায়ার সহিত সেই জ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নাই। মায়াবাদী যখন মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয় আছে বলিয়াই আর কিছু বলেন নাই, অর্থাৎ তৃতীয়া কোন শক্তির উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি সত্ত্ব-গুণ-বোধক কোন শক্তির ব্যাপার এই দৃষ্টান্তে লক্ষ্য করেন নাই, তখন তিনি বলিবেন না যে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানই মায়ার সত্ত্ব গুণের কার্য্য।

পাঠক দেখিবেন যে এই মোক্ষের কারণ মায়া নহে বা হইতেও পারে না। কারণ, জ্ঞানে মায়া থাকেনা—জ্ঞানোদয়েই রজ্জুকে রজ্জু-ভাবেই দেখা যায়—ব্রহ্মকে ব্রহ্মই দেখা যায়। অতএব দৃষ্টান্তে সত্ত্বগুণ বা উহার সহিত উপমিত হইতে পারে, এমন কোন গুণ, শক্তি বা অবস্থা আমরা পাই না। অথচ মায়াবাদী বলিতেছেন যে মায়াতে সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান, এমন কি, সগুণব্রহ্ম (ঈশ্বর) যে মায়াদ্বারা উপহিত, তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধানা। মায়াবাদের বিখ্যাত ও সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্তে এত বড় ত্রুটী কেন বর্ত্তমান? আমাদের মনে হয় যে মায়া সাংখ্য প্রকৃতির অনুকরণে অধিকাংশে সৃষ্ট। মায়া-বাদের প্রধান দৃষ্টান্তের অন্য একটী দিক্ (point) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক্। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। রজ্জু কখনই সর্প নহে, তবে অল্লান্ধকারে উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় কেন? কারণ, পূর্ব্বে পূর্ব্বে অন্যস্থানে যখন সাপ দেখিয়াছি, তখন ঐরূপই, অর্থাৎ দীর্ঘ, বক্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদিই দেখিয়াছি। তাই পূর্ব্ব-স্মৃতি আসিয়া আমার অন্তঃকরণে স্থির নিশ্চয় করিতে সাহায্য করে যে ঐ যে পদার্থটী পড়িয়া আছে, তাহা সর্পই, অন্য কিছু নহে। আমরা যদি পূর্ব্বে কখনও কোন স্থানে সর্প না দেখিতাম, তবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব দৃষ্টাবভাসঃ" অর্থাৎ পূর্ব্ব-দৃষ্ট পদার্থের সময়ান্তরে স্মরণরূপ তাহার যে আভাস, তাহাকে অধ্যাস কহে। অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত কোন বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ করার নাম অধ্যাস। সুতরাং পূর্ব্বে কোন বস্তু দৃষ্ট না হইলে সেই বস্তুর ভ্রম হইতে পারে না। অর্থাৎ সর্প পূর্ব্বে না দেখিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম অসম্ভব। এখন আমরা দেখি যে এই সূত্র মায়াবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ মিথ্যা, ইহা কতদূর সমর্থন করে। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে (মায়ার অপগমে) এক ব্রহ্মই দৃষ্ট হন, জগৎ বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। কারণ, তাহা মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র। সুতরাং স্বয়ং পরব্রহ্মের নিকট জগৎ

বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কারণ, তাঁহার উপর কোন কালেও মায়ার কোনও প্রভাব বিস্তার করিবার সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা দেহাবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বয়ং ব্রহ্মই। কারণ, দেহাবদ্ধ আত্মারই উপাধি, ব্রহ্মের কোনই উপাধি নাই। মায়াবাদে কূটস্থব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মই। তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ইত্যাদি। উপাধি বাদ দিলে পরব্রহ্মে ও কূটস্থ ব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই। কূটস্থ ব্রহ্মের জীবত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে যখন জগৎ বলিয়া কোন বস্তুর জ্ঞানই ছিল না, তখন জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্মৃতি থাকা অসম্ভব। অতএব জীবের জগৎ সম্বন্ধে কোন পূর্ব্ব-স্মৃতি নাই, সুতরাং তিনি ব্রহ্মস্থানে জগৎভ্রম করিতে পারেন না। জগৎ যদি সত্যই হইত, এবং উহা যদি একমাত্র ব্রহ্মই হইত, তবে জীব জগৎ না দেখিয়া প্রথম জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে একমাত্র ব্রহ্মই দেখিতেন। কারণ, তাহাই তাঁহার পূর্ব্ব-পরম-চৈতন্যাবস্থার স্মৃতি। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে জীব জগৎকে জগৎ বলিয়াই জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে দেখিতে থাকে ও সেই ভাবেই ব্যবহার করে। এই আলোচনা দ্বারাও আমরা দেখিতে পাই যে মায়াবাদের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্তে আরও একটী বিশেষ ত্রুটী বর্ত্তমান। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা আরও পাইতেছি যে অধ্যাস দ্বারা ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইবে যে যখন দৃষ্টান্ত কখনও সম্পূর্ণ হয় না, তখন দৃষ্টান্তের ত্রুটী প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরাও স্বীকার করি যে কোন দৃষ্টান্তই পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে মায়াবাদ রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম বা ঐ একই প্রকারের দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এত বড় একটী দর্শন একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উপর সংস্থাপিত। ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কি না, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমরা দেখিয়াছি যে উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধে অতি অল্পই বুঝিতে পারি। অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্যাপারের পনের আনার সহিত দৃষ্টান্তের কোনই ঐক্য নাই। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে

বলিতে হয় যে দৃষ্টান্তে একমাত্র আবরণ (তমোগুণের কার্য্য) প্রকাশ করে, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু প্রমাণ করে না। যে দর্শন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগৎকেই মিথ্যা বলেন, তাহার সহিত যদি নানা দোষে দুষ্ট ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহা ভিত্তিহীন কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। পাঠক মনে রাখিবেন যে একমাত্র দৃষ্টান্তের ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াই মায়াবাদ খণ্ডিত হইল, এইরূপ কথা আমরা বলি না। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে উপনিষদ সমূহ মায়াবাদ সমর্থন করেন না এবং বহু বলবতী যুক্তি দ্বারাও উহা খণ্ডিত হইতে পারে।

বিবর্ত্তবাদ

মায়াবাদ পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবর্ত্তবাদের অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিশেষ প্রকার বর্ত্তনকেই (পরিবর্ত্তনকেই) বিবর্ত্ত বলিতে হইবে। উক্ত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Evolution বা ক্রম-বিকাশ-বাদ (Gradual unfoldment) অর্থাৎ উৎপাদক হইতে উৎপন্নে ক্রম পরিণতি। কিন্তু মায়াবাদের বিবর্ত্তবাদ উক্ত প্রকারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে না। "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" "প্রকৃত পক্ষে বস্তু আছে, তাহার অন্যরূপ জ্ঞানকে বিকার এবং প্রকৃত পক্ষে বস্তু নাই, তথায় যে অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিবর্ত্ত বলিয়া কথিত হয়। বিকার বা পরিণাম-বাদের মত এই যে, কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। আর বিবর্ত্তবাদিদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে কার্য্য না থাকিলেও কার্য্য প্রতীতি হয়। (পরমর্ষি গুরুনাথ)।" এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। মায়াবাদ অনুযায়ী জগৎ মায়ারই পরিণাম। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তিমান্ ও শক্তি অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত। শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। কোন এক

দ্রব্যের শক্তি ক্ষয় হইলে সেই দ্রব্যেরও কিছু ক্ষয় হয়। সুতরাং শক্তির পরিণাম হইলে শক্তিমানেরও অন্ততঃ আংশিক পরিণাম হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মায়াবাদ মায়াকে ব্রহ্মের শক্তিও বলেন, আবার উহাকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ ভাবে কল্পনা করিয়া সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যের একমাত্র কর্ত্রীরূপে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। যদি বলা হয় যে শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তির প্রয়োগ অসম্ভব, তবে সেই একই যুক্তি প্রদর্শিত হইবে যে মায়া অনিবর্চ্চনীয়া। ইহা যে যুক্তি নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বিচারতঃ মায়ার পরিণামে ব্রহ্মেরও যৎকিঞ্চিৎ পরিণাম হইয়াছে। শারীরক কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ মুনি বলিয়াছেন যে পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বভূমি। "বিবর্ত্তবাদস্যহি পূর্ব্ব-ভূমিঃ বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ। ব্যবস্থিতেঽস্মিন পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।" "অর্থাৎ বেদান্তের মধ্যে যে বিবর্ত্ত-বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা কালে জানিতে পারা যায় যে পরিণামবাদই বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বভূমি। পরিণাম আরও হইলেই বিবর্ত্তবাদ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়।" অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াবাদও পরিণামবাদ একেবারে এড়াইতে পারেন না। মায়া-বাদে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলা হয়। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং যে ভাবেই চিন্তা করা যাউক না কেন, ব্রহ্মকে উপাদান কারণ স্বীকার করিলে জগৎকে ব্রহ্মেরই পরিণাম স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সেই পরিণাম পূর্ণব্রহ্মের পরিণাম অথবা তাঁহার আংশিক পরিণাম, ইহাই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী মাত্র স্বরূপের পরিণাম সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পরিণামে অব্যক্ত-স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। এই সকল বিষয়ই সেই অংশে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্তের পরিণাম হইয়াছে

সত্য, কিন্তু practically জগৎ অব্যক্তে ভাসমান। কারণ, জগদুৎপত্তির জন্য অব্যক্ত বিন্দুমাত্রও বিকৃত হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতে মায়াবাদোক্ত বিবর্ত্তবাদের কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অব্যক্ত-স্বরূপের পরিণাম সত্ত্বেও উঁহা নির্ব্বিকারই আছেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মায়াবাদ ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিবার জন্যই মায়াবাদি ও বিবর্ত্তবাদের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রোক্ত অংশে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিয়াও অব্যক্তের পরিণাম স্বীকার করা যায়, তখন অযথা মায়া ও বিবর্ত্তের কল্পনা বৃথা। মায়াবাদে প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলা হয় এবং অযথা মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করেন আমাদের মতে জগৎ সত্য যদিও নিত্য নহে। ইহাও সেই অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মকেই একমাত্র মনে করি। তিনিই সৃজন, পালন ও লয় কর্ত্তা। মায়া নাম্নী শক্তির অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। আমরা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলি। আমরা মায়াবাদের প্রধান দৃষ্টান্ত (রজ্জুতে সর্পভ্রম) সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিয়াছি যে মায়া একমাত্র তমোগুণ সম্পন্না। উহাতে রজঃ বা সত্ত্বগুণ নাই। রজঃ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও গৌণ ভাবে প্রাপ্ত বলিতে হইবে। প্রকৃতও মায়াবাদের দৃষ্টান্তের মূল অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে মায়ার আবরণ শক্তি মাত্র আছে। অন্য যাহা কিছু পরবর্ত্তী কালে যুক্ত হইয়াছে, তাহা উহার গোড়ার কথা নহে। অর্থাৎ মায়া অন্ধকার মাত্র ও অভাব পদার্থ মাত্র। উহা ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্বংস হয় অর্থাৎ আলোকের উপস্থিতিতে অন্ধকার বিনষ্ট হয়। মায়াবাদ বলেন যে রজ্জুসর্পের ন্যায় মায়া সত্যও বটে। কারণ, উহা সাময়িক ভাবে দেখা যায়। উহা যে ভ্রম মাত্র কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথ্যা-জ্ঞান জ্ঞান নহে, মিথ্যা-অস্তিত্ব অস্তিত্ব নহে। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে মায়ার সংজ্ঞা যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে এবং

উহা আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। মায়া যে অন্ধকার মাত্র এই কথাই সত্য। অজ্ঞান অন্ধকার আমাদের হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমরা আমাদের স্বরূপ অথবা আমাদের পরমারাধ্য হৃদয় দেবতাকে দেখিতে পাই না। আমাদিগের হৃদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে, তাই আমরা হা হুতাশ করিতেছি, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অজ্ঞান বশতঃ যাহা-দিগকে আমরা আজ সত্য তত্ত্ব বলিয়া মনে করি, কাল দেখা যায় যে উহারা সত্য নহে, কিন্তু মিথ্যাই। এই যে অনুসন্ধান ও পথ না পাওয়া হইতেই হতাশার ও মায়ার সৃষ্টি অর্থাৎ জগৎ প্রহেলি-কাময়। এই জগৎ সম্বন্ধে সত্য তত্ত্ব নির্ণয় সুকঠিন এবং মরুভূমে যেমন মরীচিকাই সম্বল, কিন্তু প্রকৃত বারি-লাভ ও উহা দ্বারা আকুল পিয়াসার তৃপ্তি যেমন দুর্ল্লভ, এস্থলেও সেইরূপ সত্য তত্ত্ব লাভ এবং তজ্জন্য চিরশান্তি সুদুর্ল্লভ। পঞ্চদশীও যে এই ভাবের ভাবুক, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এইরূপ এইরূপ ভাব হইতেই প্রথমতঃ মায়ালতার সৃষ্টি। উহা এখন নানাবিধ শাখা পল্লব বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। উহারা পরবর্ত্তী কালে নানা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি যে মায়ার বা অজ্ঞানের অন্ধকারই একমাত্র সম্পদ্ এবং আবরণই উহার একমাত্র শক্তি। মায়াবাদীও বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া ধ্বংস হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান জ্যোতিঃতে মায়া-রূপ অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। সুতরাং উহা অন্ধকার ও সেই অন্ধকারের শক্তি আবরণ মাত্র উহাতে বর্ত্তমান। উহা কিছু সৃষ্টি করে না বা করিতে পারে না। সুতরাং মায়াবাদ অনুযায়ী দৃষ্টান্তে যে বিবর্ত্তবাদ প্রমাণিত হয়, তাহা বিশ্লেষণে দাঁড়াইতে পারে না। অর্থাৎ মায়ার যাহা স্বভাব অর্থাৎ অন্ধকার, তাহা সত্য বস্তুকে ঢাকিয়াই রাখিতে পারে, কিন্তু উহা অন্য কিছু প্রদর্শন করিতে পারে না। আর উহা যে স্রষ্টা সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা ত সর্ব্ববাদি সম্মত। মায়াবাদী মায়ার সহিত সূর্য্য-গ্রহণের

উপমা আনয়ন করিয়া থাকেন। সূর্য্য যখন চন্দ্রের ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তখন উহাতে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। সূর্য্য তখন অদৃশ্য হয়, কিন্তু তৎস্থলে আমরা অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। মেঘও সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে, কিন্তু উহার স্থলে অন্য বস্তু প্রদর্শন করায় না। এই দুই স্থলেও দেখা গেল যে মায়ার স্বভাব আবরণ করা, কিন্তু একেকে অন্য বস্তু ভাবে প্রদর্শন করা নহে। সুতরাং এই দুই স্থলে বিবর্ত্তবাদ প্রমাণিত হইল না। মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাকে তাঁহার হইতে সম্পুর্ণরূপে পৃথক্-কৃত ভাবে মায়াবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া স্বাধীন ভাবেই সব কিছু করিতেছে। কারণ, ব্রহ্ম মায়াবাদে নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশক্তি শূন্য। শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি শক্তিহীনা। সুতরাং পৃথক্ কৃতা মায়া যে আবরণ ভিন্ন কিছুই করিতে পারে না, তাহা সত্য। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মায়ার স্বভাব ঘনান্ধকার। মায়া অচেতন, শক্তিমান্ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং মায়া স্বাধীন ভাবে সেই অন্ধকারের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং মায়াই যদি অজ্ঞানতার একমাত্র কারণ হইত, তবে মায়োপহিত জীব অন্ধই থাকিতেন, কিছুই দেখিতে পাইতেন না। কেন যে আমাদের অজ্ঞানতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্ব কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশত্রয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। "গুণ বিধান"' "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী"। পাঠক মনে রাখিবেন যে বিবর্ত্তবাদকে অনির্ব্বচনীয়বাদও বলা হয়। মায়া অনির্ব্বচনীয়া, বিবর্ত্তবাদও অনির্ব্বচনীয়। এইরূপ যদি মায়াবাদের প্রধান তত্ত্ব সমূহই অনির্ব্বচনীয় হয় তবে মায়াবাদ যে সত্য তাহা কেমনে প্রমাণিত হইবে? মায়াবাদের প্রধান যুক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া। যখনই যুক্তিতে কুলায় না, তখনই ঐ যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মায়া যাহা খুসী করিতে পারেন, তাহাতে যুক্তি-তর্কের, ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নাই।

একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না যে মায়াবাদ মায়ারূপিণী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহু কষ্ট কল্পনা এবং মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মায়াবাদ ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিতে যাইয়া মায়া ও বিবর্ত্তবাদের কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম যে নির্ব্বিকার, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু সেই তত্ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, ইহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার আর পুনরুক্তি করিব না। ক্রিয়ার দ্বারাও ব্রহ্মের কোনও প্রকার বিকার হয় না বা হইতেও পারে না। ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তি আছে, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইচ্ছার স্বভাব ক্রিয়া করা। সুতরাং যাহার যাহা স্বভাব, সে তাহা করিলে, তাহার কোনই বিকার হয় না বা হইতেও পারে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবং অন্যান্য স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে তিনি অনন্ত গুণ ও শক্তি দ্বারা চালিত হন না, কিন্তু তিনি উহাদিগের ঊর্দ্ধে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া উহাদিগকে পরিচালনা করেন। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে তিনি জাগতিক ক্রিয়া সমূহ চিরকাল নির্লিপ্ত ভাবেই সম্পাদন করিতেছেন। "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশেও জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের নির্লিপ্ততার বিষয় লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও যিনি উহার ঊর্দ্ধে বাস করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে যে বিকৃত হওয়া একান্ত অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও জগতের সমক্ষে মানবের পক্ষে নির্লিপ্ততার উচ্চতম আদর্শ ধরিয়াছেন। ব্রহ্মে যে সেই আদর্শের নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। সুতরাং অনন্ত কর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্ম নিত্য নির্লিপ্ত, সুতরাং নিত্য নির্ব্বিকার। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে কোনও বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। মায়াবাদী কর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী এবং কর্ম্মকে তিনি কোনই স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন, বিশেষতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে, যেন কর্ম্ম দ্বারা কেবল অনি-

ইই উৎপন্ন হয়, বিকারই সংসাধিত হয়। কিন্তু ক্রিয়া যে ব্রহ্মের স্বভাব, তাহা তিনি কি প্রকারে ভুলিতে পারেন? মায়াবাদী শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে মায়াবাদ শ্রুতি-সম্মত। কিন্তু সেই উপনিষদ্ই বলেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ"। ইতিপূর্ব্বে উক্ত উপনিষদের নানা সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া উহাতে কথিত হন নাই। শক্তি Dynamic, উহা কখনও Static নহে। আমরা যদি আমাদের ইচ্ছা-শক্তির কথা চিন্তা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে উহা কত শক্তি রাখে। সুতরাং শক্তি কখনও অচল, স্থির ও নিষ্ক্রিয় নহে।শক্তিকে শক্তি(Dynamic)বলিব, আবার উহাকে নিশ্চল বলিব,ইহা স্ববিরোধী উক্তি। ব্রহ্ম অনন্ত ভাবে Dynamic, সুতরাং তাঁহার শক্তির ক্রিয়াও আছে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় না। কারণ, ইচ্ছাশক্তির সুতরাং ব্রহ্মের ক্রিয়া করা স্বভাব। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলেন যে শক্তি এবং ক্রিয়া ব্রহ্মের স্বভাব। পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে বিবর্ত্তবাদ সত্য নহে, কিন্তু পরিণামবাদই সত্য। পরিণামবাদ সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্মের বিকার হইয়াছে। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার স্বভাব। সুতরাং তাঁহার কোনই বিকার হইতে পারে না। যাহা হউক্, এ বিষয়ে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠক তাহা স্মরণ করিলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত মীমাংসা পাইবেন। মায়াবাদ বহুল প্রচারের ফলে দেশে সন্ন্যাস-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম বলিয়া সকলের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর আবাল্য-সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তিনি অবশেষে ভারতবর্ষে চারিটী প্রধান মঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ম্মের বিরোধী ছিলেন এবং একমাত্র জ্ঞানের উপর ষোলআনা জোর দিয়াছেন, ইহা তাঁহার লেখার মধ্যে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহী যদিও ধার্ম্মিক হন, যদিও

তিনি আত্মিক উন্নতিতে উন্নত হন, তাহা হইলেও জন-সাধারণ তাঁহাকে তাঁহার হইতে অবনত সন্ন্যাসী অপেক্ষা হেয় চক্ষে দেখেন। আমরা বলি না যে সন্ন্যাসী মাত্রই গৃহী অপেক্ষা অবনত অথবা গৃহী মাত্রই সন্ন্যাসী হইতে অবনত। উভয় আশ্রমেই উন্নত ও অবনত পুরুষ আছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। গৃহস্থাশ্রমের অর্থ কি? যে আশ্রমে মাতা, পিতা, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ও আত্মীয় স্বজন সহ বাস করা যায়, তাহাকে গৃহস্থাশ্রম বলে। এখন দেখা যাউক্ যে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা কি কি বস্তু লাভ করি। মাতাপিতা না হইলে আমরা জগতে আসিতেই পারিতাম না এবং জগতে লালিত, পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারিতাম না। এই জন্যই তাঁহাদিগকে নৈসর্গিক ভক্তিভাজন বলা হয়। মাতাপিতার নিকট যে আমরা কতদূর ঋণী, তাহা আমরা এস্থলে লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। মিলিত মাতা ও পিতায় আমরা অনন্ত স্নেহময় পরমপিতার একটী ক্ষুদ্রাকারের প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। এই জন্যই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বলা হয় এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি সাধন না করিয়া গুরুদেবের প্রতিও ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধক ভক্তি-সঙ্কটে পতিত হন। তাই পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—“কেহ-কেহ-মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করিয়া, প্রথমেই অন্য কাহারও প্রতি ভক্তি করে। ইহারাও ভক্তি সঙ্কটে পতিত সন্দেহ নাই। কারণ, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করিলে, অনন্ত ন্যায়বান মঙ্গলময় পরমপিতার নিয়মানুসারে যাবৎ ঐ মাতাপিতার উদ্ধার না হইবে, তাবৎ তাহারও উদ্ধার নাই। যদি কোন আত্মা অতি উচ্চ স্থান হইতে আসিয়াও পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকেও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।” “ঈশ্বর-প্রেম পূর্ণ ভাবে কখন হয় না বলিয়া ঈশ্বর ভক্তিরও কখনই লয় হইতে পারে না। কিন্তু পার্থিব ভক্তির লয় আছে, কারণ, উহা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে না। যখন পার্থিব ভক্তিভাজনের প্রতি

ভক্তির পূর্ণতা হয় এবং যখন পার্থিব ভক্তিভাজনের প্রতি প্রেম সাধনা আরম্ভ হয়, তখনই পার্থিব ভক্তির লয় হয়। পরন্তু ইহা অতি সুকঠিন। এই পার্থিব ভক্তির লয় সাধনার্থে বা পার্থিব ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য কত শত মহাত্মা পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হন। যেহেতু জন্মান্তরে ঐ কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে হইতে পারে। পার্থিব ভক্তির লয় সাধনা এতই দুরূহ যে ভূমণ্ডলে ঐরূপ অবস্থা কতিপয় মাত্র মহাত্মার হইয়াছিল, হইতেছে বা হইবে।" (সত্যধর্ম্ম)। তৎপরে পতি-পত্নী। পতি-পত্নীর মধ্যে প্রেম-সাধনা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। দাম্পত্য প্রেমই সর্ব্ব প্রেমের মূল। অন্য স্থলে প্রেম-সাধনা সম্ভব বটে, কিন্তু উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই প্রকৃত প্রেমই ঈশ্বর-প্রেমের অঙ্কুর। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে আমাদিগের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। হিন্দু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সন্তানকে পুত্র ও পুত্রী বলা হয়। ইহার অর্থ আমরা এই বুঝিয়াছি যে সন্তান-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহাকে মানুষ ভাবে গড়িয়া উঠাইতে বহু সাধনা ও স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, অনেক কিছু সহ্য করিতে হয়, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। সুতরাং যাহারা এই কার্য্যসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, তাহারা যে নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে স্থান লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ কি ? অর্থাৎ মাতাপিতার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে জগৎ পিতাও যে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে উন্নত হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতিও সেইরূপ বহু কর্ত্তব্য আছে এবং তাহা পালন করিতে পারিলে যে আমাদের উন্নতি অনিবার্য্য, ইহাও নিঃসন্দেহ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রেমলীলার জন্যই এই বিশ্ব সৃজন ও পালন করিতেছেন। এই গূঢ় সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা

যাইবে যে ইহা যেন সেই প্রেমলীলার উদ্দেশ্য জীবনে জীবন সাধনার্থ প্রথম শিক্ষা-স্থল। এই স্থলেই মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, দাম্পত্য প্রেম, সন্তান-স্নেহ, এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা সাধিত হইতে পারে। আমাদিগকে প্রেমময় পরম পিতার দিকে অগ্রসর করিবার জন্যই তিনি গৃহে গৃহে ক্ষুদ্রাকারে প্রেমলীলার অভিনয় করিতেছেন। আমরা সাধারণ ব্যক্তিবর্গ সকলেই প্রথম শিক্ষার্থী। সুতরাং আমাদের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ব-প্রকার সাধনা সম্ভব, কিন্তু অন্য কোন আশ্রমে তাহা সম্ভব নহে। অবশ্যই বলিতে হইবে যে কোন কোন অত্যুচ্চাঙ্গের সাধনা গৃহে থাকিয়া সম্পাদন করা বড়ই সুকঠিন। আবার গৃহস্থাশ্রমে সকল সাধনাই অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ, এস্থলে বাধা, বিঘ্ন, প্রলোভন অত্যধিক এবং পরীক্ষাও কঠিন। কিন্তু "যত মুস্কিল, তত আছান"। অর্থাৎ যিনি এই বাধা বিঘ্ন দূরে অপসারণ করিয়া কঠিন পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন, তাহাদের পুরস্কারও ততোঽধিক বুঝিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পরীক্ষার জন্যই আমাদের জগতে আগমন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। কারণ, পরব্রহ্ম হইতে অতি সাধারণ অচেতন পদার্থটী পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনিও কর্ম্ম করেন। মায়া-বাদ কর্ম্মের নিন্দা করেন বটে, কিন্তু মায়াবাদীও কি কর্ম্ম বিরহিত অবস্থায় থাকিতে পারেন? কখনই না। সুতরাং কর্ম্ম কখনও নিন্দনীয় নহে। অন্যায় কর্ম্মই নিন্দনীয় এবং নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই প্রশংসনীয়। সংসার-আশ্রম কর্ম্মবহুল স্থান। এই আশ্রমে থাকিয়াই কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্মের উৎকর্ষ অর্থাৎ নির্লিপ্ততা সাধন করিতে হইবে। সংসার হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সেই নির্লিপ্ততা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রমে প্রেমের চারিপ্রকার সাধনাই যথা—প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও শ্রদ্ধা সাধনাই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ঐ সকল গুণ এই আশ্রমেই সাধারণতঃ সাধিত হয়। প্রেমের সর্ব্বপ্রকার সাধন

সন্ন্যাস-আশ্রমে সম্ভব নহে। এই প্রেম-সাধনার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয়। কর্ম্ম ভিন্ন তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে সংসার আশ্রম প্রেমাদি বহু গুণের এবং কর্ম্ম সাধনের স্থল। যে স্থানে প্রেম আছে, যে স্থানে কর্ম্ম আছে, সেই স্থানে জ্ঞান না আসিয়া পারে না। পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিগণ সংসারী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সংসারী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীই বলিয়াছিলেন ঃ—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" (যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহা দ্বারা আমি কি করিব?) মহর্ষি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বিদায় কালেও মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার প্রিয়ই ছিলেন কিন্তু এখন প্রিয়ত্ব বর্দ্ধিত করিলেন। রাজর্ষি জনকের সভায় সমুপস্থিত বহু মুনি ঋষিই সংসারী ছিলেন। নতুবা তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলে স্বর্ণ-মুদ্রা মণ্ডিত শৃঙ্গা সহস্র গাভীতে তাঁহাদের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। সন্ন্যাসী ত ভিক্ষু, তাহার গাভী বা স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন কি? সভায় গার্গী দেবীও ছিলেন এবং তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের দশাবতারের মধ্যে পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ও বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধদেব ভিন্ন অন্য সকলে গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। * সুতরাং গৃহস্থাশ্রম যে সর্ব্বপ্রধান আশ্রম, তাহাতে সন্দেহ কি? গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞান সাধনা যে অসম্ভব নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত বিষয় দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। আশ্রম সম্বন্ধে পরমর্ষি গুরুনাথের সংক্ষিপ্ত উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "সত্যধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তৎপরে গুরুদেবের আদেশ লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। কেহই আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন না। তবে ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিবিধ শাস্ত্র পাঠ

---

* বুদ্ধদেব ও বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের পর সুতরাং সংসার-আশ্রমে কিছুকাল যাপন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ও বহুবিধ সাধনা করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তখনও শাস্ত্র পাঠ ও সাধনায় ক্ষান্ত হইবেন না। অনন্তর পুত্র উৎপন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলে এবং সে স্বয়ং সংসার নির্ব্বাহে সমর্থ হইলে আবশ্যক মত সংসার ত্যাগ করিতেও পারেন। যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, সংসারশ্রমীর অনুকুল ভাবে কার্য্য করিবেন।" (সত্যধর্ম্ম)। সর্ব্বশেষে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে সংসারাশ্রমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হইল না বলিতে হইবে। কারণ, উহা বিস্তার করিয়া লিখিত হইলে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধে পরিণত হইবে এবং উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। মায়াবাদ ক্রিয়া বিরোধী হওয়ায় অদৃষ্টবাদ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারাই আমরা বর্ত্তমান জন্মে চালিত হইবই, ইহা বলেন। এমন কি, ব্রহ্ম জ্ঞান বা সোঽহংজ্ঞান লাভ হইলেও মানবের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং সেই জন্য তিনি সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারেন এবং তখন তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মই করিতে পারেন। ইহাও মায়াবাদী বলেন। এই ভাবটী অর্থাৎ অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা ভারতে বহু-কাল রাজত্ব করিতেছিল। এই ভাব হইতেই নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। "মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভম্' "অর্থাৎ শতকোটী কল্পেও কর্ম্মের ফল ভোগ না করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। শুভাশুভ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে"। সাধা-রণের জীবনে নানা প্রকার বহু পাপ কার্য্য হইতে দেখা যায়। যদি উক্ত ভাবই সত্য হয়, তবে খৃষ্টান ধর্ম্মের অনন্ত নরকের বিধানই হইল। সত্য বটে, পাপ করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ইহাও ততোঽধিক সত্য যে ব্রহ্ম প্রেমময়, অনন্ত করুণাময়, অনন্ত ক্ষমাময়। ব্রহ্মোপাসনা ও তাঁহার নিকট অনুতপ্ত চিত্তে ব্যাকুল প্রার্থনায় যে সর্ব্বপ্রকারের সকল পাপক্ষয় হইতে পারে, ইহাও সুনিশ্চিত। পরমপিতা যে আমাদিগকে শাস্তি দেন, তাহার ফলেও আমাদিগের মঙ্গলই উৎপন্ন হয়। তাঁহার করুণা আমাদের পাপ

হইতে অনন্তগুণে অধিক, ইহা জানিতে হইবে। সুতরাং আমাদের পাপের ক্ষমাও আছে। এই জগৎ অনন্ত অনন্ত অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য। তাঁহার অসংখ্য বিধানই তাঁহার করুণায় পরিপূর্ণ। আমরা পদে পদেই অপরাধী। তিনি তাঁহার নিজ করুণাগুণে আমাদিগকে শত শত পাপ হইতে উদ্ধার করেন, নতুবা আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না, আমাদের উদ্ধারের উপায় ছিল না। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন:—"যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালছে, যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, "লয়ে যাব ভবসিন্ধু" পারে রে। (বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়)" এই সম্বন্ধে পৃথিবীর সহস্র সহস্র পাপিগণ উচ্চকণ্ঠে এবং সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন। জগাই, মাধাই, সল প্রভৃতির ন্যায় কত অসংখ্য পাপীর উদ্ধারের কাহিনী এ বিষয়ে পরিস্ফুট ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। "ধন্য তাঁহার করুণা, পাপীকে করেনা ঘৃণা, নির্ব্বিশেষে সমভাবে সবে আলিঙ্গন করে" উক্তরূপ অদৃষ্টবাদ প্রচারিত হওয়ায় উহা আমাদের মজ্জাগত হইয়া আছে। পুরুষকার যে বহু বহু অদৃষ্ট (কর্ম্মফল) হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহা ত আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। এমন কি, অনন্ত করুণাময়ের করুণার উপরেও নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমরা নিম্নলিখিত মহাবাক্য ভুলিয়াই গিয়াছি। "তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে, অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে। (ত্রৈলোক্যনাথ সন্যাল)"। উহার পরিবর্ত্তে আমরা বলিতে শিখিয়াছি:—"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষং"। এই দুইটী ভাব অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদ ও অদৃষ্টবাদ এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই। সন্ন্যাসবাদ বর্ত্তমান যুগে দুর্ব্বল হইলেও উপরোক্ত অদৃষ্টবাদ আমাদিগকে অধিকার করিয়াই আছে। তাই এখনও অলসতা এবং নিরুদ্যম আমাদিগের স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই আছে। মায়াবাদ জ্ঞানের উপর ষোলআনা জোর দেওয়ায় এক সময় ভক্তি-ধর্ম্ম সেইরূপ ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছিল

না, শুষ্ক তর্ক দ্বারা ভক্তের নয়নাঞ্জন ও প্রেমিকের প্রাণধন পরব্রহ্মের সাধন ভজন দেশে প্রচারিত হইতে দিতেছিল না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বোক্ত নানা অংশে বহু যুক্তি যোজনা দ্বারা সেই সেই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে মায়াবাদের ইতি-হাসে আমরা দেখিয়াছি যে মায়ার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে উপনিষদ্ উহার ভিত্তিভূমি নহে। উহা কিছু না হইতে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত আলো-চনায় আমরা দেখিয়াছি যে "(১) মায়াবাদ উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত নহে। মায়াবাদের সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। (২) মায়াবাদে কথিত ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব উপনিষদ্ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (৩) নেতিনেতিবাদ দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হয় না। (৪) মায়াবাদে কল্পিত সগুণ ব্রহ্ম উপনিষদে পাওয়া যায় না। (৫) মায়াবাদ কথিত চিদাভাসও উপনিষদে পাওয়া যায় না। (৬) মায়াবাদ বলবতী যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে"। আমরা আরও দেখিয়াছি যে মায়াবাদ বৌদ্ধ দর্শন দ্বারা বহুল ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। পণ্ডিত প্রবর Dr. সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সহিত ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে জোড়া দেওয়া হইয়াছে (superadded)। মায়াবাদ ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ বলেন। জ্ঞানকে তাঁহার গুণ বলা হয় নাই, ফলে দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহার জ্ঞান আছে কিন্তু তিনি জানেন না। উহারা যে স্ববিরোধী উক্তি, তাহা যে কেহ বুঝিতে পারেন। উপনিষদও বলেন যে তাঁহার জ্ঞান আছে ও জ্ঞান-ক্রিয়া আছে। অনন্তত্ব কেবল ব্যাপ্তি অর্থেই মায়াবাদে প্রযোজ্য হইতে পারে। তিনি যে অনন্ত-স্বরূপ, অনন্ত গুণ-নিধান, অনন্ত শক্তিতে

শক্তিমান, অনন্ত মহিমায় মহিমাময়, অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান, অনন্ত ভাবে অনন্ত সুন্দর, অনন্ত অমৃতে নিত্য পরিপূর্ণ, তাঁহাতে যে অনন্ত অনন্ত অনন্ত ভাব অনন্ত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান, তাহা মায়াবাদ স্বীকার করেন না। কারণ, তাহাতে কথিত ব্রহ্ম নিত্যই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং অনন্ত শব্দ সীমাবদ্ধ অর্থে (Restricted sense-এ) মায়াবাদে কথিত হইতেছে। ফলে দাঁড়াইল এই যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্যস্বরূপ, ইহাই মায়াবাদ হইতে জানা যায়। মায়াবাদ প্রেমকে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র বলিয়াছেন, যদিও ব্রহ্মপ্রেম হইতেই জগৎ সৃষ্ট (অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি)। তিনিই ত একমাত্র প্রেমময় জন্মদাতা, একমাত্র প্রেমময় স্রষ্টা, প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর। এই সকল কারণে অনেকে মায়াবাদকে Nearest approach to Śunyavad of Buddhistic Philosophy বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মায়াবাদ সাংখ্য হইতে যে বহু অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা জীবাত্মাকেও সাংখ্য পুরুষের ন্যায় নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষী মাত্র বলিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পুরুষের উপস্থিতিতেই যেমন প্রকৃতি পরিচালিত হয়, মায়াবাদের চিদাভাসও তেমনি জীবের অন্তঃকরণ এবং দেহকে চালায়। সাংখ্য-প্রধান ও মায়াবাদের মায়া প্রায় এক। মায়াবাদী মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রদর্শিত হইল এবং মায়াবাদ উহার যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উহাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু ভিন্ন কিছুতেই ব্রহ্মের শক্তি বলা যায় না। সাংখ্য-মতেও পুরুষ ও প্রকৃতি বিভিন্ন এবং বিপরীত তত্ত্ব। সাংখ্য-প্রধান সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট, মায়াবাদের মায়াও উক্ত ত্রিবিধগুণ বিশিষ্টা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কোন উপনিষদে যে উক্ত গুণ ত্রয়ের উল্লেখ মাত্র নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। সাংখ্য কল্পবাদ স্বীকার করেন। মায়াবাদ জগৎকে মিথ্যা বলেন বটে, কিন্তু কল্পের পর কল্প ক্রমে সৃষ্টি অনাদিকাল চলিতেছে ও চলিবে, ইহাও বলেন। কেবল তাহাই নহে, আরও

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কল্পান্তে জগতের লয়েও না কি জীব ও জগৎ ব্রহ্মে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিতি করে। এই প্রকারের অত্যাশ্চার্য্য মিথ্যা পদার্থের কল্পনা আর কোথায়ও আছে কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে মায়াবাদ সাংখ্যমত দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। মায়াবাদ পরব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ দুইটী ব্রহ্ম কল্পনা করিতে উহা বাধ্য হইয়াছেন। নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মদ্বারা এই সুকঠিন সৃষ্টি সমস্যার সুমীমাংসা উহা করিতে পারেন নাই, তাই তাহা প্রকারান্তরে পরব্রহ্মকে সগুণ ও সক্রিয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কূটস্থব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মকে কেন সগুণ ও সক্রিয় বলিয়া কল্পিত হইল? আমাদের মনে হয় যে "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি," "স ঐক্ষত' প্রভৃতি বাক্যের জন্যই সগুণ ব্রহ্মের সগুণতা ও সক্রিয়তার কল্পনা; নতুবা উক্ত শ্রুতি বাক্য সমূহের কোনই অর্থ থাকে না। "সগুণ ব্রহ্ম" অংশ এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সগুণ ব্রহ্মের চিদাভাস পতিত মায়া সৃষ্টি-কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মই মায়াযোগে উক্ত কার্য্য করিতেছেন। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি যদি স্বয়ং মায়াযোগে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন না করেন, তবে তাঁহাকে সগুণ (as opposed to নির্গুণ (গুণ শূন্য)) ব্রহ্ম বলিবার কোনই অর্থ থাকে না। জীবাত্মাকে যেমন কূটস্থ ব্রহ্ম বলা হয়, সেইরূপ একটী নাম সগুণ ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত হওয়া উচিত ছিল। জগৎ যে মিথ্যা নহে, সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। মায়াবাদী জগৎকে মিথ্যা বলেন বটে, কিন্তু উহাকে ব্যবহারিক ভাবে সত্য বলেন। এমন কি, সোঽহং জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকও জগৎকে ব্যবহারিক ভাবে সত্য বলিতে বাধ্য। পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যেরূপ দেখা যায় যে সৃষ্টি সমস্যার সমাধানের জন্যই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিলেও সগুণ ও সক্রিয় বলিতে মায়াবাদ

বাধ্য হইয়াছেন, অর্থাৎ দ্বিভাব সমর্থিত হইয়াছে। এস্থলেও সেই-রূপ ভাবে দ্বিভাব সমর্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে। আমরা জগৎকে সত্যও বলি, আবার উহাকে সাদি ও সান্তও বলি, অর্থাৎ উহা অনিত্য। মায়াবাদও প্রকারান্তরে তাহাই বলিতেছেন। আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব নিম্নলিখিত অর্দ্ধশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্"। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু তিনি যে কেবল মাত্র সত্যস্বরূপ নহেন, ইহাও যে সত্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। জগৎ যে মিথ্যা নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জীব অর্থে-আত্মা + দেহ। সুতরাং তিনি যে ব্রহ্ম নহেন, ইহা সহজ বোধ্য। জীব অর্থে যদি কেবল আত্মা (জীবাত্মা) মাত্র ধরা যায়, তবে তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বটেন. কিন্তু বাস্তবে তিনি অংশ ভাবে ভাস-মান। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সুতরাং আচার্য্যের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। মায়াবাদ পূর্ব্বেও একটু একটু আলোচিত হইতেছিল। সৃষ্টি কার্য্যের জটিলতা, রহস্য ভেদের কাঠিন্য এবং আশ্চর্য্য ভাবের উদয় এবং মোহ বা অজ্ঞানতায় মায়াবাদের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর উহাকে একটী পূর্ণ মতবাদে পরিণমন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মোহ বা অজ্ঞানতাই মায়ারূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মায়া দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য হইতেছে এই কথা ছাড়িয়া দিলে মোহ এবং মায়ার কোনই পার্থক্য থাকে না। সাধকের নিকট মোহও যাহা, মায়াও তাহাই। উক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে মায়াবাদ সত্য নহে। এই স্থলে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা যে মায়াবাদের তর্ক-জাল যেন মায়া দ্বারা আবৃত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার আশ্রয়ে থাকিয়া মায়াবাদী যাহা কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা কুজ্ঝটিকা জালে আবৃত। নীহার যেমন সূর্য্যোদয়ে ক্রমশঃ

বিদূরিত হইয়া যায়, মায়াবাদের যুক্ত্যাভাস উৎপন্ন মায়াজালও সেইরূপ মানব হৃদয় হইতে সত্য জ্ঞানের উদয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। মায়াবাদের যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই মায়া মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা, ইহা বুঝিলেই সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণ, সাধকের কল্যাণ এবং জগতের কল্যাণ। হে অনন্ত জ্ঞানময় পিতঃ! কবে মোহান্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে তোমার সত্য জ্ঞানের, দিব্য জ্ঞানের অতুলনীয়া জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া সকল অন্ধকার বিলোপ করিবে? হে অনন্ত জ্ঞানাধার পিতঃ! কবে জগদ্বাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার দিব্য জ্ঞানালোক প্রকাশিত থাকিবে? কবে তোমারই জ্ঞান জ্যোতিঃতে সুস্পষ্ট ভাবে তোমারই সত্যতত্ত্ব সমূহ জানিতে পারিয়া জগৎবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে? কবে আমরা সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে সকল সমস্যার সত্য ভাবে সুসমাধান করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইব? কবে আমরা তোমার সত্যজ্ঞান জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব? দয়াময় পিতঃ! তুমি অনন্ত দয়ার আধার। তোমার দয়ায় সকলই হইতে পারে। তোমার দয়া হইলে অন্ধ চক্ষু পায়, বোবা কথা বলে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। জগৎ আজ ঘোর অন্ধকারে নিপতিত, কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, পথভ্রান্ত হইয়া বিপথেই চলিতেছে। তোমাকে বাদ দিয়া মানব সকল সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিতে চায়। হে করুণাময় পিতঃ! আমরা বড়ই অধঃপতিত, বড়ই দুর্ব্বল, অকূল সাগরে পড়িয়া সর্ব্বদাই হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি নিজ গুণে আমাদিগের প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টিপাত কর। তোমার স্নেহের যে অন্ত নাই। হে অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! জগদ্বাসিজন যে তোমারই নিজ সন্তান। তোমার করুণা ভিন্ন মৃত জগৎ পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে না। হে অনন্ত প্রেমময় পিতঃ! হে অমৃতের একমাত্র আধার! তোমার নিজগুণে বিষপানে মত্ত সন্তানগণকে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার পরম জ্ঞানামৃত পান করাও। তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া তোমারি সাধন

ভজনে নিয়ত নিরত থাকুক্ এবং তোমারই গুণানুকীর্ত্তন করিয়া জগতের আকাশ বাতাশ পরিপূর্ণ করুক্। দয়াময় পিতঃ! নিজ গুণে অধম সন্তানদিগকে দয়া কর।

ওঁং

ওঁং সত্যং জ্ঞানং সর্ব্বান্ধকার-নাশনং জ্যোতির্ম্ময়ং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

যে জ্ঞান আত্মার নিত্য ধর্ম্ম, তাহার অভাব সুষুপ্তি অবস্থাতেও হয় না. কারণ, সুষুপ্তিকালে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও হয় এবং সুষুপ্তির পরে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছি" বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সুষুপ্তি কালে জ্ঞান না থাকিলে উল্লিখিত প্রতীতির উৎপত্তি হইতে পারে না। (তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা)

সুষুপ্তি

সুষুপ্তি সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। সুষুপ্তি শরীরের একটী অবস্থা-মাত্র। জাগরণ ও স্বপ্নও যেমন দেহের এক একটী অবস্থা, সুষুপ্তিও তেমনই একটী। সুতরাং সুষুপ্তি জড়ের অবস্থা বই আত্মার অবস্থা নহে। কিন্তু মায়াবাদিগণ বলেন যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে তাহা-দের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে বহু দার্শ-নিক বহু আলোচনা করিয়াছেন। একাধিক উপনিষদও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন সুষুপ্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইতেছে। মানবের শারীরিক ত্রিবিধ অবস্থা। যথা—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগরণ অবস্থায় শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক আমরা নানা কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং

অন্তঃকরণ দ্বারা চিন্তা প্রভৃতি সম্পাদন করি। স্বপ্নাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ জাগরণ কালে লব্ধ সংস্কার দ্বারা অনেক কিছু সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন স্বপ্নদ্রষ্টা জাগরণ অবস্থায়ই আছেন এবং সেইরূপ ভাবেই যেন তিনি কার্য্য করিতেছেন সুষুপ্তি সম্বন্ধে আমাদের মত প্রথমতঃ সংক্ষেপে লিখিয়া পরমত খণ্ডন কালে ইহার বিস্তার করা যাইবে। সুষুপ্তি যে একটী শারীরিক অবস্থা মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় থাকে, প্রাণ ক্রিয়ার বিশ্রাম হয় না এবং অন্তঃকরণ লীন প্রায় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। নিদ্রা তমোগুণের ক্রিয়া। সুষুপ্তিতে তমোগুণের আবরণ অত্যধিক হয় বলিয়া জ্ঞানও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিপ্রায় অবস্থিত থাকে একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু স্বল্প ক্রিয়া হয়। আনন্দও অত্যল্প লাভ হয়। কারণ, উহা অভাবাত্মক আনন্দ মাত্র, শ্রান্তির অবসানে বিশ্রামানন্দবৎ। সুতরাং তাহাতে অত্যধিক আনন্দ থাকিতে পারে না। ভাবাত্মক আনন্দ যেরূপ আমাদিগকে উৎফুল্ল ও জাগ্রত করে, উহা তাহার নিকট দাঁড়াইতেও পারে না। আমাদিগের প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। এই আনন্দও শারীরিক অবস্থা বিশেষ জনিত এবং ইহা কখনই সাধকদুর্লভ ব্রহ্মানন্দ নহে। আবার এই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিশেষ ভাবে মিলিত হন না, বরং এই অবস্থাই জীবের পক্ষে হীনতমা অবস্থা। কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে নিকৃষ্টতম যে তৃতীয়গুণ, তাহা দ্বারা জীব প্রায় সম্পূর্ণ রূপে আবৃত থাকে। এই অবস্থায় তমোগুণের উচ্চতম সীমা (Maximum limit) প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে মৃতপ্রায় অবস্থার সহিত উপমিত হইতে পারে। এই অবস্থাকে যে কেহ কেহ ব্রহ্মের সহিত মিলনের অবস্থা বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে সুষুপ্তি অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় এবং অন্তঃকরণ লীন প্রায় অবস্থায় উপনীত হয় বলিয়া প্রথমতঃ ইহাকে

সমাধি অবস্থার আভাস মাত্র মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহাকে অতিরিক্ত সাজে সাজাইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির অবস্থা মনে করা হইতেছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"সুষুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞানও থাকে না, বিষয় জ্ঞানও থাকে না। যাহারা বলেন "আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছি," সুষুপ্তিতে এরূপ বোধ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুষুপ্তির পূর্ব্ব ও পরের জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা মধ্যবর্ত্তী সুষুপ্তির বিজ্ঞান শূন্যতা ও ক্লেশশূন্যতা উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে এরূপ কিছুই বোধ হয় না। "ছান্দোগ্যের" অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে সুষুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজাপতিকে সত্যই বলিয়াছেন, "নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি,"—"অর্থাৎ হে ভগবন্, এই অবস্থাতে নিশ্চয়ই এই পুরুষ নিজেকে 'এই আমি' এই ভাবে জানে না এবং এই সকল বস্তুকেও জানে না।" সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার ব্যষ্টিগত জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে। ব্যষ্টিজীবনের এই শূন্যময় ভাব হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাতে আমরা সৃষ্টির আভাস পাই। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই তখন সম্বদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অবস্থাতেই ছিল। তাহা বিনষ্ট বা ব্যাহত হইলে আর পুনঃ প্রকাশিত হইত না এবং পূর্ব্বের জ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিত না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তাহা কি আকারে ছিল? ইহা নিশ্চয় এই যে জ্ঞান কেবল জ্ঞানভাবেই থাকিতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পুনরায় জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়, এই কথা অসঙ্গত, স্ববিরুদ্ধ। কেহ যদি বলে যে একখানা রুটী রাত্রিতে ভাঁড়ারে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহা মাখম হইয়া যায়, প্রভাতে ভাঁড়ার হইতে খুলিলে তাহা আবার রুটীর রূপ ধারণ করে, তবে এই কথা যেমন অসঙ্গত, পূর্ব্বোক্ত কথা

তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক অসঙ্গত। জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি জানি' এই তত্ত্বদ্বারা জড়িত। আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান সুষুপ্তির সময় অব্যাহত ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা জ্ঞানাকারেই ছিল, আত্মজ্ঞান দ্বারা জড়িত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সুষুপ্তির সময়ে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান যে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান সমষ্টি আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়াছিল—এমন এক আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়াছিল, যাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, নিদ্রিত হয় না, যাহা কোন প্রকারের কাল বা অবস্থার অধীন নহে। এই সত্যটী অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মজ্ঞানের দুইটী দিক্ আছে, একটী ব্যষ্টি, আর একটী সমষ্টি। ব্যষ্টি দিক্‌টী কাল ও অবস্থার অধীন। এমন এক সময় আছে যখন শরীরস্থ স্নায়ুযন্ত্রের ক্লান্তি ও অবসাদ বশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমষ্টি দিক্‌টী এরূপ কাল ও অবস্থার অধীন নহে। ইহা কোনও কালে, বা কোনও অবস্থায়, বিলুপ্ত হয় না। ইহা কাল ও অবস্থার অধীন নহে, কাল ও অবস্থাই ইহার অধীন। এই সত্য আমরা পূর্ব্বে বিচারসহ বুঝাইয়াছি। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিক্ বা প্রকারই ব্যষ্টির সুষুপ্তিকালে জাগ্রত থাকে এবং ব্যষ্টিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ (কঠ ৫।৮)। আত্মজ্ঞানের এই দুই রূপের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি সেই পূর্ব্বকার পুরাতন আমি বলিয়াই নিজেকে জানি, আমি আর একজন বলিয়া জানি না। বিষয় জগতের যে অংশকে জানি, তাহাকেও এই এক "আমি" দ্বারা জড়িত বলিয়াই জানি। বিশ্বাত্মাকে আমার আত্মা বলিয়াই জানি। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদ ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ব্যষ্টি নিদ্রিত হয়, কিন্তু সমষ্টি

জ্ঞান নিদ্রিত হয় না। ব্যষ্টি সকল সময়ে জগৎকে জানেই না, যখন জানে তখনও অতি অল্পই জানে, এবং যতটুকু জানে, তাহা ক্রমেক্রমে জানে। তাহার বিষয় জ্ঞান দেশকালের সীমার অধীন। সে যেমন জ্ঞানী, তেমনই অজ্ঞানী। কিন্তু সমষ্টি আত্মা সমুদায় জানেন এবং সকল সময়েই জানেন। তাঁহার জ্ঞান দেশ কাল দ্বারা অপরিছিন্ন। তৃতীয়তঃ ব্যষ্টি আত্মা জাগ্রদবস্থায়ও সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত নহে। সে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া বলে, তাহাও সকল সময়ে তাহার নিজায়ত্ত থাকে না। আমরা যখন যে বিষয়ে মন দেই, তাহা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিয়য় আমাদের জ্ঞান হইতে চলিয়া যায়। ব্যষ্টি আত্মজ্ঞানের বেষ্টন ছাড়িয়া যায়। সুষুপ্তির সময় যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বিস্মৃতির সময় তেমনই বিষয় জ্ঞানের অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত জ্ঞান খণ্ডাকারে আসিয়া আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্ভব করে। আমরা সকলেই এই বিস্মৃতির অধীন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ও মূর্খে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই, যিনি তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান এক কালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সমষ্টি আত্মাতে বিস্মৃতি নাই। সমস্ত বিষয়, সমগ্র দেশ, সমগ্র কাল তাঁহার জ্ঞানে চিরবর্ত্তমান। তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বিধৃত থাকে বলিয়াই পুনরায় আমাদের স্মরণ হয়। আমাদের ভোলার সঙ্গে তিনি ভুলিলে কিছুই আমাদের স্মরণ হইত না। জ্ঞান যে কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে।"

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় আমাদের ভক্তিভাজন। তাঁহার উদ্ধৃত উক্তি সমূহের আলোচনা করিতে হইবে। বিশুদ্ধ সমালোচনার (honest criticism-এর) প্রণালী অবলম্বনে আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি. ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে। তাহা নিম্নলিখিত ভাবে

প্রমাণিত হইতে পারে। এস্থলে অনুমান প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব হইলে এই সমস্যার উদ্ভব হইত না এবং উদ্ভব হইলেও তাহা বহু কাল পূর্ব্বে মীমাংসিত হইত। দেখা যায় যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য বৈদিক যুগ হইতে অদ্যাবধি বিচার চলিতেছে। যদি বলেন যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মার জ্ঞান থাকে না, তবে বলিতে হয় যে আত্মার চৈতন্যও তখন থাকিতে পারে না। আবার চৈতন্য না থাকিলে প্রাণ ক্রিয়াদি (শ্বাস প্রশ্বাসাদি এবং তজ্জন্য অন্তর-স্থিত যন্ত্র সমূহের পরিচালন ক্রিয়া) অসম্ভব হয়। জ্ঞান এবং চৈতন্য একার্থবোধক। সাধারণের ধারণা এই যে চৈতন্য বলিলে জ্ঞান বুঝাইবে না, কিন্তু ইহা ভুল। চৈতন্য থাকিলেই অনুভূতি (চলতি ভাষা হুঁষ) আছে। সুতরাং জ্ঞানও আছে। চৈতন্য-শূন্য জ্ঞান ও জ্ঞান-শূন্য চৈতন্য অর্থশূন্য কথার কথা মাত্র। পরমাত্মাকে জ্ঞান স্বরূপ এবং চিৎ স্বরূপ বা চৈতন্য স্বরূপ উভয় শব্দেই নির্দ্দেশ করা হয়। আত্মার জ্ঞান নাই বলিলে আত্মার চৈতন্য নাই বলিতে হইবে। চৈতন্য শূন্য আত্মা থাকিতে পারে না। কারণ, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা এক সময় জ্ঞান শূন্য এবং অন্য সময় সজ্ঞান, ইহা অসম্ভব। আত্মার জ্ঞান যদি এক সময় না থাকে, তবে তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে না। তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন "জ্ঞান অজ্ঞান .... ইহাও নিশ্চয়" (১৩৬৯-১৩৭০ পৃষ্ঠা)। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন "সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার .... আভাস পাই" (১৩৬৯ পৃষ্ঠা)। উভয় স্থলেই তিনি বলিয়াছেন যে সুষুপ্তিতে আত্মজ্ঞান থাকে না (বিলুপ্ত হয়) এবং এই অবস্থাকে শূন্যময় ভাব বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে জীবের জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ আত্মার প্রধান লক্ষণ যে জ্ঞান, তাহা তাঁহাতে সাময়িক ভাবে বর্ত্তমান থাকে না। ইহা যে একান্তই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি ভাড়ারের দৃষ্টান্তে যে অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বহুগুণে অধিকতর অসঙ্গত যদি বলা যায় যে রাত্রে ভাড়াকে

একটী রুটী রাখিলে তাহা শূন্যভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হয়, কিন্তু প্রভাতে দ্বার খুলিলেই রুটী শূন্য হইতে পূর্ণাকার ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। যদি বলেন যে জীবাত্মার জ্ঞান পরমাত্মার জ্ঞানের আশ্রয়ে থাকে, তবে বলিতে হয় যে জীবাত্মার জ্ঞান সর্ব্বদাই পরমাত্মার অনন্ত জ্ঞানে আশ্রিত, তাহাতে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কোন অবস্থায়ই অল্পাধিক্য নাই। অথবা পরমাত্মার জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, জীবে দেহ সংসর্গ জন্য উহার বিকৃত ও অপূর্ণ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়; জাগরণে ও স্বপ্নে যে কারণে জীবাত্মার জ্ঞানকে পরমাত্মার জ্ঞান হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করা হয়, সুষুপ্তিতেও সেই একই কারণেই উহাকে (জীবাত্মার জ্ঞানকে) পৃথক্ মনে করিতে হইবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও তাহা স্বীকার করেন। জীবাত্মার জ্ঞান তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি কখনও জ্ঞান বিরহিত অবস্থায় থাকিতে পারেন না। তিনিও জ্ঞান স্বরূপ। কারণ, জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। অবশ্যই বলিতে হইবে যে পরমাত্মার অনন্ত জ্ঞানই জীবে অর্থাৎ আত্মার দেহাবদ্ধ অবস্থায় অংশ ভাবে ভাসমান। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন এক ও অখণ্ড হইয়াও বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানও সেইরূপ এক ও অখণ্ড হইয়াও ব্যক্তিতে অংশ ভাবে ভাসমান। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মার জ্ঞানই দেহ সংসর্গে বিকৃত হইয়া চারিভাগে প্রকাশিত হয়। যথা—বুদ্ধি, মন চিত্ত ও অহঙ্কার। কিন্তু যতদিন জীবাত্মা দেহাবদ্ধ থাকিবেন, সেই দেহ স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক, অথবা কারণ-দেহই হউক, ততদিনই তাঁহার জ্ঞান অপূর্ণ ও বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইবে, অপূর্ণত্বের ও বিকৃতির মাত্রা যতই অল্প বা অধিক হউক। সেই জ্ঞান পরমাত্মা কখনও কাড়িয়া নিয়া পুনঃ প্রদান করেন না। যে জ্ঞান জীবাত্মার নিজস্ব সম্পত্তি, তাহা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত

হইতে পারেন না। * জ্ঞান বা চৈতন্য শূন্য আত্মা হইতেই পারে না। কারণ, আত্মার স্বরূপ তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। যদি তর্ক স্থলে ইহা স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে দেহে চৈতন্য শূন্য আত্মা থাকায় দেহে কোনরূপ প্রাণক্রিয়া করিতে পারে না। কারণ, প্রাণক্রিয়ার মূলে চৈতন্যময় আত্মার দেহে অবস্থিতি। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে আত্মা সূক্ষ্মদেহ সহ স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে দেহ শবে পরিণত হয়। দেহের বহু যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেও তাহাদের দ্বারা কোনই কার্য্য সম্ভব হয় না। সুতরাং দেহে চৈতন্যময় আত্মার অনুপস্থিতিতে প্রাণক্রিয়া রোধের কারণ। সুতরাং আত্মার জ্ঞান বা চৈতন্য পরমাত্মা কাড়িয়া নিলে দেহের মৃত্যু হইবে। কিন্তু মানব সুষুপ্ত হইলেই মৃত হয় না। বরং দেখা যায় যে তাহার প্রাণক্রিয়া দেহে হইতেছে এবং আরও দেখা যায় যে সুষুপ্তির পর মানব সুষুপ্তির পূর্ব্বাবস্থা হইতে সুস্থ ও সবল হইয়াছে। এই কারণেই চিকিৎসকগণ রোগী যাহাতে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার বিধান করেন। কারণ, তাহা হইলে রোগ কথঞ্চিৎ উপশম হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আত্মার চৈতন্য বা জ্ঞান, প্রেম, দয়া, সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি অনন্তগুণ তাঁহাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নাই। উহারা অনন্ত ভাবে মিশ্রিত ও একীভূত হইয়া আত্মায় নিত্য বর্ত্তমান। যদি বলেন যে আত্মার জ্ঞান সুষুপ্তি কালে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পরমাত্মায় থাকে, তবে বলিতে হইবে যে পরমাত্মা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে দেহ বিচ্যুত করিয়া রাখেন। যদি তাহাই হয়, তবে সেই সময়েই জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। জীবাত্মা মুহূর্ত্তের তরেও দেহ বিচ্যুত অবস্থায়

* যাহা হয় তাহা এই যে অত্যধিক তমঃ দ্বারা দেহ আক্রান্ত হয় বলিয়া জাগ্রত অবস্থার ন্যায় জ্ঞান প্রকাশ পায় না। আমরা প্রকাশের যন্ত্র দ্বারা বুঝি যে জ্ঞান আছে কিনা? সেই যন্ত্র যখন অত্যধিক ভাবে অপটু, তখন প্রকাশ করে কে?

থাকিতে পারেন না। কারণ, দেহ দ্বারাই পরমাত্মার ও জীবাত্মার ভেদ সংস্থাপিত হইয়াছে।এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে "গুণ বিধান" ও "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এক অখণ্ড ব্রহ্মের মধ্যে খণ্ডখণ্ড ভাবে ভাসমান আত্মার দেহাবদ্ধতা ভিন্ন অবস্থান অসম্ভব। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে পরমাত্মা দেহ দ্বারা খণ্ডিত হয়েন নাই, কিন্তু বহু ভাবে, বিচ্যুত ভাবে ভাসমান হইয়াছেন মাত্র, অবিচ্যুত হইয়া বিচ্যুতভাবে প্রকাশমান। সুতরাং আত্মা যদি দেহে না থাকেন, তবে দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আত্মাকে সুষুপ্তিতে দেহ বিচ্যুত করা হয় না। আত্মা দেহেই সজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধের শীর্ষভাগে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তির পরে সুখে নিদ্রা যাইবার প্রতীতি হয়। এই প্রতীতির কারণ স্মৃতি। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির মনে হয় যে তিনি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। স্মৃতির অর্থই পুনর্ব্বার জ্ঞানোদয়। সুতরাং সেই ব্যক্তি সুষুপ্তি কালে সুখভোগ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইহাকে কল্পনা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কল্পনা নহে। তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বলবতী যুক্তি নহে। উহাকেও অনুমান মাত্র বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্ব্বোদ্ধৃত মত অন্যান্য যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীবকে আনন্দভূক এবং চেতোমুখ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থায় জীব আনন্দ ভোগ করেন এবং তিনি তাহা জানেন। আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই যে জাগরণে ও স্বপ্নে আমাদের জ্ঞান থাকে। সুতরাং আত্মা সেই দুই অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানলাভ করে। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটীই শারীরিক অবস্থা মাত্র। ইহারা আত্মার অবস্থা নহে। সুতরাং দুইটী অবস্থায় জ্ঞান থাকিবে, কিন্তু তৃতীয়

অবস্থায় তাহা থাকিবে না, ইহা হইতেই পারে না। কারণ, আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিবে। ইহাতে সংশয় করিবার যুক্তিযুক্ত কোন হেতু নাই। এখন প্রশ্ন হইবে যে সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা জ্ঞান ক্রিয়া অনুভব করি না কেন? অন্য দুই অবস্থায় যখন জ্ঞান থাকে, ইহা সুস্পষ্ট ও সর্ব্ববাদিসম্মত, তখন সুষুপ্তিকালে আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকিবেনা কেন? কেবল সুখানুভূতির অস্পষ্ট স্মৃতি কেন বর্ত্তমান থাকে? ইহার উত্তর বুঝিতে আমাদের প্রথমতঃ সুষুপ্তি অবস্থাটী কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। স্বপ্ন-বিহীন নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। ইহা কিরূপে উপস্থিত হয়, তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। আমাদের জানা আছে যে প্রত্যেক জড় পদার্থের সুতরাং দেহেরও তিনটী গুণ আছে। যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। উহারা প্রত্যেক পদার্থেই আছে বটে, কিন্তু সমভাবে নাই। কোন পদার্থ সত্ত্ব প্রধান, কোন পদার্থ রজঃ প্রধান, আবার কোনটী তমঃ প্রধান। তমঃ-এর ধর্ম্ম ভ্রান্তি, প্রমাদ, জড়তা ও নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রা তমঃ জনিত। সুষুপ্তিতে দেহে তমঃ-এর প্রাধান্য হয়, তাই জ্ঞান ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ আবৃত প্রায় থাকে, কিন্তু তমঃ-এর এমন শক্তি নাই যে উহা আত্মার চৈতন্যকে লোপ করিতে পারে। তাঁহার প্রকাশ যৎকিঞ্চিৎ পরিমানে অবশ্যই থাকিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে চৈতন্য আত্মার গুণ, কিন্তু তমঃ জড়ের গুণ। জড়ের তমোগুণ আত্মার চৈতন্যকে একেবারে লোপ করিতে পারে না, কিন্তু অল্লাধিক পরিমানে আবরণ করিয়া রাখিতে পারে মাত্র। এই সম্পর্কে "জড়ের বাধকত্বের কারণ" ও "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশদ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। বৃক্ষলতাদিরও চৈতন্য তমঃ দ্বারা অত্যন্ত ভাবে আচ্ছন্ন। এই জন্যই উহাদিগকে অচেতন পদার্থ বলিয়াই মনে করা হইত। কিন্তু উহাদেরও চৈতন্য আছে, উহাদেরও সুখদুঃখ আছে। Sir J. C. Bose-এর বৈজ্ঞা-

নিক আবিষ্কারেও তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। বৃক্ষ লতাদির শরীর এতদূর তমঃ প্রধান যে উহা Carbon gas গ্রহণ করিতে করিতে কঠিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপিও উহাদের চৈতন্য বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় নাই। উহাদিগেতে চৈতন্যের ক্রিয়া দেখা যায়। সেইরূপ সুষুপ্ত মানবেরও জ্ঞান বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তমোগুণের আবরণের অত্যাধিক্য বশতঃ উহা বিলুপ্ত প্রায় হয়। আমরা দেখিয়াছি যে জাগরণ অবস্থায়ও জ্ঞান উঁহার স্বভাবে প্রকাশিত হয় না, উঁহা দেহ সংসর্গে আসিয়া চারি বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে উঁহাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও অহংবৃত্তি বলা হয়। স্বপ্ন-কালে জ্ঞানের প্রকাশ অত্যন্ত ভাবে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে তমোগুণের Maximum প্রভাব দেহে প্রকাশ করায় জ্ঞানের outward expression অত্যধিক ভাবে সীমাবদ্ধ (Restricted) হয়। তাই আমরা জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাই না। কারণ, আমাদের মস্তিষ্ক ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের উপর তমোগুণের maximum প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। ইহা স্বাভাবিক যে আবরণের ঘনত্ব অনুযায়ী আসল পদার্থের বহিঃপ্রকাশ অল্পাধিক হয়। কিন্তু সেই জন্য সেই পদার্থটী বিলুপ্ত হয় না। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরও উত্তাপ একটু একটু প্রকাশিত হয়, কিন্তু অগ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সাধারণের দৃষ্টিতে উহা যেন বিলুপ্ত। মোটামুটি ভাবে বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে জীবাত্মার অনন্তগুণ নিত্য তাঁহাতে বর্ত্তমান। উঁহাদের কখনও বিনাশ বা বিলোপ হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ, আত্মার স্বভাব যাঁহা, তাঁহা নিত্য ও অবিনশ্বর। উহাদের বিরহিত অবস্থা হয় না বা হইতেও পারে না। ইতিপূর্ব্বে কথিত "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" যদি আমরা ধারণা করিতে পারি, তবে ইহা সহজ বোধ্য হয় যে দেহই আত্মার গুণরাশিকে নানামাত্রার আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। আত্মার গুণরাশির আসলে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যাহা হয়, তাহা আমাদের সম্যক্ জ্ঞানের

অভাবের জন্য আমরা প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাই না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মা এবং পরমাত্মা এক ও অখণ্ড, কিন্তু বহু ভাবে ভাসমান মাত্র। এই সকলই দেহের আবরণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার জ্ঞানের বিনাশ বা সাময়িক বিলোপের প্রশ্নেরই উদয় হইতে পারে না। অবশেষে বক্তব্য যে প্রাণ ক্রিয়া চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। "সুষুপ্ত অবস্থায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই প্রতীতিও স্মৃতিরূপে জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। যে স্থলে স্মৃতি আছে, সেই স্থলেই পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে স্মৃতি পূর্ব্ব জ্ঞানের পুনরুদয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাও আমরা জানিতে পারি যে শারীরিক স্নায়ুযন্ত্রের ক্লান্তি ও অবসান বশতঃ নিদ্রাগমে জ্ঞান বহুসাংশে আবৃত হয়, কিন্তু বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না। এই অবস্থাটী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। এমন একটা গৃহের কল্পনা করা যাউক্ যে গৃহের দক্ষিণে নদী প্রবাহিত এবং সে গৃহে প্রচুর পরিমাণে জলসিক্ত সুশীতল বায়ু সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত থাকে। যদি কোন ব্যক্তি বৈশাখের দ্বিপ্রহরে ৫।৭ মাইল হাটিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঐরূপ গৃহে একটী আরাম কেদারায় বিশ্রাম করেন, তখন তাহার শরীরের ও মনের অবস্থা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি তখন সেই বায়ু সেবন করিতে করিতে বিশ্রাম উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহার মন তখন অন্য দিকে যাইতে চাহে না। সুষুপ্তির অবস্থাও তাহাই, মাত্রার পার্থক্য মাত্র। সকলেই জানেন যে নিদ্রা শ্রান্তি হরণ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় শরীর নিস্পন্দ, প্রাণক্রিয়া মাত্র বর্ত্তমান থাকে। মন চাঞ্চল্য শূন্য হয়। তমঃ জন্য দেহমনের এরূপ পূর্ণ বিরাম শারীরিক ভাবে আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। ইহাকেই শারীরিক সম্পূর্ণ বিশ্রাম (Perfect Rest) বলা হয়। মানব রজোগুণের ক্রিয়া দ্বারা

সর্ব্বদা শ্রান্ত ও ক্লান্ত। অনেকে দুশ্চিন্তাজ্বরে সর্ব্বদা আক্রান্ত। চিন্তা ভাবনা মনকে যথেষ্টরূপে ক্লান্তি দান করে। তাই কথিত হইয়াছে:—"চিন্তা চিতা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানাম মহীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণৈঃসহ বপু"। যে কোন চিন্তাই শরীরের উপর অল্পাধিক কার্য্য করে। ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য। সুতরাং মনের যখন অনায়াস লভ্য শরীর ও মনের কর্ম্মহীনতা জন্য বিরাম লাভ হয়, তখন তিনি নিশ্চয়ই বিশ্রামানন্দ ভোগ করেন। এই আনন্দ যে জ্ঞান ভিন্ন অসম্ভব, তাহা সহজ জ্ঞান লভ্য। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তমোগুণ আবরক ও নিয়ামক উভয়েই। * সুনিদ্রা বা সুষুপ্তি এই উভয় কার্য্যই অত্যধিক ভাবে সম্পাদন করে। এই আনন্দ ভোগের স্মৃতিকেই নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। "আমার মনে হইতেছে যে আমি সুষুপ্তিকালে সুখ ভোগ করিয়াছি। অর্থাৎ জ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা জাড়িত থাকিল। সুষুপ্তিতে বিশ্রামানন্দ ভোগকালীন আত্মজ্ঞান থাকে, নতুবা সেই সম্ভোগের স্মৃতির উদয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তমোগুণের অত্যধিক প্রভাব বশতঃ সেই অনুভূতির outward expression হয় না। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে আত্মার জ্ঞাতৃভাব সুষুপ্তি অবস্থায়ও থাকে। "সর্ব্বত্রা ব্যভিচারাজ্ জ্ঞ স্বরূপস্য সত্যত্বম্। সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেৎ, ন, সুষুপ্তস্যানুভূয়মানত্বা, ন হি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যতে ইতিশ্রুতেঃ"। (মাণ্ডূক্যোপনিষদের ৭ম মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্য)। "বঙ্গানুবাদ:—আত্মার জ্ঞাতৃভাবটী কোথায়ও ব্যভিচারী হয় না। সর্ব্বত্রই অনুগত থাকে: সুতরাং উহা সত্য। যদি বল, সুষুপ্তি

---

* "যতকিছু কর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সকলই রজোগুণের কার্য্য। যদি অবাধে রজোগুণের কার্য্য হইতে থাকিত, তবে চাঞ্চল্যের আতিশয্য জন্য জগৎ উৎসন্ন হইত। এই দোষ নিবারণও তমোগুণের আর একটী কার্য্য। একারণ উহাকে নিয়ামক বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

(তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)

কালে আত্মারও ত জ্ঞাতৃভাব থাকে না, সুতরাং উহাও ব্যভিচারী হইতে পারে। না, সে সময়েও তাঁহার জ্ঞাতৃভাব অনুভব গোচর হইয়া থাকে, কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না (দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)।" এই জন্যই এই অবস্থায় স্থিত জীবকে আনন্দভুক্ এবং চেতোমুখ বলা হইয়াছে। সুতরাং সুষুপ্তিতে আত্মজ্ঞান থাকে, নতুবা আনন্দ ভোগ ক্রিয়ার স্মৃতি মানবের থাকিত না। আনন্দ ভোগ নিশ্চয়ই একটী ক্রিয়া। এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ লাভ হইল, তাহাতে তাহার আনন্দ উৎপন্ন হইল। এক ব্যক্তি বিশেষ ভাবে প্রশংসা লাভ করিলে তাহার আনন্দ হয়। এক ব্যক্তির পুত্র লাভ হইল এবং তাহাতে তাহার আনন্দ হইল। এই সকল স্থলেই ভাবাত্মক ভাবে তাহারা আনন্দ লাভ করে। আবার কোন এক ব্যক্তি সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তাহাতে তাহার যন্ত্রণা জনিত বিক্ষিপ্ততা হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরাপদ ভাবের আনন্দ লাভ করিলেন অর্থাৎ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এস্থলে আনন্দ অভাবাত্মক ভাবে উদিত হয়। উভয় প্রকার দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে সেই সেই ব্যক্তি আনন্দ ভোগ করেন। উহার মধ্যে আনন্দ বিষয় ও জীব ভোক্তা। এস্থলে কেবল আনন্দ ভোগের কথাই চিন্তা করিতে হইবে। কি কারণে আনন্দ উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুষুপ্তির আনন্দ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে যে আনন্দ বিষয় ও সুষুপ্ত ব্যক্তি ভোক্তা। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে সুষুপ্তি জনিত আনন্দ অভাবাত্মক. আচার্য্য শঙ্করও তাহাই বলেন। "আনন্দময় আনন্দপ্রায়ঃ, আনন্দএব অনাত্যন্তিকত্বাৎ যথা লোকে নিরায়াসঃ স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে অত্যন্তানায়াস রূপাহীয়ং স্থিতিঃ অনেনানুভূয়ত ইত্যানন্দভুক্। (মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৫ম মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্য")। "বঙ্গানুবাদ :—আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দবহুল হয়; কিন্তু কোনই আনন্দস্বরূপ নহে; কেননা, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ

নহে। সংসারে নিরায়াস স্থিত সুখী ব্যক্তিকে যেমন (আয়াস ক্লেশরাহিত্য নিবন্ধন) আনন্দ ভোগী বলিয়া কথিত হয়; তেমনি আমাদের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন, এই কারণে তিনি আনন্দভূক্। (দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)" যদি ভাবাত্মক ভাবে উৎপন্ন আনন্দকে বিষয় ও উহার ভোগীকে ভোক্তা বলা যায়, তবে অভাবাত্মক ভাবে উৎপন্ন আনন্দকেও বিষয় ও ভোগীকে ভোক্তা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। আচার্য্যের ভাষ্য হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের পরিশ্রান্ত ব্যক্তির বিশ্রামানন্দের সুস্পষ্ট স্মৃতি থাকে, কিন্তু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি কেন এত অস্পষ্ট। তিনি ত পূর্ব্বকথিত রূপ আনন্দোপভোগের যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহা সত্য যে দৃষ্টান্তোক্ত ব্যক্তির সুস্পষ্ট স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কারণ, তিনি তখন তমঃ দ্বারা অত্যন্ত ভাবে আচ্ছন্ন নহেন এবং শীতল বায়ু সেবন রূপ ভাবাত্মক ক্রিয়াও তাহাতে হইতেছে। অধিকন্তু, তাহার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ জাগ্রত। কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তি তমঃ দ্বারা অত্যন্ত ভাবে আচ্ছন্ন বলিয়া তাহার স্মৃতি ঐরূপ সুস্পষ্ট হইতে পারে না। সুষুপ্তির গভীরতায় সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এমন ভাবে তমসাচ্ছন্ন থাকে যে উহাদের মাধ্যমে কোন জ্ঞান ক্রিয়ার outword expression হয় না বা হইতেও পারে না। বৃদ্ধের সুষুপ্তি হইতে যুবকের সুষুপ্তি গভীরতরা। আবার যুবকের সুষুপ্তি অপেক্ষা বালকের সুষুপ্তি আরও গভীরতরা সুতরাং যে স্থলে তমোগুণের আক্রমণ অধিক, সেই স্থলে জ্ঞানাবরণও সেইরূপ অধিক। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে ভাবাত্মক আনন্দের পরিমাণ অভাবাত্মক আনন্দ হইতে সর্ব্বদাই অধিকতর। স্বর্গগত শ্রীশ চন্দ্র দাশ মহাশয় সুষুপ্তি অবস্থায় মানবের জ্ঞানের বর্ত্তমানতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণের কথা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি চারিটী

সমবয়স্ক ও সুস্থ শরীর যুবককে নিদ্রিত হইতে দেওয়া হউক্। তাহারা অল্প সময় মধ্যেই সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত হইবে। তখন যদি তাহাদের মধ্যে কোন এক জনকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা যায়, তবে তিনিই জাগ্রত হইবেন, অন্য কেহ জাগরিত হইবেন না। যদি সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানই না থাকিত, তবে তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে তিনি জাগ্রত হইতেন না। আবার যিনি আহূত হইয়াছেন, তিনিই কেবল জাগরিত হইলেন কেন, অন্য কেহই বা জাগ্রত হইলেন না কেন? ইহা বিবেচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে জাগ্রত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালে জ্ঞান ছিল। আমাদের স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে সুষুপ্তিতে জ্ঞান আবৃতপ্রায় থাকে বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও বলিয়াছেন এবং আমরাও এবিষয়ে তাঁহার সহিত একমত যে "এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই যিনি তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান এককালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন।" যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান কোথায় থাকে? অবশ্যই বলিতে হইবে যে জ্ঞান আমাদের আত্মাতেই থাকে; আমাদের শরীরের গঠন এই প্রকার যে তাহা (অর্জ্জিত জ্ঞান) আবৃত থাকে। এমন বহু বহু ঘটনা আছে, যাহা আমাদের স্মৃতিপথে কখনও আসে না। কিন্তু সেই জন্য কি সেই সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে? কখনই নহে। সমস্ত অর্জ্জিত জ্ঞানই আমাতে আছে; কিন্তু উহার অধিকাংশই আবৃত অবস্থায় বর্ত্তমান। এমন ঘটনা হয়, যাহা দ্বারা হঠাৎ বহু পূর্ব্বের ঘটনার স্মৃতি জাগ্রত হয়। এই সম্পর্কে "জন্মান্তরবাদ" অংশ দ্রষ্টব্য। একটী কথা বুঝিলেই এই তত্ত্বের সহজ মীমাংসা লাভ হয়। তাহা এই যে আমাদের জাগরণ কালে আমাদের সমস্ত অর্জ্জিত জ্ঞান যেথায় থাকে, সুষুপ্তিতেও উহা তথায় থাকে। জাগরণ অবস্থায় এক সময় একটী বিষয় মাত্র হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, অন্য সকল জ্ঞান তখন আবৃত থাকে, কিন্তু বিনষ্ট

বা বিলুপ্ত হয় না। সেই সময় ইহা অবশ্যই বলা হয় না যে সেই অন্য সমস্ত জ্ঞান তখন পরমাত্মায় (জীবাত্মায় নহে) বর্ত্তমান থাকে। সুষুপ্ত অবস্থায়ও জ্ঞানক্রিয়া হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে আবৃত থাকে। এই ত গেল সর্ব্বসাধারণের কথা। কিন্তু এরূপ সাধনাও আছে, যাহা দ্বারা কেবল বর্ত্তমান জন্মের বিস্মৃত ঘটনাই স্মৃতিপথে আনয়ন করা হয় না, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাও স্মৃতিপথে উদিত হয়। অতএব স্মৃতির আলোচনা দ্বারাও বুঝিতে পারা গেল যে আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে বটে, কিন্তু বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায়ও তাহাই হয়। তখন আত্যন্তিক ভাবে তমঃ দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া সেই কালে আমাদের জ্ঞানের সেইরূপ বিনাশ হয় না, কিন্তু জ্ঞানের কখনও অভাব হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের যে মন্ত্র তত্ত্বভূষণ মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রের প্রশ্নের অন্তর্গত তাহা নিজের সিদ্ধান্ত মাত্র। উহাতে তাহার সন্দেহ প্রকাশ পাইয়াছে। উহাকে common sense conclusion বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহা যে সূক্ষ্মবিচারসহ নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সুষুপ্তি অবস্থায় মানবের জ্ঞান থাকে। আত্মার জ্ঞান যখন থাকে, তখন তাঁহার অনন্ত গুণই থাকে বুঝিতে হইবে। আত্মা কখনও কোন এক গুণ সহ বর্ত্তমান থাকেন ও অন্যান্য গুণ তাঁহার থাকে না, ইহা হইতে পারে না। আত্মা স্বমহিমায় নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু তমঃ আবরণের অত্যাধিক্য বশতঃ তাঁহার গুণরাশি এরূপভাবে অন্তঃকরণে কার্য্য করিতে পারে না, যাহাতে আমরা জাগরণকালীন বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এখন আমরা উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহে সুষুপ্তি সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। এস্থলেও বিশুদ্ধ সমালোচনার রীতি অবলম্বিত হইবে। সুতরাং তাহাতে যদি কোন মন্ত্র সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আলোচনা উপস্থিত

হয়, তাহাতে বিচারশীল সুধী পাঠক আমাদের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। প্রথমতঃ আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র নিম্নে উদ্ধার করিলাম। "উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি।" "স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।" "বঙ্গানুবাদ :—অরুণের পুত্র উদ্দালক স্বপুত্র শ্বেত কেতুকে বলিয়াছিলেন—হে সৌম্য! তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত সুষুপ্তি বা স্বপ্নতত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময়ে এইরূপ শয়ন করে, অথবা জীব পুরুষ যে সময়ে এই "স্বপিতি" নামে প্রসিদ্ধ হয়, হে সৌম্য, তখন সে স্বতে (পরমাত্মার) সহিত মিলিত হয়, স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে ইহাকে (তখন) স্বপিতি বলিয়া থাকে, কারণ, (তখন) সে স্বকে (আপনার যথার্থ স্বরূপ পরমাত্ম ভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যত্র কোথায়ও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া (বিশ্রামার্থ পুনর্ব্বার) সেই বন্ধন স্থানই অবলম্বন করে, হে সোম্য এই মনও অর্থাৎ মন উপাধি যুক্ত (মনোমধ্যে প্রবিষ্ট) এই জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কোথায়ও বিশ্রাম স্থান লাভ না করিয়া (শ্রান্তির অপনোদনার্থ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ উপলক্ষিত পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে, কারণ, হে সৌম্য, যে হেতু এই প্রাণই প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের (জীবের) বন্ধন বা প্রকৃত আশ্রয় স্থান। (পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)"। বিশিষ্ট ভাষ্যকারগণ এই দুই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে জীব সুষুপ্তি অবস্থায় সৎ স্বরূপের সহিত মিলিত হয় এবং স্বীয়

রূপ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখা যায় যে মন সুষুপ্তিতে অন্য অবলম্বনবিহীন হইয়া প্রাণকেই অবলম্বন করে। এস্থলে প্রাণ শব্দ পরমাত্মা রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৮৬৩ মন্ত্র—"তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি"। "বঙ্গানুবাদ ঃ—এইরূপে নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার শূন্য সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না; কারণ, তিনি তখন সৌরতেজঃ দ্বারা সম্পন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকেন। (পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)"। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্ত ব্যক্তি সমস্ত এবং সম্প্রসন্ন হন। শঙ্কর স্বামী "সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ" এর অর্থ করিয়াছেন "উপ-সংহৃত সর্ব্ব কারণ বৃত্তি বিত্যেতৎ; অতো বাহ্য বিষয় সম্পর্ক জনিত কালুষ্যাভাবাৎ সম্যক্ প্রসন্নঃ সম্প্রসন্নো ভবতি।" অর্থাৎ "যাহার চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিরত হইয়াছে, অতএব বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ জনিত যে চিত্ত কালুষ্য, তাহা না থাকায় সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া থাকা।" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ লিখিয়াছেন :—"সমস্তঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিরহিতঃ) (অতএব) সম্প্রসন্নঃ (নিরুদ্বেগঃ সন্)—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার শূন্য এবং সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইয়া।" আমরা এই মন্ত্রে যে ব্যাখ্যা পাইলাম, তাহা যুক্তিযুক্ত ও আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেহ যেন মনে না করেন যে "তেজসাহি তদা সম্পন্না ভবতি" কথায় বুঝাইতেছে যে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। পণ্ডিত দুর্গাচরণ, মহেশচন্দ্র, এবং আচার্য্য শঙ্কর সকলেই ইহাকে সৌরতেজঃ বলিয়াছেন এবং এই অর্থই প্রকরণ সঙ্গত। এস্থলে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনের কথা বলা হয় নাই। ছান্দোগ্য—৮।১১।১—'তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি'। "বঙ্গানু-

বাদ :—প্রজাপতি বলিলেন—আত্মা যে সময় এরূপ সুষুপ্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য, (সুতরাং) সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না, ইহাই (ঈদৃশ অবস্থাপন্ন আত্মাই) আত্মা অর্থাৎ অপহত পাপ্মাদি লক্ষণাক্রান্ত আত্মা এবং ইহাই অমৃত, অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। (পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)" প্রজাপতি কর্তৃক সুষুপ্ত জীবের অবস্থা বর্ণনা করিতে ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত এবং সম্প্রসন্ন হন। আচার্য্য শঙ্কর ও পণ্ডিত দুর্গাচরণ উপরোক্ত ভাবেই শব্দ দ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ "সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য, সুতরাং সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত। এই মন্ত্রোক্ত সুষুপ্ত জীবের অবস্থাও যুক্তিযুক্ত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত।" ছান্দোগ্য—৮।১১।৩—"এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাৎ"। "বঙ্গানুবাদ :—প্রজাপতি বলিলেন, হে মঘবন্, এই সুষুপ্ত আত্মা এই প্রকারই বটে আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু তদ্ভিন্ন বিষয় নহে। (পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)"। পণ্ডিত দুর্গাচরণ শেষ অংশের নিম্ন লিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"এতস্মাৎ (আত্মনঃ) অন্যত্র (বিষয়ান্তরং) নো এব (নৈব) অনুব্যাখ্যাস্যামি"। এস্থলে প্রজাপতি বলিলেন যে তিনি প্রকৃত আত্মা হইতে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিবেন না। সুতরাং বলিতে হইবে যে সুষুপ্ত জীব সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার সত্য স্বরূপ নহে, কিন্তু সুষুপ্ত জীবের অবস্থা মাত্র, যেমন পূর্ব্বে পূর্ব্বে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থ জীবের অবস্থা মাত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলেন নাই। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা সৎ স্বরূপের সহিত মিলিত হওয়া দূরের কথা, তিনি স্বস্বরূপেও অবস্থিতি করেন না। সৎ স্বরূপের সহিত "সম্প্রসন্ন" (সম্মিলিত) হইতে হইলে জীবাত্মার পরমাত্মার স্বরূপ লাভ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশ দ্রষ্টব্য।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে ছান্দোগ্য উপনিষদেরই একস্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, অন্য স্থলে তাহার সমর্থন নাই, বরং বিপরীত ভাবই বর্ত্তমান, অর্থাৎ সুষুপ্ত জীবের অবস্থা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। সুষুপ্ত জীবের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা মাণ্ডূক্যোপনিষদের ৫ম মন্ত্রে বিস্তারিত তত্ত্ব পাই। এরূপভাবে সুষুপ্তি সম্বন্ধে অন্য কোথাও আলোচিত হয় নাই। "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ, প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ"। "বঙ্গানুবাদ:—যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া লোকে কোনও কাম্য বস্তু কামনা করে না, কোনও স্বপ্ন দেখেনা, তাহা সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূতের ন্যায় হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভব দ্বার, সেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই তৃতীয় পাদ। (তত্ত্বভূষণ)" এই মন্ত্রেও বলা হয় নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। "একীভূত," "আনন্দময়," "প্রজ্ঞানঘন" শব্দ সমূহ দর্শনে পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে জীবাত্মাকে যখন উক্ত শব্দ সমূহ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, তখন তিনি সুষুপ্তিকালে পরমাত্মার সহিত এক হন। কিন্তু তাহা যে নহে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন:—"সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাহার স্থান, তিনি সুপ্ত স্থান, দিবস যেমন নৈশ তমোরাশি দ্বারা গ্রস্থ হয়, অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ স্বপ্নস্থানদ্বয়ে বিভিন্ন প্রকার মনঃ কল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈতসমূহ নিজনিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যেন অবিবেক বা ভেদবুদ্ধিতে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়, এই কারণেই একীভূত বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন

মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান সমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে, সেই এই অবস্থাটী অবিবেকাত্মক বলিয়া "প্রজ্ঞানঘন" নামে কথিত হইয়া থাকে। তৎকালে বিষয় বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবে মানস ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না, এই জন্য 'আনন্দময়" অর্থাৎ আনন্দবহুল হয়, কিন্তু কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে, কেন না ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। (ইতিপূর্ব্বে ১৩৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য)"। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে সুষুপ্তিতে জ্ঞানের স্বল্পতা উপস্থিত হয়। কারণ, তমঃএর আক্রমণ সেই অবস্থায় অত্যধিক। সুষুপ্তিকালীন আনন্দ যে বীজাকার প্রাপ্ত হয়, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর মাণ্ডূক্যের ৭ম মন্ত্রের "ন প্রজ্ঞানঘন" এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে "এটী সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ, কারণ, উহার স্বরূপটী বীজ ভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক" (ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থা প্রতিষেধঃ বীজভাবাবিবেক স্বরূপত্বাৎ)। মাণ্ডূক্যের ৩,৪ মন্ত্রদ্বয়েও জীবকে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে। আশ্চার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে "জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে ভূতপূর্ব্ব গতি নিয়মানুসারে সুষুপ্তি সময়ে (জীবকে) প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়।" অর্থাৎ এই অবস্থায় জ্ঞান অত্যল্প থাকে বলিয়া জীবকে প্রাজ্ঞ বলা উচিত নহে, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহা যে কিরূপ প্রাজ্ঞত্ব, তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে মাণ্ডূক্যোপনিষদে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ৭ম মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে "নান্তঃপ্রাজ্ঞং ন বহিঃ-প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং" বলা হই-য়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে মাণ্ডূক্যোপনিষদে এবং পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) উভয় স্থলেই সুষুপ্ত জীবের অবস্থা ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ পৃথক্ পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং আত্মার স্বরূপ এবং সুষুপ্ত জীবের

অবস্থার পার্থক্য যে অত্যধিক, তাহাও আমরা দেখিতেছি। সুতরাং জীব সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপ লাভ করে না। ইহা স্থির নিশ্চয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—২।১।১৯—"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতানাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে"। "বঙ্গানুবাদঃ—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময় সুষুপ্ত হয়, সে সময় কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না, (সে সময়) হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃদপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পুরীততে হৃদয় বেষ্টনে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট শরীরাভিমুখে যে বহির্গত হইয়াছে, সেই সমস্ত নাড়ী দ্বারা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত সেই কুমার কিংবা মহারাজ অথবা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন (স্বপ্নদশায়) আনন্দে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করেন (অবস্থান করেন) (পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)"। এই ব্যাখ্যায় দেখা যাইবে যে এই মন্ত্রেও বলা হইয়াছে যে জীব সুষুপ্তিকালে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে যাহা পাওয়া গিয়াছে, ইহা তাহাদেরই আভাস মাত্র। জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলনের কথা নাই। কৌষীতকি উপনিষদ্-৪।১৯—"যত্রৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্ যত এতদাগাদিতি। হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি। তদ্ যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদন্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি। শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি। তাসু তদাভবতি। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতথাস্মিন প্রাণঃ এবৈকধা ভবতি। তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্ণামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি। শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈ র্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেবন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ

প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে। প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ"।

"বঙ্গানুবাদ :—হে বালাকে, যাঁহাতে এই ব্যক্তি সুপ্ত ছিল, যাঁহাতে ছিল, এবং যাঁহা হইতে আসিল, তাহা এই—হৃদয়ে হিতা নাম্নী নাড়ীসমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়বেষ্টন অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সকল নাড়ী এক একটী কেশের সহস্রাংশ পরিমাণ ক্ষুদ্র এবং শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত বর্ণের অতি সূক্ষ্ম রস দ্বারা পূর্ণ। জীবাত্মা যখন সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দেখে না তখন সে এই সকল নাড়ীতে অবস্থিতি করে। তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়। তখন বাক্ সকল নামের সহিত, চক্ষু সকল রূপের সহিত, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত এবং মন সকল চিন্তার সহিত তাহাতে লীন হয়। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সমূহ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এই আত্মা হইতে প্রাণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি) সমূহ নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। প্রাণ সমূহ হইতে দেব (অর্থাৎ জাগতিক শক্তি) সমূহ এবং দেব সমূহ হইতে লোক সমূহ (নিসৃত হয়)। (তত্ত্বভূষণ)"। এই মন্ত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের-২।১।১৯ মন্ত্রের পুনরুক্তি মাত্র। আখ্যায়িকাও একই। বলা হইয়াছে যে জীব······অবস্থিতি করে। সুতরাং তিনি পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, ইহা বলা হয় নাই। তৎপর বলা হইয়াছে যে তিনি প্রাণের সহিত একধা অর্থাৎ একপ্রকার হন। মাণ্ডূক্যোপনিষদে একীভূত শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিলেই এই অংশের ব্যাখ্যা হইতে পারে। সুষুপ্তিতে তিনি প্রাণের অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সহিত একপ্রকার হন। সুষুপ্তিতে প্রাণক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জীব প্রাণের সহিত এক প্রকার হইয়া যান অর্থাৎ তাঁহার অন্য কোন ক্রিয়া থাকে না। পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের এবং বর্ত্তমান মন্ত্রে সুষুপ্তিকালে শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই উপনিষদের ২য় অধ্যায়ে প্রাণের অর্থাৎ প্রাণবায়ুর উৎকর্ষ

সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে এস্থানে প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়মন্ত্রে "যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণঃ এবৈকধা ভবতি।" ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে যে বহিরিন্দ্রিয় ও মন প্রাণে (প্রাণ-বায়ুতে) এক প্রকার হন। মোটামুটি বুঝিতে গেলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে মনের ক্রিয়া তখন প্রাণ ক্রিয়ায়ই নিবদ্ধ থাকে। প্রশ্নোপনিষদ্—৪র্থ প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের ৮টী মন্ত্রেই জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। মন্ত্র সমূহ ও উহাদের ব্যাখ্যা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ, প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে উহাদের আলোচনা করা যাইবে। অনু-সন্ধিৎসু পাঠক মন্ত্র সমূহ ও উহাদের শঙ্কর ভাষ্য দেখিতে পারেন। প্রথম প্রশ্নেই দেখা যায় যে কাহারা জাগরিত থাকে, কে স্বপ্ন দেখে, কে সুষুপ্ত হয় এবং সকলে কাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রশ্ন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে দেহের নানাবিধ যন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। আচার্য্য শঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন। আত্মা (জীবাত্মা) সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ প্রথম মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে শেষে লিখিয়াছেন যে "প্রতিষ্ঠা বিশিষ্ট আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই।" দ্বিতীয়মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে নিদ্রাকালে বহিরিন্দ্রিয় সমূহ মনে লয় অর্থাৎ উহারা নিষ্ক্রিয় থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র—স্বপ্নাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রাণ ক্রিয়া ও মনের কার্য্য বর্ত্তমান থাকে বলা হইয়াছে। অন্য সকল নিষ্ক্রিয় থাকে। চতুর্থমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে "সেই উদানই (উদান নামক দেহস্থিত বায়ু) মনোরূপী যজমানকে প্রত্যহ (সুষুপ্তি কালে স্বপ্নদর্শন হইতে বিরত করিয়া) ব্রহ্মপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে"। ইতঃপর দক্ষ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে মন জীবাত্মায় লয় হয়। মন কখনও ব্রহ্ম লাভ করে না। মায়াবাদী ও সাংখ্যবাদিগণ মনকে জড় বলিয়া-

ছেন। সুতরাং উহা ব্রহ্মদর্শনে অসমর্থ। এ বিষয়ে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মন ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। পঞ্চম মন্ত্রে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে স্বপ্নকালে জীব পুরীতৎ নামক নাড়ীতে শয়ন করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।১।১৯ মন্ত্রেও ইহাই লিখিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ মন্ত্র—সুষুপ্তিকালে জীব সৌর তেজঃ দ্বারা অভিভূত হয় এবং তখন তিনি সুখলাভ করেন। এই সুখ যে ক্রিয়া রাহিত্য জন্য, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহা কখনও ব্রহ্মানন্দ হইতে পারে না। সৌরতেজঃ দ্বারা অভিভূত হওয়ার কথা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।৬।৩ মন্ত্রে দেখিতে পাইয়াছি। ৭ম ও ৮ম মন্ত্র—পক্ষী সমূহ যেমন বৃক্ষে বাস করে ও আশ্রয় লাভ করে, সেইরূপ ঐ সকল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহযন্ত্রাদি প্রাণবায়ু প্রভৃতি পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় ৭ম মন্ত্রে প্রথম "সম্প্রতিষ্ঠন্তে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সম্যক্ ধাবন্তি" এবং দ্বিতীয় "সম্প্রতিষ্ঠন্তে" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "বিলয়ার্থং ধাবন্তি"। "সম্প্রতিষ্ঠন্তে" শব্দের অর্থ সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করে বলিলেই এই মন্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা হয় বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত মহাশয়ও ১১শ মন্ত্রের "সম্প্রতিষ্ঠন্তি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে"। পক্ষিগণ বিলয়ার্থ বৃক্ষে ধাবিত হয় না, কিন্তু তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র। আমরা বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেও দেখিতে পাই যে সকলই অক্ষর ব্রহ্মে অবস্থিত। এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র, অন্য কিছু বলা হয় নাই। ৯ম মন্ত্র—এস্থলে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অর্থাৎ দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা প্রভৃতি অবস্থা-সম্পন্ন পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সুষুপ্তি জন্য পরমাত্মায় জীবের অবস্থিতির কথা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সুষুপ্তিকালে জীব দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা,

স্নসম্বিতা, মন্তা, বেদ্ধা, কর্ত্তা ভাবে থাকে না, অথচ উহারাই জীবের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যে জীব অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং এই অবস্থা জীবের জাগরণ অবস্থা, সুষুপ্তিতে এই সকল অবস্থা থাকিতে পারে না। একাদশ মন্ত্রে বলা যাইয়াছে যে "বিজ্ঞনাত্মা অন্তঃকরণ বা তদুপোলক্ষিত চৈতন্য) সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ যাঁহাতে (অক্ষরে) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যিনি সেই অক্ষরকে জানেন ইত্যাদি" (পণ্ডিত দূর্গাচরণ)। সুতরাং ৯ম মন্ত্রে সুষুপ্তির অবস্থার কোন কথা নাই। প্রশ্নোপনিষদের মন্ত্র সমূহে আমরা যাহা পাইলাম, তাহাতে নূতন কিছুই নাই। অর্থাৎ অন্যান্য উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্র সমূহে যাহা আছে, উহারা উহাদেরই আভাস মাত্র। সুষুপ্তিতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের কোন কথাই নাই, জীবাত্মা যে পরমাত্মার আশ্রয়ে নিত্য বর্ত্তমান তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বো দ্ধৃত ৬।৮।১ মন্ত্রের "স্বপিতি" এবং "স্বম্ অপীতঃ" শব্দদ্বয় সম্বন্ধে পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "স্বপিতি" এবং "স্বম্ অপীতঃ" এই দুইটীকে একার্থসূচক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের ধাত্বর্থ এক নহে। স্বপিতি =স্বপ্+লট্ তি=নিদ্রা যায়। স্বম্—আপনাকে, অপীতঃ=অপি +ই+ক্ত—প্রাপ্ত, স্বম্ অপীতঃ=আপনাকে প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষি বলিতেছেন—যে ব্যক্তির বিষয় বলা যায় "স্বপিতি" (নিদ্রা যাইতেছে), তাহার বিষয়েই বলা যাইতে পারে "স্বম্ অপীতঃ" (অর্থাৎ সে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে)।" ইহাতে দেখা যাইবে যে দুইটী শব্দ বিভিন্ন অবস্থা সূচক, কিন্তু উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতুই দুই অবস্থাকে এক অবস্থা মনে করা যাইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।১ মন্ত্রে আছে:—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি।" অর্থাৎ তখন সৎ দ্বারা তিনি মিলিত হন। এই কথার অর্থ কি? প্রত্যেক

জীবই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ের নিত্য প্রেমক্রোড়ে শিশুবৎ চির অবস্থিত। সেই অবস্থা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কোনই অপেক্ষা করে না। তাহা জীবের সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে লয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সমভাবে বর্ত্তমান। যখন অনন্ত প্রেমময় পিতা আমাদিগকে তাঁহারই মধ্যে নিত্যই প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন সুষুপ্তিকালে আমরা সৎস্বরূপ দ্বারা মিলিত হই, এই উক্তির বিশেষত্ব কোথায়? আমরা ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াই আছি। সাধন ভজন দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সজ্ঞান সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনাই উপদিষ্ট হয়, কিন্তু সুষুপ্তির দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মিলনের উপদেশ কেহই কোন কালে প্রদান করেন নাই। মোক্ষের জন্য কেহই সুষুপ্তি আশ্রয় গ্রহণ করে না। মোক্ষের অর্থ অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন ; কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হওয়া দূরের কথা, বরং উহা যতদূর সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, ততদূর হয়। পাঠক মনে রাখিবেন যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতোব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" "বঙ্গানুবাদ :—সুতরাং অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন করিলে ও অবগত হইলে এই সমুদায়ই বিদিত হয়"। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঔপনিষদিক ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি বহু বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায়ও সুষুপ্তি দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির তত্ত্ব কখনও বলেন নাই। বহির্দৃষ্টিতে সুষুপ্ত অবস্থায় জীবের অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ তাহার সত্তামাত্র অনুভব যোগ্য থাকে। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে জীব তখন সৎ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছেন বা তিনি নিজে

সংস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যে তিনি সং স্বরূপ প্রাপ্ত হন না বা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন না, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মের অন্য কোন স্বরূপের কথা না বলিয়া ঋষি কেন তাঁহার সং স্বরূপের কথা বলিলেন, তাহা পাঠক বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবেন। অবশ্যই "সং" শব্দের এস্থলে বিশেষ significance আছে বলিতে হইবে। এস্থলে "যেন সং দ্বারা মিলিত হন," "সে যেন স্বকে প্রাপ্ত হন" বলিলেই প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করা হইত মনে হয়। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের "স্বাপ্যয়াং" (১।১।৯) সূত্রের ব্যাখায় লিখিয়াছেন :—"স উপাধি দ্বয়ো পরমে সুষুপ্ত্যাবস্থায়ামুপাধিকৃত বিশেষাভাবাং স্বাত্মনি প্রলীন ইবেতি স্বং হ্যপীতো ভবতীত্যুচ্যতে"। "বঙ্গানুবাদ ঃ—যখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন এইরূপ কোন অবস্থায়ই থাকে না সে (আত্মা) তখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকেন. এবং এই অবস্থায়ই নিজ স্বরূপে যেন লীন হইয়া থাকার মত বলা হয়"। এতদ্দারাও বুঝাইতেছে যে জীব আপন স্বরূপে লয় প্রাপ্তের ন্যায় হন. কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লীন হন না। ইহাই আচার্য্যের মত। তিনি "আত্মনি প্রলীন ইব" বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।২ মন্ত্রে সুষুপ্তি অবস্থায় মন যে প্রাণে থাকে, তাহাই বলা হইয়াছে। এস্থলে "প্রাণ" শব্দে "প্রাণ উপলক্ষিত পরম দেবতা" এবং "মনঃ" শব্দে "মনঃ উপলক্ষিত জীব ভাবে" আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি আমরা মনঃ ও প্রাণের সহজ সরল ও মুখ্য অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে। অর্থাৎ মনঃ প্রাণ ক্রিয়ায় মাত্র নিযুক্ত থাকে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুষুপ্তি অবস্থা শারীরিক অবস্থা মাত্র। ইহা সহজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান উভয় দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং শারীরিক ভাবেই ইহা ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত উক্তি নহে। আমরা দেখিয়াছি যে বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী উপনিষদ্ সেই ভাবেই সুষুপ্তির বর্ণনা করিয়াছেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকার প্রথম শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্যে দেখা যায় যে তিনি মনুষ্যের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত্রিবিধ অবস্থাকেই শারীরিক বলিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে এই রূপ ব্যাখ্যা করিলেই সত্য ব্যাখ্যা হইবে বলিয়া মনে হয় জীবের মন জাগরণ ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়ে নানাদিকে ভ্রমণ করে, কিন্তু সুষুপ্ত অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের একান্ত রাহিত্য থাকায়, শরীর অবসন্ন হওয়ায় এবং তমঃ দ্বারা একান্ত ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় মন প্রাণে মাত্র অর্থাৎ প্রাণবায়ুতে অবস্থিতি করে বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিতে প্রাণক্রিয়া মাত্র বর্ত্তমান থাকে। মনের স্বভাব চঞ্চলতা এবং ক্রিয়াশীলতা। সুষুপ্ত অবস্থায় মন একান্ত ভাবে লয় হয় না। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত শঙ্কর ভাষ্য এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। সুতরাং মন প্রাণ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে বলা হইয়াছে। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ' অংশে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে লিখিত বিষয় পাঠক স্মরণ করিবেন। অন্তঃকরণ আত্মার কার্য্য ক্ষেত্র। আত্মার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার যাহা কিছু আমরা শরীরে লক্ষ্য করি, তাহা অন্তঃকরণ প্রথমে আত্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুসারে উহা দেহকে চালনা করে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ আত্মা ও দেহের মধ্যবর্ত্তী (medium) ভাবে কার্য্য করে। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য। অন্তঃকরণ যে দেহকে চালায়, ইহা বিজ্ঞান সম্মত সত্যও বটে। সুতরাং নিদ্রাকালে দেহে প্রাণক্রিয়া অন্তঃকরণ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা চিন্তা করিয়াই বলা হইয়াছে যে মন প্রাণে অবস্থিতি করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।৬ এবং ৬।১৫।১ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই উপনিষদের ৬।৮।২ মন্ত্রোক্ত "প্রাণ" শব্দের অর্থ প্রাণবায়ু বা পঞ্চপ্রাণ। ঐ স্থলেও বলা হইয়াছে যে মন প্রাণের সহিত মিলিত হয় এবং তৎপরে বলা হইয়াছে যে প্রাণ তেজের সহিত ও তেজঃ পরমদেবতার সহিত মিলিত হয়। সুতরাং

মন যে প্রাণের সহিত মিলিত হয়, তাহা পরমাত্মা নহে, কিন্তু প্রাণবায়ু মাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।১। ৭ মন্ত্রেও দেখা যায় যে "এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ সমূহের বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ সামর্থ্যকে) গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ সেই আকাশে শয়ন করে।" সুতরাং এস্থলে প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়, ইহা বলা সঙ্গত হইবে না প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু। বায়ুই নিশ্বাস সহ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচটী নামে কথিত হয়। যথা—প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ব্যান। বায়ুই প্রাণ শব্দের মুখ্য অর্থ এবং এই অর্থেই উহা উপনিষদের নানা স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে ও এই অর্থেই শারীরিক সকল যন্ত্র অপেক্ষা প্রাণের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মা দেহে না থাকিলে দেহের যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, তেমনি প্রাণবায়ু নিশ্বাস সহ গৃহিত না হইলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে জীবনের অবসান হয়। সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য আত্মার পরেই প্রাণ বায়ুর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই স্থানে স্থানে প্রাণ শব্দের অর্থ গৌণভাবে আত্মা বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রাণ প্রাণ-বায়ু মাত্র, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থলে গৌণভাবে দেহকেও আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু দেহ যে আত্মা নহে, ইহা আস্তিক মাত্রই বিশ্বাস করেন। আলোচ্য মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যেও দেখা যায় যে তিনি প্রাণ শব্দের ব্যাখায় "প্রাণ উপলক্ষিত দেবতা" বলিয়াছেন। সুতরাং তিনিও গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, তাহা সকল উপনিষদ্ বলেন না। * পূর্ব্বোক্ত সকল মন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সুষুপ্তিকালে আমাদিগের নিম্নলিখিত অবস্থা সমূহ উপস্থিত হয় :—"(১) আমা-

* এক ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।১ মন্ত্রে মিলনের কথা আছে। তাহা যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাও বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মন্তব্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

দের বহিরিন্দ্রিয় সমূহ স্বপ্নাবস্থা হইতেও অধিকতর ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। (২) আমাদের প্রাণ ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবহমান থাকে এবং তজ্জন্য অন্তরস্থিত যন্ত্রসমূহ (ফুস্‌ফুস্‌ হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি) কার্য্য করে। (৩) আমাদের অন্তঃ-করণও লীন প্রায় থাকে। (৪) সুষুপ্তিকালে স্বল্প আনন্দ থাকে এবং তাহা অভাবাত্মক। (৫) সুষুপ্তিকালে আমাদের জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু তাহা তমঃ আবরণে আবৃত প্রায়। সুতরাং উহার প্রকাশের পরিমাণও স্বল্প।" এই যে প্রথম তিন অবস্থা, উহা নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে কথিত অবস্থার কিয়দংশের আভাস মাত্র। তাই এই অবস্থাকে ব্রহ্মের সহিত মিলনের অবস্থারূপে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।১ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "বহির্ম্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ। সর্ব্বশ্চৈবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।। সর্ব্বভাব-বিনির্ম্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ। এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যু গ্রন্থবিস্তরঃ ॥" (বঙ্গানুবাদ ৯৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৮।১ মন্ত্রে ঐরূপ ভাবে সুষুপ্তিতত্ত্বের শাব্দিক গঠনের আরও একটী কারণ এই যে ঋষি তাঁহার পুত্রকে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভে তত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন। প্রত্যেক পদার্থের বা অবস্থার যে মূল কারণ ব্রহ্মই, তাহা তিনি প্রমাণ করিতেছিলেন। সুতরাং সুষুপ্ত জীবের মূলেও যে ব্রহ্মই, ইহা বুঝাইতে যাইয়া ঐরূপভাবে উক্ত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঋষি তাঁহার পুত্রকে সকলের মূল অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। এখন আমরা যুক্তি মাত্র অবলম্বনে আলোচনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন কতদূর সম্ভব। এত সময় এ বিষয়ে যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যায় যে কোন উপনিষদই বলেন নাই যে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলন জনিত অফুরন্ত জ্ঞান ও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। বরং ইহাই উক্ত হইয়াছে

যে সেইকালে জ্ঞান ও আনন্দ অত্যল্পই থাকে। আবার সেই আনন্দও অভাবাত্মক। জাগরণ ও স্বপ্নে যে জ্ঞান ও আনন্দ থাকে, তাহাও সুষুপ্তিকালে থাকে না। অথচ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬৮৷১ মন্ত্রে বলেন যে জীবাত্মা স্বস্বরূপ লাভ করেন এবং সৎ স্বরূপ দ্বারা মিলিত হন। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে সুষুপ্তি কালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইবে বটে, কিন্তু জীবাত্মা অন্ধকারেই থাকিবেন এবং সেই অন্ধকার জাগরণ ও স্বপ্নের অন্ধকার হইতেও বহুগুণে গভীরতর। ইহা স্ববিরোধী উক্তি। "ক" নামক ব্যক্তি রাজা হইবেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধকারময় গুহায় নিবদ্ধ থাকিবেন, তিনি প্রায় অজ্ঞান অবস্থা লাভ করিবেন এবং অত্যন্ত অভাবাত্মক স্বল্প আনন্দ লাভ করিবেন মাত্র। রাজত্ব লাভে তাহার অন্ধকারের অতিবৃদ্ধি, তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানের অত্যল্পতায় পরিণতি এবং ভাবাত্মক আনন্দের লোপ এবং স্বল্প অভাবাত্মক আনন্দ লাভ। ইহাও যেরূপ অসম্ভব, সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত মিলনও সেইরূপ অসম্ভব। সুষপ্তিকালে বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় এবং অন্তঃকরণ প্রায় লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষসংহিতার শ্লোকোক্ত অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই কেহ মনে করিতে পারেন যে সুষুপ্তি কালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, ঐরূপ স্থির হওয়াও যাহা, জড়ের স্থিরতাও তাহা। 'মনুষ্য সত্ত্বগুণেও স্থির হয় এবং তমোগুণেও স্থিরবৎ অবলোকিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থিরতা দ্বয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণে যে স্থির, সে বিষণ্ণ, অপ্রকাশ ও জড়প্রকৃতি এবং সত্ত্বগুণে যে স্থির, সে প্রসন্ন, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্য স্বভাব সম্পন্ন। মোহ কালে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি ও তজ্জন্য স্থিরতা তমোগুণের কার্য্য। আর জ্যোতিঃর সমুচিত বিকাশ নিবন্ধন প্রয়োজনাভাব-বোধে কর্ম্ম সম্পাদনে যে অপ্রবৃত্তি এবং ঐ অপ্রবৃত্তি জনিত প্রসন্ন ভাবের

স্থিরতা, সেই স্থিরতা সত্ত্বগুণের ফল" (ক)। সুতরাং সুষুপ্তির স্থিরতা মৃতাবস্থার স্থিরতার প্রায় তুল্য। ইহা কখনই ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বে যে স্থিরতা সাধক লাভ করেন, তাহা হইতেই পারে না। ইহা জড় সমাধির সহিত কতকটা উপমিত হইতে পারে। সুষুপ্তি কালে যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই হইত, তবে ইহা আপামর সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই সমান ও অনায়াস লভ্য হইত, সুতরাং সাধনা নিরপেক্ষ হইত। যদি তাহাই হয়, তবে সাধনার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারিত না এবং ঋষি, মুনি এবং আচার্য্যগণ সাধনার জন্য নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন না, কেবল সুষুপ্তি বৃদ্ধির সাধনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইত। ব্রহ্মের সহিত মিলনই মোক্ষপদ বাচ্য। নিদ্রা তমোগুণের অবস্থা, সুতরাং দেহে যাহাতে তমোগুণের আধিক্য সম্পাদিত হয়, তাহা সাধন করিলেই মোক্ষলাভ হইত। অহিফেন, Morphia বা তজ্জাতীয় ঔষধ সেবন করিলেই যথেষ্ট হইত। রজঃ এবং সত্ত্বের জন্য কোন সাধনাই প্রয়োজন হইত না। বরজোড় শারীরিক পরিশ্রম করিলেই সুষুপ্তি লাভ হইত। সাধারণে অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা সুষুপ্ত থাকে। অলস ব্যক্তির নিদ্রা আরও অধিক। সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ৬ ঘণ্টা অবিচ্ছেদে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত থাকা যায়, তবে ত যথেষ্টই মনে করিতে হইবে। কতজন সাধক অবিচ্ছেদে ব্রহ্মের সহিত ৬ ঘণ্টাকাল ব্যাপী মিলিত থাকিতে পারেন, তাহা আমরা জানি না। শুনা যায় যে কুম্ভকর্ণ রোগ আছে। সেই রোগী ত আরও অধিককাল ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদে মিলিত থাকিতে পারেন। এইরূপ ভাবে মিলনের ফল কি? দেখা যায় যে নিদ্রাজন্য কোনও জীবনেই বিন্দুমাত্রও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই। ব্রহ্মের সহিত যদি মিলনে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না হয়, সে যে সত্য মিলন নহে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। আবার ব্রহ্মের সহিত ঐরূপ মিলন সময়ে সেই মিলন জ্ঞান কিছুই থাকে না, অজ্ঞান

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

অন্ধকারে আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকি এ কেমন মিলন? গৃহে আলোক আসিল, কিন্তু অন্ধকার বিদূরিত হইল না, গৃহস্থ যেই তিমিরে, সেই তিমিরে। সূর্য্যের নিকটস্থ বা তাহার সহিত মিলিত হইলাম, কিন্তু আমার অন্ধকার ঘুচিল না। ইহা যে অসম্ভব, তাহা যে কেহ বুঝিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে—১৩০৯পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে তমোগুণকে নিয়ামক বলা হয়। সুতরাং বুঝা যাইবে যে নিদ্রা শরীর রক্ষার্থ পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান। শরীর রক্ষার্থ উহার যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সময় মাত্র তদর্থে ব্যয়িত হওয়া উচিত। কারণ নিদ্রার্থ ততোঽধিক যে সময় ব্যয়িত হইবে, তাহাই বৃথা নষ্ট হইল মনে করিতে হইবে। পরমর্ষি গুরুনাথ ৪ ঘণ্টা সময় নিদ্রার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে ৬ ঘণ্টা নিদ্রায় ব্যয়িত হইলে জীবনের এক চতুর্থাংশ অচেতন প্রায় অবস্থায়েই ব্যয়িত হইল বলিতে হইবে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যদি ব্রহ্মের সহিত মিলনই হয়, তবে নিদ্রাকাল হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি করাই প্রয়োজনীয়। কারণ, যত অধিককাল ব্রহ্মের সহিত মিলিত অবস্থায় থাকা যায়, ততই পরমলাভ। তমঃ হইতে রজঃ, এবং রজঃ হইতে সত্ত্ব যখন উৎকৃষ্ট, তখন তমোগুণের অবস্থা নিশ্চয়ই হীনতম অবস্থা। সুতরাং সুষুপ্তির অবস্থা যাহা তমোগুণের আত্যন্তিক অবস্থামাত্র— স্বপ্নাবস্থা হইতেও হীনতর। কারণ, স্বপ্নাবস্থায় তমোগুণের আবরণ অপেক্ষাকৃত অল্পতর। আবার জাগরণ অবস্থায় তমোগুণের আক্রমণ আরও অল্পতর। সুতরাং সুষুপ্তির অবস্থা, জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থা হইতে হীনতম। "সত্ত্বগুণ সুখাত্মক স্বচ্ছ, লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণ দুঃখাত্মক, চঞ্চল ও চালক (প্রবর্ত্তক) এবং তমোগুণ মোহাত্মক, গুরু, আবরক ও নিয়ামক" (ক)। "পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভ্রান্তি, প্রমাদ, জড়তা ও নিদ্রা তমোগুণের ধর্ম্ম। জড়তার দুইটী গুণ,—স্থাপনা ও প্রকাশাবরোধকতা। জড় বিজ্ঞানে

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

তুমি পড়িয়াছ যে জড়কে যেখানে রাখ, সেইখানেই থাকে। প্রকৃত পক্ষেও যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে থাকিতে প্রবৃত্তিকে স্থাপনা করে। আর জড় বিজ্ঞানে পড়িয়াছ যে জড় মাত্রই স্থানাবরোধক। বাস্তবিক প্রকাশের অবরোধ করাই জড়তার অপর গুণ। অতএব জগতে যত বিষন্ন ও মোহাভিভূত দেখিতে পাইতেছ ভ্রান্ত ও সংশয়িত দৃষ্টিগোচর করিতেছ, উহারা সকলেই যে তমোগুণাচ্ছন্ন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই" (ক)। সুতরাং তমোগুণ নিদ্রা ও আলস্য দ্বারা আমাদিগকে কর্ম্ম বিমুখ করিয়া রাখে। "রজোগুণ চঞ্চল ও চালক বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে করিতে যখন সত্ত্বগুণের সবিশেষ উদ্রেক হয়, তখনই মুমুক্ষুত্ব জন্মে" (ক)। অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে—সাধনা না করিলে মুমুক্ষুত্বই উপস্থিত হয় না, মোক্ষ ত অতি দূরের কথা। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। উপদেষ্টাগণ সত্ত্বভাবাপন্ন হইতেই উপদেশ দিয়াছেন, কখনই তমোগুণাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে বলেন নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। নিদ্রা এবং সুষুপ্তিতে তমোগুণের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। আচার্য্য শঙ্করও নানাস্থলে তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং সেই অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত মিলন একান্ত অসম্ভব। তমোগুণ প্রভাবে সুষুপ্তিকালে হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন থাকে এবং জ্ঞানের স্বল্পতা উপস্থিত হয়। সেই জ্ঞান এতদূর অল্পতায় পরিণত হয় যে কেহ কেহ সেই অবস্থাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। আর ব্রহ্মের সহিত মিলন কালে জীবাত্মায় ইহার বিপরীত অবস্থা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সাধক তখন অত্যধিক ভাবে দিব্য জ্ঞান, দিব্যপ্রকাশ, এবং দিব্য আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ব্রহ্মের সহিত মিলন কালে বিন্দুমাত্র অন্ধকার বা অভাবাত্মক আনন্দ থাকে না বা থাকিতেও পারে না। অপর পক্ষে ব্রহ্মের

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

সহিত মিলন কালে জীবাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের পরিমাণ অত্যধিক হয়। ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইব, অথচ সেই কালে ইন্দ্রিয় নিরোধ জন্য স্বল্পজ্ঞান ও অভাবাত্মক স্বল্প আনন্দ মাত্রের অধিকারী হইব, ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। ব্রহ্ম অনন্ত ভাবময়। তাঁহাতে বিন্দুমাত্রও অভাব নাই। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলন কালে অভাবাত্মক আনন্দ পাইতে পারেন না। সুষুপ্তিকালের আনন্দ যে অভাবাত্মক স্বল্প আনন্দ, তাহা আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন। স্থূল, ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের উৎস। ব্রহ্মের সহিত মিলন কালে জীবাত্মা সেই অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু, অনন্ত প্রেমসিন্ধু, ও অনন্ত আনন্দসিন্ধুতে সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষভাবে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং সেই আনন্দের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সেই সাধকের পক্ষেও অসম্ভব। কারণ, তাহা এতই অধিক ও এতই অপূর্ব্ব। এই জন্যই ইহাকে মূকাস্বাদনবং অনির্ব্বাচ্য বলিয়া বিশিষ্ট সাধকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। "শ্রুতিতে আছে পুরুষ যখন নিদ্রা যায় (স্বপিতি), তখন স্বংহ্যপীতো ভবতীতি" স্বং অর্থে আত্মা, অতএব জীব সুষুপ্তিকালে আত্মায় যায়। সুতরাং আত্মাই সর্ব্বকারণ। ইহা শঙ্করের এক যুক্তি। স্বং শব্দের অর্থ আত্মা বটে, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মা নহে, ব্যবহারী আত্মা। (ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা)। নিদ্রা চিত্তবৃত্তি বিশেষ। নিদ্রাকালে জীব জীবই থাকে, কেবল শুদ্ধ চৈতন্যরূপে স্থিত হয় না। নিদ্রা তামসবৃত্তি, তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্তের সঞ্চার রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলা যায়। শ্রুতিতে আছে "সুষুপ্তি কালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ সুখরূপমেতি।" স্মৃতিতে বলেন "সত্ত্বা জাগরণং বিদ্যাত্রজসা স্বপ্নমাবিশেৎ প্রস্বাপনং তু তমসাতুরীয়ং ত্রিষু সন্ততং।" ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন "অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নিদ্রা।" যোগ ভাষ্যকারও নিদ্রার তমঃ প্রাধান্য ও ত্রিগুণাত্মকত্ব সম্যক্ বুঝাইয়াছেন। কৌষীতকি

শ্রুতিতে আছে নিদ্রাকালে মন আসিয়া প্রাণরূপ আত্মায় একীভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয় ও মনের সঞ্চরণ রুদ্ধ হইয়া নিজেতে বা অন্তঃকরণে থাকাই "স্বং হ্যপীতো ভবতীতি" শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। নচেৎ নিদ্রারূপ ঘোর তামসিক বৃত্তির সমুদাচার কালে পুরুষের কৈবল্যের ন্যায় স্বরূপ স্থিতি বলা অসম্ভব কল্পনা। তাহা হইলে সমাধি ও আত্মজ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়। নিদ্রাতে যে চিত্তের লয় হয়, তাহা সাংখ্যেরা স্বীকার করেন না। কৌষীতকি শ্রুতিতেও আছে চিত্ত তখন পুরীতৎ নাড়ীতে (অন্ত্রে) থাকে, লয় হয় না। লয় হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের লয় হয়। অতএব "স্বপ্নকালে চিত্ত স্বং শব্দ বাচ্য প্রধানে লয় হয় না, কিন্তু চেতন আত্মায় লয় হয়" শঙ্করের এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অলীক। চেতন আত্মা অর্থে চেতনাযুক্ত অন্তঃকরণ হইলে উহা কথঞ্চিৎ সাংখ্য সম্মত হয়। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" এই শ্রুতির অর্থ যথা—নিদ্রাকালে প্রাজ্ঞ বা প্রকৃষ্ট রূপে অজ্ঞ (নৈশ অন্ধকারে রুদ্ধ দৃষ্টির ন্যায়) আত্মভাবের দ্বারা পরিষক্ত হইয়া বাহ্য বা অন্তর কিছুর জ্ঞান হয় না। এই প্রাজ্ঞ আত্মা শ্রুত্যন্তরোক্ত তমোঽভিভূত নিদ্রাবস্থা।" (শ্রীমদাচার্য্য হরিহরানন্দ আরণ্য দ্বারা সম্পাদিত পাতঞ্জল দর্শন-৪৫৭পৃঃ)।

সর্ব্বশেষে আমাদের বিশেষ ভাবে সর্ব্বোচ্চ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য কি? মায়াবাদিগণ বলেন যে অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করাই সাধনার উদ্দেশ্য। কূটস্থব্রহ্ম পরব্রহ্মই। তিনি অবিদ্যা আবরণে আবৃত। সেই আবরণ উন্মোচন করিলেই তিনি তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিবেন, যেমন সূর্য্য গ্রহণে চন্দ্রের ছায়া অপসারিত হইলেই সূর্য্য স্বভাবে প্রকাশিত হয়। আমরাও বলি যে সকল গুণসাধনার ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ। অর্থাৎ জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহা তাঁহার সত্তাভাবে জানিতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে, হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সে বিষয়ে অন্ধ-

কারের লেশ মাত্র থাকিলেও চলিবেনা। সংশয়ের ছায়া মাত্র পাত হইলে অথবা সেই জ্ঞান গভীরতম না হইলে চলিবে না। আবার আমরা প্রত্যেকেই অনন্ত প্রেমরসময় নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতির নিত্য প্রেম ক্রোড়ে নিত্য অবস্থিত। তিনি আমাদিগকে তাঁহারই অনন্ত প্রেমে নিত্য প্রেমান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের এই অবস্থা সত্য ভাবে গভীরতম ভাবে জানিতে হইবে। কেবল "অতএব," "সুতরাং" দ্বারা বুঝিলেই হইবে না। সুতরাং জ্ঞানের স্থান অতি উচ্চে। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে আমাদের জ্ঞান কত অধিক হইলে, কত গভীর হইলে, এইরূপ অবস্থার সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এতসময় আমরা দেখিয়াছি যে সুষুপ্তিতে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ **Irreducible minimum** (নিম্নতম) স্তরে উপস্থিত হয়। সেই জ্ঞান এত ক্ষীণ যে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কেহ কেহ সন্দিহান। ব্রহ্মের সহিত মিলন কালে সাধকের যে জ্ঞান লাভ হয়, উহার সহিত তুলনা করিলে সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান কিছুই না বলিতে হয়। সাধকগণ সেই পরম জ্ঞান ও পরমানন্দ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া নিজেদের অসামর্থ্যতাই প্রকাশ করিয়াছেন। যে মিলনে এইরূপ অপূর্ব্ব জ্ঞান, অনির্ব্বচনীয় সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হয়, সুষুপ্তি কালে সেই মিলনেই আমরা একপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার সমুদ্রেই ডুবিয়া থাকি। ইহা কি কখনও হইতে পারে? তখন কি আমাদের স্বস্বরূপের, সচ্চিদানন্দ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করি? তখন কি আমরা আমাদের নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতির সহিত মিলনের অপূর্ব্ব অমেয় পরমানন্দ ভোগ করি, পরম জ্ঞান লাভ করি? কখনই না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সুষুপ্তিকালে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন ত হয়ই না, অপরন্তু জীব অজ্ঞানের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। প্রচলিত কথায় বলে:—"বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেন পরিচিয়তে।" ব্রহ্মের সহিত মিলনের অবশ্যম্ভাবী ফল অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ প্রভৃতি, কিন্তু সুষুপ্তি

কালের নামধারী মিলনে তাহার কিছুই পাই না; আধ্যাত্মিক উন্নতি বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না, শারীরিক শ্রান্তির অপনোদন জন্য শরীর মন একটু ভাল লাগে এই মাত্র। সুতরাং ঐ অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত মিলন হয় না বা হইতেও পারে না। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে সুষুপ্তির অবস্থা অতি হীন অবস্থা, ইহা একটী শারীরিক অবস্থা মাত্র এবং এই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন মরীচিকায় বারিভ্রম বই আর কিছুই নহে। এই আলোচনায়ও আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে জড়জাত তমোগুণ আমাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকারের প্রায় শেষ সীমায় আনয়ন করে ও আমাদিগকে পরমাত্মার সহিত মিলনের সম্পূর্ণ রূপে বাধা প্রদান করে।

ওঁ শান্তং শিবমদ্বৈতং ওঁ

ওঁ

যেন সৃষ্টানি ভূতানি সততং পালিতানি চ।
সর্ব্বশক্তিনিদানস্তং নমামি জগদীশ্বরম্ ॥
(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

সাংখ্যমত

সাংখ্যমত সম্বন্ধে বহুস্থলে বিশেষতঃ মায়াবাদ অংশে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতে আমাদের মত কিছু পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন। সাংখ্যমতের যে সকল বিষয় সত্যদর্শনের সহিত ঐক্য আছে, এস্থলে সেই সম্বন্ধে কোনই আলোচনা হইবেনা। নিম্নলিখিত মূল বিষয় সমূহমাত্র এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। এস্থলে বিশেষ ভাবে বক্তব্য এই যে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনই, বিশেষতঃ ঈশ্বর কৃষ্ণ কৃত সাংখ্য কারিকা

আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে। পুরাতন সাংখ্য বলিয়া যাহা কথিত হয়, সেই সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইবে না। উহারা একটী মতবাদে(System of Philosophyতে) পরিণত হয় নাই। সাংখ্য প্রবচন সূত্র আধুনিক গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে উহা বিজ্ঞান ভিক্ষু কর্ত্তৃক রচিত। সুতরাং প্রামাণ্য দর্শন হিসাবে উহার মূল্য অধিক নহে। সমস্যা সমূহ :—"(১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কল্পান্তে সমতা প্রাপ্ত হয়। কল্পারম্ভে উহাদের সাম্যভঙ্গ করে কে? (২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ স্বাধীন ভাবে কিপ্রকারে জগৎ গঠন, পরিচালনা ও লয় করিতে পারে? (৩) সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ সমূহ কোথায় বর্ত্তমান থাকে? (৪) সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতির কি প্রকারে সংযোগ সংঘটিত হয়? (৫) বহু পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা? (৬) নিষ্ক্রিয় পুরুষ কি প্রকারে ভোক্তা ও সাক্ষী হইতে পারেন? (৭) সাংখ্যোক্ত দুঃখ নিরসনই কি মোক্ষ দান করিতে পারে?" <u>প্রথম সমস্যা</u>—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কল্পান্তে সমতা প্রাপ্ত হয়। কল্পারম্ভে উহাদের সাম্যভাব ভঙ্গ করে কে? <u>আলোচনা</u>—সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যভাবকে প্রধান বা প্রকৃতি বা অব্যক্ত বলা হয়। ইহারই পরিণামে বুদ্ধ্যাদি সকল উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগকে দ্রব্য বলা হয়। উহারা বন্ধন রজ্জুর কার্য্য করে বলিয়া উহাদিগকে গুণও বলা হয়। যাহা হউক্, কল্পান্তে সম পরিমাণে থাকে বলিয়া উহারা সাম্যভাব লাভ করে। প্রধানকে অনাদি বলা হয় ও উহা নিষ্কারণ। যদি তাহাই হয়, তবে তাহার Constituent parts অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ও অনাদি ও নিষ্কারণ। উহার পরিণাম আছে বটে, কিন্তু সেই পরিণামে উহাদের (ত্রিগুণের) নিজস্ব পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। পরিণত পদার্থ বিশেষে উহাদের পরিমাণের পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে উহারা পরস্পর সমান। সুতরাং উহাদের সমতা constant. যদি তাহাই হইল, তবে উহাদের সমতা ভঙ্গ হইবে কি প্রকারে? যে তিনটী দ্রব্য সম পরিমাণ ও সাম্য

প্রাপ্ত, সুতরাং এক, অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী, তাহাদের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইতে পারে না। সাংখ্য সমতাভঙ্গের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমটী এই যে সৃষ্টি করা প্রকৃতির স্বভাব। যদি প্রকৃতি স্বয়ং স্বাধীন ভাবে সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে, তবে উহা অনাদি কাল হইতে সৃষ্টিই করিতে থাকিবে, কাহারও অপেক্ষা করিবে না। সুতরাং জগতের কখনও লয়ও হইবে না। কিন্তু সাংখ্য কল্পের পর কল্প সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় স্বীকার করেন। এই সম্পর্কে বেদান্তদর্শনের-২।১।৩-১০ সূত্র সমূহ দ্রষ্টব্য। উহারা সাম্যভঙ্গ খণ্ডন করিয়াছে। আমরা ইতঃপর দেখিব যে অচেতনা প্রকৃতির নিজস্ব এমন কোন শক্তি নাই যাহাতে সে স্বাধীন ভাবে উহার সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছা ব্যতীত জড় স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতে পারে না। উহার নিজের শক্তিও পরিচালনা করিতে পারে না। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে। তাহাতেও দেখা যাইবে যে এই তত্ত্ব সত্য। কেনোপনিষদের উপাখ্যান সম্বন্ধেও আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে জড়ের কোনই নিজ শক্তি চালনা করিবার স্বাধীন শক্তি নাই। সুতরাং প্রধানের স্বভাব জন্য উহার সাম্যভঙ্গ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—কেহ কেহ বলেন যে পুরুষের সংযোগ বশতঃ প্রধানের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। ইতঃপর দেখা যাইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। যদি তর্কস্থলে ধরিয়া নেওয়া যায় যে পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ সম্ভব, তবে আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে পুরুষ নিষ্ক্রিয় মাত্র। সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুরুষের সংসর্গে প্রকৃতিতে ক্রিয়ার উদ্রেক অসম্ভব। বরং নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যে জড়ের যে নিজস্ব ক্রিয়া শক্তি আছে, তাহাও নিশ্চল হইয়া থাকিবে। ইহাই যে স্বাভাবিক, তাহা সহজ বোধ্য। জগতে এমন পুরুষ দেখা যায়, যাঁহার সংসর্গে আসিলে মৃতপ্রায়

ব্যক্তিরও নবজীবন লাভ হয় এবং তিনি জগতে নানাবিধ কল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আবার এমন অলস, নিরুৎসাহী ও নিরাশ ব্যক্তিও আছে, যাহার সংসর্গে কেহ আসিলে তাহার যেটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, তাহাও নিভিয়া যায় এবং সে ক্রমশঃ নিদ্রা, অলসতা, ও নিরাশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার জীবন শূন্যতায় পূর্ণ হয়। জড় জগতেও এইরূপ দেখা যায়। আগুন জল সংসর্গে নির্ব্বাপিত হয়। অগ্নিতে তেজের মাত্রা অত্যধিক, কিন্তু সেই তেজঃ পূর্ণ অগ্নি বা বিদ্যুৎ জল সংসর্গে আসিবার জন্য শক্তিহীন হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে অগ্নির মৃত্যু জল দ্বারা সংঘটিত হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তাঁহার নিজের কোনই শক্তি নাই বা থাকিতে পারে না। সাংখ্যও কোথায়ও বলেন নাই যে পুরুষের কোন শক্তি আছে। সুতরাং তাঁহার সংসর্গে প্রধানের সাম্য ভঙ্গ হইতে পারে না। আমরা "মায়াবাদ" অংশে দেখিয়াছি যে নিষ্ক্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মের উপস্থিতিতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না এবং অন্তঃকরণও চালিত হইতে পারে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুরুষের উপস্থিতিতেও প্রধানের সাম্যভঙ্গ হইতে পারে না। যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে পুরুষ-সংযোগ জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সাধন করিতে পারে না। আবার ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইতঃপর আরও লিখিত হইবে যে প্রকৃতি স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতে পারে না। সাংখ্যও তাহা স্বীকার করেন। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে সাম্যভঙ্গ ও তৎপর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অসম্ভব। সাংখ্য পুরুষ চিৎস্বরূপ বটেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াও নাই। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানে পরিচালনা শক্তিও নাই। আবার যদি স্বীকারও করা যায় যে পুরুষ-সংযোগে প্রকৃতিতে ক্রিয়াশক্তি জাগ্রত হয়, তবুও বলিতে হইবে যে উহা জ্ঞানমণ্ডিতা সৃষ্টি রচনা করিতে নিতান্ত অক্ষম। বস্তু-

জোড় উহা chaos and confusion সৃষ্টি করিতে পারিত। এই সৃষ্টির পদে পদে দেখা যায় যে একজন অনন্ত জ্ঞানময় ও অনন্ত ইচ্ছা-ময় সুতরাং নিত্য কর্ম্মী ইহার পশ্চাতে সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য করিতেছেন। তাই ইহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী বিচ্যুতি নাই, কিন্তু অপর পক্ষে ইহাতে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, প্রেম ফুটিয়া উঠি-য়াছে। জগৎ যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের কার্য্য, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানেন। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ পুরুষ-সংযোগকে পুরুষ-সান্নিধ্য অর্থ করেন। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হয় যে প্রত্যেক পুরুষই সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তাঁহারা নিত্যই প্রকৃতি সন্নিধানে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং প্রকৃতি সেইজন্যই ক্রিয়াশীলা থাকিতে পারেন। সৃষ্টির কল্পান্ত, লয়াবস্থা ও কল্পারম্ভের কোনই হেতু থাকিতে পারে না সৃষ্টি নিত্যই পুরুষ সন্নিধানে চলিতে থাকিবে, উহার বিরাম বিশ্রাম থাকিবে না। আবার পুরুষের সর্ব্বব্যাপিত্ব যখন সত্য, তখন তাঁহার বন্ধনের প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু সাংখ্য বলেন যে প্রকৃতি পুরুষকে বন্ধন করে ও মোক্ষ দান করে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে পুরুষ-সান্নিধ্য মনে করিলে সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়। অতএব বহু ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এর মধ্যে সাম্যভাব ভঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং সেই ভাবে সৃষ্টিও হইতে পারেনা। দ্বিতীয় সমস্যা: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ স্বাধীন ভাবে কি প্রকারে জগৎ গঠন, পরিচালনা ও লয় সাধন করিতে পারে? আলোচনা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্য ভাবই প্রধান। উহারা পরিণামে যে সকল পদার্থ হয়, তাহাকেই জড় জগৎ বলা হয়। প্রধান যে অচেতন ও জ্ঞানহীন, তাহা সাংখ্য নিজেই স্বীকার করেন। যদি তাহাই হইল, তবে অচেতনা ও জ্ঞানহীনা প্রকৃতি স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কেমনে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সাধন করিবেন? ইহা যে

অসম্ভব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। জড়কে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহা স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে "জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা 'সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে সৃষ্টির একটী মূল উদ্দেশ্য বর্ত্তমান এবং জগৎ সেই উদ্দেশ্য সাধনে রচিত ও পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। জগতের প্রত্যেক কার্য্যই এমন ভাবে সাধিত হইতেছে, যাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উপায় সমূহ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্যস্ত। এই সম্পর্কে "সপ্ত সমস্যা" অংশ দ্রষ্টব্য। সাংখ্যও বলেন যে পুরুষের ভোগের নিমিত্তই প্রকৃতি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন সুতরাং সৃষ্টির মূলে একটী উদ্দেশ্যের বর্ত্তমানতা সাংখ্যও স্বীকার করেন। কিন্তু জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্যে থাকিতে পারে? একমাত্র জ্ঞানীরই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞান জড়ের পক্ষে যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আবার সেই কার্য্যটী একটী তুচ্ছ খেলার Ball চালনা নহে। উহা সাংখ্য মতেই কল্পের পর কল্প বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা, উহা অসংখ্য নিষ্ক্রিয় ও চিৎস্বরূপ পুরুষকে কবলিত করা, তাঁহাদিগকে অসংখ্য ভাবে ভোগ করান এবং ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে মোক্ষ দান করা। পাঠক চিন্তা করিবেন যে ইহা চৈতন্য ও জ্ঞানহীনা প্রকৃতির পক্ষে কতদূর সম্ভব। পুরুষ কিছুই করিতেছেন না, প্রকৃতিই অসংখ্য পুরুষকে বন্ধন করিতেছে, অসংখ্য প্রকারে ভোগ করাইতেছে এবং কল্পের পর কল্প ভোগ করাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছে। জ্ঞানহীনা প্রকৃতির পক্ষে যে ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব, তাহা সহজ বোধ্য। এস্থলে কেনোপনিষদে কথিত উপাখ্যান সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে পারি। এই উপাখ্যানটী দুই ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রথমতঃ উহাকে শাব্দিক ভাবে ধরিতে পারা যায়।

অর্থাৎ ব্রহ্মই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দেবতাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহাদের নিজস্ব কোনই শক্তি নাই, তাঁহাদিগেতে যে শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহারই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই। দ্বিতীয়তঃ উহাকে রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহাতে দেখা যাইবে যে জড়ে নিহিত শক্তি পরিচালনা করিতেও উহার নিজস্ব কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মের বা পরম পুরুষের ইচ্ছা ব্যতীত স্বাধীন ভাবে বায়ু ও অগ্নি শত চেষ্টা করিয়াও একটী তৃণকে নড়াইতে বা পোড়াইতে পারে নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে, অর্থাৎ জড় স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতে পারে না। ইহাই যখন সত্য, তখন জ্ঞান হীনা প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পের পর কল্প অর্থাৎ অনাদি অনন্ত কাল এইরূপ কার্য্য করিয়াই চলিতে থাকিবে? আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে প্রধান পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াই সকল করিতেছে, উহা নিজে স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতেছে না। সুতরাং প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বাধা কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সাংখ্য পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও চিৎস্বরূপ মাত্র। তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াও নাই। He is therefore as good as dead. সুতরাং এইরূপ পুরুষের সংসর্গে প্রকৃতিতে যে কোনও ক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। Impotent পুরুষ সহবাসে কোনও স্ত্রীলোক গর্ভধারণে সমর্থ হয় না বা হইতেও পারে না। এই সম্বন্ধে 'মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবার প্রকৃতি ও সাংখ্য পুরুষের মিলনই যে অসম্ভব, তাহা ইতঃ-পর প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সাংখ্য প্রধান স্বাধীন ভাবে অথবা পুরুষ সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারে না। এস্থলে সাংখ্য কথিত অবশিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। সাংখ্য সৃষ্টিক্রম নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রধান হইতে মহৎ বা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র) ও একাদশ

ইন্দ্রিয় [মনঃ, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা (বুদ্ধিন্দ্রিয়) এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ (কর্মেন্দ্রিয়)] পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূত (ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি) উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রথমেই আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে দেহ ও আত্মার সংযোগ সাধন হইলে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইবার কথা। কিন্তু জীব ব্যতীত অন্তঃকরণের (বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, অহং-কারের—সাংখ্যে চিত্তের কোনই উল্লেখ নাই) স্থান কোথায়? অর্থাৎ জীব সৃষ্টি হইলে অর্থাৎ দেহ ও পুরুষের যোগ হইলে, পুরুষের প্রতিবিম্ব দেহে পতিত হইলে বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং কি প্রকারে জীব-দেহ-শূন্যা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে? যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তবে প্রস্তর খণ্ডেও বুদ্ধি বর্ত্তমান আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রস্তর খণ্ডে কেন, জীব ব্যতীত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথায়ও বুদ্ধির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি কেহ বলেন যে জড় জগতে বিরাট বুদ্ধি বর্ত্তমান, তবে তাহা নিছক কল্পনা মাত্র। জগতে দেখা যায় যে বুদ্ধি জীব আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। জীবাশ্রয় শূন্যা বুদ্ধি কেহ কখনও দেখে নাই বা অনুমান করিতে পারে না। বুদ্ধি কখনও শূন্যে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং শূন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধির উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য আত্মা (পুরুষ) এবং দেহ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাংখ্যমতে বুদ্ধির উৎপত্তি-কালে জড় বলিয়া কোনই পদার্থ ছিলনা। কারণ, বুদ্ধিই প্রধানের প্রথম এবং সাক্ষাৎ পরিণাম। আবার কি প্রকারে স্বয়ং অচেতনা প্রকৃতি হইতে চেতনবৎ বুদ্ধির উৎপত্তি হইতে পারে? যদি বলেন যে প্রকৃতি ও পুরুষ যুক্ত হইলে বিশ্বব্যাপী বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, তবে বলিতে হয় যে তাহাও অসম্ভব। সাংখ্য বলেন যে পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর পতিত হইয়া প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে। বুদ্ধির মাধ্যমেই পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া হয়। ইহাও সাংখ্যমত। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে প্রধানের

বা তাহা হইতে পরম্পরা ভাবে উৎপন্ন অন্য কোন জড় পদার্থের উপর পুরুষ কোনই ক্রিয়া করে না বা করিতেও পারে না। সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ প্রধানের উপর ক্রিয়া করিয়া সেই বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে না। বুদ্ধিই বা স্বয়ং কি প্রকারে অহংকার উৎপাদন করিতে পারে? "চৈতন্যাংশ * দেহে বদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্ঞানময়ত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন বোধ তাহার বুদ্ধিতে পরিণত হয়। বুদ্ধির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সংশয়াত্মক মনের উৎপত্তি হয়। তখন 'এইটী কর্ত্তব্য কিনা' ইত্যাদি ভাব আসিতে থাকে। অমনি অহংকার উৎপন্ন হইয়া চিত্তের সাহায্যে লুপ্ত-স্মৃতির আভাস যোগে 'ইহা আমি করিতে পারি' ইত্যাদি অভি-মানের সঞ্চার করে (ক)"। এই স্মৃতি কিসের? ইহা পূর্ব্ব পরম চৈতন্য অবস্থার স্মৃতি। সুতরাং অহংকার ব্রহ্মেরই জ্ঞানের বিকৃত অবস্থা। ইহা জড়ের অবস্থা নহে। বুদ্ধিও যেমন জ্ঞানের বিকার, সেইরূপ অহংকারও জ্ঞানের বিকার। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের দিব্য জ্ঞানই দেহ সংসর্গে আসিয়া চারি বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাহাই বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহংকার। উহাদের সমষ্টিকে অন্তঃকরণ বলা হয়। আবার অহংকারই বা কি প্রকারে ষোড়শ গণ এবং পঞ্চতন্মাত্র স্বয়ং পঞ্চ মহাভূত উৎপাদন করিতে পারে? যদি বলেন যে প্রধানের সহিত পুরুষ সংযোগ হইলেই উহার (প্রধানের) উক্তভাবে ক্রমশঃ পরিণাম হয়, তবে বলিতে হয় যে ইতঃপর প্রমাণিত হইবে যে প্রধান ও পুরুষ সংযোগ অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগে বুদ্ধির উৎপত্তিই অসম্ভব। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বলিতে হইবে যে প্রধানই স্বয়ং পরিণত হইয়া বিশাল জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাও

---

* চৈতন্যাংশ অর্থে ব্রহ্মের অংশ ভাবে ভাসমান। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ দ্রষ্টব্য।

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা।

অসম্ভব। কারণ, অচেতন পদার্থ স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার অন্ত:করণ সম্পূর্ণরূপে জড় পদার্থ হইতে পারে না। বুদ্ধি, মনঃ ও অহংকার প্রত্যেকেই জ্ঞানকার্য্য করে। সুতরাং পুরুষের উপস্থিতি ও কার্য্য অন্তঃকরণের উৎপত্তির কারণ। পুরুষ ভিন্ন জড় দেহ জড় বই আর কিছুই নহে। মৃতদেহে জীবাত্মার (পুরুষের) অবর্ত্তমানতা হেতু উহা জড়পিণ্ড বই আর কিছুই নহে। উহাতে অন্তঃকরণের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না! সুতরাং প্রধান স্বয়ং পরিণত হইয়া বুদ্ধ্যাদি উৎপাদন করিতে পারে না। ধরা যাউক যে প্রধানের সহিত পুরুষ-সংযোগ হয় এবং সেই জন্য উহা পরিণত হইয়া ২-৩টী তত্ত্ব উৎপাদন করে। কোনও দেহ বিশেষে পুরুষ বিশেষের সংযোগের জন্য পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয় না বা হইতেও পারে না। আর উহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে দেহের উৎপত্তিই অসম্ভব। বুদ্ধি. অহংকার ও মনের উৎপত্তিও জীব বিশেষ দ্বারা হয়, ইহা সাংখ্য বলেন না। বরং ইহাই এক সমস্যা যে প্রধান হইতে যে বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, তাহা ব্যষ্টি বুদ্ধি না সমষ্টি বুদ্ধি। সুতরাং দাঁড়ায় এই যে প্রধানই এক মাত্র দেহ এবং উহার সহিত একমাত্র পুরুষ যুক্ত হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ বুদ্ধ্যাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। প্রধান দ্বারা আবদ্ধ একমাত্র পুরুষ হইতে বহু পুরুষের উৎপত্তির কথা সাংখ্য বলেন না। সেই মতে পুরুষ বহু, বিভিন্ন ও স্বাধীন। এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি সকলের শেষে বলা হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে জড় পদার্থ সুতরাং দেহের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? আবার দেহের উৎপত্তি না হইলে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া কেমনে বুদ্ধির, বুদ্ধি হইতে অহংকার, এবং অহংকার হইতে ষোড়শ গণের উৎপত্তি হইবে? আদিতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বুদ্ধি,

অহংকার ও মনের উৎপত্তিও অসম্ভব। আমরা 'সৃষ্টিতত্ত্ব' অংশে দেখিয়াছি যে সুকৌশলে নির্ম্মিত জীবদেহ ভিন্ন অন্তঃকরণের (বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, ও অহংকারের) উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ স্বীকার করিলেও বুদ্ধির ও উহা হইতে অহংকার ইত্যাদির উৎপত্তি অসম্ভব। জীবদেহ নিরপেক্ষ বুদ্ধি, অহংকার, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কোনই প্রমাণ নাই। সেইরূপ পঞ্চভূত নিরপেক্ষ পঞ্চতন্মাত্রার অস্তিত্বেরও কোনই প্রমাণ নাই এবং সাংখ্যও কোনও প্রমাণ দেন নাই। শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমান্বয় ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির বিশেষ গুণ। ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে পঞ্চদশীর তত্ত্ব বিবেক ও ভূত বিবেক অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে প্রামাণ্য উপনিষদ্ সমূহে ও বেদান্ত দর্শনে যে সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত সাংখ্য সৃষ্টিতত্ত্বের কোনই ঐক্য নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকে লিখিত আছে যে ব্রহ্ম হইতে ক্রমান্বয় ব্যোম্, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" "বঙ্গানুবাদ :—এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী (ক্ষিতি)।"(তত্ত্বভূষণ)। সেই উপনিষদেই ৬ষ্ট অনুবাকে বলা হইয়াছে :—"স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" সাংখ্য শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন বলা হয়। তবে কেন উহা ব্রহ্ম সম্বন্ধে নির্ব্বাক এবং শ্রুতি কথিত সুস্পষ্ট সৃষ্টি তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন? শ্রুতি কথিত সৃষ্টি তত্ত্ব যুক্তি যুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু সাংখ্যমত সেইরূপ নহে। অতএব আমরা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সাংখ্য সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য নহে। এস্থলে ইহা উল্লেখ

যোগ্য যে সাংখ্য সৃষ্টিতত্ত্বে চিত্তের কোনও স্থান নাই। কেহ কেহ উহাকে মনের অন্তর্গত বলেন। কিন্তু মনের ও চিত্তের Function বিভিন্ন। সুতরাং উহারা এক হইতে পারে না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জীবাত্মার জ্ঞান দেহ সংসর্গে আসিয়া চারি বিভক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। তাহাই বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার। ইহাদিগের সমষ্টিকেই অন্তঃকরণ বলা হয়। উহাদের প্রত্যেকের Function বিভিন্ন। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশ দ্রষ্টব্য। তৃতীয় সমস্যা:—সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ সমূহ কোথায় বর্ত্তমান থাকেন? আলোচনা:—পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য অবস্থায় চিৎস্বরূপ ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং প্রকৃতি-সংযোগের পূর্ব্বেও পুরুষ সমূহ স্বাধীন ভাবে ছিলেন এবং সুদূর অতীতে কোন এক নির্দ্দিষ্টকালে তাঁহাদের সংযোগ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রকৃতি পুরুষ সংযোগের যখন শেষ আছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সেই সংযোগের আদিও আছে। তাহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা সাদি, তাহা সান্ত। আবার যাহা সান্ত, তাহা অবশ্য সাদি (ক)। আবার কল্পান্তে উঁহারা ভিন্ন হন এবং কল্পারম্ভে যুক্ত হন। * সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ সাদি। কারণ, তাহা না হইলে বলিতে হয় যে অনাদি কালে অসংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়াই বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা অসম্ভব (খ)। কারণ, দেখা যায় যে বিশ্বে

(ক) পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে পুরুষ অনাদি কাল হইতে আবদ্ধ। সুতরাং তিনি অনাদি কাল হইতে প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারেন না। যদি তাহাই সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে তাঁহার স্বাধীনতাও নাই এবং তিনি Absoluteও নহেন।

* এই সম্পর্কে ইতঃপর বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে।

(খ) ইতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ অসম্ভব, অনাদি সংযোগ ত দূরের কথা।

একই অনাদি মুহূর্ত্তে অসংখ্য জীব সৃষ্ট হয় নাই। জগৎ সৃষ্টির কথা চিন্তা করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে ক্রমান্বয় পঞ্চ-ভূত সৃষ্ট ও উহাদের মিশ্রণের পর মণ্ডল সমূহ ক্রমান্বয় সৃষ্ট হইয়াছে। বিশ্বে যে অসংখ্য মণ্ডল অবস্থিত, তাহা আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিতে পাইয়াছি। এই মণ্ডল সমূহও এক মুহূর্ত্তেই সৃষ্ট হয় নাই, উহারা ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রমই জগতের একটী বিশিষ্ট প্রণালী। ইহা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীর কথা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বহু পূর্ব্বে সূর্য্য মণ্ডল হইতে কতক উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং তাহা কালে পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। যে সকল মণ্ডলে জীবের আদি সৃষ্টি হয়, সেই সকল মণ্ডলেও জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে শীতল হইতে হইয়াছিল। এই শীতলতা প্রাপ্তির জন্যও এক এক মণ্ডলে বহুকাল ব্যয়িত হইয়াছে। এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও জীব সমূহের উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহাতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে কত কোটী কোটী বৎসর গত হইয়াছে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। সুতরাং মণ্ডল সমূহই যখন অনাদি নহে, তখন জীবও অনাদি হইতে পারে না। পৃথিবী যদি অনাদি না হইল, তবে অন্যান্য মণ্ডলও অনাদি নহে এবং সেই পন্থা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র বিশ্বও অনাদি নহে। "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সৃষ্টি সাদি। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগও অনাদি নহে। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কি মনে করেন যে এই বিরাট বিশ্ব প্রত্যেক কল্পারম্ভে একমুহূর্ত্তে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সকল মণ্ডল ও সকল জীব এক মুহূর্ত্তেই সৃষ্ট হয়? ইহা যে অসম্ভব, তাহা সহজ বোধ্য ও বিজ্ঞান সম্মত। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-রূপ বিষম সমস্যার সুমীমাংসা করিতে না পারিয়াই সাংখ্য উহাকে অনাদি সংযোগ বলিয়াছেন। ইহা যুক্তি যুক্ত মীমাংসা নহে, কিন্তু লোক চক্ষে

ধূলি নিক্ষেপ মাত্র। অতএব সাংখ্য স্বীকৃতি অনুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে পুরুষ সমূহ যখন মোক্ষের পরেও প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য ও স্বাধীন ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন, তখন সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেইরূপ স্বাধীন ও প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন ও থাকেন। চতুর্থ সমস্যা:—সৃষ্টি কালে পুরুষ ও প্রকৃতির কি প্রকারে সংযোগ সংঘটিত হয়? আলোচনা:—পুরুষ ও প্রকৃতি বিপরীত ও অসদৃশ তত্ত্ব বলিয়া সাংখ্যে কথিত হয় (কারিকা—১১)। দুইটী বিভিন্ন স্বভাবের বিপরীত, বিজাতীয় ও স্বাধীন পদার্থ দ্বয়ের মিলন অসম্ভব। Like alone can act upon like তত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও বিসদৃশ তত্ত্ব হওয়ায় উঁহাদের মিলন ও পরস্পরের উপর পরস্পরের কার্য্য একান্তই অসম্ভব। দুইটীই Absolute. সুতরাং উঁহাদের মিলন হওয়া দূরের কথা, উঁহাদের মধ্যে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়াও একান্ত অসম্ভব। আবার পুরুষ নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় ও চিৎস্বরূপ মাত্র; তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া পর্য্যন্ত নাই। এই অবস্থায় পুরুষ কেন ও কি প্রকারে প্রকৃতির কবলস্থ হইবেন? সাংখ্য পুরুষের যে স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কি বলা যায় যে কোনও কারণে বা প্রয়োজনে তিনি প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইবেন? সকল নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে বিবেকী, নিষ্ক্রিয়, স্বাধীন ও চিৎস্বরূপ সাংখ্য পুরুষের পক্ষে প্রকৃতিতে বদ্ধ হওয়ার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। চিৎস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতির মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া অবশ্যই ভোগার্থ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইতে পারেন না। যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তবে তাঁহার জ্ঞানের ও বিবেকের অভাব আছে বলিতে হইবে। কিন্তু চিৎস্বরূপ নির্ব্বিকার পুরুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। সাংখ্য পুরুষকে নিষ্ক্রিয়ও বলেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার দ্বারা প্রকৃতি-সংযোগ-রূপ কার্য্য কেমনে সম্পন্ন হইবে? তাহাতে আবার সেই কার্য্য তাঁহার স্বভাবের একান্ত বিরুদ্ধ। অর্থাৎ

প্রকৃতির মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া উহার অন্তর্গত হইয়া কেন তিনি আবদ্ধ ভাবে কল্পের পর কল্প বাস করিবেন? পুরুষের যখন মোক্ষ হয়, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে তিনি প্রকৃতি দ্বারা আবদ্ধ হন ও সেই জন্য কিছু কিছু ফল ভোগ করেন। সাংখ্য পুরুষকে ভোক্তা মাত্র বলা হয়। এই ভোক্তার অর্থ এক একজন এক একরূপ করেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি দর্শন দ্বারাই অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই ভোগ করেন। কিন্তু অপর দিকে বলা হয় যে তিনি নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপ মাত্র, তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াও নাই। যদি তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়াই না থাকে, তবে তিনি দর্শনই বা কেমনে করিবেন এবং সেই জন্য ভোগই বা কেমনে করিবেন? উভয় কার্য্যেই ক্রিয়ার প্রয়োজন। কিন্তু পুরুষ সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ক্রিয়। কেহ কেহ বলেন যে সাংখ্য পুরুষ সাক্ষী মাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি দর্শনও করেন, সুতরাং তাঁহার দর্শন ক্রিয়াও হয়। এক ব্যক্তি কোন ঘটনার সাক্ষী হইবে, অথচ সে তাহা দর্শন করে নাই, শ্রবণ করে নাই, ইত্যাদি, ইহা হইতে পারে না। কোন বিষয়ের সাক্ষী হইব, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান ক্রিয়া হয় নাই, ইহা স্ববিরোধিনী উক্তি। বিচারালয়ে সাক্ষী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও এই সম্পর্কে চিন্তয়িতব্য। যদি কেহ বলেন যে এমন অবস্থা আছে, যাহা আমার সম্মুখে সংঘটিত হয়, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ক্রিয়া হয় না, তবে বলিতে হয় যে তাহা কল্পনা মাত্র অথবা তিনি সেই ঘটনার সাক্ষী নহেন, যেমন আমার সম্মুখে কোনও ঘটনা ঘটিলে এবং আমার মন যদি সেই দিকে আকৃষ্ট না হয়, তবে সেই সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান ক্রিয়া হয় না, সুতরাং আমাকে সেই ঘটনার সাক্ষীও বলা যায় না। আমাদের মনে হয় যে সাংখ্য stand point রক্ষা করিবার জন্য ব্যাখ্যাকারগণ নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সাংখ্য বর্ণিত স্বভাব সম্পন্ন পুরুষকে প্রকৃতির সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করিয়া সেই আপত্তি এড়াইবার জন্য উঁহাদের অনাদি সংযোগ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু অনাদি সংযোগ যে হইতে পারে না,

তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভোগকে কেবল মাত্র দর্শন বলা হইল। দর্শনকে আবার সাক্ষী বলা হইল, কিন্তু সাক্ষী হইতে হইলেই যে পুরুষের কোন এক প্রকার জ্ঞান ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনই উত্তর নাই। স্থূল, পুরুষকে ভোক্তাও বলিব, আবার তাঁহাকে নিষ্ক্রিয়ও বলিব, ইহা স্ববিরোধিনী উক্তি। আবার ইতঃপর দেখা যাইবে যে পুরুষ প্রকৃতির সন্নিধানে মাত্র থাকেন। অথচ পুরুষকে দেহাবদ্ধও বলা হয় এবং জন্ম মরণ জন্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সাংখ্য প্রয়াসী। এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব দর্শনে স্থান পাওয়া উচিত কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ভোগের জন্য প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে পুরুষ কেবল নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু তিনি অভাবগ্রস্থও বটেন। কিন্তু তাহা সাংখ্যোক্ত পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তিনি Absolute, Absolute-এর কি কখনও কোন প্রকার অভাব থাকে বা থাকিতে পারে? এই অবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন একেবারেই অসম্ভব। সাংখ্য পুরুষের সম্বন্ধে বলেন যে তিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ এবং নিষ্ক্রিয়। ইহাই যাঁহার স্বভাব, তিনি কোন কারণেই কোন কালেই বিপরীত-তত্ত্ব-প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতে পারেন না, ভোগার্থ ত নহেই। তিনি নিত্য মুক্ত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভোগের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না সুতরাং তিনি প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইতে পারেন না। আবার প্রকৃতির পক্ষেও ঐরূপ বিপরীত-তত্ত্ব-পুরুষকে আকর্ষণ করা একান্ত অসম্ভব। উহার মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যাহা দ্বারা এরূপ স্বভাবের পুরুষকে উহা আকর্ষণ করিয়া ভুলাইতে পারে? পৃথিবীতে এরূপ বহু মহাপুরুষ দেখা গিয়াছে যাহারা সাধন ভজন দ্বারা এমন অত্যুন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, যে স্থলে তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার প্রলোভনই প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। যদি মানুষ সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তিনি অনাদি কাল হইতে অর্থাৎ নিত্য

নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, ও চিৎস্বরূপ মাত্র, প্রকৃতি সমগ্রভাবে তাহার সমগ্র মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। মোক্ষের পর পুরুষ প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও মুক্ত ছিলেন অর্থাৎ প্রকৃতি-সম্পর্ক শূন্য ছিলেন। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি কেবল ভোগের জন্য কেন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া আবদ্ধ হইবেন ও স্বাধীনতা, নির্ব্বিকারত্ব প্রভৃতি সুস্বভাব বিসর্জ্জন দিবেন? নিত্য মুক্ত পুরুষের আবার বন্ধন ও মোক্ষ কেমনে সম্ভব হইবে? এইরূপ পুরুষের প্রকৃতির সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে সাংখ্য অনাদি বলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ইহা সমস্যা মীমাংসার জন্য নহে, কিন্তু সমস্যা এড়াইবার জন্য। অনাদি-সংযোগ বলিলে ইহাও বলিতে হইবে যে উহা নিতান্ত স্বাভাবিক অর্থাৎ উহারা নিত্য সংযুক্তই থাকিবে। কিন্তু উহারা বিপরীত তত্ত্ব। সুতরাং উহাদের সংযোগই হইতে পারে না, অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক সংযোগ ত দূরের কথা। আবার দেখা যায় যে মোক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয় যাহা যাহার নিত্য স্বভাব, তাহার পক্ষে উহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সংযোগ প্রকৃতি ও পুরুষের স্বভাব নহে। সুতরাং উহা অনাদিও নহে। পুরুষের বন্ধন আছে, ইহা সাংখ্য স্বীকার করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বন্ধনের পূর্ব্বে পুরুষ মুক্ত বা স্বাধীন ছিলেন। যাহার বন্ধন নাই, তিনিই আবদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু যিনি অনাদি আবদ্ধ, তাঁহার আবার বন্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সেই আবদ্ধতা তাঁহার স্বভাব। যাহার বন্ধন আছে তাহারই মুক্তি হইতে পারে। অপর পক্ষে যিনি মুক্ত ছিলেন, তিনিই আবদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং এই ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে অনাদি প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অসম্ভব। কেহ কেহ সংযোগের অর্থ সান্নিধ্য বলেন। পুরুষ-সান্নিধ্যই যদি সৃষ্টি ও স্থিতির একমাত্র কারণ হয়, তবে প্রকৃতি নিত্যই ক্রিয়াশীলা থাকিতে পারে। কারণ, পুরুষ সমূহ ত

সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং অনাদি সংযোগ, বন্ধন ও মোক্ষের কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য বলেন যে প্রকৃতি পুরুষকে বদ্ধ করে ও মোক্ষ দান করে। যদি প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগের অর্থ প্রকৃতি-পুরুষ-সান্নিধ্য স্বীকার করা যায়, তবে পুরুষের মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, তিনি সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তথাকথিত মোক্ষের পরেও তিনি প্রকৃতি সন্নিধানে বর্ত্তমান থাকেন। দেহাবদ্ধাবস্থায় দেহের সহিত সুতরাং প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিশেষ যোগের আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, পুরুষ দেহে থাকিতেও বিবেকী, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও চিৎস্বরূপ। তথাকথিত বন্ধন ও মোক্ষ উভয় অবস্থায় পুরুষ এক স্বভাব। তাঁহার নিত্য স্বভাবের বিচ্যুতি হয়, তাহা সাংখ্য বলেন না। সান্নিধ্য বলিলে চলে না। কারণ, সাংখ্যমতে এক এক পুরুষের এক এক দেহ। দেহের মৃত্যুর পর যে পুরুষ সূক্ষ্মদেহে পরলোকে গমন করেন, তাহাও সাংখ্য স্বীকার করেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে পুরুষ দেহান্তর্গত হইয়াই থাকেন, কেবল মাত্র সন্নিধানে থাকেন না। শব্দার্থ ধরিতে গেলেও সান্নিধ্যকে কেহ বন্ধন বলিতে পারেন না। সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে পুরুষ-সান্নিধ্য বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বশেষে বলিতে পারা যায় যে সাংখ্য পুরুষ দেশ কালাতীত ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি কি প্রকারে বিপরীত তত্ত্বোৎপন্ন দেহ বিশেষে আবদ্ধ হইবেন? ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্য পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি স্বীকার করেন। সুতরাং বলিতে পারা যাইবে না যে পুরুষ সর্ব্বব্যাপী ও দেশকালাতীত থাকিয়াও দেহে আবদ্ধ হয়েন। অতএব প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অসম্ভব। আমরা জগতে দেখি যে মানুষ কত সহস্র সহস্র প্রকারের কুৎসিৎ, পৈশাচিক, ভীষণ, অমানুষিক কার্য্য সকল করিতেছে। মানুষ ইহ-সর্ব্বস্ব মনে করে। সে স্বার্থবুদ্ধির জন্য না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। সে ষড়রিপু ও অষ্ট পাশের ক্রীতদাসের ন্যায় কার্য্য করে। মানুষ জগতে অসংখ্য

অসংখ্য প্রকারের পাপ করিতেছে। সে সর্ব্বদাই আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষময় কার্য্য করিয়া চলিতেছে। সে দেহের দাবী মিটাইবার জন্যই ব্যস্ত ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যখন মানুষ এইরূপ পৈশাচিক ও নারকীয় সুখ সম্ভোগ করিতেই আগ্রহান্বিত, তখন নিত্য নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ কেন এইরূপ সম্ভোগ করিতেই আগ্রহান্বিত, তখন নিত্য নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ কেন এইরূপ সম্ভোগ করিতে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইবেন? তিনি যখন চিৎস্বরূপ, তখন এই সংযোগের ফল কি হইবে, তাহা তিনি অবশ্যই জানিতেন। যদি বলা হয় যে সাংখ্য পুরুষ দেহে নির্ব্বিকার ভাবেই অবস্থান করেন, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। কারণ, বলা হয় যে তিনি প্রকৃতি সম্ভোগের জন্যই উহার সহিত যুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ভোগ করেন এবং ভোগের ফল প্রাপ্ত হন। বিষয় ভোগ করিবেন, অথচ উহার ফল ভোগ করিবেন না, ইহা অসম্ভব। আর ভোগ করেন, অথচ তিনি নিষ্ক্রিয়, ইহাও অসম্ভব। ভোক্তৃত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বিরুদ্ধ উক্তি। তাহা একে সম্ভব নহে। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সাংখ্য ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চমসমস্যা: বহু পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা? আলোচনা:—সাংখ্যমতে পুরুষ বহু ও বিভিন্ন। সাংখ্যমতানুযায়ী চিন্তা করিলে দেখা যায় যে পুরুষ প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে বাস করেন। পুরুষ সমূহ সর্ব্বব্যাপী। যখন এই দুইটী তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে সকল মোক্ষ প্রাপ্ত পুরুষই এক হইতে বাধ্য। পুরুষ যখন চিৎস্বরূপ মাত্র, তখন তিনি অবশ্যই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সুতরাং বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী একই স্বভাবের বহু পদার্থ এক না হইয়াই পারে না। যদি

একটী বোতলে দুই শিশি oxygen রাখা যায় ও কোনও রূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা শিশিদ্বয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তবে উভয় শিশিস্থ oxygen এক হইয়া বোতলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যখন ইহা সত্য, তখন দুই জন মোক্ষ প্রাপ্ত পুরুষ প্রকৃতির আশ্রয় ত্যাগের মুহূর্ত্ত হইতে এক না হইয়াই পারেন না। কারণ, চিৎস্বরূপ পুরুষ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম। তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্বের চিহ্ন অর্থাৎ দেহ আর তখন নাই এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বন্ধন মুক্ত বা প্রকৃতি-সম্পর্ক শূন্য। পুরুষে পুরুষে স্বভাবে কোনই পার্থক্য নাই। তাঁহারা উভয়ই চিৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তাঁহারা এক না হইয়াই পারেন না। ইহাই যখন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে বা কল্পারম্ভে বহু পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। কারণ, তখনও তাঁহারা চিৎস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও দেহশূন্য মাত্র। সুতরাং তাঁহারা এক না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেই এক পুরুষ কি প্রকারে বহু হইলেন, তাহা সাংখ্যে পাওয়া যায় না। উহা বহু পুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বহু পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য কারিকায় একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয় যে একই কালে সকল পুরুষের মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং পুরুষ বহু। সাংখ্য ভুলিয়া যান যে জীবের মৃত্যুর অর্থ পুরুষের (জীবাত্মার) মৃত্যু নহে, উহা দেহের মৃত্যু মাত্র। কঠ উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে আত্মার বিনাশ নাই। সাংখ্যও তাহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। কারণ, সাংখ্য পরলোক, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ এবং জন্মান্তর স্বীকার করেন। সুতরাং পুরুষের মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং একটী জীবের মৃত্যুতে সকল জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে সাংখ্য নিজেও পুরুষকে নিত্য বলেন। প্রকৃতি কল্পের পর কল্প অনাদি-সংযুক্ত পুরুষকে ভোগ করাইয়া মোক্ষ দান করে। সুতরাং পুরুষের মৃত্যুর প্রশ্নই উদয় হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং তিনিই যে বহু জীব

ভাবে ভাসমান হইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার বিন্দু মাত্রও বিকার হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বহু পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ বলেন। সেই সংযোগ কখন হইয়াছিল; তাহা সাংখ্য বলিতে পারেন না। তাই উহাকে অনাদি সংযোগ বলা হয়। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। প্রধানের সাম্য ভাব যখন ভঙ্গ হয়—তাহা উহার স্বভাব বশতঃই হউক্ অথবা পুরুষের সংযোগ বশতঃই হউক্—তখনই পুরুষ-সংযোগ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পুরুষ-সংযোগ না হইলে প্রধানের পরিণতি হইতে পারে না। আবার সেই পুরুষ একই হইবে। কারণ, প্রধান তখন এক, অখণ্ড ও সাম্য ভাবাপন্ন অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং উহাকে একমাত্র পুরুষই আশ্রয় করিবে। প্রধানের পরিণতির সাথে সাথে অবশ্যই সেই পুরুষই উহার সহিত যুক্ত থাকিবেন। কারণ, সাংখ্যমতে প্রধানের উদ্দেশ্যই পুরুষকে সম্ভোগ করান। যদি প্রধান পরিণত না হয়, তবে পুরুষের সম্ভোগ হয় না। যদি বলেন যে প্রধানের সহিত যুক্ত হইলেই পুরুষের সম্ভোগ হইল, তবে এই বিশাল সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন থাকিত না, প্রধান ও পুরুষ যুক্ত থাকিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইত। সুতরাং বলিতে হইবে যে অবশ্যম্ভাবিরূপে সেই এক মাত্র পুরুষ সহ যুক্ত হইয়া প্রধান নানা ভাবে পরিণত হইবে ও তাঁহাকে অসংখ্য ভাবে সম্ভোগ করাইবে। প্রত্যেক পুরুষই যখন সর্ব্বব্যাপী ও প্রধান যখন এক, তখন প্রধানের পক্ষে একমাত্র পুরুষই যথেষ্ট। অন্য পুরুষ সমূহ প্রধানের পরিণতির অসংখ্য অবস্থায় কেমনে উহাকে (প্রধানকে) আশ্রয় করিবে? যখন প্রকৃতি এক পুরুষ দ্বারা অধিকৃত, তখন বিবেকী, চিৎস্বরূপ ও নিষ্ক্রিয় অন্য পুরুষ সমূহ কেমনে সেই প্রকৃতিকে অধিকার করিবে? সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং প্রধান ও তদুৎপন্ন জগৎ বা প্রকৃতি একই। অন্যভাবে চিন্তা করিলেও বুঝিতে

পারা যায় যে বিশ্বে বহু পদার্থ থাকা সত্বেও উহারা সকলে মিলিত হইয়া একই হইয়া আছে। Sir James Jeans বলেন যে আমাদিগের একটী অঙ্গুলি হেলনেও সমস্ত বিশ্ব কম্পিত হয়। ইহা সম্ভব হয় না যদি বিশ্ব এক না হইত। ব্যোম এক, অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উহার অন্তর্গত। সুতরাং বিশ্ব এক। অতএব যে পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া প্রধানের প্রথম পরিণাম সংঘটিত হয়, সেই একমাত্র পুরুষই আদি অন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন, অন্য পুরুষের প্রকৃতিতে কোনই স্থান থাকিতে পারে না। সুতরাং পুরুষ এক, কখনই বহু নহেন। কল্পান্তে জগৎ অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয় ও প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গে কল্পারম্ভে পুনরায় পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্ট হয়। পুরুষ সমূহ কল্পান্তে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকে ও কল্পারম্ভে পুনরায় সেই সেই পুরুষ সেই সেই দেহ আশ্রয় করে। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? পুরুষ ও প্রকৃতি বিচ্যুত হইল। নির্ব্বিকার পুরুষ কেন আবার দেহ বদ্ধ হইয়া সেই প্রকার ভোগ করিবেন? তাঁহার ভোগ সম্বন্ধে ত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সেইরূপ ভোগ যে বিবেকী ও চিৎস্বরূপ পুরুষের মোটেই প্রয়োজনীয় নহে, তাহা অবশ্যই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি কেন পুনরায় সেইরূপ ভোগ করিতে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? তাঁহার দেহাবদ্ধ হইতে হয় এবং ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। তাঁহার মোক্ষও আছে, সুতরাং তাঁহার বন্ধনও আছে. সুতরাং তিনি দেহাবদ্ধ কালে. স্বাধীন থাকিতে পারেন না আবার ইহা কেমনে সম্ভব হয় যে প্রত্যেক পুরুষ কল্পারম্ভে পূর্ব্বকল্পের দেহ বাছিয়া লইয়া তাহা আশ্রয় করিবেন? সেই সেই পুরুষ কেন স্বেচ্ছায় দেহাবদ্ধ হইয়া পুনরায় দুর্ভোগ ভোগ করিবেন? কল্পান্তেই প্রকৃতি হইতে বিচ্যুতির সাথে সাথেই বা কেন তাঁহাদের মোক্ষ হইবে না? যদি আদি অন্ত একমাত্র পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা

যায়, তবে এই সম্বন্ধে কথঞ্চিং মীমাংসা লাভ হয়, যদিও সম্পূর্ণ মীমাংসা অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে প্রলয়ান্তে পুনঃ কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত পুরুষ সমূহ অব্যক্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন, ইহা সাংখ্য স্বীকার করেন না, কিন্তু পুরুষ সমূহ অব্যক্তের সহিত যুক্ত হইয়াই থাকেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা নিবেদন করিতেছি। বিশ্ব প্রলয়ান্তে যখন অব্যক্তে লীন হয়, তখন অব্যক্ত হইতে ২৩টী তত্ত্ব অর্থাৎ সকল বিকৃত পদার্থ উহাতে সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হইবে। উহাদের বিন্দুমাত্র চিহ্নও তখন অব্যক্তে বর্ত্তমান থাকিবে না। It will be pure and simple অব্যক্ত বা প্রধান। অব্যক্ত বা প্রধান কি? ইহা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থাই কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত অটুট থাকিবে। সুতরাং সেই কালে অব্যক্ত বিশুদ্ধ সত্ব, রজঃ ও তমঃ ভিন্ন কিছুই থাকে না বা থাকিতেও পারে না। ইহা জাগতিক পদার্থের দৃষ্টান্তের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। জল Hydrogen ও xygen-এ লয় হয়। কঠিন পদার্থের বায়বীয় পদার্থে লয় বিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে বায়বীয় পদার্থও (মরুৎ) ব্যোমে লয় হয়। ইহা অস্বীকার করিলে জগতে অক্রমতা দোষ আরোপ করা হয়। তাহা অসম্ভব। ক্রম প্রণালী জগতের একটী বিশিষ্ট বিধান। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে মরুৎও ব্যোমে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে। জল ব্যোমে লয় প্রাপ্ত হইলে ব্যোমে জলের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যাইবে না। আবার সেই ব্যোম অব্যক্তে লয় হইলে উহাতেও (অব্যক্তে) ব্যোমের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত অব্যক্তে বিশুদ্ধ সত্ব, রজঃ ও তমঃ মাত্র বর্ত্তমান থাকিবে। উহাতে অন্য কোন পরিণত বা বিকৃত পদার্থের কোন চিহ্নই থাকিবে না। যদি ইহাই সত্য হইল, তবে অব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব—পুরুষ সমূহ কেমনে তাহাতে (অব্যক্তে)

বর্ত্তমান থাকিবে ? পুরুষ অব্যক্তের অংশ (Constituent part) নহে। আর ইহা স্বীকৃত যে কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত প্রধান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। সুতরাং সেই কালে অব্যক্তে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভিন্ন উহাদের বিপরীত তত্ত্ব পুরুষ কেন, অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। অব্যক্ত যখন কল্পান্তে এক ও অখণ্ড হইল এবং সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন পুরুষ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য। পুরুষ অব্যক্তের বিপরীত ও বিভিন্ন। সাংখ্য বলেন যে পুরুষ মোক্ষের পর প্রকৃতি সম্পর্ক শূন্য হইয়া প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রলয় কালে অব্যক্ত এক ও অখণ্ডরূপে পরিণত হইবার process-এ পুরুষকে দূরে নিক্ষেপ করে। বিশুদ্ধ এক ও অখণ্ড বস্তুর মধ্যে কোনই Foreign substance থাকিতে পারে না। ইহা সহজ বোধ্য। জল যখন মরুৎ-এ লয় হয়, তখন তাহাতে যদি জলাতিরিক্ত লৌহ খণ্ড থাকে, তবে তাহা মরুৎ-এ লয় হইবে না, কিন্তু তাহা যেমন, তেমনি পড়িয়া থাকিবে। পুরুষ সমূহ কিছুতেই অব্যক্তে লীন অবস্থায় থাকিতে পারে না। তাঁহারা অপরিণামী। তাঁহারা বিকৃতও হয় না এবং পরিণত অবস্থা হইতে স্বস্বরূপেও আসেন না। তাঁহাদের নিত্য এক স্বভাব। সাংখ্য প্রধানকেই প্রসবধর্ম্মী বলা হয় এবং কল্পান্তে যে উহা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বলা হয়। উৎপন্ন জাগতিক পদার্থ মাত্র উৎপাদকে লয় হইতে পারে। মৃত মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে লয় হয়। কিন্তু আত্মা বা সাংখ্য পুরুষ পঞ্চভূতে লয় হয় না। সাংখ্যও তাহা স্বীকার করেন না। যদি কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত অব্যক্তে অসংখ্য পুরুষ লীন হইয়া থাকে, তবে অব্যক্তের স্বভাব বশতঃই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, ইহা বলাও অসঙ্গত হইবে না। কারণ, অব্যক্তে যে অসংখ্য পুরুষ বর্ত্তমান, সাংখ্যমতে তাঁহাদের উপস্থিতির জন্যই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইতে পারে। কারণ, বলা হয় যে পুরুষের উপস্থিতিতেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হয়। আবার

অন্যভাবে চিন্তা করিলে সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে পুরুষের উপস্থিতিতেই যখন প্রকৃতিতে ক্রিয়া হয়, তখন অসংখ্য পুরুষের বর্ত্তমানতা সত্ত্বেও বা কেন বিশ্ব অব্যক্তে লীন হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়? সুতরাং বলিতে পারা যায় যে অব্যক্ত অবস্থায় পুরুষ সমূহ উহাতে থাকিতে পারে না। আবার বিশুদ্ধ অব্যক্তের সহিত পুরুষ সমূহের বাসেরও কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ, বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সুতরাং আদান প্রদানের কোনই বিধান সাংখ্যে নাই। বলা হয় যে পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে প্রকৃতিতে ক্রিয়া হয়, এবং বুদ্ধিই পুরুষের ভোগার্থ তাঁহার সম্মুখে বিষয় সমূহ উপস্থিত করে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্তা-বস্থায় প্রধানে পরিণত পদার্থের অর্থাৎ বুদ্ধির চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সুতরাং অব্যক্তাবস্থায় অব্যক্তেরও পুরুষের প্রয়োজন নাই এবং পুরুষেরও অব্যক্তের কোনই প্রয়োজন নাই। পুরুষ প্রকৃতির মিলন কেবল মাত্র পুরুষের ভোগের জন্যই। দেখা গেল যে অব্যক্ত সহ মিলনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সুতরাং মিলিত থাকাও নিষ্প্রয়োজনীয়। যদি বলেন যে পুরুষ যখন প্রকৃতি সহ একবার মিলিত হইয়াছে, তখন তাঁহার মোক্ষ পর্য্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকিতে হইবে, তবে বলিতে হইবে যে তবে কল্পবাদ কল্পনা হইতে বিরত হইতে হইবে। কারণ, দেখা গেল যে কল্পান্তে অব্যক্ত ও পুরুষ মিলিত অবস্থায় থাকিতে পারে না এবং থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ইহা বুঝিতে পারা যায় যে পুরুষ সমূহ কল্পান্ত হইতে কল্পারম্ভ পর্য্যন্ত অব্যক্তে লীন হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সাংখ্য বহু পুরুষবাদ যুক্তিসহ নহে। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং তিনিই স্বেচ্ছায় লীলার্থ বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং আমরা সাংখ্য বহু পুরুষবাদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

ষষ্ঠ সমস্যাঃ—নিষ্ক্রিয় পুরুষ কি প্রকারে ভোক্তা হইতে পারেন?

আলোচনা—এই সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। ইতি পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নিষ্ক্রিয় পুরুষ ভোক্তা হইতে পারেন না। আমাদের সহজ জ্ঞানও সেই একই উত্তর প্রদান করিবে। ভোক্তার অর্থ যিনি ভোগ করেন। যিনি ভোগ করেন, তাহা যে ভাবেই হউক্ না কেন, তিনি অবশ্যই ক্রিয়া করেন। সুতরাং তিনি সক্রিয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিষ্ক্রিয়ত্ব ও ভোক্তৃত্ব একে সম্ভব নহে। সাংখ্য পঙ্গু ও অন্ধের উপমা দ্বারা সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। পুরুষ পঙ্গু অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় এবং প্রধান অন্ধ অর্থাৎ চৈতন্য ও জ্ঞান হীন। পঙ্গুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্ধ চলে। অর্থাৎ পুরুষ জ্ঞানী ও পরিচালক এবং প্রধান অন্ধভাবে পরিচালিত। যদি তাহাই হয়, তবে পুরুষের জ্ঞান-ক্রিয়া ও পরিচালনা-ক্রিয়া আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সাংখ্য পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পুরুষের ইচ্ছায়ই প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। পুরুষ না চালাইলে অন্ধ প্রকৃতি চলিতে পারে না। জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। জড়ের কোনই স্বাধীনতা নাই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে জড় জগৎও একজন সক্রিয় ও জ্ঞানবান পরম পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত না হইয়া বরং পুরুষের একমাত্র কর্ত্তৃত্বই প্রমাণিত হইল। পঙ্গু যেমন অন্ধের স্কন্ধে নির্ব্বাক ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেই অন্ধ চলিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষ দ্বারা প্রচালিত না হইলে প্রকৃতিও অচলা থাকিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে "মায়াবাদের" চিদাভাস অংশে ইহা বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরুষের কেবল মাত্র উপস্থিতির জন্য জড়ে কোনই ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না,

বিশেষতঃ সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি বিপরীত ও বিভিন্ন তত্ত্ব। কেহ কেহ বলেন যে উপমা কখনও সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং উহার ত্রুটী লক্ষ্য করা সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরাও স্বীকার করি যে উপমা সর্ব্বাংশে এক হইতে পারে না। কিন্তু এমন উপমা প্রদত্ত হওয়া উচিত নহে, যে যাহাতে উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রমাণ করে। এস্থলে তাহাই হইয়াছে। পঙ্গু-পুরুষের এমন কোন অবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না, যাহাতে তিনি নিষ্ক্রিয়ও থাকিবেন অথচ তিনি অন্ধকে পরিচালনা করিবেন। বরং অন্ধ নিষ্ক্রিয় পুরুষকে ঘাড়ের বোঝা মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে অথবা নিজে অচল হইয়া বসিয়া পড়িবে। নিষ্ক্রিয় পুরুষ তাহার (অন্ধের) সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজের নিষ্ক্রিয়ত্ব স্বভাব তাহাকেও (অন্ধকেও) অলস ও অচল করিবে। এখন পুরুষ যে নিষ্ক্রিয়ই হইতে পারেন না, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। সাংখ্য পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু যিনি চিৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী, তিনি সত্য না হইয়াই পারেন না। সুতরাং পুরুষ সত্য ও তাঁহার অস্তিত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা জগতে দেখি যে মানুষ তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। তাহা হইতেই Struggle for existence উক্তি আসিয়াছে। এমন কোন মানুষ নাই যিনি সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট নহেন। চিকিৎসকগণ বলেন যে আমাদের শরীরে কোনও কারণে কোনও বিষ প্রবেশ করিলে তাহা বহিষ্করণের জন্য আমাদিগের স্বাভাবিক ভাবে চেষ্টা আসে। যদি শরীরিক শক্তি প্রয়োগে আমরা সেই বিষকে দূর করিতে পারি, তবেই আমাদের রক্ষা। ঔষধ পথ্য সেই যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করে। এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই বলা হয় যে Power of resistance বলবৎ থাকিলে রোগ হইতে সহজে মুক্ত হওয়া যায়, এবং উহা হ্রাস পাইলে বহু কাল রোগে ভুগি এবং উহা যখন একেবারেই কমিয়া যায়, তখন মৃত্যু

উপস্থিত হয়। অতএব দেখা গেল যে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমরা সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত। আমরা কখনও আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকি না। এখন একটী কাষ্ঠ খণ্ড সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক্। উহাকে কেহ যদি খণ্ড খণ্ড করিতে অথবা উহাতে যদি একটী লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিতে চাহেন, তবে দেখা যাইবে যে উক্ত কার্য্যদ্বয় বিনা আয়াসে সম্পন্ন হয় না। উভয় কার্য্যেই কাষ্ঠ খণ্ড উহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিবে। এইরূপ ভাবে যদি আমরা আরও চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকলেই সচেষ্ট ও ক্রিয়া করে। অন্য সকল বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু এই সম্বন্ধে কাহারও উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে সাংখ্য পুরুষেরও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রিয়া করিতে হয়। আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে জগতের সঙ্গে পুরুষের তুলনা হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা criticism of experience দ্বারা পরিচালিত হইব। জগতে যাহা দেখা যায়, তাহা জগতেই আবদ্ধ নহে। একই বিধি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। One God, One Law, One Universe তবে জগতে সকলই স্থূলাকারে দেখিতে পাই, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা কারণ আকারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মেরও (পুরুষেরও) নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে। আবারও আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে পুরুষের অস্তিত্ব স্বাভাবিক। আমরাও বলি যে পুরুষের অস্তিত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু সেই স্বাভাবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁহার শক্তি প্রয়োগও স্বাভাবিক। আমাদের একটী কথা মনে রাখিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হয়। তাহা এই যে প্রত্যেক গুণেরই নিজস্ব শক্তি আছে। অস্তিত্ব ব্রহ্মের একটী গুণ। সুতরাং উহারও শক্তি আছে। শক্তি ভিন্ন কোন গুণ নাই। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বও যেমন স্বাভাবিক, সেই গুণের শক্তি দ্বারা তাহা রক্ষা

করাও স্বাভাবিক। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে কেহই নিষ্ক্রিয় নহেন। আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতেছেন যে Electrone, Protone প্রভৃতি পর্য্যন্ত অনবরত ঘুরিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতেছে। আমরা কেহই নিশ্চল হইয়া একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারি না। হয় অগ্রসর হইব, নতুবা পশ্চাৎপদ হইব। ক্রিয়া ব্রহ্ম হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেরই স্বভাব। সপ্তম সমস্যা:— একমাত্র সাংখ্য দর্শনানুমত দুঃখ নিরসনই কি জীবকে মোক্ষদান করিতে সমর্থ? আলোচনা:—সাংখ্য দুঃখ ত্রয়ের বিনাশ সাধনই মোক্ষের একমাত্র কারণ বলেন। দুঃখত্রয় কি? উহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ—যথা শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাদির বিপর্য্যয় জনিত জ্বর, অতিসার রোগাদি শারীরিক। প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ জনিত ক্লেশ মানসিক। এস্থলে বক্তব্য যে বর্ত্তমানে আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা যাহা বুঝি অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয়, সেই সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। আধিভৌতিক চারিপ্রকার। ভূত সকল হইতে অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন যথা মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক, যূক, মৎকুণ, মৎস্য, মকর, গ্রাহ ও স্থাবরাদি হইতে উৎপদ্যমান ক্লেশচয়। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন-যথা শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপতন জনিত ক্লেশ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নিতান্ত স্থূল প্রকারের দুঃখ নিরসনের কথা বলা হইয়াছে। এমনও বলা হইয়াছে যে এই সকল দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি সাংখ্য পথালম্বন না করিয়াও চিকিৎসাদি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। নিত্য দুঃখ নিরসনের জন্যই সাংখ্য মার্গাবলম্বনের বিধি। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে প্রোক্ত দুঃখ সমূহ কত স্থূল। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জানিতে পারিলেই দুঃখ সমূহের নাশ হইবে, সুতরাং মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ প্রোক্ত দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ। অর্থাৎ শারীরিক বাধা বিঘ্ন এড়াইতে পারিলেই হইল। তাই সন্ন্যাসের

বিধান। অর্থাৎ সন্ন্যাস ও যোগ ক্রিয়া দ্বারা শরীর শোধন ও শারীরিক বাধাকে অধিক পরিমাণে নিরসন করিতে পারিলেই হইল। ইহাতে আত্মিক উন্নতির কোনই বিধান নাই। আর থাকিবেই বা কেমনে? যে দর্শন ব্রহ্ম সম্বন্ধে নির্ব্বাক্, উহা পরমাত্মার স্বরূপ প্রকৃতির আলোচনা কি প্রকারে করিবে? উহা ত নিরীশ্বর (Godless) দর্শন। সুতরাং আত্মিক উন্নতির প্রশ্নই উদয় হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে সাংখ্য দর্শন স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ ত্যাগকেই চরম মুক্তি মনে করিয়াছেন। পুরুষ যখন প্রকৃতিকে চিনিতে পারে, তখনই তাঁহার মোক্ষ হয় বলা হইয়াছে। এই চিনিতে পারার অর্থ কি, তাহা সাংখ্য দর্শনে সুস্পষ্ট নাই। এস্থলে অবশ্যই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে চিংস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষ প্রকৃতিতে সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কেন উহাকে চিনিতে পারেন নাই? কেন উহাকে চিনিবার জন্য তাঁহার কল্পের পর কল্প কাল ব্যয়িত হইল? ইহা কি সাংখ্য বর্ণিত পুরুষের পক্ষে সম্ভব? এই স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ ত্যাগের জন্যই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের বিধি। Ethical বিধি সাধন করিতে পারিলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রথম স্তরে উত্থিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মিক সাধনা প্রায় অস্পৃষ্ট থাকে। বর্ত্তমানে অনেকে Ethical Religion-এর পক্ষপাতী। কিন্তু তাহারাও উৎকট বৈরাগ্য সমর্থন করেন না। প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর জগতে যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই আমরা ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিব। উহাদের অসদ্ব্যবহারেই অবশ্য পাপ সঞ্চয় ও পতন অনিবার্য্য। অত্যাসক্তিও যেমন অন্যায়, উৎকট বৈরাগ্যও তেমনি অন্যায়। মধ্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিধি নিষেধ সর্ব্বাগ্রে পালন করিতে হইবে। ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কামনা পূরণ করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা

মোক্ষ মার্গে চলিতে হইবে। মোক্ষ কি? বেদান্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম-দর্শনই মুক্তি। যে দর্শন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন না, তাহা ব্রহ্ম-দর্শন সম্বন্ধে কি বলিবে? ব্রহ্ম-দর্শন ভিন্ন মুক্তি একেবারেই অসম্ভব। ইহা সকলেই জানেন। বৈরাগ্য ও তজ্জাতীয় কার্য্যে দ্বারা যে অবস্থা লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মদর্শনের তুলনায় অতি তুচ্ছ। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উহা হৃদয়ে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের বিকাশ সাধন করা। সেই কার্য্য উৎকট বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভব নহে। যদি তাহাই হইত, তবে পৃথিবীতে পরিবার, সমাজ প্রভৃতির প্রয়োজন থাকিত না। আমাদের জীবনের কার্য্য শেষ হইবে না। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ। সুতরাং তাহা লাভ করিতে আমাদেরও অনন্ত প্রায় কাল সাধনা করিতে হইবে। কামে লিপ্ত হইব না, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইব না, লোভ পরবশ হইব না, মোহমুগ্ধ হইব না, মদে উন্মত্ত হইব না, এবং ঈর্ষানলে দগ্ধ হইব না কেবল এইরূপ এইরূপ Negative সাধনা দ্বারা অধিক আত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা আত্মিক গুণরাশির বিকাশ সাধন করিতে পারিলেই দোষপাশরাশির কেবল দমন হইবে না, কিন্তু উহারা একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত গুণরাশির বিকাশ সাধন না হইবে, সেই পর্য্যন্তই দোষপাশরাশির লয় হইবে না, সাময়িক ভাবে উহারা সংযত থাকিবে মাত্র। লয়ে ও দমনে অত্যন্ত পার্থক্য। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে দোষপাশরাশি যেমন আমাদিগকে বন্ধন করে, তেমনি উহারা সেই বন্ধন মোচনের সাহায্যও করে। কণ্টকেনাবিদ্ধ কণ্টকম্। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে সাংখ্য-দুঃখ-নিরসনেই মানবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব যে সাংখ্য দর্শনের মূলমত সমূহ যুক্তি সহ নহে। এই সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহাতেও সাংখ্যের বহু মত খণ্ডিত হইয়াছে।

ওঁং প্রেমলীলাময়ী-সৃষ্টি-কারণং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

দহন-পবন-হীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং
অবনী-জল-বিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকম্।
সমগমন বিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং
গগনমিব বিশালং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকম্

(অবধূত গীতা)

আধ্যাত্মিক গুণ ও জড়ীয় গুণ

—*:※:*—

কেহ কেহ বলেন যে জড়ীয় অর্থাৎ ভৌতিক গুণ বলিয়া কিছু নাই। জড় জগতে যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলই পরমাত্মার গুণ। ধাতু দ্রব্য অথবা কাঠের কাঠিন্য, জলের তারল্য, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মের গুণ। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বকালে যদি উক্ত গুণগুলি তাঁহাতে না থাকিত, তবে সৃষ্টিতে উহাদের প্রকাশ সম্ভব হইতে পারিত না। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে জড়ীয় কোন গুণের অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করেন না। যাহা জড়ীয় গুণ বলিয়া পরিচিত, তাহা ব্রহ্মের কোনও গুণের বিকারও নহে—তাহা ব্রহ্মেরই গুণ—অব্যক্ত ছিল, ব্যক্ত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। উহারা তাঁহার গুণ রাশির আভাসও নহে। যদিও উক্ত বিষয়ের উত্তর ইতিপূর্ব্বে বিশেষতঃ "ইচ্ছাশক্তি" ও "অব্যক্তের পরিণাম" অংশদ্বয়ে এক প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে মানবের এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। Hypnotism-এর অদ্ভুত শক্তি যে ইচ্ছাজাত এবং

মানবের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যাবস্থায়, তিনি যাহা বলেন, তাহাই ফলে, এই সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মানবের ইচ্ছার যখন এতদূর শক্তি, তখন পরমেশ্বরের ইচ্ছার শক্তি যে তাহা হইতেও অনন্ত গুণে বলবতী, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইচ্ছার সহযোগে তাঁহার গুণরাশির আভাসে অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে যে ভৌতিকগুণ সমূহ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রথম অধ্যায়ে নানাস্থলে এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উহাদের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। পরমাত্মার জড়ীয় গুণরাশি ছিল, অর্থাৎ প্রেম, জ্ঞান, সরলতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ রাশির ন্যায় তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়ীয়-গুণে যথা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, তারল্য, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণে গুণবান ছিলেন, অর্থাৎ জড়জগতে আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই হুবহু তাঁহাতে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এইরূপ উক্তি ভ্রম পূর্ণ। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে প্রত্যেক বিকৃতিতে পদার্থের রূপগুণের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং জড়ীয় গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। বিকৃতের গুণ নিত্য নির্ব্বিকারে থাকা অসম্ভব। আর যদি তাহাই হয়, তবে জড়ীয় রূপগুণ দর্শন করিয়া আমরা ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও ফল লাভ করিতে পারিতাম, সাধনার কোনই প্রয়োজন হইত না। সাধনার দিক্ থেকে এই মতের সমালোচনা করা যাউক্। পৃথিবীতে বহু মহাজন ঋষিত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সেই সকল সাধক রত্নগণ কেহ বা প্রেমে, কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা একাগ্রতা প্রভৃতি গুণে একত্ব লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা দুই বা ততোধিক গুণে একত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ এরূপ কথা বলেন নাই যে তিনি জড়ীয় গুণের অর্থাৎ রূপ, রস প্রভৃতি গুণের সাধনা দ্বারা সেই সকল গুণে একত্ব লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রেমগুণ সম্পন্ন পরমেশ্বরের ন্যায় একটী বা বহু জড়ীয় গুণ সম্পন্ন পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছেন।

পাঠক এস্থলে "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশে ৮৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ দেখিবেন। উহাতে দেখা যাইবে যে প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন কালে ঋষি প্রত্যেক বস্তুটীকে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করেন না, কিন্তু ব্রহ্ম যে প্রত্যেক বস্তুতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই দর্শন করেন। এপর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রেই জড়ীয় গুণ সাধনা দ্বারা পরমেশ্বর দর্শন করা যায়, এইরূপ উপদেশ নাই। বরং পরমাত্মা জড় নহেন, এই তত্ত্বই নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান যেরূপ জড় নিয়া দিবানিশি বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকেন, কোন দার্শনিক সেইরূপ ভাবে জড় সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতেছেন না যে জড়ীয় গুণের জ্ঞানে, সাধনায় বা বিশ্লেষণে পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করা যায়। বরং তাঁহারা আলোচ্য মতের সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি প্রচার করিতেছেন। আরও বলা হইয়াছে যে দেহ মনে, এবং মন জীবাত্মার লয় হইলে পরম পিতার কৃপায় সাধক তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করেন। অর্থাৎ যখন জীবাত্মা জড় সংসর্গ ত্যাগ করেন, তখন কেবল তিনি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে পারেন। এই সম্পর্কে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এ অবস্থায় কি প্রকারে স্বীকার করা যায় যে জড়ীয় গুণ আত্মারই গুণ। জড়ীয় গুণ বলিয়া কিছু নাই। দর্শন শাস্ত্রের উপকারিতা আমরা স্বীকার করি। কারণ, দর্শন শাস্ত্র পরমেশ্বরের দর্শনের সাহায্য করে এবং এই অর্থেই উক্ত শাস্ত্রের নাম দর্শন শাস্ত্র। দর্শন যদি আমাদিগকে ব্রহ্মের দিকে না লইয়া যায়, তবে তাহা তর্ক জালে আবৃত গ্রন্থ মাত্র। উহা দ্বারা আমাদের উপকার না হইয়া অপকারই উৎপন্ন হয়। তখন আর উহাকে দর্শন শাস্ত্র নামে অভিহিত করা অসঙ্গত। আস্তিক্য দর্শন মাত্রই আমাদের সদগতির সহায়, অথবা সেই উদ্দেশ্য নিয়াই লিখিত। ভারতে প্রায় প্রত্যেক দর্শন মতের এক এক শ্রেণী সাধক আছেন। তাহারা দর্শনকে কেবল বুদ্ধির ব্যাপারে পর্য্যবসিত করেন নাই,

কিন্তু অবলম্ব্য দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করিতে থাকেন, সাধন ভজন করেন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য যত্নবান হন। সুতরাং আমাদের আলোচ্য দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি সাধনা করেন, তবে তাহাকে সাধক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণনা করিতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। সাধনার প্রণালী এই যে সাধক সকল আধ্যাত্মিক গুণের উন্নতির জন্য সাধারণ ভাবে সাধনা করিবেন, কিন্তু কোন একটী গুণ বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া সাধনা দ্বারা সেই গুণে একত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। কারণ, কোন সাধকই এত বড় শক্তিমান হন না যে তিনি প্রারম্ভেই সকল গুণে একত্ব লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত দর্শন শাস্ত্রের মীমাংসা অনুসারে যদি কয়েকটী সাধক পরমেশ্বরের দর্শনার্থ জড়ীয় গুণের (তথা-কথিত আত্মার গুণের) সাধনা আরম্ভ করেন, তবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে? ধরা যাউক, একজন জড়ীয় রসের সাধনা করিবেন, কেহ বা স্পর্শগুণের সাধনা করিবেন ইত্যাদি। গুণের অনুশীলনই গুণ বৃদ্ধির প্রধান উপায়। সুতরাং প্রথম সাধক রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিবেন ও অতিশয় রসাস্বাদন জন্য শারীরিক রোগে আক্রান্ত হইবেন। দ্বিতীয় সাধক স্পর্শগুণের অনুশীলন করিতে থাকিবেন। তাহার ফল যাহা হইবে, তাহা অতি বিস্তারিত ভাবে না লিখিয়া এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইবেন। উক্ত সাধকদ্বয় তথাকথিত আত্মার গুণের সাধনার ফল স্বরূপ যাহা পাইলেন, তাহা কি কখনও আমাদের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? আত্মার গুণের সাধনার দ্বারা কি কখনও ঐরূপ ভীষণ ফল লাভ হইতে পারে? উপাসনা কালে জড়ীয়গুণের (তথাকথিত আত্মার গুণের) কোন সাধক পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন যে তিনি যেন পাষাণের কাঠিন্য, জলের তারল্য, মরুভূমির ভীতিপূর্ণা শুষ্কতা প্রভৃতি লাভ করিতে পারেন, যেমন প্রেমগুণের সাধক পরম

দয়াল পরমপিতার নিকট একান্ত ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন পরমাপতার প্রেমলাভ করিতে পারেন। উক্ত-রূপ জড়ীয় গুণের জন্য প্রার্থনা দ্বারা কি কোন সাধক তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? অথবা পরমপিতা কি ঐরূপ প্রার্থনা গ্রহণ করেন? আমাদের ত মনে হয় না। "সকল জড়ীয় গুণ আত্মার গুণ" এই তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচারিত হইলে জড়বাদ অবশ্য-ম্ভাবিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে। মানুষ স্বভাবতঃই শ্রম বিমুখ ও সুখ প্রিয়। সে বলিবে "আমি যাহাই করিতেছি, তাহা লোক দৃষ্টিতে সৎই হউক অথবা অসৎই হউক, অতি উচ্চ অঙ্গের কার্য্যই হউক্ অথবা পৈশাচিক কার্য্যই হউক্, নিশ্চয়ই আমি আত্মার গুণ লইয়া কাজ কারবার চালাইতেছি, সুতরাং আমার কোন কার্য্যই দূষণীয় নহে।" এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবন পরি-চালনা করিলে ধর্ম্ম জীবনের কথা দূরে থাকুক, সমাজ জীবনও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যদি জড়ীয় গুণ ব্রহ্মের গুণই হয়, তবে "প্রতিমায়াং ঘটে পটে" ব্রহ্ম পূজার বিধিই বা দোষের কি? প্রতিমা পূজক ত বলিতে পারেন যে প্রতিমার প্রত্যেক গুণই যথা—কাঠিন্য, রূপ প্রভৃতি যখন ব্রহ্মেরই গুণ, তখন প্রতিমাই ব্রহ্ম ও প্রতিমা পূজা করিলে ব্রহ্মের পূজাই হইবে। যদি বলা যায় যে প্রতিমা সান্ত কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, তবে তিনি প্রতিউত্তরে বলিবেন যে জড়ের সকল গুণই যখন ব্রহ্মের গুণ, তখন প্রতিমার সসীমত্বও ব্রহ্মেরই গুণ বলিতে হইবে। সুতরাং তাহাতেই বা দোষ কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে জড়ীয় গুণ ব্রহ্মের গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের উপাসনা স্থলে প্রতিমা পূজা আসিয়া উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দর্শন শাস্ত্র নিরাকারবাদই সমর্থন করেন। উক্ত শ্রেণীর দার্শনিক বলেন যে তাহারা প্রত্যেক দর্শন কার্য্যে ব্রহ্ম-দর্শন করেন, প্রত্যেক শ্রবণ কার্য্যে ব্রহ্মেরই বাণী শ্রবণ করেন,

আত্রাণ কার্য্যে তাঁহাকেই আত্রাণ করেন ইত্যাদি। সর্ব্ব সাধারণ ও বহু শাস্ত্র যে বলেন যে ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, মনন করা যায় না ইত্যাদি, তাহা ভুল। ব্রহ্ম যে অনির্ব্বচনীয় এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অগ্রাহ্য এবং জীব শিবত্ব লাভ না করিলে ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিব না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম-দর্শন যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণের ন্যায় এতদূর সহজ হইত, তবে আর মানবের সাধনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে যে কত সাধক কত কঠোর সাধনা করিতেছেন, তাহার কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। কেবল আমাদের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি যে ব্রহ্মদর্শনের তুল্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ পুঁথিগত শিক্ষা দ্বারা অতি অল্লায়াসেই ও অল্পকালের মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারা যাইত। ব্রহ্মদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে ত আমরা কৃতার্থ হইতাম। এস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মদর্শন কথার কথা নহে। "সাধন ভজন বিনে কে পায় ব্রহ্ম দরশন? যদি সহজ হ'ত সবাই পেত, কে কর্‌ত সাধন ভজন? পড়ে দর্শন বিজ্ঞান, কয় জন পায় সে দিব্য জ্ঞান? (কেবল) বিচার-বিতর্ক-জালে, বাড়ায় অভিমান; থাকে দর্শন শ্রবণ কথায়, জানে ব্রহ্ম-নিরূপণ। ব্রহ্ম সহজ সাধ্য হয়, তাও কথার কথা নয়, সহজ ভাবে থাকে যে জন সেই দরশন পায়; (কিন্তু) জটিল কুটিল পথে ঘুরে অন্ধ হয়েছে নয়ন। মুখে রতন কি মিলে, কেবল হেসে আর খেলে? সাঁতার তু'লে অতল জলে ডুব না দিলে; তাই কথা ছেড়ে নামটী ধ'রে ডুব্‌তে কর আয়োজন।"

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা যেন কেহ ইহা মনে না করেন যে আমি জ্ঞানকে তুচ্ছের বিষয় বলিয়া মনে করি। জ্ঞান মোটেই অবহেলার বস্তু নহে। জ্ঞানের সাধনা, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি গুণ সাধনা অপেক্ষাও অধিকাংশে কঠিনতর। কিন্তু সেই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন:—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (১।৩।১৪)।" "বঙ্গানুবাদ:—ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই (তত্ত্বজ্ঞান রূপ) পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন। (তত্ত্বভূষণ)।" মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন:—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকারণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি তথা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। (১।৫) "বঙ্গানুবাদ:— ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, ইহারা অপরা বিদ্যা, পক্ষান্তরে যদ্দারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। (তত্ত্বভূষণ)।" যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। কিন্তু সেই বিদ্যা পুথিগত বা মস্তিষ্ক গত থাকিলেও চলিবে না। অনন্ত নিত্য জ্ঞানময়কে জ্ঞানে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করা চাই, পুথিগত বিদ্যায় ত নহেই, অনুভব বা উপলব্ধিতে শেষ করিলেও চলিবে না। এস্থলে কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ (১।২।২৩)।" "বঙ্গানুবাদ:— এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণ শক্তি বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা (আত্মদর্শনার্থ) বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ

আঘ্রাণ কার্য্যে তাঁহাকেই আঘ্রাণ করেন ইত্যাদি। সর্ব্ব সাধারণ ও বহু শাস্ত্র যে বলেন যে ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, মনন করা যায় না ইত্যাদি, তাহা ভুল। ব্রহ্ম যে অনির্ব্বচনীয় এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অগ্রাহ্য এবং জীব শিবত্ব লাভ না করিলে ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিব না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম-দর্শন যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণের ন্যায় এতদূর সহজ হইত, তবে আর মানবের সাধনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে যে কত সাধক কত কঠোর সাধনা করিতেছেন, তাহার কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। কেবল আমাদের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি যে ব্রহ্মদর্শনের তুল্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ পুঁথিগত শিক্ষা দ্বারা অতি অল্লায়াসেই ও অল্পকালের মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারা যাইত। ব্রহ্মদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে ত আমরা কৃতার্থ হইতাম। এস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মদর্শন কথার কথা নহে। "সাধন ভজন বিনে কে পায় ব্রহ্ম দরশন? যদি সহজ হ'ত সবাই পেত, কে কর্‌ত সাধন ভজন? পড়ে দর্শন বিজ্ঞান, কয় জন পায় সে দিব্য জ্ঞান? (কেবল) বিচার-বিতর্ক-জালে, বাড়ায় অভিমান; থাকে দর্শন শ্রবণ কথায়, জ্ঞানে ব্রহ্ম-নিরূপণ। ব্রহ্ম সহজ সাধ্য হয়, তাও কথার কথা নয়, সহজ ভাবে থাকে যে জন সেই দরশন পায়; (কিন্তু) জটিল কুটিল পথে ঘুরে অন্ধ হয়েছে নয়ন। সুখে রতন কি মিলে, কেবল হেসে আর খেলে? সাঁতার ভুলে অতল তলে ডুব না দিলে; তাই কথা ছেড়ে নামটী ধ'রে ডুব্‌তে কর আয়োজন।"

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা যেন কেহ ইহা মনে না করেন যে আমি জ্ঞানকে তুচ্ছের বিষয় বলিয়া মনে করি। জ্ঞান মোটেই অবহেলার বস্তু নহে। জ্ঞানের সাধনা, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি গুণ সাধনা অপেক্ষাও অধিকাংশে কঠিনতর। কিন্তু সেই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন :—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (১।৩।১৪)।" "বঙ্গানুবাদ :—ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই (তত্ত্বজ্ঞান রূপ) পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন। (তত্ত্বভূষণ)।" মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন :—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকারণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। (১।৫) "বঙ্গানুবাদ:— ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, ইহারা অপরা বিদ্যা, পক্ষান্তরে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। (তত্ত্বভূষণ)।" যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। কিন্তু সেই বিদ্যা পুঁথিগত বা মস্তিষ্ক গত থাকিলেও চলিবে না। অনন্ত নিত্য জ্ঞানময়কে ধ্যানে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করা চাই, পুঁথিগত বিদ্যায় ত নহেই, অনুভব বা উপলব্ধিতে শেষ করিলেও চলিবে না। এস্থলে কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ (১।২।২৩)।" "বঙ্গানুবাদ :— এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণ শক্তি বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা (আত্মদর্শনার্থ) বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ

করেন। (তত্ত্বভূষণ)"। "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ (১।২।৮)" "বঙ্গানুবাদ :—ইনি অর্থাৎ আত্মা হীন মনুষ্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হন না,' যে হেতু অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারে ভাবে। হীনাচার্য্য হইতে অন্য দ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচার্য্য দ্বারা উক্ত না হইলে এই বিষয়ে অর্থাৎ আত্ম বিষয়ে গতি নাই অর্থাৎ আত্মাকে জানা যায় না; যে হেতু ইনি অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য। (তত্ত্বভূষণ)" "পুথিগত" বিদ্যা বলায় কেহ যেন মনে না করেন যে আমি উপনিষদ্ বা তজ্জাতীয় গ্রন্থ সমূহকে উপহাস করিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে সেই সকল গ্রন্থ অমৃত পরিপূর্ণ এবং সাধকের আত্মোন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়। কিন্তু পাণ্ডিত্য হিসাবে উক্ত সংগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে উহা তর্ক ও অহংকারে পরিণত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণা। এস্থলে আমাদের একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন জগন্নাথ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তদানীন্তন ঢাকা কলেজের দর্শন শাস্ত্রের একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে উপনিষদুক্ত ঋষিগণ জ্ঞানী ছিলেন ও সেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও ত সেই বিদ্যায় বিদ্বান, তবে কেন তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না। এই প্রশ্নের উত্তরই পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কতকগুলি শব্দের বা বাক্যের অর্থ শিক্ষা করাই জ্ঞান নহে। এইরূপ শিক্ষা বাহ্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান একান্ত অন্তরের। এস্থলে পরমহংসদেবের তুলনাটী কতক পরিমাণে প্রযোজ্য হইতে পারে। টিয়া পাখী কৃষ্ণ নাম শিক্ষা করিয়া তাহা বলে কিন্তু যখন বিড়াল উহাকে আক্রমণ করে, তখন উহা টাঁ। টাঁ। করে। আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ও পাখীর কৃষ্ণ নামের বুলি শিক্ষা করা প্রায় এক। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ জ্ঞানে ব্রহ্মদর্শন লাভ না হয়,

সেই পর্য্যন্ত উহাকে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। উপরোক্ত দার্শনিক মত যদি সত্য হয়, তবে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে পরমেশ্বর নির্ব্বিকার নহেন। কারণ, সৃষ্টি ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মণ্ডলেই যে অবিরাম পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহা দ্বারা আমরা যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি যে সমগ্র সৃষ্টিতে অর্থাৎ বিরাট বিশ্বে প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। "ব্রহ্ম নিজেকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভাবে এই জড় জগতে বিকাশ করিতেছেন" ইহার অর্থই তিনি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিজেরই সর্ব্বদা অনন্ত প্রায় পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার হইতে পারেন না। Mr. Henry Stephen তাঁহার Problem of Metaphysics নামক পুস্তকে উক্তরূপ দার্শনিক মতের আলোচনার সম্পর্কে বলিয়াছেন:—"We must therefore conceive Ultimate Being as something whose nature it is to complete and perfect itself by realising its own highest potentiality." 'অর্থাৎ ব্রহ্মকে আমাদের এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার স্বভাবই হইয়াছে এই যে তাঁহার ভিতরে যে উচ্চতম সম্ভাবনা আছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করা ও তাহা দ্বারাই নিজেকে পূর্ণ করা।' * এইরূপ উক্ত হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে যে ব্রহ্ম পূর্ণ

* এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত ভাবে স্বাধীন। তিনি নিত্যই অনন্ত অনন্ত অনন্ত ভাবে উন্নত। তাঁহাতেই অনন্ত উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে, তাঁহার গুণ বা শক্তির কোনই অভাব নাই, তিনি নিত্যই আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। He is therefore Being and not Becoming. আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে, বিশেষতঃ প্রথম প্রবন্ধ স্তরে দেখিয়াছি যে তিনি জীবকুল সৃষ্টি করিয়াছেন একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এবং তাহা এই যে তিনি প্রত্যেক জীবকে অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতায় গ্রহণ করিবেন। ইহার অর্থ এই যে তিনি প্রত্যেক জীবের

নহেন ও তাঁহার নিঃস্ব অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতা লাভের জন্যই তাঁহার এই সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ তিনি যেন একজন অত্যন্ত অপূর্ণ সাধক মাত্র। ইহা কতদূর শ্রদ্ধেয় উক্তি, তাহা পাঠকগণ সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন। এস্থলে বিরুদ্ধ বাদী বলিবেন যে আমাদের মতেও ত ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপকে সৃষ্টির বীজ স্বরূপ বলা হইয়াছে। এবং সেই স্বরূপের পরিণামেই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্রষ্টব্য। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপের পরিণতিতে উঁহার সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। অব্যক্ত স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অখণ্ড সুতরাং অবিভাজ্য স্বভাববশতঃ জগৎ উৎপাদন করিয়াও নিজে অবিকৃত রহিয়াছেন। ঐ অংশে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। কিন্তু উক্ত দার্শনিকগণের মতে পূর্ণ ব্রহ্মের যে কেবল নিত্য বিকার হইতেছে, তাহা নহে. কিন্তু এই বিকাশ-নামধেয় বিকার তাঁহাকে পূর্ণত্বের দিকে নিয়া যাইতেছে ও অনন্তকাল

মধ্যে আত্মস্বরূপে বিকাশ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি স্বয়ং অপূর্ণ ও তাঁহার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণ করিতেছেন। তিনি যদি স্বয়ং অপূর্ণই হইতেন. তবে তাঁহার পূর্ণতার জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? তাঁহার মধ্য অনন্ত সম্ভাবনাই বা কোথা হইতে আসিল? তিনি ত আর সৃষ্ট পদার্থ নহেন যে তাঁহার স্রষ্টাই তাঁহার ভিত্তি ভূমি অথবা তিনি তাঁহার স্রষ্টার ভাসমান অবস্থা মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মকে Becoming বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রত্যেক জীবকেই Potential ব্রহ্ম বলা যায়। এই সম্পর্কে সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় বিশেষতঃ নিম্নলিখিত অংশ সমূহ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য—"(১) সৃষ্টির সূচনা। (২) পূর্ব বিধান। (৩) আত্মা ও জড়ের মিলন। (৪) ব্রহ্মের ভাসমানত্বের প্রণালী"। যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট যে জীবে অনন্ত সম্ভাবনা আছে এবং তাহা বিকাশ করিবার জন্যই এই সৃষ্টি লীলা। কিন্তু ব্রহ্ম কখনও অপূর্ণ নহেন ও হইতেও পারেন না এবং তাঁহাতে কোনই সম্ভাবনা নাই, তাঁহাতেই সকলই পূর্ণ।

তিনি এই ভাবে চলিবেন, যেন সৃষ্টি ভিন্ন তিনি পূর্ণ হইতে পারিতেন না, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা মহাপ্রলয়ের পরে তিনি পূর্ণ ছিলেন না বা থাকিবেন না। এই মত গ্রহণ করিলে আরও একটী বিশেষ ত্রুটী এই যে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন এবং তাঁহার সৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, সৃষ্টি না হইলে তাঁহার কিছুতেই চলে না। সুতরাং তিনি Absolute ও নহেন। ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। Mr. Stephen তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন "It may be objected that this concrete Theism makes God to consist not in being but in becoming and therefore in a never-ending process—that He never is, but is always in the making. But it is to be borne in mind that passive inactive being [if it could be at all] would not be life but death—the being of a burnt out cinder. Life consists inactivity & activity is the process of attaining an end and inclu des continuance of being. God is not inert substance but inexhaustible life and thought and His life consists in the process by which He makes real His own infinity. An exhausted infinity, an infinity which is being without any becoming would be an infinity of nothing. God is eteral life because He is infinite reality and therefore infinite activity—that unity of being and becoming." "অর্থাৎ আপত্তি হইতে পারে যে এই concrete theism ব্রহ্মকে একজন পূর্ণ পুরুষ বলে না, কিন্তু তিনি অনন্ত প্রণালী দ্বারা একজন হইতেছেন (becoming) ইহা বলে। তিনি কখনও পূর্ণ নহেন, কিন্তু সর্ব্বদা হইতেছেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন নিষ্ক্রিয় সত্তা (যদি কখনও তাহা হইতে পারে) জীবিত

নহে, কিন্তু মৃত—দগ্ধীভূত অঙ্গার ভস্ম মাত্র। জীবন কর্ম্মেতেই বাঁচে এবং লক্ষ্যের দিকে গতিই কর্ম্ম এবং লক্ষ্যই সত্তার স্থায়িত্ব বজায় রাখে। পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় পদার্থ নহেন, কিন্তু অফুরন্ত জীবন ও চিন্তা এবং তিনি তাঁহার অনন্তত্বকে যে বাস্তব সত্তা (Reality) দিতেছেন (অর্থাৎ তিনি নিজেকে যে জড় জগৎ ভাবে বিকাশ করিতেছেন) তাহাতেই তাঁহার জীবন। যে অনন্তত্ব ফুরিয়ে গিয়াছে যে অনন্তত্ব নিজেকে পূর্ণ করিতেছে না, কিন্তু পূর্ণ সত্তা হইয়া আছেন, তাহা শূন্যের অনন্তত্ব। (অর্থাৎ জড় জগতে নিজেকে বিকাশ না করিলে তিনি অনন্ত ত নহেনই, অপরন্তু শূন্য মাত্র।) পরমেশ্বর অনন্ত জীবন, কারণ তিনি অনন্ত বাস্তব সত্তা (Reality) সুতরাং অনন্ত কর্ম্ম সত্তা ও হইবার মিলন ভূমি।" উদ্ধৃত অংশের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। Mr. Stephen বলিয়াছেন যে নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বর দগ্ধীভূত অঙ্গারভস্মবৎ অর্থাৎ অকেজো। কারণ, জীবনের অর্থই কর্ম্মশীলতা। পাশ্চাত্য-গণ এবং তাঁহাদের অনুকরণে প্রায় সকলেই কর্ম্মশীলতাকেই একমাত্র গুণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াশীলতা যে জ্ঞান ও প্রেমের ফল, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সৃষ্টিতত্ত্বে আমরা দেখিয়াছি যে অনন্ত প্রেমময় পরমপিতার প্রেম হইতে সৃষ্টি বিসৃক্ষা ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। আমরা ক্রিয়াশীলতাকে তুচ্ছ করিতেছি না, কিন্তু কর্ম্মের স্থান জ্ঞান ও প্রেমের নিম্নে ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া প্রয়োজনীয়। মানুষের পক্ষে দেখি যে সে অনেক সময় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু কখনও জ্ঞান শূন্য অবস্থায় থাকে না। সুষুপ্তিতেও তাহার জ্ঞান থাকে, কিন্তু তখন তাহার কোন সজ্ঞান কর্ম্ম থাকে না। সেইরূপ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের এমন অবস্থা অনুমান করা যায় যে তিনি নিজে ইচ্ছা করিলে জাগতিক কর্ম্ম বিরহিত অবস্থায় থাকিতে পারেন। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অংশে লিখিত বিষয় পাঠক স্মরণ করিবেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত গুণাতীত।

তিনি ক্রিয়াশূন্য ভাবে কখনও নাই। তবে সেই ক্রিয়া তাঁহার নিজ সম্বন্ধে। আমরা যাহাকে ক্রিয়া বলি, অর্থাৎ জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া, সেই বিষয়েও প্রথম অধ্যায়ে ও "মায়াবাদ" অংশে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরমেশ্বর অনন্ত গুণাতীত সুতরাং তিনি কোন প্রেরণা বা কারণ দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করেন না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা না করিলে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় ছিলেন, এবং মহাপ্রলয়ের পরেও সেই অবস্থায় থাকিবেন। সুতরাং তাহাতে নিষ্ক্রিয় বলিয়া দোষী করা যায় না। অথবা নিজের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশ করিবার জন্য সৃষ্টিতে তিনি ক্রিয়া করিতেছেন, একথাও সত্য নহে। তিনি নিত্যই অনন্ত গুণে ও অনন্ত শক্তিতে পূর্ণ। তাঁহার কোনই অভাব নাই। এই সৃষ্টি তাঁহার প্রেমলীলা মাত্র। এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ইচ্ছার মধ্যেই কার্য্য করা ও না করার শক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আবার তিনি যখন ইচ্ছা সংবরণ করিবেন, তখন আর সৃষ্টি থাকিবে না। "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায় পাঠ করিলেই উদ্ধৃত মন্তব্য যে ভুল, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে রজোগুণ আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণা দান করে। "মনুষ্য সত্ত্ব গুণেও স্থির থাকে এবং তমোগুণেও স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই স্থিরতা দ্বয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণে যে স্থির, সে বিষণ্ণ, অপ্রকাশ ও জড় প্রকৃতি এবং সত্ত্বগুণে যে স্থির, সে প্রসন্ন, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্য স্বভাব সম্পন্ন। মোহকালে অপ্রবৃত্তি ও তজ্জন্য স্থিরতা তমোগুণের কার্য্য, আর জ্যোতিঃর সমুচিত বিকাশ নিবন্ধন প্রয়োজনাভাব-বোধে কর্ম্ম সম্পাদনে যে অপ্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি জনিত প্রসন্ন ভাবের স্থিরতা, সেই স্থিরতা সত্ত্বগুণের ফল।

(ক)।" জীবের পক্ষে উক্ত অবস্থা, কিন্তু ব্রহ্ম সব গুণেরও অতীত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনাভাবে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার কোনই ত্রুটী দেখা যায় না। Dr. J. B. Baillei, B. A (CamB). D. Phil (Edin) এর "Origin and Significance of Hegel's Logic" গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রোক্ত Hegelian মত যুক্তি সঙ্গত নহে। Dr. Baille আমাদের মতই সমর্থন করিয়াছেন :—"If the process were that of Reality, then it would necessarily follow that the Absolute itself passes through the process of gradual self-knowledge. But this, which is even as it stands incredible, contradicts Hegel's own contention that the Absolute subject is the 'Truly real', is self-determining, self-complete and has its purpose even in itself. It is somewhat astonishing that a thinker who held that the philosophy arises as the recollection, the after-thought of a departed epoch, and builds its temple on the ruins of the past, should have identified the recorded memory of a vanished life with the ceaseless process of the Absolute. "অর্থাৎ যদি প্রণালীটী বাস্তবতা (Reality) সম্বন্ধেই ধরা যায়, তবে ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে স্বয়ং ব্রহ্মেরই আত্মজ্ঞানের ক্রম বিকাশের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। ইহা যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিশ্বাস্য। তাহা ছাড়া হিগেলের নিজের তর্ক (মত) যে ব্রহ্মই স্বয়ং প্রকৃত সত্তা, সর্ব্বশক্তিমান, সম্পূর্ণ এবং তাঁহার নিজের মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য নিত্য বর্ত্তমান, ইহা তাহারই

(ক) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা

বিরোধ উৎপাদন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মনীষি বলেন যে দর্শন শাস্ত্র বিগত যুগের স্মৃতি ও পরবর্ত্তী পরিকল্পনা হইতে উদ্ভূত হয় এবং অতীতের ভগ্নাবশেষের উপর উহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সেই ব্যক্তিই বিগত জীবনের লিপিবদ্ধ স্মৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিরাম (ক্রম বিকাশের) প্রণালী এক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে আমরা "মায়াবাদ" অংশে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং দেখিতে পাইয়াছি যে ব্রহ্ম কখনও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। মায়াবাদে জগৎকে মিথ্যা—মায়ার খেলা মাত্র বলা হইয়াছে। তাহাও যে সত্য নহে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আবার উক্ত Hegelian মতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম যে কেবল কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা নহে, কিন্তু উহা দ্বারাই তিনি আপনাকে পূর্ণ করিতেছেন, যেন তিনি একজন সাধারণ সাধক বই আর কিছুই নহেন তিনি জগৎরূপে পরিণত হইতেছেন এবং অনন্তকাল তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইবেন। আমরা উক্ত দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মত (like poles asunder) যে দুই প্রান্তে (two extremes-এ) যাইতেছে, তাহা দেখিয়াছি এবং উভয় মতেরই সিদ্ধান্তই যে ভ্রান্ত তাহাও পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পাশ্চাত্য দর্শন মানবের পার্থিব অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অতীত কোন অবস্থা ধারণা করিতে পারে না। যদি কেহ আত্মিক রাজ্য হইতে কিছু বলেন, তবে তাঁহাকে Mystic বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক অবস্থাও যে সাধনা দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা তাহারা অনেক সময় গ্রাহ্য করেন না এবং সেইরূপ সাধনার জন্য মানবকে উৎসাহ দেন না। ভারতীয় প্রায় প্রত্যেক দর্শনের অনুগামী এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। যথা—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন পাশ্চাত্য দর্শনের অনুযায়ী সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হয়

না। অর্থাৎ তত্তৎ দর্শনে যে সকল আদর্শ ও মীমাংসা বর্ত্তমান, সেই অনুযায়ী জীবন গঠন করিবার জন্য এক একদল লোক সাধন ভজন করিতেছেন না। এই প্রসঙ্গে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আধ্যাত্মিক সাধনা লব্ধ অভিজ্ঞতা, পার্থিব অভিজ্ঞতার ন্যায় অথবা তাহা হইতেও অত্যধিক পরিমাণে দর্শনের প্রমাণের মধ্যে গ্রহণীয় হওয়া উচিত। ইহাকেই শব্দ প্রমাণ বা আপ্তবাক্য বলা হয়। যদি শব্দ প্রমাণ বা আপ্তবাক্য আমাদের জীবন হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়, তবে আমরা কোন স্তরে নামিয়া যাই, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা যাহারা ইউরোপ বা আমেরিকা না দেখিয়া ও উহাদের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী তাহারা কেন ঋষবাক্যে বিশ্বাসী হইবেন না। জগতে যত মহা সত্য লাভ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে ঋষিদিগের অনুভূতি লব্ধ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তর্ক যুক্তি দ্বারা সত্যের অল্পাংশই লাভ হইয়াছে। কথিত আছে যে মহাপুরুষগণ জীবন ও বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপরই দর্শন প্রস্তুত হয়। যদি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যকে অবিশ্বাস করিতে হয়, তবে ইউরোপ ও আমেরিকার অস্তিত্বও অনেকেরই অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। পাঠক বলিতে পারেন যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পার্থিব অভিজ্ঞতার ন্যায় সুলভ নহে একথা সত্য। কিন্তু অপরা বিদ্যার অনেক সত্যই নিরক্ষর ব্যক্তির অজ্ঞাত থাকিলেও তাহা বিশ্বাস করিয়াই জীবন চালাইতে হয়। তেমনি যাহারা সাধন ভজন করেন না, তাহাদেরও সেইরূপ অনেক আধ্যাত্মিক সত্য বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। নিরক্ষর ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাবে যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য সকল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না, তেমনি সাধন ভজন বিহীন ব্যক্তি বুঝিতে পারে না বলিয়া আধ্যাত্মিক সত্যও মিথ্যা হয় না। পার্থিব বিষয়ে যেমন সাধনার সিদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক বিষয়েও সেইরূপ সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়, আধ্যাত্মিক সাধনা কঠিনতর

এই মাত্র পার্থক্য। সকল অভিজ্ঞ ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণই বলিবেন যে পার্থিব বিদ্যা বা কার্য্যে সফলতা লাভ করিতেও অত্যধিক সাধনার প্রয়োজন। যে জিনিষের যত মূল্য, তাহা পাইতেও সেইরূপ সাধনারই প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক সাধনার ফল অমূল্য এবং অনন্তকাল স্থায়ী। সুতরাং সেই সাধনা কঠিনতর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কঠিন হইলেও তাহা অসাধ্য নহে। ইহার পরেও যদি কেহ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তাহাকে বলিতে হয় যে "সাধন ভজন কর, অবশ্যই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। The test of the pudding is in the eating. আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া উহার আস্বাদন গ্রহণ কর, তবেই বুঝিতে পারিবে যে উহা মিষ্ট কি তিক্ত অথবা শুধুই ফাঁকি"। আমরা এই আলোচনায় বুঝিতে পারিলাম যে পার্থিব অভিজ্ঞতার ন্যায় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অস্বীকার করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এখন আমরা শ্রুতি হইতে ঋষিবাক্য সমূহ উদ্ধার করিতেছি। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত Hegelian মত অর্থাৎ ব্রহ্ম ক্রমশঃ জড় জগতে পরিণত হইতেছেন, ইহা সত্য নহে। "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্। বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্-১।১।৬)।" "বঙ্গানুবাদ:—যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপরহিত, চক্ষুঃ শ্রোত্র বিহীন, সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্বভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন। (তত্ত্বভূষণ)" "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-৩।৮।৮)।" "বঙ্গানুবাদ:—হে

গার্গি! ব্রাহ্মণগণ বলেন ইনি সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, তিনি স্নেহ বস্তু নহেন, তিনি ছায়া নহেন তিনি তমঃ নহেন, তিনি বায়ু নহেন, তিনি আকাশ নহেন, তিনি অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু, অশ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়বিহীন, মনোবিহীন, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত, তিনি অপরিমেয়, তিনি অন্তররহিত, তিনি বাহ্যরহিত, তিনি কিছুই ভোজন করেন না এবং তাঁহাকে কেহ ভোজন করে না। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন।" "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোতৃমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৩।৮।১১)।" "বঙ্গানুবাদ:— হে গার্গি! এই অক্ষরকে দেখা যায় না (কিন্তু) তিনি দর্শন করেন. তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, (কিন্তু) তিনি শ্রবণ করেন. তাঁহাকে মনন করা যায় না, (কিন্তু) তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না, (কিন্তু) তিনি জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ শ্রোতা নাই. ইনি ভিন্ন অন্য কেহ মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। (মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি। (কেনোপনিষদ—১।২)" "বঙ্গানুবাদঃ যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, অর্থাৎ এই সমুদায় শক্তির কারণ, তিনিই মনঃ আদির প্রবর্তক, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু. এই জ্ঞান দ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব ধারণা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হন। (তত্ত্বভূষণ)।" "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব

তদ্বিদিতাদথো অবদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে" (কেনোপনিষদ্ ১।৩)।" "বঙ্গানুবাদ :—যিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনের গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না. কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না, তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। (তত্ত্বভূষণ)।" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" (কঠোপনিষদ্—২।১৮)।" "বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানবান আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই. ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই, ইহা হইতেও কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত (অপক্ষয় বর্জ্জিত) ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। (তত্ত্বভূষণ)।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" (কঠোপনিষদ্—৩।১৫)।" "বঙ্গানুবাদ :—যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, গন্ধহীন, এবং অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধি নামক মহতত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। (তত্ত্বভূষণ)।" উপনিষদ্ হইতে উক্তরূপ আরও বহু মন্ত্র উদ্ধার করা যায়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহ পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে জড়ীয় গুণ ব্রহ্মের গুণ নহে। উক্ত মন্ত্র সমূহের অর্থ এত সুস্পষ্ট যে উহাদের উপর আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের অনেকেই বুঝাইয়া দিবে যে জড়ীয় গুণ ব্রহ্মের গুণ নহে। অর্থাৎ জড় আত্মা নহে। "মায়াবাদের" অন্তর্গত "নেতিনেতিবাদ" অংশ পাঠ করিলেও পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে জড়, জড়ের গুণ, শক্তি বা অবস্থা ব্রহ্ম নহে অর্থাৎ আত্মার গুণ জড়ীয় গুণ

নহে। জড়কে আত্মা অথবা জড়ীয় গুণ রাশিকে আত্মারই গুণ, অথবা জড় জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র, এই সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যদি কোন দর্শন ঐরূপ মত মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই সমাজ সেই দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেই। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত উক্তি নহে, তাহা নিম্নলিখিত অংশে প্রকাশ পাইবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ গ্রহণ করে নাই। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, নিম্বকাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহার মত বিরোধী ভাবে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ ত সুস্পষ্ট ভাবে মহাত্মা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া দিলেন। স্বর্গত Sir Brojendra Nath Seal মহাশয় বলিয়াছেন যে শতকরা ৯০ জন ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ একজন যাহা বলিলেন, শত শত জন উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অপূর্ণ ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত "সোঽহম্," "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বয় উপনিষদের অমৃত পূর্ণ উপদেশ ও অতি সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ বাণী সমূহকে যেন আবরণ করিয়া রাখিল। উক্ত উক্তি সকলের উপর গ্রথিত মায়াবাদ পূর্ণ দর্শন যেন আরও গভীরতর আবরণে আবৃত হইল। উপরোক্ত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বহু দিন হইতেই মত প্রচারিত হইতেছিল। অবশেষে বিদ্রোহ-স্বরূপই যেন ভক্তি ধর্ম্ম অতি প্রবল ভাবে ভারতে প্রচারিত হইল। বিদ্রোহের যাহা স্বভাব, তাহা এস্থলেও নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিল। ভক্তি ধর্ম্ম আবার অন্য প্রান্তে (other extrerne-এ) চলিয়া গেলেন। ফলে জ্ঞানকে ভক্তগণ বিশেষ ভাবে আমলই দিতে চাহিলেন না— জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ আরম্ভ হইল। জ্ঞান যে আমাদের পরম ধন, তাহা অনেকেই ভুলিয়া গেলেন এবং তাহারই ফলে অবতারবাদ সৃষ্টি করিয়া মহাপুরুষদিগকে পরমেশ্বরের আসনে বসাইলেন

ও বাহ্য পূজার প্রতিষ্ঠা করিলেন। উক্তরূপ ভক্তিধর্ম্মই এখন ভারতকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে এক সময় বেদ বেদান্তের চর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। স্মৃতি ও পুরাণই একমাত্র অবলম্ব্য ছিল। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান পুরুষ কাশীধামে যাইয়া বেদ বেদান্ত শিক্ষা করিতেন। রাজা রামমোহন রায় সেই স্থানে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর চারিজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উক্ত উদ্দেশ্যেই কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প সংখ্যক সন্ন্যাসীমাত্র বর্ত্তমানে মায়াবাদ অনুসারে সাধন করিতেছেন। এখন যে শিক্ষিত সমাজে অদ্বৈতবাদের আলোচনা আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা অধিকাংশ স্থলে মস্তিষ্কের দিক (Intellectual side) দিয়া, সাধনের দিক থেকে নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অনুসরণকারীর সংখ্যা সত্যের মাপকাঠি নহে। এই মত আমরাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। কিন্তু নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ যে কেবল সংখ্যা গরিষ্ঠ দ্বারাই আক্রান্ত, তাহা নহে, কিন্তু বহু বিজ্ঞ দার্শনিকদিগের সুযুক্তিরাশি দ্বারা উহা খণ্ডিত হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ দ্বারা প্রচারিত সত্যধর্ম্ম ও সৃষ্টিতত্ত্ব কখনও জড়কে ব্রহ্ম বলেন না। জড় পরব্রহ্মের পরম্পরা ভাবে অভেদ বটে, কিন্তু এই অর্থে অভেদ যে তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই স্বরূপ বিশেষ হইতে উহার উৎপত্তি এবং অচৈতন্যই ইহার বিশেষ ধর্ম্ম। জড়ের সহিত পরব্রহ্মের ভেদের পরিমাণ এত অধিক যে উহার সীমা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সেই সৃষ্টিতত্ত্বে অল্পতম (Irreducible minimum) কল্পনা বর্ত্তমান এবং অযথা অনেক কল্পনায় দুষ্ট নহে। উহাদিগকে কল্পনা বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সকল তত্ত্বই সুপ্রমাণিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব সমূহ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ; সেই তত্ত্ব পুরাতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র বা বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্য তত্ত্বের বিরুদ্ধ বা অসংলগ্ন

নহে, সেই তত্ত্ব যেমন জড়কে ব্রহ্ম, আত্মা অথবা আমাদের মনোবিকার বা মিথ্যা বলে না, সেইরূপ তাহা বিজ্ঞানকেও অবহেলা করে না. তাহা ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আবার সৃষ্টি কর্ত্তারূপে সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মার কল্পনা করেন না ; তাহা কোন কোন দর্শনের ন্যায় দেহাত্মভেদ স্বীকার করিয়াও জড় জগৎকে ব্রহ্ম অথবা আত্মা বলেন না, তাহা জীবনে জড়কে আত্মা বা ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব মনে করিয়া আমাদের আচরণকে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভাবে বিভাগ করেন না. সেই তত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রের সার সত্যকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন ; উহা জ্ঞানকে তুচ্ছ করে না, অথবা প্রেম ও ভক্তি সাধনার উপদেশ শূন্য নহে, বরং তাহা জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা, নির্ভরতা প্রভৃতি গুণরাশির সাধনার উপদেশে পরিপূর্ণ. অপর পক্ষে তাহা নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ ও অনন্ত অনন্ত গুণ নিধান পরব্রহ্মকে প্রেম ও ভক্তি করিতে বিধি দান করে বলিয়া ভক্তি সাধনার্থ পরমেশ্বরের আসনে অন্য কাহারও প্রতিষ্ঠা অথবা তাঁহার বাহ্য পূজা মহাপরাধ বলিয়া গণ্য করে ; সেই তত্ত্ব পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়া আবার তাঁহার প্রতিমা পূজার বিধি দেয় না, সেই তত্ত্ব ব্রহ্মকে একমাত্র জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে নাই, অর্থাৎ পরব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞানেরই সাধ্য, একথা বলেন না, কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের একমাত্র পরম প্রেমের পাত্র, একমাত্র অনন্ত কালের ভক্তি ভাজন, একমাত্র পরম সুহৃদ ও একমাত্র নিত্য সহায় ও নিত্য সাথী এবং তাঁহাকে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, নির্ভরতা সরলতা প্রভৃতি গুণ সাধনে লাভ করা যায়, সেই তত্ত্ব পৃথিবীর এবং অন্যান্য মণ্ডলের সকল মহাপুরুষগণকেই সুগভীর ভাবে ভক্তি করিতে বিধি দেয়, কিন্তু সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায় সেই মহাপুরুষগণকে অর্থাৎ দেবদেবীগণকে—অত্যুন্নত সাধক সাধিকাদিগকে পরমেশ্বরের আসনে বসাইতে একান্ত ভাবে নিষেধ করে, সেই তত্ত্ব অনন্ত গুণ সাধনার

উপদেশে পরিপূর্ণ এবং বলেন যে উৎকৃষ্ট গুণ সমূহের উন্নতি হইলেই অপকৃষ্ট গুণগুলি অর্থাৎ জাতগুণগুলি (সাধারণ ভাষায় কথিত দোষপাশরাশি) আপনা হইতেই লীন হয়; সেই তত্ত্ব সত্য ও যুক্তিযুক্ত, সুতরাং তাহা পণ্ডিত ও মূর্খ, জ্ঞানী ও ভক্ত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, পাপী ও পুণ্যবান সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন এবং সকলের জীবনে জীবনে সাধনীয়।

ওঁং অজরং অমরং নিত্যনির্ব্বিকারং ব্রহ্ম ওঁং।

ওঁং

ত্বং সৃষ্টিহেতু ত্বমনন্ত-সদ্‌গুণ
ত্বং সৃষ্টিরূপশ্চ বিমুক্তিকারণম্।
ত্রাতা বিনাশী ত্বমনন্তরূপক
স্ত্রায়স্ব দাসং স্বক মাশুতারক ॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistomology)

Epistomology পাশ্চাত্য দর্শনে একটী বিশেষ বিষয়। এই সম্বন্ধে উহাতে অতি বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। কিন্তু কোনও সুমীমাংসা অদ্য পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে পাশ্চাত্য দর্শন wrong end হইতে আরম্ভ করিয়া বিচার করিতে যাইয়াই সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার না করিয়া আলোচ্য বিষয়ে হাত দিলে এইরূপ গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা ভিন্ন আত্মা কি, অন্তঃকরণ কি এবং জড় জগৎ কি, তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। সুতরাং জাগতিক বস্তু সত্য

কি মিথ্যা, অন্তঃকরণ কি শুধুই জড় পদার্থ অথবা শুধুই আত্মিক, কেন ও কেমনে আমাদের জ্ঞান লাভ হয় প্রভৃতি কঠিন বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব। "সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে জড় জগৎ সৃষ্টির মূলে পরমপিতার ইচ্ছাশক্তি ও তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে বর্ত্তমান। আমরা আরও দেখিয়াছি যে তাঁহারই প্রেমময়ী ইচ্ছায় তিনিই জড়দেহ যোগে বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই দেহে দেহে যুক্ত হইয়া বহু ভাবে প্রকাশমান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একই ছিলেন ও একই আছেন, সৃষ্টির জন্য তিনি বহু হন নাই। আমরা আরও দেখিয়াছি যে একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে। কিন্তু জড় পদার্থের উহা নাই। চৈতন্যহীনের পক্ষে বিজ্ঞান লাভ যে একান্ত অসম্ভব, তাহা সকলেরই সহজ জ্ঞানে বলিয়া দিবে। সুতরাং বিজ্ঞান লাভ একমাত্র আত্মার পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু জড়ের পক্ষে উহা অসম্ভব। জীবই Subject, কিন্তু জড় চিরকাল object. আমরা আরও দেখিয়াছি যে আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া তাঁহার সত্তা ও পূর্ণজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। তখন আত্মার জ্ঞান দেহ সংসর্গে আসিবার জন্য বিকৃত হইয়া চারিভাগে প্রকাশিত হয়। যথা—বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহংকার। মস্তিষ্ক জ্ঞান প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে বিকৃতির কারণ লিখিত হইয়াছে। "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশেও অন্তঃকরণের উৎপত্তি এবং আত্মা ও অন্তঃকরণের সম্পর্ক এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উহাদের পুনরুক্তি করিব না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহংকার প্রকাশের যন্ত্র জড় পদার্থ বলিয়া তাহা আত্মার Medium হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। সুতরাং আত্মার জ্ঞান ভিন্ন Medium-এর মধ্যে দিয়া প্রকাশ পাওয়ায় বিকৃত হয়। কারণ, জড় চিরবিকৃত। আমাদের জ্ঞানও

তাই অপূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত হয়। একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞানই নিত্য পূর্ণ। তিনি নিত্য অশরীরী, নিত্য নিরাকার, নির্ব্বিকার। দেহাবদ্ধ সুতরাং সীমাবদ্ধ ভাসমান আত্মার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনো-যুক্ত আত্মার জ্ঞান ও গুণ রাশির কখনও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা "গুণ বিধান" ও "সোঽহং" অংশদ্বয়ে বর্ত্তমান। দেহাবদ্ধ সুতরাং বিবিধ দোষ পাশের আবরণে আবদ্ধ অপূর্ণ জীবাত্মার জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অন্য ভাবে চিন্তা করিলেও এবিষয়ে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা জড় পদার্থটীকে পূর্ণভাবে দেখি না। একটী Table-এর কথা চিন্তা করা যাউক্। সাধারণতঃ ইহার সম্মুখের অংশ এবং উহারও উপরিভাগ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু উহার সর্ব্বাংশের সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না। আমরা এইরূপ ভাবে table সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করি, উহারই বিচার ও অনুমান দ্বারা আমরা সিদ্ধান্তে আসি যে উহা একটী সম্পূর্ণ table আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে একই সময় সম্পূর্ণ একটী table-এর ধারণা আমরা করিতে পারি না। অতএব আমরা পাইলাম যে আমাদের জ্ঞান কখনও পূর্ণ নহে কিন্তু সর্ব্বদাই অপূর্ণ ও বিকৃত। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের জ্ঞানের বিকৃতি ভাবও অপূর্ণতা জন্য এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের defect জন্য আমরা আংশিক জ্ঞান লাভ করি বলিয়া আমাদের মনে করিতে হইবে না যে জড় পদার্থ মিথ্যা মায়ার খেলা মাত্র। মস্তিষ্ককে অন্তঃকরণের যন্ত্র বলা হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব যে মস্তিষ্ক কেন অন্তঃকরণের যন্ত্র হইল। আমরা দর্শন করি, চক্ষু ঐ দর্শন-ক্রিয়ার যন্ত্র। সেইরূপ কর্ণ শ্রবণ-রূপ জ্ঞান-ক্রিয়ার যন্ত্র, নাসিকা আঘ্রাণ-রূপ জ্ঞান-ক্রিয়ার যন্ত্র, জিহ্বা আস্বাদন-রূপ জ্ঞান-ক্রিয়ার যন্ত্র, এবং ত্বক্ স্পর্শরূপ জ্ঞান-ক্রিয়ার যন্ত্র। সেইরূপ মস্তিষ্ক অন্তঃকরণের যন্ত্র। উহার মাধ্যমেই আত্মার জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত চারিভাগে প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রত্রয় দ্রষ্টব্য।

"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবাণীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্।" "অথ যো বেদেদং মন্বাণীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।" (ছান্দোগ্য-৮।১২।৪-৫)।" বঙ্গানুবাদ:—"তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের (অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকার) যে স্থলে অনু প্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্টাতৃ পুরুষ (বর্ত্তমান), চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। (দেহের মধ্যে থাকিয়া) যিনি বুঝিতেছেন যে 'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি' তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন 'আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছি' তিনিই আত্মা, বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন—'আমি ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি,' তিনিই আত্মা, শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য।" "আর যিনি বুঝিতেছেন যে 'আমিই ইহা মনন করিতেছি' তিনিই আত্মা; মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদায় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" আমরা দেখিয়াছি যে ব্যোমের সত্ত্বাংশ দ্বারা কর্ণেন্দ্রিয় গঠিত। সেইরূপ মরুতের সত্ত্বাংশ দ্বারা ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ দ্বারা চক্ষু, অপের সত্ত্বাংশ দ্বারা জিহ্বা এবং ক্ষিতির সত্ত্বাংশ দ্বারা নাসিকা গঠিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জড়ের গুণ। ইহাও দেখা গিয়াছে যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ ও প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশের সাহায্য করে। রজঃ গুণ চালক অর্থাৎ উহা কার্য্য করিবার সাহায্য করে। তমোগুণ আবরক অর্থাৎ উহা জ্ঞান প্রকাশের বাধা উৎপাদন করে। আমরা দেখিয়াছি যে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ

পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত। এই কারণেই উহারা জ্ঞান প্রকাশের সাহায্য করে। আবার আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের মস্তিষ্ক পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ সমষ্টি দ্বারা গঠিত। তাই মস্তিষ্ক একাই পাঁচ প্রকার জ্ঞান প্রকাশ করিবার সাহায্য করে। মস্তিষ্ক সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত, সুতরাং স্বচ্ছ বলিয়া আত্মার জ্ঞানের প্রতি-বিম্বও গ্রহণ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন হইবে যে আত্মা ও জড় যখন পৃথক্ পদার্থ, তখন আত্মার জ্ঞান মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কি প্রকারে প্রকাশ পায়। ইহার উত্তর বুঝিতে "আত্মা ও জড়ের মিলন" "জড়ের বাধকত্বের কারণ." "গুণ বিধান" এবং "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশ চতুষ্টয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে জড় পরমপিতার ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারই স্বরূপ বিশেষের পরিণামে উৎপন্ন বলিয়া উহা বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান। জীবে "আত্মা ও জড়ের" Homogeneous mixture হইয়াছে বলিয়া উহারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারে ও করে। তাই দেহ রূপ জড় আত্মার আবরণের কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং দেহাবদ্ধ আত্মাও দেহের মাধ্যমে কার্য্য করিতে সমর্থ। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে দেহ যত সূক্ষ্ম হইতে থাকে, আমাদের আবরণের মাত্রাও ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ব্যোম প্রধান দেহে আবরণের পরিমাণ অত্যল্প বর্ত্তমান থাকে। ইহার কারণ দেহে ব্যোমের পরিমাণের আধিক্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে সত্ত্বাংশেরও ক্রমবৃদ্ধি। আত্মা স্থূল নহেন. সূক্ষ্ম নহেন. কিন্তু উঁহা কারণ বা কারণেরও অতীত। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে অন্তঃকরণ দেহকে চালাইতেছে। অন্তঃকরণ যে কেবল জড় নহে অথবা আত্মাও নহে, কিন্তু উহা পাঞ্চভৌতিক ও আত্মিক উভয়ই, ইহা আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে দেখিয়াছি। আবার জড় এবং জীবাত্মাও পরব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাই জীবাত্মা ভাবে ভাসমান এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই

একতম স্বরূপের—অব্যক্তের (অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বের) পরিণামে জড় জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং তাঁহারা পরস্পরের উপর পরস্পর কার্য্য করিতে সমর্থ। অর্থাৎ Like alone can act upon like নামক তত্ত্ব এ ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে আত্মার জ্ঞান দেহ সংসর্গে বিকৃত হইয়া চারিভাগে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহংকারের সমষ্টিই অন্তঃকরণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক উহার প্রকাশক যন্ত্রমাত্র। এইজন্য অন্তঃকরণকে আত্মার কার্য্যক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। জড় পদার্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে এবং মনঃ যদি সেই দিকে একাগ্র হয়, তবেই আমাদের জ্ঞান লাভ হয়। মনঃ যদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত একযোগে কার্য্য না করে, তবে বস্তু বিশেষের জ্ঞান লাভ হয় না। কোন এক ব্যক্তি তাহার প্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধে গভীর একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতেছেন। তখন যদি তাঁহার নিকট কোন দৃশ্য বস্তু উপস্থিত হয়, তবে তিনি তাহা দেখিবেন না এবং নিকটে যদি কোন শব্দ উত্থিত হয়, তাহাও তিনি শুনিবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ মনঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ সেই বস্তুর কোনও প্রকার জ্ঞান লাভের আশা নাই। প্রত্যেকেই এই তত্ত্ব নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারেন। কোন পদার্থ দৃষ্ট হইলে, স্পৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কে আসিলে এবং মনঃ যদি সেই দিক্ যায়, তবে পদার্থের জ্ঞাতব্য বিষয় sensory nerves-এর মধ্যে দিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। এই সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান বিস্তারিত ভাবে বলিতে পারিবেন। ইহাকেই sensation বা অনুভূতি বলা হয়। স্মৃতি, বুদ্ধি, ও অহংকার উহার পর্য্যালোচনা করে এবং ফল স্বরূপ আমরা পাই বিজ্ঞান। বাহিরের পদার্থের sensation এবং অন্তঃকরণ উহাকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞান দান করে। সুতরাং বিজ্ঞান

sensation মাত্র নহে, কিন্তু উহার নানা ভাবের ফল। "সৃষ্টিতত্ত্বে" যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে পরম পিতার ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে Matter is a product of mind কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সেই Mind Individual mind নহে, কিন্তু উহা Universal Mind অর্থাৎ পরম পিতার সৃষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছাশক্তিই জড় জগতের একমাত্র নিমিত্ত কারণ। আবার ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের একমাত্র ইচ্ছাশক্তিই সৃষ্টির একমাত্র কারণ নহেন। তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ উহার উপাদান কারণ। উভয়ের মিলনে জগৎ সৃষ্ট। কেবল অব্যক্ত স্বরূপ হইতে আপনা আপনি জগৎ সৃষ্ট হয় নাই এবং একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারাও উহা সম্ভব হয় নাই। এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সূচনা" ও "ইচ্ছাশক্তি" অংশ দ্বয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায়ে নানা স্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে হেতু জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতে পরম্পরা ভাবে আসিয়াছে, যে হেতু দেহ সমূহ সেই জগৎ হইতে উৎপন্ন, যে হেতু জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, এবং যে হেতু অন্তঃকরণ পাঞ্চভৌতিক ও আত্মিক উভয় ভাবে গঠিত, সেই হেতুই উহা মস্তিষ্ক ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কারণ, বহির্জগৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন নহে, কিন্তু পৃথক্ (Distinct) মাত্র। জড় যে কি পদার্থ তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। **Hegelian Philosophy**-এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জগৎ আত্মার (যিনি স্বরূপে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহেন, তাঁহার) **Externalisation.** অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিতে গেলে বলিতে হয় যে জড়জগৎ আত্মা হইতেই তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহার একটী স্বরূপের উপাদানে তাঁহারই নিজ দ্বারা রচিত। কারণ, জীবাত্মা স্বরূপে পরমাত্মা।

এস্থলে একটী কথা অবশ্য বক্তব্য যে এই ভাবে আমরা কেবল তখনই ভাবিতে পারি, যখন আত্মাকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া ভাবি, কিন্তু বাস্তবে আত্মা সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে জগৎ ব্যষ্টি জীবাত্মা দ্বারা সৃষ্ট, ইহা চিন্তা করা সঙ্গত হইবে না। অতএব সত্য-দর্শনানুযায়ী চিন্তা করিলে বহু কালের সুকঠিন সমস্যার সত্য, সরল ও প্রাঞ্জল সুমীমাংসা লাভ হইবে। জড় জগৎ কেবল মাত্র ইচ্ছাকৃত নহে, উহার উপাদান কারণও আছে। সুতরাং ইহা subjective Idealism হইতে পারে না। আবার জাগতিক পদার্থ সমূহ আত্মা হইতে আপাতদৃষ্টিতে অনুমিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থও নহে। উহাদের বস্তু সত্তা (objectivity) আছে। কিন্তু উহারা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন নহে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে সূক্ষ্ম অর্থে উহারা আত্মার অন্তর্গত। অতএব সত্য-দর্শনানুযায়ী উহাকে Idealism-Realism বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় উহাকে Ideal Realism বলা যাইতে পারে।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ওঁ

ওঁ

সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্তমেক-

মনাদি মাদিম্ ভুবনস্ত চান্তম্।

আনন্দরূপং পরমং মহিষ্ঠং

তমা[illegible] নমামি ॥ (

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

সপ্ত সমস্যা

ইতিপূর্ব্বে যে সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহাতে আমরা বহু বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদের সাধ্যানুযায়ী উহাদের সত্য মীমাংসা লাভের চেষ্টাও হইয়াছে। সমস্যা সমূহ সত্য ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে কি না, তাহা একমাত্র অনন্ত জ্ঞানাধার পরব্রহ্মই জানেন। প্রসিদ্ধ Physical Philosopher Mr. Du Bois Raymond বলেন যে বিশ্বে যে সাতটী সমস্যা বর্ত্তমান, তাহা কোন বিজ্ঞান বা দর্শন এ পর্য্যন্ত সমাধান করিতে পারে নাই ও পারিবেও না। সেই সপ্ত সমস্যা এই:—"(১) Nature of matter and energy : জড় এবং ক্রিয়াশক্তির স্বভাব। (২) Ulnimate source of motion : গতির আদি উৎস। (৩ The first begining of life : জীব জীবনের প্রথম আরম্ভ। (৪) The cause of adaptation of means to ends in Nature : উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রকৃতিতে উপায় অবলম্বিত হয় কেন? (৫) The origin of sensation and consciousness : অনুভূতি এবং সংজ্ঞার মূল। (৬) The origin of rational thought and its universal concomittant speech : যুক্তিযুক্ত জ্ঞান এবং ইহার সর্ব্বপ্রসারী আনুষঙ্গিক বাক্যের মূল। (৭) The possibility of free will : স্বাধীন ইচ্ছার সম্ভাবনা।" আমরা এখন দেখিব যে এই গ্রন্থে সকল সমস্যার দার্শনিক মীমাংসা বর্ত্তমান কি না। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল মীমাংসা বর্ত্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত সুমীমাংসা কিনা, তাহা পাঠকবর্গের বিচারাধীন। এই সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত

নহে, সুতরাং সেই ভাবের আলোচনা আমরা করিব না। দার্শনিক আলোচনাও যাহা হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। সংক্ষেপেই সেই সকল মীমাংসায় উল্লেখ করিব। "(১) জড় এবং ক্রিয়া শক্তির স্বভাব :—আমরা "সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশে (প্রথম অধ্যায়ে) বিস্তারিত ভাবে দেখিয়াছি যে জড় (Matter) এবং ক্রিয়াশক্তির মূল কোথায় নিহিত রহিয়াছে। কোন বস্তুর স্বভাব জানিতে হইলে উহার উৎপাদকের অর্থাৎ উহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণের স্বভাব এবং উৎপাদন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই আমরা সত্য ভাবে কার্য্যে সফলতা লাভ করিব। কারণ, উৎপন্ন বস্তুতে ঐ দুই কারণে ব্যতীত কিছুই আসিতে পারে না। স্বভাব বলিলে ধর্ম্ম বুঝায়। সুতরাং জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং আকৃতি ও নিরাকৃতি এবং অচৈতন্য। এই সমস্তের নানাবিধ মিলনে জড়ের নানা অবস্থা ও গুণ উৎপন্ন হইয়াছে। পরমেশ্বরের বিবংহয়িষা অর্থাৎ নিজেকে প্রেমগুণে বহু ভাবে ভাসমান করিবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছার জন্যই তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে তিনি ক্রমশঃ ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূত সৃজন করিলেন, উহারা পঞ্চীকৃত হইল এবং উহাদের অসংখ্য সম্মিলনে তাঁহারই ইচ্ছায় জড় জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং জড় জগতের মূলে ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপ ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি। প্রথমটী উপাদান কারণ ও দ্বিতীয়টী নিমিত্ত কারণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জড় মাত্রই সাকার ও নিরাকার উভয়ই। উহা দেশ ব্যাপ্ত এবং সকলেরই শক্তি আছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে দেশের (space-এর) মূলে অব্যক্ত স্বরূপ এবং ক্রিয়াশক্তির মূলে সেই স্বরূপেরই শক্তি। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে সেই শক্তিকেই অনন্ত অনন্ত অনন্ত শক্তিমান পরমপিতা তাঁহার সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা বহুবিধ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সম্পর্কে

"ইচ্ছাশক্তি" অংশ দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে এবং উহাতে ক্রিয়াশক্তিও আছে। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিতে যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে জড় জীবদেহ রূপে পরিণত হইয়া আত্মার আবরণ স্বরূপ হইয়াছে এবং তাহাতেই ব্রহ্মের বহু ভাবে ভাসমান হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ক্রিয়াশক্তি সহ জড় জগৎ যাহা কিছু করিতেছে, তাহাই সৃষ্টির সুমহান্ ও সুমঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। ইহা ভিন্ন জড় জগতের কোনই আবশ্যকতা ছিল না বা নাই। সাংখ্য সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে জড় জীবের জন্যই, উহার অন্য কোন কার্য্যকারিতা নাই। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সেই সুমহান্ উদ্দেশ্য পরমেশ্বরের স্বগুণ-পরীক্ষা। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের প্রথম চারি অংশে ও অন্যান্য স্থলে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সেই মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই জীবসমূহ নিম্নতম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম অবস্থা লাভ করিবেন। এই যে জীবের ক্রমবিকাশ এবং সুদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রলয় কালে পূর্ণামুক্তি লাভ, ইহা সম্ভব হইত না যদি তিনি জড়কে এবং তজ্জন্য দেহকে আবরণ স্বরূপ প্রস্তুত না করিতেন। "জড়ের বাধকত্বের কারণ" এবং "গুণ বিধান" অংশদ্বয়ে দেখা গিয়াছে যে জড় কিরূপ ভাবে জীবাত্মার বাধকতার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। আমরা "ইতর জীবের কথা," 'চিদাভাস' ও "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ সমূহে এবং অন্যান্য স্থলে দেখিয়াছি যে জড় কিরূপে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিতেছে। অতএব দেখা যায় যে জড় ও উহার ক্রিয়াশক্তির স্বভাবই জীবাত্মার পক্ষে আত্মস্বরূপ লাভের পথে বাধা প্রদান করা অর্থাৎ জড় জগৎ জীবের বাধা স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জড় যেরূপ বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি সেই বাধা অপসারণের জন্য সাহায্যও করে। "কণ্টকেনাবিদ্ধ কণ্টকম্"। "স্রষ্টার বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে বিপরীত গুণের অপূর্ব্ব মিলন সম্ভব হইয়াছে

এবং তাঁহার হইতে এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট পদার্থেও সেইরূপ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের শক্তি দুঃখ হইতে সুখের শক্তি, অচৈতন্য হইতে চৈতন্যের শক্তি. বিকর্ষণ হইতে আকর্ষণের শক্তি বলবত্তরা। সেই রূপ জড়ের বাধা দূর করিবার শক্তি অপেক্ষা বাধা প্রদানের শক্তি বলবত্তরা ইহার বিপরীত হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিতই হইত না। কারণ বাধা উত্তীর্ণ হইবার শক্তি দ্বারাই গুণের পরীক্ষা হইবে। সুতরাং জড় যদি আপনা আপনি বাধা দূর করিয়া দিতে পারিত অথবা জীব যদি অনায়াসেই জড়ের বাধা অতিক্রম করিতে পারিত, তবে গুণরাশির প্রকৃত পরীক্ষা সম্ভব হইত না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জড়ের ও উহার ক্রিয়া-শক্তির স্বভাবই আত্মার পূর্ণতা লাভের পথে বাধা প্রদান করে।

(২) গতির আদি উৎস:—Motion অর্থে গতি। আমার হস্তে একটী প্রস্তর খণ্ড আছে। আমি উহা দূরে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তখন উহাকে আমি হস্তচ্যুত করিয়া দিব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার শক্তিও উহাতে প্রদান করিব। বিজ্ঞান বলেন যে জড়কে চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। এই যে পরিচালনার শক্তি, ইহার প্রয়োগের ফলকেই গতি কহে। আমরা 'সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশে দেখিয়াছি যে জড়ের ক্রিয়াশক্তি জগতের উৎপাদক পরমপিতার অব্যক্ত স্বরূপের শক্তি হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি উহাকে নানাবিধ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং জড়ের ক্রিয়াশক্তির মূলে অব্যক্ত স্বরূপের শক্তি এবং উহার চালক পরমপিতার জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং পরম চেতনই সকল গতিশক্তির মূল কারণ এবং উৎস। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে গতিশক্তিও ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত। জড়ের ক্রিয়াশক্তি আছে, সুতরাং উহার গতিশক্তিও আছে। কিন্তু উহা অচেতন বলিয়া স্বাধীন ভাবে নিজেকে নিজে চালাইতে পারে না এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলেই উহার গতিশক্তির

ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই। এই জগতে যত গতিশক্তির কার্য্য আমরা দেখিতেছি, উহাদের মূলে চেতনেরই ইচ্ছা, সেই চেতন জীবও হইতে পারেন অথবা স্বয়ং পরম চেতনও হইতে পারেন। এই সম্পর্কে "কল্পবাদ" অংশে লিখিত বিষয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একমাত্র পরম চেতনের ইচ্ছায়ই জগৎ চলিতেছে। কারণ, জীবের ইচ্ছাও ত সেই অনন্ত ইচ্ছাশক্তির অংশ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং জীবের ইচ্ছার মূলেও সেই পরম চেতনের ইচ্ছাশক্তিই বর্ত্তমান। সকল কার্য্যই [গতিক্রিয়া সহ] সেই একমাত্র পরব্রহ্মের ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায়ই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছায়ই ইহা স্থিত হইতেছে এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই ইহা এককালে সুদূর ভবিষ্যতে লয় প্রাপ্ত হইবে। (৩) <u>জীব জীবনের প্রথম আরম্ভ</u>:—"সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে আমরা এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে পৃথিবী যখন যে প্রকারের জীব সৃজন ও পালনের উপযুক্ত হইয়াছে, তখনই সেই সেই প্রকারের জীবদেহ পরম পিতার ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মই নানা জীবদেহ যোগে অংশ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। পাঠক সেই সকল আলোচনা পাঠ করিলেই এই সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিতে পারিবেন। এস্থলে আর উহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না। জীবের উৎপত্তি জড়ের Physical and chemical action-এর ফলে সম্ভব হয় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। এই সম্পর্কে "জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব" অংশও দ্রষ্টব্য। (৪) <u>উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃতিতে উপায় অবলম্বিত হয় কেন?</u> —এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সৃষ্টির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। এই সৃষ্টির একজন কর্ত্তা আছেন এবং ইহার একটী মহদুদ্দেশ্য বর্ত্তমান। সেই উদ্দেশ্যই ব্রহ্মের স্বরূপ পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায়ে বিশেষভাবে

"সৃষ্টির সূচনা" অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই তাঁহার সুমহতী ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া মাত্র। আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে সৃষ্টি যেমনি প্রেমময়ী, তেমনি উহা জ্ঞানমণ্ডিতা। ইহা সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা চালিত। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সৃষ্টিতে যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হইবে, কোন কার্য্যই কখনই সেই উদ্দেশ্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হইবে না, অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ী ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত সৃষ্টি-কার্য্য কখনই বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতে পারে না। "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টিতে মঙ্গল বই অমঙ্গল ছিল না, নাই বা থাকিবে না। Plato এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এই সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে কেবল মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে (For the realisation of some good)। সুতরাং প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ আকারে সেই মঙ্গল উদ্দেশ্যের জন্যই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ, এই বিশ্বের স্রষ্টা একজন অনন্ত মঙ্গলময় পুরুষ। তিনি নিত্য শিব। সুতরাং তাঁহার দ্বারা কৃত কার্য্য তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন জন্যই সম্পন্ন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? Plato এবং Aristotle উভয়ই teleology অর্থাৎ একটী মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য এই বিশ্ব সৃষ্ট ও পুষ্ট, ইহা বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য বহু দার্শনিকও এই মতের পক্ষপাতী। আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণও (Biologists) এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য আছে। সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য স্বীকৃত হইলেই (এবং তাহা অস্বীকার করিবার সুযোগও নাই, কারণ, কার্য্য মাত্রেই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান) ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ রূপ কার্য্যের মঙ্গল অংশই সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির

জন্যই সংঘটিত এবং জগৎ সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সৃষ্ট ও পুষ্ট এবং পরিণামে সেই মহদুদ্দেশ্য এককালে পরিপূর্ণ হইবেই। পরমেশ্বরের ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং পরিণতির পূর্ব্বের কার্য্য সমূহও সেই ভাবেই সম্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই প্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই যে কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য সর্ব্বদাই কার্য্য হইতেছে। আমরা ইহাও বহু স্থলে দেখিয়াছি যে জীবে ও জড়ে এক বিধানই কার্য্য করিতেছে। সুতরাং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সৃষ্ট জড় জগৎও সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নিয়ত কার্য্য করিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে One God, One, Law, One Universe.

(৫) অনুভূতি ও সংজ্ঞার মূল এবং (৬) যুক্তিযুক্ত জ্ঞান ও উহার সর্ব্ব প্রসারী আনুষঙ্গিক বাক্যের মূল:—আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ," "চিদাভাস," এবং "জ্ঞানতত্ত্ব" অংশত্রয়ে এই দুই সমস্যার অধিকাংশেরই মীমাংসা লাভ করিয়াছি। একমাত্র ৬ষ্ঠ সমস্যার শেষ ভাগের আলোচনা হয় নাই। তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের পাঠক এত সময় বুঝিতে পারিয়াছেন যে জীব অর্থে দেহ+আত্মা। দেহ জড় এবং আত্মায় অনন্ত গুণ বর্ত্তমান, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত বলিয়া উহারা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে প্রকাশমান। আত্মাই চৈতন্য স্বরূপ এবং উঁহাই দেহের চালক। আমরা "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে অন্তঃকরণ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাইয়াছি যে আত্মার জ্ঞানাদি গুণরাশি এবং ইচ্ছাশক্তি অন্তঃকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণ ভূত সমূহের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত বলিয়া উহাতে আত্মার গুণ ও শক্তি প্রতিফলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে। মস্তিষ্ক অন্তঃকরণের যন্ত্র মাত্র। সুতরাং অন্তঃকরণকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়। উহার এক ভাগ আত্মিক ও অন্য ভাগ পাঞ্চভৌতিক। অন্তঃকরণ আত্মার কার্য্য ক্ষেত্র। সুতরাং আত্মা দেহে

না থাকিলে অন্তঃকরণের কোনই কার্য্য হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মাই সমুদায়। তাঁহার জ্ঞানই জড় সংসর্গে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে নানা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। যে হৃদয় যত তমঃসাহয় সেই হৃদয়ে বিকৃতির পরিমাণ ততোহধিক। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে আত্মার জ্ঞানই বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহংকার ভাবে অথবা পাশ্চাত্য ভাষায় Sensation, Consciousness, Rational thought and Judgment প্রভৃতি ভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আত্মার জ্ঞানই উহাদের মূলে। এখন আমরা বাক্যের মূল কোথায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি। বাক্য উচ্চারণ করিতে কণ্ঠ, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও মুখের প্রয়োজন বটে। ফুসফুসেরও শক্তি থাকা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুখই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান যন্ত্র। এই জন্য মুখকে বাক্ যন্ত্র বা বাগিন্দ্রিয় বা কেবল মাত্র বাক্ বলা হয়। এই মুখ আমাদের একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান। আমরা সৃষ্টিতত্ত্বে দেখিয়াছি যে বাগিন্দ্রিয় ব্যোমের রজোংশ প্রধান ভাবে গঠিত। ব্যোমের গুণ শব্দ। সেই জন্য ইহাতে শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তি বর্ত্তমান। অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণরূপ কর্ম্ম উহা করিতে সমর্থ। আমরা দেখিয়াছি যে অন্তঃকরণের যন্ত্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক পঞ্চভূতের সত্বাংশ প্রধান ভাবে গঠিত। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অন্তঃকরণেরই চিন্তা করিবার অধিকার আছে। ইচ্ছাশক্তিও অন্তঃকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যখন অন্তরে ইচ্ছার উদয় হইবে, তখন যে ভাবের ইচ্ছা হইবে, সেই ভাবের কর্ম্ম উপযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ যখন কিছু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়, তখন হস্ত দ্বারা সেই কার্য্য করা হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানের গমনাগমনের ইচ্ছা হইলে পাদ সেই অনুযায়ী কার্য্য করিবে, মল মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হইলে পায়ু অথবা উপস্থ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে; সেইরূপ হৃদয়ে যখন ভাবরাশি উপস্থিত হয়, তখন হৃদয় দেশে তাহার

উপযুক্ত অনুভূতি লাভ করি। সেইরূপ আমাদের কোনরূপ হৃদয়স্থ ভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলে আমরা তাহা মুখ দ্বারা বাক্য রূপে প্রকাশ করি। ইংরেজীতে একটী কথা আছে—When the heart is full, the mouth speaketh. অর্থাৎ যখন হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, তখন আমরা কথা কহি। আমরা যদি নিজ নিজ জীবন একটু আলোচনা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে আমাদের হৃদয়ে এমন সকল ভাব উপস্থিত হয় যে তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। এমনও দেখা যায় যে হৃদয়ে কোনও দুঃখ বা আনন্দ উপস্থিত হইলে আমরা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া পারি না এবং সময় সময় ঐরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে হৃদয় শান্ত হয় না। আমাদের ইচ্ছা বাহিরে কর্ম্মরূপে প্রকাশ করিবার জন্য অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা আমাদের দেহে যে সকল যন্ত্র দিয়াছেন তাহাদের সাহায্যেই আমাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং মুখ শব্দ প্রকাশের একটী যন্ত্র মাত্র এবং উহার মূলে অন্তঃকরণের চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা অর্থাৎ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করিবার প্রধান কর্ম্মেন্দ্রিয় আমাদের বাক্ যন্ত্র। সুতরাং উহার মূল চিন্তা করিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মাই উহার মূলে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে অন্তঃকরণকেই উহার মূল বলা যায়। আমরা মুখ দ্বারা আমাদের হৃদয়ের প্রকাশক যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহাই ভাষা নামে ব্যবহৃত হয়। ভাব প্রকাশক শব্দ নানাদেশে নানা আকারে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এক এক দেশে এক এক ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। পশু পক্ষীগণেরও ভাষা আছে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে আমাদের ভাষা দ্বারা হৃদয়ে সকল ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিতে পারি না। তাই পরমপিতাকে অবাঙ্‌মনোগোচর বলা হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যেমন ব্যোম বর্ত্তমান, সেইরূপ নিখিল জীব জন্তুর ভাষার মূলেও একটী সূক্ষ্মতী ভাষা আছে,

যাহা দ্বারা হৃদয়ের ভাব প্রায় পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা যায়। উহাকে বৈজিক ভাষা কহে। সেই সম্বন্ধে "ব্যোমের অস্তিত্ব" অংশে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। প্রচলিত ভাষা সমূহ উহারই অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার মধ্যে যে ভাষা বৈজিক ভাষার যত নিকটবর্ত্তী, সেই ভাষা হৃদয়ের ভাব তত সরল ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্র পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষীয় মহাসাধকগণ বৈজিক ভাষা জানিতেন এবং পরমর্ষি ভোলানাথ বৈজিক ভাষায় দীক্ষা দান করিতেন। (৭) স্বাধীন ইচ্ছার সম্ভাবনা:—প্রশ্ন হইতেছে যে স্বাধীন ইচ্ছা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? "গুণ বিধান" ও "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মা স্বরূপে ব্রহ্মই। পরমাত্মা অনন্ত স্বাধীন। এই জন্যই ব্রহ্মকে ইংরেজীতে Absolute বলা হয়। পরমাত্মা স্বেচ্ছায় জীবাত্মা ভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবাত্মাও অংশতঃ স্বাধীন। জীবাত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই সীমাবদ্ধ হয়, অপূর্ণতায় পরিণত হয়। তাঁহার অনন্ত গুণ জীবে বর্ত্তমান থাকিলেও দোষপাশের আবরণের জন্য তাহা বীজাকার প্রাপ্ত। স্বাধীনতাও তাঁহার অনন্ত গুণের একটী গুণ। সুতরাং জীবের স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ এবং অতিশয় ক্ষুদ্র। তাই তাহার ইচ্ছা পদে পদেই পরাভূত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সে স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারে ও করে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলে জড়ের ন্যায় অন্য দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিতাম বটে, কিন্তু সেই সকল কর্ম্মকে সৎ (পুণ্য) বা অসৎ (পাপ) আখ্যা দেওয়া হইত না। জড় দ্বারা যখন পরের উপকার করা হয়, তখনও যেমন সেই জন্য উহা দায়ী নহে, আবার যখন সেই জড় দ্বারা অন্যের অপকার করা হয়, তখনও উহা দায়ী হয় না। জড়ের চালকই উক্ত উভয় প্রকারের কার্য্যের জন্য দায়ী হন। আমাদের স্বাধীনতা না থাকিলে সদসৎ কোন

কর্মের জন্যই আমাদের দায়িত্ব থাকিত না, আমাদের পাপ পুণ্য হইত না। সুতরাং আমরা শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করিতাম না। সুতরাং আমাদের উন্নতি বা অবনতির প্রশ্নই উপস্থিত হইত না। আমরা স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম করি বলিয়াই আমরা পাপ পুণ্যের ভাগী হই, আমাদের উন্নতি বা অবনতি সম্ভব হয়। প্রস্তর খণ্ডের কোনই স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাই উহাদের উন্নতি বা অবনতি নাই বা হইতেও পারে না। অপর পক্ষে স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত সাধনা দ্বারা অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে মানুষ অগ্রসর হইতেছেন অপূর্ণকে পূর্ণ করিবার জন্যই এই সৃষ্টি-লীলা সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের সকল সজ্ঞান ও অজ্ঞান সাধনার গতি আমাদিগের পূর্ণত্ব দান করিবার জন্যই। এই জন্যই পরমপিতার নাম হইয়াছে—"সাধনের ধন"। এই সম্পর্কে 'সৃষ্টি সাদি কি অনদি অংশে ১০২-১০৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ পাঠক স্মরণ করিবেন। তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমাদের উন্নতি এবং অবনতি নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত কর্ম দ্বারা উপার্জ্জিত হয়। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন : "স্বকর্মে বাঁচা মরা"। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, তবে পরমেশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা কি উহা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর বুঝিতে "গুণ বিধান" অংশে জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিত বিষয় পাঠক স্মরণ করিবেন। জীবাত্মার সকল গুণই একমাত্র পরমাত্মারই গুণ। জীবে আমরা জ্ঞান, প্রেম, সরলতা প্রভৃতি যাহা দেখিতেছি, তাহা পরমাত্মারই গুণ। পরমাত্মার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটী গুণই এক ও অখণ্ড এবং সেই সকল গুণই একমাত্র তাঁহাতেই আছে, অন্যত্র কোথায়ও নাই। জীবে যে সকল পরমাত্মার সরল গুণ দেখিতে পাই, তাহা পরমাত্মারই গুণ, তাঁহার (জীবের) নিজস্ব কোন সরল গুণ নাই। জীব দেহ-বাসী এবং তজ্জন্য দোষ পাশ আবরণে আবৃত বলিয়া পরমাত্মার গুণই অপূর্ণ ও বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়।

সাধারণের মধ্যে উহা এতদূর বিকৃতি ও অপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যে উহাদিগকে গুণের আভাস মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়। যিনি দোষপাশরাশির আবরণ যতদূর উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার গুণরাশিও পূর্ণত্বের দিকে ততদূর ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি স্বাধীনতা বিরোধী আবরণ যতটুকু উন্মোচন করিয়াছেন, তাহার স্বাধীনতাও ততটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইটুকু বুঝিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা সুলভ হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, কিন্তু দেহাবরণে আবৃত বলিয়া ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান অথবা পরমাত্মাই দেহাবরণে আবৃত হইয়া বহুভাবে সুতরাং সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতা যখন এক ও অখণ্ড, তখন জীবের স্বাধীনতা ও পরমাত্মার স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবের মধ্যে বিকৃত ও অপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম দেখিয়া আমরা যখন বলি না যে জীবে জ্ঞান ও প্রেম নাই, সেইরূপ জীবের স্বাধীনতাও অপূর্ণ ও বিকৃত বলিয়া আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে পারি না যে জীবে স্বাধীনতা নাই। জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণও যেমন পরমাত্মার গুণ, স্বাধীনতাও তাঁহার সেইরূপই একটী গুণ বুঝিতে হইবে। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। স্বাধীন ইচ্ছা পরমধন। কর্ম্মের দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে স্বাধীন ইচ্ছা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। ইহা আমাদের অমূল্য সম্পত্তি। ইহার আধিক্য জন্যই মানবে ও পশুতে, মানবে মানবে, মানবে এবং দেবে, এমন কি দেবতায় দেবতায় পার্থক্য। ইহারই সদ্ব্যবহারে পশুত্ব হইতে দেব পদবীতে উন্নীত হওয়া যায় এবং পরিশেষে পরব্রহ্মে তন্ময় হওয়া যায়। আবার ইহারই অপব্যবহারের বা বিকৃত ব্যবহারের অপর নাম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই নরকে দ্রুত পতন সম্ভব হয়। এই মহাধন যে পরম প্রেমময় পরমপিতা আমাদিগকে দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন,

ইহার জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম সমূহ বহু সময়ে অন্যায় এবং পাপে পরিপূর্ণ। অনন্ত স্বাধীন ব্রহ্মের অংশ দ্বারাও ঐরূপ অন্যায় কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। ইহার উত্তর ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণ সমূহ বিকৃত হইলে যেরূপ উহাদের বিকৃত অংশ দ্বারা অন্যায় ও পাপ সংঘটিত হইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃত স্বাধীনতারও বিকৃত অংশ দ্বারা পাপ এবং অন্যায় সংঘটিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে "মায়াবাদ" অন্তর্গত "চিদাভাস" অংশে লিখিত বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জীবাত্মা কখনও দোষপাশ দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, সুতরাং দোষপাশের ফল স্বরূপ পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবাত্মার ইচ্ছা কখনও দুষ্টা নহে এবং উহা কখনও ব্রহ্মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় না। জীবের যত কিছু অন্যায়, তাহা তাঁহার হৃদয়ের দোষেই উৎপন্ন হয়। জীবাত্মার যাহা প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা, তাহা সর্ব্বদাই পরমাত্মার অনন্ত স্বাধীন ইচ্ছার অন্তর্গত—তাঁহার ইচ্ছার নিকট চির অবনত। অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা এক ও অখণ্ড, জীবের দেহ সংসর্গে আসিয়া তাহাই বিকৃত হইয়া নানাভাবে—কখনও সদিচ্ছা ভাবে এবং কখনও উচ্ছৃঙ্খলতা ভাবে প্রকাশিত হয়। জীবের স্বাধীন ইচ্ছা যে ব্রহ্মের অনন্ত স্বাধীন ইচ্ছার অন্তর্গত, তাহা আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও অনুভব করিতে পারি। আমরা অনেক কর্ম্ম আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা দ্বারা সম্পাদন করিতে পারি বটে, কিন্তু আবার আমাদের অনেক কর্ম্মও শত চেষ্টায়ও সুসম্পন্ন হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে জীবের ইচ্ছার উপরে অন্য মহত্তরা ইচ্ছা সর্ব্বদা বর্তমান। আবার আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাও যে ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ, তাহাও আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ভক্তি-ভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের স্বাধীনতাকে বদ্ধ

গৃহে স্থাপিত শিশুর স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করিতেন। শিশুর স্বাধীনতা যেমন সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকুতেই আবদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতাও তেমনি আমাদের উন্নতি অনুযায়ী অল্লাধিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শিশুর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, এখন ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব Viceroy and Governor General সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু বিধানের বহির্ভূত কার্য্য করিলে তাঁহাকেও ফল ভোগ করিতে হইত। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। অতএব উক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জীবের স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু উহা জীবে সীমাবদ্ধ, কাহারও কাহারও পক্ষে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সকল জীবেই উহা অল্লাধিক বিকৃত ও অপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়। ইহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে স্বাধীনতা এক, অখণ্ড, অনন্ত ও পূর্ণ এবং তাঁহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। তাঁহাই জীবে জীবে দেহ সংসর্গ জন্য অপূর্ণ ও বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, যেমন ব্রহ্মের অন্যান্য স্বরূপেরও দেহ সংসর্গে জীবে অপূর্ণ ও বিকৃত প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। এস্থলে বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনাই অতি-সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাঠক গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয় সমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন। উহাতে যে সকল অংশের উল্লেখ আছে, তাহা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। আমাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে গ্রন্থে সপ্ত সমস্যার যুক্তিযুক্ত সুচারু মীমাংসা বর্ত্তমান।

ওঁ অনন্ত-জ্ঞান-প্রেমময়ং সর্ব্বকারণং লীলাময়ং পরমেশ্বরম্ ওঁ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

পর পৃষ্ঠায় তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ

তৃতীয় খণ্ড

ওঁ

—*:※:*—

বৈজ্ঞানিক! ও বিজ্ঞানে অনন্ত সুখ বিধানে নাহি পারে, ইহা জেনে হওহে সত্বর। হে বীর! বাহিরে বৈরি, নাশিবারে যত্নকারী, অন্তরে প্রবল অরি, দরশন কর॥ সর্ব্বদা হতেছে জিত, তবু পরে পরাজিত করিবারে কর জিদ, এবুদ্ধি কেমন। যে তোমারে করে জয় তারে কর পরাজয়, তবে হবে সুখোদয়, শুন বীরগণ॥ হে বুধ! বিদ্যার তরে, শরীর পাতন ক'রে, অহর্নিশ শাস্ত্র করে করিছ ধারণ। 'অপরা'র সমুন্নতি অজস্র বাঞ্ছিত অতি, পরা বিদ্যা কিন্তু গতি, তুলনা কথন॥ হে ধার্ম্মিক! ধর্ম্মধনে ল[illegible]রে সযতনে বাধা দেয় ক্ষণে ক্ষণে যশের আশায়। ভুলে গিয়ে তাই যশে মজ মজ ধর্ম্ম রসে, দুঃখ লৌকিক অযশে কিবা আছে হায়। লোক কাছে সুনিন্দিত ঈশ কাছে অনিন্দিত হেন মহত চরিত সুপূজিত হয়। নিন্দা ভয় ছাড় তাই, ভজ ভজ ধর্ম্ম ভাই, তা হ'লে পাইবে ধ্রুব ধর্ম্ম মধুময়॥ (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

ধর্ম্ম ও জড় বিজ্ঞানের বিরোধ

জড় বিজ্ঞান জড় সম্বন্ধেই আলোচনা করে। উহা কখনও মানবের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে, ততোঽধিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। ধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রসারী। উহা জড় এবং আত্মা উভয় সম্বন্ধেই চিন্তা করে, কিন্তু উহা আত্মা সম্বন্ধেই আলোচনা প্রধান এবং তাহা সাধনা করিতে যাইয়াই মানবের দৈহিক ও নৈতিক, ঐহিক ও পারত্রিক জীবন সম্বন্ধেও আলোচনা করে।

সুতরাং স্থূল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে বিজ্ঞান জড়ের তত্ত্ব আলোচনা করে ও প্রচার করে মাত্র, কিন্তু ধর্ম্ম সাধনে সাধকের হৃদয়ে আত্মার তত্ত্ব সমূহ এবং সাধনার প্রণালী প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মের অনন্ত গুণ হৃদয়ে বিকশিত হয়, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জড় বিজ্ঞান জড়কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে এবং জড়ের গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সংসাধন করে। জড় প্রকৃতির শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া বিজ্ঞান যে কত অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য নিচয় সংসাধন করিতেছে, তাহা আর আজ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। কেহই তাহাতে অবিশ্বাসী হইতেছেন না বা অবিশ্বাসী হইতে পারিতেছেন না। কারণ, প্রত্যক্ষ সত্যে অবিশ্বাস করিবার সুযোগ কোথায়? যে ধর্ম্ম সত্য, তাহা এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্য যাহা, তাহাদের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু এক শ্রেণীর ধার্ম্মিক আছেন, যাহারা বিজ্ঞানকে সেরূপ ভাল চক্ষে দেখেন না। তাঁহারা মনে করেন যে বিজ্ঞান লোকের হৃদয় হইতে ভক্তি ও বিশ্বাস দূর করিতেছে। যাহা সত্য, তাহা প্রচারিত হইলে যদি অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হয়, তবে সেই সত্য আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হওয়াই একান্ত প্রয়োজনীয়। হইতে পারে যে, যে প্রণালীতে অর্থাৎ যে অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া ভক্তি সাধন চলিতে ছিল, তাহা কিছু দিনের জন্য মন্দ গতিতে চলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য প্রচারে বাধা দিতে কাহারও বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই, আমাদের সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে, সত্য তত্ত্ব সমূহ সাধন করিতে হইবে, সত্যই আমাদের জীবনের মূল মন্ত্র হইবে। যাহা সত্য, তাহা চিরকাল স্থায়ী, কিন্তু মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী মাত্র।

এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ দার্শনিক জ্ঞান, সত্য জ্ঞানেরও বিরোধী। ইহার কারণও ঐ একই। পরমর্ষি গুরুনাথ লিখিয়াছেন:—"যে দর্শন শাস্ত্র শাস্ত্র জগতে সম্রাট্, গুরুবৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুর ন্যায় হিতোপদেশক; এবং যে দর্শন শাস্ত্র দেহাত্মভেদ প্রভৃতি পরম জ্ঞান প্রচার দ্বারা দেহে আত্মবোধী মানববর্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছে, তাহার মহিমা বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্রাংশে অসম্ভব।" "যে দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান লাভের মূল কারণ, যাহার বিচার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট এবং উহার আভাস মাত্র অবলম্বন করিয়া যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংঘটিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার পূর্ণ দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করেন। জ্ঞানের নিকট হইতে আমাদের বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে না, বিচার পরিত্যাগ করিতে হইবে না, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যরূপ প্রমাণ সমূহ অগ্রাহ্য করিতে হইবে না, আমাদের ঐকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে "যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তি সাধনার মূল ভিত্তি সত্যই হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভিত্তি অসত্য হইলে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয় যে কোন সময় সৌধ ধসিয়া পড়ে। সত্য যখন ব্রহ্মের একটী প্রধান স্বরূপ এবং যখন তাঁহার সকল গুণই নিত্য সত্য, তখন সত্য, তত্ত্ব লাভ হইলে ভক্তি সাধনার বাধা জন্মিবে কেন? * বরং অসত্য ভিত্তি হইলেই তাহা সাধককে বিপথে নিয়া যাইতে পারে। সত্যধর্ম্ম যাহা, তাহা বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। কারণ, তাহাতে অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত প্রেমময়,

---

* 'দ্বন্দ্বীয় বিপরীত পক্ষের মিলন' অংশে সত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বর্ত্তমান।

অনন্ত মহিমাময়, অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার জ্ঞান, প্রেম আদি গুণ ও মহিমাই দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ গত মহাযুদ্ধদ্বয়ের কথা এবং নানাবিধ মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানের দুরবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে বস্তু যত উপকারী, তাহারই অপব্যবহারে তাহা তত অপকারী হইয়া উঠে। প্রত্যেক পদার্থে যে বিপরীত গুণদ্বয় বর্ত্তমান তাহা "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে আমরা দেখিয়াছি। যে দুগ্ধ মহাউপকারী, তাহাই অবস্থা বিশেষে মহা অপকার সাধন করে। মানুষ সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। যে যত নিকট আত্মীয়, সে বিরূপ হইলে ততোঽধিক অনিষ্ট করিতে পারে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অর্থ অনর্থের মূল অনেকে বলেন বটে, কিন্তু অর্থভিন্ন সেই সকল বক্তাদের একদিনও চলে না। পৃথিবীতে কয়টী সংপ্রতিষ্ঠান অর্থ ভিন্ন পরিচালিত হইতেছে? অর্থের সদ্ব্যবহারে যেমন উপকার হয়, অসদ্ব্যবহারে তেমনি মহানিষ্ট ঘটে। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই একই বিধান কার্য্য করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিজ্ঞান দায়ী নহে, উহার অপব্যবহারই দায়ী। আবার যুদ্ধ চিরদিনই হইয়া আসিতেছে, চিরদিনই কুরুক্ষেত্র এবং Flanders দেশ বিদেশে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। লোকক্ষয়ও যে পূর্ব্বে অত্যল্প হইত অথবা নির্দ্দোষ শিশু এবং স্ত্রীলোকের প্রতি যে অত্যাচার না হইত, তাহা নহে। এ বিষয়ে সকল ইতিহাস পাঠকই সাক্ষ্য দিবেন। সেই সময় ত বিজ্ঞানের এত প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল না। তবে কেন বিজ্ঞানের এত নিন্দা? যে বিজ্ঞানের জন্য পৃথিবী সভ্যতার দিকে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে ও সাম্যের দিকে ধীরে ধীরে চলিতেছে, যে বিজ্ঞান ব্যতীত আমরা আজ জীবন ধারণ করিতে পারি না, যে বিজ্ঞান দেশ কালের ব্যবধান অত্যধিক ভাবে হ্রাস করিয়াছে এবং আরও অধিক পরিমাণে হ্রাস করিবে বলিয়া আশা করা যায়, অধিক কি, যে বিজ্ঞান শত সহস্র তথ্য আবিষ্কার করিয়া

পার্থিব জ্ঞানের আলোক প্রস্ফুটিত করিতেছে ও "ভূলোককে পক্ষান্তরে দ্যুলোকবৎ করিয়াছে," সেই বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র মহৌষধ উহাকে ধর্ম্মে মণ্ডিত করা। বিজ্ঞান পশুত্বের গ্রাম হইতে মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের এবং তৎপর দেবত্বের গ্রামে বহন করিয়া লইতে পারে না। বোধহয় বিজ্ঞান তাহা দাবীও করে না। কেহ বলিতে পারেন যে বিজ্ঞানালোকে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা কি মনুষ্যকে সভ্যতার স্তরে উপনীত করায় নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানের গতি ঐ পর্য্যন্তই। ধর্ম্ম উহার পশ্চাতে না থাকিলে যে উহা দ্বারা মহানিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগই তাহার সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। সভ্যতাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় নহে। মনুষ্য জীবনে যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিতে সভ্যতা অত্যল্প পথই অগ্রসর করিয়া দেয়। বিজ্ঞান কখনও কোনও মনুষ্যকে তাঁহার যাহা প্রধান সম্বল অর্থাৎ নৈতিক বল, ধর্ম্ম বল ও আত্মিক বল প্রদান করে না বা করিতেও পারে না। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান একত্র হইলে এবং বিজ্ঞান ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইলে বর্ত্তমানে আমরা বিজ্ঞানের প্রতি যে কারণে দোষারোপ করিতেছি, তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং এই যোগে যে পৃথিবীর মহোপকার সাধিত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা ধর্ম্মকে গ্রাহ্যই করেন না, এমন কি, পরমেশ্বরে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী নহেন। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়া পরম জ্ঞানময় পিতার মহিমা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি গুণ কেহ না দেখিতে পারিল, তবে সে বিজ্ঞানের বিস্তারে কি লাভ হইল? তাহা কি নিষ্ফল ভারবহন মাত্র নহে? পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আমরা প্রকৃতির অধ্যয়নে বহু ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারি। অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতা তাঁহার নিজ হস্তে অভ্রান্ত লিপিতে নিজ পরিচয় প্রকৃতিতে

লিখিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তাহার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা দ্বারা সেই তত্ত্বসমূহ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে আবিষ্কার করিতে পারেন ও তাহা দ্বারা মহাধনে ধনী হইতে পারেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষে অপরা বিদ্যা পরাবিদ্যা লাভের হেতু হইতে পারে। এই সুযোগ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যত সুলভ, অন্য সাধারণের পক্ষে তত সুলভ নহে। আর বিজ্ঞানই বল, দর্শনই বল অথবা ধর্ম্মই বল, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে আমরা সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হইব। সৃষ্টির একটী অতি সুমহান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান এবং সেই উদ্দেশ্য প্রত্যেক জীবের জীবনে সংসাধিত হইবেই। ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে দেখিতে পাইয়াছি। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যে বিভাগই অসদ্ব্যবহার দ্বারা বাধা উৎপাদন করিবে, সেই অসদ্ব্যবহার জনিত কার্য্যই উপেক্ষার বস্তু হওয়া উচিত, নতুবা কোন বিভাগই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে। জীবনের উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব সুখ সম্ভোগ নহে। ইহ সর্ব্বস্বতা আমাদিগকে বিপথেই টানিয়া লইয়া যাইবে। Plain living and high thinking-ই আমাদিগকে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর-করিয়া দিবে। বিজ্ঞান জগতের আদি ইতিহাস হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিজ্ঞানের বহুমত ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইতে হইতে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রে যদি কোথায়ও কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে, তবে সেই জন্য উহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে না। ভুল ভ্রান্তিই বর্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্র বর্জ্জন করিতে হইবে না। ইহা ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযোজ্য। দর্শন যেন জড়কে Mental state (মানসিক ভাব মাত্র) অথবা মায়া বলিয়া উড়াইয়া না দেন। দার্শনিক যেন মনে রাখেন যে পরমেশ্বরই জড়জগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং অনাদি অনন্ত না হইলেও সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে মহাপ্রলয়ের

শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং তাহা সেই অর্থে সত্য। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" এবং "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ দ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবার বৈজ্ঞানিকগণ যেন ধর্ম্ম এবং দর্শনকে তুচ্ছ না করেন। বৈজ্ঞানিকগণ যেন মনে রাখেন যে বিশ্বের তুলনায় একটী অতি ক্ষুদ্র বিন্দু সম পৃথিবী মণ্ডলে প্রকাশিত সৃষ্টি প্রণালী লইয়াই তিনি সাধনায় ব্যস্ত থাকেন। কেহ বলিতে পারেন যে বিজ্ঞান ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের আলোচনাও করেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞান অদ্য পর্য্যন্ত কয়েক কোটী মাত্র নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে লিখিত মণ্ডল সংখ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই সংখ্যা (কয়েক কোটী নক্ষত্র) বিশ্বের সকল মণ্ডল সংখ্যার তুলনায় সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। আবার বিজ্ঞান সেই সকল মণ্ডল সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা সেই সকল মণ্ডল সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। (Infinitesimal fraction of the total knowledge about those spheres) এই সম্পর্কে "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে উদ্ধৃত Sir James Jeans-এর উক্তি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বিশ্ব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও অজ্ঞ অপর পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, বিশ্বের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দান করে। এমন কি, শেষে বিশ্বের অতীত অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে এবং তাঁহাতে নিত্য যুক্ত হইয়া থাকিবার সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে সত্যধর্ম্মে দীক্ষা-র্থী'র পক্ষে বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। সত্যধর্ম্ম লিখিত বিশ্বে স্থিত সকল জীবকে অভেদ জ্ঞান করিতে এবং পরিশেষে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণনিধান অনন্ত প্রেমময়ের অন্তর্গত হইয়া চিরকাল অনন্ত জ্ঞানানন্দসাগরে এবং অনন্ত প্রেমানন্দ পারা-

বারে সুবিনিমগ্ন হইয়া থাকিবার উপদেশ দান করেন, সত্যধর্ম্মে অনন্ত কালের অনন্ত সাধনীয় অনন্ত জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ আছে। সুতরাং ধর্ম্ম খেলার বা অবহেলার বস্তু ত নহেই, অপর পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র ধন, যাহার সাহায্যে আমরা বিশ্বের সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারি, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধনা করিতে পারি এবং পরিশেষে পূর্ণামুক্তি লাভ করিতে পারি। আমাদের মনে হয় যে এই বিরোধের মূল কারণ এই যে এক বিভাগ অন্য বিভাগের সাধনায় তৎপর নহেন। বৈজ্ঞানিক তাহার বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করিতে যেরূপ কঠোর সাধনা করিতেছেন, তাহার সহস্রাংশের একাংশ সাধনা না করিয়াই অথবা সদ্গুরুর উপদেশ লাভ না করিয়াই তিনি ধর্ম্মের নানাতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন হালকা মত প্রকাশ করেন যে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যদি উভয় বিভাগ পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ও তাহা আয়ত্ত করিতে সাধনা করেন, তবে এই বিরোধ অচিরেই শেষ হইতে পারে এবং জগতের মহদুপকারের কারণ-স্বরূপ হইতে পারে অথবা জগৎ যে শুভদিনের প্রতীক্ষায় আছে তাহা এই মহামিলন কিঞ্চিৎ নিকটতর করিতে পারে।

ওঁং সত্যং জ্ঞানং প্রেমলীলাময়ং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

হৃদয়-মোহন তুমি হৃদয়ের পতি,
অনন্ত বিশ্বের তুমি একমাত্র গতি।
জ্ঞানের নিধান তুমি প্রেমের নিধান,
তোমার চিন্তনে নাথ সুশীতল প্রাণ।
(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে "আধ্যাত্মিক গুণ ও জড়ীয় গুণ" এবং "ধর্ম্ম ও জড় বিজ্ঞানের বিরোধ" অংশদ্বয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশে জ্ঞান ও ভক্তি নিয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে জ্ঞান কঠোর গুণ এবং ভক্তি ও প্রেম কোমল গুণ। প্রেম রসপূর্ণ জ্ঞানও অমৃত পূর্ণ, কিন্তু জ্ঞানামৃত আস্বাদন করা সুকঠিন। প্রেম কোমল গুণ বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট উহা সুলভ, কিন্তু জ্ঞান কঠোর গুণ বলিয়া অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি উহার সাধনা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আবার অল্পসংখ্যক সাধক জ্ঞানানন্দে মগ্ন থাকেন। অনেকের ধারণা এই যে জ্ঞান থাকিলে প্রেম উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে প্রেম ও ভক্তি সাধনার প্রারম্ভে যদি প্রেম বা ভক্তিভাজনের দোষগুলির সম্বন্ধে ধারণা সর্ব্বদা উজ্জ্বল ভাবে সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার পক্ষে সেই সেই পাত্রের প্রতি প্রেম এবং ভক্তি সাধনা কঠিন হয়। প্রেম এবং ভক্তি সাধনার একটী প্রধান অঙ্গই এই যে সাধক প্রেম এবং ভক্তির পাত্রের দোষ দর্শন করিবেন না। অবশ্য একত্র থাকিতে হইলে তাহাদের দোষের প্রতি দৃষ্টি না পড়িয়াই পারে না, কিন্তু সাধক যদি উহাদের সম্বন্ধে বিস্মৃতি সাধনা করেন, এবং উপেক্ষার চক্ষে দৃষ্টি করেন, তবে আর উহারা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। এই ত গেল ভক্তি বা প্রেম সাধনার প্রথমাবস্থার কথা। কিন্তু যখন প্রেম বা ভক্তি গভীরতা লাভ করে, তখন আর প্রেম বা ভক্তির পাত্রের সাধারণ সাধারণ দোষগুলি দৃষ্টি পথে আসিলেও উহাদের বৃদ্ধির বা স্থায়িত্বের পথে কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। যেমন চারা গাছটীকে রক্ষা করিতে হইলে উহাকে বেড়া দিতে ও অন্যান্য রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ প্রেম ও ভক্তির সাধনার প্রারম্ভিক

স্তরে বিশেষ সতর্কতা লইতে হয়। আবার সেই চারাগাছ যখন প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন যেমন মদমত্ত হস্তী অথবা প্রবল ঝড় উহার কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ প্রেম ও ভক্তি উচ্চগ্রামে উন্নীত হইলে প্রেমভাজন বা ভক্তিভাজন দোষ ত্রুটীর জ্ঞানও উহার কিছুই করিতে পারে না। জ্ঞান ও প্রেম যে একেই সম্ভব, তাহা বিশদ ভাবে বুঝিতে পারা যায়, যখন আমরা দেখি যে গভীর প্রেমে মিলিত দম্পতি পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞানী, সেরূপ আর কেহই তাহাদিগকে জানে না। কিন্তু তাহাদের সেইরূপ জ্ঞান তাহাদের গভীর প্রেম হ্রাস করিতে পারে না। আর সর্ব্বোপরি অনন্ত জ্ঞানময় পরমপিতা আমাদের সকল দোষ ত্রুটীই জানেন, কিন্তু তথাপিও তিনি প্রত্যেক জীবকে তাঁহার অনন্ত প্রেমে নিত্য অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের কখনও ক্ষয় বা লয় হয় না। প্রোক্ত কারণেই জ্ঞান ও প্রেমের বা ভক্তির বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই বিবাদ এখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে জ্ঞানমার্গাবলম্বী প্রেম বা ভক্তির নাম শুনিতে পারেন না ও আবার প্রেম অথবা ভক্তিমার্গাবলম্বী জ্ঞানের নাম শুনিতে পারেন না। জ্ঞান যে ঈশ্বর ভক্তির লাভের অন্তরায় বলিয়া কথিত হয়, তাহার কারণ এই যে নানা ব্যক্তি নানা কূটতর্ক দ্বারা নানারূপ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত করে। সাধকেরও প্রথমাবস্থায় জ্ঞান এতদূর উন্নত থাকে না যে তিনি বিচার দ্বারা মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া সত্য গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি অনেক সময় মোহগ্রস্থ হইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যায় যে অজ্ঞানই প্রেম ও ভক্তি পথের অন্তরায়, কিন্তু সত্য জ্ঞান নহে। আমরা যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করি, তবেই বুঝিতে পারিব যে মানুষ জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্ম এই তিনের একটীও বাদ দিয়াও জীবন যাপন করিতে পারেন না। মানুষকে যদি একটী দেহভাবে কল্পনা করা যায়, তবে জ্ঞান উহার মস্তক, প্রেম উহার হৃদয় এবং

কর্ম্ম দেহের অন্তর ও বাহিরের কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে কিছু সময় বাঁচিয়া থাকা যায়। কোন কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় একেবারে না থাকিলেও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইলে কিছু সময় বাঁচিলেও বাঁচিতে পারা যায়, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইলে তৎক্ষণাৎই জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রেমকে আমাদের প্রাণ বলা হইয়াছে। একটী পূর্ণ মনুষ্য দেহ প্রস্তুত করিতে যেমন মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আমাদের প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে জ্ঞান ও প্রেম উভয় গুণেরই উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং কর্ম্ম করিতে হইবে। এই তি-টীর একটীকেও তুচ্ছ করিলে চলিবে না। যেমন হৃদ্‌যন্ত্র বিহীন, মস্তিষ্ক বিহীন ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বিহীন দেহ হইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান ভিন্ন, প্রেম ভিন্ন অথবা কর্ম্ম ভিন্ন একটী প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের চির বাঞ্ছিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। অর্থাং আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক উন্নতি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের মিলনেই সম্ভব হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই তিনেরই উৎকর্ষ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। "সৃষ্টির সূচনা" অংশে আমরা দেখিয়াছি যে পরম পিতার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, এবং সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি কার্য্যে প্রধান ভাবে নিযুক্ত আছেন। মানবের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? অবশ্য বলিতে হইবে যে উহারা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। অর্থাৎ মানব কঠোর গুণের, কোমল গুণের এবং শক্তির ক্ষুদ্র আধার। পুরুষে কঠোর গুণের এবং নারীতে কোমল গুণের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক নরনারীর কোমল ও কঠোর গুণের মিলন করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে জ্ঞানও পরিত্যাজ্য নহে, প্রেমও পরিত্যাজ্য নহে। আবার কর্ম্ম না করিলে, সাধনা না করিলে গুণের উন্নতি লাভ হয় না। সুতরাং আমাদের জীবনে

তিনেরই একান্ত প্রয়োজন। অনন্ত মঙ্গলময় পরমপিতার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা শক্তি আছে। জীবের আদর্শও তিনি। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতা লাভই জীবের পক্ষে সাধনা। সুতরাং যাহা পূর্ণে বর্ত্তমান, তাহা জীবেও বর্ত্তমান। উহাদিগের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। এই বিকাশ সাধনে উক্ত তিনটীরই একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে পাঠক "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশ পাঠ করিবেন। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের অনন্ত সংমিশ্রণে যে একটী অপূর্ব্ব গুণ হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। তাঁহাতে প্রেম ও জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নাই, অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময়ত্বই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ। যখন উহারা মিলিত হইয়া একটী মাত্র গুণ ভাবে ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান, তখন জ্ঞান ও প্রেমের বিরোধ যে একান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাহা বলাই বাহুল্য। পরমেশ্বর জ্ঞান-প্রেমময়। তাঁহার জ্ঞান প্রেম ছাড়িয়া নহে। এবং প্রেমও জ্ঞান ছাড়িয়া নহে। ইহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ভক্ত রজনী কান্ত গাহিয়াছেন :—"সে যে পরম-প্রেমসুন্দর, জ্ঞাননয়ন-নন্দন, পুণ্য-মধুর নিরমল জ্যোতিঃ জগতবন্দন।" পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার রচিত ব্রহ্মস্তোত্রে লিখিয়াছেন :—"সন্ প্রেমপুষ্পৈশ্চিরমর্চ্চয়ন্ত্যকং জ্ঞানীচ বোধামলবিল্বপত্রকৈঃ। কর্ম্মী চ কর্ম্মাগুরুচন্দনেন স্মরামি ত্বং সর্ব্বময়ং কৃপানিধিম্।" "বঙ্গানুবাদ :—সজ্জন যাঁহাকে প্রেম কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, জ্ঞানী যাঁহার জ্ঞানের পবিত্র বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করেন এবং কর্ম্মযোগী যাঁহাকে কর্ম্মরূপ অগুরু চন্দন দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্বময় কৃপানিধিকে স্মরণ করিতেছি।" সাধনা রাজ্যে যিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পথ কত কঠিন ও পরীক্ষা-সঙ্কুল এবং সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কতই প্রয়োজনীয়। যাত্রাপথে প্রতিপদে কত সমস্যাই হৃদয়ে উদয় হয়, উহাদের সরল ও প্রাঞ্জল মীমাংসা লাভের জন্য প্রাণ কতই ব্যাকুল হয়,

কিন্তু জ্ঞানের অভাবে উহারা অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়। অবশ্য একথা বলিতেই হইবে যে জ্ঞান সাধনার পথ প্রেম ও ভক্তি সাধনার পথ হইতে কঠিনতর। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানকে বর্জ্জন করিতে হইবে না অথবা যিনি জ্ঞান-মার্গের সাধক, তাঁহাকে তুচ্ছ করিতে হইবে না। এস্থলে ইহা অবশ্য কক্তব্য যে শুষ্ক কূট তর্কে পারদর্শিতাকে জ্ঞান বলিতে হইবে না। পাণ্ডিত্য বা যশঃ বা কূটতর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষকে জয় করাকে জ্ঞান কহে না। অপরা বিদ্যা জ্ঞান লাভের উপায় বটে, কিন্তু জ্ঞান সাধক সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে তাঁহার সকল বিদ্যাই যেন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের দিকে ধাবিত হইতেছে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে, পথে অপরা বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ততঃ কিছু জ্ঞান না থাকিলে সাধক কিরূপে নিজের পথ বাছিয়া নিয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাত্রা সুরু করিবেন? কেহ বলিতে পারেন যে বিশ্বাস করিলেই ধর্ম্ম পথ লাভ করা যায়। কিন্তু পথ ত সম্মুখে অনেক এবং প্রায় প্রত্যেক উপদেষ্টাই তাঁহার নিজের পথই একমাত্র পথ অথবা সর্ব্বপ্রধান পথ বলিয়া উপদেশ দেন। আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ ভক্তি পথাবলম্বী, কিন্তু বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্য্যগণের উপদেশের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দু ধর্ম্ম একটী, কিন্তু ইহাতে বিভাগ অসংখ্য প্রায়। খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৌদ্ধধর্ম্মেও বহু বিভাগ বর্ত্তমান। এখন সাধক কোন পথ গ্রহণ করিবেন? এই প্রশ্ন উদয় হইলে জ্ঞানই জিজ্ঞাসুর সাহায্য করিতে পারেন, অন্য কিছু নহে। ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে:—"নানা কথার ছলে নানা মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে।" এই সংশয় নিরাকরণের সহায় জ্ঞানই হইতে পারেন। মহাভারতে আছে:—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" 'বঙ্গানুবাদ:—যাহার মত ভিন্ন নহে, তিনি মুনি নহেন। মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই পথ।" এই মহাজন বাছিয়া লওয়া ত জ্ঞানের কার্য্য। নানা মহাজন নানা

পথে চলিয়াছেন। সেই পথের মধ্যে পথিকের উপযোগী কোন পথ, তাহা নির্ণয় করিতে জ্ঞানই একমাত্র সমর্থ। প্রথমতঃ নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই যতদূর সম্ভব বিচার করিয়াই মানবের গুরুবরণ করিতে হয়। অপর পক্ষে জ্ঞানের সাধক প্রেম ও ভক্তিকে কখনই তুচ্ছ করিবেন না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এই দুইটীই আমাদের প্রাণ। আমাদের আরও বুঝিতে হইবে যে প্রেম সাধনায় কৃতকার্য্য হইলে অন্যান্য গুণের সাধনা অপেক্ষাকৃত অনায়াস সাধ্য হয়। এই ত গেল জ্ঞান ও প্রেম গুণের কথা। যদি সাধনার বিষয় সমগ্র ভাবে চিন্তা করা যায়, তবে বলিতে হয় যে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিলিত। সাধক প্রথমতঃ নিজের উপযোগী একটী গুণকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া সাধন করিবেন, কিন্তু অন্যান্য গুণ বর্জ্জন করিবেন না, বরং সাধারণ ভাবে উহাদের যতদূর উৎকর্ষ সম্ভব তাহা সাধন করিবেন। একটী গুণে একত্ব লাভ করিলে অন্য গুণে একত্ব লাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে। এইরূপ সাধনা চিরকাল চলিবে। সুতরাং দেখা যায় যে জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই আমাদিগের পক্ষে সাধনীয়। উহাদের মধ্যে কোনটাই উপেক্ষার বস্তু নহে। ভক্তি ও প্রেম সাধনা সহজ বলায় কেহ যেন মনে না করেন যে এই দুই গুণের সাধনা জল ও বায়ু সংগ্রহের ন্যায় অতি সুলভ। এই উক্তি তুলনা মূলক। মানুষ প্রেমের লীলাক্ষেত্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, সেই স্থানেই সে অনায়াসে মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি, লাভ করিতে পারেন। এই স্থানে নরনারী দাম্পত্য প্রেম সাধন করিতে পারেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম সাধিত হইলে তাঁহাদিগেতে ঈশ্বর প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল বলা যাইতে পারে। শেষে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের আরও উন্নতির জন্য সাধনা করিতে হয়। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" ও "সোঽহংজ্ঞান" অংশদ্বয়ে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। গৃহের অন্যান্যের প্রতি স্নেহ, মমতা ভালবাসা সংস্থাপন করিতে

পারিলে জগতে সকলের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আসে। প্রেম সাধনায় গৃহপালিত পশুপক্ষীও বাদ পড়িবে না। তাহাদিগকেও ভালবাসিতে হইবে এবং তাহাদিগকে খাদ্যাদি দান ও বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রেম সাধনার সুবিধার জন্যই পরম প্রেমময় পরমপিতা গৃহে গৃহে যথোপযুক্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে প্রেমবৃত্তের কেন্দ্র গৃহ। উহা ঐ স্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতে বিস্তার লাভ করে এবং তৎপরে স্বয়ং জগদীশ্বরে উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সাধনার প্রারম্ভ অপেক্ষাকৃত সহজ। নতুবা প্রেম সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ কঠিন। তাই পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন:—"প্রেমপুরে পশিবারে চাহিছ অবল মন, সে পুরে গমন, আদি-অন্ত সুখের সদন। মধ্যে তার বধ্য হয় জন, কিম্বা দগ্ধ অনুক্ষণ, শুনি তার বিবরণ, যে হয় কর বিধান। মুখ ভাগে সুখ তার, পরে পথ দুঃখাগার, কণ্টকিত প্রায় তার, পরে বহুদূর— পরে সংশয় শেখর, শিখর তার উচ্চতর, অতিক্রম করা ভার, বলহীন যেই জন। যার আছে একাগ্রতা, করুণ রস মমতা, অভিমান বিহীনতা, নিঃস্বার্থতা আর—পশিতে পারে সে তথা, ঘুচে তার মনোব্যথা, দেখে অপরূপ, যেই বিবেকাঞ্জন-লোচন। (তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)" আমরা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে দেখিয়াছি যে প্রেমের অর্থ উভয়ের মধ্যে গুণ-সামঞ্জস্য। তাই ব্রহ্মপ্রেম সাধনার শেষ হয় না, পূর্ণতা লাভ হয় না। কারণ, জীবের পক্ষে অনন্ত একত্বের একত্ব সাধন না হইলে পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মের সহিত জীবের গুণ সামঞ্জস্য সম্পাদিত হইতে পারে না। আবার আমরা সোঽহং জ্ঞান অংশে দেখিয়াছি যে কোন জীবই অনন্ত একত্বের একত্ব পূর্ণভাবে সাধনা করিতে পারেন না। কারণ, পূর্ণভাবে উহা সাধিত হইলে সেই সাধকও পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন—এইরূপে একাধিক ব্রহ্ম হইবেন। কিন্তু উহা অসম্ভব। অতএব আমাদের প্রেম সাধনা বা গুণ সামঞ্জস্য সাধনা চিরকাল চলিবে। আবার যদি

আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবুও আমরা ঐ একই অবস্থা লক্ষ্য করিব। এক একটী গুণে একত্ব লাভ করিলে আমাদের সেই সেই গুণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু অন্যান্য অনন্তগুণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে (In a general way) জ্ঞান লাভ করিতে থাকিব বটে, কিন্তু উঁহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। এই ভাবে একত্ব লাভ হইতে থাকিবে এবং জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত কারণে জীব অনন্ত একত্বের একত্বও লাভ করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সরল করিবার চেষ্টা করিতেছি। কোন এক ব্যক্তিকে তাহার পিতা তাহার একটী বড় কারবার সম্বন্ধে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে আদেশ দিলেন। সেই কারবারে শত শত বিভাগ বর্ত্তমান। এখন সেই ব্যক্তি প্রত্যেক বিভাগের সকল বিষয় শিক্ষা করিতে থাকিবেন, প্রত্যেক বিভাগে কার্য্য করিতে থাকিবেন এবং প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। এইরূপে যখন তিনি প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং যখন তিনি ঐ সকল জ্ঞানের পরস্পর মিলন করিয়া একটী মাত্র জ্ঞানে পরিণত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যখন সমগ্র কারবারের জ্ঞান তাহার নখ-দর্পণে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন, তখন তাহার সেই কারবার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইল বলা যাইতে পারে। সেইরূপ সাধকের ব্রহ্মের অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণে একত্ব লাভ করিতে হইবে এবং সেই অনন্ত একত্বের একত্ব সাধনে যত্নবান হইতে হইবে। ইহাতে সাধক অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন বটে, কিন্তু এই সাধনা পূর্ণ হইবে না। সুতরাং সাধকের অনন্ত জ্ঞানেরও পূর্ণতা লাভ হইবে না। ইহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতে পারিলাম যে জ্ঞান ও প্রেম—কোন গুণেরই পূর্ণতা লাভ হয় না। সুতরাং এই

দুই গুণের সাধনা অনন্ত প্রায় কাল চলিবে। আমরা দেখিতে পাইলাম যে অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ না করিতে পারিলে উক্ত গুণদ্বয়ের কোন গুণের সাধনাই পূর্ণ হয় না, সুতরাং উভয় গুণের সাধনাই শেষে এক প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। যদি তাহাই হইল, তবে আর আমরা জ্ঞান ও প্রেম সম্বন্ধে বিবাদ করিয়া অযথা শক্তিক্ষয় করি কেন, অযথা নিজক্ষতি ডাকিয়া আনি কেন? উভয়ই যখন ব্রহ্মেরই গুণ, তিনি যখন অনন্ত, নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞান-প্রেমময়, তখন যে উঁহারা মিলিত ভাবেই তাঁহাতে কার্য্য করে এবং আমাদের ধারণায় কোন বিরোধ উঁহাদের মধ্যে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমাদের এইরূপ বিবাদ যে কেবল নিরর্থক, তাহা নহে, কিন্তু অনিষ্টকারকও বটে।

ওঁং জ্ঞান-প্রেমময়ং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমোনমঃ
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং অসীমানন্ত গুণায়।
নমস্তভ্যং অনন্তায় অনন্ত ত্রিলোচনে
অনন্তানন্ত কান্তয়ে অনন্তানন্ত রূপায়॥

উপসংহার

উপসংহারে বিশেষ করিয়া কিছুই বলিবার নাই। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই আমরা যথাসাধ্য যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই সকল উল্লেখ করিলে উহারা পুনরুক্তি হইবে মাত্র। দর্শন শাস্ত্রে

প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। উহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (আপ্ত বাক্য)। দার্শনিক বিষয় সমূহ সকল সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না, অনুমান ও শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে স্থলে যেরূপ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব, সেই স্থলে সেইরূপ প্রমাণই যথাসাধ্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের সম্পূর্ণ উপমা সম্ভব নহে। কেবল উপমার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা সমস্যার সমাধান করি নাই, অথবা একটী মাত্র উপমা প্রদর্শন করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি নাই। যথাসম্ভব যুক্তি দ্বারা বিষয়ের মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকের বিচারাধীন। যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত যাহাতে পাঠকের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, উপমা তাহার সাহায্য করে মাত্র। উপমা যুক্তি নহে, ইহা আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সর্ব্ব প্রথমে দেখিয়াছি যে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রেমময়ী লীলার জন্য এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বলীলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে তিনি স্বয়ং বহু ভাবে ভাসমান হইয়া তাঁহার স্বগুণ-পরীক্ষারূপ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এতদর্থে তিনি তাঁহার সুমহীয়সী শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ সহযোগে জড়ের সৃষ্টি করিলেন এবং উহাই জীবাত্মার আবরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। এই আবরণ উন্মোচনের শক্তি দ্বারাই যে সেই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে এই স্বগুণ পরীক্ষারূপ মহাতত্ত্ব বিশ্বের জটিল সমস্যা সমূহের মীমাংসার মূল সূত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অর্থাৎ জড় জগৎই যে কেবল অপূর্ণ, তাহা নহে, কিন্তু জীবাত্মাগণও অপূর্ণ ভাবে ভাসমান এবং তাঁহারা পূর্ণত্বের দিকেই ধাবিত। সুতরাং অনন্ত প্রায় সুদীর্ঘ পথে আমাদের যাত্রার সঙ্গে

সাক্ষাৎ হইতেও হইবে। কারণ, বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণের শক্তি পরীক্ষিত হইবে। সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্যা সমূহের মীমাংসার জন্য দুইটী মূল মন্ত্র একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। প্রথমটী সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা ব্রহ্মের স্বগুণ-পরীক্ষা, নিজেকে বহু ভাবে ভাসমান করা বা প্রেমলীলা। এই তিনই যে এক, তাহা "সৃষ্টির সূচনা" অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী—সৃষ্টিতে ক্রম প্রণালীর প্রভাব। অর্থাৎ কি সৃষ্টি, কি স্থিতি, কি লয়, সকলই ক্রমান্বয় হইতেছে ও হইবে। বিশ্বে কিছুই হঠাৎ হয় নাই বা কিছুই হঠাৎ যাইবে না। আমরা উক্ত দুইটী মূল মন্ত্র প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই সকল সমস্যার মীমাংসা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ অর্থাৎ পরমাত্মা নিজ ইচ্ছায় স্বয়ং বহু জীব ভাবে সুতরাং সীমাবদ্ধ ভাবে ভাসমান এবং জড় জগৎ তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার একটী স্বরূপ অবলম্বনে রচিত ; উভয়ই পরমপিতার আশ্রিত এবং উভয়েরই একমাত্র জনক ব্রহ্মই। জড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে উহার শক্তি অত্যধিক। এমনকি ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় উহা তাঁহার আবরণ স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে বহু ভাবে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার জড় সাধনা দ্বারা উপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে আবরণ উন্মোচনের কিছু সাহায্য করে। আমাদের কর্ম্ম জড়ের সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। আবার কর্ম্ম ভিন্ন গুণ-সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং জড় অবহেলার বস্তু নহে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দেহাত্মবোধ লয় করা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশেষে পৃথিবীবাসিগণের প্রতি পরমর্ষি গুরুনাথের নিবেদন নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহাতে দেখা যাইবে যে তিনি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন, সংসার বা জড়কে তুচ্ছ করেন নাই। বরং জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেই বলিয়াছেন। "হে মানবগণ! হে বংশ-রিরক্ষিষু মনুষ্যবৃন্দ! তোমরা যদি স্বীয় বংশ-প্রবাহ চিরস্থায়ী

করিতে ইচ্ছা কর, তবে আপনারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক মোক্ষমার্গের পথিক হও এবং স্ব স্ব বংশীয়েরা যাহাতে ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা কর ; নতুবা পাশব বলের প্রাধান্য জন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া অবক্তব্য বাক্য বলিও না, অকর্ত্তব্য কার্য্য করিও না এবং অচিন্তয়িতব্য কুৎসিত বিষয়ের চিন্তা করিও না। হে ভ্রাতৃগণ ! হে পরম স্নেহাস্পদগণ ! হে প্রাণ-প্রতিম জগন্নিবাসিগণ ! তোমরা শিষ্ট হও, শান্ত হও, ভক্ত হও, প্রেমিক হও, জ্ঞানী হও, এবং সৎকর্ম্মান্বিত ও সদিচ্ছা-পরিচালিত হও। তোমরা একে অন্যকে প্রহার করিও না, অবজ্ঞা করিও না, অধম ভাবিও না। তোমরা সকলেই একই মহান্ পরমেশ্বরের পরম অংশ। তোমরা সকলেই পার্থিব বিষয়ে আসক্ত হইও না, রূপ-মোহে মুগ্ধ হইও না, এবং ভ্রান্তি মার্গে পরিচালিত হইও না। সকলেই সংসারের উন্নতি কর, পার্থিব জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর এবং বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয়াদি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন কর। তবে, পার্থিব যে কার্যই কর না কেন, তাহাতে একান্ত ব্যাসক্ত হইও না। রজ্জুর উপরিভাগে অবস্থান করিতে করিতে নৃত্যগীত-লয়তানকারী নট যেমন মৌলি-নিষ্ঠ কলসী বিস্মৃত হয় না, সেইরূপ তোমরাও সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য কর, কিন্তু কোনও কার্য্যেই সেই সর্ব্বভূত সুহৃদ্ পরম পুরুষকে বিস্মৃত হইও না। সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্ব স্ব হৃদয়াসনে আসীন রাখ এবং তদীয় ভজনায় রত থাক। যদি তাঁহাতে তোমাদের অনুমাত্রও ভক্তি থাকে, যদি সকলের পরম-পিতাকে পিতা বলিয়া এবং তদীয় সন্তান মানববৃন্দকে ভ্রাতৃ-ভগিনী জ্ঞান করিয়া থাক, এবং যদি পরকালের তুলনায় ক্ষুদ্রতম বলিয়া প্রতীয়মান এই পৃথিবীবাসের অনিত্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হও, তবে অবহিত চিত্তে—অপ্রমত্তমনে কার্য্য করিতে থাক। এবং পরহিংসা, পরদ্বেষ ও পরনিন্দা, একেবারে দূরে নিক্ষিপ্ত কর। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা বুদ্ধির সংশোধন-পূর্ব্বক অনিত্যতা বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া অহঙ্কারকে একেবারে বিদূরিত কর। সংসার,

সদালাপ ও সাধু-সেবা দ্বারা মনের সংশয়-ভাব-নিরাকরণ-পূর্ব্বক দৃঢ়তর বিশ্বাস-সহকারে অনন্ত গুণ নিধান অসীম শক্তিপূর্ণ পরাৎপর মঙ্গলময় জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন-পুরঃসর স্ব স্ব জীবন চরিতার্থ ও জন্মগ্রহণ সার্থক কর। আর ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তোমরা সকলে ধন্য হও এবং তোমাদিগের স্বর্গাদপি গরীয়সী এই জন্মভূমি পৃথিবী ধন্য ধন্য হউক। হে করুণাময়! এই পৃথিবীবাসী জনগণের প্রতি কৃপা বিতরণ কর এবং নিজ গুণে ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ইহাদিগকে প্রগাঢ় অন্ধতমোজাল হইতে বিমুক্ত কর। দয়াময়! দয়া কর। (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা)। আমরাও প্রার্থনা করি:—হে অনন্ত অনন্ত গুণ নিধান! হে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর! তুমি নিজ দয়াগুণে যাঁহাকে তোমার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা সন্দর্শন করাও, তিনিই ধন্য। ধন্য তোমারি অনন্ত প্রেমে তাঁহার জন্ম! তোমারি শ্রীহস্তের যন্ত্ররূপে তাঁহার তোমারি প্রেমলীলায় অংশ গ্রহণ! হে অনন্ত প্রেমময় পিতঃ! হে অনন্ত দয়াময় পিতঃ! কবে তোমারি দয়ায়, তোমারি অনন্ত প্রেমে আমার শুষ্ক, পাষাণ, কঠিন হৃদয় নিত্য ভরপুর থাকিবে? কবে আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয় তোমারি অনন্ত প্রেম প্রভাবে অসীম উদার ভাবে প্রসারিত হইয়া জগতের সকল জীবকে প্রেমালিঙ্গনে হৃদয়স্থ করিয়া রাখিবে? হে অনন্ত প্রেমরসময় সুমধুর দেবতা! কবে তোমারি সুশীতল প্রেমবারির অবিরাম বর্ষণে আমার শুষ্ক ও অত্যুত্তপ্ত মরুভূমি সম হৃদয়ভূমি "সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা, মলয়জ শীতলা" হইয়া চির বিরাজিত থাকিবে? হে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ! কবে আমার এই ভীষণ কঠিন হৃদয় তোমারি নিত্য প্রেম বারি বরিষণে বিগলিত হইয়া, হে অনন্ত অপার প্রেমসিন্ধু! তোমারি দিকে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত গতিতে প্রধাবিত হইবে এবং শত সহস্র মুখী হইয়া তোমারি সঙ্গে নিত্য মিলনে মিলিত হইবে? হে অতল প্রেমজলধি! কবে তোমারি প্রেমে আত্মহারা হইয়া তোমাতেই

নিত্য সুবিনিমগ্ন হইয়া থাকিব, আর তোমারি প্রেম গুণানুকীর্ত্তন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব ? হে অনন্ত প্রেমময় নিত্য প্রাণরমণ প্রাণপতি! কবে আমার হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রে তন্ত্রে প্রতি তন্ত্রে তোমারি প্রেম মহামন্ত্র সুমধুরতম সুরে নিত্য সংগীত হইতে থাকিবে, কবে আমার বাক্যে বাক্যে প্রতিবাক্যে তোমারি প্রেম থাকিবে, কবে আমার বাক্যে বাক্যে প্রতিবাক্যে তোমারি প্রেম মহামন্ত্র উদাত্ত স্বরে নিত্য ধ্বনিত হইবে, কবে তোমারি প্রেমামৃতলহরী আমার সকল ভাবনা, সকল চিন্তা প্লাবিত করিয়া উহাদিগকে ওতপ্রোত ভাবে নিত্য ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, কবে আমি দিব্য প্রেমনয়নে দেখিতে পাইব যে তুমিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ হইয়া, তুমিই আমার একমাত্র হৃদয়েশ্বর হইয়া আমাকে তোমারি একান্ত প্রেমে তোমাতেই একান্ত ভাবে নিত্য অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছ এবং অনন্ত ভাবে আমার সহিত তোমার অপূর্ব্ব চিরপ্রেমলীলা নিখুত ভাবে সম্পাদিত হইতেছে? হে আমার হৃদয়রাজ্যের এক ছত্রাধিপতি মহারাজাধিরাজ পরম প্রেমময় দেবতা! কবে তুমি আমার হৃদয় রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া চিরতরে তোমারি একান্ত অধীন করিয়া রাখিবে? হে নিত্য জ্ঞান-প্রেমময় শিশু! কবে আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যত্র তত্র সর্ব্বত্র তোমারি অতুলনীয় প্রেমসুন্দর মধুররূপ নিত্য প্রত্যক্ষ করিবে? হে অনন্ত প্রেমলীলাময় পরমেশ্বর! কবে আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তোমারি প্রেমপূর্ণ আদেশ নিত্য শিরোধার্য্য করিয়া তোমারি প্রেমহস্তের যন্ত্র স্বরূপ মহানন্দে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবে? হে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা মহামহিমাময় অনন্ত প্রেম-ইচ্ছাময় পরম দেবতা! কবে তোমারি প্রেমে তোমাতেই নিত্য অন্তর্গত থাকিয়া তোমারি প্রেমময়ী ইচ্ছার হস্তে চিরতরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমারি নিত্য প্রেমক্রোড়ে নিত্য বাস করিব, তোমারি অপূর্ব্ব প্রেমসুন্দর মধুর রূপ অনিমেষ প্রেম-নয়নে নিত্য নিরীক্ষণ করিব এবং তোমারি অনন্ত প্রেমসুধা

পিয়াসু চকোরবৎ নিত্যপান করিব? কবে তোমারি দিব্য জ্ঞানে নিত্য উজ্জল হইয়া তোমারি নিজ হস্তে রচিত প্রকৃতি গ্রন্থে তোমারি অপূর্ব্ব রচনা পাঠ করিয়া করিয়া তোমারি অনন্তগুণ, অনন্ত শক্তি, তোমারি অপার মহিমার নির্ভুল পরিচয় লাভ করিয়া সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে এই বিশ্বলীলা তোমারি প্রেম-লীলা ইহার মূলে, ফুলে, কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায়, পত্রে গাত্রে, রসে, গন্ধে, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে তোমারি অনন্ত প্রেম উঁহার অনন্ত শক্তি সহ চির বিরাজমান, কবে দেখিতে পাইব যে তোমারি প্রেমেই জগৎ আসিয়াছে, তোমারি প্রেমেই জীবকুল জগতে লীলা বিহার করিতেছে, তোমারি প্রেমে তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত ভাবে গুণ বিধান করিয়া তোমারি দিকে অব্যর্থ সন্ধানে আকর্ষণ করিতেছে এবং একদিন প্রত্যেককেই তোমার অপূর্ব্ব অনন্ত প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করিবে? পিতঃ! কবে তোমার অপার কৃপায় সাক্ষাৎ ভাবে সকল সমস্যার সত্য মীমাংসা লাভ করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে তোমারি সত্য তত্ত্ব সমূহ প্রচার করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব? কবে, কবে, হে সত্য স্বরূপ! হে জ্ঞান স্বরূপ, হে অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় দেবতা, হে অনন্ত গুণনিধান, হে অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁৎ! কবে তোমার অপার কৃপায়, তোমারি অপরূপ একমেবাদ্বিতীয়ং রূপ দর্শন করিয়া তোমাতেই নিত্য একান্ত ভাবে সুবিনিমগ্ন হইয়া থাকিব, তুমি আমার একমাত্র পরাতৃপ্তি হইবে, হৃদয় মুহূর্ত্তের তরেও তোমা হইতে চঞ্চল হইবে না? হে অনন্ত দয়ার আধার পরম পিতঃ! তোমার অপার দয়াগুণে সেই পরম শুভদিন শীঘ্র শীঘ্র আমার জীবনে আনয়ন কর। দয়াময় দয়াকর। তোমার দয়া ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। পিতঃ! তোমার যে করুণাগুণে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বাধা বিঘ্ন বিদূরিত হয়, তাঁহার কণামাত্র আমাকে নিজগুণে দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। ওঁৎ। "এপাপ রাজ্য ছেড়ে আমি ব্রহ্মধামে করব গমন, নিত্য প্রেম সিন্ধু নীরে নিত্য রহিব মগন। নিত্য শুক্র সাক্ষাৎ

তাবে করিবেন পরিবেশন, নিত্য জ্ঞান-কঠিন-অন্ন (আমি) নিত্য করিব ভোজন। (তাঁর) নিত্য প্রেম-পীযুষ ধারা করিব মুই নিত্য পান, হব শীতল, যাব অতল ভুলিব অপর ধন। জীবনে মোর নিত্য তাঁহার ইচ্ছা করিব পালন, (মোরে) রাখবনা আর, প্রেমে এবার করিব তাঁর সমর্পণ। আমি নিত্য ধ্যানে, নিত্য দিব্য জ্ঞানে হয়ে নিত্য প্রেমে মগন, (আমি) হেরব মুক্ত হৃদয়ে নিত্য (সেই) সুন্দর প্রেম আনন। (প্রেম মধুর আনন), (মোর নিত্য জ্ঞান-প্রেম ধন।)" হে অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্নেহময় পিতঃ! তোমার নিজ অপার অনন্ত স্নেহগুণে আমার জন্মজন্মান্তরের সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান কর যাহাতে সকল সদাকাঙ্ক্ষা এবার আমার জীবনে পরিপূর্ণ হয়।

ওঁং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মওঁং।

পরপৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ভাগ আরম্ভ।

পরিশিষ্ট ভাগ

ওঁং

ত্বং বায়ুবদ্ বিশ্বজনস্য
ত্বং তাপবৎ সর্ব্বনরস্য রক্ষকঃ
ত্বং ব্যোমবৎ সর্ব্বহৃদি স্থিতঃ প্রভু
স্ত্রায়স্ব দাসং স্বক মাশু তারক ॥

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

———

প্রথম পরিশিষ্ট

ব্রহ্মের অস্তিত্ব

ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে A. B. C. of Satya Dharma and its Philosophy নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সেই আলোচনার মর্ম্ম জানিয়াও কোন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে গণিত দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমানিত না হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাই একমাত্র গাণিতিক যুক্তি দ্বারাই যে তাঁহার অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হইতে পারে, তাহাই এস্থলে আলোচিত হইবে। চিন্তাশীল পাঠক বিবেচনা করিবেন যে সেই উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়াছে কিনা। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ দার্শনিক যুক্তি যোগে পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে সেই সম্বন্ধে কোনই আলোচনা হইবে না:—(১) ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। (২) অব্যক্তের পরিণামে জ[illegible] জন্য তাঁহার (অব্যক্তের) কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মে[illegible] বিকার হয় নাই। (৩) ব্রহ্ম স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার যে[illegible] ভাবে স্ব

জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, অথচ সেই কার্য্যে তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই।" আধুনিক বিজ্ঞান এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিশ্ব এক হইতে আসিয়াছে, কিন্তু উহা এখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এই তত্ত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন আমরা যদি গাণিতিক যুক্তি দ্বারা এই একের তত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারি, তবে আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকিবে না। বিজ্ঞানের এরূপ সাধ্য নাই এবং উহা এরূপ দাবীও করে না যে উহা পরীক্ষাগারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করাইবে। অর্থাৎ H_2O দ্বারা যেমন জল সৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইবে না। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা সুন্দর ভাবে প্রমাণ করিতে পারিবে যে এক হইতেই বহু হইয়াছে এবং বহুর অস্তিত্ব একেরই উপর নির্ভর করে। গাণিতিক যুক্তি দ্বারাও আমরা তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। যদি তাহাই করিতে পারা যায়, তবে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব যে সেই একই ব্রহ্ম। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যুক্তিযুক্ত অনুমানও প্রমাণ মধ্যে গণ্য। জাগতিক পদার্থে আমরা কোন কোন গুণ নিরন্তর দেখিতে পাই। উহারা নিরাকারত্ব, সাকারত্ব ও অচৈতন্য শক্তিও উহাতে বর্ত্তমান। উহারা কোথায় হইতে আসিল? অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহারা এমন একটী পদার্থ হইতে আসিয়াছে, যাহা সাকার, নিরাকার, অচেতন ও শক্তিমান। তাহাই যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ, তাহাও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান কারণ। জগৎ স্বর্ণালঙ্কারের সহিত উপমিত হইতে পারে। উহাও স্বর্ণ+কারুকার্য্য বা নামরূপ। উহারা (স্বর্ণ ও কারুকার্য্য সমূহ) ভিন্ন উহাতে (স্বর্ণালঙ্কারে) অন্য কিছুই নাই। আবার স্বর্ণ ভিন্ন স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্যেরও কোনই অস্তিত্ব নাই। কারণ, কারুকার্য্য সমূহ একমাত্র স্বর্ণ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং স্বর্ণালঙ্কারের স্বর্ণই একমাত্র বস্তু (substance)। উহা (স্বর্ণালঙ্কার) হইতে স্বর্ণ

উঠাইয়া নিলে কারুকার্য্য সমূহও থাকে না, শূন্য মাত্র থাকে। সেইরূপ জগৎ হইতে অব্যক্ত স্বরূপ উঠাইয়া নিলে (abstraction করিলে) জাগতিক নামরূপের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ জগৎ হইতে অব্যক্ত স্বরূপ withdraw করিলে সকলই শূন্য হইয়া যায়। কারণ, জাগতিক নামরূপ একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য, কিন্তু জাগতিক নামরূপ আপেক্ষিক ভাবে সত্য। উহাদের নিজস্ব কোনই স্বাধীন সত্ত্বা নাই। এই তত্ত্বও ইতিপূর্ব্বে দার্শনিক বিচার দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। * প্রারম্ভে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গাণিতিক যুক্তি দ্বারাও যে এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এখন প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পরার্দ্ধ সংখ্যা (১০০০০০০০০০০০০০০০০ —একের পৃষ্ঠে সতেরটী শূন্য) সম্বন্ধে চিন্তা করি। উহাই উচ্চতম গণনীয়া সংখ্যার নাম। আমরা গণনার জন্য নানা নাম কল্পনা করিয়াছি। যথা—দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি। কিন্তু পরার্দ্ধের উপরে গণনার জন্য কোনও নাম কল্পিত হয় নাই। উক্ত সংখ্যার অর্থ কি? উহাতে সতেরটী শূন্য বর্ত্তমান বটে, কিন্তু উহাদের পশ্চাতে ১ (এক) বর্ত্তমান। ঐ এক আছে বলিয়াই ঐ শূন্য গুলির মূল্য, নতুবা উহাদের কোনই মূল্য নাই। সেইরূপ এক জগতের পশ্চাতেআছেন বলিয়াই জাগতিক নামরূপের অস্তিত্ব, নতুবা উহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই। Noumenon আছে বলিয়াই Phenomena-র অস্তিত্ব, নতুবা উহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই। সেই একই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অব্যক্ত (অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব), সুতরাং ব্রহ্ম। তাহাই জাগতিক Phenomena-র পশ্চাতে একমাত্র Noumenon. সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য এবং

---

* সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়, বিশেষতঃ "অব্যক্তের পরিণাম" অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

জগৎ তাঁহার অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম বাদে জাগতিক নামরূপের কোনই অস্তিত্ব নাই, উহারা শূন্য মাত্র। "প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি ভিন্ন জগতে কিছু বা কেহ নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে একের পরে যতই শূন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, ততই সেই সংখ্যার মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় কেন? একটী শূন্যের মূল্যও যাহা, দশটী শূন্যের মূল্যও তাহা. অথবা শূন্যের কোনই মূল্য নাই, উহা একটীই হউক্ বা দশটীই হউক্। এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে আমাদের স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে আবারও চিন্তা করিতে হইবে। স্বর্ণালঙ্কার কি? উহা এক খণ্ড স্বর্ণ ও তদুপরি কারুকার্য্য সমূহ। স্বর্ণালঙ্কার বহু প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। উহার কারুকার্য্য যতই জটিল (complex) ও সুন্দর হইবে, অর্থাৎ উহার বিকার যতই বৃদ্ধি পাইবে, উহার মূল্যও ততই বৃদ্ধি পাইবে। একটী সাদাসিদা (Plain) স্বর্ণ বলয় ও বিবিধ কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণবলয়ের মূল্যের পার্থক্য বর্ত্তমান। শেষোক্ত বলয়ের মূল্য অধিকতর। এইরূপ অন্যান্য প্রকারের অলঙ্কার সমূহ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। জীবদেহ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এই পার্থক্য এত অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে যে তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব। Amoeba নামক জীবদেহ এবং মনুষ্য দেহের ও তদোধিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের (Genius দিগের) দেহের গঠন প্রণালী সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিতেছে যে উহার জন্যই অর্থাৎ দৈহিক কারুকার্য্যের পার্থক্যের জন্যই উহাদের মূল্যের আকাশপাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। আবার যদি পঞ্চভূত সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্যোমে কারুকার্য্য অল্পতম (Irreducible minimum)। উহা হইতে মরুতে কারুকার্য্য অধিকতর। এই ভাবে কারুকার্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতে উহার পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। অর্থাৎ বিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্ষিতিতে উহার পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ক্ষিতিতে বিকারের পরিমাণ অধিকতম (maximum). আমাদের গণনায় কিন্তু ক্ষিতির মূল্যই অধিকতম। আমরা অনায়াসে অজ্ঞাতভাবেই সর্ব্বদা ব্যোম লাভ করিতেছি। ব্যোমের অভাব কখনও হয় না বা হইতেও পারে না। মরুৎ, তেজঃ ও অপের অভাবে আমরা অধিককাল বাঁচিতে পারি না সত্য, কিন্তু উহারা এরূপ সুলভ ও অযত্ন লভ্য যে উহাদের সংগ্রহের জন্য ক্লেশের তারতম্য অনুসারে উহাদের মূল্য আমরা ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিক দিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ক্ষিতির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে করি। ক্ষিতি বলিতে অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য কঠিন পদার্থ বুঝায়। মাটির (Land-এর) জন্যই পৃথিবীতে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্ন সংঘটিত হইয়াছে। আমরা কাঞ্চন ও কাম চরিতার্থতার বস্তুকে অধিক মূল্য দিয়া থাকি। কাঞ্চন ক্ষিতি পদার্থ। স্ত্রী পুরুষের কামক্রিয়ার যন্ত্রের নাম উপস্থ। উহা ক্ষিতির রজোহংশ প্রধান ভাবে গঠিত। কাম ও কাঞ্চনের জন্য যে পৃথিবীতে অহরহঃ বহু বহু অনর্থপাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, যে বস্তুতে কারুকার্য্য যত অধিক হইবে, অর্থাৎ যে বস্তু যত অধিক বিকৃত হইবে, জন সাধারণ উহার মূল্য ততোহধিক মনে করিবে। অর্থাৎ বিকৃতির মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইবে, পৃথিবীর গণনায় উহার মূল্যও ততই বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্যই এক হইতে একের পৃষ্ঠে একটী শূন্য অর্থাৎ দশের মূল্য অধিকতর, একের পৃষ্ঠে একটী শূন্য অর্থাৎ দশ অপেক্ষা একের পৃষ্ঠে দুইটী শূন্যের অর্থাৎ একশতের মূল্য ততোহধিকতর ইত্যাদি। অর্থাৎ শূন্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে অথবা বিকৃতি বৃদ্ধির সাথে সাথে পদার্থের মূল্য বৃদ্ধি। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে জাগতিক পদার্থ হইতে অব্যক্ত স্বরূপ বাদ দিলে কারুকার্য্যের বা নামরূপের কিছুই থাকে না। অর্থাৎ abstracted জাগতিক কারুকার্য্য বা নামরূপ বা বিকৃতি বা শূন্য একই। সুতরাং

দেখা গেল যে একই নিত্য ও স্বাধীন সত্য এবং শূন্যগুলি অর্থাৎ বিকৃতি সমূহ একের অস্তিত্বে মূল্যবান। এক বাদ দিলে উহারা মূল্য হীন শূন্য মাত্র। সেইরূপ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য ও স্বাধীন সত্য, কিন্তু তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের উপর কারুকার্য্য সমূহ বা নামরূপ আপেক্ষিক ভাবে সত্য। অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম বাদে উহারা শূন্য মাত্র, উহাদের অস্তিত্বই থাকে না. সুতরাং মূল্যও থাকে না, শূন্য হইয়া যায়। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে একই নিত্য সত্য এবং জাগতিক নামরূপ তাঁহার হইতে আসিয়াছে এবং তাঁহারই আশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান আছে। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ (গীতা-৯।৪," (৪০৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ আছে)। সেই একই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই নানাজনে নানা নামে ডাকেন। গণিত শাস্ত্রে একটী নূতন system আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে এক ও শূন্য মাত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে জড় জগতে দুইটী মাত্র বস্তু বর্ত্তমান। উহারা উহার substance এবং কারুকার্য্য বা নামরূপ অর্থাৎ বিকৃতি। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে abstracted বিকৃতি ও শূন্য একই। একই একমাত্র বস্তু এবং উঁহার অস্তিত্বেই শূন্যের অস্তিত্ব ও মূল্য। ব্রহ্ম বাদে যে বিশ্বের নামরূপ শূন্য মাত্র, তাহা শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অজ্ঞাতসারে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবাত্মার অস্তিত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শূন্য হইতেই বিশ্ব হইয়াছে। সুতরাং উহারও কোনই অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধ দর্শন আলোচনায় ইহা স্থল নহে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম বাদ দিলে শূন্যে উপনীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম বাদ দিয়া সৃষ্টির কল্পনা করিতে গিয়াছেন বলিয়াই শূন্যে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। অতএব বৌদ্ধ দর্শন দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম বাদে সকল নামরূপ বা বিকৃতি শূন্য মাত্র। মায়াবাদ বলেন যে নামরূপই জগৎ।

জগতের উপাদান কারণ মায়া। সুতরাং উহারা (নামরূপ) মিথ্যা বা শূন্য মাত্র। অর্থাৎ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা হইয়াছে বলিয়াই উহাকে শূন্যে পরিণত করিতে পারা গিয়াছে। অতএব মায়াবাদও শূন্যবাদের ন্যায় প্রমাণ করে যে ব্রহ্ম বাদে জগতের নামরূপ শূন্য এবং মূল্যহীন। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে মায়াবাদ বৌদ্ধ দর্শনের অনুকরণে রচিত। আবারও প্রশ্ন হইতে পারে যে ১ একই এক মাত্র গণনীয়া সংখ্যা নহে। ২ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাও আছে। এই আটটীর সংখ্যার মিলনেও বহু সংখ্যা গঠিত হইতে পারে। উহারাও শূন্য নহে। উহারা স্বাধীন ভাবেও এক একটী সংখ্যা প্রকাশ করে, তাহাতে একের অপেক্ষা করে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এর প্রত্যেকেই একেরই বহু ভাবে প্রকাশক সংখ্যা মাত্র। যথা—২=১+১, ৩=১+১+১ ইত্যাদি। উহারা এক ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না, অর্থাৎ একই একমাত্র সংখ্যা, কিন্তু উহা বহু ভাবে ভাসমান হইয়াছে। সেই জন্য বহু ভাবে ভাসমান বস্তু সমূহের গণনার জন্য বহুত্ব বোধক সংখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মের একতম স্বরূপের পরিণামে জগতের উৎপত্তি বটে, কিন্তু এই পরিণামে সেই স্বরূপের কোনই বিকার হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের পরিণাম সত্ত্বেও উহাও practically জগৎ ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। আরও দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম দেশকালাতীত। তিনি দেশ কালে বর্ত্তমান থাকিয়াও উহাদের অতীত, সুতরাং তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণব্রহ্ম। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। (কঠ—২।২০)। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাঁহার অনন্ত স্বরূপের প্রত্যেকটী স্বরূপ সম্বন্ধেও তাহা সত্য। অর্থাৎ তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ দেশ কালে বর্ত্তমান থাকিয়াও উহাদের অতীত। সুতরাং অব্যক্ত স্বরূপও আমাদের ধারণীয় বিন্দু পরিমাণ বস্তুতেও পূর্ণ, অনন্ত প্রায় বিশ্বেও উহা পূর্ণ এবং বিশ্বাতীত অনন্তেও উঁহা পূর্ণ। উঁহা নিত্য এক, অবিভাজ্য ও অখণ্ড ভাবেই জগতে এবং জাগতিক বস্তু সমূহে বর্ত্তমান। আবার দেখা

গিয়াছে যে জগতের একমাত্র উপাদান বা একমাত্র substance অব্যক্ত স্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম। আবার জগতে যে আমরা বহু বস্তু দেখি, উহারা প্রত্যেকেই একে অন্যের সঙ্গে গ্রথিত। তাই Sir James Jeans বলিয়াছেন যে আমাদের একটী অঙ্গুলি হেলনেও বিশ্বে Disturbance উপস্থিত হয়। আর একটী বিষয় চিন্তা করিলেও উহাই প্রমাণিত হইবে। তাহা এই যে ব্যোম হইতে অবশিষ্ট জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ব্যোম সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং ব্যোমেই জগৎ অবস্থিত। সুতরাং অসংখ্য জাগতিক বস্তু একে অন্যের সহিত সংলগ্ন। আমরা যদি এই ভাবে আরও অগ্রসর হই, তবে দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মই বিভু ভাবে ব্যোমেও ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। স্বয়ং ব্রহ্মই বিশ্বে ও বিশ্বের অতীত অনন্তে নিত্য বর্ত্তমান। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে প্রত্যেকটী বস্তুর পশ্চাতে বস্তু সত্তারূপে একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম বর্ত্তমান এবং সমগ্র জগতের পশ্চাতেও সেই একই স্বরূপ বর্ত্তমান। সুতরাং এক অব্যক্ত স্বরূপ সমগ্র ভাবেও জগতের একমাত্র সার বস্তু, আবার খণ্ড খণ্ড জাগতিক বস্তু সমূহেও উঁহাই একমাত্র বস্তু। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে যাহাদিগকে আমরা বহু মনে করি, তাহা একেরই বহু ভাবের অভিব্যক্তি বা ভাসমান অবস্থা মাত্র। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে একই নিত্য সত্য এবং উহার কল্পিত অভাব শূন্য নামে অভিহিত হয়। প্রকৃত পক্ষে শূন্য বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যোম পদার্থ বর্ত্তমান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মই স্বয়ং ব্যোমেও ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান এবং উহার অতীত অনন্তেও তিনিই বর্ত্তমান। সুতরাং শূন্য বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে গণিত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যদিও উহা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে একেরই নিত্য স্বাধীন সত্তা আছে, কিন্তু অন্য যাহা নাম-রূপে জগতে প্রকাশিত, তাহার নিজস্ব কোনই স্বাধীন সত্তা নাই।

উঁহারা কেবল একের সত্ত্বায়ই সত্তাবান। পরার্দ্ধ হইতে এক উঠাইয়া নিলে উহার মূল্য যেমন শূন্য হয়, সেইরূপ বিশ্ব হইতে অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম বাদ দিলে বিশ্ব বলিয়া কিছু থাকে না, শূন্য হইয়া যায়। সুতরাং একই একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু এবং সেই একই ব্রহ্ম। অব্যক্ত তাঁহারই একতম স্বরূপ এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই অন্তর্গত। উঁহা কখনও তাঁহা হইতে বিভিন্ন নহেন। সুতরাং অব্যক্ত স্বরূপ জগতের পশ্চাতে বলাও যাহা, ব্রহ্ম জগতের পশ্চাতে বলাও তাহা। জগৎ ও জাগতিক বস্তু সমূহ সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সেই একের উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ উহারা আপেক্ষিক ভাবে সত্য। জীব=আত্মা+দেহ। দেহ জগতের অন্তর্গত। সুতরাং উহা হইতে অব্যক্ত স্বরূপ বাদ দিলে উহাও শূন্যে পরিণত হয়। সুতরাং বাকী থাকিল আত্মা। প্রশ্ন হইতে পারে যে দেহ বাদ দিলে আত্মা বাকী থাকে, কিন্তু শূন্য থাকে না, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমাদিগেতে জড়ীয় গুণ ভিন্ন আত্মিক গুণের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি। আত্মিক গুণ যথা—জ্ঞান, প্রেম, চৈতন্য প্রভৃতি। উহারা জড় দেহের গুণ হইতেই পারে না। জড় পদার্থ মাত্রই চৈতন্য শূন্য। কিন্তু জীবের চৈতন্য আছে, চিন্তা করিবার, জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু উহা জড়ে সম্ভবেনা। এপর্যান্ত কেহ প্রমাণ করিতে পারে নাই যে চৈতন্য শূন্য পদার্থ হইতে চেতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেহে এমন এক পদার্থ আছেন যাঁহাতে চৈতন্য, জ্ঞান প্রভৃতি আত্মিকগুণ বর্ত্তমান। সেই পদার্থই জীবাত্মা। নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনও পুরুষের বা জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পরমাত্মার জীবাত্মা ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী ও জীবাত্মা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। উহাদের দ্বারা জীবাত্মার অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হইয়াছে। 'জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব' অংশে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সেই তত্ত্ব মিথ্যা। উহাতে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে জড়ের

Physical and ch·mical combination-এ চিন্তার সুতরাং চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেহ হইতে অব্যক্ত বাদ দিলে উহা শূন্য বই আর কিছুই নহে। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মই স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে দেহে আবদ্ধ হইয়া বহু ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। ব্রহ্ম যে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাহাও পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। তিনিই অনন্ত একত্বের একত্বে নিত্য বিভূষিত ওঁং। অর্থাৎ তাঁহাতেই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি এক হইয়াও বহু ভাবে ভাস-মান হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং একই নিত্য সত্য এবং বহু সেই একেরই বহু ভাবে ভাসমান অবস্থা মাত্র। সমুদ্র যেমন এক থাকিয়াও বহু তরঙ্গাকারে ভাসমান হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ এক হইয়াও বহু জীব ও জাগতিক বস্তু ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এখন যদি আমরা নিম্নলিখিত formula গ্রহণ করি, তবে বিশ্বের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাইব যে একই নিত্য সত্য এবং বিশ্বের মূল বস্তু সত্তারূপে (substance ভাবে) একমাত্র পদার্থ বর্ত্তমান এবং তাহাই ব্রহ্ম। $x^0=1$ এই formula নিম্নলিখিত ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

$$1=\frac{x^5}{x^5}=x^{5-5}=x^0$$

$\therefore x^0=1$. এখন x এর অর্থ Unknown finite thing. উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক বস্তু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে, আবার বিশ্ব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান আলোচনায় "x" এর অর্থ বিশ্ব ধরা যাউক্। Zero power negates everything of "x" except its substance. যদি Zero power সমস্ত "x" কে শূন্যে পরিণত করিতে পারিত, তবে $x^0=1$ না হইয়া $x^0=0$ হইত। সুতরাং "x" এর সমস্তই যায় না, কিছু বাকী থাকে। সুতরাং আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে

পারি যে "x"এর এমন কিছু থাকে, যাহা অক্ষয় অমর। তাহা উহার ultimate substance ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ, ultimate substance ultimate Principle ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। Ultimate substance-এর অর্থই First Cause. First Cause-এর ক্ষয় বা লয় নাই বা থাকিতেও পারে না। ইহা ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সহজে বুঝিতে গেলে বলিতে হয় যে First Cause-এর লয় হইলে উহা আর First Cause থাকিবে না। যাহাতে উহার লয় হইবে, তাহাই First Cause হইবে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে "x" এর অর্থ বিশ্ব। সুতরাং বিশ্ব$^{\circ}$=১ এর অর্থ বিশ্বের ultimate substance, ultimate Principle or First Cause. কারণ, "o" power যে বিশ্বের ultimate substance ব্যতীত অন্য সকল ক্ষয় করে, তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। সুতরাং $x^{\circ}=1$ অথবা বিশ্ব$^{\circ}$=১ এর অর্থ অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার ভাবে লিখিত হইতেছে। বিজ্ঞান প্রত্যেক ক্ষিতি পদার্থকে বায়বীয় পদার্থে লয় করিতে পারে। যথা—বরফ নামক ক্ষিতি পদার্থকে জলে এবং জলকে Hydrogen and oxygen-এ লয় করা যায়। বিজ্ঞান এখনও বায়বীয় পদার্থকে ব্যোমে লয় করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন ক্ষিতি পদার্থকে ক্রমশঃ মরুতে লয় করিতে পারে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মরুৎকেও ব্যোমে লয় করা যায়। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তবে ক্রমপূর্ণ জগতে অক্রমতা দোষ আরোপিত হয়। তাহা অসম্ভব। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ব্যোম আদি সৃষ্ট পদার্থ এবং মহাপ্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক মাত্র ব্যোমই থাকিবে। সেই ব্যোমে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতে অবস্থিত কোনওরূপ কারুকার্য্য বা নামরূপ থাকিবে না, ব্যোমে যৎকিঞ্চিৎ নগণ্য কারুকার্য্য মাত্র থাকিবে। মহাপ্রলয় হইলে ব্যোমও থাকিবে না, সুতরাং কোন নামরূপই থাকিবে না। অতএব দেখা যায় যে

সকল নামরূপেরই ধ্বংস আছে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে মহাপ্রলয়ান্তে কোনও জাগতিক নামরূপ থাকিবে না, কিন্তু আসল পদার্থ বা ultimate substance থাকিবে। বিজ্ঞান প্রকারান্তরে তাহাই বলিতেছেন। অর্থাৎ phenomena থাকিবে না, কিন্তু matter and energy constant থাকিবে। বিজ্ঞান ইহার অধিক বলিতে পারে না। যখন নামরূপ সর্ব্বদা লয় যোগ্য এবং ultimate substance অক্ষয়, তখন "x" এর "o"power "x" এর নামরূপই লয় করিবে, কিন্তু উহার ultimate substance লয় করিবে না বা করিতেও পারিবে না। "x" এর সমস্তই যে "o"power লয় করিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে "x"এ (universe-এ) এমন কোন পদার্থ আছেন, যাহার লয় বা ক্ষয় নাই এবং তাহা এক। সেই এক পদার্থই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ অব্যক্ত সুতরাং ব্রহ্ম। আবার অন্য ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে "x" এর "o"power উহার কিছু অবশ্যই ক্ষয় করিবে। যখন $x^0=1$, তখন পরার্দ্ধ^0 = ১। অর্থাৎ "o"power পরার্দ্ধকে একে লয় করিল। সুতরাং দেখা যায় যে "o'power সকল বস্তু বা সংখ্যাকে affect করিবেই। ফলে উহার আসল বস্তু বা ultimate substance মাত্র থাকিবে, কিন্তু অন্য কোনও বিকৃতি থাকিবে না। সেই ultimate substanceএক এবং উঁহাই ব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। আমরা দেখিতে পাই যে কোন সংখ্যার শক্তির (power এর) বৃদ্ধির সহিত উহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। যথা—$২^২=৪$, কিন্তু $২^৪=১৬$ ইত্যাদি। সেইরূপ সংখ্যার শক্তির হ্রাসের সহিত উহার মূল্যও অবশ্যই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বস্তুর বিকৃতির বৃদ্ধির সাথে সাথে উহার মূল্যের বৃদ্ধি। সুতরাং বিকৃতির হ্রাসের সাথে সাথে উহার মূল্যের অবশ্যই হ্রাস হইবে। সুতরাং "0"power "x" এর সমস্ত বিকৃতি একেবারে নষ্ট করিবে, যেমন পরার্দ্ধকে "0"power একে লয়

করে, উহার শূন্য বা বিকৃতি সমূহ আর থাকিবে না। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বিকৃতি উহার "0" power বিনাশ করিয়াছে। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে বিশ্বের ultimate substance মাত্র বাকী থাকিল। কারণ, তাহা নিত্য নির্ব্বিকার অক্ষয় ও অমর। উহা কখনও বিশ্বের বিকৃতি, ক্ষয়ের জন্য বিন্দু মাত্রও affected হইবে না বা হইতেও পারিবে না। আমরা অন্য ভাবেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। x^0 কে আমরা বলি "x" এর শূন্য শক্তি, $x^২$ কে "x" এর দুই শক্তি, $x^৪$ কে "x" এর চারি শক্তি ইত্যাদি। ০, ২, ৪ প্রভৃতিকে "x" এর নানা শক্তি বলা হয়। ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার একতম স্বরূপ অব্যক্তকে বিশ্বে পরিণমন করা হইয়াছে। কিন্তু সেই কার্য্যে অব্যক্ত বিন্দুমাত্রও বিকৃত হন নাই। অর্থাৎ স্বর্ণকার যেমন একটী স্বর্ণখণ্ডকে তাহার কার্য্য (সুতরাং ইচ্ছাশক্তি) দ্বারা নানা নামরূপ দান করিয়া একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করেন, ব্রহ্মও সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ হইতে নামরূপ সৃজন করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন। অর্থাৎ জাগতিক নামরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির ফল। স্বর্ণকার ইচ্ছা করিলে অলঙ্কারের নামরূপ নাশ করিয়া উহাকে (অলঙ্কারকে) পুনরায় স্বর্ণ খণ্ডে আনয়ন করিতে পারেন। সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিশ্বের নামরূপ ধ্বংস করিয়া উহাদিগকে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপে লয় করিতে পারেন। তাঁহার সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছাশক্তিতে ত্রিবিধ শক্তি বর্ত্তমান। যথা— সৃজন, পালন ও লয়। যখন উক্ত কার্য্যত্রয় সম্পন্ন হইবে, তখন ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়িনী ইচ্ছাশক্তি কার্য্যকরী থাকিবে না। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপের উপর সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কোনও কার্য্য করিবেন না। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত স্বরূপ যেমন ছিলেন, তেমনি থাকিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নামরূপ সমূহ বিবর্জ্জিত অবস্থায় বা স্ব-স্বরূপে

অব্যক্ত স্বরূপ থাকিবেন। সুতরাং বিশ্ব হইতে সকল নামরূপ বাদ দিলে একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপই সুতরাং ব্রহ্মই থাকিবেন। ব্রহ্ম নিত্য একমেবাদ্বিতীয়ম্। অতএব $x^0=1$ সত্য এবং এই Formula দ্বারা প্রমাণিত হইল যে একই নিত্য সত্য এবং সেই একই ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে $১^0=১$ হইলে এক একই থাকিল, উহাতে কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে x কোনও অজ্ঞাত সসীম পদার্থকে বুঝায়, তাহা সমগ্র বিশ্বই হউক্ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক পদার্থই হউক্। বিশ্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধেও ইতঃপর লিখিত হইবে। সুতরাং $১^0=১$ এর প্রথম এক কোনও সসীম বস্তুকে বুঝাইবে। উহা অনন্ত অসীম বস্তুকে বুঝাইবে না। সুতরাং প্রথম ১ এককে যদি বিশ্ব স্থলে Symbol ভাবে ধরা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ $বিশ্ব^0=১$। এখন বিশ্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে ১^0 ও যাহা, $বিশ্ব^0$ ও তাহা। অর্থাৎ বিশ্ব নামক পদার্থ হইতে উহার সমস্ত বিকৃতি ০ power নাশ করিবে এবং উহার ultimate substance মাত্র থাকিবে এবং তাহা এক এবং তাহাই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বিশ্ব=ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ+নামরূপ। সুতরাং বিশ্ব—নামরূপ=অব্যক্ত স্বরূপ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে বিশ্বের substance বা উপাদান অব্যক্ত স্বরূপই এবং উহার নামরূপ অব্যক্ত দ্বারা গঠিত। সুতরাং বিশ্ব হইতে অব্যক্ত বাদ দিলে কিছুই থাকে না, শূন্য মাত্র বাকী থাকে, যেমন স্বর্ণালঙ্কার হইতে স্বর্ণ (substance) বাদ দিলে কোনও কারুকার্য্য থাকে না, উহারা শূন্য হইয়া যায়। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে $x^0=1$, অর্থাৎ বিশ্ব হইতে নামরূপ বাদ দিলে একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকিবেন। সুতরাং বিশ্বরূপ পদার্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে উহার substance বা উপাদান

এক এবং তাহাই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই। ইতি-পূর্ব্বে আমরা তাহাই দার্শনিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। এখন যদি আমরা একের বিশ্ব না ধরিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বরেরই symbol ভাবে গ্রহণ করি, তবুও $১^০=১$ হইবে। কারণ, ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার। সুতরাং সেই একের কোনই বিকৃতি নাই। সুতরাং 0 power একের কিছুই ধ্বংস বা লয় করিতে পারিল না। নিত্য নির্ব্বিকারের আবার ধ্বংস কি? অতএব আমরা $১^০=১$ এর যে কোন অর্থই ধরি না কেন, উহার ফল একই হইবে, কখনই বিভিন্ন হইবে না। এখন যদি ঐ একই প্রণালীতে কোনও ক্ষুদ্র জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে সেই বস্তুটীর পশ্চাতেও ultimate substance ভাবে একমাত্র পদার্থ বর্ত্তমান এবং তাহাই অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্ত স্বরূপ পূর্ণ ভাবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের পশ্চাতেও বর্ত্তমান। অতএব এইরূপ গাণিতিক ভাবে চিন্তা করিয়াও দেখা গেল যে বিশ্ব হইতে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হইতে পারে। কেহ বলেন যে উপরোক্ত আলোচনায় প্রথম অংশ উপমা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে বিষয়টী প্রমাণিত হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা criticism of experience দ্বারা পরিচালিত হইব, আমরা বিশ্বের বিশ্লেষণে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ত অনুমান গ্রহণ করিব। ইহা ভিন্ন সত্য মীমাংসা লাভের অন্য কোন উপায় নাই। যুক্তিযুক্ত অনুমানও প্রমাণ মধ্যে গণ্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে গাণিতিক বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। আমরা এ স্থলে গাণিতিক যুক্তি দ্বারা দেখিয়াছি যে একই নিত্য সত্য, অন্য যাহা কিছু, তাহা একের উপরই নির্ভর করে। সেই এক ভিন্ন অন্য যাহা কিছু, তাহাই শূন্য মাত্র। জগতের বিধান এক। Unity in diversity তত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত। একটী সুপ্রসিদ্ধ বাণী আছে "One God, One

Law, One Universe" ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান" তত্ত্বও এই সম্পর্কে আমরা স্মরণ করি। উহাদের বিশ্লেষণে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি যে একই বিধান সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। গণিতে এক বিধান কিন্তু অন্যত্র বিভিন্ন বিধান হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বুঝিতে পারা যায় যে গণিত দ্বারা যখন একই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল বস্তু বলিয়া জানা যায়, তখন সেই একই যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম. তাহাও যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ গাণিতিক যুক্তি যোগে একের তত্ত্ব যাহা লাভ করা গিয়াছে, তাহা এবং দার্শনিক যুক্তি যোগে লব্ধ একের তত্ত্ব যখন সম্পূর্ণ রূপে মিলিয়া গিয়াছে, তখন গাণিতিক যুক্তি বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনই যুক্তি সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত গাণিতিক যুক্তি অথবা প্রকৃতির সৃষ্টি ও পরিচালনা কার্য্য দর্শনে প্রকৃতিনাথের জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গলময়ত্ব প্রভৃতি স্বরূপ সম্বন্ধে সত্য অনুমান যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ সর্ব্ব সাধারণের নিকট অসম্ভব। যে সাধক ভগবৎ কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন, তিনিই মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করিবেন, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আমরা যদি প্রোক্ত ভাবের প্রমাণ উপেক্ষা করি, তবে আমরা যে কেবল মূক হইয়া থাকিব, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের চিন্তাশক্তিও বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ, আমাদের সকল কার্য্য ও চিন্তা প্রকৃতি এবং অন্তঃকরণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। আমরা জগৎকে মিথ্যা মায়ার খেলা বা শূন্য মনে করি না। জগৎও আপেক্ষিক ভাবে সত্য। সত্য বস্তুর অনুসরণে অবশ্যই আমরা স্বাভাবিক ভাবে পরম সত্যে উপনীত হইতে পারিব, ইহা স্থির নিশ্চয়। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নহে। বিজ্ঞানও অনুমান প্রমাণ গ্রহণ করেন। দর্শন শাস্ত্রে অনুমান প্রমাণকে কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আবার আমরা যদি বিজ্ঞানের অন্য

বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তবে আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে স্থূল সূক্ষ্মে লয় হইতে পারে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি (সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্), তাহাও পরীক্ষা লব্ধ সত্য। সুতরাং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ বিপরীত ক্রমে অপ্, তেজঃ, মরুৎও ব্যোমে লয় হইতে পারে। * মহাপ্রলয়ে ব্যোমেরও লয় হইবে। ব্যোম যাহাতে লয় হইবে, তাহাই অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম বা First Cause. প্রশ্ন হইতে পারে যে মহাপ্রলয় যে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সৃষ্টি যে সাদি, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। জড় পদার্থ মাত্রেরই চারিটি অবস্থা দেখা যায়। যথা—জন্ম, বৃদ্ধি হ্রাস ও লয়। সৃষ্টি যখন সাদি এবং জগৎ যখন জড় পদার্থ, তখন উহারও চারিটী অবস্থা অবশ্যই আছে। সুতরাং উহারও লয় হইবে। নাস্তিকগণ জগদুৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উহা হঠাৎ হইয়াছে বলেন। হঠাৎ হইলেও উহা সাদি। উহা আমাদের অধার্য্য দূরবর্ত্তী অতীতে হইতে পারে, কিন্তু তথাপিও উহা সাদি। তাহাদের মত যে ভ্রান্ত, তাহা ইতঃপর লিখিত হইতেছে। অতএব লয়বাদ অনুযায়ীও দেখা যায় যে একই সত্য এবং তাহাই ব্রহ্ম। যখন বিজ্ঞানের নানা বিভাগ ও দর্শন শাস্ত্র দ্বারা একের তত্ত্ব একই ভাবে সুপ্রমাণিত হইল, তখন আর উপমার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে পূর্ব্বোক্ত Formula সাক্ষাৎ ভাবেই বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। উহাতে দেখা গিয়াছে যে বিশ্ব^0 = ১। এই একের অর্থ যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম, ইহাও পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব গণিত দ্বারা প্রমাণিত হইল। সর্ব্বশেষে বলা যাইতে পারে যে গণিতকে

* বিজ্ঞান এই পর্য্যন্তই অনুসন্ধান করিতে পারে। ইহার পর যাহা তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বাহিরে।

Exact science বলা হয় এবং উহা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের গতিবিধি গণিত দ্বারা নিখুঁত ভাবে বলিয়া দিতে পারা যায়। এই কার্য্য দ্বারা এবং প্রকৃতির গঠন ও পরিচালনা প্রণালী দর্শনে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষা কর্ত্তা একজন মহাজ্ঞানী বা Greatest Mathematician. কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান তর্কশাস্ত্র সম্মত। সেইরূপ একজন মহাজ্ঞানী বিশ্বের রচনার ও পরিচালনার পশ্চাতে না থাকিলে এরূপ জ্ঞানপূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিচালনা হইতে পারিত না। স্থূল, বিশ্ব এরূপ ভাবে রচিত যে প্রকৃতির বিশ্লেষণে প্রকৃতিনাথের পরিচয় সহজেই লাভ করা যায়। জ্ঞানশূন্য অচেতন জড় পদার্থ কখনই এইরূপ জ্ঞানময়ী সৃষ্টির স্রষ্টা ও পরিচালক হইতে পারিত না। নিম্নে অতি সংক্ষেপে কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ—কেহ কেহ বলেন যে পরমাণু হঠাৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা অসম্ভব হঠাৎ বলিয়া কিছু নাই। সৃষ্টি ক্রমপূর্ণা। বিজ্ঞানও ইহা স্বীকার করেন। Sir James Jeans বলিয়াছেন যে হঠাৎ সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ—যদি তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়াও নেওয়া যায় যে হঠাৎ পরমাণু উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপিও বলিতে হইবে যে জ্ঞান শূন্য ও অচেতন জড় পদার্থ কখনই mathematical accuracy-র সহিত বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করিতে পারিত না। বিজ্ঞানই বলেন যে জড় চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহা কোন এক চেতন পদার্থ ভিন্ন চালিত হইতে পারে না। যদি একান্তই ধরা যায় যে হঠাৎ পরমাণু সকল হইয়াছিল, তবুও বলিতে হইবে যে উহারা chaos and confusion মাত্র সৃষ্টি করিতে পারিত। কোনও রূপ বিশ্ব কার্য্য উহাদের দ্বারা কখনই সম্ভব হইত না, বিশ্ব সৃষ্টি ও স্থিতির কথা ত সুদূর পরাহত। একজন Perfect Idiot মানুষ হইয়াও Newton বা Einstein হইতে পারে না। সে কেবল জঞ্জালই উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত কোনই

জ্ঞানপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ—সৃষ্টি কার্য্য বিশ্লেষণে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই যে সৃষ্টির একটী অতি সুমহান্ উদ্দেশ্য আছে। উহার প্রমাণ স্বরূপ একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। পৃথিবী আদিতে A lump of hot gaseous matter (thrown out from the sun) মাত্র ছিল। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থ উহা কালে একটী সুন্দরী সুষমাময়ী বসুন্ধরারূপে পরিণত হইয়াছে। উহা hot gaseous matter হইতেও খারাপতর কিছুই হয় নাই। আধুনিক Biology বিজ্ঞান বলেন যে যদি সৃষ্টির কোনই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান না থাকিত, তবে Protoplasm হইতে মানুষ পর্য্যন্ত না হইয়া উহা (Protoplasm) হইতে আরও কিছু খারাপতর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং সৃষ্টির যে একটী সুমহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহা সুস্পষ্ট। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে। অজ্ঞান ও অচেতন জড়ের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উহা চালাইলে চলে, থামাইলে থামে। উহা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে উহার শক্তির কোনই পরিচালনা করিতে পারে না। উহার শক্তির পরিচালনার জন্য একজন জ্ঞানবান ও শক্তিমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে।" অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক অনন্ত জ্ঞানে নিত্য পরিপূর্ণ। জ্ঞান শূন্য কিছুই জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা করিতে পারে না। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে সেই স্রষ্টা এক এবং তিনিই ব্রহ্ম। অতএব গাণিতিক যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল।

ওঁ সত্যং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ওঁ

ওঁং

অনন্ত শান্তে নিলয়শ্চ সত্যঃ
প্রভুঃ পিতা মঙ্গলভাব পূর্ণঃ।
অনাদ্যনন্তোঽখিলসৃষ্টি হেতু
বিভুঃ শিবো জ্ঞানময়শ্চ পূর্ণঃ ॥

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

ব্রহ্মের পূর্ণত্ব

বৃহদারণ্যকোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব বিষয়ক মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—"ওঁং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা নানা পণ্ডিত নানা ভাবে করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের পাণ্ডিত্য বা সাধনার তুলনায় একেবারেই কিছু না। অথবা তাঁহাদের সহিত তুলনার উল্লেখ করাই একান্ত অন্যায়। আবার এই মন্ত্রটী ব্রহ্মের পূর্ণত্ব বিষয়ক। আমার ন্যায় সাধন ভজন হীন মূর্খের পক্ষে এইরূপ সুকঠিন ও সুগভীর ভাব পূর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি কেন আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম? ইহার একমাত্র উত্তরই এই যে আমার হৃদয়ে যাহা উদিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা। সকলের নিজ নিজ ভাব প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। পণ্ডিত সমাজ বা সাধক সমাজ তাহা গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহা পৃথক্ কথা। আর একটী কারণ এই যে মন্ত্রটী সম্বন্ধে আমি বহু বৎসর যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু হৃদয় অন্য কথিত ব্যাখ্যায় সায় দেয়

নাই। আমার ব্যাখ্যা ব্যাকারণ ও অভিধান সঙ্গত হইবে কিনা জানি না। পণ্ডিতগণ হয়তঃ এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াই অগ্রাহ্য করিবেন। কারণ, ইহা চির প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে পৃথক্ এবং ইহা অখ্যাত, অজ্ঞাত, নগণ্য ব্যক্তির লেখনী প্রসূত। তবে সাধক গণের হৃদয়ে ইহাতে সায় দিলেও দিতে পারে, ইহাই ভরসা। যাহা হউক্, যাঁহার প্রেরণায় এই কার্য্যে আমি ব্রতী হইলাম, সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমময় পরম পিতা তাঁহার অপার স্নেহ গুণে এই মলিন শিশুকে স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ করুন এবং একান্ত অজ্ঞ সন্তানের ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয় তাঁহারই দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করুন, ইহাই তাঁহার নিকট দীন হীন সন্তানের ব্যাকুল প্রার্থনা। পাঠকদিগের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন সমস্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা দান করেন এবং তদনন্তর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রকরণ (context) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। এই মহামন্ত্রটী বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত বহু ব্রহ্ম তত্ত্ব আমরা দেখিতে পাই। চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই (চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়। উহা কোনও ব্রহ্মতত্ত্ব মূলক পরিচ্ছেদ নহে।) যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ। সেই সংবাদের শেষমন্ত্রে দেখা যায় যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে আত্মাই সমুদায়। তিনি যে সেই ভাবের কথা বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল অথবা তিনি সেই ভাবের উপর বিশেষ জোড় দিতেন। প্রামাণ্য উপনিষদ্ সমূহ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ব্রহ্ম নিত্য সত্য, এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনন্ত ও পূর্ণ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব যুক্তি সঙ্গতও

বটে। সুতরাং উহাদিগকে আমাদের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম যখন এক এবং তিনি যখন একমাত্র বস্তু, তখন বিশ্বে তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু (substance) নাই। অথচ বিশ্বে অসংখ্য বিভিন্ন আকার প্রকারের বস্তু দেখা যায়। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই (তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপই) যে জগদাকারে কার্য্যত: ভাসমান হইয়াছেন, তাহা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই জগতের Noumenon এবং আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকার প্রকার বা নামরূপ Phenomena. সমুদ্রতরঙ্গের সমুদায়ই সমুদ্রের জল মাত্র। বায়ু সংযোগে সমুদ্রের উপরিভাগের কতক অংশের আকারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। আসল বস্তুর (substance এর) অর্থাৎ সমুদ্র জলের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইরূপ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ তাঁহারই ইচ্ছা সংযোগে জগৎরূপে ভাসমান হইয়াছেন। সুতরাং জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই substance ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই। আর আমরা যে আকার প্রকার দেখি, তাহা উহাতে ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সমূহ, যেমন স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য ভিন্ন সকলই স্বর্ণ মাত্র, কারুকার্য্যও স্বর্ণ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে জড় জগৎ = ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ + তাঁহার ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সমূহ। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু (substance)। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে অন্য substance নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। আবার, ব্রহ্মই সেই জগদুৎপন্ন দেহ যোগে জীবাত্মারূপে স্বয়ং ভাসমান হইয়াছেন; এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জগৎ ভাসমান বস্তু বলিয়া মিথ্যা নহে। উহার মূলে উপাদান কারণরূপে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান। ব্রহ্ম নিত্য সত্য। সুতরাং তাঁহার গুণ বা স্বরূপ মাত্রই নিত্য সত্য। উঁহার (একতম স্বরূপের) উপাদানত্বে যাহা হইয়াছে, তাহাও অবশ্য সত্য। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য

স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ। অর্থাৎ তিনিই সত্য এবং তিনিই অনন্ত। ব্রহ্মে অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ বা স্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক গুণই সত্য ও অনন্ত। তাহা না হইলে তিনি স্বয়ং সত্য ও নিত্য অনন্ত হইতে পারিতেন না। পূর্ণত্ব ব্রহ্মের একটী স্বরূপ। সুতরাং পূর্ণত্বও নিত্য সত্য ও নিত্য অনন্ত। আবার তিনি নিত্যই এক ও অখণ্ড। সুতরাং তিনি নিত্যই অনন্ত ভাবে পূর্ণ, সর্ব্বত্র পূর্ণ। তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ, অনন্তেও পূর্ণ। এই জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন:—"অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ (৩।২০)। অর্থাৎ তিনি অণু হইতেও অণু বৃহৎ হইতেও বৃহৎ।" মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন:—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ (৩।১।৭)" "বঙ্গানুবাদ:—তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, দিব্য অর্থাৎ স্বয়ম্প্রভ, এবং অচিন্ত্যরূপ; তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এখানে নিকটেও আছেন, এবং এখানেই জ্ঞানবান্ পদার্থ সমূহের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত রহিয়াছেন। (তত্ত্বভূষণ)।" কেহ বলিতে পারেন না যে এই গৃহে তিনি পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার অংশ মাত্র বর্ত্তমান। অর্থাৎ গৃহের প্রাচীর তাঁহাকে বিভাগ করিয়া তাঁহার অংশ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যে অসম্ভব, তাহা সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ ব্যোম সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্যোম কখনও কোনও জাগতিক জড় পদার্থ দ্বারা খণ্ডিত হয় না। উহা বিশ্বব্যাপী ও অবিভাজ্য। উহাকে কেহ বিভাগ করিতে পারে না। স্থানাবরোধকতার প্রশ্নও ব্যোম সম্বন্ধে উত্থাপিত হইতে পারে না। ইহার কারণ ব্যোমের অখণ্ড ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব। এই সম্পর্কে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্যোম সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না যে উহার প্রতিবিন্দুই পূর্ণ। ইহা সত্য বলিয়াও স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল উপমা প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনই সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

সুতরাং উক্ত উপমাও সম্পূর্ণ নহে। "দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans বলিয়াছেন যে আমাদের একটী অঙ্গুলি হেলনেও সমস্ত বিশ্বে সাড়া পড়িয়া যায়। ইহার কারণ যে ব্যোম পদার্থ, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। ব্যোম বিশ্বব্যাপী এবং সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ। ব্যোম অবিভাজ্য এবং অখণ্ড বলিয়া উহার বিন্দু কল্পনা করা যায় না। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনও ব্যোমকে নিত্য ও অখণ্ড পদার্থই বলিয়াছেন এবং উহার পরমাণুর কল্পনা করেন নাই। সুতরাং দেখা যায় যে ব্যোমের অখণ্ড ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব বশতঃ উহাতে সর্ব্বত্র পূর্ণত্বের অন্ততঃ আভাস বর্ত্তমান। ব্রহ্ম নিত্য অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং ব্যোম হইতেও অনন্তগুণে সূক্ষ্ম। সুতরাং তিনি যে সর্ব্বত্র পূর্ণ হইবেন, তাহাতে আর সংশয় কোথায়? আর তাঁহার পূর্ণতাও নিত্য অনন্ত। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ না হইয়াই পারেন না। এই সম্পর্কে "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" এবং "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। তৃতীয়তঃ—জগৎ সসীম। সুতরাং জাগতিক পদার্থ মাত্রই সসীম। সুতরাং ব্যোমও সসীম পদার্থ মাত্র। সুতরাং ব্যোমের সহিত অনন্ত অসীম ব্রহ্মের তুলনাই হইতে পারে না। সসীমের সকলই সসীম। উহার স্বাভাবিক সসীমত্ব বশতঃ উহা বিন্দুতেও পূর্ণ হইতে পারে না। অপর দিকে ব্রহ্ম অনন্ত অসীম। অতএব যিনি নিত্য পূর্ণ, অখণ্ড ও অনন্ত, তিনি সর্ব্বত্রই অনন্ত ও পূর্ণ। ব্রহ্মকে কোন দেশে অবস্থিত মনে করিতে গেলেই ঐরূপ ভ্রান্তির উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমরা তাঁহাকে দেশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার অংশ সৃষ্টি করি। তিনি দেশে থাকিয়াও নিত্য দেশের অতীত। যদি একান্তই আমাদের বলিতে হয় যে ব্রহ্ম এখানে, ব্রহ্ম সেখানে, তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ, অনন্তেও পূর্ণ, সর্ব্বত্রই পূর্ণ, বিশ্বে তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, বিশ্বের অতীত অনন্তেও তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য সমূহ

এই ভাবেরই সমর্থক। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯।৪-৬ মন্ত্রত্রয় এবং কঠোপনিষদের ৫।৯-১১ মন্ত্রত্রয় বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য" উপরোক্ত ভাব হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আমরা আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। মন্ত্রটী ব্রহ্মের পূর্ণত্ব বিষয়ক, সুতরাং এই মন্ত্রস্থিত প্রত্যেক পূর্ণ শব্দের পরেই ব্রহ্ম শব্দ বর্ত্তমান, ইহা চিন্তা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পূর্ণ শব্দের পরে ব্রহ্ম শব্দ উহ্য আছে. ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ, অন্য কেহ বা কিছু পূর্ণ নহেন। মন্ত্রের তিনটী অংশ। যথা:—"(১) পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্। (২) পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে। (৩) পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" প্রথম অংশ:—পূর্ণমদঃ=পূর্ণম্+অদঃ=অদঃ পূর্ণম্=ঐ পূর্ণ। এস্থলে "ঐ" শব্দে কেহ অদৃশ্য ব্রহ্ম কেহ কারণাত্মক ব্রহ্ম, কেহ নিরুপাধিক ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্যই চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি ব্রহ্ম মনেরও অগ্রাহ্য। এই সম্বন্ধে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কখনও দৃশ্য হন না। ব্রহ্ম নিত্যই এক সমাবস্থাপন্ন, তিনি নিত্যই অদৃশ্য। সুতরাং "ঐ" শব্দ দ্বারা অদৃশ্য ব্রহ্মকে বুঝায় না। তিনি যখন নিত্য অনন্ত, পূর্ণ, অখণ্ড, নিরাকার ও নির্ব্বিকার, তখন তাঁহাকে "ঐ" "এই" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যায় না। কেহ "ঐ" শব্দে "কারণাত্মক ব্রহ্ম" অর্থ করিয়াছেন। ঐ একই কারণে সেই অর্থও এস্থলে যুক্তিযুক্ত হয় না। "ঐ," "এই" প্রভৃতি শব্দ জাগতিক পদার্থ মাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে, ব্রহ্মকে নহে। তিনি জাগতিক ভাবে অনির্দ্ধার্য। আবার "ঐ" শব্দে অদৃশ্য ব্রহ্ম বলিলে "এই" (ইদম্) শব্দে দৃশ্য ব্রহ্ম বলিতে হয় এবং কেহ কেহ তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু দৃশ্য ব্রহ্ম নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তিনিই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। আবার কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া দুই ব্রহ্ম নাই। এক ব্রহ্মই সত্য। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম নিত্যই

সমভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন বা বিকার নাই। তিনি নিত্যই কারণ বা কারণেরও অতীত। আবার তিনি নিত্যই কার্য্য করিতেছেন। আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দেখিতে পাই :— "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬।৮)"। "বঙ্গানুবাদ :—ইঁহার বিচিত্রা পরাশক্তি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া।" (তত্ত্বভূষণ)। সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্মের ক্রিয়া ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন :—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। (১।৪।১০)।" "বঙ্গানুবাদ :—অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্ম রূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকেই এইরূপ জানিয়াছিলেন—"আমিই ব্রহ্ম"। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)" আবার পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত প্রেম তত্ত্বে দেখা যায় যে আত্মা নিজেকে নিজেই প্রেম করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মের ক্রিয়া শক্তি স্বাভাবিকী। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা এবং তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই প্রেম, তিনিই প্রেমিক, তিনিই প্রেমের পাত্র। সুতরাং সৃষ্টি কালে তিনি কার্য্য করেন এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয়ান্তে তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন, ইহা সত্য নহে। এই সম্বন্ধে "মায়াবাদ" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। অতএব তিনি নিত্যই কারণাত্মক এবং কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম। অথবা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই অনন্তগুণে গুণবান, অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান এবং একই কালে (simultaneously) অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তির অতীত। সুতরাং তাঁহার কারণ ভাব ও কার্য্য ভাব পৃথক্ করিলে তাঁহার পূর্ণত্ব থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম কেবল কারণ ভাবেও পূর্ণ নহেন, কেবল কার্য্য ভাবেও পূর্ণ নহেন। কিন্তু তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন ভাব নিত্য মিলিত বলিয়াই তিনি নিত্য পূর্ণ। ব্রহ্ম নিত্যই উপাধি শূন্য। তিনি নিত্যই নিরুপাধিক। "অদঃ" শব্দে নিরুপাধিক ব্রহ্ম বুঝিতে হইলে "ইদম্" শব্দে সোপাধিক ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে এবং কেহ কেহ সেইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু সোপাধিক

ব্রহ্ম বলিয়া যখন কেহ নাই, তখন "অদঃ" শব্দের 'নিরুপাধিক ব্রহ্ম" অর্থ করা যুক্তি সঙ্গত হইবে না। যদি নিরুপাধিক ও সোপাধিক ব্রহ্ম বলিয়া দুই ব্রহ্ম কল্পিত হয়, অথবা একই ব্রহ্মকে দুই ভাগ করা যায়, তবে তিনি উঁহাদের একভাগে পূর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং নিরুপাধিক ও সোপাধিক উভয়ই পূর্ণ ব্রহ্ম নহেন। উভয় মিলিত ভাবেই পূর্ণ। অতএব আলোচ্য মন্ত্রের "অদঃ" শব্দের অর্থ অদৃশ্য ব্রহ্ম, কারণাত্মক ব্রহ্ম, অথবা নিরুপাধিক ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরাঅসমর্থ।" ঐ" শব্দে দূরস্থিত জাগতিক বস্তু বুঝায়। সুতরাং এস্থলে 'অদঃ পূর্ণম্" বলিতে বুঝিতে হইবে যে যাঁহাকে আমরা দূরদেশে বা দূরস্থিত বস্তুতে অবস্থিত আছেন বলিয়া মনে করিতেছি, সেই ব্রহ্ম পূর্ণ। অর্থাৎ ঐ বস্তুতে যিনি, তিনি পূর্ণ। অর্থাৎ আমাদের ধারণায় যিনি "দূরাৎ সুদূরে," তিনি পূর্ণ। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আমরা ব্রহ্মকে দেশ কালে অবস্থিত মনে করি, যদিও তাহা করিতে যাইয়া আমরা ভ্রান্ত হই। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ব্রহ্মের স্থান গোলোক বা বৈকুণ্ঠ বলেন, শাক্ত শৈবগণ ব্রহ্মের স্থান কৈলাসে বলেন। Semetic ধর্ম্ম সমূহে অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহাদের ব্রহ্মের স্থান স্বর্গে বলেন (**Father in Heaven**). উহারা সকলেই দূর দূরান্তরে। সুতরাং আমরা যে ব্রহ্মকে দূরদেশে অবস্থিত মনে করি, তাহা সত্য। সুতরাং দূরদেশে বা দূরস্থিত বস্তুতে যিনি, তিনি পূর্ণ. এই তত্ত্ব সত্য। অন্য ভাবেও ইহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তাহা এই যে ব্রহ্ম. যিনি দূরদেশেও নিত্য বর্ত্তমান, তিনিও পূর্ণ। মন্ত্রের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগ—পূর্ণমিদং= ইদং পূর্ণম্ =এই বা ইহা পূর্ণ। এস্থলে ইদম্ শব্দের অর্থ দৃশ্য ব্রহ্ম বা কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম বা সোপাধিক ব্রহ্ম বা বিশ্ব বলা হয়। তাহা যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এস্থলে "ইদং পূর্ণম্" বলিতে বুঝিতে হইবে যে আমরা যাঁহাকে নিকটে অবস্থিত মনে করিতেছি, তিনিও পূর্ণ। অর্থাৎ যিনি এই বস্তুতে

(নিকটস্থিত বস্তুতে), তিনি পূর্ণ। অর্থাৎ যিনি "তদিহান্তিকে" তিনি পূর্ণ। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মকে "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ" মনে করেন। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মকে সমভাবে সর্ব্বব্যাপী বিভুও মনে করেন। তিনি (ব্রহ্মবাদী) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) হৃদয়েও অবস্থিত মনে করেন। সুতরাং ব্রহ্মকে যে আমরা নিকটে মনে করি, তাহাও সত্য। সুতরাং নিকটস্থিত বস্তুতে বা দেশে অর্থাৎ নিকটে যিনি, তিনি পূর্ণ, এই তত্ত্ব সত্য। পূর্ব্বের ন্যায় বলা যাইতে পারে যে নিকটেও যিনি বর্ত্তমান, তিনি পূর্ণ। অতএব মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইল এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে—পূর্ণভাবে—অনন্ত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি নিকটে, তিনি দূরে তিনি বিশ্বে, তিনি বিশ্বের অতীত অনন্তে পূর্ণ ও অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান। তিনি নিত্য এক, অখণ্ড ও পূর্ণ। তাঁহার খণ্ড বা অংশ কল্পনারও অতীত। ঋষি মানব সমূহের হৃদয়ের ভাব জানিয়া উক্ত রূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এখন আলোচ্য মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় অংশ এইঃ—"পূর্ণা পূর্ণমুদচ্যতে।" অন্যান্য ব্যাখ্যা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হন। কেহ কেহ বলেন যে এই দ্বিতীয় পূর্ণ দৃশ্য ব্রহ্ম, কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, সোপাধিক ব্রহ্ম বা বিশ্ব। ইঁহারা কেহই পূর্ণ নহেন। দৃশ্য ব্রহ্ম বলিয়া কেহ নাই, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বিশ্ব যে সসীম, ইহা আর্য্য শাস্ত্রও বলেন (ব্রহ্মের একপাদে বিশ্ব অবস্থিত) এবং আধুনিক বিজ্ঞানও তাহাই বলেন। কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া উপনিষদে কোনও ব্রহ্মের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি বলা যায় যে একই ব্রহ্মেই কারণত্ব ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই বর্ত্তমান, সুতরাং কারণাত্মক ব্রহ্ম এবং কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম বলিতে ত্রুটি কোথায়, তবে বলিতে হয় যে ইহা সত্য যে ব্রহ্মেই উভয় ভাব বর্ত্তমান বটে, কিন্তু ঐ উভয় ভাবের এবং উঁহাদের আতীত্য ভাবের একত্বে তিনি পূর্ণ। উহার একটী ভাব বাদ দিয়া অন্য ভাব গ্রহণ করিলেই সেই খণ্ডীকৃত

ভাবটীকে আর পূর্ণ বলা যায় না, সেই ভাব অংশ মাত্র হয়। সোপাধিক ব্রহ্মও যে নাই অথবা সোপাধিক ব্রহ্ম কল্পিত হইলেও যে তিনি পূর্ণ নহেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে দৃশ্য ব্রহ্ম নাই, সোপাধিক ব্রহ্ম নাই, কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অথবা বিশ্ব পূর্ণ নহেন। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ ব্রহ্ম উৎপন্ন হইতে পারিলেন না। "উদচ্যতে" শব্দের অর্থ "নির্গত হয়, উৎপন্ন হয়" অর্থাৎ জন্মে। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে (পূর্ণ হইতে পূর্ণের বলা হইয়াছে) কি পূর্ণ ব্রহ্মের জন্ম হইতে পারে? ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহা ত কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (২।১৮)।" "বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানবান আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইঁনি অজ, নিত্য শাশ্বত (অপক্ষয় বর্জ্জিত) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইঁনি বিনষ্ট হন না। (তত্ত্বভূষণ)।" যখন ব্রহ্ম অজ, নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ এবং যখন তাঁহার হইতে কিছুই জন্মে না, তখন সেইরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অন্য পূর্ণের কি ভাবে জন্ম বা উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে কোনও পূর্ণবস্তুর উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণের উৎপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু অপূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাহাই না হইত, তবে ব্রহ্মের উপাদানত্বে জগতের উৎপত্তি হইতে পারিত না। ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের ভাসমানত্বে জগদুৎপত্তি হইয়াছে। উৎপত্তির অর্থে এস্থলে ভাসমানত্ব বুঝিতে হইবে। সেই জাগতিক দেহ যোগে স্বয়ং ব্রহ্মই জীবাত্মা রূপে সূক্ষ্ম ভাবে ভাসমান হইয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্যদ্বয়ে ব্রহ্ম নির্ব্বিকারই আছেন।

ইহার বিস্তৃত বিবরণ "অব্যক্তের পরিণাম" ও "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমুদ্র যেমন বায়ুযোগে তরঙ্গাকারে ভাসমান হয়, ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপও সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাযোগে জগদাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমুদ্রে তরঙ্গের উৎপত্তির জন্য উহার আসল বস্তুর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল আকারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার, অখণ্ড ও অবিভাজ্য অব্যক্ত স্বরূপের আকারের পরিবর্ত্তন-রূপ বিকারও হয় নাই। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন:—"তুমি নাথ নিরাকার, অথচ হে সর্ব্বাকার, তবু তুমি নির্ব্বিকার, ধন্য ধন্য গুণময়।" অতএব দেখা গেল যে পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই অংশের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে বুঝিতে হইবে। আমরা জগতে দেখিতে পাই যে উৎপাদক বস্তু হইতে উৎপন্ন বস্তু নির্গত হয়। এখন আমরা মনে করিতে পারি যে উৎপাদক বস্তুতে যিনি বর্ত্তমান, তিনি পূর্ণ এবং উৎপন্ন বস্তুতে যিনি বর্ত্তমান, তিনিও পূর্ণ। উৎপাদক হইতে উৎপন্ন নির্গত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম খণ্ডিত হন নাই, অথবা তাঁহার পূর্ণত্বের কোনই ক্ষতি হয় নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উৎপাদক উৎপন্ন অবিচ্ছেদে তিনি পূর্ণ। আমরা উৎপাদক ও উৎপন্নকে পৃথক পৃথক বস্তু মনে করি। সুতরাং সাধারণের পক্ষে প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম কি বৃহদাকার উৎপাদকেও পূর্ণ এবং ক্ষুদ্রাকার উৎপন্নেও পূর্ণ। এইরূপ প্রশ্নের কারণ এই যে আমরা জড় ভাবে জর্জ্জরিত, সেইজন্য আমরা জাগতিক দেশ ও উহার ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতে পারি না। সেইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই ঋষি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম উৎপাদকেও পূর্ণ, উৎপন্নেও পূর্ণ। অর্থাৎ তাঁহার অখণ্ড ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বভাব বশতঃ তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেই পূর্ণ। সুতরাং আমরা যে দেখিতেছি যে উৎপাদক হইতে যাহা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ব্রহ্মের পূর্ণত্বের কোনই বাধা

উৎপাদন করিতেছে না। একটী তত্ত্ব মনে রাখিলেই এই সম্বন্ধে সুমীমাংসা লাভ করা যায়। তাহা এই যে ব্রহ্ম নিত্যই নির্ব্বিকার এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা ও অনন্ত পূর্ণত্ব তাঁহার নিত্য স্বভাব। এখন মন্ত্রটীর তৃতীয় অংশের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত হইবে কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম উৎপাদকেও পূর্ণ, উৎপন্নেও পূর্ণ। এস্থলে ঋষি অন্য ভাবের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। প্রশ্নটী এই যে একটী সমস্ত বস্তু হইতে উহার কিছু অংশ গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম কি বাকী আদি বস্তুতেও পূর্ণ থাকেন এবং উহার যে অংশ পৃথক করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতেও কি তিনি পূর্ণ থাকিবেন? পাঠক এইরূপ এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে লিখিত এবং বর্ত্তমান প্রশ্নের ন্যায় প্রশ্ন কেবল সাধারণ ব্যক্তিগণই করিয়া থাকেন, তাহা নহে, কিন্তু যাহারা দার্শনিক আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যদি তাহাই না হইত, তবে ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মাতিরিক্ত বিশ্বের ও জীবকুলের কল্পনাই সম্ভব হইত না। তাই ঋষি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সমগ্র বস্তুতেও পূর্ণ, উহা হইতে কিছু অংশ পৃথক্ করিলে সমগ্র বস্তুটীর যাহা বাকী থাকে, তাহাতেও তিনি পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে পূর্ণ। কোন বস্তুকে শত সহস্র অংশে খণ্ড খণ্ড করিলে উহার প্রত্যেক অংশেই ব্রহ্ম পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহার বিভাগ হইতে পারে না। জড় পদার্থের বিভাগ হইতে পারে, কিন্তু জড়াতীত আত্মা বস্তুর অংশীকরণ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। আত্মা হইতে পূর্ণ দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্রও বাদ দেওয়া চলে না। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার, অখণ্ড এবং পূর্ণ। তাঁহার বিন্দু কল্পনাও অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে "অদঃ" শব্দে ঐ বস্তু বা দূরস্থিত বস্তুকে বুঝায় এবং "ইদম্" শব্দে ইহা বা নিকটস্থ বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু যথাক্রমে দূরস্থিত বস্তুতে যিনি এবং নিকটস্থিত

বস্তুতে যিনি, ইহা বুঝায় না। হাঁ। "অদঃ" এবং "ইদম্" শব্দ দ্বয়ের এইরূপ শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিলে এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা ব্রহ্মের পূর্ণত্ব বিষয়ক মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। সুতরাং আমরা উক্ত শব্দদ্বয় দূরস্থ ও নিকটস্থ বস্তুদ্বয়কে বুঝিব না, কিন্তু সেই বস্তু-দ্বয়ে যে ব্রহ্ম বর্ত্তমান, তাঁহাকেই বুঝিব এবং তিনিই যে উভয় স্থলেই পূর্ণ, তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে "ইদম্" শব্দে "অদৃশ্য ব্রহ্ম", "কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম," "সোপাধিক ব্রহ্ম," "সগুণ ব্রহ্ম" বা "বিশ্বকে" বুঝায় না। কারণ, উঁহারা কেহই পূর্ণ নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে "ইদং পূর্ণং" বাক্য সত্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে উপনিষদের ব্যাখ্যাতাগণ সকল সময় শাব্দিক অর্থ অবলম্বনে মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা করেন নাই। এস্থলে আরও বক্তব্য যে strictly বলিলে "ঐ" বা "ইহা" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যায় না। কারণ, তিনি অনির্ব্বাচ্য ও অনির্দ্ধার্য্য। ঐ, ইহা, উহা প্রভৃতি শব্দ জড় পদার্থের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় মাত্র। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায়ও কোনই ত্রুটী হয় নাই। এইরূপ উৎপাদকে যিনি বর্ত্তমান, তিনি পূর্ণ এবং উৎপন্নে যিনি বর্ত্তমান, তিনিও পূর্ণ বুঝিতে হইবে। এস্থলে উৎপাদক ও উৎপন্নকে পূর্ণ বুঝিতে হইবে না। কারণ, উৎপন্ন পদার্থ কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ হইতে যাহা উৎপন্ন বলিয়া মনে করা গেল, তাহা পূর্ণ নহে। সুতরাং দ্বিতীয় অংশেও আমরা বুঝিব যে উৎপাদকে এবং উৎপন্নে এক ব্রহ্মই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আলোচ্য মন্ত্র ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সূচক। সুতরাং কোনও অপূর্ণ বস্তু বা ভাব পূর্ণের স্থলে গ্রহণীয় হইতে পারে না। তৃতীয় অংশেও ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে উক্ত ভাবেই উহার মীমাংসা করা যাইতে পারে। এস্থলেও সমস্ত বস্তুতেও

তিনি পূর্ণ এবং উহার অংশ গ্রহণ করিলে উহাতে যাহা বাকী থাকে, তাহাতেও তিনি পূর্ণ। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আমরা দূরস্থিত বস্তুতে তিনি, নিকটস্থিত বস্তুতে তিনি ইত্যাদি বলিয়াছি। ইহা সত্য এবং এইরূপ ব্যবহার শ্রুতিতেও বর্ত্তমান। "যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥" (শ্বেত—২।১৭)। "বঙ্গানুবাদ:—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদায় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।" (তত্ত্বভূষণ)। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ (ঈশ—১)" "বঙ্গানুবাদ:—জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় এরূপ জানিয়া বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; অথবা, ঈশ্বর প্রদত্ত বিষয় দ্বারা ভোগ নির্ব্বাহ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। (তত্ত্বভূষণ)।" এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ (অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ) পাঠককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহাতেও দেখা যাইবে যে ব্রহ্ম সকল বস্তুতে, ভাবে প্রভৃতিতে অবস্থিত আছেন। ইহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যেরই উক্তি। বাহুল্য ভয়ে সেই সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইল না। * সুতরাং "অদঃ" শব্দে দূরস্থিত বস্তুতে যিনি, আর "ইদম্" শব্দে নিকটস্থ বস্তুতে যিনি ইত্যাদি বলায় কিছুই অসঙ্গত হয় নাই, বরং শ্রুতি সম্মতই হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত

---

* এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা জড় যে আত্মা নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই স্থলে এই ব্রাহ্মণের একটী মন্ত্র ঐ ব্রাহ্মণের সারভাগ লিখিত হইয়াছে।

শ্রুতিমন্ত্র সমূহ, প্রকরণ ও উপরোক্ত আলোচনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহাতে পূর্ব্বলিখিত ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন মানব হৃদয়ে উদয় হয়, উহাদের উত্তর দিতে যাইয়া ঋষি আলোচ্য মন্ত্র বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন উহার অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এই মন্ত্র পরিশিষ্টভাগে লিখিত হইয়াছে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এখন আমরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি, তবে আর পূর্ব্বোক্ত শাব্দিক ত্রুটিও থাকে না। উহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে "সকলই আত্মা" ভাবে উপদেশ দিয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে সর্ব্বশেষ বিশ্লেষণে (ultimate analysis-এ) আমরা পাই যে প্রত্যেক পদার্থের সার বস্তু (substance) স্বয়ং ব্রহ্মই। জড় পদার্থের phenomena বা নামরূপ সমূহ ব্রহ্মকৃত কারুকার্য্য মাত্র, কিন্তু আসল বস্তু তিনিই। আবার নামরূপও সেই আসল বস্তু দ্বারাই রচিত, যেমন স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য স্বর্ণ দ্বারাই গঠিত। স্বর্ণালঙ্কারে স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই থাকে না। সুতরাং এক অর্থে স্বর্ণালঙ্কারকে স্বর্ণই বলা যায়। সুতরাং সেইরূপ অর্থে প্রত্যেক বস্তুকেই ব্রহ্ম বলা যায়। সুতরাং "দূরস্থিত বস্তু তিনি," "নিকটস্থ বস্তু তিনি" বলিলে, "উৎপাদক তিনি," "উৎপন্নে তিনি" না বলিয়া "উৎপাদক তিনি," "উৎপন্নও তিনি" বলিলে, "সমগ্রে তিনি" "অংশেও তিনি" এবং "অংশ-বিযুক্ত পদার্থেও তিনি" না বলিয়া "সমগ্র পদার্থ তিনি," "অংশও তিনি" এবং "অংশ-বিযুক্ত পদার্থও তিনি" বলিলে বিশেষ কোন ত্রুটি হয় না। ব্রহ্ম যখন এক, অখণ্ড ও পূর্ণ, তখন সকল বস্তুর সার ভাগই পূর্ণ। এস্থলে আমাদের একটী বিষয় অবশ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই যে এই ভাবের চিন্তায় পদার্থের নামরূপকে তুচ্ছ (Ignore) করা হইয়াছে, কেবল মাত্র আসল পদার্থ বা সার পদার্থকে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবল মাত্র সেই

অর্থেই অর্থাৎ উপরোক্ত ভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া বস্তুকে ব্রহ্ম বলিলে বিশেষ কোন ক্রটি হয় না, অন্যথা নহে। অর্থাৎ যদি বস্তুটীকে পূর্ণ ভাবে অর্থাৎ সার পদার্থ+নামরূপ ভাবে চিন্তা করা যায়, তবে আর উহাকে ব্রহ্ম বলা যাইবে না। ইহার পরও প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি সকল বস্তুই ব্রহ্ম ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে ত আমরা মায়াবাদেই উপনীত হইলাম। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে সেইরূপ আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য, তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু (substance) নাই, ইহাও সত্য। আবার জড় জগৎও মিথ্যা নহে। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন নিম্নে লিখিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সর্ব্বপ্রধান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি "সকল বস্তুই ব্রহ্ম" ভাবের উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন স্থলেই তিনি জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই, মায়ার খেলা বলেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তিনি জাগতিক কারুকার্য্য বা নামরূপকে তুচ্ছ মনে করিয়াছেন এবং জগতের সার ভাগ যে ব্রহ্মই, সেই ভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়াই নানা উপদেশ দান করিয়াছেন। আমাদের এই অনুমান যে সত্য, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার মতানুযায়ী উক্ত উপনিষদের পরিশিষ্ট ভাগের কোনও মন্ত্র ব্যাখ্যা করিলে ক্রটি হয় বলিয়া মনে করি না, বরং প্রকরণ সঙ্গতই হয়। সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নহে। তাঁহার সেইমত যুক্তি সঙ্গত কিনা, তাহা লিখিত হইতেছে। জড় জগৎ কি? এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ+ তঁাহাতে ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সমূহ। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে সেই কারুকার্য্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে সেই অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা সুরচিত। অর্থাৎ নামরূপের একমাত্র উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ, অন্য কিছু নহে। এখন যদি আমরা একখানি স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে উহাও এক-

মাত্র স্বর্ণদ্বারা গঠিত এবং উহার কারুকার্য্য সমূহ সেই স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে। অর্থাৎ অলঙ্কার হইতে স্বর্ণ বাদ দিলে উহার কারুকার্য্য সমূহও বিলুপ্ত হয়। সমুদ্রতরঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হয়। সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্র জল বাদ দিলে তরঙ্গ থাকে না। কারণ, তরঙ্গের একমাত্র উপাদান কারণ সমুদ্রজল। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে জড় জগৎ হইতে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মকে বাদ দিলে জাগতিক কারুকার্য্য বা নাম-রূপের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং জড় জগতের একমাত্র বস্তু (substance) ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে জগৎ যে ভাবে বর্ত্তমান আছে (as it is), তাহাতে উহা হইতে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ কখনই বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই বস্তুত্ব (substance) ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি জগৎ হইতে কারুকার্য্য abstract করা হয়, তবে চিন্তায় নামরূপ পাই বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোথায়ও কেবল নামরূপ ভাবে কিছুই পাই না। সুতরাং ঐরূপ বাদ দেওয়াকে False abstraction বলা যাইতে পারে। কারণ, স্বাধীন ভাবে উহাদের অস্তিত্ব কোথায়ও নাই। সুতরাং ঐরূপ Falsely abstracted নামরূপ মিথ্যা বটে, কিন্তু বাস্তব নামরূপ মিথ্যা নহে। কারণ, উহাদের পশ্চাতে উপাদান ভাবে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম চির বর্ত্তমান। মায়াবাদ ও সত্য-দর্শনের পার্থক্য এই যে মায়াবাদ একমাত্র নামরূপকেই জগৎ বলেন এবং মায়াই উহার উপাদান ও অধিষ্ঠাত্রী। মায়ার অবসানে নামরূপ থাকে না, কিন্তু ব্রহ্ম মাত্রই থাকেন। জগন্মিথ্যাবাদ মায়াবাদের ভিত্তিভূমি। উক্ত মতে কারুকার্য্যকে বা নামরূপকে মিথ্যাই বলা হয়। আর সত্য-দর্শন ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলেন এবং সেই অব্যক্ত স্বরূপের যোগে সংঘটিত কারুকার্য্য সমূহকে মিথ্যা বলেন না, সত্যই বলেন। কারণ, ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ যাহার উপাদান, তাহা মিথ্যা হইতে

পারে না। তবে ইহা নিত্য নহে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ যখন নিত্য সত্য এবং উঁহার উপাদানত্বেই যখন জগৎ হইয়াছে, তখন জগৎই বা কেন নিত্য সত্য হইবে না? ইহার উত্তর নিম্নে লিখিত হইতেছে। জগদুৎপত্তির দুইটী কারণ। একটী উপাদান ও অন্যটী নিমিত্ত। এই দুইটী কারণ ব্যতীত কোনও বস্তু হয় না। ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ জগতের উপাদান কারণ এবং তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছা উহার নিমিত্ত কারণ। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে কারুকার্য্য সমূহ বা নামরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত। এক অর্থে আমাদের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত উহাদিগকে artificial বলা যাইতে পারে। কারণ, উহারা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। অর্থাৎ উহারা অব্যক্ত স্বরূপের স্বভাবজাত বা automatic নহে, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় উঁহা নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন:—"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। (৪।১)।" "বঙ্গানুবাদ:—যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা শক্তিযোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।" (৬।১২)। "বঙ্গানুবাদ:—যিনি এক বীজকে বহু প্রকার করেন।(তত্ত্বভূষণ)"(অব্যক্ত স্বরূপ জগতের বীজ)। কঠোপনিষদ্ বলেন:—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" (৫।১২)। "বঙ্গানুবাদ:—এক রূপকে যিনি বহু প্রকার করেন।" (তত্ত্বভূষণ)। (এস্থলে রূপ অর্থে স্বরূপ বা গুণ। অব্যক্ত ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ।) এই সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছা ব্রহ্মের নিত্যা ও পূর্ণা ইচ্ছাশক্তির সাময়িক ভাব। কারণ, সৃষ্টি ছিল না এবং থাকিবে না। কিন্তু ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি থাকিবে। কারণ, উহা নিত্যা। সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছাশক্তি প্রকার ভেদে তিন—সিসৃক্ষা, রিরক্ষিষা এবং জিহীর্ষা। মানব মাত্রেরই ইচ্ছাশক্তি আছে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। পাশ্চাত্যদর্শন আমাদের অন্তঃকরণকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

যথা—knowing, feeling and willing. কিন্তু আমাদের সেই ইচ্ছাশক্তিরও নানা কালে নানা ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই। সেই সকল প্রকাশ সাময়িক, কিন্তু আমাদের মূলা ইচ্ছাশক্তি নিত্যা। সেইরূপ ব্রহ্মের মূলা ইচ্ছাশক্তি নিত্যা বটেন। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি-বিষয়িণী বিশেষ ইচ্ছা অনিত্যা। "সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছা অনিত্যা" বলায় বুঝিতে হইবে না যে উঁহা প্রথম ক্ষণে উদিত হইয়া, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির আদি অন্ত যেমন মানব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না এবং সেই জন্যই সৃষ্টিকে অনাদি অনন্ত বলা হয়, সেই রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছার আদি অন্ত মানব হৃদয়ে অধার্য্য। সেইরূপ অনিত্যা সৃষ্টি-বিষয়িণী ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্ট জগতের কারু-কার্য্য সমূহও অনিত্য। কারুকার্য্যের বস্তু ভাগ (substance) অবশ্যই নিত্য। কারণ, উহা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপই। উঁহার স্বভাবই নিত্যত্ব। অতএব আমরা দেখিলাম যে জগৎ অনিত্য হইলেও অসত্য নহে। মায়াবাদ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র নামরূপকেই জগৎ মনে করায় উহাকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা কখনও বলি না যে স্বর্ণালঙ্কার কেবল কারুকার্য্য বা নামরূপ মাত্র। আমরা বলি যে উহা স্বর্ণখণ্ড+ কারুকার্য্য সমূহ। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগতের নামরূপকে চিন্তা করাকে false abstraction বলা যাইতে পারে। জগৎ যখন ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপের উপাদানে গঠিত এবং জগৎ যখন উঁহাতেই স্থিত আছে ও চিরকাল থাকিবে এবং কেহই যখন জগৎ হইতে অব্যক্ত স্বরূপ ও কারুকার্য্য সমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না; তখন জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এই স্থলে আমাদের আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই যে কোনও একটী বিষয় তুচ্ছ করিলেই তাহা মিথ্যা হয় না। আমরা বহু বস্তুকে তুচ্ছ করি বটে, কিন্তু সেই জন্য সেই সকল বস্তু মিথ্যা হইয়া

যায় না। সেইরূপ অব্যক্ত স্বরূপের সুতরাং ব্রহ্মের তুলনায় তাঁহার ইচ্ছাকৃত কারুকার্য্য সমূহ নগণ্য বা অতি তুচ্ছ বটে, কিন্তু সেই জন্যই জাগতিক কারুকার্য্য সমূহকে মিথ্যা বলা যায় না। আর একটী কথা এই যে কোন সমস্যার মীমাংসার জন্য আমরা চিন্তা দ্বারা কোন কিছুর কোন কিছু অংশ বাদ দিয়া বিচার করিতে পারি। তাহাতে সত্য মীমাংসায় যদি আসিতে পারা যায়, তবে সেই সেই ভাবের চিন্তায় বিশেষ কোন ক্রটি নাই। অতএব আমরা দেখিলাম যে জাগতিক বস্তু মাত্রেরই substance ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম এবং উহার নামরূপ ব্রহ্মের তুলনায় অতি তুচ্ছ। সুতরাং সেই অর্থে প্রত্যেক বস্তুকে ব্রহ্ম বলিলে বিশেষ কোনও ক্রটি হয় না। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে গণিতেও সময় সময় নগণ্য সংখ্যাকে তুচ্ছ করা হয়। যাহা হউক্, ইহা বলা যাইতে পারে যে ঐরূপ করিতে যাইয়াই মায়াবাদ প্রায় শূন্যবাদে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতা নিতে হইবে। যে সকল আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ে ধারণা করিয়াই পদার্থের বস্তু ভাগকে ব্রহ্ম বলিতে পারা যায়, অন্যথা নহে। এই কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। জাগতিক কারুকার্য্য বা নামরূপের স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ উপাদান কারণ-বিবর্জ্জিত ভাবে কোনও অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু ইহাও সত্য যে উহারা যে অব্যক্ত স্বরূপ হইতে বিভক্ত না হইয়াও Distinct ভাবে চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই Distinction পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা একটী পরিধি শূন্য অনন্ত বা বৃহত্তম বৃত্তের কল্পনা করি। এই বৃত্তের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত হউক্ এবং সেই ক্ষুদ্র বৃত্তকে কারুকার্য্য সমন্বিত একটী অতি সুন্দর পদ্মে পরিণমন করি। এই পদ্মটী ক্ষুদ্র বৃত্তের, সুতরাং বৃহত্তম বৃত্তের অবলম্বনে রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা বৃহত্তম বৃত্ত হইতে বিভক্ত না হইয়াও Distinct ভাবে বর্ত্তমান। এই পরিধি শূন্য

বৃহত্তম বৃত্তটাই ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম স্থানীয় এবং উঁহাই তাঁহার অনন্ত শক্তি সম্পন্না ইচ্ছা দ্বারা ক্ষুদ্র ও সুন্দর বিশ্বরূপে ভাসমান হইয়াছেন। অতএব যখন নামরূপকে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারি না এবং উহারা যখন উপাদান কারণ অবলম্বনে সত্য ভাবেই বর্ত্তমান, তখন জগৎ মিথ্যা নহে এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের ভেদাভেদ সম্পর্ক। অর্থাৎ জগতের কেবল মাত্র বস্তু ভাগ গ্রহণ করিলে অভেদ বলা যায়, কিন্তু নামরূপ সহ জগৎ চিন্তা করিলে উহাকে ভেদ বলা যায়। এই ভেদের অর্থ বিভাগ নহে, কিন্তু পৃথক্ ভাবাপন্ন বা Distinct. জীবের অর্থ আত্মা + দেহ। দেহ জাগতিক পদার্থ। আত্মা দেহাবদ্ধ বলিয়াই ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। আত্মা ও পরমাত্মায় স্বরূপতঃ কোনই পার্থক্য নাই, কিন্তু দেহবদ্ধতা জন্য জীবাত্মা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদাভেদ সম্পর্ক। এই সম্বন্ধে "অব্যক্তের পরিণাম" এবং "ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদও আছে, অভেদও আছে। এই ভেদ ও অভেদ কি প্রকারের ও কতটুকু, তাহা বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে এবং সেই ভাবেই ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। আমরা ভেদের মাত্রাও বাড়াইব না, অভেদের মাত্রাও বাড়াইব না। উভয় ভাবই যখন সত্য, তখন উভয়ের মাত্রা সম্বন্ধেই আমরা সতর্ক হইব। যদি তাহা না হই, তবে হয় আমরা মায়াবাদী হইব, নতুবা দ্বৈতবাদী হইব। পশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে Subjective Idealism-এর Logical conclusion-এ Hume-এর শূন্যবাদে উপনীত হইতে হইবে এবং Realism-এর শেষ ভাগে দ্বৈতবাদ বা জড়বাদ স্বীকার করিতে হইবে। আবারও প্রশ্ন হইবে যে বিশ্ব একটি বস্তু এবং উহা জড় পদার্থ, সুতরাং প্রোক্ত অর্থে বিশ্বকেও ব্রহ্ম বলা যায় এবং সেই একই অর্থে উহাও পূর্ণ। সুতরাং আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম ভাগ স্থিত "ইদং"

এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে স্থিত দ্বিতীয় "পূর্ণের" অর্থ বিশ্ব করিলে কোনও ত্রুটি হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সেই অর্থে এবং কেবল মাত্র সেই অর্থেই বিশ্বকে ব্রহ্ম বলিতে ত্রুটি নাই বটে, কিন্তু নামরূপ সমন্বিত বিশ্বকে ব্রহ্ম বলিলে অবশ্যই ত্রুটি হইবে। ব্যাখ্যাতৃগণ বিশ্বকে নামরূপ সমন্বিত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, উহার কেবল মাত্র সারভাগকে লক্ষ্য করেন নাই। সেই জন্যই তাঁহারা সোপাধিক ব্রহ্ম, কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নামরূপ সমন্বিত বিশ্বকে পূর্ণব্রহ্ম বলা যায় না। উপসংহারে বক্তব্য এই যে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায়ও ত্রুটি বর্ত্তমান। অর্থাৎ উহাতে অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে স্থিত সুস্পষ্ট সত্তা নামরূপকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ জাগতিক পদার্থকে সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইল না, আংশিক ভাবে মাত্র চিন্তিত হইল। প্রথম ব্যাখ্যার ত্রুটি শাব্দিকমাত্র এবং ঐরূপ ত্রুটি সকল ব্যাখ্যায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা ঔপনিষদিক উক্তি দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে স্বয়ং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সেইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় ত্রুটি গুরুতর। গুরুতর এই অর্থে যে উহাতে বস্তুসমূহকে সুতরাং জগৎকে সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হয় নাই এবং এই ভাব গ্রহণ করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং একটু ভুল হইলেই বহু অনর্থপাতের আশঙ্কা আছে। * উহাতে বস্তু সমূহকে সুতরাং জগৎকে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে নামরূপকে স্বাধীন ও পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করাকে False abstraoton বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় এবং আমরা সেই ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী. অতএব আমরা দেখিতেছি

---

* One false step and you are driven to Mayavad and thence to Sunyavad.

যে ব্রহ্ম নিত্য এক, অখণ্ড, অনন্ত ও পূর্ণ। তাঁহারই অনন্ত পূর্ণত্ব অটুট ভাবে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ, বিশ্বেও পূর্ণ, বিশ্বের অতীত অনন্তেও তিনি পূর্ণ, তিনি পঞ্চভূতে পূর্ণ, পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতেও পূর্ণ. "অনলে, অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধর, সলিলে, গহনে, বিটপি লতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে" তিনি পূর্ণ; আবার ভূতসমূহ অতিক্রম করিয়াও তিনি পূর্ণ; তিনি বিশ্বের আদিতে পূর্ণ, অন্তে পূর্ণ, মধ্যেও পূর্ণ; তিনি স্থূলে পূর্ণ, সূক্ষ্মে পূর্ণ, কারণেও তিনি পূর্ণ, আবার কারণাতীত হইয়াও তিনি পূর্ণ, তিনি এখানে পূর্ণ, সেখানে পূর্ণ, গৃহে পূর্ণ, দেশে পূর্ণ, পৃথিবীতে পূর্ণ, নরকে পূর্ণ, স্বর্গে পূর্ণ, বিশ্বস্থিত অসংখ্য মণ্ডলের প্রত্যেক মণ্ডলে তিনি পূর্ণ, তিনি আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবে পূর্ণ, প্রাণের প্রত্যেক স্পন্দনে তিনি পূর্ণ, প্রত্যেক কার্য্যে পূর্ণ, প্রত্যেক বাক্যে তিনি পূর্ণ; তিনি উৎপাদকে পূর্ণ, তিনি উৎপন্নে পূর্ণ, তিনি সমস্ত বস্তুতে পূর্ণ, উহাদের অংশ সমূহে পূর্ণ, তিনি আমার দক্ষিণে পূর্ণ, আমার বামে পূর্ণ, তিনি ঊর্দ্ধে পূর্ণ, অধোদেশে পূর্ণ, তিনি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চারিদিকে পূর্ণ, দশদিকে পূর্ণ, অসংখ্য দিকে পূর্ণ; তিনি আমার অন্তরে পূর্ণ, বাহিরে পূর্ণ; তিনি অসংখ্য বস্তুতে পূর্ণ, বিশ্বকে অসংখ্য পরমাণুতে বিভাগ করিলে উহার প্রত্যেক পরমাণুতে তিনি পূর্ণ; তিনি স্বয়ং পূর্ণ, প্রত্যেক জীবের আত্মায় তিনি পূর্ণ, তিনিই একমাত্র পরিধি শূন্য বৃত্ত, সেই অপার অনন্ত বৃত্তের প্রত্যেক কল্পিত বিন্দুই তাঁহার মধ্য বিন্দু; তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম. তিনিই নিত্য নির্ব্বিকার, অখণ্ড ও পূর্ণ; তিনিই নিত্য অবিভাজ্য. তাঁহার কোনই অংশ হইতে পারে না। তিনি নিত্য দেশ কালে পূর্ণ ভাবে থাকিয়াও দেশ কালের অতীত ও পূর্ণ; তাঁহার নিত্য পূর্ণত্বের কখনই কোনও ক্ষতি হয় না বা হইতেও পারে না। তিনি পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ, তাঁহাকে অনন্ত কাল বলিয়া অনন্তবার পূর্ণ বলিলেও তাঁহার অনন্ত ও নিত্য পূর্ণত্বের

কিছুই বলা হয় না। তবে আসুন আমরা সেই অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম ওঁংকে বারংবার, অসংখ্যবার হৃদয়ের অন্তরতমস্থল হইতে ভক্তি ভরে, প্রেম পূর্ণ অন্তরে, জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রণাম করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই, অনন্ত অনন্ত অনন্ত স্নেহময় পিতার নিকট তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি এবং সর্ব্বদা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করি।

পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ প্রেম রসধাম,
পূর্ণ জ্যোতিঃ, পূর্ণ শিব, দয়ানিধি, ভগবান। *

ওঁং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

বিনাস্তিকত্বেন তপঃফলং ফলেৎ
সচ্ছাস্ত্রবোধশ্চ বিনা মতিং যদি।
ভক্তিং বিনা মুক্তিফলং ভবেচ্চ চেৎ
তথাপি চিত্তং ন চলেত্ত্বদীশ মে॥

(পরমর্ষি গুরুনাথ)

তৃতীয় পরিশিষ্ট

উপনিষদে কি শূন্যবাদ আছে?

বেদান্তে বা উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির সম্বন্ধে উপনিষদের বহু স্থলে বহুমন্ত্র কথিত হইয়াছে।

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

(কীর্ত্তনের সুরে গীত হইতে পারে।)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোন কোন পণ্ডিত সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে দুই একটী মন্ত্রের কদর্থ করিয়া বলেন যে উপনিষদেও শূন্যবাদ দৃষ্ট হয়। তাহাদের এইরূপ বলিবার কারণ মনে হয় যে দুই একটী মন্ত্রের দুই একটী শব্দ প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা ঐরূপ অর্থ করেন। আমরা প্রামাণ্য উপনিষদ্ হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মন্ত্র সমূহ উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে তাহাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। প্রারম্ভে আমাদের বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে উপনিষদ সৃষ্টিকে সাদি বলেন। বহু স্থলেই বলা হইয়াছে যে এই জগৎ ছিল না এবং একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন. তাই জগৎ উৎপন্ন হইল। সৃষ্টি যে সাদি, তাহা উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা ভাষায় বর্ণনা করিতে যাইয়া যাহা বলা হইয়াছে. তাহাই দুই এক স্থলে প্রোক্ত ব্যক্তিদিগের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে।

কঠোপনিষদ্—"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। (৫।১২)" "বঙ্গানুবাদ:—যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বীয় একরূপকে বহু প্রকার করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য:—এস্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বীয় এক রূপ হইতে বহুরূপ বিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই যে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা গেল। কঠোপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বে পরিপূর্ণ। উহাতে শূন্যবাদের চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।)

প্রশ্নোপনিষদ্:—"তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। (১।৪)।" "বঙ্গানুবাদ:—তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—প্রজাপতি প্রজাকাম অর্থাৎ প্রাণীদের উৎপত্তিবিষয়ে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা করিলেন অর্থাৎ আত্মিক গুণ সমূহের কোনটীর ঐশ্বর্য্য অধিক, তাহা ইচ্ছা করিলেন। তিনি উক্তরূপ ইচ্ছা করিয়া এবং "ইহারা আমার জন্য বহুবিধ প্রাণী

উৎপাদন করিবে'' এই ভাবিয়া রয়ি অর্থাৎ আদি ভূত এবং প্রাণ অর্থাৎ চৈতন্য এই মিথুন উৎপাদন করিলেন।" (মন্তব্য :—এস্থলে ব্রহ্মকৃত সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এস্থলে উপাদানের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই বটে, কিন্তু চেতন ও ভূতোৎপত্তির কথা আছে। শূন্য হইতে চেতন আসিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তাহা আসিয়াছে, ইহা সত্য। আবার শূন্য হইতে ভূতও আসিতে পারে না। ইহা যে সত্য, তাহা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখিতে পাইব। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন কেহ বা কিছু ছিল না বা থাকিতেও পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতেই জগৎ আসিয়াছে। সুতরাং তিনিই জগতের উপাদান কারণ। তিনি যে জগতের নিমিত্ত কারণ, তাহা মন্ত্রে সুস্পষ্ট। সুতরাং শূন্য হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না।) 'স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্ মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকা লোকেষু চ নাম চ। (৬।৪)" "বঙ্গানুবাদ :—তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন উৎপন্ন হইল। অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম উৎপন্ন হইল।" (মন্তব্য :—এস্থলে পূর্ব্বমন্ত্রের উপর মন্তব্য প্রযোজ্য।) মুণ্ডকোপনিষদ :—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥' "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥' "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥ (১।১।৭-৯)।' "বঙ্গানুবাদ— "যেমন উর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি এখানে অর্থাৎ সংসার মণ্ডলে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়।" "তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তি

বিবিক্ষতা দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহা হইতে অর্থাৎ উপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্নে অর্থাৎ জগদুৎপত্তির বীজ জন্মিল। অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, ভূরাদি লোক সমূহ এবং কর্ম্মজ অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল।" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমুদায় জানেন, সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষরূপে সমুদায় জানেন, যাঁহার তপঃ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই (হিরণ্য-গর্ভাক্ষ্য) ব্রহ্ম, নাম, রূপ, এবং অন্ন জন্মিয়াছে।" (তত্ত্বভূষণ) (মন্তব্য :—উপরোক্ত মন্ত্র সমূহ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম হইতেই এবং ব্রহ্ম দ্বারাই জগৎ উৎপন্ন অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সুতরাং শূন্য হইতে সৃষ্টির প্রশ্নই উত্থিত হইতে পারে না) 'তদেতৎ সত্যম্—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ (২।১।১)" 'বঙ্গানুবাদ :—ইহা সত্য,—যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ বিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। (তত্ত্বভূষণ)" "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ (২।১।৩)" "বঙ্গানুবাদ :—এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মনঃ, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল, এবং সমুদায়ের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। (তত্ত্বভূষণ)" (মন্তব্য :—এই মন্ত্রদ্বয় হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তিনি জগতের উপাদান কারণ। মুণ্ডক উপনিষদের ২য় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে আরও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে জগতের সকলই তাঁহার হইতে আসিয়াছে, শূন্য হইতে নহে।) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ :—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।

ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽ-ন্নরসময়ঃ। (২।১)।” “বঙ্গানুবাদ :—এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে মনুষ্য হইয়াছে। এই মনুষ্য অন্নরসের বিকার। (তত্ত্বভূষণ)।” “সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। (২।৬)।” “বঙ্গানুবাদ :—তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন। আমি প্রজা উৎপত্তির জন্য বহু হইব। তিনি তপঃ করিলেন অর্থাৎ আত্মগুণ সমূহের কোনটার ঐশ্বর্য্য অধিক, ইহা ইচ্ছা করিলেন। এই যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়, তিনি পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছা করিয়াই সৃষ্টি করিলেন। (পরমর্ষি গুরুনাথ)।” “তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ; নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্য-ঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। (২।৬)” “বঙ্গানুবাদ:—ব্রহ্ম তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যাহা কিছু আছে, —সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে সত্য বলে। (তত্ত্বভূষণ)।” “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। (২।৭)।” “বঙ্গানুবাদ :—বিশেষ বিশেষ নামরূপবৎ প্রকাশিত এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নামরূপবৎ প্রকাশের বিপরীত অবিকৃত ব্রহ্মরূপ ছিল। তাহা (অর্থাৎ অসৎ শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম) হইতে সৎ অর্থাৎ প্রকাশিত নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং-কর্ত্তা বলে। ইতি। যিনি সেই

সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য :—পূর্ব্বোদ্ধৃত ২।১ এবং ২।৬ মন্ত্রদ্বয় হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ২।৭ মন্ত্রে অর্থাৎ ২।৬ মন্ত্রের অব্যবহিত পরের মন্ত্রে প্রথমতঃ লিখিত হইয়াছে যে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" এই বাক্যের কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে শূন্য হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থলে ঐরূপ অর্থ কিরূপে হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যদি সেই অর্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে উহা ২।৬ মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। একই ঋষি একই উপনিষদে পরপর দুইটী বিরুদ্ধতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সত্য ব্যাখ্যা হইয়াছে। এস্থলে সৎ এর অর্থ নামরূপ সম্বলিত জগৎ। তাহার প্রমাণ এই যে এই মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে "ততো বৈ সদজায়ত।" সুতরাং সৎ বলিতে ঋষি এস্থলে নামরূপ সম্বলিত জগৎকেই বুঝিয়াছেন। সুতরাং যে অবস্থায় নামরূপ সম্বলিত জগৎ ছিল না, তাহা সৎ এর বিপরীত অবস্থা বা অসৎ অবস্থা। এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন, জগৎ ছিল না। সেই অবস্থাকে তাবায় বলিতে যাইয়াই "অসৎ" শব্দ অর্থাৎ "নামরূপ বিহীন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মানব সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকেই সত্য বলে। মুণ্ডকোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।১।৮ মন্ত্রে সত্য শব্দের ব্যাখ্যায় তত্ত্বভূষণ মহাশয় আকাশাদি পঞ্চভূতকেই সত্য বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে Realist-গণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহকেই Real বা সত্য বলেন। আলোচ্য মন্ত্রে অসৎ অর্থে শূন্য হইতে পারে না। কারণ, উহার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির কথা আছে। সেইরূপ ভাবে অর্থ করিলে অত্যন্তভাবে প্রকাশ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইতে পারে না।) এই সম্পর্কে ৬ষ্ঠ অনুবাকের প্রারম্ভিক মন্ত্র

দিয়ে উদ্ধৃত হইল। "অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।" "বঙ্গানুবাদ :—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ মনে করে, তবে সে অসৎই হয়। যদি কেহ মনে করে যে ব্রহ্ম আছেন, তবে জ্ঞানিগণ তাঁহাকে সৎ বলিয়া মনে করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" ইহার পরেও কি বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির কথা না বলিয়া ঋষি আলোচ্য মন্ত্রে শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন? তৈত্তিরীয়োপনিষদ আদ্যোপান্ত ব্রহ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। আলোচ্য মন্ত্র ব্রহ্মানন্দবল্লীর অন্তর্গত। এই প্রকরণেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বর্ত্তমান। ইহাকে ব্রহ্ম প্রকরণও বলা হয়। সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" সূত্র (১।৪।২৬)—এই উপনিষদের উপরোক্ত মন্ত্র দ্বয়ের (২।৬-৭) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রহ্ম নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছেন, এই কথাই সত্য। আলোচ্য মন্ত্রেই লিখিত আছে :—তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। শূন্য কখনও নিজ হইতে নিজ দ্বারা কিছুই উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, শূন্য কখনও ক্রিয়া করিতে পারে না। অর্থাৎ শূন্যে কোনই বস্তু সত্তাও নাই এবং উহা কোনও রূপ ক্রিয়া করিতে একান্ত অক্ষম। সুতরাং উহা নিজ হইতে নিজ দ্বারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই জগতের একমাত্র স্রষ্টা, তিনি রস স্বরূপ, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনিই তাঁহার অনন্ত প্রেমময়ী ইচ্ছা যোগে তাঁহারই অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বনে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে মূল গ্রন্থে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিশ্বে বা বিশ্বাতীত অনন্তে শূন্য বলিয়া কোন কিছু নাই। আমরা স্থূল লইয়াই থাকি এবং স্থূলের চিন্তাই করি, কিন্তু ব্রহ্ম ত স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, কিন্তু

তিনি কারণ এবং কারণেরও অতীত। সুতরাং জড় ভাবে জর্জরিত মানব স্থূলকেই সত্য মনে করে। দেহাত্মভেদ-জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ একই কথা। কিন্তু আমরা দেহাত্মভেদ-জ্ঞান ত করিই না, অপরন্তু আমরা দেহাত্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন। বর্ত্তমান পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে মানব সাধারণ Politics and Business নিয়াই একান্ত ব্যস্ত। বহুলোক আছেন, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহেন, তাহারা দেহ-সর্ব্বস্ব এবং ইহ সর্ব্বস্ব। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলেন এবং চিরাচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সময় সময় যোগ দান করেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রকৃত ভাবে বিশ্বাসী নহেন। মানুষ কেবল নিজের সুখ সুবিধা নিয়াই ব্যস্ত। অলসতা ও আরামই সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। They remain quite content if the demands of the flesh are fully satisfied. They want nothing more. বিজ্ঞানও সেই দিকে ইন্ধন যোগাইতেছে। ইহাই যখন মানব সাধারণের অবস্থা, তখন সে সূক্ষের কথা, হেতোঃহেতুক কারণের কথা চিন্তা করিবে কি প্রকারে? সুতরাং সে জড়কেই একমাত্র সত্য বস্তু মনে করে। অতএব পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ আসিয়াছে, শূন্য হইতে নহে। ঐতরেয়োপনিষদ :—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকান-সৃজত। (১।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—এই জগৎ পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিল। নিমেষ ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন, "আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব ?" এরূপ আলোচনা করিয়া তিনি এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য :—এস্থলে ব্রহ্মই সৃষ্টি কর্ত্তা। একমাত্র তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, অন্য কিছুই ছিলেন না। সুতরাং জগতের উপাদান কারণও তিনি। এই কথা এস্থলে বিস্তার করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু শূন্য হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। Nothing can produce nothing. সুতরাং ইহা সহজ বোধ্য

যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র সমূহও তাহাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদঃ —"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ (৪।১)" "বঙ্গানুবাদ:—যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা শক্তিযোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে সমুদায় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য:—ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে।) "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্ একং বীজং বহুধা যঃ করোতি। (৬।১২)" "বঙ্গানুবাদ:—যিনি অনেক নিষ্ক্রিয় বস্তুর একমাত্র নিয়ন্তা, যিনি একমাত্র বীজকে বহু প্রকার করেন। (তত্ত্বভূষণ)।" (মন্তব্য:—পূর্ব্বোদ্ধৃত কঠোপনিষদের ৫।১২ মন্ত্র এবং এই মন্ত্র একই। কেবল "রূপ" স্থলে "বীজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার একরূপকে বীজ ভাবে গ্রহণ করিয়া জগৎ সৃজন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।) ছান্দোগ্য উপনিষদ: —"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীত্তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্। (৩।১৯।১)।" "বঙ্গানুবাদ:—'আদিত্যই ব্রহ্ম' এই উপদেশ। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই:—এই (জগৎ) পূর্ব্বে অসৎ (অর্থাৎ নামরূপ বিহীন) ছিল। তাহা সৎ (অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তাবান্) হইল, তাহা সম্ভূত হইল, তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল, তাহা এক বৎসরকাল স্পন্দহীন অবস্থায় রহিল, তাহার পরে বিভিন্ন হইল; অণ্ডের একভাগ রজতময়, অপর ভাগ সুবর্ণময় হইল। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" (মন্তব্য:—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ মন্ত্রদ্বয়ের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এস্থলেও "অসৎ" শব্দের অর্থ সেইরূপ ভাবেই বুঝিতে হইবে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল"

ইহার অর্থই এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, কিন্তু নামরূপ সম্বলিত জগৎ ছিল না। এস্থলেও অসৎ অর্থে "নামরূপ বিহীন" সুস্পষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই ইহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই ভাব অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়াছে।) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। (ছান্দোগ্য—৬।২।১-৩)।" "বঙ্গানুবাদঃ —হে সৌম্য! অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্ত্তমান ছিল। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি (ইহার পর আরও) বলিলেন "কিন্তু হে সৌম্য! কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে ? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে ?" এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সত্রূপেই বর্ত্তমান ছিল। সেই সৎ স্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা সঙ্কল্প করিলেন আমি বহু হই ; আমি জন্ম গ্রহণ করি। অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" (মন্তব্য : এস্থলে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক-মাত্র সৎই (ব্রহ্মই) বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার হইতেই এবং তাঁহার দ্বারাই নামরূপ সম্বলিত জগৎ উৎপন্ন হইল। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে অসৎ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা এই বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে যে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুরূপ আপত্তিও খণ্ডিত হইল। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কোন মন্ত্রোক্ত অসৎ শব্দের অর্থ নামরূপ বিহীন ব্রহ্ম অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ সম্বলিত জগতের বিপরীত একমাত্র নামরূপ বিহীন ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। এই মন্ত্র সমূহ দ্বারা সকল নাস্তিকতা এবং শূন্যবাদ

প্রতিত হইল বুঝিতে হইবে। Nothing can come out of nothing তত্ব ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। (৩।১৪।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, (কারণ) তাঁহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" (মন্তব্য :—ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান, তাহা বলা হইল। বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ, (১।১।২)" সূত্র এই মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।) বৃহদারণ্যক উপনিষদ :—"নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যু স্তন্মনোহকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। ইত্যাদি (১।২।১)।" "বঙ্গানুবাদ : অগ্রে এস্থলে কিছুই ছিল না। "অশনায়া" রূপ মৃত্যু দ্বারা এই সমুদায় আবৃত ছিল, কারণ অশনায়াই (অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই) মৃত্যু। তাহার পরে মৃত্যু সঙ্কল্প করিলেন, "আমি আত্মবান (অর্থাৎ দেহযুক্ত) হই। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)। (মন্তব্য :—এস্থলে অশনায়া মৃত্যু হইতে উৎপত্তি বলা হইয়াছে। মৃত্যু কিছু উৎপাদন করে না, কিন্তু লয়ই করে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে যে মৃত্যু হইতে প্রথমে জল, তৎপর পৃথিবী, তৎপর অগ্নি, পরে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে পঞ্চভূতের উৎপত্তির কথাও নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২) কথিত ভূতোৎপত্তির ক্রমও নাই। এই জন্য মনে হয় যে এই অংশটী রূপকে আবৃত। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে মৃত্যুর অর্থ এস্থলে নামরূপ সম্বলিত জগতের অভাব। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কোন কোন মন্ত্রে কথিত অসৎও যাহা, মৃত্যুও তাহা। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নামরূপ বিহীন ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না এবং এই সৃষ্টি তাঁহার হইতে তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা যে সত্য তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রয়ে সুস্পষ্ট হইবে।) "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। (বৃহ-১।৪।১)।" "বঙ্গানুবাদ :—এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে

বর্ত্তমান ছিলেন। সেই আত্মা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্ত রত্ন)।" (মন্তব্য:—ইহার পর তাঁহার দ্বারা তাঁহার হইতে নামরূপ সৃষ্টির বর্ণনা আছে। সেই সুদীর্ঘ আলোচনা এস্থলে উদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলেও ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মকৃত সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এস্থলেও কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং নামরূপ সম্বলিত জগৎ ছিল না।) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ। (১।৪।১০)।" "বঙ্গানুবাদ:—"অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকে এইরূপ জানিয়াছিলেন "আমিই ব্রহ্ম।" এই হেতুতে তিনি এই সমুদায় হইয়াছেন"। (মন্তব্য:—এই মন্ত্রেও সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহার হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে।) "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্। (২।৫।১৮)।" "বঙ্গানুবাদ:—"তিনি" দ্বিপদ "শরীর" সমূহ "নির্ম্মাণ" করিয়াছেন। তিনি চতুষ্পদ শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হইয়া পুরুষরূপে নানাদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই পুরুষ সর্ব্বদেহে পুরিশয় (অর্থাৎ দেহ পুরে শয়ান)। এমন কিছুই নাই, যাহা ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, এমন কিছুই নাই, যাহা ইহা কর্ত্তৃক অনুপ্রবিষ্ট নহে। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" (মন্তব্য:—এস্থলেও ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং তিনিই যে সমুদায়, তাহা লিখিত হইয়াছে।) সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল মন্ত্র প্রামাণ্য উপনিষদে বর্ত্তমান, তাহা উদ্ধৃত হইল। প্রত্যেক মন্ত্রের পরই আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তদতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই। যদি ভ্রম বশতঃ কোনও অপ্রসিদ্ধ মন্ত্র উদ্ধৃত না হইয়া থাকে, তবে উহার বিশ্লেষণেও ঐ একই মীমাংসা

প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। বেদান্ত বা উপনিষদ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা সত্য এবং ইহাই লোক প্রসিদ্ধ। ইহাতে যে নাস্তিকতা বা শূন্যবাদ নাই বা থাকিতে পারে না, তাহাও সুদৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে। এস্থলে স্বর্গগত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় দ্বারা লিখিত উপনিষদের অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এইরূপ গ্রন্থে যে শূন্যবাদ থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। "'উপ' ও 'নি' পূর্ব্বক 'সদ্' ধাতুতে 'কিপ্' প্রত্যয় যোগে উপনিষদ্ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দের ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে 'সদ্' ধাতুর 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করিয়া "যদ্দারা অবিদ্যা ও বাসনা বিনষ্ট হয়" 'উপনিষদের' এই অর্থ করেন। 'উপ' এই উপসর্গের 'নিকট' অর্থ, 'নি' এই উপসর্গের 'বিশেষরূপ' অর্থ এবং 'সদ্' ধাতুর 'গমন' অর্থ গ্রহণ করিলে 'উপনিষদ' শব্দের এই অর্থ সিদ্ধ হয়—যাহা গুরুর নিকট বিশেষ রূপে গমন করিয়া শিক্ষা করা যায়।" ধাত্বর্থ যাহাই হউক্, উপনিষদ্ শব্দে সাধারণতঃ গভীর ও গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়।" 'উপনিষদ্' শব্দের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে উপনিষদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ, শূন্যবাদ সমর্থক গ্রন্থ নহে। এইরূপ গ্রন্থ সমূহেও প্রোক্তরূপ দোষাশঙ্কা দুই কারণে হইতে পারে। প্রথমতঃ—যদি গভীর ভাবে চিন্তা না করিয়া শব্দকে প্রকরণ বিচ্ছিন্ন ভাবে উপরি উপরি অর্থ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ—বক্তার দোষানুসন্ধিৎসা। অর্থাৎ যাহারা নাস্তিক বা শূন্যবাদী, তাহারা মনে করেন যে প্রামাণ্য উপনিষদেও যদি তাহাদের মত সমর্থক উক্তি থাকে, তবে তাহাদের মত প্রচারে সুবিধা হইবে। সুতরাং সেই ভাবে প্রণোদিত হইয়া তাহারা আপাতসমর্থক উক্তির কদর্থ করিয়া তাহাদের মত প্রচার করেন। যাহা হউক্, উপনিষদ্ চিরকাল ব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ ছিল, আছে ও থাকিবে। উপনিষদ্ ভারতবর্ষের মুকুটমণি। ইহা চিরকাল ভারতের মহাগৌরবের বিষয় ছিল, আছে ও থাকিবে।

যতই দিন যাইতেছে, ততই ইহা পৃথিবীর নানা স্থানে অধিক হইতে অধিকতর সমাদর লাভ করিতেছে। এইরূপ গ্রন্থেও যিনি অযথা পূর্ব্বোক্তরূপ ভীষণ দোষারোপ করেন, তিনি নিজেই যে মহা অপরাধে অপরাধী হইবেন, সে বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্রও নাই।

ওঁ সত্যং জ্ঞান-প্রেমময়ং ওঁ

ওঁ

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্)

চতুর্থ পরিশিষ্ট

পরমাণুই কি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ?

জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহাতে দুই দুইটী বিরুদ্ধ শক্তি কার্য্য করিতেছে। পৃথিবীতে একই কালে দিবা ও রাত্রি বর্ত্তমান, যেমনি ইহাতে সর্ব্বদাই ঊষা আছে, তেমনি ইহাতে সর্ব্বদাই সন্ধ্যা বর্ত্তমান। সেইরূপ ইহাতে সর্ব্বদা মধ্যাহ্ন ও নিশীথও বর্ত্তমান। ইহাতে যে পরিমাণ উষ্ণতা, সেই পরিমাণে শৈত্য, যে পরিমাণে আলোক, সেই পরিমাণে অন্ধকার, যে পরিমাণে সুখ, সেই পরিমাণে দুঃখ, যে পরিমাণে দয়া, সেই পরিমাণে নিষ্ঠুরতা, যে পরিমাণে সাহস, সেই পরিমাণে ভীরুতাদি লক্ষিত

হয়। পরমাণুদিগের মধ্যে যেমন আকর্ষণ আছে, তেমনি বিকর্ষণও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদ্দৃষ্টে কেহ বলিতে পারেন যে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তি এই জগতের স্রষ্টা। ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি জগতের স্রষ্টা হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে সৃষ্টিতে দুই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইত, যাহাদের মধ্যে একটী আকর্ষক হইলে অন্যটী বিকর্ষক হইত। কিন্তু জগতে দেখা যায় যে একই পদার্থে বিপরীত শক্তি কার্য্য করিতেছে। প্রত্যেক জড় পদার্থে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বায়ুতে জীবন রক্ষকতা ও জীবন নাশকতা বর্ত্তমান। এমন কি, সর্প বিষেও মৃত্যুর ন্যায় অমৃত বর্ত্তমান। ইহা হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে যিনি এই জগতের স্রষ্টা, তাঁহাতেই বিপরীত গুণ ও শক্তি সমূহ মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও ব্রহ্ম এক মাত্র এবং তাঁহাতেই অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অনন্ত সংমিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার হইতেই এই জগৎ আগমন করিয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ সমূহেও আমরা বিপরীত গুণের মিলন দেখিতে পাই। উৎপাদকে যাহা থাকে, উৎপন্নেও তাহা থাকে, তবে উৎপন্নে তাহা বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জগতের স্রষ্টা এক, দুই বা বহু নহেন।

"দ্বিতীয়তঃ:—দেখা যায় যে অসংখ্য প্রায় গ্রহ নক্ষত্রাদি জগতে বর্ত্তমান। উহারা এক পথ ভিন্ন বিপরীত পথে চলে না, এক প্রকার কার্য্য ভিন্ন অন্যবিধ কার্য্য করে না। যখন উহারা একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে এবং এক প্রকার কার্য্য সাধন করিতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহাদের স্রষ্টা এক ভিন্ন দুই নহেন। যদিও প্রতি গ্রহ নক্ষত্রাদিতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি বর্ত্তমান, তথাপি যখন উহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে উহাদের স্রষ্টা এক বই

দুই বা বহু নহেন। তৃতীয়তঃ—জগৎ যে পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত, তাহা ইতি পূর্ব্বে "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণও সেই কথাই বলিতেছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়েও ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি ক্রমান্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। * আবার বিপরীত ক্রমে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজঃ মরুতে লীন হইতে দেখা যায়। বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত মরুৎকে ব্যোমে লয় করিতে পারে নাই। যখন আমরা দেখি যে ক্ষিতি ক্রমশঃ অপ্, তেজঃ ও মরুতে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তখন আমরা যুক্তি যুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে মরুৎকে ব্যোমে লয় করা যাইতে পারে। ইহা অস্বীকার করিলে ক্রমপূর্ণ জগতে অক্রমতা দোষের আরোপ করা হয়। তাহা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যায় যে সমস্ত বিশ্ব একমাত্র ব্যোমে লয় হইতে পারে। সুতরাং জাগতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে এক হইতে জগৎ আসিয়াছে ও একেই লয় হইবে। ইহা হইতেও অনুমান করিতে পারা যায় যে জগতের আদি বস্তু এক, কখনই একাধিক নহে। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং স্থূলও ক্রমশঃ বিপরীত ক্রমে একটা সূক্ষ্মতম পদার্থে লয় হইবে। আমরা "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে দেখিয়াছি যে ব্যোম অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, সুতরাং ব্যোমও মহাপ্রলয়ে অব্যক্তে সুতরাং ব্রহ্মে লয় হইবে। সুতরাং আমরা এককেই অর্থাৎ ব্রহ্মকেই এক এবং Ultimate Principle ভাবে লাভ করিলাম। চতুর্থতঃ—পাতঞ্জল দর্শন অনুযায়ী বলা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থের তারতম্য অনুভূত হয়, তাহার তারতম্য

* "সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ" অংশে এই সম্বন্ধীয় পরীক্ষার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

কোন এক স্থলে অবশ্যই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে। যদুর জ্ঞান অপেক্ষা মধুর জ্ঞান অধিকতর, মধুর জ্ঞান অপেক্ষা রামের জ্ঞান অধিকতর। এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলে আমরা অবশ্যই এক স্থলে উপস্থিত হইব। যাঁহার জ্ঞান অনন্ত অপার, যাঁহার জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহাতে অনন্ত জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান। সেই এক পরম পুরুষই ব্রহ্ম। এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের তারতম্য করিতে করিতে আমরা একেই উপস্থিত হইব। সুতরাং শেষ উৎকৃষ্টতম পদার্থ এক বই দুই বা বহু নহেন। পঞ্চমতঃ:—শ্রুতি, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে জগতের স্রষ্টা এক মাত্র। সুতরাং ধর্ম্ম শাস্ত্রানুযায়ীও আমরা পাই যে জগতের মূলে একমাত্র পরম বস্তু বর্ত্তমান। ষষ্ঠতঃ:—আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে উহাতে কথিত পরমাণু (atom), Electron, Proton প্রভৃতির নানা সংখ্যা নানা প্রকারে রচিত। বিজ্ঞান এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে এক হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং সেই এককে আবিষ্কার করিতেই উহা প্রধাবিত। কেহ কেহ বলেন যে Energy হইতেই জগৎ আসিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত Electron, Proton প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহারা বিদ্যুৎ কণা মাত্র। সুতরাং উহারা জড় পদার্থ মাত্র। উহারা তেজঃ পদার্থ। তেজঃ পদার্থে শক্তির অত্যাধিক্য। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে একমাত্র শক্তি হইতেই জাগতিক পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সকল পদার্থেই অল্পাধিক শক্তি আছে, কিন্তু তেজঃ জড়ীয় পদার্থে উহার আধিক্য অত্যন্ত, এই মাত্র প্রভেদ। সপ্তমতঃ:—প্রথম পরিশিষ্টে গাণিতিক যুক্তি যোগে প্রমাণিত হইয়াছে যে একই নিত্য সত্য। নামরূপের পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু সেই একের কোনই পরিবর্ত্তন নাই।" অতএব আমরা দেখিতেছি যে ধর্ম্ম শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিতেছেন যে এক হইতেই জগতের উৎপত্তি।

আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণও সেই তত্ত্বই সমর্থন করিতেছে। ইতি-পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে জগতের স্রষ্টা এক মাত্র, কখনই দুই বা বহু নহেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে সেই এক পদার্থ কি? উহা কি পরমাণু? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে পরমাণু জগৎ সৃষ্টি করে নাই এবং করিতেও পারে না। কেন পারে নাই, তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পরমাণু বলিলে আমরা দুই প্রকার পদার্থকে বর্তমানে নির্দেশ করি। বৈশেষিক দর্শনের মতে কোন পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু কহে। আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে atom বা পরমাণু বলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে পরমাণু নহে। কারণ, উহারা অবিভাজ্য নহে। উহারা Electron, Proton প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। বৈশেষিক মতে পরমাণু চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের অবিভাজ্য অতি সূক্ষ্ম অংশই পরমাণু। উহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয়। আকাশ বা ব্যোম অবিভাজ্য পদার্থ। উহাকে নিত্য পদার্থ বলা হয়। এস্থলে "নিত্য" শব্দের অর্থ সনাতন অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত-প্রায় সৃষ্টিকালে যাহার কোনই পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যোম অবিভাজ্য সুতরাং নির্ব্বিকার ভাবে বর্তমান আছে ও থাকিবে। যখন চতুর্ব্বিধ পরমাণু বলা হইয়াছে তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞান মতেও নানা দ্রব্যের পরমাণুর রচনার পার্থক্য আছে। অর্থাৎ উহাদের মধ্যে Electron, Proton প্রভৃতির সংখ্যার পার্থক্য আছে। সুতরাং চতুর্ব্বিধ পরমাণুর চারি প্রকার ভেদ আছে। উহারা কখনই এক প্রকার পদার্থ নহে। সুতরাং পরমাণু চারি প্রকারের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরমাণু (atom) অবশ্যই বহু প্রকারের। উহারা ভিন্ন ব্যোম পদার্থ জগতে চিরকাল বর্তমান। সুতরাং পাঁচ (আধুনিক বিজ্ঞান মতে বহু) প্রকারের পদার্থ দ্বারা জগৎ রচিত। আবার পরমাণু

একটী নহে, উহারা অসংখ্য। সুতরাং একটী মাত্র সূক্ষ্মতম পদার্থ পরমাণু বা atom সমূহের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এক হইতেই জগৎ আসিয়াছে, কিন্তু এখন দেখা গেল যে পরমাণু বহু প্রকারের ও অসংখ্য এবং জগতে একটী মাত্র সূক্ষ্মতম বস্তু পাওয়া যায় না, যাহা হইতে জগৎ আগমন করিয়াছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পাঁচ প্রকার অসংখ্য পদার্থের সংযোগে যে জগৎ রচিত, তাহার মূলে একমাত্র সূক্ষ্মতম বস্তু পরমাণু হইতে পারে না। আরও একটী বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পরমাণুই সূক্ষ্মতম বস্তু নহে। তাহা আমাদের চিন্তা (Thought)। জগতে দুইটী বস্তু প্রত্যক্ষ সত্য। যথা—Matter and Thought. এই সম্বন্ধে কাহারও কোনই আপত্তি নাই বা থাকিতে পারে না। কেহ কেহ, বলেন যে জড় পদার্থের নানাবিধ মিশ্রণে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং ইহা স্বীকার করা যায় না। জড় পদার্থের চৈতন্য নাই। ইহা বিজ্ঞানও স্বীকার করেন। সুতরাং সেই অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন Thought আসিতে পারে না। ইহাও সর্ব্ববাদি সম্মত যে চিন্তা জড় অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। "সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্" তত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত। Thought যখন জড় পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম, তখন জড় পদার্থ হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণু জড় জগতের মূলে, এই কথা সত্য নহে। জড় পদার্থ অচেতন। ইহা একেবারেই জ্ঞান-শূন্য। বিজ্ঞানও জড় পদার্থকে অচেতনই বলেন। একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই যে জড় চালাইলে চলে ও থামাইলে থামে। এইরূপ অচেতন জড় পরমাণু কি প্রকারে এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবে? এই বিশ্ব অতিশয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানের সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা এবং অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধানেও আজ পর্য্যন্ত অল্পায় সংখ্যক বিধানই আবিষ্কৃত হইয়াছে। Newton যথার্থই বলিয়া ছিলেন যে তিনি

জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপল খণ্ড মাত্র আহরণ করিতেছেন। মানুষ এবং ইতর জীবের দেহের গঠন, ইহাদের জ্ঞান-প্রকাশোপযোগী যন্ত্রের ক্রম বিকাশ ইত্যাদিরূপ বিষয় চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে এই রচনা কতই সূক্ষ্ম ও জটিল। এইরূপ ভাবে নৈসার্গিক পদার্থ সমূহের সম্বন্ধে যদি চিন্তা করা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে অচেতন, জ্ঞান শূন্য, Inertia-সম্পন্ন পরমাণু স্বয়ং সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ রচনা কৌশলে পরিপূর্ণ এই বিশ্ব সৃজন করিতে পারে না। অচৈতন্য ও Inertia আর বিশ্ব রচনার দৃষ্ট গভীর জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ তত্ত্ব। সুতরাং তাহা অচেতন পরমাণুতে সম্ভব নহে। আমরা দেখি যে কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে কোন একটী জটিল কার্য্য করিতে দিলে সে বিশৃঙ্খলা সংঘটন করে, সে chaos and confusion সৃষ্টি করে এবং সেই কার্য্য পণ্ড করে। অত্যন্ত জটিল ও বৃহৎ ব্যাপার সে কিছুতেই সংসাধন করিতে পারে না। নির্ব্বোধেরও যৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তাহা যতই অল্প হউক্ না কেন, কিন্তু জড় পদার্থ ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-হীন। সুতরাং জ্ঞান-শূন্য জড় দ্বারা কেবল বিশৃঙ্খলা হইতে পারত, কিন্তু কোন বিধি, নিয়ম বিশ্বে থাকিত না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ নৈসর্গিক বিধি, নিয়ম আবিষ্কার করিতেছেন। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে অলঙ্ঘ্য বিধি, নিয়মে আবদ্ধ জগতে chaos and confusion নাই। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে জ্ঞান-শূন্য জড় জটিলতা পূর্ণ বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারিত না। এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য অনন্ত জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখন যদি আমরা চিন্তা রাজ্যে গমন করি, তবে দেখিতে পাইব যে সেই বিধান আরও কত সূক্ষ্ম, কত জটিল ও জ্ঞান-পূর্ণ। Psychology এখনও চিন্তা রাজ্যের জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই। এই জন্যই উহাকে Most imperfect Science বলা হয়। আবার জ্ঞান, প্রেম, সরলতা, একাগ্রতা, পবিত্রতা সম্বন্ধে চিন্তা আরও কত গভীর,

জটিল ও সূক্ষ্ম। দর্শন শাস্ত্রের বিষয় সমূহ চিন্তা করিলেই এই তত্ত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি। জড় জগৎ ও মানসিক জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে কি আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করিতে পারি যে জীবরাজ্য সহ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জড় স্বাধীন ভাবে উহার একমাত্র নিজস্ব শক্তি দ্বারা রচনা করিয়াছে? এই কার্য্যে অনন্ত জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং জ্ঞান-শূন্য জড় উহা কখনও সৃজন ও পালন করিতে পারে না জাগতিক বিধান কেবল জ্ঞান-পূর্ণ নহে, উহা ক্রম-পূর্ণও বটে। জ্ঞান-শূন্য জড় কি এইরূপ সুশৃঙ্খলা-পূর্ণ বিশ্ব রচনা করিতে পারে? ইহার উত্তরে অবশ্যই 'না' বলিতে হইবে এবং ইহাও নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে যে এমন একটী পরম পদার্থ ইহার পশ্চাতে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সূক্ষ্মতম বা কারণতম এবং যাঁহার হইতে সূক্ষ্মতর কোনও পদার্থ নাই, যিনি অনন্ত জ্ঞানে ও অনন্ত শক্তিতে নিত্য পরিপূর্ণ, তিনিই বিশাল ও জটিল জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও পাতা। আধুনিক Biology বিজ্ঞান জীব সৃষ্টিতে যে একটী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, তাহা স্বীকার করেন। যদি সৃষ্টিতে কোনই উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে Protoplasm হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইতে পারিত না। জীবরাজ্যে ঊর্দ্ধগতি না হইয়া অধোগতিও হইতে পারিত। এই যে জীব ও জড় রাজ্যের ক্রমোন্নতি আমরা দেখিতেছি, ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টির একটী মহান্ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান এবং সেই জন্যই বিশ্বে ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হয়। আমরা যদি আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করি, তবেই বুঝিতে পারিব যে ইহা প্রথমে সূর্য্য মণ্ডল হইতে প্রক্ষিপ্ত বায়বীয় পদার্থ মাত্র ছিল। কত কোটী কোটী বৎসর পরে পৃথিবী আজ কেমন সুশৃঙ্খল ও শোভাপূর্ণ হইয়াছে। উহার আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনাই হয় না। উহা ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া শোভা, সৌন্দর্য্যে ও নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় সম্ভারে পূর্ণ হইয়াছে। একটী উত্তপ্ত gas পূর্ণ মণ্ডল কেন

মোক্ষতত্তে এইরূপ সুন্দরী শোভাময়ী বসুন্ধরা রূপে পরিণত হইল ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে পৃথিবী সৃষ্টির মূলে একটা মহান্ উদ্দেশ্য বর্তমান, নতুবা সেই মণ্ডলটী সেই ভাবেই চিরকাল থাকিতে পারিত অথবা উহা আরও খারাপতর অবস্থায় পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে ইহার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য বর্তমান। অজ্ঞান জড়ের কখনই কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এক অনন্ত জ্ঞানময় পরম পুরুষ আছেন, যিনি কোনও মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই বিশ্ব সৃজন ও পালন করিতেছেন। তিনিই অনন্ত জ্ঞানময়, তিনিই অনন্ত প্রেমময়, তিনিই সত্য স্বরূপ এবং অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তির আধার। তিনিই সকলের মূলে। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে জড় পরমাণু এক প্রকারের নহে এবং উহারা সূক্ষ্মতম একটী মাত্র পদার্থও নহে, সুতরাং উহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং জগতের মূল অনুসন্ধান করিতে আমাদের অন্যত্র গমন করিতে হইবে। পরমাণু হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যোম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিলে কোন ত্রুটী হয় না। উহা এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং সূক্ষ্মতম জড় পদার্থ। সুতরাং পরমাণু দ্বারা জগৎ সৃষ্ট বলিলে যে সকল ত্রুটী লক্ষিত হয়, ব্যোমের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য হয় না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যোমই শেষ তত্ত্ব নহে। ব্যোম কখনও স্বয়ং স্বাধীন ভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করে নাই; ব্যোমও জড় পদার্থ মাত্র। উহারও জ্ঞান নাই। সুতরাং অজ্ঞান পরমাণুও যেমন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান ব্যোমও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না, অজ্ঞান পরমাণু যেমন chaos and confusion সৃষ্টি করিতে পারিত, সেইরূপ ব্যোমও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতে পারিত।

জগতে কোনই বিধি নিয়ম থাকিত না। সৃষ্টি কার্য্যে অজ্ঞান পরমাণুরও যেরূপ কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, অজ্ঞান, অচেতন ব্যোমেরও কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং জগতের মূলে যদি অজ্ঞান ব্যোমই বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টি ক্রমময়ী হইত না, উহাতে কোনই উদ্দেশ্য থাকিত না, সুতরাং ক্রমোন্নতি অসম্ভব হইত। অতএব পরমাণুও যেমন বিশ্ব সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান ছিল না, তেমনি ব্যোমও নহে। জাগতিক ভাবে চিন্তা করিলে মনে হয় যে ব্যোম হইতে জগৎ আসিয়াছে। আমরাও বলি যে ব্যোম জড় জগতের প্রকৃতি, কিন্তু ব্যোমই শেষ কথা নহে। পরমাণু দ্বারাও জগৎ সংঘটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরমাণু যে জগতের মূলে নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে জগতের মূলে স্রষ্টা কে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে ব্রহ্মই জগতের মূলে। তিনিই প্রেমলীলার্থ তাঁহার একতম স্বরূপকে—অনন্ত নিরাকারত্বের ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক স্বরূপকে জগতের বীজ ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তি যোগে এই বিরাট বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব "অব্যক্তের পরিণাম" অংশে প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে আর সেই সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হইবে না। এই মাত্র বলা যায় যে ব্যোম সেই অব্যক্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিণাম এবং সেই জন্যই উহা জড় জগতের প্রকৃতি হইতে সমর্থ হইয়াছে। অব্যক্তের পরিণাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ব্রহ্মের বিকার হইয়াছে, সুতরাং সেই পরিণাম অসম্ভব। এই সম্বন্ধেও সেই অংশে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অব্যক্তের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই পরিণামে অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই। ইহার কারণ সেই স্বরূপের নিত্য অখণ্ডত্ব, অবিভাজ্যতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা। সুতরাং ব্রহ্মের কোনই বিকার হয় নাই। পরমাণুর মূল খুঁজিয়া

না পাইয়া কেহ কেহ বলেন যে জগতের মূল পদার্থ আকস্মিক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে chance বলিয়া কোন কিছু নাই। সৃষ্টি ক্রমময়ী। সকলই ক্রমানুযায়ী হইয়াছে ও হইবে। কিছুই হঠাৎ হয় নাই এবং হইবেও না। এই সম্বন্ধে Sir James Jeans-এর উক্তি "সৃষ্টি সাদি কি অনাদি" অংশে ১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে যে তিনিও বলিয়াছেন যে সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পরমাণু যেমন হঠাৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, ব্যোমও সেইরূপ হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বিশ্ব হঠাৎ ইহার অণু পরমাণু সহ উৎপন্ন হয় নাই এবং কোন প্রকারের জড় পদার্থও এই জগতের স্রষ্টা নহে। জগতের স্রষ্টা একমাত্র ব্রহ্মই। জীব ও জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়াছে, সেই তত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত অংশে এবং "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে লিখিত হইয়াছে। পাঠক সেই সকল অংশ পাঠ করিলেই ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ওঁ জগৎ-সৃজন-পালন-কারণং ব্রহ্ম ওঁ

ওঁ

সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
সর্ব্বগুণং গুণাতীতং নমামি জগদীশ্বরম্॥

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)।

পঞ্চম পরিশিষ্ট

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ও ঈশ্বর।

ব্রহ্ম শব্দ বৃহ+মন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ প্রত্যয় নিরতিশয়ত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত বৃহৎ, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়। সুতরাং তিনি অনন্ত ভাবে বৃহৎ। বৃহৎ বলিলে আমরা সাধারণতঃ দেশে বড় বুঝি। যেমন বৃহৎ বস্তু, বৃহৎ দেশ বৃহৎ পর্ব্বত ইত্যাদি। ব্রহ্ম দেশ কালের অতীত, কিন্তু দেশ কালেও বর্ত্তমান। তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বিভুও বলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে সর্ব্বব্যাপী শব্দের 'সর্ব্ব' অর্থে বিশ্বের সর্ব্বত্র বুঝায়, বিশ্বের অতীতকে বুঝায় না। যদি তাহাই সত্য বলিয়া মনে করা যায়, তবুও বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম যখন অনন্ত, তখন বিশ্বের অতীতে তাঁহার ছাড়া কিছুই নাই সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অনন্ত-ব্যাপী। কারণ, তিনি ভিন্ন দেশ নাই, কাল নাই এবং আমাদের ধারণীয় বা অধার্য্যও কিছু নাই বা থাকিতেও পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দে বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত (**Immanent and Transcendent**) ভাবে অনন্ত-ব্যাপী অর্থে পরম পুরুষকে বুঝায় এবং বিভু শব্দে সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বুঝায়, যেমন সত্য অর্থে নিত্য বুঝায়, কিন্তু সনাতন অর্থে সর্ব্বকালে বিদ্যমান বুঝায়, কিন্তু কালাতীত নিত্য বুঝায় না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ অনন্ত ভাবে ব্যাপক। ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দে তাঁহার একটী মাত্র স্বরূপের অর্থাৎ অনন্ত ব্যাপকত্বের বা অনন্ত বৃহত্ত্বের পরিচয় মাত্র আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই শব্দ দ্বারা তাঁহার অন্যান্য কোনও স্বরূপের পরিচয় আমরা পাইতেছি না। পাশ্চাত্য দর্শনে উক্ত **Absolute** সত্তা এবং অনন্ত। তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র আছে। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি অনন্ত গুণের কোনও গুণ নাই। মায়াবাদ দর্শনে

ব্রহ্মকে নির্গুণ (গুণ শূন্য) বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান তাঁহার একটী স্বরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি চিন্তা করা যায় যে যিনি অনন্ত-ব্যাপী, তিনি অবশ্যই সত্য তবে বুঝিতে পারা যায় যে সত্য ব্রহ্মের একটী স্বরূপ। জ্ঞান থাকিলেই তিনি জানিতে পারেন। জ্ঞান আছে, অথচ কিছুই জানিবার শক্তি নাই, ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়াই মনে হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা এবং তিনিই জ্ঞেয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি কাহাকে জানিতেন? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকেই জানিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদও তাহাই বলেন। যথা—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। (১।৪।১০)" "বঙ্গানুবাদ :—অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্ম রূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকেই এইরূপ জানিয়াছিলেন—"আমিই ব্রহ্ম"। (মহেশ চন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন)।" আর ব্রহ্মই ত একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই ত একমাত্র সারবস্তু। তিনি ভিন্ন ত দ্বিতীয় বস্তু (Substance) জগতে নাই। সুতরাং সূক্ষ্ম অর্থে সৃষ্টিতেও তিনি তাঁহাকেই জানিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন: —"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (৬।৮)।" "বঙ্গানুবাদঃ— ইহার বিচিত্রা পরাশক্তি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া (তত্ত্বভূষণ)।" উপনিষদ্ মায়াবাদের ভিত্তি-ভূমি বলিয়া কথিত হয় এবং বেদান্তকে মায়াবাদিগণ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্মের জ্ঞানও তাঁহার একতম স্বরূপ বা গুণ এবং জ্ঞানের ক্রিয়া আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মায়াবাদের ন্যায় বোধ হয় কোন কোন **Absolutist** পাশ্চাত্য দর্শন ব্রহ্মের জ্ঞানও নাই বলিয়াছেন। মায়াবাদ ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপও বলেন, কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সত্য স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি চিন্তা করা যায় যে, যিনি অনন্ত-ব্যাপী, তিনি অবশ্যই সত্য, তবে বুঝিতে পারা যায় যে সত্য ব্রহ্মের একটী

স্বরূপ বা গুণ। সুতরাং মায়াবাদের ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান বাদ দিলে ব্রহ্ম এবং Absolute একই। অর্থাৎ তিনি সত্য এবং অনন্ত, কিন্তু সর্ব্ব গুণ শূন্য। উভয় স্থলেই বলা যাইতে পারে যে তিনি যদি সত্য এবং অনন্তই হন, তবে তাঁহার সত্তা এবং অনন্তত্ব এই দুইটী গুণ অবশ্যই আছে বলিতে হইবে। ব্রহ্মের যদি দুইটী গুণই থাকিতে পারে, তবে তাঁহার অনন্তগুণ থাকিতে বাধা কোথায়? বরং যিনি অনন্ত, তিনি অনন্ত ভাবেই অনন্ত, ইহা ধারণা করিতে পারিলেই সত্য তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। অর্থাৎ তিনি ব্যাপকতায় অনন্ত, তাঁহার গুণের সংখ্যা অনন্ত, তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেক গুণ অনন্ত ভাবে উন্নত এবং শক্তিতে তিনি অনন্ত। অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণ ও অনন্ত প্রকার শক্তির প্রত্যেকটী অনন্ত ও নিত্য সত্য। ব্রহ্ম শব্দে এরূপ কিছুই নাই, যাহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে তিনি নির্গুণ (গুণ শূন্য)। বরং ঐ শব্দ ইহাই বুঝায় যে তাঁহার নিরতিশয় বৃহত্ব আছে। বৃহত্ব একটী গুণ। সুতরাং তিনি গুণবান। ব্রহ্ম যে নির্গুণ বা গুণ হীন নহেন তাহা নিম্নলিখিত ভাবেও প্রমাণিত হইতে পারে। মায়াবাদিগণ মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌কে অত্যাচ্চ স্থান প্রদান করেন, অর্থাৎ উক্ত উপনিষদ্ মায়াবাদের একখানি বিশিষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তুরীয় ব্রহ্মকে শিব বলা হইয়াছে। যিনি শিব, তাঁহাতে অনন্ত বিপরীত গুণের মিলন অবশ্যম্ভাবী। জগতে দেখা যায় যে যাহার দয়া আছে, তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াও দান করেন। স্নেহান্ধ মাতা পিতা সন্তানের দোষ ত্রুটি ন্যায় চক্ষে দেখিয়া তাহাকে শাসন করেন না। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব জগতে নাই। এইরূপ কার্য্যের ফল অমঙ্গল। আবার অপর দিকে ন্যায়বাদী অত্যন্ত কঠোর ভাবে দোষীকে শাস্তি দেন, তাহার প্রতি কোনও করুণা প্রকাশ করেন না। ইহাতেও অমঙ্গল সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাঁহাতে অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত দয়া নিত্য বর্ত্তমান, তাঁহার দ্বারা কখনই মঙ্গল বই অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। His Justice is always

tempered by Mercy and vice versa. তাঁহার দণ্ড শাস্তি বা পুরস্কার সর্ব্বদা মঙ্গলে পরিপূর্ণ, কখনই অতিরিক্ত (Excessive) নহে। সেইরূপ ব্রহ্মে যদি অনন্ত বিপরীত গুণের মিলন না হইত, তবে তিনি মঙ্গল কার্য্য করিতে পারিতেন না। অর্থাৎ তাঁহাতে যদি অনন্ত বিপরীত গুণের একত্ব সম্পাদিত না হইত, অর্থাৎ তিনি যদি অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ না হইতেন, তবে তিনি শিব বা মঙ্গলময় হইতে পারিতেন না। তুরীয় ব্রহ্মকে যখন শিব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহাতে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান এবং উঁহারা একত্বে মিলিত। ইংরেজীতে God শব্দটী পরম পিতার বাচক। God শব্দের আদি শব্দ Good। উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া God ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। Good অর্থে মঙ্গলময় বা শিব। ঋষি শ্বেতাশ্বতর ব্রহ্মকে শিব ভাবেই উপাসনা করিতেন। তৎকৃত উপনিষদই এই বিষয়ে প্রমাণ। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক Plato "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই পরম পুরুষকে শিব বা মঙ্গলময় বা Good (God) বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাতে অনন্ত একত্বের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে বা তিনি অনন্ত বিপরীত গুণের আধার। মায়াবাদে ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়ও বলা হয়। যদি তাঁহার অস্তিত্বই থাকে, তবে যে তিনি ক্রিয়াবান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও ক্রিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। জগতে কি প্রাণী, কি জড় পদার্থ—সকলেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী ভাবে কর্ম্ম করে। একটী জড় পদার্থও নিজেকে অন্য জড় পদার্থের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য বাধা প্রদান করে। প্রাণিগণও সেইরূপ করেন, সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মে এমন শক্তি নিত্য বর্ত্তমান যাহাতে তাঁহার নিত্য অস্তিত্ব সম্ভব হয়। কেহ মনে করিতে পারেন যে ব্রহ্মের অস্তিত্বই তাঁহার নিত্য স্বভাব, উহা রক্ষা করিবার জন্য আবার শক্তির কি প্রয়োজন? আমরাও সম্পূর্ণ রূপে

স্বীকার করি যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাঁহার নিত্য স্বভাব। কিন্তু একথাও সত্য যে তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে তাঁহার শক্তিও স্বাভাবিক ও নিত্য। তিনি কখনও অন্যদীয় সাহায্য দ্বারা তাঁহার নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেন না। তাঁহার সকলই নিত্য ও স্বাভাবিক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সর্ব্বত্রই একই বিধান কার্য্য করিতেছে। One God, One Law, One Universe. জগতে তাঁহারই গুণ ও শক্তি প্রতিভাত হইয়াছে। ব্রহ্মে উঁহারা বিশুদ্ধ, সত্য পূর্ণ ও নির্ব্বিকার ভাবে বর্ত্তমান, কিন্তু জগতে সকলই বিকৃত ও অপূর্ণ। আবার যদি ব্রহ্মেই ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান না থাকিত, তবে জীবে এবং জগতে কোনই শক্তি থাকিতে পারিত না। কারণ, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগতে যখন অসীম শক্তির কার্য্য দেখিতেছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাঁহাতেই অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। He is the Fountain Head of infinite energy which flows into the universe. আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্মের অন্ততঃ একটী স্বরূপ বা গুণ বর্ত্তমান। গুণ মাত্রই শক্তিমান। সুতরাং ব্রহ্মও শক্তিমান। আবার মায়াবাদ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলেন। নিমিত্ত কারণে ক্রিয়াশক্তি থাকিবেই। সুতরাং ক্রিয়াশক্তিশূন্য নিমিত্ত কারণ কথার কথা মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন। ব্রহ্ম যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নহেন, সেই সম্বন্ধে "মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু তিনি অনন্ত গুণাতীত এবং অনন্ত শক্তির অতীত। তিনি তাঁহার কোন গুণ বা শক্তি দ্বারা বাধ্য হইয়া জগৎ-কার্য্য করিতেছেন না, কিন্তু লীলার্থই নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিতেছেন মাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য বোধে ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে সকল কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলা হইয়াছে। কর্ম্ম জগতে এই আদর্শ অতি উচ্চতম

আদর্শ। ব্রহ্ম সকল আদর্শের আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং এই আদর্শেরও নিরতিশয়ত্ব তাঁহাতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনিও ইহা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে সমাধা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাকেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মেও চরম কর্ম্ম-সন্ন্যাস বর্ত্তমান। অর্থাৎ তিনি জগৎ সম্বন্ধে কর্ম্ম করিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা দ্বারা এতটুকুও স্পৃষ্ট হইতেছেন না। নির্লিপ্ততার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল পদ্ম পত্রে জল। জল পদ্ম পত্রে আছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার (পদ্মপত্রের) কিছুই আসিয়া যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মে কর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি বিন্দু মাত্রও স্পৃষ্ট (affected) হন না। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল তুলনাই অসম্পূর্ণ। সুতরাং বলিতে হইবে যে তিনি কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উহা হইতে অনন্ত রূপে—সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত। প্রোক্ত অংশে তাঁহার গুণাতীতত্বের ও নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আর উহাদের উল্লেখ করিব না। মানুষ নিজেদের তুলনায় অন্যকে বিচার করে। সে জগতে দেখিতে পায় যে মানুষের গুণ আছে, কিন্তু তিনি কখনই সর্ব্বকালে সর্ব্বগুণের অতীত হইতে পারেন না, বরং দেখা যায় যে মানুষ সর্ব্বদাই গুণ দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করে। সে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপ গুণ দ্বারা বাধ্য হইয়া এবং আসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে অল্লাধিক দোষস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ব্রহ্মের যদি গুণ থাকে, এবং তিনি যদি ক্রিয়া করেন, তবে অবশ্যই তাঁহার পক্ষে দোষস্পর্শ হইবে। কিন্তু ব্রহ্মে তাহা অসম্ভব। তিনি নিত্যই সর্ব্বদোষপাশলেশ-শূন্যং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্। কিন্তু যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্রহ্মে গুণও নাই, কর্ম্মও নাই, তবে আর তাঁহার পক্ষে দোষ স্পর্শ সম্ভব হইবে না। সুতরাং তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আমাদের মনে হয় যে ব্রহ্মের নির্গুণতা ও নিষ্ক্রিয়তা তত্ত্বের মূলে এই ভাব

কার্য্য করিয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে যাঁহার অনন্তগুণ অনন্ত পরিমাণে আছে, তিনিই অনন্ত গুণাতীত সুতরাং অনন্ত শক্তির অতীত হইতে পারেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্বটি পরিষ্কার করা যাউক্। ক্রোড়পতিই ক্রোড়ের অতীত হইতে পারেন. কিন্তু যিনি কপর্দ্দক শূন্য, তিনি ত নহেনই, যাহার ৯৯৯৯৯৯৯ টাকা আছে, তিনিও ক্রোড়ের অতীত হইতে পারেন না। কারণ, তাহার ক্রোড় টাকা পূর্ণ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম নিত্যই অনন্ত ভাবে পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার কোনও প্রকারের অভাব নাই বা থাকিতে পারে না। তিনি নিত্যই আপ্তকাম। অতএব তিনি নিত্যই অনন্ত শক্তিতে পূর্ণ। অন্যথা তাঁহার অভাব আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মের কোনওরূপ অভাব আছে, ইহা কল্পনারও অতীত। ব্রহ্মের গুণাতীত্য ও শক্তির অতীত্য সম্বন্ধে একটী প্রধান কারণ এই যে তিনি নিত্যই অনন্ত ভাবে স্বাধীন। তাঁহার স্বাধীনতাও যখন নিত্য, অনন্ত এবং পূর্ণ, তখন তাঁহার পক্ষে অপূর্ণ মানবের ন্যায় কোনও গুণ বা শক্তি দ্বারা বাধ্য হইবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি যাহাই করেন, তাহাই তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যে জগদ্ব্যাপার তিনি সম্পাদন করিতেছেন. ইহাও সেই পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার প্রেম বা অন্য কোনও গুণ বা অন্য কোনও শক্তি দ্বারা বাধ্য হইয়া তিনি এই কার্য্য করিতেছেন না। শ্রী নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল মহাশয় সত্যই গাহিয়াছেন:—"এক তিনি দেবদেব নিখিল কারণ, খুসী তাঁর এই ধরা সৃজন পালন।" এই জন্যই সৃষ্টি ব্যাপারকে ভগবল্লীলা বলা হয়। বেদান্ত দর্শনও বলিয়াছেন:—লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্। (২।১।৩৩)। লীলা সম্বন্ধে "লীলাতত্ত্ব" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে উন্নত মানব

সর্ব্বদা তাঁহার গুণরাশি দ্বারা বিশেষতঃ হেয় গুণরাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন না, কর্ত্তব্য বোধে তিনি গুণানুযায়ী কার্য্য করেন বটে। উন্নত মানবে যাহা অপূর্ণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মে তাহা অনন্ত ও পূর্ণ পরিমাণে বর্ত্তমান। অর্থাৎ তাঁহার স্বাধীনতা নিত্য অনন্ত ও পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার বাধ্য হইয়া কোনই কার্য্য করিতে হয় না। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম অনন্ত গুণাধার, অনন্ত শক্তির আধার এবং অনন্ত গুণ ও শক্তির অতীত। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির প্রত্যেকটী একে অন্য হইতে পৃথক্। যথা—জ্ঞানে প্রেম নাই, প্রেমে জ্ঞান নাই; করুণায় ন্যায় নাই, আবার ন্যায়ে করুণা নাই ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণের অনন্ত মিশ্রণে যে একত্ব সম্ভব হইয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রকৃত একমাত্র স্বরূপ। আবার যদি চিন্তা করা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই নিত্য এবং অনন্ত। আমরা চিন্তা করিতে পারি না যে তাঁহার কোনও গুণ সত্য ভিন্ন মিথ্যা বা অনিত্য। মিথ্যা জ্ঞান জ্ঞান নহে, মিথ্যা প্রেম প্রেম নহে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁহার যাহা কিছু, তাহাই নিত্য সত্য। সেইরূপ তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই অনন্ত। নতুবা তিনি অনন্ত হইতে পারিতেন না। যদি বলেন যে তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই সান্ত বটে, কিন্তু উহাদের সমষ্টিতে তিনি অনন্ত, তবে বলিতে হয় যে তাহা অসম্ভব। কারণ, সসীমের সহিত অসংখ্য সসীম পদার্থ যোগ দিলেও উহাদের সমষ্টি সসীমই হইবে, কখনই অনন্ত হইবে না। ঐ সমষ্টির সীমা আমাদের অধার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই প্রকৃত অনন্ত হইবে না। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে গাণিতিক অনন্তও অধার্য্য সসীম মাত্র, কিন্তু প্রকৃত অনন্ত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সত্য এবং অনন্তত্ব এইরূপ দুইটী গুণ, যাহা পরমপিতার অন্যান্য অনন্ত গুণের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত গুণের প্রত্যেকটী সত্য এবং

অনন্ত না হইয়াই পারে না। অর্থাৎ তাঁহার যাহা কিছু, তাহাই সত্য এবং অনন্ত। এই দুইটী গুণের এইরূপ বিশেষত্বের জন্যই বোধ হয় Absolutists উহাদিগকে আর ব্রহ্ম হইতে বাদ দিতে পারেন নাই, যদিও তাহারা তাঁহার অন্যান্য অনন্ত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, এই দুইটী গুণও যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে আর তাঁহার কিছুই থাকে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে ভৌতিক গুণ যথা—রূপ, রস, গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ছিল না, নাই বা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মে হেয় গুণরাশি বা দোষপাশরাশি বা জাত গুণরাশি নাই। সুতরাং তিনি সেই অর্থে নির্গুণ। মানবে যে সকল আধ্যাত্মিক গুণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রায় সর্ব্বদাই অপূর্ণ এবং নানা ভাবে অল্পাধিক বিকৃত হয়, কিন্তু ব্রহ্মের গুণরাশি নিত্যই সত্য, অনন্ত ও নির্ব্বিকার। সুতরাং মানবে প্রকাশিত অপূর্ণ, সান্ত এবং বিকৃত গুণ ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সেই অর্থে তিনি নির্গুণ। আবার তাঁহার পক্ষে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও কর্ম্ম করিতে হয় না। তিনি নিত্য অশরীরী। তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।১৯ মন্ত্র বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন না বলিয়া তিনি সেই অর্থে নিষ্ক্রিয় বটেন। এখন আমরা পরমাত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করি। এক আত্মাকেই পরম এবং জীব ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়াছে। পরমাত্মা তিনিই যিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, মহান্ এবং যিনি দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় যুক্ত, তিনি জীবাত্মা। পরমাত্মা ও জীবাত্মায় স্বরূপতঃ কোনই পার্থক্য নাই, কিন্তু জীবাত্মা দেহবদ্ধতা জন্য ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায়ে বিশেষতঃ নিম্ন-লিখিত অংশ চতুষ্টয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে :—"(১) ব্রহ্মের জীবভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী," (২) "জীবাত্মা," (৩) "গুণ বিধান" এবং (৪) "আত্মা ও জড়ের মিলন।" উহা-

দিগেতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মই স্বয়ং স্বেচ্ছায় লীলার্থ দেহ যোগে ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এই দেহবদ্ধতা জন্য তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। এখন আত্মা শব্দের অর্থ দেখা যাউক্। আত্মা=অত+মন্। এস্থলে অত ধাতুর অর্থ ব্যাপিয়া থাকা এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়ত্ব। অর্থাৎ যিনি অনন্ত ভাবে ব্যাপ্ত, তিনি আত্মা। অতএব দেখা যায় যে ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দ দ্বয় একই অর্থ প্রকাশক। ব্রহ্ম শব্দে নিরতিশয় বৃহৎ সুতরাং অনন্ত-ব্যাপী, আর আত্মা শব্দে যিনি নিরতিশয় ব্যাপ্ত বা অনন্ত ব্যাপ্ত সুতরাং অনন্ত বৃহৎ। এক স্থলে অনন্ত বৃহৎ সুতরাং অনন্ত ব্যাপ্ত এবং অন্য স্থলে অনন্ত ব্যাপ্ত সুতরাং অনন্ত বৃহৎ। সুতরাং ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা শব্দ দ্বয়ে কোনই পার্থক্য নাই। উপনিষদে উভয় শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ পরমাত্মা শব্দ জীবাত্মার তুলনায় ব্রহ্মকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। জীবাত্মা ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান, পরমাত্মা নিত্য অনন্ত অপার। মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকেও কেহ কেহ পরমাত্মা বলেন। এখন ভগবান শব্দ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা ভগ+মতুপ্ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগ অর্থে ঐশ্বর্য্য। সুতরাং যিনি ঐশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ যিনি অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান এবং অনন্ত মহিমায় মহিমাময়, তিনিই ভগবান। ভগবান শব্দে প্রেমলীলাময় বুঝায় না। এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে ॥ (১।২।১১)' "বঙ্গানুবাদ: —যাহা অদ্বয় জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ব বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। (গৌড়ীয় সংস্করণ)।" ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দ একই পরম বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়। স্বর্গগত পণ্ডিত সীতা নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে Dr Brajendra Nath

Seal মহাশয় উক্ত শ্লোক লক্ষ্য করিয়া বলিতেন যে রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মের, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমাত্মার এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভগবানের উপাসক ছিলেন। এই উক্তি মোটা-মুটি ভাবে সত্য বলিয়া বুঝিলে আমরা উক্ত তিন শব্দের প্রচলিত পার্থক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিব। রাজা রাম মোহন রায় যদিও মায়াবাদের ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন নাই, তথাপি তিনি শঙ্কর মতের কোন কোন তত্ত্বের উপর জোড় দিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শঙ্কর মতাবলম্বী বলিয়াও সন্দেহ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সত্য নহে। তাঁহার উক্তি সমূহই তাহা প্রমাণ করে। তাঁহার দ্বারা রচিত সঙ্গীতের অংশ উদ্ধৃত হইল। "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর, সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।" এস্থলে ব্রহ্মকে স্রষ্টা এবং জ্ঞাতা বলা হইল। মায়াবাদের ব্রহ্ম স্রষ্টাও নহেন (জগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র) এবং তাঁহার জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না। এই সম্বন্ধে মূল গ্রন্থে বহু স্থলে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ মায়াবাদের ব্রহ্ম-বাদের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু উপনিষদই তাঁহার ধর্মের ভিত্তিভূমি। তিনি নানা প্রামাণ্য উপনিষদ্ হইতে মন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং সেই সকল মন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মোপসনার জন্য যে তিনটী মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহারাও উপনিষদেরই মন্ত্র। তিনি জ্ঞানমার্গালম্বী ছিলেন। তাঁহাতে যথেষ্ট ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাতে জ্ঞানের প্রাবল্য বর্তমান ছিল। তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ তত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে একজন মহাভক্ত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্ঞানও যথেষ্টই ছিল। তাঁহার দ্বারা রচিত "ব্রহ্মগীতো-পনিষৎ" প্রভৃতি গ্রন্থই তাহা প্রমাণ করিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে

যেমন ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এখন "ঈশ্বর" শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করা যাউক্। "ঈশ্বর" শব্দ ঈশ + বরচ্ ভাবে নিষ্পন্ন হয়। ঈশ শব্দ প্রভুত্ব বাচক। সুতরাং ঈশ্বর শব্দে মহান প্রভু বুঝায়। ঈশ্বর শব্দ নানা ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ঈশ্বর শব্দ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা ভাবেও ব্যবহৃত হয়। মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্মকেও ঈশ্বর বলা হয়। যিনি অন্ততঃ একটী গুণেও পরমপিতার সহিত একত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেও ঈশ্বর বলা হয়। সেইরূপ বহু একত্ব প্রাপ্ত সাধকের যিনি ঈশ্বর বা প্রভু, তিনিই পরমেশ্বর। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-৬।৭)" "বঙ্গানুবাদ:—সেই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠতর, ভুবনেশ্বর, সম্ভজনীয় দেবতাকে আমরা জানি। (তত্ত্বভূষণ)" অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে "ব্রহ্ম ও পরমাত্মা" শব্দে পরম পুরুষের অনেক ব্যাপকত্ব বা বৃহত্তমত্ব গুণ মাত্র বুঝায়। 'ভগবান' শব্দে অনন্ত শক্তিমান মাত্র বুঝায় এবং "ঈশ্বর" শব্দে মহান্ প্রভু মাত্র বুঝায়। কিন্তু প্রচলিত ভাবে "ব্রহ্ম" অর্থে বুঝিতে হইবে যে তিনি সত্য, অনন্ত, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। পরমাত্মা জীবাত্মার তুলনা মূলক শব্দ ভাবে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ভাবে ব্যবহৃত হয়। ভগবান শব্দে প্রচলিত ভাবে বুঝায় যে তিনি প্রেমলীলাময় ভক্তের ভগবান। তিনি অবশ্যই সৃষ্টি-স্থিতি-পালন কর্ত্তা। ঈশ্বর শব্দ যে নানা ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ঈশ্বর শব্দে পরম পুরুষের এক একটী গুণ মাত্র বুঝায়, কিন্তু ভগবান শব্দে বহু শক্তিশালী বুঝায়। কিন্তু উক্ত শব্দ সমূহে বহু ভাব সংযোগ করা হইয়াছে। ফলে উক্ত শব্দ

সমূহে যাহা প্রচলিত ভাবে বুঝায়, তাহা Strictly ধাত্বর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এমন কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না যাহা দ্বারা পরম পিতাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রণবই এক মাত্র শব্দ যাহা দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রণবও বহু প্রকার। পঞ্চম প্রণবই (ওঁং) একমাত্র শব্দ যাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অনন্ত গুণাধার ও অনন্ত শক্তির আধার এবং তিনি একই কালে অনন্তগুণ ও শক্তির অতীত। অনেকে প্রণবের অনেক অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু পরমর্ষি গুরুনাথ পঞ্চম প্রণবের নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চম প্রণব নিম্নলিখিত ভাবে নিষ্পন্ন হয় :—অ+আ=আ, আ+উ=ও, ও+ম্ বা অনুস্বার=ওঁং। "অ" অর্থে পালন কর্ত্তা, "আ" অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা, "উ" অর্থে লয় কর্ত্তা এবং "ম্" অর্থে গুণাতীত। অতএব দাঁড়াইল এই যে পরম পিতা সর্ব্বপ্রকারের অনন্ত গুণাধার এবং অনন্ত গুণাতীত। অতএব দেখা গেল যে পরম পিতাকে যে নামেই বলা হউক্ না কেন, তাঁহার পূর্ণ বর্ণনা একমাত্র পঞ্চম প্রণব ভিন্ন অন্য শব্দ দ্বারা সম্ভব নহে। এই জন্যই প্রণবের সর্ব্বোচ্চ স্থান। ইঁহাকে সর্ব্ববেদের সার বস্তুও বলা হইয়াছে। পরমর্ষি গুরুনাথ বলিয়াছেন যে পৃথিবী একটী মাত্র শব্দ পাইয়াছে যাহা দ্বারা পরম পুরুষের বর্ণনা হইতে পারে। এই জন্যই দীক্ষা মন্ত্র প্রণব পুটিত না হইলে সম্পূর্ণ হয় না। পরম পুরুষ বাচক যে কোন শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন, উহা দ্বারা তাঁহার একটী বা দুইটি গুণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পঞ্চম প্রণব দ্বারা তাঁহার সকল গুণ ও শক্তির কীর্ত্তন করা হয়। কারণ, তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা বলিলে তাঁহার অনন্ত প্রকার অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির উল্লেখ করা হইল এবং শেষে "ম্" যোগ করিলে তাঁহাকে গুণাতীত সুতরাং শক্তির অতীতও বলা হইল। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যে পরম পিতার অনন্তগুণ ও অনন্ত শক্তি নিযুক্ত আছেন। সুতরাং পঞ্চম প্রণব

এক শব্দে অনন্ত গুণধাম ও অনন্ত গুণাতীত পরম পিতাকে বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্ম বলিলে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বুঝায় না, ভগবান বলিলেও প্রেমলীলাময় বুঝায় না এবং ঈশ্বর বলিলেও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা বুঝায় না। সুতরাং পরম পিতাকে প্রেমলীলাময় ব্রহ্ম বা অনন্ত গুণাতীত ভগবান বলিলে বিশেষ কোনও ত্রুটি হয় না। যে ত্রুটি হয়, তাহা উক্ত শব্দ সমূহের প্রচলিত ব্যবহার দ্বারাও হইতেছে। আমাদের সকল কার্য্যই অসম্পূর্ণ। সুতরাং আমরা যে শব্দই গ্রহণ করিব, তাহা দ্বারা পরম পিতার অল্প সংখ্যক গুণই প্রকাশ করিবে। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ও ঈশ্বর একেরই কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশক শব্দ। উহারা কখনই তাঁহার পূর্ণ ভাব প্রকাশক শব্দ নহে।

ওঁ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ওঁ

ওঁ

তুমি প্রভু নিরাকার অথচ হে সর্ব্বাকার,
তবু তুমি নির্ব্বিকার, ধন্য ধন্য গুণময়।
(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

একজন মায়াবাদী সাধকের সহিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। "(১) ব্রহ্ম যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তিনি অবতার ভাবে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে তিনি যাহা

স্বেচ্ছাক্রমে নিজ সৃষ্ট দেহে যেন আবদ্ধ হন এবং ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান হন। দেহে অবস্থান কালে তিনি কখনই সম্পূর্ণ ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হন না। জীব পরমোন্নত হইতে পারেন। তিনি বহু সহস্র বা বহু কোটী গুণে পরম পিতার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তথাপিও দেহাবদ্ধ অবস্থায় তিনি (ব্রহ্ম) সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পান না। শেষ কারণ-দেহ শেষ না হওয়া পর্যান্ত তিনি অপূর্ণ ভাবেই ভাসমান থাকিবেন, সেই অপূর্ণতার মাত্রা যতই স্বল্প হউক্ না কেন। আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম স্বয়ং নিত্যই পূর্ণ এবং দেহাবদ্ধ অবস্থায়ও তিনি পূর্ণ। কিন্তু তিনি অপূর্ণ ভাবে ভাসমান মাত্র। এই জন্যই জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক। প্রকৃত পক্ষে মায়াবাদীও এই তত্ত্বই প্রচার করেন। আমাদের সহিত সেই মতের পার্থক্য এই যে আমাদের মতে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র ভাবের ভাসমানত্বের কারণ দেহাবদ্ধতা এবং মায়াবাদে তাহার কারণ অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। মায়াবাদও বলিতে বাধ্য হয় যে কূটস্থ ব্রহ্ম অবিদ্যা উপহিত ও স্বস্বরূপ বিস্মৃত। আমরাও বলি যে দেহে বদ্ধ হইয়া জীবাত্মা স্বস্বরূপ বিস্মৃত। অবিদ্যাও দেহ জনিত। অর্থাৎ আত্মা দেহের সহিত যোগ হইলেই দোষ পাশের উৎপত্তি হয় এবং সেই দোষ পাশ জনিত অন্ধকারই অবিদ্যা। অবিদ্যা অন্য স্থান হইতে উড়িয়া আসে না। উহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, স্বাধীন সত্তা নাই। আমরাও বলি যে জীবাত্মা মাত্রই স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বা ব্রহ্মই। তিনি অন্য কেহ নহেন। সুতরাং এক অর্থে প্রত্যেক জীবাত্মাই—কীটানুকীট হইতে পরমোন্নত পরমাত্মা পর্যান্ত সকলেই ব্রহ্মের অবতার। এই সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু কেহই ব্রহ্মের পূর্ণ অবতার নহেন বা হইতেও পারেন না। কারণ, দেহাবদ্ধাবস্থায় তাঁহার পূর্ণ বিকাশ হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ, দেহাবদ্ধাবস্থায় পূর্ণ প্রকাশ না হইলে একই কালে একাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে দেহাবদ্ধ আত্মা স্বরূপে পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান, অভিন্ন, হইলেও পৃথক (Distinct) ভাবে ভাসমান, যেমন তরঙ্গ সমুদ্র হইতে বিভিন্ন না হইয়াও পৃথক ভাবে ভাসমান। অবতারত্বের অর্থ অবতীর্ণতা, অর্থাৎ যে জীবে যতটুকু ব্রহ্মের গুণের বিকাশ হইয়াছে, তিনি ততটুকু অবতারত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মের অনন্ত গুণের পূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ অনন্ত একত্বের একত্বের পূর্ণ বিকাশ যখন কোন কারণ-দেহেও সম্ভব হয় না, তখন পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ পার্থিব দেহাবদ্ধাবস্থায় অসম্ভব। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ অবতার হইতে পারে না। আমাদের একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের স্বভাব নিত্য, ইঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না বা হইতেও পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান বটেন, কিন্তু সেই জন্য ইহা চিন্তা করা যায় না যে খেয়ালী মনুষ্যের ন্যায় যখন যাহা খুসী, তখন তাহা তিনি করেন। আর তিনি নিত্যই অনন্ত ভাবে পূর্ণ তাঁহার কোনই অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজনীয়তা নাই। পরলোকগত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি-মত্ত্ব আছে বলিয়া তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে যদি বলেন যে আত্মহত্যা দ্বারা আত্মা ত হত হন না দেহই হত হয় অর্থাৎ আত্মার হত্যা অসম্ভব। কারণ, উহাতে আত্মার নিত্য স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। তাহা অসম্ভব। আমরাও সেইরূপ বলি যে ব্রহ্মের স্বভাবই এইরূপ যে তিনি তাঁহার সর্ব্ব-শক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেহাবদ্ধ এবং সেই একই কালে পূর্ণ অবতার হইতে পারেন না। ইহার বিরুদ্ধে আরও একটি প্রধান আপত্তি এই যে উহা স্বীকার করিলে জগতে একই কালে বহু পূর্ণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। ধরা যাউক্, বর্ত্তমান পৃথিবীতে একশত দেহাবদ্ধ পূর্ণাবতার আছেন। যদি তাহাই হয়, তবে স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম এক এবং শতটি দেহাবদ্ধ পূর্ণাবতার-রূপী পূর্ণ ব্রহ্ম—সমষ্টিতে ১০১টি পূর্ণ ব্রহ্ম পৃথিবীতে আছেন।

পাতঞ্জল দর্শনের যুক্তি অনুযায়ী প্রমাণ করা যায় তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মের পূর্ণাবতার অসম্ভব। এই সম্পর্কে আমাদের একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণে যখন যুক্তিতর্কে হালে পানি না পায়, তখনই ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির ও সর্ব্বশক্তিমত্তার দোহাই দেন। মানব সৃষ্টির প্রথম হইতেই যদি একমাত্র ঐরূপ ভাবদ্বয়ের উপরই নির্ভর করিয়াই মানব থাকিত, তবে আজ পৃথিবীতে এত অধিক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কৃত ও সুপ্রমাণিত হইত না। মানব দেখিয়াছে যে, যে সকল তত্ত্ব প্রথমতঃ ঐরূপ ভাবে অর্দ্ধ মীমাংসিত ছিল, তাহা পরে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে আমি ব্রহ্মের সুমহীয়সী ইচ্ছাশক্তির অনন্ত শক্তির কিছুই খর্ব্বতা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অপার মহিমা আছে, ইহা অতি সত্য। কিন্তু তিনি অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা ইহাও সত্য। তাঁহাতেই অনন্ত বিপরীত গুণের অনন্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে। জগতে একটী অমোঘ বিধান কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহা সেই অনন্ত গুণের অনন্ত সংমিশ্রণে যে একটী অপূর্ব্ব, নিত্য ও অনন্ত ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহারই ফল স্বরূপ। উহা খেয়ালী মানুষের খেয়াল জাত নহে। সেই বিধান ক্রমময় ও ন্যায় সঙ্গত যুক্তিতে পরিপূর্ণ বটে। সেই যুক্তি একমাত্র Empirical Logic-এর যুক্তি দ্বারা পূর্ণ নহে, কিন্তু তাহা সুযুক্তিতে পূর্ণ। সেই বিধান কখনই অযৌক্তিক নহে। সেই যুক্তি বুঝিতে আমাদের Empirical and Transcendental Logic উভয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় বিধির বিধান সর্ব্বদা মঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহা কখনও অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ব্রহ্ম যখন মানব ভাবে অবতার হইতে পারেন, তখন তিনি কেন স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সাকার ভাবে সাধককে দেখা দিতে পারিবেন না? ব্রহ্মই স্বয়ং ভক্তের অবস্থানুযায়ী বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আকার ধারণ করিয়া নানারূপে

দেখা দেন। দেবদেবীর যে সকল রূপ, তাহা ব্রহ্মেরই নানা ভাবের ধৃত রূপ, তিনি যে ভাবে যাহাকে দেখা দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মের পূর্ণাবতার কখনই হয় না বা হইতেও পারে না। যাঁহাদিগকে আমরা অবতার বা পূর্ণাবতার বলি, তাঁহারাও মানুষ মাত্র ছিলেন, তাঁহারাও মনুষ্যোচিত কর্ম্মই করিয়াছেন এবং মনুষ্যোচিত দোষ গুণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক অর্থে জীব মাত্রই ব্রহ্মের অংশাবতার। হিন্দু শাস্ত্রে মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহকেও অবতার বলা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মতই সমর্থিত হইল। সুতরাং তিনি যখন কোন না কোন দেহ ধারণ করেন, তাঁহাকে আর তখন ব্রহ্ম বলা যায় না। তিনি ত তখন জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন। দেহধারী ব্রহ্মই জীব সুতরাং চির ক্ষুদ্র ভাবে ভাসমান। সুতরাং কোনও না কোনও দেহ ধারণ করিলেই তিনি যেন ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবের দর্শনে ব্রহ্ম দর্শনের ফল লাভ হয় না, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম দর্শনে যে তৃপ্ত তাহাও লাভ হয় না। সেইরূপ ভাবের ব্রহ্ম দর্শনই যদি সাধকের আকাঙ্ক্ষা হইত, তবে ত তিনি জীব মাত্র দর্শনেই ব্রহ্ম দর্শনের ফল লাভ করিতেন। জীব ত তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অনায়াসে দেখিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম দর্শনের জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। যদি বলা যায় যে শাস্ত্রে যেরূপ ভাবে দেব দেবীর রূপ বর্ণনা আছে, ব্রহ্ম মায়া প্রভাবে সেই সেইরূপ ধারণ করিয়া ভক্তকে দেখা দেন, তবে বলিতে হয় যে তাহাও সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ মায়াবাদে মায়া ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাকে সাংখ্য প্রকৃতির ন্যায় স্বাধীনা ভাবে গঠন করা হইয়াছে। মায়া ব্রহ্ম জ্ঞানাদি দ্বারা তমীভূত হন। ব্রহ্মে অনন্ত জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান, শক্তিমানেরই শক্তি, সুতরাং ব্রহ্মে মায়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়,

ইহা মায়াবাদেরই মত। সুতরাং তাঁহার কোনই শক্তি নাই। শক্তিমান ভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণ-হীন ও শক্তিহীন ব্রহ্মের মায়ারূপিনী শক্তি থাকিতে পারে না। মায়া মায়াবাদের কল্পনা বই আর কিছুই নহে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে উভয় ভাবেই প্রমাণিত হইল যে মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না। আর নিত্য নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কেন মায়া দ্বারা উপাহিত হইবেন? তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকারও বটেন। কে তাঁহাকে মায়োপহিত করেন? মায়ার সহিত ব্রহ্মের (মায়াবাদের পরব্রহ্মের) কোনই সম্পর্ক নাই। তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে মায়োপহিত নহেন। (মায়াবাদে সগুণ ব্রহ্ম মায়োপহিত এবং কূটস্থ ব্রহ্ম অবিদ্যা উপহিত সুতরাং নিষ্ক্রিয় এবং মায়া সম্পর্ক শূন্য ব্রহ্মের পক্ষে মায়া শরীর ধারণ একান্ত অসম্ভব। ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং সেইরূপ ব্রহ্ম কেন মিথ্যা রূপ ধারণ করিবেন? তিনি ত মায়া দ্বারা চালিতও হন না। মায়া শরীর বলিয়া যাহা কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুগণ বলেন, তাহাও মায়া শরীর নহে। নিম্ন শ্রেণীর পার-লৌকিক আত্মাগণ যে নানারূপ ধারণ করিয়া অন্ধ বিশ্বাসীদিগকে বিভ্রান্ত করেন, সেই সকল শরীরও ভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূতই জগতে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। পারলৌকিকগণ বা ইহ লোকস্থ সিদ্ধগণ ইচ্ছামাত্র পঞ্চভূত দ্বারাই ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন। Spirituali t-গণ বলেন যে পারলৌকিকগণ Materialised Body ধারণ করিতে পারেন। এই Materialised Bodyই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত গঠিত দেহ। যখন তাহারা Materialised Body ধারণ করেন, তখন তাহা লোকচক্ষুর গোচর হয়, এবং ইহা দ্বারা অন্যবিধ পার্থিব কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। শুনিয়াছি মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী পারলৌকিকদিগের সহিত Hand-shake করিয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ দেহ মায়া শরীর নহে। আমি নিম্নলিখিত সত্য কাহিনী ১৯০৩ সনে শ্রীশ্রীগুরুদেবের

নিকট শুনিয়াছি। সেই কালে কলিকাতায় একটী সাধু আসিয়াছিলেন। তখন সন্ন্যাসীদিগের প্রতি বর্ত্তমান কাল হইতে অধিকতর শ্রদ্ধা ছিল। কোন এক ব্যক্তি সেই সাধুর নিকট যাতায়ত করিত এবং তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিত। সাধু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বিষ্ণু দর্শন করিতে ইচ্ছুক কিনা? ইহাতে সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাকে বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখান হইল। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখিলেন। সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি বিষ্ণু মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন কিনা। ইহাতে সেই ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন যে তিনি বিষ্ণু মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষ্ণু দর্শনে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা তাহার হয় নাই। এমন অনেক সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক আছেন, যাহারা নিম্নশ্রেণীর পারলৌকিক আত্মা লইয়া অনেক খেলা করেন এবং অন্ধ বিশ্বাসীদিগকে ভ্রান্ত করেন। এস্থলে তাহাই হইয়াছিল। কোন নিম্নশ্রেণীস্থ আত্মা বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেইরূপ দর্শনে দর্শক কখনই আনন্দ লাভ করেন না। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে এমন অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ পারলৌকিক আত্মা আছেন, যাহারা অন্ধ বিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব নিয়া খেলা করেন। এই ভাবে চিন্তা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্ম যদি মায়া শরীরে দেখা দেন, তবে সাধক কোনই আনন্দ লাভ করিবেন না। বিষ্ণু দর্শন যেমন সেই ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা হইয়াছিল, মায়া শরীরধারী ব্রহ্ম-দর্শনও সেইরূপ মিথ্যাই হইবে। মায়া দ্বারা কৃত সকলই মিথ্যা সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম কেন মিথ্যা রূপ ধারণ করিবেন? আর যদি বলেন যে তিনি ইচ্ছামাত্র Materialised শরীরের রূপ ধারণ করিয়া দেখা দেন, তবে বলিতে হয় যে তিনি ত তখন সাময়িক ভাবে জীবই হইলেন। সুতরাং সেই জীব দর্শন ও ব্রহ্ম দর্শন এক নহে। সুতরাং উভয়ে আকাশ পাতাল পৃথক্। দ্বিতীয়তঃ—

ব্রহ্ম দর্শনের অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে ব্রহ্ম একজন মানুষের ন্যায় অথবা কোন জড় পদার্থের ন্যায় আমাদের চর্ম্ম চক্ষুর গোচর হন? বহিরিন্দ্রিয় যখন মনে এবং মনঃ যখন জীবাত্মার লয় হয় তখন পরমাত্মার অপার কৃপায় জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পারেন। অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মাকে দেখেন। তখন মনঃ এবং বহিরিন্দ্রিয় লয় প্রাপ্ত হওয়ায় জীবাত্মা পৃথিবীকে ভুলিয়া যান এবং তখন তিনি একমাত্র আত্মার রাজ্যে বাস করেন। এই Alone to Alone অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় বা মন কি কোন কার্য্য করিতে পারে? উহারা যে তখন লয় প্রাপ্ত সুতরাং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। সে অবস্থায় মায়া শরীর বা Materialised Body-এর প্রশ্নই উঠে না। কারণ, তখন তিনি জড় সম্পর্ক বর্জ্জিত অবস্থায় আত্মার রাজ্যে বিচরণ করেন। সুতরাং ব্রহ্ম দর্শন কালে ব্রহ্ম কখনও মায়া প্রভাবে নানারূপে সাধককে দর্শন দান করেন না। ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধে অন্য একটী তত্ত্ব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতে পারে। তাহা এই যে আত্মার জ্ঞানই বিবিধ বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। যথা—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত ও অহঙ্কার। কিন্তু আত্মার নিজস্ব একমাত্র জ্ঞান বিশুদ্ধ। উহাতে কোনই বিকার বা বিভাগ নাই। সুতরাং সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আত্মা ব্রহ্ম দ্বারা ধৃত মিথ্যা রূপ দেখিতে পারেন না। কারণ, সেই জ্ঞানে মিথ্যা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে। সুতরাং আত্মা সেই মিথ্যা রূপকে মিথ্যা বলিয়াই জানিবেন এবং তিনি তখন মিথ্যা বিষ্ণুরূপ দর্শকের ন্যায় পরম পিতাকে জানাইবেন যে তিনি এই মিথ্যা মায়ারূপ দর্শনে তিনি তৃপ্তি লাভ করেন নাই এবং তিনি ব্রহ্মের সত্য রূপ দর্শনের জন্যই প্রার্থী। সুতরাং এই তত্ত্বানুযায়ী অনুসন্ধানেও বুঝিতে পারা গেল যে ব্রহ্ম দর্শন কালে আত্মা কখনও ব্রহ্মের মিথ্যা মায়ারূপ দেখেন না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম দর্শন কালে আত্মার সত্য জ্ঞান অত্যুজ্জ্বল থাকিবেই।

সুতরাং তখন মায়া বা মিথ্যা বা অন্ধকার থাকিতেই পারে না। মায়াবাদও বলেন যে ব্রহ্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মায়া ধ্বংসই হয়। তৃতীয়তঃ—পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম দর্শন জড় পদার্থ দর্শনের ন্যায় নহে। ব্রহ্ম দর্শনের অর্থ এই যে ব্রহ্মের কোন এক গুণে সাধকের একত্ব লাভ হইয়াছে। এস্থলে দর্শনের অর্থ পাওয়া এবং পাওয়ার অর্থ হওয়া। যখন কোন সাধক এক বা একাধিক গুণে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ সেই সেই গুণে ব্রহ্মের সহিত এক হন, তখন সেই সেই গুণের চরমোৎকর্ষ স্থান ব্রহ্ম নিরীক্ষিত হন। সুতরাং ব্রহ্মকে দর্শন করাও যাহা, ব্রহ্মের সহিত অন্ততঃ একটী গুণে এক হওয়াও তাহা। যদি ইহাই সত্য তত্ত্ব হইল, তবে ব্রহ্মের মায়া শরীর ধারণ এবং নানারূপ প্রদর্শনের প্রশ্নই উপস্থিত হয় না। গুণী গুণাধারকে দেখেন। সাকারের প্রশ্ন কিরূপে উপস্থিত হইবে? ব্রহ্মের অনন্ত গুণই Abstract, Concrete নহেন, নিরাকার, সাকার নহেন। আত্মাও নিরাকার, গুণও নিরাকার, স্বয়ং ব্রহ্ম অনন্ত ভাবে নিরাকার। সুতরাং নিরাকার নিরাকারকে নিরাকার দ্বারা দেখিবে, ইহাতে আশ্চার্য্যের বিষয় কি আছে? চতুর্থতঃ সাধক ইন্দুভূষণ রায়ের নিম্নোক্ত সঙ্গীতাংশ উদ্ধার করিয়া বলা হয় যে ব্রহ্মই সাকার ভাবে সাধককে দর্শন দান করেন। 'সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার কূপে নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে।" এস্থলে দেখা যায় যে সাধকের নিকট ব্রহ্ম দর্শন কালে সাকার ডুবিয়া যায় অর্থাৎ সেই কালে সাকার কিছু থাকে না এবং নিরাকার ব্রহ্ম সত্য ভাবে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ সাধক তাঁহাকে Real দেখেন। "নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে" বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে তিনি সাকার রূপ ধারণ করিয়া সাধককে দর্শন দান করেন। আমরা সাকার রূপকেই Real বলি অথবা জড় পদার্থ মাত্রকেই Real বা সত্য বলি। এই ভাব অনুসরণ করিয়াই পাশ্চাত্য দেশে Realists নামক দার্শনিকগণের অভ্যুত্থান হইয়াছে। জড় পদার্থের মধ্যেও নিরাকার বোধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

অনেকে সন্দিহান। আমরা সাকার পদার্থ দর্শনে যেরূপ উহার সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হই, নিরাকার পদার্থ সম্বন্ধে ততদূর নহে। অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য হইলেই আমরা কোন পদার্থের বা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হই। এই জন্যই জড় পদার্থকে সাধারণতঃ সত্য বা Real বলা হয়। সেইরূপ সাধক বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম নিরাকার হইয়াও সাধকের নিকট কৃপা করিয়া দর্শন দেন এবং সেই দর্শনে ব্রহ্মকে Realest of the Real বলিয়া দর্শন করা যায়। অর্থাৎ আমরা সাকার জড় পদার্থ দর্শনে উহার সত্যতা সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হই, সেইরূপ ব্রহ্ম দর্শন কালে তাঁহাকে তাহা হইতেও অনন্ত গুণে সত্য বলিয়াই জ্ঞান হয়। সেই দর্শন জড়ীয় সাকার রূপ দর্শন নহে, কিন্তু সাকার রূপ দর্শনে উহার সত্যতা হইতেও সেই পরম দর্শনের সত্যতা অনন্ত গুণে অধিকতর। সাকার পদার্থ দর্শনে বরং ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম দর্শনে ব্রহ্মের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের অবসর থাকে না। তাই ব্রহ্ম দ্রষ্টা পরমর্ষি গুরুনাথ তাঁহার দ্বারা রচিত ব্রহ্মস্তোত্রে বলিয়াছেন যে রাত্রি সমাগমে সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও তাঁহার চিত্ত টলিবে না ইত্যাদি। সত্য জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত জ্ঞান দর্শনে কি ভুল হইতে পারে? সত্য জ্ঞানের মধ্যে কি ভ্রান্তি থাকিতে পারে? জ্ঞানাগ্নি না মায়া ধ্বংস করে? আর ব্রহ্মকে কি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায়? তিনি চিন্ময়, তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখা যায়। তিনি যে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারেন না, সেই সম্বন্ধে "ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন' অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আত্মাই পরমাত্মাকে দেখেন। সুতরাং পরমাত্মা স্বীয় সত্তা স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া জীবাত্মাকে মায়ারূপ দেখান, ইহা একটি নিছক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার জড়-ভাব-বিবর্জ্জিত। ব্রহ্মদর্শন কালীন মনের অবস্থা সম্বন্ধে প্রোক্ত অংশে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু

প্রামাণ্য উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইরূপ উক্তি সমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও কি বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম তাঁহার ভক্তকে নানা মায়ারূপ দর্শন করান? ইহার উপরও কূটতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে মনের লয় হইতে পারে বটে, কিন্তু জীবাত্মাকে মায়ারূপ প্রদর্শন করিতে বাধা কোথায়? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে যে তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। কারণ, তখন "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই" এই ভাব বর্ত্তমান থাকে। পরমাত্মা বা জীবাত্মার স্বরূপে মায়া নাই। সুতরাং মায়া দ্বারা গঠিত রূপের তখন উপস্থিত অসম্ভব। আত্মার রাজ্যে মায়া নাই। সুতরাং মায়া শরীরও নাই। আর সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের জীবাত্মাকে (মনঃ লয় প্রাপ্ত আত্মাকে) মায়ারূপ দর্শন করাইবার সম্ভাবনা আছে কি? তাঁহাতে ত মায়া নাই। আর মায়ার অর্থই ত মিথ্যা। সত্য স্বরূপে কি মিথ্যার অস্তিত্ব আছে? তিনি সত্য স্বরূপ হইয়া কি মিথ্যার ব্যবহার করিতে পারেন? অতএব এই সমালোচনায় আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ব্রহ্মে মায়া নাই, সুতরাং তিনি মায়ারূপ ধারণও করিতে পারেন না। (৩) আবারও প্রশ্ন এই যে ব্রহ্ম নিরাকার ও সাকার উভয়ই। তবে কেন তিনি নিজেকে সাকার ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবেন না? অর্থাৎ ব্রহ্ম সাকার রূপ ধারণ করিয়া কেন তিনি সাধককে দর্শন দান করিতে পারিবেন না? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে ব্রহ্ম নিরাকার ও সাকার উভয়ই বটেন, কিন্তু আমরা যাহাকে সাকার বলি, তাহাও তিনি নহেন। কিন্তু তিনি অনন্ত নিরাকারত্ব এবং অনন্ত সাকারত্বের সংমিশ্রণে যাহা হয়, তাহাই তিনি। আমরা জড় পদার্থের সাকার বা নিরাকার ভাব লইয়াই যুক্তি যোজনা করি, বর্ত্তমান প্রশ্নের মধ্যেও জড়ীয় সাকারত্বের কথাই উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু জড়ের সাকারত্ব এবং নিরাকারত্ব ব্রহ্মের সাকারত্ব এবং নিরাকারত্ব নহে, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জড়ের যাহা কিছু, তাহাই বিকৃত। জড় চির

বিকৃত পদার্থ। সুতরাং নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মের রূপের বা গুণের সহিত জড়ীয় রূপ গুণ তুলিত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের জড়ীয় সাকার রূপ নাই এবং তিনি তাহা স্বয়ং ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটী গুণ নিরাকার। উঁহারা প্রত্যেকে অনন্ত ভাবে Abstract, কখনও Concrete নহে। সুতরাং সেই অনন্ত নিরাকার গুণের সংমিশ্রণে যে গুণটী হইয়াছে, তাহাই তিনি এবং তাঁহাই অনন্ত নিরাকার। আমাদের জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ চিন্তা করিলে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস লাভ করিতে পারি। কারণ, আমাদের জ্ঞান, প্রেম যাহা আমরা অনুভব করি ও জ্ঞান প্রেম বলিয়া বুঝি, তাহাও বিকৃত ভাবেই আমাদের নিকট অনুভূত হয়, উঁহারা কখনই আত্মিক বিশুদ্ধ গুণ ভাবে অনুভূত হয় না। কেবল একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্ম দর্শন কালে তাঁহার অবলম্ব্য গুণের প্রকৃত সত্তা স্বরূপ দেখিতে পান। কারণ, তখন তিনি সেই গুণের চরমোৎকর্ষ স্থান নিরীক্ষণ করেন এবং তখন তিনি জড় সম্পর্ক শূন্য। সুতরাং ব্রহ্ম অনন্ত নিরাকার বটেন। এখন প্রশ্ন হইবে যে তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব গুণের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকারত্বের যে সমগ্র ভাব, তাঁহাই তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব। আমরা অবশ্যই তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্বের ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্বের সমগ্র ধারণা প্রতিমুহূর্ত্তেই করিতেছেন। এই যে অনন্ত নিরাকারত্বের সমগ্রত্ব বা অনন্ত নিরাকারত্ব দ্বারা যাহা গঠিত, তাঁহাই তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব। কেহ মনে করিতে পারেন যে বিশ্বে যে অনন্ত প্রায় নিরাকার পদার্থ আছে, উহাদের সমষ্টিই ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকার রূপ এবং বিশ্বে যে অনন্তপ্রায় সাকার পদার্থ আছে, উহাদের সমষ্টিই তাঁহার অনন্ত সাকার রূপ। ইহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের

অনন্ত গুণের প্রত্যেকটীই নিত্য এবং অনন্ত। তাঁহার মধ্যে অনিত্য, এমন কি আমাদের অর্থাৎ চিরকাল স্থায়ী অর্থে অনন্ত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সান্ত গুণও থাকিতে পারে না। সৃষ্টি সাদি ও সান্ত। সুতরাং উহারা (সাকার ও নিরাকার পদার্থ সমূহ) নিত্য ও অনন্ত নহে। আর সান্ত পদার্থ সমূহের সমষ্টিতে অনন্তত্ব লাভ হয় না। সেইরূপ সমষ্টির ধারণা আমরা না করিতে পারি, কিন্তু উহা কখনই প্রকৃত অনন্ত হইবে না। যাহা অনন্ত, তাহা নিত্যই অনন্ত। এই বিষয় সম্বন্ধে "অব্যক্ত কি" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আর প্রবন্ধ বাড়াইব না। মহাপ্রলয়ে সাকার বা নিরাকার কোন জড় পদার্থই থাকিবে না। সুতরাং অসংখ্য সাকার পদার্থের সমষ্টি এবং অসংখ্য নিরাকার পদার্থের সমষ্টি দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত নিত্য ও পূর্ণ নিরাকার ও সাকারত্ব রূপ গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার অনন্ত নিরাকারত্বের সমগ্রত্বই তাঁহার অনন্ত সাকারত্ব। সুতরাং ইহা বলিলে চলিবে না যে তিনি যখন অনন্ত সাকার, তখন তাঁহার পক্ষে সান্ত এবং অনিত্য সাকার মায়ারূপ গ্রহণে ত্রুটী নাই। আর ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম সাকার মায়ারূপ ধারণ করিয়া সাধককে দর্শন দান করিতে পারেন না। (৬) যুক্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মীমাংসা হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। Empirical Logic (পার্থিব ন্যায়শাস্ত্র) দ্বারা যে সকল ব্রহ্ম তত্ত্বের শেষ মীমাংসা হয় না, তাহা সত্য। এই সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না বলিয়া বিচার কালে যুক্তিকে বাদ দিলেও চলিবে না। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে যুক্তি দ্বারা শেষ মীমাংসা লাভ হয় না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিচারে কত কত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন? ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার কালে যখন নিতান্ত পার্থিব যুক্তি দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না, তখন Transcendental Logic-এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পরম

পিতার মঙ্গল বিধান এবং মঙ্গলময় তত্ত্ব সমূহ কখনই অযৌক্তিক নহে। উহাদের প্রত্যেকটী সম্পূর্ণ রূপে সুযুক্তি পূর্ণ। কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত সত্য ও অনন্ত জ্ঞানে নিত্য পরিপূর্ণ। তাঁহার বিধান বা তত্ত্ব কখনই জ্ঞান বিরোধী বা অজ্ঞানতা পূর্ণ হইতেই পারে না। তবে আমাদের কর্ত্তব্য হইবে যে আমরা সেইরূপ সত্য যুক্তি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব। যুক্তির অর্থ কি? আমরা তাহাকেই যুক্তি বলি, যাহার অবলম্বনে আমরা সত্য জ্ঞানের দ্বারে উপনীত হইতে পারিব। যাহা দ্বারা সত্য জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা প্রকৃত যুক্তি নহে, কিন্তু যুক্ত্যাভ্যাস বা কুযুক্তি বা মিথ্যা যুক্তি। সত্য তত্ত্ব উদ্ধারার্থ যে বিচার, তাহাই প্রকৃত বিচার। কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া কূটতর্ক দ্বারা পরমত খণ্ডনের জন্য অথবা নিজমত সমর্থনের জন্য ব্যস্ত হই। দুঃখের বিষয় এই যে এই কারণে সত্য নির্ণয় হয় না এবং উষ্মার সঞ্চার করে। এমন কি সময় সময় From words to blows-এর আশ্রয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়। এই সকল সময় যুক্তির আশ্রয় মোটেই গ্রহণ করা হয় না। অথচ যুক্তির উপর সকল দোষ চাপান হয়। আমরা একেবারে যুক্তিশূন্য হইয়া কোনও কার্য্য করি না। সেই যুক্তি অসম্পূর্ণ হইতে পারে, মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তথাপিও আমরা কার্য্যের পূর্ব্বে কোনও না কোনও রূপ বিচার করিয়া থাকি। বিচার যুক্তি ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। যুক্তি ভিন্ন যখন মানুষ চলিতে পারে না, তখন সে কি প্রকারে শ্রেষ্ঠতম বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্ম তত্ত্ব বিনা যুক্তিতে মীমাংসা করিবে? অন্ধ বিশ্বাসী যখন কোন এক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজের কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন, তখনও তিনি মনে মনে এইরূপ যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন যে সেই ব্যক্তি সাধু, অভিজ্ঞ, সত্যবাদী ইত্যাদি, সুতরাং তাঁহার উপদেশ প্রতিপালনে দোষ নাই। এই যে মহাপুরুষদিগের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হয় এবং উহা এক প্রকার প্রমাণ মধ্যে গণ্য, তাহার কারণও ঐ একই। কোন গ্রন্থকে

অভ্রান্ত বলিবার কারণ এই যে উহাতে নিহিত বহু তত্ত্ব যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে এবং সেই সকল তত্ত্বের বক্তাগণ সাধু, সত্যবাদী, অভিজ্ঞ ইত্যাদি। সুতরাং মহাজনদিগের দোহাই দেওয়াই হউক্ অথবা অভ্রান্ত গ্রন্থেরই দোহাই দেওয়া হউক্, উহার পশ্চাতেও যুক্তি আছে। আমরা যে সে ব্যক্তিকে মহাজন বলি না এবং যে সে গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলি না। সুতরাং যুক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল না। এই যে আমরা বলি যে পার্থিব যুক্তি দ্বারা ব্রহ্ম তত্ত্বের শেষ মীমাংসা লাভ হয় না, ইহাও এক প্রকার যুক্তিই। এখন অভ্রান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক্। পৃথিবীর সকলেই কিন্তু কোন এক গ্রন্থকে অভ্রান্ত মনে করে না। হিন্দুগণ বেদকে, মুসলমানগণ কোরাণকে, খৃষ্টানগণ বাইবেলকে অভ্রান্ত মনে করেন! এইরূপ অন্যান্য মতাবলম্বিগণ এক একখানি গ্রন্থকে অভ্রান্ত মনে করিতে পারেন। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের অভ্রান্ত গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না। আবার দেখা যায় যে এক ধর্ম্মের অভ্রান্ত গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন মত বিরোধী তত্ত্ব অন্য অভ্রান্ত গ্রন্থে বর্ত্তমান। উপনিষদ্ অভ্রান্ত গ্রন্থ কিন্তু তন্নিহিত তত্ত্বের বিভিন্ন এবং সময় সময় বিপরীত ব্যাখ্যা বর্ত্তমান। বেদান্ত দর্শন অভ্রান্ত বলিয়া কথিত না হইলেও উহা প্রায় সেইরূপ ভাবেরই গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও প্রায় সেইরূপ গ্রন্থ। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ নিজ নিজ মতানুযায়ী উহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে কোন কোন স্থলে একের ব্যাখ্যা অন্যের বিপরীতও হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য অভ্রান্ত এবং বিশেষ রূপ সমাদৃত গ্রন্থ সম্বন্ধেও দেখা যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায় যদি কোন এক গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলে তবে ব্যাখ্যাকারগণকেও অভ্রান্ত মনে করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারাও সাধক ও পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলিলে বিপরীত ব্যাখ্যাকেও অভ্রান্ত সত্য মনে করিতে হইবে। তাহা অসম্ভব। এখন ধরা যাউক যে উপনিষদের কোনও একটী তত্ত্বের বিপরীত ব্যাখ্যা বর্ত্তমান। এখন পৃথিবীর মানব কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে। এস্থলেই

বলিতে হইবে যে তিনি ঐ গ্রন্থ এবং তজ্জাতীয় গ্রন্থ সমূহকে বিশেষ ভাবে পাঠ করিবেন এবং বিচার দ্বারা অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিবেন যে উহাদের কোন্ ব্যাখ্যা যুক্তি যুক্ত সুতরাং সত্য অথবা কোন ব্যাখ্যাই সত্য না হইয়া অন্য এক ব্যাখ্যা সত্য হইবে। সুতরাং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কোন কিছুর বিচার কালে যুক্তির আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মার বাক্যও যদি যুক্তিহীন হয়, তবে তাহা তৃণবৎ অগ্রাহ্য, কিন্তু যুক্তি যুক্ত বালক বাক্যও সাদরে গ্রহণীয়। বিচার করিব, কিন্তু যুক্তির ধার ধারিব না, ইহা স্ববিরোধী উক্তি। সুতরাং সত্য তত্ত্ব নির্ণয়ার্থে বিচার এবং বিচারের জন্য যুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। যুক্তি ভিন্ন বিচার হয় না এবং বিচার ভিন্ন তত্ত্ব মীমাংসিত হয় না। কেহ বলিতে পারেন—'মহাজনো যেন গতঃ স: পন্থা'। কিন্তু এই মহাজন নির্ণয় করাও যুক্তির উপর নির্ভর করে। সকল মহাজনকেই সকলেই এক বাক্যে গ্রহণ করে না; আবার সকল মহাজনেরই একমাত্র পন্থা নহে। বেদান্তে উপাসনার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এই কার্য্য ও যুক্তিও বিচার দ্বারা সম্পন্ন হয়। মনন ত সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি প্রয়োগে বিচার। সুতরাং যুক্তি ভিন্ন সাধারণের পক্ষে তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য অন্য উপায় নাই। সাধারণে কোন বিশেষ মহাপুরুষ না মানিতে পারেন, কোন বিশেষ গ্রন্থকে না মানিতে পারেন, কিন্তু তিনি ন্যায়তঃ যুক্তি মানিতে বাধ্য। এই সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা দ্বারা বলিতে পারি যে অনেকেই নিজ নিজ সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া নিজ মত রক্ষার্থ ও পরমত খণ্ডনার্থে কূটতর্কের অবতারণা করে, সত্য তত্ত্ব উদ্ধারার্থ কোনই যত্ন নাই। এই জন্যই এত মতভেদ।" সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইংরেজীতে উক্তি আছে-One God, One Law, One Universe. জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও বলেন যে জগতে একই বিধান

কার্য্য করিতেছেন। আত্মিক জগতে দেখা যায় যে প্রেমের আকর্ষণীয় শক্তি আছে এবং প্রেমের শক্তিই জয় যুক্ত হয়। জড় জগতেও দেখা যায় যে জড়ের আকর্ষণীয় শক্তি আছে। সেই শক্তি বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। তাই জগৎ গঠিত ও রক্ষা পাইতেছে। বিকর্ষণী শক্তি বলবত্তরা হইলে জগৎ কেবল মাত্র chaos and confusion-এ পরিণত হইত, এই মহাসুন্দরী প্রকৃতি দেবীকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, যে বিধান মূলে কার্য্য করিতেছেন, তাহা একই, কখনই বহু নহেন। তবে যে আমরা বহু দেখি, তাহা প্রকাশেরই পার্থক্য মাত্র—প্রকার ভেদ মাত্র। ব্রহ্ম যখন এক, তাঁহার বিধান যখন এক, তখন তাঁহার ধর্ম্মও একই হইবে, কখনই একাধিক হইবে না। প্রকৃত ধর্ম্ম সত্য ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ, তিনি যেমন ধর্ম্মস্বরূপ, তেমনি তিনি সত্য স্বরূপ, তাঁহার কিছুই সত্য বই মিথ্যা নহে। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মও পূর্ণ ভাবে সত্য। আমাদিগকে সেই সত্য-ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যে যুক্তির ভাগ নিতান্ত স্বল্প নহে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মোপাসনা এবং গুণ সাধনার স্থান অতি উর্দ্ধে।

ওঁং নিত্যং নিরাকার-সাকারং ব্রহ্ম ওঁং

ওঁং

যত কিছু অমঙ্গল দুঃখ বিপদ ঘেরা জাল,
তোমার প্রেম সুবিশাল, (করবে) মঙ্গলেতে লয়।
তোমার প্রেমলীলায় বিপদ এলে, প্রেমের টানেই যাবে চলে,
সুন্দর করে নেবে বলে এ বিধান হয়।
প্রেমে নিত্য টানছ সবে প্রেমের জয় হবেই হবে,
(সকল) আপদ বিপদ কেটে যাবে, (সবাই) হইবে নির্ভয়।

সপ্তম পরিশিষ্ট

জগতে দুঃখ বিপদ কেন ?

পুরাণে লিখিত আছে যে শিবই রুদ্র। রুদ্র অর্থে ভীষণ বুঝায়। শিব শব্দের দুইটী অর্থ। একটী অর্থে বুঝায় যিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধম, তিনি শিব। * এই জন্যই বলা হইয়াছে :—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।" যাঁহার দোষপাশ লয় প্রাপ্ত, তিনি অবশ্যই সুপবিত্র হইয়াছেন। শিব শব্দের দ্বিতীয় অর্থ সকলেরই জানা আছে, অর্থাৎ যিনি মঙ্গলময়, তিনিই শিব। একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণ শিব বা পরম শিব। মঙ্গল কাহার দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে ? যিনি বিরুদ্ধ সদ্‌গুণের আধার এবং যাঁহাতে সেই সকল বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে, তিনিই মঙ্গল করিতে পারেন। আমরা সচরাচর দেখি যে স্নেহান্ধ মাতা পিতা তাঁহাদিগের সন্তানদিগের অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করেন, সময় সময় ঐ সকল কার্য্যে উৎসাহও দেন, কিন্তু তাহাদের (সন্তানদের) দোষ ত্রুটী সংশোধনের জন্য কোনই ব্যবস্থা করেন না, তাহাদিগকে শাসন করা ত দূরের কথা। ফলে মাতা পিতার কার্য্যে সন্তানদের অমঙ্গলই উৎপন্ন হয়। আবার এমন অনেক দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্যক্তি আছেন, যাহারা ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অকাতরে দান করেন। এইরূপ অপাত্রে দানও অমঙ্গলের কারণ হয়। কিন্তু যে মাতাপিতার স্নেহও আছে এবং ন্যায় গুণও বর্ত্তমান, তাঁহারা সন্তানের দোষ ত্রুটী সংশোধনের জন্য শাসনও করেন, কদাচ সন্তানের অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দেন না বা তাহার সমর্থন করেন না। ফলে তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলই করেন। সেইরূপ যে সকল দয়ালু ব্যক্তির ন্যায়জ্ঞানও উজ্জ্বল, তাহারা কখনই অপাত্রে দান করিয়া জগতে অমঙ্গল সৃষ্টি করেন

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্যে এই অর্থ লিখিত হইয়াছে।

না। সুতরাং দেখা যায় যে যাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ নাই, তাহা দ্বারা অমঙ্গলের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। তাই তিনি নিত্য, অনন্ত ও পূর্ণ ভাবে মঙ্গলময় বা পূর্ণ শিব। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি শিব হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাতে যদি বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ না হইত, তাহা হইলে তিনি মঙ্গলময় হইতে পারিতেন না। তাঁহাতে যখন বিরুদ্ধ গুণের একত্ব হইয়াছে, তখন তাঁহাতে কঠোর ও কোমল গুণ বর্ত্তমান। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্ম স্তোত্রে তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা ও পাতা বলা হইয়াছে, আবার তাঁহাকে প্রলয় কর্ত্তাও বলা হইয়াছে। সেই গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে:—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।" দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মই একাধারে ভীষণ এবং রক্ষক। আবার তিনিই প্রাণীদিগের একমাত্র গতি। পরমর্ষি গুরুনাথ প্রণীত ব্রহ্ম স্তোত্রে লিখিত আছে:—"ত্বং ভীষণো ভীষণ ভাবকানাং পাতুশ্চ পাতা চ ভয়ং ভয়ানাম্। ভয়াপহারী বিপদন্নিবারি, সুরক্ষকঃ সজ্জনহৃদয়ে বিহারী॥ নাথোঽস্তনাথস্য চরাচরস্য বাচামগম্যো মনসোঽপ্যবার্য্যঃ। ত্বং জ্যোতিষাং জ্যোতি-রমূল চারু জগন্মোহনস্তেঽস্তুভবেন শান্তিঃ॥ স্রষ্টা চ পাতা কৃপয়া কৃপাপূর্ণ্যাম্যাকল্যাণদ পাপশাস্তা। প্রেমামৃতানন্দ অনন্ত ধাম দয়া ভবান্ পাসি বিমোচ্য পাপাৎ॥" ইহাতেও দেখা যায় যে ব্রহ্মে বিপরীত গুণের মিলন হইয়াছে। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন:—"তিনি (ব্রহ্ম) যেমন অনন্ত দয়াময় বলিয়া পুণ্যের পরম পুরস্কার দাতা, তেমনই অনন্ত ন্যায় পরায়ণ বলিয়া পাপীর পক্ষে উচিত অবধরণ ও উপযুক্ত দণ্ডদাতা। এ কারণ অনুভূতি ঈশ্বর প্রাণ শাস্ত্র[illegible] মহিমার বর্ণনা কালে লিখিয়াছেন যে:—"যদ্যপি

কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥" কঠোপনিষদ্ ব্রহ্মকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার উঁহা তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ও বলিয়াছেন। সুতরাং যিনি শিব, তাঁহার মধ্যে প্রেমময়ত্ব এবং রুদ্রত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। অর্থাৎ যিনি শিব, তাঁহার মধ্যে অনন্ত কোমল অনন্ত কঠোর গুণের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ব্রহ্মকে শিব ভাবেই দেখিয়াছেন। উঁহাও বলিয়াছেন যে যিনি শিব, তিনি রুদ্রও বটেন। তাই ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন:— "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" সুতরাং শিবের প্রসন্নমুখ বা কোমল গুণ—প্রেম, দয়া, করুণা, কৃপা প্রভৃতি আছে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে বহুগুণ বিভূষিত মহাপুরুষ পরমর্ষি ভোলানাথকে পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শিব এবং রুদ্র—উভয় আখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। সৃষ্টিতে ভীষণ ভাব কেন? ইহার বিস্তারিত আলোচনা "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে একটী বিষয় সম্বন্ধে মাত্র আলোচনা করা যাউক্। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? উহা ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে গ্রন্থের বহু স্থলে বিশেষতঃ "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে আমরা যদি গভীর ভাবে জীবন পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে আমাদের জীবন যেন পরীক্ষাময়। যে স্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধা অবশ্যম্ভাবী। আবার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে দুঃখ ভোগও অনিবার্য্য। আমাদের পদে পদে বাধা। এই বাধা যতই অতিক্রম করিতে পারিব, ততই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। এই পরীক্ষার জন্যই আমাদের সম্মুখে মোহান্ধকার উৎপাদন প্রয়োজনীয়। তাই আমাদের হৃদয়ে রিপু, পাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আমরা মোহান্ধকার বশতঃ ঈশ্বরকে, তাঁহার ধর্ম্মকে অস্বীকার করি, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, দেহ-সর্ব্বস্ব বা ইহ-সর্ব্বস্ব হইতে চাই, তাই আমাদের যত দুঃখ দৈন্য

উপস্থিত হয়। আমরা আমাদের অন্যায় কর্ম্মের ফল ভোগ করি। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে, মোক্ষমার্গে চলেন, তিনি এই সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার জীবন সফল এবং জন্ম সার্থক হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদে ইহার একটী প্রকৃষ্ট উপমা আমরা প্রাপ্ত হই। প্রজাপতির প্রথম উপদেশ লাভ করিয়াই বিরোচন মনে করিলেন যে দেহই আত্মা, সুতরাং দেহই সমুদায়। অসুরগণের মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া তিনি তাহাদিগকেও সেইরূপই জানাইলেন। তাই অসুরগণ মোহান্ধকারেই থাকিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের সম্মুখে পরপর তিনটী পরীক্ষা উপস্থিত করা হইল। তিনি তিনবারই মোহগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু সাধনার বলে তিনি সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে আমাদের পরীক্ষার জন্য মোহান্ধকার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজাপতিকে কেহ কেহ উপদেষ্টা ঋষি বলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সংবাদটী রূপকে পূর্ণ এবং তাহা এই যে ব্রহ্ম সকলের সম্মুখেই পরীক্ষা আনয়ন করেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্মোপাসনা ও তপ সাধনা করেন, তিনি অবশেষে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম পদ লাভ করেন। আর যিনি পরীক্ষার মর্ম্ম না বুঝেন, আপাত মধুর বিষয় রাজ্যেই বিচরণ করেন, সুতরাং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন, তিনি দুঃখেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। তিনবার পরীক্ষার অর্থ এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতে সর্ব্বত্রই পরীক্ষা আছে। এই তিন ভাবের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই পূর্ণ দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায় বা পূর্ণামুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি স্থূল ভাবের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তিনি দেহ-সর্ব্বস্ব ভাবে আসুরিক জীবন যাপন করেন। মনুষ্য জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—পশু জীবন, মানব জীবন এবং দেব জীবন। যাহারা স্থূল ভাবের পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য্য হইয়া নিম্নতম স্তরের জীবন যাপন করেন, এবং দেহকেই আত্মা মনে করেন,

সুতরাং ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পরলোক অস্বীকার করেন, সেই সকল মানুষই পশুরাজ্যে বিচরণ করেন। আর যাহারা এই শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন এবং ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও পরলোক স্বীকার করেন এবং কিছু কিছু সাধন ভজনও করেন, কিন্তু সবিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন না, তাহারা মনুষ্য জীবন যাপন করেন। যিনি পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীবনের পরীক্ষা রাশি হইতে উত্তীর্ণ হন এবং যিনি ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা সবিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, তিনি দেব জীবন যাপন করেন। এই তিন জীবনেই যথেষ্ট পরীক্ষা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরীক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আমাদের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী পরীক্ষা—পদে পদে পরীক্ষা। কারণ, ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সৃষ্টি লীলা কি? অপূর্ণতা হইতে পূর্ণত্বে গমনই সৃষ্টিলীলা। সাধনা দ্বারা ও ভগবৎ কৃপা লাভে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। তাই আমাদের সুদীর্ঘ জীবন সাধনার বা সাধনার জন্যই জীবন। সাধনা দ্বারা ও ভগবৎ কৃপালাভে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা ক্রমশঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবনে সাধন করিব, ইহার জন্যই আমরা জগতে প্রেরিত হইয়াছি। ইহা ভিন্ন জীব ও জগতের সৃষ্টির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই জন্যই জড় জগৎ ও জড়োৎপন্ন দেহ সমূহ বাধা স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার এই জগৎ ও দেহের সাহায্যে জাগতিক বাধা সমূহ কতক পরিমাণে অতিক্রম করা যায়। কণ্টকেনাবিদ্ধ কণ্টকম্। প্রজাপতি ঋষি নহেন। তিনিই ব্রহ্ম। এস্থলে রূপকে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই আমাদের সম্মুখে ত্রিবিধ বাধা বিঘ্ন সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি চাহেন যে আমরা সাধনার বলে এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করি। এই সংবাদ যদি রূপকে আবৃত না হইত, এবং প্রজাপতি যদি ঋষিই হইতেন, তবে তিনি দেহকে আত্মা, স্বপ্নাবস্থ মানুষকে আত্মা এবং সুষুপ্তাবস্থ

মানুষকে আত্মা বলিতে পারিতেন না এবং সর্ব্বশেষে তিনি প্রকৃত আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু বলিবেন না, ইহাও বলিতে পারিতেন না। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন (৮।৮।৪ মন্ত্রে) যে তিনি ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রকৃত আত্মার তত্ত্ব জানান নাই, বরং দেহ-কেই আত্মা বলিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থ ও সুষুপ্তাবস্থ মানুষ যে আত্মা নহে, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল যে আত্মা সম্বন্ধে তিনি তিনবার মিথ্যা উপদেশ দিয়াছেন। ইহা একজন ঋষির পক্ষে বা দেবতার পক্ষে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে তিনি নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে শিষ্যকে উঠাইয়া উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষার নিয়ম এইরূপ হইলেও ঋষির পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ অসম্ভব। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মই স্বয়ং আমাদের সম্মুখে বাধা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই মোহান্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধনা বলে ও ভগবৎ কৃপা লাভে এই অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া জানিতে হইবে, সকল বাধা বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে ও সকল অন্ধকার দিব্যজ্ঞান-জ্যোতিঃতে নিঃশেষে শেষ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা গেল যে বাধার জন্য বাধা নহে, শাস্তির জন্য শাস্তিও নহে, কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই এই সকল পরীক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সুতরাং জগৎ নিত্য মঙ্গলে পরিপূর্ণ। কোথায়ও বিন্দু মাত্রও অমঙ্গল নাই। পরমর্ষি গুরুনাথের সঙ্গীত দ্বারা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "অনন্ত মঙ্গলময় পিতা যে আমার, মঙ্গলে এ অমঙ্গল রচে শুধু যাঁর। তিনি যে মঙ্গলময়, চাও কি তাঁর পরিচয়? পরিচয় বিশ্বময় দেখ একবার। বাসনা মঙ্গল করে, কিন্তু নাহি শক্তি ধরে, কেন নরে তাহা পারে মঙ্গল উদ্দেশে তাঁর। অমঙ্গল রাশি হ'তে সুমঙ্গল বিধি রচে, সদা জন্মে জগতে, মঙ্গল ভাবেতে তাঁর। আত্ত-দুঃখ-কথা কে'রে, কেন চপলতা ধরে? কেন বিরক্তা পরে, বিঘ্ননাশী সুধাভার।"

ওঁ সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারণং অনন্ত-মঙ্গলময়ং ওঁ

ওঁ

সুখ সুখ সদা চাহ, সুখের তত্ত্ব নাহি লহ,
দুঃখময় সুখ বহ, লভিলে না সুখ জীবনে।

(তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত)

অষ্টম পরিশিষ্ট

পৃথিবীতে কি একমাত্র দুঃখই বর্ত্তমান?

বুদ্ধদেব যখন রাজপুত্র ভাবে গৃহে ছিলেন, তখন তিনি দুঃখের নানাবিধ চিত্র দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব পুত্রের নিকট যাহাতে দুঃখ জনক চিত্র না উপস্থিত হয় এবং কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন না। অবশেষে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধদেব মানবের দুঃখ নিরসনের জন্য সৎপথ আবিষ্কারার্থ গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই যে তাঁহার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা, তাহা হইতেই বৌদ্ধগণ বলেন যে জগতে কেবল দুঃখই বর্ত্তমান, ইহাতে কোনই সুখ নাই। এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। বুদ্ধদেব কি প্রকারের দুঃখ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন? মৃত্যুর চিত্র, জরাগ্রস্তের চিত্র ইত্যাদি। অবশেষে তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ এবং তৃষ্ণা নিবারিত হইলেই সকল দুঃখ নিবারিত হইবে। তৃষ্ণা যে বহু দুঃখের কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র তৃষ্ণা নিবারণ দ্বারাই সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ

করিতে পারা যায় না। ইহা ত অভাবাত্মক বিধান। নানাবিধ কামনা বাসনা অবশ্যই দমন করিতে হইবে, কিন্তু হৃদয়ে নিহিত আত্মিক গুণরাশির যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ সাধন না করিতে পারিলে আমাদের দোষপাশরাশির বিলয় সাধন অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে বিকশিত না হইলে কামরিপুর বিলয় সাধন হয় না। উহা দমনে থাকিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম লাভের পূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ ন্যায়পরতা গুণের পরমোৎকর্ষ না হইলে ক্রোধ নামক রিপুর লয় হয় না। ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হৃদয়ে না জন্মিলে বিষয়ের প্রতি লোভ লয় প্রাপ্ত হয় না ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃত ভাবে দুঃখ নিবারণ কেবল মাত্র তৃষ্ণা নিবারণ দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু নানা প্রকারের তৃষ্ণা উহাদের corresponding আত্মিক গুণরাশির পরমোন্নতি দ্বারাই নিবারণ করা একমাত্র সম্ভব। আবারও বলি যে নানাবিধ রিপুপাশ দমন করা যায় ও দমনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু উহাদের লয় ভিন্ন তৃষ্ণার একেবারে নিরসন হয় না বা হইতেও পারে না। আবার রিপু পাশের লয়ের অর্থই নানাবিধ আত্মিক গুণের পরমোন্নতি লাভ। দমনে ও লয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আর আত্মিক গুণের অত্যন্ত বিকাশ ভিন্ন দোষ পাশরাশির সম্পূর্ণ লয়ও অসম্ভব। ইহা যখন সত্য, তখন ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা আত্মিক উন্নতি এবং অবশেষে ব্রহ্ম-দর্শন লাভ হইলেই সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। কেবল তৃষ্ণা জনিত দুঃখই যে নিবারিত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু সেই অবস্থা লাভে অনন্ত আনন্দও লাভ হইবে। সেই আনন্দ ভাবাত্মক এবং অসীম। উপযুক্ত সাধন ভজনে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণ রাশির পরমোৎকর্ষ লাভ করা যায়। আমরা অত্যন্ত অপূর্ণ। আমাদের উদ্দেশ্য অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতা লাভ। অভাববোধের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিবেই। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য

ব্যাকুলতাও থাকিবে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্তই দুঃখ বর্ত্তমান থাকিবেই। আমরা আনন্দ ধাম হইতে আসিয়াছি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। (তৈত্তেরীয়োপনিষদ্-৩।৬)।" "বঙ্গানুবাদ:—যে হেতু আনন্দ হইতেই এই প্রাণি-সমূহ জন্মে, জন্মিয়া আনন্দ দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। (তত্ত্বভূষণ)।" সেই জন্যই আমরা আনন্দই চাই। আমরা সত্য আনন্দ লাভ করিতে পারি না বলিয়াই মিথ্যা পাতলা আনন্দ উপভোগের জন্য ব্যস্ত হই। অর্থাৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাই। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা যেন হৃদয়ের গতি ফিরাইয়া দেই। অর্থাৎ প্রকৃত সুখের আস্বাদনের জন্য যেন আমরা ব্যাকুল হই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা যাইবে না। অপূর্ণের আকাঙ্ক্ষা যাইতেও পারে না। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু ভিন্ন হইতে পারে এবং তাহাই আমাদের করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা তৃষ্ণা তৃষ্ণার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার ঊর্দ্ধগতি হইলেই নীচ বাসনা কামনা ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইবে। মাধ্যাকর্ষণে যেমন বস্তুকে নীচের দিকে টানিতেছে, সেইরূপ জড় সম্পর্কিতা বাসনা কামনাও আমাদিগকে নীচের দিকেই টানিতেছে। সুতরাং আমাদিগের আকাঙ্ক্ষাকে ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। সেই কার্য্য কষ্ট সাধ্য বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। কারণ, উহা আমাদিগের চরম লক্ষ্য এবং অনন্ত মঙ্গলময়ের বিধানে তাহাই সংসাধিত হইবে। এখন দেখা যাউক্ আমরা কোন্ প্রকারের দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাই। বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে যে সকল দুঃখময় চিত্র দেখিয়াছিলেন, উহারা সকলেই পার্থিব দুঃখ প্রকাশক। বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণ দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা কালেও প্রকাশ করেন যে পৃথিবীতে দুঃখই বর্ত্তমান, কিন্তু সুখ মোটেই নাই এবং দুঃখের বর্ণনা কালে পার্থিব দুঃখেরই বর্ণনা করেন। যদি পার্থিব

দুঃখই একমাত্র দুঃখ হয়, তবে অসংখ্য প্রকারের পার্থিব সুখও বর্ত্তমান। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বৌদ্ধদিগের ন্যায় বলেন যে পৃথিবীতে একমাত্র দুঃখই বর্ত্তমান। কত দৈব দুর্ঘটনা সর্ব্বদা জগতে সংঘটিত হইতেছে, কত পুত্রহারা জননীর শোকসূচক আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে, কত পতিহারা সতী বিচ্ছেদানলে সন্তপ্ত দগ্ধ হইতেছেন, কেহ কেহ বা শোকে দুঃখে কালের কবলে পতিত হইতেছেন, কেহ কেহ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত হইতেছেন, কেহ কেহ বা অন্নাভাবে দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন, কেহ কেহ বা বিষম রোগ যন্ত্রণায় সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং অবশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন। এইরূপ এইরূপ শোক দুঃখের অসংখ্য প্রকারের চিত্র জগতে বর্ত্তমান। দুঃখ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেও বহু সহস্র গুণে গাঢ়তর কৃষ্ণ চিত্র সত্য ভাবেই প্রদর্শন করা যায়। কিন্তু বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও পার্থিব সুখ ও আনন্দের চিত্রও অসংখ্য। বহু স্থলে মাতা পিতা পুত্র কন্যা দ্বারা সুখী হইতেছেন, দম্পতি গভীর প্রেমে মিলিত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছেন, ধনী ধন দ্বারা বহু বহু প্রকার সুখ ভোগের সামগ্রী আহরণ করিতেছেন, পার্থিব সুখের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই অনায়াসে লাভ করিতেছেন, সবল শক্তির প্রয়োগে নানা প্রকার সুখ লাভ করিতেছেন, বিদ্বান্ বিদ্যা চর্চ্চা দ্বারা অপূর্ব্ব সুখ লাভ করিতেছেন, যশস্কর কার্য্য করিয়া লোক যশস্বী হইতেছেন এবং সেই জন্য তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ থাকে। এইরূপ এইরূপ সহস্র সহস্র প্রকারের সুখ মানুষ সম্ভোগ করিতেছে। সুখবাদী আরও বলেন যে মানুষ দুঃখ হইতে সুখেই অধিকতর কাল কাটায়। কত জননী পুত্র হারা হইয়া চিরকাল শয্যাশায়িনী থাকেন? কত সতী সাধ্বী পতি হারা হইয়া শোকে দুঃখে দেহত্যাগ করেন? তাঁহাদের সংখ্যা নগন্য। প্রায় সকলেই শোকের প্রথম আঘাত কিছু দিন সহ্য

করিয়া পুনরায় সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কালই তাঁহাদের শোক দুঃখ হরণ করে। তাহারা আবার হাসি মুখে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করে, কেহই চির বিষাদিত থাকে না। আমাদের মতে দুঃখবাদী ও সুখবাদী উভয়েই ভ্রান্ত। পৃথিবীতে কেবল দুঃখই বর্ত্তমান, কোনই সুখ নাই, ইহাও যেমন মিথ্যা, পৃথিবীতে একমাত্র সুখই আছে, কিন্তু দুঃখ নাই, ইহাও সেইরূপই মিথ্যা। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে পৃথিবীতে সুখ দুঃখের পরিমাণ সমান। সুখ লাভ করিতে হইলে প্রথমে দুঃখ বরণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু দেখা যায় যে দুঃখ বিনা সুখ লাভ না হইলেও, যে পরিমাণ দুঃখ পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ সুখ লাভ হয়। ক্ষুধার তীব্রতা থাকিলেই আহারে অধিক তৃপ্তি লাভ করা যায়, ক্ষুধা শূন্য অবস্থায় আহারে প্রবৃত্তি হয় না। অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলেই জল পানে আনন্দ হয়। অত্যন্ত গরমে পরিশ্রম করিয়া শীতল জলে স্নানই সুখ দায়ক। কে না জানেন যে অত্যন্ত গরমের পর বহুক্ষণ ব্যাপিনী বর্ষা কতই আনন্দের কারণ হয়? অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে পৃথিবীতে বহু দুঃখ আছে, ইহাও যেমন সত্য, তেমনি ইহাতে বহু সুখও সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আবার দেখা যায় যে জীবনে সুখের পর দুঃখ, অথবা দুঃখের পর সুখ আসিতেছে। এমন হয় না যে কোনও ব্যক্তি সুদীর্ঘ জীবন অবিমিশ্র দুঃখেই যাপন করে, তাহার অদৃষ্টে ক্ষণ কালের জন্যও সুখ-সূর্য্য উদয় হয় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। এই সম্পর্কে আরও একটা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাহা এই যে জগতে সুখ এবং দুঃখ সম পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু সুখের শক্তি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা। যদি তাহাই না হইত, অর্থাৎ দুঃখের শক্তি যদি সুখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা হইত, তাহা হইলে সংসার শ্মশানে পরিণত হইত। দুঃখ জগতে আছে সত্য এবং আমরা দুঃখ ভোগ করি, ইহাও সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুখেই বাস করি। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে বহু ক্ষেত্রে দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় হাসি মুখে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাগতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা

করা যাউক্। আকর্ষণের শক্তি বিকর্ষণের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা না হইলে বিশ্ব রচিতই হইতে পারিত না। ইহাতে কোনই শৃঙ্খলা থাকিত না, কেবল chaos and confusion-ই বর্ত্তমান থাকিত। সেইরূপ দুঃখের শক্তি অপেক্ষা সুখের শক্তি বলবত্তরা বলিয়া পৃথিবী জীববাসের উপযুক্ত হইয়াছে। দুঃখ বহু প্রকারের। যথাঃ—(১) অভাব জনিত দুঃখ। (২) দোষ ও পাপ ও তজ্জনিত পাপোৎপন্ন দুঃখ। (৩) প্রেম জনিত দুঃখ। (৪) অপূর্ণতা জনিত দুঃখ।" "প্রথমতঃ—অভাব জনিত দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সদ্য জাত শিশু হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই অল্পাধিক অভাব জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমন কোন লোক নাই, যিনি আজীবন এই দুঃখ হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন। যিনি যত বড় ধনীই হউন অথবা আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতই হউন, তাঁহার নানা প্রকারের অভাব থাকিবেই, সুতরাং দুঃখও অনিবার্য্য। তবে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত ব্যক্তি এইরূপ বহু অভাব অগ্রাহ্য করেন। আবার এমন অত্যুন্নত মহাত্মাও আছেন, যিনি সেই সকল অভাব অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্তের দান বলিয়াই হাসি মুখে শিরোধার্য্য করেন। সুতরাং সেই অভাব তাঁহাকে দুঃখ দান করে না। কিন্তু সাধারণ মানব এইরূপ দুঃখ অর্থাৎ অভাব জনিত দুঃখের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়। এমন বহু অভাব মানব জীবনে উপস্থিত হয়, যাহাকে তৃষ্ণা জনিত দুঃখ বলা যায় না। যথা—উপযুক্ত অন্নাভাব, উপযুক্ত বস্ত্রাভাব, উপযুক্ত অর্থাভাব ইত্যাদি। "উপযুক্ত" শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে যে যাহা না হইলে নয়, এমন পরিমাণ ও এমন প্রকারের বস্তুর অভাব। শরীর রক্ষণাবেক্ষণোপযোগী খাদ্যের অভাব হইলেই অন্নাভাব বলা যায়, লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার উপযোগী বস্ত্র না থাকিলেই বস্ত্রাভাব বলা যায়। স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার অর্থ না থাকিলে, সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ না থাকিলে বা এইরূপ

অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ না থাকিলেই অর্থাভাব বলা যায়। এইরূপ অন্যান্য অভাবও আছে, যাহা আমাদের জীবনে আমাদের আকাঙ্ক্ষা (তৃষ্ণা) ভিন্নও আগমন করে। উহাদিগকে কিছুতেই এড়াইয়া চলিতে পারা যায় না। সাধারণ মানব এইরূপ নানা ভাবে অভাবগ্রস্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। সাধু মহাত্মাগণের জীবনে অভাবের দুঃখ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা বহু অভাব অগ্রাহ্য করেন। সাধারণে বহু অভাব সৃষ্টি করে। সাধুগণ অভাবকে নিম্নতম (minimum) সংখ্যায় আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন। তাঁহাদের জীবনের সাধনীয় মন্ত্র হয় Plain living and high thinking, তাই তাঁহাদের জীবনে অভাবের অল্পতা সাধিত হয়। পার্থিব অভাব ভিন্ন আধ্যাত্মিক অভাবের জন্য মানুষ দুঃখ ভোগ করে। সাধারণ মানব এইরূপ অভাবজনিত দুঃখ ভোগ করে না বটে, কিন্তু সাধকগণ ও উপাসকগণ গুণের অভাব এবং ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত অবস্থার অভাব জন্য বিশেষ দুঃখ ভোগ করে। দ্বিতীয়তঃ—দোষ ও পাপ এবং তজ্জনিত পাপোৎপন্ন দুঃখ। সাধারণ মানব সকলেই এই দুঃখ ভোগ করেন। আমাদের যত দুঃখ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশের মূল কারণ এই স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষ দোষ ও পাপ দ্বারা চালিত হইয়া নানা প্রকারের বহু অন্যায় কর্ম্ম করে। ইহাদের প্রভাব অত্যধিক। আমাদের কর্ম্মের ফল জন্ম জন্মান্তরে, ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা মাত্র পাপ হইতে, দোষ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানব ত সেই পথা অবলম্বন করে না। সুতরাং সে দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। অনন্ত মঙ্গলময়ের অমোঘ মঙ্গল বিধানে সে অবশ্যই এককালে সংপথ লাভ করে ও পাপ হইতে মুক্ত হয়। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে দোষ পাপ জয় করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। উহাদিগকে জয় না করা পর্য্যন্ত দমনে রাখিতে পারিলেও

বহু বহু পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। যে জীবনে রিপু পাশ প্রবল থাকে এবং যে মানব উহাদের দমনের জন্য কোনই যত্ন করে না, সে যে দুঃখেই জীবনাতিপাত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তৃতীয়তঃ—প্রেম জনিত দুঃখ। এই দুঃখ সকলেই অল্পাধিক ভোগ করেন, কিন্তু মহোন্নত ও পরমোন্নত মহাত্মাগণ এই দুঃখ বিশেষ ভাবে ভোগ করেন। এই দুঃখের শেষ নাই। মানব যতই উন্নত হইতে থাকিবেন, এই প্রকার দুঃখ তাঁহার জীবনে ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই সম্বন্ধে "স্রষ্টায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মানব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন, সুতরাং তাঁহাদের দুঃখ অল্প কয়েকটী ব্যক্তি সম্পর্কেই সংঘটিত হয়। কিন্তু মহাত্মাগণের প্রেমবৃত্তের পরিধি ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহাদের প্রেমের পাত্র হয়। তাঁহারা শেষে নিখিল জগতের প্রতি অভেদ জ্ঞান করেন। সুতরাং কীট কীটাণু হইতে পরমোন্নত পরমর্ষি পর্য্যন্ত তাঁহার অভেদ জ্ঞানের পাত্র হন। সুতরাং তাঁহাদের দুঃখে তাঁহারা (অভেদকারিগণ) দুঃখিত। চতুর্থতঃ—অপূর্ণতা জনিত দুঃখ। এই দুঃখ সাধারণ মানব কেন, অত্যুন্নত মহাত্মাগণও ভোগ করেন না। এই দুঃখ অত্যুন্নত পরমোন্নতদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমোন্নত, তাঁহারাই মাত্র ভোগ করেন। এইরূপ দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। সুতরাং ইহার বর্ণনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জীবনের উদ্দেশ্য অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতা লাভ। পূর্ণ বস্তু যে কি, তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা পৃথিবীর কোনও সাধকের আছে কিনা সন্দেহ। যে সাধক পরলোকে সাধনা ও ভগবৎ কৃপাদাতে অনন্ত প্রায় উন্নতি লাভ করিয়াছে. তাঁহার হৃদয়েই পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং তাহা পাইবার জন্য তিনি সাধনায় নিযুক্ত হন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের বহু প্রকারের দুঃখের

কথা (প্রেমজনিত দুঃখ ভিন্ন) পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা সকলই আমাদের অপূর্ণতা জনিত। সুতরাং সেই অর্থে আমরা সকলেই অপূর্ণতা জনিত দুঃখে দুঃখিত। কিন্তু এস্থলে "অপূর্ণতা জনিত দুঃখ" অর্থে বুঝিতে হইবে যে অত্যুন্নত মহাত্মাদিগের মধ্যে পরমোন্নত মহাত্মার পূর্ণতা লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তাহা পূর্ণ না হওয়ায় যে দুঃখ, তাহাই অপূর্ণতা জনিত দুঃখ। প্রেম জনিত দুঃখ ভিন্ন পূর্ণের অন্য কোন দুঃখ নাই বা থাকিতে পারে না। প্রেমজনিত দুঃখ তাঁহাতে বর্ত্তমান। Dr. Brojendra Nath Seal মহাশয় একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। 'He is Loving God and Suffering God.," জগতের জীবের দুঃখ সম্পূর্ণ রূপে নিবারিত হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মেই অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে। জীব তাঁহার হইতেই আসিয়াছে। সুতরাং জীবে অবশ্যম্ভাবিরূপে দুঃখ বর্ত্তমান থাকিবে। ব্রহ্মে দুঃখ কেন? এই প্রশ্ন সুকঠিন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা "ব্রহ্মায় বিপরীত গুণের মিলন" অংশে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে তাঁহাতে প্রেম জনিত দুঃখ ভিন্ন অন্য কোন দুঃখ নাই। তিনি নিত্য প্রেম স্বরূপ—পূর্ণ প্রেমামৃতসিন্ধু। আমরা তাঁহার প্রেমের পাত্র। আমরা নিত্যই তাঁহার প্রেমান্তর্গত। সুতরাং তিনি আমাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিত। আর একটী বিষয় চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মে দুঃখ বর্ত্তমান। তাহা এই যে তাঁহাতে দুঃখ না থাকিলে জীবে দুঃখ থাকিতে পারিত না। দুঃখ অভাব পদার্থ নহে। সুখের অভাব দুঃখ নহে, দুঃখের অভাবও সুখ নহে। উভয়ই ভাব পদার্থ। সুখের বিকৃতিও দুঃখ নহে। সুতরাং উহা আত্মার স্বরূপ। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের দুঃখ অধিকাংশ স্থলে স্থূল রূপে ও বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মে দুঃখ নিত্যই কারণাকারে বর্ত্তমান। তিনি সকল কারণের কারণ এবং কারণেরও অতীত।

যে সকল সাধক প্রেমে পরমোন্নত হইয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ দুঃখ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধারণা করিতে পারেন, সাধারণের পক্ষে ইহা ধারণা করা কঠিন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ব্রহ্মে দুঃখ যেমন অনন্ত, সুখও সেইরূপ অনন্ত। অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্ত সুখের ও অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্ব হইয়াছে। সেইরূপ একত্বই ব্রহ্মের একতম স্বরূপ। সাধারণ লোক যাহাকে সুখ বা দুঃখ মনে করে, ব্রহ্ম তন্মধ্যে কোনটাই নহেন। অথবা অনন্ত সুখের এবং অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্বই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের একটী স্বরূপ। সুতরাং জগতে অসীম প্রায় সুখ ও দুঃখ সমভাবে বর্তমান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মে যখন এক প্রকারের দুঃখ বর্তমান, জীবে কেন বহু প্রকারের দুঃখ। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই ব্রহ্মই অপূর্ণ জীব ভাবে ভাসমান হইয়াছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা। এই সম্বন্ধে "সৃষ্টির সূচনা" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি জড় জগৎ ও জড়দুঃখপূর্ণ দেহ আমাদের পরীক্ষার্থ বাধা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনা ও গুণ সাধনা দ্বারা এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে হইবে, ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তিনি অপূর্ণ ভাবে ভাসমান জীব-কুলকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছেন। এই পরীক্ষা নানাবিধ বাধা বিঘ্ন ভিন্ন অসম্ভব। তাই আমাদের নানাবিধ দুঃখ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মে যাহা বর্তমান, তাহাই জড় জীবে ও জগতে প্রকাশিত হয় না। উহাদের প্রকাশ নানা ভাবে বিকৃত হইবেই, অপূর্ণে স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রকারের দোষ ত্রুটীর আবির্ভাব হইবেই। এই সম্বন্ধে বহু স্থলে বিশেষতঃ "ব্রহ্মের জীব ভাবে ভাসমানত্বের প্রণালী" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে [illegible] জ্ঞান রাশি অন্তঃকরণ ও বহিরিন্দ্রিয়ের [illegible]

বাহিরে প্রকাশিত হয় এবং জড় সংসর্গে উহাদের বিকৃত ভাবের প্রকাশ সম্ভব হয়। যেমন সূর্য্যরশ্মি চির শুভ্র, কিন্তু উহা নানা বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া যখন গৃহে প্রবেশ করে, তখন উহা নানা বর্ণ ধারণ করে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে আমরা যাহাকে আপাত দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলি, তাহাও তিনি তাঁহার মঙ্গল গুণে মঙ্গলেই পরিণমন করেন। জগতে প্রকৃত ভাবে কোনই অমঙ্গল সংঘটিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে জগৎ ও দেহ যেরূপ বাধা প্রকাশ করে, উহাদের দ্বারা আবার সেই বাধা অতিক্রমের সাহায্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে বিশ্বে দুঃখ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সুখও সেই পরিমাণেই আছে। সুখের শক্তি দুঃখের শক্তি অপেক্ষা বলবত্তরা বলিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত সুখেই বাস করিতেছি এবং স্বয়ং ব্রহ্মেই অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা একত্র হইয়াছে। জীব ব্রহ্ম হইতেই আগমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার মধ্যেও সুখ ও দুঃখ বর্ত্তমান থাকিবে। জগৎ ও দেহ সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহারা এরূপ ভাবেই রচিত হইয়াছে যাহাতে উহারা আমাদিগের সুখ ও দুঃখ প্রদান করিতে সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং জগতে একমাত্র দুঃখই বর্ত্তমান, কিন্তু সুখ মোটেই নাই, ইহা সত্য নহে।

ওঁ অনন্ত-সুখ-দুঃখময়ং ব্রহ্ম ওঁ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৭	ne	One
১২	৮	পরস্পরাভাবে	পরস্পরাভাবে
১৪	১১	নিম্নোদ্ধত	নিম্নোদ্ধৃত
১৪৮	৬	Absolutelv	Absolutely
১৪৯	১২	ভবন্তি	ভবন্তি,
১৫৯	৭	সূর্যকে	সূর্য্যকে
১৭৮	১৮	বিষম	বিষয়
১৮৩	১১	"মহকল্পান্তে"	"মহাকল্পান্তে"
৩৬০	৬	Neutraised	Neutralised
৩৮৯	ফুটনোট-৫	অধমর্ন	অধমর্ণ
৫৪১	শেষ	খেন	দেখেন
৫৫৯	ফুটনোটের আগে লম্বা লাইন হবে।		
৫৫৩	১৬	অসম্ভব সীমা	সীমা
৬০৮	ফুটনোট-৫	দোশ	দোষ
৬০৯	১২	কার্যের	কার্য্যের
৬৪৪	১৩	সচ্চিদানন্দস্ব-রূপ	সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ
৬৮৩	৪	রজঃ-সত্ত্ব-	রজঃ-সত্ত্ব-
৭৪৭	পৃষ্ঠানং	৬৪৭	৭৪৭
৮০৫	১৬	পায়ে	পায়ে
৮৪৯	৩	হইতে	হইতেই
৮৫০	১২	অমঙ্গলে	অমঙ্গলের